CUC-H04265-11-P030381

বিচিত্রা

সচিত্র মাসিক পত্র

P30381

11

১০ম বর্ষ, প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ—পৌষ, ১৩৪৩

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY
Acc. No.......
Book No.........

756·3
0056

সম্পাদক

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল্

পরিচালক

সুশীলচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, ডি-লিট্ (প্যারিস্)

বিচিত্রা নিকেতন লিঃ

২৭।১ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বার্ষিক সডাক মূল্য—৬৷৹

বিষয়-সূচী

(শ্রাবণ—পৌষ, ১৩৪৩)

বিষয়		পৃষ্ঠা
(উপন্যাস)—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়		৫৪, ২৪৮, ৩৬১, ৫১৮, ৬৪১, ৭৭৭
—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ	...	৮৩২
হির—শ্রীউমাপদ চট্টোপাধ্যায়	...	৫১০
শ্রীঅলোক রায়	...	৩৫১
মতী উষা বিশ্বাস	...	১০৮
—শ্রীকার্ত্তিক শীল	...	৮০০
শ্রীশান্তি পাল	...	৩৮০
—শ্রীনির্ম্মল মুখোপাধ্যায়	...	৩৫০
দেবী—শ্রীনবগোপাল দাস	...	৪২৪
—শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়	...	৫০৬
ব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য	...	৮১৯
শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	৭৪২
উপন্যাস)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৭,১৪৫
-শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার	...	৬৫৫
ও অভিনয়—শ্রীবিজন আচার্য্য	...	৩৭১
-শ্রীপ্রিয়তোষ দাশগুপ্ত	...	৪১১
নিবেদন—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র	...	৪৫
-শ্রীকর্ম্মযোগী রায়	...	৬২১
গুয়ান মেয়ে—শ্রীহৃষীকেশ মৌলিক	...	৪৭৭
শ্রীগিরিজাকুমার বসু	...	৪২৭
শ্রীকর্ম্মযোগী রায়	...	৩২৭
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার	...	৪৩০
ব্য—শ্রীসরোজকুমার মজুমদার	...	২২৬
শ্রীফণিভূষণ মৈত্র	...	৫৯২

বিষয়		পৃষ্ঠা
আলোচনা—শ্রীবসুধা চক্রবর্ত্তী	...	২৬৪
ইয়োরোপা—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ	...	২৭,১৬৯, ৩০৩,৫৪১,
ইম্যুউনিটী—ডাক্তার	...	৫৩৬
উন্মেষ—শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা	...	৫৯৯
উপন্যাসের উপযোগীতা—শ্রীরাইমোহন সামন্ত	...	৩৪৮
উল্কা—শ্রীশরদিন্দু সেনগুপ্ত	...	৪৬০
একটি পিকচার পোষ্ট-কার্ড—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার	...	৪৮৬
কবি আমি নই—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ	...	২৯৪
কবিতা-পাঠ—শ্রীনবেন্দু বসু	...	১৫,৮০৮
কবির প্রতি—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার	...	৭৬
কল্পনা ও বাস্তব—শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তফী	...	৭৭৬
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মুসলমানের অভিযোগ ও তাহার স্বরূপ—মঃ রেজাউল করীম	...	১৬৯
কাব্যের ভূমিকা—শ্রীভোলনাথ ঘোষ	...	৩৩৫
কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে—শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায়	...	৭৭২
খেলা-ধূলা—শ্রীবিনয় রায়চৌধুরী	...	১২১,২৬৫
গরীবের বউ—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু	...	৩৭০
গান—শ্রীমমতা মিত্র	...	৩১৮
গাহিতে এসেছি গান—মনসুর-উর-রহমান	...	৪৮৫
চতুরঙ্গের কলাকৌশল—শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়	...	৭৮৬
জগদম্বা মেস (নাটক)—শ্রীসুবোধ বসু	...	৪৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
জাগো পুরুরবা জাগো—শ্রীমাধুরী ভট্টাচার্য্য ...	৭৭১
জানিনে তবু রয়েছি পথ চেয়ে—শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায় ...	৫১৩
জীবনের জয়যাত্রা—শ্রীকালীচরণ মিত্র ...	৪০৪
জীবিত অবস্থায় অর্দ্ধমৃত—ডাঃ এস, সি, সেন ...	৬৭২
ডাক-ঘর—শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার ...	৭৩৭
তবু, কিছু কি বলো—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর ...	৩৯৬
তামিল জাতির উৎপত্তি ও প্রাচীন ইতিহাস শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল ...	৪৭ ... ১৭৭,৩১৯
তুমি চলে গেছ—শ্রীঅমিয়কুমার রায়চৌধুরী ...	৮৪০
তৈল—শ্রীরাইমোহন সামন্ত ...	৬৮৯
দক্ষিণেশ্বর—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪৫৯
দাবী—শ্রীসুপ্রভা দেবী ...	১২
দার্জ্জিলিঙ, পাহাড়—অমি মিত্র ...	৪০৭
দীনেন্দ্র প্রয়াণে—জসীম-উদ্দীন ...	৪৪৮
দেশাধীপের মৃত্যু—ডাঃ সোমনাথ সাহা ...	৬০৫
দেশের কথা—শ্রীসুশীলকুমার বসু ...	৯৫,২৩৬, ৪১২, ৫২৫, ৬৭৭, ৮১৩
দৈবজ্ঞ—শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা ...	৪৮৩
দ্বন্দ্ব—শ্রীমমতা মিত্র ...	৮৬
দ্বৈতী—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ...	৩০১
নটনারায়ণ—শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য ...	৩৭৪
নদী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ...	৪২২
নন্দিনী—শ্রীইন্দ্রাণী দেবী ...	৭৪৩
নবদ্বীপে মাধুকরী (প্রবন্ধ)—শ্রীজনরঞ্জন রায় ...	২১
নবদ্বীপে মাধুকরী (প্রতিবাদ) শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় ...	৬৭৩
নলিনীদলগত—শ্রীসত্যরঞ্জন সেন ...	৬৬১
নানাকথা	... ১৩৪,২৭৪, ৪১৮, ৫৬০, ৭০০,৮৪১
নিশিগন্ধা—শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ...	১৩২
নিঃস্ব—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ...	৮৭
পঞ্চমী—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ...	
পত্রকথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	
পরম মুহূর্ত্ত—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ ...	
পরিচয়—শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় ...	
পলাশফুল—শ্রীমোহিনীমোহন পাল ...	
পল্লী ও নগর—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ...	
পল্লী-বর্ষা—শ্রীশান্তি পাল ...	
পাপিয়া ও রক্তগোলাপ—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য ...	
পালাগানে মানুষ ও প্রকৃতি—শ্রীকামিনীকুমার রায় ...	
পাষাণ—স্বর্গীয় সুকুমার সান্যাল ...	
পাঁজির ভুল—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ...	
পুস্তক-পরিচয় ...	৫৫৬, ৬৮৯,
পূর্ণিমা রাতে—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ ...	
প্রতীক্ষা—শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী ...	
প্রবালপুরীর মেয়ে—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ ...	
প্রশ্ন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ...	
প্রসূতী ও গর্ভকালীন পরিচর্য্যা শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ...	
প্রেমের অভ্যুদয়—শ্রীমমতা মিত্র ...	
প্রেমের গল্প—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য ...	
ফরিদপুর মুসলিম ছাত্রসম্মিলনী চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন ...	৫৩
ফুলতোলা—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর ...	৫৮৭
বঙ্গদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি শ্রীপরেশনাথ দাশগুপ্ত ...	৩৮৮
বঙ্গসাহিত্যে হুগলী কলেজের দান শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার ...	৭৬১
বন্দী ভগবান—শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী ...	৩৪
বরষা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র ...	১৭
বাণী—শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা ...	৭৮৫
বারতা—শ্রীসুপ্রভা দেবী ...	৪

য়	পৃষ্ঠা
মেয়ে—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর ...	৪২৮
ত গিরিপ্রান্তরে—শ্রীমৃগাঙ্কমৌলি বসু ...	৬১৯
বঙ্গে ম্যুরাল পেন্টিং	
চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ...	৭৫৩
র চিত্রকলা—শ্রীযামিনীকান্ত সেন ...	৪৪২
বরণ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৩৭
প্রসঙ্গ ...	৫৫৪
প্রকৃতি—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩৩,
১৬৩, ৪৩৭, ৫৮৮,	৭৩৩
া—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু ...	৫০৪
—শ্রীদিলীপকুমার পুরকায়স্থ ...	১৮
গান—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ...	২০
ব ফল—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য ...	১৯২
প্রবাসী বাঙ্গালীদের আর্থিক অবস্থা ...	
শ্রীপঞ্চানন ভৌমিক	৫৩১
তে লাগে ভাল—শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায় ...	৭৪৯
যাই পৃথিবীরে	
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ...	৬৩৩
রতী—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ...	৫০৭
শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ...	৬১০
চল ফ্যারেডে—শ্রীনীলরতন কর ...	৫৬৯
র মায়া—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার ...	৫৭৩
ন—শ্রীশান্তি পাল ...	৩২৫
ন্যবতী—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৭২৮
নতি—শ্রীইন্দুবালা মজুমদার ...	২৭৩
লন—শ্রীসুবোধকুমার পুরকায়স্থ ...	৯৪
ক্ত মিলন—শ্রীশ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬৩
রাজ্যে গুপ্তচর বিভাগ	
শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী ...	৩৫৮
সাহিত্য সমাজ—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩৯
বে চলে—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৬৫৪
পথে—শ্রীঅচ্যুত রায় ...	৩২৭
নবিজ্ঞা—ফজলুস্ সালাম ...	৩৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
রথের দিনে—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ...	৩৮২
রবি-বাসর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১
রবি-বাসর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪২১
রহস্যময়ী—শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা ...	৪১৮
রাজহংস—শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	৫১১
রৌদ্রসমুদ—শ্রীপ্যারিমোহন সেনগুপ্ত ...	৬৩৪
লীলার সাথীতো বোবা নহি	
শ্রীপ্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৪৬৭
শরৎ—মনসুর-উর-রহমান ...	৬৯৯
শরৎচন্দ্র কি ব্রাহ্মসমাজের উপর অবিচার করিয়াছেন	
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল ...	৬৮৫
শরৎচন্দ্রের প্রতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৬৩ ৯৬৩
শরৎ-সাহিত্যে নারী—শ্রীকনককান্তি ঘোষ ...	৪৯২
শরতের গান—শ্রীফাল্গুনী রায় ...	৩৩৪
শান্তি-বীথি—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য ...	৫০৩
শিল্পী শ্রীযুক্তবিষ্ণুচরণ চৌধুরীর একখানি ছবি—	
শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ...	২৯৫
শীতের বাঁশী—শ্রীতরলিকা দেবী ...	৫৮৬
শুভলগ্ন—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ...	৭৯৯
শৈব্যা—শ্রীবীণা দেবী ...	৫৩৯
শ্মশান—শ্রীশান্তি পাল ...	৮৯
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে পুঁথির লিপিকাল	
শ্রীনলিনীকান্ত দাশগুপ্ত ...	৫৫৪
শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীনিরুপমা দেবী ...	৬১৭
সনেট—শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায় ...	৩৬০
সনেট—শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী ...	৪৯৯
সমাজ, রাষ্ট্র ও বিজ্ঞান—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র	৭২৯
সর্ব্বব্যাপী প্রেম—শ্রীমমতা মিত্র ...	৪৯১
সাতমাইল—১৯৩৬—শ্রীশান্তি পাল ...	৮০৬
সিকিম ও তিব্বতে বারো দিন	
শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ...	৫৪৮
	৬৯৩, ৮৩৩
সিগারেট—শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার ...	৫৯৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
সুতপা—শ্রীঅবনীনাথ রায়	...	৫৭২
সুধীর বন্ধু—শ্রীজ্যোতির্মালা দেবী	...	৭৫০
সুশান্ত সা' (উপন্যাস)—শ্রীনীহারঞ্জন দাশগুপ্ত	...	৯০, ২৩২, ২৮৩, ৪১৯, ৫৬৭, ৭০৬
সূর্য্যাস্ত—শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার	...	৩৬০
সৌন্দর্য্য সাধনা—ডাঃ আর, দাস	...	৫৪০
স্ত্রী-যুদ্ধ (উপন্যাস)—শ্রীসুবোধ বসু		১১২, ১৮৭, ৩৭১
স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ—শ্রীউষা বিশ্বাস	...	
স্বর্গের আলো—শ্রীসুশীলকুমার দেব	...	
স্বপ্ন-মায়া—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ	...	
স্বপ্নের-মায়া—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী	...	
হসন্ত-অশান্ত-সংবাদ—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	
হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন—স্বামী আত্মানন্দ	...	
হৃদয়ের রক্ত—শ্রীনলিনীকান্ত শাস্ত্রী	...	

চিত্র-সূচী

(কেবল পূর্ণ-পৃষ্ঠ)

বিষয়		পৃষ্ঠা
অসীমের প্রতি (রঙিন)—শ্রীনির্ম্মল গুহ	...	৩৫০
কর্ম্মান্তে (রঙিন)—শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়	...	৪৯২
ছাগপালিকা (রঙিন)—শ্রীবিজয়কুমার সেন	...	৭২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেশন—(১৯৩৬)	...	২০৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা বিভাগ	...	২০৮
পল্লী-দৃশ্য (এক রঙা)—শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস	...	২৪
পল্লীশ্রী (রঙিন)—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সাহা	...	৫৬৩
প্রতীক্ষায় (রঙিন)—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ	...	
বঙ্গপল্লী (রঙিন)—শ্রীপূর্ণেন্দু দে ঘটক	...	
বনফুল (রঙিন) শ্রীধীরেনকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ	...	
বিদায়কালে (রঙিন)—শ্রীচিন্তামণি কর	...	
বিধবা (রঙিন) শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়	...	
সুরের রেশ (রঙিন) শ্রীসুধীব খাস্তগীব	...	
স্নানের ঘাট (উদয়পুর) (একরঙা) শ্রীঅনন্তকুমার বসু	...	

বিচিত্রা
শ্রাবণ, ১৩৪৩

বিধবা

শ্রীচৈতন্যদে

বিচিত্রা

দশম বর্ষ, ১ম খণ্ড	শ্রাবণ, ১৩৪৩	১ম সংখ্যা

রবি-বাসর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আমি তোমাদের রবি-বাসরের এই অধিবেশনে উপস্থিত হবার আহ্বান পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, প্রীতিলাভ করেছি। তোমাদের দেখে যেমন মুগ্ধ হচ্চি তেমনি তোমাদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছি এই রবি-বাসরের মধ্য দিয়ে। আমার সম্বন্ধে বরাবর দুর্লভতার একটা অভিযোগ চ'লে আসছে, তার বিরুদ্ধে আমার যা কিছু বলবার আছে তা বলছি। আমি অন্তরের ভিতরে খুবই জানি, সত্য ব'লে জানি যে, আমার এই অভিযোগের মূলে রয়েছে এমন একটা দুর্ব্বলতা, যে দুর্ব্বলতা ছেলেবেলা থেকেই আমার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আসছে। আজকালকার মত যখন আমার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েনি, পৃথিবীর নানাদেশের সঙ্গে যখন আমার কোনো কারবার ছিল না, খ্যাতির বিড়ম্বনা ছিল না, তখনও আমি আপনাকে দশজনের সুমুখে লোকসমাজের কাছে ধরা দিতে পারিনি। কেমন যেন একটা সঙ্কোচ আমাকে জনসমাজের কাছ থেকে দূরে রেখে দিয়েছিল। এজন্য আমাকে দায়ী করলে চলবে না। আমি ছেলেবেলায় যে পরিবেশের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি, সেখানে বাইরের সঙ্গে আমার যোগ ছিল অতি অল্প। আমি আপনার মনের মধ্যে নানা কল্পনার ছবি এঁকে চলতাম, বাইরের সঙ্গে কোনো সংস্রব আমার ছিল না ব'লে সে সময়ে যে আমার মনের মধ্যে খুব একটা অতৃপ্তি ছিল এমন কথা আজ আর মনে পড়ে না। বাইরের চেয়ে আমি অন্তরের মধ্যেই নিজেকে বিশেষ ক'রে অনুভব করার আনন্দ সেই ছেলেবেলাতেই পেয়েছিলাম;

তারপর যখন স্কুলে পড়তে গেলাম, তখনও আমি আপনাকে আমার সেই নির্জ্জনতায় থাকবার অভ্যাস থেকে মুক্ত করতে পারিনি। কেমন যেন একটা বাধোবাধো ঠেক্‌তো। সেখানেও আপনার মনে নীরবে ব'সে থাকতাম, আপনার মনের ভিতরই নানা সমস্যার কথা জেগে উঠত। আপনাকে একলা—অত্যন্ত একলা ব'লেই মনে করেছি। এজন্যই স্কুলের যাওয়া-যাওয়ার মধ্য দিয়েও আমার সঙ্গে কোন ছেলের ঘনিষ্ঠতা হয় নি, এজন্যই আমার বাল্যবন্ধু নেই, আমার বন্ধুত্বের কোন বালাই নেই। স্কুলের ভিতর গিয়েছি বটে, তবু হাঁস যেমন জলের ভিতর গা ভাসিয়ে সাঁতরে যায়, জলে ডুব দিলেও তার গায়ে জল লাগে না, তেমনি আমারও গায়ে জল লাগে নি।

বাল্যের সেই যে অভ্যাস, তার হাত থেকে একেবারে মুক্তি পেয়েছি এমন কথা যদিও আমি বলতে পারিনে, তবে আমি যে দুর্লভ এমন কথাও আজ সহজভাবে মেনে নিতে পারিনে। আজ আমার খুবই ইচ্ছা হয় তোমাদের সকলের সঙ্গে মেলা-মেশা করি, কিন্তু এ বয়সে শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্যে, অপটুতার জন্যে সে ইচ্ছা পূর্ণ করবার সুযোগ হয়ে ওঠে না।

আমাদের ছেলেবেলায় যখন আমরা অতি বালক বয়সে সাহিত্য-চর্চ্চা করতে আরম্ভ করেছিলাম, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের এত প্রসার ছিল না, এত বিস্তার ছিল না, এত পথ ছিল না। আজ আমাদের সাহিত্য আপনার গুণে খ্যাতির বিস্তার করেছে, নিত্য নূতন নূতন আনন্দের রসসত্র সৃষ্টি করেছে, এবং সে রসধারা অন্তরে প্রবেশ ক'রে নব নব ভাবে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও কুসুমিত হয়ে উঠ্‌ছে। তখন তা হ'ত না।

সে সময়ে সাধারণভাবে চলত সাহিত্য-চর্চ্চা। সে সময়ে যাঁরা খ্যাতিমান সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁরা সকলে মিলিত হ'তেন। নানা আলোচনা হ'ত সেখানে। বক্তৃতা হ'ত, প্রবন্ধ পাঠ হ'ত, সব সময়েই যে সাহিত্যের আলোচনা হ'ত তা নয়, আর, সকলেই যে সাহিত্যিক ছিলেন তাও নয়। তবে তাঁরা অনেকেই ছিলেন সাহিত্য-রসিক। নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। বয়স্কেরা সেই সভায় কেন জানিনে আমাকেও ডাকতেন। তাঁদের আলাপ-আলোচনা শুনতাম, তাঁরাও আমাকে স্নেহ করতেন, একথা মনে করতেন না যে আমি বালক।

তারপর যখন বয়স বাড়তে লাগল, একটু নাম ও যশ হ'তে লাগল, তখনও আমার তরুণ মন রাজধানীর কোলাহলের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইল না। আমি বরাবরই নির্জ্জনতাকে ভালবাসি, সেখানে আমি সম্পূর্ণভাবে আপনাকে পাই, অন্তরে ও দেহে একটা সরসতা জেগে ওঠে। আমাদের জলধর দাদা জানেন, পদ্মা নদীর তীরে শিলাইদহে নগরের সব রকমের কোলাহল হ'তে দূরে থাকতেম একান্ত একাকী। বাইরের কোন আকর্ষণ ছিল না, কোন-কিছুতেই আমার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতে পারত না। সেখানকার নদীর জল, সেখানকার তরুলতার শ্যামলতা—আকাশ ও বাতাস আমার সেই নির্জ্জন বাসকে সার্থক ও সুন্দর ক'রে তুলেছিল। দেহে ও মনে নির্জ্জনতার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পরিপূর্ণভাবে অন্তরের মধ্যে অনুভব করতাম। মনের ভিতরে যে ভাব ও কল্পনা জেগে উঠত, তাকে ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতাম। এই ভাবে শিলাইদহে আমার রচনা অজস্রভাবে পৃথিবীর আলোর কাছে প্রকাশ পেয়েছিল।

আমার এইরূপ নির্জ্জন বাসের অভ্যাসের দরুণ আমি আপনাকে জনসমাজের কাছ থেকে যে অনেকটা দূরে এনে ফেলেছি, সে কথা অনেকটা সত্য হ'লেও আমি আপনাকে সকলের কাছে দুর্লভ ব'লে এখন আর মনে করিনে। তোমরা যদি মনে কর, আমার আত্মাভিমানের জন্য মেলা হয় না, তা হ'লে তোমরা আমাকে ভুল বুঝেছ। এর চেয়ে আমার প্রতি আর বেশি-কিছু অবিচার হ'তে পারে না। আমার কাছে, যাদের সহজ যোগ্যতা থাকে, তারা অনায়াসে এসে মেলামেশা করেন, কাজের ক্ষতি করেন, মনে করে নেন আমার অখণ্ড অবসর। অবশ্য আমাকে নিতান্ত যাদের প্রয়োজন, তাঁদের কাছে আমি কোন কালেই ত দুর্লভ নই। তবে এখন দেহ আমাকে অনেক আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা থেকে বিরতি দিতে চায়, তাই অনেক সময় মনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করবার সুযোগ ক'রে উঠ্‌তে পারিনে।

আজ আমি যদি আবার আমার যৌবন ফিরে পেতাম, অল্পবয়স্ক হতাম, সহজ হ'ত তাহলে ছাত্রবৃন্দ ও তরুণ বয়স্কদের সঙ্গে মেলা-মেশা করা। তা হলে আমি তাদের সঙ্গে সমভূমিতে এসে দাঁড়াতাম, তাদের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে সাম্‌না-সাম্‌নিভাবে মুখোমুখি হয়ে কথা কইতাম। তাদের আলাপ ও আলোচনায় ভাবের বিনিময়ে আনন্দ ও উৎসাহ পূর্ণভাবে উপভোগ করতাম। যারা কবি, যারা লেখক সেই সকল তরুণ মনের সহিত হ'ত আমার মিলন। কিন্তু সে সুযোগ ও শক্তি হ'তে আমি যে এখন বঞ্চিত হয়েছি। কাজেই তোমাদের দুর্লভতার জন্য অভিযোগ করবার ত কিছু নেই, তবু যখনই সুযোগ পাই, তখনই আমি ছুটে আসি তরুণবয়স্কদের সঙ্গে যোগ দিতে—তা'দিগকে উৎসাহিত করতে।

আমার লেখার ভিতর দিয়ে যে সকল তরুণ সাহিত্যিকের পরিচয় ঘটেছে এবং যাঁদের লেখার সহিত আমারও পরিচয় হয়েছে অথচ নানা কারণে প্রত্যক্ষভাবে আত্মীয়তা ঘ'টে ওঠেনি, যদি সম্ভব হ'ত, যদি কলকাতায় থাকতাম, তবে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম, তাঁদের তরুণ মনে কতখানি উৎসাহ, কতখানি সঙ্কল্প ও দৃঢ়তা জেগে উঠেছে, কি উৎসাহ ও উত্তেজনা নিয়ে তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন, সে সবই অনুভব করতে পারতাম। যদি তাঁদের সঙ্গে সহজভাবে যোগ হ'ত, তাঁদিগকে যেমন উৎসাহিত ক'রে আনন্দিত হতাম, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে আমিও উপকৃত হতাম তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী।

রচনা করার পক্ষে নির্জ্জনতার অবকাশ যেমন সুবিধাজনক, তেমনি তাতে যে অসুবিধা নেই তাও নয়। একথা সত্য যে, নির্জ্জনতার মধ্যে শুধু পাওয়া যায় নিতান্ত নিজেকে, সাধনার চিরনিষ্ঠার মূল্য সেখানে আছে। মেনে নিতে পারি, সেখানে কোন আবিলতা থাকে না, সেখানে কোনও চিত্ত-বিক্ষেপ হওয়ার কারণ ঘটে না, সর্ব্বপ্রকার চঞ্চলতা ও কোলাহলের কারণ সেখানে অবর্ত্তমান। তবে এ-কথা সত্য যে, সমাজের কাছ থেকে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করলে, কোন রকমেই মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মাবার সুযোগ ঘটে না। নানা লোকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মধ্যে যে একটা শিক্ষা আছে, তার ভিতর হ'তে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তা বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে থাকলে সম্ভব হয় না। সমাজকে জান্‌তে হ'লে, বুঝতে হ'লে, তার উন্নতির পথ কোন্ দিকে কোন্ পথে তার সন্ধান নিতে হ'লে চাই পরিচয়, অন্তরের পরিচয়, সমাজের সত্যিকার নাড়ীজ্ঞান। এই নাড়ীজ্ঞান লাভ হয় শুধু মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দ্বারা এবং সেই অন্তরের পরিচয় হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের সাহায্যে। এই মানব-মনের

পরিচয়ের ভিতর দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সে হ'ল সত্যিকার অন্তরের পরিচয়। এই পরিচয়ের দ্বারা এই সহযোগিতার দ্বারা জনসমাজের কি সঙ্কল্প তা জানতে পেরে ভবিষ্যৎকে যারা তৈরী করবে, জাগিয়ে তুলবে, উন্নতির পথ দেখিয়ে দেবে, কালের উপযোগী বাণী প্রচার করবে, তারা পায় পথের সন্ধান। কাজেই জনসমাজের কাছ থেকে দূরে স'রে থাকলে ত চলবে না। তাদের মানুষকে চিনতে হবে, মানুষের ভিতর দিয়ে মেলা-মেশা ক'রে। আমার মত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে চলবে না। আমি সুদীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে অভ্যাসের মধ্যে যে প্রধান ত্রুটি করেছি, অভিজ্ঞতার দ্বারা যে সত্যকে উপলব্ধি করেছি, আজ তোমাদের কাছে সেকথা বললাম। আমার সহজ বুদ্ধি ব'লে দিচ্ছে, মানুষকে সমাজকে ভালবাসতে হবে। সকলে এক হয়ে এক মনে না চললে আমাদের ব্যর্থতাই শুধু এগিয়ে আসবে, সফলতা আসবে না। এ-কথাটা যেন আমাদের অন্তরে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আমরা যেন এ কথা বিস্মৃত না হই।

রবি-বাসরের এই যে মিলন, এই যে তোমরা সব তরুণ সাহিত্যিক ও বন্ধুরা মিলিত হয়েছ, এ বড় আনন্দের কথা। বাঙ্গলাদেশে এক সময়ে যে সজীবতা, শ্যামলতা, উৎসাহ ও আনন্দের রূপ আপনাকে হাস্যময়ী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত করেছিল, সর্ব্বদিকে সর্ব্বভাবে আনন্দ ও সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছিল, আজ আর তা নেই। আজ যেন এই দেশ মরুভূমির মত,—শ্যামলতা নেই, সজীবতা নেই, বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র যেন দুঃখের ছবি ফুটে উঠেছে। এই দুঃখকে আমরা বহন ক'রেই চলেছি। আমাদের এই দুঃখকে দূর ক'রে আবার সামাজিকতার মধুর মিলন সৃষ্টি ক'রে সরসতা ও সজীবতায় অন্তরে অন্তরে আনন্দসত্র উৎপন্ন করতে হবে, দিন দিন তাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে। পৃথিবীতে সব কিছুই বেঁচে থাকে না। সভা, সমিতি, প্রতিষ্ঠান সবই যে চিরকাল বেঁচে থাকবে, সে ভবিষ্যদ্বাণী কেউ করতে পারে না। আমরা ছেলাবেলায় যে কত সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ হতে দেখেছি, তার ঠিকানা নেই। কত সভা, সমিতি, লাইব্রেরী, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হতে দেখেছি, কিন্তু সে-সব এখন কোথায়? কাজেই, কি থাকবে না থাকবে সে ভাবনা ভেবে কোন ফল নেই। যতদিন তোমাদের এই রবি-বাসর বেঁচে থাকবে ততদিন তোমরা এর ভিতর দিয়ে দেশের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের সৃষ্টি করবে, উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে, সকলের প্রাণে উৎসাহ ও আনন্দের বাণী জাগিয়ে দেবে, কাকেও নিরাশ হতে দেবে না, অলস হতে দেবে না,—দেশের কাজকে ও সমাজের কল্যাণকে বড় ক'রে লোকে দেখতে পারে এমন একটা প্রেরণা তোমরা সমাজের বুকে, দেশের বুকে ছড়িয়ে দেবে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের একটা উত্তেজনা থাকে, সেটা যেমন সত্য, তেমনি আর একটা সজীব আন্দোলন চিরন্তনভাবে বেঁচে থাকে, সেটা হচ্চে সাহিত্য। রাষ্ট্র, সাহিত্য ও সমাজের কল্যাণের ব্রত সামাজিক মানুষকে গ্রহণ করতে হয়,—তার সঙ্গে যোগ রাখতে হয়, সে যোগ হতে আপনাকে বঞ্চিত ক'রে কোন মানুষ বাঁচতে পারে না। এজন্য তোমাদের দেশকে অন্তরের সবলতার সহিত প্রাচুর্য্যের সহিত দাক্ষিণ্যের সহিত চারিদিক দিয়ে দিতে হবে অনেক কিছু। এই দেওয়ার সুযোগ হতে তোমরা নিজেকে যেন বঞ্চিত কোরো না। এই কথাটাই তোমাদের কাছে আমার বিশেষ ক'রে বলবার ছিল।

আমার জীবনে আমি যা কিছু করেছি, যা কিছু দিয়েছি, সর্ব্বসাধারণ যদি তা গ্রহণ ক'রে থাকে— তার চেয়ে আর আমার আনন্দ বেশী কি হতে পারে! আর যদি গ্রহণ না করেও থাকে, তাতেও ত বলবার

বেশী কিছু নেই। অনেক দিন লেগেছে আমার দেশবাসীকে আমার সাধনার ফল অনুভব করতে। আমার মনের ভিতর কত সময় কত প্রশ্ন, কত সন্দেহ, কত বেদনা যে জেগে উঠেছে, তার অবধি নেই। আবার সকলের অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভক্তি ও ভালবাসা নানা ছোট-ছোট ঘটনা উপলক্ষ ক'রে যেভাবে নিয়ত প্রকাশ পাচ্ছে, তাতেও আমি মুগ্ধ হয়েছি—আনন্দে অভিভূত হয়েছি। মানুষের মন মানুষের কাছ থেকে দরদ অনুকম্পা ও নগদ বিদায় চায়, দূরের কালের উপর বরাত দিয়ে থাকার চেয়ে হাতে হাতে যা পাওয়া যায়, তাই সে চায়। সে চায় প্রীতি, অনুকম্পা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা এ জীবনেই পেতে। খ্যাতি প্রতিপত্তি সবই যদি এখানেই সে লাভ করতে পারে—সে আনন্দ ও প্রীতিই তার পরম লাভ। এমন লেখক কেউ পৃথিবীতে নেই, আমি স্পর্দ্ধা ক'রে বলছি না, যে চায়না তার নিজের খ্যাতি-প্রতিপত্তি এ জীবনেই লাভ করতে। এই যে জনসমাজের কাছ থেকে যশের পুরস্কার লাভ—সে হচ্ছে সাহিত্যিক জীবনের সার্থকতা। অর্থের দিক দিয়ে সার্থকতা কয়জনের জীবনেই বা আসে? বৈজ্ঞানিক যে আবিষ্কার করেন, যে সত্য প্রচার করেন, তার সত্যাসত্যের বিচার হতে সময়ের প্রয়োজন হয়, নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তার সার্থকতা আসে। সে হয়ত অনেক সময় যুগের পর যুগ চলে যায়। সাহিত্যের সম্বন্ধে অনেক সময়ই এ-কথা খাটে না।

আমার আর কিছু কথা নেই। মনে রেখো সাহিত্য-সাধনা বড় কঠোর সাধনা। রস-রচনায় প্রবৃত্ত হ'তে হলে, সাহিত্যের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করতে হ'লে কঠিন আবরণের ভিতর দিয়ে চলতে হবে। অঙ্কুর যেমন কঠিন আঁঠির ভিতর থেকে আপনাকে সরস ক'রে সুন্দর ক'রে ধরণীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি কঠোর সাধনা তোমাদের করতে হবে, তবেত সে সাধনা সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে, পুষ্প-পল্লবে বিকশিত হবে। আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের মধ্যে যেন সেই সাধনার শক্তি জেগে ওঠে।

আমার কোন অভিমান নেই, মনে বেদনা নেই, আমার কোন নালিশ নেই কারো কাছে। তোমরা আমাকে ভালবেসে যা কিছু এনে দিচ্ছ—সেই প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা সে-সব আমার জীবনের শেষদিকের পথের পাথেয়। তোমরা আমাকে মনে ক'রে ভালবেসে আহ্বান করেছ, তাইতে আমি ধরা দিয়েছি। তোমাদের ভক্তির ও স্নেহের যে অর্ঘ্যডালা, সেই ভালবাসাই আমার পরম লাভ। আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি, নমস্কার করি, তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। তোমরা রবি-বাসরের সকল সভ্যবৃন্দ মঙ্গলবাণী গ্রহণ কর—এই হচ্ছে আমার শেষ কথা, আর কিছু আমার বলবার নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত ৩রা শ্রাবণ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে রবি-বাসরের সপ্তম বর্ষের সপ্তম অধিবেশনে রবি-বাসরের সর্ব্বাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের শ্রদ্ধাভিনন্দনের উত্তরে কবিবরের প্রতিভাষণ।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শিশু-ভারতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় প্রতিভাষণটি অনুলিখিত করেছিলেন।

প্রশ্ন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্-এ

সত্য করি' কহ মোরে কি পেয়েছ প্রাণের নিভৃতে,
পেলেনা যা' এই ধরণীতে ?
লভিয়াছ জীবন-সম্বল
আপনার অন্তস্তলে পশিয়া কেবল ?
কী আছে সেথায়
সূচীভেদ্য অন্ধকারে সঙ্গীহীন গোপন গুহায় ?
বিশ্বে যাহা পেলেনা কোথাও,
রুদ্ধ কক্ষে আঁখি মুদি' চিত্তে তাহা পাও ?

জানি তুমি একদিন আমাদেরি মত শান্তিহারা
ছিলে যেন উন্মাদের পারা।
আলোড়িয়া কত আবর্জ্জনা
খুঁজিয়াছ আতিপাতি অমৃতের কণা
মরতের পরতে পরতে,
ফিরিয়াছ পথে পথে নতশিরে ব্যর্থমনোরথে।
নয়নে ফুটেছে আজি তব
উদার প্রশান্তি ভরা দৃষ্টি অভিনব।

মনে হয় তোমা মাঝে আজি আর কোন দৈন্য নাই,
বিস্ময়ে তোমার পানে চাই।
শুধাইলে, শুধু মধু হাসি
নয়নে অধরে তব যেন পুষ্পরাশি
প্রস্ফুটিত করে,
কও না ত কোনো কথা মৃদু হাসি মিলায় অধরে
জ্যোৎস্না ঝরে ফুল্ল দুনয়নে,
জানি জ্বলে রত্নদীপ পরাণ গহনে।

সে-মণি লুকান আছে সবারি কি অন্তর মাঝারে,
মাটিচাপা স্ফুরিতে না পারে ?
কেমনে সে ধূলির গুণ্ঠন
উন্মোচিয়া উদ্ধারিব দীপ্তি বিকিরণ ?
জানিনা কোথায়
লুকান রয়েছে মণি কঠিন অস্বচ্ছ মৃত্তিকায়
অন্তরের কোন গুপ্ত কোণে,
তোমারে নেহারি যবে জাগে আশা মনে।

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩৬

বাটলারগঞ্জের একটি অপেক্ষাকৃত নিভৃত অংশে প্রমথর গৃহ। বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে সদ্য-সংস্কৃত সুবৃহৎ বাংলো-ছাঁদের বাড়িটি ঝকঝক্ করছে। রাজপথ থেকে বাংলোর সম্মুখ দিকের বারান্দা পর্য্যন্ত ঘুটিং-ঢালা পথ, তার দুই পার্শ্বে মূল্যবান অ্যারকেরিয়ার বীথি, বাংলোর সম্মুখে পথ শেষ হয়েছে একটি প্রশস্ত চক্রাবর্ত্তে, সেই আবর্ত্তের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ প্রস্ফুটিত ম্যাগনোলিয়া বৃক্ষ; পথের দুই দিকে এবং কম্পাউণ্ডের স্থানে স্থানে বহুবিন্যস্ত বিচিত্র আকারের পুষ্পোদ্যান, তাতে ক্যামেলিয়া, ম্যাগনোলিয়া, গন্ধরাজ, কাঁটালী চাঁপা, গোলন চাঁপা, যুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা, জবা প্রভৃতি দেশী ও বিদেশী ফুলের গাছ; কম্পাউণ্ডের চতুঃসীমায় মেহগনি এবং ইউক্যালিপ্‌টস্ তরুশ্রেণী, এবং তার কাছে কাছে বহুপ্রকারের মূল্যবান এবং দুর্লভ ফলের গাছ; পশ্চিম দিকের কোণে গ্রীণ হাউস, তাতে ফার্ণ, অর্কিড্ এবং বহুবিচিত্র লতাগুল্ম; কম্পাউণ্ডের একদিকে সহস্রাধিক টবে টিকিট-মারা বিবিধ প্রকারের চন্দ্রমল্লিকার চারা সযত্নে বর্দ্ধিত হচ্ছে, শীতকালে যখন প্রস্ফুটিত হবে বাগানের সেই দিকটা আলোকিত ক'রে রাখবে,—সন্ধ্যা চন্দ্রমল্লিকা ভালবাসে তাই প্রমথ এবার চন্দ্রমল্লিকার এই বিপুল আয়োজন করিয়েছে, চন্দ্রমল্লিকার মরশুমটা সন্ধ্যাকে নিয়ে লক্ষ্ণৌয়ে বাস করবে এই তার মনের বাসনা।

বাংলোটি একতলা, কিন্তু বৃহদায়তন,—তা ছাড়া, আধুনিক জীবন যাপনের যত কিছু সুখ-সম্ভোগের ব্যবস্থা সকলই তার মধ্যে সুলভ।

বেলা তখন দেড়টা। সন্ধ্যা তার বসবার ঘরে টেবিল চেয়ারে ব'সে প্রমথকে চিঠি লিখছিল। গৃহে পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে মুঙ্গের থেকে প্রমথর টেলিগ্রাম পেয়েছে। টেলিগ্রামের মর্ম্ম,—সুরেশের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, সুতরাং লক্ষ্ণৌ পৌঁছতে প্রমথর তিন চার দিন বিলম্ব হবে, সন্ধ্যা যেন প্রত্যহ চিঠি এবং টেলিগ্রামে তাদের সংবাদ পাঠায় এবং প্রমথ লক্ষ্ণৌ পৌঁছবার পূর্ব্বে কিছুতেই প্রিয়লালকে না ছাড়ে।

এরূপভাবে প্রমথ মুঙ্গেরে আটকে পড়ায় সন্ধ্যা অতিশয় চিন্তিত হয়ে তাকে চিঠি লিখছিল। চিঠি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময়ে সাধুচরণ এসে বললে, "মা, সেই ডাক্তার সাহেব এসেছে।"

চিঠি লেখবার তন্ময়তার মধ্যে একবার যেন একটা মোটর আসার শব্দ কানে পৌঁছেছিল, কিন্তু তখন কৌতূহল সে তন্ময়তাকে পরাস্ত করতে পারে নি। সাধুচরণের কথা শুনে বিস্মিত হ'য়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "এরি মধ্যে ডাক্তার সাহেব আবার কে এল সাধু?"

সাধুচরণ বল্‌লে, "ঐ যে গো, ইজের পরা সাহেবের মত চেহারা ইষ্টিশানে তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে জিনিস-পত্তোর নিয়ে চ'লে গেল। এখন এসে বল্‌তেছে, তোমাদের মাঠাকরুণকে বল কি-যেন-ভাল ডাক্তার এসেছে।"

সন্ধ্যা বুঝতে পারলে প্রিয়লাল এসেছে এবং সাধুচরণের কাছে ডক্টার চৌধুরী ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েছে। তার পরিধানের 'ইজের' এবং নামের ডক্টার—এই দুইকে সংযুক্ত ক'রে সাধুচরণ তাকে ডাক্তার সাহেব ব'লে সাব্যস্ত করেছে। জিজ্ঞাসা করলে, "জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন?"

সুদীর্ঘ রেলপথ অতিক্রম ক'রে বন্ধুবান্ধবহীন অবাঙালীর দেশে এসে সাধুচরণের মেজাজটা খুব মসৃণ ছিল না, রুক্ষস্বরে বললে, "শোনো কথা! নিয়ে আসবে না ত' কি ফেলে আসবে? নিয়ে এসেছে।"

মনটা অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠল। গোলযোগটা কিছুতেই তা হ'লে সহজে মিটবে না না-কি! প্রমথর আসবার আগেই এ

অপ্রীতিকর অভিনয়ের যবনিকা পাত হ'লে ভাল ছিল, কারণ রহস্যপ্রিয় প্রমথ কি করতে কি ক'রে ফেলে তার আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। মনে মনে একটুখানি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা স্থির করলে সে যাই হোক না কেন, নিজগৃহে নিষ্ঠার সহিতই আতিথ্যধর্ম পালন করবার চেষ্টা করবে,—আচরণের মধ্যে এমন-কিছুই করবে না যা অতিথিকে ক্ষুব্ধ করতে পারে।

চিঠি লেখা আপাততঃ স্থগিত রেখে বাইরে এসে প্রিয়লালকে দেখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আসুন ডক্টার চৌধুরী, আসুন!"

দুই হাত যুক্ত ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "কোনো রকম কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা না ক'রে অকপটে স্বীকার করছি আমি একজন অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তি!"

মৃদুস্মিত মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সে তবু ভাল। সময়ে সময়ে দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের নিয়ে আমাদের কম হাঙ্গামা পোহাতে হয় না।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "কিন্তু আপাততঃ যে আমি দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিই। ষ্টেশন থেকে দৃঢ়পণ করে এসেছি, প্রমথর সঙ্গে কিছুতেই চুক্তি ভঙ্গ করব না, সে ফেরা পর্য্যন্ত আপনার বাড়িতে অপেক্ষা করবই!"

সন্ধ্যা বললে, "বেশ ত, তাই করুন। বাড়ি পৌঁছে ওঁর একখানা টেলিগ্রাম পেয়েছি তাতেও উনি লিখেছেন যে উনি লক্ষ্ণৌ পৌঁছবার আগে আপনাকে যেন ছাড়া না হয়।"

শুনে প্রিয়লালের মনের কুণ্ঠা অনেকখানি কেটে গেল, প্রফুল্লমুখে বল্‌লে, "আত্মসমর্পণ করলাম, ছাড়বেন না। উপস্থিত তা হ'লে যেখানে হোক একটা আস্তানা বেঁধে দিন।" তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে, "কি রকম স্বার্থপর লোক দেখুন, নিজের কথাটুকু নিয়েই ব্যস্ত রয়েছি, অথচ প্রথমেই যে কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল এপর্য্যন্ত তা করিনি! প্রমথ কেমন আছে, কবে আসছে? তার বন্ধু কেমন আছেন?"

সংক্ষেপে প্রিয়লালের প্রশ্নত্রয়ের উত্তর দিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আসুন ডক্টার চৌধুরী, আপনার থাকবার ঘরটা দেখিয়ে দিই।"

বাংলোর পূর্ব্বপ্রান্তে প্রমথ ও সন্ধ্যার ঘর। ঠিক তার বিপরীত পশ্চিম প্রান্তের ঘরে সন্ধ্যা প্রিয়লালের শয়নের ব্যবস্থা ক'রে দিলে। কক্ষসংলগ্ন ড্রেসিং রুম, তার পরেই বাথরুম। শয়ন-কক্ষের পাশের ঘরটা স্থির করলে প্রিয়লালের বসবার, লেখাপড়ার জন্য। অবসর কালে বারান্দায় বসবার জন্য একটা প্রশস্ত ইজিচেয়ার রাখালে, তার পাশে গোটা তিন চার আর্মলেস্ চেয়ার আর একটা ছোট চারকোণা টেবিল,—বই খবরের কাগজ অ্যাশট্রে ইত্যাদি ছোট ছোট জিনিস রাখবার জন্য।

হরিয়া নামে একজন চতুর ভৃত্যকে ডেকে প্রিয়লালের ঘর ঝেড়ে-মুছে পালঙ্কে শয্যা রচনা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা ক'রে দেবার আদেশ দিলে। সংসারের আর-সব কাজ থেকে তাকে একেবারে মুক্তি দিয়ে নিরন্তর প্রিয়লালের পরিচর্য্যায় মোতায়েন করলে।

দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কাল রাত্রে গাড়িতে আপনার ঘুম হয়নি, এখন একটু বিশ্রাম করুন। আমিও ওঁর চিঠিটা শেষ ক'রে ডাকে পাঠিয়ে দিই। আবার একটু পরে দেখা হবে এখন।"

হৃষ্টমুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "আচ্ছা।"

"কষ্ট হবে। কোন রকমে এরি মধ্যে কাজ চালিয়ে নেবেন।"

প্রিয়লাল সজোরে মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না, না, মিসেস্ মুখার্জ্জি, এখন যখন আপনার আশ্রয়ে এসে আপনার অতিথি হলাম, তখন ভদ্রতার এ-রকম সাজানো কথা বল্‌লে চলবে না, একেবারে খাঁটি আন্তরিকতার সোজা কথা বলতে হবে। আমি সত্যিই এমন অপদার্থ লোক নই যে, এমন সুব্যবস্থায় আমার কষ্ট হবে।"

মৃদুহাস্যের সহিত সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা হ'লে যখন যা দরকার হবে অসঙ্কোচে চেয়ে নেবেন।"

"নিশ্চয় নোব।"

"আপনার খাওয়া হয়েছে ত ডক্টার চৌধুরী?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "অনেকক্ষণ। অর্দ্ধজীর্ণ হয়ে এল।"

"এখন সামান্য কিছু খাবেন?"

"কিছু না।"

"একটু সরবৎ আর ফল ?"

"তাও না।"

"চা খাবেন কখন ?"

"পাঁচটার সময়ে।"

"আচ্ছা, এখন তা' হলে একটু বিশ্রাম করুন, আমিও চিঠিখানা শেষ করি গিয়ে।"

চিঠিতে সন্ধ্যা প্রিয়লালের বিষয়ে এইটুকু যোগ করলে,—তোমার আসা পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতে অপেক্ষা করবেন এই স্থির ক'রে ডক্টার চৌধুরী কিছুক্ষণ হ'ল ষ্টেশন থেকে এসেছেন। সুতরাং তুমি অনর্থক যে গোলযোগের সৃষ্টি করেছ আমার দ্বারা তার শেষ হ'ল না, তুমি অবিলম্বে এসে এ থেকে আমাকে মুক্তি না দিলে আমার প্রতি সত্যই অন্যায় ব্যবহার করা হবে। আশা করি, এর চেয়ে বেশী-কিছু বলবার প্রয়োজন নেই।

৩৭

বৈকালে চা পানের পর সন্ধ্যা প্রিয়লালকে মোটর ক'রে বেড়াতে পাঠিয়েছিল। গোমতীর তীরে খানিকটা সময় অতিবাহিত ক'রে এবং দু-চার জন পরিচিত ব্যক্তির খোঁজ-খবর নিয়ে প্রিয়লাল যখন বাড়ী ফিরে এল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

ড্রইং রুমে আলো জলছিল। কথোপকথনের শব্দে সন্ধ্যা ব্যতীত অপর অপরিচিত ব্যক্তির উপস্থিতি বুঝতে পেরে প্রিয়লাল সেখানে প্রবেশ না ক'রে বারান্দার একটু দূরে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল।

মোটরের হর্ণের শব্দ সন্ধ্যার কানে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে হরিয়া এসে বললে, "মা, সাহেব এসেছেন।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কি করছেন ? মুখ-হাত ধুয়েছেন ? কাপড় বদলেছেন ?"

"হ্যাঁ। বারান্দায় ব'সে আছেন।"

"আমাকে ডাকছেন ?"

"না, আমি নিজেই আপনাকে খবর দিতে এলাম।"

আগন্তুকের নিকট অল্পক্ষণের জন্য অবকাশ গ্রহণ ক'রে প্রিয়লালের কাছে উপস্থিত হয়ে সন্ধ্যা বললে, "এরই মধ্যে ফিরলেন ডক্টার চৌধুরী ? বন্ধুবান্ধবদের দেখা পেলেন না বুঝি ?"

প্রিয়লাল বললে, "সে কথা আর বলবেন না! দুজন গেছেন দেশান্তরে, আর একজন গৃহান্তরে। বিরক্ত হয়ে ফিরে এলাম।"

"গোমতীর ধারে যাননি ?"

"গেছলাম, তাও একা-একা বেশীক্ষণ ভাল লাগল না।"

সন্ধ্যা বললে, "চলুন ডক্টার চৌধুরী, ঘরে চলুন, চৌবেজীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। মথুরানাথ চৌবে, লক্ষ্ণৌর একজন বিখ্যাত গাইয়ে। চমৎকার লোক।"

প্রিয়লাল বললে, "আনন্দের সঙ্গে যাচ্ছি, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে ত হবে বাক্য-ছন্দের আলাপ, চৌবেজীর পক্ষ থেকেই আসল আলাপটা হওয়া উচিত।"

প্রিয়লালের কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পেরে সন্ধ্যা স্মিতমুখে বললে, "বেশ ত', সে ত আনন্দের কথা। কিন্তু হিন্দী ওস্তাদি গান আপনার ভাল লাগবে ত ?"

প্রিয়লাল বললে, "লাগবে, যদি-না সেই উপলক্ষে রাগ-রাগিণীর নাম-গোত্র সম্বন্ধে বিদ্যের পরিচয় দিতে হয়। সে যা একবার জব্দ হয়েছিলাম, তাই থেকে শিক্ষা হয়ে গেছে।"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বললে, "কি হয়েছিল ?"

প্রিয়লাল বললে, "একটা গানের বড় আসরে দুর্বুদ্ধিক্রমে গাইয়ের কাছাকাছি গিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ একসময়ে আমাকে সমঝদার বিবেচনা ক'রে গাইয়ে ব'লে বসল, এবার কোন্ রাগিণী গাইব ফরমাস করুন।' কতকগুলো রাগ রাগিণীর নাম জানা ছিল, হঠাৎ একটা জমকালো নাম মনে পড়ল, বললাম, 'একটা সুরফাঁকতাল গান।' শুনে গাইয়ে ত অবাক! মুখে বিহ্বলতার ছায়া। চেয়ে দেখি অনেকেই মুখ টিপে টিপে হাসছে। গৃহস্বামী, আমার বন্ধু, জোড় হাত ক'রে বললেন, "ওস্তাদজী, মাফ করবেন, সুরফাঁকতাল শব্দের দ্বারা আমার বন্ধু এই কথাই বলতে চাচ্ছেন যে সুর আর তাল দিয়ে এমন একটা জমাটি গান করুন যার মধ্যে একটুও ফাঁক অর্থাৎ ফাঁকি না থাকে।' একটা প্রচণ্ড হাসিতে আসরটা গর্জ্জন ক'রে উঠল। তবলার আসরে সুরফাঁকতাল গাইতে ব'লে কি বিপর্য্যয়ের অবতারণ করেছিলাম তা অবশ্য আমার বন্ধুরই কাছ থেকে

পরে বুঝে নিয়েছিলাম। কিন্তু যে-কথার সুরু হ'ল 'সুর' দিয়ে সে কথা যে সুরের নাম নয় তালের নাম, এ কি ক'রে জানব বলুন।"

সন্ধ্যা হাসিমুখে বললে, "কিন্তু শেষ হয়েছে ত 'তাল' দিয়ে।"

প্রিয়লাল বললে, "মাতাল পাতাল নৈনিতাল—এমন অনেক কথাত' শেষ হয়েছে 'তাল' দিয়ে, কিন্তু তাই ব'লে ত আর ও-গুলো তালের নাম নয়।"

প্রিয়লালের যুক্তিতে পরাজিত হয়ে সন্ধ্যা হাসতে হাসতে বললে, "তা বটে।"

ড্রয়িং রুমে যেতে যেতে প্রিয়লাল বললে, "মিসেস মুখার্জ্জি ঝাঁপতালটা কিন্তু একটা তাল। কি বলুন?"

প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে স্মিতমুখে সন্ধ্যা বললে, "আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে চলুন, চৌবেজীর কাছে আপনার এ-সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না।"

মথুরানাথ চৌবের বয়স পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে দু-চার বৎসর হবে। সুগঠিত বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ দেহ, মাথার চুলে খামখেয়ালী-ভাবে স্থানে স্থানে পাক ধরেছে, মুখে প্রসন্ন হাসি,—যা দেখে মনে হয় তার উৎপত্তিস্থল, মনের আকাশও নির্ম্মল।

মথুরা চৌবের নিকট সন্ধ্যা ভাল ক'রেই প্রিয়লালের পরিচয় দিলে। বললে, "ইনি কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ বড়লোক, মস্ত বিদ্বান ব্যক্তি, সম্প্রতি বিলাত থেকে খুব সম্মানজনক উপাধি নিয়ে এসেছেন।' মথুরা চৌবের কথা বললে, 'ইনি লক্ষ্ণৌর একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক, কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে ইনি এখানকার সকল ওস্তাদকে পরাজিত করেছেন। ধার্ম্মিক, সাত্ত্বিক প্রকৃতির নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আমি এঁকে আমার অতি নিকট আত্মীয় ব'লে মনে করি।'

বহু বাঙালী মেয়েদের গান শেখাবার সুযোগে মথুরা চৌবে বাঙলা ভাষাটা এমন আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে যে বুঝতে প্রায় কিছুই আটকায় না, কাজ চলাগোছ বলতেও কতকটা পারে। সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "বাবুসাহেব তোমার কে হন উষামায়ী?"

সহসা এই প্রশ্নে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। কি-ভাবে উত্তর দেবে ভেবে সে কতকটা বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে, এমন সময়ে প্রিয়লাল তাকে সে অবস্থা থেকে উদ্ধার করলে, বললে, "আমি ওঁর স্বামীর বন্ধু হই।"

প্রসন্নতাব্যঞ্জক শিরশ্চালনা ক'রে মথুরা চৌবে বললেন, "ঠিক আছে।"

অল্পক্ষণ আলাপ-পরিচয়ের পর প্রিয়লালকে গান শোনাবার জন্য সন্ধ্যা মথুরানাথকে অনুরোধ করলে। এ অনুরোধে মথুরানাথ আনন্দিতই হোল, কারণ প্রথমত, এই তার জীবিকা অর্জ্জনের কাজ, দ্বিতীয়ত, গানের একটা তানও মেরে যেতে পারলে সন্ধ্যার কাছে যে মোটা মাসহারার ব্যবস্থা আছে আজ থেকেই তার গোড়াপত্তন হয়,—বিশেষতঃ প্রিয়লালের কথা মনে ক'রে সন্ধ্যা ইতিপূর্ব্বেই একবার মথুরানাথের নিকট কয়েক দিন পরে গানবাজনা আরম্ভ হবার প্রস্তাব করেছিল। পূর্ব্বদিকের একটা ঘরে গানবাজনার যন্ত্রাদির ব্যবস্থা ছিল, মথুরা চৌবের তবলা-বাদকও সেই ঘরে অপেক্ষা করছিল। ফরাস এবং সোফা-চেয়ার উভয় প্রকারের ব্যবস্থাই তথায় বর্ত্তমান। সন্ধ্যা, প্রিয়লাল এবং মথুরা চৌবে সেই ঘরে এসে আসন গ্রহণ করলে।

তবলা এবং তানপুরা বাঁধা হ'লে মথুরানাথ গান আরম্ভ করলে, 'এরি অব গুঁথ লায়োরি মালনিয়াঁ'—সুলতান সালেমের একটি বিখ্যাত খেয়াল। দেখতে দেখতে কামোদের গভীর-করুণ ধ্বনিতে সমস্ত ঘরখানা ভ'রে উঠল,—এমন অপূর্ব্ব একটা সঙ্গীত-পরিবেশ স্থাপিত হ'ল, মনে হল যার মধ্যে যন্ত্র, কণ্ঠ এবং শ্রোতাদের মন এক বেদনার আনন্দে মিলিত হয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। দীর্ঘকালব্যাপী নানাবিধ কর্ত্তব-কৌশলের মধ্য দিয়ে গান শেষ হ'ল।

প্রিয়লাল মথুরানাথের সুরমাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তার মধ্যে নিমজ্জিত হ'য়ে গিয়েছিল, গান শেষ হ'লে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা ক'রে আরও দুই-একটি গান গাইবার জন্য তাকে অনুরোধ করলে।

আর দুখানা গান গেয়ে মথুরানাথ বললে, "বাবুজী, হামার তিনখানা গান শুনলেন, এবার হামার সাকরিদ উষামায়ীর একখানা গান শুনুন। এ হামি জোরসে বলতে পারি বাবুজী, সারা লখনউ শহরে উষামায়ীর মাফিক সুরেলা কণ্ঠ দুসরা না আছে। গুমটি দরিয়াতে যত জল আছে, মায়ীর কণ্ঠে তত

সুর আছে। মায়ী ত রেওয়াজ করে না, শুধু হামার গান শোনে। রেওয়াজ করলে মায়ী সারা হিন্দুস্থানকে পয়াস্ত্ করতে পারে।"

প্রিয়লাল বললে, "আমিও মনে-মনে তাই ভাবছিলাম যে, যে-বাড়ীতে গানবাজনার এত ব্যবস্থা সেখানে তার একটা বিশেষ-রকম গুরুতর কারণ না থেকে যায় না।" তারপর অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সন্ধ্যাকে একটি গান গাইবার জন্য অনুরোধ করলে।

আরক্তমুখে সন্ধ্যা বললে, "না, না, আমি গাইব না। ওস্তাদজী আমাকে ভালবাসেন তাই ও-সব কথা বললেন। ও-সব কথা ঠিক নয়।"

সন্ধ্যার কথা শুনে মথুরানাথ হাসতে লাগল; বললে, "হামি তোমাকে ভালবাসি মায়ী সে বাৎ ঠিক আছে। লেকিন তোমার বারে যো-সব বাত বলেছি সে-ভি ঠিক আছে।"

প্রিয়লাল বললে, "আপনি যে গান গাইতে পারেন, আর ভাল গাইতে পারেন, চৌবেজীর কথা থেকে এ বিশ্বাস আমার হয়েছে। এর পর আপনি যদি না গান তা হ'লে এই বুঝব যে, যে-আনন্দ আপনি আপনার অতিথিকে অনায়াসে দিতে পারতেন তা ইচ্ছে ক'রেই দিলেন না,—সুতরাং আপনার আতিথ্যধর্ম্মে দোষ পড়ল।" মথুরানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কি বলুন চৌবেজী, ঠিক কি-না?"

মথুরানাথ হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "বহুৎ ঠিক আছে।"

অনেক ওজর-আপত্তির পর সন্ধ্যা যখন দেখলে যে একটা গান না গাইলে প্রিয়লাল সত্যই ক্ষুণ্ণ হবে তখন অগত্যা সে গাইবার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

প্রায় চার বৎসর সন্ধ্যা মথুরানাথের নিকট গান শিখছে। কাশীতেই প্রমথ সন্ধ্যার গান গাইবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পেয়েছিল। লক্ষ্ণৌয়ে এসেই সে তথাকার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মথুরানাথকে নিযুক্ত করে। চার বৎসর মথুরানাথের নিকট সন্ধ্যা গান শিক্ষা করছে এ কথা যেমন সত্য, এই চার বৎসরের মধ্যে যতক্ষণ সময় সে মথুরানাথের মুখে গান শুনেছে তার এক-চতুর্থ অংশও নিজে গানের চর্চ্চা করেনি, এ কথাও তেমনি সত্য। গানের ঘরে তার জন্য একটি অর্দ্ধ-খাড়া আরাম কেদারা ছিল, তাইতে উপবেশন ক'রে মুদিত নেত্রে নিমজ্জিত মনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে মথুরানাথের গান শ্রবণ করত। সে সময়ে তার মনে হ'ত সুরের সচল স্রোতে অবগাহন করতে করতে তার পরিক্লিষ্ট আত্মা নির্ম্মল হয়ে উঠছে, নিরাময় হয়ে আসছে। সঙ্গীতকে সে বিলাস-বস্তুর মতো গ্রহণ করেনি, আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় স্বরূপ গ্রহণ করেছিল। তাই একমাত্র প্রমথ ভিন্ন অপর কারো অনুরোধে সহজে সে গান গাইত না।

সন্ধ্যা চেয়ার পরিত্যাগ ক'রে ফরাসের উপর উঠে বসল। তারপর দু-চার মোচড়ে তার ছোট তানপুরাটা ঠিক ক'রে নিয়ে মথুরানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কি গাইব আদেশ করুন ওস্তাদজী।"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে মথুরানাথ বললে, "সেই ভুপালীটা গাও মায়ী, সে গানটা তুমি খুব ভাল গাইতে পার—'মেরে ঘর বাজে'।"

সে গানের অর্থ, বিশেষত অন্তরা অংশের অর্থ, স্মরণ ক'রে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। এ পর্য্যন্ত যা কোনো দিন করেনি তাই করলে,—প্রতিবাদ ক'রে বললে, "ও গানটা কি ভাল হবে? অন্য কোনো গান বলুন না ওস্তাদজী।"

সন্ধ্যার আপত্তির প্রকৃত কারণের কাছ দিয়েও না গিয়ে মথুরানাথ সবেগে বললে, "না, না, খুব ভাল হবে, তুমি গাও। এখন ভুপালীর লগন্ আছে, ও গান খুব জমবে।"

আর আপত্তি করলে আপত্তির নিগূঢ় কারণটিকেই হয়ত প্রকট ক'রে তোলা হবে আশঙ্কা ক'রে সন্ধ্যা তানপুরাটা তুলে নিয়ে তার উপর মাথার বাম দিকটা স্থাপন ক'রে একাগ্র মনে সুর ছাড়তে লাগল; তারপর মাত্র দু-চার মিনিট ভুপালীর স্বরগ্রামটা একটু ভেঁজে নিয়ে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে গাইতে আরম্ভ করলে—

মেরে ঘর বাজে
সরস সুন্দর বীণা মৃদঙ্গ
বহুত দিনন পর পিয়া ঘর আয়ে
সব মিলি গায়ে রসকি তান॥

অর্থাৎ,

আমার গৃহে সরস সুন্দর
বীণা মৃদঙ্গ বাজে।
বহুদিন পরে প্রিয়তম ঘরে এসেছেন,
সকলে মিলে গাও সরস তানে ॥

গান ত এইটুকু, এইত এক কোঁটা তার অর্থ, কিন্তু তান বাঁট সার্গম বিস্তার দিয়ে এই গান সন্ধ্যা আধঘন্টা ধ'রে গায়। আজ কিন্তু সে তেমন কিছুই করলেনা। দু-চারটে ছোট ছোট তান দিয়ে বার তিনেক গানটা গেয়ে অল্পক্ষণেই শেষ করলে। কিন্তু কোথা থেকে তার মধ্যে এল এমন-একটা প্রাণস্পর্শী দরদ যে, গান যখন থামল তখন শুধু সন্ধ্যাই অলক্ষিতে তার চোখ দুটো অঞ্চলে একবার মুছে নিলে না, দেখা গেল প্রিয়লালেরও চোখ সজল হয়েএসেছে।

এই বাঁট-বিস্তারহীন গান ওস্তাদ মথুরানাথকেও এত মুগ্ধ করলে যে, সন্ধ্যার মাথায় দক্ষিণ হস্ত স্থাপন ক'রে সে বললে, "ধন্য বেটি, ধন্য! আশ্চর্য্য! এ গান তুমি এত ভাল কোনোদিন গাওনি।"

প্রিয়লাল বললে, "মিসেস মুখার্জি, চৌবেজী বলছেন আপনি ধন্য, কিন্তু আমি বলছি, আপনার গান শুনে আমিই ধন্য। কি অদ্ভুত গান আপনি গাইলেন। অদ্ভুত ছাড়া একে আমি আর কিছুই বলব না।"

প্রিয়লালের কথা শুনে মথুরানাথ হাসতে লাগল; বললে, "আর গান শুনবেন বাবুজী?"

প্রিয়লাল বললে, "আজ আর না চৌবেজী, আজ মন ভ'রে গেছে, অন্য দিন আবার হবে।"

"ঠিক বাৎ।" ব'লে মথুরানাথ তানপুরার খোলটা টেনে নিয়ে তানপুরায় পরাতে সুরু করলে।

মথুরানাথ এবং তার তবলচী প্রস্থান করলে প্রিয়লাল বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে বসল। সন্ধ্যা গেল প্রিয়লালের আহারের তত্বাবধানে। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "ডক্টার চৌধুরী, আপনার খাবার এখন দেবে?"

"এখনি না দিলে এমন কোনো অসুবিধে হবে কি?"

সন্ধ্যা বললে, "কিচ্ছুনা, যখন আপনার ইচ্ছে হবে তখনি দেবে।"

"তা হ'লে আধঘন্টাটাক পরে দিলেই হবে। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মিসেস মুখার্জি, বসুন।"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সন্ধ্যা বসল। তারপর ক্রমে ক্রমে নানা বিষয়ে কথা উঠল,—সন্ধ্যার গানের কথা; লক্ষ্ণৌর স্বাস্থ্যের কথা; সেখানকার বাঙালী সমাজের কথা; অবশেষে প্রমথর কথা।

প্রিয়লাল বললে, "প্রমথর উদার অন্তঃকরণের যতটুকু পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে আমি তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাকে ভালবাসি কেন জানেন মিসেস্ মুখার্জি?"

মৃদুকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "না, তা জানিনে।"

"সে আপনার স্বামী ব'লে। মহাভাগ্যবান পুরুষ সে। আমি তার সৌভাগ্যের পরিমাণ আমার দুর্ভাগ্য দিয়ে চমৎকার মাপতে পারি। যে সম্পদ লাভ করেছে ব'লে আমি তাকে ভাগ্যবান বলছি, আমি ঠিক সেই জিনিস হারিয়েছি মিসেস মুখার্জি।"

"মিসেস মুখার্জি!"

একমুহূর্ত্ত বিলম্ব করিয়া মৃদু-কম্পিত-কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "আজ্ঞে?"

"আমি হয়ত আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করছি, হয়ত আপনাকে 'অফেন্স' দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা যদি অনুগ্রহ ক'রে স্মরণ রাখেন মিসেস মুখার্জি, তাহ'লে বোধহয় আপনার মনে আমার প্রতি একটু সহানুভূতিও জাগতে পারে। সে কথাটা একবার গাড়িতে কতকটা আপনাকে বলেছিলাম, আর একবার ভাল ক'রে বলবার আগে একটা গল্প বলি, তাহ'লে বোধহয় আমার মনের অবস্থা অনেকটা বুঝতে পারবেন। আমাদের পাড়াতে মাণিকের মা নামে একটি বিধবা স্ত্রীলোক ছিল, তার একমাত্র সন্তান ছিল মাণিক। সেই সতের আঠার বৎসরের ছেলে মাণিক, বিধবার নয়নের মণি, হঠাৎ একদিন তিন দিনের জ্বরে মার কোলে মাথা রেখে মারা গেল। দুঃখে শোকে মাণিকের মা ত' একেবারে পাগল হয়ে গেল। কিন্তু সে সত্য-সত্যই পাগল হ'ল মাস ছয়েক পরে একদিন, যেদিন তাদের পাশের বাড়ীতে একটি সতের আঠার বৎসরের আত্মীয়ের ছেলে এসে উপস্থিত হ'ল। মাণিকের সঙ্গে সে

ছেলেটির আশ্চর্য্য রকমের মিল,—বয়সের মিল, আকৃতির মিল, এমন কি কণ্ঠস্বরেরও মিল। একদিন হঠাৎ সে-ছেলে-টিকে দেখতে পেয়ে মাণিকের মা পাগলের মতো তাকে জড়িয়ে ধরলে, তারপর 'ওরে আমার মাণিকরে!' ব'লে সে কী কান্না! ছেলেটি ত' অবাক! তারপর তাকে কী আদর যত্ন, কী খাওয়ানো-দাওয়ানো, কী জিনিষ-পত্র উপহার দেওয়া! তারপর মাসখানেক পরে যেদিন মাণিকের মার কাছে বিদায় নিয়ে ছেলেটি নিজের বাড়ি চ'লে গেল সে-দিন মাণিকের মার কি নিদারুণ কান্না! সেদিন যেন আবার নতুন ক'রে মাণিকের মৃত্যু হ'ল, এমনি ব্যাপার। বুদ্ধি দিয়ে মাণিকের মা বেশ জানে যে, ও ছেলেটি মাণিক নয়, মাণিক ছমাস হ'ল তারই কোলে মাথা রেখে মারা গেছে,—তবু মনের দিক দিয়ে তার ওপর মাণিকেরই মতো প্রবল আকর্ষণ! আপনাকে নিয়ে আমারও হয়েছে মাণিকের মার অবস্থা! বুদ্ধি দিয়ে বেশ জানি যে আপনি সে নয়, অপর লোক, কিন্তু কর্ম্মাটারে গাড়িতে উঠে আপনাকে হঠাৎ দেখে যে চমকানটা চমকে উঠেছিলাম তার বেগ ত এখনও থামল না। সেই বেগ থেকে অহেতুক হলেও আপনার ওপর এমন একটা প্রবল আকর্ষণ জন্মেছে যার জন্যে সত্যিই বিব্রত হ'য়ে আছি। সেই আকর্ষণের উপদ্রবে যদি মাঝে মাঝে আমার কথায় বা ব্যবহারে একটু অসংযম দেখতে পান তাহ'লে মাণিকের মার গল্প মনে ক'রে আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস মুখার্জ্জি! বাস্তবিক আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আশ্চর্য্যরকম মিল! শুধু বয়সে আর আকৃতিতেই নয়, নামেও। আপনার নাম উষা, আর আমার স্ত্রীর নাম ছিল সন্ধ্যা; বেশি তফাৎ নয়, মাত্র ঘণ্টা বারোর তফাৎ!" ব'লে প্রিয়লাল হাসতে লাগ্‌ল।

"মা!"

চমকিত হ'য়ে সন্ধ্যা চেয়ে দেখ্‌লে পিছনে সাধুচরণ দাঁড়িয়ে।

"কি সাধু?"

"ডাক্তার সাহেবের খেতে যদি দেরি থাকে ত তুমি খেয়ে নাও না। তোমার আবার পিত্তি পড়লে মাথা ধরে।"

সাধুচরণের কথা শুনে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হ'য়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি যাও! তোমার ও-সব কথা ভাবতে হবে না।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, 'তা বেশ ত' এবার আমারও খাবার দিক্, রাতও হয়েছে অনেক।"

ক্ষুব্ধভাবে ভন্ ভন্ ক'রে কি বক্‌তে বক্‌তে সাধুচরণ প্রস্থান করলে। স্পষ্ট বোঝা গেল তার সদুদ্দেশ্যের প্রতি অবিচারের জন্যে সে প্রসন্ন হয় নি।

প্রিয়লাল সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, সাধুচরণ আমাকে ডাক্তার সাহেব ব'লে সাব্যস্ত কেন করলে বল্‌তে পারেন মিসেস মুখার্জ্জি?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আপনি সাহেবের পোষাক প'রে এসে তার কাছে ডাক্তার চৌধুরী ব'লে পরিচয় দিয়েছিলেন, বোধহয় সেই জন্যে।"

শুনে প্রিয়লাল উচ্ছ্বসিত হয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

খাবার টেবিলে একজনের খাবার দেখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "শুধু আমার কেন!—আপনার?"

"আমি পরে খাব অখন।"

"কেন মিসেস মুখার্জ্জি?—বিলম্ব ক'রে লাভ কি? আপনারও দিতে বলুন না।"

সন্ধ্যা কিন্তু স্বীকৃত হ'ল না, যত্নপূর্ব্বক প্রিয়লালকে খাইয়ে তাকে বাথরুমের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সে দ্রুতপদে প্রিয়লালের শয়ন কক্ষের দিকে প্রস্থান করলে।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে প্রিয়লাল দেখ্‌লে হরিয়া নিকটে দাঁড়িয়ে আছে, আর সন্ধ্যা তার বিছানায় মশারি গুঁজে দিচ্ছে। ব্যগ্রস্বরে বল্‌লে, "আপনি কেন নিজে করছেন মিসেস মুখার্জ্জি! হরিয়া ত রয়েছে।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "তা হোক, ওরা হয়ত কোনো দিকে ফাঁক রেখে দেবে, মশা ঢুকবে।"

"মশা আছে নাকি?"

"যথেষ্ট।"

"কিন্তু মশারি ত আমার ছিল না?"

"এটা এখানকার মশারি। বিছানার সঙ্গে কিন্তু সর্ব্বদা ছুটো ক'রে মশারি রাখবেন।"

মশারি গোঁজা হয়ে গেলে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কুঁজোয় জল আছে, আর টেবিলের উপর গেলাস রইল। রাত হয়েছে, এবার আপনি শুয়ে পড়ুন। কোনো দরকার হলে হরিয়াকে বলবেন, বারান্দায় সে শুয়ে থাকবে।"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "আপনার অনেক কষ্ট হ'ল, এবার গিয়ে খেতে বসুন। আচ্ছা, নমস্কার!"

"নমস্কার!" —বারান্দার আলোছায়ার মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দাবী

শ্রীসুপ্রভা দত্ত, এম্‌-এ

১

ভুলেছি ভুলেছি সব। আসিয়াছি আজি
শোণিতাক্ত প্রাণখানি অশ্রুচিহ্ন ঢাকা
ফেলিতে পথের তলে, যেই রাজপথে
মহাকাল উতরিয়া চলে নরনারী
অনন্ত দিবস রাতি। পরাণের সাজি
কুসুমে ওঠেনি ভরি, রিক্ত তরুশাখা
হেমন্ত শিশিরাঘাতে; তব রাজরথে
ধূলি নিবারিব হায় কোথা জলঝারি?
তবু নাহি ব্যথা বাজে, ভুলিয়াছি সব
মালা যে আনিতে হবে দিতে হবে দীপ,
সিক্ত করি নিতে হবে রথচিহ্ন রেখা
হেলায় গেলেম ভুলি। মরণ-আসব
আকণ্ঠ করিয়া পান হে রাজ-অধীপ,
পথপার্শ্বে আছি পড়ে, দিতে হবে দেখা।

২

তবু দেখা দিতে হবে। হে রাজাধিরাজ,
আমারে ভুলিলে তব কোথা রবে মান?
রিক্ত করি ক্ষণে ক্ষণে এই ক্ষীণ প্রাণ
হরণ করিয়া তার যত শোভা সাজ
জীর্ণ করি, দীর্ণ করি, চূর্ণ করি দিয়া
হে নিষ্ঠুর প্রিয়তম একী তব খেলা!
হের অস্ত সমাগমে আলোক মেখলা
দ্রুত করি সম্বরণ যায় মিলাইয়া
আজিকার দিনমান; সারা দীর্ঘক্ষণ
তোমার আমার মাঝে বিরহ অপার
মেলিয়া রাখিয়াছিল ছায়াখানি তার,
দুই তীরে ফিরেছিল অশান্ত ক্রন্দন।
সন্ধ্যা আসে, ছায়াখানি মিলায় ছায়ায়
তবু কি সুদীর্ঘ রাতি ভুলিবে আমায়?

কবিতাপাঠ

(বর্ণনা)

শ্রীনবেন্দু বসু এম্-এ

২। শব্দবিন্যাস

শব্দবিন্যাসের নানা কৌশল আছে। কবির স্বাভাবিক উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে নিত্য নূতন কৌশল সৃষ্টিও হয়ে চলেছে। কয়েকটি সুপরিচিত পদ্ধতির পরিচয় দিই।

(১)। অনুপ্রাস। অনুপ্রাসের বেশ সহজ আর স্পষ্ট একটি উদাহরণ :—

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার
বহে না চল মন্দানিল লুটিয়া ফুলগন্ধভার ।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ
ফুটে না বনে কুন্দনীপ
ছুটে না কলকণ্ঠসুধা পাপিয়া পিক চন্দনার।

(কালিদাস রায়—"অন্ধকার বৃন্দাবন।")

অনুপ্রাসের এই একই রকম ধ্বনিতরঙ্গ কিন্তু বেশীক্ষণ কানে বাজলে তার একটানা মিষ্ট স্বরের গুঞ্জনে ক্রমশঃ একটু অবসাদ আসে। তাই দক্ষ রচনায় অনুপ্রাস অনেক সময়ে সূক্ষ্মভাবে কাজ করে। শব্দতরঙ্গ ছন্দধারার তলে তলে ওঠে নামে :—

নদীকূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে,
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষা শেষের গগন কোনায় কোনায়,
সন্ধ্যা মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়,
নির্জ্জন ক্ষণে কখন অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।

(রবীন্দ্রনাথ—পূরবী—"লীলাসঙ্গিনী"।)

এখানে প্রথম দু'ছত্রে "ল"এর তরল গতি তৃতীয় আর চতুর্থ ছত্রে 'স', 'ক', আর 'র' এর অপেক্ষাকৃত গাঢ় আর কর্কশ অনুপ্রাসে অনেকটা ব্যাহত হয়। তার পরের দুটি ছত্রে "বর্ষাশেষের" আর "সন্ধ্যামেঘের" যুক্তাক্ষরের উচ্চারণে আবৃত্তির গতিমুখে পাথর চাপা পড়ে। ক্ষণপরেই "কোণায় কোণায়" আর "সোনায় সোনায়" কথাগুলির সরল উচ্চারণে সে রুদ্ধ স্রোত আবার খুলে যায়। এই সকল সূক্ষ্ম কৌশলের সাহায্যে এমন একটা শব্দ-সামঞ্জস্য সৃষ্ট হয় যার লালিত্য সমগ্র কবিতাটির মধ্যে ধ্বনিত হ'তে থাকে।

(২) যখন বলি :—

গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি,
তুমি কোন গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি ;
দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে, নম্রনেত্রপাতে,
স্মিতহাস্যে, নাহি চল সলজ্জিত বাসর-শয্যাতে,
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।

(রবীন্দ্রনাথ—চিত্রা—"উর্ব্বশী"।)

তখন পাই ব্যঞ্জনবর্ণবহুল ধ্বনিলালিত্য।

(৩) আবার :—

কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত অনন্ত রাতে কেন চেয়ে বসে রও,
কথা কও, কথা কও।

(রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ "অতীত"।)

এখানে স্বরবর্ণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

(৪)। যখন শুনি :—

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়,
এমন মেঘস্বরে, বাদল ঝরঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায়—

(রবীন্দ্রনাথ-মানসী-"বর্ষার দিনে"।

তখন অনুভব করি লঘু গুরু ধ্বনির সামঞ্জস্য যার প্রভাবে চেতনার আকাশে সত্যই যেন মেঘভার ঘনিয়ে আসে, আর পিপাসু চিত্ত রসবারিধারায় সিক্ত হয়।

(৫)। যদি নিছক শব্দ-ঝঙ্কার শুনতে চাই তাহ'লে এই রকম সব ধ্বনিতরঙ্গ হাতের কাছে পাই :—

রক্তিম অংশুক মাথে
কিংশুক কঙ্কণ হাতে,
মঞ্জীর-ঝঙ্কৃত পায়ে,
সৌরভ-সিঞ্চিত বায়ে,
বন্দন-সঙ্গীত গুঞ্জন-মুখরিত
নন্দন-কুঞ্জে বিরাজো।
(রবীন্দ্রনাথ-গান)

কিম্বা আর একটু মন্দগতিতে :—

তোমার সাজাব যতনে কুসুমরতনে
কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে।
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা
কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা
সীমন্তে সিন্দুর অরুণ বিন্দুর
চরণ রঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কনে।
(রবীন্দ্রনাথ—শাপমোচন।)

(৬) শব্দবিন্যাস অলঙ্কারশাস্ত্রের একটা কৌশল মাত্র নয়। শব্দের সঙ্গে অর্থেরও একটা যোগ আছে। অর্থজ্ঞাপক অনেক কথার সৃষ্টি হয়েছে অর্থানুরূপ ভাবজ্ঞাপক কোন আদিম শব্দের অনুসরণ করে। যেমন "ঝড়" কথাটির ধ্বনিতে ঝড়ের সময়কার উন্মত্ত বায়ু আর গাছপালার সংঘর্ষের আভাষ আছে। "ঘণ্টা" কথায় ঘণ্টার ধাতব শব্দটি শুনতে পাওয়া যায়। দৈনন্দিন অতিব্যবহারের ফলে হয়ত এই সকল কথার শব্দমূল্য আর আমাদের কানে বাজে না, কেবল অর্থসম্পর্কে অন্যমনস্কভাবে তাদের ব্যবহার করে যাই মাত্র, কিন্তু দক্ষ কবির কাব্যে তারা আবারও তাদের প্রাচীন শব্দমর্য্যাদায় সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। ঝিঁঝিঁপোকার ডাক থেকেই তার নামের উৎপত্তি কিন্তু সব সময়ে ঝিঁঝিঁপোকা বলতে তার ডাকের কথা আমাদের মনে থাকে না। অথচ কবিতায় যখন পাই :—

চ'লবো ডালায় আলোক-মালায়
প্রদীপ জ্বেলে,
ঝিল্লি-ঝনন অশোক তলায়
চমক মেলে।
(রবীন্দ্রনাথ—মহুয়া "অর্ঘ্য"।)

তখন অন্ধকার বনভূমির মধ্যে সকল ঝিঁঝিঁ একত্রে ডেকে ওঠে একটা বিরাট ঐক্যতানে। কীটতত্ত্বের "ঝিল্লির" কথা তখন ভুলে যাই। অর্থাত্মক ধ্বনিবিন্যাসের আর একটি সূক্ষ্ম উদাহরণ দিই। কবি লিখেছেন :—

আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে
আজি নবঘন বিপুল মন্দ্রে…
(রবীন্দ্রনাথ—কণিকা "আবির্ভাব"।)

যে কেউ সমুদ্রসৈকতে ঢেউয়ের আছড়ে পড়া আর তার ফিরে যাওয়ার দৃশ্য আর শব্দ অনুসরণ করেছেন তিনিই জানেন যে ঢেউ (ইংরাজীতে যেগুলোকে breakers বলে) যখন আসে তখন প্রথমে শোনা যায় একটা তীব্র শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের মতন একটা জলের বাঁধ ঈষৎ উঁচু হয়ে এগিয়ে আসে। যতক্ষণ না সে দেওয়ালটা ভেঙ্গে যায় ততক্ষণ আর বিশেষ কোন শব্দ হয় না। প্রথমে এই তীব্র শব্দ আর তার পরেকার বিলম্বের ভাব উল্লিখিত কবিতায় ধ্বনিরূপ গ্রহণ করে "উত্তাল" শব্দের দীর্ঘ উচ্চারণে আর তারপর ঈষৎ যতিতে। তারপর ঢেউটি ফেটে ভেঙ্গে আছড়ে-পড়ে' ছড়িয়ে যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল "ছন্দ" কথাটির ঝঙ্কার আর দমকে। "ছন্দ" বলতেই যেন সহসা সর্বাঙ্গ জলকণায় অভিষিক্ত হয়ে গেল। ফিরে যাবার বেলা ঢেউয়ের জল যায় বালির সঙ্গে ঘসতে ঘসতে। এই ঘর্ষণের শব্দ আর পিছনটানের গতি অনুভব করি "নবঘন" কথাটির দ্রুত উচ্চারণে। তারপর মরা ঢেউয়ের বারিধিতে মিলিয়ে যাওয়ার ধ্বনি "মন্দ্রে" কথাটিতে মর্ম্মরিত হয়ে ওঠে। অর্থানুগামী ধ্বনিবৈচিত্র্যের আর একটি চমৎকার নিদর্শন দিই। সত্যেন্দ্রনাথের "ঝর্ণা" কবিতাটির আরম্ভ এই :—

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দনবর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে…

এখানে বেশী পরিমাণে "র" আর "ল" এর প্রয়োগে ঝর্ণার উৎসমুখে যে লঘু মর্ম্মর আর খলখল শব্দ হ'তে থাকে তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তার পর

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোবে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু।

এখানে উৎস থেকে বার হয়ে জল স্ফীতধারে বইতে আরম্ভ করলো। ছন্দের ঝঙ্কারে তাই সে নৃত্যপরায়ণতা আর নেই। ক্রমশঃ নদীর প্রসার বাড়লো, বেগ মন্থর হ'ল, জল কাণায় কাণায় ভরে উঠলো। তখন তার ধ্বনি আর খাত্তব, প্রতিধ্বনিবহুল রইল না; ঠাস ভরাট হয়ে উঠলো।

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে,
ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত।

তারপর সেই নদী যখন জলপ্রপাত হয়ে নীচেকার শিলা-পীঠে আছড়ে পড়তে লাগলো তখন বর্ণনায় 'ড' আর 'ঠ' বেশী :—

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী।

(৭) শব্দবিন্যাসের সাহায্যে ভাব বা অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য ছাড় ভাবের পরিবেষ্টনস্বরূপ একটা অনুকূল ধ্বনির মণ্ডলও সৃষ্টি করা যায়। রবীন্দ্রনাথের "বধূ" কবিতায় বর্ণনার বিষয় হ'ল গ্রাম্যবধূর প্রবাসের ব্যথা। কিন্তু ঐ বিষণ্ণভাবটিকে ঘিরে আছে একটা ত্রস্ত কম্পমানতা যেমন কোন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি অপরিচিত অনভ্যস্ত আবেষ্টনের মধ্যে অনুভব করে থাকেন। এই কম্পমানতার সুর ছন্দের ধ্বনি-কম্পনে গড়ে উঠেছে :—

দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা

কিম্বা

বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।

আমরা অনুভব করি যেন জলের ওপর আলো-ছায়ার কম্পনে বধূটির কম্পিত শঙ্কিত চিন্তারাশিই প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের :—

এস তুমি বাদল বায়ে ঝুলন ঝুলাবে
কমল চোখে কোমল চেয়ে কুজন ভুলাবে

শুনলে আমরা শুধু ঝুলনের ছন্দেই দোল খাই না, সে সময়কার নিরুদ্বেগ তৃপ্তিটুকুও অনুভব করি।

(৮) অন্তরের ভাব ছাড়া বাইরেকার আবেষ্টনের সঙ্গেও সামঞ্জস্য রক্ষা করে শব্দতরঙ্গ রচিত হয়ে থাকে। যেমন কোলাহলমুখর দৃশ্যের বর্ণনায় ভাষাও সরব, ঝঙ্কৃত :—

"অলখ নিরঞ্জন"—
মহারব উঠে বন্ধন টুটে করে ভয় ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে অসি বাজে ঝঞ্ঝন।
পঞ্জাব আজি গরজি উঠিল "অলখ নিরঞ্জন"।
(রবীন্দ্রনাথ—কথা—"বন্দীবীর"।)

কোলাহল যখন শান্ত হয়ে গেল তখন বর্ণনার সুর আর শব্দও হয়ে পড়লো শান্ত :—

স্থির হয়ে বীর রহিল, না করি একটি কাতর শব্দ;
দর্শকদল মুদিল নয়ন, সভা হ'ল নিস্তব্ধ।
(ঐ)

ভাব যেখানে লঘু আনন্দের সেখানে কবি প্রচুর পরিমাণে "ল" আর "স" এর কল্লোল আর উচ্ছ্বাস তুলেছেন :—

কলকল্লোলে লাজ ছিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলী;
মৃণাল ভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে,
আলাপে প্রলাপে হাসি উচ্ছ্বাসে,
আকাশ উঠিল আকুলি।
(রবীন্দ্রনাথ—কথা—"সামান্যক্ষতি")

আবার ভাব যেখানে বিষাদ-সমাচ্ছন্ন, বর্ণনার ধ্বনিও সেখানে ক্ষীণ, মুমূর্ষ :—

সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।
(রবীন্দ্রনাথ—কথা—"পূজারিণী"।)

৩। পুনরুল্লেখ।

কবিতায় কলির মধ্যে বা শেষে অনেক সময়ে এক বা ততোধিক কথার পুনরুল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিটির বিশেষ রসমূল্য আছে যদি না অনাবশ্যক বা অতিপ্রয়োগ হয়। আবেগের মুখে এক কথা একাধিকবার উচ্চারণ করা

মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। আবেগের রুদ্ধ বন্যা তাতে মুক্তি পায় :--

এই তো প্রভাত, এই তো আকাশ,
এই তো পূজার পুষ্প বিকাশ,
এই তো বিমল, এই তো মধুর,
এই তো ভালো ;
এই তো আলো, এই তো আলো।
(রবীন্দ্রনাথ—গীতালি।)

বারে বারে "এই তো আলো, এই তো আলো" বলে কবি তাঁর আলো দেখার বিস্ময় আর আনন্দের আবেগকে কণ্ঠের সুরে সেই আলোক পারাবারের মতনই উচ্ছ্বসিত করে তোলেন। বিস্ময় আর আনন্দের মতন অন্য কোন রসের আবেগ প্রবল হলেও এই পুণরুচ্চারণের মধ্যে তাকে মুক্তি পেতে হবে। কৈকেয়ীর বিদ্বেষ, বিদ্রূপ, ঘৃণা ক্রোধ প্রভৃতি ভাবের সংযমহীন, দিশাহারা আবেগ প্রকাশ পায় তার বার বার দশরথকে "পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি" বলে বক্রাবিদ্ধ করায় (মাইকেল মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্যের চতুর্থ সর্গ দ্রষ্টব্য)। ইংরাজী কাব্যে এই পুনরুল্লেখ পদ্ধতি টেনিসনে প্রায়ই পাওয়া যায়। তাঁর Guinevere নামক কবিতায় অনুতপ্তা রাণীর খেদোক্তি বার বার "Not Lancelot nor another" বলায় হৃদয়-বিদারক হয়ে ওঠে।

৪। বিরোধ।

সুর, চিত্র বা কাব্য রচনা হ'ল সামঞ্জস্যের রচনা। সেই সামঞ্জস্যের মধ্যেই মাঝে মাঝে বিরোধের আভাস দিয়ে রূপকে স্পষ্ট আর রসকে ঘন করা শিল্পীর একটা চমৎকার পদ্ধতি।

কিছুপূর্ব্বে আমরা বলেছি যে বর্ণিত দৃশ্য যেখানে কোলাহলমুখর সেখানে বর্ণনাও শব্দময় আর শান্ত দৃশ্যের বর্ণনাও মৃদুধ্বনি। এই রকম বিরোধাত্মক বর্ণনা সমীচীন স্থলে পর পর অবস্থিত করে' কবিতার রূপরসকে লাবণ্যমণ্ডিত করে :—

মুক্ত কৃপাণে পুররক্ষক তখনি ছুটিয়া আসি
শুধাল "কে তুই ওরে দুর্ম্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি।"
মধুর কণ্ঠে শুনিল "শ্রীমতী, আমি বুদ্ধের দাসী।"
(রবীন্দ্রনাথ—কথা—"পূজারিণী।")

পুররক্ষকের তর্জ্জন-গর্জ্জনের পর "মধুরকণ্ঠে" শ্রীমতীর নম্র বিনীত নিবেদন সত্যই যেন দুর্য্যোগের রাত্রিতে ঝড়বাদলের অবসানে শান্ত চন্দ্রোদয়। কাব্যে এ যেন আলো-ছায়ার খেলা।

ভাবের বিরোধের মতন দৃশ্যবিরোধেরও সময়ে সময়ে অবতারণা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ প্রথমে দেখা যাক এই দৃশ্যটি :—

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল
পথ তরুশাখে ধরেছে মুকুল
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল পারুল রজনীগন্ধা।
অতিদূর হ'তে আসিছে পবনে বাঁশীর মদির-মন্দ্র,
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে হাসিছে পূর্ণচন্দ্র।

এমন রাত্রিতে স্বতঃই মনে হয় যে এ বুঝি এক অভিসারের রাত্রি, মিলনসুখে যাপন করবার রমণীয় মধুরাত্রি। কিন্তু এই রাত্রিতে যেন নিতান্ত অসঙ্গতভাবে দেখা গেল এক শোকাবহ দৃশ্য :—

নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী বাহির প্রাচীর প্রান্তে
দাঁড়ালেন আসি পরিখার পারে,
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে
কে ওই রমনী প'ড়ে একধারে তাঁহার চরণোপান্তে।
নিদারুণ রোগে মারী-গুটিকায় ভ'রে গেছে তার অঙ্গ
রোগ-মসী ঢালা কালী তনু তার
লয়ে প্রজাগণে-পুর পরিখার
বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার বিষাক্ত তার অঙ্গ।
(রবীন্দ্রনাথ—কথা—"অভিসার")

৫। সঙ্গতি।

বিরোধের পর সঙ্গতির পরিচয় দিই। কবীন্দ্রের এই গানটি সুপরিচিত :—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাইরে ঘুম নয়নে মম,

দুয়ার খুলে হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
বাহিরে কিছু দেখিতে না পাই,
তোমার পথ কোথা ভাবি তাই।
সুদূর কোন নদীর পারে,
গহন কোন বনের ধারে
গভীর কোন অন্ধকারে,
হতেছ তুমি পার।

রাত্রিকাল, সূচীভেদ্য অন্ধকার, ঝড়, বৃষ্টি, গহন বন, দূর নদী-তীর, এই পরিবেষ্টনের মধ্যে একাকী পথিক বার হয়েছে তার বিপজ্জনক অভিসার যাত্রায়। মনে হয় যেন ঝড়ের রাতে, ঝাপসা অন্ধকারে, যত অলীক কালো ছায়া তাকে ভ্রুকুটি করে। ঐ দূরত্ব আর গভীরতাজ্ঞাপক কথাগুলি কি রকম দৃশ্যের অস্পষ্টতাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। তার মাঝখান দিয়ে যে চলে যায় সে নিজে আরো কত অস্পষ্ট। শুনতে পাই খরস্রোতা নদীর তর তর বেগ, বনের মধ্যে গাছের মাথায় ক্ষুব্ধ বাতাসের স্বনন, গভীর অন্ধকারে পাতা আর তৃণের ওপর অস্ত পা পড়ার শব্দ, কাঁটাগুল্মে বাধা পেয়ে উদ্বিগ্ন গোপনচারী পথিককে কতবার দাঁড়াতে হয়—সব সেই অন্ধকারের মধ্যে, গভীর অন্ধকারের মধ্যে। এ বর্ণনায় একটি কথা বা ভাব নেই যা অন্ধকার, দুর্যোগ, বিজনতা, বিপদ আর শঙ্কার ভাবকে ঘনীভূত না করে তোলে। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পাই ভাব আর দৃশ্য বর্ণনার এক মনোহর ঐক্য।

শ্রীনবেন্দু বসু

স্বপ্ন-মায়া

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

আমার জীবন ভার লঘু কোরে দাও আজ হে সুন্দরী আকাশের রাণী,
সহিতে পারিনা আর নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস বায়ু গুমরিছে আত্মবেদী মূলে ;
জীবন ও সুবর্ণের অশেষ পিপাসা আর মৌন মূক মরণের বাণী
বহিয়া প্রাণের তরী কালের উজানে বহে ভিড়িবে সে কোন উপকূলে ?
দুর্বহ জীবনভার বহিতেই হবে সখি, প্রাণপণে বহিতেই হ'বে,
চরণে ফুটিবে কাঁটা, হাসিবে শীতল চাঁদ বাঁকা হাসি নির্মেঘ গগনে
দেবতার ভ্রূকুঞ্চন খেয়ালের সৃষ্টি বুকে, এ অদৃষ্টে চিরদিন র'বে—
তুমি শুধু কৃপা কর, কৃপা কর হে নায়িকা, এ গভীর মরণ-লগনে ॥

আজিকার মধুনিশি, মরতের এ মিলন, আজিকার ভালবাসাবাসি,
কষ্টের সংসার মাঝে অসংখ্য অভাব আর দৈন্য সাথে চলে পাশাপাশি
মরমৃত্তিকার বুকে গীতরিক্ত এ জীবনে কারো' পরে নাহি অভিযোগ ;
ছিন্ন ভাগ্যসূত্র হ'তে অদৃশ্য আঘাতে সখি, ঝরে পড়া এ জীবন ফুল—
অব্যর্থ সন্ধানী কাল ফেলিয়াছে মৃত্যুস্রোতে সহিতেই হ'বে এ দুর্ভোগ
তুমি তা'রে তুলে লও মরণ প্রবাহ হতে হে সুন্দরী করিওনা ভুল।

নবদ্বীপে মাধুকরী

শ্রীজনরঞ্জন রায়

যদস্থ চরিত লীলা কর্ণপীযূষ বিপ্রুট্।
সগৃদদন বিধূত দ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ॥
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনাঃ।
বহবইহ বিহঙ্গাঃ ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি॥

—ভ্রমর গীতা।

তাঁহার কথা এমন অপূর্ব্ব এতই সরস যে, তাহা কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্পর্শ করিলে মানুষের সুখদুঃখ জ্ঞান লুপ্ত হয়, তাহার আর কোনও মায়াব বাঁধন থাকে না। নিরভিমান হইয়া সে তখন বিহঙ্গমের ন্যায় ভিক্ষান্নের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণবিরহ কাতরা শ্রীরাধিকা জীবনধারণের উপযোগী সামান্য কিছু প্রসাদ আহার করিয়া সাধনারত ছিলেন এবং ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ "মাধুকরী" বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণভজন করিতেন—সর্ব্বজীবকে এই শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীরাধিকা ভ্রমরকে উপরোক্তরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় উন্নতোজ্জ্বল যে রসের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই নিজ পতি-বিরহে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ সাধনার মধ্যে পরিস্ফুট করিয়া প্রচার করিলেন। নবদ্বীপে গৌরভক্তগণের মাধুকরী প্রসঙ্গে আমরা আজ সেই রসাস্বাদ করিবার প্রয়াস করিতেছি।

"ঈশ্বরীর নাম গ্রহণ শুন ভাই সব।
যে কথা শ্রবণে লীলার হয় অনুভব॥
নবীন মৃৎভাজন আনে দুই পাশে ধরি।
এক শূন্যপাত্র আর এক তণ্ডুল ভরি॥
একবার জপে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ অন্তর॥
তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত লয়েন হরিনাম।
তাতে যে তণ্ডুল হয় লৈয়া পাকে যান॥
সেই সে তণ্ডুল মাত্র রন্ধন করিয়া।
ভক্ষণ করান প্রভুকে অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥
রাত্রি দিন হরিনাম প্রভুর সংখ্যা যত।
সে চেষ্টা বুঝিতে নারি বুদ্ধি অতিহত॥
প্রভুর প্রেয়সী যেঁহো তাঁহার কি কথা।
দিবা নিশি হরিনাম লয়েন সর্ব্বথা॥
তাঁহার অসাধ্য কিবা নামে এত আর্ত্তি।
নাম লয়েন তাহে রোপন করেন প্রভুর শক্তি॥"

—প্রেম বিলাস

উপরোক্ত পয়ারাংশ হইতে বিষ্ণুপ্রিয়ার সাধনার ছবিখানি ফুটিয়া উঠে। তাঁহার এই সাধনা আমাদের চক্ষে অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যে আদর্শ রহিয়াছে তাহা অতি মহৎ। স্বামীদেবতাকে তিনি সর্ব্বদা অন্তর মধ্যে অনুভব করিতেছিলেন, এজন্য বিরহব্যথা ছিল না। স্বামী যে বলিয়া গিয়াছেন—"আমি যথাতথা যাই, থাকিব তোমার ঠাঁই।" দয়িতের প্রেম সমাধিতে তিনি মগ্ন থাকিতেন। "স্মরস্তম্ভ বিমূহ্যন্তি বিরহোৎকণ্ঠ বিহ্বলা"—যাঁহার অন্তরমধ্যে অন্তরতম দেবতা সর্ব্বদা বিরাজ করেন, বাহিরের সঙ্গে তাঁহার কতটুকুই বা সম্পর্ক থাকে? তিনি যে আপন অন্তরের আনন্দরসে পূর্ণকাম। সংসারের সুখদুঃখ, মান অপমান, শীত গ্রীষ্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ক্ষুধাতৃষ্ণা পর্য্যন্ত তাঁহাকে কাতর করিতে পারে না। তিনি যে সর্ব্বজয়ী! ব্রহ্মচারিণী হিন্দুরমণীর পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত্র অতুলনীয়।

শচীমাতার দেহত্যাগের পর ঈশান নাগর, বিষ্ণুপ্রিয়ার সংবাদ লইতে প্রেরিত হয়েন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুর হইতে নিজ প্রিয় শিষ্যকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। ঈশানের নিকট হইতে নবদ্বীপের গৌরভক্তগণের আর্ত্তি ও নিষ্ঠা এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার সাধনার বিষদ বর্ণনা প্রাপ্ত হই।

তাহা এত মহিমময় যে পাষণ্ডের মস্তককেও অবনত করিয়া দেয়। সংসারের কাহারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া সাধনরত। দামোদর পণ্ডিত, দাস গদাধর, শ্রীরাম পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ দিনান্তে একবার মাত্র মহাপ্রভু দর্শনে সে বাটীতে প্রবেশ করেন, নতুবা সর্ব্বদাই বাহির-দ্বার নদ্ধ থাকে। যেন পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীর লোক নহেন বিষ্ণুপ্রিয়া। সম্মুখে স্বামী-দেবতার মূর্ত্তিটিকে লইয়া অপার সাধন-সুখে মগ্ন। মূর্ত্তি-পূজা যদি সাধনার একদেশ হয় তবে এইভাবেই তাহার সেবা করা প্রয়োজন। তোমাকে সব দিয়াছি প্রাণেশ, অন্তরে তুমি, বাহিরে তুমি। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "ভবতি না- বিয়োগ যে নহি সর্ব্বত্মনা কচিৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ—"আমাকে সর্ব্বদা চোখে দেখিতে পাইতেছ না বলিয়া তোমাদের যাহা কিছু দুঃখ, নতুবা নিয়ত অন্তরমধ্যে আমায় পাইয়াও তোমাদের বিরহ-ক্লেশ কেন হইতেছে?" কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার সে ক্লেশ নাই। তাঁহার স্বামী-দেবতা তাঁহারই প্রার্থনা মত তাঁহাকে যে বিগ্রহ স্থাপনের আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর সেই মূর্ত্তিটী বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মুখে*। স্বামী বলিয়া গিয়াছিলেন আমার বিরহের অবলম্বন স্বরূপ তুমি আমার বিগ্রহ স্থাপন করিও এবং সেই বিগ্রহ ও আমাকে অভেদ জ্ঞানে সেবা পূজা করিও—তোমার সব বিরহ-ক্লেশ অপনোদিত হইবে...। বিষ্ণুপ্রিয়া যে সর্ব্বত্যাগী হইয়া একান্তে নির্জ্জনে তাহাই করিতেছেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানাহ্নিক প্রভৃতি সমাধা করিয়াই স্বামী-বিগ্রহের নিকটে বসিয়া জপধ্যানে মগ্ন হইতেন। মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত অতি প্রাচীন দামোদর পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট ঈশান নাগর জানিতে পারেন বিষ্ণুপ্রিয়ার এই ভজন-রহস্য। স্বামীতে ও শ্রীকৃষ্ণে অভেদ বুদ্ধি লইয়া তিনি অপূর্ব্ব স্বামী-সাধনায় মগ্ন হইতেন। আবেশ পুলকে কখনও যোগসমাধিতে—কখনও বা কিঞ্চিৎ-মাত্র বাহ্যাবস্থায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত কাটিয়া যাইত। "নাম লয়েন তাণ্ডে রোপন করেন প্রভু শক্তি"—দামোদর পণ্ডিতের নিকট ঈশান এইরূপই শুনিয়াছিলেন। জপের সংখ্যা রাখা শাস্ত্রের নিয়ম। কিন্তু আত্মময় তাপসের কর এক স্থানেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তিনি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার জপ করিতেন কি-না তাহা আমরা জানিতে পারি না। চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবত যদি গৌরঘরণীকে এই অতুলনীয় সাধন-চিত্রটী দিয়া নিজ নিজ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতেন তাহা হইলে অনেক অধিক তথ্য জ্ঞাত হওয়া যাইত। বৃন্দাবন দাসের ন্যায় কবির অমৃতোপম কথায় বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন-প্রণালী বর্ণিত হইলে তাহা সমধিক উপভোগ্য হইত। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—বিবাহের পূর্ব্বেই শচীমাতা এই কন্যাকেই গৌরাঙ্গের যোগ্যা পাত্রীরূপে স্থির করেন—"শচীদেবী তাঁরে দেখিলেন সেইক্ষণে, সেই কন্যা পুত্র যোগ্যা বুঝিলেন মনে"—চৈঃ ভাঃ। ঘটক কাশীনাথ শচীমাতা কর্ত্তৃক বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন—"যেন কৃষ্ণ রুক্মিণীতে অন্যোন্য উচিত, সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই পণ্ডিত"—চৈঃ ভাঃ। শচীদেবী একদিন গৌর নিত্যানন্দকে ভোজন করাইতে করাইতে দেখিলেন যে, নারায়ণের হৃদয়-সংলগ্না বিষ্ণুপ্রিয়া—

"কৃষ্ণ শুক্লবর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুইজন চতুর্ভুজ, দুই দিগম্বর॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মূষল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখে মকর কুণ্ডল॥
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃৎ দেখিয়া আর দেখিতে না পারে॥"

চৈঃ ভাঃ।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে চৈতন্য ভাগবতে গৌরাঙ্গদেবের নবদ্বীপ লীলার কথাই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার শেষার্দ্ধ লীলা চৈতন্য চরিতামৃতে সবিস্তারে লিখিত আছে। কিন্তু গৌরগণের সমস্ত বিবরণ ও বৈষ্ণব-দর্শন ঐ দুইখানি গ্রন্থে সীমাবদ্ধ নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্যজ্ঞাতব্য অনেক প্রসঙ্গ অন্যান্য মহাজনগণ নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। সেগুলিকে বাদ দিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সমস্ত কথা জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হইবে না।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভগবানের পাদপীঠ জগৎমাতা বলা হইয়াছে—

---

* বারান্তরে এই বিগ্রহের প্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচনা করিব। লেখক।

P3038
25,229

"সনাতনমিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতো নৃপঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎকন্যা ভূস্বরূপিনী।"

চৈতন্য মঙ্গলে তাঁহাকে নবদ্বীপময়ী বলিয়া সম্মান দেখান হইয়াছে—

"নবদ্বীপময়ী বন্দোঁ বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যাঁর অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙ্গা পা।"

বংশী শিক্ষায় বলা হইয়াছে—

"চৈতন্যবল্লভা তুমি জগত ঈশ্বরী।
তোমার দাসের দাস হইতে বাঞ্ছা করি।"

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গসহস্রনামকীর্ত্তনে বলিয়াছেন—

"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শক্তি মহাপ্রভু দেবতা।"

ঈশান নাগরের নিকট হইতে আমরা সাধনবতী বিষ্ণুপ্রিয়ার এইরূপ সংবাদ পাইয়া থাকি—

"বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচীদেবীর অন্তর্দ্ধানে।
ভক্তদ্বারে দ্বাররুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে॥
তাঁর আজ্ঞা বিনা তানে নিষেধ দর্শনে।
অত্যন্ত কঠোর ব্রত করিলা ধারণে॥
প্রত্যুষেতে স্নান করি কৃতাহ্নিক হঞা।
হরিনাম করি কিছু তণ্ডুল লইয়া॥
নাম প্রতি এক তণ্ডুল মৃৎপাত্রে রাখয়।
হেন মতে তৃতীয় প্রহর নাম লয়॥
জপান্তে সেই সংখ্যার তণ্ডুল মাত্র লঞা।
যত্নে পাক করে মুখ বস্ত্রেতে বান্ধিয়া॥
অলবণ অনুপকরণ অন্ন লঞা।
মহাপ্রভুর ভোগ লাগায় কাকুতি করিয়া॥
বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনী।
মুষ্টিক প্রসাদ মাত্র ভুঞ্জেন আপনি॥
অবশেষে প্রসাদান্ন বিলায় ভক্তেরে।
ঐছন কঠোর ব্রত কে করিতে পারে॥
বজ্রাঘাত সম বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভাবিনু মাতাকে কৈছে পাইমু দর্শন॥
হেনকালে আইলা তথা দাস গদাধর।
শ্রীরাম পণ্ডিত আদি ভকত প্রবর॥
প্রসাদ লইতে সভে দামোদর সনে।
অন্তঃপুরে প্রবেশিলা সজল নয়নে॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা আজ্ঞা অনুসারে।
মো অধমে লঞা পণ্ডিত গেলা অন্তঃপুরে॥
যাঞা দেখি কাণ্ডাপটে মায়ের অঙ্গ ঢাকা।
কোটীভাগ্যে শ্রীচরণ মাত্র পাইনু দেখা॥
ভক্ত কৃপাবলে কিঞ্চিৎ পাইনু প্রসাদ।
কৃতার্থ হইনু মনে ঘুচিল বিষাদ॥
যে কষ্ট সহেন মাতা কি কহিমু আর।
অলৌকিক শক্তি বিনা ঐছে সাধ্য কার॥
তাহা শুনি মোর প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
কৃষ্ণ ইচ্ছা মানি করে খেদ সম্বরন॥ অঃ প্রঃ।

তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া জপ করিতেন। সেই জপের দ্বারা কতগুলি তণ্ডুল হইত তাহা বলা যায় না। তবে তাহা যে প্রচুর হইত না ইহা অনুমান করা যায়। তাহা রন্ধনকালে বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ মুখখানি বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন। কারণ যদি তাহাতে মুখামৃত পড়ে তবে ভোগের অন্ন নষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি 'অলবণ ও অনুপকরণ' অন্নমাত্র দ্বারা মহাপ্রভুর ভোগ দিতেন। তাহাতে না ছিল ব্যঞ্জন, না ছিল দধী দুগ্ধ মিষ্টান্ন। পরম সাধিকা শুধু সেই অন্ন কয়টী নিবেদন করিবার কালে 'বিবিধ বিলাপ' করিতেন। ভক্তি-অশ্রুর দ্বারায় তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত। ভোগ শেষে কেবল এক মুষ্টি অন্নপ্রসাদ তিনি নিজের জন্য গ্রহণ করিতেন। অবশিষ্ট প্রসাদ ভক্তগণকে বিতরণ করা হইত। নবদ্বীপে যে সব গৌরভক্ত বর্ত্তমান ছিলেন তাঁহারা সকলেই কণিকা প্রসাদের জন্য সেই তৃতীয় প্রহর অন্তে গৌরগৃহের বহির্দ্দেশে সমবেত হইতেন। তৎপরে বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ শয়ন গৃহে গিয়া একাকী পর্দ্দার পশ্চাতে গিয়া দণ্ডায়মান হইতেন। দাসী তখন বাহিরের দ্বার খুলিয়া দিতেন। পরম আনন্দে ভক্তগণ অন্দর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৌরাঙ্গের বিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। তৎপরে পর্দ্দার অন্তরাল হইতে সকলে নবদ্বীপময়ী-গৌরাঙ্গের শক্তিরূপা বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণ-দুখানি দর্শন করিয়া প্রণাম করিতেন। সর্ব্ব অঙ্গে তাঁহাদের পুলক-কম্পন জাগিত। নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত। সর্ব্বশেষে তাঁহারা প্রসাদ-কণিকা গ্রহণ করিয়া প্রেম-টলমল দেহে গৌর নামের গর্জ্জন হুঙ্কার করিতে করিতে বাহির

হইতেন। এইরূপে নবদ্বীপে তথা বঙ্গদেশে "মাধুকরী" বিতরণ প্রথা আরম্ভ হয়। ক্রমে এখানে গোস্বামী ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় তিন প্রভুর সহিত আরও বহু সেবার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। নবদ্বীপের ত্যাগী বৈষ্ণবগণ এখনও দ্বিপ্রহরান্তে মহাপ্রভুর মন্দির হইতে মাধুকরী প্রসাদ মুষ্টি লইয়া অন্যান্য মন্দির হইতে মাধুকরী গ্রহণ করেন।

নবদ্বীপে মাধুকরী প্রথা উদ্ভবের বিবরণ আমরা পাই-য়াছি। কিন্তু মাধুকরী বলিলে ঠিক কি বুঝায় তাহা বলা হয় নাই। প্রসঙ্গত সেই বিষয়ে কিছু বলিতেছি। ভ্রমর যেমন এক ফুল হইতে অন্য ফুলে অল্পক্ষণ বসিয়া সারাদিন মধু আহরণ করে, বৈষ্ণবের মাধুকরীর দ্বারা সেরূপ অর্থ বুঝায় না। সংসার-ত্যাগী ভজনশীল বৈষ্ণব জীবন ধারণের জন্য অবশ্যই কিঞ্চিৎ আহার করিবেন, একস্থান হইতে তাহা গ্রহণ করিবেন না— বহুস্থান হইতে স্বেচ্ছাদত্ত দেবসেবার কিছু কিছু প্রসাদ, ভিক্ষা দ্বারা সঞ্চয় করিবেন—মধুকরীর ইহাই উদ্দেশ্য। মাধুকরীর দ্বারা বহু দেব বিগ্রহ দর্শনের সুযোগ ঘটে, ভিক্ষা করিতে হয় বলিয়া অভিমান বিনষ্ট হয়, স্বল্প প্রসাদ সেবার জন্য অতিভোজন হয় না—অথচ জীবনধারণোপযোগী আহার গ্রহণ করা যায়। অনাহার দ্বারা সাধনের ব্যাঘাত ঘটে—গীতায় অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
নচাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে মাধুকরীর কিরূপ অর্থ করিয়াছেন দেখুন—

স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং দেহোবর্ত্তেত যাবৎ।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ॥

অবধূত ব্রাহ্মণ যদুরাজকে বলিতেছেন, মহারাজ! ঈশ্বর-মননশীল ব্যক্তি দেহ-রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেইমত অল্প ভোজন করিবেন, তিনি গৃহস্থগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত ভোজ্য সংগ্রহের জন্য মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিবেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এইরূপভাবে মাধুকরীর বর্ণনা আছে—

"এক এক বৃক্ষতলে এক এক দিন বাস।
পরিধান বহির্ব্বাস মাধুকরী গ্রাস॥
সাড়ে সপ্ত প্রহর যায় শ্রবণ কীর্ত্তনে।
অর্দ্ধপ্রহর নিদ্রা নহে কোন দিনে॥

বাঙ্গালী ভক্তগণ শ্রীবৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া তথায় রূপসনাতন প্রভৃতির ভজন ও মাধুকরী ভিক্ষার উক্তরূপ বর্ণনা করিতেন।

শ্রীজনরঞ্জন রায়

ব্যথার গান

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কোথায় অহল্যা কাঁদে পাষাণের অন্ধকারে আর্ত্তনাদ করি,
সীতার নয়ন জল উথলিছে দূর কোন অশোক-কাননে,
দ্রৌপদীর হাহাকারে ঝরিতেছে নিখিলের আশার মঞ্জরী,
বিরলে বসিয়া রহে দগ্ধভাগ্য দময়ন্তী বিশুষ্ক আননে,
কোথা নর-নারায়ণ সর্ব্বহারা বুভুক্ষায় হয়েছে উতল
তোর কি পশে না কাণে ? অন্তরে ওঠেনা ব্যথা বেদনা লহর ?

অশান্ত শিশুর মত তুই শুধু কল্পনার কুড়ায়ে উপল
সংসারের সিন্ধুতীরে কাটাইলি জীবনের সারাটি প্রহর !
ঈশানে বৈশাখী বায়ু বহিয়া এনেছে এবে দুরন্ত ঝটিকা,
প্রশান্ত সাগর কূলে পশ্চিমের মেঘপুঞ্জ ঘনাইয়া আসে,
কে জানে কখন তোর হারাইবে স্বপ্নে রচা জীবন-নাটিকা
আত্মভোলা ওরে কবি ! আনন্দেতে মগ্ন তুই প্রেমের সুবাসে !
ওই যে ক্রন্দন রোল দিক্ হতে দিগন্তরে উঠিছে ফুলিয়া,
তারি মাঝে আয় তুই অকারণে রয়েছিস্ সবারে ভুলিয়া।

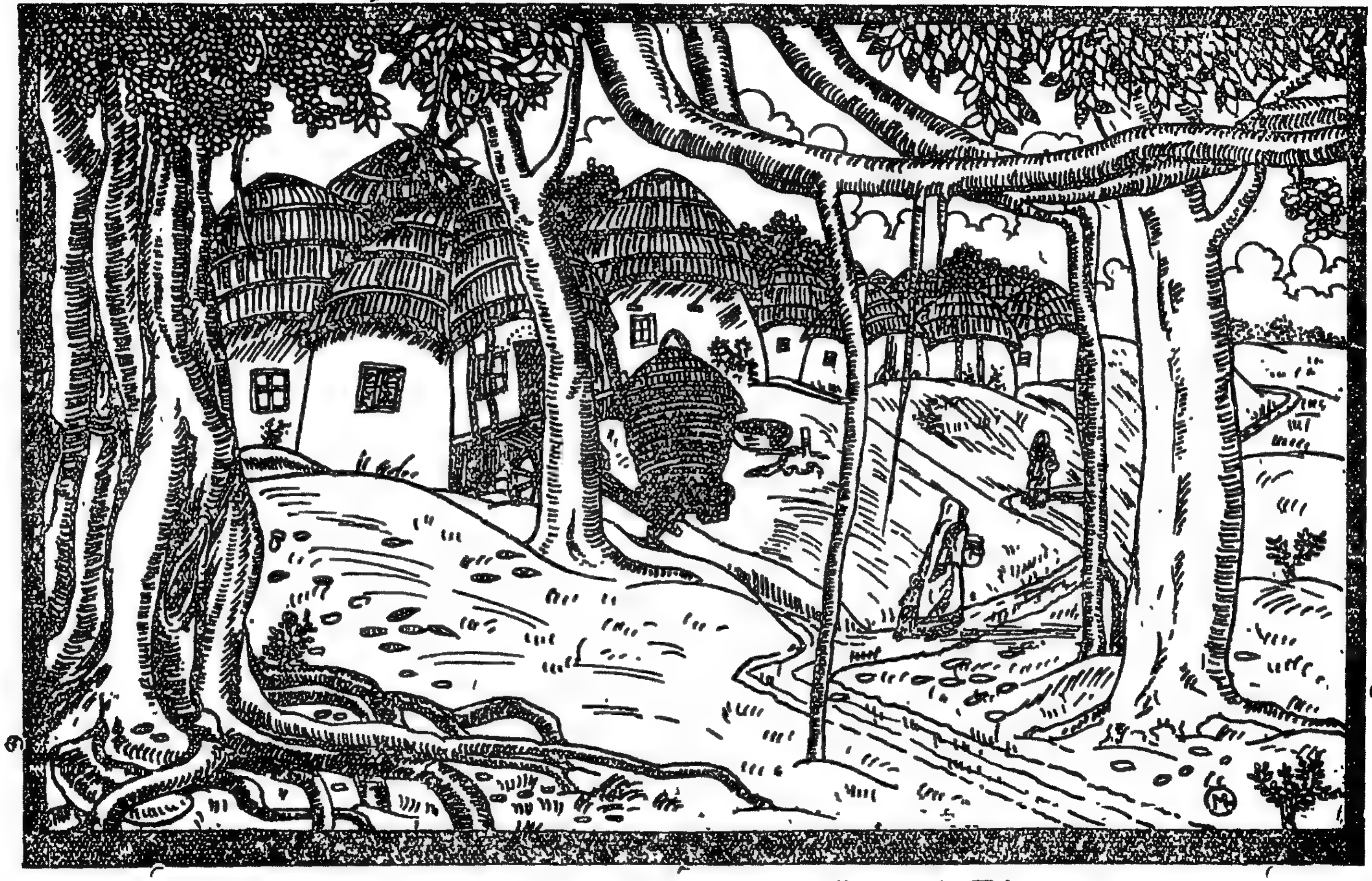

বিচিত্রা
শ্রাবণ, ১৩৪৩

পল্লীদৃশ্য

শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

ইয়োরোপা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

আলোকচিত্রশিল্পী—লেখক

মনের মধ্যে সুদূরের জন্য দোলা লাগিয়ে ইংলণ্ডের অপরূপ ঋতু-উৎসব পরীক্ষার্থীর জানালার সামনে দিয়ে শোভাযাত্রার মত মাসের পর মাস চলে গিয়েছে। প্রথম বসন্ত-স্পর্শের ভীরু উল্লাসের মধ্যে গাছে গাছে ফুলের আভাস, ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সূচনা খুঁজে ফিরতে চেয়েছি। সোয়ালো পাখীর ফিরে আসার জন্য, সী-গালের জলকেলির জন্য, আমার জানালার সামনের বার্চগাছের পাতায় পাতায় বর্ণ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাকবার্ডের আগমনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছি। ভোরের স্কাইলার্কের আহ্বানটী শুনতে একদিনও ভুল হয়নি; স্নোড্রপ ও ক্রোকাসের সহসা বিকাশের সন্ধান বাদ দিতে একদিনও ইচ্ছা হয়নি।

আজ ছুটী ছুটী! মনে মনে যে বসন্ত-ব্যাকুলতা এত দিন অনুভব করেছি তার আজ বন্ধন মুক্তি হবে। কাজের বাধা যেন দূর হয়ে গেল—তা সে যেমন করেই যাক্ না কেন—একটা ঝড়ে উড়ে যাক্ বা বৃষ্টিতে ধুয়ে যাক্—আর আমি অনির্দ্দিষ্ট পথে বের হয়ে যাই। আজ থেকে আমার ছুটি কাটাব কেমন করে? দু পাশের লতাগুল্মের 'হেজে'র বেড়ার পাশ দিয়ে ছায়াঘনবিড় গ্রামপথে হাঁটতে হাঁটতে কখন মৃদুকম্পিত ভায়োলেটের শেষ স্পর্শটুকু পাওয়া গেল, কখন বা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর দিনগুলির উত্তাপে লাইলাক ও ল্যাবার্ণাম্ বিকশিত হয়ে উঠবে সেই খবর নিতে নিতে কোথায় আজ যাব 'সারে'র নিভৃত, নিদ্রামগ্ন, নাইটিঙ্গেল-মুখরিত নদীতীরে? কোথায় যাব সাসেক্সের সাগুদেশের স্নিগ্ধ হরিৎ প্রান্তরে?

এই দেশকে একদিনের জন্যও নূতন বা অপরিচিত মনে হল না। আমার বহুদিনের কল্পনার শ্যামল গ্রামটী—টমাস হার্ডির গ্রাম, চেরী ম্যাপল পপলারে সুন্দর লীলাচঞ্চল হাস্যময় মে-উৎসবের গ্রামটির চিত্রের সঙ্গে ইংলণ্ডের গ্রাম যেন মিশে গেল। সাহিত্যের পাতায় এই ইংলণ্ডের গ্রামের সঙ্গে পরিচয় ছিল যেখানে রৌদ্রের দীপ্তি আছে দাহ নেই, প্রকৃতির উল্লাস আছে উন্মত্ততা নেই, যেখানে কৃষক বালকের মত গর্ব্বের সৌরভে আমোদিত প্রান্তরে গাছের ছায়ায় শুয়ে সুমধুর আলস্যে গুন গুন করে গান করা যাবে

Lying in the hay all day

I feel as lazy as the hazy summer day.

যেখানে শীতের শেষে বসন্তের চুম্বন-পুলকে প্রকৃতি যখন পরিণত শোভায় মধুর হয়ে উঠেছে সেই সময় চার্লস ল্যাম্বের মত দিনের প্রসন্ন আলোকের উত্তাপে অনুভব করব I feel ripening with the orangery.

শরৎকালের বন্ধনমুক্ত মন ঘরে আর পড়ে থাকতে চাইল না। এই সময়েই প্রাচীন ভারতের রাজারা দিগ্বিজয়ে বের হতেন। আমার মনও ইয়োরোপের সব দেশে তার বল্গা ছেড়ে দিয়ে ছুটতে চাইল। চঞ্চল হয়ে উঠলাম যে যেখানে খুসী চলে যাব—যত দূরে খুসী যাব—যেখানে আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থাকবে না, চেনা লোক থাকবে না আর থাকবে না ইয়োরোপীয় সতর্ক সময়নিষ্ঠা ও সুকঠিন আচারশীলতা।

একদিন সন্ধ্যাবেলা "ইয়ুথ হোষ্টেল এ্যাসোসিয়েশনের" তিনটী নূতন সভ্য আমরা পিঠে-বাঁধা 'রুকস্যাকে' বোঝাই জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে এডিনবরার অতুলনীয় রাজপথ প্রিন্সেস ষ্ট্রীট বেয়ে উঠতে লাগলাম। লণ্ডন থেকে মাত্র ক'ঘণ্টার পাড়ি, তা ছাড়া এত বড় সহর; তবু প্রিন্সেস ষ্ট্রীট থেকে এডিনবরার গিরিদুর্গ থেকে মনে হতে লাগল যেন এরি মধ্যে আমার অরণ্যবাস আরম্ভ হয়ে গেছে। জনারণ্যের মধ্যেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এই দুর্গ—এই ত সবে বৈচিত্র্যের

আরম্ভ। তার উপর মনে করতে হবে যে এই সহরের উপকণ্ঠেই রাণী মেরীর হলিরুড প্রাসাদ। ভাবতেই মন কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠে।

একে যেমন সুন্দর দেখাত বলে বর্ণনা করা আছে তেমনি সুন্দর ম্লান মহিমায় এই ভগ্নস্তূপ এখনো আছে; কিন্তু মায়াবী মাইকেল স্কটকে আর পাওয়া যাবে না; টেভিয়ট

এডিনবরার গিরিদুর্গ

এডিনবরায় আড্ডা করে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত দেশে কিছু ঘোরা গেল। এই সীমান্তকে স্কটের দেশ বলতে পারা যায়; কারণ স্কটের লেখনীই এই জায়গাকে এত বিচিত্র, রোমাঞ্চকর ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। স্কটের বর্ণনায় যে দেশ পাই, যে দৃশ্য পাই তা এখনো অটুট আছে; শুধু নেই সে অদ্ভুত যুগের লোকগুলি। মেলরোজ য়্যাবির ভগ্ন স্তূপ এখনো দাঁড়িয়ে আছে; 'শেষ চারণের গানে' জ্যোৎস্নায়

হিলসের নদীগুলি বর্ষায় এখনো 'চেষ্টনাট' রং-এর ফেনায় আকুল হয়ে উঠে; কিন্তু তার মধ্যে কোন যাদুকরের মন্ত্র মিশান নেই। ট্রসাক্‌স্ হ্রদের শান্ত সৌন্দর্য্যের মধ্য থেকে কি হঠাৎ কোন অলৌকিক সুন্দরী আজ আবার উঠে আসতে পারে! নাই পারুক তা বলে স্কটের দেশ বার্ণসের দেশ আগেকার চেয়ে কম সুন্দর বলে মনে হল না। কিন্তু আমার গন্তব্য স্থল ত এখানে শেষ হয়ে যায়নি। সভ্যতার

স্কটের দেশ

বাইরে হাইল্যাণ্ডের জনপ্রাণীহীন পর্ব্বতের মধ্যে আমায় যেতে হবে, যেখানে পর্ব্বতবেষ্টিত হ্রদগুলির নীরবতার দিকে আকাশ নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে আর অতলান্ত মহাসাগর এসে তাদের ডাক দিয়ে যায়।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্। আমাদের ট্রেণ গ্রাম্পিয়ান শৈলমালার তলা দিয়ে চলেছে। পথে কত ঝরণার শোভা, কত হেদারের মৃদু অস্পষ্ট গন্ধ। আর সমস্ত আকাশ ঘিরে বিখ্যাত ক্যালেডোনিয়ার মেঘের স্নিগ্ধ শোভা। মরুভূমিতে উটকে বলে দিতে হয় না যে সে কোথায় এসেছে। তেমনি হাইল্যাণ্ডসেও কাউকে বলে দিতে হবে না সে কোথায় এসেছে। এ দেশ যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে সত্তাকে স্পর্শ করে নিজেকে অনুভব করিয়ে দেয়। আকাশে মেঘের ঘন নীলিমা, পাহাড়ে হেদারের ম্লান লালিমা, বন-হরিণের স্বেচ্ছাবিচরণ, তার উপর মেঘের গুরু গুরু ডমরুরব। আপনি মনে জাগে কালিদাসের :—

আষাঢ়সিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাৎ
কাদম্বমর্দ্ধোদ্গাত কেশরং চ
স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাম্—

স্কটের গৃহ

এই হচ্ছে ইয়োরোপের 'জন্মস্থান'। সন্ধ্যাবেলা আখ্‌নাশেলাখ্‌ নামে একটী অজ্ঞাত ষ্টেশনে নেমে পড়লাম। এই নাম বোধ হয় এদেশের ভূগোলের পাতায় পাওয়া যাবে না। এই অভিযানের বর্ণনা দিবার জন্য কোন সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতাও সেখানে ছিল না। তার দরকারও ছিল না। সেকথা শীঘ্রই বুঝতে পেরেছিলাম।

ওই পথটি কাউকে রোমে নিয়ে যেতে পারবে না। শুধু যে পাহাড়টীতে নিয়ে যাবে সেখানে আছে অতন্দ্র নীরবতা, হেদারের বর্ণগরিমা আর বর্ষাসিক্ত 'পীট' মাটির একটা অবর্ণনীয় গন্ধ। একটা প্রাচীন অক্ষুণ্ণ শান্তির আভাস বুঝি ওইখানে আছে, তবু জানি যে এইখানকার ভীষণ রমণীয়তার মধ্যে অতীত যুগের বিভিন্ন গোত্রের (ক্ল্যান) হিংসা ও

পর্ব্বত পথে

রক্তপাতের ইতিহাস ওই হেদারের রং-এর পিছনে লুকান রয়েছে। পাহাড়ের কাঁধের উপর ঘুরে ঘুরে পথ উঠেছে কিন্তু তার কোন বাঁকে অতর্কিতে কোন অতিথিপরায়ণ কুটীরের হনিসাকল্ বা হলিহকগুলি মাথা নেড়ে ক্লান্ত পথিককে বিশ্রাম সন্ধানের জন্য আহ্বান করবে না। কোন সমুদ্রযাত্রা-শ্রান্ত নাবিক পল্লীগাথার অনুসরণে এখানে কোন গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না বা তার কাছ থেকে উত্তর পাবে না "হে শ্রান্ত নাবিক, আমার একটী রূপসী কন্যা আছে, তুমি যদি ভীষণ সমুদ্রে আর অভিযানে না যাও তাহলে তাকে পাবে।" সেই পৌরাণিক গৃহস্বামী ও তার কন্যার অতিথি-পরায়ণতা দূরে থাক্, চরণযুগল যখন অবসন্ন হয়ে উঠেছে তখন ওই নির্জ্জন নিষ্করুণ পর্ব্বতে একটী অশ্বও পাওয়া যাবে না। মনে মনে বলতে থাকি—"হে পাদপদ্মযুগল, তোমরা ত আমার নও, আমার বুটদ্বয়ের; তবে আমাকে আর কষ্ট দাও কেন?"

সারাদিন পর্ব্বতারোহণের পর একটী "ইয়ুথ হোষ্টেলে" এসে পৌছান গেল। এই হোষ্টেলগুলি ১৫।২০ মাইল দূরে দূরে কোন ঝরণা বা হ্রদ বা সমুদ্রের পারে খোলা হয়েছে; কোন পুরাণো চাষার বাড়ী বা ধানের গোলাকে (ইয়োরোপীয়) হোষ্টেল করা হয়েছে; তাতে দুটী শোবার ঘর, একটী ছেলেদের একটী মেয়েদের; খড়ের তোষক মাটীতে পাতা আর তিনটী করে কম্বল প্রত্যেকের জন্য আছে; শীত যে রকম সে হিসাবে শরীরের উপরে ও নীচে ভাগ করে কম্বল গায়ে দিতে হবে। নিজস্ব একটী ঘুমাবার বস্তায় শরীর ঢুকিয়ে দিয়ে খড়ের বালিশে মাথা দিয়ে সারাদিন পরিশ্রমের পর সুখে ঘুমান খুব সহজ ব্যাপার। একটী 'কমন রুম' আছে, সেখানেই উনান ও কাঠ আছে; সেখানেই একাধারে রান্না ও আড্ডা চলে। নিজেই বাসন মেজে, কম্বল প্রভৃতি রোদে দিয়ে, ঘর পরিষ্কার করে পরের দিন ভোরে আবার যাত্রা করতে হবে। তিন রাত্রির বেশী এক হোষ্টেলে থাকা নিষিদ্ধ। খাবার জিনিষ সেখানেই কিনতে পাওয়া যায় কখনো কখনো—আলু, ডিম, দুধ, রুটী, মাখন ও টিনের জিনিষ; তাও নিজের পিঠের 'রুকস্যাকে' বয়ে নিয়ে চলাই সুবিধা। প্রত্যেক হোষ্টেলে রাত্রিবাসের ও জিনিষপত্র ব্যবহারের জন্য একটী শিলিং মাত্র দক্ষিণা দিতে হয়। এই হোষ্টেল সমিতি না থাকলে দুর্গম হাইল্যাণ্ডস্ সাধারণ লোকের কাছে অজ্ঞাত ও সত্য সত্যই অগম্য থেকে যেত। এখানে হোটেল বলতে কিছুই নেই—যা আছে তাও সভ্য জায়গাতে এবং সেখানে খরচ ইয়োরোপের দামী ও সভ্য হোটেলের চেয়ে বোধ হয় বেশী। কোন চাষা রাত্রে অতিথি রাখতে পারে না, কারণ জমিদারের কড়া নিষেধ। এখানকার জমিদাররা এ দেশকে সাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ শিকারস্থানে পরিণত করেছেন ও আমেরিকার লক্ষপতি ও ভারতবর্ষীয় মহারাজারা এদের অতিথি হয়ে, অবশ্য কাঞ্চনমূল্যে, আসেন হরিণ ও গ্রাউজ শিকারের জন্য। সে জন্য সাধারণ লোকের আগমন এখানে অবাঞ্ছনীয়, তাতে শিকার নষ্ট হয় ও আভিজাত্যের দাম কমে যায়।

এরা দেশকে ভালবাসে, দেশের প্রতি অজ্ঞাত কোণাটীকে জানতে, সুন্দর করে সাজাতে, বিদেশীকে দেখিয়ে প্রশংসা পেতে চায়। এদেশে সৌন্দর্য্যচর্চ্চা লোকের অস্থিমজ্জাগত, সেজন্য কোন সুন্দর জিনিষকে এরা নষ্ট হতে দিবে না। এই যৌবনের দেশে শুধু মটরে বা ট্রেনে দেশ ঘুরে এরা সন্তুষ্ট নয়, পায়ে হেঁটে তন্ন তন্ন করে দেশকে জানতে চায়; সেজন্য কত জাতীয় সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর এই আনন্দ সকলের জন্যই; যে দরিদ্র, যার ছুটী বৎসরে মাত্র জুনমাসের পনের দিন, সেও বেড়াতে যাবে। তার জন্য ত কোন হোটেল যদি নাই থাকল, প্যারিসে ভিয়েনায় যদি সে নাই যেতে পারল, নিজের দেশের মুক্ত প্রান্তর পর্ব্বত অরণ্যানী তার জন্য রয়েছে; দেশের সমিতি তারও দাবী মিটাবার কথা ভুলে যায় নি।

সন্ধ্যাবেলা হোষ্টেলের বারোয়ারী ঘরে এসে বসা গেল। নানারকম লোকের সঙ্গে আলাপ; এখানে জাত নেই, পাণ্ডিত্যের ভয় নেই, অর্থের আঘাতপ্রবণতা নেই। যার যতরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে, যত মজার ঘটনা হয়েছে সব বিনিময় হতে লাগল। এরা কেহ কাউকে আগে দেখেনি, কারো মত বা স্বভাবও জানে না; তবু প্রত্যেকের নিজের প্রকৃতির তীক্ষ্ণ কোণাগুলি ঘসে মেজে অপরের কাছে যাতে বিরূপ না হয় এমন ভাবে তৈরী করে নিতে হয়েছে। এই খানে ইউরোপীয় সামাজিক ভদ্রতা আমাদের মধ্যে সাধা-

রণতঃ সত্যপ্রিয় আন্তরিকতার নামে যে সমালোচনার প্রচলন আছে তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়। নিত্য-গতিশীল জীবন ইউরোপের। কে বা কাকে চেনে? অথচ একদিনের দেখায় কত আলাপ হয়ে গেল; সহরের স্বল্পভাষিতা, গম্ভীরতা দূর করে সবাই আলাপ করতে লাগল। কোন পরিচয় আমাদের জানা নেই; কাল কাউকে চিনব না; তবুও আজকের জন্য আমরা কেহই যেন অপরিচিত নই। কারণ আনন্দের অংশীদার হতে কোন বাধা নেই বিশেষত সবারই উদ্দেশ্য যখন এক, পথ ভিন্ন হলেও। কে কোন পথে পাহাড় অতিক্রম করে এসেছে, কোথায় কোন দুর্লংঘ্য স্রোতস্বিনী আছে তার বর্ণনার মধ্যে এক বৃদ্ধের সঙ্গে পরিচয় হল। ইনি সপরিবারে এসেছেন পদব্রজে। যৌবনে বিবাহের পর মধুমাস যাপন করবার জন্য যুগলে পদব্রজে হাইল্যাণ্ডে এসেছিলেন; তখনকার দিনে ভিক্টোরিয়ার যুগের সামাজিক বন্ধনের ফলে এদের বহু নিন্দা ও সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। এখন বৃদ্ধ বয়সে আবার সেই মধুমাস ঝালিয়ে নেবার জন্য এখানে এসেছেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত গণিতের অধ্যাপক —র বুদ্ধি ও তারুণ্যের প্রশংসা করতে হবে! তাঁরই ছোট মেয়ে গোয়েন একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে ছেলেভুলান মিষ্টি ছড়ায় বলছে যে হোষ্টেলের বাইরের ঝরণাটাতে একটা পরী থাকে; আমরা সবাই সাব্যস্ত করলাম যে সে নিজেই সেই পরী। আর তার ভাই ডেভিড—চেহারায় কিন্তু সে গলিয়াথের মত—কেহ তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না দেখে ক্ষুণ্ণমনে এই পাহাড়ে কোন ক্ল্যান রাজত্ব করত তার ইতিহাস জানাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। কে জানত সে আমাদের সর্ব্বদা কাজ করে দিতে প্রস্তত, বিনয়ী বন্ধু 'বিলের' মধ্যে এডিনবরার একজন উদীয়মান সলিসিটার লুকিয়ে আছে? কেই বা জানত যে যে চশমাপরা লোকটী তার স্কচ্ কথা দিয়ে সবাইকে হাসাচ্ছে সে হচ্ছে একটি ব্যাঙ্কার? এই বিচিত্র দলটীর মধ্যে হঠাৎ নৃত্যচ্ছন্দে আবির্ভাব হল হাস্যমুখর তিনটী ডাণ্ডী সহরের মেয়ের। একটী শ্রীমতী দণ্ডী গান গেয়ে বলে উঠলেন যে তিনি ডিম যোগাড় করতে পেরেছেন। তাজ্জব ব্যাপার! "আমরা কেহ কোথাও পেলাম না, তোমরা কি ক'রে পেলে হে।" কিছুক্ষণ পরিহাসের পর স্বীকারোক্তি হল যে কাল যে ডিম পাড়বার সম্ভাবনা আছে সেগুলির জন্য আজ দাদন দিয়ে আসা হয়েছে! ইতিমধ্যে নানারকম পল্লী-

হোষ্টেলের মাঠে—গোয়েন ও দণ্ডায়মানা শ্রীমতী দণ্ডী

সঙ্গীত আরম্ভ হল। সবাই তাতে যোগদান করল। তারপর একজন এডিনবরার ছাত্র তাদের কলেজের নূতনতম "craze" গানটী ধরল, সে বলল, "ওহে আমাদের সাগরপারের বন্ধু, এই গানটা তোমার শোনা উচিত, কারণ নিশ্চয়ই এর মধ্যে তোমার হাত আছে,

My bonnie is over the ocean
My bonnie is over the sea;
Bring back, oh, bring back,
Bring back my bonny to me.'

আজকের এই হাইল্যাণ্ডসে অনেক পরিবর্ত্তন হচ্ছে। ভোরের 'গ্রাউজের' বা দ্বিপ্রহরের বনহরিণের ডাকের সঙ্গে

একটী হাইল্যাণ্ডার—
জনৈকা hiker-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত চিত্র

সঙ্গে কখনো বা মটরের হর্ণ এখানকার আদিম নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে যায়। এখানে আজ যে 'কিল্ট' পড়ে বেড়াবে লোকে নিঃসন্দেহে বুঝবে যে সেই হচ্ছে বিদেশী। তবু এখানকার সবগুলি পর্ব্বত ও হ্রদের উপর যেন একজনের সত্তা ও প্রভাব বিরাজ করছে। তিনি হচ্ছেন "বনি প্রিন্স চার্লি।" পৃথিবীর এই ভূখণ্ডের যত বীরত্বের গান, যত চারণ-গাথা. সবই তাঁকে ঘিরে। এদেশের একটী বীর্য্যময় ও অত্যাচারিত যুগের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন 'চার্লি'। আজো কোন বৃদ্ধ নাবিক ঝড়ে নৌকাডুবির আশঙ্কা হলে গেয়ে উঠবে তাঁর গান; থেকে থেকে সে গানের ধূয়া সমস্ত আকাশে প্রতি-ধ্বনিত হয়ে ফিরবে "Will he na come back again?" আর মানসপটে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় শিঙ্গাধ্বনি ও অগ্নি-সংকেতের মধ্যে জেগে উঠবে একটী তরুণ প্রিয়দর্শন রাজ-পুত্রের পলায়মান চিত্র যার মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে; যার রক্ষার জন্য কত ভীষণ নিশীথে বাত্যাবিক্ষুব্ধ জলরাশির উপর দিয়ে একটী বীর বালিকার একাকী অভিযান। অন্ধকার যখন হ্রদ গুলির উপর ঘনিয়ে আসে, পাহাড়ের নীচে ছায়া যখন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে মিলিয়ে যায় তখন মনে হয় ওই গানের ধূয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন অরণ্যান্তরালে 'বনি প্রিন্স চার্লি' এখনি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

জ্যামেকা

জন অলিভার লা গর্গের জ্যামেকা ভ্রমণের বিবরণ অত্যন্ত কৌতুহলপ্রদ। ১৯২৭ সালে তিনি আমেরিকার একখানা বিখ্যাত সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে জ্যামেকা যান।

জ্যামেকার একটী নিগ্রো পরিবার

তাঁর ভ্রমণকাহিনী ঐ কাগজে বার হয়েছিল। নিম্নে তার কিছু উদ্ধৃত করা গেল :—

জ্যামেকা কারিবিয়ান সমুদ্রের এমন স্থানে অবস্থিত যে বড় বড় জাহাজের লাইনগুলো তাকে ছুঁয়ে যাবেই। সেই জন্যেই জ্যামেকার ইতিহাস খুব বৈচিত্র্যময়। চিরকাল এর আশেপাশে ছিল যত বোম্বেটের আড্ডা। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বোম্বেটে মর্গ্যান, কিড্, ব্ল্যাক বিয়ার্ড - এদের নামের সঙ্গে জ্যামেকার নাম বিশেষভাবে জড়িত। এরা সবাই ফাঁসীকাঠের আসামী।

উত্তর দিক থেকে জ্যামেকার দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়! প্রথমে পড়ে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ওয়াটালিং দ্বীপ।

আমেরিকা আবিষ্কার করবার পথে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস এই দ্বীপ একদিন প্রত্যূষে দেখতে পান। ওয়াটলিং দ্বীপের উপকূল অসমতল ও প্রস্তরময়, ভাল পোতাশ্রয় একটাও নেই, শুধুই দেখা যাবে বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়চে পাষাণময় তীরে।

নেলসনের স্মৃতি-ফলক। —ফোর্ট চার্লস

বৈকালের দিকে চোখে পড়বে কিউবা দ্বীপের মাইসি অন্তরীপের উচ্চ পর্ব্বত। ভারী চমৎকার এই পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরটা দেখতে হয় অস্তরাগরঞ্জিত আকাশের তলায়। কিউবা দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলের এত কাছ ঘেঁসে জাহাজ যায় যে তুমি জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে মৎস্যশিকার-নিরত জেলেদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে পারো।

বাঁয়ে বহুদূরে ধোঁয়ার মত দেখা যাবে হেইটি দ্বীপের পর্ব্বতমালা, ওদেরই পাদমূলে স্পেনীয়-আমেরিকার যুদ্ধের বিখ্যাত শান্তিয়াগো বন্দর, স্পেনীয় সেনাপতি কারভেরা যেখানে বোতলের মুখে ছিঁপি-আঁটা মত হয়ে আটকে পড়েছিলেন মার্কিণ নৌবহরের দ্বারা। এসব সমুদ্রে স্পেন যুদ্ধের ব্যাপারে কখনও সুবিধা করতে পারেনি।

জ্যামেকার রাজধানী কিংষ্টন খুব বড় বন্দর। এ অঞ্চলের মধ্যে তো বটেই। কিংষ্টন বন্দরে যেতে হবে। অথৈ সাগরজলের মাঝখানে ডুবে আছে সে কালের আর একটা বিখ্যাত ঐতিহাসিক বন্দর—পোর্ট রয়্যাল। বড় বড় জলদস্যুদের প্রধান আড্ডা যে পোর্ট রয়্যাল, যেখানে দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে কত খুন, জখম, যুদ্ধ, বিগ্রহ, গোলাবর্ষণ হয়ে গিয়েচে, তার তুমি কোনো চিহ্নও দেখতে পাবে না আজ।

কিংষ্টন বন্দরের অল্প দূরে ফোর্ট চার্লস। নেলসন প্রথম যৌবনে এখানে বহুদিন কাটিয়েছিলেন। দুর্গের প্রাচীরে এক-খানা প্রস্তরফলকে লেখা আছে—এখানে হোরেসিও নেলসন একদিন পায়চারী করতেন। তুমি যখন এখানে পায়চারী করবে, তখন তাঁর গৌরবের কথা স্মরণ কোরো।

পোর্ট রয়্যালের ইতিহাস বড় কৌতূহলজনক। পোর্ট রয়্যাল বড় হয়েছিল ডাকাতির পয়সায়। সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে এখানকার সবাই ছিল বোম্বেটে। পরস্পর পরস্পরের ওপর ডাকাতি করতো। আইন ছিল না, শৃঙ্খলা ছিল না। স্পেন ইংরাজের জাহাজ লুঠতো, ইংরেজ স্পেনের জাহাজ লুঠতো। সোনা-বোঝাই স্পেনীয় জাহাজ লুঠ করবার জন্যে ইংরেজ বোম্বেটের দল ওৎ পেতে বসে থাকতো।

মস্টেগ, নারিকেল ও কোকোর বাগান, জ্যামেকা

ঐতিহাসিক হেণ্ডারসন লিখেচেন :—

—১৬৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পোর্ট রয়্যালকে বলতো 'সোনার সহর'। দাড়িওয়ালা, ঝুনো নাবিকের দল বন্দরের পানশালা ও নাচঘরে রেশমী পোষাক ও সোনার অলঙ্কার পরে দিনরাত আমোদ প্রমোদ করতো ও সোনার মোহর বাজী রেখে জুয়া খেলতো। পোর্ট রয়্যাল সহরে তখন সোনাকে সোনা বলে কেউ ভাবতো না। পানশালার পানপাত্র ছিল সোনার, রূপোর। সাধারণ জাহাজের খালাসীর কোমরের ছোরার বাঁটে দামী মুক্তা বসানো থাকতো। তাদের কানে তুলতো ভারী ভারী সোনার ইয়ারিং।

স্বর্ণময় নরক ছিল পোর্ট রয়্যাল। স্বর্ণ ও সুরা এই ছিল ওখানকার উপাস্য দেবতা। সোনা মুক্তো সুলভ ছিল তো বটেই কিন্তু তার চেয়েও সস্তা ছিল মানুষের জীবন। ছোরা মারলেই হোল। পানশালায় মত্ত নাবিকের ও বোম্বেটের দল তো কথায় কথায়ই ছোরা মারতো। নাচঘরেও তাই। আবার নিয়ম ছিল নাচ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হত ব্যক্তির লাস ঘরেই পড়ে থাকবে। বোম্বেটেরা মদে ও জুয়ায় ২০০০

সমুদ্রকুক্ষিগত পোর্ট রয়্যাল সহর। ছবির সম্মুখস্থ জলরাশির নিকট পোর্ট রয়্যাল ডুবে আছে।

থেকে ৩০০০ মোহর খরচ করতো এক রাত্রে। ব্রডওয়ে লজ্জার মুখ লুকোবো।

এই গেল হেণ্ডারসনের বিবরণ।

এ ছাড়া পোর্ট রয়্যালের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা গবর্ণর মোডিফোর্ডের ডায়েরীতে এই নারকীয় জীবনের বিশদ বর্ণনা আছে। মানুষ যে কতদূর পশুত্বে নামতে পারে, মোডিফোর্ডের ডায়েরী পড়লে তা বোঝা যায়। কিন্তু বেশীদিন টিক্‌লো না পোর্ট রয়্যাল। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন বন্দরের কাউন্সিলের অধিবেশন চলচে, এমন সময় এক ভীষণ ভূমিকম্পে প্রাসাদের চূড়া থেকে ভিত্তিপ্রস্তর পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌ল।

কাউন্সিলের খাতাপত্রে এর বর্ণনা আছে :—

—দু মিনিট সময়ের মধ্যে দ্বীপস্থ সমুদয় গির্জ্জা, বসতবাটী ও চিনির কারখানা ভূমিসাৎ হোল। পোর্ট রয়্যাল সহরের বারো আনা সমুদ্রগর্ভে ডুবে গেল। দুর্গ ভেঙে চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মানুষ যে কত মারা গেল, তার ঠিকানা নেই।

তারপর অনেকদিন পর্য্যন্ত পোর্ট রয়্যালের বাড়ীঘর জলের তলায় দেখা যেতো। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এ্যাডমিরাল সার চার্লস হ্যামিল্টন লিখেচেন—নিথর সমুদ্রের স্বচ্ছ জলরাশির তলদেশে পোর্ট রয়্যালের ঘরবাড়ী নিমজ্জিত আট্‌লাণ্টিক মহাদেশের ছবি মনে এনে দেয়।

বিদায়, পোর্ট রয়্যাল!

কিংষ্টন্ বন্দরে নামবার সময় কাষ্টমের কর্ম্মচারীদের উৎপাত তত নেই।

আমরা জাহাজ থেকে নেমে অল্প সময়ের মধ্যেই সহরে ঢুকলাম।

পোর্ট মেরিয়া, জ্যামেকার আর একটী প্রসিদ্ধ বন্দর।

সহরটা এমন কিছু নয়, বড় বড় বাড়ীঘর চোখে তেমন পড়বে না। এখানকার লোকে অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝেচে যে আমেরিকার অনুকরণে গগণস্পর্শী সৌধ তুললে দেখায় ভাল বটে, কিন্তু বাসের পক্ষে সে সব নিরাপদ নয়, কবে যে রাত দুপুরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে তার ঠিক ঠিকানা নেই। ভূমিকম্প জ্যামেকাতে লেগেই আছে ফি বছর।

কিন্তু অন্য সব দিক থেকে কিংষ্টন্ বাস করবার পক্ষে ভাল জায়গা। রাস্তাঘাট খুব চওড়া ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিস দাঁড়িয়ে। মোটর-দুর্ঘটনা এ সহরে

পোর্ট এন্টনিও। দক্ষিণ জ্যামেকার একটা বন্দর।

নাকি খুবই কম। বড় বড় তাল জাতীয় গাছ বড় বড় রাস্তার দুধারে। বাঁধানো ফুটপথ। সারি সারি দোকান, চমৎকার সাজানো, তাতে দেশী বিদেশী সব রকম জিনিস বিক্রী হচ্চে।

বড় বড় দোকানে বাঁধা ধরা দর, দরদস্তুর করবার নিয়ম নেই। কিন্তু ছোট দোকানে দোকানদার যে দাম বলবে, তার অর্দ্ধেক হচ্চে আসল দাম। সেখানে যে যত বকতে পারবে, তারই জিত তত।

ফুটপথেই বাজার বসেচে। আর কত ধরণের জিনিসই সাজিয়ে রেখেচে! কত রকমের ফল, ডিম, রুটীফল, মরিচ, কাঁচা মশলা, সাদেয় পাতা, আম, লেবু, আনারস, মিষ্টি আলু, পেয়ারা। হাঙরের ডানা, বেত, নানাজাতীয় ফার্ণ পাতার অ্যালবাম্, সমুদ্রের বড় বড় কড়ি ও ঝিনুক। এখানকার জঙ্গলে এক জাতীয় শক্ত কাঠ প্রচুর পাওয়া যায়। এখানকার কারিগরেরা ঐ কাঠ দিয়ে চমৎকার খোদাইকরা শিল্পদ্রব্য গড়ে। টুরিষ্টরা সেগুলো খুব কেনে। দেশ বিদেশে চালান

ন্যাকোভিয়া, জ্যামেকা
রাজপথের উভয় পার্শ্ববর্তী বাঁশবন।

দেবার জন্যে ব্যবসাদারেও কিনে রাখে। কিন্তু আজকাল আমেরিকা থেকে সস্তা জিনিস আমদানীর ফলে স্থানীয় কাঠের খোদাই শিল্প নষ্ট হতে বসেচে।

জ্যামেকা ইনষ্টিটিউট একটা খুব বড় বাড়ী। কিংষ্টন সহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে এটা অবস্থিত। বাড়ীটা অর্দ্ধেক লাইব্রেরী, অর্দ্ধেক মিউজিয়ম। পোর্ট রয়াল বন্দরের গির্জ্জার

পোর্ট এণ্টনিওর সম্মুখস্থ সমুদ্রে এই শ্যামল দ্বীপটী ভ্রমণকারীদের অত্যন্ত প্রিয়।

ঘণ্টা পুরানো জিনিসগুলোর মধ্যে একটী প্রধান দর্শনীয় বস্তু। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পের পর এই ঘণ্টাটী সমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়।

জ্যামেকা দ্বীপের নয় লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র পনেরো হাজার শ্বেতকায়, বাকী সকলে কৃষ্ণকায় নিগ্রো।

নিগ্রো দু'শ্রেণীর আছে। সম্পূর্ণ কালো আর 'কলার্ড'। 'কলার্ড' নিগ্রোদের দেহে শ্বেতরক্তের সংমিশ্রণ ঘটেচে, সম্পূর্ণ কালোর দল খাঁটী নিগ্রো।

'কলার্ড' অধিবাসীদের অবস্থা সম্পূর্ণ কালোদের চেয়ে ভাল। কারণ তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষিত এবং তাদের চেহারাও ভালো। অনেক বড় বড় চাকুরী পায় তারা।

গবর্ণমেণ্টের আইন সভায় নিগ্রোরা প্রতিনিধি পাঠাতে পারে কিন্তু সে প্রতিনিধিদের বিশেষ কোনো ক্ষমতা নেই।

১৮৩৪ সালে দাসপ্রথা এখানে আইন দ্বারা উচ্ছেদ করা হয়।

দাসপ্রথা উচ্ছেদের ফল প্রথমটা বড়ই খারাপ হোল। অতগুলো লোক হঠাৎ স্বাধীনতা পেয়ে কি করবে ঠিক করতে পারলে না। হাতে তাদের কোনো কাজকর্ম্মও নেই। স্রেফ্ শুয়ে বসে ঝুঁড়েমি করে তারা দিন কাটাতে লাগলো। জ্যামেকার বড় বড় আখের ক্ষেতগুলোর মালিক প্রায় সবাই ইংরেজ, তাদের আখের ক্ষেতেই এরা ছিল চাকর—এখন এদের অভাবে আখের ক্ষেতের কাজ বন্ধ হবার যোগাড় হোল। অনেকে আধাদরে নিজেদের ক্ষেতখামার বিক্রী করে স্বদেশে চলে গেল। কৃষিকার্য্যের এই দুরবস্থা দেখে গবর্ণমেণ্টকে এসিয়া বিশেষ করে ভারতবর্ষ থেকে কুলী আমদানীর ব্যবস্থা করতে হোল। অল্পদিনের মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার চীনা ও সাত হাজার ভারতীয় কুলি এসে পড়লো। দেখা গেল নিগ্রোদের চেয়ে তারা বুদ্ধিমান, তাছাড়া তাদের আর একটা গুণ, মদ্যপান তারা পাপ বলে বিবেচনা করে। এদের দিয়ে ভালই কাজ চলতে লাগলো।

জ্যামেকার নিগ্রো অধিবাসীরা দায়ে না পড়লে কাজ করতে চায় না। অভাববোধ বলে পদার্থ নেই এদের শরীরে।

জ্যামেকায় পার্ব্বত্য অঞ্চলে কফির বাগান ও পায়খানা।

নিজেরাই নিজেদের বাসগৃহ তৈরী করে নেয়, তার জন্যে মিস্ত্রির কাছে ছুটতে হয় না। কলার পাতার ছাউনি, বাঁশের খুঁটি ও মাটীর দেওয়াল এই হোল বাসগৃহ। তাতে জানালার বালাই নেই। একটু যাদের অবস্থা ভালো, তারা প্যাকিং বাক্সের কাঠ দিয়ে ঘরের দেওয়াল তৈরী করে। কেরোসিনের টিন কেটে ঘরের ছাদ করে। ছাদের ওপরে পুষ্পিত লতা উঠিয়ে দৈন্যের সব চিহ্ন বেমালুম লুপ্ত করে দেয়।

আমরা একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে জ্যামেকার পল্লী-অঞ্চল দেখতে বেরুলাম।

পথের দুধারে নতুন ধরণের গাছপালা, ছোট ছোট গ্রাম ফার্ণবন, বাঁশবন। বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে মোটরের রাস্তা। কিংষ্টন থেকে ৪০ মাইল দূরে সেণ্ট টমাস বলে একটা ছোট সহর। এখানে গন্ধকের জলের কয়েকটী প্রস্রবণ আছে। এই প্রস্রবণে স্নানের ফলে দুরারোগ্য চর্ম্মরোগ আরাম হয়।

সিসল ছাল রৌদ্রে শুকানো হইতেছে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট দড়ি প্রস্তুত করা হয়।
জ্যামেকায় সিসল গাছের যথেষ্ট চাষ আছে।

অনেক দূর থেকে রোগীরা এসে এখানে স্নান করে। এদের জন্যে থাকবার হোটেল আছে। সস্তায় বাড়ী ভাড়া পাওয়াও যায়।

সেণ্ট টমাস ছাড়িয়ে জিম্ ক্রা পর্ব্বতমালা—এর দক্ষিণ পাশে পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা করা হয়েচে। প্রায় আড়াই হাজার ফুট ওপরে যান ওঠে, সেখান থেকে চতুর্দ্দিকের নীল শৈলরাজি, দূরের সমুদ্র ও ক্ষুদ্র পোর্ট এণ্টনিও সহরের দৃশ্যে মন মুগ্ধ হয়। এখানে পথের ধারে বড় বড় কলা বাগান দেখা গেল।

সামনে সেণ্ট এ্যান উপসাগর।

আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে মানসচক্ষুতে দেখলাম বহুদূর সমুদ্র-বক্ষে অনেকদিন আগের তুখানা পাল ছেঁড়া, মাস্তুল ভাঙা ক্ষুদ্র জাহাজ আটলাণ্টিকের উত্তাল তরঙ্গরাশির সঙ্গে সাহসের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে আসচে, তাদের নাম 'ক্যাপিটানা' ও 'সান্তিয়াগো'; কলম্বসের পতাকা উড়চে তাদের ভাঙা মাস্তুলে।

সেণ্ট এ্যান্ উপসাগর বাঁয়ে রেখে কিছুদূর এগিয়ে গেলে রানাওয়ে উপসাগর; স্পেনীয় সেনাপতি সাসি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে এখানে লুকিয়েছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত একটা দেশী ডোঙ্গাতে পালিয়ে তিনি স্পেনে চলে যান এবং নিরুপদ্রবে ও শান্তিতে শেষ জীবন একটা মঠে অতিবাহিত করেন।

জ্যামেকার পার্ব্বত্য পথে মোটরে ভ্রমণ না করলে বোঝা যাবে না জ্যামেকা কত সুন্দর দ্বীপ। পাহাড়ের ধারে ঘন বাঁশবনের মধ্য দিয়ে রাস্তা, বাঁশ পাতার ফাঁক দিয়ে দূরের নীল সমুদ্র দেখে দেখে আমাদের আশ মিটছিল না, সরু সরল এরিকা গাছে পর্ব্বতসানু শ্যামল হয়ে আছে। কাছেই হয়তো কোনো গ্রাম্য গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি নিস্তব্ধ বাতাসে ভেসে আসচে, বনের মধ্যে কত কি পাখীর কূজন!

স্পার ট্রি পাহাড়ে চন্দ্র ও গ্রহাদি পর্য্যবেক্ষণ করার জন্যে একটা বৃহৎ মানমন্দির হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়েচে; তার ব্রোঞ্জের ডোম অনেকদূর থেকে রোদে চক্‌চক্ করছিল।

অদূরে রিও কোবার নদী—এর উভয় তীরে যেমন ফার্ণ, দীর্ঘ তৃণরাজি, বাঁশবন, নারকেল গাছ, কোকো ও মার্টল গাছের শোভা জ্যামেকার কোনো স্থানে এমন দেখা যায় না। এখানে একটা ক্ষুদ্র হোটেল আছে, তার মালিক জনৈক বৃদ্ধ নিগ্রো। টুরিষ্টদের কল্যাণে হোটেলের অবস্থা খুবই ভাল বলে মনে হোল।

রিও কোবার পার হয়ে অল্পদূরে মাউণ্ট ডিয়াবোলো। ২৩০০ ফুট উপরে পাহাড়ের ওপর একটা সমতল স্থান আছে, সেখানেও একটা হোটেল আছে। পরিষ্কার দিনে হোটেলের

বংশবীথি

বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্পাইগ্লাস দিয়ে দেখলে বহুদূরে উত্তরে কিউবা দ্বীপ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, দক্ষিণে পানামা খালের অভিমুখে বিস্তৃত কারিব সাগরের রৌদ্রদীপ্ত বক্ষে ছোট ছোট শ্যামল দ্বীপরাজি কৃষ্ণকায় মুক্তপক্ষ জলচর পাখীর মত দেখায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেমের গল্প

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

আজকের সন্ধ্যাটা বেশ জমে উঠেছে। ঝুর্ ঝুর্ করে চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। চল, বারান্দার ঐ কোণটায় গিয়ে বসা যাক, হাসনুহানার গন্ধটা ঐখানেই ভালো রকম পাওয়া যাচ্ছে। আলোটা চোখের কাছ থেকে সরিয়ে ফেল। এতক্ষণে গাছের আড়াল থেকে প্রতিপদের চাঁদ উঠেছে, মেঘের কতকগুলো ছেঁড়া সুতো যেন মাকড়শার জালের মত চাঁদের গায়ে জড়িয়ে ধরেছে, সেইগুলোকে ছাড়িয়ে ওর আকাশের ওপরে উঠতে একটু দেরী হচ্ছে। তা হোক, এরি মধ্যে চারিদিকে আলো ছায়ার ভাগাভাগি হয়ে গেল, খানিকটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট। সূর্য্যের আলো সব জিনিষ যেমন খোলাখুলি দেখিয়ে দেয়, চাঁদের আলো তা করে না, কতকটা দেখায় আর কতকটা লুকিয়ে রাখে। এ যেন স্বপ্নরাজ্য তৈরী হোলো। সমস্তই আবছায়ার মত। এ সময় সবই যেন রহস্যময়। হাওয়াতে মাঝে মাঝে নানা রকম ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, তার কয়েকটা বেশ চেনা যাচ্ছে, আর বাকীগুলো চেনা যাচ্ছে না। একটা তো হাসনুহানা, একটা বেলফুল, একটা বকুল, একটা মাধবী—কিন্তু আর যে কত অপরূপ গন্ধ পেলে তা চিনতে পারলে কি? দূর থেকে ঐ যে ঢোলের শব্দ আসছে, কিছু বোঝবার যো নেই কোন পাড়া থেকে ওটা বাজছে। পথ দিয়ে দুজন ছেলে গলা মিলিয়ে গান গেয়ে চলেছে, ওরা কারা? ওরা কি গান গাইছে? উত্তর দিকটা বড় অন্ধকার, ওদিকে অনেক ঝোপ জঙ্গল। ঐ অন্ধকারের মধ্যে একটা আলো দেখা যাচ্ছে, ও কিসের আলো? প্রশ্ন ওঠে অনেক, তার অধিকাংশের উত্তর নেই। সন্ধ্যা হলেই কত রকমের রহস্য তৈরী হয়। গল্প শুনবার এই উপযুক্ত সময়। সত্যের সঙ্গে মিথ্যা গল্প এই সময়েই শোনা যায় এবং বিশ্বাস করা যায়। এ সময় গল্প বানাতেও বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

কি গল্প শুনবে? প্রেমের গল্প? প্রেমের গল্প ছাড়া আর কিছু তোমাদের মুখরোচক হয় না। কিন্তু আগেকার লোকের এ রকম পছন্দ ছিল না। তাঁরা নানারকম উদ্ভট কল্পনা নিয়ে গল্প রচনা করতেন বটে, কিন্তু তার মধ্যে প্রেমের স্থান খুব বেশী নয়। রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে প্রধান উপকরণ হচ্ছে মানুষে মানুষে লড়াই, মানুষে মানুষে প্রেম নয়। আরব্য রজনীর গল্পের প্রথম সূত্রপাতই হচ্ছে প্রেমের অসারতা নিয়ে। অবশ্য তখনকার দিনের প্রেম নিয়ে অনেক অমূল্য কাব্য আছে। কিন্তু তখন কাব্য লেখা হোতো অল্প বয়সে, আর গল্প লেখা হোতো বেশী বয়সে। তখন বৃদ্ধেরা গল্প বলতো, আর অল্পবয়স্কেরা তা শুনতো। কিন্তু এখন নবীনেরাই গল্প বলে, আর নবীনেরাই তা শোনে। তারা সে রকম অসম্ভব কাহিনী আর বলে না, কিন্তু তারা এমন জিনিষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটী করে যা এখনো তাদের কল্পনার মধ্যেই আছে। আমার তো মনে হয় একটু বেশী বয়েস না হলে গল্প লিখতে যাওয়া উচিত নয়। যৌবন কালের লেখা গল্প বেশীর ভাগই গল্প হয় না, হয়ে যায় উচ্ছ্বাস।

যাক, প্রেমের গল্প যদি বলতে হয় তবে সত্য গল্পই বলবো। কিন্তু তার আগে তোমাদের সঙ্গে কতকগুলো সর্ত্ত আছে। তোমরা প্রেম বলতে যা বোঝো, এই সত্য-গল্পের প্রেমের সঙ্গে তা হয়তো মিলবে না। প্রেম অবশ্য চিরকাল এক রকমই জিনিস; একটা অত্যন্ত রকমের ভালোলাগা;—সময়ে বা অসময়ে, ন্যায়ে বা অন্যায়ে, একজনের আর একজনকে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় ভালোলাগা। মানুষের মনের এই বিশিষ্ট বৃত্তিটিকে চিরকালই প্রেম বলা হ'য়ে থাকে, এবং জিনিসটা যে কি তা সবলেই জানে। কিন্তু ওর তত্ত্ব সম্বন্ধে সকলের ধারণা সমান নয়। এ বিষয়ে আমি যে কথা মনে করি তা শুনলে হয়তো তোমরা মারতে

আসবে। কিন্তু আমি যা বলবো তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে।

আমি বলবো প্রেম অতি ক্ষণস্থায়ী জিনিষ। গাছের জীবনে বেলফুল ফোটে যতটুকু সময়ের জন্য, মানুষের জীবনে প্রেমফুল ফোটে ততটুকু সময়ের জন্ত। সারা বছরের মধ্যে ওতে ফুলের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না,—কিন্তু দারুণ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ওর তলায় তলায় ফুলের জমি তৈরী হয়। তার পর যেমনি কেউ একটু জল ঢেলে দেয় অমনি ফুল ফুটতে আরম্ভ হয়। কিন্তু তা কেবল দু দিনের জন্যে। তার পরে যতই জল ঢালো, আর ফুল ফুটবে না। আবার যদি কখনো বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস আসে, ফুল তখন আবার ফুটবে।

এটা বড় দুঃখের কথা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কথাটা সত্য। প্রেম সাধারণতঃ চিরস্থায়ীও হয় না, একনিষ্ঠও হয় না। অন্ততঃ আমি তো হ'তে দেখলাম না। যেখানে দেখবে প্রেম একনিষ্ঠ এবং চিরস্থায়ী হ'য়ে আছে, ভালো করে খবর নিলেই জানতে পারবে যে সেটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, সেখানে স্বার্থের আকর্ষণ কিংবা অন্য কোনো রকমের আকর্ষণ এসে গেছে; তাতে সেই প্রথমকার অহেতুক অদম্য ভালোলাগার অফুরন্ত-বোধ আর নেই; আর তা অতলস্পর্শ নয়, এখন তার তলা পর্য্যন্ত মাপা যায়। মানবচিত্তের রীতিই এই। যে বস্তু ঈপ্সিত, তার প্রতি আগ্রহ থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ সে লব্ধ হয় নি; সে বস্তু লব্ধ হ'লেই প্রথম আগ্রহটুকু চলে যায়। ঐ আগ্রহটাই তো প্রেম। লব্ধ বস্তু ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে যায় এবং ক্ষণে ক্ষণে একটা নতুন আগ্রহ দেখা দেয় বটে, কিন্তু তাতে তেমন ব্যথার টনটনানি নেই। কেবল দেখা গেছে যে ভগবানের প্রতি যার প্রেম জাগে তার সেটা একনিষ্ঠ ও চিরস্থায়ী হয়,—কিন্তু তার কারণ হচ্ছে এই যে ভগবান কারো লব্ধ নয়, চিরকালই অলব্ধ, কাজে কাজেই আগ্রহটুকু সমানে থেকে যায়।

চিত্তবৃত্তিও আমাদের পরিবর্ত্তনশীল, আকর্ষণও আমাদের পরিবর্ত্তনশীল। সকলেই সে কথা জানে, কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে তার বিচার করে। আগেকার আরব্য-উপন্যাসের উদাহরণ দেখ—

বাদশাহ বল্‌লেন—"সখী, আজ আমাদের মিলন। কিন্তু কাল সকালেই তোমাকে কেটে ফেলবো।"

বাদশাজাদী বল্‌লেন—"সে কি কথা? তাতে তোমার কি লাভ হবে?"

বাদশাহ বল্‌লেন—"তোমাদের ভালবাসা স্থায়ী নয়। আজ আমাকে ভালোবাসবে, কাল আর-এক জনকে ভালোবাসবে। অতএব তার আগে কেটে ফেলাই ভাল।"

আর এখনকার তরুণ লেখকরা কি করেন? তাঁরা প্রথম ভালোবাসাটাকে খুব ছোটো করে দ্বিতীয় ভালোবাসাটাকে বড়ো করে তোলেন। প্রেমিকার আগে যার সঙ্গে প্রণয় ছিল, তাকে লুকিয়ে সে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভালোবাসে, এবং তাকে পেয়ে খুব সুখী হয় কিংবা না পেয়ে দেওয়ানা হ'য়ে যায়। কিন্তু এতে লেখক না দেখালেও পাঠক দেখতে পায় যে প্রথম প্রণয়টাও প্রণয় ছিল,—দ্বিতীয়টাও প্রণয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে,—এবং সুযোগ যদি হয় তবে তৃতীয় দফাতেও সেটা প্রণয় হয়ে দাঁড়াবে ঠিক আগের মতই। প্রেম সম্বন্ধে এই সত্য কথা চাপা দেবার চেষ্টা না করে গোড়া থেকে এটা সোজাসুজি মেনে নেওয়াই ভাল। তা করতে যদি লজ্জা কিংবা কষ্ট হয়, তবে উচিত হচ্ছে প্রেমের গল্প লেখা ছেড়ে দিয়ে অন্যরকম গল্প লেখবার চেষ্টা করা।

তোমাদের সুশীল আমার ওপর বেজায় চটে যাচ্ছে। ওর পাঁচ বছর হোলো বিয়ে হ'য়ে গেছে, এখনও বৌকে বেল ফুলের মালা পরায়। ও অনেক রকম নজির দেখিয়ে প্রমাণ করবে যে ওর ভালোবাসা আগের চেয়ে কিছুমাত্র কমে নি। ভালোবাসা ওর কমেছে কি-না তা আমিও হয়তো প্রমাণ করতে পারবো না। কারণ ওটা কখন থেকে যে কমতে আরম্ভ করে তা ধরা যায় না, ও বস্তুটা ফুরিয়ে গেলেও অনেকদিন পর্য্যন্ত তার অনুভূতিটা অভ্যাসবশতঃ বজায় থেকে যায়। যেমন আম খাওয়া শেষ হয়ে গেলেও ছেলেরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আঁঠিটা চুষতে থাকে,—যেমন তামাক পুড়ে গেলেও বুড়োরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হুঁকোটা টানতে থাকে। আমাদের গোপ্‌লার পা যখন অ্যাম্পুটেশন করা হয়েছিল, তার পরে ছ মাস পর্য্যন্ত সে প্রত্যহ রাত্রে চীৎকার করে কাঁদতো। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেই ব'লতো যে তার পায়ের বুড়ো আঙুল টন্ টন্ করচে। যদি বলা হোতো যে তার আঙুল নেই, তা হ'লে সে রেগে উঠে জবাব দিতো—"তা নাই বা রইলো, আমার

তো টন্ টন্ করছে সেটা কি মিছে কথা বলছি?" প্রেমের বোধ ঐ জাতীয়, তা ফুরিয়ে গেলেও যেন ফুরোয় না।

তোমরা যে বল প্রেম একজনের ওপরেই একবার মাত্র হয়, ওটা নিতান্ত বাজে কথা। গাছে ফুল ফোটা যেমন একবারেই ফুরিয়ে যায় না, প্রেমও তেমনি একটিমাত্র সংস্করণে নিঃশেষ হয় না, অনেকবার ওর নূতন নূতন সংস্করণ আবির্ভূত হয়। সারাজীবনে একটিমাত্র পাত্রের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম সংসারে দুর্লভ, ওটা অস্বাভাবিক জিনিষ। নিজের কথাই বলি, আমার জীবনে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত আধ ডজন দফায় প্রেম জন্মেছে। প্রথম প্রেম অবশ্য মায়ের ওপর, সেইখানেই প্রথম হাতেখড়ি। মনে আছে তখন একদণ্ড মায়ের কাছ ছাড়া হতাম না, ঘুরে ফিরে মায়ের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম। মায়ের কোল ভারী মিষ্টি লাগতো, কোলে না বসলে খাওয়া হোতো না, কোলে না শুলে ঘুম হোতো না। অনেক বয়স পর্য্যন্ত এই ভাবে কেটেছে। লোকে বলতো বুড়ো ছেলে মায়ের কোল ছাড়ে না, কিন্তু সে কথা কে শোনে? সর্ব্বদা মাকে আঁকড়ে ধরে রাখতাম, যাতে আমি ছাড়া আর কেউ মায়ের একটুও ভাগ না পায় এই জন্যে সর্ব্বদা মাকে আগ্‌লে থাকতাম। মা যদি কারো সঙ্গে দুটো হেসে কথা কয়েছে কি আমার প্রতি একটু অন্যমনস্ক হয়েছে, অমনি নানা উপায়ে তাতে বাধা দেবার চেষ্টা করতাম, নানারকম ছুতো-নাতায় মায়ের দৃষ্টি আমার দিকে আকর্ষণ করতাম। যখন কিছুতে পারতাম না তখন ইচ্ছে করে হয় আঙুল কাটতাম, না হয় কাপড় ছিড়তাম, না হয় খিদে পেয়েছে বলে কাঁদতাম। কারো সঙ্গে কিছু গোপনীয় কথা কইবার জন্যে মা যদি আমাকে কাছ থেকে সরিয়ে দিতো এবং সে কথা শোনবার কোনো উপায় থাকতো না, তখন রাগে হিংসেয় আমি জ্বলে মরতাম। ছেলেবেলাকার হিংসে অন্যান্য বয়সের চেয়ে ঢের বেশী, আর এই হিংসেই হচ্ছে প্রেমের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। যার মনে হিংসে নেই তার মনে ভালবাসার জোর নেই। যৌবনে ভালোবাসার যে সব লক্ষণ দেখা যায় সমস্তই ছেলেবেলাকার মায়ের প্রতি ভালোবাসার অনুকরণ,—নতুন কিছুই নেই। সেই আঁকড়ে ধরা, সেই ঝাঁপিয়ে পড়া, সেই মায়া কাড়ানো, সেই আদর আবদার অত্যাচার, সেই সমস্তই থাকে, কেবল বয়সের সঙ্গে সেগুলি রূপান্তরিত হয় মাত্র। বাল্যকালে মায়ের ওপর ভালোবাসা যার যত গভীর থাকে, যৌবনের ভালোবাসাও তার তত গভীর হয়। যার ছেলেবেলায় মা মরে গেছে তার কাছ থেকে ভালোবাসা আদায় করা বড় কঠিন। ছেলেবেলায় যে মায়ের আদর পায়নি, যৌবনে সে বড় নিষ্ঠুর হয়।

যাক্, তার পর দ্বিতীয় দফা প্রেম হোলো ইস্কুলের এক বন্ধুর সঙ্গে। সে একেবারে গলায় গলায় প্রেম। খাওয়ার জ্ঞান নেই, নাওয়ার জ্ঞান নেই, অষ্টপ্রহর সেই বন্ধুর সঙ্গে থাকা। ঝড় হোক ঝাপটা হোক, রোগ হোক বিপদ হোক, তার কাছে রোজ যাওয়াই চাই। তার গলায় হাত দিয়ে বেড়ানো, তার সঙ্গে এক পাতে খাওয়া, এক বিছানায় শোওয়া, এবং একসঙ্গে পড়ার ছল করা, এই তখন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। পরস্পর প্রতিজ্ঞা করলাম যে জীবনে কখনো বিয়ে করবো না, বড়ো হয়ে কেবল দুজনে একসঙ্গে থাকবো। বন্ধুর মাকে তখন কত ভক্তি, তখন সে নিজের মার চেয়েও বড়। এদিকে মা বেচারী খাবার নিয়ে বসে থাকে, বারে বারে ডাকতে পাঠায়, ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করে, কিন্তু তখন আর মাকে কে গ্রাহ্য করে? মায়ের দিন তখন ফুরিয়ে গেছে। তখন প্রেমের একমাত্র পাত্র হয়েছে সেই বন্ধু। তখন মনে হোতো ওর চেহারাটি কি সুন্দর, এমন সুন্দর মুখের ভাব আর কারো নেই। সেই বন্ধু এখনও বেঁচে আছে, কিন্তু এখন তাকে দেখলেই মনে হয় এই বিশ্রী চেহারাকে আমি মনে করতাম সুন্দর! কি ছেলেমানুষই যে তখন ছিলাম! তার সঙ্গে এখন আর কথা কইতেই ইচ্ছে হয় না। যদি পথে দেখা হয় তো নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে একবার বলি—'ভালো তো?' কিন্তু তার বেশী আর একটি কথা কইতে বিরক্ত বোধ হয়।

তার পর এলো তৃতীয় বারের প্রেম। সেটা আমার জাঠতুতো বৌদিদির প্রতি। তখন আমার কৈশোর কাল, সবে মাত্র গোঁফের কয়েকটি রেখা উঠেছে, দাড়িতে চুল না গজালেও জুল্‌পি কামিয়ে দাড়ি কামানোর গৌরব অনুভব করচি এবং লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেতে ধরেছি। যৌবন না এলেও তখন যৌবনের সন্ধান পেয়েছি এবং যুবক পদবাচ্য

হবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছি। এমন সময় বাড়ীতে নতুন বৌদিদি এলো,—পায়ে বাজে তার মলের শব্দ (তখনকার দিনে মলের চলন ছিল), আঁচলে তার চাবির শব্দ, কাপড়ে তার নানাবিধ জুরে, মুখটা থাকে ঘোমটা ঢাকা,—তার মধ্যে থাকে একটুখানি হাসি, অনেকখানি চুল, আর অজস্র সুবাস তেলের গন্ধ। মা ছাড়া অন্যরকম স্ত্রীলোকের নতুন রকম একটা আস্বাদ সেখান থেকেই প্রথম পেলাম। বৌদিদির ঘোমটা আর কারো কাছেই খুলতো না, কেবল আমার কাছেই খুলে যেতো। খুললেই দেখতাম তার মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে যা আর কেউ জানে না, বড়ই ঔৎসুক্য হোতো এগুলো আমায় খুঁজে বের করতে হবে। বৌদিদির নির্জ্জনতা কাটাবার, ভয় ভাবনা কাটাবার, বাপের বাড়ীর শোক কাটা-বার সঙ্গী হলাম আমি। খেলা করতে করতে প্রেম এসে-গেল মনে। তখন দেখলাম বন্ধুর প্রেমের চেয়ে এ প্রেম কত বেশী মিষ্টি। ভয় পেও না, এ প্রেমের মধ্যে হয়তো দোষের সম্ভাবনা থাকতে পারতো কিন্তু দোষ কিছুই হয়নি। তা হ'লে কি হয়, ভালোবাসার সমস্ত লক্ষণ এতে পুরোপুরি বজায় ছিল। যথেষ্ট ভালোবাসতাম, যথেষ্ট অত্যাচার করতাম, যথেষ্ট খুনসুটি করতাম। দাদাকে ভয়ানক হিংসে করতাম। নিশ্চয় জানতাম যে বৌদিদি আমাকে দাদার চেয়ে অনেক বেশী ভালোবাসে, খুব চালাকি করে সেটা দাদার কাছে লুকিয়ে রাখে, আর দাদা এমনি বোকা যে সে মোটেই বুঝতে পারে না। দাদা বেচারার ওপর এই জন্যে আমার মায়াও হোতো। কি সুন্দর হাসি বৌদিদি-আমার কাছে হাসতো, আর দাদা এলেই সেই মুখ একেবারে ভার হ'য়ে আর-একরকম হ'য়ে যেতো,—দাদা এমনি অন্ধ যে তা দেখতেও পেতো না। কিন্তু সেই বৌদিদি যে পরে কি রকম ক্যাডাভ্যারাস্ আর কি রকম হিংসুটে হ'য়ে গেল!

যাকগে, চতুর্থ দফা প্রেম হোলো স্ত্রীকে নিয়ে। বৌদিদির মধ্যে যে জিনিষের একটুমাত্র সন্ধান পেয়েছিলাম, এইখানে তার চরম প্রাপ্তি হোলো। এখানে একেবারে অবারিত অধিকার। অন্য প্রেমে যাহোক কিছু বাধা পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে আর কেউ বাধা দেবার নেই, আর দিলেও তা উড়িয়ে দেওয়া যায়। মায়ের কাছে যে সব আকাঙ্ক্ষা মেটেনি, সে সব ক্ষোভ চাপা পড়ে ছিল, পরিতৃপ্তির সুযোগ পেয়ে সেইগুলো এখন নতুন করে জেগে উঠলো। প্রেম এখানে অত্যন্ত মজ্‌গুল, ক্ষুধা এইখানেই নিবৃত্তি পায়। এখানে অত্যাচারও খাটে, সহানুভূতিও মেলে। আগেকার প্রেমগুলোর সঙ্গে তুলনা করে দেখলাম যে এর তুলনায় সেগুলো নিতান্তই বাজে। কার সঙ্গে কার বা তুলনা! স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসার মত জিনিষ দুনিয়াতে আর কিছু আছে নাকি? তখন মনে হয়েছিল যে এ হচ্ছে অক্ষয় এবং অমর সামগ্রী। ভাগ্যিস্ এই বিশিষ্ট স্ত্রীটিকে আমি পেয়ে-ছিলাম! এ না হয়ে যদি অন্য কেউ আমার স্ত্রী হোতো তা হ'লে জীবনটা একেবারে বৃথাই কেটে যেতো। ভগবানের কি দয়া, একেবারে আমার উপযুক্ত স্ত্রীটি জুটিয়ে রেখে দিয়ে-ছেন। একি কেবল এক জন্মের ব্যাপার, জন্মে জন্মে স্বামী-স্ত্রীর পুনঃ পুনঃ মিলন হয়। আরো কত রকম ফিলজফি যে মাথায় খেলতো! সে সব কথা বেশী বলে দরকার নেই, তোমরাই তা এখন আমার চেয়ে ঢের বেশী বলতে পারবে।

তারপর অবশ্য ছেলেপুলে হোলো, সংসারের ভার পড়লো, কাজেই ফিলজফিগুলো ক্রমে ক্রমে কমে গেল। তা হ'লেও স্ত্রীর সঙ্গে দেহ-মনের মিলনটা চিরকালই বজায় থেকে যাবে এ কথা বলাই বাহুল্য। গিন্নীকে আমি যে খুব ভক্তি করি সে সে কথাতো সবাই জানো। এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলে কাজ নেই, উনি আবার ও-ঘর থেকে শুনতে পাবেন।

এর পরেও কিন্তু আবার এক প্রেমের সুযোগ ঘটে গেছে, সেটা খুব চুপি চুপি বলতে হবে। আগে কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি যে এ আবার সম্ভব হতে পারে। প্রেমের বিষয়ে এক-দম নিশ্চিন্তই হয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ও-সব ছেলে-বেলাকার সেন্টিমেন্ট, বিয়ে দিয়ে ছেলেপুলে হয়ে গেলেই ওর ফাঁকি ধরা পড়ে যায়, তখন আর ঐ জাতীয় মোহ জন্মাতেই পাবে না। কিন্তু মধ্যবয়সে এসে এমন একজনের স্পর্শ পেলাম যাতে আবার আমি ছেলেমানুষ হয়ে উঠলাম, শুকনো ডালে আবার নতুনতর প্রেমের পাতা গজিয়ে উঠলো। তখন দেখলাম স্ত্রীকে ভালবাসলেও আর একজনের প্রতি আর এক রকমের ভালোবাসা মনের মধ্যে জন্মাতে পারে। Man is polygamous by nature—এ কথাটা মিথ্যা নয়। আজ-

কাল এটা না হয় লজ্জার বিষয়, কিন্তু আগেকার দিনে অনেকেই দুই পক্ষ করতো। তখনকার দিনে এ সব তত্ত্ব চেপে রাখবার দরকার হোতো না, কিন্তু আজকাল আর তা চলে না, সংযম দেখাতে হয়। ভালোবাসা যদি একবার জেগে আবার জাগে তবে সে কথা বলবার যো নেই। যাই হোক সংযম করতে গিয়ে এই প্রেমটা অত্যন্ত রোম্যান্টিক রকমের হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সবুর করো, এই গল্পটাই তোমাদের আলাদা করে গুছিয়ে বলবো মনে করেছি, আগে আমার বক্তব্যটা শেষ করে নিই।

তারপর শেষকালে আমার আর একটি ষষ্ঠপক্ষের প্রেমপাত্রী জুটেছে, সেটী হচ্ছে আমার নাতনী। এমন ন্যাওটা মেয়ে আর দেখিনি। ও যে সকলকে ছেড়ে আমাকেই কেন এত ভালোবাসে জানি না, নিজের বাপ মার কাছে পর্য্যন্ত যায় না। এ সম্পর্কটাও আমাদের পূর্ব্বজন্ম থেকে চলে আসছে কি না জানি না। তবে প্রেম অধিকাংশই বেসিপ্রোকাল, যেখ নেই পাওয়া যায় সেখানেই দেওয়া যায়। মেয়েটাকে আমিই মানুষ করছি, ওকে নিয়ে আমি খুব শান্তি পেয়েছি। কেবল মুখখানি দেখতে সুন্দর যে তা নয়, ওর এমন বুদ্ধি যে আর কি বলবো। এটুকু বয়সেই ও আমাকে বশ করেছে, বয়স হলে ও যে আরো কত লোককে বশ করবে তার ঠিক নেই।

যাই হোক মোটের উপর বলতে চাই যে, প্রেম কখনো এক জায়গায় চিরস্থায়ী হয় না। তার কারণ প্রেম জন্মায় প্রকৃতির অন্তর্নিগূঢ় প্রয়োজনে। ও জিনিষ আপনা আপনি স্বতঃস্ফূর্ত হয়েও আসে না এবং কেউ ইচ্ছে করেও আনতে পারে না। অথচ ও জিনিষ সকলের মধ্যেই অন্তর্নিহিত হ'য়ে আছে, যখনই উপযুক্ত রকমের যোগাযোগ ঘটে যায় তখনই বেরিয়ে আসে। একবার মাত্র নয়, প্রয়োজন হ'লে অনেক বারই আসে। যে দেশের মাটী যতই কঠিন হোক, তার তলায় যেমন জল আছে, টিউব-ওয়েল বসালেই সে জল বেরিয়ে আসে,—তেমনি যার হৃদয় যত বড়ই কঠিন হোক, তার মধ্যে যদি টিউব-ওয়েল বসাবার দরকার হয়, তবে প্রেমের ফোয়ারা নিশ্চয় সেখান থেকে ছুটে বেরোবে। শুধু তাই নয়, একটা জায়গাতে দুটো বা তিনটে টিউব-ওয়েলও যে বসানো যায়, তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নবযুগের রোম্যান্সেও আছে আর আদি যুগের রামায়ণ মহাভারতেও আছে।

তবে কি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পৃথিবীতে নেই একেবারে? তাও আছে। এ জগতে নেই এমন জিনিষই নেই। সম্পূর্ণ কামনারহিত হ'য়ে ভালোবাসা, প্রিয় ব্যক্তির কাছে কোনো রকম প্রতিদান না প্রত্যাশা ক'রে নিঃশেষে আত্মত্যাগ করেই পরম পরিতৃপ্তি পাওয়া,—এও সামান্য লোকের মধ্যেই দু-একটা দেখা যায়। কিন্তু তার সংখ্যা অতি কম, সাধারণ রোম্যান্টিক কাহিনীর মধ্যে তার স্থান নেই। সে জিনিষটা রোমান্স নয়, তার চেয়ে বড় জিনিষ। ও নিয়ে সিড্‌নি কার্টনের মত কচিৎ দু-একটা আদর্শ চরিত্র দেখানো যায়, কিন্তু সাধারণ ঘর করাও যায় না, সাধারণ বই লেখাও যায় না। ওর মধ্যেও প্রকৃতির প্রয়োজন আছে, ওরকম দু একটা উদাহরণ সংসারের মধ্যে রাখার দরকার হয়। কিন্তু প্রকৃতির আসল প্রয়োজন ও নিয়ে নয়, সাধারণ জীব নিয়ে; এবং জীব মাত্রেই স্বার্থ আছে, তার প্রেমের মধ্যেও আছে।

কথাটা তোমরাও যে মনে মনে বিশ্বাস করছো না তা নয়, কিন্তু শুনতে তোমাদের ভালো লাগছে না। কেবল নিজের দিক দিয়ে দেখলে এই সব কথায় মনে আঘাত পাবে, কিন্তু সারা প্রকৃতির দিকে যদি চেয়ে দেখ তবে ঐ একই নিয়ম সর্ব্বত্র দেখতে পাবে। প্রেম নিয়ে কাজ করতে চাও কর, কিন্তু প্রেম অতি বস্তুতান্ত্রিক বৃত্তি।

তোমরা হয় তো বলবে পুরুষের প্রেম তা হতে পারে কিন্তু মেয়েদের প্রেম তা নয়। আমার বাগানের দুদিকে দুটো মাধবীলতা রয়েছে দেখেছো তো? ওর মধ্যে একটা উঠেছে নিমগাছের ওপর, আর একটা উঠেছে আম গাছের ওপর। ওদের মধ্যে একটাকে যদি জিজ্ঞাসা কর কেমন লাগছে, তো বলবে বেশ লাগছে,—আমার আছে মিষ্টতা আর আমার গাছের আছে তিক্ততা, তিক্ত মধুরে আমাদের বেশ একরকম কম্বিনেশন হয়েছে। অপর লতাটাকে যদি জিজ্ঞাসা কর কেমন লাগছে তো বলবে খাসা লাগছে, আমি দিই ফুল আর আমার গাছ দেয় ফল, ফুলে ফলে আমাদের সম্পদ কত! দুজনেই সুখী, প্রয়োজনের গতিকে যে ওদের প্রেম তা ওরা বুঝতেই পারে না। কিন্তু আজ ঐ মাধবীলতাকে কেটে

ফেলে তার জায়গায় একটা মালতীর চারা বসিয়ে দাও, দুদিন পরে দেখবে তার সঙ্গেও ঐ গাছের একই রকম জড়াজড়ি। মেয়েদের প্রেম ঐ রকমের,—monogamous,—কারণ ওদের পক্ষে তাই প্রয়োজন।

সবই প্রয়োজনের প্রেম। আমার জ্যাকি কুকুরটাকে দেখ। বাচ্ছা বেলা থেকে ওটাকে পুষেছি, আমি ছাড়া দুনিয়ায় ও কাউকে জানে না। ওর মত একনিষ্ঠতার উদাহরণ আর কোথাও মিলবে না। কিন্তু ঐ জ্যাকিকে যদি আজ বেচে দিই, তো দেখবে দুদিন পরে ও নতুন মনিবের সঙ্গে ঠিক এই রকম ব্যবহারই করবে। তখন যদি দৈবাৎ আমার সঙ্গে দেখা হয় তো, হয়তো বার কয়েক ল্যাজ নাড়বে মাত্র, তার বেশী আর কিছু নয়।

বেশী কথায় কাজ কি, সেদিন দেখলাম আমাদের হরি খুড়ো বেলফুলের মালা কিনছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'খুড়ো, বেল ফুল কি হবে?' খুড়ো অমনি একগাল হেসে বললে—'আর বাবা, বলো কেন? তোমার নতুন খুড়ীর (তৃতীয় পক্ষের) সখ। ফুল না পেলে তাঁর ভালো লাগে না। একটু খেলা করে আর কি,—ছেলেমানুষ তো! হয় তো পুতুল সাজায়।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'খুড়ো, প্রথম খুড়ীকে কি এই রকম মালা কিনে দিতে?' খুড়ো অমনি কাণের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললে—'তাঁর কথা ছেড়ে দাও। তিনি ছিলেন সতী সাধ্বী; আমার কি তাঁকে ফুল দেবার কোনো দরকার হোতো?' অর্থাৎ প্রথম পক্ষে যে জিনিষের জন্যে বেল ফুলের প্রয়োজন ছিল না, তৃতীয় পক্ষে সেই জিনিষ বেলফুল দিয়ে লাভ করতে হয়।

কিন্তু ঐ হে, গিন্নী ডেকে পাঠিয়েছেন, রাত হ'য়ে গেছে বোধ হয়। গল্পের ভণিতা করতেই এত সময় কেটে গেল, গল্পটা আর আজ বলাই হোলো না। একটু বয়স হ'য়ে গেলে এই রকম হয়, তখন আর কথারও ঠিক থাকে না সময়েরও ঠিক থাকে না। তা যাই হোক, তোমরা তো গল্প শুনতে চাও সময় কাটাবার জন্যে। যেমন হোক একটা গল্প হলেই তোমাদের চলে যায়। তা আজ না হয় মিথ্যা গল্প না শুনে প্রেমের সম্বন্ধে ছুটো সত্য কথা শুনলে? যেমন ক'রে হোক সময়টা তো কেটে গেল! আসল গল্পটা আর একদিন বলবো।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

অযোগ্যের নিবেদন

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

মনে তব বাঁচিবার যোগ্যতা নাই মোর জানি গো ঃ
তবু যদি মনে রাখো, সেই হবে সম্পদ মানি গো।
মনে পড়ে অতীতের বিস্মৃত আশা আর স্বপ্ন,
তুমি কাছে ছিলে যবে জোছনায় হয়েছিনু মগ্ন ;
কবিতায়-কবিতায় প্রাণে-মনে উঠেছিল গুঞ্জন।
মনে পড়ে অতীতের বিস্মৃত কতো সুখ-ভুঞ্জন।
আজ তুমি কাছে নাই, এলো একা নির্ম্মলা রজনী,
নিশীথের নীল মেয়ে দোলাইছে পত্রের ব্যজনী ঃ
আকুলিত হলো মন বুঝি সেই বাতাসের পরশে ;
মনে পড়ে একদিন ভরে গিয়েছিল মন হর্ষে।
সেদিনের কথা তুমি ভুলিয়াছ,—হয়তো বা ভোলোনি—
আজিকার এই রাতে মন-দ্বার বুঝি তব খোলো নি!
আমি খুলে দিনু দ্বার, কহিলাম রাত্রির কর্ণে—
মন মোর হলো নীল, অয়ি নিশা, জ্যো'স্নার বর্ণে।
বাতায়নে চাহি আজ ভাবি নাই কোনো অনুপমারে,—
বিনিদ্র শয্যায় কল্পনা করিতেছি তোমারে !!

তামিল জাতির উৎপত্তি ও প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

১। মনুষ্য জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার (১)

ভারত মাতার যুগ্ম চরণ দক্ষিণে তিন দিক হইতে ভারত মহাসাগর দ্বারা বিধৌত। ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভাগটি একটি উপদ্বীপ, এবং এই উপদ্বীপটীর নাম দাক্ষিণাত্য। ইহা অতি প্রাচীন মালভূমি—ভূতত্ত্ববেত্তাগণের মতে ইহা হিমালয় হইতেও প্রাচীন। মনুষ্য জাতির বিস্তারের সময় দাক্ষিণাত্য মালভূমির সহিত মাদাগস্কর ও দক্ষিণ আফ্রিকার সংযোগ থাকার কথাও তাঁহারা বলেন। তখন সুমাত্রা দ্বীপ, যবদ্বীপ, বোর্ণিও দ্বীপ ইত্যাদি ছোট বড় ভূ-ভাগ দ্বীপে পরিণত হয় নাই এবং যে সকল স্থান তাহারা এখনও অধিকার করিয়া আছে সেখানে একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বিদ্যমান থাকিয়া দাক্ষিণাত্যের সহিত সংযুক্ত ছিল। তখন নিউগিনির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া অষ্ট্রেলিয়া পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং নিউজীলণ্ডের আয়তন আরও বৃহৎ ছিল বলিয়া কথিত হয়। ভূ-গোলকের উত্তরার্দ্ধে জিব্রাল্টর এবং আরও দুই তিনটী স্থানে আফ্রিকার সহিত য়ুরোপের যোগ ছিল। ব্রিটেন য়ুরোপের সহিত সংযুক্ত থাকাতে এখান হইতে আইসলন্দ, গ্রীনলন্দ ইত্যাদি হইয়া আমেরিকা পর্য্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন ভূমিখণ্ড বিদ্যমান ছিল বলিয়া কথিত হয়। এদিকে এশিয়ার পূর্ব্বোত্তরে সাইবিরিয়ার পূর্ব্বাংশের সহিত আমেরিকার পশ্চিমোত্তরস্থ আলাস্কার যোগ থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বহ্বাধুনিক (Pliocene) যুগে এন্থ্রপইডী পরিবারভুক্ত জীবগণ দুইটি ধারায় বিভক্ত হওয়াতে এক ধারার জীবগণ মনুষ্য জাতিতে পরিণত হয়। প্রত্নজীবতত্ত্ববিদ্‌গণ যবদ্বীপকেই মনুষ্যের আদি জন্মভূমি বলিয়া অনুমান করেন। এই জন্মভূমি হইতে মনুষ্য পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রথমাবস্থায় মনুষ্য ও তাহা হইতে নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে অধিক ব্যবধান ছিল না। অপরাপর জীবেরা যে ভাবে জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিল, মনুষ্যও সেইরূপে জীবন সংগ্রাম চালাইত। প্রভেদের মধ্যে এই যে, অন্যান্য জীব অপেক্ষা মনুষ্যের অধিক বুদ্ধি থাকাতে সে তাহাদের উপর নিজ আধিপত্য স্থাপিত করিয়া এবং একটী মাত্র জাতিতে পরিণত হইয়া বহু প্রাচীন যুগেও সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্ব-বর্ণিত স্থলাংশগুলির সংযোগ থাকাতে অতি প্রাচীন যুগের মনুষ্যেরা ভারতের পূর্ব্ব দক্ষিণ অংশে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং এখান হইতেই এশিয়া, আফ্রিকা, য়ুরোপ, আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়ে। সেই যুগের সবলোক সর্ব্বত্র একই প্রকারের ছিল। বিচ্ছিন্ন ভাবে আবদ্ধ হইয়া অতি দীর্ঘকাল এক একটী স্থানে বাস করায়, সেই সেই বাসস্থলোপযোগী কতকগুলি বিশেষত্ব স্বতঃ তাহাদের আকৃতির মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই কারণেই মনুষ্য জাতির উপজাতি গুলি উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের বাসস্থান, জলবায়ু, আহার, বংশ পরম্পরাগত গুণ ও কাল তাহাদিগকে যেরূপভাবে গঠিত করিয়াছে তাহারা সেইরূপই হইয়াছে।

প্রাচীন যুগের মনুষ্যেরা নিজ নিজ মনোমত বাসস্থান অধিকার করিবার পর হইতেই উপজাতির বিবর্ত্তনের এবং মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের যুগপৎ সূত্রপাত হইল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্নতা বশতঃ ফলের বিভিন্নতা ঘটিল। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থানে, যথা নাতিশীতোষ্ণ উত্তর মণ্ডলে মানুষ শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের চরমসীমায় উপনীত হইতে থাকিল। অন্যত্র মানুষ পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। অনেক স্থানের মানুষ এখনও বন্য ও অসভ্য রহিয়া গিয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীর উত্তরাংশে কয়েক বার বহুবর্ষব্যাপী হিমানী উৎপাত হইয়াছিল। এই সকল উৎপাতের সময় এবং উহাদের মধ্যবর্ত্তী কালগুলিতে মনুষ্যকে বাধ্য হইয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন খাদ্যের

(১) Wallace's article on Anthropology in the International Geography.

অভাবই স্থান পরিবর্ত্তনের মুখ্য কারণ। দেশের অনুর্ব্বরতা বা লোক সংখ্যার বৃদ্ধি বশতঃ এই অভাব ঘটিতে পারে। নৈসর্গিক কারণে এক এক দেশ কখনও কখনও শুষ্ক ও অনুর্ব্বর হইয়া যায় এবং সেখানে মনুষ্য ও পশুর বাস অসম্ভব হইয়া পড়ে। মধ্য এশিয়ার জলশূন্যতার ফলে য়ুরোপ ও এশিয়াবাসী জাতিগণের ইতিহাসে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সভ্যতার তারতম্য হেতুও অনেক সময় জাতি সমূহ মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। সভ্যতায় অনেক সময় মানুষকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে। বলবান দিগ্ বিদিক্-জ্ঞানশূন্য অসভ্য জাতিরা অপেক্ষাকৃত বলহীন জাতিগণের ধন লুণ্ঠন বা বাসস্থান অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে স্থান ত্যাগ করে। ধর্ম্মোন্মাদ বশতঃ অথবা ধার্ম্মিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্যও মনুষ্যগণ একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করে।

মানব জাতির পর্য্যটনের প্রতিরোধকারী কতকগুলি ধারারও উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা সমুদ্র, পর্ব্বত মালা, গভীর অরণ্য, জলপূর্ণ নিম্নভূমি, মরুভূমি। এগুলি প্রাকৃতিক বাধা। কৃত্রিম বাধাও থাকিতে পারে, যথা দুর্গ, প্রাচীর, মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র।

বিগত লক্ষ বৎসরের মধ্যে কত অসংখ্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া এবং কত অসংখ্য স্থান ত্যাগ করিয়া, কত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া যে মানবকুল বর্ত্তমান স্থান সমূহে উপনীত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। (১) হয়তো এক একটি জাতি অর্দ্ধেক ভূপৃষ্ঠ পর্য্যটন করিয়া তাহাদের আধুনিক বাসভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয় জাতিগণ দ্বারা আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার কতকগুলি অংশের অধিকার ইহার উদাহরণ।

২। ভারতবর্ষের জাতিসমূহ। (২)

এই নীতি অনুসারে বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষে কত জাতিরই সমাগম হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে, এখন যে সকল জাতির বাস ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কখন বা কি প্রকারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে আলোচনা অনেকেই করিয়াছেন কিন্তু ইহার সম্যক মীমাংসা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। অনেক জাতি দেশান্তর হইতে আসিয়া ভারতীয় জনসমূহ মধ্যে এরূপভাবে গ্রস্ত ও মিশ্রিত হইয়াছে যে তাহাদিগকে পৃথক্ করা এক প্রকার অসম্ভব। এ সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় ও মারওয়াড়ী জাতি এবং শাক দ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ উদাহরণ স্বরূপ। আধুনিক কালে যে সকল জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিয়াছে যথা, মুসলমান, পারসী, ইহুদী, ইংরাজ ইত্যাদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বহুযুগ হইতে উত্তর ভারতে আর্য্যজাতির বংশধরগণ (অন্যান্য অনেক জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া), দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় জাতি (অপর কয়েক জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া), এবং কোনো কোনো পার্ব্বত্য ও অরণ্যময় স্থানে কতকগুলি অসভ্য জাতি বাস করিয়া আসিতেছে। এই সকল জাতিরা কোন্ সময়ে ও কি প্রকারে এদেশে প্রবেশলাভ করিয়াছিল? আর্য্য জাতির ভারতে আগমন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বতমালার উত্তর পশ্চিম ভাগ সংলগ্ন কোন স্থান হইতে আসিয়া খৃষ্ট জন্মের অন্ততঃ ছয় সাত হাজার বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার দক্ষিণে এবং সিন্ধুনদের পশ্চিমে আফ্‌গানিস্থান ইত্যাদি লইয়া যে ভূভাগ তাহা অধিকার করিয়াছিলেন এবং আনুমানিক খৃষ্টের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে উত্তর ভারতে ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহারা কোন্ কোন জাতিকে বিতাড়িত করিয়া প্রথমে পঞ্চনদ, তৎপরে মধ্যদেশ এবং আরো পরে মগধ ইত্যাদি অধিকার করিয়াছিলেন? যাহারা এখন দ্রাবিড় জাতি বলিয়া পরিচিত তাহাদের সহিত কি তাঁহাদের সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল? না, তাঁহারা এখনকার অরণ্যবাসী কোল ইত্যাদি জাতিকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন? প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন যে স্মরণাতীত যুগ হইতে সমগ্র ভারতবর্ষ একটী খর্ব্বশির (brachycephal) কৃষ্ণকায় জাতিদ্বারা অধিকৃত ছিল। তখন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থা সম্ভবতঃ অন্য প্রকারের ছিল। প্রথম অবস্থায় হয় তো গঙ্গা ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থল এ সময় অপেক্ষা আরো উত্তর পশ্চিমে ছিল এবং সমগ্র দেশ নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। উপরিউক্ত জাতিই অনেকের মতে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী

(১) Haddon's Wanderings of People.

(২) V. Smith's History of India and Encyclopoedia Britannica.

ছিল এবং পুরাণ ইত্যাদিতে ইহারাই নাগ নামে কথিত হইয়াছে। পরে কোনো কোনো স্থানে ইহারা সভ্যতায় কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশই বন্য ও অতি অসভ্য ছিল। মুণ্ডা, কোল, হো ইত্যাদিরা ইহাদেরই অবশেষ। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই জাতিকে প্রাগ্‌দ্রাবিড়ী (pre-Dravidian) জাতি বলা হয়। হয়তো শেষ হিমানী যুগের পর হইতেই প্রাগ্‌দ্রাবিড়ীরা ভারতবর্ষের অধিবাসী। হিমানী যুগের পর ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থানের অনেক ইতর-বিশেষ হইয়াছে। কতকগুলি প্রাকৃতিক বাধা বশতঃ প্রাগ্‌দ্রাবিড়ীরা ভারতবর্ষে আবদ্ধ থাকায়, তাহাদের মধ্যে সভ্যতার অধিক বিকাশ হইতে পায় নাই। ইরাণের অধিবাসীরা খর্ব্বশির আল্পাইন (অর্থাৎ উচ্চ উপত্যকাবাসী) জাতির অন্তর্গত একটি জাতি ছিল বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু তাহাদেরও পূর্ব্বে অতি প্রাচীন কালে ঐ দেশে একটি কৃষ্ণবর্ণ জাতির অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের সহিত প্রাগ্‌দ্রাবিড়ী জাতির সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নয়। মলয় উপদ্বীপের সাকাই জাতি এবং অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্ব অধিবাসীরা এই জাতির অন্তর্গত। সম্ভবতঃ স্মরণাতীত যুগে ইহারাই মলয় উপদ্বীপ হইতে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং ইহাদের একদল ভারতবাসী হইয়া ইরাণে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

৩। দ্রাবিড় জাতি (১)

খর্ব্বশীর মানব ব্যতীত আর এক প্রকার মানব দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদিগকে দীর্ঘশীর (Dolichocephal) মানব বলে। আর্য্যেরা দীর্ঘশীর মানবের উদাহরণ। এই দুই শ্রেণীর মানবের সংমিশ্রণে একটী তৃতীয় শ্রেণীর মানবের উৎপত্তি হইয়াছিল, এবং এক সময়ে পশ্চিম এশিয়া (এশিয়া মাইনর ইত্যাদি) এই মিশ্র জাতির বাসস্থান ছিল। ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মোঙ্গোলীয় রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে বলেন যে দ্রাবিড়ীরা এই জাতীয় মানব। এই মতে ইহারাই পশ্চিম এশিয়া হইতে বেলুচিস্থানের পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে. কারণ বেলুচিস্থানের ব্রাহুই জাতির সহিত দ্রাবিড়ীগণের জাতিগত ও ভাষাগত সম্বন্ধ আছে। ব্রাহুই ভাষা দ্রাবিড়ী ভাষার লক্ষণাক্রান্ত। অনেকে আবার বলেন যে দ্রাবিড়ীরা প্রথম হইতেই ভারতবাসী এবং ব্রাহুইরা বাণিজ্য সম্বন্ধে বা অন্য কোনো কারণে দ্রাবিড়ীদের ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে দ্রাবিড়ীদের সহিত ব্রাহুইদের আকারগত সাদৃশ্যও আছে।

৪। দ্রাবিড়ীগণের দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ (১)

যাহা হউক, প্রথম দলের দ্রাবিড়ীরা প্রাগ্‌দ্রাবিড়ীগণের সহিত অধিক মিশ্রণের পূর্ব্বেই গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের পথে দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে উপনীত হয়। গুজরাতী ও মহারাষ্ট্রী ভাষায় দ্রাবিড়ী ভাষার অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান। দ্রাবিড়ীরা দাক্ষিণাত্যে আসিয়া এখানকার বহু প্রাগ্‌দ্রাবিড়ীকে বিতাড়িত করে এবং পরে তাহাদের সহিত কিয়ৎপরিমাণে মিশ্রিতও হয়। ইহাদিগকে আদিদ্রাবিড়ী বলা যাইতে পারে। দ্রাবিড়ীদের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশ্রিত হইয়া বসবাস করিতে থাকে। যে সকল প্রাগ্‌দ্রাবিড়ীরা আদি দ্রাবিড়ীদের সহিত মিশ্রিত হইতে ইচ্ছা করে নাই বা সুবিধা পায় নাই, তাহারা নিরাপদ পাহাড়ে, জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল। কতকগুলি প্রাগ্‌দ্রাবিড়ীও মিশ্রণের সুবিধা না পাইয়া ঐরূপ করিয়াছিল, যেমন ওরাও জাতি।

সম্ভবতঃ এই মিশ্রজাতির সহিতই আর্য্য জাতির সজ্বর্ষ হইয়াছিল এবং মিশ্রজাতির লোকেরা দস্যু নামে অভিহিত হইয়াছিল। দ্রাবিড়ীদের সহিত শক জাতির এবং শক ভাষার কিছু সম্বন্ধ আছে বলিয়া কথিত হয়। কোনো কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে আদি দ্রাবিড়ীরা শক জাতির দ্বারা দাক্ষিণাত্যে বিতাড়িত হয় এবং আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এই শক জাতিকে পরাভূত করেন। আর এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের মত এই যে দ্রাবিড়ীরা আফ্রিকার এক কৃষ্ণবর্ণ জাতি কর্ত্তৃক উত্তর-ভারত হইতে বিতাড়িত হয়। যাহা হউক অনেকের মতে আর্য্যদের সহিত আদি দ্রাবিড়ীদের কোনো সজ্বর্ষ ঘটে নাই; এবং আর্য্যদের দ্বারা তাহারা দাক্ষিণাত্যে

(১) V. Smith's Ancient History of India and Encyclopoedia Britannica.

(১) V. Smith's Ancient History of India ar Encyclopoedia Britannica.

বিস্তারিত হয় নাই। ঘটনা পরম্পরা হইতে অনুমান হয় যে দাক্ষিণী দ্রাবিড়ীদের সহিত আর্য্যদের শত্রুভাব ছিল না, প্রত্যুত পরে উভয়ের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ঔপনিবেশিকদের দ্বারা আদি দ্রাবিড়ীরা অনেক পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের সংস্কৃতি বা কৃষ্টি (culture) অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল।

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমান্ত যখন আর্য্যোপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তখন অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মিথিলা প্রভৃতি উত্তরপথের পূর্ব্ব সীমান্তস্থিত প্রদেশসমূহ কোন্ জাতির অবস্থান ছিল? ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও মগধবাসীগণের সহিত চেরদেশবাসীগণের অথবা চের জাতির উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে আর্য্যগণ যাহাদিগকে পক্ষিজাতীয় মনুষ্য মনে করিতেন তাহারা একই বংশ সম্ভূত জাতি। মধ্যপ্রদেশের পার্ব্বত্য উপত্যকা সমূহে যে-সমস্ত বর্ব্বর জাতি অদ্যাবধি আপনাদিগকে চেরো বা চের বংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা আর্য্যবংশ সম্ভূত নহে। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে তাহারা দ্রাবিড় জাতীয়।

দ্রাবিড় জাতি বহু প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহারা মধ্যভারতে ও দাক্ষিণাত্যে বাস করিয়া থাকে। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিশারদ এচ্ আর, হল স্থির করিয়াছেন যে এই দ্রাবিড়ীগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে বাস করিয়া আসিতেছে, এবং ইহারাই খৃষ্ট জন্মের চারিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বাবিরুষের (Babyloniaর) সেমেটিক জাতীয় আদিম অধিবাসীগণকে পরাজিত করিয়া সুমেরীয় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুমেরীয়গণ প্রাচীন কীলকাক্ষরের (Cuneiform script এর) সৃষ্টিকর্ত্তা। পরে মেসোপটেমিয়াতে ক্রমান্বয়ে আসুর ও বাবিরুষ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাদের সভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাবিরুষের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রাচীন সুমেরীয় জাতির যে সকল প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, তাহারা সেমেটিক বা আর্য্যবংশ সম্ভূত ছিল না। হল অনুমান করেন যে এই প্রাচীন সুমেরীয় জাতির অবয়ব ও মুখ বর্ত্তমান কালের দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রাবিড়িগণের ন্যায়।

অতি অল্পদিন পূর্ব্বে মধ্যভারতের উপত্যকা সমূহের কোনো স্থানে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার প্রস্তর নির্ম্মিত কীলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কীলকটীর গাত্রে কতকগুলি মনুষ্য-মূর্ত্তি ও কতকগুলি অক্ষর আছে। একজন যুরোপীয় পণ্ডিত বলেন যে, ঐ অক্ষরগুলি কীলকাক্ষর (Cuneiform letters) এবং কীলকটী বাবিরুষের একটী প্রাচীন মুদ্রা (Cylindrical Seal) এবং অনুমান দুইহাজার খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে খোদিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে বাবিরুষে এই জাতীয় মুদ্রার (সীল মোহরের) বহু প্রচলন ছিল এবং এই জাতীয় সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রাচীন আসুরে, বাবিরুষে এমন কি প্রাচীন মিসরে পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে পাষাণ নির্ম্মিত প্রাচীন সমাধিস্থান খনন কালে মৃন্ময় শবাধারে মনুষ্যের শব আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় শবাধার প্রাচীন বাবিরুষের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। (১)

এই সকল আবিষ্কার হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীন বাবিরুষবাসিগণের সহিত ভারতবাসী দ্রাবিড় জাতির অতি নিকট সম্পর্ক ছিল এবং উত্তরাপথের পশ্চিম প্রান্তে বেলুচিস্থানে ব্রাহুই জাতি ও তাহাদের ভাষা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, হয় দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষ হইতে গিয়া মেসোপোটমিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, না হয় দ্রাবিড়ীগণ পশ্চিম এশিয়া হইতে আসিয়া বাবিরুষ অধিকার করিয়াছিল এবং পরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে আর্য্যোপনিবেশের পূর্ব্বে একটী বৃহৎ জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল এবং তাহারাই ভারতবর্ষে দ্রাবিড় জাতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। তাহারাই বোধ হয় ঋগ্বেদের দস্যু এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা মগধে এবং বঙ্গে বাস করিয়াছিল তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণকর্ত্তৃক পক্ষি-

(১) Anderson's Catalogue and Handbook of Archeological Collections in the Indian Museum, Calcutta, Part II p. 426

নামে অভিহিত হইয়াছে। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ আধুনিক বঙ্গবাসিগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাহারা মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। [তবে কতকগুলি ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতীয় ব্যক্তিদিগের মুখের অবয়ব দেখিলে মনে হয় যে, তাঁহাদের ধমনীতে আর্য্যশোণিতও বিদ্যমান।—লেখক।]

৫। দ্রাবিড়ী সভ্যতা। (১)

পঞ্চনদ অধিকার করিবার পর আর্য্যেরা পূর্ব্বদিকে প্রথমে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। মধ্যদেশের নিবিড় অরণ্য দ্বারা তাঁহাদের গতি প্রতিহত হইয়াছিল পরে তাহারা বন পরিষ্কার করিয়া গঙ্গা ও যমুনার সংযম-স্থল পর্য্যন্ত বাসোপযোগী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক পরিমাণে সভ্য ছিলেন, বৃহৎ বৃহৎ নদীসঙ্কুল বিস্তীর্ণ সমতল দেশের অধিকারী হইয়া ক্রমান্বয়ে সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে থাকিলেন। তাই বলিয়া সেই সময়ের সাগরবেষ্টিত দাক্ষিণাত্যে মালভূমির অধিবাসীরা সভ্যতায় নিতান্ত হীন ছিল না। খৃষ্ট জন্মের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে তাহাদের যথেষ্ট সংস্কৃতি বা কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কালেই দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি প্রবল রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল রাজ্যের অধিবাসীরা পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের সহিত এবং গ্রীক ও রোমানদের সহিত বাণিজ্য করিত। তাহারা সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে জানিত এবং ভারতমহাসাগরের কয়েকটী দ্বীপে ও উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। শিল্প-কলায়ও তাহারা আশ্চর্য্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল। মাদুরার বস্ত্রশিল্প ভারতবিখ্যাত ছিল। তাহাদের সঙ্গীত প্রণালী আর্য্য সঙ্গীত প্রণালী হইতে ভিন্ন হইলেও তাহারা নিজ সঙ্গীত পদ্ধতির সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুশীলন করিয়া তাহাকে এমন একটি রূপ দিয়াছিল, যাহা আয়ত্ত করা সুগম নয়। গৃহনির্ম্মাণ-কলাতেও তাহারা অপূর্ব্ব দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহাদের দেবালয়গুলি এত সুদৃঢ় ও বিশাল যে প্রত্যেকটি ছোটখাট দুর্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

(১) V. Smith's Ancient History of India and Encyclopoedia Britannica.

তামিল জাতি। (১)

তামিল শব্দ হইতে উৎপন্ন—দ্রাবিড়, দ্রাবিড়, দামিল, তামিল। কিন্তু দ্রাবিড় ও তামিল শব্দ একার্থ বাচক নহে। সমগ্র দাক্ষিণাত্য মালভূমিটী দ্রাবিড় দেশ কিন্তু তামিল দেশ দ্রাবিড় দেশের সর্ব্বদক্ষিণ অংশটী। এই অংশের ভাষাকে তামিল ভাষা বলে। মাদ্রাসের কয়েক মাইল উত্তর হইতে পূর্ব্ব উপকূলের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত, অর্থাৎ পুলিকাট হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমঘাট হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত এবং ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণ ভাগ লইয়া যে ভূখণ্ড তাহাতেই তামিল ভাষা কথিত হয়। এই ভূভাগে তামিল জাতির প্রায় দেড় লক্ষ লোকের বাস। মোটামুটি বলিতে গেলে তামিল দেশের উত্তরে তেলেগু বা অন্ধ্রদেশ; অন্ধ্রদেশ গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড। এখন সেখানে হাইদ্রাবাদ করদ রাজ্য।

৬। তামিল চরিত্র। (১)

তামিলেরা খর্ব্বাকৃতি এবং তাহাদের গঠনে তত বলের ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় না পাওয়া গেলেও তাহাদের অনেকগুলি সদ্গুণ আছে। তাহারা বিনয়ী, প্রিয়ম্বদ, অনাড়ম্বর, সবল, মিতব্যয়ী, কষ্টসহিষ্ণু ও ধৈর্য্যগুণ সম্পন্ন। তাহাদের স্মরণ শক্তির ও গণিতে তীক্ষ্ণতায় প্রসিদ্ধি আছে। তাহারা অনলস ও কার্য্যপ্রিয়। যেখানে উপার্জ্জনের সম্ভাবনা আছে, সেখানে যাইতে তাহারা পশ্চাৎপদ নহে।

তামিলেরা ধর্ম্মপরায়ণ ও ভক্তিপ্রবণ। পর্ব্বদিনে ও উৎসব কালে তাহারা ভক্তিরসে নিমজ্জিত থাকে। দলবদ্ধ হইয়া ভক্তিরসাশ্রিত গান গাহিতে গাহিতে পথে গমনকালে তাহারা মত্ত হইয়া যায়।

তাহাদের আহারের প্রধান দ্রব্য ভাত—প্রায়ই জল দেওয়া ভাত। তাহারা তরকারীর বড় ধার ধারে না। লঙ্কা মরিচ ও তেঁতুল ভাতের প্রধান উপকরণ। দুগ্ধের পরিবর্ত্তে দধি ও ঘোলের ব্যবহারই অধিক। গমের অভাবে চূর্ণ তণ্ডুল দ্বারা নানাপ্রকার পিষ্টক নির্ম্মিত হয়। তাহারা কদলী পত্রে "অন্নম্"

(১) V. Smith's Ancient History of India and Encyclopoedia Britannica.

খাইতে ভালবাসে। মস্তকে একখণ্ড শিখা রাখিয়া পাশের চুল চারিদিকে ছোট ছোট করিয়া কাটে এবং মস্তক ও দেহ অনাবৃত রাখিয়া প্রায়ই নগ্নপদে বাটীর বাহির হয়।

৭। তামিল বর্ণমালা ও ভাষা। (১)

ভারতবর্ষের অন্যান্য বর্ণমালার ন্যায় তামিল বর্ণমালাও ব্রাহ্মী বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন। দ্রাবিড় দেশের যে কয়টী বর্ণমালা দেখিতে পাওয়া যায় সকলেরই টানের একটি বিশেষত্ব আছে। ইহা উত্তর ভারতের বর্ণমালা সমূহের টান হইতে ভিন্ন। তামিল বর্ণমালায় ব্যঞ্জন বর্ণের প্রত্যেক বর্গের কেবল প্রথম ও পঞ্চম বর্ণ আছে এবং মহাপ্রাণ উচ্চারণগুলি নাই। তৃতীয় বর্ণের কাজ প্রথম বর্ণের দ্বারাই হইয়া থাকে। শব্দের আদিতে প্রথম বর্ণের উচ্চারণ ব্যতীত অন্য বর্ণের উচ্চারণ নাই। বর্ণ অভ্যস্ত হইলেও এই নিয়ম। শব্দ মধ্যস্থ অসংযুক্ত বর্ণ গ, ড, দ, ব এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। সংস্কৃত 'দন্ত' শব্দ তামিলে 'তন্দ' এবং 'ভাগ্য' তামিলে 'পক্কিয়' হইয়া যায়। 'চ' য়ের উচ্চারণের একটু বিশেষত্ব আছে, ইহা একক থাকিলে ইহার উচ্চারণ 'চ' ও 'শ' য়ের মধ্যবর্ত্তী। শব্দের আদিতেই থাকুক আর মধ্যেই থাকুক 'চ" য়ের উচ্চারণ 'শ' য়ের নিকটবর্ত্তী, কিন্তু অভ্যস্ত হইলে সংস্কৃত 'চ্চ' য়ের ন্যায়। শব্দের আদিতে সংযুক্ত বর্ণ থাকিতে পারে না। শ, ষ, স, ও হ বর্ণ নাই। প্রথম তিনটির কাজ 'চ' দ্বারা হয়, এবং 'হ' এর কাজ অনেক সময় 'ক'-য়ের দ্বারা হয়। এই বর্ণমালায় কতকগুলি বিশেষ ব্যঞ্জন বর্ণ আছে, যথা মূর্দ্ধণ্য র ও ল এবং আর একটি বর্ণ যাহার উচ্চারণ ল ও 'ড়' য়ের মধ্যবর্ত্তী।

ইহাতে সংস্কৃত বর্ণমালার সকল স্বরেরই উচ্চারণ আছে, অধিকন্তু হ্রস্ব একার ও হ্রস্ব ওকারও আছে। সংস্কৃত শব্দ তামিল বর্ণমালা দ্বারা লিখিতে যে সকল বর্ণের অভাব পড়ে তাহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হইলে গ্রন্থলিপির বর্ণমালার সাহায্য লওয়া হয়। যে সকল সংস্কৃত শব্দ মধ্যে মধ্যে তামিল ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের আকার ও উচ্চারণের অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছে যথা 'লোক্' স্থানে 'উলগ,' 'রূপ' স্থানে 'উরুবম্', 'অদ্‌ভূতম্' স্থানে 'অর্পুতম্', 'ঋষি' স্থানে 'ইরুদি', 'দীর্ঘম্' স্থানে 'তির্কম্', 'রাজন্' স্থানে 'অরসেন্'।

তামিল দেশে ব্রাহ্মণ ঔপনিবেশিক (১)

তামিল দেশের উচ্চ অঙ্গের জীবনযাত্রানির্ব্বাহ পদ্ধতি এবং সাহিত্যিক সংস্কৃতি বা কৃষ্টি ঐ দেশস্থ ব্রাহ্মণ ঔপনিবেশিকদিগের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। যদিও তামিল জাতির কোনো ইতিহাস ঐ ভাষায় লিপিবদ্ধ নাই, তথাপি কতকগুলি প্রাচীন তামিল কাব্যগ্রন্থে প্রাচীন রাজাদের বীরত্বের ও শাসন প্রণালীর বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে প্রাচীন কালে তিনটী প্রধান তামিল রাজ্য—পাণ্ড্য, চোল ও চের (কেরল)—বিদ্যমান ছিল, তন্মধ্যে পাণ্ড্য রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রবল ছিল, এবং ইহার রাজধানী মাদুরা ছিল।

মহাভারতে পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোকের অনুশাসনেও তামিল জাতির নাম পাওয়া যায়। প্লিনী তাঁহার ভৌগোলিক বিবরণেও তামিল ও তেলেগু জাতির বর্ণনা করিয়াছেন। ম্যাগাস্থিনিসের ভারত বর্ণনায় পাণ্ড্য দেশের নাম পাওয়া যায়। চোল রাজ্যের নাম অশোকের অনুশাসনে ও চালুক্য রাজাদের অনুশাসনে পাওয়া যায়। চোল রাজ্য পূর্ব্বতীরবর্ত্তী এবং সমগ্র কাবেরী উপত্যকার উত্তরাংশ, তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লী প্রদেশ ব্যাপী ছিল। ইহার রাজধানী ত্রিচিনপল্লী ছিল। এই রাজ্যে পুগার ও কাঞ্চী নামক দুইটী বড় নগর ছিল। করোমণ্ডল শব্দটি চোল মণ্ডল শব্দের অপভ্রংশ। চের বা কেরল রাজ্যের নাম হরিবংশে ও অনেকগুলি পুরাণে পাওয়া যায়। এই রাজ্য কালিকাটের দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত সমগ্র মালাবার উপকূল এবং কোইম্বাটুর, সালেম ও মহীশূরের দক্ষিণ ভাগ লইয়া গঠিত হইয়াছিল। এই রাজ্যে পূর্ব্বে তামিল ভাষাই প্রচলিত ছিল; তখন মালয়ালম ভাষা তামিল ভাষা হইতে পৃথক্ হয় নাই। মালাবার শব্দ সংস্কৃত মলয়বার (মলয়দেশ) শব্দ হইতে উৎপন্ন।

(১) Bishop Calderwood's Comparative Grammar of the Dravidian Languages.

(১) Bishop Calderwoods Comparative Grammar of the Dravidian Languages.

তামিল ভাষার অন্যান্য ভাষার সহিত সম্বন্ধ। (১)

তামিল, মালয়ালম, কন্নাদ (কানারীজ), তেলেগু, তুলু, কুড়গু (কুর্গ), তোডা, গোন্দ, খোন্দ, ওরাওঁ, বাজমহালী, কৈকাদী এবং ব্রাহুই—এই ভাষাগুলিকে দ্রাবিড়ী ভাষা বলে। তামিল ভাষাই সর্ব্বপ্রাচীন, শব্দ সম্পদে পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ, অন্যান্য দ্রাবিড়ী ভাষা অপেক্ষা ইহাতে সংস্কৃত শব্দের অনুপাত অনেক কম। সব দ্রাবিড়ী ভাষাগুলিই প্রত্যয়-সংযোগী (Suffisiagglunating)। মুণ্ডারী, হো, সাঁওতালী ইত্যাদি কোল ভাষা; তুর্কী, মোঙ্গোল, বুরিয়াত, তুঙ্গুস, মাঞ্চু ইত্যাদি যুবল আলতাই ভাষা; হাঙ্গেরীয় ও ফিনিস্ ভাষা এবং জাপানী ভাষা এই শ্রেণীর। এই শ্রেণীর ভাষার ধাতুর সহিত ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ সূচক এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সূচক প্রত্যয় মিলিত হইয়া শব্দ নির্ম্মিত হয় এবং শব্দের প্রত্যেক অংশ ধাতু হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত, গ্রীক ইত্যাদি আর্য্য ভাষায় প্রত্যয়গুলি ধাতুর অঙ্গের সহিত এরূপে সংযুক্ত হইয়া যায় যে, তাহাদিগকে পৃথক্ করা অনেক সময় কঠিন হয় এবং পূর্ব্বে উহাদের কিরূপ আকার ছিল তাহাও নির্ণয় করা যায় না। এই সকল ভাষাকে পূর্ণ সংযোগী (inflexional) ভাষা বলে। দ্রাবিড়ী ভাষাগুলি পূর্ণসংযোগী নয়, কিন্তু সংস্কৃতের ন্যায় বিভক্তি-প্রধান।

(১) Tucker's Introduction to the Natural History of Language.

তামিল ভাষায় মূর্দ্ধণ্য বর্ণের প্রাধান্য (১)

সমস্ত দ্রাবিড়ী ভাষায় বিশেষতঃ তামিলে মূর্দ্ধণ্য বর্ণের অতিশয় প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতে যে কয়টী মূর্দ্ধণ্য বর্ণ আছে তাহাতো ইহাতে আছেই, প্রত্যুত অতিরিক্ত কয়েকটি মূর্দ্ধণ্য বর্ণ তামিল ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্দ্ধণ্য 'ষ' টি ইহাতে নাই, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কিন্তু মূর্দ্ধণ্য 'র' ও 'ল' এবং 'ড়' আছে। মূর্দ্ধণ্য বর্ণগুলি সংস্কৃত ভাষায় কোথা হইতে আসিল? গ্রীক, পারস্য ইত্যাদি অন্যান্য আর্য্য ভাষায় তো মূর্দ্ধণ্য বর্ণ নাই। য়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরা অনুমান করেন যে দ্রাবিড়ীদের সংস্পর্শে আসিয়া সিন্ধুনদ পার হওয়ার পূর্ব্বেই ভারতীয় আর্য্যদের ভাষায় এই সকল উচ্চারণ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। মূর্দ্ধণ্য উচ্চারণ তাতার ও ফিনিস ভাষার একটি বিশেষত্ব। ইহাদের সহিত দ্রাবিড়ী ভাষার উচ্চারণগত সম্বন্ধ আছে। ল্যাপল্যাণ্ডের ও আইসল্যাণ্ডের ভাষার এবং (যদি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনীয় হয়) ইংরাজী ও জার্ম্মাণ ভাষার উচ্চারণেও মূর্দ্ধণ্য উচ্চারণ লক্ষিত হয়।

(১) Bishop Calderwood's Comparative Grammar of the Dravidian Languages

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

অচল প্রেম

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

১

নৌকা হইতে নামিয়া দীপ্তি একবার অলস দৃষ্টিতে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। পার ঘাটায় তখনও খেয়ার নৌকায় পারের যাত্রী বোঝাই হইতেছে। জাহ্নবীর জলোচ্ছ্বাস অস্তোন্মুখ সূর্য্যকরে ঝলমল করিতেছিল। ঝাউতলায় বাঁধা তাহাদের কল্যাণপুরের কাছারী বাড়ীর পানসীখানা জল-তরঙ্গে নাচিতেছিল। সারি দিয়া দুই তিন খানা বোঝাই নৌকা পালভরে রাজহংসীর ন্যায় গর্ব্বিত গতিতে ভাগীরথীর জলরাশি-মন্থন করিয়া গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

এই কল্যাণপুরের ভাগীরথী! রাজধানীর ভাগীরথীর সহিত এ ভাগীরথীর কত প্রভেদ! সে ভাগীরথীর উভয় তটে অসংখ্য হর্ম্ম্যরাজি, বুকের উপর শত শত জলযান; জলরাশি আবিল পঙ্কিল—শত বাধার বন্ধনভারে পীড়িত। আর এই ভাগীরথী?—এ রূপের ত তুলনা নাই। শ্যামল তৃণশস্প ও বনরাজির বক্ষ ভেদ করিয়া অনাবিল স্বচ্ছ পবিত্র বারিরাশি বাধাবন্ধনলেশহীন হইয়া উন্মাদ উদ্দাম গতিতে তরতর করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। সম্মুখে বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন আঁকা বাঁকা গ্রামের পথ—কোথাও আম কাঁঠালের বাগানের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া—কোথাও কৃষক পল্লীর খড়ে-ছাওয়া মাটীর ঘরগুলির পশ্চাৎ দিয়া—আবার কোথাও বা ধানের ক্ষেতের বুক চিরিয়া নদীর কূলে আসিয়া মিশিয়াছে। যতদূর চক্ষু যায় কেবল শ্যামল সবুজের শোভা! ধূলিলেশহীন দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ গ্রামের পথ নিভৃত পল্লীর কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি বহিয়া যুগ যুগ ধরিয়া এমনি ভাবে পড়িয়া আছে! ঐ পথের ওপারে ঘন সবুজের আড়ালে কত যুগ যুগান্তরের বৈচিত্র্যহীন ব্যস্ততাহীন কর্ম্মকোলাহলহীন শান্ত গতানুগতিক পল্লীজীবনের একটানা স্রোত বহিয়া যাইতেছে! বাহিরের জগৎ অবিশ্রান্ত কর্ম্মজীবনের ভীষণ ভূমিকম্পে ওলট-পালট হইয়া গেলেও এই শান্ত স্থির পল্লীজীবনের অঙ্গে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করিয়া যায় না।

বাল্যের সুখস্মৃতির অস্পষ্ট রেখারই মত অন্তরের নিভৃত কোণে সঙ্গোপনে লুক্কায়িত ছিল এই পল্লীর জাহ্নবী। কত যুগযুগান্তর ধরিয়া এমনই করিয়া এই জাহ্নবীর পারঘাটায় পারাপার হইয়াছে কত গ্রাম্য যাত্রী! তাহার পিতৃ-পিতামহের অধ্যুষিত জাহ্নবীতটবর্ত্তিনী পল্লীর এই পারঘাটায় এমনই করিয়া পাটনী কত যুগ ধরিয়া যাত্রী পারাপার করিয়াছে! দীপ্তি পারঘাটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এই কথাই ভাবিতেছিল। হঠাৎ সে ডাকিল, "মামা!"

দীপ্তির আহ্বানে যদুগোপাল বাবু ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কাছে আসিলেন, স্মিতমুখে বলিলেন, "কি মা!"

"তোমাদের এই পারঘাটায় বেহারী পাটনী কেন—বাঙ্গালী পাটনীরা কি মরে গেছে?"

এ অদ্ভুত প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া যদুমামা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "না মা, ওরা বেশী টাকায় নিলেম ডেকে নিয়েছিল তাই—"

"তোমরা তারও বেশী টাকা দিয়ে নিলেম ডেকে নিলে না কেন? ষ্টেশনেও দেখে এলুম তাই, বেহারী কুলী। ট্যাক্সীতেও দেখলুম পাঞ্জাবী ড্রাইভার, খেয়াঘাটেও পশ্চিমা পাটনী—কেন, বাঙ্গালী নেই—বাঙ্গালী কি মরে গেছে? সহরে বাঙ্গালী মরেছে, গ্রামেও কি তাই?"

বৃদ্ধ যদুবাবু যেন নিজেই এ-সব অপরাধের মূল, এই ভাবে আমতা-আমতা করিতে করিতে বলিলেন, "না মা, তা কেন, এই যে আমাদের পানসীর দাঁড়ী মাঝী—ওরা সবাই বাঙ্গালী মুসলমান। তা সন্ধ্যে নেমে আসছে, এইবার পাল্কীতে গিয়ে উঠে বোসো।"

"পাল্কী?"

"হাঁ মা, ঐ যে অশথতলায় বেয়ারারা পাল্কী নিয়ে বসে আছে—ঐ দোকান ঘরের সামনে, ওরা আমাদেরই প্রজা।"

দীপ্তি হাসিয়া বলিল, "না মামা, ওতে যেতে পারবো না, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে। পাল্কী! তা, আশ্চর্য্য কিছুই নেই, কলকাতাতেও ত গরুরগাড়ী চলছে। তার চেয়ে চল হেঁটেই যাই—কতটুকু আর হবে পথটা?"

যদুগোপাল বাবু নীরব। এই দীর্ঘ যাট বৎসর বয়সে কখনও তিনি এমন ফাঁপরে পড়িয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তিনি দীপ্তির স্বর্গগতা জননীর দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিভ্রাতা। দীপ্তির পিতা কেন তাঁহার উপর এই অসম্ভব গুরুভার চাপাইয়া গেলেন!

দীপ্তি বলিল, "কি ভাবছো মামা? হেঁটে যেতে পারবো না? খুব পারবো। দশ বছর আসিনি দেশে, তা বলে ভুলে যাই নি কিছু, মামা। ঐ বাগান ক'খানা পেরুলেই বামুনপাড়া? আর তার পরেই আমাদের বাড়ী—কেমন, না? এ আর কতটুকু? চল যাই।"

যদুবাবু পুনরপি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "না মা, তা ভাবছিনে—"

"তবে?"

"বলছিলুম কি, এই গিয়ে, এটা হ'ল পাড়াগাঁ—আমাদের একটা মান সম্ভ্রম আছে—তুমি হলে জমিদার—এটা ত কলকাতা নয় যে, কে কাকে চেনে—"

দীপ্তি হাসিয়া বলিল, "তাই নাকি? তা, এটা ত একটা চাষাভূষোর গাঁ, এখানে আমরা যা করবো তার উপর কথা কইবে কে? চল হেঁটেই যাই মামা,—পাড়াগেঁয়ে এই কাঁচা রাস্তাটা আমার বেশ লাগছে।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়াই দীপ্তি তাহার স্যাণ্ডাল পরিহিত পা দু'খানি বাড়াইয়া দিল এবং হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া অনেকটা পথ অগ্রসর হইল। অগত্যা অনন্যোপায় হইয়া বৃদ্ধ যদুগোপালবাবু তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তিনি তখন অনেক কথা ভাবিতেছিলেন। সত্যই দীপ্তির পিতা তাঁহার উপর অতিগুরু কর্ত্তব্যভার চাপাইয়া দিয়াছেন। নরনাথ দত্ত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, যৌবনে মধ্যভারত সরকারের ও পরে বেহার সরকারের পূর্ত্তবিভাগে চাকরী লইয়াছিলেন এবং শ্রম ও অধ্যবসায় গুণে চাকরীর শীর্ষস্থানে উন্নীত হইয়াছিলেন। অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন প্রচুর, এবং ক্রমশঃ পৈতৃক বহুপ্রাচীন জমিদারীকে তাহারই কল্যাণে আরও বিস্তীর্ণ প্রথম শ্রেণীর জমিদারীতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি থাকিতেন দূরে কর্ম্মস্থলে। তাঁহার জ্ঞাতিরা অধিকাংশই থাকিতেন বিদেশে, পালে পার্ব্বণে কখনও কচিৎ দেশে যাইতেন। কাজেই তিনি তাঁহার অতি বিশ্বস্ত এই শ্যালকের উপরে বিপুল বিষয়সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে যদুবাবুর আপত্তি থাকিবার কথা ছিল না, কারণ ইহাতে তাঁহার নিজের সংসার প্রতিপালন ত হইতই, পরন্তু উহারই জন্য তাঁহার এতদঞ্চলে প্রভূত মান-সম্ভ্রম এবং প্রভূত্ব প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু গত বৎসর হঠাৎ কলিকাতায় রায় বাহাদুর নরনাথের মৃত্যু হওয়ার পর হইতে তাঁহারই উইল অনুসারে তাঁহার কন্যার অভিভাবকত্বের গুরুভারও যদুগোপাল বাবুর উপর ন্যস্ত হয়। তিনি ছিলেন বিপত্নীক। দীপ্তি যখন তিন বৎসরের, তখন দ্বিতীয়বার প্রসবকালে তাহার জননী অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। দীপ্তির তাঁহাকে মনেই ছিল না, সে পিতাকেই জানিত তাহার সব কিছু। যদুবাবু নাগপুর ও রাঁচীতে নরনাথ বাবুর বিষয়আশয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া কলিকাতা হইতে দীপ্তিকে লইয়া তাহারই ইচ্ছানুসারে দেশে আসিতেছিলেন। দীপ্তির তখন কলেজের ছুটি। আট বৎসর বয়সে দীপ্তি একবার পিতার সহিত দেশে আসিয়াছিল। তখন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়রাই তাহাদের সংসার দেখিতেন শুনিতেন। তারপর এই দীর্ঘ দশ বৎসর। সে প্রায় শিশুকাল হইতেই মধ্যপ্রদেশে ও বেহারে লালিতা পালিতা হইয়াছিল এবং মারাঠী ও বেহারী বালিকাদের সহিত মিলামিশা ও পড়াশুনা করিয়াছিল। গত চার বৎসর তাহার পিতা অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া তাহাকে লইয়া সংসার পাতাইয়াছিলেন, সে কলিকাতাতেই কলেজে পাঠ করিতেছিল। পিতামাতার অন্য সন্তানগুলি দীর্ঘজীবী হয় নাই, এজন্য দীপ্তিই তাঁহাদের হৃদয় জুড়িয়া ছিল, বিশেষতঃ মাতৃবিয়োগের পর হইতে সে জগতে পিতার একমাত্র অবলম্বন অন্ধের নড়ির মতই হইয়াছিল। তাহার একটি

মুখের কথা তাঁহার বাড়ীতে বোধ হয় বাসিয়ার জারের হুকুমের অপেক্ষা কম ছিল না।

এ হেন আদরে আবদারে পালিতা গর্ব্বিতা জমিদার কন্যার—জমিদার কন্যাই বা কেন, এখন স্বয়ং জমিদার—অভিভাবকতা করা বড় সহজ কথা বলিয়া যদুবাবু মনে করিতে পারেন নাই। অন্যদিকে তিনি বাশভারী কড়া মেজাজের ম্যানেজার হইলেও দীপ্তির কাছে একবারে আজ্ঞাবাহী মুখাপেক্ষী বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। কাজেই গ্রাম্যপথে সাধারণ প্রজাদের চোখের সামনে দীপ্তি হাঁটিয়াই যাউক বা এরোপ্লেনে উড়িয়াই যাউক, সামান্য একটি প্রতিবাদের কথা উচ্চারণ করিবারও তাঁহার সাধ্য ছিল না।

অশ্বত্থতলে একটি ছোটখাটো গঞ্জ—ধানচালের আড়ত, গুড় ও নারিকেল দড়ির গুদাম, বেনের মশলার দোকান, ময়রার দোকান, কাপড়ের দোকান,—কত কি। ছোট হইলেও লোকজনের জমজমা কম ছিল না।

গঞ্জের একখানা বড় দোকান ঘরের সম্মুখে সবুজ ময়দানে অশ্বত্থ বৃক্ষ তলে বাহকরা নরযান লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। আগন্তুকদিগকে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই উঠিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। বাহকরা পুরাতন খানসামা নিতাই-চরণের ইঙ্গিতে নরযান উঠাইয়া লইয়া তাহাদের পশ্চাতে চলিল।

দুই চারিপদ অগ্রসর হইয়া দীপ্তি রুষ্টস্বরে বলিল, "কি অসভ্য ওরা মামা। ছিঃ ছিঃ, চাষা কিনা।"

যদুবাবু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "কারা অসভ্য, মা?"

দীপ্তি বলিল, "ঐযে ঐ দোকানদাররা—ওরা হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইলো, যেন কোনো যুগে সহরের মানুষ দেখেনি।" দীপ্তির স্বরে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের আভাস।

যদুবাবু মিনতিভরা কণ্ঠে বলিলেন, "যেতে দাও মা, ওদের কথা—তুমিই ত বলছিলে, চাষাভুষো বৈত নয়!"

'সবাইকে ত ওদের মধ্যে চাষাভূষোর মত দেখলুম না। একজনকে দেখলে না—মোটেই ছোটলোক নয়, গায়ে জামা, পায়ে জুতো ফর্সা কাপড়-চোপড়—ঠিক যেন কলকাতার বাবু।"

নিতাইচরণ পশ্চাৎ হইতে বলিল, "ঠিক কয়েছ, দিদিবাবু, ওনারা কলকেতার বাবুই বটেক। ওনারা হচ্ছেন ডাক্তার বাবু!"

দীপ্তি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু!"

যদু বাবু বলিলেন, "হাঁ মা, গেল বছর উনি ডাক্তারী পাশ করেছেন।"

দীপ্তি বলিল, "তা এই পাড়াগাঁয়ে কি করছেন উনি?"

যদুবাবু বলিলেন, "উনি পাশের গাঁয়ের চন্দ্র ঘোষের ছেলে, চন্দ্রদা তোমার বাবার খুব বন্ধু ছিলেন। কলকাতায় থাকেন বটে, তবে মাঝে মাঝে দেশে ঘরেও আসেন।"

নিতাইচরণ অযাচিতভাবে বলিয়া উঠিল, "বড্ডো ভাল ছেলে ওনারা—"

দীপ্তি বাধা দিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "তা ওনারা ঐ খোড়োঘরে দোকানদারের সঙ্গে বসে কি করছেন? ঐ যে দুটো লোক—বুনো মোষের মত মুস্কো জোয়ান—গলায় তুলসীর মালা—ওনারা ত দোকানদার?"

নিতাইচরণ গ্রামের নূতন খবর দিবার গৌরবে মহা আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। বলিল, "হাঁ দিদিবাবু ওনাদের এক ভাই মুদী—ঐ যে তানার ঐ দোকানঘর—আর এক ভাই কেনারাম, ওনার হচ্ছে ময়রার দোকান—মানুষকের হাতেকে ট্যাকাকড়ি আছে ঢের দিদিবাবু—"

দীপ্তি হাসিয়া বলিল, "তাই নাকি? তা' ওনাদের ট্যাকা-কড়িতে মোদের ভাগ দেবে কি ওনারা কিছু, নিতাই? জিজ্ঞাসা করছি ওনাদের দোকানঘরে ভদ্র লোক বসে দাঁড়ায় কেন?"

নিতাই বিস্মিত হইয়া বলিল, "বোসবেক না, দিদিবাবু? খেয়াঘাটকে যানারা এসে তানারাই বসে। সাঁজের বাতি জলবার পর দেখ যদি দিদিবাবু—উঃ সে কি গাওনা বাত্তি! গাঁয়ের বাবুরা ঐখেনেই আড্ডা করে, তামুকটা আসটা খায়—ডুগীতবলা বাজায়, ঐযে কি বলে থ্যাটার নাকি, তার নিহা-সাল দেয়—কেমনগো ছোট কত্তা তাই নয়?"

যদু বাবু এতক্ষণ নীরবে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া যইতেছিলেন, কত কি ভাবিতেছিলেন। চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হাঁ, তাই বটে!"

দীপ্তি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "বেশ যা হোক্—কি তাই বটে মামা?"

নিতাই চরণ উৎসাহ পাইয়া গ্রামের বাবুদের নানা পরিচয় দিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু যখন দেখিল, তাহার দিদিবাবু অন্যমনস্কভাবে একবার মাত্র একটি ছোট 'হুঁ' দিয়া হন্‌হন্ করিয়া পথ চলিতে লাগিল, তখন বুঝিল ঐ প্রসঙ্গে কথা শোনা তাহার দিদিবাবুর আর অভিপ্রেত নহে। সে তাহার দিদিবাবুকে খুব বেশী না চিনিলেও দুই একবার কলিকাতার বাসায় যাতায়াতের ফলে তাঁহার মতিগতির কথা বিলক্ষণ অবগত হইয়াছিল।

পথে অপরিচিত গ্রাম্য লোকেরা দীপ্তিকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া পথ ছাড়িয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু বিস্মিত নয়নে তাহার মুখের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিতে ইতস্ততঃ করিল না। দীপ্তি ক্রোধে প্রায় জ্ঞানহারা হইল। কি নির্লজ্জ অসভ্য এই নিরক্ষর গ্রামবাসীরা—এই কল্যাণপুরের ইতর ভদ্র সবাই সমান? গ্রামের সম্বন্ধে দীপ্তির প্রথম ধারণা যে মোটেই ভাল হইল না, তাহা তাহার মুখচক্ষুর ভাবই বলিয়া দিতেছিল।

২

পত্নীর আবদারের প্রশ্নে অন্তরের হাসি চাপিয়া বিস্ময়ের ভান করিয়া সনৎকুমার বলিল, "ছড়ায়? কি ছড়ায়?"

নীহার বলিল, "আহা! কিছু যেন জানো না! বলছি কি, লোকে কি ছড়ায়? এই যেমন কোন কাজ-কর্ম্মে উৎসবে?"

"ওঃ তাই বল। কেন, কবিতা টবিতা লেখা হচ্ছে বুঝি? দেখি, কিসের কবিতা?"

"আঃ বলনা আগে—কথাটা মনে আসছে না যে!"

"তা লোকে খৈ ছড়ায়, বাতাসা ছড়ায়—"

"যাও, তুমি ভারি দুষ্টু! আমি বুঝি তাই বলছি—সে ত হরির লুটের বেলা, নয়ত যখন বৃষকাঠ নিয়ে যায়—"

"ওঃ ওগুলো বুঝি উৎসব না? তবে আবার কিসে কি ছড়ায়?"

নীহারের ডাগর চোখ দুটিতে অভিমানের জল টলটল করিতেছিল, বুঝি ঝরিয়া পড়ে! সনৎকুমার তাড়াতাড়ি অভিমানিনীর শিশিরসিক্ত রক্তোৎপলের মত মুখখানি আদরে বুকের মাঝে টানিয়া লইয়া বলিল, "ছিঃ ছিঃ, সত্যি কেঁদে ফেললে? লেখো না, গোলাপ ফুল ছড়ায়, বেল ফুল ছড়ায়, তা হলেই হবেখন। লোকে ত আর উৎসবে হীরে মুক্তো ছড়ায় না।"

নীহার বলিল, "বারে! ওত সবাই জানে; নতুন একটা কিছু বলে দাও না।"

সনৎকুমার বলিল, "তবে গোলাপ জল, ক্যাওড়া, আতর? কেমন? উৎসবটা কিসের, গরীব শুনতে পায় না কি? বন্ধুর অভ্যর্থনায় না কি?"

"তা নয় ত কি? দীপ্তি এসেছে, ওকে একটা কবিতা উপহার দিচ্ছি আমরা।"

সনৎকুমার সহসা খানিকটা গম্ভীর হইয়া বলিল, "হুঁ। তা, তোমাদের এই পাড়াগাঁর অসভ্য রকমের ফুল ছড়ান অভ্যর্থনার উপহার ওর ভাল লাগবে কি? ও যে খাস সহরে মেয়ে।"

নীহার বলিল, "বারে! আমরাও কোন্ পাড়াগেঁয়ে? তোমাদের হাতে পড়েছি বলে নাকি?"

"না, তা বলছি না। তবে তোমরা সহরে হলেও পাড়াগাঁয়ে পা ফেলতে শিউরে ওঠোনি—এই যা তফাৎ।"

"অবাক! ও এলো কদ্দিন পাড়াগাঁয়ে যে, এর মধ্যেই একেবারে এখানকার মানুষ হয়ে যাবে? ও ত তোমাদেরই আপনার জন গো—আপনার বলে আপনার? একেবারে বুকে রাখবার—"

নীহার স্বামীর প্রতি মধুর হাসির সহিত কটাক্ষপাত করিল।

সনৎকুমারও হাসিয়া কপট ক্রোধ দেখাইয়া বলিল, "বটে! বড্ডো কথা ফুটেছে, না? দেখাচ্ছি মজা!"

স্বামীর দৌরাত্ম্যে নীহারবালা মুখ চোখের উপর হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চূর্ণ কুন্তলগুলি সরাইতে সরাইতে সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল, "যাও, কি যে কর!"

তথাপি বাহুপাশে পত্নীকে আবদ্ধ রাখিয়া সনৎকুমার হাসিয়া বলিল, "কোবো না? ইয়ার্কি করলেই শাস্তি পেতে হবে। দেখো, সত্যি কথা বলতে কি, দীপ্তি আমার বোন হলেও বোন ঠিক নয়, কেন না ওরা আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেনি—নবনাথ কাকা থাকতেও নয়। জান ত, তিনি তাঁর বিষয় আশয়ের ভার তাঁর এক কোথাকার কে সম্বন্ধীর উপর দিয়ে গিয়েছিলেন।"

নীহার বলিল, "তা, তিনি থাকতেন বিদেশে পড়ে, কাজেই আপনার লোকের উপর দেশের বিষয়-আশয়ের ভার না দিয়ে করেন কি?"

"কেন বাবার উপর সে ভারটা দিলেই বা কি মন্দ হতো?"

"তা, তার জন্যে দীপ্তি কি অপরাধ করলে?"

সনৎকুমার বলিল, "ও বাবা, দীপ্তি? তিনি আবার তাঁর উপরে যান। দেখ না, দশ বছর পরে দেশে এলো, তা আমাদের একবার জানালে না। নিজের বাড়ী ত একরকম পোড়ো বাড়ীই হয়েছিলো, প্রথম এসেই আমাদের এখানে উঠলে পারতো ত?" কথাটায় ক্রোধ অপেক্ষা অভিমানের ভাবই ছিল বেশী। সনৎকুমার বলিল, "দেখ, একটা কথা তোমায় বলে রাখি, যেচে ওদের সঙ্গে মিশতে যেয়ো না তুমি।"

নীহার বলিল, "বা রে, তা কখনো হয়? এক সঙ্গে পড়েছি যে দুজনে বেথুনে, তা জানো ত'?"

সনৎ বলিল, "তা হোক। কৈ, চার পাঁচ দিন এসেছে, একদিনও তোমার খোঁজ করেছে? না, না, ও শুনেছি গুমুরে।"

নীহার বলিল, "অমন কথা বোলো না, ওর বাইরেটা হয়ত একটু রুক্ষ, কিন্তু ভেতরে খুব সাদা।"

"কিবে, ভেতরে কি শাদাবে? এই যে সনৎদা যে! পালাচ্ছো যে বড়?" কথাটা বলিতে বলিতে একটি তরুণী কক্ষে প্রবেশ করিল,—সে দীপ্তি।

যেন কতকালের আলাপ। অথচ কলিকাতায় থাকিতে দুই চারিদিন ব্যতীত বিশেষ দরকারে এই দাদার সহিত সাক্ষাৎ বা কথাবার্তা হইয়াছে কি না সন্দেহ। সনৎকুমার আমতা আমতা করিয়া বলিল, "কি রকম, পালাবো কেন? কাজ আছে—এসো বোসো—"

সনৎকুমার অপ্রতিভ হইল বটে, কিন্তু নীহার ছাড়িবার পাত্র নহে, সে বলিল, "বারে উল্টো চাপ দেওয়া হচ্ছে বুঝি? তুমি হলে বড়মানুষ জমিদার,—এ গরীব গেরোস্তদের ঘরে—"

তাহার মুখে থাবা দিয়া কথা কাড়িয়া লইয়া দীপ্তি বলিল, "ভারি কথা শিখেছিস, না? উঃ মস্ত গিন্নী হয়েছিস—তবু যদি বছর দুই বিয়ে না হোতো! দাঁড়া বাঁদরী, গড় করি দুজনকে তোদের, দাদার সঙ্গে বৌদিরও ত একটা প্রণাম প্রাপ্য।"

দীপ্তি গলবস্ত্র হইয়া উভয়কে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। সকলে হাসিয়া ফেলিল, ঘরের আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়া গেল। সনৎকুমার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল, সে দীপ্তির সম্মুখে যেন জড়সড় হইয়া পড়িয়া অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, বলিল, "তা হলে তোমরা আলাপ সালাপ করো, আমি আসছি একটু ঘুরে।"

দীপ্তি হাসিয়া বলিল, "দাদার বুঝি ভয় হোলো সহুরে বোন দেখে? তা, ও পোড়ারমুখীও ত সহরের মেয়ে।"

"না, না, তা না," বলিতে বলিতে সনৎকুমার সরিয়া পড়িল।

নীহার দীপ্তিকে বসাইয়া বলিল, "তারপর আছিস কেমন? হঠাৎ পাড়াগাঁয় যে?"

"কেন, আসতে নেই কি নিজের দেশে ঘরে?"

"না, তাই বলছিলুম—পণভঙ্গ নাকি? দশ বছর ত এ মাটী মাড়াসনি মেয়ায়। তা, ওদিকেও পণ ভঙ্গ হোলো, না তা না?"

"ওদিকে? তার মানে?"

"তার মানে, বিয়ে টিয়েতে মন ফিরলো? না—"

"তোর মুণ্ডুটুণ্ডুতে মন ফিরলো। কেন, বাঙ্গালীর মেয়েদের বিয়ে ছাড়া আর কোন কাজ নেই বুঝি?"

নীহার বলিল, "অবাক! বিয়ে না ক'রে থুবড়ী বুড়ী হয়ে ব'সে থাকবি নাকি? বাঙ্গালীর মেয়ে ঘর সংসার করবে না, পটের বিবি হয়ে বসে থাকবে, না? চল, মার সঙ্গে দেখা করবি চল। কি খাবি? গরীবের ঘরের খুদকুঁড়ো মুখে রুচবে ত?"

"সে কাজ অনেক কাল সারা হয়েছে মশাই—জেঠাইমা কি ছাড়তে চান?"

নীহার একগাল হাসিয়া বলিল, "সত্যি ভাই? সত্যি মার সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছিস? যাই মা। বোস্ ভাই একটু, আমি এই এলুম বোলে!" কক্ষান্তর হইতে নীহারের ডাক পড়িল। সে ডাক যে তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর, তাহা বুঝিতে দীপ্তির বিলম্ব হইল না। নীহার একরূপ ছুটিয়া চলিয়া গেল।

দীপ্তি বিস্মিত হইল। কি এমন জরুরী কাজ? সে বন্ধু,

কতকাল পরে আসিয়াছে দেখা করিতে—আশ্চর্য্য! তাহাকে ফেলিয়া একবারে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সে অনায়াসে শ্বশ্রূর আজ্ঞাপালন করিতে চলিয়া গেল? না হয় একটু বিলম্বই হইত! ইহাই কি বিবাহিত জীবনের দাসখৎ?

"নীহারদি, দেখো না ভাই, জামাই বাবু কি দুষ্টু—ওমা!" কথাটা বলিতে বলিতে এগারো বারো বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে দ্বারের কাছে আসিয়া দীপ্তিকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। দীপ্তিও বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, দীপ্তি কোমলকণ্ঠে ডাকিল, "নীহারদিকে খুঁজছিলে, ভাই? এসোনা এইখানে, সে এই এলো বলে।"

মেয়েটি কাছে আসিয়া বসিলে সে সস্নেহে তাহার একখানি হাত ধরিয়া বলিল, "তোমার নাম কি, ভাই? কোন্ বাড়ী তোমাদের?"

মেয়েটি সাজিয়াগুজিয়া আসিয়াছিল, কাজেই সে যে এ বাড়ীর নয় তাহা দীপ্তি বুঝিয়াছিল, সে ভাবিতেছিল পাড়াগাঁর মেয়ে এত সুন্দরও হয়!

"কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস দীপ্তি? ওমা' ও যে হিমুদার বোন। তুই কখন এলিরে রেখা?"

রেখা বলিল, "এই আসছি নীহারদি, দাদার জন্মদিন কিনা বোলুই, ভাই—"

নীহার হাসিয়া বলিল, "তাই নেমন্তন্ন করতে এইছিস, না? ওমা, মস্ত গিন্নি হয়েছিস দেখছি যে! কি লো! তুই ওর মুখের দিকে অমন করে চেয়ে রয়েছিস যে? হুঁ চেয়ে থাকবার মতন বটে—হাজারে বাঙ্গালীর ঘরে এমন মেয়ে একটা পাওয়া যায় না। হিমু দা আমার পিসতুতো ভাই, ওঁরাই এখানকার সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন আমার।"

দীপ্তি ছোট একটা হুঁ দিয়া মেয়েটিকে বলিল, "হ্যা ভাই, তোমার দাদা কি ডাক্তার?"

মেয়েটি জবাব দিতে না দিতেই নীহার বিস্মিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, কেন বল্‌দিকি? হিমুদা ত ডাক্তারই বটে। পাশের গাঁয়ে ওঁদের বাড়ী—এই পেসাদপুরে। তুই জানলি কি করে?"

দীপ্তি বলিল, "এরই মত দেখতে একটি পুরুষমানুষকে গঙ্গারঘাটে আর'বার দিন দেখেছিলুম। নিতাই বলছিল, ডাক্তার।"

নীহার বলিল, "হ্যাঁ ঠিকই বলেছে। দেখছিসনি, কে যেন হিমুদার মুখখানা এর মুখে কেটে বসিয়ে দিয়েছে! আর একটু বোস ভাই, ওকে নিয়ে একবার মার কাছ থেকে হয়ে আসি।"

দীপ্তি বলিল, "তা বসছি। কিন্তু এই একটু আগে ঘোড়ার মত ছুট দিয়েছিলি কেন বল দিকি?"

নীহার রেখাকে লইয়া যাইতে যাইতে বলিল, "ভোলামন ভাই, বড়ীর হাঁড়ী কটা রোদে দিয়েছিলুম, তুলতে ভুলে গিয়েছিলুম। মা ডাকলেন তাই তাড়াতাড়ি তুলতে গিয়েছিলুম। বোস ভাই এলুম বলে।"

দীপ্তি ভাবিতে লাগিল, কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! এই কি তাহার কলেজের সতীর্থ নীহার? কি যাদুমন্ত্রে সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী নীহারবালা বাঙ্গালী পল্লীগৃহস্থঘরের এই অদ্ভুত 'জন্তু'তে পরিণত হইয়াছে? ধন্য বাঙ্গালীর পল্লী—তোমার আকাশ বাতাসকে নমস্কার! পল্লীগ্রামের এই অসভ্য বর্ব্বরতার প্রতি দীপ্তির মন আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই ছুটীর পরেই তাদের আই, এ পরীক্ষার ফল বাহির হইবে। দীপ্তি স্থির করিয়াছিল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই কলেজে পড়া ছাড়িয়া দিবে এবং দেশে আসিয়া পিতৃপিতামহের অধ্যুষিত আবাসে কিছুদিন বসবাস করিবে কিন্তু দুই চারিদিনের পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতাই তাহার মনকে বিরূপ করিয়া তুলিল নীহার ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইবার পরই তাহার বিবাহ হয়। তৎপূর্ব্বে তাহার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শিনী ছাত্রী কলেজে কেহই ছিলনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে যেরূপ নারীপ্রগতির পক্ষপাতিনী ছিল এবং প্রতিপদে নারীর অধিকারের স্বপক্ষে যেরূপ দৃঢ়স্বরে দাবী করিত, তাহাতে তাহার দুই বৎসরে এই পরিবর্ত্তন বস্তুতঃই বিস্ময়কর! দীপ্তি তাই ঐ কথাটাই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিল। আপন মনে বলিতেছিল, পল্লীর এই দূষিত আবহাওয়া হইতে যতদূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

৩

রাসবিহারী এভেনিউএর একটি বাড়ীর দ্বিতল ফ্ল্যাটের

একাংশে একখানি সাইনবোর্ড সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানিতে বড় বড় হরফে লেখা আছে :—

"লেডি আর্টিষ্ট ও লেডি পামিষ্ট।

একই সঙ্গে ভাগ্য গণনা এবং ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট, পেন্টিং, একটাকায় আটখানি ফটো, অয়েল পেন্টিং। সুলভে সত্বর কার্য্য সম্পন্ন হয়।"

পার্শ্বের ফ্ল্যাটে ইহার অপেক্ষা একখানি ছোট সাইনবোর্ড। তাহাতে লেখা :—

"লেডি ডাক্তার ও মিডওয়াইফ, দিবারাত্র পাওয়া যায়।"

একদিন সকালে লেডি আর্টিষ্টের ফ্ল্যাটের শয়নকক্ষে সদ্যো-নিদ্রোত্থিতা একটি নারী আলস্য ত্যাগ করিয়া খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেলা কটা ?"

চায়ের কাপ হইতে উষ্ণ বাষ্প কুণ্ডলীর আকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিল, কাপের গাত্র বহিয়া ধারার আকারে কিছু উষ্ণ চা গড়াইয়া পড়িয়াছিল। খানসামা নিধিরাম স্কন্ধ হইতে তোয়ালেখানা লইয়া কাপটি মুছিতে মুছিতে বলিল, "সাড়ে নটা, মা।"

মনিব কাপটি টিপয় হইতে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু ?"

খানসামা বলিল, "বাজারে গেছে।" যেরূপ অবজ্ঞাভরে খানসামা কথাটা বলিল, মনিব যে কে এবাড়ীর, তাহা উহা হইতে বুঝিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয় না।

মনিব বলিলেন, "হুঁ।" তাহার পর চায়ের কাপে দুই এক চুমুক দিয়া একখানা ক্রীমক্র্যাকারে কামড় দিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং মশারির বাহিরে চরণকমল দুখানি বাড়াইয়া দিলেন, খানসামা নিধিরাম স্লিপারযুগল সযত্নে ঝাড়িয়া মুছিয়া পরাইয়া দিল।

মনিব হুকুম করিলেন, টেব্‌ল্ হইতে পত্রধারটী টিপয়ের উপর রাখিয়া দিতে। তাহার পর পত্রের মোড়ক খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "বাথরুমে সব ঠিক ক'রে রেখেছো ? টুথ-ব্রাসটা পালটানো হয়েছে বোধ হয় ?"

নিধিরামের প্রাণ উড়িয়া গেল। কর্ত্তব্যে ত্রুটি তাহার হুজুর মেহেরবানের দরবারে কি ভাবে গৃহীত হয়, তাহা সে বিলক্ষণ জানিত। যিনি বাড়ীর 'বাবু' নামে অভিহিত এবং যিনি চিত্র অঙ্কন অথবা ফটো চিত্রাদি প্রস্তুত করেন, তাঁহাকেও সামান্য ত্রুটির জন্য কিরূপ ধমক খাইতে হয়, সে অভিজ্ঞতাও তাহার আছে। টুথব্রাস পালটাইতে সে সত্যই বিস্মৃত হইয়াছিল। কিন্তু এ বাড়ীর ধারা অনুসারে মুহূর্ত্তে টাল সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "আজ্ঞে লেক রোডের বাজারে মিস্‌লো না মা,—সব দিশী। ওবেলা কোলকাতা হতে এনে রাখবো'খন।"

এমন মিথ্যা তাহাকে দিনে বহুবার বানাইতে হইত, নতুবা এবাড়ীতে চাকুরী রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। জবাবটা দিয়াই হুজুর মেহেরবানকে প্রশ্নান্তরের অবসর না দিয়াই নিধিরাম মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল,—যেন হুজুরের গোসলখানার যোগাড় করিবার জন্য সে অতিমাত্র উদ্‌গ্রীব।

তাহার মনিব তখন উঠিয়া হেলিয়া দুলিয়া অগ্রসর হইয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে উপবেশ-নান্তে পত্রপাঠে মনোনিবেশ করিলেন। প্রসাধনের পর সুবেশা সুসজ্জিতা নারীর এবং সদ্যোনিদ্রোত্থিতা বিস্রস্তবসনা বিস্রস্ত-কেশা নারীর সৌন্দর্য্যের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। রাশবিহারী এভেনিউয়ের লেডি আর্টিষ্ট ও পামিষ্ট মিস কল্পনাদেবী যখন সাজিয়া গুজিয়া মক্কেল ধরিতে বাহির হন অথবা ঘরে বসিয়া কোষ্ঠি ঠিকুজী গণনা করেন, তখন তাঁহার যে রূপ দেখা যায়, এখন তাহার শতাংশের একাংশও দেখা যাইতেছিল না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাজিয়া গুজিয়া থাকিলে তাঁহাকে সুন্দরী তরুণী বলিয়া নিশ্চিত ধারণা হইলেও এখন তাঁহাকে অন্ততঃ পঞ্চবিংশতি বৎসরের নিম্নবয়স্কা নহে বলিয়া মনে হইতেছিল।

চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা দেবী পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। পত্র আসিতেছে তাঁহারই প্রাণের বন্ধু লেডিডক্টর ও মিডওয়াইফ মিস বাণীদেবীর নিকট হইতে। ঠিকানা, কল্যাণপুর পোষ্ট, কল্যাণপুর গ্রাম, জমিদার ভবন। জেলা নদীয়া। পত্রখানি এই :— ০ ০ ০

"ভাই কল্পনা দিদি,

তোকে দিদি বলি আদর করে, যদিও তুই ঢের ছোট আমার চেয়ে বয়সে। এক বোঁটায় দুটি ফুল, দুটী বোনে আমরা একই বাসার শিকারী বাজ, দেহ দুটি-হলেও প্রাণ ত একটা আমাদের।

কলকাতার মানুষগুলো কি চালাক হয়ে উঠছে ক্রমে! জালে পড়তেই চায় না যেন! কিন্তু ভাই নদে জেলা বেঁচে থাকুক, আর নদে জেলাই বা কেন, কলকাতার বাইরে বাঙলার যেখানেই যাও, শিকার কিলবিল করচে, এসে জাল ফেল্‌লেই হোলো।

ঠাট্টা না, সত্যিই ভাই এখান থেকে আধ ক্রোশ দূরে প্রসাদপুরে একটা ডেলিভারীর শক্ত কেশে কল পেয়ে এসে দেখি, জাল যদি ফেলতে হয় শিকারের জন্যে, তবে এখনও এই সব আনকোরা নতুন নদনদীর জলে।

এখান থেকেই কল্যাণপুরের জমিদারের বাড়ীর কল পেয়েছি ভাই। জমিদার বলতে একটা একরত্তি মেয়ে; মাথার উপর কেউ নেই। নামে এক অভিভাবক মামা আছে, তারই কলেরায় নার্স করতে এসেছি, দিন দশ টাকা করে নিচ্ছি, তা ছাড়া খাওয়া পরা। ওঃ ভাই অনেক টাকা এদেব। মেয়েটাকে তোর মনে আছে কি? নীহার বলে একটা মেয়ে পড়তো আমাদের তিন চার ক্লাস নীচে—তারই সঙ্গে ম্যাট্রিক ক্লাসে, না কোন ক্লাসে এসে ঐ মেয়েটা জয়েন করেছিল—ওর নাম দীপ্তি। ভেবেছিলুম, কেউ নেই, বেশ করে কাঁধের উপর ভর করে বোসবো। ও বাবা—একবারে কোঁস কেউটে! তেজে মট্‌মট্ করছে, কাউকে কাছে ঘেঁসতে দেয় না। আমায় যেমন ভাড়া করে এনেছে, ঠিক তেমনি ভাড়াটে নার্সের মতই দেখে। কিন্তু আমার নামও বাণী! শেষ পর্য্যন্ত বাইতে ছাড়বো না। কলকাতায় চলুক না একবার—সেখেনই বারো মাস থাকে, এখানে দুদিন বেড়াতে এসেছে।

তবে কখনও কখনও মেজাজ ভাল থাকলে বেশ প্রাণ খুলে কথা কয়। একদিন রাত্তে রোগী ঘুমুলে পাশের ঘরে আমরা ব'সে ছিলুম। আমি তাকে প্রফুল্ল দেখে কলেজের কথা পেড়েছিলুম এবং তার ভর্ত্তি হবার আগে একবার এক-জামিনের পর আমাদের কাসিয়ংয়ে এক্সকার্সানের কথা তুলে নীহারের বাড়ী ফিরবার জন্তে কান্নাকাটিতে কি রকম হাসি পড়ে গিয়েছিল মেয়ে মহলে, তাই বলে বেশ করে আসর জমালুম। তাই শুনে দীপ্তিও হেসে খুন! তারপর বেশ সহজ-ভাবে হাসতে হাসতে তার দশ বছর পরে পাড়াগাঁ দেখার গল্প করতে লাগ্‌লো। বল্‌লে, দশ বছর আগে যে মান্ধাতার যুগের পাড়াগাঁ দেখে গেছে, এবার এসেও তাই দেখছে। সেই হাতাবেড়ী ছেলেপুলে ঘরসংসার, সেই চাষাভূষোর সঙ্গে মেশামিশি, সেই খোলকত্তালের কেত্তোন, মনসার ভাসান, সেই গানের আড্ডা তাস পাশার আড্ডা; আর পরের ঘোঁট-মঙ্গল, ধোপানাপিত বন্ধ,—কিছু বদলায়নি, যেমন গোরুর গাড়ীর যুগ তেমনিই আছে। নীহারটা নাকি একেবারে গোল্লায় গেছে। ওর এক জ্ঞাতি ভায়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। তা, নীহারটা নাকি একেবারে তার পোষা কুকুরটি ব'নে গিয়েছে, তু বলে ডাকলেই ছুটে যায়! আর পাড়াগাঁর স্বামীগুলোও নাকি তাই, এক একটি নিরেট গাধা।

হাঁ ভাই, দীপ্তি যাই বলুক, পুরুষ জাতটা গাধা থাকাই ভাল নয়? আমাদের মত দু চারটে লেডি আর্টিষ্টের হাতে পড়লে অমন কত গাধা দুদিনে ঘোড়া ব'নে যায়! কিন্তু গাধা পিটে ঘোড়া তৈরী করা ভাল, না গাধাকে গাধা রাখাই ভাল? আমাদের মানুষটি যদি গাধাই না থেকে যেতো, তা হলে কি আমরা এই বাজারে ক'রে খেতে পারতুম?

যাক্, দীপ্তিটা শিকারের মত শিকার হলেও সহজে বাগ্ মানবে না বলেই মনে হয়। ওর কেমন একটা ঝাঁঝ আছে, যার কাছে এগুতে ভরসা হয় না। কিন্তু নির্ভরসা হোস্‌নি ভাই, মস্ত শিকারের সন্ধান পেয়েছি পাশের ঐ প্রসাদপুর গাঁয়ে। আনকোরা ডাক্তারী পাশ ক'রে বেরিয়েছে, এখনও বেঙ্গির গন্ধ গায়ে আছে। বাপের কিছু রেস্তো আছে। ফুসলে ফাসলে নামাতে পারলে কিছু কামিয়ে নিতে পারা যেতে পারে। ছোকরা ডাক্তারটাই দীপ্তির মামাকে নার্সিং করবার জন্যে আমায় ঠিক করেছিল প্রসাদপুরে। তার পর নিজেও রুগীকে দেখতে এসেছিলো দুদিন, সদরের ডাক্তার এসে ওরই সাহায্য নিয়েছিলো চিকিৎসা করতে। নাম হিমাংশু, দেখতে শুনতে বেশ, তবে বড় লাজুক, আমাদের দেখলেই জড়সড় হয়ে পড়ে।

এখন তোমায় একটু কাজ এগিয়ে রাখতে হবে, ভাই। আমার এখনও ফিরতে দু পাঁচ দিন দেরী হবে, আশ-পাশের গাঁয়ে খুবই কলেরার মরশুম দেখা দিয়েছে। যদিও পাড়াগাঁ, তাহলে এখানেও লেডী ডাক্তার ও নার্সের দরকার

হচ্ছে, ছোটখাটো জমিদার আছে অনেকগুলো। আমি চার ফেলেছি ছোকরা ডাক্তারের কাছে, সেও ঠোকরাচ্ছে যেন বলে মনে হচ্ছে। শুনছি, শিগগিরই কলকাতায় যাবে ডিস্‌পেনসারী খোলবার যোগাড়যন্তোর করতে। ওদের ভবানীপুরে বলরাম বোস ঘাট ষ্ট্রীটে বাড়ী আছে। এরই মধ্যে শশাঙ্ককে পাঠিয়ো সেখানে মাঝে মাঝে সন্ধান নিতে, যেন এজেন্ট সেজে বড় বড় ড্রাগিষ্টদের কাছ থেকে ধারে মাল-যোগান দেবার লোভ দেখায়। ঐ সূত্রে তোমার সঙ্গেও যেন আলাপ করিয়ে দেয়। তোমার পক্ষ থেকে কি ভাবে হুইলের টান মারতে হবে এবং কি ভাবে মাছটিকে ডেঙ্গায় তুলতে হবে, তা বোধ হয় আমার বলে দেবার দরকার হবে না।

বড্ডো বড় হোলো চিঠিখানা, কিন্তু উপায় নেই, বিজনেস্ ইজ্ বিজনেস! ইতি তোমারই বাণী দিদি।

চা পান ও পত্রপাঠ সাঙ্গ হইলে, কল্পনাদেবী একটি সিগারেট ধরাইয়া বাথরুমে চলিয়া গেলেন এবং প্রায় এক ঘণ্টা পরে বেশ পরিবর্ত্তন ও কেশ প্রসাধনান্তে বসিবার ঘরে আসিয়া সংবাদপত্র লইয়া বসিলেন। একবার খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও ক্লায়েন্ট্ আসিয়া খবর রাখিয়া গিয়াছে কি না। উত্তরে 'না' শুনিয়া অপ্রসন্নমুখে বলিলেন, "বাবু এসেছে বাজার ক'রে?"

খানসামা বলিল, "হাঁ মা, অনেকক্ষণ এসেছে, বাটনা বেটে উনুন ধরিয়ে নিচ্ছে।"

কল্পনা বলিলেন, "বেশ। ওকে ডেকে দে, দরকার আছে। তুই উনুন ধরিয়ে ভাতটা চাপিয়ে দে—

"আজ্ঞে, মাছ কুটতে বাকী রয়েছে মা"—

"থাক্! তুই ওসব করেনে এ বেলা। ওকে ডেকে দে।"

নিধিরামের আর বাক্যস্ফূট করিতে সাহস হইল না। মনে মনে গজ গজ করিতে করিতে সে চলিয়া গেল। এ বাড়ীর আর সব ভাল, 'বাবুর' ঘাড়ের উপর বেশীর ভাগ কাজ চাপাইয়া দিয়া আড্ডা মারা আর গুড়ুক ফোঁকা ছাড়া বকসিসটা-আসটা হাতানই ছিল তাহার প্রধান কাজ। ইহাতে পান হইতে চুণ খসিলেই ছিল মহা অসন্তোষ!

এ বাড়ীর 'বাবু' বলিতে কি বস্তু বুঝায়, তাহা হয়ত অনুমান করা কষ্ট সাধ্য হইবে না। মনিব যখন মিস, তখন "বাবু" তাহার বিবাহিত স্বামী বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না নিশ্চিতই। বস্তুতঃ তাঁহাকে সকলে মনিবের 'কারবারী ভ্রাতা' বলিয়াই জানিত। যাহা হউক, এই 'বাবু' নামধেয় জীবটি যেরূপ কাঁচুমাচু মুখে আসিয়া মনিবের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তাহাতে মনে হওয়া অসঙ্গত বা আশ্চর্য্য নহে যে, তিনি সদ্য মানুষ খুন করিয়া অথবা ঐরূপ কোন একটা মস্ত বড় অপরাধ করিয়া জজ সাহেবের দায়রায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! ন হাতি কাপড়, গায়ে হাত-কাটা ফতুয়া, পায়ে ছেঁড়া চটি। অথচ দিব্য ফুট ফুটে সুন্দর তরুণবয়স্ক যুবক, বয়স ২২।২৩ বৎসরের অধিক হইবে না।

"ডেকেছো আমায়?"

মনিব বলিলেন, "হাঁ ডেকেছি। যাও দিকি দৌড়ে একবার শশাঙ্ককে ডেকে নিয়ে এসো, বিশেষ দরকার আছে।"

মন্মথনাথ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "এখনই?"

কল্পনা দেবী ঈষৎরুষ্ট স্বরে বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, এখনই—এই যে পাঁচবার বললুম, শুনতে-পেলে না? যাও।"

মন্মথনাথ শুষ্কমুখে ব্যথিত হৃদয়ে কাছে আসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আজকাল এমন কড়া মেজাজ হয়েছে কেন বল দিকি? শশাঙ্ক না হলে কি কাজ চলে না—কেন আমি কি কেউ নই?" কথাটা বলিয়া তিনি আদর করিয়া কল্পনাদেবীর একখানি হস্ত ধারণ করিলেন।

কল্পনা দেবী মুহূর্ত্তকাল বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ওঃ কপোত কপোতী যথা? দেখো, ওসব ছেলেমানুষি যদ্দিন ভাল লেগেছিলো তদ্দিন করা গেছে, এখন বড় শক্ত কাল পড়েছে,—এখন চাই টাকা। টাকা-না হলে এক পা চলবার যো নেই, তাই শশাঙ্ককে দরকার হয়েছে। শশাঙ্কর উপরে হিংসে করলে চলবে কেন?"

অনুযোগের সুরে মন্মথনাথ বলিলেন, "হিংসে কিসের? বাইরে আমাদের যে সম্পর্কই লোকে জানুক, বাণী যখন তোমাদের যৌথ কারবারে এনে আমায় ঢুকিয়েছিলো, তখন থেকে আমি কি তোমাদের শিকার জুটিয়ে আনছিনি?

পুরুতে মন্তর পড়ে আমাদের বিয়ে না হোক, তোমায় আমায় স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ অস্বীকার করতে পারো কি ?"

কল্পনাদেবী রুষ্টস্বরে বলিলেন, "কিসের সম্বন্ধ ? এ তো লেনদেনের কারবার। তুমি যা আগে করেছো করেছো, তার দামও আদায় করতে কসুর করনি। এখন মন্দার বাজার—ব'সে ব'সে ভাত মারছো—একটি কাজও জোটাতে পার না, আবার মুখ নেড়ে কথা কইছো ? যাও, যাও, শশাঙ্ককে ডেকে আনো গিয়ে। যাও দাঁড়িয়ে রইলে যে "

মন্মথ নাথের মুখখানা আঁধার হইয়া গেল, তিনিও এবার ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিলেন, "বটে কমলা লেবুর রস চুষে নিয়ে ছিবড়ে ফেলে দিচ্ছো বটে। জানো, ইচ্ছে করলে আমি তোমাদের এই বাবুইয়ের বাসা ভেঙ্গে দিতে পারি ? আমি—'

কল্পনা দেবীর নয়ন মুহূর্ত্তকালের জন্য জ্বলিয়া উঠিল ; কিন্তু মুহূর্ত্তপরেই তিনি মুখেচোখে ভুবনভুলানো হাসির রেখা টানিয়া আনিয়া আধ আধ স্বরে বলিলেন, "তামাসা বোঝো না, ভিয়ারি ! তুমিইত আমার সব, শশাঙ্ক কে ? শিকার যা ধরে আনো, তারাই বা আমাদের কে ? টাকা আর ভালবাসা শাকের কড়ি মাছে মেশাও কেন ছিঃ।"

মন্মথনাথ গলিয়া গেলেন, দ্বিগুণ উৎসাহে শশাঙ্ককে ডাকিতে ছুটিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

মুক্তি-মিলন

শ্রীশ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায়

নাইবা হ'ল দেহের পরশ
যা পেয়েছি সেই ত ভাল ;
মনের পরশটুকুই আমার
জীবন-পথের স্মৃতির আলো।
আজকে যেথায় চলার শেষে
গেলাম ধূলায় চিহ্ন রেখে—
কালকে আমার হ'বে আবার
যাত্রা সুরু সেখান থেকে ;
আবার যদি আঁখির পাতায়
কালো আঁধার আসেই নেমে,
যত্নে বাঁধা বীণাটি মোর
নেহাৎ যদি যাবেই থেমে,
সুর-হারা সে হবে না-কো
মর্ম্মে গাঁথা রবেই রবে—
আসা-যাওয়ার মাঝেই আমার
মুক্তি-মিলন হবেই হবে।

‘শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন’ পুঁথির লিপিকাল

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত এম্-এ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ১৩২৩ সালে অনন্ত-নামা বড়-চণ্ডীদাসের যে গ্রন্থখানি উহাব আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত বসন্ত-রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, অদ্যাবধি উহার দ্বিতীয় পুঁথি আবিষ্কৃত হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় বড়ু-চণ্ডীদাসের গোটা-কয়েক পদ মাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাপ্ত পুঁথির মর্য্যাদা হানি হয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পুঁথি আবিষ্কৃত না হউক ১৯।২০ বৎসর পরে এই গ্রন্থখানিব দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ইহাতে প্রথম সংস্করণের যাবতীয় বস্তুই আছে, উপরন্তু ‘দ্বিতীয়বারের সম্পাদকীয় বক্তব্য’—নামে আটখানি পৃষ্ঠা, এবং পুঁথির সহিত প্রাপ্ত ‘গাঁথাঘরের বিজক,’ ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত ‘হরিবংশে’র একখানি পৃষ্ঠা ও ১১০০ খৃষ্টাব্দে লিখিত ‘মহাভারত আদিপর্ব্বে’র একখানি পৃষ্ঠা, এই তিনের চিত্র নূতন সংযোগ করা হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণে সম্পাদক মহাশয় নিজের কি একটা ‘বিশ্বাসে’ এ গ্রন্থেব নামকরণ করিয়াছিলেন ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।’ ১৩৪১ সালের ‘বিচিত্রা’-য় ‘কৃষ্ণকীর্ত্তন’ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে আমাকে বলিতে হইয়াছিল, এই ‘বিশ্বাস’ নেহাৎ ভিত্তিহীন। অবশ্য এ ভরসা আমার কিছুমাত্র ছিল না যে, তজ্জন্য দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানির নূতন একটা নাম রাখা হইবে। হয়ও নাই। কিন্তু পুঁথির সহিত প্রাপ্ত কাগজখানিতে (গাঁথাঘরের বীজকে) পাইতেছি “শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্বের ৯৫ পচানই পত্র হইতে এক সত দস পত্র পর্য্যন্ত একুনে ১৬ শোল পত্র” শ্রীকৃষ্ণপঞ্চানন নামক এক ব্যক্তি (বিষ্ণুপুরেব) শ্রীশ্রীমহারাজ হজুরের (জন্য) লইয়া গেলেন, পুনশ্চ আনিয়া দিবেন। ইহার তলে লেখা, শ্রীকৃষ্ণপঞ্চানন (কর্ত্তৃক) কৃষ্ণসন্দর্ব্বে (র্ভে)ব এই ১৬ পত্র দাখিল হইল। এতদ্ব্যতীত গ্রহণ ও প্রত্যর্পণ উভয়েরই তারিখ কাগজখণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু প্রাপ্ত পুঁথিতে এই ষোড়শ পত্রের মধ্যে ৯৮।১ পৃষ্ঠা ও ১০৪ হইতে ১১১ পত্র পর্য্যন্ত নাই। ইহার কারণ অনুমান করা অতীব সহজ; ৯৮ সংখ্যক পত্রের ভাঁজ ছিড়িয়া প্রথম পৃষ্ঠাখানি কোথায় হাবাইয়া গিয়াছে, এবং ১০৪ হইতে ১১১ পত্র পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার কেহ লইয়া গিয়া আর ফেরত দেন নাই, অথবা অন্য কোনও কাবণে পুঁথি-চ্যুত হইয়া গিয়াছে। প্রথম সংস্কবণের ‘সম্পাদকীয় বক্তব্যে’ বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিয়াছিলেন, “পুঁথির সহিত প্রাপ্ত একখণ্ড কাগজের লেখা দেখিয়া অনুমান হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণলীলাত্মক কীর্ত্তনের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বে বিষ্ণুপুব বাজের পুঁথিশালায় সযত্নে রক্ষিত হইত।” তাহা হইলে, প্রথমবারে তাঁহার নিজেরও বিলক্ষণ জানা ছিল যে, প্রাপ্ত পুঁথির মধ্যে রক্ষিত কাগজখণ্ড পুঁথিরই সম্পর্কীয়। অর্থাৎ ‘এই শ্রীকৃষ্ণলীলাত্মক অপূর্ব্ব গ্রন্থখানির’ নাম ‘শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ’, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন’ নয়। এই কাগজ-খণ্ডের মূল্য স্মরণ করিয়াই নিশ্চয় দ্বিতীয় সংস্করণে উহার প্রতিকৃতি ছাপিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিকৃতি ও গ্রন্থের কল্পিত ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন’ নাম একসঙ্গে চলেনা। অতএব প্রতিকৃতি ছাপিয়াও, কল্পিত নামের মোহে পড়িয়া সম্পাদক মহাশয়কে দ্বিতীয় সংস্করণে একটি কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে, “কোন প্রকাবে উহা (ঐ কাগজ-খণ্ড) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথির সহিত জড়াইয়া গিয়া থাকিবে।” অর্থাৎ কাগজ-খণ্ডের মূল্য যাক্, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন’ নামটি থাকুক্!! সম্পাদক মহাশয়ের আশঙ্কাটা বুঝিতে পাবিতেছি, এইরূপ একখানি সরস ও উপাদেয় কাব্যের সম্পাদনা করিতে গিয়া ‘শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ’ জাতীয় একটা গদ্যাত্মক নাম দিয়া ছাপিলে, অ-কবি বলিয়া হয়ত দেশময় তাঁহারই একটা অখ্যাতি রটিয়া যাইবে। কিন্তু জয়দেবের ন্যায় ব্যক্তিও তাঁহাব ‘গীতগোবিন্দে’র মুখবন্ধে ‘প্রবন্ধ’ শব্দ ব্যবহার

করিয়া * আজিও কবি হিসাবে জীবিত আছেন। সম্পাদক মহাশয়ের ভয় কেন ?

কিন্তু যাক্, গ্রন্থের নাম যদিও বা একটা তুচ্ছ ব্যাপার হইতে পারে, আবিষ্কৃত পুঁথি তুচ্ছ নয়,—গ্রন্থ তুচ্ছ না, গ্রন্থের কবি তুচ্ছ নয়। গ্রন্থ ও কবি সম্বন্ধে নানা দিক ধরিয়া কত আলোচনা, কত গবেষণা, ছোট বড় সভায় সমিতিতে কতনা কোলাহল ও তামাসা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু একটা কথা—ঐ সকলের জন্য পুঁথির লিপিকাল সম্বন্ধে পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'স্থির সিদ্ধান্ত'ই অনেকাংশে দায়ী। যে যে কারণে প্রত্নলিপিতত্ত্বের সাহায্যে পুঁথির লিপি পরীক্ষা করিয়া বয়স নির্দ্ধারণ করিতে হইয়াছিল, পুঁথি অসাধারণ ও অপূর্ব্ব বিবেচিত না হইলে সে সকল কারণ উপস্থিত হয় না, এবং দ্বিতীয় পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়ায় সে সকল কারণ পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান ও বলবৎ থাকার কথা। পুঁথিখানি 'দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষা' করিবার পর অক্ষরগুলির তুলনামূলক বিচারে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-কর্ত্তৃক স্বতন্ত্র যুক্তি দ্বারা সমর্থিতও হইয়াছিল। এতৎসত্ত্বেও দেখিয়াছি, কেহ কেহ এই 'স্থির সিদ্ধান্তে' (প্রত্নলিপির সাহায্য বিনা) অল্পবিস্তর সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব সম্পাদক মহাশয়ের আশা সফল হয় নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সিদ্ধান্ত লোকে নিঃসংশয়ে মানিয়া লইবে, কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রত্নলিপি সম্বন্ধে যুক্তি সর্ব্বদাই অকাট্য ও অখণ্ডনীয়, এবং তাঁহার সিদ্ধান্তও সকলক্ষেত্রেই অভ্রান্ত হইতে বাধ্য। এ বিশ্বাস না থাকিলে প্রাপ্ত পুঁথির ন্যায় 'অসাধারণ' পুঁথির লিপিকাল সম্বন্ধে অন্ততঃ দ্বিতীয় একজন ব্যক্তিরও মতামত গ্রন্থে অবশ্যই সন্নিবিষ্ট থাকিতে দেখিতাম।

কিন্তু যে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অপরের মতামতের প্রতি অনাদর প্রকাশ করা হইয়াছে, সে বিশ্বাসও যে খাঁটি বা অবিমিশ্র তাহা বলা যায় না। বিশ্বাসে কামনার ভেজাল আছে। সম্পাদক মহাশয়ের যে "কামনা জুটিয়া যুক্তির পথ রোধ করিয়াছে" শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই অপ্রিয় উক্তিতে কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু কথাটা অসত্য বলিয়া কেহই প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থির সিদ্ধান্ত, পুঁথিখানি সম্ভবতঃ ১৪ শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত; সম্পাদক মহাশয়ের কামনা না জুটিলে, যিনি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির এবং বিদ্যাপতি ও (চৈতন্যদেবের সমসাময়িক) অদ্বৈতাচার্য্যের মিলনে বিশ্বাস করেন, তিনিই আবার এত সহজে ১৪ শ শতকের প্রথমার্দ্ধে চণ্ডীদাসের কাল নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন কি ?

কামনায় সম্পাদক মহাশয় ভীত হইয়াছিলেন, পাছে মতদ্বৈধতা তাঁহার কামনা ও বিশ্বাস উভয়ের প্রতি উৎপাৎ করে। "চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমার্দ্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন"—এই ভাষার প্রয়োগে সম্পাদক মহাশয়, বোধ করি, মনে করিয়াছিলেন, ইহাতে উভয় দিকই রক্ষা পাইবে। এই ভাষাকে টানাটানি করিলে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্ত-পুঁথি সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তের সহিতও উহার যেমন সমন্বয় সাধন করা যায়, একদা বটবৃক্ষতলে যে বিদ্যাপতির মুখে সুমধুর গীতালাপ শ্রবণ করিয়া (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কোনও সময়ে) অদ্বৈতাচার্য্য মোহিত হইয়াছিলেন বলিয়া কাহিনী আছে, সেই বিদ্যাপতির সহিত 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'-রচয়িতা চণ্ডীদাসের সমসাময়িকতায়ও উহাতে বাধা পড়ে না !! সময়ে সময়ে আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যাই যে, ইতিহাস রস-শাস্ত্র নহে।

কিন্তু সুখের বিষয়, সম্পাদক মহাশয় 'দ্বিতীয় বারের বক্তব্যে' মত প্রকাশ করিয়াছেন, "এখন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিখানা খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকের শেষের দিকে লিপীকৃত হইয়া থাকিবে বলিলে বিশেষ অন্যায় হইবে না।" পুঁথির সহিত বড়ু চণ্ডীদাসও যদি ১৪শ শতকের শেষের দিকে আসেন, তবে তাঁহার সহিত বিদ্যাপতির মিলনের পথটা অনেকটা পরিষ্কার হইতেও পারে।

যাহা হউক, কতকগুলি কারণের সমাবেশ ঘটায় বঙ্গভাষায়, বঙ্গাক্ষরে এবং কাগজে লিখিত প্রাপ্ত-পুঁথিখানির

* শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথা সমেতমেতং
করোতি জয়দেব কবিঃ প্রবন্ধং ।

কাল-নির্ণয়ে প্রত্নলিপি-তত্ত্বের সাহায্য লইতে হইয়াছে। মধ্য এসিয়ায় আবিষ্কৃত বহু তালপত্রে লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের কাল-নির্ণয়ের জন্যও প্রত্নলিপি-তত্ত্ব ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব মনে করি যেন, বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত পুঁথিখানির মূল্য ও গুরুত্ব মধ্য-এসিয়ায় আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির মূল্য ও গুরুত্বের প্রায় সমান। কিন্তু প্রত্নলিপি-তত্ত্বটা কি? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখায় পাই, ইহা এমন এক তত্ত্ব যাহাতে "আধুনিক লিপি অথবা প্রাচীন লিপির অনুকরণের প্রয়োজন নাই।" হঠাৎ পড়িয়া মনে হইয়াছিল বুঝি, "যে পুঁথিতে আধুনিক লিপি ও প্রাচীন লিপির অনুকরণ আছে, তাহার জন্য প্রত্নলিপি-তত্ত্বের প্রয়োজন নাই,"—পাণ্ডুলিপির এই জাতীয় কোনও বাক্য ছাপাখানার কল্যাণে উপরোক্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পরে এই ধারণা ধূলিসাৎ হইয়া গেলেও, মনে করিতে পারি নাই, ইহাই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্তরের কথা ছিল, বা হইতে পারে। কারণ, পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীচন্দ্র-দেবের রামপাল-তাম্রশাসন সম্পর্কে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই নিজে লিখিয়াছিলেন, অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণানুসারে উহা ভোজবর্ম্মার বেলাব-তাম্রশাসন অপেক্ষা প্রাচীন, যেহেতু ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনের তিন-চারিটি অক্ষর অপরখানিতে ব্যবহৃত ঐ ঐ অক্ষর অপেক্ষা আধুনিক। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' সম্বন্ধে কেন এই সহজ যুক্তির বিপর্য্যয় ঘটিল, তাহার কারণ তাঁহার প্রবন্ধের প্রারম্ভেই ব্যক্ত আছে, "শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পুঁথিখানি যেদিন সাহিত্য-পরিষদে প্রথম লইয়া আসেন, সেই দিন আমার ধারণা হইয়াছিল যে, উহা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত অদ্যাবধি আবিষ্কৃত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন।" অকালোৎপন্ন ধারণা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত ও বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনার পুরোহিতকেও কিরূপ উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রাপ্ত পুঁথিতে এক বা একাধিক ব্যক্তির যে তিন প্রকারের হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া মত-প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা : ১। প্রাচীন হস্তাক্ষর; ২। প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি, এবং ৩। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর। ব্যক্তি যদি 'এক' হয়, বা হইবার বাস্তবিকই সম্ভাবনা থাকে, তবে 'প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি' এই বাক্যাংশ অর্থহীন ও বাহুল্য হইয়া পড়ে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘকাল ধরিয়া তর্ক করিয়াছিলেন, ফরিদপুর হইতে আবিষ্কৃত ধর্ম্মাদিত্য গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের তাম্রশাসন-চতুষ্টয় জাল, কারণ ঐ গুলিতে অক্ষরের প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত নবীন রূপের সমাবেশ আছে। এই নীতি অনুসারে "দীর্ঘকাল ধরিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পুঁথিখানি পরীক্ষার" পর, উহা খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল এই স্থির সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তে, তাঁহার ঘোষণা করা উচিৎ ছিল যে, "শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় 'কৃষ্ণকীর্ত্তনের' যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন," তাহা "জাল"। বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বোধ করি এসকল ঘটনার সবিশেষ কোনও সংবাদ রাখিতেন না, রাখিলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ভরসা করিয়া পুঁথিখানি পরীক্ষিত হইবার জন্য ছাড়িয়া দিতেন কিনা সন্দেহ।

পুঁথির লিপি-বিচারের ভার গ্রহণ করিয়াও, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহার ভিন্ন ভিন্ন হস্তাক্ষর 'বিশেষভাবে' আলোচনা করার ভার ও দায়িত্ব সম্পাদক মহাশয়ের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছিলেন। অগত্যা তাঁহাকে 'সম্পাদকীয় মন্তব্যে' পুঁথি সম্বন্ধে কয়েকটি 'বিশেষ কথা' বলিতে হইয়াছে। তাহাতে পাই, পুঁথি খণ্ডিত হইলেও দুইশতাধিক পত্র এখনও বর্ত্তমান, এবং দু-ভাঁজ করা কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লেখা। ইহার পরেই পাইতেছি, "পুঁথিতে দুই হাতের লেখা বেশ সুস্পষ্ট; ১৭৬।১, ২০৪—২০৭।১, ২১২, ২১৭।২—২২২।১ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় হাতের এবং ৬০, ১১৫ সংখ্যক পাতা তৃতীয় হাতের লেখা ও পরবর্ত্তী যোজনা বোধ হয়।" এই উক্তি সাঙ্ঘাতিক। এবং কত সাঙ্ঘাতিক তাহা সম্পাদক মহাশয় কল্পনাও করিতে পারেন নাই। দু-ভাঁজ-করা কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় যখন লেখা তখন অন্ততঃ ১৭৬, ২০৭, ২১৭ ও ২২২ সংখ্যক পত্রগুলির এক পৃষ্ঠায় তথা-কথিত প্রাচীন অক্ষর, এবং অপর পৃষ্ঠায় তথাকথিত নবীন হস্তাক্ষর আছে। প্রাপ্ত 'অসাধারণ ও অভিনব' পুঁথিটির লিপিকাল সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র আলোচনা না করিয়া, এই স্থানে, এই মুহূর্ত্তে, বলিয়া দিতে পারি, তথা-কথিত নবীন হস্তাক্ষরের যে বয়স, সমগ্র পুঁথিখানিরও

সেই বয়স, কারণ এই দ্বিবিধ হস্তাক্ষর তুই বিভিন্ন লিপিকরের বলিয়া অনুমান করিলেও, দুই ব্যক্তিই যে একই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, একথা স্বীকার করিতে প্রত্যেকে বাধ্য,—যেহেতু একই পুঁথির একই পত্রের উভয় পৃষ্ঠায় যে তুই বিভিন্ন ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন তাঁহারা কখনই বিভিন্ন যুগে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন না।

এবার আলোচনা করি। অ-নু-ক-র-ণ। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে যে সকল কারণে 'অনুকরণ' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল, তাহা অন্তবিধ। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ও বলেন, "তৃতীয় হাতের লেখা প্রথম হাতের এতটা অনুকরণ যে, বিশেষভাবে পরীক্ষা ব্যতীত ধরা পড়ে না।" ইহা তো সামান্য কথা। আমি বলি, যতগুলি পৃষ্ঠা, ততজন লিপিকর, এবং প্রত্যেক হাতের লেখা অপরগুলির এতটা অনুকরণ যে 'তদপেক্ষা আরও বিশেষভাবে' পরীক্ষা না করিলে তাহা কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। অসম্ভব কিসে?

প্রাপ্ত পুঁথির তুই শতাধিক পত্র হইতে ৪১টি লাইনের ছবি (অনুকৃতি, facsimile) গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে, তাহাও আবার কেবল একখানি পত্রেরই সমগ্রটা (৩।১-২), ও পার পৃষ্ঠা-বিশেষ হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতিপয় লাইনের। কে জানে এই বাছাবাছির উদ্দেশ্য কি? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অক্ষরগুলির ব্যাখ্যায় উদাহরণ স্বরূপে যে যে পৃষ্ঠা হইতে যে যে অক্ষরের উল্লেখ করিয়াছেন, সমগ্র পৃষ্ঠার যখন ছবি দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই, তখন সেই সেই অক্ষরগুলির ছবি দিলেই তো যথেষ্ট হইত। নির্ব্বাচিত লাইনগুলি দেখিয়া কাহার কি লাভ? কতকগুলি সমগ্র পৃষ্ঠার অনুকৃতি পাইলে এই সুবিধা হয় যে, একই অক্ষরের বিভিন্নরূপ, অর্থাৎ তথা-কথিত প্রাচীন এবং নবীন রূপ, ঐ পৃষ্ঠায়, তথা পুঁথিতে, আছে কিনা তাহা ধরা পড়ে, বা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। লাইন নির্ব্বাচন দ্বারা জনসাধারণকে এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইল কেন? সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য, যে যে পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় হস্তাক্ষর আছে বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, সেই সকলের ভিতরেও কোনও একখানি সমগ্র পৃষ্ঠার অনুকৃতি দেওয়া হয় নাই। অনুকৃতি ছাপিবার হাঙ্গামা করার প্রয়োজনটা কি ছিল? তৃতীয় প্রকারের (অর্থাৎ তথা-কথিত প্রাচীন অক্ষরের অনুকরণের) হস্তাক্ষরের নমুনাস্বরূপ তুইটি লাইনের (৬০।১।৬-৭) ছবি পাইতেছি। অপরাধের মধ্যে এই লাইন তুইটির অক্ষর সমাবেশ একটু ঘন-ঘন, এবং অন্যান্য কোনও কোনও পৃষ্ঠার অক্ষরের তুলনায় (যদি অনুকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া থাকে), এগুলি কিছু ছোট। স্মরণ রাখা উচিৎ, লিপিকরের হস্ত মুদ্রাযন্ত্র নহে, এবং এরূপ ঘন অক্ষর সমাবেশের দৃষ্টান্ত ৫ ও ৭ পত্রের অনুকৃতিতেও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মজা এই, ৬০।১ লাইনের অনুকৃতি হইতে কাগজের ফটোগ্রাফটি (background) মুছিয়া ফেলা হইয়াছে, যেন হঠাৎ দেখিলেই ঐ লাইন তুইটির অক্ষর সমাবেশে এমন একটি নূতন ভাব চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠে, যাহাতে অনুকরণ' শব্দের প্রয়োগের সার্থকতায় কাহারও অবিশ্বাস না জন্মে। আরও সন্দেহ হয়, এই বিশ্বাসকে গাঢ়তর করিবার জন্য, এবং কাগজের ফটোগ্রাফ-বিলোপ যে অনিচ্ছাকৃত, ইহা বুঝাইবার জন্য, ঐ একই পৃষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত বড ও অপেক্ষাকৃত কম ঘন অক্ষরের অপর তুইটি লাইনও ঐ একই ভাবে মুদ্রিত করা হইয়াছে। মনে করা দুরূহ যে, এতগুলি ব্যাপারের সংঘটন বা সম্মিলন আকস্মিক বা অনিচ্ছায় ঘটিয়াছে। যাহা-হউক সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করি, ৬০।১।৬-৭ লাইনের ন্যায় যদি ৬০ এবং ১১৫ পত্রের অপরাপর লাইনগুলির লেখা হয়, তবে তিনি আর একবার ঐ পত্র তুইখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, হঠাৎ দেখিলেই উহাকে যদিও বা অনুকরণ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, বিশেষভাবে দেখিলে সে ভ্রম এককালে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অতঃপর সমস্যা, পুঁথির তথা-কথিত প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর একই ব্যক্তির কি না। ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে তথাকথিত প্রাচীন হস্তাক্ষরে লিখিত পৃষ্ঠায়, বামভাগে কোণ-সংযুক্ত 'থ' (৩।২।১ খোণেকেঁ; ৩।২।২ খণেকেঁ), 'থ' (৩।২।২ মাথাএ), 'ঘ' (১৬০।২।৪ যেহ্ন) ইত্যাদি দেখা যায়। তথা-কথিত পরিবর্ত্তন-যুগের 'অ'-র পরিবর্ত্তে ৩।২ পৃষ্ঠায়ই আধুনিক 'অ' দেখি। এইরূপ কোণ সংযুক্ত অক্ষর এবং আধুনিক আকারের 'অ' ও 'আ' সমগ্র পুঁথিতে আরও অবশ্যই আছে, এবং প্রচুর সংখ্যায় আছে।

অর্থাৎ এ সকল অক্ষরের আধুনিক রূপের সহিত লিপিকর বেশ পরিচিত ছিলেন। যে সকল পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তাক্ষর আছে বলিয়া প্রকাশ, তাহাতে যদি তথা-কথিত প্রাচীন অক্ষরও থাকে, তবে লিপিকর এক হওয়া অসম্ভব বা বিচিত্র নয়। নচেৎ দুই।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধের উপসংহার-ভাগ আগে দেখি। "শূদ্রপদ্ধতি" গ্রন্থ ১৪৪২ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১৩৮৫।৮৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। "বোধিচর্য্যাবতার" ১৪৯২ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১৪৩৬।৩৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। "ধর্ম্মরত্ন" গ্রন্থের শেষ পত্রে ঘটকসিংহ নামক এক ব্যক্তির ১৪১৭ শকাব্দে জাত পুত্রের জন্মপত্রিকা লিখিত আছে, উক্ত গ্রন্থ ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত। ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা "কৃষ্ণকীর্ত্তনের" প্রাচীন অক্ষর সমূহ প্রাচীনতর। কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে সমস্ত প্রাচীন আকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তিন চতুর্থাংশের অধিক অক্ষর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের" যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।" —কিন্তু 'শূদ্রপদ্ধতি' গ্রন্থখানি ১৪৪২ বিক্রমাব্দে লিখিত হয় নাই, হইয়াছিল ১৪৪২ শকাব্দে বা ১৫২০ খৃষ্টাব্দে, এবং একথা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও অতঃপর স্বীকার করিয়াছিলেন (সা-প-প, ১৩২৬, দ্বিতীয় সংখ্যা)। 'ধর্ম্মরত্ন' গ্রন্থখানিতে ঘটকসিংহের ১৪১৭ শকাব্দে জাত পুত্রের জন্মপত্রিকা লিখিত আছে বলিয়াই যে উক্ত গ্রন্থ ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, এ ধারণা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরও কি করিয়া জন্মিল, তাহা আন্দাজ করা শক্ত, কিন্তু এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়েরই মত প্রবলতর ছিল। তাঁহার মতে, "রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেটি নকলের তারিখ ভাবিয়া পুঁথিখানি ১৪১৭ শকে নকল করা হইয়াছে বলিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নয়। সেটি ঘটকসিংহের ছেলের ঠিকুজীর তারিখ। সেকালে পণ্ডিতেরা পুঁথির গায়ে অনেক জিনিবই লিখিয়া রাখিতেন; ঠিকুজিও লিখিতেন; সুতরাং পুথিখানা ঠিকুজির অনেক আগের লেখা। পুথিখানি যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম দেওয়া আছে; নিজের জন্যই তিনি লিখিয়াছিলেন। ঘটকসিংহ তাহার নিকট পুথিখানি পাইয়াছিলেন। সুতরাং পুথিখানি হাত বদল হইবার পর ঠিকুজীটা লেখা হইয়াছিল। সেইজন্য আমরা ইহাকে ইং ১৪ শতকের পুথি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ১৪ শতকের পুথি বড় পাওয়া যায় না।" (সা-প-প, ১৩২৭, প্রথম সংখ্যা)। কিন্তু যে শ্রীনিবাস শর্ম্মা নামক পণ্ডিত পুঁথিখানা লিখিয়াছিলেন, ঠিকুজিও যে তাহারই হস্তাক্ষর একথা অক্ষরগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই, বোধ হয়, কেহই সাহস করিয়া অস্বীকার করিতে পারিবেন না, এবং পুঁথির ল, স, শ, প, ত, ধ, য, ব, জ, প্রভৃতি অক্ষরের সহিত ঠিকুজির এই অক্ষরগুলি তুলনা করিলে সকলেরই উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। শ্রীনিবাস শর্ম্মা খুব সম্ভবতঃ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, এবং এমনও হইতে পারে, যে বৎসরে, যে মাসে বা যে দিনে তিনি পুথিখানি লেখা সমাপ্ত করিয়াছিলেন, সেই বৎসর সেই মাস অথবা সেই দিনেই ঘটকসিংহের জাতপুত্রের জন্ম সময়টা পাইয়া তিনি পুঁথির গায়ে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। বড় জোর, ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের বছর কুড়ি আগে পুঁথিখানির লেখা শেষ হইয়াছিল, কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পুথি দুর্ল্লভ বলিয়া, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে, না হয় নিদান-পক্ষে শেষার্দ্ধে, লিখিত পুঁথিখানিকে ১৪ শতাব্দীতে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা না করিলেও ক্ষতি ছিলনা, কারণ ১৪ শতকেরও পুঁথি শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে গিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয় 'শূদ্রপদ্ধতি'র লিখনাব্দকে যে শকাব্দ বলিয়াছেন, তাহা সম্পাদক মহাশয় তাঁহার 'দ্বিতীয় বারের বক্তব্য' (পৃঃ ১৮৮০) উল্লেখ করিয়া-ছেন, এবং ইহারই উপরে নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন, "যদি শূদ্রপদ্ধতির লিপিকাল শকাব্দই হয়, তাহা হইলেও ১৪৯২ বিক্রম সংবতে অর্থাৎ ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বোধিচর্য্যাবতারে ব্যবহৃত অক্ষরাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অক্ষর প্রাচীনতর বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই।...এখন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানা খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকের শেষের দিকে লিপীকৃত হইয়া থাকিবে বলিলে বিশেষ অন্যায় হইবে না।"

অক্ষর বিচারের জন্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পুঁথিখানি বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 'দীর্ঘকাল' পড়িয়াছিল, একথা সম্পূর্ণ [illegible]ত্য মনে হয়। কিন্তু তিনি যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, [illegible] নিজের কর্ম্মময় জীবনের অনবসরের জন্য, না হয় [illegible]তাদায়, না হয় অন্য কোনও কারণে, তাঁহাকে যে [illegible] শেষ করিয়া দিতে হইয়াছিল, [illegible]ড়িলে বুঝিতে বাকী থাকে না। নতুবা তাঁহার ন্যায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এবং বহুদর্শী ও সাবধানী অক্ষর-তত্ত্ব-কবিদের পক্ষে এত অসঙ্গতি-পূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

"কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে সমস্ত প্রাচীন আকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তিন-চতুর্থাংশের অধিক অক্ষর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই," বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কৃষ্ণকীর্ত্তনের উ, ঊ, খ, ঘ, চ, ছ, জ, ট, থ, ফ, ভ এবং য—অপর পুঁথিত্রয়ে ব্যবহৃত এই অক্ষর-গুলি অপেক্ষা প্রাচীন আকারের। অতএব, তাঁহার মতে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথি ঐ পুঁথিত্রয় অপেক্ষা প্রাচীন। এই যুক্তির সারবত্তা মানিয়া লইলেও 'সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত' হওয়ার কারণ তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই। বরঞ্চ এই যুক্তি অনুসারে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'কে সেনরাজগণের যুগে টানিয়া লইয়া যাওয়া উচিৎ, কারণ এতন্মধ্যে অধিকাংশ অক্ষরের সহিত ঐ যুগের ঐ ঐ অক্ষরের সাদৃশ্য বিদ্যমান বলিয়া প্রকাশ। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বড়ু-চণ্ডীদাস নিজে পালরাজগণের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এবং যেহেতু সম্পাদক মহাশয়ের মতে প্রাপ্ত পুঁথিতে চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা আছে, সেই হেতু বঙ্গভাষার উৎপত্তির সময়টা পাণিনির সমসময় হইতে খোঁজাখুঁজি করিতে হয়।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীকার করেন, 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র প্রাপ্ত পুঁথিতে ব্যবহৃত ই, ঈ, এ, ঐ, ও, ঔ, গ, ঞ, ঠ, ড, ত, ন, শ, ষ, স ও হ—এই ষোড়শ অক্ষর বর্ত্তমান আকারের। 'ই', 'শ' ও 'হ'—যে অবিকল বর্ত্তমান আকারের, ইহা আমি অস্বীকার করি। কিন্তু তাঁহার তর্ক নিরসন করিতে এই অক্ষরগুলির আলোচনার প্রয়োজন নাই। 'ঙ' সম্বন্ধেও তাঁহার সহিত সকলেই একমত হইবেন। 'ঌ' একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নাকি প্রাচীন আকারের। এই প্রাচীন আকারের অক্ষরটি অন্য কোনও প্রাচীন লেখে তিনি দেখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, 'ঙ' ও 'ঌ' এই অক্ষরদ্বয়ও নিরাপদে আলোচনার বহির্ভূত থাকিতে পারে। বাকীগুলি দেখা যাক্।

তাঁহার মতে উ, ঊ, ঋ, (ঌ), খ, ঘ, ট থ, ফ, ভ, য এবং ল—এই অক্ষরগুলির কেবল প্রাচীন আকারই 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে' দেখা যায়। 'ঝ' সম্বন্ধে প্রথমে বলেন (প্রথম সং, পৃঃ ।০), "গ্রন্থে দুই প্রকারের 'ঝ' ব্যবহার হইয়াছে, এই দুই প্রকারই প্রাচীন", ও পরে (পৃঃ ।৴০) বলেন, 'ঝ' "সময়ে সময়ে প্রাচীন আকারের।" 'ব' ও 'ম' সম্বন্ধে একবার (পৃঃ ।৶০) বলেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই অক্ষরের কোনও আধুনিক আকার দেখিতে পাওয়া যায় না", পুনরায় বলেন, "প-বর্গের মধ্যে প্রাচীন আকারের 'ফ' ও 'ভ' দেখিতে পাওয়া যায়" (পৃঃ ।৵০) অর্থাৎ 'ব' ও 'ম'-র প্রাচীন আকার দেখা যায় না। অতএব তাঁহার মতে 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে' কেবল আধুনিক আকারের অক্ষরের সংখ্যা অপেক্ষা কেবল প্রাচীন আকারের অক্ষরের সংখ্যা কম কি না, তাহা ঠিক বুঝা যায় না, কিন্তু বেশী নহে, একথা স্থির। তবু নাকি 'কৃষ্ণকীর্ত্তনের' পুঁথি সম্ভবতঃ ১৪শ শতকের প্রথমার্দ্ধে লিখিত!

তথাকথিত প্রাচীন অক্ষরগুলির মধ্যে 'উ, 'ঊ' ও 'ঋ' এই অক্ষর-ত্রয়, তাঁহার মতে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 'গুহ্যাবলী বিবৃতি' 'পঞ্চাকার' এবং 'যোগরত্নমালা' নামক ১১৯৮, ১১৯৯ ও ১২০০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত 'উ' 'ঊ' ও 'ঋ' র মত। 'ভ' র যে আকার তাহা তিনি বলেন বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত ৫১ ও ৭৪ লক্ষ্মণ সংবৎসরের (অশোকচল্ল বা অশোকবল্লদেবের) শিলা-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বাকীগুলি সম্বন্ধে তিনি বলেন, উহাদের আকার দেবপাড়ায় আবিষ্কৃত বিজয়সেন-দেবের শিলালিপিতে (এবং কখনও তখনও সমসাময়িক তাম্রশাসনে) ব্যবহৃত ঐ ঐ অক্ষরের আকারের ন্যায়। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে, 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র এই অক্ষরগুলির আকার ১২০১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে (কারণ, বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-শয়ের মতে, অশোকচল্লদেবের উক্ত শিলালিপিদ্বয় যথাক্রমে

১১৭০ ও ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ) লিখিত শিলালিপিতে, তাম্রশাসনে ও পুঁথিতেই দৃষ্ট হয়, এবং ঐ সকল অক্ষরের প্রাচীন রূপ 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র সময় পর্য্যন্ত (১৩০০–১৩৫০ খৃষ্টাব্দ) অব্যাহতভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু :—

উ। ঊর্দ্ধদিকের রেখা (চৈতন) হীন 'উ' ('ড'-র ন্যায় 'উ') অন্ততঃপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, এবং ইহার দৃষ্টান্ত ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন লিপিকরের লেখা প্রতি ছয়খানা পুথি খুঁজিলেই পাওয়া যাইতে পারে। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা দশম ভাগ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যার ১৪৭-৪৮ পৃষ্ঠায় বলরাম দাসের 'বৈষ্ণব-বিধান' গ্রন্থের ১১৯০ সনের (১৭৮৪ খৃঃ, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে) লিখিত যে পুঁথিখানির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার 'উ'-ও 'ড' রূপে লিখিত।

ঊ। 'উ' সম্বন্ধে যে কথা, 'ঊ' সম্বন্ধেও সেই কথা।

ঋ। 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'ঋ'র সহিত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিত্রয়ের ঋ'র যতখানি সাদৃশ্য, বর্ত্তমান 'ঋ'র সহিতও ততখানি সাদৃশ্য। কারণ, ঐ গ্রন্থত্রয়ে 'ঋ'র প্রধান অংশ একটি মাত্রা-সংযুক্ত ত্রিকোণ 'ব' (Buhler's Indische Palaeographie, Tafel VI, X. 7), বর্ত্তমান 'ঋ'র প্রধান অংশ একটি নিম্নদেশে কোণ সংযুক্ত 'খ', এবং 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'ঋ'র প্রধান অংশ একটি 'ধ', তাহাও আবার অক্ষরের বামদিকের নিম্নভাগ অর্দ্ধ-বৃত্তাকৃতি, কোণ সংযুক্ত নহে। প্রাচীন যুগের কোনও তাম্রশাসনে, পুঁথিতে বা শিলালিপিতে এই আকারের 'ঋ'র দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

ভ। অশোকচল্লদেবের বুদ্ধগয়ায় (বোধগয়ায়) আবিষ্কৃত শিলালিপিদ্বয়ে যে 'ভ' ব্যবহৃত হইয়াছে, 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'ভ' অপেক্ষা তাহা প্রাচীন, কারণ শিলালিপিদ্বয়ের 'ভ'-র নিম্নাংশ 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'ভ'-র ন্যায় উপরের দিকে বর্দ্ধিত নয়। প্রথম শিলালিপিতে দুই প্রকারের 'ভ' আছে; প্রথম প্রকারে 'ভ' মাত্রার সহিত যে ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা সংযুক্ত, তাহা 'ভ'-র দক্ষিণদিকের কোণে মিলিয়াছে (যথা, 'প্রভবা' লাইন ১), দ্বিতীয় প্রকারে 'ভ'-র বামদিকে মিলিয়াছে (যথা 'ভদন্ত', লাইন ৫, 'ভট্ট দামোদর', 'ভট্ট পদ্মম' লাইন ৭)। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এই ক্ষুদ্র রেখাটি সোজা বা খাড়া। ফলে দ্বিতীয় প্রকারের 'ভ' একটি ইংরাজী পাঁচের ন্যায় দেখায়। প্রথম প্রকারের 'ভ' বিজয়সেনের দেবপাড়া-প্রশস্তির 'ভ'-র মত ('প্রভৃতিভি' লাইন ৪)। অশোকচল্লদেবের দ্বিতীয় শি[illegible] লিপির 'ভ'-য়ে এই ক্ষুদ্র সংযোজক রেখা অ[illegible] ('ভাণ্ডাগারিক' লাইন ৪)। এই হিসাবেও 'কৃ[illegible] শিলালিপিদ্বয়ের 'ভ' হইতে ভি[illegible] যে ক্ষুদ্র সোজা রেখাটি ডানদিকে কাৎ হ[illegible] বাংশে কোথাও মধ্যস্থলে ('অঙ্গভঙ্গ' ৩।২।১) কোথাও ডানদিকের কোণে ('ভেকের' ৩।১।৮) মিশিয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বরং বলিতে পারিতেন, 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'ভ' অনেকটা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লিখিত পুঁথিত্রয়ের 'ভ'-র মত, কিন্তু এই 'ভ'-য়েও অনেকস্থলে ক্ষুদ্র রেখাটির অভাব পরিলক্ষিত হয়, এবং এই 'ভ'-য়ে এবং বর্ত্তমান 'ভ'-য়ে প্রভেদ নাই বলিলেও হয়। বিশ্বরূপসেনদেবের তাম্রশাসনে যে 'ভ' আছে তাহার ক্ষুদ্র রেখাটি 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'ভ'-র মত, কিন্তু এই 'ভ'-য়ের নিম্নাংশ এখনও ঊর্দ্ধে উঠে নাই ('ভট' লাইন ২২)। যাহা হউক, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীকার করেন, 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'ভ' 'শূন্যপদ্ধতি', 'ধর্ম্মরত্ন' ও 'বোধিচর্য্যাবতারে'র শেষপত্রে ব্যবহৃত 'ভ'-র ন্যায়। কিন্তু এই প্রকারের 'ভ' ১০৮০ বঙ্গাব্দে (১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে) লিখিত 'অঙ্গদরায়বারে'র একখানি পুঁথিতেও দৃষ্ট হয়, (সা,-প-প, ২৭শ ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ২৪ চিত্র, 'ভণে' শেষ লাইন)। ১১৭৫ বঙ্গাব্দে বা ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'জৈমিনি ভারতে'র একখানি পুঁথিতেও 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র মত 'ভ' দেখা যায়, তবে ইহার সংযোজক রেখাটি একটু বাঁকা হইয়া উপরের কোণে আসিয়া মিশিয়াছে (ঐ, ২৫ চিত্র, 'ভক্ত' লাইন ৩, 'সভাযোগ্য' লাইন ২)।

থ। যাঁহারা প্রত্নলিপি চর্চ্চা করেন তাঁহারা বোধ করি কেহই স্বীকার করিবেন না, 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'থ' ও দেবপাড়া প্রশস্তির 'থ' (যথা 'সুথ' লাইন ১) একই প্রকারের। উভয় 'থ'-য়ে তফাৎ যথেষ্ট। কেবল দুইয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, অক্ষরের বামভাগ যেখানে দক্ষিণ দিকের সরলরেখার সহিত যুক্ত হইয়াছে, সেই স্থানে বামভাগের নিম্নদেশ গোলাকৃতি। কিন্তু 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র এই অক্ষরের নিম্নভাগ আবার

সামান্য উর্দ্ধে উঠিয়া দক্ষিণদিকের সরলরেখার সহিত মিলিত হইয়াছে, প্রশস্তির অক্ষরে তাহা নয়। 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'খ'-র [illegible]হিত অনেকাংশে সাদৃশ্যযুক্ত 'খ' প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্র-[illegible]মূহের মধ্যে বোধ্ গয়ার লক্ষ্মণসেনদেবের অতীত [illegible]৭৪ সম্বৎসরে উৎকীর্ণ অশোকচল্লদেবের শিলালিপিতে [illegible]' লাইন ২), কিন্তু ইহারও সকল [illegible]ভাগে মিলিত হয় নাই ('শিখরি' ও 'খসদে[illegible]), এবং কোনও 'খ'-রই মাত্রা দেখা দেয় নাই। দেবপাড়া প্রশস্তির 'খ'-র সহিত 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'খ' অপেক্ষা অধিকতর সাদৃশ্যযুক্ত 'খ' উল্লিখিত 'অঙ্গদরায়বারে' দেখা যায় ('কহে খবর' লাইন ৮), এবং 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'খ' অপেক্ষা প্রাচীন আকারের 'খ' ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'মিতাক্ষরা'র একখানি পুঁথিতে দেখা যায় (R. L. Mitra's Notices of Sanskrit MSS, III, Pl. III, 'বৈশাখ' লাইন ৬)। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে' 'খ' একই প্রকারের, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি; তৃতীয় পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নিম্নে কোণ-সংযুক্ত 'খ'-ও আছে, এবং ইহাও এই প্রবন্ধে দেখান দুরূহ বা অসম্ভব হইত, যদি এই পৃষ্ঠাখানিরও লাইন বাছাই করা হইত।

ঘ। 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'খ' ও দেবপাড়া প্রশস্তির 'খ'-য়ে যতটুকু সাদৃশ্য বিদ্যমান, উভয়ের 'ঘ'-য়ে ততটুকুরও অভাব। প্রশস্তির 'ঘ'-র ('ঘটা' লাইন ৬) বামভাগের উপরের অংশের সহিত 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র বা আধুনিক 'ঘ'-র সহিত আকারগত সাদৃশ্য একটুও নাই, এবং এই অংশ নিম্নাংশের সহিত তুলনায় অক্ষরের অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে; 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র এবং আধুনিক 'ঘ'-য়ে তাহা নয়। কিন্তু 'ধর্ম্মরত্নে'র পুঁথিখানিতে ব্যবহৃত 'ঘ'-র উপরাংশের অধিকৃত স্থান নিম্নাংশের অপেক্ষা বেশী ('বন্দ্যঘটীয়' 'ঘটকসিংহ', ঠিকুজির ২ লাইন)। 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'ঘ'-র বামভাগের নিম্নাংশের সহিত সেন-যুগের 'ঘ'-র সাদৃশ্য যত কম, উল্লিখিত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে লিখিত 'জৈমিনি-ভারত'র 'ঘ'-র সাদৃশ্য তত বেশী ('দিব্যঘরে' লাইন ৪, মাঘ' লাইন ৬) দেবপাড়া শিলালিপির ন্যায় 'ভ' বল্লালসেনের সীতাহাটি-তাম্রশাসনে ('ঘনা' লাইন ১৭), লক্ষ্মণ সেনের তর্পণদীঘি তাম্রশাসনে ('ঘটিত' লাইন ১৮), বিশ্বরূপসেনের মদনপাড় তাম্রশাসনে 'বিঘটিত' লাইন ২৯), এবং এমন কি দামোদরদেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসনেও (J.A. S. B, 1874, Part I, Pl. XVIII, l. 13) দেখা যায়। আধুনিক আকারের 'ঘ' বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্মণসেনদেবের অতীত রাজ্যের ৫১ সম্বৎসরে উৎকীর্ণ অশোকচল্লদেবের শিলালিপিতে ('বাঘর' লাইন ৭, 'ঘন' লাইন ১০) দৃষ্ট হয়।

ট। মজা বাঁকা 'ট' 'শূদ্রপদ্ধতি'র পুঁথিতেই (১৫২০ খৃষ্টাব্দ) আছে ('প্রৌঢ়' শেষ পৃষ্ঠা, লাইন ৪)*। দেবপাড়া প্রশস্তির 'ট'র ('পৌরাঢ্য' লাইন ২৭) ছাঁদ একটু ভিন্ন রকমের।

থ। 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'থ' 'ঘ' প্রভৃতি অক্ষরের ন্যায় 'থ'রও বামভাগের নিম্নদেশ যে পরিমাণ গোলাকৃতি এবং যত উর্দ্ধে উঠিয়া দক্ষিণ দিকের দণ্ডায়মান রেখার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেন-যুগের অক্ষরেও এতটা নয়। বরং এই হিসাবে 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'থ'-র সহিত উল্লিখিত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে লিখিত 'অঙ্গদরায়বারে'র 'থ'-র সৌসাদৃশ্য বেশী ('হাথ' লাইন ৭)। 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ৩।২ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় লাইনে নীচে কোণ সংযুক্ত 'থ'-র কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

ফ। 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে' ৪৬।২ পৃষ্ঠার চতুর্থ লাইনে যে 'ফ' আছে, তাহার সহিত দেবপাড়া শিলালিপিতে ব্যবহৃত এই অক্ষরের ঘন সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেন নাই। লক্ষ্মণসেনদেবের ৭৪ অতীত রাজ্যাব্দে উৎকীর্ণ অশোকচল্লদেবের শিলালিপিতেও এই একই প্রকারের 'ফ' ব্যবহৃত হইয়াছে।

য। 'থ' সম্বন্ধে যে কথা উক্ত হইয়াছে, 'য' সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযুজ্য। 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'য'র সহিত উল্লিখিত 'অঙ্গদরায়বারে'র পুঁথির শেষ লাইনের 'নারায়ণ'-এর 'য' তুলনীয়, যদিও শেষোক্ত গ্রন্থের অক্ষরের গোলাকার নিম্নভাগ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিয়া দক্ষিণস্থ রেখার সহিত মিলিত হয় নাই।

* 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে' এই পৃষ্ঠার যে অনুকৃতি দেওয়া আছে, তদপেক্ষা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Notices of Sanskrit MSS, Vol. V, Pl. VI,-য়ে প্রদত্ত অনুকৃতি দেখিলে আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

‘কৃষ্ণকীর্ত্তনে’ নিম্নে কোণ সংযুক্ত ‘য’ও দেখা যায় (১৬০:২।৪ ‘যেহু’)।

ল। ‘কৃষ্ণকীর্ত্তনে’ যে প্রকার ‘ল’ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা কেবল ‘বোধিচর্য্যাবতার’ প্রভৃতি পুঁথিত্রয়েই নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত উল্লিখিত ‘জৈমিনি-ভারতে’ও পাই (‘কুণ্ডল’, ‘অলঙ্কার’, লাইন ৪, ‘দিলেন’ লাইন ২)। ‘অজদরায়বারে’ ব্যবহৃত ‘ল’-ও এই আকারের। ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসের অধুনা-লুপ্ত ‘পঞ্চপুষ্পে’ “রামেশ্বর দাসের ‘হাটের প্রবন্ধ’ ” নামক যে ক্ষুদ্র পুঁথির বিবরণ বাহির হইয়াছে, তাহারও ‘ল’ ‘ন’র মত (পৃঃ ৮২৮)।

উপরের এই আলোচনা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এই অক্ষরগুলি যে আকারে ‘কৃষ্ণকীর্ত্তনে’ পাওয়া যায়, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহাদের প্রাচীন আকার বলা যায় না, এবং দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ অক্ষরই ন্যূনাধিক ঐরূপ আকারে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বহুকাল পর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। অতএব ‘কৃষ্ণকীর্ত্তনে’ ঐগুলির ব্যবহার পুঁথির প্রাচীনত্বের নিশ্চিত লক্ষণ নহে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পূর্ব্বেই যে অক্ষরগুলি আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাও না হয় দেখাইতেছি। এতদ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, ‘কৃষ্ণকীর্ত্তনে’র এই অক্ষরগুলি যদিই বা প্রাচীন আকারের বলিয়া স্বীকার করি, তথাপি চতুর্দ্দশ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে যে কোনও সময় উহার লিপিকর এগুলি লিখিতে পারিতেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার Notices of Sanskrit Manuscripts (সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ) এর পঞ্চম খণ্ডের পঞ্চম চিত্রে, ১২৩১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাক্ষরে লিখিত একখানি ‘সেতুবন্ধে’র পুঁথির * শেষপৃষ্ঠার অনুকৃতি দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রাপ্ত অক্ষরাবলীর মধ্যে দেখা যায়, অপরাপর অক্ষরের মধ্যে উ, ঊ, থ, ব এবং থ এই কয়টি সম্পূর্ণ আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত দমোদরের ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষরগুলির মধ্যে ‘থ’ (মধুসূদনাখ্য’ লাইন ১১, ‘নথ’ লাইন ১৪, ‘ময়ূখ’ লাইন ১৪), ‘থ’ (‘যথা ’লাইন ৮ উল্টাপিঠ, ‘রাজপথ’ লাইন ১১ উল্টাপিঠ), ‘য’ (‘যস্তৈ’ লাইন ১৫, ‘জয়িনঃ’ লাইন ৭, (‘যত্র’ লাইন [illegible] উল্টাপিঠ)-এর নিম্নভাগ কোণ-সংযুক্ত এবং [illegible] আকারের। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিত্যালয়ে রক্ষিত উল্লি[illegible] ত্রয়ের মধ্যে ‘পঞ্চাকারের শেষ প[illegible] শেষ লাইন) ও ‘ভ’, [illegible] (Verhandlungen de[illegible] Internationa[illegible] Orientalisten Congresses gehalten Zu Berlin, in September, 1881, Tafel II. 1.) ‘য’ (‘যোগীশ্বরানাম্’ লাইন ২) আধুনিক আকারের দেখা যায়। ‘গুহ্যাবলী বিবৃতি’র এই পুঁথিতে নিম্নে কোণ সংযুক্ত ‘থ’-ও আছে (‘প্রথমতঃ’ লাইন ৭)। হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকালের ৩৯ সম্বৎসরে যশোহরে লেখা কালচক্রযানের একখানি টীকায় (সা-প-প, ১৩২৭, ১ম সংখ্যা, ৫ম চিত্র) আধুনিক আকারের ‘য’ (‘চর্ম্মকায়ো’ লাইন ১) ও ‘ক্ষ’ (লাইন ৭) দৃষ্ট হয়। দামোদরদেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসনে যে ‘ঢ়’ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকে আধুনিক আকার বলা চলে (‘প্রৌঢ়’ লাইন ১০)। আধুনিক আকারের ‘ল’ চট্টগ্রাম তাম্রশাসনে (‘পলিকায়াং’ লাইন ১০ উল্টাপিঠ), বোধ্‌গয়ার উল্লিখিত শিলালিপিদ্বয়ে (‘শ্রীমল্লথ্ন’ ও ‘শ্রীমল্লক্ষণ’ শেষ লাইন), ‘গুহ্যাবলী-বিবৃতি’তে (‘অন্তলৌকিক’ লাইন ১,) ও তাহারও পূর্ব্বে বল্লালসেনের সীতাহাটি-তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। এমন কি, বিজয়সেনের দেবপাড়া-প্রশস্তির অনেকগুলি ‘ল’-ও আধুনিক ‘ল-র ন্যায় (যথা ‘বল্লভা’ লাইন ১, ‘শৈলজা’ লাইন ২, ‘লীলা’ লাইন ২)।

প্রথমদিন দেখা মাত্রই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কেন ধারণা হইয়াছিল যে, প্রাপ্ত পুঁথিখানি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত তদবধি আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, তাহার কারণ সুস্পষ্ট। প্রধানতঃ খ, ঘ, থ প্রভৃতি অক্ষরগুলির গোলাকার নিম্নভাগই সেই কারণ। অনুকৃতিতে দেখা যায়, ‘খ’, ‘থ’ ও ‘য’-র কোণ সংযুক্ত আকারও লিপিকর লিখিতে জানিতেন। সুতরাং যে কালে অক্ষরের কোণ সংযুক্ত আকার প্রচলিত ছিল, সেই কালে গোলাকৃতি নিম্নভাগ ব্যবহার লিপিকরের যুগের বিশেষত্ব নয়, তাঁহার নিজের বিশেষত্ব বা

* এই পুঁথি যে ১২৩১ খৃষ্টাব্দে লিখিত নয়, একথা কেহ প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন নাই।

ছাগপালিকা

শ্রীবিজয়কুমার সেন

বিচিত্রা
শ্রাবণ, ১৩৪৩

[illegible] বত্তিতা। এই কথাটা আবও পরিষ্কাবরূপে বুঝা যায়, [illegible] 'অ' ও 'আ' দেখিলে। অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি যোজক সংযুক্ত [illegible] 'আ' অন্যত্র কুত্রাপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। [illegible] শিষ্ট অক্ষরগুলির মধ্যে 'ক' 'ট' 'দ' ও 'প' এই অক্ষব [illegible] ার।

[illegible] তঃ অষ্টাদশ শতাব্দীব [illegible] জৈমিনি ভারত', 'কন্বিা খেয়ান' লাইন ৫)। বন্দ্যোপাধ্যায মহাশয় দুই প্রকার 'ক'-ব উল্লেখ কবিয়া বলেন, দ্বিতীয় প্রকারেব 'ক' প্রাচীন বা আধুনিক বর্ণমালায় সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন বর্ণমালায় দেখিতে পাওয়া যায না একথা যত সত্য, আধুনিকেও পাওয়া যায় না একথা তত অ-সত্য। বন্দ্যোপাধ্যায মহাশয় 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' সম্বন্ধে যতগুলি কথা বলিয়াছেন, এই উক্তিই বোধ হয তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। পুঁথিখানি যখন তাঁহার নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, সেই সঙ্গে চৈতন্য-পর যুগেব কয়েকখানি বাঙ্গলা পুঁথিও পাঠাইলে ভাল হইত। 'ধর্ম্মবত্নে'র শেষপৃষ্ঠাখানিই ভাল করিয়া দেখিলেও বন্দ্যোপাধ্যায মহাশয় দ্বিতীয় প্রকারের 'ক' দেখিতে পাইতেন।

ট। তিনি বলেন, " 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' আবিষ্কৃত হইবাব পূর্ব্বে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর 'ট' কি করিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ কবিল তাহা বুঝা যাইত না।" কিন্তু দামোদরের চট্টগ্রাম তাম্রশাসন ও লক্ষণসেনদেবেব ৭৪ অতীত রাজ্যাব্দে উৎকীর্ণ অশোকচল্লদেবেব শিলালিপিতে ব্যবহৃত 'ট' দেখিলেই উহ স্পষ্ট বুঝা যাইত। 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র তথাকথিত প্রাচীন আকারের 'ট'-র সহিত বিজয়সেনদেবের দেবপাড়া প্রশস্তির 'ট' একই আকারের বলা যাইতে পারে না। কারণ প্রশস্তির 'ট'-য়ে মাত্রার বাম প্রান্ত হইতে একটি রেখা অর্দ্ধবৃত্তাকৃতিতে নামিয়া নিয়ে একটি আংটার মত রেখার সহিত আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে, আংটার দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধগতি অতি সামান্য, এবং মাত্রার দক্ষিণ প্রান্ত নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে ('স্ফুট-' লাইন ৫, 'বরাটিকা' লাইন ৬)। পক্ষান্তরে, 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র 'ট'-র সমস্তটাই একটি মাত্রা বাঁকা আংটার মত, দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধগতি অক্ষরের অন্ততঃ মধ্যস্থল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, অক্ষরের মাত্রাটি বাঁকা, এবং মাত্রার দক্ষিণ দিব হইতে যে রেখাটি ঊর্দ্ধদিকে গিয়াছে, তাহা আধুনিক আকারের 'ট'-র ঊর্দ্ধদিকেব রেখার মত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ প্রাচীন আকারের উদাহরণ স্বরূপ যে দুইটি 'ট' নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাব অন্ততঃ প্রথমটির সহিত আমি তথাকথিত পরিবর্ত্তন যুগের আকারের 'ট'-র কোনই পার্থক্য দেখিনা। মাত্রা-বাঁকা 'ট', অর্থাৎ তথাকথিত পবিবর্ত্তন যুগের 'ট' 'শূদ্রপদ্ধতি'তে ('মুকুট' লাইন ৪, Mitra's Notices of Sans. MSS., V, Pl. IV) আছে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে কথার উল্লেখ কবেন নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত 'রামেশ্বব দাসেব হাটের প্রবন্ধ' যে পুঁথি হইতে সঙ্কলিত করা হইয়াছে তাহারও 'ট' মাত্রা-বাঁকা। কোনও হস্তলিখিত বড় পুঁথির অক্ষরের এইরূপ প্রকার ভেদ যদি সমীচীন হয়, তবে যে কোনও বড় পুঁথি খুঁজিয়া প্রতি অক্ষরের ডজন খানেক বিভিন্ন রূপ বাহির করিয়া দেওয়া যায়। বুঝিনা, এই প্রকার ভেদ পুঁথির বয়স নির্দ্ধারণে কি সাহায্য করে। পুঁথিতে কোনও কোনও অক্ষর বিশেষের নানা যুগেব বিভিন্ন রূপ আছে, তাহা হইলে পুঁথিখানি কোন যুগের বলি?

দ। পুঁথির যে দুই প্রকার 'দ' উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম প্রকার বা প্রাচীন 'দ'-র দুইটি এবং দ্বিতীয় প্রকার বা আধুনিক 'দ'-র একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম আকাবেব দ্বিতীয় উদাহরণের 'দ'-র সহিত দ্বিতীয় আকাবের এমন কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না, যদ্দ্বারা এই দুইকে প্রাচীন ও আধুনিকের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে। পক্ষান্তরে, প্রথম প্রকারের দুই 'দ'র মধ্যে প্রচুর প্রভেদ। তথাকথিত প্রাচীন আকাবের প্রথম উদাহরণের 'দ'-র ন্যায় 'দ' উল্লিখিত 'অক্রদরায়বারে' এবং 'জৈমিনি ভারতে' অনেক আছে ('অক্রদরায়বার'-'দিয়া' লাইন ৬; 'জৈমিনি-ভারত'-'দিলেন' লাইন ২, 'দিল' লাইন ৩)।

প। 'প'-র আকার সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "প্রাচীন ও আধুনিক আকাবের মধ্যবর্ত্তী পরিবর্ত্তন যুগের আকার (Transitional form) অদ্যাবধি কোনও শিলালিপি বা তাম্রশাসনে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না"। এক হিসাবে তাঁহার এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য,

কারণ তথাকল্পিত পরিবর্ত্তন যুগের আকারের ‘প’ সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোনও পুঁথিতেও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। অক্ষরের বামভাগ দক্ষিণভাগে যুক্ত না হইয়া মাত্রায় যুক্ত হইয়াছে, এরূপ ‘প’ উক্ত ‘অজদরাযবাবে’র পুঁথিতে আছে, (যথা ‘পকড়কে’ লাইন ৭, ‘পর’ লাইন ৫, ‘পাতাল’ লাইন ১)। ইহাকে পরিবর্ত্তন যুগের অক্ষর বলিলে, ‘পরিবর্ত্তন যুগ’ শব্দের নূতন অর্থ সৃষ্টি করিতে হয়।

বাকি অক্ষরগুলিব আলোচনা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

এপর্য্যন্ত অপ্রকাশিত পুঁথি হইতে কোনও উদাহরণ তুলিয়া দিই নাই, দিবার আব প্রয়োজনও নাই, তবে মাত্র দুই চারিটি দিব। অক্ষরের প্রধান অংশ ‘ধ’ একপ ‘ক্ষ’, ভবদেব ভট্টের ‘কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি’র একখানি পুঁথিতে দেখিয়াছি, সেখানি বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত। কিন্তু ইহাতে অক্ষরেব বামভাগ গোলাকৃতি এবং তলে কোণসংযুক্ত। ‘চোরপঞ্চাশিকা’র একখানি পুঁথিতে ‘কৃষ্ণকীর্ত্তনে’র অক্ষরের ন্যায়ই, শ, হ, উ, ‘ক্ষ’-র ন্যায় ক, দুই প্রকারের জ, ঢ, ভ, এবং ল দেখা যায়। এই পুঁথির ‘ণ’ ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে’র দ্বিতীয় প্রকারের ‘ণ’র মত, এবং ইহাতে তিন প্রকারের ‘ট’ আছে, (১) আধুনিক আকার, (২) তথাকথিত পরিবর্ত্তন যুগের আকার, যাহাতে অক্ষরের মধ্যদেশের বক্রগতি ক্রমশঃ সরল হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার লিপিকর অক্ষরটি লিখিয়া পরে হাত তুলিয়া উর্দ্ধদিকের রেখাটি বসাইয়াছেন, কিন্তু ‘কৃষ্ণকীর্ত্তনে’র লিপিকর তথাকথিত পরিবর্ত্তন ও প্রাচীন উভয় যুগের ‘ট’ লিখিতে, মাত্রা দিয়া, পরে আর হাত না উঠাইয়া, মাত্রার দক্ষিণ প্রান্ত নীচের দিকে টানিয়া আনিয়া, সেই হাতেই উর্দ্ধদিকের রেখাটি তুলিয়া দিয়াছেন; (৩) বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিব অক্ষরের আকার, কিন্তু এই ক্ষেত্রেও উর্দ্ধদিকের রেখা দ্বিতীয় আকারের সদৃশ। এখানি অষ্টাদশ শতাব্দীব লেখা বলিয়া অনুমান হয়। ১৬৫৯ শকাব্দে বা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত ‘গীতগোবিন্দে’র একখানি পুঁথিতে— ‘কৃষ্ণকীর্ত্তনে’র অক্ষরেব ন্যায়, ‘ক্ষ’-র মত ‘ক’, ‘চ’, মাত্রা-বাঁকা ‘ট’, দ্বিতীয় প্রকারের ‘ণ’, প্রথম প্রকারেব—প্রথম উদাহরণের ও দ্বিতীয় প্রকারের ‘ধ’, তিন প্রকারের ‘প’, ‘ভ’, ‘ল’ ও ‘শ’ পরিলক্ষিত হয়। ১৬৮৪ শকাব্দে বা ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে লিখিত ‘শান্তিশতকে’র একখানি পুথিতে খ, [illegible] ধ, ফ, য, ষ প্রভৃতি অক্ষরগুলিব বামভাগে নিম্নদেশের [illegible] বক্র, এবং তাহা দক্ষিণ ভাগেব সহিত মিলিত হইবার [illegible] কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিয়াছে। ‘কৃষ্ণকীর্ত্তনের’ এই [illegible] অবিকল ইহাই বিশেষত্ব, তবে ই[illegible] আরও কিছু বেশী বা স্প[illegible] সহিত তুলনার পক্ষে ‘শান্তিশতকে’র এই পুঁথিখানি মূল্যবান। ‘কৃষ্ণকীর্ত্তনে’ এই অক্ষরগুলির এবং আরও কতকগুলি অক্ষবের তলে বাম হইতে দক্ষিণে প্রসারিত একটি ক্ষুদ্র লেজ সংযুক্ত আছে। ‘গীতগোবিন্দে’র অপর একখানি পুঁথিতে এই লেজ কোনও কোনও স্থলে মূল অক্ষবের দৈর্ঘ্য অপেক্ষাও বেশী।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে যুক্তির বলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহাও দেখা দরকার। তিনি বলেন, ‘কুসুমাঞ্জলি-প্রকাশের’ একখানি পুঁথির ."প্রথম অর্দ্ধেকটা পুরান লেখা। তাতে সর্ব্বত্রই ‘ত’ সংখ্যার জায়গায় ‘ও’ আছে। এইরূপ ‘ত’ এর জায়গায় ‘ও’ লেখা ১৩০০ হইতে ১৪০০ মধ্যের পুঁথিতেই পাওয়া যায়। ১৩০০র পূর্ব্বেও এরূপ দেখা যায় নাই, পরেও অতি বিরল। সুতরাং এই কুসুমাঞ্জলি টীকার প্রথম অংশটা ১৪ শতকের লেখা আমরা বলিতে পারি।......উহার (কৃষ্ণকীর্ত্তনের) যে পাতে ‘ত’ এর জায়গায় ‘ও’ আছে সেই পাতাটির ফটোগ্রাফ দেওয়া হইল। আমাদের বিশ্বাস এখানিও ১৪ শতকের লেখা।"

বাঙ্গালা পুঁথিতে ‘ত’ এর স্থলে ‘ও’ সর্ব্বযুগেই বিরল, অন্ততঃ নেওয়ারী পুঁথির তুলনায়। কিন্তু চৌদ্দশতকের পূর্ব্বে ইহার ব্যবহারের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দামোদর দেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসনে (উল্টাপিঠ, লাইন ৩) রহিয়াছে, এবং পুঁথিতে রীতিটা রক্ষা হইয়া আসিতেছিল অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। কারণ, ১৬৩২ শকাব্দে বা ১৭১০ খৃষ্টাব্দে লেখা ‘পরাগলি মহাভারতে’র একখানি পুঁথিতেও ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে (সা-প-প, ১৩৩৩, পৃঃ ১১৩)। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ‘বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য

বিষয়ক প্রস্তাবে'র তৃতীয় সংস্করণে (১৩১৭ সাল) 'ভাগবতে'র একখানি পৃষ্ঠার অনুকৃতি বা প্রতিকৃতি (৮৩ পৃষ্ঠার সম্মুখভাগে) দেওয়া আছে। লোকের বিশ্বাস, পুঁথি- [illegible]নি নাকি গদাধর আচার্য্য চৈতন্যদেবের নিকটে [illegible]। পৃষ্ঠাখানির লেখা দেখিয়া অবশ্য অনেকে [illegible]শ শতাব্দীর বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজী [illegible]হ। অনুকৃতিটি পুঁথির ৩৭ পৃষ্ঠার, [illegible] উহা লেখা আছে। ইহারও 'ত' 'ও' রূপে লিখিত। গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃঃ ১) ভুলক্রমে '৩৭' কে 'ওঙ্ক'-রূপে পাঠ করা হইয়াছে। আরও একটি উদাহরণ দিই, একখানি অপ্রকাশিত পুঁথি হইতে। একখানি পুঁথিরই শেষ দিকে ভরত মল্লিকের 'কারক-উল্লাস' ও প্রথম দিকে 'কারক-বিচার' রহিয়াছে। ভরত-মল্লিক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জীবিত ছিলেন, আর বর্ত্তমান পুঁথিখানি যদি অষ্টাদশ শতাব্দীরও হয়, তবে একেবারে শেষাশেষি দিকের। কাগজের আকৃতি ও লেখা দেখিয়া কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বলিতে ইচ্ছা হয়। এই পুঁথিতেও 'ত' সংখ্যাকে 'ও'-রূপে পাইতেছি। অতএব শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তিও একেবারেই টিঁকেনা।

তবে 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পুঁথিখানি কবে, কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল? যখনই হউক, ইহার জন্য প্রত্নলিপি-তত্ত্বের প্রয়োগের বা প্রত্যেকটি অক্ষর স্বতন্ত্রভাবে তুলনা-মূলক বিচারের আবশ্যকতা দেখিনা। সাধারণ ভাবে দেখি। পুঁথিখানি পুরাতন সন্দেহ নাই। কতগুলি অক্ষরও পুরাতন আকারের, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। সেগুলি কেবল মাত্র বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার সহিত পরিচিত ব্যক্তির পড়া দুরূহ, সম্ভবতঃ অসম্ভব। যাঁহারা পুঁথি হইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারাও বোধ করি পৃষ্ঠাগুলি অবাধে এবং দ্রুত পড়িয়া যাইতে পারিবেন না। লিপি-করের হস্তাক্ষর এরূপ সুন্দর ও গোটা গোটা হইলে, উনবিংশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখা পড়িতে এতটা বাধে না। তথাকথিত প্রাচীন আকারের অক্ষরাবলীর মধ্যে কোনও কোনও অক্ষর অষ্টাদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীর কোনও কোনও পুঁথিতে দেখা যায়, শুধু এই জন্যই মনে করিতে পারা যায় না, অষ্টাদশ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহা লিখিত। মনে না করিতে পারার হেতু এই যে, যতগুলি তথাকথিত প্রাচীন আকারের অক্ষর 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পুঁথিতে দেখা যায়, সেগুলি সমষ্টিভাবে এ যাবৎ কোনও অষ্টাদশ বা সপ্তদশ শতাব্দীর পুঁথিতে দেখা যায় নাই। পক্ষান্তরে প্রশ্ন উঠে, পুঁথির দ্বিতীয় প্রকারের হস্তাক্ষরের বয়স কত? পুঁথির পত্রগুলি ভুভাঁজ করা বলিয়া, প্রথম ও দ্বিতীয় লিপিকর একই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রতিকৃতিতে দ্বিতীয় প্রকারের হস্তাক্ষরের যে দুই তিনটি লাইন পাইতেছি, তাহা দেখিয়া অনুমান হয় না এ লেখা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার।—কিন্তু সমগ্র পুঁথির লিপিকর এক হইলে পুঁথিখানিকে অখণ্ডভাবে দেখিয়া উহাকে ষোড়শ শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, কারণ দেখা গিয়াছে, লিপিকর অক্ষরের প্রাচীন আকার লিখিতে লিখিতে স্থানে স্থানে নবীন রূপও লিখিয়া ফেলিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন, অক্ষরের নবীন রূপ দেখিয়া পুঁথির বয়স নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, তাঁহাদের যুক্তিও বিচারসহ নয়, কারণ তাহা হইলে পুঁথিখানিকে বিংশ শতাব্দীর বলিতে হয়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতেই হইবে, আধুনিক অক্ষর পুঁথিতে অল্প-স্বল্প নয়। এই রূপ সকল দিক বিচার করিয়া মোটামুটি হিসাবে অনুমান করা যায় যে ষোড়শ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যে কোনও সময়ে 'কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাপ্ত পুঁথিখানি লিখিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধই ইহার লিখনের সময়। পুঁথি এই সময়ের হইল, গ্রন্থের ভাষায় বাধে কিনা, সেকথা এখানে বিচার্য্য নয়, কিন্তু ভাষায় 'আ-কার' ও 'চন্দ্রবিন্দু', সম্ভবমত বাদ দিলে না-ও বাধিতে পারে। আরও অনুমান হয় লেখক একাধিক পুঁথি দৃষ্টে তাঁহার পুঁথি নকল করিয়াছিলেন। একই পুঁথিতে ভাষার বিবিধ রূপ থাকার সম্ভবতঃ ইহাই প্রধান কারণ। তাছাড়া যেমন হস্তাক্ষরে তেমন ভাষায়, লিপিকরের নিজের কেরা-মতিও কিছু কিছু আছে।

পরিশেষে জানাইয়া রাখা ভাল, এই প্রবন্ধটি বহুকাল পূর্ব্বে একাধিকবার লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে ইহা মুদ্রিত হইতে পারে নাই। এখন 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হওয়ায়, ইহাতে যৎসামান্য সংযোগ করিয়া মুদ্রণের পক্ষে পুনরায় উপলক্ষ্য ঘটিল।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

কবির প্রতি

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার, আই-সি-এস,

বারে বারে তব শেষের কবিতা শেষের মৌন গান
জানায়ে দিতেছে শেষ গোধূলিতে এই তব শেষ দান।
লেখনী তোমার এ কী অনিবার বেদনা বহিয়ে আনে
বঙ্গদেশের প্রাণে!
অভিমান ভরে আজি ভারতীর আঁখি করে ছলছল;
যত কথা ছিল এরি মাঝে শেষ? যেতে মন চঞ্চল!

তুমি কি জাননা কত শ্রদ্ধায় কত স্পর্দ্ধায় কবি,
বঙ্গদেশের প্রতি পরিবার পূজিছে তোমার ছবি।—
নাহি জন্মিলে এই সন্তান অখ্যাত বাংলার
দীন হয়ে যেত বিশ্বের ভাণ্ডার।

অনন্তকাল ধরে
মানুষের ঘরে ঘরে
পৃথিবীর তৃণ পৃথিবীর ফুল
করেছে তাদের হৃদয় আকুল,
তাদেরো প্রাণের ব্যথা নিবেদন সুখদুঃখের ছবি
রচনা করিয়া গিয়েছে তাদের কবি।

মূর্ত্তি গড়েছে কত অনুপম, প্রাণ দিতে পারে নাই,
বলিতে চেয়েছে, ফোটেনিক বাণী, বলিবার
ভাষা নাই!
নিয়ত যে-বাণী প্রকাশ লভিতে চেয়েছে, তারে
বিফল আবেগে কাঁদিয়া ফিরিতে হয়েছে কবির
মনের দ্বারে।

জাতি ও বর্ণ ভূধর ও সাগর [illegible]
প্রকাশ লভিতে যে-বাণী কাঁদিয়া [illegible]
দেশে দেশে
তারে প্রাণ দিলে তুমিই প্রথম, আঁকিলে
তাহার ছবি,
সারা পৃথিবীর তুমিই প্রথম কবি,
তুমিই একাকী রবি!

কত বরষের তপস্যা ফলে, কত না যুগের চাওয়া
কত সাধনায় পাওয়া
মানব জাতির পুণ্যের সঞ্চয়
অন্ধকারের বন্ধমোচন হে আলোক অক্ষয়!

এরি মাঝে কহ কথা তব হল শেষ,
এরি মাঝে দাও বিদায়ের নির্দ্দেশ!
তোমার মনের অযুত মণির আলো
জরা কভু তারে করিতে পারে কি কালো!
তোমার প্রতিভা চিরযৌবনা সে যে উর্ব্বশী সমা—
কী করিবে তারে কালের পরিক্রমা!

প্রতি বর্ষার নিবিড় মেঘের ছবি
আসে আর বলে আজ কোন্ গান মোর তরে
গাবে কবি?
প্রতি হৃদয়ের বেদনামুখর বাণী
নব নব গানে দাও-কবি মোরে আনি!

থামায়োনা বীণা এখনো রয়েছে বেলা
এখনো রয়েছে আলো,
চলুক তোমার নবছন্দের খেলা
যতখণ নাহি নামে চোখে ঘন কালো।

এই পৃথিবীর ফুলের ভাষাটি জানো
পাখীর কাকলি গানেতে বহিয়ে আনো।
সমুদ্র জলে শ্রাবণের জ্যোৎস্নায়,
রজনীগন্ধা গন্ধের বন্যায়,
ধূসর সুনীল গিরির শুভ্র শিরে,
যে-মহিমা আছে অনন্তকাল ঘিরে—
তাহাদের বাণী শোনাও শোনাও কানে
হে কবি তোমার মরণ-হরণ গানে!

তুমি রহিবে না, তব কথা রবে জাগি—
সারা পৃথিবীর চিরদিবসের লাগি।
তোমার কথাটি রজনীগন্ধা হয়ে
ধরণীর বুকে নিয়ত উঠিবে ফুটি,
নব ঘন মেঘ তোমার ছন্দ লয়ে
দেশে দেশে যাবে বরষে বরষে ছুটি!

মহুয়ার বনে তোমার প্রেমের আলো
বসন্ত দিনে নিয়ত উঠিবে জ্বলি,
ঝাউ মর্মরে বাদল মেঘের কালো
হেরিলে ধরায় বিরহিণী আঁখি
উঠিবে গো ছলছলি।
তখনো কি তুমি থাকিতে পারিবে দূরে?—
ধরণীর প্রেম তোমারে রাখিবে ধরি
ধরণীর ধূলি ভালবেসেছিলে, তাই তব প্রাণ রবে
চিরদিন
এই ধূলি মাঝে ভরি।

ধূলি মাঝে ভরি রহিবে তোমার প্রাণ?—
নব জগতের লভিবে না সন্ধান?—
মিথ্যা এ কথা, তুমি যে জ্যোতির্ময়
জগতে জগতে গ্রহে গ্রহে তব চলিবে দিগ্বিজয়।
বহুযুগ পরে হয়ত আবার ভিড়িবে তোমার তরী
পৃথিবীর এই ঘাটে
মকরচূড়ের মুকুট পরিয়ে চড়িয়ে সোনার তরী
নাবিবে ধরার হাটে!

সেদিনো দেখিবে তোমারি প্রেমের মন্ত্র জপিছে ধরা—
তোমার বাণীই আকাশে বাতাসে ভরা।
হয়ত তখন বক্ষে ধরিয়া কহিবে বসুন্ধরা
চলিয়া যে বড় গিয়েছিলে ত্বরি ত্বরা!

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

বেদে

শ্রীদিলীপকুমার পুরকায়স্থ

ক

তখন আমার বয়স বোধ করি আট নয়। বাড়ীতে থাকিতাম; পাড়াগাঁ,—সঙ্গী-সাথী ভাল ছিল না বলিয়া বাবা আমাকে পাঠশালে যাইতে দিতেন না। আমি বাটীতে পড়া-শুনা করিতাম এবং পিতৃদেবই আমার গৃহশিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাবা সারাদিন আমাকে অত্যন্ত আদর-যত্ন করিতেন, কিন্তু পড়াইবার সময়ে তাঁহার মূর্ত্তিটী সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইত; তখন আর তেমন করিয়া মিষ্টস্বরে কথা কহিতেন না, তেমন করিয়া সস্নেহ সম্বোধন করিতেন না এবং অত্যন্ত বদমেজাজী ছিলেন বলিয়া অতি সহজেই রাগিয়া যাইতেন। ক্রোধ চড়িয়া গেলে তাঁহার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না; তাই মাঝে মাঝে এমনি প্রহার করিতে সুরু করিতেন যে, আমার চিৎকারে চারিদিকের লোক ছুটিয়া আসিত। সুতরাং নিজেকে বাঁচাইবার জন্য আমি যতদূর সম্ভব তাঁহার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতাম। ইহাতে একদিকে আমার কিছু ক্ষতি হইয়াছিল,—তাঁহার সমস্ত দিনের ঐ স্নেহযত্নটুকু আর পাইতাম না; তবে এই স্নেহযত্নটুকু ব্যতীত আর যে জিনিষটা আমি তাঁহার নিকট হইতে প্রায়ই লাভ করিতাম, সেইটার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই এই ক্ষতিটুকু স্বীকার করিতেও আমি লেশমাত্র দ্বিধা বোধ করিতাম না; কিন্তু সারাদিন দূরে দূরে থাকিলেও অধ্যয়নের নির্দ্দিষ্ট সময়টুকু আমাকে তাঁহার সুমুখেই অতিবাহিত করিতে হইত; তাই নিষ্কৃতি আমি পাইলাম না এবং সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে এমনি চীৎকার করিতে বাধ্য হইতাম, যে সেই শব্দে মা সরস্বতী আমার গৃহদ্বার হইতেই "ত্রাহি" "ত্রাহি" ডাক ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেন,—ভিতরে প্রবেশ করিয়া কণ্ঠস্থিতা হইতে আর সাহস পাইতেন না। সুতরাং ইহার ফল হইল এই যে, আমি পাঠশালার তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পড়িতে আরম্ভ করিয়াও "মর্য্যাদা" বানান করিতে পারিলাম না এবং ভাগ অঙ্ক কষিতে অক্ষম হইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। বাবা বাড়ীতে ছিলেন না; আমার এই ত্রুটী ধরা পড়িয়া গেল মার চোখে। বাবা ফিরিয়া আসিলে একদিন তিনি রাগ করিয়া কহিলেন, "ছেলেকে কি শিখিয়েছ?—ও যে কিছু জানে না"—।

বাবা অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "জানে বৈকি;—অনেক জানে।"

মা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "জানে! আমার মাথা মুণ্ডু জানে;—সারাদিন শুধু মার-ধোরই করো, এতটুকুও শিখোতে পারনি।"

"কেন গো, ও ত সবই পারে"—

"পারে?—হা আমার কপাল,—ও যে সামান্য ভাগ অঙ্কটা পর্য্যন্ত জানে না।"

বাবা হাঁক দিয়া ডাকিলেন, "অমল"—

আমি অদূরে বাঁশঝাড়ের অন্তরালে বসিয়া পিয়ারা চিবা-ইতেছিলাম,—সমস্তই শুনিলাম,—এবার ডাক শুনিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেলাম।

সে দিনটা আজো আমার মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে। চৈত্র মাস;—বেলা বোধকরি দুটা,—বাহিরে কড়া রোদ উঠিয়াছে। আমি বহুক্ষণ বাবার চোখের সুমুখ হইতে পলাইয়া পলাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম। তারপর আত্মসমর্পন করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া বাবার শোবার ঘরে আসিয়া চীৎকার করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম,—"ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল; তাঁহার ন্যায় মাতৃ-ভক্ত"—বাবা মধ্যাহ্ন আহার সারিয়া ঘরে ঢুকিলেন, আমার হৃৎপিণ্ড দুলিয়া উঠিল; কিন্তু তথাপি থামিলাম না, পড়িতে লাগিলাম,—'এবং পণ্ডিত আমাদের দেশে বিরল; এই জন্যই তাঁহার উপাধি ছিল 'বিদ্যাসাগর'। যে সকল"—

বাবা একমুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "ওরে, ও বিদ্যেসাগর, এখন ওটা রেখে শ্লেট পেন্সিল নিয়ে আয়—অঙ্ক কষতে হবে।"

আমি ভয়ে ভয়ে শ্লেট পেন্সিল লইয়া আসিলে, তিনি পৃষ্ঠা ভরিয়া ছোট-বড় অনেকগুলি ভাগ অঙ্ক আমাকে কষিতে দিয়া, নিজের যূথিক-শুভ্র কোমল শয্যার উপরে শুইয়া পড়িলেন। চৈত্রের তপ্ত মধ্যাহ্নে শিয়রের জানালা দিয়া খোলা মাঠের মুক্ত হাওয়া আসিয়া গায়ে লাগিতেছিল; বাবা আর বেশীক্ষণ জাগিয়া আমাকে পাহারা দিতে পারিলেন না;—ঘুমাইয়া পড়িলেন, এবং ক্ষণকাল পরেই তাঁহার নাক ডাকিতে সুরু করিয়া দিল।

আমি শ্লেট পেন্সিল রাখিয়া দিয়া, নিঃশব্দে গিয়া জানালায় দাঁড়াইলাম। সুমুখে খোলা মাঠ, তারপর দিঘী, তার পরে আবার এক দিগন্ত-জোড়া প্রান্তর! তাল, সুপারী, নারিকেল—কত রকমের গাছ প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া নীরবে দগ্ধ হইতেছে। কতক্ষণ একভাবে চাহিয়া থাকিয়া, কি মনে হইল, ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। বাঁশবনের পাশ দিয়া দীঘির পার ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। কড়া রোদে পথঘাট সব তাতিয়া উঠিয়াছে। আমি চলিতে চলিতে অনতিকাল পরেই সেই প্রকাণ্ড প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এটা গাঁয়ের গো-চর; দেখিলাম, গরু ছাড়িয়া দিয়া অদূরে বটের শীতল ছায়ায় বসিয়া দুটী রাখাল বালক বাঁশী বাজাইতেছে;—ইহাদের চিনিতাম; সোজা সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলাম।

ডাকিলাম, "ভোলা—"

ভোলা ঘাড় ফিরাইয়া আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল; কহিল, "অ্যাঁ! দাদাবাবু, এখানে যে"—?

কহিলাম, "এমনি এসেচি"—।

ভোলা এবং কানাই আমাকে পাইয়া খুসী হইল। কানাই উঠিয়া আসিয়া কহিল, "দাদাবাবু, ডাণ্ডগুলি খেলবে"?

"এই রোদ্দুরে?—নাঃ, এখন থাক্"।

তাহারা আমার প্রায় সমবয়সী;—হয়তো বা কিছু বড়। আমাকে তাহারা বড় ভালবাসিত;—সর্ব্বদাই পিয়ারা, আম, জাম, খেঁজুর আনিয়া উপহার দিত। কিন্তু মা-বাবা কোনদিনই আমাকে তাহাদের সহিত মিশিতে দেন নাই,—কারণ তাহারা আমাদের প্রজার ছেলে। ছোট বড়র জ্ঞান তখনো আমার তেমন করিয়া হয় নাই; তাই তাহাদের সহিত মেলামেশা যে আমার শোভা পায় না, তখনো ইহা বুঝিতে পারি নাই; তখন চিত্ত নির্ম্মল ছিল, এ সংসারের আব-হাওয়া তখনো আমার বিকচ কমলোপম অন্তরকে গিয়া স্পর্শ করে নাই,—তাই মানুষমাত্রকেই তখন প্রাণ খুলিয়া বন্ধু ভাবে আলিঙ্গন করিতে পারিতাম। এই জন্যই, বহু চেষ্টা করিয়া মা বাবা আমাদের মধ্যে ব্যবধানের যে সুদৃঢ় প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, কেমন করিয়া যে আজ তাহা ধ্বসিয়া পড়িয়া গেল, বলিতেই পারিলাম না। তাহাদের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিলাম, "বাঁশী বাজা তো কানাই"—।

নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, অলস মধ্যাহ্নে বটের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া কানাই বাঁশী বাজাইতে লাগিল, আর দু'জনে চুপ করিয়া প্রাণ ভরিয়া তাহা শুনিতে লাগিলাম

হঠাৎ কাণে আসিল, "সাপের খেলা—আ—আ" পরক্ষণেই আর একটা মিহি গলা শুনিতে পাইলাম, "দুধরাজ, কেউটে, গোখরো, ঢোঁড়া,—হরেক রকম—।

ভোলা চোখের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল, "এদিকে এসো সর্দ্দার, এদিকে—"

সাপুড়ে আমাদের সুমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পিছনে একটী ছোট মেয়ে। দু'জনেই মাথার ঝুপড়ি মাটীতে রাখিয়া উপবেশন করিল। সাপুড়ে বৃদ্ধ হইয়াছে,—তাহার মাথার চুল এবং গোঁপ-দাড়ি অধিকাংশই সাদা হইয়া গিয়াছে। মেয়েটীর বয়স বোধ করি সাত আটের অধিক নয়। বেদের ঘরের মেয়ে, কিন্তু দেখিতে বেশ সুন্দর, এমন নাক, চোখ ওষ্ঠাধর সচরাচর দেখা যায় না। তাহার দেহের গৌরবর্ণ রোদে পুড়িয়া ঈষৎ রক্ত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। উভয়েরই গলায় নানা বর্ণের অনেকগুলি পুঁতির মালা এবং হাতে কনুইয়ের উপরে ছোট বড় অনেকগুলি কবচ একত্রে বাঁধা রহিয়াছে।

ভোলা কহিল, "সাপ খোল ত সর্দ্দার—"

সর্দ্দার ঝুপড়ির উপর হইতে একটা ময়লা কাপড় তুলিয়া লইয়া, কপালের ঘাম মুছিয়া কহিল, "এমনি খুলে কি হবে, বখ্‌শি নাচাও—"

ভোলা অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ, হাঁ নাচাব, তুমি খোল—"

মেয়েটীর রক্তাভ ওষ্ঠাধরের উপর দিয়া একটুখানি হাসি খেলিয়া গেল, সর্দ্দার আমাদের মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "কি দেবে তোমরা—?"

এইবার ভোলা চুপ করিল; কানাই ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "কি নাও তুমি"—?

"এই ধান নিই, কাপড় নিই, পয়সা নিই;—এ আর নতুন কথা কি বাবা"?

"ও বাবা, ওসব আমাদেরই বা কে দেয়?—ও আমরা কোথায় পাব সর্দ্দার? তবে যদি"—

আর বলিতে হইল না। "তবে ডাক্‌লে কেন বাবা"—বলিতে বলিতে সর্দ্দার ঝুপড়ি হাতে উঠিয়া পড়িল। মেয়েটীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "ওঠ, মা, ওঠ,—অনেক পথ হাঁটতে হবে—।"

এই সাপের খেলা দেখিবার সখটা আমার অত্যন্ত বেশি ছিল। ঠাকুরমার মুখে সাপ সম্বন্ধে অসংখ্য কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া এই জীবটীর প্রতি আমার কেমন যেন একটা আসক্তি জন্মিয়া গিয়াছিল। সর্দ্দার চলিয়া যায় দেখিয়া কহিলাম, "সর্দ্দার সাপ খোল, আমি ধান দেব"—।

সর্দ্দার বসিয়া পড়িল। ভোলা খুসী হইয়া কহিল, "দাদা-বাবু, ও খুব ভাল সাপ খেলাতে পারে,—নাম শোননি—ওরই নাম জালিম সর্দ্দার—।"

"একটু সরে বস ত বাবারা"—বলিয়া সর্দ্দার ঝুপড়ির ডালা তুলিয়া লইয়া বাঁশীতে ফুঁ দিতেই এক প্রকাণ্ড কেউটে মাথা তুলিয়া খাড়া হইয়া উঠিল; মেয়েটী মিহি গলায় গান ধরিল, "ওরে মনসার পুত,

তোর কপাল হইল"—ইত্যাদি।

সাপের খেলা শেষ হইল। সর্দ্দারকে সঙ্গে করিয়া আমি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া একাকী সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দ্বিপ্রহরে সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন, আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গোলাঘরের পিছনে গিয়া দাঁড়াইলাম। এই ঘরখানির একটা জানালা আমি বাহির হইতে খুলিতে পারিতাম,—এ সঙ্কেত আর কেহ জানিত না। ইহার প্রয়োজন আমার ছিল; কারণ গাছ হইতে আতাফল পাড়িয়া আনিয়া আমি প্রায়ই এই জানালা দিয়া ধানের ভিতরে লুকাইয়া রাখিতাম,—এমন নিরাপদ স্থান আর ছিল না। আজো এই পথে প্রবেশ করিয়া, দুই হাত দিয়া প্রচুর ধান লইয়া কোঁচড় ভরিলাম, তারপর আস্তে আস্তে বাহির হইয়া, জানালা বন্ধ করিয়া, নিঃশব্দে চলিয়া আসিলাম,—কেহ টেরও পাইল না। বক্‌সিসের পরিমাণ দেখিয়া, প্রশান্ত হাসিতে সর্দ্দারের মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল। সে আমাকে সম্ভব অসম্ভব অনেক রকমের আশীর্ব্বাদ করিয়া, পরিশেষে বলিয়া গেল যে, সে মধ্যে মধ্যে এই পথে আসিয়া আমাকে সাপের খেলা দেখাইয়া যাইবে।

খ

আমি একটা জিনিষ প্রায়ই লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে ছেলের অভিভাবক যত কড়া হন, সেই ছেলে তত বেশী বজ্জাত হয়। ছেলেদের নিজের বশে রাখা এবং সৎপথে পরিচালিত করা অভিভাবকের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যখন তাহারা ছেলেদের হাতে পায়ে শিকল বাঁধিয়া দিয়া তাহাদের নড়িবার চড়িবার শক্তিটুকুকে পর্য্যন্ত নিজেদের করায়ত্ত করিতে চেষ্টা পান, তখন বোধকরি মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই ঘটে বেশী। এমনো অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, অভিভাবক নিজের বিগত জীবনের কথা বিস্মৃত হইয়া, ছেলের বেলায় না-হক অত্যন্ত কড়া হইয়া উঠেন। তিনি একবার নিজের বাল্যজীবনের কথা স্মরণ করিয়া ছেলের স্বভাবটুকু উপলব্ধি করিতে চেষ্টা পান না;—বরং এমন সব হুকুম করিয়া বসেন, যাহা পালন করা ছেলেদের একান্ত স্বভাববিরুদ্ধ। অভিভাবকের এই অন্যায় অসঙ্গত শাসনপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার জন্য ছেলেরা নানাপ্রকার ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে; কিন্তু ইহাতেও যদি নিষ্কৃতি না পায়, তাহা হইলে পরিশেষে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তবে এ বিদ্রোহ বাহিরে প্রকাশ পায় না,—অন্তরেই গোপন থাকে।

আমারও ঠিক সেই অবস্থাই ঘটিল। সেই দিন ফিরিয়া আসিবার পর মর্ম্মান্তিক প্রহার করিয়াও পিতৃদেবতা যখন নিবৃত্ত হইলেন না,—সীমানির্দ্দেশ করিয়া হুকুম করিলেন যে,

ইহার বাহিরে আমি যাইতে পারিব না,—অমুকের সহিত কথা বলিতে পারিব না এবং বিকাল বেলায় পর্য্যন্ত মাঠে খেলিতে গেলে পা ভাঙ্গিয়া দিবেন, তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, এই বাধা-নিষেধগুলির একটাও আমি মানিব না। প্রথম পাঁচ সাত দিন বশ্যাটে বলদের মত ঘাড় বাঁকাইয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিলাম, তারপর যখন টের পাইলাম আমার উপর বাবার শ্যেন দৃষ্টি আর তেমন নাই, তখন আমাকে আর পায় কে? পূর্ব্বে যে সময়টুকু গৃহে থাকিতাম এখন সেটুকুও আর থাকিতাম না,—অথচ বড় কেহ আমাকে ধরিতে পারিত না।

ইতিমধ্যে সেই সাপুড়ে সর্দ্দারের সহিত আমার বিলক্ষণ বন্ধুত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। সে আমাকে আরো তিন দিন সাপের খেলা দেখাইয়াছে, তাহার সাপের গায়ে হাত দিতে দিয়াছে, এবং যে কবচ সঙ্গে থাকিলে সাপ কামড় দেয় না,—বরঞ্চ সুমুখে পড়িলে ছুটিয়া পলায়, তাহারই একটা আমাকে বিনা-মূল্যে উপহার দিবা বলিয়া দিয়াছে, যেন কাহাকেও না বলি এবং না দেখাই। এ সকলের পরিবর্ত্তে আমি তাহাকে গোপনে আরো অনেক ধান দিয়াছি।

এই সাপুড়ে অতি প্রসিদ্ধ। শৈশব হইতেই লোকমুখে ইহার নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু সে দিনের পূর্ব্বে আর কোথাও তাহাকে দেখি নাই। তাহার ন্যায় সাপ খেলাইতে, সাপ ধরিতে এবং সাপের বিষ ঝাড়িতে আর কেহ পারিত না। চারিদিকের দশ বারো খানা গ্রামের মধ্যে তাহার নাম ছিল। সেই দিন অপরাহ্ণ বেলায় 'উত্তরফুল' যাইবার পায়ে হাঁটা পথ ধরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, খানিকটা অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম, বাঁদিকে একটা তেঁতুল গাছের ছায়ায়, একটা মাটির ঢিপির উপর সর্দ্দার ওই দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে।

ডাকিলাম, "ও সর্দ্দার—!"

"খোকাবাবু, এসো।"

আমি গিয়া তাহার কাছে বসিলাম; কহিলাম, "এখানে বসে কি কচ্ছ?"

"একটু জিরিয়ে নিচ্চি, খোকাবাবু!"

"দেখি তোমার সাপের ঝুড়িটা"—এই বলিয়া আমি একটুখানি অগ্রসর হইয়া, ঝাঁপির মুখ হইতে ডালাটা একটু-খানি তুলিতেই ভিতর হইতে একটা ফঁস্‌" করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। সর্দ্দার হাত দিয়া ডালাটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "এখন ওদের বিরক্ত করো না খোকাবাবু,—এখন ওরা ঘুমুচ্ছে—।"

আমি সরিয়া বসিলাম; ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, "আজ তোমার মেয়ে কোথায় সর্দ্দার—?"

"মেয়ে"? সর্দ্দার হাসিল; কহিল—"মেয়ে ত আমার নয় খোকাবাবু!"

"তোমার নয়? কিন্তু লোকে যে বলে—"

"লোকে বলে"—সর্দ্দার আবার হাসিল—"হাঁ, এখন আমারই বটে; কিন্তু আসলে আমার নয়—"

"কেন—?"

"কেন কি খোকাবাবু, ও আমার নিজের মেয়ে নয়,—ও-কে আমি কুড়িয়ে পেয়েচি।"

মানুষ আবার কখনো কুড়াইয়া পাওয়া যায়, এ ধারণা আমার ছিল না; বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় কুড়িয়ে পেলে সর্দ্দার?"

"নদীর ঘাটে। একদিন সন্ধ্যেবেলা চান করতে গেছি, দেখি, ঘাটের দিকে একটা ভেলা ভেসে আসচে আর তার উপরে ছোট্ট একটা মেয়ে; তক্ষুণি এগিয়ে গিয়ে ধোরে আন-লাম। দেখলাম, সাপের কামড়ে মরেচে। তারপর কোলে করে বাড়ীতে এনে মন্ত্র পড়ে বিষ ঝেড়ে বাঁচিয়ে ফেল্লাম;—আমার কেউ নেই খোকাবাবু, তাই বুঝি খোদা একটি দিলেন,—ওকে নিজের মেয়েই করে নিলাম—"

আমি ক্ষণকাল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চাহিয়া রহিলাম; তারপর ধীরে ধীরে কহিলাম,

"সে আজ কোথায়? তাকে সঙ্গে আনো নি কেন?"

"বাড়ীতে আছে খোকাবাবু;—ওর আজ বোখার হয়েচে।"

"ওই মন্ত্রটা আমায় বলে দাওনা সর্দ্দার।"

"সর্ব্বনাশ, ওটা কি বলা যায়?" একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, তুমি আর একটু বড় হও, তারপর তোমায় শিখিয়ে দেবো—।"

আমি খুসী হইয়া কহিলাম আচ্ছা—"

একটু খানি চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "তোমার মেয়ের নাম কি সর্দ্দার ?"

"ওব বাপ-মা ওকে কি বলে ডাকৃতো, আমি তো তা জানিনে খোকাবাবু, তবে আমি ওকে 'মনসা' বলে ডাকি—"

"ওর বাপ-মা কে তুমি চেন না বুঝি—"

"না চিনিনে ;—চিন্‌লে ত ওকে ওর বাপ-মায়ের কাছেই পাঠিয়ে দিতাম খোকাবাবু—"

"তুমি চারদিকে খোঁজ নিলে না কেন ?"

"অনেক নিয়েচি ; ওকে বাঁচিয়ে চারদিকে কত খবর দিলাম, কিন্তু কেউ নিতে এলো না"—ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—"অনেক দূর থেকে ভেসে এসেছিল, বোধ হয়, কোন রাজার মেয়ে হবে—।"

কথাটা আমি অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কারণ ঠাকুরমা'র মুখে আমি এমনি আরো বহু কাহিনী শুনিয়াছিলাম ; তাই কিছু সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, সর্দ্দার, তখন তোমার মেয়েটি কত বড় ছিল,—কত বয়স হবে ?"

"একেবারে ছোট্ট খোকাবাবু,—বছর চারেক হবে।"

আমি আর কোন প্রশ্ন করিলাম না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বেলা গড়াইয়া পড়িল।

"এই বার উঠি খোকাবাবু, বেলা বয়ে গেল"—এই বলিয়া সর্দ্দার ঝুপড়ি মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সুমুখের আঁকা বাঁকা পথ ধরিয়া পরক্ষণেই বাঁশ বনের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

গ

"ও সর্দ্দার, কি কচ্চো—?"

"মাছ ধরছি খোকাবাবু,—এসো।"

সর্দ্দার সুতাং নদীর ঘোলা জলে বঁড়শি ফেলিয়া, ভাঙ্গা ছোট একটা পুরাতন পাকাঘাটের উপরে বসিয়া মাছ ধরিতেছিল, আমি গিয়া তাহার পাশে বসিলাম।

এই স্থানটি একটু অন্ধকার। চারিদিকে বাঁশ-বেতের ঝাড় এবং কাশের বন ; মাঝে মাঝে গুটি কয় অশ্বত্থ-বট এবং আম-কাঁঠালের গাছও আছে। ইহাদের শাখায় শাখায় বহু পাখী রাত্রিবাস করে ; সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, পাখীরা ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের গানে এবং ঝিল্লীস্বরে এই প্রায়ান্ধকার বন-ভূমি মুখর হইয়া উঠিল।

"সর্দ্দার তোমার বাড়ী যে দেখচিনে ?"

"ওই ত পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে"—এই বলিয়া সর্দ্দার আঙুল দিয়া গভীর বনের ভিতর অদৃশ্য প্রায় ছোট একখানা গৃহ দেখাইয়া দিল।

আমি ভয় পাইয়া কহিলাম, 'এই বনের ভিতর তুমি থাক ? তোমাব ভয় করে না,—যদি সাপ কামড়ায় ?"

সর্দ্দার হাসিল ; ডান হাতখানা তুলিয়া সস্নেহে আমার মাথার এলো-মেলো চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "না খোকাবাবু, সাপ আমাদেব কামড়ায় না, দেখেই ভয়ে পালিয়ে যায়"—একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিল,—"তোমাকে যে ওই কবচটা দিয়েচি, ওটা কাউকে দিয়ো না, সব সময় সঙ্গে রেখো তোমাকেও সাপ ভয় করবে—।"

আমি কহিলাম, "আচ্ছা,"—ক্ষণেক পরেই পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—"সর্দ্দার, তোমাব নাকি ভয়ানক জর হয়ে ছিল ?"

"হাঁ খোকাবাবু, একেবারে মর মর হয়েছিলাম"—একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"অদেষ্টে বোধ হয় দুঃখ আছে, তাই আবার সেরে উঠেচি।"

কিছু সময় কেহই কোন কথা কহিলাম না ; সহসা সর্দ্দার "আঃ"—বলিয়া বঁড়শির ছিপটা তুলিয়া লইল ; এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আহা, ফসকে গেল।" তারপর নূতন টোপ পরাইয়া বঁড়শিটা পুনরায় জলে ফেলিয়া দিল।

"কি কি মাছ ধরলে সর্দ্দার ?"

"কৈ কিছু পাইনি, দু'চারটে খল্‌সে, পুঁটি—"

সন্ধ্যা হয় হয়। সম্মুখে সুতাং নদীর মৃদু স্রোতটুকু কুলু কুলু গীত গাহিয়া কাহার সন্ধানে অবিশ্রান্ত বহিয়া যাইতেছে। নদীর জল, ওপারের অত্যুচ্চ বৃক্ষের পল্লব-বহুল অগ্রশাখাগুলি এবং শৈবালময় শ্যামল স্নিগ্ধ তট-

ভূমি সন্ধ্যার অস্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে ;—সেই দিকে চাহিয়া উভয়েই ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম।

"খোকাবাবু !"

"কেন সর্দ্দার ?"

"সন্ধ্যা যে হ'য়ে এলো, বাড়ী যাবে না ?"

"এই যে উঠি—"

কিন্তু উঠি উঠি করিয়াও আবার বসিয়া পড়িলাম ; সর্দ্দারের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল ; কহিলাম, "সর্দ্দার তুমি যে একদিন বলেছিলে—"

"কি, খোকাবাবু ?"

"ওই মন্ত্রটা আমায় শিখিয়ে দেবে— ।"

"ওঃ, তাই"—মৃদু হাসিয়া কহিল—"এখনও সময় হয়নি খোকাবাবু, তুমি আর একটু বড় হও।"

"আর কত বড় হব সর্দ্দার,—অনেক ত হয়েচি।"

সর্দ্দার হাসিয়া কহিল, "না, আরো হও—।"

আমি একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, "কিন্তু সাপ ধরা ত এখনই দেখাতে পারো সর্দ্দার— ?"

সর্দ্দার একটুখানি হাসিয়া কহিল, "হাঁ, তা পারি"—এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল—"বেশ, তুমি আগামী রবিবারে সকাল বেলা এসো ; পাহাড়ে সাপ ধরতে যাবো,—তুমি সঙ্গে যেতে পারবে ; কিন্তু অনেক পথ হাঁটতে হবে যে.—পারবে ত ?"

"খুব পারবো সর্দ্দার, তুমি কিছু ভেবো না"—এই বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। অন্ধকারে বাড়ীর পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। পিছন হইতে সর্দ্দার চেঁচাইয়া কহিল. "খোকাবাবু, সঙ্গে আসবো কি ?"

"না সর্দ্দার, আমার কোন ভয় করে না"—এই বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেলাম।

আজ রবিবার। বসন্তের নির্ম্মল স্নিগ্ধ প্রভাতটী বড়ই সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। প্রত্যুষে উঠিয়াই আমি সর্দ্দারের দেওয়া সেই কবচটী পকেটে পুরিলাম। বাবা কোথায় গিয়াছিলেন, আসিতে কয়েক দিন বিলম্ব হইবে,—আমার ভয় করিবার কোন হেতু নাই। প্রথম খানিকক্ষণ এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, তার পর এক সময়ে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া সর্দ্দারের গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

তখনো রোদ উঠে নাই ; সর্দ্দার বোধ করি আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল ; দেখিবামাত্রই মৃদু হাসিয়া কহিল, "চলো, আর দেরী করো না ; পথটাও নিতান্ত কম নয়,—প্রায় কোশ চারেক হবে।"

নদী পার হইয়া কত ক্ষেতের আলের উপর দিয়া কত প্রান্তরের বুক চিরিয়া, কত বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। রোদ ক্রমশঃ চড়িতে লাগিল ; চলিতে চলিতে পথ আর ফুরায় না,—আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। কঠিন বন্ধুর পথ দিয়া চলিতে গিয়া পায়ে কত ব্যথা পাইলাম ; কিন্তু বাহিরের এতটুকু কাতরতা প্রকাশ না করিয়া পূর্ণ উদ্যমে চলিতে চলিতে অবশেষে এক সময়ে দু'জন "রঘুনন্দন" পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

সর্দ্দার ছোট একটা শেওড়া গাছের নীচে আসিয়া আমাকে কহিল, 'ছায়ায় বসে' খানিকক্ষণ বিশ্রাম কর'—তারপর নিজের মাথার পাগড়ি ও ঝাঁপি এবং পিঠের ঝোলা মাটীতে রাখিয়া, পাহাড়ের গা বাহিয়া নির্ঝরের যে ক্ষীণ জলধারা তখনো ঝরিয়া পড়িতেছিল, তাহারই নীচে গিয়া হাত-পা ধুইয়া, খানিকটা পান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাকে কহিল, "তোমার তেষ্টা পায়নি খোকা-বাবু ?"

কহিলাম, "নাঃ—।"

প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়া দু'জন পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে গিয়া উঠিলাম। কোথাও গভীর বন—ভয়ানক অন্ধকার, কোথাও বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তৃণাস্তীর্ণ ভূখণ্ড ; কোথাও অত্যুচ্চ গিরিগাত্র খাড়া উপরের দিকে উঠিয়া গেছে, কোথাও বা অতল অন্ধকারময় গভীর খাদ। আশে-পাশে ছোট বড় কত রকমের পাথর ; লাল, হলদে কত রংয়ের বালু ;—দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

"ও সর্দ্দার, আর কত দূর ?"

"এই যে খোকা বাবু, এইত এসে পড়েছি।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "সাপ কোথায় থাকে, তুমি তা কেমন করে জানবে সর্দ্দার ?"

"ওদের বাড়ী আমি চিনি"—বলিয়া সর্দ্দার একটুখানি হাসিল।

এদিকে বন জঙ্গল আর তেমন নাই; শুধু মাঝে মাঝে দু'একটা বড় গাছ। সহসা একটা গর্ত্তের সুমুখে বসিয়া পড়িয়া সর্দ্দার নত হইয়া কি একটুখানি পরীক্ষা করিল; পরক্ষণেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "না, আবার চলো—"

বেশি দূর যাইতে হইল না; একটুখানি অগ্রসর হইয়াই সে আবার একটা গর্ত্তের সুমুখে বসিয়া পড়িয়া পূর্ব্বের ন্যায় একটুখানি পরীক্ষা করিল; তারপর মৃদু হাসিয়া কহিল, "হয়েছে তুমি একটু সরে বসো—।"

"গাছের উপরে উঠে বসি?"

সর্দ্দার হাসিল, "না, প্রয়োজন নেই—"

আমি দূরে গিয়া একটা গাছের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সর্দ্দার মাথার ঝাঁপি এবং পিঠের ঝোলা মাটীতে রাখিয়া প্রথমে গাঁজা খাইল, তারপর বাঁশী হাতে করিয়া গর্ত্তের অদূরে আসিয়া বসিল।

ঝির্ ঝির্ করিয়া বসন্তের বাতাস বহিতেছে; স্তব্ধ মধ্যাহ্নে দূর হইতে কি একটা পাখীর ডাক অবিরাম কানে পৌঁছিতেছে; সর্দ্দার দুই চোখ স্তিমিত করিয়া বড় করুণ সুরে বাঁশী বাজাইতে লাগিল।

প্রথম কয়েক মিনিট সাপের নাম গন্ধও নাই। তার পরেই সহসা এক প্রকাণ্ড কালো গোখরো, মস্ত বড় ফণা বিস্তার করিয়া, ফ্যাঁ করিয়া গর্জ্জিয়া গর্ত্তের মুখ হইতে খাড়া হইয়া উঠিল। আমি দূরে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম; কিন্তু সর্দ্দারের সে দিকে খেয়াল নাই,—সে যেন আরো করুণ সুরে বাঁশী বাজাইতে লাগিল। প্রথম দুর্জ্জয় ক্রোধে সর্পরাজ বার কয়েক মাটীর উপরে ছোবল মারিল, তারপর সুতীব্র সুরার নেশায় মানুষ যেমন করিয়া ঢুলিয়া আসে, ঠিক তেমনি করিয়াই যেন ধীরে ধীরে অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন কতক্ষণ কাটিয়াছিল, আমার হুস্ ছিল না; কিন্তু সহসা যখন সর্দ্দার খপ্ করিয়া সাপের গলাটা ধরিতে গিয়াই হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদ করিয়া হাতটা ফিরাইয়া আনিয়া চাপিয়া ধরিয়া আমাকে ডাকিয়া উঠিল, "খোকাবাবু, শীগগীর এসো"—আমার তখন চৈতন্য হইল। ছুটিয়া আসিয়া দেখিলাম, সর্দ্দারের হাত হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া রক্ত পড়িতেছে এবং সাপ পুনরায় গর্ত্তের মধ্যে অন্তর্ধান করিয়াছে। সর্দ্দারের দু' হাতই বন্ধ; সে আমাকে ঝুলির ভিতর হইতে দড়ি বাহির করিয়া বাঁধিয়া দিতে বলিল। আমি খুব কষিয়া তাহার কনুইয়ের উপর দু'টা দড়ি বাঁধিয়া দিলাম। এবার সে আমার পানে চাহিয়া হাসিল, কহিল, "হয়েচে, কিন্তু তুমি কি ভয় পেলে খোকাবাবু?"

আমি শুষ্ককণ্ঠে ঢোক গিলিয়া কহিলাম, "না, কিন্তু সাপ যে কামড় দিল—?"

সর্দ্দার তেমনি ভাবেই কহিল, "এতে আমার কিছু হয় না, কিন্তু এবার বাড়ী যাই চল, আজ আর সাপ ধরা হ'ল না" —এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল—"ওটাকে ধরতে পারতাম; কিন্তু বড় জানোয়ার,—আজ থাক্।"

আসিবার পথে কোন একটা গ্রামের সরকারী ডাক্তার-খানায় গিয়া সে ডাক্তারের পরামর্শ চাহিল; ডাক্তার কহিলেন, হাত কাটিয়া ফেলা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

সর্দ্দার হাসিল; কহিল, "যে হাত দিয়ে এত সাপ ধরলাম, সেই হাত আমার একটা সাপের কামড়ে কিছু হবে না। আর, এই-ই ত আমার একমাত্র সম্বল ডাক্তারবাবু, একে কেটে ফেলবো?—সে হয় না, আমি বাড়ী চোল্‌লাম।"

সে আমাকে পশ্চাতে লইয়া তাহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শেওলা-পড়া পৈঠার উপর বসিয়া পড়িয়া ডাকিল, "মনসা—!"

মেয়ে বোধ করি ঘরের ভিতর রান্না করিতেছিল, বাহির হইয়া আসিল; কহিল, "এসেচ বাবা; আমার রান্না হয়ে গেছে,—তুমি চান করে এসোগে—"

সর্দ্দার হাসিয়া কহিল "তুই আয় মা ইদিকে; আর খেতে হবে না"—আমার পানে চাহিয়া কহিল—"খোকাবাবু, এবার তুমি বাড়ী যাও; সারাদিন কিছু খাওনি,—তোমার হয়ত ক্ষিদে পেয়েচে।"

আমি কোন জবাব দিলাম না; আড়ষ্ট হইয়া একটা ডালিম গাছের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

মনসা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; সর্দ্দারের হাতের রক্ত কালো হইয়া উঠিয়াছিল; সেই দিকে চাহিয়াই সে একেবারে

সর্দ্দারের কোলের কাছে বসিয়া পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "বাবা, ও কি—?"

সর্দ্দার আমার পানে চাহিয়া একটু হাসিল; তারপর মেয়েকে প্রবোধ দিয়া কহিল, "ও কিছু নয় মা; তুই ব্যস্ত হ'সনে"—গলার এবং হাতের কবচগুলি দেখাইয়া কহিল—"ওসব থাকতেআমাদের কোন ভয় নেই।"

মনসা কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না বাবা, ও কি বলছ?—তোমার হাত যে একেবারে নীল হয়ে গেচে—"

সর্দ্দার অস্ফুটে কহিল, "না, মা, ও কিছু নয়"—আমাকে কহিল,—"খোকাবাবু তুমি বাড়ী যাও, আর দেরী করো না।"

আমার নড়িবার শক্তি আর ছিল না; তাই তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ইহার কিছু সময় পরেই সর্দ্দার একটা গল্প বলিয়াছিল; তাহার সকল কথা আমার স্মরণ না হইলেও মোটামুটি ঘটনাটা এই :—

সর্দ্দারের পিতামহ নাকি সে সময়ে এ অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাপুড়ে ছিল। কত লোক যে সাপের সুমুখে পড়িয়া শুধু ঐ ব্যক্তিটির নাম করিয়াই বাঁচিয়া গেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার নাম শুনিলেই নাকি সকল সাপ ভয়ে মাথা নত করিয়া পলাইয়া যাইত,—তা সে যত বড় এবং যত বিষাক্তই হোক না কেন। তাহার সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পিতামহকেই একবার কোন একটা ভয়ানক বিষাক্ত বজ্জাত সাপ দংশন করিয়া বসিল; কিন্তু বিষ তাহার উপর কোন কাজ করিতে পারিল না; কারণ, তাহার গায়ে কোন এক সন্ন্যাসী প্রদত্ত অনেকগুলি কবচ ছিল। সর্দ্দার তাহার নিজের হাতের এবং গলার কবচগুলি দেখাইয়া কহিল, "এ গুলিই সেই; তাই বিষ আমারও কোন অনিষ্ট করতে পারবে না; প্রথম একটু ঝিন্ ঝিন্ করেছিল, এখন দেখচি সেটাও আর নেই;—অনেকক্ষণ হয়েচে, বোধ হয়, বিষ কেটে গেছে"—এই বলিয়া সে হাতের বাঁধন খুলিতে উদ্যত হইতেই, মেয়ে বাধা দিল, "না বাবা, অমন কাজ করো না—"

সর্দ্দার মেয়েকে ঠেলিয়া দিল; কহিল, "রাখ মা, তুই মিছে ভয় করিসনে, ও কখনো মিথ্যে হতে পারে না"—এই বলিয়া সে হাতের বাঁধন খুলিতে লাগিল।

তারপর একটা ঘণ্টা কাটিল না, সর্দ্দার শয্যা লইল; তাহার হাত পা, চোখের পাতা, এবং ওষ্ঠাধর ক্রমশঃ নীলাভ হইয়া আসিতে লাগিল; বার কয়েক সে বমি করিল, তারপর সমস্ত যাতনা,—সমস্ত বেদনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এ সংসারের শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল,—এ আর ভাঙ্গিল না।

সে আজ বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে দিন আর নাই; এই জগতের সঙ্গে সঙ্গে, আমার জীবনের উপর দিয়া পরিবর্ত্তনের কত স্রোত বহিয়া গেছে। কালের স্রোতে কত কিছু ভাসিয়া আসিয়াছে,—কত কিছু হারাইয়া গেছে। এই স্রোতের মুখেই একদিন সেই সর্দ্দারের স্মৃতিটুকুও কেমন করিয়া যে হারাইয়া ফেলিলাম, তাহা বলিতে পারি না। তারপর এই সে দিন বহু বৎসর পরে একবার দেশে গিয়াছিলাম। শৈশবের স্মৃতি-বিজড়িত এই পল্লীখানির শান্ত স্নিগ্ধ শোভা আর এক নূতন রূপ ধরিয়া আমার চোখের সুমুখে ফুটিয়া উঠিল। একদিন অপরাহ্ণে বেড়াইতে বাহির হইয়া অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে, সহসা সুতাং নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইতেই, বাঁদিকে পাতার ফাঁকে, সেই ছোট ঘাটখানা আমার চোখে পড়িল; অগ্রসর হইয়া তাহারই একটা সিঁড়ির উপরে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। বহুদিন পরে আমার সেই সর্দ্দারের কথা আবার মনে পড়িল। মনে পড়িল, একদিন সে এই ঘাটে বসিয়াই মাছ ধরিতেছিল, আর আমি আসিয়া তাহার পাশে বসিয়াছিলাম। ঘাটখানা আজো ঠিক তেমনি ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে বিন্তু সে আজ কোথায়?—কোন্ অজানা দেশের অচেনা ঘাটে বসিয়া আজ সে মাছ ধরিতেছে। চারিদিকের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই;—তেমনি করিয়াই গাছপালা—বনজঙ্গলে চারিদিক সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তেমনি করিয়াই পাখী ডাকিতেছে, তেমনি করিয়াই ছল্ ছল্ করিয়া নদীর জল ঘাটের উপর ছাপাইয়া উঠিতেছে। তারপর একে একে সমস্ত ঘটনাই আমার চোখের সুমুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল;—সর্দ্দারের সেই হাসি, তার প্রতিদিনের কথা-বার্ত্তা আলাপ আলোচনা, গল্প গুজব, তার সস্নেহ সম্বোধন; সেই বিষাক্ত, ক্লেদাক্ত, ক্রোধান্ধ সরীসৃপ এবং সর্ব্বোপরি মনসার সেই বুক ভাঙ্গা কাতর ক্রন্দন যেন আমার কানের মধ্যে রিরি করিয়া বাজিতে লাগিল। সর্দ্দারের মৃত্যুর পর এ দিকে আর আসি নাই; তাই মনসার কি হইয়াছে জানি না; তবে শুনিয়াছিলাম, সে নাকি ভিন্ন গ্রামের কোন এক সাপুড়ে ছেলেকে আশ্রয় করিয়া গ্রাম হইতে চলিয়া গিয়াছে;—হয়তো সে আজো আছে, হয়তো বা নাই। এক সময়ে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, সর্দ্দারের বাড়ীটি আর নাই;—সে জায়গাটা কাশের বন আর বেতের ঝাড়ে পূর্ণ হইয়া গেছে।

শ্রীদিলীপকুমার পুরকায়স্থ

দ্বন্দ্ব

শ্রীমমতা মিত্র

নয়নে যে দেয় না ধরা, পাইনে পরশ যা'র—
সদাই যাহার চল্‌ছে লুকোচুরি,
হৃদয়ে মোর ফেলেছে সে কমল-চরণ তার,—
আছে আমার চিত্ত-নিলয় পুরি'।

মরম-লোকের সাত-মহলা উজ্জ্বল হ'য়ে হাসে—
পুণ্য-ছোঁয়া লেগেছে তার গায়ে,
কে এলে গো! কে এলে মোর অন্তরেরি পাশে—
প্রীতির কুসুম দিই তোমারি পায়ে।

নিঝুম রাতে স্বপন মাঝে দেখেছিলেম যায়—
ছিল যে মোর আরাধনায় ধ্যানে—
সেই কি এলে তিমির টুটে উদার আলোর প্রায়,
একেবারে প্রাণ মিশালে প্রাণে!

হৃদ্-মালঞ্চে পুষ্প ফোটে আজ যে লাখে লাখে
ফাগুন হাওয়ার লভি পরশখানি,
কেউ জানে না পরাণ-মুকুল মুঞ্জরে কার ডাকে—
বল্‌তে চাহে না বলা সব বাণী।

দেহকে মোর প্রদীপ করে ঘোরাই দিবস রাতি
দেবতাকে বন্দনারি ছলে—
আপনাকে দান করবে বলে পুলক রসে মাতি
প্রেম যে আমার ধূপের মতন জ্বলে।

সারাটি মন আছে ছেয়ে নাইক তবু সুখ
অবোধ সম নয়ন তারে চায়
তৃপ্ত হৃদয়,—যুগল আঁখি আশাতে উৎসুক,
দেখার লাগি আকুল তিয়াসায়।

———

নিঃস্ব

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সুদীর্ঘ সাত বছর পরে নিরঞ্জন বিলেত থেকে আজ দেশে ফিরবে।

ধনী পিতার একমাত্র সন্তান সে। সাত বছর আগে বি-এ পরীক্ষায় ইকনমিক্স অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়ে সে যখন পাশ করল তার ওপর অনেকেই অনেক কিছু আশা করেছিল। আই-সি-এস দেবার জন্মে সে তখন বিলেত যাবার ঝোঁক ধরল। পিতামাতার বিশেষ মত না থাকলেও নিরঞ্জনকে তাঁরা বাধা দিলেন না। বন্ধু-বান্ধবরা বলল, "সোনার টুকরো ছেলে এ,—এ যদি আই-সি-এস-এর জন্যে না যায় ত' যাবে কে ?"

নিরঞ্জনের বিলেত যাওয়াই ঠিক হ'ল।

পিতামাতার ঝাপসা চোখের সামনে দিয়ে গর্জ্জন করতে করতে ট্রেণটা প্লাটফর্ম্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল, যতদূর দেখা যায় নিরঞ্জন সাদা রুমালটা ওড়ালো তার প্লাটফর্ম্ম ভরা আত্মীয়-বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে'। তার চোখেও তখন অশ্রুকণা ঝিক্-ঝিক্ করে উঠেছিল। কিন্তু মনের ভেতর তখন তার এক রঙীন কল্পনা. .সোনালী উন্মাদনা! তাই তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বিদায়ের করুণ মর্ম্মরধ্বনি বারবার ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠা সত্ত্বেও, কি রকম একটা আবেগময় নেশার মতই পারিপার্শিক আব-হাওয়াকে সে উপভোগ করছিল!...সে সমস্তই আজ প্রায় সাত বছর আগেকার কথা!

তারপর এলো পরিবর্ত্তন···একটা বিপুল পরিবর্ত্তন নিরঞ্জনের মনে! তার ধাকা সে সামলাতে পারল না, সমস্তই গেল ওলট পালট হ'য়ে! কোথায় গেল তার আই-সি-এস পরীক্ষা, কোথায় গেল তার উন্নতির স্বপ্ন! বিলাসিতার নাগপাশে নিজেকে সে ফেলল জড়িয়ে!...

বার ক'য়েক আই-সি-এস ফেল করে, বার ক'য়েক ব্যারিষ্টারি ফেল করে, এদিক ওদিক ঘুরে যথেচ্ছাচারীর মত টাকা খরচ করে, অবশেষে "সিনেমা ক্রিটিক" হয়ে সে দেশে ফিরবে ঠিক করল। যে ছেলে ছিল মিতব্যয়ী, ছিল বিনয়ী সেই হ'ল সম্পূর্ণ অমিতাচারী, প্রকৃতি হ'ল তার রূঢ় কঠোর।

বাড়ীর পুরোনো চাকর বনমালী। নিরঞ্জনকে সে ছোট থেকেই কোলে-পিঠে করে' মানুষ করেছে। তার ছেলে নেই, স্ত্রী নেই। তাই সে তার তৃষ্ণাতুর হৃদয়ের সমস্ত ক্ষুধা মিটিয়েছে এই নিরঞ্জনকে নিয়েই। বাড়ীতে কেউ আর তাকে চাকর বলে' ভাবতেই পারে না, সে যেন তাদের পরিবারেরই একজন। মাইনে সে নেয় না। নিরঞ্জনের পিতা সে কথা তুললেই বলে, "বাবু কি আমার দেনা-পাওনা চুকিয়ে তাড়িয়ে দিতে চান ?"

তাই মাইনের কথা আর ওঠে না, কিন্তু প্রতি মাসেই তার নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমা হয়।

বাড়ীতে আজ নানা আয়োজন। বনমালীর যেন নিঃশ্বেস নেবার সময় নেই, এটা করছে ওটা করছে···কেবল ছুটছে, কেবল হাঁপাচ্ছে! বার্দ্ধক্য ধীরে ধীরে তার দেহের ওপর আধিপত্য সুরু করে দিয়েছে, মাথার চুলে সে উড়িয়ে দিয়েছে তার শ্বেত নিশান। কিন্তু তবুও বনমালী যেন আজ যুবক··· যুবকের চেয়েও সে যেন আজ বেশী উৎসাহী...পেশীতে পেশীতে তার আনন্দ, উত্তেজনা যেন উপছে উপছে পড়ছে।

কিন্তু তবুও মন তার একেবারে নিরুদ্বেগ নয়। সে ভাবছে, নিরঞ্জন যদি আজ তাকে পূর্ব্বের আত্মীয়তায় চিনতে না পারে! ব্যবধান ত' কম নয়—দীর্ঘ সাতটি বছরের!... প্রতিটি দিন উৎসুক অপেক্ষায় তাকে কাটাতে হয়েছে! বুকটা তার এক অজানা আতঙ্কে ধক ধক করে' উঠল!

সেই কখন বাবু গিয়েছেন তাকে আনতে...কৈ, এখনও ত' তিনি এলেন না? বার বার সে ঘড়ির দিকে চাইতে লাগল।

...সাত বছর আগেকার লাজুক নিরঞ্জনের ঝাপসা স্মৃতি তার মনে এলো। সুন্দর কমনীয় তার মুখ চোখ...ছেলে-মানুষী মাখান।...আচ্ছা নিরঞ্জন কি এখনও সে রকম লাজুক আছে, এখনও কি অপরিচিত কারুর সঙ্গে কথা বলতে গেলে লজ্জায় তার কান দু'টো রাঙা হ'য়ে ওঠে?

বাড়ীর সামনে একটা গাড়ী এসে থামল—ঐ ত' বাবুর গলা শোনা যাচ্ছে। বনমালীর বুকের রক্ত তোলপাড় করে উঠল। কম্পিত পদে সে নীচে নাবতে লাগল।

দূর থেকে দেখল গাড়ী থেকে 'সুট' পরে' এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক নাবছে। চিনতে তার দেরী হ'ল না—এই ত' নিরঞ্জন, তার নিরঞ্জন। রঙটা বোধ হয় আগের চেয়ে ফরসাই হ'য়েছে, লম্বায় সে যেন বেশ খানিকটা উঁচু হ'য়ে উঠেছে, চাল-চলন কথাবার্ত্তা সমস্ত একেবারে বদলে গিয়েছে।

এই সেই নিরঞ্জন! সাত বছর আগেকার সেই নিরঞ্জনের সঙ্গে আজকের এই দীর্ঘকায় যুবকটির কোন সাদৃশ্যই সে খুঁজে পেল না! তার ছোট্ট নিরঞ্জনকে, তার নিজের নিরঞ্জনকে সে যেন হারিয়ে ফেলেছে!

বনমালী বড় আশা করেছিল তাকে দেখে নিরঞ্জন নিশ্চয়ই আগে ছুটে আসবে সেই বহুকাল আগেকার 'বনমালীদা' 'বনমালীদা' বলে। কিন্তু তাকে যেন নিরঞ্জন দেখেও দেখল না। বুকের ভেতরটা তার হাহাকারে ভরে গেল। কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে সে শুধু গাড়ী থেকে জিনিষগুলো নাবাতে লাগল।

আরও কিছুদিন কেটে গিয়েছে। বনমালী কিন্তু নিরঞ্জনের কাছে একদিনও সেই আগেকার মত সম্বর্দ্ধিত হয় নি। তার সোনার স্বপ্ন কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে, প্রবল অশ্রুর জোয়ারে গলাটা তার মাঝে মাঝে যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। আজই সে তার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে প্রত্যক্ষ করল এই জগতে আপন বলতে তার কেউ নেই! যে নিরঞ্জনকে ছেলেবেলা থেকে সে মানুষ করেছে, যার সহস্র ঝড় ঝাপ্টা হাসিমুখে নিজের পিঠের ওপর বরণ করে নিয়েছে, আজ সেই নিরঞ্জনই কিনা তার কাছে পর হ'য়ে গেল, সেই কিনা আজ তাকে অবহেলা করে সব চেয়ে বেশী!

সেদিন সন্ধ্যে বেলায় কি একটা কাজে বনমালী নিরঞ্জনের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ নিরঞ্জনের ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ স্বর শুনে থেমে গেল। নিরঞ্জন তার মাকে বলছিল, "দেখ মা...বনমালীকে ছাড়িয়ে এবারে একটা ভালো খানসামা রাখো। ও এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছে, সব সময়ে কিরকম যেন ঝিমোয়, আমার একটা কাজও ভালো করে করতে পারে না।"

মা বললেন, "ছিঃ বাবা! ওযে কতকাল ধরে আমাদের বাড়ীতে আছে, কত যত্ন করে তোমাকে মানুষ করেছে, অসুখে বিসুখে কি রকম প্রাণপাত করে' সেবা করছে সে সমস্তই কি তুমি ভুলে গেলে? ওকে ত' আমরা চাকর বলে দেখি না, ওযে আমাদের সংসারেরই একজন!"

ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে নিরঞ্জন বলে উঠল, "বেশ ত। ওর ওপর যদি তোমার এতই মায়া পড়ে থাকে মাসে মাসে কিছু দিয়ে ওকে দেশেই পাঠিয়ে দাও। ও আমাকে মানুষ করেছে বলে ওকে নিয়ে যে প্রতি পদে হোঁচট খেয়ে আমাকে চলতে হবে তা আমি পাবব না বলে দিচ্ছি।"

বনমালীর সামনে সমস্ত পৃথিবীটা যেন দুলে উঠল, বুক ফেটে তার কান্না বেরিয়ে আসতে লাগল যেন। কোনও রকমে টলতে টলতে সে নিজের ঘরে নেবে এলো।

রাত তখন প্রায় একটা। সমস্ত বাড়ীটা ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। বনমালী একটা কাগজে তার মনিবকে এই মর্ম্মে লিখল যে, যে টাকা তার পাওনা হয়েছে সে টাকা যে কাজে ব্যয় করবার তার সাধ ছিল, আজ আর তা মুখে আনতেও সাহস হয় না, কিন্তু তাই বলে মনে মনে ব্যয় করা টাকা ফিরিয়ে নিতেও সে পারবে না; অতএব 'বাবু' যেন তাঁর নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সে টাকার একটা গতি করেন। চিঠিটা বৈঠকখানার বড় সেক্রেটারিয়েট টেবলটার উপর রেখে সদর দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

নিশুতি রাত...চারিদিকে ঝমঝমে নিস্তব্ধতা! তারার আলোয় কাঁপা নীল আকাশের দিকে চেয়ে অশ্রুর জোয়ার আর বাধা মানল না। দপদপে ছোট একটি কোমল তারার দিকে চেয়ে হঠাৎ আজ তার মনে পড়ে গেল সাত বছর আগেকার একটি কিশোর ছেলের সরল চাউনি! চোখের ইসারায় সে যেন তাকে আজ ডাক দিচ্ছে!

নিজেকে কোনও রকমে সামলে নিয়ে বড় রাস্তার ওপর সে পা দিল। মাথাটা তার ঘুরতে লাগল, পা দু'টো অবশ হয়ে এলো...তবু সে থামল না, রাস্তার বাঁকের ওধারে অন্ধকারের ভেতর তার দীর্ঘ শরীরখানি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল...মাঝ রাতের বাতাস তার দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠল!

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শ্মশান

শ্রীশান্তি পাল

ধিয়া ধিয়া ধিয়া তা তা থৈ থৈ নাচিছে দিগম্বর,—
হর হর শঙ্কর।
শকুনি গৃধিনী কাক,
হিংস্র বনের পশু
একটি টুক্‌রা মাংসের তরে করিতেছে হানাহানি!
স্তব্ধ এ চরাচর,
বাতাসের বুকে নিঃশ্বাস নাহি বহে,
মহাশ্মশানের করাল মূর্ত্তি ভীম সে ভয়ঙ্কর!
বম্‌ বম্‌ বম্‌
হর হর শঙ্কর!
ডিমিকি ডিমিকি ড্রিমি ড্রিমি ড্রিম্‌ ডম্বরু-করতাল
সংহার মহাকাল!
তা তা থৈ নাচে মুর্দ্দফরাস মুচি,—
মদে ঢুলু ঢুলু আঁখি
অতি লোভী তারা, লোলুপ দৃষ্টি হানি'
কদর্য্যতার রূঢ় আবরণে ঘন ঘন মুখ ঢাকে,
আর নিয়ে যায় পুরানো বালিশ যত
ছেঁড়া কাঁথা, কাঠ, কয়লা ও ছাই পাঁশ,
গুঁড়া গুঁড়া পাট-কাঠি
মাটির কলসী দু'টা;—
ডিমিকি ডিমিকি ঝন ঝণ ঝণ ডম্বরু-করতাল,
সংহার মহাকাল!

লক্‌ লক্‌ লক্‌ লেলিহান শিখা, চিতার আগুন জ্বলে,
দিগ্‌-অম্বর-তলে!
কাঁদে অভাগিনী মাতা—
মৃত শিশু কোলে ল'য়ে,
ক্ষুধার জ্বালায় জঠর জ্বলিয়া যায়,
চক্ষে নাহিক ঘুম,
পরনের শাড়ী ছিঁড়ে কুটিকুটি হ'ল,—
জড়সড় লজ্জায়;
দিন গণে আর শিরে হ'নে করাঘাত,
মুহুমুহু করিয়া পড়িছে ভুঁয়ে!—
লক্‌ লক্‌ লক্‌ চিতার আগুন জ্বলে,—
ধূম্র গগন তলে!
সংসার টলমল!

শিয়রে শমন জাগিয়া বসিয়া আছে,—
ভীম সে ভয়ঙ্কর!
হর হর হর শিব শিব শঙ্কর!

১২

যাত্রা হওয়ার ৪।৫ দিন পরেই আমার পরীক্ষার খবর পাওয়া গেল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। কলকাতা থেকে দাদার সেই শিক্ষকটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন এবং দাদা সেই টেলিগ্রামখানি হাতে করে সারা গ্রামটা ঘুরে এলেন।

প্রাণে আনন্দ আর ধরেনা। যেন জীবন-যুদ্ধে মস্ত বড় একটা সংগ্রাম জয় করলাম। যেখানে যাচ্ছি সেখানেই একটা বিজয়ী বীরের গৌরবে সকলের দিকে চেয়ে দেখছি—আমাকে দেখার মধ্যেই যেন আজ সকল চোখের সার্থকতা।

এইবার কোন কলেজে পড়ব, কলকাতায় কোথায় থাকব—এই হয়ে উঠল একটা মস্তবড় আলোচনার বিষয়। আমাদের বাড়ীতে দিনরাত কেবল ঐ আলোচনাই হচ্ছিল—দাদার মুখে ত ও ছাড়া কোন কথাই ছিল না। তাছাড়া যেখানেই যাচ্ছিলাম, সেইখানেই ঐ কথা। সকলকে ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকব, কলকাতার মেসের জীবনে একটা নতুন জীবন আরম্ভ হবে; কলেজে পড়া, মাষ্টাররা নয় প্রফেসাররা লেকচার দেবেন—এই সব নানান কারণে দুচার দিন উত্তেজনা এত বেশী হয়েছিল যে সাবিত্রী পর্য্যন্ত যেন চাপা পড়ে গেল আমার প্রাণে।

দাদা সকলকে ডেকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগলেন। আমলা কর্ম্মচারী সকলের সঙ্গে ত আলোচনা হলই এমন কি মাধবপুর বাজারের দোকানদাররাও বোধহয় দাদার সঙ্গে এই বিষয় আলোচনায় বাদ যায়নি। "তাইত সুশন্ কেমন করে কলকাতায় গিয়ে একলা থাকবে? এত বয়স হ'ল মাকে ছেড়ে ত ও একদিনের তরেও দূরে থাকেনি, মা-ই বা ওকে ছেড়ে থাকবেন কি করে? আমি বলি, কলকাতায় একটা বাড়ী ভাড়া করা হোক; সেখানে মা গিয়ে ওকে নিয়ে থাকুন, নইলে কলকাতার মেসে যা খাওয়া শুনেছি ওর ত পেটই ভরবে না ইত্যাদি;"—এই রকম ধরণের কথা দাদার মুখে প্রায়ই শুনতে পেতাম, যখনই দাদার সঙ্গে কারুর সঙ্গে দেখা হত। একদিন আলি মিঞাকে এই ধরণের কি বলাতে, আলি মিঞা বলেছিলেন "তা-কি হয়, দাদাবাবু? কলকাতা সহরে একটা বাড়ী ভাড়া করে রাখার খরচ কি কম—পোষাবে কি করে?"

দাদা তার উত্তরে একটু উত্তেজিত হয়েই বলেছিলেন, "না পোষায় না হয় আমরা বাড়ীতে শাক ভাত খাব, তবুও বিদেশে সুশনকে কষ্ট দেওয়া চলবে না। সাধারণ পাশ করে যাওয়া ছেলে হলেও বা একটা কথা ছিল; ও ত হরিশের চাইতেও ভাল ছেলে, এমন ছেলেকে কি কেউ অযত্ন করে!"

বেশীর ভাগটা দাদা বোঠানের উদ্যোগেই গ্রামের লোকদের এক বিরাট নিমন্ত্রণ দেওয়া হল আমাদের বাড়ী। সকলে এলেন, খেয়ে চলে গেলেন, এবং সকলের মুখে আমার প্রশংসা ধন্য ধন্য করে উঠল। নিমন্ত্রণের দিন এত উত্তেজনার মধ্যেও বোঠানের সঙ্গে সাবিত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রম দেখে বিশেষ একটা তৃপ্তি পেয়েছিলাম, বেশ মনে আছে।

* * * *

নতুন নতুন কল্পনার মধ্যে দিন কতক বেশ ভালই কাটল। ক্রমেই কলকাতা যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছে—কলেজ খুলতে

আর বোধ হয় তখন ৮।১০ দিন বাকি। কলকাতায় হরিশ যে মেসে থেকে পড়াশুনা করে সেই মেসেই আমার থাকবার বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছিল, এবং ভর্ত্তিও হয়েছিলাম হরিশের কলেজে।

একদিন সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে দেখি, সমস্ত আকাশখানি মেঘে ঢাকা এবং বাইরে ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়ছে। আমার ঘরের জানালাটি খোলা ছিল এবং, ঘুম ভাঙ্গার পর আমি বিছানা ছেড়ে না উঠে, বিছানায় চুপ করে শুয়েই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। নানান রকম চিন্তার মধ্যে বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রাণটা কেমন যেন উদাস বোধ হতে লাগল। এবং সমস্ত চিন্তা ছাপিয়ে প্রাণখানাকে পেয়ে বসল—সাবিত্রী।

কেমন যেন সমস্ত প্রাণ মন শরীর দিয়ে আজ এই বাদলার দিনে সকালবেলা সাবিত্রীকে কাছে পেতে ইচ্ছে করছিল—একান্ত আপনার করে।

কলকাতায় যাব—সাবিত্রী ত আমার সঙ্গে যাবে না; কলকাতায় যাওয়ার অত উৎসাহ হঠাৎ যেন নিভে গেল। এখন যাব আর সেই পূজোর ছুটীতে আসব—সাবিত্রীকে ছেড়ে এতদিন থাকব কি করে। সাবিত্রীকে কাছে না পেলে কলকাতায় থাকা যে আমার পক্ষে নির্ব্বাসন। মনটা বড্ডই খারাপ বোধ হতে লাগল।

খানিক্ষণ পরে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টিটা থামল—বোধহয় খানিক্ষণের জন্য। আকাশ ছাওয়া মেঘ মাঝে মাঝে গুরু গুরু গর্জ্জন করছে। মনে হচ্ছে এখুনিই যেন আবার আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামবে।

নীচে নেমে এলাম। পুকুরের ঘাটে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে বাড়ীর ভিতরের দিকে পিছল মাটীর উপর দিয়ে কোনও রকমে পা টিপে টিপে এগুচ্ছি এমন সময় দেখি সাবিত্রী আসছে আমাদেরই বাড়ীর দিকে। সমস্ত মাথা কাঁধ গলা জড়িয়ে নিয়েছে একখানি ভিজে গামছায়; জল কাদা পিছল বাঁচিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম।

দূর থেকে ডাকলে, "শান্তদা! শান্তদা!"

বললাম, "তুমি এই জল বৃষ্টিতে বেরিয়েছ সাবি?"

বললে, "কৈ মাছ ধরবে শান্তদা?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি রকম?"

সাবিত্রী বললে, "আমাদের বাড়ীর উঠানের উপর দিয়ে কত যে কইমাছ যাচ্ছে তুমি ধারণাও করতে পার না। চলনা আমাদের বাড়ী।"

কথাটা বুঝলাম। সাবিত্রীদের বাড়ীর উত্তরের দিকে একটা জলা জায়গা আছে, বর্ষাকালে প্রায় জলে ভরে যায়; কতকটা বিলের মত। তাই বর্ষাকালে একপশলা বড় বৃষ্টির পরে প্রায়ই কইমাছ সাবিত্রীদের বাড়ীর ডাঙ্গায় ওঠে।

বললাম, "হ্যাঁ ধরবো। চল। দাঁড়াও আমার গামছাখানা নিয়ে আসি।"

সাবিত্রী আর এগুলো; না সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। আমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে একতালার বারান্দায় টাঙ্গানো একটা দড়ির উপর থেকে আমার গামছাখানা মাথার উপর ফেলে বেরিয়ে এলাম। চললাম সাবিত্রীর সঙ্গে তাদের বাড়ী।

সাবিত্রীর সঙ্গে পথে চলতে চলতে বিশেষ একটা আমোদ অনুভব করেছিলাম। সারা পথটাই কাদা হয়েছে—মাঝে মাঝে পা পিছলে যাচ্ছে। দুজনে দুজনের হাত ধরে পড়তে পড়তে পরস্পরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে কোনও রকমে এগুচ্ছি। মাঝে মাঝে পথে জল দাঁড়িয়েছে—ছপ্ ছপ্ করে দুজনে চলেছি তার উপর দিয়ে। একটা কল্‌কল্ কল্‌কল্ শব্দ সারা পথটায়ই শুনতে শুনতে চলেছি—বর্ষার জল উঁচু জায়গা থেকে নীচু জায়গায় পড়ছে কখনও পুকুরে, কখনও ডোবায়, কখনও মাঠের উঁচু জায়গা ভেঙে ধসে যাওয়া নীচু জায়গায়, কখনও পথটির দুধারের ড্রেনের ভিতরে।

সাবিত্রীদের বাড়ীতে গিয়ে পৌছতে না পৌছতে আবার মুষলধারে বৃষ্টি এল। দুজনে ছুটে কোনও রকমে সাবিত্রীদের বাড়ীর বারান্দায় গিয়ে উঠলাম।

সাবিত্রীর মা বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে যাওয়ার দরজার চৌকাঠের কোণ ঠেসে একখানি কাঁথা গায়ে জড়িয়ে চুপকরে বসে বোধহয় জপ্ টপ্ কিছু করছিলেন। মুখ তাঁর শুকনো শুকনো—ছোট ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল, রুক্ষ। আমাদের দেখে বললেন, "মেয়েটার কাণ্ড দেখ। এই বৃষ্টিতে গিয়ে সুশনকে টেনে এনেছে।"

সাবিত্রী বললে, "মা! শান্তদা কৈমাছ ধরবে বলে এসেছে।" এই বলে বাড়ীর ভিতর চলে গেল। সাবিত্রীর মা আমার দিকে চেয়ে বললেন, "হ্যাঁ বাবা! একটু বৃষ্টি হলেই কত যে কৈমাছ আমাদের ঐ পুকুর পাড়ের উঠানের উপর ওঠে—আমার ত লোকজন নেই, কেই বা ধরে।"

বললাম, "দাঁড়াও সইমা। বৃষ্টিটা থামুক কতগুলো ধরচি আজ।"

সাবিত্রীর মা বললেন, "সাবিত্রীটা কৈমাছ খেতে এত ভালবাসে—কিন্তু ওরকম জ্যান্ত মাছ ধরতে ভয় পায়। আর আমার ত এই শরীর।"

বারান্দার একপাশে একটা খাট ছিল আমি তার উপর গিয়ে বসলাম।

বললাম, "তোমাকে আজ বড় শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে সইমা—আবার জ্বর হয়েছিল নাকি?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সইমা বললেন, "রোজই ত জ্বর হচ্ছে বাবা। দিন দিন শরীরটা যে কি রকম খারাপ হচ্ছে—সে কথা বলিই বা কাকে।"

বললাম, "যদু কবরেজের ওষুধ খেয়ে জ্বর হওয়াটা বন্ধ হয়েছিল না?"

বললেন, 'দিন কয়েক মাঝে জ্বরটা বন্ধ হয়েছিল, সে ওষুধ খেয়ে কিনা জানিনা। কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হতে হতেই আবার জ্বর সুরু হল।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "ওষুধ এখন খাও ত?"

বললেন, "না। ওষুধ টষুধ আর খাবনা ঠিক করেছি—ও কিছু হয় না।"

বললাম, "কিন্তু একটা চিকিৎসা করান ত দরকার—এ ভাবে অসুখ বাড়তে দিলে ত বেড়েই চলবে।"

সইমা বাইরের দিকে চেয়ে খানিকটা চুপ করে বসে রইলেন। একটা হতাশামাখান করুণ উদাস দৃষ্টি। দেখতে দেখতে চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। আঁচলের খুঁটে চোখ পুঁছতে পুঁছতে ভাঙ্গা গলায় বলতে লাগলেন, "এ অসুখ আর আমার সারবে না বাবা! আমি জানি মিথ্যে আঁকু পাঁকু করে লাভ নেই। যে কদিন অদৃষ্টে ভোগ আছে বেঁচে থাকবই।"

খানিকটা চুপ করলেন। আঁচলে চোখ পুঁছে আবার বলতে লাগলেন, "শুধু সাবিটার জন্য ভাবি। আমি চলে গেলে ওর দশা কি হবে। ঐত পাগলী মেয়ে—কোন কাণ্ড-জ্ঞান পর্য্যন্ত হয়নি।"

সইমার গলা একেবারে ভেঙ্গে গেল। আর কিছু বলতে পারলেন না। আঁচলের খুটে ঘন ঘন চোখ পুঁছতে লাগলেন। আমিও চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। বলবই বা কি? খানিকক্ষণ পরে সইমা কতকটা শান্ত হয়ে আবার বলতে লাগলেন, "কত যে পাপ করেছি আর জন্মে তাই আমার ঘরে আমাব পেটে এসে জন্মেছে। নইলে অমন মেয়ে বাবা—অমন রূপ, অমন গুণ, কৈ আর ত একটাও দেখিনা। অত-টুকু মেয়ে নিজের হাতে সব করে, এই বয়সেই হাত পুড়িয়ে রাঁধে—আমার অসুখ বলে আমাকে উনুনের কাছে অবধি যেতে দেয় না।"

আবার চুপ করলেন। আমি চুপ করেই বসে আছি। একটু পরে হঠাৎ আমাকে ডাকলেন, "বাবা সুশন!"

আমি চাইলাম সইমার মুখের দিকে।

বললেন, "এইখানে এস, আমার কাছে একটু বস বাবা। এই সাবি! কোথায় গেল মেয়েটা। একটা আসন যদি দিত।"

আমি উঠে গিয়ে সইমার কাছে চৌকাঠের উপর বসলাম, বললাম, "থাক্, থাক্, আসনের দরকার নেই।"

বললেন, "আমি একবার বসলে আর সহজে উঠতে পারিনা সুশন। দিন দিন যেন আমার কোমরটা অবশ হয়ে আসছে।"

সইমা ধীরে ধীরে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন "বেঁচে থাক বাবা—দীর্ঘজীবি হও। বাপ মার বুক জুড়ানো সন্তান তুমি। চারদিকে সবাই তোমার সুখ্যাতি করে, শুনে যে প্রাণে কি শান্তি পাই—ভগবানই জানেন।"

আবার একটু চুপ করে রইলেন। আঁচলের খুঁটে চোখ পুঁছতে পুঁছতে ভাঙ্গা গলায় আবার বললেন, "আমার আর বেশীদিন নেই বাবা। সাবিটা রইল। ওকে তুমিই আশ্রয় দাও। আমার এই অনুরোধটা রাখ। দেখছই ত

ওকে—রূপে গুণে ও তোমার অযোগ্য হবে না। চিরকাল তোমাকে পেটের ছেলে বই অন্য কিছু ভাবিনি। তুমি এখন যোগ্য হয়েছ; আমার এই কথাটী ফেলনা বাবা। জীবন ভোর দুঃখই পেয়ে গেলাম—মরবার সময় আমাকে একটু শান্তিতে মরতে দিও।"

এই বলে সইমা দুহাত দিয়ে আমার হাত দুখানি চেপে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেল্‌লেন। আমি মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইলাম। বাইরে ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি সমানে পড়ছে। খানিকক্ষণ কেঁদে কেঁদে চুপ করলেন। তারপর বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন। পরে কতকটা শান্ত গলায় বলতে লাগলেন, "তোমার মাকে একথা আমি একদিন বলেছি। তাঁর খুব মত আছে। তোমার বাবাকে বল্‌বেন বলেছেন। মন্টিরও খুব ইচ্ছে। বড় ভাল মেয়ে মন্টি, বড় ভাল মেয়ে।"

এই বলে আবার চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। আমি তখন আকাশ পাতাল ভাবছি। কতক্ষণ এইভাবে দুজনে চুপচাপ বসেছিলাম জানিনা, হঠাৎ ঘরের ভিতর হ'তে চাপা গলায় সাবিত্রীর কথা শোনা গেল।

"মা"

সইমা বল্‌লেন, "কি রে?"

ভিতর হতে সাবিত্রী চাপা গলায় বল্‌লে, "শোন না একবার ভেতরে।"

সইমা একটু হেসে হাতের কনুয়ে ভর রেখে মুখটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "জানিস ত আমি একবার বস্‌লে সহজে উঠ্‌তে পারি না। কি বলছিস? তা বেশ ত তুইই নিয়ে আয় না।"

সাবিত্রী বোধহয় ভেতর থেকে কিছু একটা ইসারা করলে।

সইমা বল্‌লেন, "আহা একটা পাগল। সুশনের সামনে খাবার নিয়ে আসতে মেয়ে হঠাৎ লজ্জায় মরে গেল।" সাবিত্রী আর দ্বিতীয় প্রতিবাদ না করে মাথা নীচু করে ত্বরিতপদে বাইরে এল। আমার সামনে একখানা পেতলের রেকাবীতে মুড়ী বাতাসা ও নারকেলের সন্দেশ ও এক গেলাস জল রেখে দিয়ে ত্বরিতপদে ঘরের ভিতর চলে গেল।

একপ্রাণ চিন্তা নিয়ে যখন সাবিত্রীদের বাড়ী থেকে বাড়ী ফিরে এলাম তখন বৃষ্টি সবে মাত্র একটু ধরেছে। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল তাই কইমাছ ধরা আর হল না।

* * * *

বাড়ী ফিরে এলাম, মনের মধ্যে কেমন যেন একটা বোঝা নিয়ে। সাবিত্রীর মার কথার তাৎপর্য্য বুঝতে আমার একটুও দেরী হয়নি, কিন্তু এথাটা যতই ভাবতে লাগ্‌লাম ততই ক্রমেই যেন ভারী হয়ে উঠতে লাগ্‌ল প্রাণটা বুকের মধ্যে।

বিয়ে? সাবিত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ে? প্রথমটা কেমন যেন একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কই এ কথা ত এতদিন একবারও মনে হয়নি। সাবিত্রীর সঙ্গে আমার সঙ্গে এই যে প্রেমের লীলা সুরু হয়েছিল এর পরিণতি যে কি—কোনও দিনই ভেবে দেখিনি। একটা উত্তেজনা উন্মাদনার মধ্যে বর্ত্তমান নিয়েই পাগল হয়ে উঠেছিলাম—ভবিষ্যতের দিকে কখনও তাকাইনি। কিন্তু আজ যখন সাবিত্রীর মা ভবিষ্যতের দিকে আঙুল দিয়ে ভবিষ্যতটি দেখিয়ে দিলেন, প্রথমটা যদিও বিশেষ আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম কিন্তু ক্রমেই মনটা যেন সঙ্কুচিত হয়ে পেছিয়ে আস্‌তে লাগল। সাবিত্রীর সঙ্গে পূর্ণ মিলনের অপরিসীম আনন্দটুকু কল্পনা করে পুলকে যে একবারও শিউরে উঠিনি এমন নয়, কিন্তু তবুও বিবাহ! সে যেন অনেক দূরের কথা, অনেক বড় কথা; কেমন যেন অসম্ভব ঠেক্‌ল, যেন তা হওয়ার নয়।

আজ জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে জীবনের কাহিনী লিখতে বসে, সে সময়ের মনের অবস্থাটা অনেকবার ভেবে দেখেছি কিন্তু সাবিত্রীর সঙ্গে বিবাহের নামে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে না উঠে কেন যে প্রাণটা ভারী হয়ে উঠেছিল—বিশেষ কোন কারণ খুঁজে পাই না। সে বয়সে প্রেমের খেলাটুকু ষোল-আনা বুঝেছিলাম কিন্তু বিবাহ জিনিষটার দায়িত্ব নেওয়ার শক্তি কি তখনও আমার হয়নি? কিংবা ভাবতে আজও লজ্জায় ঘৃণায় মাথা নুয়ে পড়ে—এমনই কি দম্ভ ছিল আমার প্রাণে, যে সাবিত্রীকে আমার সহধর্ম্মিনীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না? আমি, মাধবপুরের রতন সার পুত্র, সাহাবংশের গৌরব, দেশের দশের ষোল আনা ভরসা আমারই উপরে, সুদর্শন, বুদ্ধিমান—আমার গলায় যে বর-

মাল্য দেবে সেই অসামান্য সুন্দরী যেন কোন সুদূর গুহায় বসে তপস্যা করছে, কঠোর তপস্যা, আমারই জন্য যুগ যুগ ধরে; সে কখনও ওপাড়ার "সাবি" নয়, হতে পারেনা—এই রকম একটা নীচ আত্মম্ভরিতায় ভরা ছিল কি আমার প্রাণ? জানিনা—আজ ভেবেও কোনই কুল কিনারা পাইনা।

বাড়ী ফিরে এসে সমস্ত দিন প্রাণখানা ভারী হয়ে রইল। সাবিত্রীর সঙ্গে প্রেমের লীলাটুকুর জন্য কোনও অনুশোচনা বা গ্লানি আমার মনে হয়নি, সাবিত্রীব মার কথার পরেও সাবিত্রী যেমন মধুব ছিল তেমনিই রইল। তবুও সাবিত্রীব মাব ওকথাটা যেন না শুনলেই ভাল হত। সাবিত্রীকে নিয়ে মাধবপুবেব আকাশের নীচে ঘরে বাইরে, পথে ঘাটে মাঠে যে আনন্দটুকু কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম হঠাৎ যেন কেমন তাতে একটু বাধা পড়ল।

সেদিনটা সাবিত্রী আর আমাদের বাড়ীতে এলনা। দুপুরেব পরে বিকেলের দিকে বৃষ্টি আর ছিল না। সাবিত্রী আসবে—এ আশা যে করিনি, এমন নয়। বিকেল ফিরে সন্ধ্যে হয়ে গেল, কিন্তু সাবিত্রী এল না। তার পবের দিন সকালবেলা সাবিত্রী যখন আমাদের বাড়ীতে এল, তাকে দেখেই প্রাণটা হঠাৎ কেমন হালকা হয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কি যে তখন ভেবেছিলাম, কেন যে মন সাবিত্রীকে দেখেই আবার মধুর সরল হয়ে উঠল—আমার আজ একেবারেই মনে নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত

মিলন

শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ

সেদিন বিজন রাতে
কম্প্রহাতে—
বক্ষে তার রাখি চাপি মোর করতল
নীরবে কবে সে যবে মেলি দুটি আঁখি ছলছল
"ক্ষমো এ পথের দেরি, মুখপানে চেয়ে দেখ প্রিয়",
নিবেদিব দৃষ্টি মোর, সর্ব্বমন, সকল ইন্দ্রিয়;
স্থূলতনু রবে পড়ি, জানি, সেইক্ষণে
তারি সে-নিবিড় আলিঙ্গনে।

বন্ধু, তারে মৃত্যু বলে ভুল তুমি নাহি করো যেন,
সে মোর মিলন ব'লে জেনো।
জান যদি কোনো গান মিলনমাধুর্য্যে রমণীয়,
গুঞ্জরি গাহিও।

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বাংলায় দুর্ভিক্ষ

বাংলার প্রায় সর্ব্বত্র খাদ্যাভাব এবং বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন জেলার বহু বিস্তৃত স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। দুর্ভিক্ষ, অন্নাভাব, জলাভাব, মহামারি প্রভৃতি বাংলায় অপরিচিত নহে। নিত্যপরিচয়ের ফলে এসব আমাদের গাসহা হইয়া গিয়াছে এবং মনও এসব সম্বন্ধে অসাড় হইয়া গিয়াছে। আমাদের এই সব নিত্যসহচরের আবির্ভাবের সংবাদ যখন আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করি তখন মনে ইহা আর কোন নূতন রেখাপাত করিতে চাহে না। কিন্তু, এবার যে দুর্দ্দিন বাংলায় দেখা দিয়াছে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে, জলাভাবে বস্ত্রাভাবে যেরূপ কল্পনাতীত দুঃখের জীবন যাপন করিতেছে, না খাইয়া, অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া, মৃত্যু বরণ করিতেছে, সংক্রামক ব্যাধির কবলিত হইতেছে, ভীষণতায় ও বিস্তৃতিতে তাহা যেমন অভূতপূর্ব্ব তেমনই মর্ম্মন্তুদ। পুরুষ স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া পলাইতেছে, মাতা শিশু পুত্রকন্যা পরিত্যাগ করিতেছে, নারী তাহার সতীত্বের বিনিময়ে (খুলনা সংবাদে প্রকাশ) এক মুষ্টি অন্ন চাহিতেছে, বিবস্ত্র অবস্থায় লোককে পথে বাহির হইতে হইতেছে, বুভুক্ষা মানুষকে পশুর পর্য্যায়ে লইয়া গিয়াছে, মনুষ্যত্ব মরিয়াছে, মানুষ মরিতেছে।

বাংলার গণজীবনে আজ একটা ভাঁটার যুগ আসিয়াছে, নহিলে হয়ত ইহা লইয়া দেশে আরও চাঞ্চল্য, কর্ম্মব্যস্ততা ও উদ্বেগ দেখা যাইত। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব ভুলিবার নহে। আমরা যখন বিলাসে ও অপব্যয়ে অর্থ নষ্ট করিতেছি, তখন একমুষ্টি অন্নের অভাবে মানুষ না খাইয়া মরিতেছে, আমরা যখন বসন বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছি তখন, বস্ত্রের অভাবে লোকে চট, ছিন্নকন্থা, মশারির টুকরা পরিতেছে, অনেকের আবার তাহাও জুটিতেছে না। যাহারা আজ পশুর মত মরিতে বসিয়াছে তাহারা আমাদেরই ভাইবোন; আমাদেরই মত তাহারা সুখের নীড় বাঁধিয়াছিল, আমাদেরই মত স্নেহ প্রেম, মর্য্যাদা ও আত্মসম্মানের অধিকারী ছিল। তাহাদিগকে বাঁচাইবার, এই শোচনীয় দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিবার দায়িত্ব আমাদের। প্রতিবেশীর কাছে, জাতির কাছে, মনুষ্যত্বের কাছে আমাদের এই ঋণ শোধ করিতে যদি আমরা পশ্চাদপদ হই তবে, আমাদের লজ্জা ও অপরাধের সীমা থাকিবে না।

কিন্তু, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত এই অবস্থার প্রতিকার কখনই সম্ভব হইতে পারে না এবং জাতির সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংঘ হইতেছে দেশের রাজ সরকার। কাজেই, এই অবস্থা দূর করিবার, মৃত্যু এবং মৃত্যুতুল্য দুঃখ হইতে লোককে উদ্ধার করিবার সর্ব্বপ্রধান ভার হইতেছে গভর্ণমেণ্টের। প্লাবনে বা জলের অভাবে বাংলার কোন না কোন স্থানে অজন্মা, শস্যহানি ও ফলে যে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে, কোন কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব যে স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও অপনোদন করিবার দায়িত্ব রাজ সরকারের।

যে সকল স্থানে অনেক দিন ধরিয়া ক্রমাগত শস্য জন্মিতেছে না এবং অদূর ভবিষ্যতেও জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, সে সকল স্থান হইতে লোক যাহাতে সহজে অন্যত্র উঠিয়া যাইতে পারে তাহাতে উৎসাহ দেওয়া এবং তাহার সুবিধা করিয়া দেওয়া সরকারেরই কর্ত্তব্য। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাস পাইবামাত্র যাহাতে সে সকল স্থান হইতে লোকে (অন্ততঃ বহু লোকে) সপরিবারে সহরে সহরে বা বিশিষ্ট শ্রমকেন্দ্রসমূহে যাইতে পারে ও সেসকল স্থানে কর্ম্ম ও আশ্রয় পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাও অসম্ভব নহে। এ প্রদেশের কায়িক শ্রম সাপেক্ষ

যে সকল কাজ করিয়া ভিন্নপ্রদেশবাসীরা উদরান্নের সংস্থান করিতেছেন, এ প্রদেশের শ্রমিকেরাও যাহাতে সে সকল কাজ করিতে প্রলুব্ধ হইতে পারেন, এবং এইরূপে কর্ম্মসমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক উদরপীড়া প্রত্যক্ষভাবে অনাহার, দীর্ঘদিনব্যাপী স্বল্পাহার এবং অভক্ষ্যভক্ষণ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে লোকক্ষয়ের ইহাও একটা প্রধান কারণ। অনাহার ও স্বল্পাহার অনেক সময়ই ম্যালেরিয়া, ক্ষয়রোগ প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে।

অস্পৃশ্যতার আর্থিক দিক

সমগ্র ভারত হইতে বাংলাকে পৃথক করিয়া ধরিলে দেখা যাইবে যে অস্পৃশ্যতার জন্য আমাদের যে আর্থিক ক্ষতি হইতেছে তাহার পরিমান নিতান্ত কম নহে। কলিকাতায় ও মফঃস্বলের সহরগুলিতে এবং অনেক সমৃদ্ধ পল্লীতেও পাচক ও চাকরের কাজ করিয়া যাহারা জীবিকার্জ্জন করে তাহারা প্রায় সকলেই বিহার উড়িষ্যার অধিবাসী। বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা কায়িক শ্রম করিয়া থাকেন তাঁহারা সাধারণতঃ অনুন্নত শ্রেণীর এবং তাঁহাদের অন্ন ও জল অচল বলিয়া এই সকল কার্য্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হয় না। অবশ্য, ভিন্ন-প্রদেশবাসী পাচক বা পরিচারকদের উচ্চ কুল সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সংশয় নাই। এদিক দিয়া সম্পন্ন বাঙ্গালী-মুসলমানেরা অনেক নিরন্ন স্বপ্রদেশবাসীকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হিন্দুরা যদি এই সকল কাজে অনুন্নত বাঙ্গালী-হিন্দুদের নিযুক্ত করিতে আপত্তি না করিতেন তবে, সাধারণ সময়েই অনেক লোকের বেকার অবস্থা ঘুচিত, এবং বর্ত্তমান অন্নকষ্টের দিনে অনেক লোক বাঁচিয়া যাইত। খুব বেশীদূরে না যাইয়াও নিজ নিজ বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী সহরে অনেক লোকে কাজ পাইত।

জাতীয় জীবনে ক্রীড়ার স্থান

খেলাধূলা জীবনের পরিপূর্ণ গঠনের একটা প্রধান উপাদান; এবং খেলাধূলার বহুল প্রচলন জাতির জীবনী-শক্তির প্রাচুর্য্যের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ। ক্রীড়ার উপযোগিতা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে তেমন বিশেষ সজাগ ছিলাম না এবং খেলাধূলার প্রচলনও আমাদের মধ্যে খুব বেশী ছিল না। ফুটবল খেলাকে উপলক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালীরা সম্প্রতি ক্রীড়া-মোদী হইয়া উঠিয়াছেন এবং সহরে ও পল্লীতে খেলাটির বহুবিস্তৃতিও ঘটিয়াছে। এক কথায় ফুটবল খেলাটা বাঙ্গালীদের পক্ষে অনেকটা জাতীয় ক্রীড়ায় পরিণত হইয়াছে। খেলাটি বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে বলিয়া ইহাতে আমাদের লজ্জার কিছু নাই। কারণ যাহা মানুষকে আনন্দ দিতে পারে, শক্তির অধিকারী করিতে পারে যাহা তাহার দেহ মন বুদ্ধিকে সমুন্নত করিতে পারে, তাহার বিশেষ কোন দেশ বা জাতি নাই, তাহা সর্ব্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি। যদিও খেলায় জয়োল্লাস প্রকাশ করিবার সময় 'হিপ-হিপ হুররে' ধ্বনি করায় লজ্জার কারণ আছে। ফুটবলের জন্য বিদেশী ফুটবল নির্ম্মাতা ও ব্যবসায়ীদের আমরা অনেক টাকা দিয়া থাকি, কাজেই দেশে ভাল ফুটবল তৈয়ারীর কথা, আমাদের ভাবিতে হইবে।

বাঙ্গালীরা এই খেলায় এক সময় যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে তাঁহারা বর্ত্তমানে বিচ্যুত হইলেও, বাংলার পল্লী অঞ্চলে ইহার বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছে এবং আমাদের নানা দুঃখ দৈন্য, রোগ শোকের অবসন্নতার মাঝে তবু ইহা যুবকদের মধ্যে কতকটা প্রাণের স্পন্দন লইয়া আসে। এই খেলার আরও প্রসার বাঞ্ছনীয় এবং বাঙ্গালীরা যাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরবের অধিকারী পুনরায় হইতে পারেন তাহাও সকল বাঙ্গালীই ইচ্ছা করেন।

কিন্তু, এ প্রসঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়দের এবং ক্রীড়া-মোদীদের একথাটা মনে রাখা দরকার যে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি সত্য হইলেও, আমাদের জীবনে ক্রীড়ার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে; সেই সীমা যাহাতে ইহা অতিক্রম করিতে না পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পরিমাণ-সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলিলে, সীমা অতিক্রম করিলে, অমৃতও বিষ হইয়া উঠে। সম্ভবতঃ আমাদের ন্যায় অন্যেরাও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আমাদের শিক্ষিত যুবকদেরও অনেকেই খেলাধূলার সংবাদ ও খেলোয়াড়দের

(এই সঙ্গে ফিলম্ ষ্টারদেরও) নাম ও পরিচয় ব্যতীত জগতের আর প্রায় কোন সংবাদই রাখেন না;—সংবাদ পত্রেও তাঁহাদের আগ্রহের বিষয় এই একটি মাত্র এবং ইহাই তাহাদের আলাপ-আলোচনার প্রধান বিষয়। এ অবস্থাটা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। লেখকের জানা আছে কোন একটা মফঃস্বল সহরে, দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে সাহায্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট লোক একটা সভার অনুষ্ঠান করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু, তাঁহাদের শঙ্কা ছিল যে, খেলা দেখার লোভ ত্যাগ করিয়া লোকে সভায় যোগদান করিতে চাহিবে না। তাঁহাদের আশঙ্কা শেষ পর্য্যন্ত মিথ্যা হয় নাই। এই অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রয়োজন হইবে না।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে টীমগঠন

মহামেডান স্পোর্টিং এই তৃতীয়বার লিগবিজয়ী হইলেন। তাঁহাদের এই দুর্লভ সম্মানে আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। ফুটবলে তাঁহারাই ভারতের সম্মান ও গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন—যদিও ইহাদের খেলোয়াড়েরা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহ হইতে সংগৃহীত না হইয়া বাংলা হইতে সংগৃহীত হইলে বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের আরও অধিকতর আনন্দের কারণ হইত। কিন্তু এসম্পর্কে অন্য দিক দিয়া আমাদের একটা বলিবার কথা আছে। সাম্প্রদায়িকতা আমাদের রক্তমাংসে এমনভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে সাম্প্রদায়িক সকল ব্যাপার সম্বন্ধেই আমাদের বিশেষভাবে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। নিজ নিজ প্রিয় টিমের প্রতি লোকে কত অনুরক্ত হইয়া থাকে, ইহা লইয়া কতটা উত্তেজনা, বিভিন্ন টিমের সমর্থকদের মধ্যে কিরূপ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।

আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা, উত্তেজনা কোন কারণ ব্যতীতও যথেষ্ট বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার সহিত খেলার প্রতিযোগিতা মিশিয়া অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিতেছে। খেলার উৎসাহ, আগ্রহ যুবকদের মধ্যেই বেশী এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে টিম গঠনের ফলে তাঁহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব অধিকতর শাণিত হইয়া উঠিতেছে। আশা করি মহামেডান স্পোর্টিংএর কর্ত্তৃপক্ষ, খেলোয়াড় ও সমর্থকগণ কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন।

জার্ম্মান স্কলারশিপ

জার্ম্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর বিদ্যা অধ্যয়নের নিমিত্ত 'Deutsche Akademie ১৯৩৬-৩৭ সালের জন্য ১৭ জন ভারতীয়কে নূতন বৃত্তি দান করিয়াছেন। নাম দেখিয়া মনে হইল ইঁহাদের মধ্যে আট জন বাঙ্গালী আছেন। ইঁহাদের দুইজন মহিলা।

"বর্ব্বরোচিত" ব্যবহার

'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত নিজস্ব সংবাদদাতার বিবরণ হইতে মহাত্মাজী জানিয়াছেন যে, দেব কোট পঞ্চায়েত বোর্ডের কোন সভায় প্রচলিত কার্য্যধারা অবলম্বিত হইয়াছিল; অর্থাৎ ইহার হরিজন সদস্য সভার ঘরে ঢুকিয়া হাজিরা খাতায় নাম স্বাক্ষর করিবার পর সভা-ঘরের বহির্ভাবে গিয়া দাঁড়ান এবং সভার কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানেই দাঁড়াইয়া থাকেন। হরিজন পত্রিকায় মহাত্মাজী ইহাকে "বর্ব্বরোচিত" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ সংবাদ সাধারণের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য আনয়ন করে নাই অথবা দক্ষিণ দেশের সংবাদপত্রসমূহও ইহাকে কোন গুরুত্ব দেন নাই। অর্থাৎ এই প্রকার অবস্থা যে সাধারণ এবং লোকে যে ইহাতে অভ্যস্ত, ইহার দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। অনুন্নত হিন্দুদের প্রতি অনুচিত ব্যবহার কোন না কোন আকারে দেশের সর্ব্বত্রই চলিতেছে।

ভারতের জনসংখ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

সেন্সাস্ রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ মুখার্জ্জী জুলাই মাসের মডার্ণ রিভ্যু পত্রিকায় ভারতের জনসংখ্যা সম্পর্কীয় কয়েকটি চিত্তাকর্ষক কথার অবতারণা করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল।

ভারতবর্ষ ও অন্য কয়েকটি দেশের সহরবাসীর সংখ্যানুপাত

দেশ	মোট জনসংখ্যার শতকরা
ভারতবর্ষ	১১
ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌	৮০
উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড	৫১
কানাডা	৫৪
ইউ-এস-এ,	৫৬
ফ্রানস্‌,	৪৯

অধিবাসীদের বয়স হিসাবে (০-১৫, ১৫-৫০, ৫০ এবং তদূর্দ্ধ) তিনটি দলে ভাগ করিলে প্রতিভাগের শতকরা অনুপাত নিম্নরূপ

জনসংখ্যার শতকরা অনুপাত

	বয়স ০—১৫	বয়স ১৫—৫০	বয়স ৫০ ও তদূর্দ্ধ
ভারতবর্ষ	৩৯.৯	৫০.৫	৯.৬
যুক্তপ্রদেশ	৩৮.৯	৫১.৩	৯.৮
বাংলা	৪০.৮	৫১.১	৮.১
বিহার ও উড়িষ্যা	৪০.২	৫০.২	৯.৬
বম্বে	৩৯.৭	৫১.২	৯.১
মাদ্রাজ	৩৮.৯	৫০.৫	১০.৬
পাঞ্জাব	৪১.২	৪৮.১	১০.৭
হিন্দু	৩৯.২	৫০.৯	৯.৯
মুসলিম	৪২.২	৪৯.৩	৮.৫
খৃষ্টান	৪১.৭	৪৯.২	৯.১
শিখ	৩৯.৫	৪৮.২	১২.৩
পার্শী	২৭.৭	৫৬.৭	১৬.১

ভারতবর্ষে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম এবং ক্রমেই কমের দিকে যাইতেছে। প্রতি ১০০ জন পুরুষে বিভিন্ন সেন্সাসে স্ত্রীলোকের সংখ্যা:

১৮৮১-৯৫ : ১৮৯১-৯৬ : ১৯০১-৯৬ ; ১৯১১-৯৫ ১৯২১-৯৫ : ১৯৩১—৯৪।

গত সেন্সাসে প্রতি ১০০ জন পুরুষে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীলোকের সংখ্যা হিন্দু ..৯৫ : খৃষ্টান...৯৫ : জৈন...৯৪ : পার্শী ৯৪ : মুসলিম...৯০ : শিখ...৭৮।

সন্তানোপযোগী বয়সের স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যানুপাত আরও অধিক শিক্ষনীয় হইবে পুরুষের পক্ষে এই বয়স ২০-৫০ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ১৫-৪৫।

প্রতি ১০০ জন পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা (সন্তানোপযোগী বয়সের)

মোট সংখ্যার- অনুপাত	সন্তানোপযোগী বয়সের অনুপাত
হিন্দু...৯৫	১০৬
খৃষ্টান...৯৫	১০৪
জৈন...৯৪	৮০
মুসলিম...৯০	১০২.৬
শিখ...৭৮	৮৫

সন্তানোপযোগী বয়সের হিন্দু স্ত্রীলোকদের যে আনুপাতিক সংখ্যাধিক্য দেখা যাইতেছে, হিন্দুদের মধ্যে বিধবার সংখ্যাধিক্যের জন্য তাহার সুফল হইতে হিন্দুসমাজ বঞ্চিত আছেন। হিন্দুদের মধ্যে সন্তানোপযোগী বয়সের বিধবার সংখ্যা প্রায় ৮৩ লক্ষ। ইঁহাদের বাদ দিলে এই বয়সের হিন্দু স্ত্রীলোকদের আনুপাতিক সংখ্যা প্রতি ১০০ জন পুরুষে দাঁড়ায় ৮৯.৭ মাত্র। ইহা হিন্দুদের বৃদ্ধি না পাইবার একটা প্রধান কারণ। Dr. Huttonএর মতে এই বৃদ্ধি আরও কম দেখা যাইত যদি না, আদিম জাতির বহুসংখ্যক লোক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিত। বৃদ্ধির এই উপায় অবশ্য চিরদিন স্থায়ী হইবে না। লেখকের মতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যার এই বৈষম্য সাম্প্রদায়িক শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতেছে এবং বাংলায় ও পাঞ্জাবে নারী হরণের অতিবৃদ্ধির মূলে এসব কারণ রহিয়াছে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিবারের গড় আয়তন

হিন্দু...৪.৩ : শিখ...৪.১ : মুসলিম ..৪.১ : খৃষ্টান...৫।

বিবাহের সময় স্ত্রীর বয়সের সহিত পরিবারের আয়তন মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সকল বয়সে বিবাহিত

স্ত্রীলোকের সন্তানের গড় জন্মসংখ্যা ৪.২, এবং তাহার মধ্যে বাঁচিয়া থাকে ২.৯ ; কিন্তু, বিবাহের সময় স্ত্রী যত অধিক বয়স্ক হন, এই সংখ্যা দু'টিও তত বাড়িয়া যায়। ৩০ এবং তদূর্দ্ধে যাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে তাঁহাদের সন্তানের জন্মসংখ্যা ৫.১ এবং বাঁচিয়া থাকিবার সংখ্যা ৩'৬। ২০-৩০এর মধ্যে বিবাহিতের মধ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৪.৩ এবং ৩'১। আমাদের বিবাহিত স্ত্রীলোকের গড়পড়তা ৪টি সন্তান জন্মে ও তাহার মধ্যে ২.৯ বাঁচিয়া থাকে অর্থাৎ শতকরা ৩০টি মারা যায় এই অপব্যয়ের মধ্য দিয়া আমাদের জাতি বাড়িতেছে।

Raymond Pearl এর প্রবর্ত্তিত গণনা অনুসারে দেখা যায় যে, বাংলায় শেষ পর্য্যন্ত মুসলমানদের জনসংখ্যা হইবে ৩২ নিযুত এবং হিন্দুদের হইবে ২৪ নিযুত। বর্ত্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা ২৭.৮ নিযুত এবং হিন্দুদের ২২ নিযুত।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির এই বৈষম্য সম্বন্ধে ভুজঙ্গবাবু বলিয়াছেন,—"বৃদ্ধির এই বৈষম্য সম্প্রদায়গুলির সামর্থ্যসমতা বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছে। বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দ্রুত শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছেন এবং তাঁহাদের এই দ্রুত অবনতি সত্য সত্যই ভয়ের কারণ হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষা, মার্জ্জিত জীবন, বিলম্বে বিবাহ এবং জীবনযাত্রার উচ্চ মান, এগুলির সবই জন্মসংখ্যা হ্রাস করে এবং ইহারা সম্প্রদায়ের উচ্চবর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যেই মাত্র ক্রিয়াশীল। অন্যদিকে, পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্রেণীগুলি এই সকল প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই এবং এসব তাহাদিগকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে নাই। ইহারা দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে এবং আমাদের শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে ও কৃষ্টিতে যাহাদের দান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ও অধিক মূল্যবান সেই শিক্ষা ও কৃষ্টির অধিকারী শ্রেণীগুলিকে তাহার মূল্য যোগাইতে হইতেছে। দেশের জনসংখ্যার এই বর্দ্ধমান ভুলগতি প্রকৃত শঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করা যাইতেছে যে হিন্দুরা এখন ক্ষয়িষ্ণু জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল থাকিলেও বর্ত্তমানে দ্রুত ধ্বংসের পথে যাইতেছে এবং সংখ্যা, গুরুত্ব ও প্রতিপত্তিতে দ্রুত স্থানচ্যুত হইতেছে। নদীগুলি মরিয়া যাওয়াই এরূপ ঘটিবার সর্ব্বপ্রধান কারণ ; দুইভাবে ইহার ফল দেশের উপর বিষময় হইয়াছে। বন্যার জলে দেশের এই সকল অংশ ভালভাবে ধুইয়া না যাওয়ায় এবং ভালভাবে ইহার জল নিকাশিত না হওয়ায় ম্যালেরিয়ার বহুব্যাপক মহামারির আবির্ভাব হইয়াছে, এবং তাহার ফলস্বরূপ আসিয়াছে স্বাস্থ্যহীনতা, আয়ের ক্ষতি, ক্ষীণ উৎপাদিকাশক্তি, ন্যূন জন্মহার এবং ক্ষীণ জীবনীশক্তি। অন্যদিকে, যে নদীবাহিত উর্ব্বর পলিমাটি সঞ্চিত হইয়া বাংলার জমিকে প্রতি বৎসর তাজা করিত এবং যাহা অতীতকালে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অতিশয় বৃদ্ধি করিত, নদীগুলির অবনতির ফলে, বাংলা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এই উভয় কারণেরই পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে এমন একটি দূষিত পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া ক্রমশঃই কঠিন হইয়া উঠিতেছে।"

সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন

আমরা যে সকল কার্য্য পছন্দ করি না, যে সকল কার্য্য আমাদের আদর্শ ও রুচির বিরোধী, জীবনধারণের নিমিত্ত আমাদের অনেক সময় সেগুলি করিতে হয়। কেহ হয়ত কলহ বা মারামারি পছন্দ করেন না, কিন্তু তাঁহার প্রতিবেশী যদি কলহ করেন বা তাঁহার উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করেন তবে তাঁহাকেও কলহ বা মারামারি করিতে হইবে। যুদ্ধও আমাদের পক্ষে এইরূপ একটি কার্য্য,—যুদ্ধ আমরা পছন্দ না করিতে পারি, কিন্তু তবুও দেশ রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎসতা ও নৃশংসতা বেশীর ভাগ লোককেই দেখিতে হয় না ; সুতরাং সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, দেশের উন্নতিমূলক কার্য্যাদি অবহেলা করিয়া বা সে গুলিতে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া, হাজার হাজার অনশনক্লিষ্ট নরনারীর মুখের দিকে না তাকাইয়া, সৈন্যদের বেতন, খাদ্য প্রভৃতিতে ও সামরিক সাজ সরঞ্জামে কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হয় ইহা অনেকেই পছন্দ করেন না ; কিন্তু, তথাপি সর্ব্বদেশেই দেশরক্ষার নিমিত্ত প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হয়—একদল লোকের স্বাধীন চিন্তা, বিবেক বুদ্ধি নষ্ট করিয়া যন্ত্রে পরিণত করিতে হয়। (পৃথিবীর সকল দেশেই যে শুধু দেশ রক্ষার

আয়োজন করেন এমন কথা বলিতে চাহি না : পরন্তু, পৃথিবীর সমুদয় শক্তিশালী জাতিই পরদেশ লুণ্ঠনের আশায়, নিজ নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য কখনও বা অধিকৃত সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য, শুধু দেশরক্ষার নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন তদপেক্ষা অনেক বেশী অর্থ সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় করিয়া থাকেন। এবং একথাও সত্য ঐ সকল জাতির ধনলিপ্সাই পৃথিবীর মোট দুঃখ কষ্টের চৌদ্দ আনার জন্য দায়ী)। পৃথিবীর এত অর্থ ও লক্ষ লক্ষ কর্ম্মঠ যুবকের কর্ম্মশক্তি অনর্থক ব্যয়িত না হইয়া, এই অর্থ ও কর্ম্মশক্তি লোকহিতকর কর্ম্মে ব্যয়িত হইলে পৃথিবীর সুখ সাচ্ছন্দ্য অনেক বৃদ্ধি পাইত সে কথা সত্য। কিন্তু যতদিন সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকের শোষণরথের চক্রে পৃথিবী পিষ্ট হইতে থাকিবে, ততদিন শান্তিকারী কোন দুর্ব্বল জাতিরও সামরিক নিরপত্তা, অপরের আক্রমণে যাহাতে বিপন্ন হইয়া না পড়ে তজ্জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশের কোন দিন সাম্রাজ্য লাভ করিবার আশা নাই, তাহাদেরও দেশরক্ষার নিমিত্ত প্রভূত আয়াস স্বীকার করিতে হয়।

একথাও সত্য, সকলদেশকেই, কি ধনশালী, কি দরিদ্র, সামরিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করিবার জন্য প্রভূত কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। আর্থিক দিকের কথা গণ্য না করিলেও, পৃথিবী হইতে যুদ্ধের ন্যায় একটি পাশববৃত্তি যত শীঘ্র লোপ পায় ততই মঙ্গল। কিন্তু, লোপ পাওয়া দূরে থাকুক স্বাধীন ও সভ্য দেশসমূহের রণসজ্জার বৃদ্ধির বহর দেখিয়া মনে হয় এই বৃত্তি আত্মঘাতী গতিতে বাড়িয়াই চলিয়াছে। রণ-সজ্জার কমাইবার জন্য প্রধান শক্তিবর্গের মধ্যে যে সকল কথা বার্ত্তা চলিয়াছে বা সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে তৎসমুদয়ই ব্যর্থ হইয়াছে। এখন প্রবলতম ও প্রধানতম শক্তিবর্গ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা ও রণসম্ভার উপযুক্ত (?) পরিমাণে সংগ্রহ করাই পৃথিবীর শান্তিরক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত পন্থা; এবং তদনুযায়ী সকলে প্রস্তুতও হইতেছেন। শান্তিরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেও, ঐ সকল দেশ সুযোগ ও সুবিধা পাইলে ছলছুতায় দুর্ব্বল জাতিকে পীড়ন করিবেন না সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইবেন না এমন নিশ্চয়তা কিছু নাই, বরং আশঙ্কা যে আছে, তাহারই প্রমাণ নিত্য পাওয়া যাইতেছে।

একথা সত্য, আমরা ইংরাজের অধীন; সুতরাং উপস্থিত আমাদিগকে পরিশ্রম করিয়া দেশ রক্ষার গুরুদায়িত্ব লইবার জন্য সচেষ্ট না হইলেও চলিবে। কিন্তু দেশ রক্ষার ভার ভারতবাসীকে স্বহস্তে লইতে হইবে এমন আশা করা অসঙ্গত নয়। এদিকে বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত, যুদ্ধের সহজে-লোকক্ষয়কারী নানাপ্রকার কৌশলও আবিষ্কৃত হইয়াছে, আবার রণ-ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করাও দু' এক পুরুষের কাজ নয়। সুতরাং রণ-ব্যবসায়ে আমাদের অন্যান্য সভ্যদেশের ন্যায় নিপুণতা লাভ করা নিশ্চয় উচিৎ।

ফিলিপাইন এতদিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন ছিল, তাহাদের অবস্থাও ছিল আমাদের অনুরূপ। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক ফিলিপাইনের স্বাধীনতা ঘোষিত হইবার পর, সেখানে দেশ রক্ষার সমস্যা দেখা দিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সামরিক-শিক্ষার সার্টিফিকেট দিবার জন্য যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা সমস্যার তুলনায় সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদতিরিক্ত কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেটুকু করিতে অগ্রসর হইয়াছেন সে জন্যই তাঁহারা সমস্ত বঙ্গবাসীর ধন্যবাদার্হ। আশা করি, বঙ্গের যুবকগণ এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবেন।

সিনেট সভায় সামরিক শিক্ষা সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক

সামরিক শিক্ষার পরিকল্পনার আলোচনাকালে গত ২৭শে জুন তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় যে তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, তাহা নানাদিক দিয়াই উপভোগ্য। নিম্নে আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পরিকল্পনার বিরোধীতা করিয়াছিলেন তিন জন ইউরোপীয়ান সভ্য—ডাঃ জেঙ্কিন্স, ডাঃ আর্কুহার্ট ও অধ্যাপক ক্যামেরণ। ডাঃ জেঙ্কিন্স বলেন পরিকল্পনাটী যেভাবে করা হইয়াছে তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার উৎকর্ষের হানি হইবে। অধ্যাপক ক্যামেরণও কতকটা ঐ ভাবের কথা বলেন। ডাঃ আর্কুহার্ট বলেন:

"কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য দেশসমূহে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সামরিক শিক্ষার বিস্তার একটি বিতর্কমূলক বিষয় বলিয়া

পরিগণিত। যেকোন বিশ্ববিদ্যালয়েই হউক না কেন ছাত্রদিগকে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিলে দেখা যাইবে তাহারা সামরিক শিক্ষা বিস্তারের বিরোধী। আমার মনে হয় সমর সজ্জায় আগ্রহাতিশয্যই পৃথিবীর বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলার জন্য অনেকাংশে দায়ী।"

দুই চারিজন দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে সামরিক শিক্ষার বিস্তার বিতর্কমূলক বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইলেও, দেশের যাঁহারা নেতা বা শাসক তাঁহারা সামরিক শিক্ষার সমর্থনই করিতেছেন। অবশ্য কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমিতি 'যুদ্ধ-বিরোধী' প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ এসম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এবং যুদ্ধবিরোধী মত পোষণ করিলেও যে, সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকিয়া যায়, পূর্ব্বে তাহা দেখান হইয়াছে।

ডাঃ আর্কুহার্টের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত সি, সি, বিশ্বাস বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন :

"পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিকামী দেশ ; কিন্তু ভারতবর্ষ ক্রমেই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে যে সে নিরস্ত্র ;—অন্যান্য দেশের ন্যায় সামরিক শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ তাহার নাই।......পূর্ব্বোক্ত বক্তারা আমাদের যে ভাবে উপদেশ দিলেন, সে ভাবে আমাদের উপদেশ দেওয়া নিরর্থক : তাঁহাদের সু-পরামর্শ গ্রহণ করিতে আমরা অক্ষম। নিজেদের দেশের সমর সজ্জার গতি সংযত করিতে যাঁহারা পারেন না, তাঁহারা আমাদিগকে এইরূপ হিতকর উপদেশ দিলে বড়ই অদ্ভুত শোনায়। আমরা আমাদের ভাল বুঝি ; আমাদের ছাত্রদের মঙ্গল কিসে হয় তাহাও বুঝি। এবং, আমাদের ছাত্রদের পক্ষ হইতে আমি বলিতে চাহি, এই প্রস্তাব আমাদের ছাত্রদের মঙ্গলই করিবে। এই প্রস্তাব সর্ব্বাংশে সমীচীন হইয়াছে।"

অধ্যাপক জে. এল, বানার্জ্জি বলেন :

"ডাঃ জেঙ্কিন্স ও ডাঃ আর্কুহার্টের দেশবাসীগণ বলিয়া থাকেন যে আমরা নিজেদের দেশ রক্ষা করিতে অসমর্থ বলিয়াই স্বায়ত্তশাসন পাইবার উপযুক্ত আমরা নহি। 'তোমরা তোমাদের দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে অক্ষম' এই অপবাদ তাঁহারা আমাদের বিশেষভাবে দিয়া থাকেন। কিন্তু এখন, যখন বিশ্ববিদ্যালয় এই অপবাদ স্খালনের চেষ্টা করিতেছেন, তখন তাঁহারাই বাধা দিতেছেন—ডাঃ আর্কুহার্ট তাঁহার আদর্শ শান্তিবাদ দ্বারা, ডাঃ জেঙ্কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উৎকর্ষ-হানির দোহাই তুলিয়া।"

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতার উপসংহার করিয়া বলেন :

"অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, লণ্ডন, এডিনবরা, মানচেষ্টার এবং ডাবলিনের কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম কানুনে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।...

বিশ্ববিদ্যালয় যাহা করিতেছে ছাত্রদের স্বার্থের দিক চাহিয়াই তাহা করিতেছে ; কাজেই ছাত্রদের ইহাতে পূর্ণ সমর্থন আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।"

কোচিনে সেবাদাসী নিরোধ আইন প্রবর্ত্তন

কোচিনের মহারাজা সেবাদাসী নিরোধ আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই আইনে কোন হিন্দু মন্দিরে, অর্চ্চনা স্থানে অথবা অন্যত্র, কোন হিন্দু স্ত্রীলোককে সেবাদাসী করা অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি সেবাদাসী উৎসর্গ উৎসবের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাতে অনুমতি দিবে, যোগদান করিবে অথবা সাহায্য করিবে, তাহাকে এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

ধর্ম্মের নামে আমাদের দেশে যে সকল বীভৎস ও কুৎসিত প্রথা প্রচলিত আছে, সেবাদাসী-উৎসর্গ প্রথা তাহাদের অন্যতম। শিশু বয়সেই বালিকাগণকে সেবাদাসী রূপে উৎসর্গ করা হয় ; এবং সেই শিশু বয়স হইতেই বালিকাগণকে ধর্ম্মের নামে ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে হয়। ধর্ম্মের নামে অগণিত বালিকার সর্ব্বনাশ—স্বাভাবিক ও সামাজিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধর্ম্মের নামে দুশ্চরিত্রের লাম্পট্য ও লালসার নিকট সরল নিষ্পাপ বালিকাগণকে বলি, ভারতবর্ষের বিরাট হিন্দু সমাজ কি করিয়া চক্ষু বুজিয়া সহিয়া আসিয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

এই ঘৃণিত প্রথার কুফল ও নৃশংসতা শুধু উৎসর্গীকৃত বালিকাগণেই আবদ্ধ নহে। পরোক্ষভাবে এই প্রথা আমাদের যে সকল অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই প্রথার প্রত্যক্ষ কুফলও অল্প নহে। সমাজের কোনরূপ নিন্দা গ্লানি সহ্য না করিয়া বরঞ্চ পরোক্ষভাবে সমাজের সমর্থন লাভ করিয়া, কোনরূপ দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া যাহারা সেবাদাসীর সংস্পর্শে আসিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে কি নিজেদের উপর, কি নারীজাতির উপর, কোন শ্রদ্ধা বা সম্মানের ভাব পোষণ করা অসম্ভব। এবং যাহাদের নিজেদের উপর বা স্ত্রী, ভগিনী বা মাতার উপর কোন আস্থা বা শ্রদ্ধা নাই তাহাদের মত শত্রু সমাজের আর নাই—সামাজিক ও পারিবারিক সকল প্রকার মহান আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া তাঁহারা তো নিজেরা পশুবৎ হয়-ই, পরন্তু এই আদর্শ গুলিকেও তাহারা হীন করিয়া ফেলে।

এই ঘৃণ্য এবং সমাজ ও পারিবারিক জীবন বিধ্বংসকারী প্রথা নিজ রাজ্য হইতে লোপ করিতে কোচিনের মহারাজা অগ্রসর হওয়ায় সকল হিন্দুই মহারাজার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। অন্য যে সকল স্থানে এই ঘৃণ্য ও নৃশংস প্রথা প্রচলিত আছে সে সকল স্থানেও এই প্রথা রহিত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা হওয়া উচিত।

বরিশালে পতিতাগণের সন্তানদিগের শিক্ষার অসুবিধা

সম্প্রতি সংবাদপত্রে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :

বরিশাল, ২৪শে জুন।

> জানা গিয়াছে যে, সহরের পতিতাগণ জেলার স্কুল ইনস্পেক্টর এবং বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের নিকট তাহাদের সন্তানগণের শিক্ষার অসুবিধা বিষয়ে আবেদন করিয়াছে। সহরের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তাহাদের সন্তানগণকে ভর্ত্তি করিতে দেওয়া হয় না। তাহারা তাহাদের সন্তানগণের শিক্ষার অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে তাহাদিগকে ভর্ত্তি করিবার ব্যবস্থা কিংবা তাহাদের নিমিত্ত বিশেষ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবার প্রার্থনা করে। ইউ-পি

অনেক সময় দেখা যায়, যে দোষ আমাদের নিজেদেরই সেই দোষ অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া তাহাদের সর্ব্বপ্রকার অসুবিধায় ফেলিবার চেষ্টা করি। আমাদের সামাজিক কুব্যবস্থা, স্ত্রীলোকের প্রতি হৃদয়হীন ব্যবহার, স্ত্রীলোকের আর্থিক দুর্গতি, বিধবা বিবাহের অ-প্রচলন, দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচার হইতে নারীদিগকে রক্ষা করিবার অক্ষমতা ও তৎসহ ধর্ষিতা নারীদের সমাজে স্থান না পাওয়া, ভদ্রের ছদ্মবেশধারী সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোক কর্ত্তৃক প্রলোভন প্রদর্শন—এই সকল কারণের একটি না একটি যে প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই স্ত্রীলোকের পতিতাবৃত্তি অবলম্বনের মূলে রহিয়াছে তাহা সর্ব্বজন বিদিত। এই কারণগুলির জন্য পুরুষই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী সে কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ এই পতিতারাই যখন তাহাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে শিক্ষার আলোকে আনিয়া 'মানুষ' করিয়া তুলিতে চায় তখন নানাপ্রকার কাল্পনিক কারণ দর্শাইয়া তাহাতে বাধা জন্মাইতে আমাদের কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হয় না।

বরিশালে যাঁহারা বাধা জন্মাইতেছেন তাঁহারা বলিবেন, পতিতারা চরিত্রহীন—চরিত্রের নৈতিক নিষ্ঠা বলিয়া তাহাদের কিছু নাই, সুতরাং তাহাদের সন্তান-সন্ততিদিগেরও যে নৈতিক নিষ্ঠা বলিয়া কিছু থাকিবে না সে কথা স্বতঃসিদ্ধ। এরূপ স্থলে পতিতাগণের সন্তানদিগের সংস্পর্শে ভদ্রপরিবারের সন্তানদিগের নৈতিক অবনতি ঘটিবে।

প্রথমতঃ পতিতামাত্রেরই নৈতিক নিষ্ঠা বলিয়া কিছু নাই একথা মনে করা ভুল। কোন কোন মনীষি বলিয়া থাকেন সন্তানবতী পতিতাদের নৈতিক চরিত্র যত হীন আমরা মনে করি তাহাদের নৈতিক চরিত্র তত হীন নহে—যে নারীর হৃদয়ে মাতৃস্নেহ মুকুলিত হইয়াছে, অবস্থার বিপাকে পড়িয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইলেও, তাহার নৈতিক অবনতি না ঘটিবারই কথা। এস্থলে বরঞ্চ বলা যায়, যে সকল পতিতা সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য লালায়িত হইয়াছেন তাঁহাদের নৈতিক অবনতি না-ও ঘটিতে পারে।

যদি ধরিয়াই লওয়া যায় মাতারা নৈতিক চরিত্রে হীন তাহা হইলেও যে সকল পতিতা সন্তানদিগের শিক্ষালাভের জন্য ব্যগ্র তাঁহারা নিশ্চয়ই চাহেন না যে তাঁহাদের পুত্র কন্যারাও

তাঁহাদের মত ঘৃণিত ও দুঃখময় জীবন যাপন করুক *। যদি সেরূপই চাহিতেন তবে সন্তানদিগকে শিক্ষা দিয়া 'মানুষ' করিবার চেষ্টা না করিয়া অশিক্ষা দ্বারা ও কলুষ আবহাওয়ার ভিতর পুষ্ট করিয়া পশুবৎ করিবারই চেষ্টা করিতেন। এবং যে সকল পতিতা আপন সন্তানদিগের উন্নতি কামনা করিতেছেন তাঁহারা যে গৃহেও সন্তানদিগকে সর্ব্বপ্রকার কলুষ আবহাওয়া হইতে দূরে রাখিতে সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন করিবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। মাতাদিগের সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন সত্বেও যদি কোন স্কুলগামী বালক বালিকা কলুষ আবহাওয়ার প্রভাবে নষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত মাতারা ব্যর্থ চেষ্টা করিবেন না বলিয়াই মনে হয়। মাতারা যদিও চেষ্টা করে, বিদ্যালয় সমূহের কর্তৃপক্ষ সব বালক বালিকার শিক্ষার পথ রুদ্ধ না করিয়া, এরূপ বালক বালিকাকে বিদ্যালয়ে না রাখিতেও পারেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, পতিতাগণের সন্তানদিগের নিমিত্ত পৃথক বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা এরূপ মত পোষণ করি না। শিশুকাল হইতেই যদি পতিতাগণের সন্তানদিগের মনে, তাহারা যে সাধারণ হইতে নীচু, তাহারা যে নিম্নস্তরের, তাহাদেরকে যে সমাজ ঘৃণা করিয়া থাকে ইত্যাদি ভাব সকল মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহারা নিজেদের প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধার ভাব ও সমাজের প্রতি এরূপ বিদ্বেষভাব লইয়া বড় হইবে যে, তাহারা নিজেদের ত কোন উন্নতিই করিতে পারিবে না, পরন্তু সমাজের ঘোর শত্রু হইবে। বস্তুতঃ যে সকল শিশু সহৃদয় ব্যবহার, স্নেহ প্রীতি হইতে বঞ্চিত থাকে, অপরের ঘৃণার বস্তু হয় তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই বড় হইয়া সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে পারে—ইহাদের অধিকাংশ, বড় হইয়া সৌভাগ্য লাভ করিলেও, সমাজের প্রতি, সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি, সমাজে যাঁহারা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে, শক্তি অনুযায়ী সমাজকে আঘাত করিতেও ছাড়ে না। ইহাত গেল, যে সকল শিশু সাধারণ শিশুরা যাহা পায় তাহা হইতে বঞ্চিত থাকে তাহাদের কথা। ইহার উপর শিক্ষিত পতিতা-সন্তানগণের আরও একটি দুঃখ আছে। বালক-বয়সে অপরের নিকট হইতে ঘৃণা ও হৃদয়হীন ব্যবহার লাভ করিয়া বড় হইয়া তাহারা যখন দেখিবে, শিক্ষা বা সামর্থ্যে অন্যের চেয়ে হীন না হইলেও সমাজে কোন স্থান তাহাদের

* ১৯২০-২১ সালে মহাত্মা গান্ধী এই বরিশালেরই পতিতাগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাহাদিগের সম্বন্ধে মহাত্মাজী যাহা লিখিয়াছিলেন এখানে তাহার দু'এক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। ঐ উদ্ধৃতাংশ হইতে দেখা যাইবে স্বাভাবিক সরল ও পারিবারিক জীবনের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ কত গাঢ়—নিজেদের পুত্র-কন্যাদের এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের সংস্পর্শে আসিতে না দিয়া পরস্পরের পুত্র-কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন:

"Between them (the prostitutes of Barisal) all they told me they had six girls and four boys, the eldest of whom was married to one of their own class. The girls were to be brought up to the same life as themselves, unless something else was possible."

এই পতিতাগণ ঘৃণ্য জীবন হইতে মুক্তি আকাঙ্ক্ষাও করিত—

"That these women should have considered their lot beyond repair was like a stale in the living flesh." মহাত্মাজীর এই লেখাটি হইতেই দেখা যায় পতিতাগণের নৈতিক চরিত্র উন্নত ছিল। মহাত্মাজী লিখিয়াছেন:

"And yet they were intelligent and modest. Their talk was dignified, their answers were clean and straight; and for the moment their determination was as firm as that of any Satyagrahi. Eleven of them promised to give up their present life and take to spinning and weaving from the following day if they received a helping hand. The others said they would take time to think, for they did not wish to deceive me."

নাই—সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক ও সামাজিক জীবনযাপন করিবার প্রণালীগুলি তাহাদের পক্ষে রুদ্ধ তখন তাহারা সমাজের, সমাজে যাঁহারা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন, যাঁহারা সম্মানিত, যাঁহারা সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করিতেছেন তাঁহাদের ঘোর শত্রু হইয়া উঠিবে। সুতরাং পতিতাগণের সন্তানদিগের পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থার দ্বারা হিত হইতে অহিত-ই অধিক হইবে।

সম্মিলিত সাম্প্রদায়িক দল

কোন ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কোন সম্মিলিত রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা যে স্বাভাবিক নহে, তাহা যে দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রসূও হইতে পারে না তাহা আমরা পূর্ব্বে কয়েকবার দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান বলিয়া অথবা মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ কৃষক বলিয়া, মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষিত হইলে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্ম সম্মিলিত মুসলিমদলের উপযোগিতা আছে, এই প্রকারের যুক্তিও যে ভুল তাহাও আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বরং এই কথা বলা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ লোক কৃষক বলিয়া কৃষকদের স্বার্থ রক্ষিত হইলে মুসলমানদের অধিকাংশের স্বার্থ রক্ষা পাইবে। যদিও মুসলমানদের মুসলমান হিসাবে অথবা হিন্দুদের হিন্দু হিসাবে স্বতন্ত্র কোন স্বার্থ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। আর্থিক এবং সাম্প্রদায়িক বিভাগ অনেকটা মিলিয়া যাইবার ফলে পূর্ব্বোক্তরূপ ভুল যুক্তির সাহায্যে লোককে ভুলান সহজ হইতেছে।

যাঁহারা কৃষক ও প্রজার স্বার্থের এবং মুসলমানের স্বার্থের কথা একই সঙ্গে বলিতেছেন, তাঁহাদের মনে রাখা দরকার যে, কৃষক বা প্রজারা সকলেই মুসলমান নহেন তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু ও অন্যেরাও আছেন অপরপক্ষে মুসলমানদের সকলেই কৃষক বা প্রজা নহেন। তাঁহাদের মধ্যেও জমিদার, মহাজন (ইঁহাদের সংখ্যা অবশ্য অনেক কম) মধ্যসত্ত্বাধিকারী, ব্যবসায়ী, সরকারী চাকুরে, উকিল, ব্যারিস্টার, শিক্ষক প্রভৃতির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, এবং ইঁহাদের মধ্যে একটি দ্রুতবর্দ্ধনশীল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিতেছে। এইরূপ যদি নাও হইত, মুসলমানেরা সকলেই যদি কৃষক হইতেন এবং কৃষকদের মধ্যে মুসলমান ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বী না থাকিত এবং অন্যদিকে জমিদার মহাজন মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সকলেই অন্যধর্ম্মের লোক হইতেন তবুও, কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সম্মিলিত মুসলিমদল গঠনের কোন উপযোগিতা আছে বলিয়া আমরা মনে করিতাম না এবং কোন সাম্প্রদায়িক দল গঠনকে দেশের পক্ষে সমানই ক্ষতিকর মনে করিতাম।

কারণ, সমাজের অর্থনৈতিক বিভাগের মধ্যেই প্রকৃত স্বার্থের বিরোধ নিহিত আছে এবং যাহারা কায়িক শ্রম করিয়া ধনোৎপাদন করে, পরিশ্রমজীবি সমাজের উচ্চস্তরের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগও থাকে। সেই স্বার্থের কথা, তাহা লাভ করা গেলে কি পরিমান উপকার হইবে তাহার কথা, সেই স্বার্থ অপরের দ্বারা কিভাবে ব্যাহত হইতেছে তাহার কথা, ভালভাবে জানিতে পারিলেই তবে সেই স্বার্থ লাভ করিবার জন্ম লোকের আগ্রহ জাগিতে পারে এবং বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভও ঘটিতে পারে। কিন্তু, মূল সমস্যাকে ঢাকিয়া রাখিয়া যদি তাহাকে অন্য নামে অভিহিত করা হয় তবে, প্রকৃত সমস্যার সহিত পরিচয় না থাকায়, প্রতিকারের চেষ্টাও ভুল পথে চালিত হয় এবং ইহাতে মূল সমস্যা দূরে সরিয়া গিয়া অন্য কতকগুলি লোকের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ ঘটে। সকল কৃষকই যদি মুসলমান হইতেন এবং মুসলমানেরা সকলেই যদি কৃষক হইতেন, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা হইলে যদি প্রকৃতও তাঁহাদের স্বার্থরক্ষা হইত, তবুও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নামে কাজ করিতে গেলে এই সম্প্রদায়েরই অনেক লোক পরীশ্রমজীবি হইয়া উঠিতেন এবং কৃষকদের দ্বারাই নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইতেন। আসল সমস্যার সহিত লোকের পরিচয় না থাকায়, তাঁহাদের এই স্বার্থপরতা লোকের চোখে ধরা পড়িত না এবং সাম্প্রদায়িক প্রীতির জন্য নিজসম্প্রদায়ের লোকের আর্থিক ও মর্য্যাদা প্রভৃতির উন্নতিতে (যদিও ইহার মূল্য সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণকেই যোগাইতে হয়) আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার গর্ব্ব অনুভব করিবার এবং সেই সব উন্নতিকে নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি মনে করিয়া আনন্দিত হইবার যে মনোভাব সৃষ্টি হয়, তাহা এই সব লোকদের স্বার্থপরতার সহায়ক হইত। ইহা গেল, কল্পিত একটা অপেক্ষাকৃত অনুকূল অবস্থার কথা। কাজেই, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সাম্প্রদায়িকদলের দ্বারা অনিষ্ট

হইবার সম্ভাবনা আরও বেশী রহিয়া গিয়াছে এবং এইরূপ দলের দ্বারা কাহারও কোন লাভ হইবার বিন্দুমাত্র আশাও নাই (কয়েকজন লোকের ব্যক্তিগত লাভ ছাড়া)। সম্মিলিত মুসলিম দলকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা কথাগুলি লিখিতেছি। সম্মিলিত মুসলিম দল যদি টিকিয়া থাকিয়া কাজ করিতে পারিতেন (অবশ্য তাহা পারেন নাই এবং বাংলার প্রায় সকল স্থানেরই প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মুসলমানেরা সম্মিলিত মুসলিমদলের সহিত তাঁহাদের যোগ না থাকিবার কথা জানাইয়াছেন) এবং তাঁহাদের কার্য্যের ফলে যদি মুসলমান কৃষকদের সাময়িক লাভ কিছু ঘটিতও তবু, মুসলমান কৃষকেরা শীঘ্রই দেখিতে পাইতেন যে নিজ সম্প্রদায়ের বনিক ও পরিশ্রমজীবিদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন হইয়াছে ; তাঁহাদের যে শক্তি নির্ভুল পথে চালিত হইলে, সমগ্র যুবকসম্প্রদায়ের সুখসুবিধা ও শক্তি বাড়িয়া যাইত, সেই শক্তিই তাঁহাদের বিপক্ষ দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছে ; সময় ও শক্তির প্রচুর অপব্যয় হইয়াছে, অবস্থা জটিলতর হইয়াছে, পূর্ব্বে যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ও সাহায্য পাইলে যাঁহারা সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন তাঁহারা প্রায় পরাজিত হইয়াছেন, এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করিবার সুযোগ নষ্ট হইয়াছে। হিন্দু বা মুসলমান কাহারও পক্ষেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দল গঠন কখনও শুভকর হইতে পারে না। জমিদার ও প্রজার ধর্ম্ম এক হইলেই তাঁহাদের স্বার্থ এক হয় না, আবার ধর্ম্ম ভিন্ন হইলেই দুইজন জমিদারের অথবা দুইজন প্রজার স্বার্থ ভিন্ন হইয়া যায় না। ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কাজ হইলে নেতাদের হাতে জনসাধারণের ঠকিবার আশঙ্কা আছে, এবং সমস্যা ও পথ সামনে সুস্পষ্ট না থাকায় ন্যায়নিষ্ঠ ও অকপট নেতার পক্ষেও নিজের অজ্ঞাতসারে জনসাধারণকে ভুলপথে পরিচালনা করিবার সম্ভাবনা আছে। অন্যদিকে অর্থনীতির ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ হইলে, সাধারণ লোকের কাছেও সমস্যার রূপ এবং তাহা সাধারণের পথ স্পষ্টতর হইবে বলিয়া নেতাদের কার্য্যাবলির উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার সুযোগ তাঁহারা পাইবেন এবং নেতাদেরও নির্ভুল পথে চলিবার সমস্যাকে সঠিকভাবে বিচার করিবার, আত্মসমালোচনা করিবার অধিকতর সুবিধা হইবে।

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ করিবার আরও বিপদ আছে এই দলে গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ঢুকিয়া পড়া, দলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করা এবং জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করা অনেক সহজ হইবে এবং বর্ত্তমানে লোকের মনে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি যেরূপ প্রবল, তাহাতে অন্যদের অপেক্ষা জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার ইঁহাদের পক্ষে সহজ হইবে।

কাজেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দলগঠন, তাহা স্পষ্টভাবে মুসলমানেরাই করুন আর প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুরাই করুন, দেশের পক্ষে যে ক্ষতিকর হইবে, কোন সম্প্রদায়কেই যে তাহা লাভবান করিতে পারিবে না, একথা সুনিশ্চিত।

হিন্দু সম্মিলনে গৃহীত প্রস্তাব

বরিশাল জিলা হিন্দু সম্মিলনে অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে নিম্নের প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হইয়াছে :

(১) ধোপা, নাপিত, পাটনী, বেহারা, নমঃশূদ্র প্রভৃতি হিন্দুগণ নিজ নিজ বৃত্তিমূলক সেবা সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুকে দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) হিন্দুসমাজ ধ্বংসকারী অস্পৃশ্যতা-মহাপাপকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সামাজিক ও পারিবারিক ভোজনগৃহে তথাকথিত অস্পৃশ্য হিন্দুগণকে প্রবেশ ও ভোজনাধিকার প্রদান এবং ঘোষণাপূর্ব্বক ঐরূপ অনুষ্ঠানসমূহ পবিত্র মঙ্গল কার্য্যরূপে গ্রহণ করিবার জন্য এই সভা জিলার সমগ্র হিন্দুসমাজকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে।

দারিদ্র্যের স্বরূপ

নিখিল বঙ্গ প্রজাসম্মিলনীর সভাপতিরূপে মৌলবী এ-কে-ফজলুল হক কৃষকদের বর্ত্তমান দারিদ্র্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"লক্ষ লক্ষ নরনারী আজ পেটের ক্ষুধায় দুমুঠা অন্ন এবং লজ্জা নিবারণের সামান্য বস্ত্রখণ্ডও জুটাইতে পারিতেছে না। অথচ, দেশে বা দুনিয়ায় ধন ও অন্নের অভাব নাই। ধনীদের বাক্স ও ব্যাঙ্কে টাকা আর ধরিতেছে না। গভর্ণমেন্ট শতকরা বার্ষিক মাত্র আড়াই টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে

চাহিলে, দশ পাঁচ মিনিটের মধ্যে কোটী কোটী টাকার আবেদন পাইতেছেন। অন্যদিকে দেশের ধনোৎপাদনকারী কৃষককুল হালের বলদ, পেটের অন্ন ও বীজ সংগ্রহের জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শোষণকারী সাম্রাজ্যবাদীদের জুড়িদার ভাই কোটিপতি ব্যবসায়ীগণ, টাকার বাজারের উপর যে ছিনিমিনি খেলা খেলিতেছেন, ইহা তাহারই শোচনীয় ফল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, টাকা পয়সা পৃথিবীতে না থাকার দরুণই যে এই দেশব্যাপী অভাব অনটন তাহা নয়, বরং সমস্ত ধন ও ঐশ্বর্য্য মুষ্টিমেয় লোকের নিকট গিয়া আটকাইয়া পড়াতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলতঃ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে, একদিকে অল্পসংখ্যক লোকের নিকট অপরিসীম ধনদৌলতের বাড়াবাড়ি, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ নরনারীর নিদারুণ অভাব অনটন। একদিকে মুষ্টিমেয় ধনীর গৃহ শতরকমের উপাদেয় খাদ্যে পরিপূর্ণ, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেরা উপবাসী থাকিয়াও, ক্ষুধায় কাতর, কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখে তুলিয়া দিবার জন্য দুটি অন্ন জুটাইতে পারিতেছে না; একদিকে ধনীর গৃহ আবশ্যকের অতিরিক্ত কত মূল্যবান বসনভূষণে পরিপূর্ণ, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ নরনারী লজ্জানিবারণের জন্য সামান্য বস্ত্রখণ্ডও জুটাইতে পারিতেছে না; অধিকাংশ নারীর আজ ছেঁড়া ন্যাকড়া ও এলোচুলই হইয়াছে লজ্জা নিবারণের সম্বল।"

দারিদ্র্যের প্রতিকার না হইলে কি হইবে

"দেশের শতকরা ৯০জন অধিবাসীর এই যে মর্ম্মান্তিক দুর্দ্দশা, ইহার প্রতিকার—প্রতিবিধান না হইলে, হয় ইহাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইবে, অন্যথায় সাম্যবাদ—সমাজতন্ত্রবাদ ত সামান্য কথা, তাহা অপেক্ষাও কোন দুঃসাহসিক কার্য্যে ইহাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। যে দুরবস্থার তাড়নায় মানুষ স্ত্রী পুত্রকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়া, স্বাভাবিক স্নেহ প্রীতির বন্ধন ছেদন করিতেছে,—সেই মর্ম্মান্তিক অবস্থার তাড়নায় তাহাদের পক্ষে কোন কর্ম্মপন্থাই দুঃসাহসিক বিবেচিত হইতে পারে না।" ডাঃ আমেদ তাঁহার অভিভাষণে উপরি-উক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন।

কৃষকদিগের আর্থিক দুর্দ্দশার কারণ

নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির ঢাকা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ রবিউদ্দীন আমেদ বলিয়াছেন:

"প্রতি বৎসর দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু সেই জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে চাষোপযোগী জমি বাড়িতেছে না এবং কর্ম্মহীন কৃষকদিগকে অন্য কোনপ্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও নিয়োগের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং কৃষক সমাজে দিন দিনই বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।...জন প্রতি চাষের উপযোগী গড়ে তিন বিঘাও করিয়া আছে কি না সন্দেহ। পক্ষান্তরে তিন বিঘা জমি একজনের ভরণ পোষণের পক্ষে কখনই যথেষ্ট নহে। সেজন্য দেখা যায় প্রতি তিন বিঘা জমির উপর ঋণ চাপিয়াছে প্রায় ৪০৲ টাকা। এই হিসাবে প্রত্যেক কৃষক পরিবারের গড়পড়তা ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইতেছে ২০০৲ টাকার উপর।......অন্যদিকে যদি শিল্পের প্রসার লাভ হইত তবে হয়ত কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকদের একটা ব্যবস্থা হইবার আশা থাকিত।......একদিকে শিল্পের প্রসার হইতেছে না, অন্যদিকে জনসংখ্যার অনুপাতে আবাদ জমির পরিমাণ মারাত্মকরূপে কমিতেছে; সুতরাং দারিদ্র্যও রাক্ষসী মূর্ত্তিতে প্রকট হইতেছে।"

জমিদারী প্রথা

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ আমেদ জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

"জমিদারী প্রথার প্রতি আমার আদৌ কোন আস্থা নাই। এই প্রথাকে সমাজ-দেহের উপর বিষব্রণের ন্যায় আমি জ্ঞান করিয়া থাকি। সুতরাং যত সত্বর সম্ভব জমিদারী প্রথার বিলোপ হয়, তাহা দেশের লোকের পক্ষে কল্যাণ। প্রায় পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার জমিদারের পক্ষে তিন কোটি টাকা বার্ষিক রাজস্ব দিয়া প্রায় বিশ-পঁচিশ কোটি টাকা ভোগ করিবার এবং তাহার অধিকাংশই পুরুষানুক্রমে বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করিবার ন্যায়তঃ কি অধিকার থাকিতে পারে? বস্তুতঃ জমিদারী প্রথার দ্বারা একদিকে যেমন দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী নিপীড়িত, নিষ্পেষিত ও শোষিত হইয়া নিঃস্ব ও মনুষ্যত্ব হারা হইয়াছে, অন্যদিকে

বিনাশ্রমে নগদ অর্থের দ্বারা একদল বিলাসী অকর্ম্মণ্য অলস ও অমানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।..... আমার মতে জমিদারী প্রথার বিলোপ পূর্ব্বক সরকারী রাজস্বের উপর উদ্বৃত্ত টাকার দ্বারা বাংলার প্রজাসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা ও তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যথোপযুক্ত পরিমাণে চিকিৎসালয় বাড়ান উচিত।"

সভাপতি ফজলুল হক সাহেব বলিয়াছেন ঃ

"...ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছলে বলে কৌশলে বাংলা অধিকার করিয়া এই অগণিত দেশবাসীর মধ্যে অল্পসংখ্যক বিদেশীর শাসনকে স্থায়ী করিবার জন্য এই দেশের লোকদিগের মধ্য হইতে তাহাদের পক্ষে একদল প্রবল সমর্থকের আবশ্যক হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যেই এই জমিদারী প্রথা সৃষ্টি এবং জমিদারগণও লর্ড কর্ণওয়ালিশের সেই উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পালন করিয়া আসিয়াছেন। কোম্পানীর আমলে জমিদারগণ কোম্পানীর নিকট হইতে লব্ধ ক্ষমতার বলে দেশের লোকের উপর যে সকল অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে কিন্তু জমিদার অত্যাচারীই হউন আর সদাশয়ই হউন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, মূলতঃ এই প্রথাই অন্যায়মূলক। আমি এই প্রথাকে অপচয়মূলক বলিয়া মনে করি। চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা না থাকিলে বাধ্য হইয়া লোককে শিল্প-ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে হইত, তাহার ফলে দেশে নিত্য নূতন শিল্প এবং বাণিজ্যের অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিত, লক্ষ লক্ষ বেকারের কাজ জুটিত। সুতরাং দেশের সম্মুখে আজ এই বেকার সমস্যা ও দুর্দ্দিন এত নির্ম্মম ও নিষ্ঠুররূপে দেখা দিত না।"

শ্রীসুশীলকুমার বসু

সকল প্রকার চর্ম্মরোগে প্রকৃষ্ট

ল্যাড্‌কো

নিম সাবান

শিশু অঙ্গে নির্ভয়ে ব্যবহার্য্য

সকল বড় দোকানে পাইবেন।

ল্যাড্‌কো ঃ কলিকাতা

অন্তিম

শ্রীমতী ঊষা বিশ্বাস্ এম-এ, বি-টি

সন্ধ্যার কালো ছায়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে নেমে এল…ছোট্ট একটি গ্রাম। তারই কোল ঘেঁসে এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে ছোট্ট একটি নদী—দূরে পাইন বনের মধ্যে গিয়ে মিশেছে নক্ষত্রকরোজ্জ্বল বসন্তসন্ধ্যার প্রদোষান্ধকারের সঙ্গে। ধরণীর বুক থেকে জমাট অন্ধকার উঠে ঘন বনানীর কালো ছায়াগুলিকে নিবিড়তর করে তুলেছে—তাদের ফাঁকে ফাঁকে রজতাভ নীল কুয়াসার সূক্ষ্ম আবরণ বিচিত্র মায়াজাল রচনা ক'রছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, গম্ভীর, বিষাদাচ্ছন্ন। গ্রাম শান্ত, সুপ্তিময়।

গ্রামের জীর্ণ কুটিরগুলির ছায়াময় কলেবর অন্ধকারে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। তাদের মাঝে মাঝে কয়েকটি আলো মিট্ মিট্ ক'রে জ্ব'লছে। মধ্যে মধ্যে দরজা খোলার ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু' একটা কুকুর হঠাৎ ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে উঠে থেমে যাচ্ছে। কদাচিৎ সেই মর্ম্মরমুখর বনের মধ্যে থেকে কোনও নিঃসঙ্গ পথিক বা কোনও অশ্বারোহী বেরিয়ে আসছে। কখনও বা একটা গরুর গাড়ী ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চ'লেছে। বনের মধ্যে একটি গ্রাম। তাতে মাত্র কয়েক ঘর লোকের বাস। গ্রামবাসীরা আজ সব চলেছে বসন্তোৎসবে। গ্রামের মধ্যে ছোট একটি পাহাড়—তারই উপরে একটি গির্জ্জা। তার বহু পুরাতন ঘণ্টাঘরটির উন্নত শীর্ষ উপরে নীলাকাশের অন্ধকারের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।

বৃদ্ধ ঘণ্টাবাদক ঘণ্টাঘরে চ'ল্ল। তার পদভরে জীর্ণ সিঁড়ি মড়্ মড়্ ক'রে উঠ্ল। তার হাতের বাতিটি মাঝ আকাশে তারার মত জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগ্ল।

বৃদ্ধের পক্ষে এই সিঁড়ি বেয়ে ওঠাটাই আজকাল কঠিন হয়ে পড়েছে। পা দু'টো তার ক্ষীণ, দুর্ব্বল। তার মত জরাতুর বৃদ্ধের মুক্তি ছিল মরণেই। কিন্তু বিধির বিধানে আজও সে বেঁচে আছে। একে একে তার পুত্র পৌত্রেরা সকলেই তার চোখের সামনে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিল। ছেলে বুড়ো অনেককেই সে এম্‌নি ক'রে যেতে দেখ্ল। কিন্তু তার আর যেন মরণ নেই। অথচ এ বেঁচে থাকাও তার দায় হয়ে উঠেছে। বছরের পর বছর সে যোগ দিয়েছে এই উৎসবে। তার মনে নেই কতদিন সে এই ঘরে বসেই এই মুহূর্ত্তটির প্রতীক্ষা ক'রেছে। ভগবানের ইচ্ছায় আজ আবারও সে……

বৃদ্ধ ঘণ্টাঘরের উন্মুক্ত জায়গাটিতে এসে আলিসায় ভর দিয়ে দাঁড়াল। নীচে গির্জ্জা। তারই চারিদিককার ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে গ্রামের গোরস্থানটি অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। পুরাণো ক্রুশগুলি যেন তাদের বিস্তৃত বাহু দ্বারা অযত্ন রক্ষিত কবরগুলিকে রক্ষা ক'রছে। তাদের উপরে ঝুঁকে প'ড়েছে কয়েকটা পত্রহীন বার্চ্চ গাছ। নীচ থেকে সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুম কলিকাগুলির সুমিষ্ট গন্ধ সান্ধ্য বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে—তাতে যেন অনন্ত নিদ্রার একটি বিষাদমাখা আমেজ লেগে র'য়েছে।

আর এক বছর পরে সে কোথায় থাক্‌বে? সে কি আবার এই ঘরে উঠে ঘণ্টা বাজাবে? আর কি কখনও সে এই অতি পরিচিত পিত্তলের ঘণ্টাটি বাজিয়ে সুষুপ্ত গ্রামবাসীদের ঘুম ভাঙাবে? কে জানে? হয় ত' বা সে ঐ গোরস্থানের একটি অন্ধকার কোণে অম্‌নি একটি ক্রুশের নীচে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত থাক্‌বে! মৃত্যুর জন্যে সে ত' প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তাই আজ আবার তাকে এই উৎসবে যোগ দিতে হ'য়েছে। মাথার উপরকার অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে একবার সে চেয়ে দেখ্ল। অম্‌নি অভ্যাসবশে তার মুখ থেকে অস্ফুটে উচ্চারিত হ'ল—"তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক।" সে হাত দিয়ে শূন্যে ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত ক'রল।

নীচ থেকে এক বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে তার নাম ধরে ডাকল। গির্জ্জার প্রাচীন তত্ত্বাবধায়ক হাত দিয়ে চোখ ঢেকে উপরে ঘণ্টাঘরের দিকে তাকাল। অশ্রু-আবিল চোখ ছুটি তার জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে—দৃষ্টির তার স্থিরতা নেই। সে খুঁজছিল গির্জ্জার ঘণ্টাবাদক বৃদ্ধ মিথেইচকে। ঘণ্টাবাদক নীচের দিকে তাকাল—সেখান থেকেই উত্তর দিল—"কি চাও? এই যে আমি এখানে। আমায় দেখতে পাচ্ছ না?"

"না, আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। তোমার ঘণ্টা বাজাবার সময় হয় নি?"

উভয়েই আকাশের দিকে তাকাল—তাদের মাথার উপর জ্বলছে ভগবানের অগণিত বাতিগুলি। মিথেইচ ভাবতে লাগল......"না, না, এখনও সময় হয় নি। আমি জানি কখন"......সত্যি, সময় তার জানা ছিল। আজ পর্য্যন্ত কখনও তার ঘড়ির দরকার হয় নি। তারা দেখেই সে সময় বুঝতে পাবে।...... স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য—ঐ যে সাদা মেঘগুলি সন্ধ্যার কাজল কালো আকাশে আস্তে আস্তে ভেসে বেড়াচ্ছে—ঐ অন্ধ নিবিড় বনের অস্ফুট মর্ম্মরধ্বনি—ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছোট নদীটির কল কল্লোল—সবই তার সুপরিচিত—তার জীবনের সঙ্গে কোন্ এক নিগূঢ় সূত্রে গাঁথা। সে কি বৃথাই এত বছর এখানে কাটিয়েছে?

সুদূর অতীতের ছবিগুলি একে একে তার মানসপটে প্রতিফলিত হ'তে লাগল। মনে পড়ে গেল তার বহু পুরানো দিনের কথা—সেই প্রথম যেদিন সে তার বাবার সঙ্গে এই ঘণ্টাঘরের উপরে উঠেছিল। বাপ্ রে! সে কতদিনের কথা! কিন্তু তবু মনে হয় এ যেন সেদিনকার ঘটনা! সে দেখ্‌ছে সে যেন একটি ছোট বালক—দেহের রং তার শুভ্র কাঞ্চন বর্ণ, চোখ দু'টি তার দীপ্ত, সমুজ্জ্বল মৃদু মন্দ বাতাসে চুলগুলো তার অল্প অল্প উড়ছে। যে বাতাস রাস্তায় ধূলো উড়ায় এ যেন সে বাতাস নয়, এ অদ্ভুত বাতাস যেন শুধু নিঃশব্দে তার অদৃশ্য ডানা দুটিই নাড়ে।......দূরে নীচে ছোট ছোট জীবগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে—গ্রামের কুটিরগুলি ছোট্ট, অতি ছোট্ট দেখাচ্ছে—বনটি যেন ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে—যে ডিম্বাকৃতি ভূমিখণ্ডের উপরে গ্রামটি অবস্থান করছে সেটা যেন মস্তো বড়, অশেষ, অনন্ত বলে মনে হচ্ছে! সেই দিকে চেয়ে আজ এই শুভ্রকেশ বৃদ্ধের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল। সে মনে মনে বলে উঠ্‌ল—"ঐ ত' সবটুকুই দেখা যাচ্ছে।" এই ত' জীবনের গতি ও পরিণতি! মানুষ যৌবনে তার শেষ দেখতে পায় না—কিন্তু আজ সে তার সবটুকুই নিঃশেষে দেখতে পাচ্ছে—জীবনের আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত। সে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে যে ঐ গোরস্থানের একটি কোণে তার দেহাবশেষ সমাহিত হবে।......ভগবানের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হ'ক্। আজ তার বিশ্রামের সময় এসেছে। এ জীবনের বোঝা সে এতদিন গৌরবের সঙ্গেই বয়ে এসেছে। এখন ঐ আর্দ্র সরস মৃত্তিকাই তার কাছে জননীর স্নেহশীতল বক্ষের মত বলে মনে হচ্ছে।......সত্বর, অতি সত্বর সে ওখানে আশ্রয় পাবে।......

সময় হয়েছে। মিথেইচ আর একবার আকাশের তারাগুলির দিকে তাকাল, মাথা থেকে টুপীটি খুলে ফেল্‌ল—শূন্যে একটি ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করে ঘণ্টার দড়ি সজোরে চেপে ধরল। এক মুহূর্ত্তে রাত্রির সেই গভীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ঘণ্টার ধ্বনি অনুরণিত হতে লাগল। সেই পিত্তল নির্ম্মিত ঘণ্টায় সে আঘাত করে যেতে লাগল—একটার পর একটা। সন্ধ্যার সেই পবিত্র মুহূর্ত্ত মুখর হয়ে উঠল সেই উদার, গম্ভীর, সুচির শব্দায়মান উদাত্ত স্বরে।

তারপর ঘণ্টা থেমে গেল। গির্জ্জায় উপাসনা আরম্ভ হল। অন্যান্যবার মিথেইচ নেমে গিয়ে গির্জ্জাঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে প্রার্থনায় যোগ দিত ও গান শুনত। কিন্তু আজ সে ঘণ্টাঘরেই রয়ে গেল। এই সিঁড়ি নামা তার পক্ষে আজকাল অত্যন্ত কষ্টকর। বিশেষতঃ আজ সে বড়ই ক্লান্ত। সে বেঞ্চের উপরে বসে পড়ল। ঘণ্টার শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'তে লাগল......সে তাই শুনতে শুনতে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। কী যে সে ভাবছে সে তা নিজেও জানে না! ঘণ্টাঘর দীপের স্তিমিত আলোকে ঈষৎ আলোকিত—অন্ধকারে কাণে বাজছে অদৃশ্য ঘণ্টাধ্বনির ক্ষীণ রেশটুকু। নীচ থেকে ভেসে আসছে গির্জ্জাঘরের সঙ্গীতের অব্যক্ত কলধ্বনি। ঘণ্টা-সংলগ্ন দড়িগুলি সান্ধ্য বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপছে।

বৃদ্ধের ক্লান্ত মাথাটি অবসাদে তার বুকের উপর ঢলে

পড়্ল। কত এলো মেলো চিন্তার রাশি তার মনে আসতে লাগল। সে ভাবল—"ওরা এখন গান গাইছে।" সে কল্পনায় দেখছে সে যেন গির্জ্জায় গিয়েছে—গায়ক বালকের দল বালকণ্ঠে একতানে গান গাইছে—"ফাদার নৌম", যিনি আজ বহুকাল মৃত তিনি যেন আবার ফিরে এসেছেন, গির্জ্জায় উপাসক-মণ্ডলীর সঙ্গে তিনিও আজ প্রার্থনায় যোগ দিয়েছেন—কৃষকদের শত শত মস্তকগুলি উঠছে নামছে, যেন পরিপক্ব শস্যের শীর্ষগুলি বাতাসে দুলছে—তারা মাঝে মাঝে শূন্যে ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করছে। যদিও এরা বহুকাল মৃত তবুও এদের আজ অতি পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার পিতার কঠিন গম্ভীর মুখ—তার ভাইরা সব ব্যাকুল প্রার্থনায় রত। সে নিজেও যেন তাদেব মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে—স্বাস্থ্যে বলে দীপ্ত, কান্তিমান্—মন তার কোন্ এক অজানা সুখের মোহমদির স্বপ্নে ভবপূর্ব! কিন্তু কোথায় সে সুখ?......মুহূর্ত্তের জন্যে মনে তার এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্দীপনা এল—তার অতীত জীবনের ছোট বড় ঘটনাগুলি যেন স্পষ্টতর, উজ্জ্বলতর হয়ে উঠ্ল।...

অতীত জীবনের দিকে চেয়ে সে দেখতে পেল—কঠোর পরিশ্রম, অপরিসীম দুঃখ, দুশ্চিন্তার ঘন মেঘ...কোথায় সুখ? দুর্ভাগ্যের নিদারুণ পীড়নে তরুণের সৌম্য সুন্দর মুখেও দুশ্চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত হয়ে যায়—দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহও নুইয়ে পড়ে দুঃখের বোঝায়—মর্ম্মমথিত করা দীর্ঘশ্বাস অজ্ঞাতেই বেরিয়ে আসে বক্ষপঞ্জর ভেদ করে......

বামে, গ্রামের অন্য রমণীদের মধ্যে সে তার প্রেয়সীকেও দেখতে পেল—সে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। যেন ভক্তির একটি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। কী ভালো মেয়েই ছিল সে! তার অক্ষয় স্বর্গলাভ হ'ক্—এই তার কামনা। আহা বেচারা! কত দুঃখই না সে ভোগ ক'রেছে সারা জীবন ধ'রে! নিরবচ্ছিন্ন নিষ্করুণ দারিদ্র্য, কঠিন প্রাণান্ত পরিশ্রম—নারীজীবনের অবশ্যসহনীয় দুঃখ—তার দেহের অপরূপ কান্তিকে ম্লান ক'রে দিয়েছে। তার চোখে আর সে জ্যোতিঃ নেই—তার মুখে তার স্বভাবসুলভ সেই শান্ত গম্ভীর ভাবটিও আর নেই। সেমুখে আজ নিয়ত বিরাজ ক'রছে আতঙ্কের একটি কালো ছায়া—কোন্ এক অজানা বিপদের আশঙ্কা। কোথায় তার সুখ?......তাদের একটি মাত্র সন্তান জীবিত ছিল। সেই ছিল তাদের জীবনের আশা ও আনন্দের একমাত্র উৎস।......কিন্তু দুর্ণিবার প্রলোভনের হাত থেকে তাকেও বাঁচান গেল না।

ঐ তার ধনী শত্রু আজ নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা ক'র্ছে সে কত অনাথ আতুরজনের প্রাণে ব্যথা দিয়েছে—তাদের চোখের জল ফেলিয়েছে! সে আজ তার সেই অতীতের জমা পাপস্খালনের জন্যে প্রার্থনা ক'র্ছে—ভগবানের চরণে তার অন্তরের ক্ষমা নিবেদন ক'র্ছে। সুগভীর অনুশোচনায় সে আজ তার গর্ব্বোদ্ধত মাথা মাটিতে লুটাচ্ছে। ভক্তির তার যেন আর অন্ত নেই! মিখেইচের হৃদয় অশান্ত, উদ্বেল হ'য়ে উঠ্ল। গির্জ্জার মূর্ত্তিগুলির কালো মুখগুলি যেন ভ্রূকুটি ক'রে উঠ্ল মানুষের দুঃখ ও পাপের উপরে।

এ সবই সে বিগত জীবনে পিছনে ফেলে এসেছে—সবই অতীত। অসীম বিশ্ব আজ যেন তার কাছে সসীম হ'য়ে ধরা দিয়েছে এই অপরিসর ঘণ্টাঘরটির ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে! অন্ধকারে বাতাসের করুণ বিলাপধ্বনি শোনা গেল। অমনি ঘণ্টার দড়িগুলিও কেঁপে উঠ্ল। বৃদ্ধ আপন মনে বিড়্ বিড়্ ক'রে বল্ল—"ভগবান এর বিচার ক'রবেন।" তার শুভ্র শির নুইয়ে প'ড়্ল—দুই গণ্ড বেয়ে তার অশ্রু ঝরতে লাগল।

নীচ থেকে কে যেন হঠাৎ চিৎকার ক'রে ব'ল্ল—"মিখেইচ! মিখেইচ! তুমি কি ঘুমিয়ে প'ড়েছ?"

"কি" ব'লে বৃদ্ধ অমনি ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সল—ব'ল্ল—"উঃ ভগবান! সত্যিই কি আমি ঘুমোচ্ছি? এ রকম ত' আগে কখনও হয় নি।"

অভ্যাসবশে ক্ষিপ্রহস্তে সে ঘণ্টার দড়িটি চেপে ধ'র্ল। নীচে অসংখ্য জনসমূহ পিপিলিকাশ্রেণীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে—চকচকে সোনালি কিংখাবের পতাকা বাতাসে ফরফর ক'রে উড়ছে। শোভাযাত্রা গির্জ্জাঘরটি প্রদক্ষিণ ক'রছে। দূর থেকে তাদের জয়ধ্বনি মিখেইচের কাণে এল। বৃদ্ধের হৃদয়-তন্ত্রীতে অপূর্ব্বভাবে আঘাত ক'রল সেই ধ্বনি। তার মনে হ'ল বাতিগুলি যেন আজ উজ্জ্বলতর হ'য়ে জ্ব'লছে—জনতা যেন অন্যদিনের চেয়ে ঢের বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—

পতাকাগুলিও যেন আজ জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে—সন্তজাগরিত বাতাস যেন নীচেকার শব্দগুলিকে তার অদৃশ্য পাখায় ক'রে উপরে ব'য়ে এনে সেই উৎসব রজনীর গুরুগম্ভীর ঘণ্টারবের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে।

মিখেইচ এর আগে কখনও এমনি ক'রে ঘণ্টা বাজায়নি। মনে হ'ল বৃদ্ধের সমস্ত হৃদয় যেন ঐ প্রাণহীন পিত্তলের ঘণ্টাটির মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়েছে। তাই সেই ঘণ্টাধ্বনি এমন অপূর্ব্ব হ'য়ে উঠেছে— ঘণ্টাগুলি যেন বিচিত্র সুরে হাসছে, গাইছে, কাঁদছে! সেগুলি থেকে যেন এক অপার্থিব সুরের ধারা উঠে, উঁচুতে—আরও উঁচুতে—ঐ অজস্র তারা ভরা আকাশের সঙ্গে গিয়ে মিশছে। তারই মূর্চ্ছনা যেন বার বার পৃথিবীর বুকে এসে বাজছে।

"ভগবান আবির্ভূত হ'য়েছেন"—ঘণ্টার সুগম্ভীর স্বনে মন্ত্রিত হ'ল এই বাণী। ঐ স্বরকে ছাপিয়ে আরও দু'টি তীক্ষ্ণ স্বর সানন্দে পালাক্রমে গাইতে লাগল—"ভগবান আবির্ভূত হ'য়েছেন।"

দু'টি কিশোরী গায়িকা শশব্যস্তে ক্ষিপ্রগতিতে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এল। তাদের তরুণ কণ্ঠস্বর সকল কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে উঠল। ব্যগ্রকণ্ঠে হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তারা শিশুর মত গেয়ে উঠল—"ভগবান আবির্ভূত হ'য়েছেন।"

সেই জীর্ণ ঘণ্টাঘর যেন কাঁপতে লাগল। দুরন্ত বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল বৃদ্ধ ঘণ্টাবাদকের মুখে। সেও সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠল—"ভগবান আবির্ভূত হ'য়েছেন।"

বৃদ্ধ ভুলে গেল তার দুঃখ দুশ্চিন্তাময় অতীত জীবনের কথা। সে ভুলে গেল যে তার ক্ষুদ্র জীবন এই নিরানন্দ সঙ্কীর্ণ ঘণ্টাঘরের সীমার মধ্যে আবদ্ধ। সে ভুলে গেল যে এই বিশাল বিশ্বে সে বাত্যাহত বনস্পতির মতই একক, সঙ্গীহীন। স্বর্গলোক থেকে যেন এক অপূর্ব্ব কান্নার রাগিণী বিষাদবিধুর পৃথিবীর বুকে বার বার ফিরে ফিরে আসছে। বৃদ্ধ তাই শুনতে শুনতে যেন তন্ময় হয়ে গেল। তার মনে হ'ল সে যেন পুত্র পৌত্র পরিবৃত হয়ে রয়েছে—সে যেন তাদের আনন্দ-কলরব শুনতে পাচ্ছে। প্রাচীন তরুণেরা মিলিত কণ্ঠে এক অপূর্ব্ব সুখের গীতি গাইছে—যে সুখের আস্বাদ সে এ জীবনে কখনও পায় নি। সে দড়ি ধরে টান্‌ল—তার দু' গণ্ড প্লাবিত করে অশ্রুধারা বইতে লাগল। ব্যথাতুর হৃদয় তার সুখ-মরীচিকার আশার হিল্লোলে দু'লে উঠল।

নীচে লোকেরা সব বলাবলি করতে লাগল যে বৃদ্ধ মিখেইচ এর আগে কখনও এমনি করে ঘণ্টা বাজায় নি।

হঠাৎ সেই প্রকাণ্ড ঘণ্টাটিতে শিথিল হাতের একটা অনিশ্চিত আঘাতের আওয়াজ শোনা গেল। তারপর আচমকা সে শব্দ থেমে গেল—মাঝ পথে। ছোট ছোট ঘণ্টাগুলি থেকে অসমাপ্ত শব্দ তখনও শোনা যাচ্ছিল—তারপর সেগুলোও থেমে গেল। দীর্ঘকম্পমান সুরের প্রতিধ্বনি আস্তে আস্তে শূন্যে মিলিয়ে গেল। বৃদ্ধ ঘণ্টা-বাদকের ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ সেই বেঞ্চের উপর এলিয়ে পড়্‌ল। তার রক্তলেশহীন, পাণ্ডুর গণ্ড বেয়ে শেষ দু' ফোঁটা অশ্রু ঝ'রে পড়্‌ল।

বৃদ্ধ ঘণ্টাবাদকের জীবনের কাজ শেষ হয়ে গেল ঘণ্টায় এই তার অন্তিম আঘাত। এখন আর কেউ এসে তার শূন্য স্থান পূর্ণ ক'রবে। *

শ্রীঊষা বিশ্বাস

---

* Vladimir Korolenkoর "The Old Bell Linger" শীর্ষক গল্প হইতে অনূদিত।

স্ত্রী-যুদ্ধ

শ্রীসুবোধ বসু এম-এ, বি-এল

ভারতবর্ষে অল্পদিন মাত্র স্ত্রী যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধাড়ম্বর কম নয়।

না, বিলাতের মত পোষ্টবাক্স, ল্যাম্পপোষ্ট বা সরকারী দালানকোঠা এখনও পোড়ান আরম্ভ হয় নাই, এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য এখনও জেলে যায় নাই কেউ,—কিন্তু কড়া কড়া সব রেজলিউশান পাশ হইতেছে। কিন্তু মহাপ্রাচ্য স্ত্রীসঙ্ঘের আপ্রাণ-চেষ্টার ত্রুটী নাই। পুরু গদীর চেয়ারে বসিয়া পত্রিকার মারফত সঙ্ঘ মহাপ্রাচ্যের নারীকুলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে।

মহাপ্রাচ্যসঙ্ঘের অফিস ছিল মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে। কিন্তু ভাড়া বাকী পড়ায় সেটাকে সঙ্ঘের বিশিষ্টা সদস্যা মিসেস্ গুপ্তের বাড়িতে উঠাইয়া আনা হইয়াছে। সেখানেই সঙ্ঘের নিয়মিত অধিবেশন হইয়া থাকে।

সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য এই যে এরা এ-দেশের স্ত্রী-আন্দোলনকে উনবিংশ শতাব্দীর আবেদনের যুগ হইতে বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধাশ্রিত আন্দোলনে রূপান্তরিত করিতে চায়। তবে মারামারিটা অন্তঃপুরের বাইরে এখনও আরম্ভ হয় নাই। শুধুমাত্র সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

সঙ্ঘের সেক্রেটারির নাম পুর্ণিমা। বয়স একুশ কিম্বা তার কাছাকাছি। ইংরেজি-সাহিত্যে এম্-এ পড়ে। উত্তম শ্যামবর্ণের উপর আত্মপ্রত্যয়ের জৌলুষটুকুতে মুখখানাকে সতেজ মনে হয়। ব্লাউসের হাতা কবজি পর্য্যন্ত বিস্তৃত, আতাম্র চুলগুলি পিছনে শক্ত করিয়া টানিয়া খোঁপা বাঁধা, দীর্ঘপল্লবনিবিড় চোখে বজ্র ও বিদ্যুৎ মেলামেশা করিয়া কখনও আলো জ্বালে কখনও অঙ্কুশ নিক্ষেপ করে। তার অভিরুচি যুদ্ধপ্রবণ, অথচ তার ভঙ্গীতে যে-লীলা সতত প্রকাশমান, তা উপন্যাসের নায়িকাতে প্রায়ই বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়।

পুরুষদের সম্বন্ধে বর্ত্তমানে পুর্ণিমার মনোভাব এই বকম:—'যে পুরুষ যুগ যুগ ধরে দাসত্বের শিকল দিয়ে আমাদের আলো-বাতাসহীন অন্তঃপুরে বন্দী করে রেখেচে, যে পুরুষ নিজেদের খেয়ালমত নারীকে দাসীত্বের কোঠায় পৌছিয়ে দিয়েছে, হাতে সোনার আবরণে কড়া পরিয়েছে, পশুবলে নারীকে নিষ্পেষিত করে তার বিভিন্ন সত্বা লুপ্ত করতে উদ্যত,—সেই অত্যাচারী পুরুষের গর্ব্ব খর্ব্ব করা নিখিল নারীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।'

তাই সঙ্ঘের রেজলিউশানের মধ্যে এই কথাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়: 'পুরুষের শক্তি পঙ্গু করিয়া, তাহাদের শান্তি নষ্ট করিয়া, তাহাদের আত্মসুখের পথে আগুন লাগাইয়া নারী বাহির হইয়া পড়িবে তার বিজয়-পথে। নারীর শতযুগের জড়তা, নারীর সহস্র বৎসরের আলস্য-নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়াছে। শোনা যাইতেছে তার জীবনের কলরব। এইবার পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে মহানারীর মহাযাত্রা-লগ্ন সমুপস্থিত,—জাগো, ভারতললনা, জাগো।'

কিন্তু কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে সঙ্ঘের একটা সাধারণ অধিবেশন হইতে অনুমোদন গ্রহণ করা সঙ্ঘের নিয়মাবলীসম্মত প্রয়োজন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির আভ্যন্তরিন গোলযোগবশতঃ কিছুতেই সেই মহাপ্রাচ্যের মহানারীর মহাধিবেশনটাকে ত্বরান্বিত করা সম্ভবপর হইতেছিল না।

সঙ্ঘের বিশিষ্টা সদস্যা মিসেস নাগ সেক্রেটারীর অবৈতনিক-পদের জন্য নির্ব্বাচনযুদ্ধে পরাজিত হইবার পর হইতে স্ত্রী-সুলভ অভিমানভরে সঙ্ঘকে বিসর্জ্জন দিবার সঙ্কল্পে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু কালপরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যথটা কমিয়া আসায় সে অভিলাষ তিনি সম্প্রতি ত্যাগ করিয়াছেন।

মিসেস্ নাগ ফ্যাসনেব্‌ল বিধবা। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট

মাধবচন্দ্র নাগ এক সময়ে তাঁর স্বামী ছিলেন,—এখন তিনি পরলোকে। আত্মীয়জনহীন সংসারে মিসেস নাগ অন্য কোনও অবলম্বন না পাইয়া সামাজিক কর্ম্মপরায়ণতা বাড়াইয়া দিলেন। মিটিঙে বক্তাদের মধ্যে তাঁর নাম তিনি সাগ্রহে প্রবেশ করাইয়া দেন, শোভাযাত্রার মেয়ে-সংগ্রহ করিয়া তাদের নেতৃত্ব করায় গর্ব্ব বোধ করেন তিনি,গানের সামান্য জানিলেও সভাসমিতিতে স্ত্রী-গীত কোরাসের তদ্বির করিয়া থাকেন। বিগত-যৌবনা, রং ফর্সা, হাই-হিলের জুতা পরা মিসেস নাগের মতামতগুলি কম স্বাধীন নয়।

মিসেস্ গুপ্তকে লইয়া সঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কিছু অসুবিধা হয়। তাঁর মতামতগুলি এতই কম আধুনিক, এবং তাঁর মনোবৃত্তিটা এতই প্রাচীন, যে স্ত্রী-সঙ্ঘের মুক্তবাদ ও তাঁর গৃহিনীবাদ সঙ্ঘে সংঘর্ষের সৃষ্টির উপক্রম করে। কিন্তু এ সত্ত্বেও মিসেস গুপ্তকে সহ্য করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। ধনী এটর্ণীর স্ত্রী তিনি, এবং যেহেতু সঙ্ঘের সদস্যাদের চাঁদা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, সেই হেতু মিসেস গুপ্তকে পরিতুষ্ট রাখা সমিতির পক্ষে দূরদর্শিতার পরিচায়ক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এঁর বাড়িতেই সঙ্ঘের অপিস অবস্থিত এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনগুলি হইয়া থাকে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে আরেকটা মেয়ে-সভ্যা আছেন। সুলতা তার নাম এবং বয়স সবার চাইতে কম। মেয়ে-কলেজে সুলতা বি-এ পড়ে। ওর বুদ্ধিটা যদিও এর মধ্যে খুব সুপক্ক হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই, তবু ওর উৎসাহের প্রাচুর্য্য কম নয়। এদিক দিয়া সুলতা কলেজের মেয়েদের যোগ্য প্রতিনিধি।

সুধীজনেরা বলিয়া থাকেন যে ধর্ম্ম ও অর্থ এ দুই জগৎ-সভ্যতার রূপ দিয়াছে। এই বিরাট থিওরির বিচারস্থান এটা নয়, তবে জোর করিয়া এইটুকু শুধু বলা চলে যে অর্থের দিকটা যদি না ভাবা হইত, তবে রায় বাহাদুর গণেশবাহন চৌধুরীকেও সঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে নেওয়া হইত কি না সন্দেহ। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে পুরুষ গ্রহণের প্রস্তাবে প্রথম হইতেই পূর্ণিমার আপত্তি ছিল। তার মতে, যে-কোন নারী একটা বিদ্বান পুরুষের চাইতে জ্ঞানী। কিন্তু মিসেস নাগের উৎসাহে ও অর্থের বিষয়ে চিন্তা করিয়া, রায় বাহাদুর গণেশবাহনকে এই সম্মানিত পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করা গিয়াছিল। পুরুষজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা মাত্র না করিয়া রায় বাহাদুর অনুগৃহীত লোলুপতার সঙ্গে স্ত্রী-পক্ষে যোগদান করিয়া দুর্ব্বলের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন।

রায় বাহাদুর মৃতদার ধনী ব্যবসায়ী। পূর্ব্বজীবনে স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। স্ত্রীকে পর্দা এবং পাল্কী কঠিন নিষ্ঠার সহিত মানিয়া চলিতে হইত। কিন্তু স্ত্রী মারা যাওয়ার পর হইতেই তিনি অকস্মাৎ অত্যন্ত উদার হইয়া উঠিয়াছেন এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য তাঁর আগ্রহের অবধি নাই। তাঁর অর্থে সঙ্ঘ বিশেষভাবে উপকৃত। অবশ্য পূর্ণিমার কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নাই। নাকটা বাঁকাইয়া অবজ্ঞার ভঙ্গীতে বলে, 'টাকাই যদি না দেবে, তো সঙ্ঘে আর পুরুষ রাখতে যাবো কেন?' কিন্তু মিসেস নাগ এই মনোবৃত্তির প্রতিবাদ করেন। বলেন, ছিঃ।

সম্প্রতি মহাধিবেশনের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে পুনর্ব্বার উৎসাহ দেখা দিয়াছে। কথা ছিল গুড্ ফ্রাইডে-র ছুটীতে অধিবেশন করা হইবে। বিস্তর কাগজ ছাপান হইল, খাম ও ডাকটিকেট কেনা হইল, মোটরে মোটরে বিস্তর পেট্রোল পুড়িল, কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির আভ্যন্তরিক গোলযোগ-বশতঃ তাহা যে সত্যসত্যই ঘটিয়া উঠে নাই, সে-খবর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

সঙ্ঘের ইচ্ছা, নিখিলপ্রাচ্য নারী সঙ্ঘের অধিবেশনটা বড় দিনের সময় কলিকাতায় হয়। স্ত্রী-মুক্তি বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। কর্ম্মিনীরা অধীর, সুযোগ অপূর্ব্ব, এবং পরাধীনতা আর সহ্য যায় না। কতকগুলি বিশেষ অধিকার সঙ্ঘ স্ত্রীদের জন্য এইবার দাবী করিবে। পুরুষেরা তাহা পূর্ণ করিলে মঙ্গল, নহিলে কোন্ প্রকার যুদ্ধরীতি অবলম্বিত হইবে তাহা শীঘ্রই আর গোপন থাকিবে না।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সেক্রেটারী তাই বিশেষ জরুরী সভা আহ্বান করিয়াছে। বিশেষ অনুরোধ জানান হইয়াছে কোনও অজুহাতেই কেহ যেন অনুপস্থিত না হয়। সময় দেওয়া হইয়াছে দুপুর দু-টায় এবং লাল কালি দিয়া সময়টাকে বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে।

মিসেস নাগ রায় বাহাদুরকে ফোন করিলেন, 'কাল দুটোয় আসচেন তো, রায় বাহাদুর ?'

তারের অন্যপ্রান্ত হইতে জবাব আসিল, 'নমস্কার, নমস্কার।—হেঁ হেঁ, আপনি আসচেন তো ?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমিও নিশ্চয়ই।'

'তারপর, কেমন আছেন ?'

'হেঁ হেঁ, তা একরকম চলে যাচ্ছে। আপনি ভালতো ?'

'দেখুন রায় বাহাদুর, একরকম চলে যাওয়াটাই কি মানুষের উদ্দেশ্য হতে পারে ? যার ক্ষমতা আছে, তার উচিত জীবনের থেকে যতটা পাওয়া যায় আদায় করে নেওয়া। আচ্ছা, নমস্কার।'

রিসিভারটা সজোরে মিসেস নাগ রাখিয়া দিলেন। ওপ্রান্তে রায় বাহাদুর গণেশবাহন রিসিভারের মুখে তখনও ফুঁ দিয়া বলিতেছেন, 'হ্যালো, হ্যালো, শুনচেন।' কিন্তু জবাব পাওয়া গেল না। তাই তিনি এক্স্চেঞ্জকে ডাকিলেন, সাউথ অয়ান, টু...ইত্যাদি।

দুই

দুপুর সওয়া দুইটা। উপস্থিত সভ্যাদের জিহ্বা যতই না বিরক্তিসূচক অব্যয়গুলি ব্যবহার করিয়া হয়রান হইয়া পড়িতে লাগিল, ততই মিসেস নাগ ও রায় বাহাদুর গণেশবাহন আসিবার কম সম্ভাবনা দেখাইতে লাগিলেন। পূর্ণিমা জুতার গোড়ালি দিয়া বারম্বার মেঝে ঘষিয়া দিতেছে, সুলতা নাক বাঁকাইয়া, ভুরু কুঁচকাইয়া বিরক্তি দেখাইতেছে, আর মিসেস গুপ্ত ঘড়ির দিকে তাকাইলেই হাঁই তুলিতেছেন।

দেওয়ালে নিখিলবিশ্বের নারীপ্রগতির পাণ্ডাদের ছবি, এবং ইস্তাহারের ছড়াছড়ি। কাচের আলমারিতে গরম গরম সব বই,—ইংলণ্ড, ষ্টেটস্, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ও ল্যাটিন দেশগুলির স্ত্রী-যুদ্ধের জয়পরাজয়ের ইতিহাসে মজবুত করিয়া ঠাসা। এইখানে সঙ্ঘের সভ্যাগুলি উপযুক্ত অনুপ্রেরণা পায়।

পূর্ণিমা হতাশ হইয়া কহিল, 'কবে যে এঁরা সময়ের মূল্য বুঝবেন, ভেবে অবাক হই।'

কথার জবাব দিতে হইলেই মিসেস গুপ্ত চশমাটাকে একসিঁড়ি নীচে নামাইয়া নেন,—মুদ্রাদোষটা এখন এমন স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে যে চশমাটা নাকের মাঝামাঝি টানিয়া না আনিলে মনেই হয় না যে তিনি আন্তরিকভাবে কিছু বলিতেছেন।

'মিসেস নাগের মোটরটা,' চশমা নামাইয়া মিসেস গুপ্ত কহিলেন, 'আবার প্রায়ই বিগড়ে যায়। অথচ কখনো স্বীকার করবেন না যে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি।'

'সহরে ট্যাক্সির তো আর অভাব নেই', পূর্ণিমা কহিল, 'সঙ্ঘের কাজে উৎসাহ থাকলে ওতে আর আটকায় না।'

'খেপেছ ?' মিসেস গুপ্ত গম্ভীরভাবেই কহিলেন, 'মিসেস নাগ যাবেন ট্যাক্সিতে পয়সা খরচা করতে। দেখো, এ মোটর-বিগড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়।'

পূর্ণিমা মিসেস নাগের উপর প্রীত নয়। তাকে পূর্ণিমা যথেষ্ট গম্ভীর মনে করে না, বরঞ্চ বিধবার পক্ষে তার বাচালতাকে একটু অশোভন মনে করে। কিন্তু এই মিসেস নাগই পূর্ণিমার বড় প্রতিদ্বন্দী,—ইলেকশানে আরেকটু হইলেই পূর্ণিমাকে হারাইতে বসিয়াছিলেন। সঙ্ঘে তার প্রভাব-প্রতিপত্তিও সবিশেষ রকম মজবুত। তাই পূর্ণিমা যতই না তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন থাকুক, তাঁকে সমীহ করিয়া চলা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। মিসেস নাগের বিলম্বের জন্য পূর্ণিমার ক্ষোভ ছিল না,—তাঁর ত্রুটীতে পূর্ণিমার দুঃখিত হইবার কথা নয়। তবু সে বিরক্তি দেখাইল এইজন্য যাতে সঙ্ঘের সদস্যারা মিসেস নাগের দায়িত্বজ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারে।

কহিল, 'এই মিসেস নাগই সঙ্ঘের সেক্রেটারি হ'তে চেয়েছিলেন।'

সুলতা মুখে আতঙ্ক টানিয়া আনিয়া কহিল, 'তবেই সন্ধেন হয়েছিল। কিন্তু রায় বাহাদুর গণেশবাহনের তো মোটরের আর কিছু অভাব নেই,—তিনিই বা শুধু শুধু দেরি করছেন কেন ?'

'পুরুষদের কথা আর বলো কেন,—সমস্ত জাতটাই এরকম।'—পূর্ণিমা কহিল।

মিসেস গুপ্ত বুড়া মানুষ। কথাবার্তার ফাঁকেই তাঁর একটু তন্দ্রা আসে,—পূর্ণিমার ঝাঁঝালো কথায় তন্দ্রা টুটিয়া গেল। চশমাটাকে ঠিক করিয়া তিনি কহিলেন, 'ওকথা বলো না।

পুরুষদের মধ্যেও ভালোমন্দ আছে,—এই তো মিষ্টার গুপ্তও তো রয়েছেন।'

সুলতা কহিল, 'দোহাই, পুরুষের সপক্ষে আপনি কিছু বলবেন না।'

মিসেস গুপ্তকে মাঝে মাঝেই সাবধান করিয়া দিতে হয়। সঙ্ঘের আদর্শে তিনি এখনো উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারেন নাই, এবং সদস্যাদের বিবেচনায় এর জন্য দায়ী তাঁর বয়স।

স্বামীর জন্য খাবার তৈরি করায় তাঁর দুর্ব্বলতা অতিশয় প্রবল। সঙ্ঘের অধিবেশন স্থগিত করিয়া তিনি এতদিন আহারের তত্ত্বাবধানে গিয়াছেন যে সভ্য এখন আর তাতে অপমান বোধ করে না।

পূর্ণিমাতো একদিন স্পষ্টই মুখের উপর তাকে শুনাইয়া দিল। আপনি পুরুষের দাসী নন, অভিমানভরে পূর্ণিমা কহিল, 'সেবা করে ধন্য হওয়ার কিছু নেই।'

মিসেস গুপ্ত আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলেন, 'স্ত্রী-স্বাধীনতা চাই বলে স্বামীর খাবারও বুঝি ঠিক রাখ্‌তে পারবো না ?'

'কেন রাখবেন ?' পূর্ণিমা ঝাঁঝালো স্বরে কহিল, 'আপনার খাবার কখনো ঠিক করে রাখেন তিনি ?'

বিকল মোটর-এঞ্জিনের উন্মাদকণ্ঠ গেটের দিকে অকস্মাৎ তীব্রভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সম্পূর্ণ পাঁচ মিনিট মেদিনী প্রকম্পিত হইবার পর বোঝা গেল, একটা মোটর থামিয়াছে।

'ঐঃ !' মিসেস গুপ্ত কহিলেন।

'সম্ভবতঃ', সুলতা কহিল, 'মিসেস নাগ।'

'কথা শোনো, মেয়ের' চশমাটা নাকের মাঝামাঝি আনিয়া বিস্ময়ের কণ্ঠে মিসেস গুপ্ত কহিলেন, 'সম্ভবত! মিসেস নাগের মোটর ছাড়া আর কারুরটা এতটা শব্দ করতে পারে নাকি ?'

'দেখো তো সুলতা' পূর্ণিমা কহিল, 'এঞ্জিনটাই শুধু এসেছে, না মিসেস নাগও আসতে পেরেছেন,—পেছন দিকটা আবার রাস্তায় পড়ে থাকেনি তো ?'

উঁচু-হিলওয়ালা জুতো লয়ে দ্রুত খুটখুট করিয়া উঠিয়া মিসেস নাগ, 'ঈস, কী দেরী হয়ে গেছে' বলিতে বলিতে গটগট করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। সাদা মিহি কালো-পাড়ের তাঁতের কাপড় পরণে, গায়ে আদ্দির কাপড়ের হ্রস্বহাত ব্লাউস। গলায় সরু সোনার চেন ও হাতে এট্যাসি কেস। বগলের রঙিন খর্ব্বছাতা বেশে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। মিসেস নাগের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়ের এই যে যদিও তাঁর বয়স এখন আর বাড়িতেছে না, তবু তিনি ক্রমেই বিগতযৌবনা হইয়া পড়িতেছেন।

সভার উদ্দেশ্যে বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া তবে তিনি ছাতাটা টেবিলে রাখিলেন। পূর্ণিমাকেই তাঁর ভয়,—নইলে আর কারুর কাছে তিনি জবাবদিহির প্রয়োজন মনে করেন না।

সামান্য কিছু স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের সাথে পূর্ণিমাকে কহিলেন, 'তোমরা কতক্ষণ, পূর্ণিমা ?'

পূর্ণিমা কহিল, 'আমরা সময়মতই এসে থাকি, মিসেস নাগ। আর দেখুন ; সময়মত না এলে সঙ্ঘের কাজের বিশেষ অসুবিধে হয়—বিশেষ এমন একটা জরুরী অধিবেশনে যদি সদস্যাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাক্‌তে হয়।'

'দায়িত্বজ্ঞান' মিসেস নাগ চেয়ারটা সশব্দে টানিয়া ভঙ্গী-ভরে বসিতে বসিতে বলিলেন, 'কারুর চাইতেই আমার কম নয়। কিন্তু মোটরটা বিগড়ে গেলে সে আর আমার দোষ নয়,—না, সেটাও আমার দোষ ?'

মিসেস গুপ্ত চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন। মেয়েদের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল একটি ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি,—যার মর্ম্মার্থ এই, 'কেমন বলেছিলুম কিনা তোমাদের, এ মিসেস নাগের মোটর বিগড়ানো ছাড়া আর কিছু নয় !' মিসেস নাগকে কহিলেন, 'বড্ড বেশী খারাপ হয় আপনার গাড়িটা, মিসেস নাগ। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ির এই অসুবিধে,—বড় জ্বালান।'

'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড' মিসেস নাগ প্রতিবাদ করিলেন, 'অবাক কথা ! কতবার বলবো আপনাকে ওটা মোটেই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড নয়। কি রকম চড়া হয়, সেটা দেখতে হবে তো। আমি আবার পেট্রোল খরচার ভয়ে গাড়ি ঘরে বন্ধ রাখ্‌তে পারিনে।'

পূর্ণিমা কহিল, 'গাড়ির আলোচনাটা আমরা না-ই করলুম, মিসেস গুপ্ত।'

মিসেস নাগ কহিলেন, 'আমিও তাই বলি। কিন্তু রায় বাহাদুর তো এখনও এলেন না ? ওঁর তো আর মোটরের জন্য আটকাবার কথা নয়। নতুন নতুন গাড়ি কেনাই যে ওঁর

নেশা। আর সব কটাই বিশেষ দামী গাড়ি।---ও ছাই, এ আবার যে গাড়ির আলোচনাই এসে পড়লুম!'

পূর্ণিমা হয়তো তখন মনে মনে রায় বাহাদুর গণেশবাহনের মুণ্ডুপাত করিতেছিল। পুরুষ নেওয়াতে পূর্ব্বাবধিই তাঁর আপত্তি।

মিসেস গুপ্ত কহিলেন, 'অসুখ বিসুখ নয়তো? খবর রাখেন কিছু রায় বাহাদুরের, মিসেস নাগ?'

মিসেস নাগ কহিলেন, 'নাঃ, অনেকদিন ওঁর কিছু খবর রাখিনে।'

রায় বাহাদুর না-আসা অবধি সভার বড় বড় কাজগুলি স্থগিত রহিল। মহাধিবেশনের খরচ অনেকটাই গণেশ-বাহনের স্কন্ধে উঠানো হইবে,—এইরূপ সঙ্ঘের শুভ সংকল্প। ইতিমধ্যে নারীদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। এই সিদ্ধান্তে আসা কষ্টকর হইল না যে স্ত্রীদের নিষ্পেষিত করিয়া পুরুষেরা নিজেরাই প্রমাণ করিল তারা, ঘোর অত্যাচারী।

পূর্ণিমা কহিয়া উঠিল,—'অৰ্দ্ধবর্ব্বর পুরুষেরা!'

শুনিয়া মিসেস গুপ্ত আঁতকাইয়া উঠিলেন। 'অ্যাঁ', সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, 'না, না, ভুল,—ভুল তোমার। পুরুষের মধ্যেও ভালোমন্দ দুই আছে। এই তো মিষ্টার গুপ্তর কথাই ধরো না।'

মিসেস নাগ ঠোঁট উল্টাইয়া কহিলেন, 'আপনি হোপ-লেশ, মিসেস গুপ্ত।'

'আমি কি করলুম?'—মিসেস গুপ্ত প্রশ্ন করিলেন।

'ভুলে যান কেন, পুরুষদের ভালো লাগলেও মনে মনে চেপে রাখতে হয়,—এমনি করে প্রকাশ করে ফেল্লে সঙ্ঘ চলে কি করে বলুন তো?'

'ওঃ'—মিসেস গুপ্ত বুঝিলেন।

'আপনি ভুলে যাবেন না মিসেস গুপ্ত যে পুরুষের কাছ থেকে আপনি সাহায্য, সাজসজ্জা, মোটর এসব নিতে পাবেন, কিন্তু তাই বলে পুরুষকে করুণা দেখানো চলতেই পারে না। আমাদের সঙ্ঘের উদ্দেশ্য তা নয়,—তা কি ভুলে গেলে চলে?'

কিন্তু রায় বাহাদুরের অপেক্ষায় কাজ স্থগিত রাখা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। আর দেরি করিতে হইলে আবার মোটর প্রসঙ্গটাই টানিয়া আনিতে হয়; কিন্তু সেটা মিসেস নাগের অভিপ্রেত নয়, অন্ততপক্ষে তাঁর নিজের মোটরটা সম্বন্ধে। আবার নিতান্ত মেয়েলী কথাবার্ত্তাও সঙ্ঘ বরদাস্ত করে না।

মিসেস নাগ কহিলেন, 'উনি আসুন,—আমরা না হয় প্রস্তাবগুলির আলোচনা ইতিমধ্যে আরম্ভ করে দিই'

'কিন্তু দেখবেন', সুলতা কহিল 'টাকাটা যেন ঠিকমত আদায় করে নেওয়া হয়।'

'আলোচনাটা কি', পূর্ণিমা কিঞ্চিৎ শ্লেষ করিয়া কহিল, 'তিনি এলে আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে নাকি!'

'খেপেছ', মিসেস নাগ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, 'রায় বাহাদুর তেমন মানুষই নন। আমরা যাতে 'হ্যাঁ' বলি; তাতে কোন দিনও ওঁর আপত্তি দেখেছ?'

এই আশ্বাস পাইবার পর পূর্ণিমা প্রথমদিককার প্রস্তাব-গুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

সঙ্ঘের বিশ্বাস হিন্দুবিবাহের অনড়বন্ধন-হেতু প্রাচ্যনারীরা শোচনীয় পরাধীনতার মধ্যে জর্জ্জরিত হইতেছে। নারীর যদি ইচ্ছামাত্র বিবাহ ছিন্ন করিবার অধিকার হস্তগত হয়, তবে অত্যাচারী পুরুষেরা স্বার্থপরতা অন্তর্দ্ধান করিতে দেরী করিবে না। অফিস হইতে আসিয়া স্ত্রীকে আর হুকুম চালাইতে পারিবে না,—চটি আনো, জল দাও, খাবার তাড়াতাড়ি লইয়া আস। কিম্বা অন্যান্য কাজ করিতে স্ত্রীকে বাধ্য করিতে পারিবে না। বরঞ্চ তাকেই সর্ব্বক্ষণ রীতিমত দেবীর ন্যায় সম্মান করিয়া, উপঢৌকনদ্বারা সন্তোষবিধানপূর্ব্বক তবে গৃহে অচলা করিতে সমর্থ হইবে।

'এ-প্রস্তাবের খসড়াটা হয়েছে চমৎকার', মিসেস নাগ সহর্ষে কহিলেন 'স্বেচ্ছায় নারী যদি পুরুষের কাছ থেকে চলে যেতে পারে, তবেই মাত্র তার স্বাধীনতা অনেকটা জেতা হয়েছে বুঝতে হবে। ক্ষমতা থাকলেই তো ওরা অত্যাচারী, নইলে তো ওরা জোড়-হাত।'

মিসেস গুপ্ত চশমাটা উত্তেজনাও আতঙ্কের আতিশয্যে একেবারে নাকের ডগায় টানিয়া আনিলেন। 'ওটা এখন', সাতঙ্কে তিনি কহিলেন, 'বাদ দিলে হয় না? মিষ্টার গুপ্ত শুনলে হয়তো ঠিক পছন্দ নাও কর্ত্তে পারেন।'

পূর্ণিমা কহিল, 'আপনি বলেন কি মিসেস গুপ্ত! পুরুষ-দেব অভিলাষ মতোই কি আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক হবে? তবে সঙ্ঘ উঠিয়ে দিলেই হয়।'

মিসেস নাগ কহিলেন, 'আপনি অবাক করলেন, মিসেস গুপ্ত। এ-প্রস্তাব পাশ হলেই তো আর আপনাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে হচ্ছে না,—তবে ভয়টা আপনার কিসের বলুন?'

ইহার পর বিবাহে গোত্রান্তর করার বিষয়ে যে প্রস্তাবটা ছিল, সেটা আলোচিত হইল। প্রস্তাবের মর্মার্থ এই:—আবহমান কাল ধরিয়া পুরুষ বিবাহে নিজ গোত্র স্ত্রীর উপর চাপাইয়াছে। অন্যের গোত্র বহনে যে আত্মাপমান, যে হীনতা-স্বীকার, তাহা মহাপ্রাচ্যের নারীদের নিকট ক্রমেই অঙ্কুশ-বেদনার ন্যায় বোধ হইতেছে। নারী তো দাসী নয়,—দাসীমনোভাবের চিহ্নটুকুও সে সহ্য করিবে কেন? এইবার হইতে নারীর গোত্র নারীরই থাকিবে,—তাহা পুরুষের গোত্রের পদলেহন করিবে না।

মিসেস নাগ কহিলেন, 'স্পেল্‌ন্ডিড্!' অথচ এই একই প্রস্তাবে মিসেস গুপ্ত সম্পূর্ণই আহত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, 'বিয়েতে যদি গোত্রান্তরই না হ'লো তবে আবার বিয়ে হ'লো কি রকম?'

পূর্ণিমা হতাশ হইয়া ঠোঁট কামড়াইল। মিসেস গুপ্তকে সহ্য করিতে হইলে পাথর হইতে হয়,—তার বুকে আবেগ থাকিবে না, আক্রোশ থাকিবে না, অপমান বোধ বর্ত্তমান থাকিবে না।

'অবাক করলেন, আপনি', মিসেস নাগ পূর্ণিমাকে সমর্থন করিয়া মিসেস্ গুপ্তকে কহিল, 'কি চমৎকার প্রস্তাবটা আপনি বুঝতে পারচেন না? এবার থেকে মীরা মিত্র মাধবচন্দ্র নাগকে বিয়ে করে আর মিসেস নাগ হয়ে উঠবে না। আপনিই বলুন, মিসেস গুপ্ত, কোথায় মিত্তির আর কোথায় নাগ? নাগ বললেই মনে হয় যেন ফোঁস ফোঁস করে উঠচে।'

মিসেস নাগের যুক্তি সারগর্ভ এবং বুঝাইবার ক্ষমত চমৎকার।

এমন সময় একজোড়া জুতার শব্দের পরে দ্বারপথে দেখ গেল একটি ভুঁড়ি ও তারপর একহাত উপরে একটা টাক।

'রায় বাহাদুর গনেশবাহন,' সদস্যারা কহিয়া উঠিলেন।

তিন

রায়বাহাদুর গনেশবাহন বেঁটে এবং মোটা। লম্বাতে তিনি মিসেস নাগের কাঁধের কাছে পড়িয়া থাকেন অথচ জগতের অনেকটা জায়গাও তিনি আটকাইয়া রাখিয়াছেন দেহের পরিধিতে। কপালের উপরে মাথার যতটা দেখা যায় সাহারা মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে,—তৃণগুল্মের কোনও লক্ষণই দেখা যায় না। ভুঁড়িটা কিন্তু ক্রমেই এমন আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে যে দরজিদের কাছে সেটা একটা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ণিমা কহিল, 'শেষে সত্যিই এলেন রায় বাহাদুর। এর পরেও যদি পুরুষদের ওপর সঙ্ঘের অভিযোগ থাকে, তবে কি সেটা আমাদের দোষ।'

এমনভাবে আক্রান্ত হইয়া রায় বাহাদুর গনেশবাহন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি এত যে বিনীত দুঃখ একটু আগেই জ্ঞাপন করিলেন তার যদি এমন একটা ফল পাওয়া যায়, তবে কে না বিপন্ন বোধ করে। দুই তিনবার ঢোঁক গিলিয়াও গল হইতে যখন কোনও জবাব বাহির করিতে পারিলেন না তখন দাঁত বাহির করিয়া তিনি হাসিয়া কহিলেন, 'হেঃ হেঃ।'

বিপন্ন রায় বাহাদুরের সাহায্যে আসিলেন মিসেস নাগ। উপদেশের মত করিয়া কহিলেন, 'এ তোমার অন্যায় পূর্ণিমা, —হ্যাঁ, একে আমি অন্যায়ই বোলবো। রায় বাহাদুর কাজের মানুষ, স্ত্রী-সঙ্ঘই তো আর ওঁর একমাত্র কাজ নয়। আর্থিক-ক্ষতি করে মিটিঙে আসা আমি কোনও দিনই অনুমোদন কর'বো না।

রায় বাহাদুরের গনেশবাহন কিছু আশ্বস্ত বোধ করিল। মিসেস গুপ্তকে কহিল, 'আপনার স্বাস্থ্য বেশ ভালোতো, মিসেস গুপ্ত?'

মিসেস গুপ্ত কহিলেন, 'তা আর বিশেষ ভালো কোথায়; এটা ওটা লেগেই আছে। হাওয়া বদলাতে যেতে হচ্ছে, কিন্তু মিষ্টার গুপ্তের কোর্ট ছুটী না হলে তা যাই বা কার সঙ্গে?'

সুলতা জনান্তিকে কহিল, 'হায়রে পুরুষমুখাপেক্ষিতা! অসহ্য এ!'

রায় বাহাদুর কহিলেন, 'হেঃ হেঃ, আপনি ভালো তো, মিসেস নাগ।'

'আমাদের আর ভালো আর মন্দ', মিসেস নাগ কহিলেন, '—এত দেরী হলো আপনার, রায় বাহাদুর, দরকারী কাজ ছিল বুঝি?'

'আপনার, গিয়েছিলুম একটু—'

'সেয়ারের বাজারে? পাইকারী বাজারে? জাহাজ কোম্পানীতে খোঁজ নিতে?'

'আজ্ঞে, একটু দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলুম। তিনটে দাঁত নড়নড় করছিল, তুলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু এতটা যে দেরী হবে তা আপনার, আমি মোটেই ভাবিনি। অথচ ডাক্তারগুলির কি কাণ্ডজ্ঞান আছে, না স্ত্রী-সঙ্ঘের মূল্য বোঝে?'

'তাই বলুন,' মিসেস নাগ আনন্দের সঙ্গে কহিলেন, নইলে রায় বাহাদুরের কথার নড়চড়! আচ্ছা রায় বাহাদুর, সবশুদ্ধ কটা দাঁত পড়লো আপনার?'

'গোটা পাঁচেক হবে', রায় বাহাদুর জবাব দিলেন, 'বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, আর বলেন কেন?'

'মাত্র পাঁচটা পড়েছে,—তাকেই কিনা আপনি বুড়ো হওয়া বলেন', বিস্মিত হইয়া মিসেস নাগ কহিলেন, 'আপনি তো জানেন না, চল্লিশের আগেই মিষ্টার নাগের কটা দাঁত পড়েছিল।'

পূর্ণিমা ঠোঁট কামড়াইতেছিল। বিরক্ত হইলেই সে ঠোঁট কামড়াইয়া রাগটাকে ভিতরে আটকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মাত্রাটা বেশী হইলে আর পারে না।

কহিল, 'দাঁতের আলোচনাটা কি এখন খুবই বিশেষ দরকারী, মিসেস নাগ? সঙ্ঘের কাজ হয়ে যাওয়া অবধি কি সেটাকে মুলতুবী রাখা একেবারেই অসম্ভব?'

রায় বাহাদুর গণেশবাহন প্রমাদ গণিলেন। মিসেস নাগ মাত্র এক সেকেণ্ড অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তার পরই হাসিয়া কহিলেন, 'কথা শোনো, মেয়ের। সঙ্ঘের কাজের চাইতে ত্রিভুবনে বেশি জরুরী আর কিছু আছে নাকি?'

সঙ্ঘের কাজের আলোচনা সুরু হইল। রায় বাহাদুর গণেশবাহন এদিকে বিশেষ উদার। প্রতিবাদ করিয়া নারীর কোমল চিত্তে ব্যথা দিতে তিনি ইতঃস্ততঃ করেন বলিয়া সমস্ত আলোচনাই তিনি কাণ দিয়া শোনেন, অথচ মুখ দিয়া আপত্তির কোনও ভাষা বাহির করেন না, এবং সভায় স্বমহিমাতে শোভা পান। আজকার গরম গরম আলোচনায়ও তিনি মুখ খুলিলেন সামান্যই। কিন্তু পূর্ণিমার দিকে কিছুক্ষণ ও মিসেস নাগের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া বারম্বার তিনি ঢোঁক গিলিলেন এবং চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া চেষ্টা করিয়া টেবিলের উপর মাথা জাগাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

রায় বাহাদুরের জল তৃষ্ণা পাইয়া গেল। মিসেস গুপ্ত ভৃত্যকে আহ্বান করিতেই, মিসেস নাগ ভীত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'পাগল! রোদের থেকে ঘুরে এসেই ঠাণ্ডা জল খেলে সর্দ্দিগর্ম্মি হতে পারে,— সে ভয় নেই বুঝি আপনার?'

রায় বাহাদুর সকৃতজ্ঞভাবে কহিলেন, 'ধন্যবাদ, মিসেস নাগ, ও কথাটা মনে ছিল না।'

'তবেই নারীর মূল্য বুঝুন, রায় বাহাদুর,' মিসেস নাগ কহিলেন, 'পুরুষের জীবনে নারী অপরিহার্য্য, নারীর পুরুষ ছাড়া সচ্ছন্দে চলে। তোমার এ বিষয়ে মত কি পূর্ণিমা?'

'আমার মত', পূর্ণিমা কহিল, 'কারুর তো আর অজানা নেই। সমস্ত দিক বিচার করে আমার এই মনে হয় যে পুরুষ কতগুলি অর্দ্ধবর্ব্বর, অত্যাচারী, উৎপীড়কের দল,— আর কিছু নয়।'

মিসেস গুপ্ত সামান্য জীব কাটিয়া সশঙ্কিতভাবে কহিলেন, 'রায় বাহাদুর পুরুষ, তা তুমি ভুলে যেওনা, পূর্ণিমা।'

'রায় বাহাদুরকে,' সুলতা মৃদু হাসিয়া কহিল, 'আমরা মেয়েও মনে করে নিতে পারি।'

কার্য্যবিবরণীতে লেখা প্রস্তাবগুলির আরো আলোচনা হইবার পর পূর্ণিমা কহিল, 'প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার আছে, রায় বাহাদুর?'

'আপনি কি বলেন, মিসেস নাগ?' রায় বাহাদুর বিপন্ন হইয়া প্রশ্ন করিলেন।

মিসেস নাগ কহিলেন, 'চমৎকার!'

'চমৎকার', রায় বাহাদুর প্রতিধ্বনি করিলেন।

মিসেস নাগ কহিলেন, 'বিধবা মেয়েদের অভাব অভিযোগ বিষয়ে আমি কতগুলি বিশেষ প্রস্তাব করিতে চাই। স্কুলে

চলবে না তো, আমি দেশের বিধবা মেয়েদের রিপ্রেজেণ্ট করছি।'

পূর্ণিমা কহিল, 'বিধবা মেয়েদের সম্বন্ধে প্রস্তাবগুলিকে আপনি দেখেন নি? পুনর্ব্বিবাহ চালাতেই হবে,—সে কথা তো জোর দিয়ে লেখা আছে।'

মিসেস নাগ কহিলেন, 'শোনই! আমাকে বলতে দাও।'

'বলুন', পূর্ণিমা কহিল।

'বিধবাদের ওপর', মিসেস নাগ কহিতে লাগিলেন, 'পুরুষ কী অত্যাচারটাই না করে আসচে। নিজেরা মনের সুখে যত ইচ্ছে বিয়ে করচেন, অথচ স্ত্রীলোকের বেলায় কী তার জবরদস্তি!'

'এটা কিন্তু', রায় বাহাদুর গণেশবাহন এতক্ষণ পরে মৃদু আপত্তি জানাইয়া কহিলেন, 'পুরুষের ওপর অবিচার করা হলো। আপনারা গিয়ে, এই দেখুন না,—আমিও তো স্ত্রী-বিয়োগের পরে আর দারান্তর গ্রহণ করি নি।'

'দারান্তর গ্রহণ না করা', মিসেস নাগ হতভম্ব রায় বাহাদুরের মুখের উপরে বলিলেন, 'মৃতদার পুরুষের পক্ষে নেহাৎই বোকামী। অবশ্য, মৃতদারের বিধবা ছাড়া বিয়ে করা উচিত নয়।'

এতক্ষণে পূর্ণিমা কহিল, 'এসব প্রস্তাব আপনার মোটেই নতুন নয়, মিসেস নাগ। আপনি প্রস্তাবগুলি ভালো করে পড়েন নি, মনে হচ্চে।'

মিসেস নাগ সংক্ষেপে কহিলেন, 'শোনই।'

একটু পূর্ব্বে মিসেস গুপ্তর তন্দ্রা আসিয়াছিল। সভ্যের প্রস্তাবগুলি বেশি কড়া হইলে সর্ব্বদাই তাঁর তন্দ্রা আসে। জাগিয়াই বিধবাবিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া আবার ঘুমাইবেন কিনা ভাবিতেছিলেন। তাহা না করিয়া তিনি প্রতিবাদ করিলেন, 'তোমার প্রস্তাবটায় একটু বাড়াবাড়ি আছে, পূর্ণিমা। বিধবা হলেই তার বিয়ে দিতে হবে,—এ ব্যবস্থা ভালো নয়। বয়স বেশি হলে তার আবার ফিরে বিয়ে করা কি ঠিক?'

'কিন্তু, কেন শুনি, মিসেস গুপ্ত', উচ্চস্বরে এবং দ্রুত মিসেস নাগ কহিলেন, 'বড় এক-চোখো আপনি। স্বামী নিয়ে বুড়ীরা যদি সুখে ঘরকন্না করতে পারে, তবে একটু বয়স্কা বিধবাদের ওপর এ অত্যাচারটা কেন, শুনতে পাই? কি বলেন আপনি, রায় বাহাদুর!'

চেষ্টা করিয়া টেবিলের উপরে মাথাটা ভালো করিয়া উঠাইয়া রায় বাহাদুর কহিলেন, 'নিশ্চয়।'

'বাজে কথা থাক্' পূর্ণিমা কহিল 'আপনার প্রস্তাবটা বলুন, মিসেস নাগ, আমরা বিচার করে দেখি সেটা গ্রহণযোগ্য কি না।'

মিসেস গুপ্ত ব্যর্থভাবে বাহির দিকে চাহিয়া আক্ষেপ করিলেন, 'নাঃ, চাবটে বাজলেও চাকরগুলির আর আজকাল দেখা পাওয়া যায় না। চায়ের জল চড়েনি এখনো বোধ হয়।'

মিসেস নাগ কহিলেন,—'হিন্দু-আইনে বিধবার সম্পত্তি সম্বন্ধে যে আইন বর্ত্তমানে রয়েছে, আমার মনে হয়, সভ্যের তরফ থেকে তার তীব্র প্রতিবাদ জানানো উচিত। মৃত স্বামীর যে সম্পত্তি বিধবা পায়, তাতে তার কি রকম অধিকার জানো?—শুধু মাত্র আংশিক অধিকার। জীবনকাল পর্য্যন্ত শুধু সে তা ভোগ করতে পারবে,—কিন্তু তা বলে নিজের ইচ্ছে মত যে খরচা করবে, তারও উপায় নেই। কেমন, ঠিক বলছি কিনা, রায় বাহাদুর?'

'একদম ঠিক', রায় বাহাদুর জবাব দিলেন, 'মনে হচ্চে আইনে আপনার বিশেষ অধিকার আছে।'

'না না, আইনে অধিকার নয়', মিসেস নাগ বিনয়ের সঙ্গে জানাইলেন, 'এই নিয়ে আমার স্বামীর কয়টা কুচুটে অপদার্থ আত্মীয়ের সঙ্গে মামলা বাঁধবার উপক্রম হয়েছিল। সেই সম্পর্কে জেনেছি। তবে শিখে নিয়েছি, আর ভুলবো না।'

সুলতা কহিল, 'ঈস্, নারীর ওপর কী অত্যাচার!'

'অত্যাচার বলে অত্যাচার', মিসেস নাগ প্রায় আক্রোশের সঙ্গে বলিলেন, 'অত্যন্ত অসঙ্গত রকমের সব কাণ্ড-কারখানা। আর হবে না কেন,—পুরুষগঠিত পৃথিবী, নিজের সব রকম সুবিধে করে নিয়েচে।'

মিসেস নাগ নতুন একটা মোটর কিনিবেন সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এমন সময় মিষ্টার নাগের পরবর্ত্তী ওয়ারিশেরা বাদ সাধিল। আদালত হইতে সম্পত্তি অপব্যয়িত হইতেছে এই অজুহাতে নিষেধাজ্ঞা নিয়া মিসেস নাগের নির্দ্দোষ আনন্দে তারা বাধা দেয়।

'আপনি যথার্থ বলেছেন', পূর্ণিমা দৃঢ়তার সঙ্গে কহিল, 'এ অন্যায়ের প্রতিকার করতেই হবে। আমার আইন-টাইন তেমন পড়া নেই বলে একটু অসুবিধে হয়।'

প্রস্তাবগুলির মধ্যে পূর্ণিমা নতুন একটা প্রস্তাব সংযোজন করিল।

মিসেস নাগ কহিলেন, 'তাছাড়া, বিধবা মেয়েদের তো তোমরা বিয়ে-দেওয়াতে চাচ্ছো,—অথচ আইনে কি বলে জানো? আইনে বলে,—বিধবার বিয়ে হলে তার পূর্ব্বস্বামীর সম্পত্তি তার হাতছাড়া হবে। কি রকম বেয়াক্কেলী কাণ্ড বলো তো! আগের স্বামী হয়তো বেশি টাকা কড়ি রেখে গেছেন,—এদিকে আবার বিয়ে করলে তা তার হাত থেকে ফস্‌কাবে। কি রকম একটা সঙ্কটের সৃষ্টি হয় বলো তো! কী বিরাট অন্যায়! অবলা বিধবার ওপর কী নির্ম্মমতা। —হয়তো টাকার মায়াতেই তার বিয়ে করা সম্ভবপর হয়ে উঠ্‌বে না।'

পূর্ণিমা সহানুভূতির সহিত ঘাড় নাড়িল। 'চমৎকার', রায় বাহাদুর গণেশবাহন কহিলেন, 'আপনি যতটা জানেন, শতকরা নব্বুইটা পুরুষ ততটা জানে না, মিসেস নাগ। এসব আপনি শিখলেন কোথা থেকে? আপনার স্বামীর আত্মীয়েরা বলেছে বুঝি?'

'না না', মিসেস নাগ কহিলেন, 'এ সম্বন্ধে আমি উকিলের পরামর্শ নিয়েছি।'

এতক্ষণ পরে সঙ্ঘের সাথে মিসেস গুপ্তের মতের মিল দেখা গেল।

'বিধবাকে তার নিজের স্বামীর পয়সা খরচা করতে দেবে না', মিসেস গুপ্ত কহিলেন, 'এ কেমন কথা। তাছাড়া, আপনার মোটরটাও বদলানো দরকার হয়ে পড়েছে, মিসেস নাগ।'

'মোটরের আলোচনা', মিসেস নাগ গম্ভীরভাবে কহিলেন, 'কাজের সময় আমি করবো না।'

পূর্ণিমা নতুন আর একটা প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করিতে মনোযোগ দিল। ইহার পর অর্দ্ধঘণ্টা আলোচনার ফলে প্রস্তাবগুলি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির দ্বারা পাশ হইয়া মহাধিবেশনের অনুমোদন অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পূর্ণিমা কহিল, 'তবে তাই ঠিক রইল। আমি দু-তিন দিনের মধ্যে সঙ্ঘের সমস্ত শাখাতে জানিয়ে দিচ্ছি সঙ্ঘের মহাধিবেশন বড়দিনের ছুটীতে কলকাতায় হবে। দু-দুজন করে ডেলিগেট নির্ব্বাচন করে তারা পাঠাতে পারবেন।'

সকলে সম্মতি জানাইল।

'লিখে দাও', মিসেস নাগ কহিলেন, 'একটু ভাল দেখে মেয়ে যেন পাঠান হয়! নইলে পরে মফঃস্বলের পানসে ভয়-কাতুরে কতগুলি মেয়ে যদি প্রতিনিধি হয়ে আসে তবে তাদের দিয়ে সবল রকম যে কোনও প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেওয়াই কঠিন হবে। জানি তো সব।'

এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইল এক যুবক। বয়স আটাশ উনত্রিশ,—সবল শক্তিমান দেহ, লম্বায় প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি।

শশাঙ্ক মিসেস গুপ্তের ছেলে।

মিসেস নাগ আনন্দে চেঁচাইয়া উঠিলেন 'শশাঙ্ক, তুমি? এসো এসো, বাচ্চো কেন? শশাঙ্ক কবে এলো মিসেস গুপ্ত?'

'আজকেই এসেচে' মিসেস গুপ্ত কহিলেন, 'ভোরবেলা।'

শশাঙ্ক ফিরিবার জন্য পা উদ্যত করিয়াছিল। বিরত হইয়া কহিল, 'ধন্যবাদ, মিসেস নাগ। আপনারা যে এখানে খবরটা আমি জানতুম না।'

'তার আর কি হয়েচে', মিসেস নাগ প্রীতির হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'সঙ্ঘের কাজ শেষ হয়ে গেছে। তোমার আসাতে কোনও ক্ষতি হয়নি।'

'ক্ষতির জন্য নয়', দাঁড়াইয়াই শশাঙ্ক কহিল, 'আমি স্বার্থার্থ হয়ে এসেছিলাম। সেদিক দিয়ে দেখলে, এই অবলা-সঙ্ঘের মধ্যে আসায় কোন লাভ হবে না।'

পূর্ণিমা ঠোঁট কামড়াইতেছিল। শশাঙ্ককে তার জানিতে বাকি নাই। তার আগমনকে পূর্ণিমা তপোবনে মত্ত হস্তীর প্রবেশের মত মনে করে।

'অবলা-সঙ্ঘ?' প্রায় রুদ্ধনিঃশ্বাসের সঙ্গে পূর্ণিমা প্রতিবাদ করিল, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন শশাঙ্কবাবু, আমাদের অবলা-সঙ্ঘ নয়। আমরা কাঙালপনা করিনা; আমরা লড়তে প্রস্তুত।'

'সেই জন্যই তো আপনাদের সভার মধ্যে ঢুকে পড়তে ভয় পাই,' মৃদু হাসিয়া শশাঙ্ক বলিল, 'নিজেকে ঠিক নিরাপদ মনে করতে পারি না — আচ্ছা আসি।'

রায় বাহাদুরের সঙ্গে একটু মাথা নোওয়ানুয়ি করিয়াই শশাঙ্ক বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুবোধ বসু

খেলা ধূলা

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী এম-এ

ফুটবল

অতি সহজেই যে এবার লীগ-চ্যাম্পিয়ান হল—সে বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং। মিলিটারি দল ডারহামের পর একমাত্র সিভিলিয়ান টীম মহমেডান ১৯৩৪ হতে ক্রমান্বয় তিন বছর লীগ-চ্যাম্পিয়ান হয়ে লীগ-ইতিহাসে একটী রেকর্ড করল। এর পূর্ব্বে বহুবার শীল্ড-বিজয়ী ক্যালকাটা ও ডালহৌসি পর পর তিনবার লীগ-চ্যাম্পিয়ান হতে সক্ষম হয়নি যদিও তখনকার অতি সুন্দর খেলার পার্শ্বে বর্ত্তমান অতি নিম্ন ষ্টাণ্ডার্ডের খেলা দাঁড়াতে পারে না। এবার লীগের প্রথম হতেই প্রমাণ করছিল যে মহমেডান দলের সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। লীগের শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সে অপরাজেয় হয়ে ছিল। একমাত্র ব্লাকওয়াচের ২-১ গোলে জয়লাভে মহমেডান দলের "অজেয়" রেকর্ড রইল না। মোহনবাগান মাঠে এট্যাচড্ সেক্সন বনাম মহমেডান দলের খেলায় লীগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ড রসিদ আহত হন। তার আগের দিনে যাদুকর সামাদও ভীষণ আহত হয়ে হাসপাতালে আশ্রয় নেন। এই দুদিনে ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বোধ হয় খেলার মাঠ থেকে শেষ বিদায় নিলেন। দিল্লীতে প্রথম রসিদ সুদক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত হন। তারপর নূর-মহম্মদ ও রসিদ এই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়-দ্বয়ের জোরে ১৯৩৩ সালে মহমেডান দল

চৈনিক বনাম ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন যথাক্রমে লি-ওয়াই-টং এবং সম্মথ দত্ত টস্ করছেন। মাঝখানে রেফরি লো

প্রথম ডিভিসনে উঠে। সেই বছরই রসিদ প্রথম ইণ্টার-ন্যাশনাল ম্যাচে খেলেন এবং তারপর থেকে সব আন্তর্জ্জাতিক ম্যাচেই তিনি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। অনেকের মতে বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেণ্টার-ফরোয়ার্ড বলতে রসিদকেই বুঝায়। আসছে বছর রসিদ খেলার মাঠে নামলেও ডাক্তারদের মতে তার ক্রীড়ানৈপুন্য, ক্ষিপ্রতা ও দুর্দ্দান্ত 'শট' থাকবে না। এবারও নূরমহম্মদের উৎকৃষ্ট খেলা ক্যালকাটার অন্যান্য নামজাদা সেণ্টার হাফদের খেলা ম্লান করে দিয়েছে। রহিম, সেলিম, সাবু এবং ওসমানের খেলা বেশ উল্লেখযোগ্য হয়েছে। ব্ল্যাকওয়াচ শেষ পর্য্যন্ত মাত্র দু' পয়েণ্টে লীগ-চ্যাম্পিয়ানের নীচে ছিল। কিন্তু লীগের খেলা অনুসারে ব্ল্যাকওয়াচের এত উচ্চ স্থানে পৌঁছান উচিত ছিল না। দু'একটী গেম ছাড়া লীগ-চ্যাম্পিয়ান টীমের মত ব্ল্যাকওয়াচের কোন উৎকৃষ্ট খেলা আমাদের চোখে পড়ে নি। গেষ্ট, ম্যাককুই বেশ খেলেছিল। শুধু স্থানীয় খেলোয়াড় নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মোহনবাগান। ব্ল্যাকওয়াচ, মহমেডান, ইষ্টবেঙ্গল, ক্যালকাটার সঙ্গে ড্র এবং অন্যান্য দুর্ব্বল টীমদের হারিয়ে মোহনবাগান লীগের একটি উচ্চ স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট। খেলায় বেশীক্ষণ মহমেডান দলকে চেপে খেলেও শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান ড্র করে। সেই খেলার ফলাফলের জোরেই মহমেডান লীগ-বিজয়ী হল এবং সেইদিনই বেনীপ্রসাদ আহত হন। শিল্ডে তিনি খেলতে পারবেন না। সন্মথ দত্ত, কে, দত্ত ও বি, মুখার্জ্জি আগেকার মোহনবাগানের সেই অপূর্ব্ব খেলার নমুনা দেখিয়েছেন। নন্দ চৌধুরী, এস চৌধুরী ও প্রেমলাল উত্তম খেলেছিলেন। বহুদিন পর ক্যালকাটা আবার লীগের অতি উচ্চস্থানে পৌঁছেছে। একদিন লীগ-চ্যাম্পিয়ান বা দ্বিতীয় স্থান ক্যালকাটার নিশ্চিত ছিল। মহমেডানের সঙ্গে ড্র করে এবং ব্ল্যাকওয়াচ, ইষ্টবেঙ্গল, ডালহৌসিকে ক্যালকাটা হারায়। শেষের দিকে ক্যালকাটার কাছে ব্ল্যাকওয়াচের কাষ্ট দু গোলে অভাবনীয় পরাজয় না ঘটলে লীগে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হত। কারণ মহমেডান পর পর ড্র করে মাত্র দু পয়েণ্টে উপরে ছিল।

সামাদ ও স্পিককে হারিয়ে ই, বি, আর ভয়ানক দমে যায়। লীগের প্রথম হতে ই, বি, আর বেশ সুন্দর খেলছিল।

চৈনিক বর্ম্মার ভারতীয়দলের খেলায় আর, কার, বল নিয়ে ছুটছেন

আজকের কথা নয় সেই "তাজহাট" টীম হয়ে সামাদ খেলতে এসে হঠাৎ একদিন ক্রীড়াজগতে "হিরো" হয়ে উঠেন। তারপর মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল দলে কিছুদিন খেলেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং জাভায় ক্রীড়াদক্ষতায় সামাদ সকলকে মুগ্ধ করেন। তিনি সাউথ আফ্রিকায় টীমের ক্যাপ্তেন নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু যোগ দিতে সক্ষম হননি। সামাদ রাইট আউট ও লেফ্‌ট আউট উভয়ই স্থানে বিশেষ

কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছিলেন। ভারতের মাটিতে সামাদের ন্যায় এতবড় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের আর আবির্ভাব হয়েছে কিনা সন্দেহ। বয়সে তিনি গোষ্ট পালের চেয়েও বড়। প্রায় ২৩ বছর ধরে সামাদ আশ্চর্য্যকর ক্রীড়ানৈপুণ্যের দ্বারা সকলকে আনন্দ দিয়ে এসেছেন। সামাদের সঙ্গে আরেকটী উন্নত তরুণ খেলোয়াড় মাঠ থেকে বিদায় নিলেন ; তিনি স্পিক। মহমেডান দলের সফি তাঁকে অন্যায়ভাবে আঘাত না করলে এতবড় দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই হত না। রেফারি লো সফির নাম টুকে

চৈনিক এবং ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণ

নেন কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আই, এফ, এ, এর কোন বিচার করেছে বলে শোনা যায়নি।

প্রথম হাফে কালিঘাটের অবস্থা ছিল শোচনীয়। একমাত্র পাগস্লে টীমটীকে বাঁচান। প্রতিদিন সুন্দর খেলে এবং উত্তম টীমের বিরুদ্ধে স্কোর করে পাগস্লেই কালিঘাটকে লীগের উচ্চস্থানে এনে দেন। তাঁর ন্যায় "ষ্টার" খেলোয়াড় ক্যালকাটার মাঠে অনেকদিন দেখা যায়নি। যেমন সুন্দর পাশ এবং বল কাটান তেমনি দারুণ শটে পাগস্লে বার্ম্মায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে সম্মানিত হন। ব্যাকে আরেকটী রেঙ্গুন খেলোয়াড় জোহানিস বেশ সুন্দর খেলেছিল। গোলকিপার এস, বানার্জ্জি মহমেডান দলের বিরুদ্ধে খেলায় তিনটী পেনালটী ও অব্যর্থ গোলগুলি বাঁচিয়ে বিশেষ কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন। সেদিন এস, বানার্জ্জির ন্যায় এত সুন্দর খেলা মাঠে খুব অল্পই দেখা গেছে।

একমাত্র ছোনে মজুমদারের ওপর নির্ভর করে দুখীবাবুর এরিয়ান্স টীম বেঁচে থাকতে চায়। তবে তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে এবার এরিয়ান্স মাঠে নেবেছিল এবং উত্তম টীমদের হারিয়ে এরিয়ান্স লীগে ফল মন্দ করেনি। শুধু গোলকিপারের দোষে এরিয়ান্স অনেকগুলি গেম হেরেছে। এস, রায়, এন, ঘোষ ও সার্পের খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাছাবাছা খেলোয়াড় নিয়েও সকলের নিম্নস্থানে এসে পৌঁছেছে ইষ্ট বেঙ্গল। এবার লীগের ফলাফল ইষ্ট বেঙ্গলকে খুব দমিয়ে দিয়েছে। জেতা গেমগুলি শুধু খেলার দোষে কেমন করে হারতে হয় ইষ্ট বেঙ্গল তার প্রমাণ দিয়েছে। ব্যাকে পি, দাসের

নিখুঁত খেলা প্রশংসার যোগ্য। পি, দাস, পি, মজুমদার, পি, বানার্জ্জি, দুলাল প্রভৃতি খেলায় এখনও প্রমাণ করে যে বাইরের খেলোয়াড় ছাড়া শুধু স্থানীয় তরুণ উন্নত খেলোয়াড়-দের নিয়ে ইষ্ট বেঙ্গল এখনও লীগে বেঁচে থাকতে পারে। যেবার ইষ্ট বেঙ্গল বি, ডিভিসনে নেবে যায় সেবার কম করে টীমে আটজন ইণ্টার-ন্যাশনাল খেলোয়াড় ছিল। বাইরের

আন্তর্জ্জাতিক লীগ ম্যাচে ইউরোপিয়ান দল

খেলোয়াড় মুরগেস, করিম, হোসেন, কাইজার, মজিদ, রমনা, মহিউদ্দিন, খুব অল্পদিনই উচ্চ ষ্টাণ্ডার্ডের খেলা খেলেছে। মজিদের ত এখন টীম হতে বিদায় নেওয়াই উচিত। সারা বাংলায় ইষ্ট বেঙ্গল ৭।৮ জন উৎকৃষ্ট খেলোয়াড় খুঁজে তাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কিছু শিক্ষা দিয়ে ক্রীড়ামাঠে নাবাবার ক্ষমতা নেই—এ কেউ বিশ্বাস যাবে না। মোহনবাগান বনাম ইষ্ট বেঙ্গলের শেষ খেলায় একটি অপ্রিয় ঘটনা ঘটে। খেলার শেষে ইষ্ট বেঙ্গলের কয়েকজন অতি উৎসাহী সভ্য প্রেমলাল রেফারী এস, ঘোষ, এস, দত্ত প্রভৃতিকে গালাগালি দেয়। তবে দুই দলের কর্ত্তৃপক্ষরা ও পুলিসের উপস্থিতে ব্যাপারটী আর বেশীদূর গড়াতে পারেনি।

কাষ্টমসের স্থান এবার লীগে তত সুবিধা নয়। একমাত্র করুণা ভট্টাচার্য্যের মুগ্ধকর খেলা ছাড়া কাষ্টমস টীম হিসেবে অতি দুর্ব্বল বলে মনে হল। পুরোন সিম্যান, নেইল প্রভৃতির এখন বিদায় নেওয়াই উচিত। ডালহৌসির ন্যায় মাত্র ২ পয়েণ্টে পুলিসের ওপরে থাকাতে কাষ্টমস বি ডিভিসনে নাববার হাত থেকে বেঁচে গেল। তাই এবারের মত ডালহৌসী কোন মতে টিঁকে রইল। কিন্তু একদিন লীগ প্রতিযোগিতার

গোড়াপত্তন করে এই ডালহৌসী। আজকালকার ভীষণ প্রতিযোগিতার মাঝে এই দুর্ব্বল টীম নিয়ে ডালহৌসি এ ডিভিসনে কতদিন বেঁচে থাকবে? ক্যালকাটা ও ডালহৌসি দুই পুরোন শ্রেষ্ঠ ইউরোপিয়ান সিভিলিয়ান টীমের শোচনীয় অবস্থা দেখা দিতে ক্যালকাটার খেলার ষ্টাণ্ডার্ডও সেই অনুসারে ক্রমেই নিম্নস্থানে এসে পৌছচ্ছে।

বৃহৎ অংশীদার উক্ত দলের সুযোগ্য সেক্রেটারী এন, মিটার। লীগে সকলের শেষস্থান অধিকার করেছে মিলিটারী টীম এটাচড্ সেক্সন। কিন্তু উক্ত দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ক্যাস ১৩টী গোল করে লীগের "বেষ্ট" স্কোরার হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন।

আন্তর্জ্জাতিক লীগম্যাচে ভারতীয় দল

এই দুই টীম পূর্ব্বেকার গৌরবময় স্থানে পৌছতে না পারলে বর্ত্তমান খেলার গতি অতি উচ্চ স্থানে পৌছবে কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় ডিভিসনে এবার নাবল পুলিস। শেষের কয়েকটী ম্যাচ পুলিস মন্দ খেলেনি। বরাবর পুলিস 'বি' ডিভিসন হতে এ ডিভিসনে ওঠে এবং আবার বি ডিভিসনে নেবে যায়। সুতরাং খেলার ইতিহাসে পুলিসের এ কৃতিত্বে কিছু নতুনত্ব নেই। এবার এ ডিভিসনে উঠল বিজয়ী ভবানীপুর দল। বহুদিন প্রাণপণ চেষ্টার পর আজ ভবানীপুরের সাফল্যলাভে আমরা সুখী। এই কৃতকার্য্যের

	গেম	জয়	ড্র	পরা	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
মহমেডান স্পোর্টিং	২২	১৫	৬	১	৩১	৮	৩৬
ব্ল্যাকওয়াচ	২২	১৫	৪	৩	৪৫	২৪	৩৪
মোহনবাগান	২২	৯	৮	৫	১৭	১৪	২৬
ক্যালকাটা	২২	৮	৮	৬	২৭	১৬	২৪
ই, বি, আর	২২	১০	৪	৮	২৮	২২	২৪
কালিঘাট	২২	৮	৭	৭	২৭	৩২	২৩
এরিয়ান্স	২২	৯	৫	৮	২৩	২৯	২৩
ইষ্ট বেঙ্গল	২২	৭	৬	৯	২৬	২০	২০

	গেম	জয়	ড্র	পরা	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
কাষ্টমস	২২	৩	১১	৮	২০	২৮	১৭
ডালহৌসি	২২	৭	৩	১২	১২	২৯	১৭
পুলিস	২২	৫	৫	১২	১৭	৩০	১৫
এট্যাচড্‌ সেক্সন	২২	২	১	১৯	১৭	৫৫	৫

এ ডিভিসন খেলার শেষে প্রতি বছরের মত এবারও ভারতীয় দল বনাম ইউরোপিয়ান দলের চ্যারিটী ম্যাচ হয়।

ইণ্টার-ন্যাসনাল ম্যাচ

ফুটবল ইতিহাসে ভারতের মাটীতে এই প্রথম সত্যিকার আন্তর্জাতিক খেলা হয়।

বার্লিনের পথে চৈনিক দল ভারতে ও বার্ম্মায় কয়েকটী এক্‌জিবিসন ম্যাচ খেলে। বার্ম্মায় নামজাদা টীমদের হারিয়ে এসে চৈনিক দল অজস্র নাম কিনে কলকাতায় দুটী এক্‌জিবিসন ম্যাচ খেলতে রাজী হয়। চৈনিক দল দুই দিনের

এরিয়ান্স দল

এবার দুই দলে টীম নির্ব্বাচন নিয়ে একটু বাদ প্রতিবাদ কাগজে হয়েছিল। দুই দলেই ভাল খেলোয়াড়দের নির্ব্বাচিত না হওয়ার কারণ বোধহয় চৈনিক বনাম ভারতীয় ইণ্টার ন্যাসনাল ম্যাচে সুদক্ষ খেলোয়াড়দের নেওয়া হয়েছিল বলে। এবার খেলার ফলাফল ৩-৩—ড্র হয়। ভারতীয় দলে লক্ষ্মীনারায়ণ, দুলাল ও নুরমহম্মদ এবং বিপক্ষ দলে ক্যাস, কার্ভে উত্তম খেলেছিলেন।

খেলার বাবদ সর্ব্বশুদ্ধ চেয়েছিলেন ১০,০০০৲ টাকা। কিন্তু আই, এফ,এ এবং প্রেসিডেণ্ট রফা করলেন টিকিট বিক্রয়লব্ধ টাকার ৬০ পার্সেণ্ট অর্থাৎ যা কখন আশা করেনি তাই তাদের দেওয়া হল। অথচ আই, এফ, এর জানা উচিত ছিল যে এই খেলায় দর্শকের অভাব হবে না। এবং কার্য্যক্ষেত্রেও তাই দেখা গেল। মাত্র এক ঘণ্টায় ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের 'লোনের' ন্যায় আই, এফ, এর রিসার্ভ আসন দু টাকা চার আনার সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেল।

প্রথম দিন চৈনিক দল বনাম ভারতীয় দল খেলা দেখতে ভোর ৭টা হতে লোক যেতে আরম্ভ করে। একটার সময় মাঠে কম করে ২০০০০ হাজার লোক। বিপুল দর্শকের সামনে খেলা আরম্ভ হল। খেলার মাঠে একতিল স্থান ছিল না। টিকিট বিক্রী হয়েছিল প্রথম দিন প্রায় বাইশ হাজার এবং দ্বিতীয় দিন উনিশ হাজার টাকা। চৈনিক দলের খেলা অনেকটা 'বেষ্ট ইংলিশ দলের' খেলার ন্যায়। এত সুন্দর করে খেলেছিল কিন্তু সুযোগ্য সেন্টার-ফরওয়ার্ডের অভাবে ভারতীয় দল সেদিন জয়লাভ হতে বঞ্চিত হয়। এস্ বানার্জ্জি দুটী অব্যর্থ গোল বাঁচান। আর, কার, রহিম, মাসুমের খেলা তেমন উল্লেখযোগ্য হয়নি। দ্বিতীয় দিনে সিভিল মিলিটারী দল তত পুষ্ট ছিল না তবে খেলা অনুসারে ড্র হওয়া উচিত ছিল। গোলকিপার আর্ম্মষ্ট্রং অতি সুন্দর খেলেন। চৈনিক দল মাত্র ২-১ গোলে জয়লাভ করেন। লি-ওয়াই-টংএর খেলা

'বি' ডিভিসন চ্যাম্পিয়ান ভবানীপুর দল

নিখুঁত খেলা খুব অল্পই চোখে পড়েছে। সেণ্টার ফরওয়ার্ড লী-ওয়াই-টং একজন "ষ্টার" খেলোয়াড়। গোল কিপার পয়-কা-পিং এবং ব্যাক লি-টিং-সাংএর খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় দলের মধ্যে অতি সুন্দর খেলে সকলকে মুগ্ধ করে-ছিল করুণা ভট্টাচার্য্য ও ছোনে মজুমদার। করুণার সুন্দর সর্ট পাশগুলি অনেকটা আর্ব্বাস খেলার দোষে নষ্ট করে। টীমের ক্যাপ্টেন সন্মথ দত্ত ও নূরমহম্মদ চৈনিক দলের আক্রমণকে বার বার প্রতিরোধ করেন। খেলায় দুই দলেই সমান আক্রমণ সেদিন দেখবার মত হয়েছিল।

ভারতীয় দল : এস, বানার্জ্জি ; এস, দত্ত ও এস মজুমদার ; বি, মুখার্জ্জি, নূরমহম্মদ, মাসুম ; সেলিম, রহিম, কার, করুণা ভট্টাচার্য্য ও আর্ব্বাস।

চৈনিক দল : পয়-কা-পিং ; মাক-সু-হান্, লি টিন্-সাং ; লিউং-উইং-চিউ, সু-আ-হুই, চ্যান-চেন-ও ; ইয়াং-সু-ইক, সুয়েন-কাম-সুন, লি-ওয়াই-টং, টম-কং-পাক ও টে-উই-লিয়াং।

রেফারী : সি, এস, এম, লো।

ক্রীকেট

ইংলণ্ডের মাটীতে ভারতীয় ক্রীকেট দলের খেলার ফলাফল সন্তোষজনক নয়। নামজাদা দলকে আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় দল হারাতে সক্ষম হয়নি। এমন কি অতি কষ্টে দুএকটী দলের সঙ্গে ড্র ছাড়া বেশীভাগের খেলায় তাদের অতি শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। অথচ ভারতীয় দলে দেশের সব বাছা বাছা খেলোয়াড় আছেন। ক্যাপ্টেন কুমার ভিজিয়ানাগ্রামের পরিচালনা নিয়ে ক্রীকেটমহলে বেশ বাদ-প্রতিবাদ চলেছে। ক্যাপ্টেনের দোষ ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয় কিন্তু ভারতীয় দল সজ্য-বদ্ধভাবে খেলতে না পারায়ই খেলার ফলাফল অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে। তারপর অমরনাথের ব্যাপার নিয়ে ক্রিকেট-মহলে এক ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। সেখানে অমরনাথের অন্যায় আচরণের ফলে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়েছে। এ কম লজ্জার বিষয় নয়। অমরনাথ নির্দ্দোষী নয় কিন্তু—এতবড় শাস্তি দেওয়ার পূর্ব্বে টীমের ক্ষতির দিক দিয়ে ক্যাপ্টেন ও ম্যানেজারের একটু বিবেচনা করা উচিত ছিল। ইংলণ্ড বনাম ইণ্ডিয়া প্রথম টেষ্ট ম্যাচ লর্ড গ্রাউণ্ডে হয়। খেলার আগের দিন হতে মাঠের অবস্থা খারাপ। বৃষ্টি ও অপরিষ্কার আকাশ। ইংলণ্ডে ক্যাপ্টেন এ্যালেন টস জিতে ইণ্ডিয়াকে প্রথম ব্যাট করতে নাবান। মার্চ্চেন্ট ৩৫, ও হিণ্ডেলকার ২৬ রান করে টীমের গোড়া পত্তন করেন। কিন্তু মুস্তাক ০, নাইডু ১, ওয়াজির এর ১১ রানে টীমের অবস্থা খারাপ হয়ে আসে। ক্যাপ্টেন ভিজিয়ানা-গ্রাম ১৯ রান করে কিছুক্ষণ টীমটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। প্রথম ইনিংসে ইণ্ডিয়ার রাণ হল ১৪৭। এ্যালেন ৫ উইকেট ৩৫ ও রবিন ৩ উইকেট ৫০ রাণ নেন। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলার ফলাফল আরো চমৎকার। দুর্দ্দান্ত অমর সিংহের বোলিং খুলে যেতে ইংলণ্ডের নামজাদা সব টেষ্ট ব্যাটম্যানরা আউট হয়ে যান। একমাত্র লিলেণ্ড অতি সুন্দর খেলে ৬০ রান করে ইণ্ডিয়ার

লণ্ডনে প্রথম টেষ্টম্যাচে মিচেল অত্যাশ্চর্য্যভাবে একটি বল ধরছেন

লণ্ডনে প্রথম টেষ্টম্যাচে ভারতীয়দলের ক্যাপ্টেন কুমার ভিজিয়ানাগ্রাম (বাম দিকে) ব্যাট করছেন।

আক্রমণকে ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অমরসিংহ ২৫ ওভারে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫ রানে ৬ উইকেট নেন। নিসার ৩ উইকেট ৩৬। প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের রান হল ১৩৪। এই সর্ব্বপ্রথম টেষ্ট ম্যাচে ইণ্ডিয়া প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডকে পেছনে রেখে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নাবল। সারারাত বৃষ্টি হওয়াতে মাঠের অবস্থা খুব সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ইংলণ্ডের যাদুকর বোলার এ্যালেন, রবিন, ভেরেটীর বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ল। মার্চ্চেণ্ট নাইডু, ওয়াজির আলি, মুস্তাফআলি, অমরসিংহ প্রভৃতি সকলেই ভগ্নমনে পর পর তাঁবুতে ফিরে এলেন। একমাত্র হিণ্ডেলকার কিছুক্ষণ ঐ বোলিংএর বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ইণ্ডিয়ার রান হল মাত্র ৯৩। সুতরাং পরাজয় যে অনিবার্য্য তা অনেকেই বুঝেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে একা গিবলেট ৬৭ ও টার্ণবুল ৩৭ নট-আউট হয়ে এক উইকেটে ১০৩ রানে খেলা সমাপ্তি করেন। ইংলণ্ড সর্ব্বশুদ্ধ ৯ উইকেটে জয়লাভ করলেন। এই প্রসঙ্গে ভূতপূর্ব্ব ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন জার্ডিন বলেছেন "England won but a draw would have been the fairest result."

অমরনাথ, যাঁকে অশিষ্টাচারের অপরাধে ভারতবর্ষে ফেরৎ পাঠানো হয়, সাউথহাম্পটনে বিদায় অভিবাদন জানাচ্ছেন।

মিস্ জ্যাকবস

টেনিস

পৃথিবীর নামজাদা টেনিস খেলোয়াড়রা এবারও ওয়েম্বেলডনের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন। একমাত্র বিখ্যাত লেডিস্ চ্যাম্পিয়ান মিসেস মোডী বার বার চ্যাম্পিয়ান হয়ে এবার আর লেডিস্ সিঙ্গলস্ প্রতিযোগিতায় দেখা দেননি। পুরুষ সিঙ্গলস্ ফাইনালে গতবছরের ন্যায় এবারও সাক্ষাৎ করেছিলেন জগতের দুই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় পেরী ও ভন ক্রাম। ভন ক্রাম গত বছরে পরাজিত হন কিন্তু এবার তার শোধ নেন ফ্রেন্স-চ্যাম্পিয়ানসিপ খেলায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ফাইনাল খেলার প্রথম মুখে ভন ক্রামের পায়ে আঘাত লাগে। তার ফলে ভন ক্রাম আর খেলতে পারলেন না। দুবছর আগেও সেমি-ফাইনাল গেমে এমনই ভাবে ভন ক্রাম বিদায় নিয়েছিলেন। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীকে

অতি সহজেই হারিয়ে পেরী আবার চ্যাম্পিয়ান হলেন। মহিলা সিঙ্গল্‌স্ ফাইনালে মিসেস মোদীর পর আমেরিকার ২নং খেলোয়াড় মিস জেকব ৬-২, ৪-৬, ৭-৫ গেমে মিস স্পারলিংকে পরাজিত করেন। বহুবার মিস জেকব মিসেস ফ্যাবিয়ান ও মিস জেকবকে অতি সহজে পরাজিত করেন। পুরুষ ডাবলস ফাইনালে হিউজেস ও টাকে ৬-৪, ৩-৬, ৭-৯, ৬-১, ৬-৪ গেমে হেয়ার ও ওয়াইল্ডকে হারান। এই খেলাটী খুব প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। এবার ওয়েম্বল

মিস কে, ষ্ট্যামার্স টেনিস-কোর্টের একটি 'প্যাবলোভা'।

ফাইনালে উঠেছেন কিন্তু কোনবার চ্যাম্পিয়ান হতে সক্ষম হননি। মিস জেকবের এতদিনের আশা পূর্ণ হল। মহিলা ডাবলস্ ফাইনালে মিস জেমস ও মিস ষ্ট্যামার ৬-২, ৬-১ গেমে

ডন খেলার একটী বিশেষত্ব যে পাঁচটী প্রতিযোগিতার চারটি-তেই ইংলণ্ড জয়ী হন। এ তাদের কম গৌরবের কথা নয়

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী

দীন শরতের বাউল গান—শ্রীশরৎচন্দ্র নাথ প্রণীত। মূল্য বার আনা।

প্রকাশক শ্রীপবিত্ররঞ্জন সরকার। ৪০ হিন্দুস্থানপার্ক, বালিগঞ্জ কলিকাতা।

লোকসাহিত্য এবং লোকনৃত্য সম্বন্ধে আমাদের দেশে ইদানীং বেশ আলোচনা হইতেছে। লোকসাহিত্য সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের ও সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার অনেক কাল পরে দক্ষিণারঞ্জন পূর্ব্ব বাঙলা থেকে লোককথাগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। বাউল গান সম্পর্কে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহনের নাম উল্লেখযোগ্য। বটতলা থেকে কিছু কিছু বাউলের গান সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। প্রবাসীতে অনেক বাউল গান প্রকাশিত হয়। 'হারামণি' নামে একখানি গ্রন্থে অনেকগুলি বাউল গান প্রকাশিত হয়। বাঙলাদেশের বাউল গানগুলি সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। বাউলদের জীবনের সত্য ও দর্শন সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা হইয়াছে। বিশ্বকোষে 'বাউল' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী কোয়ারটারলীতে প্রকাশিত ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গবীণা' পরিশিষ্টের প্রবন্ধ এবং ডক্টর ইনামূলহকের বাউল প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাউলদের সম্পর্কে এখনও কোন গভীর গবেষণা হয় নাই, হইলে ভাল হয়।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীশরৎচন্দ্র নাথ মহাশয়ের রচিত অনেকগুলি বাউল গান প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকা শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর রায় মহাশয় বিশেষ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার সঙ্গে লিখিয়াছেন। ভূমিকাটী বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবার যোগ্য, অবশ্য ভূমিকা লেখকের শেষ মন্তব্য বাদ দিয়ে। এই বাউল গানগুলি অতিশয় আধুনিক, ইহাতে কিছু পণ্ডিতপনা আছে; বাউলেরা সংস্কৃত আলোচনা করেন এবং তাঁহাদের গানের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করেন এই প্রথম দেখিলাম। এই বাউল জীবিত এবং আধুনিক। তবে তাঁহার রচনার মধ্যে প্রাচীন ভাবধারা প্রবর্ত্তিত—যে ভাবধারা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে, ময়নামতীর গানে এবং অন্যান্য লোকসাহিত্যে পাওয়া যায়। এই গানগুলি পড়িলে বাউলের অনেকগুলি দুর্ব্বোধ্য রহস্য বুঝা সহজ হইবে। এই বাউল ময়মনসিং জেলার লোক এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জনের আশ্রিত, এবং তাঁহার দৌলতে সম্ভবতঃ এই গানগুলি প্রকাশিত। যাঁহারা বাউল গান বা লোকসাহিত্য ভালবাসেন এবং যাঁহারা ময়মনসিংহবাসী তাঁহারা এই স্বল্পমূল্যের সুন্দর কাগজে ও পরিষ্কার অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সুখী হইবেন। আমরা ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইয়াছি। প্রত্যেক জেলার এই ধরণের বহি মুদ্রিত হইলে বড়ই ভাল হয়।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

আজব বই—শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী সম্পাদিত। দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। মূল্য—১।০। প্রকাশক দেব-সাহিত্য কুটীর। ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

বাঙ্গালাভাষায় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শিশুসাহিত্যের গৌরব আশাতীত ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বেও মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকখানি ভাল বই ছিল, কিন্তু আজকাল এই শ্রেণীর পুস্তক অনেক বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালাভাষায় শিশুসাহিত্য যে ছবি ও গল্পে এতদূর সমৃদ্ধশালী হইতে পারে তাহা "আজব বই" দেখিবার পূর্ব্বে আমাদের ধারণার অতীত ছিল। ছেলেভুলানো ছড়া, পল্লীগাথা, নানান দেশের খবরাখবর, নানান বিষয়ের মনোমুগ্ধকর অবতারণা চিত্তাকর্ষক

ভাবে লিখিত হইলে তাহা সত্যসত্যই শিশুদের মনকে অতি সহজেই ঘিরিয়া ফেলে এবং এই ভাবে শিক্ষা যত সহজে প্রসার লাভ করে পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া তাহা কখনই সম্ভবপর নয়। "আজব বই" এই প্রকার পুস্তকের প্রথম স্থান নিঃসন্দেহেই অধিকার করিতে পারে। আমাদের ধারণাই হয় না যে কি প্রকারে এত সুন্দর পাতায় পাতায় একবর্ণ ও বহু-বর্ণ চিত্রশোভিত, ভাল কাগজে সুন্দরভাবে ছাপা নানান বিষয়ের বহুবিধ গল্পে, কবিতায়, গানে ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে পরিপূর্ণ ৩১২ পৃষ্ঠাব্যাপী এমন সুদৃশ্য বাঁধান পুস্তক মাত্র ১৷৷০ মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব। শিশুসাহিত্যের নামজাদা লেখক-গণের লেখা কবিতা, গল্প, গান, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, হাস্য-রসাত্মক গল্প ও কবিতার প্রাচুর্য্যে শিশুদের মন স্বতঃই প্রফুল্ল হইবে। সুবিনয় বাবু যে এতগুলি খ্যাতনামা লেখকদের লেখা সংগ্রহ করিয়া একত্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করি-বার ব্যাকুলতা ও আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। আমরা তাঁহাকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। প্রকাশক দেব সাহিত্য-মন্দিরও গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শিশুসাহিত্যের জন্য কয়েকখানি প্রথম শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশক করিয়া সুধী সমাজের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন এবং বিশেষতঃ এই পুস্তকটী প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহারা যে পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাঁহাদের শিশুসাহিত্যের জন্য কিছু দান করিবার আকাঙ্ক্ষাই বিশেষ প্রবল, ইহাঁদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি। পুস্তকটীর দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ছয় মাসের মধ্যেই বাহির হইয়াছে। ইহাতে প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা ৪০ পৃষ্ঠা অধিক যোগ করা হইয়াছে এবং একখানি রঙীন ও ৭খানি এক রংয়ের ছবি অতিরিক্ত সংযুক্ত করিয়াও মূল্য পূর্ব্ববৎ ১৷৷০ টাকাই রাখা হইয়াছে। এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই পুস্তকটীর দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়ায় তাহাকে তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই প্রকার পুস্তকের প্রচার যাহাতে আরও অধিক হয় তজ্জন্য অন্যান্য প্রকাশকেরা অধিকতর যত্নবান হইলে সুখী হইব।

শ্রীহিমাংশুমোহন বসু

"খেয়াল"—ছেলেমেয়েদের গল্পের বই।০ শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য—৷৷০। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের জন্য ৯টী গল্পের সমষ্টি। ছবি ও গল্পে পুস্তকটী ছেলেমেয়েদের প্রথম শ্রেণীর গল্পের বইয়ের মধ্যে স্থান অধিকার করিবে সন্দেহ নাই। সুবিনয় বাবু তাঁহার লেখার ভঙ্গীও বৈশিষ্ট্য দ্বারা সহজেই ছেলেমেয়েদের মনোহরণ করিতে পারেন। শিশু-সাহিত্যে এই প্রকার পুস্তকের সংখ্যা অতিশয় অল্প। ছাপা, ছবি ও বাঁধাই খুব ভাল।

শ্রীহিমাংশুমোহন বসু

হস্তরেখা বিচার— শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য জ্যোতীরঞ্জন প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরামশরণ বেজ, ১০ এ কালী ব্যানার্জ্জি লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

যে ভাগ্যকে দর্শন করা মানুষের হাতের বাইরে ব'লে তার নাম হয়েছে অদৃষ্ট, সামুদ্রিক বিদ্যার মতে মানুষের হাতের মধ্যেই রেখার আকারে তার লিপি আছে। সামুদ্রিক বিদ্যা অবশ্য কেবল হস্তরেখা বিচারেই নিবদ্ধ নয়, পদরেখা এবং দেহ-চিহ্নাদিও তার অন্তর্গত; আলোচ্য পুস্তকটি যদিও শুধু হস্ত-রেখা বিষয়েই নিবদ্ধ।

এই সামুদ্রিক বিদ্যা বহু প্রাচীন কাল হ'তে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। আলোচ্য পুস্তকের ভূমিকালেখক ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্-এ, পি-এচ্-ডি মহাশয়ের মতে 'এই শাস্ত্র যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব অন্ততঃ পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই', কারণ 'মহাভারতেও সামুদ্রিক শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। তথায় সামুদ্রিক শব্দেরই প্রয়োগ আছে।' কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে তিন সহস্র বৎসর খ্রীষ্টপূর্ব্বে চীন দেশে সামুদ্রিক বিদ্যা প্রচলিত ছিল, এবং অতি পুরাতন গ্রীক্ সাহিত্যে এই বিদ্যার উল্লেখ দেখা যায়। সে যাই হ'ক, কাল-ক্রমে গ্রীস্, জার্ম্মানি প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে এই বিদ্যার প্রচুর চর্চ্চা হয় এবং তার ফলে বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি রচিত হয়। জ্যোতীরঞ্জন মহাশয়ের এই পুস্তকটীর বিশেষত্ব এই যে তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় দেশের সামুদ্রিক বিদ্যার সমন্বয় পূর্ব্বক পুস্তকটি রচিত করেছেন, সুতরাং এর সিদ্ধান্তগুলি নির্ভরযোগ্য ব'লে মনে হয়। পুস্তকটি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা, এবং সিদ্ধান্তগুলি বিশদ করবার জন্য

৭২টি বিভিন্ন চিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এই পুস্তকের সাহায্যে হস্তরেখা বিচার কঠিন হবে না। সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বইখানি সুখপাঠ্য এবং কৌতূহলপ্রদ হয়েছে।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলার চাষী—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ প্রণীত। প্রকাশক বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি, ৩।১ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮৬ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

বাঙ্গালা দেশের কৃষি এবং চাষীর সম্বন্ধে এই বইখানি পাঠ ক'রে আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত এবং আশান্বিত হয়েছি। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পাইকপাড়া রাজবাটীর তরুণ ভূম্যধিকারী, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান ছাত্র। জমিদার হিসাবে প্রজাবর্গের শুভাশুভ বিষয়ে চিন্তা করবার এবং যত্নবান হবার তাঁর দাবী এবং দায়িত্ব উভয়ই আছে। এই বইখানি রচিত ক'রে তিনি তাঁর সেই দাবী এবং দায়িত্বের কর্ত্তব্য পালন করেছেন। বিমলচন্দ্রের সদৃষ্টান্ত বাঙলার জমিদার সম্প্রদায়ের সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়।

বাঙলা কৃষিপ্রধান দেশ। বাঙলার শতকরা ৬৬ জন লোকের জীবিকা কৃষির উপর নির্ভর করে। সুতরাং কৃষির উন্নতি অবনতির উপর বাঙলার আর্থিক উন্নতি অবনতি নির্ভর করছে। এ কথা শুধু বাংলার কৃষক সম্প্রদায়েরই বিষয়ে প্রযোজ্য নয়, জমিদার এবং মধ্যবিত্তসম্প্রদায়েরও প্রতি একই মাত্রায় প্রযোজ্য, কারণ প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ ভাবে এবং শেষোক্ত সম্প্রদায়ের পরোক্ষভাবে ধনাগম হয় প্রধানতঃ কৃষকেরই ভাণ্ডার হ'তে। কিন্তু এই কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা কি প্রকার? সরকারী মতে বাঙলার বর্ত্তমান কৃষি ঋণ ১৩০ কোটি টাকা, এবং কোনো-কোনো বেসরকারি মতে ৩০০ কোটি টাকা! এই বিষম ঋণভারের হ্রাস হবার কোনো লক্ষণই ত' নেই, যে পরিমাণে প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে মনে সন্ত্রাস উপস্থিত হয়! এই ভাবে চল্‌লে বাংলার আর্থিক দুর্দ্দশা ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়।

গভর্মেণ্ট অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত নেই। কিছুদিন পূর্ব্বে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো মহোদয়ের নেতৃত্বে ভারতীয় কৃষি কমিশন স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু যে পর্য্যন্ত গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক এ বিষয়ে বিশেষ কিছু প্রতিবিধান না হচ্ছে, কৃষক সম্প্রদায় নিজেদের ব্যক্তিগত এবং সমবেত প্রচেষ্টায় কি প্রকারে তাঁদের প্রধান কৃষি-সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারেন এবং কৃষি ব্যতীরেকে কুটির শিল্পাদি অন্যবিধ উপায়ে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করতে পারেন এ পুস্তকে তার বিস্তারিত আলোচনা আছে। পুস্তকখানি অতিশয় কালোপযোগী হয়েছে। এতদ্দ্বারা কৃষক-সম্প্রদায় প্রভূতভাবে উপকৃত হবেন ব'লে আমরা এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মজনু—শ্রীবাসবেন্দ্র ঠাকুর প্রণীত। "একুশ নম্বর কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের দি ফিউচারিষ্ট পাবলিশিং য়্যাণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ থেকে মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ছাপিয়ে বের করেছেন।" দাম একটাকা।

এটি কাব্যের বই। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখেছেন,—সুদূর আরবের মরুভূমিতে কবিতার লাইন বেয়ে, বেদুইন মন আমার মজনুর মতন ঘুরে মরেছে; তাই ভাবের ঘোরে মাতাল হয়ে যদি কোথাও নীতির বাঁধন শিথিল হ'য়ে গিয়ে থাকে, নৈতিক—সে জন্য আজ কৈফিয়ত দিতে প্রস্তুত নই।"

সুতরাং, নৈতিক হই আর না হই, আমরাও কৈফিয়ত চাইতে প্রস্তুত নই, কারণ যে জিনিষ চেয়ে পাওয়া যাবে না স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সে জিনিষ না চাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সে যা হোক, বইখানি আদ্যন্ত পাঠ ক'রে দেখলাম লেখকের আশঙ্কা একেবারে অকারণ নয়, নৈতিকের মতে দু-চার স্থানে নীতির বাঁধন শিথিল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু রচনার উৎকর্ষের জন্য রসিক পাঠক হয়ত তা ক্ষমা ক'রে নেবেন। ভাষা মাধুর্য্যময়ী; গতি স্বচ্ছন্দ, সাবলীল; ছন্দ এবং মিল অনবদ্য। কাব্যের সুরে কিন্তু তেমন কিছু নূতনত্ব নেই, সেই ওমর খৈয়ামের সুর—মদ এবং নারীর প্রতি মোহ, কিন্তু সে মোহ পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দুর মত ক্ষণস্থায়ী,—যতক্ষণ আছে ততক্ষণই আছে, গেল যখন তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

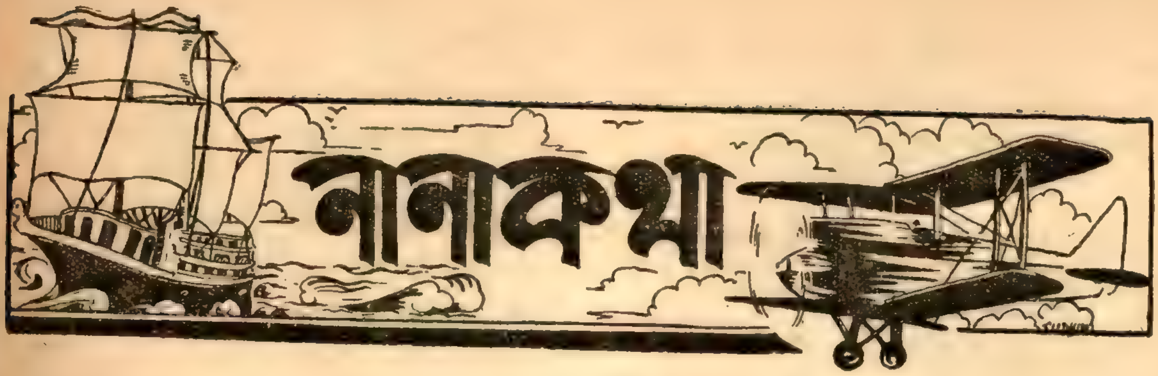

খুলনা দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতি

খুলনা জেলার স্থানে স্থানে প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে তা সকলেই অবগত আছেন। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী-দের মর্ম্মন্তুদ অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন ক'রে 'খুলনা দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতি'র সহকারী সম্পাদক উকিল শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় যে হৃদয়বিদারক পত্র আমাদের লিখেছেন তা আমরা নিম্নে মুদ্রিত করলাম। কি নিদারুণ অবস্থায় দুর্ভিক্ষ উপনীত হয়েছে এই পত্র থেকে তা বোঝা যাবে। খুলনা জনসাধা-রণের পক্ষ থেকে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে 'খুলনা দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতি' স্থাপিত হয়েছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ সমিতির সম্পাদক অথবা কোষাধ্যক্ষের নামে যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণ করলে এই অনাহারক্লিষ্ট আর্ত্ত নরনারীর ধন্যবাদভাজন হবেন। সমগ্র দান সংবাদপত্রে স্বীকৃত হবে।

বিচিত্রা-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু
সবিনয় নিবেদন,

সাহিত্যের রসের আসরে খুলনা জেলার দক্ষিণাংশের দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ নর-নারীর মিলিত আর্ত্তনাদের ব্যথা-বিষ পরিবেষণ করিতেছি, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। এক ফসলের দেশ, জল বায়ু মাটী অত্যন্ত লবণাক্ত। প্রকৃতির কৃপায় শুধু ধানই জন্মায়, এমনও স্থান আছে যেখানে ঘাসটুকু পর্য্যন্ত জন্মে না। স্থল জল একাকার, ভেড়ী বাঁধিয়া সেখানে নোনাজলের উচ্ছ্বাসকে ঠেকাইয়া রাখিতে হয়। পর্জ্জন্যের পর্য্যাপ্ত ধারার উপর কৃষকের জীবন মরণ নির্ভর; ক্ষেতের নোনা কাটিবে, ফসলের পুষ্টি বাড়াইবে শুধু এক বৃষ্টির জল। সেই জল যখন না নামে, ভাগ্য-দেবতার ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টির আগুনে শুকাইয়া উবিয়া যায়, তখন সহায়-সম্বল-হীন চির-দরিদ্র কৃষকের মাথার উপর বিনিময়ে নামিয়া আসে অকাল মড়ক···মহামারী।

এ বৎসর খুলনা জেলায় তাহাই হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার অপেক্ষা ভীষণ এবং ব্যাপক। গভর্ণমেণ্ট-স্বীকৃত মতে ৯০০ শত বর্গ মাইল স্থানে ছয় লক্ষ লোক ভীষণ অভাবগ্রস্ত হইয়াছে। কালীগঞ্জ, শ্যামনগর, আশাশুনি, রামপাল, পাইকগাছা প্রভৃতি থানার স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষরূপী বক-রাক্ষসের রাজ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পালা করিয়া প্রতি গৃহস্থকে রাজাধিরাজের আহার্য্য যোগাইতে হইতেছে। দায়গ্রস্ত কৃষক, ক্ষেতের ধান ঘরে তুলিবার ভাগ্য এমনিই অনেকের ঘটে না, মহাজনরূপ উপ-রাক্ষসেরা তাহা চাটিয়া খাইয়া ফেলে; অনা-হার ও অর্দ্ধাহারে চির-অভ্যস্ত বলিয়া এখনও তাহারা টিঁকিয়া আছে; কিন্তু আর কতদিন টিঁকিবে? গাছের পাতা, কাঁচা খেজুর, তেঁতুল-বীচি, বন-কচু, ঘাস, কলার এঁঠে, তুষসিদ্ধ খাইয়া তাহাদের দিন চলিতেছে। যে সব স্থানে ঘাস নাই··· গাছপালা নাই...চারিদিকে অ-থই জল, সেখানকার লোক কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছে...কি খাইয়া...কোন্ মন্ত্রবলে ভাবিতেও মাথা ঘুরিয়া আসে। গত বৎসর ফসল হয় নাই, কোথাও কোথাও আংশিক পরিমাণে হইয়াছিল। দিগন্ত-বিস্তৃত শস্য-ক্ষেত্র ভাদ্রের খর রৌদ্রে পুড়িয়া ছাই হইল। পরেও বৃষ্টি হইল না, গোছা গোছা কচি ধান ও ধানের শীষ মরুভূমির মরীচিকার মত কোথায় মিলাইয়া গেল! তাহার অনিবার্য্য পরিণাম বিপর্য্যয়ের বেশে কৃষকের দুয়ারে আসিয়া দেখা দিল।

ফলে গত ১লা জানুয়ারী হইতে ১৫ই মে পর্য্যন্ত এক ধুম-

ঘাট গ্রামে ৪২৭টি, মুন্সীগঞ্জে ৭৫৫টি এবং ভৈরবনগরে ২৯৩টি গরু মরিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। একমাত্র কলেরা রোগে গত কয় মাসের মধ্যে শ্যামনগর থানার মুন্সীগঞ্জ, ভৈরবনগর, বংশীপুর, ঈশ্বরীপুর, খাগড়াঘাট, ধূমঘাট, শ্রীফলকাঠি, এই ৭ খানি গ্রামে মোট ১৪২ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া শুনিতে পাইয়াছি। এই কলেরা রোগ অনাহার ও কদাহার-জনিত নয়কি? শ্যামনগর থানায় মোট ১২৯ খানি গ্রাম। বাকী ১২২ খানি গ্রামে কত লোক মরিয়াছে কে বলিবে? স্বামী-পরিত্যক্তা নারী পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিতেছে, শিশু-সন্তান পথের ধূলায় কাঁদিয়া গড়াইতেছে, এ দৃশ্য এ পোড়া চোখে দেখিয়া আসিয়াছি, প্রতিকার করিবার সাধ্য ছিল না। নিজের পরণের দুইখানি কাপড় চিরিয়া চারিভাগ করিয়া চারিটি উলঙ্গিনী নারীর লজ্জা-নিবারণে ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম। চারিদিকে হা অন্ন হা অন্ন ছাড়া কথা নাই, কঙ্কাল-সার দেহে ক্ষুধিত নর-নারীর ক্ষীণ চীৎকার। সর্ব্বত্র যেন আকাশ-জোড়া আতঙ্কের পাংশুল ছায়া পড়িয়াছে। ভয়ে কণ্ঠ শুকাইয়া যায়, মাথা ঘুরিতে থাকে, পায়ের তলার-মাটি কাঁপিয়া ওঠে। আজ বাংলাদেশের ৫।৭টি জেলায় এক সাথে দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। এই প্রবর্দ্ধমান ব্যাপকতা রোধ করিবে কে? পুরাণবর্ণিত মহা-প্রলয়ের আর দেরী কত? কবে এই অভিশপ্ত পৃথিবী ধ্বংস পাইবে? কবে মনু-পরাশর-অত্রি-হারীতের অযোগ্য বংশধরেরা ক্ষুধার তাড়নায় মরিয়া ধরা-পৃষ্ঠ হইতে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে? কি জানি ভয়ে আমার মন শুকাইয়া গিয়াছে, তাই একটু অবান্তর কথার অবতারণা করিলাম।

আপনার পত্রিকায় ছাপাইবেন কি? সাহিত্যের আনন্দের উৎসবে ইহার স্থান হইবে কি? তবু দেশের লোক জানুক, এই আমাদের কাতর প্রার্থনা। নিবেদন ইতি

বিনীত

শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উকিল, খুলনা

সহকারী-সম্পাদক,—'খুলনা দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতি'

ম্যাক্সিম্ গোর্কি

সুপ্রসিদ্ধ রুশ-লেখক ম্যাক্সিম্ গোর্কি গত ১৭ই জুন পরলোক গমন করেছেন। ১৮৬৮ সালে এক অতিশয় দরিদ্র পরিবারে গোর্কি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল 'আলেক্সে ম্যাক্সিমোভিচ্ পেস্কভ্'। রেলকারখানায় মিস্ত্রির কাজ করতে করতে তিনি সংবাদপত্রে ম্যাক্সিম্ গোর্কি নাম দিয়ে একটি গল্প প্রকাশিত করেন। ক্রমশঃ খ্যাতিবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ নামই তিনি পাকাভাবে গ্রহণ করেন।

দারিদ্র্যের জন্য গোর্কি স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করতে সমর্থ হন্‌নি, এবং জীবনের প্রথমাংশ জীবিকার্জ্জনের জন্য মুচী, পাচক প্রভৃতির হীন কার্য্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় নিজের উদ্যম এবং চেষ্টার বলে তিনি নিজেকে শিক্ষিত করে তোলেন, এবং অল্প বয়স থেকে লিখতে আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ জগতের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ব'লে সম্মানিত হন। নিজের জীবনের দ্বারা গোর্কি এই প্রতিপন্ন করেছেন যে মানুষ যদি তার নিযুপ্ত শক্তিসমূহকে পরিপূর্ণভাবে জাগিয়ে তোলে তা হ'লে জীবনের হীনতম অবস্থা থেকে উচ্চতম অবস্থায় আরোহণ করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—সরিষা

কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূরবর্ত্তী সরিষা নামক গণ্ডগ্রামে ডায়মণ্ডহারবার রোডের উপর এই আশ্রমটি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে ডিসেম্বর স্থাপিত হয়েছিল। তদবধি ক্রমোন্নতির নিরবচ্ছিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে বর্ত্তমানে এটি একটি বিশিষ্ট শিক্ষা ও কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক এই সরিষা আশ্রমের বিস্তারিত বিবরণীর জন্য আগ্রহশীল হ'লে ১৩৪২ সালের বৈশাখ মাসের বিচিত্রায় প্রকাশিত "শিক্ষা, সেবা ও শক্তিকেন্দ্র" শীর্ষক সচিত্র প্রবন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন।

কালক্রমে আশ্রম-বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এবং উচ্চতন ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ হয়, এবং তার ফলে ১৩৪১ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সরিষা শাখা-কেন্দ্র কর্ত্তৃক "বিবেক ভারতী সাহিত্য সংসদ" স্থাপিত হয়। গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ বিচিত্রা সম্পাদকের সভাপতিত্বে সমারোহের সহিত এই সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক

সম্মেলনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সংসদের উচ্চাদর্শে সাহিত্য সাধনার প্রচেষ্টা এবং তদ্বিষয়ে স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর বিশেষতঃ মহিলাবৃন্দের সহানুভূতি ও যোগদানের পরিমাণ দেখে আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করেছিলাম। সভায় পুরুষের তুলনায় মহিলারা যে অনুপাতে যোগদান করেছিলেন তা বোধকরি কলিকাতার সভা সমিতিতেও বিরল। উন্নত পদ্ধতিতে পরিচালিত আশ্রম-বালিকা-বিদ্যালয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম যে স্থানীয় মহিলা-সমাজের সহিত একটা সুনিবিড় যোগ স্থাপন করেছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সভায় পঠিত প্রবন্ধাদির মধ্যে কয়েকটির ঔৎকর্ষ্য আমাদিগকে বিস্মিত এবং পরিতৃপ্ত করেছিল। সাহিত্য সৃষ্টির যে স্তরে সংসদ উপনীত হয়েছে ব'লে মনে হ'ল তাতে অন্তত একটি ত্রৈমাসিক আশ্রম-পত্রিকা প্রকাশিত করা সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে হয়। পত্রিকা মুদ্রণের উপযোগী একটি ক্ষুদ্রায়তনের ছাপাখানা ক'রে ফেলতে পারলে স্থানীয় এবং ডায়মণ্ড হারবার প্রভৃতি অঞ্চলের মুদ্রণ-কার্য্য সংগ্রহের আয়ের দ্বারা ছাপাখানার ব্যয় নির্ব্বাহ হ'তে পারে, অধিকন্তু ছাপাখানার কার্য্য শিক্ষার জন্য আশ্রম একটি নূতন শিক্ষাবিভাগ প্রবর্ত্তিত করতে পারেন। জীবিকা অর্জ্জনের পক্ষে ছাপাখানার কার্য্যের উপযোগিতা যেরূপ দিন দিন বর্দ্ধিত হচ্ছে, তা'তে এই শিক্ষা বিভাগটি বিশেষ মূল্যবান হবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গণেশানন্দজী এবং তাঁর সহকর্ম্মিগণের নিরবসর সেবা এবং সৌজন্যে আমাদিগকে বিমুগ্ধ করেছিল। সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এবং অনুরূপ অপর পর শিক্ষা এবং কর্ম্মকেন্দ্রগুলিকে আমাদের বাঙলা দেশের সমুজ্জ্বল ভূখণ্ড ব'লে মনে করি।

বিবেক-ভারতী সাহিত্য সংসদ

দণ্ডায়মান—শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বসু এম এ, বি-টি ; শ্রীযোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-টি (যুগ্ম সংসদ সচিব) ; শ্রীখগেন্দ্রনাথ হালদার (সহকারী গ্রন্থাগারিক) ; ব্রহ্মচারী নিত্যচৈতন্য (কোষাধ্যক্ষ); শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু (সহকারী কোষাধ্যক্ষ); শ্রীবিভূপ্রসাদ বসু এম্ এ (গ্রন্থাগারিক)

উপবিষ্ট—স্বামী নির্ম্মোহানন্দ (আশ্রম প্রতিনিধি) ; শ্রীরমেন্দ্র লাল চৌধুরী এম-এ (সংসদ নায়ক) ; বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল্ (সভাপতি); সুকবি শ্রীগিরিজাকমার বসু ; শ্রীমণীন্দ্রনাথ সামন্ত এম্-এস-সি, বি-এ (সহকারী সংসদ নায়ক); স্বামী বেদান্তানন্দ (আশ্রম প্রতিনিধি)

আলোকচিত্র-গ্রহীতা—স্বামী গণেশানন্দজী

———

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Bishnupada Chakravarti at the Sahitya-Bhaban Press, 21, Holwel Lane, Calcutta and Published by Saratchandra Mukherjee from 27-1, Fariapooker St. Calcutta

বিচিত্রা

ভাদ্র, ১৩৪৩

প্রতীক্ষায়

শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

বিচিত্রা

দশম বর্ষ, ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৪৩ | ২য় সংখ্যা

বিদায়-বরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চার প্রহর রাতের বৃষ্টিভেজা ভারী হাওয়ায়
থম্‌কে আছে সকালবেলাটা।
জাগরণের ভারে যেন মুদে এসেছে
মলিন আকাশের চোখের পাতা।
বাদলার পিছল পথে
পা টিপে চলছে প্রহরগুলো।
যত সব ভাবনার আবছায়া
উড়ছে ঝাঁক বেঁধে মনের চারদিকে
হাল্‌কা বেদনার রং মেলে দিয়ে।
তাদের ধরি ধরি করে মনটা
ভাবি, বেঁধে রাখি লেখায় ;
পাশ কাটিয়ে চলে যায় কথাগুলো।

এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া,
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটাপরা অভিমানিনী।

মন বলছে, ডাকো ডাকো,
ঐ ভেসে-যাওয়া পারের খেয়ার আরোহিণী
ওকে একবার ডাকো ফিরে,
দিনান্তের সন্ধ্যাদীপটি তুলে ধরো
ওর মুখের দিকে ;
করো ওকে বিদায়-বরণ।
বলো তুমি সত্য, তুমি মধুর,
তোমারই বেদনা আজ লুকিয়ে বেড়ায়
বসন্তের ফুলফোটা ফুলঝরার ফাঁকে ফাঁকে।

তোমার ছবি-আঁকা অক্ষরের লিপিখানি
সবখানেই,
নীলে সবুজে সোনায়
রক্তের রাঙা রঙে।
তাই আমার আজ মন ভেসেছে
পলাশবনের চিকণ ঢেউয়ে ;
ফাটা মেঘের কিনার দিয়ে উপ্‌চে-পড়া
আচম্‌কা রোদ্দুরের ছটায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ জুন, ১৯৩৬

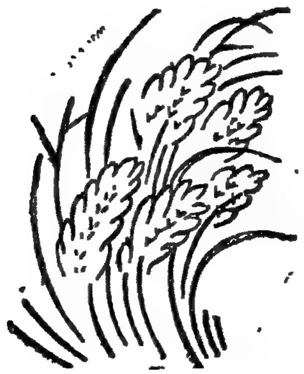

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ

দশম বার্ষিক অধিবেশন—সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে আমাকে আপনারা সভাপতি নির্ব্বাচন করেছেন। যদিও এর নাম দিয়েছেন মুসলিম সাহিত্য-সমাজ, তথাপি এই নির্ব্বাচনের মধ্যে একটি পরম ঔদার্য্য আছে। আমি হিন্দু অথবা মুসলমান সমাজের অন্তর্গত, আমি বহুদেবতাবাদী অথবা একেশ্বরবাদী এ প্রশ্ন আপনারা করেন নি। শুধু ভেবেছেন—আমি বাঙালী, বঙ্গ সাহিত্যের সেবায় প্রাচীন হয়েছি। অতএব, সাহিত্যিক দরবারে আমার একটি স্থান আছে। সেই স্থানটি অকুণ্ঠচিত্তে আমাকে দিয়েছেন। আমিও সানন্দে সকৃতজ্ঞ মনে সেই দান গ্রহণ করেছি। ভাবি, সকল বিষয়েই আজ যদি এম্নি হতে পারতো! যে গুণী, যে মহৎ, যে বড়—সে হিন্দু হোক্, মুসলমান হোক্, কৃশ্চান হোক্, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য যা-ই হোক্, স্বচ্ছন্দে সবিনয়ে তাঁর যোগ্য আসন তাঁকে দিতে পারতাম। সংশয় দ্বিধা কোথাও কণ্টক রোপণ করতে পারতো না। কিন্তু যাক্ সে কথা। আমি পূর্ব্বে একটি পত্রে বলেছিলাম, সাহিত্যের তত্ত্ব বিচার অনেক হয়ে গেছে। অনেক মনীষী, অনেক রসিক, অনেক অধিকারী বহুবার এর সীমানা এবং স্বরূপ নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন, সে আলোচনা আর প্রবর্ত্তন করার আমার রুচি নেই। আমি বলি সাহিত্য-সম্মিলন প্রবন্ধ পাঠের জন্য নয় সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় কাউকে ধরাশায়ী করার জন্য নয়, কে ভাল অক্ষম উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার জন্য নয়, যে-যা লিখেছে তার চেয়ে ভালো কেন লেখেনি এ কৈফিয়ৎ আদায়ের জন্য নয়, এ শুধু সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে মিলন-ক্ষেত্র। এর আয়োজন একের সঙ্গে অপরের ভাব-বিনিময় ও সম্যক পরিচয়ের জন্য। আমার মনে পড়ে বয়স যখন অল্প ছিল, এ ব্রতে যখন নূতন ব্রতী, তখন আমন্ত্রণ পেয়েও কত সাহিত্যসভায় দ্বিধায় সঙ্কোচে উপস্থিত হতে পারিনি, নিশ্চিত জানতাম সভাপতির সুদীর্ঘ অভিভাষণের একটা অংশ আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছেই। কখনো নাম দিয়ে, কখনো না দিয়ে। বক্তব্য অতি সরল। আমার লেখায় দেশ দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে এলো, এবং সনাতন হিন্দুসমাজ জাহান্নামে গেল বলে। যাবার আশঙ্কা ছিল, অসহিষ্ণু হয়ে যদি নজির দিয়ে আমি তার জবাব দিতাম। কিন্তু সে অপকর্ম্ম কোন দিন করিনি—ভাবতাম আমার সাহিত্য-রচনা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে একদিন না একদিন লোকে বুঝবেই। যাই হোক্, যে দুঃখ নিজে ভোগ করেছি সে আর পরকে দিতে চাইনে। তবে অকপটে বলতে পারি, আমার অভিভাষণ শুনে সাহিত্যিক বিজ্ঞতা আপনাদের এক তিলও বাড়বে না। এবং বাড়বেই না যখন জানি, তখন কতকগুলো বাহুল্য কথার অবতারণা করি কেন? এইখানে শেষ করলেই ত হতো। হতোনা তা' নয়, তবে নিজেই নাকি কথাটা একদিন তুলেছিলাম, তাই তারই সূত্র ধরে এই সম্মিলনে আরও গোটা কয়েক কথা বলবার লোভ হয়।

একদিন আমার কলকাতার বাড়ীতে কাজী মোতাহার সাহেব এসে উপস্থিত। সাহিত্য-আলোচনা করতে তিনি যাননি, গিয়েছিলেন দাবা খেলতে,—এ দোষ আমাদের উভয়েরই আছে—অসুস্থ ছিলাম খেলা হলো না, হলো বর্ত্তমান সাহিত্য প্রসঙ্গে দুটো আলোচনা। তারই মোটামুটি ভাবটা আমি কল্যাণীয়া জাহানআরার বার্ষিক-পত্র বর্ষবাণীতে চিঠির আকারে লিখে পাঠাই। এবং সেইটি "অবাঞ্ছিত ব্যবধান" শিরোনামায় বুলবুল মাসিকপত্রের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ মুহম্মদ হবিবুল্লাহ সাহেব উদ্ধৃত করেছেন তাঁর আষাঢ়ের কাগজে। দেখলাম, তার একটা জবাব দিয়েছেন শ্রীযুক্ত লীলাময় রায় আর একটা দিয়েছেন ওয়াজেদ আলী সাহেব।

লীলাময়ের লেখার মধ্যে ক্ষোভ আছে, ক্রোধ আছে, নৈরাশ্য আছে। আমি বলেছিলাম সাহিত্য-সাধনা যদি সত্য

হয় সেই সত্যের মধ্যে দিয়েই ঐক্য একদিন আসবেই। কারণ সাহিত্য-সেবকেরা পরস্পরের পরমাত্মীয়। হিন্দু হোক্, মুসলমান হোক্, কৃশ্চান হোক্, তবু পর নয়,—আপনার জন।' লীলাময় বলছেন, "প্রতিকার যদি থাকে, তবে তা' সাহিত্যে নয়—তা' স্বাজাত্যে।" স্বাজাত্য শব্দটায় তিনি কি বলতে চেয়েছেন, বুঝলাম না। বলেছেন, "ঐক্য জিনিসটা organic; হাড়ের সঙ্গে মাংস জুড়লে যেমন মানুষ হয় না, তেমনি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান জুড়লে বাঙালী হয় না, ভারতীয় হয় না।" পরে বলেছেন, "হিন্দু-মুসলমানে আপোষ ছাড়া আর কিছু করবার নেই। সুতরাং, ব্যবধান থেকে যাবে, জাতীয়তাও হবে না, আত্মীয়তাও না।" এসব উক্তি ক্ষোভের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বলি, এঁদের মত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও আজ যদি এই কথা বলতে থাকেন ত নৈরাশ্যে যে সমস্ত দিক কালো হয়ে উঠবে। এ কি এঁরা ভাবেন না? মনের তিক্ততা দিয়ে কোন মীমাংসাও হয় না, মিলনও ঘটে না। আবার এম্নি হতাশা প্রকাশ পেয়েছে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, "আজ যাঁরা নূতন করে আমাদের দুই প্রতিবেশী সমাজের সম্বন্ধ বিচার করবেন, এ নিয়ে যে আশ্চর্য্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার বন্ধন কেটে কল্যাণের অভিসারী হবেন, দীর্ঘ তাঁদের পথ, কঠিন তাঁদের সাধনা।" আমি এই কথাটাই মানতে চাইনে।- জোর করে প্রশ্ন করতে চাই, কেন তাঁদের পথ দীর্ঘ হবে? কিসের জন্য সাধনা তাঁদের সুকঠিন হয়ে উঠবে? কেন একটি সহজ সুন্দর পথে এই সমস্যার সমাধান আমরা খুঁজে পাবোনা? ওয়াজেদ আলী সাহেব পরে বলেছেন, "যাদের মনে রইলো প্রবল বিরুদ্ধতা, অন্তরে রইলো গভীর অপ্রেম, চিত্তে রইলো দীর্ঘ ব্যবধান, তাদেরকে টেনে পাশাপাশি দাঁড় করানো হলো। তাতে শিষ্টাচারের তাগিদে হাতের সাথে হাত মিললো, তাদের দৃষ্টি বিনিময় হলো না; একজনের অন্তর রইলো আর একজনের অন্তর থেকে শত যোজন দূরে।" এর হেতু দেখাতে গিয়ে বলেছেন, "অচেনা মুসলিম এলো বিজয়ীর বেশে, অধিকার করলো রাজার আসন। আনুগত্য, রাজসম্মান সে পায়নি এমন নয়; কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বদেশ স্বীকার করেও দেশ-মনের মিতালি তার ভাগ্যে হয়নি, এদের অপরিচয়ের যে ব্যবধান সেটি অবাঞ্ছিত হলেও কোনো দিন ঘোচেনি। কিন্তু এই কি সমস্ত সত্য? সত্য হলে এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান ঘুচিয়ে মিতালি করতে কটা দিন লাগে? মনে হয় লীলাময় অনেক ব্যথার মধ্যে দিয়েই লিখেছেন, "যাঁরা বিদেশে থেকে এসেছেন ও আজও তা' মনে রেখেছেন, যাঁরা জলের উপর তেলের মতো থাকবেন বলে স্থির করেছেন আবহমান কাল, দেশের অতীত সম্বন্ধে যাঁদের অনুসন্ধিৎসা ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে যাঁদের বেদনা-বোধ নেই, রাষ্ট্রের ভিতরে আর একটা রাষ্ট্র-রচনাই যাঁদের স্বপ্ন, আমরা তাঁদের কে, যে গায়ে পড়ে তাঁদের অপ্রিয় সত্য শোনাতে যাবো?"

এ কথার এ অর্থ নয় যে ব্যবধান আমরা ভালোবাসি, মিতালি চাইনে, পরস্পরের আলোচনা সমালোচনা পরিহার করাই আমাদের বিধেয়। এ উক্তির তাৎপর্য্য যে কি, সমস্ত সাহিত্য-রসিক বিদগ্ধ মুসলিম সমাজকেই আমি দিতে বলি। কলহ-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিতণ্ডা করে নয়। কোথায় ভ্রম, কোথায় অন্যায়, কোনখানে অবিচার লুকিয়ে আছে, সেই অকল্যাণকে সুস্থ-সবল চিত্ত দিয়ে আবিষ্কার করে দিতে বলি, এবং বলি উভয় পক্ষকেই সবিনয়ে সশ্রদ্ধায় তাকে স্বীকার করে নিতে। তখন পরস্পরের স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা আমরা পাবোই পাবো।

ওয়াজেদ আলী সাহেব একটি চমৎকার ভরসার কথা বলেছেন, সেটি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মনে রাখা উচিত। বলেছেন, "মুসলিম সাহিত্য সেবক আরবী ফারসি শব্দ বাঙলা ভাষার অঙ্গে জুড়তে চাইছেন, এতে আপত্তি অনাপত্তি অতি তুচ্ছ কথা, কেননা শুধু কলম চালিয়ে ওটি হতে পারে না; তার জন্যে চাই প্রচুর সাহিত্যিক শক্তি, চাই সৃষ্টিশীল প্রতিভা। এ দু'টি যেখানে নেই সেখানে ভাষা-ভূষণ পরতে গিয়ে অতি সহজেই সং সাজতে পারে।"

পারেই ত। কিন্তু এ জ্ঞান আছে কার? যিনি যথার্থ সাহিত্য-রসিক, তাঁর। ভাষাকে যিনি ভালোবাসেন, অকপটে সাহিত্যের সেবা করেন, তাঁর। তাঁকে ত আমার ভয় নেই। আমার ভয় শুধু তাঁদের যাঁরা সাহিত্য-সেবা না করেও সাহিত্যের মুরুব্বি হয়ে বসেছেন। প্রিয় না হলেও

একটা দৃষ্টান্ত দিই। 'মহেশ' নামে আমার লেখা একটি ছোট গল্প আছে, সেটি সাহিত্যপ্রিয় বহু লোকেরই প্রশংসা পেয়েছিল। একদিন শুনতে পেলাম গল্পটি Matric-এর পাঠ্য-পুস্তকে স্থান পেয়েছে; আবার একদিন কানে এলো সেটি নাকি স্থানভ্রষ্ট হয়েছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজের কোন যোগ নেই, ভাবলাম এমনিই হয়ত নিয়ম। কিছুদিন থাকে, আবার যায়। কিন্তু বহুদিন পরে এক সাহিত্যিক বন্ধুর মুখে কথায় কথায় তার আসল কারণ শুনতে পেলাম। আমার গল্পটিতে নাকি গো-হত্যা আছে। অহো! হিন্দু বালকের বুকে যে শূল বিদ্ধ হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বহু টাকা মাইনের কর্ত্তা মশায় এ অনাচার সইবেন কি করে? তাই মহেশের স্থানে শুভাগমন করেছেন তাঁর স্বরচিত গল্প 'প্রেমের ঠাকুর'। আমার মহেশ গল্পটা হয়ত কেউ কেউ পড়ে থাকবেন, আবার অনেকেই হয়ত পড়েন নি। তাই শুধু বিষয়-বস্তুটা সংক্ষেপে বলি। একটা হিন্দুপ্রধান হিন্দু-জমিদার-শাসিত ক্ষুদ্র গ্রামে গরিব চাষা গফুরের বাড়ী। বেচারার থাকার মধ্যে ছিল বহুজীর্ণ, বহুছিদ্রযুক্ত একখানি খড়ের ঘর, বছর দশেকের মেয়ে আমিনা আর একটি ষাঁড়। গফুর ভালবেসে তার নাম দিয়েছিল মহেশ। বাকি খাজনার দায়ে ছোট গাঁয়ের ততোধিক ছোট জমিদার যখন তার ক্ষেতের ধান-খড় আটক করলে, তখন সে কেঁদে বললে, হুজুর! আমার ধান তুমি নাও, বাপ-বেটীতে ভিক্ষে করে খাবো, কিন্তু খড় ক'টি দাও,—নইলে এ দুর্দ্দিনে মহেশকে আমার বাঁচাবো কি করে? কিন্তু রোদন তার অরণ্যে রোদন হলো—কেউ দয়া করলে না। তারপরে সুরু হলো তার কত রকমের দুঃখ, কত রকমের উৎপীড়ন। মেয়ে জলের জন্যে বাইরে গেলে সেই জীর্ণ কুটিরের খড় ছিঁড়ে নিয়ে লুকিয়ে মহেশকে খাওয়াতো, মিছে করে বলতো, মা আমিনা, আজ আমার জ্বর হয়েছে, আমার ভাত ক'টি তুই মহেশকে দে। সারাদিন নিজে অভুক্ত থাকতো। ক্ষুধার জ্বালায় মহেশ অত্যাচার করলে এই দশ বছরের মেয়েটার কাছেও তার ভয় ও কুণ্ঠার অবধি থাকতো না। লোকে বলতো গরুটাকে তুই খাওয়াতে পারিসনে গফুর, ওকে বেচে দে। গফুর চোখের জল ফেলে আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতো, মহেশ, তুই আমার ব্যাটা,—আমাকে তুই সাত সন প্রতিপালন করেছিস। খেতে না পেয়ে তুই কত রোগা হয়ে গেছিস,—তোকে কি আজ আমি পরের হাতে দিতে পারি, বাবা। এমনি করে দিন যখন আর কাটতে চায় না তখন একদিন অকস্মাৎ এক বিষম কাণ্ড ঘটলো। সে গ্রামে জলও সুলভ নয়। শুকনো পুকুরের নীচে গর্ত্ত কেটে সামান্য একটুখানি পানীয় জল বহু দুঃখে মেলে। আমিনা দরিদ্র মুসলমানের মেয়ে, ছোঁয়া ছুঁইর ভয়ে পুকুরের পাড়ে দূরে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী মেয়েদের কাছে চেয়ে চিন্তে অনেক দুঃখে বিলম্বে তার কলসিটি পূর্ণ করে বাড়ী ফিরে এলো। এখন ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত মহেশ তাকে ফেলে দিয়ে, কলসি ভেঙে ফেলে এক নিশ্বাসে মাটি থেকে জল শুষে খেতে লাগলো। মেয়ে কেঁদে উঠলো। জ্বরগ্রস্ত, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ গফুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো—এদৃশ্য তার সইলো না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যা' সুমুখে পেলে—একখণ্ড কাঠ দিয়ে সবলে মহেশের মাথায় মেরে বসলো। অনশনে মৃতকল্প গরুটা বার দুই হাত পা ছুঁড়ে প্রাণত্যাগ করলে।

প্রতিবাসীরা এসে বললে, হিঁদুর গাঁয়ে গোহত্যা! জমিদার পাঠিয়েছেন তর্করত্নর কাছে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতে। এবার তোর ঘর দোর না বেচতে হয়। গফুর দুই হাঁটুর ওপর মুখ রেখে নিঃশব্দে বসে রইলো। মহেশের শোকে, অনুশোচনায় তার বুকের ভেতরটা তখন পুড়ে যাচ্ছিল। অনেক রাতে গফুর মেয়েকে তুলে বললে, চল্ আমরা যাই।

মেয়ে দাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, চোখ মুছে বললে, কোথায় বাবা? গফুর বললে, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

আমিনা আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইলো। ইতিপূর্ব্বে অনেক দুঃখেও তার বাবা চটকলে কাজ করতে রাজি হয়নি। বাবা বলতো ওখানে ধর্ম্ম থাকে না, মেয়েদের আব্রু-ইজ্জৎ থাকে না—ওখানে কখনো নয়। কিন্তু হঠাৎ এ কি কথা?

গফুর বললে, দেরি করিসনে মা, চল। অনেক পথ হাঁটতে হবে। আমিনা জল খাবার পাত্র এবং বাবার ভাত খাবার পিতলের বাসনটি সঙ্গে নিতেছিল কিন্তু বাবা বারণ করে বললে, ওসব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

তার পরে গল্পের উপসংহারে বইয়ে এইরূপ আছে—

"অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় কেহ তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলা তলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লাহ্! আমাকে যত খুসি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমী কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি তার কসুর তুমি কখনো যেন মাফ্ করো না।"

এই হলো গোহত্যা! এই পড়ে হিন্দুর ছেলের বুকে শেল বিঁধবে। তার চেয়ে পড়ুক "প্রেমের ঠাকুর!" তাতে ইহলোক না হোক্ তাদের পরলোকে সদ্গতি হবে! এই কান্তিমান সুপরিপুষ্ট প্রেমের ঠাকুরটিকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, মুসলমান সম্পাদিত কাগজে এই গল্পটির যে কড়া আলোচনা বেরিয়েছিল তার কি কোন হেতু নেই? একেবারে মিথ্যা অমূলক?

তাই, আমার চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে সসম্মানে নিবেদন করে রাখি যে খুব বড় হ'লেও মনের মধ্যে একটুখানি বিনয় থাকা ভালো। ভাবা উচিত, তাঁর রচিত গল্পের সঙ্গে বাঙলার ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় না ঘটলেও বিশেষ কোন লোকসান ছিল না। Text Book থেকে পয়সা পাইনে—ও ব্যবসা আমার নয়—সুতরাং, ক্ষতিবৃদ্ধিও নেই—তবু ক্লেশ বোধ হয়। নিজের জন্য নয়,—অন্য কারণে। শুধু সান্ত্বনা এই যে অযোগ্যের হাতে ভার পড়লে এমনি দুর্দ্দশাই ঘটে। যে ব্যক্তি কোন দিন সাহিত্য-সাধনা করেনি সে কি ক'রে বুঝবে কার মানে কি! শুনেচি নাকি আমার রামের সুমতি গল্পের খানিকটা দিয়েছেন। অত্যন্ত দয়া,—বোধ করি আশা এর থেকে রামদেব সুমতি হবে। কিন্তু মুসকিল এই যে, দেশে রহিমরাও আছে!

আর শুধু বিদ্যালয়ই নয়, মহেশের ভাগ্যে অন্য দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাইনে, কিন্তু নিঃসংশয়ে জানি এক হিন্দু জমিদার রক্তচক্ষু হয়ে শাসিয়ে বলেছিলেন, ডিষ্ট্রিক বোর্ডের সাহায্যে ছাপা মাসিক বা সাপ্তাহিকে এ ধরণের গল্প যেন আর ছাপা না হয়। এতে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ দেশের সর্ব্বনাশ হয়।

যাক্ নিজের কথা।

উপরি-উক্ত হিন্দু মুরুব্বির মতো আবার মুসলমান মুরুব্বিও আছেন। শুনেছি তাঁরা নাকি আদেশ করেন ইতিহাস ফরমায়েশ মতো লিখতে। ইস্‌লাম-ধর্ম্মী কোন ব্যক্তি কোথাও অন্যায়-অবিচার করেছেন এর লেশমাত্রও যেন কোন পড়ার বইয়ে না থাকে। এখানেও সান্ত্বনা এই যে এঁদের কেউ কখনো কোন কালে সাহিত্য-সেবা করেননি। করলে এমন কথা মুখে আনতে পারতেন না। সত্যিকার সাহিত্যিকদের হাতে যদি এই ভার পড়ে, আমার বিশ্বাস, না হিন্দু, না মুসলিম কোন পক্ষ থেকেই বিন্দুমাত্র অভিযোগ শোনা যাবে না। ভাষার প্রতি, সাহিত্যের প্রতি সত্যিকার দরদ তাঁদের সত্য পথেই পরিচালিত করবে।

ওয়াজেদ আলী সাহেব একস্থানে বলেছেন, "মুসলিমের এই নবস্ফূর্ত্ত আত্মপ্রকাশ, ইসলামী কৃষ্টির এই বলিষ্ঠ জাগরণ, সাহিত্য ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মতো শক্তিমান প্রতিভার মনোযোগ আকর্ষণ করলো, হয়ত দেশের অনাগত কল্যাণের এ এক শুভ ইঙ্গিত। কিন্তু তবু কেন মন সন্দেহ-অবিশ্বাসে দ্বিধা-জিজ্ঞাসায় দুলে ওঠে? 'বুলবুল' প্রকাশিত তাঁর পত্রখানিতে যেন চোখে পড়ে; মুসলিমের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব, ভালবাসার অভাব এবং মোটামুটি একটা অন্তর্দৃষ্টির অভাব।"

আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে মুসলিমের এই "নবস্ফূর্ত্ত আত্মপ্রকাশ", ইসলামী কৃষ্টির এই "বলিষ্ঠ জাগরণ" যাঁরা নবীন, উদার, বাঙলা ভাষাকে যাঁরা অকুণ্ঠিত মনে মাতৃ-ভাষা বলে স্বীকার করেন, তাঁদের; না, যাঁরা পুরাতন-পন্থী তাঁদের? আমার অভিমত এই যে যাঁরা প্রাচীন-পন্থী, যাঁরা পিছনে ছাড়া সুমুখে চাইতে জানেন না, তাঁদের জাগরণ কি মুসলিম কি হিন্দু সকল সমাজেরই বিঘ্ন স্বরূপ। হিন্দুদের সম্বন্ধে একথা আমি বহুবার বহুস্থানে লিখেছি, মুসলিম সমাজের সম্বন্ধেও অসংশয়ে বলতে পারি, এ জাগরণ হয় যদি নবীনের—আসুক সে শ্রাবণের পূর্ণিমা

জোয়ারের মতো সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে, তবু তাকে আমি দু'হাত তুলে সম্বর্দ্ধনা করে নেবো। জানবো, এদের হাতে সমস্তই হবে শুভ এবং সুন্দর,—এদের হাতে হিন্দু-মুসলিম কারও ভয় নেই—এদের হাতে আমরা দু'জনেই হবো নিরাপদ। আমার আশঙ্কা শুধু প্রাচীনপন্থীদের সম্বন্ধে।

তিনি পরে বলেছেন, "শরৎচন্দ্রের মতো সাহিত্যিক-দের সম্প্রদায়, জাতি, এক ছাড়া দুই নয়। এ কথা সহজেই আমাদের স্বীকৃতি দাবী করতে পারে। কিন্তু আরও একটি সহজ কথার দিকে তাঁর দৃষ্টি, আকর্ষণ করি। সেটি এই যে সাহিত্য মানুষের মনের সৃষ্টি, এবং মানুষের মনকে তৈরি করে তার ধর্ম্ম, তার সমাজ, তার পরিবেশ, তার কৃষ্টি। এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা কি সামান্য ব্যাপার? এবং সাধারণতঃ সেটি কি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব?"

এই কথাগুলি শুধু আংশিক সত্য,—সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ এটুকু মোটামুটি জেনে রাখা দরকার যে মানুষ যখন সাহিত্য রচনায় নিবিষ্টচিত্ত তখন সে ঠিক হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়। তখন সে তার সর্ব্বজনপরিচিত 'আমি'-টাকে বহুদূরে অতিক্রম করে যায়, নইলে তার সাহিত্য-সাধনা ব্যর্থ হয়। এই জন্যেই যেখানে কিছুই এক নয়, বাস্তবতঃ কিছুই মেলে না, সেখানেও ম্যাক্সিম গর্কির মতো সাহিত্য-সেবকেরা আমাদের বুকের মধ্যে অনেকখানি আত্মীয়ের আসন জুড়ে বসে থাকেন। এই কথাটি আমি সকল সাহিত্যিককেই মনে রাখতে বলি। কে কোথায় তার অসতর্ক মুহূর্ত্তে কি কথা বলেছে সেইটিই তার জীবনের পরম সত্য নয়। কেবল তাই দিয়েই বিচার চলে না। এবং এই জন্যই ওয়াজেদ আলী সাহেব তাঁর প্রবন্ধে আমার সম্বন্ধে যে সব কঠিন উক্তি করেছেন আমি তার জবাব দিতে বসবো না। রাগ যখন পড়বে, তখন আপনিই মনে হবে আমি সত্যি কথাই বলেছিলাম। ওয়াজেদ আলী সাহেব সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক কথা বলেছেন এইখানে, "বস্তুতঃ, দুইটি বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির সংঘর্ষের ফলে এই বিক্ষোভ। এর জন্যে আক্ষেপ বৃথা। হিন্দু মুসলিমকে বোঝে না, এ জন্যে দুঃখের বিলাপ আজ চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে তার ভারতীয় ধর্ম্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি তার মনকে করেছে অপনি-সর, দৃষ্টিকে করেছে আচ্ছন্ন। আপনার পরিধিকে অতিক্রম করে গতি তার নিশ্চল। আপনার আভিজাত্যের গর্ব্বে যে চিরবিলীন, পরাজয়ের প্রাচীন অভিমান যার আজো দুর্জ্জয়, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত স্থান দান কর্ত্তেও যার আপত্তি অন্তহীন, তার বুদ্ধিকে মুক্ত বলা কঠিন অথচ, মুক্তি যার নেই সে চলে না, চলতে পারে না. সে জড়। এই আত্মকেন্দ্রী পরবিমুখ জড়বুদ্ধির পরিবেশ এ দেশের মুসলিমকে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' করে রেখেছে, ভারতের মাটির রসে রসায়িত হয়েও তার মন যেন ভিজছে না।"

এই যে বলেছেন দুইটা বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির ফলে এই বিক্ষোভ, এর জন্যে আক্ষেপ বৃথা। আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতিবেশী, আমাদের আকাশ বাতাস মাটি জল এক। মাতৃ-ভাষা এক বলেই স্বীকার করি। তবু সংঘর্ষ এত বড় কঠোর যে তার জন্যে আক্ষেপ পর্য্যন্ত করা বৃথা—এই মনোভাবই যদি সমস্ত হিন্দু মুসলমানের সত্য হয় ত এই কথাই বলবো যে এর চেয়ে বড় দুর্গতি মানুষের আর ঘটতে পারে না। রবীন্দ্র-নাথের বুদ্ধিও কি জড় বুদ্ধি? মন তাঁর মুক্ত হয়নি? এ যদি সত্য তবে ওয়াজেদ আলী সাহেবের এ ভাষা এল কোথা থেকে? সহজ সুন্দর ও অবলীলায় আপন মনোভাব প্রকাশ করার শক্তি তাঁকে কে দিলে? এ যুগে এমন লেখক, এমন সাহিত্যসেবক কে আছে যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী নয়? সাহিত্য ধর্ম্ম-পুস্তকও নয়, নীতি-শিক্ষার বইও নয়, অথচ, আপন বিশাল পরিধির মধ্যে আপন মাধুর্য্যে সে সব কিছুকেই আপন করে রেখেচে। তাই সাহিত্য কি, রস-বস্তু কি, আজও কেউ তার সত্য নির্দ্দেশ পেলে না। কত তর্ক, কত মতভেদ। এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান সম্বন্ধে মীজানুর রহমান সাহেব জ্যৈষ্ঠের বুলবুল মাসিক পত্রে তাঁর প্রবন্ধের এক স্থানে অকরুণ হয়ে বলেছেন, "শরৎবাবু তাঁর রাশিকৃত উপন্যাসের ভিতর স্থানে স্থানে মুসলমান সমাজের যে সব ছবি এঁকেছেন তা মুসলমান সমাজের খুব উঁচু দরের লোকের নয়।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি উঁচু-নীচু স্তরের পাত্র-পাত্রীর উপরেই কি উপন্যাসের উচ্চতা-নীচতা, ভালো-মন্দ নির্ভর করে? এ যদি তাঁর অভিমত হয়, তবে আমার সঙ্গে তাঁর মতের ঐক্য হবে না। না হোক্, কিন্তু উপসংহারে যে বলেছেন, "হিন্দু সমাজের

বিবিধ গলদ ও সমস্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র যে সকল গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন এবং প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তাঁহার সমাজকে যে চাবুক কশেছেন, সদিচ্ছাপ্রণোদিত এমন ধারা নির্ম্মম কশাঘাতও মুসলিম সমাজ অম্লান বদনে গ্রহণ করবে তা' জোর করে বলতে পারি। বাঙ্গালার কথা-সাহিত্য-সম্রাটকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি।"

সে দিন জগন্নাথ হলে আমার অভিনন্দনের প্রতিভাষণে এ কথার উত্তর দিয়েছি। অন্তরের শুভ-কামনাকে এঁরা কেমন করে গ্রহণ করবেন, এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে আমি দেখে যাবো। সে যাই হোক্, মানুষে শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করতেই পারে কিন্তু তার পরিপূর্ণতার ভার থাকে আর একজনের পরে, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর। সে দিন খেতে বসে His Excellency আমাকে এই প্রশ্নই করেছিলেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম আমার সকল কাজে পরিণত করতে চাই উভয় সমাজের আশীর্ব্বাদ। ঠিক সমাজ নয়,—চাই উভয় সমাজের সাহিত্য-সেবকদের আশীর্ব্বাদ। যে ভাষার, যে সাহিত্যের এতকাল সেবা করেছি, তারপরে অকারণ অনাচার আমার সয় না। আমার একান্ত মনের বিশ্বাস আমার মতো সাহিত্যের যথার্থ সাধনা যাঁরা করেছেন, তাঁরা হিন্দু-মুসলিম যা-ই হোন কারোও এ অনাচার সইবে না। সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের জন্য পরিবর্ত্তন যদি কিছু কিছু প্রয়োজন হয়—এমন ত কতবার হয়েছে—সে কাজ ধীরে ধীরে এঁরাই করবেন। আর কেউ নয়। সে হিন্দুয়ানীর কল্যাণে নয়, মুসলমানীর কল্যাণেও নয়,—শুধু মাতৃ-ভাষা ও সাহিত্যের কল্যাণে। এই আমার মোট আবেদন।

কোথায় কোন লেখায় মুসলিম সমাজের প্রতি অবিচার করেছি,—করিনি বলেই আমার ধারণা—তার চুল-চেরা বাদ-প্রতিবাদ প্রতিকারের পথ নয়, সে কলহ বিবাদের নতুন রাস্তা তৈরি করা।

বুলবুল কাগজখানির নানা স্থান থেকে আমি উদ্ধৃত করেছি—প্রয়োজন বোধে। এই পত্রিকার অবিচ্ছিন্ন উন্নতি কামনা করি, কারণ যতটুকু পড়েছি, তাতে সাহিত্যের উন্নতিই এঁদের কাম্য, আমারও তাই। হয়ত, কোথাও একটু কটুক্তি করে থাকবেন কিন্তু সে মনে করে রাখবার বস্তু নয়, ভুলে যাবার জিনিস।

কিন্তু আর নয়। বলবার বিষয় এখনো অনেক ছিল কিন্তু আপনাদের ধৈর্য্যের প্রতি সত্যিই অত্যাচার করেছি। সে জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি। এ অভিভাষণে পাণ্ডিত্য নেই, কারুকার্য্য নেই, বলার কথাগুলো কেবল সোজা করে বলে গেছি, যেন তাৎপর্য্য বুঝতে কারও ক্লেশ বোধ না হয়। শোনার পরে কেউ না বলেন যেমন অতুলনীয় শব্দসম্পদ, তেমনি কারুকার্য্য—কিন্তু ঠিক কি যে বলা হলো ভালো বোঝা গেল না।

বাঙলা সাহিত্যের সেবা করে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আমার অপরিসীম, তবু তাঁদের নামোল্লেখ করতে আমি বিরত রইলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা-নিবেদনের একটা রীতি আছে। যেমন আছে আরম্ভ করার সময় বিনয় প্রকাশের প্রথা। প্রথমটা করিনি। কারণ, সাহিত্য-সভায় সভাপতির কাজ এত বেশী করতে হয়েছে যে এই ষাট বছর বয়সে নিজেকে অনুপযুক্ত, বেকুফ ইত্যাদি যত প্রকারের বিনয়সূচক বিশেষণ আছে নিজের নামের সঙ্গে সংযোগ করে দিলে ঠিক শোভন হবে মনে হলো না। কিন্তু কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের বেলায় তা' নয়। সমস্ত বিদগ্ধ মুসলিম সমাজের কাছে আজ আমি অকপটে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করচি। আপনারা আমার সালাম গ্রহণ করুন। বলার দোষে যদি কাউকে বেদনা দিয়ে থাকি সে আমার ভাষার ত্রুটি, আমার অন্তরের অপরাধ নয়। ইতি

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঢাকা
১৫ শ্রাবণ, ১৩৪৩

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩৮

বেলা আটটা বাজে। চা পানের পর বারান্দায় ইজিচেয়ারে ব'সে প্রিয়লাল সেদিনকার সংবাদপত্র পাঠ করছিল। হঠাৎ এক সময়ে উপলব্ধি করলে, যে বিষয়টা তখন পড়ছিল তার আট-দশ ছত্র পড়া হ'য়ে গেছে বটে, কিন্তু কী যে পড়েছে তার বিন্দুমাত্র চেতনা নেই। মন যতক্ষণ বিনা নোটিসে বিষয়ান্তরে ডুব মেরেছিল, চক্ষু ততক্ষণ শ্রেণী-বদ্ধ অক্ষরগুলোর উপর নিরর্থক বিচরণ ক'রে বেড়িয়েছে, সামান্য মাত্রও তার মর্ম্মগ্রহণ করতে পারেনি। বিরক্ত হ'য়ে প্রিয়লাল কাগজখানা ভাঁজ ক'রে পাশের টেবিলে রেখে দিলে। মনটা হয়ে উঠল উৎকণ্ঠিত, অপ্রসন্ন।

আজ আট দিন হ'ল সে লক্ষ্ণৌ পৌঁছেচে, কিন্তু আট দিন পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশন থেকে মনের যে চাঞ্চল্য নিয়ে এসেছিল তা উপশমিত হওয়া ত দূরের কথা, উত্তরোত্তর প্রবলতরই হয়েছে। এই চঞ্চলতা যে শুধু চিত্তের গোপন মহলেই নিবদ্ধ নয়, বাহিরেও তার কিছু প্রকাশ আছে, তা সে বুঝতে পারে, কিন্তু তাকে রোধ করতে পারে না। বাহিরে তার যতটুকু প্রকাশ, তার আকৃতি এবং পরিমাণ হয় ত এমন যা অপর পক্ষের মনে বিরক্তি এবং বিস্ময় উদ্রেক করতে পারে, কিন্তু যা নিয়ে স্পষ্ট প্রতিবাদ করা চলে না। হয়ত আতিথ্যধর্ম্ম পালনের অনুরোধে সহৃদয়া মিসেস মুখার্জ্জি সেটুকু তিতিক্ষার সহিত পরিপাক করেন, কিন্তু মনে মনে তাকে কামিনীপরায়ণ বিশ্বাসহন্তা ব্যক্তির শ্রেণীতে স্থান দেন। অথচ, বস্তুত সে যে একেবারেই তা নয়, এ সে কেমন ক'রে বোঝাবে! কেমন ক'রে বোঝাবে যে, মিসেস্ মুখার্জ্জির প্রতি তার আকর্ষণ কামজ নয়, সে আকর্ষণের সহিত মিসেস্ মুখার্জ্জির দেহের কোনো সম্পর্ক নেই, একমাত্র যে বস্তুর সহিত আছে তা তার পরলোকগতা স্ত্রীর আকৃতির সহিত মিসেস্ মুখার্জ্জির আকৃতির বিস্ময়জনক সাদৃশ্য।

প্রিয়লাল স্থির করলে, যে প্রকারে হোক্ সেইদিনই প্রকৃত কথাটা সন্ধ্যার নিকট স্পষ্টতর ক'রে দেবে, নচেৎ তার পক্ষ থেকে আতিথ্যধর্ম্ম হয়ত পদে পদে ক্ষুণ্ণ হতেই থাক্‌বে।

"হরিয়া!"

হরিয়া প্রিয়লালের ধৌত বস্ত্রাদি রৌদ্রে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, নিকটে এসে বললে, "হুজুর?"

"তোমার মা কোথায় আছেন?"

অনুসন্ধান ক'রে এসে হরিয়া জানালে, সন্ধ্যা কম্পাউণ্ডে চন্দ্রমল্লিকার চারাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করছে। ঘরে গিয়ে সুট-কেস্ থেকে একটা কি বার ক'রে পকেটে পুরে প্রিয়লাল সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'ল। সন্ধ্যা তখন ভূমিতলে হাঁটু গেড়ে ব'সে ছোট একটা কাঁচি দিয়ে সযত্নে একটি চন্দ্রমল্লিকার চারার পাতা ছাঁট্‌ছিল, প্রিয়লালকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বললে, "আসুন!"

প্রিয়লাল বললে, "স্বহস্তে পরিচর্য্যা করছেন মিসেস মুখার্জ্জি?"

সন্ধ্যা বললে, "এতগুলি গাছের মধ্যে দশ রকমের দশটি গাছ আমার নিজের পরিচর্য্যায় আছে, বাকি মালীর পরিচর্য্যায়। কার গাছের ফুল বড় হয়, তা নিয়ে মনে মনে মালীর সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতা নেই তা বলতে পারিনে; যদিও এ কথাও মনে মনে বেশ জানি যে, মালীর কাছে আমার হার সুনিশ্চিত।" ব'লে সন্ধ্যা হাসতে লাগল।

প্রিয়লাল সহাস্যমুখে বললে, "আমি যদি আপনার দশটি গাছের মধ্যে একটি গাছ হতাম মিসেস মুখার্জ্জি, তা হলে আপনার কাঁচির আঘাত খেয়ে এমন একটি অদ্ভুত ফুল আপ-নাকে উপহার দিতাম যাতে শুধু আপনার নিজের মালীই নয়, সারা লক্ষ্ণৌ সহরের মালী আপনার কাছে হার মানত!"

সন্ধ্যা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠল।

"মিসেস মুখার্জ্জি!"

সন্ধ্যা নিঃশব্দে প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"আমি বুঝতে পারছি মিসেস মুখার্জ্জি, মাণিকের মার গল্পটা আজকাল আপনার একটু বেশি-বেশি মনে করবার দরকার হচ্ছে, কিন্তু আমার মনের প্রকৃত অবস্থাটা একবার যদি আপনি একটু ভাল ক'রে বুঝে নেন, তা হলে আর আপনার মনে কোনোরকম সঙ্কোচ আসে না, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। অনুগ্রহ ক'রে এখন যদি আপনি মিনিট দশ পনেরো সময় আমাকে দিতে পারেন তা হ'লে আমরা ওই বাদামগাছ তলায় বেঞ্চিতে গিয়ে একটু বসি।"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আমি ত আপনার মনের কথা জানি ডক্টার চৌধুরী।"

প্রিয়লাল বললে, "জানেন। কিন্তু আজ আপনার কাছে আমি তার একটা প্রমাণ দিতে চাই,—একটা tangible প্রমাণ।"

"প্রমাণের কোনো দরকার আছে কি?"

"একটু আছে। শুধু মুখের কথা, আর প্রমাণাশ্রিত কথা,—এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছেই। প্রমাণটা পেলে আপনি একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারবেন।"

নিশ্চিন্ত হওয়া ত দূরের কথা, প্রিয়লালের কথায় আপাতত সন্ধ্যা উদ্বিগ্নই হয়ে উঠল; কটিদেশে নিবদ্ধ চামড়ার ব্যাগে কাঁচিটা রেখে মৃদুস্বরে বললে, "আচ্ছা চলুন।"

উভয়ে বেঞ্চে গিয়ে উপবেশন করলে প্রিয়লাল বললে, "এ কথা বললে কোনো দিক থেকে যদি কিছু রূঢ়তা প্রকাশ পায় তাহলে আমাকে অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করবেন মিসেস মুখার্জ্জি, কিন্তু এ কথা প্রথমেই বলা দরকার যে, বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি বন্ধুর একান্ত সঙ্গত যেটুকু আকর্ষণ থাকতে পারে, আপনার প্রতি আমার তার বেশি এক বিন্দু আকর্ষণ নেই। মাঝে মাঝে যদি কিছু অতিরিক্ত আকর্ষণের পরিচয় পেয়ে থাকেন, নিশ্চয় জানবেন সে আকর্ষণের লক্ষ্য আপনি নন, আপনি তার উপলক্ষ; তার একমাত্র লক্ষ্য আমার স্বর্গীয়া স্ত্রী সন্ধ্যা। এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন ত মিসেস মুখার্জ্জি?"

ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে "করি।"

"করেন জানি, কিন্তু যে প্রমাণটা এখনি আপনাকে আমি দিচ্ছি, সেটা পেলে আপনার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে।" ব'লে পকেট থেকে সেই কাগজটা বার ক'রে সন্ধ্যার অঙ্গুলিবদ্ধ হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললে, "এটা আমার স্ত্রী সন্ধ্যার ফটোগ্রাফ। আচ্ছা, একটা আরসির সামনে দাঁড়িয়ে আপনার আকৃতির সঙ্গে এই ফটোগ্রাফটা মিলিয়ে দেখে সত্যি ক'রে বলুন দেখি, কারমাটারে গাড়িতে আপনাকে দেখে যে চমকে উঠেছিলাম সেটা বিশেষ অন্যায় হয়েছিল কি-না।" ব'লে প্রিয়লাল নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অখণ্ডনীয়তার প্রত্যয়ে হাসতে লাগল।

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সন্ধ্যা ক্ষণকাল ফটোটার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রইল। এ সেই ফটো যা তার বিবাহের প্রস্তাবকালে প্রিয়লালদের গৃহে প্রেরিত হয়েছিল। প্রিয়লাল ফটোটা হস্তগত করেছিল এবং বিবাহের তিন চার দিন পরে সন্ধ্যাকে দিয়ে ফটোর তলায় নাম লিখিয়ে নিয়েছিল। সন্ধ্যা শুধু দুটি কথা লিখে দিয়েছিল, "তোমার সন্ধ্যা।" এতদিন পরেও লেখাটা সদ্য টাটকা লেখার মত জলজ্বল করছে। কম্পিত সন্ধ্যা হস্তে ফটোখানা প্রিয়লালকে ফিরিয়ে দিলে।

"মিলিয়ে দেখলেন না মিসেস মুখার্জ্জি?"

মৃদুকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "মেলাবার দরকার নেই, বুঝতে পেরেছি।"

প্রসন্নমুখে প্রিয়লাল বললে, "তাহলে এ কথাও বুঝতে পারছেন যে, আপনি আমার পক্ষে এমন অদ্ভুত একটি মিডিয়ম যার মধ্য দিয়ে আমি অনায়াসে সন্ধ্যার, অন্ততঃ সন্ধ্যার স্মৃতির, নাগাল পেতে পারি। মূর্ত্তি পুজো ক'রে মানুষে যেমন ভগবানকে পাবার চেষ্টা করে, আমিও ঠিক তেমনিভাবে আপনার দ্বারা সন্ধ্যাকে পাবার চেষ্টা করি। আপনি ত' জানেন মিসেস মুখার্জ্জি, শুধু physical পাওয়াই পাওয়া নয়, spiritual পাওয়াও খুব একটা বড় রকমের পাওয়া।"

এ কথার উত্তরে সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। অদূরে মেহগিনি গাছে একটা ঘুঘু নিরবসর

ডেকে চলেছিল। তার একটানা করুণ সুরের পীড়নে বাগানের সে অঞ্চলটা আর্দ্র হ'য়ে উঠেছিল।

"মিসেস মুখার্জি?"

মুখ তুলে প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আজ্ঞে।"

"সন্ধ্যার ফটো দেখার পর এখন যখন আপনি অবস্থাটা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছেন তখন আপনার কাছে একটা প্রার্থনা করব কি? এ কিন্তু এমন অদ্ভুত খেয়ালের কথা যে শুনে হয়ত আপনি আমাকে পাগল ব'লে মনে করবেন। মনে করলে অবশ্য এমন কিছু অন্যায় করা হবে না, কারণ নিজের স্ত্রীর প্রতি যে আমার মতো গভীর অত্যাচার করতে পারে তার ত' পাগল হওয়াই উচিত। যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন তাহলে আমার প্রার্থনাটা নিবেদন করি।" ব'লে প্রিয়লাল অল্প অল্প হাসতে লাগল।

বিহ্বলভাবে প্রিয়লালের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কি বলুন।"

এক মুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে প্রিয়লাল বললে, "আমার প্রার্থনা, একদিনের জন্যে, শুধু একদিনের জন্যে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ভাবতে অনুমতি দিন যে, আপনি যেন মিসেস মুখার্জি নন,—আপনি যেন সন্ধ্যা। কালকের দিনই সেই দিন করা যাক্। কাল সকালে উঠে প্রথম দর্শনে আপনাকে বলব, 'সুপ্রভাত সন্ধ্যা!' আপনি কোনো উত্তর দেবেন না, চুপ ক'রে থাকবেন। আপনার হবে মূক অভিনয়, আমার হবে মুখর। আমি বলব, 'ওগো কথা কও, কথা কও। তোমার পাষাণের মত অভিমানের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে অপরাধী স্বামীকে দণ্ড দাও, তিরস্কার কর; শুধু তাকে উপেক্ষা ক'রে দূরে রেখো না।' এই রকম দুঃখে খেদে আরাধনায় সমস্ত দিনটা আমার কেটে যাবে অস্থিরতার চঞ্চলতার মধ্যে। আপনি কিন্তু তার মধ্যে থাকবেন প্রতিমার মতো স্তব্ধ অনড়। ক্রমশঃ আমিও নিশ্চল নীরব হয়ে আসব। অবশেষে গভীর রাত্রের কোনো এক মুহূর্ত্তে অতি সংক্ষেপে বিদায়ের পালা শেষ হবে। শুধু বলব, 'বিদায় সন্ধ্যা, বিদায়!' সেই বিসর্জ্জনের অনুষ্ঠানের মধ্যে পুনরাগমনের কোনো প্রার্থনা থাকবেনা। তারপর দিন সকালে আপনি আবার যে মিসেস মুখার্জি সেই মিসেস মুখার্জি। কি বলুন? আমার প্রার্থনা—"

সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে, "একি মিসেস মুখার্জি! অমন করছেন কেন?" তারপর সাড়া না পেয়ে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে সন্ধ্যার দুই কাঁধ ধ'রে সজোরে নাড়া দিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকলে, 'মিসেস মুখার্জি! মিসেস মুখার্জি!"

চকিত হ'য়ে সন্ধ্যা তার নিমীলিতপ্রায় চক্ষু উন্মীলিত ক'রে চেয়ে দেখলে, তারপর রক্তশূন্য ওষ্ঠাধরে অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা স্ফুরিত হ'ল।

চিন্তিতমুখে প্রিয়লাল বললে, "একটু ভাল বোধ করছেন কি?"

অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "ও কিছু নয়। নিশ্বাসটা কেমন চেপে এসেছিল তাই শরীরটা একটু বেভাব হয়েছিল।"

"আগে কখনো এ রকম হয়েছিল?"

সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, আর একবার হয়েছিল।" জামসেদপুর থেকে পিতৃগৃহে যেদিন যায় সেদিনকার কথা তার মনে পড়ল।

"ডাক্তার ডাকাব মিসেস মুখার্জি?"

হাত নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "না, কিছু দরকার নেই।"

"তা হ'লে একটু বিশ্রাম নেবেন চলুন।"

বিশ্রাম নেবার প্রস্তাব কিন্তু আর বেশী দূর অগ্রসর হ'ল না, পদশব্দে উভয়ে চেয়ে দেখলে সাধুচরণ আসছে, চক্ষে ভ্রূকুটির তীক্ষ্ণতা, মুখমণ্ডলে অপ্রসন্নতার অন্ধকার। অজ্ঞাত কারণ বশতঃ প্রথম থেকেই প্রিয়লালকে সাধুচরণের ভাল লাগেনি, সন্ধ্যার সহিত তার এই কয়েক দিনের ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য ক'রে সেই অপ্রসন্নতা সবিশেষ বর্দ্ধিত হয়েছিল; তারপর আজ দূর থেকে সন্ধ্যার দুই স্কন্ধে প্রিয়লালের হস্তার্পণ দেখে তার পিত্ত জ্ব'লে গিয়েছিল। নিকটে এসে রুক্ষ স্বরে সে ডাকলে "মা।"

"কি সাধু!"

"টেলিগেরাম এসেছে যে!"

পদাক্ষের এই 'যে' শব্দটি নিরর্থক নয়, প্রিয়লালের চপল আচরণ অপ্রতিবাদে সহ্য করবার জন্য ইহা সন্ধ্যার প্রতি অনুক্ত তিরস্কারের সঙ্কেত।

আগ্রহভরে সন্ধ্যা বললে, "কই দেখি।"

নিকটে ছিল ব'লে প্রিয়লাল সাধুচরণের হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিতে গেল, সাধুচরণ কিন্তু হাত সরিয়ে নিয়ে প্রিয়লালকে অতিক্রম ক'রে সেটা সন্ধ্যার হাতে পৌঁছে দিলে।

সাধুচরণের এই অশিষ্টতায় সন্ধ্যা মনে মনে রুষ্ট হ'ল, কিন্তু টেলিগ্রামটা খুলে পাঠ ক'রে সে এত খুসি হয়ে গেল যে, নিমেষের মধ্যে সমস্ত রোষ বিস্মৃত হ'য়ে সে সাধুচরণকেই বল্‌লে, "সাধু, উনি এক্ষণি আসছেন!"

শুনে সাধু উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল; একটু খাড়া হ'য়ে উঠে বল্‌লে, "দেখ দেখি, বাবু আসছেন, আর তুমি—!"

এই 'আর তুমি' কথা দুটিও পূর্ব্বোক্ত 'যে' শব্দের সগোত্র, অর্থাৎ প্রিয়লালের সম্পর্কে অনুযোগবাচক।

অকস্মাৎ প্রমথর আগমনের সংবাদ শুনে প্রিয়লালের মুখ একটু ম্লান হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু অবিলম্বে মনে মনে নিজেকে ঠিক ক'রে নিয়ে সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্‌ গাড়িতে প্রমথ আসছেন মিসেস মুখার্জ্জি?"

প্রিয়লালের হাতে টেলিগ্রামটা দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "নটার গাড়িতে,—যে গাড়িতে আমরা এসেছিলাম।" তারপর সাধুচরণকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে, "সাধু, সময় একেবারে নেই, শীগগির মোটার বার করতে বল, আমি দু মিনিটে তয়ের হয়ে আসছি।" ব'লে দ্রুতপদে তার কক্ষের দিকে অগ্রসর হ'ল। যেতে যেতে মনে হ'ল প্রিয়লালকে ষ্টেশনে যাবার কথা একবার বলা উচিত। ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "ডক্টার চৌধুরী, আপনি ষ্টেশনে যাবেন?"

প্রিয়লাল বললে, "আনন্দের সঙ্গে।"

"বেশ, তা হ'লে আপনিই যান।"

"কেন? আপনি তা হ'লে যাবেন না না-কি?"

"না। আমি তা হ'লে আর যাইনে।"

"কেন মিসেস্‌ মুখার্জ্জি, দুজনেই যাই, চলুন না?"

সন্ধ্যা বললে, "আপনি গেলে আর আমার যাবার দরকার নেই। আমি বরং বাড়িতে থেকে ওঁর চা-টার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে রাখি। আপনি একাই যান,—কেমন?"

একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে প্রিয়লাল বললে, "আচ্ছা, তাই না হয় যাই।"

প্রিয়লাল যখন ষ্টেশনে পৌঁছল তখন গাড়ি ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করছে। দূর থেকেই সে দেখতে পেলে প্রমথ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে আছে।

গাড়ি থামলে প্রমথ তাড়াতাড়ি নেমে প'ড়ে দুই হস্ত দিয়ে প্রিয়লালের দুই হাত সজোরে চেপে ধ'রে সহাস্যমুখে বললে, "কেমন আছ বল?"

"ভাল আছি। তুমি?"

"ভাল আছি। ঊষা কেমন আছে?"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বের মোহাবেশের কথা উল্লেখ না করাই সমীচীন হবে মনে ক'রে প্রিয়লাল বললে, "ভালই আছেন। তোমার বন্ধুর খবর কি?"

প্রমথ বললে, "বন্ধুর খবর ভাল। এ যাত্রা সুরেশটা ভারি বেঁচে গিয়েছে।"

পথে যেতে যেতে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "ঊষার সঙ্গে তোমার আলাপ-পরিচয় এ কয়েক দিনে একটু ঘনিষ্ঠ হল ত' প্রিয়লাল?"

সহাস্যমুখে প্রিয়লাল বললে, "একটু নয়, বিশেষ ভাবেই হয়েছে। এত বেশি যে, তিনি আমার বন্ধুর স্ত্রী, না তুমি আমার বান্ধবীর স্বামী, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে!"

মুখে কপট আতঙ্কের ছায়া লেপন ক'রে প্রমথ বললে, "ভাগ্যিস আরো দেরি ক'রে আসিনি! আরো পাঁচ-সাত দিন দেরী ক'রে এলে হয়ত আরো কঠিন কোনো প্রশ্ন তোলা যেতে পারত! কি বল প্রিয়লাল?"

প্রিয়লাল বললে, "তা হয়ত পারত। কারণ তা হ'লে ক্রমশঃ তাঁর সঙ্গে আমার এমন একটা আত্মীয়তা স্থাপিত হোত যে, প্রশ্নটা তখন দাঁড়াতে পারত—তিনি আমার বন্ধুর স্ত্রী, না তুমি আমার আত্মীয়ার স্বামী।" ব'লে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগল।

আর কোনো উত্তর না দিয়ে প্রমথও হাস্‌তে লাগল।

গৃহে পৌঁছে অল্পক্ষণ সন্ধ্যা এবং প্রিয়লালের সহিত কথাবার্ত্তার পর প্রমথ স্নান করবার জন্য বাথরুমে প্রবেশ করলে। স্নানান্তে চা পান করতে ব'সে সে সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "প্রিয়লাল কোথায় ঊষা?"

সন্ধ্যা বললে, "বাদামতলায় বেঞ্চে ব'সে বই পড়ছেন।"

সকৌতূহলে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, তোমার প্রতি ওর একটুও সন্দেহ হয়নি কি ?"

সন্ধ্যা বললে, "সে কথা পরে বলছি, কিন্তু তার আগে অন্য একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি এই আটদিন আমাকে এ-ভাবে ফেলে রেখেছিলে কেমন ক'রে ? সুরেশ বাবুকে একটু ভাল দেখার পর এলেও অন্ততঃ তিন চার দিন আগে আসতে পারতে। আমাকে এইরকম একটা অত্যন্ত গোলমেলে অবস্থায় এমন ক'রে ফেলে রাখা তোমার উচিত হয়েছে কি ?"

সহাস্যমুখে প্রমথ বললে, "আহা-হা! বুঝতে পারছ না ? তোমাকে একটু পরীক্ষে করছিলাম !"

সন্ধ্যা বললে "আর একটু বেশি পরীক্ষে করলে হয়ত ফেল হতাম !"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রমথ বললে, "সর্বনাশ! আমার যে যা-কিছু সবই তোমার ব্যাঙ্কে জমা! তুমি ফেল হ'লে আমি একেবারে দেউলে হতাম !"

"তবে ?"

কপট অনুতাপের ভঙ্গীতে প্রমথ বললে, "স্বীকার করছি, গোঁয়ার্তুমি করা হচ্ছিল! তবে কি-না—" সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রমথ কথাটা চেপে গেল।

সন্ধ্যা কিন্তু কথাটাকে উপেক্ষা করলে না; বললে, "তবে কি-না কি বল ?"

ভয়ে ভয়ে প্রমথ বললে, "তবে কি-না গোঁয়ার্তুমির ফলে ব্যাঙ্ক ফেল হ'লে একেবারে মন্দও হ'ত না।"

"কি ভাল হ'ত শুনি ?"

"ভাল আর এমন কি হোত, চিরকেলে বৈরিগী মানুষ আবার বৈরিগী হোত।"

"কেন, তুমি কি আমাকে তোমার বাঁধন ব'লে মনে কর ?"

এক চুমুক চা তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ ক'রে সজোরে মাথা নেড়ে প্রমথ বললে, "আরে রাম রাম, তাও কখনো করি! তবে একেবারে করিয়ে নে যে, তা বলতে পারিনে। এক এক সময়ে বাঁধন ব'লেই মনে হয়, কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হয় বাঁধনটা আর একটু চেপে বসলেও মন্দ হয় না। মনের একটা এই রকম হ-য-ব-র-ল অবস্থা আর কি !"

সন্ধ্যা বললে, "এই হ-য-ব-র-ল অবস্থা থেকে তোমাকে মুক্তি দেবার উপায় আমার আছে জানো ?"

সন্ত্রস্ত মুখে প্রমথ বললে, "না, তা' ত জানিনে। আছে না-কি ? কি উপায় আছে ?"

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে উচ্ছলোদ্যত হাস্যের আভাসকে গোপন ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কেন নবদ্বীপে গোঁসাই-জির আশ্রম।"

প্রমথ বললে, "সর্বনাশ! ও-কথাটা এখনো ভোলো নি দেখছি! কিন্তু সেই আশ্রমেই যদি প্রবেশ করলে উষা, তা হ'লে বেচারা আমি কি অপরাধ করলাম বল ? তবে আশ্রমের পরিবর্তে যদি অন্য কোনো উপাদানের আশ্রয় নিতে তা হ'লে না হয়—" কথা সমাপ্ত না ক'রে প্রমথ বিহ্বল নেত্রে সোজাসুজি সন্ধ্যার দিকে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যা বললে, "চুপ ক'রে রইলে কেন ? 'তা হ'লে না হয়' কি বল ?"

প্রমথ বললে, "বলা অত্যন্ত কঠিন!" তারপর ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা ক'রে বললে, "তা হ'লে না হয় চোখ-মুখ বুজে কোনো রকমে সারা দেহে খানিকটা ভস্ম লেপন করা যেত !"

এ কথার কিন্তু উত্তর দেওয়ার সময় পাওয়া গেল না। বারান্দায় উঠবার সিঁড়ির নিকট হ'তে প্রিয়লালের প্রশ্ন শোনা গেল, "আসতে পারি ?"

"নিশ্চয় পার। তোমার কথাই ত উষাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম। এস, এস !" ব'লে প্রমথ প্রিয়লালকে সাগ্রহে আহ্বান করলে।

নিকটে এসে একটা চেয়ারে আসন গ্রহণ ক'রে প্রিয়লাল বললে, "বিশ্রম্ভালাপে কিন্তু বিঘ্ন উৎপাদন করলাম।"

প্রমথ বললে, "উৎপাদন যদি করে থাক তা হ'লে উষার ধন্যবাদভাজন হয়েছে, কারণ বিশ্রম্ভালাপটা ক্রমশঃ বাদানুবাদে পরিণত হ'য়ে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে, তুমি যদি আসতে আর মিনিটখানেক দেরি করতে তা হ'লে উষার হার অনিবার্য্য ছিল।"

প্রিয়লাল সহাস্য মুখে বললে, "কিন্তু দাম্পত্যকলহটা উপাদেয় জিনিস বলেই শোনা আছে। এমন কথাও শোনা আছে যে, সে কলহে বাহ্যতঃ যে হারে শেষ পর্য্যন্ত সে-ই

বেশি লাভবান হয়। সেই জিনিস থেকে ত আমি তোমাদের বঞ্চিত করলাম।"

প্রমথ বল্‌লে, "এ কথার আলোচনা পরে কোনো সময়ে করা যাবে, আপাততঃ তুমি সে বাহু পরাজয় থেকে উষাকে রক্ষা করেছ সেই কৃতজ্ঞতার বশীভূত হয়ে তিনি তোমাকে এক পেয়ালা গরম চা অফার করেন কি-না দেখা যাক্।"

"এ রকম কায়দা ক'রে কথা বল্‌লে মিসেস মুখার্জির পক্ষে অফার করাও শক্ত, না করাও শক্ত!" ব'লে প্রিয়লাল হাস্‌তে লাগল।

প্রমথর কথার ভনিতায় সন্ধ্যাও হেসে ফেলেছিল; বল্‌লে "এক পেয়ালা চা দোবো না-কি আপনাকে ডক্টার চৌধুরী?"

প্রিয়লাল বল্‌লে, "ষ্টেশন থেকে আসার পর ত' বড় এক গ্লাস সরবৎ দিয়েছেন, আবার এরই মধ্যে অসময়ে চা'র দরকার নেই।"

প্রমথ বল্‌লে, "চায়ের সময়-অসময় নেই, সব সময়েই তার সুসময়। তখন তুমি সরবৎ না খেয়ে এক পেয়ালা চা খেলে আরও ভাল করতে। চা-য়ের বিষয়ে গ্ল্যাড্‌ষ্টন্ কি বলতেন জান ত?"

স্মিতমুখে প্রিয়লাল বললে, "না।"

"গ্ল্যাড্‌ষ্টন বলতেন, 'If you are too hot, it will cool you. If you are too cold, it will warm you. If you are depressed, it will cheer you. If you are too excited, it will calm you.' বৃদ্ধ ভদ্রলোক চায়ের এত অনুরাগী ছিলেন যে, যে-কোনো সময়ে অথবা যে-কোনো স্থানে হোক না কেন, এক পেয়ালা চা কেউ দিলে কখনো তিনি অস্বীকার করতেন না।"

সহাস্যমুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "চা যদি এতই উৎকৃষ্ট বস্তু, তা হ'লে না-হয় এক পেয়ালা খাওয়াই যাক্।"

টি-পট থেকে সুতপ্ত চা ঢেলে একটা খালি পেয়ালা পূর্ণ ক'রে সন্ধ্যা প্রিয়লালের সম্মুখে স্থাপিত করলে।

চা পান করতে করতে প্রিয়লাল বল্‌লে, "আমি ত' আমার প্রতিশ্রুতি পালন করলাম প্রমথ,—এইবার আমাকে বিদায় দাও।"

প্রমথ বল্‌লে, "বেশ কথা; কিন্তু তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করলেই আমি তোমাকে বিদায় দোব, এমন কোনো প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম কি? তা ছাড়া, উপস্থিত ত' তুমি ভবঘুরের জীবন যাপন করছ, কিছু দিনের জন্যে না-হয় আমাদের এখানেই ডেরা-ডাণ্ডা বাঁধলে?"

এ কথার উত্তর দিলে সন্ধ্যা। প্রমথর দিকে চেয়ে বল্‌লে, "কিন্তু দেখ, ডক্টার চৌধুরীর কথাই ত শুধু নয়, ফয়জাবাদে ওঁর একটি বন্ধু ওঁকে নামিয়ে নেবার জন্যে ষ্টেশনে এসেছিলেন, ডক্টার চৌধুরী ফয়জাবাদে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে লাহোর যাবেন, তারপর সেখান থেকে আরও কয়েকজনে মিলে কাশ্মীর রওনা হবেন, এই কথা ওঁদের আছে। এ অবস্থায় ডক্টর চৌধুরীকে আর আটকে রাখা বোধহয় উচিত হবে না।"

এ কথার উত্তর দিলে প্রিয়লাল; বল্‌লে, "না, ঠিক তা নয়, কাশ্মীর যাওয়া কিছুদিন পেছিয়ে দিলে অথবা একেবারে পরিত্যাগ করলেও এমন কিছু ক্ষতি হবেনা,—তবে—"

প্রিয়লালের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রমথ বললে, "তবে এ কথার মীমাংসা পরে যা হয় করলেই হবে, উপস্থিত যতক্ষণ না খাবার তয়ের হচ্ছে চল, বাদাম গাছতলায় গিয়ে তিনজনে মিলে আড্ডা জমানো যাক।"

সন্ধ্যা বললে, "তোমরা দুজনে যাও। আমি ওদিকে তোমাদের খাবারের তাগিদে একটু যাই।"

প্রিয়লাল বললে, "কেন মিসেস মুখার্জি, আপনি তাগিদে না গেলে খাবারের যদি একটু দেরিই হ'য়ে যায় তা হ'লে ত আপনার সঙ্গ আমরা একটু বেশিক্ষণ পেয়ে লাভবানই হব। আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন না?"

প্রমথ বললে, "যুক্তি অতিশয় সারবান। কাটাবার বৃথা চেষ্টা কোরোনা উষা। হরিয়া!"

হরিয়া নিকটেই অপেক্ষা করছিল, সম্মুখে এসে বললে, "হুজুর?"

"বাদামতলায় তিনটে বেতের চৌকী দে।"

প্রভুর আদেশ পালনের জন্য হরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

৩৯

প্রমথর আসার পর আট দিন অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রিয়লালের যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি। এর মধ্যে কয়েক বারই সে যাওয়ার কথা তুলেছে বটে, কিন্তু তাকে নিরস্ত করতে প্রমথর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। স্তিমিত উত্তাপের অগ্নি সামান্য জলসিঞ্চনেই নিভে গেছে। বিদায়ের প্রস্তাবে সন্ধ্যাও আরো বার দুই প্রিয়লালের পক্ষ অবলম্বন ক'রে দেখছে যে, আলোচনার মধ্যে যে ব্যক্তি ক্রমশঃ প্রতিপক্ষের দিকে গিয়ে দাঁড়ায় তার পক্ষ অবলম্বন ক'রে তর্ক করা পণ্ডশ্রম মাত্র। সে জন্য সেও বিশেষ কিছু আর বলে না। তা ছাড়া, প্রমথ আসার পর থেকে গৃহকর্ম্মের অছিলায় দূরে দূরে থাকবার সুযোগও অনেকটা সে পেয়েছে।

একজন প্রতিবেশিনীর গৃহে কিসের একটা সামান্য উৎসব ছিল, সন্ধ্যা গিয়েছিল সেখানে নিমন্ত্রিত হ'য়ে। প্রিয়লালও বাড়ি ছিল না, কোনও একটা বিশেষ প্রয়োজনে তার এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল। একাকী প্রমথর ভাল লাগছিল না, একটা চিঠি লিখলে, সন্ধ্যার এসরাজ নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করলে, অবশেষে একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে একটা ইংরাজি উপন্যাসে মগ্ন হ'ল। কিছুক্ষণ পরে পদশব্দে চেয়ে দেখলে সাধুচরণ এসে নিকটে দাঁড়িয়েছে। বললে, "কি সাধু, কোনো কথা বলবি ?"

মাথা চুলকে একটু ইতস্ততঃ ক'রে সাধুচরণ বললে, "বলতেই ত' এসেছি, কিন্তু তুমি রাগ করবে না ত ?"

উপন্যাসের একটা পাতা উল্টে প্রমথ বললে, "রাগ করব কেন, কি কথা বলনা।"

আর একটু প্রমথর সম্মুখে এসে কণ্ঠের স্বর ঈষৎ নিম্ন ক'রে সাধুচরণ বললে, "ডাক্তার সায়েব যেতে চাইলে আটকোনি বাবা, তোমার ও ডাক্তার সায়েব ভাল লোক নয়।"

প্রমথ বললে, "কেন রে ডাক্তার সায়েব কি দোষ করলে, তোকে বকসিস-টকসিস পয়সা-টয়সা দেয় না বুঝি ?"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখ বিকৃত ক'রে সাধুচরণ বললে, "আরে রেখে দাও তোমার বকসিস আর পয়সা। তোমার মতো দেনেওয়ালা মুনিব থাকতে আমি কারো পয়সার তোয়াক্কা করি কি-না। তোমার কাছে চেয়ে কখনো কোনো জিনিস পাই নি, বলতে পার ?"

নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে প্রমথ বললে, "তা আসল কথাটা কি খুলে বল না ?"

'ডাক্তার সায়েবের চরিত্তির ভাল নয়।'

"তা তুই কি ক'রে জানলি ?"

বিস্ময়বিস্ফারিত মুখে সাধুচরণ বললে, "শোন কথা। দিবারাত্তির বাড়িতে রইছি আর জানব না আমি। দিন নেই রাত্তির নেই, সকাল নেই সন্ধ্যা নেই খালি মার পাছে পাছে ঘুরফির ঘুরফির। কানে কানে ফিস্‌ফাস্ ফিস্‌ফাস্। কেন্ রে বাপু, তুই বেটাছেলে, বাড়িতে এত বই রয়েছে, দু-চার খানা নিয়ে লেখাপড়া কর্ না। তা নয়, ফিস্‌ফাস্ ফিস্‌ফাস্।"

গম্ভীর মুখে প্রমথ বললে, "আচ্ছা সাধু, তুই যা।"

খানিকটা চলে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে সাধুচরণ বললে, "মার কি দোষ বল ? একে মেয়েমানুষ, তায় বাড়িতে দোস্‌রা বেটাছেলে নেই, কি করবে সে ছেলেমানুষে ? তুমি আসার পর তবু একটু কমিয়েছিল, আবার দুদিন থেকে লাগিয়েছে ফিস্‌ফাস্ ফিস্‌ফাস্। তুমি ডাক্তারসায়েবকে বিদেয় কর বাবা, আমি তোমাকে পষ্টো বল্‌ছি, ও লোক ভাল নয়।"

প্রমথ বললে, "আচ্ছা, হয়েছে সাধু, তুই এখন যা।"

গুন্‌গুন্ ক'রে কি বলতে বলতে সাধুচরণ প্রস্থান করলে।

চুরুটটা বোধহয় ভাল ক'রে তখন ধরেনি, পুনরায় নিভে গিয়েছিল, কি ভাবতে ভাবতে প্রমথ সেটা ছাইদানির মধ্যে ফেলে দিলে, বইটা মুড়ে পাশের তেপায়ায় রাখলে, তারপর চেয়ারের হাতলে পা দুটো লম্বা ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

মনের একটা দিক অন্ধকার হ'য়ে এসেছে,—দুঃখে, না নৈরাশ্যে, না অভিমানে, না অপমানে তা ঠিক বোঝা যায় না। অভিমানেই বোধ হয় বেশি। যতই বল না কেন, দুধের সাধ ঘোলে মেটে না! শাঁস পেলে কে আর খোসা চিবুতে চায় বল! তাই-না তার আট দিনের অনুপস্থিতির কাছে দীর্ঘ চার বৎসরের আরাধনা পরাস্ত হ'ল। মেকির বিরুদ্ধে খাঁটি চক্ষের নিমেষে জয়লাভ করলে।

তারপর কিন্তু ধীরে ধীরে প্রমথ তার সবল উদার অন্তঃ-করণকে টেনে খাড় করলে; মনে মনে সে বলতে লাগল, আহা, হাজার হোক স্বামী ত! রূপে গুণে অর্থে বিদ্যায় অমন স্বামীকে কি সহজে প্রত্যাখ্যান করা চলে! দুর্ব্বলতার বশে না হয় একটা অপরাধই ক'রে ফেলেছিল, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্তও ত' কম করেনি! অনুশোচনায় অনুশোচনায় প্রিয়লাল এখন নির্ম্মল হ'য়ে গিয়েছে, এখন তাকে গ্রহণ করলে সন্ধ্যাকে কোন দোষই দেওয়া যায় না। এ মিলন যাতে সংঘটিত হয় সে বিষয়ে সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। নিজের এক বিন্দু স্বার্থপরতা দিয়ে অপরের বৃহৎ মঙ্গলকে বাধা দেবেনা! সযত্নে প্রমথ তার অন্তরের একটি প্রচ্ছন্ন তন্ত্রীকে উপচিকীর্ষার সমুদার সুরে বেঁধে নিলে। অপরের কল্যাণ সাধনের মধ্যে নিজের সমস্ত কুটিল স্বার্থকে নিমজ্জিত কর, লুপ্ত কর!

রাত্রে আহারাদির পর শয়ন কক্ষে গিয়ে প্রমথ সন্ধ্যার কাছে কথাটা উত্থাপিত করলে; বললে, "উষা, তোমার সঙ্গে আমার একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আছে। আমার একান্ত অনুরোধ গভীর মনোযোগের সঙ্গে তুমি কথাটা শোনো।"

প্রমথর মুখের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা বিস্মিত হ'ল। সদানন্দ প্রমথর মুখে কৌতুকের নামগন্ধ নেই, তৎপরিবর্ত্তে তথায় একটা সুনিবিড় আন্তরিকতার স্তব্ধ প্রশান্তি। বুঝলে কথাটা নিতান্ত সামান্য নয়, জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা?"

কোনো প্রকার ভূমিকা না ক'রে প্রমথ সোজাসুজি বললে, "প্রিয়লাল আর তুমি মিলিত হও। উষা, আমি সব দিক বিবেচনা ক'রে দেখেছি, উপস্থিত অবস্থায় এর চেয়ে মঙ্গলের আর কিছুই হ'তে পারে না। প্রিয়লালের সঙ্গে এই আট দিনের কথাবার্ত্তায় বেশ বুঝতে পেরেছি তোমার অভাবে সে পাগলের মত হ'য়ে আছে। তোমার যথার্থ পরিচয় পেলে সে যে আকাশের চাঁদ হাতে পাবে, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। একদিন দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হ'য়ে সে তোমার প্রতি একটা অপরাধ করেছিল বটে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগা বাঙলা দেশের স্বামীদের পক্ষে সে যে খুব একটা অসাধারণ অপরাধ, তা নয়। কিন্তু বস্তুতঃ যত বড়ই অপরাধ হোক না কেন, তার প্রায়শ্চিত্তও সে যথেষ্ট করেছে,—এখন যদি তুমি তাকে গ্রহণ কর, তা হ'লে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তোমার কোনো অপরাধই হয় না। আমার কথা যদি তোলো, আমি চিরদিনই তোমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়ে থাকব। তোমার আমার মধ্যে যে আত্মীয়তা, তা আর কিছুতেই যাবার নয়। কখনো আমি তোমাদের কাছে গিয়ে বাস করব, কখনো বা তোমরা দুজনে এসে আমার কাছে বাস কোরো। কোনো দিকই তোমার হারাতে হবে না উষা। এর জন্যে আমার পক্ষ থেকে যা কিছু বলবার বা করবার দরকার হবে তা আমি নিশ্চয়ই করব, কিন্তু প্রথমটা তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'লেই ভাল হয়। কাল বেলা এগারটার ট্রেনে আমি অভয়ের সঙ্গে দেখা করতে রায়বেরিলী যাব, ফিরব সন্ধ্যা সাতটার গাড়িতে। তুমি তার মধ্যে সুবিধা মতো কোনো সময়ে প্রিয়লালকে তোমার যথার্থ পরিচয় দিয়ো। এ ছাড়া তোমাকে কিছুই করতে হবে না, আর যা করবার সবই সে করবে। কেমন, রাজি ত?—উষা?"

একবার চকিতে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা।"

সন্ধ্যার উত্তর শুনে প্রমথ মুখে বললে বটে, "বেশ, বেশ, ভারি খুসী হলাম।" কিন্তু মনের মধ্যে এমন প্রবল একটা আঘাত পেলে যার তুলনায় সাধুচরণের অভিযোগ শুনে কিছু পূর্ব্বে যে আঘাত পেয়েছিল তা নগণ্য। এত শীঘ্র, এত সহজে 'আচ্ছা'? তার আগে দুটো চারটে চক্ষুলজ্জার দুর্ব্বল 'না'-ও নয়! কেনরে বাপু, পালিয়ে ত যাচ্ছিল না! আমি ত নিজেই হাতে তুলে দিচ্ছিলাম! আশ্চর্য্য মেয়েমানুষের কঠিন আত্ম-পরায়ণ মন!

আর বিশেষ কিছু কথাবার্ত্তা হ'ল না, প্রমথ তার শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সমস্ত রাত্রি কাট্‌ল খণ্ডিত নিদ্রায়। ঘুম আসে না শীঘ্র, এলেও ভেঙে যায় শীঘ্র। কিসের যেন একটা দুর্নিবার অস্বস্তি নিদ্রার জন্য মনকে স্তব্ধ হতে দেয় না। বিরক্ত হ'য়ে প্রমথ যখন শয্যা ত্যাগ করলে তখন প্রত্যুষের আলো সবে মাত্র ঘরে প্রবেশ করেছে। নিদ্রিতা সন্ধ্যার কাছে গিয়ে সেই নিষ্প্রভ আলোকে চেয়ে দেখলে তার মুখে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত-

তার প্রশান্তি। মনে মনে বললে, বল কি! চার বৎসরের অবরুদ্ধ দুঃখের আজ অবসান! এ কি সহজ কথা!

নিজের কথাটা মনে হ'তে বললে, তা কি করা যাবে! সুখসৌভাগ্য ত আর নিজের তালুকের জিনিষ নয় যে পেয়াদা পাঠিয়ে আমদানি করলেই হ'ল! তবু অবুঝ মনের মধ্যে রিক্ততার একটা মর্ম্মন্তুদ গ্লানি থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে!

আর একবার সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করতে চোখে জল ভ'রে এল। এই স্বর্ণপ্রতিমাকে আজ নিজের হাতে বিসর্জ্জন দিতে হবে! একটা রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মুক্তিলাভ করলে। টেবিলের উপর থেকে সিগারকেস আর দেশালাইয়ের বাক্স নিয়ে প্রমথ বারান্দায় গিয়ে বস্‌ল।

৪০

বৈকালে চা পানের পর প্রিয়লাল বললে, "গোমতীর ধারে একটু বেড়াতে যাবেন মিসেস মুখার্জ্জি? তারপর সাতটার সময়ে একেবারে ষ্টেশন থেকে প্রমথকে নিয়ে ফিরলেই হবে?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি মনে করছিলাম বাগানে বাদামগাছ তলায় গিয়ে একটু বসলে হয়,—আপনাকে একটা কথা বলবার আছে।"

সকৌতূহলে প্রিয়লাল জিজ্ঞাসা করলে, "কথা? —কি কথা?"

সন্ধ্যা বললে, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসছি।" ব'লে সে নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে, তারপর দেরাজ খুলে ছোট একটা বাক্সের ভিতর থেকে একটা আংটি বার ক'রে বস্ত্রাঞ্চলে বেঁধে নিলে। এ সেই প্ল্যাটিনমের অভিজ্ঞান আংটি বিবাহের কয়েকদিন পরে যা সে প্রিয়লালের কাছ থেকে পেয়েছিল। অলঙ্কার ভাগের সময়ে চিত্রাঙ্কিত ব'লে এবং রৌপ্য নির্ম্মিত মনে ক'রে এ আংটি আর কেউ গ্রহণ করতে স্বীকৃত না হওয়ায় গফুরই গ্রহণ করে, এবং খুব সম্ভবতঃ সন্ধ্যার স্বামীর চিত্র মনে ক'রে পরে সে আংটি আমিনা গফুরের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেয়। বৎসর দুই পূর্ব্বে দৈবযোগে দিল্লী ষ্টেশনে আমিনার ভাই নাসিরউদ্দীন একটি গাড়িতে সন্ধ্যাকে দেখ্‌তে পেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে এবং কথায় কথায় লক্ষ্ণৌর ঠিকানা জেনে নেয়। তার কিছুদিন পরে আমিনার নিকট হ'তে সন্ধ্যা ডাকযোগে এই আংটি এবং একটি চিঠি পায়। সেই থেকে এপর্য্যন্ত এ আংটি বাক্সে বন্ধ হয়ে ছিল।

প্রিয়লালের কাছে উপস্থিত হয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "চলুন ডক্টার চৌধুরী।"

সন্ধ্যার আদেশে পূর্ব্ব থেকেই বাদামগাছ তলায় দুটো বেতের চেয়ার রাখা ছিল, উভয়ে গিয়ে তৎতায় উপবেশন করলে।

প্রিয়লালের ঔৎসুক্য বিরতি মানছিল না, ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা মিসেস মুখার্জ্জি?"

একটু চুপ ক'রে থেকে ইতস্ততঃভাবে সন্ধ্যা বললে, "কথাটা বড়ই অভদ্র, ভারি রূঢ়। আজ সমস্ত দিন ধ'রে ভেবেচি কি ক'রে সে কথাটা আপনাকে বলি,—অথচ না ব'লেও উপায় নেই।"

অধীর উৎকণ্ঠায় প্রিয়লাল বল্‌লে, "নিশ্চয় বলবেন! অসঙ্কোচে বলুন!"

সন্ধ্যা মনে মনে নিজেকে কতকটা প্রস্তুত ক'রে নিলে, তারপর প্রিয়লালের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে বললে, "দেখুন আপনি আমাদের মান্য অতিথি, আপনার প্রতি কোন রকম অসম্মান অথবা অবহেলা দেখানো আমাদের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। কিন্তু তবুও অবস্থার অনুরোধে আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের এ বাড়িতে আপনার আর না থাকাই ভাল। একমাত্র সংসারের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে যে রূঢ় কথা আপনাকে বলতে হ'ল আপনি আপনার সহৃদয়তায় অনুগ্রহ ক'রে তা ক্ষমা করবেন।"

দারুণ বিস্ময়ে এবং দুশ্চিন্তায় প্রিয়লালের মুখ একেবারে পাংশু হ'য়ে গেল; বিহ্বলভাবে বললে, "কেন মিসেস মুখার্জ্জি, আমার কোনো আচরণ কি আপনার প্রতি গর্হিত হয়েছে?"

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না, না,—একেবারেই না। আপনার আচরণের মধ্যে অন্যায়ের নামগন্ধ নেই।"

"তবে?"

উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা অন্যদিকে চেয়ে নিঃশব্দে কি চিন্তা করতে লাগ্‌ল।

প্রিয়লাল বল্‌লে, "এ কথা অবশ্য আমি বুঝতে পারি যে,

অকারণে এ রকম ক'রে আপনাদের বাড়ি প'ড়ে থাকা আমার উচিত হচ্ছে না। কিন্তু অন্য লোকে যা-ই ভাবুক না কেন মিসেস মুখার্জ্জি, আপনি ত ভাল ক'রেই জানেন যে, অকারণ এ একেবারেই নয়। আপনার মধ্যে এমন অপার্থিব সম্পদের সন্ধান আমি পেয়েছি, যা থেকে দূরে থাকা আমার পক্ষে অতিশয় কঠিন হ'য়ে উঠেছে। সেই জন্যে আমি স্থির করেছি এখানে আমার থাকবার মত ছোট-খাটো একটা বাড়ি ক'রে নোব। কাল বিকেলবেলা আমার এক বন্ধুর সাহায্যে একটা জমি প্রায় স্থির ক'রেও এসেছি। কলকাতায় ত' আমার বাড়ি আছেই, এখানে একটা বাড়ি হ'লে আর কোনো অসুবিধে থাকবে না। আপনাদের আরও পাঁচজন বন্ধুবান্ধব যেমন মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসেন, আমিও তেমনি এক আধ ঘণ্টার জন্যে আস্‌ব। আশা করি, তাতে এমন-কিছু আপত্তি হবেনা মিসেস্ মুখার্জ্জি ?"

সন্ধ্যাদের কাছে কাছে প্রিয়লালের বাস করবার এমন পাকা ব্যবস্থার কথা শুনে সন্ধ্যা চিন্তিত হ'য়ে উঠ্‌ল। অনুনয়ের গভীরকণ্ঠে সে বল্‌লে, "আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ডক্টার চৌধুরী ?"

"কি অনুরোধ বলুন ?"

যে জিনিষ একেবারে চিরদিনের জন্যে শেষ হয়ে চুকে গেছে ব'লে আপনি জানেন, তার স্মৃতি দিয়ে নিজেকে এতটা পীড়ন করবেন না। আপনি সন্ধ্যাকে ভুলতে চেষ্টা করুন, আর সে জন্যে আমার আকৃতি যদি বাধা মনে হয় তা হ'লে আমার নিকটেও কথনই আর আসবেন না। আমাকে দিয়ে আপনার এ কষ্টকর স্মৃতি এমন ক'রে জাগিয়ে রেখে কোনো লাভ নেই। যে জীবন সমস্তই আপনার পড়ে রয়েছে, তা এমন ক'রে নষ্ট করবার জিনিষ নয় !"

সন্ধ্যার এ কথাকে একান্তই অবান্তর এবং অসার বিবেচনা ক'রে শুধু সামান্য একটু মৃদু হাস্যের দ্বারা প্রিয়লাল এর উত্তরের সমাপ্তি করলে, তারপর ব্যগ্রকণ্ঠে বল্‌লে, "কিন্তু আপনি ত' আপনার আসল কথা স্পষ্ট করে এ পর্য্যন্ত বল্‌লেন না মিসেস্ মুখার্জ্জি ?"

স্তব্ধ হয়ে সন্ধ্যা ক্ষণকাল নীরবে ব'সে রইল, তারপর মৃদু ব্যথিত কণ্ঠে কতকটা নিজের মনেই বল্‌লে, "দরকার না হ'লে সে কথাটা বল্‌ব না মনে করেছিলাম, এখন দেখছি না ব'লে উপায় নেই। কথাটা চিরদিনের মতো শেষ ক'রে নেওয়াই ভাল।"

"কী সে এমন কথা মিসেস্ মুখার্জ্জি ?"

সহসা সন্ধ্যার মুখ জবাফুলের মতো আরক্ত হ'য়ে উঠল। চকিত বিহ্বলনেত্রে সে একবার প্রিয়লালের দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর কঠিন কশাঘাতে নিজের চিত্তকে উদ্দীপ্ত ক'রে নিয়ে বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধা আংটিটা খুলে প্রিয়লালের হাতে দিয়ে বললে, "এ আংটিটা আপনার মনে পড়ে ?"

আংটিতে দৃষ্টিপাত ক'রেই প্রিয়লাল চমকে উঠল; মনে পড়তে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হল না; ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "এ আপনি কোথায় পেলেন ?"

"একদিন আপনার কাছেই পেয়েছিলাম।"

"আমার কাছে পেয়েছিলেন ?" তারপর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু নেত্রে এক মুহূর্ত্ত সন্ধ্যার মুখে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল চীৎকার ক'রে উঠল, "কিঃ !—তুমি সন্ধ্যা ?"

"আমি সন্ধ্যা।"

"কিন্তু আমি যে জানি সে বেঁচে নেই ?"

"না থাকলেই ভাল ছিল, কিন্তু এখনো বোধহয় অনেক দুঃখ দিতে আর পেতে বাকি আছে, তাই সে হতভাগিনী আজও বেঁচে রয়েছে।"

উত্তেজনায় প্রিয়লালের দুই চক্ষু হ'তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিল। দুই হাত দিয়ে সজোরে সন্ধ্যার একটা হাত চেপে ধ'রে বললে, "বাজে কথা বন্ধ কর ! সত্যি ক'রে বল তুমি সন্ধ্যা কি-না !"

"হ্যাঁ, সত্যিই আমি সন্ধ্যা।"

বার কয়েক সন্ধ্যার হাতটায় প্রবল ভাবে নাড়া দিয়ে প্রিয়লাল বললে, "তবে মিথ্যে কথা রটিয়ে আমাকে পাগল ক'রে দিয়েছিলে কেন ? কী আমি এত বড় অপরাধ করেছিলাম তোমার কাছে !"

দুঃখার্ত্ত নেত্রে প্রিয়লালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি ত' ও কথা রটাইনি। আপনার মুখেই আমি প্রথমে ও কথা শুনতে পাই।"

"তার আগে তুমি কিছু জানতে না ?"

"কিছু না।"

বাষ্পের অত্যধিক চাপে বয়লার যেমন ক'রে কাঁপে, বিস্ময় বেদনা দুঃখ আনন্দের যুক্ত তাড়নায় তেমনি ভাবে প্রিয়লালের সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগল। সহসা সন্ধ্যার হাত ছেড়ে দুই বাহু দিয়ে সজোরে নিজের বুকখানা চেপে ধ'রে চেয়ারের হাতলে মাথা স্থাপিত ক'রে বহুক্ষণ সে প'ড়ে রইল। অবরুদ্ধ ক্রন্দনের তাড়নায় মাঝে মাঝে পিঠখানা কেঁপে উঠছিল। অবশেষে অতিকষ্টে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগকে কতকটা সংযত ক'রে মুখ তুলে চোখ মুছে আর্তকণ্ঠে ডাকলে, "সন্ধ্যা!"

আর্দ্র জিজ্ঞাসু নেত্রে সন্ধ্যা প্রিয়লালের দিকে চেয়ে দেখলে।

"তুমি কি তোমার হতভাগ্য স্বামীকে ক্ষমা করতে পারবে সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বললে, "ক্ষমা করবার ত কিছুই আর নেই। যদিই বা কিছু ছিল, আপনার সঙ্গে এই পনেরো ষোলো দিনের পরিচয়ে তা একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

"তবে তুমি আজ রাত্রেই আমার সঙ্গে কলকাতায় চল।"

"কেন?"

"আমার লক্ষ্মীহীন গৃহে লক্ষ্মীপ্রতিষ্ঠা করব; মা তোমাকে পেয়ে হাতে স্বর্গ পাবেন।"

সন্ধ্যা এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললে, "না, তা হয় না। তা কেমন ক'রে হবে? এঁকে ছেড়ে আর কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

প্রিয়লালের মুখ মলিন হ'য়ে উঠল; বললে, "বুঝেছি। এ কথাটা আমার আগে মনে হয়নি। তুমি কি তা হ'লে প্রমথর বিবাহিতা স্ত্রী?"

সন্ধ্যা বললে, "না।"

"কোনো প্রচলিত পদ্ধতিতে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি?"

"না, তা হয়নি।"

উৎফুল্ল মুখে প্রিয়লাল বললে, "তবে আমার সঙ্গে যেতে তোমার বাধা কোথায় সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বললে, "বিয়ে না হ'লেই বাধা থাকতে নেই, এ আপনি কেমন ক'রে বলছেন?"

সন্ধ্যার এই সুদৃঢ় প্রশ্নে সহসা ধৈর্য্য হারিয়ে ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "প্রমথর সঙ্গে তোমার যখন কোনো সামাজিক বন্ধনই নেই তখন তাকে ছেড়ে যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই বা কেমন ক'রে বলছ?"

সন্ধ্যা মনে মনে একটু কি ভেবে নিলে, তারপর শান্ত সংযত কণ্ঠে বললে, "সামাজিক বন্ধন বলতে কি বোঝায় আমি তা ঠিক জানিনে, কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমার যে বন্ধন কোনো বন্ধনেরই চেয়ে তা যে কম দৃঢ় নয়, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। কি দুর্দ্দিনে কি দুঃসময়ে উনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন আপনি হয় ত তার সবটা জানেন না। সামান্য এক'টা সতেরো আঠারো বৎসরের মেয়ে,—কিন্তু বাপ মা শ্বশুর শাশুড়ি স্বামীর কাছে দাসী হয়ে থাকবারও আশ্রয় পেলাম না। অগত্যা মুখুজ্জে মশাইয়ের সঙ্গে আবার জামসেদপুরেই ফিরে গেলাম। কিন্তু কী যে মিথ্যা সন্দেহ সবিতা দিদির মনের মধ্যে ঢুকল, সমস্ত বাড়িটা অশান্তিতে বিষিয়ে গেল। অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলাম। আত্মহত্যা যে অবস্থায় আর পাপ থাকে না, সেই অবস্থা হ'ল আমার। ঠিক সেই সময়ে আমার জীবনের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা অনুভব ক'রে স্বয়ং উপযাচক হ'য়ে ইনি আমাকে আশ্রয় দিলেন। সে কি সহজ আশ্রয় দেওয়া! আদরে যত্নে শ্রদ্ধায় সম্মানে এমন ক'রে তুললেন যেন নিজেই একটা আশ্রয় পেলেন, মুখে বলতেনও সেই রকম কথা! মানুষের ওপর অশ্রদ্ধা হ'য়ে আসছিল, এমন সময়ে মানুষ যে এত বড়ও হয় দেখতে পেয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম! তারপর এই দীর্ঘ চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যেও তাঁর সে ভাবের ব্যতিক্রম হয়নি। কি মর্য্যাদা যে আমাকে দিয়েছেন তা আপনাকে কি বলব! আজ আমি তাঁকে ছেড়ে চ'লে যাই কেমন ক'রে? ন্যায় নেই? বিশ্বাস নেই? ধর্ম্ম নেই?—আপনিই বলুন!"

কলহের লঘু কণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "ধর্ম্মের কথা বলছ, কিন্তু ধর্ম্ম ত' আমারই দিকে। তোমার সঙ্গে যে একদিন আমার বিয়ে হয়েছিল সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?"

সন্ধ্যা বললে, "ভুলিনি, সে কথা পরে বলছি। আচার অনুষ্ঠান পালনের একটা ধর্ম্ম আছে তা অস্বীকার করছিনে, কিন্তু আমি যে ধর্ম্মের কথা বলছিলাম তা আরও অনেক

বড়। সে ধর্ম্ম মানুষের অন্তরের আদিম ধর্ম্ম, যার প্রভাবে ক্রমশঃ মানুষের যাকিছু আচার অনুষ্ঠান সমস্তই সৃষ্টি লাভ করেছে। তারপর বিয়ের কথা আপনি তুলেছেন, কিন্তু বিয়েকে ত আমরা একটা সত্যিকারের বন্ধন ব'লে মানিনে ?"

"কেন মানিনে ?"

"আমি ত সেই বন্ধনের দাবীতেই আপনার কাছে আশ্রয়ের জন্যে গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনি ত' আমার সে দাবী অগ্রাহ্য করেছিলেন।"

"অগ্রাহ্য করিনি, স্থগিত করেছিলাম।"

"দরকারের সময়ে স্থগিত করা মানেই অগ্রাহ্য করা নয় কি ?"

যুক্তিতে সন্ধ্যার নিকট পরাজিত হ'য়ে প্রিয়লালের ক্রোধ বেড়ে উঠ্‌ল ; যুক্তি-তর্কের পথ পরিত্যাগ ক'রে তীব্র কণ্ঠে সে বললে, "তুমি ত' প্রমথর বিবাহিতা স্ত্রী নও, তবে মিসেস মুখার্জ্জি সম্বোধনে সাড়া দাও কেন ? এ পরিচয় কি তোমার মিথ্যা পরিচয় নয় ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "এ পরিচয় আমার যতটা মিথ্যা পরিচয় তার চেয়েও অনেক বেশি সত্যি। উনি আমাকে এমন আপনার ক'রে নিয়েছেন যে, আমাকে মিসেস মুখার্জ্জি ব'লে ডাকলে বিশেষ কিছু অন্যায় করা হয় না। মিসেস্ মুখার্জ্জির ষোল আনা মর্য্যাদা উনি আমাকে দিয়েছেন।"

প্রিয়লাল ক্রোধে জ্বলে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "মর্য্যাদা, মর্য্যাদা ত' তুমি তখন থেকে খুব করছ, কিন্তু প্রমথ তোমাকে কি মর্য্যাদা দিয়েছে জানো ?—রক্ষিতার মর্য্যাদা সে তোমাকে দিয়েছে। তুমি প্রমথর রক্ষিতার একবিন্দু বেশি কিছু নও !"

শান্ত কণ্ঠে সন্ধ্যা বল্‌লে, "সত্যিই তা নয় ত আর কি ? কিন্তু তিনি এত উদার, এত মহৎ যে, আমি তাঁর রক্ষিতা শুনে একটুও অপমানিত বোধ করছিনে। তিনি আমাকে না রাখলে, কি দুর্গতি যে হোত তা কে জানে !"

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে প্রিয়লাল বল্‌লে, "আমার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ তুমি যখন অস্বীকার করছ তখন তোমার মাথায় সিঁদুর কেন, হাতে লোহা কেন ? এ সব পরিহাস কিসের জন্যে ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "এ সব বাঙ্গালা দেশের মেয়েদের ভারি গোলমেলে কথা, এ আপনি বুঝ্‌তে পারবেন না। আমিও আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। এ সব আলোচনা না করাই ভাল।"

দুঃখে, নৈরাশ্যে, অপমানে, অভিমানে পীড়িত হ'য়ে প্রিয়লাল কিছুক্ষণ যে-দিক থেকে পারলে সন্ধ্যার সহিত এই ভাবে বচসা করলে। তারপর কিছুকাল স্তব্ধ হ'য়ে নীরবে বসে রইল। অবশেষে মর্ম্মন্তুদ দুঃখটা আর একবার প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল ; বল্‌লে, "তা হ'লে কি আমার কোনো আশাই নেই সন্ধ্যা ? আমার অনুরোধে প্রমথ যদি স্বেচ্ছায় তোমাকে ছেড়ে দেয় ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "এই যে এতক্ষণ এ সব আলোচনা হ'ল এ ত' তাঁরই অনুরোধে। আপনার কাছে আমার যথার্থ পরিচয় দিয়ে আপনার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ ক'রে তিনি রায়বেরিলী গেছেন।"

"তবে ?"

"তবে—কি ?"

"তবে তুমি আমার সঙ্গে যাবেনা কেন ?"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "দেখুন, তিনি যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন ব'লে আমি যা ভাল বুঝ্‌ব তা করবনা, তা' ত আর হয় না। তা ছাড়া, যে জিনিস একেবারে অন্যের হ'য়ে গিয়েছে তা আর আপনার কোন্ কাজে লাগ্‌বে বলুন ?"

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "বুঝেছি, আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। তুমি আমাকে আজ যে প্রচণ্ড আঘাত দিলে সন্ধ্যা, আমি তা ক্ষমা ক'রে গেলাম এই মনে ক'রে যে, একদিন আমিও তোমাকে নিশ্চয় এমনি আঘাতই দিয়েছিলাম, সুতরাং তোমার প্রতিশোধ নেওয়ায় আমি আপত্তি করতে পারিনে।"

বেদনায় সন্ধ্যার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল ; দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে বললে, "একেবারেই নয়, একেবারেই নয় ! প্রতিশোধের কোনো কথা এর মধ্যে নেই। আপনি বিশ্বাস করুন, আলোচনার অনুরোধে যেটুকু বলতে বাধ্য হ'য়েছি, শুধু তাই বলেছি, তার বেশি কিছুই বলিনি। তবু নিজের বাড়ি ব'সে আপনাকে যে এই ব্যথা দিতে হ'ল তার জন্যে আমার মনে

দুঃখের শেষ নেই। আপনি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার ওপর আমার মনে বিন্দুমাত্র রাগ, দুঃখ বা অভিমান নেই। আপনি শান্ত হোন, সুখী হন, একান্ত মনে সেই প্রার্থনাই করি।"

"ধন্যবাদ!" ব'লে প্রিয়লাল উঠে দাঁড়াল; তারপর পুনরায় চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললে, "আজ রাত্রে এগারটার গাড়িতে আমি এলাহাবাদ যাব। আমার যাওয়ার জন্যে যেটুকু ব্যবস্থার দরকার তা ক'রে দিয়ো।"

সন্ধ্যা বললে, "আজই তাড়াতাড়ি যাবার এমন কি দরকার আছে, সুবিধে মতো একদিন গেলেই হবে।"

প্রিয়লাল বললে, "না, আজ আমার কোনো অসুবিধে নেই।"

সন্ধ্যা আর কিছু বললেনা, চুপ ক'রে রইল।

প্রিয়লাল বললে, "আর একটা কথা সন্ধ্যা। এ-সব বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজনও নেই, তা ছাড়া, আমার পক্ষে তা রুচিকরও হবে না। প্রমথ এলে এ প্রসঙ্গটা আর একবার ওঠবার সম্ভাবনা আছে। সেটা যদি আর না ওঠে, আমি তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হব।"

সন্ধ্যা বললে, "নিশ্চয়ই উঠবেনা, আমি ওঁকে মানা ক'রে দোবো।"

প্রিয়লাল বললে, "এবার আমি আমার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চললাম,—খানিকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থাকব। তোমাকে এখনো তুমি আর সন্ধ্যা বলছি ব'লে অন্যায় করছি এমন যদি মনে কর, তা হ'লে আবার তোমাকে মিসেস্ মুখার্জ্জি ব'লে ডাকতে আমি প্রস্তুত আছি।"

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, "না, আপনি আমাকে সন্ধ্যা বলেই ডাকবেন।"

আর কিছু না ব'লে প্রিয়লাল চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে চ'লে গেল।

৪২

অভিনয় হ'য়ে গেল শেষ!

বেচারা সন্ধ্যার উপর দিয়ে যে ঝড় ব'য়ে গেল তাতে যদি সে একটু নুয়ে প'ড়ে থাকে, সুধী পাঠক, তা'কে ক্ষমা কোরো। কল্পিত অভিনয় দেখে আমরা কেঁদে আকুল হই, আর এ ত সে করলে নিজের বাস্তব জীবনের মধ্যে প্রধান ভূমিকার মর্ম্মান্তিক অভিনয়! যে স্বামীকে পাবার জন্যে একদিন সে উন্মাদিনী হয়েছিল, আজ তাকে হাতের মধ্যে পেয়েও নিজের হাতেই বিদায় করলে। এ কাজ যে কত বড় কঠিন কাজ, তা জগতের সমস্ত স্বামী-সৌভাগ্যশালিনী স্ত্রীলোক অনুভব করবে।

স্বীকার করি, এ হয়ত সে করলে তার ন্যায়নিষ্ঠ বিশ্বাস-পরায়ণ বিচারশীল মনের দৃঢ়তায়,—কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের যে আর-একটা অবুঝ দুর্ব্বল মন আছে, যার ধর্ম্ম দুঃখে কষ্ট পাওয়া, আঘাতে অনুভব করা, সমবেদনায় বিহ্বল হওয়া তা-ও অস্বীকার করতে পারিনে। কর্ত্তব্য আমরা করি, কিন্তু সময়ে সময়ে তার মূল্যও এম্নি ক'রেই পরিশোধ করতে হয়। প্রমথর প্রতি বিশ্বাসপরায়ণতার মহিমায় ক্ষত হয়ত এ ব্যাপার লঘু হ'য়ে যাবে, কিন্তু আজ যে এর আঘাত প্রচণ্ড, তা কেমন ক'রে অস্বীকার করি!

রায়বেরিলী থেকে প্রমথ যখন প্রত্যাবর্ত্তন করলে তখনো প্রিয়লাল তার নিজের ঘরে, আর সন্ধ্যা বাদামগাছ তলায়। মাত্র দুটি লোক ত দুদিকে স্তব্ধ হ'য়ে আছে, কিন্তু সমস্ত বাড়িটা যেন নিঃশব্দতার চাপে থম্‌থম্ করছে। প্রিয়লালকে বিরক্ত করতে প্রমথ সাহস করলে না, সন্ধ্যার উদ্দেশ্যে বাদাম-গাছ তলার দিকে খানিকটা অগ্রসর হতেই দেখ্‌লে সন্ধ্যা আসছে। মোটারের শব্দ পেয়ে প্রমথ এসেছে বুঝতে পেরে সে আসছিল।

সন্ধ্যা নিকটে আসতে প্রমথ বললে, "চল, একটু ওখানে গিয়েই বসি।"

সন্ধ্যা বললে, "চল।"

দুজনে গিয়ে বাদামগাছ তলায় দুটো চেয়ারে উপবেশন করলে।

অনুমানে-আন্দাজে কথাটা অনেকখানিই বোঝা গিয়েছিল, তথাপি প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "প্রিয়লালকে তোমার পরিচয় দিয়েছিলে উমা?"

"দিয়েছিলাম।"

"কি বললে সে?"

"উনি আজ রাত্রে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন।"

"তুমি কি তাহ'লে প্রিয়লালকে গ্রহণ করলে না?"

"না।"

"প্রিয়লাল কি বল্‌লে ?"

"সে অনেক কথা, আর একদিন বলব অখন।"

এক নিমেষেই প্রমথ সন্ধ্যার অন্তরের সমস্ত বেদনাটা অনুভব করলে। বললে, "তাই বোলো।" মনের মধ্যে নিজের দিক দিয়ে যে তীব্র আনন্দটা জেগে উঠ্‌ল, আপাততঃ তা প্রিয়লালের প্রতি দুঃখ এবং সমবেদনার মধ্যে বাসা বাঁধলে।

দুজনে বহুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে পাশাপাশি বসে রইল। সতেরো আঠারো দিন পূর্ব্বে আর একদিন তারা ভারতী আশ্রম থেকে ফিরে ঠিক এমনি ক'রেই বসেছিল। সেদিন যেন হয়েছিল তাদের বিবাহ অনুষ্ঠান, আজ যেন সেই বিবাহের কুশণ্ডিকা। কিন্তু কি করুণ, কি মর্ম্মভেদী !

মাধব এসে বললে, "মা খাবার দেওয়া হয়েছে।"

প্রমথর দিকে দৃষ্টিপাত করে সন্ধ্যা বল্‌লে, "খাবে চল।"

যেতে যেতে সন্ধ্যা বললে, "দেখ, এ প্রসঙ্গ আর ওঁর কাছে একেবারে তুলো না। উনি নিজেই এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছেন।"

শুনে প্রমথ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে। অনির্ব্বচনীয় বেদনার বস্তুকে কি বচন দিয়ে প্রকাশ করবে, মনে মনে তা ভেবে তার মত বাক্‌পটু ব্যক্তিও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। বললে, "না, তুলব না।"

প্রিয়লালের ঘরের দ্বারের কাছে উপস্থিত হ'য়ে প্রমথ ডাকলে, "প্রিয়লাল, খাবার দিয়েছে, খাবে এস।"

টেবিলে প্রমথ এবং প্রিয়লাল দুজনের খাবার দিয়েছিল, উভয়ে আহারে উপবেশন করল। অখণ্ড মৌনের মধ্য দিয়ে অবিলম্বে আহার সমাপ্ত হ'ল। সন্ধ্যা কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ এবং যত্নের সহিত অল্প কথার অনুরোধে-উপরোধে যতটা পারলে প্রিয়লালকে খাওয়ালে।

আহারের পর বারান্দায় এসে তিন জনে তিনটে চেয়ারে উপবেশন করলে। তখনো তিনজনের মধ্যে কথাবার্ত্তা কিছুই হল না। যে বেদনা যে অনুভূতি সম্পূর্ণ ভাবে বাক্যের অতীত, তা তিন জনেরই মনের মধ্যে অবরুদ্ধ হ'য়ে আটকে রইল। এইরূপ ভাবে বহুক্ষণ কেটে গেল।

যথাকালে মোটর এসে বারান্দার সম্মুখে দাঁড়াল। কিছু পূর্ব্বে বসন্ত চৌবে ঘোড়ার গাড়ি ক'রে প্রমথর জিনিস পত্র নিয়ে ষ্টেশনে গিয়েছিল। বারান্দা থেকে নেমে তিনজনে মোটরের নিকট উপস্থিত হ'ল।

মোটরের দরজা খুলে প্রমথ বল্‌লে, "ওঠ প্রিয়লাল।" প্রিয়লাল উঠে বসলে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি ওঠ।" তারপর নিজে সন্ধ্যার পাশে উঠে বসল। তিনজনে পাশাপাশি ব'সে অটুট নীরবতার মধ্য দিয়ে সমস্ত পথটা অতিক্রম ক'রে ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হ'ল।

এ ট্রেনটা লক্ষ্ণৌ থেকেই ছাড়ে। একটা ফার্ষ্টক্লাস কম্পার্টমেণ্টে প্রমথর জিনিসপত্র তুলে দিয়ে বসন্ত চৌবে নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রিয়লাল তার হাতে কয়েকটা নোট দিয়ে বললে, 'এলাহাবাদের একটা টিকিট কিনে নিয়ে এস।"

ট্রেন ছাড়বার একটু আগে প্রিয়লাল গাড়িতে উঠে দরজার সামনে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দৃষ্টি তার সম্মুখ দিকে প্রসারিত, কিন্তু কী যে দেখচে তা বোঝা যায় না। নীচে প্ল্যাটফর্ম্মে সন্ধ্যা এবং প্রমথ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

গার্ড হুইস্‌ল দিলে, সবুজ বাতি দেখালে। ড্রাইভার হুইস্‌ল দিলে, তারপর গাড়ি দুলে উঠল। তখনো প্রিয়লাল সেই ভাবে তাকিয়ে রয়েছে।

নিকটে এসে প্রমথ প্রিয়লালের দিকে দক্ষিণ বাহু প্রসারিত ক'রে দিয়ে বললে, "যখনি ইচ্ছে হবে, আমাদের কাছে এসো প্রিয়লাল।"

প্রিয়লাল কিছু বললেনা, শুধু প্রমথর হাত খানা ধ'রে দুবার নাড়া দিলে। তারপর ঠিক তেমনি ভাবেই সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একবারও সন্ধ্যা অথবা প্রমথর দিকে ফিরে চেয়ে দেখলেনা।

যতক্ষণ দেখা গেল, সন্ধ্যা এবং প্রমথ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল; তারপর অন্ধকারের মধ্যে ট্রেন-খানা অদৃশ্য হ'য়ে গেলে প্রমথ বললে, "চল উষা, এবার যাওয়া যাক্‌।"

প্ল্যাটফর্ম্ম দিয়ে যেতে যেতে এক সময়ে প্রমথ হঠাৎ দেখতে পেলে সন্ধ্যার দুটি চক্ষু চকচকিয়ে উঠেছে। মুখে কিছু বললেনা, কিন্তু অন্তরের সুগভীর সমবেদনার একটা দীর্ঘশ্বাস বায়ুতে মিশিয়ে গেল।

(সমাপ্ত)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মুসলমানের অভিযোগ ও তাহার স্বরূপ

মঃ রেজাউল করীম এম-এ, বি-এল

কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ ঘটনা বা বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া সচরাচর সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রের বিশেষ সংখ্যা বাহির হইয়া থাকে। সেই ঘটনা বা বিষয়কে নানা ভাবে আলোচনা করিয়া পাঠকদের সম্মুখে তাহার সব খবর প্রকাশ করাই হইল এই শ্রেণীর বিশেষ সংখ্যার প্রধান উদ্দেশ্য। কয়েক জন বিখ্যাত জননেতার মৃত্যু উপলক্ষে কয়েকটি পত্রিকাই বিশেষ সংখ্যা বাহির করিয়াছিল। কংগ্রেসের বিগত জুবিলি উপলক্ষেও কয়েকটি জাতীয়তা-বাদী পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা বাহির করিয়াছিল। আমরা যখন শুনিলাম "মাসিক মোহাম্মদী" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটা বিশেষ সংখ্যা বাহির করিতেছেন, তখন মনে করিয়াছিলাম, উহা এই ধরনেরই কিছু হইবে। বিশেষ সংখ্যার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকে, যথা,—কোনও বিষয়ের ক্রম বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস, তাহার বিভিন্ন শাখা প্রশাখার বিবরণ, তাহার গৌরবময় মহিমার পরিচয় প্রদান, তাহার বর্ত্তমান ত্রুটি বিচ্যুতির কারণ ও সংশোধনের উপায়,—ইত্যাদি ইত্যাদি। কেবল তাহাকে হেয় করিবার জন্য বিশেষ সংখ্যা বাহির করা সাংবাদিকের নীতির বিরোধী। কিন্তু মোহাম্মদী পাঠ করিয়া আমরা শুধু হতাস হই নাই, মর্ম্মাহত হইয়াছি। এই পত্রিকার "বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা" পড়িয়া মনে হয়, যেন কোন অপ্রকাশ্য কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর "মোহাম্মদীর" কর্ত্তৃ-পক্ষের একটা আক্রোশ ছিল, তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহারা এইভাবে এই বিশেষ সংখ্যা বাহির করিয়াছেন। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, ইহার আভ্যন্তরীণ নানা শাখা প্রশাখার কোন বিবরণই নাই, ইহার প্রতি কোনও সহানুভূতির আভাষ নাই, ইহার আয় ব্যয়ের সমালোচনা নাই, ইহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে এমন কোন আলোচনা নাই যাহা পাঠ করিলে পাঠকসমাজ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারে।—আছে কেবল মনের আক্রোশ মিটাইবার প্রয়াস, একতরফা গালাগালি—আর তাহা কেবল একটা বিষয় লইয়া—যেন উহা ব্যতীত বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আর কিছুই নাই। সুতরাং ইহাকে আমরা কিছুতেই বিশেষ সংখ্যা বলিতে পারি না—ইহা বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণাত্মক একটা প্রোপাগাণ্ডা।

এই প্রবন্ধের লেখক একজন মুসলমান সুতরাং মুসল-মানের সত্যিকারের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কখনই অবচেতন থাকিতে পারি না। বরং অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত তাহা মোচ-নের চেষ্টা করিতে থাকিব। কিন্তু অভাব অভিযোগের নামে যদি কেহ অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে, তবে আমরা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারি না। মোহাম্মদীর "বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা" পড়িয়া আমাদের স্থির ধারণা হইয়াছে যে তাহাতে আমাদের সত্যিকারের কোন অভাব মোচনের চেষ্টা করা হয় নাই—ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্ম-কর্ত্তৃত্ব নষ্ট করা, মুসলমানের সাহিত্যিক মনোবৃত্তিকে আড়ষ্ট করা, ও প্রগতিশীল মুসলমান সমাজের স্বাধীন চিন্তার ক্রম-বিকাশের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করা। "মোহাম্মদীর" পরি-চালকবর্গ প্রায় সকলেই মৌলবী, মৌলানা, প্রাচীনপন্থী এবং শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে মধ্যযুগীয় আদর্শে আস্থাবান। তাঁহা-দের নিজেদের আদর্শে মুসলমান বালকগণ গড়িয়া উঠিতেছে না বলিয়া তাঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান কেন্দ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়কে আক্রমণ করিয়া মনের ঝাল মিটাইতেছেন। ইহা-দেরই সাক্ষাৎ পূর্ব্ব পুরুষগণ ইংরাজি শিখিলে কাফের হওয়ার ফতোয়া জারির করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল কাফের বলিলে আর চলিবে না, বা কেহ পরওয়া করিবে না। তাই

তাঁহাদেরই উত্তরাধিকারী স্বরূপ এই সব নবীন মৌলানাগণ অনুভাবে মুসলিম কৃষ্টির নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আক্রমণ করিয়া বসিয়াছেন। উভয় দলের উদ্দেশ্য এক—মুসলমানকে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি হইতে দূরে সরাইয়া রাখা—যেন তাহাদের মধ্য হইতে স্বাধীন চিন্তা লোপ পায়, যেন ইংরাজি শিখিয়াও মুসলমান যুবকগণ কেবলমাত্র পাদ্রী ও মোল্লা শ্রেণীতে পরিণত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়কে আক্রমণ করিয়া উহার ব্যাপারে সরকারকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ জানাইয়া "মোহাম্মদী" তাঁহাদের গোপন উদ্দেশ্যটা কতকটা খোলাখুলি ভাবেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আত্মকর্তৃত্বপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের এই শ্রেণীর অভাব অভিযোগ মিটাইতে সমর্থ নহে, সুতরাং সরকার যেন উহাকে করতলগত করিয়া তাঁহাদের অভিযোগের কারণ দূর করেন, এই প্রকার আবেদনের সুর "মোহাম্মদীতে" প্রকট। কিন্তু সমগ্র পত্রিকাটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এমন কোন ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ নাই যাহার জন্য সরকার বাহাদুর আইনতঃ ইহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। যে বিষয়ে সরকারের কোন অধিকার নাই, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বলার কোনই সার্থকতা নাই। ইহা যে "মোহাম্মদী" জানেন না তাহা নহে,—কিন্তু এই আক্রমণ হইতে নানাপ্রকার বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়া যদি সাম্প্রদায়িকতার অনল বাড়িয়া যায়, দেশময় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি সমাজের মনে একটা বিতৃষ্ণা জাগিয়া যায়, তবে ত মোল্লা শ্রেণীর নেতাদের ষোল আনা লাভ। তাহার ফলে হয় ত তাঁহারা সমাজকে মক্তব-মাদ্রাসার দিকে আগ্রহান্বিত করিতে পারিবেন। আমাদের মনে হয়, এই আশায় "বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা" বাহির করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাইলাম না।

সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপে করিতে বলা হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে পরলোকগত সার সৈয়দ আহম্মদের কথা মনে পড়িল। এই মহা মনিষী ব্যক্তি অনেক বিষয়ে সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন। এবং ভারতের বুকে ব্রিটিশ-প্রভুত্বের স্থায়িত্বের জন্য অনেক কিছু করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও শিক্ষা ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপ একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি বরাবরই বিদ্যা নিকেতন হইতে গবর্ণমেণ্টের সংস্রব বর্জ্জন করিবার অভিমত প্রকাশ করিতেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সার সৈয়দ আহমদ শিক্ষা সম্বন্ধে একটা স্কীম গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করেন, ইহাতে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন :—"আমরা এমন এক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চাই যাহা গবর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধান বা প্রভাবশূন্য হইবে।" তৎপরে ১৮৮২ সালে যে শিক্ষা কমিশন বসিয়াছিল তাহাতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন, "আমার ব্যক্তিগত মত ও আন্তরিক আকাঙ্খা এই যে, গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগটি সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোকের হস্তে ন্যস্ত করিবেন ও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কোনও মতেই উহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না।" বহু পূর্ব্বে মনিষী সার সৈয়দ আহম্মদ যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, আজ "মোহাম্মদী"র কর্তৃপক্ষ তাহার সার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিলেন না; তাঁহারা আজ শিক্ষা নিকেতনকে সরকারের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য এত লালায়িত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে মুসলমানের বিশেষ লাভ হইবে না। সেইজন্য আমরা "মোহাম্মদীর" সহিত একমত নহি—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আমাদের শত অভিযোগ থাকিলেও কখনও উহার স্বাধীনতানাশ সমর্থন করিব না।

২

'মোহাম্মদী" বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ করিয়াছেন সে বিষয়ে একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। আমাদের মনে হয় মুসলমানের কৃষ্টি কলাপ ধ্বংস করিবার অভিলাষকে সামনে রাখিয়া পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারিত হয় নাই। সেরূপ উদ্দেশ্য থাকিলে তাহার জন্য অন্য উপায় ছিল। পাঠ্য পুস্তকের নির্ব্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা অধিক বলিয়া হিন্দু কৃষ্টির প্রতি তাঁহাদের একটুকু অধিক আগ্রহ থাকা অসম্ভব নহে। বোধ হয় সেইজন্য হিন্দু সভ্যতার মহিমার বিষয় তাহাতে যে পরিমাণ স্থান পাইয়াছে মুসলমানের বিষয় সেরূপ স্থান পায় নাই। কিন্তু তজ্জন্য একথা মনে করা নিতান্ত ভুল হইবে যে, মুসলমান সভ্যতাকে

হেয় করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ষড়যন্ত্র করিয়াছে। আমরা যখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান চাই, তখন পাঠ্য পুস্তকে মুসলমান কৃষ্টিকলার বিষয় থাকা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

বহুদিন হইতে বাঙ্গলাদেশের হিন্দুরা সাহিত্য চর্চ্চা করিতেছেন বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য অনেকটা হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শুধু বাঙ্গলা সাহিত্যের বেলায় একথা উঠে কেন? প্রত্যেক দেশের সাহিত্যে সেই দেশের লেখকের ধর্ম্ম, আচার সংস্কৃতি প্রভৃতির ছাপ অনপনোদনীয়ভাবে পড়িয়াছে। এইরূপ ছাপ পড়িতে বাধ্য নতুবা তাহা সাহিত্যই হইতে পারে না। আপনার ভাব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেহই লিখিতে পারে না। সেক্ষপীয়ার কীটস্ প্রভৃতিকে অনেকে Impersonal লেখক বলিয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে তাঁহারাও স্থানে স্থানে নিজেদেরকে বেমালুম লুকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। কোন উচ্চশ্রেণীর লেখক কেবল অপরের মন যোগাইয়া লিখিতে পারেন না। কৃত্রিমতার দূষিত বায়ুতে তাঁহাদের প্রতিভা আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে। লেখককে লিখিতে হইবে তাঁহার নিজের খেয়াল অনুসারে, তাঁহার নিজের ভঙ্গীতে তাঁহার নিজের চিন্তিত বিষয়। তাহাতে কোন ধর্ম্মের ছাপ পড়িয়াছে কিনা—সে ধর্ম্ম পৌত্তলিক হউক অথবা একত্ববাদী হউক—তাহা দেখিলে চলিবেনা, শুধু দেখিতে হইবে যাহা প্রকৃত "সাহিত্য" হইয়াছে কিনা। যদি তাহা প্রকৃত সাহিত্য হয় তবে তাহা আগ্রহের সহিত পড়িতে হইবে অন্যথায় তাহা পরিত্যজ্য। রবীন্দ্রনাথের পূজারিণী, উর্ব্বশী এই শ্রেণীর কবিতা, দীনেশচন্দ্রের বেহুলা এই শ্রেণীর রচনা, মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ এই শ্রেণীর অমূল্য পুস্তক যাহা বাঙ্গলা ভাষার রসপিপাসু প্রত্যেকে আগ্রহের সহিত পড়িবে ও আনন্দ পাইবে। ইহার মধ্যে কাহার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আচার ও সভ্যতা নাশের কথা আদৌ উঠিতে পারে না। বাঙ্গলা সাহিত্য হিন্দু প্রভাবিত বলিয়া তাহা বর্জ্জন করিলে চলিবেনা। তাহার সারাংশগুলি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। সাহিত্য-পাঠকের দৃষ্টি সব সময় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে থাকা চাই, সেখানে কোন সম্প্রদায় নাই, দলগত ঈর্ষা নাই, আছে শুধু সাহিত্যরসিকের জন্য অনন্ত অমৃত।

এদেশে হিন্দু মুসলমানকে চিরকালই পাশাপাশি ভাবে বাস করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ভালবাসা ও সৌহৃদ্য যেমন দরকার ভাবের আদান প্রদানও তেমনি দরকার। এই আদান প্রদান সাহিত্যের মধ্য দিয়া যত সহজে সম্ভব হইবে, অন্যভাবে তাহা হইবে না। হিন্দু যদি প্রতিজ্ঞা করে মুসলমানের সাহিত্য পড়িবনা, আর মুসলমানও যদি সেইরূপ ধনুকভাঙ্গা পণ করে, তবে মনের ও ভাবের আদান ত হইবেই না, বরং পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার ভাব বৃদ্ধি পাইবে। অতএব যাহাতে এই প্রকার ভাবের বিনিময় সম্ভব হয় তাহারই ব্যবস্থা করা দরকার। একটা কথা আমাদের নেতাদের মনে প্রায়ই উঠিয়া থাকে যে, পৌত্তলিকতা ভাবাপন্ন হিন্দুদের সাহিত্য পড়িলে মুসলমানও পৌত্তলিক হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু এ ধারণা অলীক। প্রাচীন যুগে প্রাথমিক মুসলমানগণ আগ্রহের সহিত গ্রীক সাহিত্য আলোচনা করিয়াছিলেন। গ্রীক ভাষার বহু গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এবং আরবের ও স্পেনের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তাহা পঠিত হইত। কিন্তু ইস্‌লামের কৃষ্টিকলা ও সংস্কৃতিকে পরিহার করিয়া কেহই গ্রীক ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই অথবা হাবভাব আচার ব্যাপারে কেহই গ্রীক হইয়া পড়েন নাই, বরং তাঁহারা ইসলামের বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়া গ্রীক সভ্যতার সারাংশটুকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টান ভাবাপন্ন ইংরাজি সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াও কোনও মুসলমান খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। খৃষ্টান মিশনারীগণ বহু যুগ হইতে তাঁহাদের স্কুল কলেজে নানাভাবে খৃষ্টান ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়া আসিতেছেন, সুকুমারমতি ছাত্রদের মধ্যে বাইবেল প্রচার করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কেবল মাত্র তজ্জন্য কেহই খৃষ্টান হইয়া পড়ে নাই। যাহারা খৃষ্টান হইয়াছে তাহারা অন্যবিধ কারণেই হইয়াছে। এ দেশের মুসলমানগণও বহুকাল হইতে হিন্দু সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত। কিন্তু তজ্জন্য মুসলমানগণ হিন্দুভাবাপন্ন হয় নাই।—মুসলমানের মধ্যে হিন্দু প্রভাব যে কিছুই নাই, তাহা বলি না, বরং অনেক কিছু আছে। কিন্তু তাহা কেবল মাত্র হিন্দু সাহিত্যের কারণে

নয়। দুইটি প্রধান কারণে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে। প্রথমতঃ যাহারা হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়াছে তাহারা তাহাদের পরিত্যক্ত ধর্ম্মের প্রভাব একেবারেই পরিহার করিতে পারে নাই। এই নবদীক্ষিত মুসলমানগণ নানাভাবে, হয়ত অজ্ঞাতসারে আরব রক্তের মুসলমানের মধ্যে নিজেদের আদিম ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বহুযুগ হইতে পাশাপাশি একই সঙ্গে একই শাসনাধীনে বাস করিয়া একে অপরকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। সেই জন্য হিন্দুদের মধ্যেও মুসলমানী প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মুসলমানের উপর হিন্দু সভ্যতার এই প্রভাব বিস্তারের মূলীভূত কারণটাকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের সহিত জড়িত করা যায়, তবে তাহাতে সত্যের অপলাপ হইবে। বাঙ্গলাদেশের বাহিরে উর্দ্দুভাষী মুসলমান-দের মধ্যেও হিন্দু প্রভাব কম নহে। সে দেশের জন্য "মোহাম্মদী" কি কৈফিয়ৎ দিবেন? সেই জন্য আমরা মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ বহুল পাঠ্যপুস্তকের কারণেই যে আজ মুসলমান উন্নতি করিতে পারিতেছে না বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহার মূলে কোন সত্য তথ্য নাই। অন্যবিধ কারণে মুসলমানের দ্রুত উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সম্বন্ধ আলোচনা করা সম্ভব হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমানের গৌরবের সামগ্রী। ইহার গৌরবে জাতির গৌরব ইহার পতনে জাতির কলঙ্ক। যদি ইহার কোন দোষ ত্রুটি থাকে তবে সমগ্র জাতিকে সমবেতভাবে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক কারণে উহাকে আক্রমণ করিলে কাহারও কল্যাণ হইবে না—এই দুর্ব্বার আক্রমণ হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য এবং অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত বিপদাপন্ন করিয়া তুলিতে পারে। উহার সমালোচনা করা দোষাবহ নহে, কিন্তু বিদ্বেষবশে উহার বিরুদ্ধে যাহা করা হয় তাহাই অন্যায় ও সীমাবহির্ভূত কায। আশা করি, সাধারণ মুসলমান "মোহাম্মদীর" আক্রমণ দ্বারা বিভ্রান্ত হইবেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবেন না।

রেজাউল করিম

নিশিগন্ধা

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

তুমি যে সন্ধ্যার ফুল, নাম তব নিশিগন্ধা বুঝি!
রূপ তব অনুপম, গন্ধ তব অতীব সুন্দর।
পৃথিবীর সেরা মেয়ে, তুল তব নাহি পাই খুঁজি।
তুমি খুবই ভাল বটে, তার চেয়ে ভাল তব বর।
রূপ তার অপরূপ, হেমকান্তি, প্রশান্ত উদার,
সুঠাম সুন্দর দেহ, অপূর্ব্ব সে নয়নের জ্যোতী;
অসামান্য সে পুরুষ, রাজ্য তার পৃথিবী বিস্তার।
তোমারে যে বাসে ভাল, নিশিগন্ধা, সে যে নিশাপতি।
সূর্য্য যায় অস্তাচলে, নেমে আসে সন্ধ্যার আঁধার,
নীড়ে-ফেরে বিহঙ্গম, গোষ্ঠ হ'তে ঘরে ফেরে ধেনু;
সুরু হয় পূজারতি মন্দিরে মন্দিরে দেবতার;
বিস্তীর্ণ প্রান্তর প্রান্তে বেজে ওঠে রাখালের বেণু;
জন্ম তব সেই ক্ষণে, আয়ু তব নহে দীর্ঘ অতি,
রজনীর শেষ যামে, নিশিগন্ধা, তব পরিণতি।

বোর্ণিও দ্বীপের পল্লী অঞ্চলে

মিঃ জন্ হাল্‌স্ ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজের বহুস্থান পায়ে হাঁটিয়া ও সাইকেল যোগে ভ্রমণ করিয়াছেন। বোর্ণিও দ্বীপের অভ্যন্তরস্থ গ্রামগুলির অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য ইনি দুর্গম জঙ্গলময় পার্ব্বত্য পথে অনেক সময় নানাপ্রকার বিপদেরও সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বোর্ণিও দ্বীপের ডায়াক জাতির আচার ব্যবহার ও জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে ইনি একজন বিশেষজ্ঞ। বোর্ণিও দ্বীপের পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া মিঃ হাল্‌স্ সম্প্রতি একখানি বিখ্যাত ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল :—

বোর্ণিওর মোটর বাস

ধরো তোমার পকেটে একটা যায়গায় একখানা ষ্টীমারের টিকিট আছে, অথচ কোনো ম্যাপে বা কোনো ভ্রমণের বইয়ে সে যায়গার কোন উল্লেখ দেখা যায় না, সে একটা নতুন অভিজ্ঞতা বটে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাটা শীঘ্রই একটা দুঃসাহসিক কার্য্যের আকার ধারণ করে, যখন ট্রাভ্‌ল্-এজেন্সির কেরাণীরা—যারা দুনিয়ার সকল বিষয়ে একরকম সবজান্তা—মাথা নেড়ে বলে যে তারা এ জায়গার নামই কখনও শোনেনি।

ব্যাপারটা ঘটেছিল সিঙ্গাপুরে। দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে সবে এসে নেমেছি। ওখানকার এক জাহাজ কোম্পানীর

ম্যানেজারের নামে একখানা চিঠি এনেছিলাম, সেখানা তাঁর হাতে দিলাম। তাতে লেখা ছিল মিঃ হাল্স্ একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী, ইনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সিঙ্গাপুরে যাচ্চেন, এঁর জন্যে একটা ভাল ভ্রমণের জায়গা ঠিক করে দিও।

ম্যানেজার আমায় বল্লেন—সময় নেই, টমোহান জাহাজ দুপুরে ছাড়চে। জাহাজে গিয়ে উঠুন, সাম্বাস্ চলে যান। বল্লাম—বেশ কথা। আমি যাচ্চি—কিন্তু—সাম্বাস্ জায়গাটা কোথায়? সেখানে কি আছে? ম্যানেজার মাথা চুলকে বল্লেন সাম্বাস্? ও!...তা ওটা হবে গিয়ে ডাচ্ বোর্ণিওর ওই দিকে কোথাও। চলে যান, বেশ জায়গা।

একটি ডায়াক পরিবার

যাঁরা সোমারসেট মম্ কিংবা এইচ, ডি ভিয়ার ষ্ট্যাক্‌পুলের উপন্যাস পড়েচেন, তাঁরা অবিশ্যি খুব পুলকিত হয়ে উঠ্‌তেন এমন অজ্ঞাত স্থানে ভ্রমণের আনুষঙ্গিক নানা রোমান্সের আশায়—কিন্তু দুনিয়াময় ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার ফলে আমি জানি, ওরকম জায়গায় বেড়াতে গেলে দুঃখ কষ্ট ও বিপদই সার হয়। উপন্যাসের রোমান্স উপন্যাসের পাতাতেই থেকে যায়।

অরণ্যচারী ডুসুন শিকারী

কে, পি, এম্ কোম্পানীর জাহাজে গিয়ে উঠলাম। আমিই সাম্বাসের একমাত্র যাত্রী। ডেকে আর একজন যাত্রী ছিল, কিন্তু সে আমার চেয়ে ভাগ্যবান, তার টিকিট লাগেনি, কারণ সে মানুষ নয়, ভালুক। যবদ্বীপের বাণ্ডোয়াং জু'তে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্চে সিঙ্গাপুর থেকে।

সাম্বাস বন্দরের জেটিতে গিয়ে জাহাজ লাগলো, সেদিন পূর্ণিমার রাত। এমন ধরণের রাত যা কিনা মনে থাকে চিরকাল। কিন্তু জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে নদীজলের পচা কাদার গন্ধ, আমদানি রবারের গাঁটের বিশ্রী দুর্গন্ধ আর মশার ঝাঁক আমায় পাগল করে তুললে।

জঙ্গলের মাথায় তখন কি অপূর্ব্ব চাঁদই উঠচে, কিন্তু রবারের দুর্গন্ধ ও মশার উৎপাতে আমায় পালাতে হল কেবিনে। হায়, সোমারসেট মমের রোমান্স!

পরদিন সকালে ছোট ষ্টীমারে রওনা হয়ে সারাদিন ধরে সাম্বাস্ নদী বেয়ে চলেচি, চলেচি। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েচি নতুন দেশের নতুন দৃশ্য দেখতে, নদীর দুধারে কি ভীষণ ঘন জঙ্গল, লোকজনের বসতি চোখে পড়ে না, কর্দ্দমময় তীরে বড় বড় কুমীর রোদ পোয়াচ্চে। জঙ্গলে গাছের ডালে ডালে নানা জাতীয় পাখী ও বাঁদরের দল কিচমিচ করচে। ক্বচিৎ কোথাও বনের ফুল ফুটে আছে।

এই লোক দুটির হাতে যা রয়েচে, তা বাঁশি নয় হুঁকো

ষ্টীমারের কাপ্তেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। তার কাছে এসব একঘেয়ে পুরানো হয়ে গিয়েছে। আজ এই বিশ বছর ধরে সে এই পথে প্রতিদিন ষ্টীমার চালিয়ে যাচ্চে, নদীর প্রত্যেক বাঁকের খবর সে রাখে। আমার আমোদের জন্যে সে মাঝে মাঝে ষ্টীমারের বাঁশি বাজিয়ে জঙ্গলের বানরদের সন্ত্রস্ত করে তুলছিল।

নদীর মুখ বেয়ে দশ মাইল উজান দিকে যাবার পরে নারিকেল গাছ ক্রমশঃ পাৎলা হয়ে আসতে লাগল। তাদের স্থান অধিকার করলে রবারের বাগান আর বুড়োমানুষের দাড়ির মত দেখতে পরগাছা ঝোলানো বড় বড় গাছ।

এখানে আমরা একটা ছোট গ্রাম দেখতে পেলাম। আমাদের ষ্টীমার দেখে একদল লোক ডোঙ্গা বেয়ে নিকটে এল। ডায়াক জাতি খুব নিরীহ নয়, হয়তো বা ওরা দুএকটা মানুষের মাথা সংগ্রহ করতেই আসচে। কিন্তু কাপ্তেন বল্লে, ওরা ডায়াক নয়, মালয় ছেলেমেয়ে, যাত্রীদের কাছে এক আধটা সেণ্ট চায় সাঁতারের কসরৎ দেখিয়ে।

আর একটা মোড় ঘুরতেই সাঁতারের আমোদ থেকে একেবারে ট্রাজিডির দিকে মন গেল। সেখানে একটা কাঠের তক্তায় বড় বড় অক্ষরে ডাচ ভাষায় লেখা আছে 'WRAK' অর্থাৎ ভগ্ন পোত। ষাট বছর আগে ডাচ্-গভর্ণমেণ্ট সাম্বাসে একটা ছোট কামানবাহী ষ্টীমার পাঠান স্থানীয় সুলতানকে একটু শায়েস্তা করতে, এবং শায়েস্তা হবার পরে সুলতানকে রাজকীয় উপাধি দানে সম্মানিত করতে। কামানবাহী ষ্টীমারখানা এইখানে এসে একটা ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জলমগ্ন হয়—যদিও উভয় তীর খুবই নিকট, তবুও ষ্টীমারের একটী প্রাণীও বাঁচেনি।

সন্ধ্যার সময় আমরা একটা গ্রামে পৌছুলাম, সেখানে

কয়েকজন ইউরোপীয় থাকেন। তাঁরা আমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করলেন। একজন বৃদ্ধ হাঙ্গেরীয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোল, তিনি এদেশীয় একটী মালয় রমণীকে বিবাহ করে সুখে ঘরসংসার করচেন।

ভদ্রলোকটী রবারের চাষে দুপয়সা উপার্জ্জন করেচেন। আমাকে পরদিন সকালে তাঁর মোটরে বিশ মাইল দূরবর্ত্তী তাঁর বাংলোতে নিয়ে গেলেন। এখানেই তিনি বহুদিন আছেন। নারিকেল কুঞ্জ ও বোগেন্‌ভিলিয়া ঝাড়ের আড়ালে বাংলোখানি ভারী চমৎকার দেখতে। খুব নির্জ্জন জায়গা।

দের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ করতে হয়েচে বাণিজ্যের পথ সুগম করবার জন্যে।

এদেশে সভ্যতা বিস্তার করতে চীনারা এক সময়ে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। তারা সুদূর পার্ব্বত্য অঞ্চলে নিজেদের খরচে স্কুল স্থাপন করে ও ডায়াকদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্যে কম যত্ন করেনি। যুদ্ধও তারা অনেক করেচে, বেশী-দিনের কথা নয়, ১৯১৪ সালে চীনাদের সঙ্গে ডায়াকদের ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু তখন মহাযুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে ইউ-রোপ উন্মত্ত, এ যুদ্ধের কথা কোনো খবরের কাগজে ছাপা

সাম্বাস্ ও পন্টিয়ানাকের মধ্যবর্ত্তী মোটর রোড

তাঁর পুকুরে আমরা মাছ ধরতে বসলাম আর তিনি ধূমপান করতে করতে তাঁর গত বিশ বৎসরের বোর্ণিও প্রবাসের নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন।

তিনি বল্লেন ডাচ্ বোর্ণিওতে এখনও এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে কোনো সভ্য শ্বেতকায় মানুষ কখনও পদার্পণ করেনি। ডাচদের তৈরী বোর্ণিওর ভাল ম্যাপ পর্য্যন্ত নেই।

ডাচ্ গভর্ণমেণ্ট দেশ শাসন করেন বটে কিন্তু চীনারা বোর্ণিও সম্বন্ধে ডাচ্‌দের চেয়ে বেশী জানে। ডাচ্ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে আসবার অনেক আগে থেকে চীনারা এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করেচে, অনেক সময় ডায়াক-

হয়নি।

আজ সভ্য বোর্ণিওতে ডায়াকদের স্থান নেই। ওরাং ওটাংএর মতই তারা বহুদূরবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করেচে।

ওরাং ওটাংয়ের কথাই যখন উঠ্‌ল, তখন এখানে উল্লেখ করা উচিত যে একসময়ে বোর্ণিওতে এর ব্যবসা খুবই চলতো। ডায়াক শিকারীরা বন থেকে জীবন্ত ওরাং ওটাং ধরে নিয়ে এসে ইউরোপীয় ব্যবসাদারের কাছে বেচতো। আড়াই সিলিংএ একটা শিশু ওরাং ওটাং কিনতে পাওয়া অসম্ভব ছিল না। ওরাং ওটাং অসাধারণ শক্তিশালী জীব, এমন কি বাল্যকালেও ওরাং ওটাংএর শক্তি একজন কুস্তিগীর

পালোয়ানের চেয়েও বেশী। বর্ত্তমানে ডাচ্ গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা ওরাং ওটাং রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছেন।

ডায়াকদের বনমানুষ ধরবার কৌশল বেশ চমৎকার। যে গাছে ওরাং ওটাং আছে, তারা সে গাছটা রেখে আশ পাশের সব গাছ কেটে ফেলে দেয়। আর ঐ গাছের তলায় লাউয়ের খোলে খানিকটা দেশী মদ রাখে। তারপর সবাই মিলে চেষ্টা করে ওরাং ওটাং যাতে কিছুতেই গাছ থেকে নেমে অন্য কোথাও না যেতে পারে। রাত্রে তৃষ্ণায় কাতর ওরাং ওটাং গাছের তলায় নেমে ঐ মদটাকে জল ভেবে খেয়ে ফেলে এবং তখনি ভয়ানক মাতাল হয়ে পড়ে। তার উঠে দাঁড়াবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পায়। সেই সময় সবাই গিয়ে তাকে বন্দী করে।

পন্টিয়ানাক্ একটা ছোট গ্রাম, সাম্বাস থেকে একশো ত্রিশ মাইল দূরে। মোটর বাসে একদিন পন্টিয়ানাক্ গ্রামে বেড়াতে গেলাম। পন্টিয়ানাক্ পর্য্যন্ত ট্যাক্সিও পাওয়া যায়, কিন্তু ভাড়া বড় বেশী। তা ছাড়া ট্যাক্সিতে একা একা যাওয়ার চেয়ে অনেক লোকের সঙ্গে বাসে যাওয়া ভাল, দেশ দেখতেই যখন এসেচি।

আমি দুটো সিটের ভাড়া দিলাম, উদ্দেশ্য পাশে খানিকটা হাত পা ছড়াবার জায়গা রেখে দেব। কিন্তু পথের মধ্যে একটা গ্রাম থেকে এক চীনা ছোকরা উঠলো, তার সঙ্গে দু-তিনটী মেয়ে, একখানা সাইকেল, তিন ঝুড়ি ম্যাঙ্গোষ্টিন ফল, এক বোঝা কাপড় এবং একটা ম্যাণ্ডোলিন। বাসে তিল ধরাবার জায়গা নেই, আমাকে বাধ্য হয়ে ভদ্রতার খাতিরে আমার বাড়তি সিটটা ছেড়ে দিতে হোল।

পথের সৌন্দর্য্য একবার দেখলে ভুলবার কথা নয়। দুধারে শ্যামল বনানী, মাঝে মাঝে কুলকুল করে পাহাড়ী নদী বয়ে চলেচে, কত বিচিত্র রংয়ের পাখী, বিচিত্র রংয়ের বন্যপুষ্প। মাঝে মাঝে নারিকেল কি রবারের বাগান। দু একটা মালয় গ্রাম সব যেন ছবির মত।

সাম্বাস্ নদীতীরে নারিকেলের বাগান

কিন্তু রাস্তার অবস্থা বড় খারাপ। ডাচ্ গবর্ণমেণ্ট এই কাদার সমুদ্রে যতটা করা সম্ভব রাস্তা করে দিয়েচে কিন্তু এত কাদায় বেশী কিছু করা কি সম্ভব? কাদা হোল ডাচ্ ইষ্ট্ বোর্ণিওর অভিশাপ। সমুদ্রতীর থেকে সুরু হয়েচে, আর দেশের অভ্যন্তরে যেখানে এবং যতদূরেই যাওয়া যাক, কাদা সর্ব্বত্র বিরাজমান।

এই কাদার জন্যে বোর্ণিওতে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হোল না। বোর্ণিওর পার্ব্বত্য অঞ্চলে সোনা এবং মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া যায়। অনেক বার অনেক কোম্পানীও গঠিত হয়েচে সোনার খনি চালাবার উদ্দেশ্যে, অনেক টাকাও অনেক বার উঠেছিল, কিন্তু সেগুলি সব বোর্ণিওর এই ভীষণ কাদায় ডুবেচে।

আর কি গরম। এক গ্লাস বরফ জলের জন্যে আমি এক ডলার দিতে প্রস্তুত ছিলাম। অথচ চীনা ও মালয়দের কি অদ্ভুত ক্ষমতা পিপাসা জয় করবার। সারা পথ কাউকে একবার জল পান করতে দেখিনি। বাসে লোক বোঝাই হয়েচে ঠেসে, তার ওপর মুরগী আছে, দু একটা শূকর শাবক

লেখকের সঙ্গী, সুমাত্রার বনে ধৃত একটী ভালুক

আছে, মোট গাঁটরি আছে। আমার পাশের চীনা ছোকরা এরই মধ্যে আবার ম্যাণ্ডালিন বাজিয়ে গান সুরু করে দিয়েচে। প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

এক একটা গ্রামে বাস গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় আর নড়তে চায় না। সে গ্রাম থেকে একজন যাত্রী হয়তো উঠবে, সে তখন খেতে বসেচে। সময়ের কোনো মূল্য নেই ডাচ্ বোর্ণিওতে।

পন্টিয়ানাক্ পৌছান গেল বৈকালে। সে গ্রামটা আবার নদীর ওপারে, খেয়া পার হয়ে যেতে হয়। খেয়া পারের রেট স্থানীয় অধিবাসীদের জন্যে এক রকম, ইউরোপীয়দের জন্যে আর এক রকম, অর্থাৎ কিছু বেশী। কেন যে এ রকম হবে, তার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না।

এখানে কয়েকজন ইউরোপীয় রবার বাগানের মালিক বাস্ করেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে একটা টেনিস্ কোর্ট ক'রেচেন, একটা ছোট ক্লাবও আছে। এদের মধ্যে একজন আমায় একখানা ডায়াক তরবারি উপহার দিলেন, খুব ভাল ক্রোমিয়াম ইস্পাতের তলোয়ারের মত সেখানা তীক্ষ্ণ ধার। হাতলের গোড়ায় একগোছা মানুষের মাথার চুল। কত মুণ্ড যে এক সময় এতে কাটা পড়েচে তার কি লেখাজোখা আছে?

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইয়োরোপা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ, আই-সি-এস

আলোকচিত্রশিল্পী—লেখক

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্কটল্যাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের এক একটী যুগের কল্পনা ও পরিচয় এক একটী বিশেষ মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাদের নামেই এরা ব্যবসা চালায়, তাদের কল্যাণেই এদের দিন চলে। যতদিন স্কটল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড থাকবে ততদিন স্কটের স্মৃতি একটী বিরাট সত্ত্বার মত বিরাজ করবে। আর একটী মূর্ত্তি হচ্ছে গ্রাম্য কবি, গ্রামের এমনভাবে রিজ্বিয়োর হত্যাকাহিনীর বর্ণনা করবে, মেরীর শয়নকক্ষ দেখিয়ে দেবে যেন তারা হচ্ছে মাত্র গতকালের বিদায় নেওয়া বন্ধু; সল্‌স্‌বারি ক্র্যাগের ওপাশ দিয়ে যেন পলায়মানা রাণীর অশ্বখুরের ধ্বনি এখনো সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি।

ইতিমধ্যে আর একটী নূতন মূর্ত্তি এই জনবিরল,

গ্রেট-বৃটেনের একটি প্রাচীন বাড়ি

প্রাণের কবি বার্ণসের। এদেশের প্রেমিক প্রেমিকারা চিঠি লিখবে বার্ণসের রচনা উদ্ধৃত করে,

"My heart is sair, I dare na' tell"

উপহার পাঠাবে হাইল্যাণ্ডের ক্ল্যানদের (গোত্রের) পোষাক tartanএ বাঁধাই ছোট ছোট স্কট বা বার্ণসের বই, আর প্রিয়ার মুখের সঙ্গে তুলনা করবে রূপসী রাণী মেরীর। দেশের যেখানে যাই ঘুরে ফিরে এদের ও রাজপুত্র চার্লির কথা উঠবে বা তাদের স্মৃতিচিহ্ন দেখান হবে। হলিরুড প্রাসাদে গাইড ভূমিখণ্ডের শ্যাম অরণ্যানী ও অকরুণ পর্ব্বতমালার সামনে রূপ ধারণ করে উঠেছে।

"গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা রটি' গেল ক্রমে—"

মৈত্র মহাশয়ের মত এই ভারতীয়ের বিজ্ঞাপন চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে লাগল। এজন্য কোন নিজস্ব সংবাদদাতার প্রয়োজন হল না; কিন্তু বাতাসের আগে আগে গ্রামে গ্রামে এই অভাবনীয় আবির্ভাবের সংবাদ পৌছিয়ে যেতে লাগল। কোন একদিন দারুণ রৌদ্র উঠেছিল; টিনের খাদ্যদ্রব্য আর

পোষাকে ভরা "রুকস্তাকের" ভারে প্রস্তরময় পর্ব্বতপথে প্রতিটী পদক্ষেপকে যন্ত্রণা মনে হচ্ছিল, আর সে পথের শেষ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। সে সময় পথশ্রম লাঘবের জন্ত ও শ্রোতাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বাংলা কুচকাওয়াচের গানের নমুনা স্বরূপ

"চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে চল" ইত্যাদি

গাওয়া হয়েছিল। তার বিদেশী কথা ও বিচিত্র সুর গায়কের আগমনের আগে আগেই—বোধহয় বেতার সহযোগে সব পোড়া গন্ধ সমস্ত হাইল্যাণ্ডের আকাশে বাতাসে ভেসে ভেসে ছড়িয়ে গেল। তিন দিন পরে বন্ধুহীন বন্ধুর 'বেন টরিডনের' চূড়ায় বিশ্রাম করতে করতে যখন অপরাহ্ণ-সূর্য্যের আলোয় হেদারের বর্ণ পরিবর্ত্তন দেখছি, রোয়ান গাছের শাখায় শাখায় যখন ফুলের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, আর দিগ্বলয়ের বিলীয়মান রেখার এপারেই নীচের হ্রদটীতে একটা সান্ধ্য তন্দ্রার ভাব এরি মধ্যে নেমে আসছে তখন দুটী কিশোরী স্মিতহাস্যে জানিয়ে দিল যে তাদের দেশের এই নূতনতম

ক্যুলীন পর্ব্বত

হোষ্টেলে পৌছিয়ে যেতে লাগল এবং প্রত্যেক পথচারী ও পর্ব্বতবাসীর অধরে একটু একটু অর্থপূর্ণ চাপা হাসিও যে খেলে গিয়েছিল সেরকম সন্দেহ করলে ভুল হবে না।

আর একবার জন্মতিথির উৎসব পালন করবার অসম্ভব সাধ মনে জেগে উঠল। মোটা চাল কোন রকমে মিলল বটে, কিন্তু ডালের অভাবে ভাঙ্গা ছোলার সন্ধান করতে কিছু উপযুক্ত উদ্যোগ করতে হয়েছিল। সমুদ্রের পার ধরে ধরে বাইশ মাইল হাঁটার পর য়্যাটলাণ্টিকের যে বন্দরে সপ্তাহে একদিন জাহাজ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে সেখানকার অমূল্য সবে-ধন-নীলমণি দোকানটীতে হাজির হয়ে দেখি যে ম্যাক্রি সাহেবের ডাকঘর, জুতা মেরামত ও মুদীখানা একই দোকান-ঘরে মহাসমারোহে সম্পন্ন হচ্ছে। সেখানকার জিনিষে যা রান্না হল তা অপূর্ব্ব। মশলাহীন তেজপাতাহীন সে খিচুড়ীর রোমাঞ্চকর সংবাদটী তারাও অবগত আছে।

আর একদিন সমস্ত বেলা পাহাড় চড়াই করার পর নীচে নামবার পথে একটী ঝরণার পাশে ছায়ায় রুটী মাখন ও চিনি সহযোগে রাজকীয় একটা 'লাঞ্চ' ভোজনের চেষ্টায় আছি এমন সময় ঝোপের আড়াল থেকে একটা দীর্ঘকায়, বুদ্ধিদীপ্ত যুবকের মুখ দেখা গেল এবং সেই গাছপালার অন্তরাল থেকে একটী সকৌতূহল প্রশ্ন বের হয়ে আসল—"ওহে, তুমিই কি সেই ভারতীয়"—প্রভৃতি। একটা জিনিষ ভারী ভাল লাগে। এদের চেয়ে থাকার মধ্যে ঔৎসুক্য আছে, ঔদ্ধত্য নেই; প্রশ্নের মধ্যে সম্ভাষণ আছে, সন্দেহ নেই। এ ত তবু হাই-ল্যাণ্ডস্—যেখানে লোকে ইংরেজী বুঝে। ইয়োরোপের সর্ব্বত্র এই অতিথিপরায়ণতার ভাব পাওয়া যায়, বিশেষ করে স্পেন, জার্ম্মানী ও ইটালিতে। বিদেশীর মুখ যখন মূক হয়ে

গেছে ভাষার অভাবে, মন সেখানে ভাবের আবেগে মুখর হয়ে উঠতে বাধা পায়নি; শব্দ যখন হার মেনে স্তব্ধ হয়ে গেছে নীরবতার ভাষা সেখানে হাতের গতিতে, চাহনীর ভঙ্গীতে কাজ এগিয়ে দিয়েছে।

* * * *

হাইল্যাণ্ডের একটী একাকিনী বালিকা ধান কাটতে কাটতে যে গান গেয়েছিল তা ওয়ার্ডস্বার্থকে যে দীপপুঞ্জের কথা, কত অকথিত বাণী, অগীত গান, অব্যক্ত ব্যথা ও অনমুভবনীয় রিক্ততার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল সেই দ্বীপ-পুঞ্জ এই যাযাবর বিদেশীকেও ডাক দিল। অতলান্ত মহা-সাগরের কল্লোল ছাপিয়ে সেই অশ্রুত গানের আহ্বান এসে পৌছাল। কি অদ্ভুত দ্বীপ হচ্ছে এর 'স্কাই' (Skye) দ্বীপটা। মেঘ ও কুয়াসার ভিতর দিয়ে পথ হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে এখানে পৌছিয়ে মনে হল যে আরব্য উপন্যাসের কোন এক রহস্যময়ী যাদুকরী একে সুন্দর নির্জ্জন বাগান তৈরী করে বাঁশীর ডাকে বিদেশীকে টেনে এনে সব অধিবাসীকে নিয়ে বোধ হয় আত্ম-গোপন করেছে। একাধিক সহস্র রজনীর একটি যেন কুয়াসার অন্ধকারে ঢেকে আমার সামনে উদয় হল।

পায়ের তলায় প্রস্তরবন্ধুর চড়াই; উপরে মেঘের চন্দ্রাতপ, সম্মুখে অদৃশ্য পর্ব্বতের ভিতর দিয়ে ১৭ মাইল অজ্ঞাত পথ। সে পথে দুটি গোত্রের মধ্যে একটা বিশ্বাসঘাতকতাময় ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল যার ফলে একটা গোত্রের বংশে বাতি দিতে কেহ ছিল না। এপার থেকে তৃষিত নয়নে একবার হাইল্যাণ্ডসের দিকে ফিরে তাকালাম। এই কুহেলিকার আবরণের পর-পারে যে একটী শ্যামল সরস দেশ আছে তা এখন কল্পনা করতেও যেন মনে বাধতে লাগল। এপারের মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, বারিধারার সিক্ততা ও "ক্যুলীন" পর্ব্বতের নগ্ন নিষ্ঠুর উষরতা ওপারের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। ওপারে গ্রেট-বৃটেনের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত বেন নেভিসের তলায় নদীকলধ্বনিত শ্যাম বনপথে চলতে চলতে কারো হয়ত মনেই হবে না যে এপারে এমন একটা বিচিত্র দেশে নির্ম্মম প্রকৃতির লীলা চলছে।

৺ডি, এল, রায়ের নন্দলালকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে। দেশের জন্য তার আত্মজীবন সযত্নে বাঁচিয়ে চলবার দরকার পড়েছিল; তাই সে কখনো কোন কষ্টসাধ্য কাজে হাত দেয়নি। "আমি যদি মরি দেশের হইবে কি বা ?" তেলে-জলে মানুষ নিরীহ বাঙ্গালী হিন্দুর সন্তান নন্দলাল কেন ওই ক্যুলীন পর্ব্বতে জীবন সংশয় করতে যাবে। কিন্তু ইয়ো-রোপের হাওয়া বোধহয় আমাদের সনাতন নন্দলালকেও ঘাড়ে ধরে নিরুদ্দেশের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য পথে বের

দড়ি বেয়ে ওঠা

করে আনতে পারবে। তা যদি পারে তবেই ইয়োরোপের শিক্ষার ফল আমাদের উপর ফলবে; যুগধর্ম্মের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে আমরা এগিয়ে চলতে পারব। বিদেশে এসে আমরা শুধু অনন্যমনে পরীক্ষা পাশ করে যাব, কূপের মধ্যে মণ্ডুকের মত যার সীমাবদ্ধ নিগড়বদ্ধ জীবন ছিল সে আহার্য্য অন্বেষণে পাখীর মত আকাশে উড়ে শুধু খড়কুটা সংগ্রহ করেই ফিরে যাবে, ওই আকাশের অসীম প্রসারের, মোহন নীলিমার একটু ও আস্বাদ গ্রহণ করবে না—একথায় কিছুতেই

মন সায় দেয় না। সামনের ক্যুলীন পর্ব্বত নিষ্ঠুর ভয়াবহ বিপজ্জনক হতে পারে; তবু তার উপরও ত প্রাণ হাতে নিয়ে পায়ে কোমরে দড়ি বেঁধে লোক উঠছে; সে দৃশ্য দেখে বাইশ বৎসর বয়স পিছনে পড়ে থাকবে পরাজয়ের লজ্জা ও ব্যর্থতার গ্লানি স্বীকার করে—এ কি করে সহ্য করা যায়? হাইল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'লখ্‌মারী' হ্রদের মাঝখানে একটী 'অপ্সরা দ্বীপ' আছে; সেখান থেকে ফিরবার সময় হঠাৎ

ক্যুলীনের পদতলে

কালবৈশাখীর মত উন্মত্ত ঝড়ে নৌকা ডুবে যাবার যোগাড় হয়েছিল তখন আমরা উত্তাল তরঙ্গে অসহায় শিশুর মত ভেসে যাবার জন্য প্রস্তুত হইনি; অথবা ক্ষীণ কণ্ঠে দুর্ব্বল ভাষায় ভগবানের নাম স্মরণ করে ক্ষান্তও হইনি। সেদিন আমরা কবি ক্যাম্বেলের 'লর্ড আল্লিনের কন্যা' কবিতা আবৃত্তি করে উৎসাহ সঞ্চার করেছিলাম; তারপরে ঠিক করলাম যে এসো সবাই মিলে গান ধরা যাক। তখন বুঝতে পারলাম যে জড়বাদ বস্তুবাদ প্রভৃতিতে মগ্ন থেকেও ইয়োরোপ কেমন করে নির্ব্বিবাদে জরাকে জয় করে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বেঁচে থাকে। এদের আমাদের মত আধ্যাত্মিক সম্পদ নেই; তবু এরা আমাদের চেয়ে কত বেশী আনন্দ পেয়ে যাচ্ছে। সকলেরই জীবনের শেষ পরিণতি মৃত্যুতে; তবে কেন যে কদিন বেঁচে থাকব সে কদিন প্রাণের প্রাচুর্য্য থাকবে না? যে কখনো ভোগই করল না, তার ত্যাগের মহৎ দুঃখ লাভের সৌভাগ্য কোথায়? যে সংসারকে মলিন পুষ্করিণীর উপরের শৈবালদল সরিয়ে নীচের জলবিন্দু মাত্র গ্রহণের চেষ্টার মতন অসম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করল সে সংসারীর সন্ন্যাসে মহিমা কোথায়? যে আত্মনির্ভরশীলতায় সাহসে ত্যাগে আমরা দুঃখ বিপদকে তুচ্ছ করতে পারতাম তা আমাদের নেই। আছে শুধু দুর্ব্বল কান্না। তাই জীবনকে দেখি অসহায়ের চোখ দিয়ে।

এমনই ইয়োরোপে মানুষের প্রকৃতি আপনা থেকে অকারণে সুদূর অনির্দ্দিষ্টের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠে; তার উপর বহিঃপ্রকৃতি যখন অন্তঃপ্রকৃতিকে ডাক দেয় তখন মনে যে বিচিত্র লীলার আভাস পাই তার পরিচয় কি করে দেওয়া যায়? সারাটা দিন ক্যুলীন পর্ব্বতের সঙ্গে যুদ্ধ করে যখন নীচে নেমে আসছি, শ্রান্তির মধ্য দিয়েও একটুখানি জয়ের আনন্দ ফুটে উঠেছে আর বহুদূরে যেখানে রাত্রির জন্য আশ্রয় মিলবে সেই হোষ্টেলের অনাড়ম্বর আরাম ও বাহুল্যহীন বিলাসের কথাও মনে জেগে উঠছে তখন নীচের ঝরণায় দুটী বালিকাকে বসে থাকতে দেখা গেল। কনককেশিনী তাদের কেশে বেশে মেঘমুক্ত একটী সূর্য্যরশ্মি এসে পড়েছে; তাদের নীল সরল চোখে তাদের দেশের মেঘান্তরালের নীলনভস্তলের আভা যেন ধরা পড়েছে; আর মনে হচ্ছে যেন সমস্ত হেব্রি-ডিস দ্বীপপুঞ্জের আত্মার প্রতীক হয়ে বসে আছে তারা। একটী কথা আপনি মনে এল—'বিদেশিনী'।

এই বিদেশিনীকে ঘিরে কত কল্পনা, কত কাব্যরচনা, কত হৃদয়োচ্ছ্বাস। রূপকথার রাজপুত্র যার সন্ধানে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় সাতসমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে-ই বিদেশিনী। বৃক্ষলতার অনন্ত আনন্দমর্ম্মরে, শুভ্র অভ্রদলের লীলাকলায়, ঘনবনশয়নের শ্যামলিমায় যার আভাস পাই সে-ই বিদেশিনী।

সে কিন্তু চিরকাল সকলের সন্ধানের অবসান ও প্রাপ্তির অতীত হয়েই রইল,—সে শুধু একটু আনন্দের কণিকা যাকে অনুভব করা যাবে, স্পর্শ করা যাবে না, দেখা যাবে না। গোপন বলেই সে মধুর, নীরব বলেই তার জন্য কবির বাঁশী চিরন্তন মুখর, অপ্রকাশ বলেই তাকে প্রকাশ করবার জন্য ভুবন-ভরা এত আয়োজন। কিন্তু সে ত মানবের দেশের নয়, সে যে বিদেশিনী।

* * *

একটী উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। 'লেক ডিষ্ট্রিক্টে'—ডারওয়েণ্ট ওয়াটার হ্রদের কাছে নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াচ্ছি। স্কাই দ্বীপের উপায় ওয়ার্ডস্বার্থের এলাকায় পাওয়া যাবে না। এখানে শুধু একটী মধুর প্রকৃতি বালিকার আত্মা আছে সে হচ্ছে পৃথিবীর তিলোত্তমা-বালিকা কবির মানসসৃষ্টি লুসি গ্রে। লুসিকে পৃথিবীতে খুব কম লোকেই দেখেছিল; কিন্তু কবি তাকে যেভাবে দেখেছিলেন তা আমাদের কাছে অমর হয়ে আছে। লুসি যে আমাদের কাছে ধরা না দিয়ে অলক্ষ্যে পাহাড়ের ঝড়ের রাতে শিস দিয়ে দিয়ে নেচে নেচে বেড়ায় সে কথা যেকোন গ্রামবৃদ্ধ এখনো হলপ্ করে বলতে পারে।

হাইল্যাণ্ডসের সঙ্গে লেকডিষ্ট্রিক্টের তফাৎ যে শুধু এই-খানে তা নয়; তবে এ থেকেই প্রভেদের মূল সুরটুকু

নদী ও সমুদ্র যেখানে একাকার হয়ে গেছে

সেই পাগলামীভরা দিনগুলি অনেকটা পিছনে পড়ে রয়েছে। "গ্লেন ব্রিট্‌ল্" নামক জায়গার যেখানে অতলান্ত মহাসাগর ও নদী এক হয়ে বৃক্ষান্তরালে মিশে গিয়েছে তার পার ধরে ধরে সারাদিন কণ্টকলাঞ্ছিত জঙ্গলে 'ভাইকিং'-দের কবর খুঁজে বেড়ানর উদ্দামতা এখন আর নিজের কাছেই অনু-মোদিত হবে না। সেখানে লোকের বিশ্বাস ছিল যে প্রতি হ্রদে পর্ব্বতে গিরিগুহায় কোন না কোন যক্ষ বা প্রেতাত্মা বা ওইরকম একটা কিছু আছে; প্রত্যেক জায়গার সঙ্গে উপ-দেবতার আবির্ভাব সম্বন্ধে গল্প জড়ান আছে। আর প্রত্যেক লোকেরই নিজের বংশের সর্ব্বযত্নসংরক্ষিত ভূতের কাহিনীও পাওয়া যেত। সে সব রাত্রিতে সময় কাটাবার রোমাঞ্চকর বুঝতে পারা যাবে। উত্তরাঞ্চলে প্রকৃতির মধ্যে পাই ভীষণ রমণীয়তা, এখানে পাই স্নিগ্ধ কমনীয়তা; সেখানে পাই আদিম জীবনের উল্লাস, এখানে মার্জ্জিত রুচির বিকাশ; সেখানে পেয়েছি আনন্দ, এখানে পেলাম পরিতৃপ্তি।

এই দুটী অঞ্চলের দুটী বিশেষত্বমূলক ইয়ুথ হোষ্টেলের সংলগ্ন প্রান্তর দেখলেই বুঝা যাবে। 'কেজিকে' কবি শান্ত স্নিগ্ধ যে প্রকৃতিতে আনন্দ পেয়েছিলেন মানুষ সে প্রকৃতিকে অপ্রাকৃত চেষ্টা দিয়ে সুন্দরতর করে তুলেছে; উত্তরাঞ্চলে মানুষ গিয়েছে প্রাণের চঞ্চলতার বশবর্ত্তী হয়ে; তার পদচিহ্ন প্রকৃতি স্বহস্তে মুছে নিয়ে নিজ গম্ভীর মহিমায় লুপ্ত থাকবে।

এই হ্রদগুলির আশে পাশে যে সব লোক বেড়াতে এসেছে তাদের মধ্যে অনেক ধনী ও বিলাসীও আছে। কিন্তু তাদের আমরা পথচারীর দল গণনার মধ্যেই আনি না। তারা হচ্ছে শান্তিভঙ্গকারী; নির্জ্জনতার পবিত্রতা তারা

হোষ্টেল—ইংলণ্ডে

ধ্বংস করেছে। তাদের মটরগাড়ীর বহর ও হোটেলের ভোজন নিশ্চয়ই ওয়ার্ডস্বার্থের আত্মার অবমাননা করছে এবং গ্রাসমেয়ার হ্রদের রাজহংসটীর জলকেলির সঙ্গেও সামঞ্জস্য রাখতে পারছে না একথা মনে করে সান্ত্বনা লাভ করে হ্রদের মধ্যে নৌকা বাইতে নেমে পড়ি। তারা পারে দাঁড়িয়ে দেখে বা মটরলঞ্চে ঘুরে বেড়ায়। "উইনাণ্ডার" হ্রদের তীরবর্ত্তী যে বালক পেচকধ্বনির অনুকরণের পরে গভীর নীরবতার মধ্যে সহসা জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে প্রকৃতির বিরাট আহ্বানে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত দেখতে পেয়েছিল তার মত সৌভাগ্য কোন না কোন দিন হয়ত পাব, আর ওই মোটর-বিহারীর দলের মত কবির গৃহের দোকান থেকে একটী কবিতা সঞ্চয়ন কিনে নিয়েই ফিরে যেতে হবে না। জীবনে পরমক্ষণ অতি দুর্লভ, এবং অতি অপ্রত্যাশিত ভাবেই তা আসে। তার জন্য অহরহ নিজেকে প্রস্তুত রাখব।

গ্রাসমেয়ারের হোষ্টেলে সেদিন রাত্রে মহা আনন্দ। এক-দল জার্ম্মান পথচারী ও পথচারিণী এসেছে; তারা নানা কলাবিদ্। ইংলণ্ডের মত দেশেও এরা নিজেদের অন্তরের গভীরতায়, উৎসাহের প্রাচুর্য্যে ও নিয়মানুবর্ত্তিতায় সকলকে চমৎকৃত করে দিল। রাত্রে তারা নানা ভাষায় কত গান গাইল, কত বিভিন্ন রসের ভাবের গান। দেখে মনে হয়

হোষ্টেল—হাইল্যাণ্ডে

যেন এদের দেশের প্রতিনিধি হয়ে বিদেশে এসেছে। যেখানে যায় সৌজন্যে ও চরিত্রের বিশেষত্বে সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করে। ইতি মধ্যে আরো গভীর রাত্রে একটা ব্যাপার

হল। অন্ধকার সিঁড়ির এক কোণা থেকে ধীরে ধীরে একটা অস্ফুট স্প্যানিশ গীতারের ধ্বনি উঠল; ধীরে ধীরে সে ধ্বনি উচ্চতর হল ও তার সঙ্গে ইয়োরোপীয় 'টেনর' কণ্ঠে একটী ইটালীয় গান আরম্ভ হল—"সোলো পারে তে, লুসিয়া",

গ্রাস্মেয়ারের রাজহংস

লুসিয়া, শুধু তোমারই জন্য। এই বিখ্যাত গানটী বর্ত্তমান ইটালীর শ্রেষ্ঠ গায়ক জিলি (Gigli) স্বয়ং রেকর্ডে গেয়েছেন; সে গান যেন সমস্ত হোষ্টেলটাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত করে রাখল। নিয়ম মত রাত্রি ১১ টার পর কেহ শোবার ঘরের বাইরে আসতে পারবে না; কিন্তু আমরা সবাই সে নিয়ম ভঙ্গ করলাম। নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অন্ধকারে একটী একটী মূর্ত্তি সমবেত হতে লাগল। বিরাটকায় অনুভবের চিহ্নমাত্র-হীন মূর্ত্তি 'ওয়র্ডেন' নিজে সেখানে আসল, তার মুখে নিয়ম ভঙ্গের জন্য বিরক্তি বা ভর্ৎসনার চিহ্নও নেই; মুখে তার একটা আনন্দের উত্তেজনা, একটা তৃপ্তির আভাস। সেই ইটালীয় গান নীরব নিশীথিনীর অন্তরের সুরটী যেন আমাদের সামনে উদ্ঘাটন করে দিল।

তারপর দিন এখানকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত 'হেলভেলিনে' মহাসমারোহে আরোহণ করলাম। কিন্তু তার চূড়া থেকে ওয়ার্ডস্বার্থের দেশ দেখতে দেখতে পরিশ্রমের কথা একটুও মনে হল না। কার যেন স্নিগ্ধ হস্ত স্পর্শে সব ক্লান্তি সব গ্লানি মুছে গিয়েছে। রাত্রের গানের রেশটুকু বার বার মনে করিয়ে দিতে লাগল যে, ভাল লাগে, ভাল লাগে ইয়োরোপের

হেল্‌ভেলীন শৃঙ্গে লেখক

এ আনন্দময়, উল্লাসময়, মুক্ত জীবন যা পায়ে পায়ে চ'লে দুঃখকে দূরে সরিয়ে রাখে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে—সে জীবন আমার ভাল লাগে। 'সোলো পারা তে', হে ইয়োরোপা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

বরষা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

বাহিরে বরষা ঝরে ডাক্‌ছো মোরে
এখন ওখানে যাবো কেমন কোরে ?
তুমিই এখানে চলে এসো না নিজে
আমার এ ঘরে এসো বৃষ্টি ভিজে।

ভিজ্‌লে তোমাকে বেশ দেখাবে ভালো,
ভিজ্‌বে তোমার ছুটি নয়ন কালো,
মুক্ত কবরী থেকে ঝর্‌বে বারি
ভিজ্‌লে তোমাকে ভালো দেখাবে ভারি।

তোমার নয়ন থেকে কাজল যাবে,
বৃষ্টি কপোল থেকে রং মোছাবে ;
গায়েতে আঁচল খানি লেপ্টে রবে
ভিজ্‌লে ভালোই তুমি দেখ্‌তে হবে।

আমার ঘরের মাঝে বৃষ্টি হবে
অঙ্গে তোমার জল ঝর্‌বে যবে।
হের্‌বো আকাশ কালো শিথিল বেশে
ঝর্‌বে বরষা যাবে ঘরটি ভেসে।

ছুট্‌বে নয়নে তব বিজলি আলো,
ফুট্‌বে অধরে তব হাসি ধারালো ;
আমার হৃদয় মন চম্‌কে যাবে
ভিজ্‌লে তোমাকে বেশ ভালো দেখাবে।

বাইরে বাদল ধারা অঝোর ঝরে,
অঝোরে ঝর্‌বে চুমা সিক্তাধরে ;
কপোল অধর আর নয়ন চুমি'
আন্‌বে আমার চোখে তন্দ্রা তুমি।

আমার মনের মাঝে বৃষ্টি হবে
তোমার কণ্ঠে সুর ঝর্‌বে যবে।
মধুর কণ্ঠ হোতে সুরের ধারা
ঝর্‌বে বাদল সম আপন-হারা !

ভাস্‌বে ঘরটি মোর ভাস্‌বে মন,
ভাস্‌বো সুরের স্রোতে মোরা দু'জন।
তাই তো তোমাকে ডাকি এসোগো নিজে
আমার এ ঘরে তুমি বৃষ্টি ভিজে।

তামিল জাতির উৎপত্তি ও প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, এম-এ ভাষাতত্ত্বরত্ন

৮। তামিল সাহিত্যের গৌরবের সময়। (১)

এখন হইতে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে মহানদী, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর উপত্যকাগুলি মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং উহাদের দক্ষিণভাগ তামিল দেশ সংলগ্ন ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের তখন অপ্রতিহত প্রভাব ছিল এবং অনার্য্য জাতিরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়টি ব্রাহ্মণদের বড়ই অগৌরবের সময় ছিল। ব্রাহ্মণগণ আপনাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন। অতএব খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে সংস্কৃত সাহিত্যের অতি অল্প গ্রন্থই রচিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী রাজাদের সাহায্যে পাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। গুপ্ত রাজাদের সময় সংস্কৃত সাহিত্য পুনর্জ্জীবন লাভ করিল। সংস্কৃত ভাষায় নানা বিষয়ের অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইতে থাকিল এবং লুপ্ত পুস্তকের পুনরুদ্ধার হইতে লাগিল। এই সময় পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন ইত্যাদি অনেক শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার হইয়াছিল এবং অনেক কাব্য, নাটক ইত্যাদি রচিত হইয়াছিল।

যে সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যের অশেষ দুর্গতি, সেই সময়টি তামিল সাহিত্যের বিশেষ গৌরবের সময়। এই সময়ে প্রাচীন তামিল ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সকল প্রাচীন তামিল গ্রন্থ হইতে শুধু যে, তামিল জাতিরই বিবরণ পাওয়া যায় এমন নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিরও অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থ বহুদিন যাবৎ নিভৃত অন্ধকারে অবস্থান করিয়া রুদ্ধশ্বাস হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে আলোক ও বাতাসে আনীত হইয়া তাহাদের পুনর্জ্জীবন লাভ হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলি অতি প্রাচীন তামিল ভাষায় লিখিত বলিয়া এবং ইহাদের মধ্যে বিজাতীয় ধর্ম্মের পোষকতা আছে বলিয়া তামিল অনুসন্ধানকারীদের নিকট আকর্ষক বলিয়া বোধ হয় নাই। এতদিন শৈব ও বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা তাঁহাদের ছাত্রদের পক্ষে এই সকল গ্রন্থ স্পর্শ করা পাপ বলিয়া শিক্ষা দিতেন। শৈব ও বৈষ্ণব মঠের পুস্তকাগার মধ্যে থাকিয়া এই গ্রন্থসমূহ ধূলিরাশিতে পরিণত হইত। কেবল কতকগুলি উৎসাহী বিদ্বানের যত্নে ইহাদিগকে বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করা হইয়াছে, এবং অনেকগুলিকে মুদ্রিত করাও হইয়াছে।

৯। তামিল সাহিত্যের প্রাচীনত্ব। (২)

য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বের লিখিত কোনো তামিল সাহিত্য নাই। এ ধারণা নিতান্ত অমূলক। তামিল সাহিত্যের অমূল্য রত্নরাজি নবম শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্য মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, উহার কতকগুলি গ্রন্থ খৃষ্টজন্মের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এবং ঐ প্রাচীন কালেই তামিল জাতি সমৃদ্ধ ও উচ্চ সভ্যতায় উপনীত হইয়াছিল। আরব, গ্রীক্ ও রোমান জাতির এবং যবদ্বীপবাসীদের সহিত তাহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রচনা প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীকেই তামিল সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই পাণ্ড্য রাজা উগ্রের সময় মাদুরাতে তামিল কবিদের শেষ সঙ্ঘ বা পরিষদের অধিবেশন হইয়াছিল। এই কালের অন্ততঃ পঞ্চাশজন কবির গ্রন্থাবলী এখন হস্তগত হইয়াছে। এই কবিরা বিভিন্ন জাতীয়, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এবং তামিল দেশের বিভিন্ন অংশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিগ্রন্থ, কেহ কেহ বৌদ্ধ এবং কেহ

(১) V. Smith's Ancient History of India.

(২) V. Smith's Ancient History of India.

কেহ ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং কবি সংখ্যা মধ্যে রাজা, ধর্ম্মযাজক, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, কৃষক ও শিল্পোপজীবি ছিলেন। এই সকল কাব্য পাঠে জানা যায় যে, তামিল দেশে সে সময়ে বৌদ্ধেরা ও জৈনেরা প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত তাহারা বুদ্ধের বা তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি স্থাপনা করে নাই। শিব, বিষ্ণু ও সুব্রহ্মণ্যের মন্দির ব্যতীত ইন্দ্র ও বলদেবের মন্দিরও ছিল। সে সময়ে তামিল দেশে ব্রাহ্মণ ছিল এবং তাহারা আপনাদিগকে দ্বিজ বলিত, কিন্তু রাজারা বা বণিকরা দ্বিজ নামের প্রয়াসী ছিল না। তামিল দেশের অধিকাংশ লোক প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বাস করিত বটে, কিন্তু উহার অংশ-বিশেষে অনেকে গোপাল ও মেষপালের কার্য্য করিত এবং নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহবিহীন ছিল।

প্রাচীন তামিল কাব্যসমূহ হইতে প্রাপ্ত উপরি-উক্ত বিবরণের সহিত প্লিনী ও টলেমী লিখিত ভৌগলিক বিবরণের এবং পেরিপ্লাস নামক গ্রন্থোক্ত বিবরণের মিল আছে। ইহা হইতে ঐ সকল গ্রন্থের প্রাচীনতার অতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ৭৯ খৃষ্টাব্দে প্লিনীর মৃত্যু হয়। পেরিপ্লাস ৮০ হইতে ৮৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত। ১৬৩ খৃষ্টাব্দে টলেমীর মৃত্যু হয়। টলেমী স্বকীয় গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের যে সকল বন্দরের সূচী দিয়াছেন, তাহাদের উল্লেখ প্রাচীন তামিল কাব্যগ্রন্থে আছে। কয়েকখানি পুরাণে, দীপবংশে ও মহাবংশে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার সহিত তামিল কাব্য বর্ণিত রাজাদের রাজত্বকালের সামঞ্জস্য আছে। পুরাণগুলি খুব সম্ভবতঃ গুপ্ত বংশের রাজাদের সময় সংগৃহীত হইয়াছিল। মহাবংশ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল এবং দীপবংশ তাহারও পূর্ব্বে।

১০। প্রাচীন তামিল সাহিত্য অনুসারে তামিল দেশের আদি অধিবাসী (১)

প্রাচীন তামিল সাহিত্যে প্রাচীন কালের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বিল্লবর ও মীনবর এই দুইটী জাতিই তামিল দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী। বিল্লবরেরা (ধনুর্দ্ধর) পার্ব্বত্য প্রদেশে ও জঙ্গলে বাস করিত এবং ব্যাধ বৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করিত; এবং মীনবরেরা (মৎস্যজীবী) উপত্যকা ও সমতল ভূমিতে বা সমুদ্র-তীরে বাস করিত এবং মৎস্য মারিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এই দুইটী জাতি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের ন্যায় মনুষ্য এখনও অনেক পরিমাণে রাজপুতনায় ও গুজরাটে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের আধুনিক নাম ভীল এবং মীনা।

১১। পরবর্ত্তী নাগ জাতি।

এই অসভ্য বর্ব্বরেরা নাগ জাতি দ্বারা বিজিত হইয়াছিল। নাগদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল এবং তাহারা অনেক পরিমাণে সভ্য ছিল। তাহারা কোনো না কোনো সময়ে ভারতবর্ষের, সিংহলের ও ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ স্থানে রাজত্ব করিত। রামায়ণ ও মহাভারতে নাগদিগের বিবরণ পাওয়া যায়। রামায়ণ হইতে জানা যায় যে দাক্ষিণাত্যের মধ্যস্থলে নাগদের রাজধানী ছিল। মহাভারতে যমুনা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে খৃষ্ট জন্মের ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে অনেকগুলি নাগরাজের উল্লেখ আছে। যে স্থানে ইন্দ্রপ্রস্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই স্থানের নাগদিগকে বিতাড়িত করিতে হইয়াছিল। জন্মেজয় নাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন অর্থাৎ নাগদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। জরৎকারু মুনি নাগকন্যা মনসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক সময়ে খৃষ্টের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে একটী শূদ্র বা নাগ বংশ মগধে রাজত্ব করিয়াছিল। সিংহল দেশের ইতিহাসে প্রথমেই নাগ বংশের বিবরণ আছে এবং সিংহলের আর একটি নাম নাগদ্বীপ। প্রাচীন সৌধে বা মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ মনুষ্য মূর্ত্তির পৃষ্ঠদেশে সাপের ফনার আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। তামিল কাব্যে নাগেরা অর্দ্ধমনুষ্য ও অর্দ্ধসর্প বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল তামিলেরা প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল, তাহারা বলিত যে নাগ-শাসিত রাজ্যসমূহ অপেক্ষা অধিক প্রাচীন রাজ্যের কথা তাহাদের স্মরণ হয় না। এখনও নাগপুর ও ছোটনাগপুর এই নাম দুইটি ভারতবর্ষে নাগজাতির প্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। চোল রাজবংশে নাগকন্যার বিবাহের কথা শুনা যায়।

(১) V. Kanak Sabhai.

নাগজাতির কয়েকটি শাখা ছিল, যথা মারবার, এইনর, ওলিয়র, অরুন্দাদুর এবং পরথবর। ইহাদের মধ্যে মারবারেরাই অধিক বলবান ও প্রতাপান্বিত ছিল। তাহারা তামিল রাজাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত। নাগেরা তামিল রাজাদের সৈন্যে অনেক সংখ্যায় প্রবেশ করিত এবং কখনো কখনো সৈন্যাধ্যক্ষের পদেও উন্নীত হইত। তাহারা উচ্চ রাজকর্মচারীও হইত। ২য় শতাব্দীতে চোল রাজ্যের সাময়িক অধঃপতনের সময় নাগেরা চোল রাজ্যের রাজা হইয়াছিল। নাগেরা বয়ন-বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। কনকসভাই বলেন যে আর্য্যেরা নাগদের নিকট লিপিবিদ্যা শিখিয়াছিলেন এবং এইজন্য সংস্কৃত বর্ণমালার নাম দেবনাগরী।

১২। তামিল জাতির দাক্ষিণাত্যে আগমন (১)

যখন আর্য্যেরা প্রথমে কাবুল উপত্যকা হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন একদল মোঙ্গোল জাতীয় পীতবর্ণ মনুষ্য উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তখন গঙ্গার উপত্যকা কৃষ্ণবর্ণ নাগ জাতি দ্বারা অধিকৃত ছিল। এই নূতন জাতি সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়। এই জাতি বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত হইতে নৌকাযোগে দাক্ষিণাত্যে গিয়া উহা অধিকার করে, এইজন্যই এই জাতির নাম তামিল। তাম্রলিপ্তি কথাটি সংক্ষিপ্ত হইয়া তামিল হইয়াছে(কনক সভাই)। অনেক প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থেও তমলুকের নাম পাওয়া যায় এবং ঐসকলে উহার নাম দামলিপ্তি; অর্থাৎ দামল জাতির একটা প্রধান নগর। বাঙ্গালায় যে এককালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল ইহা হইতে তাহাই কতক বুঝা যায়।

যে সকল মোঙ্গোলীয় উপজাতি দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করিয়া নাগদিগকে পরাজিত করিয়াছিল তন্মধ্যে মারবারেরাই সর্ব্বপ্রাচীন। তাহারা পলয়ন প্রাচীন নামে অভিহিত হইত। তাহাদের রাজধানী কুমারিকা অন্তরীপের নিকট পোথিয় পর্ব্বতে ছিল। পাণ্ড্য রাজারা মারণ বংশজ বলিয়া শ্লাঘা করিতেন। মারণ শব্দ ও ম্রানমর শব্দ একই বলিয়া বোধ হয়। ম্রানমরেরা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ জয় করিয়াছিল।

(১) V. Kanak Sabhai.

থেরিয়র নামক জাতি বঙ্গদেশবাসী ও নৌসাধন ছিল। তাহারা নিম্ন বঙ্গ হইতে সমুদ্রপথে ব্রহ্ম, কোচিন-চায়না, সিংহল ও দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছিল। এই বংশের থিরয়ণ নামক কাঞ্চীর রাজা, বিষ্ণুকে তাহার পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। প্রথম শতাব্দীর তামিল কাব্যোক্ত সর্ব্বপ্রাচীন চোল রাজার নাম মুচুকুন্দ।

আর একটী তামিল উপজাতির নাম 'বনবর' বা স্বর্গীয়। তাহারা বঙ্গদেশের পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসী ছিল। তাহারা দক্ষিণ ভারতে আসিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে, যথা সালেম প্রদেশের কোল্লী পর্ব্বতে, পশ্চিম ঘাটে ও নীলগিরিতে বাস করিয়াছিল। চের চেম কুট্টুবন নামক একজন চের রাজা সিংহল রাজ প্রথম গজবাহুর এবং মগধ সম্রাটদের সমসাময়িক ছিল। কর্ণবংশীয়েরা খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে মগধ রাজ্য শাসন করিয়াছিল এবং ত্রি-কলিঙ্গের অধীশ্বর ছিল।

তিনটী তামিল উপজাতি—মরবর, থিরয়র ও বনবর দ্বারাই পাণ্ড্য, চোল, ও চের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। অশোকের অনুশাসনে এই তিন রাজ্যের উল্লেখ আছে।

তামিল উপজাতিসমূহ মধ্যে কোসর উপজাতিই দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক আগন্তুক। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে তাহারা মারণ পলয়ন রাজ্যের রাজধানী মোহুর অধিকার করিবার চেষ্টায় মৌর্য্যদের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে তাহারা কোঙ্গো (কোইম্বাটোর) অধিকার করে। অতএব দাক্ষিণাত্যে তাহাদের বসবাস খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে হইয়াছিল। তাহারা বীর যোদ্ধা বলিয়া কথিত হয় এবং পাণ্ড্য রাজাদের সম্মানিত প্রজা বলিয়া গণ্য হইত। কোশরেরা সম্ভবতঃ কুশান বংশীয়।

তামিল আগন্তুকেরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহাদের সংখ্যাও নাগদের ও দ্রাবিড়ীদের সংখ্যাপেক্ষা অনেক কম ছিল বলিয়া তাহারা পুরাতন দ্রাবিড়ী ভাষাই গ্রহণ করিয়াছিল এবং কালক্রমে তাহারা ইহার পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করিয়া লইয়া ইহাকে তামিল ভাষায় পরিণত করিয়াছিল। তামিল (ও মালায়ালম) ভাষায় (rzha) বর্ণটী অন্য কোনো দ্রাবিড়ী ভাষায় বা সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। এই বর্ণটী কতকগুলি

তীব্বতীয় ভাষায় পাওয়া যায় এবং ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে তামিলেরা তিব্বত মালভূমির লোক। তাহারা যে আর্য্য-বংশ সম্ভূত নয় তাহা তাহাদের আর্য্য-বিদ্বেষ হইতে, এবং সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে তাহাদিগকে বিদেশীয় বলিয়া উল্লিখিত হওয়াতে বোঝা যায়।

১৩। তামিল ভাষার ভাব ও শব্দ-সম্পদ।

তামিল ভাষার ভাবসমূহ ও শব্দসম্পদ এত প্রচুর যে শুদ্ধ তামিল-সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইহা হইতেও বোঝা যায় যে দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদের পদার্পণের পূর্ব্বেই তামিলেরা উচ্চ সভ্যতায় আরোহন করিয়াছিল। সঙ্গীতের, ব্যাকরণের, জ্যোতিষের এমন কি দর্শন শাস্ত্রের অবিচ্ছিন্ন (abstract) শব্দগুলিও তামিল ভাষা হইতে উৎপন্ন। ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে আর্য্যদেব দাক্ষিণাত্যে আগমনের পূর্ব্বেই এই সকল বিজ্ঞান তামিল-দেশে অনুশীলিত হইয়াছিল। তামিল ভাষায় ঙ, ঞ, ন ইত্যাদি সানুনাসিক বর্ণের প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা তাহাদের ব্রহ্মবাসী ও চীনবাসীদের সহিত সম্বন্ধ সূচিত করে। মালয়ালম (অর্থাৎ প্রাথমিক তামিল) ভাষায় সানুনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য্য দেখিয়া অনুমান হয় যে তামিলেরা তখনও দ্রাবিড়ী ভাষায় পরিপক্ব হয় নাই। পরে দ্রাবিড়ী ভাষার সংমিশ্রণে তামিল ভাষা মালয়ালম ভাষা হইতে পৃথক হইয়া গেল। প্রাচীন মালয়ালমের সহিত মোঙ্গোলীয় ও মাঞ্চু ইত্যাদি ভাষার সাদৃশ্য আছে।

১৪। অগস্ত্য ঋষি।

তামিল কবিরা অগস্ত্য ঋষি ও তাঁহার সহিত একদল আর্য্য ঔপনিবেশিকের দাক্ষিণাত্যে আগমনের কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিতেন। নাসিকের নিকট অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। ইহা হইতে বোঝা যায় যে রামায়ণের কালে অগস্ত্য গোদাবরী নদীর দক্ষিণে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। যে ভূভাগে আজ-কাল মহারাষ্ট্র দেশ অবস্থিত তখন তাহা দণ্ডকারণ্য দ্বারা অধিকৃত ছিল। ইহা রাক্ষস বা বন্যজাতিসঙ্কুল নিবিড় বন ছিল। ইহারই পরপার্শ্বে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে যে ভূখণ্ড, তাহার নাম ছিল জনস্থান; অর্থাৎ সভ্য মনুষ্য-কর্তৃক অধ্যুষিত স্থান বা দেশ। রামকে জনস্থানে অর্থাৎ অন্ধ্র, চের, চোল ও পাণ্ড্য দেশে সীতার অন্বেষণে যাইতে বলা হইয়াছিল। অতএব রামায়ণ রচনার সময়েও ঐ সকল দেশ জ্ঞাত ছিল। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত কাত্যায়নের পাণিনি বর্ত্তিকেও পাণ্ড্যদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৫। পাণ্ড্য রাজ্যের উৎপত্তি। (১)

অতএব খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে পাণ্ড্য রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কে এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে অর্জ্জুন পাণ্ড্যরাজ মলয়ধ্বজের কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর ভারতে প্রচলিত মহাভারতে এ গল্প নাই। অতএব ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। অন্যান্য বিবরণে যথা ম্যাগাস্থিনিসের বিবরণে পাওয়া যায় যে এই রাজ্য এক রাজকন্যা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্লিনী বলেন যে, হার্কুলিসের কন্যা পাণ্ডী এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাত্রী। প্রাচীন তামিল কাব্যসাহিত্যেও বলা হইয়াছে যে, একজন স্ত্রীলোক দ্বারাই এই রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। চিলপ্পথিকারম্ গ্রন্থে তাঁহাকে মাথুরাপাখি (মথুরাপতি) বলা হইয়াছে। কোনো মারর বংশীয় রাজার সহিত সেই রমণীর বিবাহ হইয়াছিল। পাণ্ডুরমণী দ্বারা স্থাপিত বলিয়া এই রাজ্যের নাম পাণ্ড্য। যদিও পাণ্ড্যবংশীয় তামিল রাজারা আপনাদিকে পাণ্ডুবংশীয় বলিয়া ঘোষণা করিত, তথাপি তাহারা আপনাদিগকে তামিল ছাড়া আর্য্য বলিত না।

১৬। তামিল দেশে আর্য্য প্রভাব (২)

আর্য্যেরা শস্ত্রবলে তামিল দেশে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহারা শান্তভাবে এ দেশে বসবাস করিতে আসিয়াছিলেন। পোথীয় পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অনেক ব্রাহ্মণ ঔপনিবেশিকের বাস

(১) V. Kanak Sabhai.
(২) V. Kanak Sabhai.

দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের বিশ্বাস যে এইস্থানে অগস্ত্য ঋষি বাস করিতেন। তামিল রাজ্যের অনেক গ্রামে ও নগরে বহু ব্রাহ্মণের বাস।

আয়র জাতির লোকেরা গোপ। অ শব্দের অর্থ গো। পুরাণে ইহারা আভীর বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহারা বলে যে, পাণ্ড্যরাজ্যের স্থাপয়িতার সহিত তাহারা তামিল দেশে আসিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণের উপাসক।

১৭। তামিল সামাজিক জীবন। (১)

পাণ্ড্য, চোল ও চের বংশীয় রাজারা ও তাহাদের অধীনস্থ প্রধানেরা সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত থাকিত। এরূপ অশান্তির সময় শান্তিসুলভ সাহিত্য, কলা, বাণিজ্য ইত্যাদির কিরূপে বিকাশ হইয়াছিল? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে সে সময়ে কেবল যুদ্ধ ব্যবসায়ীরাই যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত। অন্যেরা প্রাচীরবেষ্টিত নগরে থাকিয়া নির্ব্বিরোধে স্ব স্ব বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকিত। যে সকল দরিদ্র লোক গ্রামে বাস করিত তাহাদের উপর উপদ্রব হইত না। ব্যবসায়ীরা পণ্য লইয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে দলবদ্ধ হইয়া যাইত। তখন রাজ সৈনিকেরা তাহাদিগকে রক্ষা করিত।

১৮। তামিল রাজতন্ত্র। (২)

বংশানুক্রমিক রাজারাই শাসন তন্ত্রের অধিনায়ক ছিল কিন্তু তাহাদের ক্ষমতার যথেচ্ছ চালনা প্রতিরোধ করিবার জন্য পাঁচটী পরিষদ ছিল। দেশের প্রতিনিধি, ধর্ম্মযাজক, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, জ্যোতিষী এবং মন্ত্রীগণ দ্বারা এই সকল পরিষদ গঠিত হইত। এক একটী পরিষদের হস্তে এক একটি কার্য্যের ভার থাকিত। প্রতিনিধিনির্ম্মিত পরিষদ জনসাধারণের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিত। ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্মোৎসব ইত্যাদির পরিচালনা করিত। চিকিৎসকেরা রাজা ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিত। জ্যোতিষীরা সাধারণ উৎসবের লগ্ন নির্ণয় করিত। এবং মন্ত্রীরা কর সংগ্রহ ও ব্যয়ের পরিদর্শনে এবং বিচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। অধিক প্রয়োজনের সময় পাঁচটী পরিষদই রাজ সভায় একত্রিত হইত। রাজ্য-শাসন রাজা ও তাঁহার পাঁচটি পরিষদের হস্তে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত ছিল। পাণ্ড্য, চোল ও চের এই তিনটি রাজ্যে একই নিয়ম ছিল। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তিনটীরই আদি রাজা মগধ রাজ্য হইতে এখানে আসিয়াছিলেন।

১৯। তামিল রাজা। (১)

রাজ-শরীর বহু সাজ-সজ্জায় এবং গৌরবে পরিবৃত থাকিত। রাজা অনেক পরিচারক দ্বারা সেবিত হইতেন—গন্ধদ্রব্য-বাহক, মালাকর, তাম্বুলবাহক, পরিচ্ছদ-রক্ষক, আলোকপ্রদর্শক ও শরীররক্ষক।

রাজমস্তক সুচাকার রত্নজড়িত রাজমুকুট দ্বারা শোভিত হইত। রাজ মনিবন্ধদ্বয়ে স্বর্ণবলয়, দক্ষিণ পদে স্বর্ণবেষ্টনী (মল) এবং গলায় মুক্তাহার বা রত্নহার পরিধান করিতেন। যখন তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিতেন তখন তাঁহার মস্তকোপরী মুক্তার ঝালরযুক্ত ছত্র ধারণ করা হইত। তিনি হস্তীপৃষ্ঠে বা ঘোটকোপরি বা রথমধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বারে দামামা নিনাদিত হইত। সময় নিরূপক ঘটিকা-যন্ত্র দ্বারা সময়ঘোষকেরা প্রত্যেক নালিকারই উত্তীর্ণ হওয়া ঘোষণা করিত।

রাজ প্রাসাদের এক অংশ রাণীর ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত। রাণীর রাজমুকুট পরিবার অধিকার ছিল না। তবে উত্তরাধিকার সূত্রে যদি তিনি রাণী হইতেন তাহা হইলে রাজমুকুটে তাঁহার অধিকার থাকিত।

২০। তামিল রাজকর্ম্মচারী। (২)

প্রধান রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে ছিলেন—প্রধান পুরোহিত, প্রধান জ্যোতিষী, মন্ত্রীগণ, এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণ। অপরাধীদের বিচারের এবং স্বত্বের বিচারের জন্য বিশেষ বিশেষ কর্ম্মচারী থাকিত কিন্তু সকল ব্যবহার-কার্য্যে (মামলাতে) রাজাই চরম বিচারক ছিলেন। প্রধান বিচারকের মস্তকে এক

(১) V. Kanak Sabhai.
(২) V. Kanak Sabhai.

(১) V. Kanak Sabhai.
(২) V. Kanak Sabhai.

প্রকারের বিশেষ বেষ্টন থাকিত। বিচারের জন্য অর্থীদের নিকট হইতে কোনো অর্থ গৃহীত হইত না।

২১। তামিল দণ্ড প্রণালী। (১)

কিন্তু শাস্তি অতি কঠোর ছিল; সেই কারণে অপরাধের সংখ্যা কম ছিল। প্রত্যক্ষ ধরা পড়িলে চোরের শিরশ্ছেদ হইত। কোনো লোক ব্যভিচার করিতেছে এমন অবস্থায় ধরা পড়িলে মৃত্যুদণ্ড হইত। ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে অনধিকার প্রবেশের জন্য পাদদ্বয় খণ্ডিত হইত। কুসংস্কারমূলক ভয় হেতুও রাজা কঠোর শাস্তি দিতে প্ররোচিত হইতেন। ঢেঁড়া দিয়া রাজপুরুষেরা রাজাজ্ঞা প্রচার করিত।

২২। তামিল রাজকর। (২)

শুল্ক ও কর রাজার আয়ের মূল ভিত্তি ছিল। সমুদ্র তীরবর্ত্তী বন্দর হইতে মালের উপর শুল্ক আদায় হইত। মাল বন্দরে নামিতেই তাহার উপর রাজ নামাঙ্কিত মোহর লাগান হইত এবং শুল্ক দিলে মালের ছাড় দেওয়া হইত। বড় বড় রাজপথে এবং সীমান্ত প্রদেশেও মালের উপর শুল্ক আদায় হইত। রাজকর নগদ টাকায় অথবা শস্যের দ্বারা প্রদত্ত হইত। সামন্ত রাজারা ও প্রধানেরা যে কর দিত তাহা হইতে এবং রাজার খাস অধিকারের বিষয় হইতে—যথা মুক্তা উত্তোলন, বন্য-হস্তী ধরিয়া বিক্রয়, বন বিভাগের বস্তু সমূহের বিক্রয় হইতে রাজার যথেষ্ট আয় হইত। ভূমির আয়ের ষষ্ঠ অংশের উপর রাজার ন্যায্য দাবী ছিল। জল সরবরাহের জন্যও চাষারা রাজাকে কর দিত।

২৩। তামিল সমাজের নেতা। (৩)

রাজা সমাজের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি শরীর রক্ষক দ্বারা বেষ্টিত হইয়া প্রজাদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন। রাজধানীতে তিনিই উৎসব ইত্যাদির নেতা হইতেন, এবং দুর্ভিক্ষের বা মড়কের সময় তিনিই প্রায়শ্চিত্ত কার্যে অগ্রণী হইতেন। তিনি প্রজাদের সুখ দুঃখের ভাগ লইতেন অথবা রাজ-সৌজন্য দেখাইবার জন্য তাঁহাকে এইরূপ করিতে বাধ্য হইতে হইত। রাজার প্রতি প্রজাদের যথেষ্ট ভক্তি ছিল। উৎসবের সময় সাধারণ দেবমন্দিরে রাজার জন্য প্রার্থনা করা হইত।

২৪। তামিল জাতি-বিভাগ (৪)

তামিলদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এরূপ জাতি বিভাগ ছিল না। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে দ্বিজ শব্দ ব্রাহ্মণের জন্যই প্রয়োগ করা হইত। বিশুদ্ধ তামিলদের মধ্যে আরিবর (ঋষি) শ্রেণীর ব্যক্তিরাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত ছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ত্রিকালজ্ঞ বলিতেন। তাঁহারা নগরের বাহিরে নির্জ্জনে ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতেন।

ইহাদের নীচেই উলবর বা কৃষক শ্রেণী। সমাজে তাহারা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিত। তাহারাই দেশের ভূম্যধিকারী অভিজাত বংশ। তাহাদিগকে বেল্লার (প্লাবনপতি) বা করলার (মেঘপতি) ও বলা হইত। চের, চোল ও পাণ্ড্য-বংশের রাজারা ও অধিকাংশ প্রধানেরা বেল্লাল বংশীয়। ইহারা কখনো কখনো গঙ্গা বংশীয় নামেও অভিহিত হইত।

আইয়ার (মেষপাল) এবং রেদ্দুবার (ব্যাধ) সম্প্রদায় উলবার সম্প্রদায়ের ঠিক পরবর্ত্তী। তাহাদের নীচে স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার, ইত্যাদি যুদ্ধ ব্যবসায়ীরা তৎপরবর্ত্তী। বালায়ার (মৎসজীবি) ও পুলায়ার (মেথর) এই দুই জাতির স্থান সর্ব্বনিম্নে।

উচ্চজাতীয় ব্যক্তিদের পথ দিয়া গমনকালে নিম্ন জাতীয় লোকেরা একপাশে সরিয়া দাঁড়াইত এবং মেথরেরা পশুবৎ করিত। তামিল দেশের একটী বিশেষত্ব এই যে, সেখানে দাসত্বপ্রথা সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। ইহা তামিলদের উচ্চ সভ্যতার পরিচায়ক।

উপরি উক্ত জাতি বিভাগ ম্যাগাস্থিনিস-বর্ণিত মগধের জাতি বিভাগের অনেক পরিমাণে অনুরূপ। যে কাল সম্বন্ধে উপরি উক্ত বর্ণনা লিখিত হইল অন্ততঃ তাহার ৫।৬ শত

(১) V. Kanak Sabhai.
(২) V. Kanak Sabhai.
(৩) V. Kanak Sabhai.
(৪) V. Kanak Sabhai.

বৎসর পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মণেরা তামিল দেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহারা উত্তর ভারতের জাতি বিভাগ তামিল দেশে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তামিলদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি না থাকায়, কৃতকার্য্য হন নাই। এখনও বল্লালেরা পদৈয় দচিদের (যাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলে তাহাদের) বাটীতে জল গ্রহণ করে না।

২৫। তামিল পরিচ্ছদ। (১)

সমাজে যাহারা যে স্তরের লোক তাহারা তদনুযায়ী পরিচ্ছদ পরিধান করিত। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ কার্পাস বস্ত্রের জোড় (ধুতিচাদর) ব্যবহার করিত। ধুতিখানি হাঁটু পর্য্যন্ত পড়িত এবং চাদরখানি মাথায় জড়ান হইত। তাহারা মাথার চুল কাটিত না এবং উহা জড়াইয়া মাথার উপর বা এক পাশে বাঁধিয়া রাখিত। ব্রাহ্মণেরা মোটা শিখা রাখিয়া মস্তক মুণ্ডন করিতেন। সৈনিক ও চৌকিদারেরা এক প্রকার কোট পরিত। কেবল সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরাই পরিচ্ছদ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিত। যে পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করিলে স্বাচ্ছন্দ্য থাকে, উচ্চ বংশীয়েরা কেবল তাহাই ব্যবহার করিতেন।

২৬। তামিল রমণীদের বেশভূষা (২)

তামিল রমণীদের কেবল কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত অংশ বস্ত্রদ্বারা ঢাকা পড়িত, অন্যান্য অংশ অনাবৃত ও চন্দনলিপ্ত থাকিত। নাগা স্ত্রীলোকেরা প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকিত। বারবনিতারা কেবল কটি হইতে জঙ্ঘা পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবৃত করিত। তাহাতে তাহাদের শরীরের ঐ অংশ ভাল করিয়া ঢাকা পড়িত না। পার্ব্বত্য রমণীরা কোমরের চারিদিকে হরিৎ পত্রগুচ্ছ বাঁধিত। ভ্রমণকারী গায়কদের সঙ্গে যে সকল স্ত্রীলোক বেড়াইত তাহারা সম্পূর্ণ নগ্ন থাকিত। মোটের উপর প্রাচীন দক্ষিণ ভারতে নগ্নতা অধিক লজ্জার বিষয় ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

তামিল রমণীরা চুলের খুব পাট করিত। চুল পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া পাঁচটী গুচ্ছ বিশেষ ভাবে বিন্যস্ত করিয়া তাহা দ্বারা মস্তক শোভিত করিত। ব্রহ্মদেশে এই প্রথা এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্য রমণীরা এরূপ করিতেন না এবং তামিল দেশেও ইহা এখন অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকেরা কেশে তৈল লেপন করিত। স্ত্রীলোকেরা চুল বাঁধিবার সময় উহাতে গন্ধদ্রব্য লাগাইত এবং পুষ্পগুচ্ছ বা অলঙ্কার দ্বারা কবরীর শোভা বর্দ্ধন করিত।

স্ত্রী ও পুরুষেরা দেহে নানা প্রকারের গন্ধ তৈল মর্দ্দন করিত, এবং নানা বর্ণের চূর্ণ দ্বারা উহা শোভিত করিত। স্ত্রীলোকেরা চক্ষে কাজল পরিত। উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের বাটীতে ধূপ, ধুনা, গুগ্‌গুল, লবান প্রভৃতি পোড়ান হইত। বস্ত্রের স্বল্পতা সত্ত্বেও কণ্ঠে, বাহুতে এবং কটিদেশে নানাপ্রকারের অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়া দেহের শোভা বর্দ্ধন করিত। অভিজাতেরা বা ধনবান সর্দ্দারেরা কণ্ঠে মণিমুক্তাময় হার ও মণিবন্ধে ভারি ভারি স্বর্ণ বলয় ব্যবহার করিত। রাজবংশসম্ভূত ব্যক্তিরা এতদ্ব্যতীত এক পায়ে একগাছি সোনার মল পরিত।

নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা হস্তে শাঁখা এবং গলায় পলা বা পুঁতির মালা পরিত। দক্ষিণ ভারতে তখন রূপা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া সোনার ব্যবহার অধিক পরিমাণে হইত। অভিনেত্রীরা খুব সৌখিন অলঙ্কার ব্যবহার করিত এবং পরিপাটি করিয়া সজ্জিত হইত।

২৭। তামিল স্ত্রী-স্বাধীনতা। (৩)

স্ত্রীলোকেরা অবাধে অথচ স্ত্রীজনোচিত লজ্জা ত্যাগ না করিয়া সমাজে মিশিতে পারিত। বড় বড় নগরে দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা ফেরি করিয়া দ্রব্যাদি বেচিয়া বেড়াইত, দোকানে বসিয়া কেনা বেচা করিত এবং সম্পন্ন গৃহস্থদের বাটীতে দাসীর কার্য্য করিত। গ্রামে তাহারা পুরুষদের সহিত ক্ষেতের ও বাগানের কাজ করিত এবং পুরুষদের ক্লেশের ভাগ লইত। বড় ঘরের মহিলারা অনেক সময় গৃহেই আবদ্ধ থাকিত কিন্তু

(১) V. Kanak Sadhai.

(২) V. Kanak Sabhai.

(৩) V. Kanak Sabhai

তাই বলিয়া সমাজে তাহাদের গতিবিধি ছিল না এমন নহে। রাণী হইতে অধস্তন সকল রমণীই দেবমন্দিরে যাইত। উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যার পর ছাদে উঠিয়া পথের জনতার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিত। উৎসবের সময় তাহারা শোভা-যাত্রায় যোগদান করিত এবং আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ বা অভ্যর্থনা করিতে বাটীর বাহির হইত। এই স্বাধীনতা থাকাতেই তরুণ তরুণীরা পরস্পরকে বাছিয়া লইবার সুযোগ পাইত। কখনো কখনো তাহারা পরস্পরের সহিত পালাইয়া যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া যদি বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইত, তাহা হইলে তাহাদের আত্মীয়েরা কোনো আপত্তি করিত না। সে কালে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধে আর্থিক লাভের দিকে দৃষ্টি ছিল না, তাহারা ভালবাসার দ্বারা চালিত হইত। যুবক-যুবতীদের পরস্পরের মনোনয়ন একটী প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত প্রথা ছিল। এই প্রথা এখনও তামিল দেশ হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রাচীন কবিরা কি বলিয়াছেন, তাঁহাদের নিজ কথাতেই নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

একটি বালিকা তাহার সখীর প্রশ্নের উত্তরে তাহার প্রেমাস্পদের ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিল—

তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, আমি কি অমুক সুন্দর যুবককে আমার হৃদয় অর্পণ করিয়াছি?—তিনি সেই যুবক যিনি আমার নদীতে স্নান করার সময় আমার দিকে চাহিয়া থাকেন, আমার বাটীতে আমার সহিত দেখা করেন, যিনি আমার তুষ্টিবিধানে সদা যত্নবান্, আমার ভ্রষ্ট অলঙ্কার যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেন, আমার স্কন্ধদেশ চন্দনচর্চ্চিত করেন? আচ্ছা, আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি শুন। আমি তাঁহার সহিত সমুদ্র-কূলে বহুবার ভ্রমণ করিয়াছি, আজ তীরস্থ তৃণাদি উৎপাটন করিতে করিতে আমার হস্ত রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কি জন্য উৎপাটন করিয়াছিলাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? তিনি আমাকে ঐ তৃণ দিয়া একটী ক্রীড়নক নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। আমার সম্বন্ধে যে সকল নিন্দা না রটাইলে আমার প্রতিবেশিনীদের ঘুম হয় না, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তুমি এতই সরলা যে সেই সকল কথায় বিশ্বাস কর? তোমার জিজ্ঞাসু চক্ষুর সম্মুখীন হইতে ভীত হইয়া আমি বাটী হইতে এখানে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। আমাকে সাগরতীরে প্রত্যাবৃত্তা দেখিয়া তিনি কচ্ছভূমি হইতে পুষ্প আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা একছড়া মালা গাঁথিয়া আমার হস্তে দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রীতির এই সামান্য নিদর্শনের জন্য যাহারা মিথ্যা অপবাদ দিয়া তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছে, তাহাদিগকে তিরস্কার করিবার পরিবর্ত্তে কেন তুমি প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায়ে আমার নিকট আসিলে? তিনি একটী ইক্ষুদণ্ডের চিত্র চন্দন দিয়া আমার স্কন্ধদেশে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ চিত্রণ আমার জানা নাই বলিয়া তিনি এই চিত্রটী অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার এই সৌজন্যকে উপলক্ষ করিয়াই কি আমার ক্রীড়া-সহচরীরা আমার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং তুমি সেই সকল কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনাকে কষ্ট দিয়াছ?

ইহা ভাবের একটী সুন্দর ক্ষুদ্র উদাহরণ।

এখন একটি দুষ্টমতি দুর্ললিত যুবকের উদ্দণ্ড প্রেম-প্রদর্শনের চিত্র দেখুন। তাহার সম্বন্ধে একটী বালিকা তাহার সখীকে বলিতেছে—সখি, শুন। তুমি কি সেই দুষ্ট যুবককে জান, যে আমাদের খেলা ঘর ভাঙিয়া দেয়, আমাদের কেশের মালা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, আমাদের খেলিবার কন্দুক কাড়িয়া লয় এবং আমাদিগকে নানা উপায়ে বিরক্ত করে? একদিন যখন আমার মাতা ও আমি গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিলাম, সে আমাদের বাটীতে আসিয়াই বলিল যে তাহার অত্যন্ত পিপাসা পাইয়াছে। আমার মা আমাকে বলিলেন, "উহাকে এক পাত্র জল দাও।" আমি তাহার দুষ্টতা ভুলিয়া গিয়া তাহার নিকট এক পাত্র জল লইয়া গেলাম। হঠাৎ সে আমার বাহু ধরিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিবার চেষ্টা করিল। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "দেখ, মা, এই যুবকটী কি করিল।" চীৎকার শুনিয়া আমার মা, যেখানে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম, বেগে সেই স্থানে আসিয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম (মিথ্যা), "যুবকটি বিষম খাইয়াছে।" তখন মা তাহার পীঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই চোরের বেটা, যেন আমাকে বিঁধিয়া ফেলিবে এইভাবে আমার দিকে তাকাইয়া আমাকে হাসাইয়া দিল।

পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রেম-দৃশ্য ইহাপেক্ষা অধিক ঘটনা-বৈচিত্র্যপূর্ণ। "একদিন আমি ও একটী বালিকা, যাহাকে আমি

মনে মনে ভাল বাসিতাম, এক বন্যাস্ফীত পার্ব্বত্য নদীতে স্নান করিতেছিলাম। হঠাৎ সে পদস্খলিত হইয়া মাঝখানে পড়িয়া গেল এবং বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে সময়ে সেই স্থানে এক বীর যুবক উপস্থিত ছিল। বিপদ দেখিয়া গলার মালা ইত্যাদি না খুলিয়াই সে স্রোতে ঝাঁপ দিল এবং বালিকাটিকে নিরাপদে তীরে টানিয়া আনিল। তীরস্থ দর্শকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে তাহারা যুবতীর উত্থানপতনশীল বক্ষ বীর যুবকের বিশাল স্কন্ধে সংলগ্ন হইতে দেখিয়াছে। এই কথা যুবতীর কর্ণে প্রবেশ করিল এবং প্রত্যুত্তরে সে তৎক্ষণাৎ বীরযুবককে তাহার আন্তরিক প্রেম উৎসর্গ করিল এবং বলিল, "যাহাই ঘটুক না কেন আমি প্রেমে চিরদিন অটল থাকিব।" যুবকটী এক আরণ্য উপজাতির নায়ক-পুত্র ছিল। আমি বলিলাম "কুরব-রমণী কখনো প্রেমে বিশ্বাসঘাতিনী হয় না, এবং 'কুরব' বাণও কখনো ব্যর্থ হয় না। হে পর্ব্বতবাসীর, তোমরা যদি কখনো অবিশ্বাসের পাত্র হও, বল্লীলতা কখনো কন্দ প্রদান করিবে না, এবং তোমাদের পার্ব্বত্য শস্য-ক্ষেত্র শস্যদান করিবে না।" এই কথা বালিকার মাতার কানে পৌঁছিল এবং মাতা এই কথা তাহার পিতা ও পিতৃব্যগণকে জানাইল। তাহারা অন্যত্র সেই বালিকার বিবাহ স্থির করিবে ভাবিয়াছিল। ক্রোধে তাহাদের নেত্র রক্তবর্ণ হইল এবং তাহারা ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া প্রতিহিংসার চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিল যে উভয় পক্ষের কাহারো দোষ নাই, তখন তাহারা ঠাণ্ডা হইল এবং বালিকার ঐ মনোনীত বরের সহিত তাহার বিবাহে সম্মত হইল। তখন আমরা হাত ধরাধরি করিয়া "কুরবাই" নৃত্য জুড়িয়া দিলাম। কিছুদিন পরে ঐ দলের প্রবীণেরা আমাদের গ্রামে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে একত্রিত হইল।

আর একটী চিত্র দেখুন—

অনেক সময় সুন্দর মাল্য শোভিত এক ধনুর্ব্বাণধারী যুবক যেন শিকার অনুসরণ করিতে করিতে আমার সম্মুখীন হইত এবং আমাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত কিন্তু কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া যাইত। তাহাকে চিন্তা করিতে করিতে রাত্রিতে প্রায় আমার চক্ষু হইতে নিদ্রালোপ পাইয়াছিল এবং আমি তাহার বিরহে খিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। চক্ষু দ্বারা ভিন্ন অন্য কোনো প্রকারে সে কখনো তাহার ভাব ব্যক্ত করে নাই। আমি নারীস্বভাব-সুলভ সঙ্কোচ বশতঃ আমার ভালবাসা ব্যক্ত করিতে পারি নাই। কিন্তু লুকান প্রীতির তীব্র জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি হঠাৎ একদিন একটা লজ্জার কাজ করিয়া ফেলিলাম। একদিন আমি আমাদের খামারের পাশের এক স্থলে একটা দোলায় বসিয়া আছি এমন সময় সে তাহার অভ্যাস মত আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, "আমাকে একটু দোল দিন না।" "মধুময়ী বালা, এই আমি দোল দিতেছি" বলিয়া দোল দিতে লাগিল। আমি যেন সুখে সন্তরণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি ছল করিয়া পিছলাইয়া গিয়া তাহার কাঁধের উপর পড়িলাম। সে আমাকে হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিল এবং আমি মূর্চ্ছিতের মত তাহার স্কন্ধের উপর কিছুক্ষণ থাকিলাম। সে আমাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ছিল। অবশেষে আমি যখন চেতনা পাইয়াছি এইরূপ ভাব দেখাইলাম সে আমাকে নামাইয়া দিল, এবং স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, "আমি তোমাকে যথার্থ ভালবাসি।" এই সত্য করিয়া সে আমাকে ঘরে পাঠাইয়া দিল।

২৮। তামিল বিবাহপদ্ধতি (১)

বালকেরা ১৬ বৎসর বয়সে এবং বালিকারা ১২ বৎসর বয়সে বিবাহযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। উচ্চবংশগুলিতে ব্রাহ্মণদের নিয়মানুসারে বিবাহ হইত। যাহারা ব্রাহ্মণদের প্রভাবে পড়ে নাই, যেমন নিম্ন শ্রেণীর নগরবাসী ও পার্ব্বত্য জাতিরা, তাহাদের বিবাহ আরিবর বা তামিল পুরোহিতদের দ্বারা সম্পন্ন হইত।

২৯। তামিল আহার। (২)

তামিলদের আহার অতি সাদাসিধা ধরণের ছিল। ভাতই তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল, এবং দুগ্ধ, মাখন ও মধুও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত।

৩০। তামিল আমোদ প্রমোদ।

প্রাচীন তামিলদেশে আমোদ প্রমোদের মধ্যে ছিল কোকিলের লড়াই, নৃত্য, সঙ্গীত এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎসবে যোগদান। ঘরে স্ত্রীলোকেরা পাখী পড়াইত, বল্লাই বা অখনাই গান করিত, দোলায় দুলিত এবং পাশা খেলিত।

ক্রমশঃ

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

(১) V. Kanak Sabhai.
(২) V. Kanak Sabhai

স্ত্রী-যুদ্ধ

শ্রীসুবোধ বসু এম্-এ, বি-এল্

চার

শশাঙ্ক ইংরেজি সাহিত্যে এম্-এ তে ফার্স্টক্লাস। তার মতে ঘটনাটা একটা একসিডেণ্ট, কেননা সাহিত্যে অনুরক্তি তার যৎসামান্যই। উপযুক্ত রকম একটা চাকরি প্রাপ্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইবার পর সে উক্তি করিল,—বড়লোকের ছেলের পক্ষে অর্থার্জ্জন একটা সামাজিক পাপ; ধনবণ্টনের অসমতা তাতে লজ্জাকর রকম বৃদ্ধি পায়। অর্থবানের সন্তান-সন্ততির একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া উচিত অকাতরে অর্থ ব্যয় করা,—সঞ্চিত ধনভাণ্ডার যাতে সর্ব্বসাধারণের কাছে ছড়াইয়া পড়ে সেটা জগতের পক্ষে মঙ্গলকর। তাই বর্ত্তমানে শশাঙ্ক শুধুমাত্র দেশ-ভ্রমণ করে।

সন্ধ্যের সভা ভঙ্গ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রায়বাহাদুর যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। মিসেস নাগ যদিও প্রথমটায় মিসেস গুপ্তের আতিথ্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিল, তবুও তাহাকে রায়বাহাদুরের সঙ্গেই উঠিতে হইল। মিসেস নাগের মোটরটা আবার যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়।

ড্রইং-ঘরে চায়ের জন্য পূর্ণিমা ও সুলতাকে বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিয়া মিসেস গুপ্ত গেলেন আহার্য্যের তদ্বিরে। বিশেষত নেপথ্যে শশাঙ্ক যেমন হাঁক ডাক সুরু করিয়াছে, তাতে মিসেস গুপ্তের পক্ষে পোষাকী হইয়া বসিয়া থাকা সম্ভবপর নয়।

সুলতা কহিল, শশাঙ্কবাবু সন্ধ্যেকে নিয়ে বড় বিশ্রী ছেলেমানুসি করেন।

'পরিহাস করতে,' পূর্ণিমা জবাব দিল, 'কোনও যুক্তির দরকার হয় না। ওর নিজের পক্ষের দৌর্ব্বল্য জানেন বলেই তর্ক করতে ভয় পান,—পেছন থেকে চিম্‌টি কেটে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

'পিছনে থাকার জন্য যদি এতই অপবাদ,' চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া প্রবেশ করিতে করিতে শশাঙ্ক পিছন হইতে কহিল, 'তবে না হয় ভরসা করে সামনেই এলুম। কিন্তু যুদ্ধটুদ্ধ যেন আরম্ভ না হয়।' পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে একটা কৌউচের হাতায় বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'অন্তত চা শেষ হওয়ার আগে।"

পূর্ণিমা প্রথমটায় সামান্য অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। এইবার মুখটায় যতটা সম্ভব দেমাক টানিয়া আনিয়া, চোখটা আমীলিত ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হইবার পর কহিল, অর্থাৎ স্ত্রী-স্বাধীনতা আপনি সহ্য করতে পারেন না,—এই তো?

'সরাসর' শশাঙ্ক চায়ে আরেকটা চুমুক দেওয়ার পর কহিল, 'কি আর ওটার একটা স্পষ্ট জবাব দিতে সাহস করি। আধুনিক বাংলা কবিতার মত; সম্ভবপর হলে, জবাবগুলি আমি সব সময়েই ধোঁয়া করে রাখি। স্পষ্ট জবাব দিয়ে শেষকালটায় স্ত্রী-আধিপত্যের সময় মারা যাই আর কি।'

পূর্ণিমা এর কোনও জবাব না দিয়া ঘাড়টা তীর্য্যক্ ভঙ্গীতে ফিরাইয়া লইল।

'অত্যাচারী পুরুষদের', বিশেষ কাহাকেও উদ্দেশ্য না করিয়া শশাঙ্ক উক্তি করিল, 'অবরোধ-পোরা, না ঐ রকম কি একটা সংকল্পও সন্ধ্যের আছে শুনেছিলাম,—সত্যি নাকি খবরটা? সেজন্যই সাবধান হয়ে কথাবার্ত্তা বল্‌তে হয়।"

পূর্ণিমা ঠোঁট কামড়াইতে লাগিল।

'শশাঙ্কদা', সুলতা প্রতিবাদ করিল, 'নারী-জাগরণকে আপনি কোন যুক্তিতে হীন করতে চান? নারী তো কারুর হাতের খেলার পুতুল নয়। কেন চাইবেন আপনারা খেলার পুতুল করে রাখতে?'

শশাঙ্ক পেয়ালাটা কার্পেটের উপর নামাইয়া রাখিল। ভারি যেন আহত হইয়াছে, এমন একটা চোখের দৃষ্টি। পূর্ণিমার দিকে ফিরিয়া কহিল, আমি তা কখনো চেয়েছি, পূর্ণিমা?

'ব্যঙ্গের', পূর্ণিমা ঝাঁঝালো গলায় কহিয়া উঠিল, 'আমি জবাব দিই না।'

'মহিলা সমিতি, স্ত্রী-সঙ্ঘ এসবগুলিকে', শশাঙ্ক কহিল, 'আমি দেখতে পারি না শুধু এই জন্যে যে যত শান্তশিষ্ট মেয়েদের ওরা বকিয়ে দিচ্চে। নইলে মেয়েরা আর পুরুষদের উপর বীতরাগ হয়ে উঠে বিয়ে করতে চাইবে না কেন? একটা mass-strike এর জন্য তোমরা স্ত্রী-দেশকে ক্ষেপিয়ে তুলচ। বলোতো কী সর্বনাশের কথা!'

শশাঙ্কের উক্তিটা শুধু একটা সাধারণ উদাসীন উক্তি নয়, —এতে আছে ইঙ্গিত, ঘটনাপরম্পরার সঙ্গে এর সংযোগ গভীর।

পুরুষবিদ্রোহী পূর্ণিমার মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব এবং যে লীলা সতত প্রকাশমান ছিল তাতে বহু দুঃসাহসী যুবক আকর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত জালের ন্যায় অনেকের অনেক প্রেমপ্রচেষ্টা পূর্ণিমার কাছে ব্যর্থ হইয়াছে। তার উপাসকমণ্ডলীর অতি-উপাসনায় অনেক উদ্বিগ্ন দুশ্চিন্তা ও উপায়হীন ক্রোধে তাকে কাল কাটাইতে হইয়াছে। প্রেম-পত্র এবং কবিতা তার জীবনে কম লাভ হয় নাই। নাসিকা-কুঞ্চিত ঘৃণা এবং অকরুণ উপেক্ষার সঙ্গে সে গুলির সে সদ্গতি করিয়াছে জ্বলন্ত উনানের উদরে।

এমন সময় শশাঙ্ক অকস্মাৎ একদিন পূর্ণিমাকে দ্রষ্টব্যের শ্রেণীতে আসন পাইবার উপযুক্ত বিবেচনা করিল। এতকাল পুরুষের বিপক্ষজ্ঞানে শশাঙ্ক পূর্ণিমার প্রতি একটা প্রায় অহেতুক বৈরী মনোভাব পোষণ করিত। কিন্তু শীঘ্রই সে আবিষ্কার করিল যে পূর্ণিমার মধ্যে যে যুদ্ধের আনন্দ পাওয়া সম্ভবপর তার আর তুলনা হয় না। এই যুদ্ধের আনন্দ সব-চাইতে বেশি শশাঙ্ককে পূর্ণিমার প্রতি আকৃষ্ট করিল।

কিন্তু এই আকর্ষণের কোনো প্রতিদান শশাঙ্ক এপর্য্যন্ত পায় নাই। বরঞ্চ প্রত্যাখ্যানের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু যৌবনসুলভ এক অদ্ভুত মনোবৃত্তির দরুন এই উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান শশাঙ্কের মধ্যে যুযুৎসা তীব্রতর করিয়া তুলিল।

'যদি বকিয়েই না দেবে', পূর্ণিমার দিকে চাহিয়া সামান্য ব্যঙ্গের সঙ্গে শশাঙ্ক কহিল, 'তবে আমারই বা এমন দুর্দ্দশা হবে কেন? একেবারে একটা ধর্ম্মঘটের মধ্যে পড়ে গিয়েচি।'

সুলতা নিজে যুবতী এসব ঢঙের কথা এবং এই রকম সব ইঙ্গিত বুঝতে তার কষ্ট হয় না। তাই এই সময়ে অকস্মাৎ তার মিসেস গুপ্তের সঙ্গে একটু অত্যন্ত বিশেষ রকম জরুরী কাজের কথা মনে পড়িয়া গেল।

'মেয়েটা লজ্জা পেয়ে উঠে গেল দেখ্‌লে?' শশাঙ্ক মন্তব্য করিল, 'অথচ কার লজ্জা পাওয়া উচিত, বলো তো পূর্ণিমা? আমারি নয়? আমাকে আমার বাঞ্ছিতা অপছন্দ করে বসেছে,—কিন্তু তাতে লজ্জা আমার না ওর? এর পরেও যদি বলি, লজ্জা স্ত্রীলোকের স্বভাব,—তবু তোমরা চটে ওঠো, ভাবো ঠাট্টা করছি বুঝি।'

'আমাকেও', পূর্ণিমা উঠিবার উপক্রম করিয়া কহিল, 'উঠতে হচ্চে'

'এটাকে কি নারী সঙ্ঘের সেক্রেটারীর বীরত্ব মনে করবো?' শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল, 'তোমার আন-ন্দিত হওয়া উচিত, এই জন্যেও যে অত্যাচারী পুরুষ এতক্ষণে মাথা নীচু করেচে,—তোমাদের প্রিন্সিপ্লের পক্ষে এ তো কম গৌরবজনক নয়।'

সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পূর্ণিমা বসিয়া পড়িল। 'প্রথমটায়' ঝাঁঝ দিয়া কহিল, 'চিরকালই সে মাথা নীচু করে ভিক্ষা করে। তারপর যতই দিন যায়, ভিক্ষার কথা আর মনে থাকে না, নির্লজ্জের মত কর্তৃত্ব সুরু করে।'

'তবে তাদের' শশাঙ্ক গম্ভীর ভাবে কহিল, 'রীতিমত চালাক বলতে হবে। বোকা পেয়ে মেয়েদের ফাঁদে পোরে। এমন যে বুদ্ধিমান একটা জাত, তবু তাদের ওপর নিখিল প্রাচ্য স্ত্রী-সঙ্ঘের কোনও যদি শ্রদ্ধা হয়।'

'ভণ্ড হওয়া,' পূর্ণিমা ফুলদানি হইতে একটা ফুল উঠাইয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল, 'খুব একটা গর্ব্বের কথা নয়।'

'দুর্ব্বল হওয়া আরোও খারাপ।'

পূর্ণিমা ঠোঁট কামড়াইল,—কোনও জবাব দিল না।

'ঝগড়া করে', একটুক্ষণ জবাবের আশা করিয়া চোখ সামান্য একটু বাঁকা করিয়া শশাঙ্ক কহিল, 'প্রকৃতির বিধান উল্টে দিতে কি আর তোমাদের স্ত্রী-সঙ্ঘেরাই পারবে?

জগতে যা কঠিন, যা বড় কাজ, সব পুরুষই করবে,—চিরকাল।'

'কথাগুলি,' পূর্ণিমা খোঁচা দিয়া কহিল, 'আর কতদিন নতুনত্বের দাবী করবে?'

শশাঙ্ক এ-কথায় কান দিল না, আগের কথাগুলির প্রসঙ্গেই সে বলিয়া যাইতে লাগিল, 'আমার মতে যা কোমল, সহজ, বিশেষ বুদ্ধি খরচের যে সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না,—যেমন ছবি আঁকা, সেলাই, গান,—এসব মেয়েদের একচেটিয়া করে' দেওয়া উচিত। অবশ্য ওসব শিল্পগুলিব তাতে কিছু অবনতি যে হবে না, এমন কথা আমি বলছি না।'

'এই দেমাকের জন্যই', চটিয়া লাল হইয়া পূর্ণিমা তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, 'তোমাদের শাস্তি হওয়া দরকার। তোমাদের মত গর্ব্বী পুরুষদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াই নারীসঙ্ঘের এখন সব চাইতে বড় কর্ত্তব্য।'

প্রেম-নিবেদনের প্রচলিত পন্থাগুলিকে সামান্য সম্মান করিলেও শশাঙ্ক এ-রীতি গ্রহণ করিত কি না সন্দেহ। কিন্তু প্রেম লাভের চাইতে তার প্রেমেব সঙ্গে যুদ্ধে মোহ বেশি,—হয়তো এ তার স্বভাবধর্ম্মী প্রেম-নিবেদন পন্থা।

'তা কি করবো,' ঈষৎ হাসিয়া সে কহিল, 'মেয়েদের খুসী করবার জন্য তো আব মিথ্যে কথা বলতে পারবো-না। চাটুবাদের অভ্যেস রায়বাহাদুরদেরই থাকে। মেয়েদের খুসি করবার ইচ্ছে যদি থাকতো,—ধরো না, অন্যায় রকম ভাবে তোমার মন গলাবার দুরভিসন্ধিই আমার থাকতো যদি,—তবে হয়তো নারীর সম্বন্ধে দীর্ঘ কবিতা লিখতুম। তাতে তাদের শুধু যে অপরূপ সুন্দরী, তাদের অঙ্গের গড়ন চমৎকার, তাদের চোখের চাওয়া অনির্ব্বচনীয়, পাকা তেলা-কুচোর মত ঠোঁট এই বলেই ক্ষান্ত হতুম তা নয়,—স্বর্গে টেনে নিয়ে গিয়ে, তাদের দেবী বলে উপাসনা করে' তবে ছাড়তুম।'

কথাগুলি হজম করিতে পূর্ণিমার কতক্ষণ গেল। 'তাতে খুব দোষ হতো না,' প্রকৃতিস্থ হইবার পর সে কহিল, 'পুরুষ শাস্ত্রকারেরাও নারীকে দেবী বলে' গেছে।'

শশাঙ্ক সব্যঙ্গ হাসিল। 'নারীর উপর' একটুও অপ্রতিভ না হইয়া সে কহিল, 'চিরকালই পুরুষের ঐ দুর্ব্বলতা। ভালো লাগলো তো, বিশেষণের বাচবিচার ছেড়ে দাও, কাণ্ডাকাণ্ডি-জ্ঞান পর্য্যন্ত পুরুষ হারিয়ে ফেলতে পারে। ভুলে যাও কেন, শাস্ত্রকারেরা পুরুষ ছিলেন, যেমন কিনা কবিরা।'

'নারীর মধ্যে যে দেবীর অংশ আছে, তা তুমি মানো না?'

'পুরুষের মধ্যেও দেবের অংশ আছে, কিন্তু তাই বলে পুরুষ দেবতা নাকি?'

'আর কিছু না হোক', সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পূর্ণিমা কহিল, 'মেয়েরা পুরুষের চাইতে সুশ্রী,—তাদের পুরুষেব মত বর্ব্বর মনে হয় না।'

শশাঙ্ক একটু তরল হাসিল। 'কবিরা', আড়াযোড়া ভাঙিয়া সে কহিল, 'তা বলে বটে। কিন্তু কবিরা ক্রিটিক নয়,—তারা উচ্ছ্বাসই করতে জানে। বলেইছি তো, মেয়েদের ভালো লাগলে পুরুষের আর কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান থাকে না। তখন অনেক চাটুবাদ, অনেক অত্যুক্তি বেরিয়ে পড়ে।'

'অবাক্ করলে,' পূর্ণিমা বিস্ময়ের সঙ্গে কহিল।

'শাড়িতে, গয়নায়, পাউডার-স্নোতে,' চোখ দুইটা স্তিমিত করিয়া শশাঙ্ক বলিল, 'না ঢেকে যাদের পাতে দেওয়া যায় না, তাদের আবার সৌন্দর্য্য। আশ্চর্য্য হয়ে যাই, মেয়েদের আত্মপ্রবঞ্চনা দেখে।'

পূর্ণিমা আর কোনও জবাব দিল না। কৌচ হইতে উঠিয়া পড়িল। গটগট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল ঘব হইতে,—মাথাটা তীব্র প্রতিবাদে উদ্ধত করিয়া।

'আঃ, রাগ কেন, পূর্ণিমা,' তার পিছনে পিছনে যাইতে যাইতে শশাঙ্ক কহিল, 'দাঁড়াও। বেশ গুছিয়ে, মিষ্টি করে,' যথাসাধ্য চাটুবাদ মিশিয়ে, কবিদের মতনই না হয় কথা বলছি।'

পাঁচ

সঙ্ঘের প্রস্তাবগুলি সহরের কাগজগুলি বড় বড় হরফে সাগ্রহে ছাপাইল। জনপ্রিয় কাগজগুলির ঐ সুবিধা—সংবাদের বাচবিচার করিতে হয়-না, সবকিছুই ছাপাইতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, নারী সঙ্ঘের খবরের সঙ্গে সেক্রেটারী পূর্ণিমার ছবি না থাকিয়া, মিসেস নাগের ফটো

দেওয়া। অনেকের সঙ্গে জানাশোনা থাকায় মিসেস নাগের এই সুবিধাটুকু আছে। তবে একটা ব্লক তৈরি করিয়া দিতে মিসেস নাগের যে কিছু খরচ পড়ে নাই, এমন নয়।

'চমৎকার ছবিটা উঠেচে আপনার আজকের কাগজে,—বড়ই সুন্দর,'—রায়বাহাদুর গণেশবাহন টেলিফোনে বলিলেন।

'ভালো আর কোথায় উঠেচে' মিসেস নাগ রিসিভারের কাছে আক্ষেপ করিলেন, 'সত্যি কি আর আমি অতটা ময়লা দেখতে ?'

'না না' রায়বাহাদুর তাড়াতাড়ি সংশোধন করিলেন, 'আমি রঙের কথা বলছি না,—আমি সাধারণ মুখশ্রীর কথা বলছিলাম।'

'পত্রিকাওয়ালাদের,' মিসেস নাগ কহিলেন, 'কাণ্ড দেখুন তো রায়বাহাদুর। আমি সঙ্ঘের কোথাকার কে,—জোর করে নিয়ে আমার ছবি ছেপে দিল। বড় লজ্জা করে আমার।'

'কালকের আলোচনায়,' রায়বাহাদুর খুসির সঙ্গে মন্তব্য করিলেন, 'আপনিই তো সর্ব্বাপেক্ষা বড় অংশ নিয়েছিলেন,—আপনার ছবি ছাপানোই তো উপযুক্ত হয়েছে। এতে আমি কাগজওয়ালাদের বিবেচনার পরিচয় পাচ্ছি, বুঝলেন মিসেস নাগ।'

'প্রস্তাবগুলি', মিসেস নাগ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন লাগল আপনার ?'

'আপনার বেশ লাগল তো ?'

'হ্যাঁ'।

'আমার কাছেও চমৎকার মনে হলো।'

'নারীদের পক্ষে কোন্‌টা সব চেয়ে মঙ্গলের হবে মনে করেন, রায়বাহাদুর ?'

'বিধবা বিবাহের প্রস্তাবটাই যেন মনে হচ্ছে।'

রায়বাহাদুর যে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মানুষ এ-বিষয়ে মিসেস নাগের আর সন্দেহ রহিল না।

কাজগুলি অবশ্য পূর্ণিমাকে একাকী করিয়া বেড়াইতে হইতেছে। অবৈতনিক সেক্রেটারী হইয়া তার লাভ হইতেছে ঐটুকুই। চিঠিপত্র ছাপানো হইয়া গেল, শাখা সঙ্ঘে কিছু পাঠানোও হইতেছে,—কিন্তু মহাধিবেশনের সভানেত্রী এখনও ঠিক করা হয় নাই।

সঙ্ঘের প্রথা অনুসারে কোনও না কোনও করদ মিত্র রাজ্যের অবনজ্ঞ রকম উপাধিভূষিতা কোনও মহারাণীকে প্রেসিডেণ্ট করা প্রয়োজন। এই প্রথাটার একটা মহা সুবিধা এই যে প্রেসিডেণ্ট সঙ্ঘের কাজে কোনও উৎপাতের সৃষ্টি করিতে পারে না,—সভা অলঙ্কৃত করিয়া তারপর তার আর কোনও কাজ থাকে না।

একাধিক রাজ্যে নিমন্ত্রণলিপি গিয়াছে,—একজন মহারাণীও যে প্রলুব্ধ হইবেন না, এমন আশঙ্কা সম্পূর্ণই অমূলক।

শশাঙ্ক পূর্ণিমার নাগালই পায় না। যদি বা দেখা পায়, বিজলীর মত চমক দিয়া সে আবার অন্তর্দ্ধান হইয়া যায়। তাই সে জিহ্বা-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে, না দার্জ্জিলিং হইতে উইক-এণ্ডে বেড়াইয়া আসিবে চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ণিমার উস্কোটা অকস্মাৎ তার এত ভালো লাগিয়া গেল যে কলিকাতা হইতে নড়া আর সম্ভব হইল না।

সেদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ফেরত শশাঙ্ক দেখে, বাড়ির গেটে মোটর দাঁড়াইয়া। বুঝিতে দেরি হইল না পূর্ণিমা গেছে উপরে, ফটকের মুখটায়ই দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, কি কথা কি রকমভাবে যাইয়া বলিলে নারীসঙ্ঘের সেক্রেটারির পুনরায় মোটরারোহণটা একটু বিলম্বিত করা যায়। অবশেষে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া সে উপনীত হইল যে মোলায়েম কথা বলিয়া লাভ নাই,—কিন্তু ক্ষেপাইয়াও ফল তদনুরূপ।

বিদ্যুল্লতার মত দ্রুত নামিয়া আসিল পূর্ণিমা। শশাঙ্ককে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না,—ছাতাটা বগলে চাপিয়া সিধা আগাইয়া চলিল।

'নারী স্বচ্ছে,' একটু কাসিয়া গেটের লতাটাকে সম্বোধন করিয়া শশাঙ্ক কহিল, 'আমার হীন ধারণা ক্রমেই যেন বদ্‌লে যাচ্ছে।'

'তবে আর কি',—বেশ ঝাঁঝ দিয়া কথাটা শশাঙ্কের উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া দিয়া ও হেলতার উপেক্ষার প্রচেষ্টায় একটা অতীব সুন্দর ভঙ্গী আনিয়া, সরাসর গিয়া পূর্ণিমা মোটরে উঠিল।

'শুনুন, একটা অতিশয় জরুরী কথা আছে', শশাঙ্ক চেঁচাইয়া কহিল।

দরজা বন্ধের শব্দ হইল, ব্রাস্! এবং পরক্ষণেই মৃদুগর্জ্জন তুলিয়া মোটর রওনা হইল। শশাঙ্কের দিকে কেহই ভ্রূক্ষেপ করিল না। 'প্রেমে পড়তে যা একটু বাকী ছিল', শশাঙ্ক মনে মনে কহিল, 'তাও আর বাকী রইল না।'

পূর্ণিমাকে পুত্রবধূ করিবার একটা সংকল্প এক সময়ে মিসেস গুপ্তের মনেও ছিল। বুদ্ধি-প্রাখর্য্য ও সপ্রতিভতায় পূর্ণিমা শশাঙ্কের অনেকটা উপযুক্ত হইতে পারে,—এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। বিশেষ পূর্ণিমার মধ্যে ছিল একটা অবিসংবাদী নারী-শ্রী। কিন্তু স্ত্রী-সঙ্ঘের সেক্রেটারি হইবার পর যতই পূর্ণিমার পুরুষ-বিরোধী কার্য্যাবলী বৃদ্ধি ও তার বিদ্রোহী মতামতগুলি স্পষ্টতর হইয়া প্রকাশ পাইতেছিল, ততই মিসেস গুপ্ত আশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ফলে, পূর্ব্বের সংকল্প তিনি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিবার উপক্রম করিয়াছেন।

'মেয়ে মেয়ের মতন হবে,' মিষ্টার গুপ্তকে তিনি একদিন বলিলেন, 'সৈন্য হওয়া কি মেয়েদের শোভা পায়?'

এদিকে পূর্ণিমার কাজের আর অন্ত নাই। এম্-এর পড়া উপেক্ষিত হইতে লাগিল,—চুলগুলি হইয়া উঠিল রুক্ষ। স্নানাহারে তার অনুরক্তি নাই। সারা-দিনমান ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্ত্রী-সঙ্ঘের মহাধিবেশনের প্রথম দিককার কর্ত্তব্যগুলি সে যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিল।

মিসেস নাগ অবশ্য উপদেশ দিয়া সাহায্য করেন। নানা দিকে তাঁর নানান কাজ, তাই কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম তাঁর দ্বারা সম্ভবপর নয়।

মিসেস নাগের মোটরটা সম্পূর্ণ বিকল হইয়া যাওয়ার পর, তাঁর টেলিফোনের বিলটা একটু বাড়িয়াছে। অহরহ আজকাল তিনি টেলিফোন করিয়া থাকেন।

'কে? রায়বাহাদুর?,' মিসেস নাগ টেলিফোনে কহিলেন, 'আমি মীরা নাগ।'

অন্যপ্রান্তে রিসিভারের ভিতরে নমস্কার করিয়া রায়-বাহাদুর কহিলেন, 'ওঃ, নমস্কার, নমস্কার মিসেস নাগ। বড় সৌভাগ্য আমার।'

'সৌভাগ্য! কেন?', মিসেস নাগ প্রশ্ন করিলেন।

'নইলে', রায়বাহাদুর অভিযোগ করিলেন, 'আপনার টেলি-ফোন কি আজকাল আর পাই?'

'কথা শোনো,' মিসেস নাগ প্রতিবাদ করিলেন, 'কালও তো দুবার করেছি।'

'মাপ করবেন ভুলে গিয়েছিলাম', রায়বাহাদুর লজ্জিত হইয়া কহিলেন।

'কাল সাড়ে পাঁচটায়', অবশেষে মিসেস নাগ কহিল, আসুন না আমার বাড়ি?'

'আপনার বাড়িতে' রায়বাহাদুর গনেশবাহন সদুঃখে জানাইলেন, 'লোকের বড় ভিড় থাকে সর্ব্বক্ষণ। কারা সব ওরা, মিসেস নাগ?'

'আমার স্বামীর বন্ধু ওরা', মিসেস নাগ এক সেকেণ্ড পরে কহিলেন, আমার তত্ত্বতল্লাস করতে আসেন। তবে আসতে তাদের আমি বারণ করে দিইচি,—লোকজনের গণ্ডগোল আমি আজকাল সইতে পারি না।'

'গণ্ডগোল,' রায়বাহাদুর কহিলেন, 'আমারও আর ভালো লাগে না।'

'তবে কাল সাড়ে পাঁচটায় চায়ের নেমন্তন্ন রইল,—ভুলবেন না যেন, রায়বাহাদুর।'

'ধন্যবাদ, মিসেস নাগ।'

পক্ষান্তরে পূর্ণিমা মিসেস নাগকে টেলিফোন করিল—'কাল দুপুরে বাড়ি থাকবেন তো, মিসেস নাগ। আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শের দরকার।'

'কাল', মিসেস নাগ দুঃখিত হইয়া জানাইলেন, 'সারাদিন আমি বাড়ি থাকবো না,—তা না হয়, পরশুই এসো।'

শশাঙ্কের অবস্থাটা একটু করুণ হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল কেন জানি তার ক্ষুধাটা একেবারে মাত্রাহীন বাড়িয়া গেছে,—কিছুতেই তার পেট ভরে না, ভরিলেও বেশিক্ষণ তা স্থায়ী হয় না। দুঃখের সঙ্গে সে সিদ্ধান্ত করিল,—এ নিশ্চয়ই প্রেমে পড়ার লক্ষণ।

ছয়

মিসেস নাগ বালিগঞ্জের এক দুর্গম স্থানে বাস করেন। দুর্গমতার মধ্যে বাস করায় যে আভিজাত্য আছে তা অবশ্য

স্বীকার্য্য, কিন্তু মিসেস নাগের মোটরটা প্রায়শই বিগড়াইয়া যাওয়ায় বড় অসুবিধা হয়। কিন্তু গরিব আত্মীয়স্বজন আসিয়া উৎপাত কম করে।

মিসেস নাগ লম্বা একটা ঝাড়ুনি দিয়া দেওয়ালের মাকড়-শার জাল পরিষ্কার করিতেছেন। স্বাবলম্বনের উপকারিতার কথা চিন্তা করিয়াই যে সংস্কারের কাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তা নয়। বাড়িতে আজ চায়ের নিমন্ত্রণ আছে, কিন্তু চাকর একটির বেশি নাই। মোটরের একটা ড্রাইভার ছিল, কিন্তু মাহিনা না পাওয়ায় রাগ করিয়া দুদিন হয় সেটাও চলিয়া গেছে। তাতে মোটর চালনায় কোনও অসুবিধা হয় না,—কারণ মোটরটা বর্ত্তমানে আবার অচল হইয়া বসিয়াছে। তবে একটা লোক থাকিলে সাংসারিক সুব্যবস্থার সাহায্য হয় বৈকি।

মিসেস নাগের পাহারা হিসাবে বাড়িতে শম্ভু নামে মিসেস নাগের দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় ছোকরাকে বাস করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু চায়ের নিমন্ত্রণে তার উপস্থিতিটা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া মিসেস নাগ বহু আয়াসে তাকে বাড়ির বাহিরে পাঠাইয়াছেন। বহু আয়াসে এই জন্য, যে শম্ভুর নড়াচড়ার অভ্যাস ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে এবং গভীর পরিশ্রমের সঙ্গে সে নিদ্রার উৎকর্ষ-সাধনে প্রবৃত্ত।

কাজেই বসিবার ঘরটা মিসেস নাগকে ঝাড়ুনী দিয়া ঝাঁড় দিতে হইতেছে। কোথাও কোথাও সামান্য ছেঁড়া থাকিলেও মিসেস নাগের ড্রইং রুমের মেঝেতে কার্পেট পাতা। অবশ্য সোফাগুলির দৈহিক অবস্থা খুব ভালো নয়। জয়পুরী টিপয়ের উপর পিতলের খেলনা ঠিকই আছে, আর চেয়ারগুলির সম্বন্ধে নিন্দা করিবার কিছু নাই।

মাকড়শার জালের সঙ্গে মিসেস নাগের লড়াই চলিতেছে। বড় নাছোড়বান্দা মাকড়গুলি, কিছুতেই দূর হইতে চায় না,—অথচ মিসেস নাগের ডানায় আর বেশিক্ষণ ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকিবে এমন ভরসা কম।

'ঈস্, মাকড়টা যে একেরে মাথার 'পরে'—চাকর বংশী-লোচন আসিয়া পিছে দাঁড়াইয়াছে।

'ওম্মা' বলিয়া মিসেস নাগ ঝাড়ুনী ছুঁড়িয়া দিয়া তিন লাফে সরিয়া মাথার মাকড় ঝাড়িয়া ফেলিতে মাথা ঝাঁকুনি দিতে লাগিলেন।

'গেছে'—বংশী কহিল।

লম্বা খাকীর কোর্ত্তা গায়ে, মাথায় পাগড়ী পরা বংশী-লোচন। গদাইনস্করী চালচলনে বংশী চসাফেরা করিয়া থাকেএবং নড়াচড়ার চাঞ্চল্যের অভাব হেতু তাকে পক্ষী-রাজও ওয়কে বলা হয়। মাইনা না পাইলেও তার আসিয়া যায় না,—বাজার করিতে গিয়া সে পয়সা সে তুলিয়া লয়। তাই মিসেস নাগের কাছে সে টিকিয়া আছে।

'জ্বালালি তুই, জ্বালিয়ে মারলি,' প্রকৃতিস্থ হইয়া মিসেস নাগ কহিলেন 'বলেছি কি তোকে, আহাম্মক? হতচ্ছাড়া কোথাকার! এই তোর ফটকে দাঁড়ানো?'

বংশী একাধারে মিসেস নাগের বেয়ারা, বাবুর্চ্চি, দারোয়ান, সব কিছু। মিসেস নাগ আদেশ দিয়াছিলেন, এখন সে দারোয়ান,—ফটক আগলাইতে হইবে। সে কাজে গাফিলতি করিয়া ভৃত্য হইতে আসায় মিসেস নাগের রাগ।

'বাবু এসেছেন'—বংশী আত্মপক্ষ সমর্থনে কহিল।

'এসেছেন' চমকাইয়া উঠিয়া নিজের অপরিচ্ছন্ন জামা কাপড়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়া কহিলেন, 'রায় বাহাদুর? বলিস কিরে? এতো শীগগির তো তাঁর আসার কথা নয়।'

'ইনি চাটার্জ্জী সাহেব', বংশী তাঁকে আশ্বস্ত করিল।

'চাটার্জ্জী সাহেব?' মিসেস নাগ সবিরক্তিতে কহিলেন, 'আঃ মলো। চাটার্জ্জী-সাহেব আবার কী চান্? সময় নেই, অসময় নেই, এসে উপস্থিত হলেই হলো।'

মিসেস নাগকে এরা আসিয়া সব সময়েই বড় বিরক্ত করে। 'যা, যা বল গিয়ে', একটু ভাবিয়া মিসেস নাগ কহিলেন, 'আমি বাড়ি নেই।'

'আমি বলে দিয়েছি, আপনি আছেন',—বংশী স্বীকার করিল।

'বলেছ তো বড় কাজ করেছ', মিসেস নাগ ভেংচাইয়া কহিল, 'তোকে বাড়ি থেকে না তাড়ালে আমার শান্তি নেই।'

বংশী চাটার্জ্জী-সাহেবকে এ-বাড়ির একজন নিয়মিত আগন্তুক বলিয়া জানে। মেমসাহেবের এ-গোসায় তাই তার বিস্ময়। 'ইনি', পুনর্ব্বার সে কহিল, 'চাটার্জ্জী-সাহেব।'

'চাটার্জ্জী-সাহেব তো বয়ে গেল', ধমকাইয়া মিসেস নাগ কহিলেন, 'যত্ত গাধাগরু নিয়ে আমার কারবার।'

চাটার্জ্জী-সাহেব সম্বন্ধে বংশীলোচন হতাশ হইল।

'যাঃ, পাঠিয়ে দেগে', নিরুপায় বিরক্তির সঙ্গে মিসেস নাগ কহিলেন,—'আর শোন্,—রায় বাহাদুর আসবামাত্র নীচের ঘরটায় প্রথম বসাবি। তারপর ছুটে এসে খবর দিয়ে যাবি আমাকে।'

'ঐ টাক্-মাথা বাবু তো?'—বংশী জিজ্ঞেসা করিল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছে,' মিসেস নাগ জবাব দিলেন। 'আর দেখ্', প্রস্থানোন্মুখ বংশীর উপর প্রশ্ন হইল, 'শম্ভু বাবু বের হয়ে গেছে তো? তাকে যে বায়স্কোপে যাবার পয়সা দিয়েছিলাম।'

'গিয়েছেন', বলিয়া বংশী দু-মিনিটের চেষ্টায় ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে সক্ষম হইয়া তার কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিল।

শীঘ্রই পর্দ্দা সরাইয়া মিসেস নাগের বিবাহ-পূর্ব্ব পূর্ব্ব-প্রণয়ী চাটার্জ্জী-সাহেব প্রবেশ করিলেন। চাটার্জ্জী পেন্সন পাওয়া গবর্মেণ্টের চাকুরে। কোট প্যান্টুলান পরণে, মুখটা প্রায় মাছের মতন বক্তব্যহীন। চেহারার মধ্যে লক্ষ্য করিবার জিনিষ তার ছুঁচ্‌লো-করা গোঁফজোড়াটি,—তাদের প্রতি যে যথেষ্ট পরিশ্রম নেওয়া হয়, তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

'ইভনিঙ মীরা,—আই মিন্, মিসেস নাগ,' বিলাতী কায়দায় মাথা পিঠ নিচু ও কুঁজো করিয়া তিনি কহিলেন, 'আশা করি আমি বিরক্ত করলুম না?'

মুখে হাসি টানিয়া আনিতে মিসেস নাগের একটুও দেরী হইল না। 'কিছু নয়, কিছু নয়', সহাস্যে কহিলেন,—'কিন্তু হঠাৎ এমন অসময়ে কেন, জানতে পারি কি?'

'পাঁচটা বাজে, অসময় আর কোথায়', চাটার্জ্জী অভিব্যক্তি-হীন বদনে কহিল,—'আর ভালোবাসায় পড়লে পুরুষের কি সময় অসময় জ্ঞান থাকে, মীরা—আই মিন্, মিসেস নাগ?'

'ভালোবাসা?' মিসেস নাগ যেন ভারি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'অদ্ভুত কথা বলতে পারো তুমি। শোনো কথা, ভালোবাসা!'

'অদ্ভুত! অদ্ভুত কেন?' মিষ্টার চাটার্জ্জী প্রতিবাদ করিল, 'ভেবে দেখো মীরা মাধবকে বিয়ে না করলে এতদিনে তো আমারই অর্দ্ধাঙ্গিনী হয়ে—'

'ওসব কথা', মিসেস নাগ দ্রুত ও বিরক্তির সঙ্গে কহিল, 'আমি পছন্দ করি না, মিঃ চাটার্জ্জী। আপনাকে তো বলেই দিইচি,—বিধবার বিয়ে করা আমি উচিত মনে করি না,—তাতে পাপ হয়।'

'ওঃ, তুমিও ফুলিশ হিন্দুশাস্ত্র আওড়াচ্ছ! গড্, তুমিই না স্ত্রী-সঙ্ঘের একজন নেত্রী?'

'তা ছাড়া' মিসেস নাগ সংশোধন করিয়া কহিলেন, 'আমি বামুন নই—শ্রেণী এক নয়।'

'আমার' সাগ্রহে চাটার্জ্জী কহিলেন, 'কোনও প্রিজুডিস নাই। অসবর্ণ বিবাহ দেশের পক্ষে হিতকর।'

এইখানে সামান্য বক্তব্য আছে। যৌবনকালে চাটার্জ্জী ও মীরা প্রেমে পড়িয়াছিলেন। বিবাহের জন্য চাটার্জ্জী ক্ষেপিয়াও উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তখনো চাটার্জ্জী বেকার,—বিলাত হইতে ফেরা সত্ত্বেও চাকরি জুটাইতে অযথা বিলম্ব হইতেছিল। তাই বিবাহে বাপের অনুমতি না নেওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু বাপ কায়েতের মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া সে চিরাচরিত পদাঘাত দিলেন। কাজেই চাটার্জ্জীর মতটা তখন বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল।

'কবে থেকে', সে ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া মিসেস নাগ কহিলেন, 'মতটা বদলালো?'

'তখন', চাটার্জ্জী স্বপক্ষাবলম্বন করিয়া কহিলেন, 'আমি পরাধীন ছিলাম,—প্রাণের ইচ্ছা প্রাণে চেপে অন্যত্র বিবাহ করতে হ'লো।'

'স্ত্রী মরবার পরই বুঝি পুরানো প্রেম আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ল',—মিসেস নাগ ঝাঁঝ লাগাইয়া কহিলেন।

'বিয়ে হয়ে গেলে', চাটার্জ্জী গোঁফ ছুঁচ্‌লো করিয়া কহিল, 'পূর্ব্ব-প্রণয়ের কথা সাময়িক চাপা পড়ে যায়,—কিন্তু তা মরে না। আর এ-ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছা তো স্পষ্টই বুঝতে পারচো,—তাইতেই তো আমার স্ত্রী মারা গেল, আর তোমার স্বামীও তাই।'

'বটে!' মিসেস নাগ অবজ্ঞার সঙ্গে কহিলেন।

'এতে', চাটার্জ্জী কহিলেন, 'আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? বিশেষ তোমার রূপ—'

'থিয়েটার রাখ', মিসেস নাগ ধমকাইয়া কহিয়া উঠিলেন,

'নিজের চেহারাটা কি কখনো দেখনা, আয়নাতে? অমন ছুটে৷ সজারু-কাঁটার মত গোঁফ রেখে প্রেম করতে আসতে লজ্জা হয় না? আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম,—বিধবার বিয়েটা আমি অন্যায়ই মনে করি। কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্চি। অমন বিশ্রী এক জোড়া গোঁফ নিয়ে কোনো মেয়ের কাছে প্রেম করতে যেয়ো না,—তা তার বয়স যত বেশীই না হোক্।'

অভ্যাসবসে ছুঁচ্লো একজোড়া গোঁফ রাখিলেও মিঃ চাটার্জ্জী যে আধুনিক রুচির সম্বন্ধে অজ্ঞ, এমন নয়। 'প্রিয় মীরা, তুমি যদি রাজী হও', তিনি উদারতার সঙ্গে কহিলেন, 'তবে আমি এতো যত্নের গোঁফ্ জোড়াকেও চেঁছে ফেলবো। চাও তো এখনি ফেলতে পারি,—ক্ষুর আছে?'

স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া গিয়া ক্ষুরের জন্য মিঃ চাটার্জ্জী হাত বাড়াইয়া দিলেন।

মিসেস নাগের ধৈর্য্যের বাঁধ ক্রমেই ঢিলা হইয়া আসিতেছিল। সড়ে পাঁচটার খুব বেশী আর দেরী নাই,—রায় বাহাদুর গনেশবাহন শীঘ্র আসিয়া পড়িবেন। এ সময়ে এমন একটা ক্যাঙলা লোকের উপস্থিত থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। মানুষটাকে এতদিন প্রশ্রয় দেওয়াই যে তার অন্যায় হইয়াছিল, আজ তা মনে হইল।

'আশা করি মিষ্টার চাটার্জ্জী এবার উঠ্বেন,' ভাবশূন্যে মিসেস নাগ কহিলেন, 'জরুরী কাজে এক্ষুনি বেরুতে হবে আমাকে।'

'বেশ, না হয় আমি যাচ্ছি', ঈষৎ আহত হইয়া মচ্ছ-মুখো চাটার্জ্জী কহিলেন, 'কিন্তু বলো মীরা,—আই মিন্, মিসেস নাগ, এই দুর্ভাগা মৃতদারকে তুমি সম্পূর্ণ হতাশ করলে না?'

'অনুগ্রহ করে', মিসেস নাগ ঝাঁঝ দিয়া কহিলেন, 'আস যান্।'—হাত দিয়া সে দরজা দেখাইয়া দিল। অগত্যা রুমালে চোখ মুছিয়া ও গোঁফ ঝাড়িয়া প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতে একদিন পাওয়া যাইতে পারে, এই আশায় বিদীর্ণ বুক বাঁধিয়া চাটার্জ্জী-সাহেব প্রস্থান করিলেন।

'এসেছেন?'—বংশীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চমকাইয়া মিসেস নাগ প্রশ্ন করিলেন।

'ইনি মিত্তির-সাহেব,'—একটা কার্ড দিয়া বংশীলোচন কহিল, 'আপনি বাড়িতে আছেন না নেই বল্বো?'

'নেই', মিসেস নাগ কহিলেন।

মিত্তির-সাহেবও একজন দুর্ভাগ্য মৃতদার। এ-বাড়িতে তিনি প্রায়শই আসিয়া থাকেন। স্বামীর বন্ধু হিসাবে মিসেস নাগকে সদুপদেশাদি দিয়া থাকেন। কিন্তু ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটার মাত্র দশ মিনিট বাকী থাকায় আজ আর তার সদুপদেশের দরকার নাই। বংশীকে বিদায় করিয়া মিসেস নাগ তাড়াতাড়ি ছুটিলেন গা ধুইতে। গা-ধোয়া অর্থে মুখ রগড়ানোও বুঝায়।

বড় এক ফুলের তোড়া লইয়া পক্ষীরাজ ওরফে বংশীলোচন পা মাপিয়া মাপিয়া ঘরে পুনঃপ্রবেশ করিয়া ফুলদানির দিকে অগ্রসর হইল। ফুলদানিটা মাত্র একবার পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু পিতলের বলিয়া ভাঙে নাই।

'আহা বেচারী', তোড়াটার সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিবার পর বংশীলোচন মন্তব্য করিল, 'ফুল-কেনার পয়সাটাই খোয়া গেল,—ভেট্ হলো না।'

সাত

রায়বাহাদুর সাজগোজ করিয়াই আসিয়াছেন। নতুন জামাইটির মতো না দেখা গেলেও, সৌখীন লোক বলিয়াই মনে হয়,—কিন্তু নীচের চুলগুলি যথাসাধ্য উপরে উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেও টাকটা কিছুতেই ঢাকা পড়ে নাই।

পরস্পর অভি-ভদ্রতা বিনিময়ের পর রায় বাহাদুর বসিবার জন্য অগ্রসর হইলেন,—'আপনার বাড়ীতে এলেই কেন জানি একটা শান্তি ও নির্ভরতা অনুভব করি',—রায় বাহাদুর মন্তব্য করিলেন।

'ওটাতে', রায় বাহাদুর পাশের সোফাটায় বসিতে উদ্যত হইলে, মিসেস নাগ তাড়াতাড়ি স-আতঙ্কে কহিয়া উঠিলেন, 'বসবেন না, রায় বাহাদুর।'

গণেশবাহন সে প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত হইলেন। 'আমি একটু মোটাই বটি, মিসেস নাগ', বিব্রত হইয়া কহিলেন, 'আপনি কি মনে করেন সোফাটা আমার ভার সইতে পারবে না?'

'পাগল নাকি, কে বল্লে আপনাকে খুব মোটা আপনি?'

মিসেস নাগ কহিলেন, 'গায়ে মাংস থাকলেই বুঝি মোটা হলো? পাটকাঠি হতে হবে বুঝি? একটু শরীর না থাকলে ভালো দেখাবে কেন?—তা নয়, সোফাটির একটা পা ভাঙা, —মানে, আজকেই ভেঙে গেছে, তাড়াতাড়ি আর সারানো গেল না।'

'ধন্যবাদ, মিসেস নাগ', আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে রায় বাহাদুর কহিলেন, 'এ বয়সে পড়ে গেলে ব্যথা সারতে দেরি হ'তো।'

মিসেস নাগ গদী-আঁটা নিরাপদ একটা চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। ভুঁড়ির ওজনের জন্য বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে রায় বাহাদুরের সত্যই কষ্ট হয়। বসিতে পারিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

'আপনি নিজেকে', রায় বাহাদুরের কাছে একটা চেয়ার টানিয়া আনিয়া বসিতে বসিতে মিসেস নাগ বিশেষ মোলায়েম করিয়া কহিলেন, 'মিথ্যে অত্যন্ত বুড়ো মনে করেন, রায় বাহাদুর। কী বয়স হয়েছে আপনার!—তবে নিঃসঙ্গ জীবনে অমনি মনে হয় বটে। সেই জন্যই তো স্ত্রী মারা গেলে পুরুষের আবার বিয়ে করতে বিলম্ব করা উচিত নয়।'

রায় বাহাদুর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কোন-কিছুর জন্য আক্ষেপ জ্ঞাপন করিলেন।

'ধরুণ, আপনিই যদি', মিসেস নাগ বলিতেই লাগিলেন, 'আবার বিয়ে করতেন, তবে কি এতটা মন-মরা লাগতো আপনার?'

'আমি বিয়ে করবো? এই বুড়োকে বিয়ে করতে কেউ কি কখনো রাজী হতো, মিসেস নাগ?'

'আপনার মত পুরুষকে', মিসেস নাগ চেয়ারটা আরোও একটু আগাইয়া লইয়া কহিলেন, 'বিয়ে করতে রাজী হয়না, এমন কোনও বিধবা মেয়েও আছে নাকি ত্রিভুবনে? রূপে গুণে, সরকারী সম্মানে আপনি একজন আদর্শ পুরুষ। তাছাড়া বিপুল ঐশ্বর্য্য। কোনও কিছুরই অভাব নাই।

'তা খুব একটা বেশি নাই বটে।'

মিসেস নাগ রায় বাহাদুরের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী এতদিন ধরিয়া শুনিয়া আসিয়াছেন। কত বিনিদ্র রাতে শুইয়া শুইয়া তিনি কল্পনা করিয়াছেন, কত লক্ষ হইবে?—বেশি, কিন্তু কত বেশি? তার পরিমাণ সম্বন্ধে একটা সঠিক সংবাদ এ পর্য্যন্তও তিনি যোগাড় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইন্‌কাম-ট্যাক্সের লোক না হইয়াও রায় বাহাদুরের সম্পত্তির আয় সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা তার অতিশয়ই প্রবল।

চোখে একটু কটাক্ষের মত মিসেস নাগ টানিয়া আনিলেন। 'শুনেছি', মিষ্টি একটু দুষ্টু হাসিবার প্রচেষ্টা করিয়া কহিলেন, 'পঁচিশ লাখ টাকা শুধু নাকি আপনার ব্যাঙ্ক-এই আছে, রায় বাহাদুর,—এ কি ছেলাখেলা!'

'তা, সামান্য কিছু আছে বৈ কি', গণেশবাহন বোকার মত হাসিয়া কহিলেন।

মিসেস নাগের আর সন্দেহের ছায়ামাত্র রহিল না। কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া যে ঐশ্বর্য্যের কল্পনা করিয়াছেন, তাহা সত্যই আর কল্পনা নহে,—এক লক্ষ টাকায় কত টাকা হয়, তাহা এই বুড়া বয়সেও একবার গুনিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল।

অনেক দিন ধরিয়া মিসেস নাগ রায় বাহাদুরের কাছে একটা বক্তব্য গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সব দিকে নিঃসন্দেহ হওয়ার পূর্ব্বে তিনি তাহা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু এখন আর তার কোনও দ্বিধা রহিল না।

কিন্তু এমন সময় প্লেটে খাবার লইয়া বংশীলোচন প্রবেশ করিল। মিসেস নাগ বক্তব্যটা ঠোঁটের উপর আটকাইয়া ফেলিলেন।

'এ যে বিস্তর খাবার, মিসেস নাগ', রায় বাহাদুর কহিলেন, 'আমার আবার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া।'

'ভয় নেই রায় বাহাদুর', মিসেস নাগ হাসিয়া কহিলেন, 'আমি নিজ হাতে সবগুলিই তৈরি করেছি,—কেক্ থেকে পুডিং অবধি,—বাজারের খাবার ওতে একটাও নেই।'

'তাই নাকি মিসেস নাগ', কৃতার্থ হইয়া রায় বাহাদুর গণেশবাহন কহিলেন, 'আমার জন্য তা হ'লে বিস্তর কষ্ট হয়েছে, আপনার!'

'কিছু নয়, কিছু নয়। আপনার কাছে ওগুলো অখাদ্য না হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।'

'আপনারটা আনলো না কেন?'—এক চামচ পুডিং মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া রায় বাহাদুর কহিলেন, 'ওহে কি তোমার নাম, মেমসাহেবের খাবারও এখানে নিয়ে এসো।—এই আপনার দারোয়ান, নয়, মিসেস নাগ?'

'বেয়ারাটার আবার অসুখ হয়েছে', মিসেস নাগ তাড়াতাড়ি কহিলেন, 'তাই দারোয়ানকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিচ্ছি,—মানুষটা বেশ ভাল, পুরানো দারোয়ান কি না।'

পক্ষীবাজ ঢোক গিলিতেছে দেখিয়া মিসেস নাগ তাড়াতাড়ি তাকে চায়ের জন্য পাঠাইলেন।

'আমার প্লেট থেকেই আপনি কিছু উঠিয়ে নিন্', রায় বাহাদুর অনুরোধ করিলেন, 'চমৎকার হয়েচে পুডিংটা।'

'চা ছাড়া আমি আর কিছু খাবো না', মিসেস নাগ জবাব দিলেন, 'কেক্ পুডিং এ-সবই ডিমের তৈরি,—আমাদের বিধবাদের কি আর ওসব খাওয়ার জোগাড় রেখেচে পুরুষশাস্ত্রকারেরা?'

গণেশবাহন আর এক চামচ পুডিং গিলিয়া ফেলিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে কহিলেন,—'বলেন কি মিসেস নাগ, ডিমও খেতে পারবেন না? বিধবার ওপর হিন্দুশাস্ত্রের সত্যই দারুণ অত্যাচার! নইলে ডিম তো সত্যি সত্যি আর প্রাণী হয়ে উঠেনি।'

'তা আর বলে লাভ কী', মিসেস নাগ সখেদে জানাইলেন।

বিধবাদের ওপর এ জুলুম আর রায় বাহাদুরের সহ্য হইতেছে না। এর প্রতিকার করা যে উচিত, তাতে রায় বাহাদুরের সন্দেহমাত্র নাই। বিধবা মিসেস নাগের ওপর সমাজের যে নির্য্যাতন তিনি গত কয়েক মাস হইতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছেন, তার একটা প্রতিকারের সুযোগ তিনি অনেকদিন হইতে খুঁজিতেছেন।

'এ নির্য্যাতন', রায় বাহাদুর গণেশবাহন সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিলেন, 'আমি আর চোখে দেখতে পারি নে। যদি অনুমতি দেন তো—'

কিন্তু অনুমতি দিবার পূর্ব্বেই চায়ের পট লইয়া বংশীলোচন পুনঃ প্রবেশ করিল। গণেশবাহন থামিলেন। মিসেস নাগের অনুমতি প্রস্তুত হইয়াই ছিল, কিন্তু তাকেও অপেক্ষা করিতে হইল।

বংশীলোচনকে যথাসম্ভব শীঘ্রই বিদায় করা হইল।

'থামলেন কেন, রায়বাহাদুর', মিসেস নাগ চায়ে চিনি মিশাইতে মিশাইতে দরদের সঙ্গে কহিলেন, 'বলুন কি বলছিলেন।'

রায় বাহাদুরের আর দ্বিধা রহিল না।

'বিধবার এত দুঃখ', গদগদভাবে রায় বাহাদুর কহিলেন, 'আমি আর চোখ দিয়ে দেখতে পারি না,—ডিমও খেতে পারবে না, কী ভয়ঙ্কর জুলুম তার ওপর। এ দুঃখ আমি দূর করতে চাই। অনুমতি পেলে আপনাকে আমি বিয়ে করতে চাই, মিসেস নাগ।'

আনন্দ ও আবেগের আতিশয্যে মিসেস নাগ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। একজন আদর্শ পুরুষ রায় বাহাদুর গণেশবাহন,—লক্ষ লক্ষ টাকা তার ব্যাঙ্কে আছে,—সর্ব্বগুণভূষিত তিনি।

'আমাকে?' উচ্ছ্বসিত পুলকে তিনি কহিলেন, 'রায় বাহাদুর, সত্যি, আপনি সত্যি বলছেন তো? ওঃ, আমার চেয়ে জগতে সুখী আর কে?'

রায় বাহাদুরের জন্য অনেক তপস্যা মিসেস নাগকে এতদিন ধরিয়া করিতে হইয়াছে। সে প্রচেষ্টা ফলবতী হইয়াছে দেখিয়া আহ্লাদে তার মাথা বিগড়াইবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

'তবে তোমাকে', কিছুক্ষণ পরে পকেট হইতে একটা আংটী বাহির করিয়া গণেশবাহন কহিলেন, 'এই হীরের আংটীটি পরিয়ে দিতে চাই।'

রায় বাহাদুর হিসাবী লোক। বুদ্ধি খরচ করিয়া ঠিক ঠিকই একটা আংটী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন।

মিসেস নাগ আড়চোখে একবার তাকাইয়া দেখিল আংটী সত্যই হীরার কি না। 'পরিয়ে দাও', সহর্ষে তিনি কহিলেন, 'তোমার ভালোবাসার আংটীর দাম অমূল্য।'

'তোমার সেই আত্মীয় ছোকরাটা এখানে আবার আসবে না তো?'—গণেশবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন।

'কোনও ভয় নাই', আশ্বাস দিয়া মিসেস নাগ কহিলেন, 'তাকে পয়সা দিয়ে বায়স্কোপ দেখতে পাঠিয়ে দিইচি।'

আট

সারা বিকাল হগ-বাজারে মিসেস গুপ্ত বাজার করিয়া

কাটাইলেন। শশাঙ্ক মাতৃভক্তি দেখাইবার জন্ম সঙ্গে আসিতে রাজী হইয়াছিল, এতক্ষণে টের পাইল কি ফাঁদেই সে পা বাড়াইয়াছিল। তবে এরই মধ্যে সে দুইবার আইস্-ক্রীম ও এক ডজন মাংসের পিঠা মায়ের কাছ হইতে আদায় করিয়াছে। কিন্তু মায়ের বাজার করার পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে ক্রমেই সে আতঙ্কিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

বাজার করা যখন সত্যি শেষ হইল, তখন নতুন ফরমাস হইল,—চল্ মিসেস নাগের বাড়ি। মাতৃভক্তির বিপদ এতক্ষণে শশাঙ্ক সম্পূর্ণ টের পাইল। কিন্তু কোন অজুহাতই টিঁকিল না। অতি বিলম্বে শশাঙ্ক বুঝিল সোফারকে বাড়ি রাখিয়া নিজে গাড়ি চালাইয়া আনায় অদূরদর্শীতা হইয়াছে।

মিসেস নাগের বাড়ি পৌছিয়া মিসেস গুপ্ত উঠিয়া গেলেন সরাসরি উপরে। শশাঙ্ক ভাবিতে লাগিল যে ও যাইবে কি না, এবং কোনও সিদ্ধান্তে আসিতে না পারায় শেষে একটি চুরুট ধরাইল।

কিছুক্ষণ আগেই সন্ধ্যা হইয়াছে অথচ উপরে উঠিয়া মিসেস গুপ্ত আবিষ্কার করিলেন যে একটা আলোও জ্বালান হয় নাই। অপ্রতিভ হইয়া ভাবিলেন মিসেস নাগ বাড়ি নাই। ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইয়া নিতান্তই অকারণে ড্রইং-রুমের পর্দাটা একবার টানিয়া দেখিতে গেলেন। কিন্তু টানিয়াই চমকাইয়া উঠিলেন।

রায় বাহাদুর গনেশবাহন মিসেস নাগের চেয়ারটার সম্মুখে মধ্যযুগের নাইটদের মত হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন। তার মোটা শরীরে উঠিয়া পড়িতে একটু দেরি হইল, কিন্তু মিসেস নাগ সহজেই দাঁড়াইয়া পড়িলেন। 'আসুন, আসুন, মিসেস গুপ্ত, কী সৌভাগ্য আমার', মিসেস নাগ সহৃদয়তার সঙ্গে কহিয়া উঠিলেন। ভারি সপ্রতিভ মেয়ে মিসেস নাগ।

মিসেস গুপ্ত তখনো চোখ কচলাইতেছিলেন,—আলো জ্বালান হইলে তবে সবকিছু তার হৃদয়ঙ্গম হইল,—বুঝিলেন এ এতক্ষণ বাজার করার দরুণ মাথা-ঘোরা নয়।

রায় বাহাদুর এতক্ষণে উঠিতে পারিয়াছেন,—কিন্তু ভদ্রলোক বড় বেশি লাজুক,—মুখটা বড় বেশি লাল ও টাকটা বড় বেশি শাদা হইয়া উঠিতেছে।

'আপনি হয়তো একটু আশ্চর্য্য হয়েছেন', মিসেস নাগ ব্যাখ্যা করিবার জন্য কহিলেন, 'কিন্তু বিস্মিত হবার কিছু নেই। রায় বাহাদুর আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছেন, আমি আহ্লাদের সঙ্গে রাজী হয়েছি।'

রায় বাহাদুর ঘরের কোণা খুঁজিতেছেন দেখিয়া তাকে কহিলেন,—'আপনি লজ্জা করছেন কেন, রায় বাহাদুর, টিপয়টার সঙ্গে আবার ধাক্কা খাবেন না যেন।'

'না, লজ্জা নয়', বিজড়িত গলায় গণেশবাহন উত্তর দিল।

শুনিয়া মিসেস গুপ্ত আকাশ হইতে পড়িলেন। দুই বার সম্পূর্ণ ও একবার অর্দ্ধেক ঢোক গিলিবার পর কহিলেন, 'বিয়ে? অপনাদের?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের', মিসেস নাগ সপুলকে কহিলেন, 'বন্ধ নেওয়ার জন্ম রায় বাহাদুরের ভারী—সাহায্যের বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল।'

'বেশ, বেশ', সামনের চেয়ারটায় সহসা বসিয়া পড়িয়া মিসেস গুপ্ত কহিলেন।

তন্ময় হইয়া চুরুট টানিতে টানিতে এক সময় চমকাইয়া শশাঙ্ক দেখে সম্মুখের দিকে আরেকটা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক সম্বন্ধে স্বাভাবিক কৌতূহলবশত তাকাইয়া দেখে দরজা খুলিয়া পূর্ণিমা নামিবার উপক্রম করিতেছে। চুরুটটা দূরে ছুঁড়িয়া দিয়া তড়াক করিয়া শশাঙ্ক লাফাইয়া নামিল রাস্তায়।

'নমস্কার পূর্ণিমা, ভালো আছ তো?' শশাঙ্ক পূর্ণিমার সম্মুখীন হইয়া কহিল, 'স্ত্রী-সঙ্ঘের কুশল তো?'

'নিশ্চয়ই,—একশো বার!'—পূর্ণিমা চলিতে চলিতেই কড়া করিয়া কহিল।

'কার? তোমার না স্ত্রী-সঙ্ঘের?'

'দুয়েরই।'

'কিন্তু আমি যে মোটেই ভাল নেই।'

'দুঃখিত।'

'কিন্তু কেন ভাল নেই', শশাঙ্ক দুষ্টমির সুরে কহিল, 'তা কি তুমি জানো না?'

'জানিনা,' পূর্ণিমা দোতলার সিঁড়িতে এক পা দিয়া কহিল, 'জানতেও চাই না।'

'স্ত্রী-সুলভ কৌতূহলও নেই?'—শশাঙ্ক পিছনে চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিল।

পূর্ণিমা কোনও জবাব দিল না, শশাঙ্ক কর্তৃক অনুসৃত হইয়া উপরে উঠিয়া গেল।

ড্রইং-রুমে সম্মিলিত বিস্ময় আনন্দ ও ভীতির গুঞ্জন উঠিল।

'পূর্ণিমা!'—মিসেস নাগ চমকিয়া কহিলেন।

'শশাঙ্ক!'—সন্ত্রস্ত গণেশবাহন ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে উক্তি করিলেন—'বেড়াতে এসেছো বুঝি?'

রায় বাহাদুর গণেশবাহন বড় লাজুক লোক। বড় বেশি ঘামাইতেছেন তিনি। তাছাড়া শশাঙ্ক যা কাজিল,—তাকে রায় বাহাদুরের চিরদিনই বড ভয়। আজকে এ অবস্থায় শশাঙ্ক আসিয়া উপস্থিত না হইলেই তিনি স্বস্তি বোধ করিতেন।

'মাকে নিয়ে এসেছি,' রায় বাহাদুরের কথার জবাব দিয়া শশাঙ্ক কহিল, 'এখনো অত্যন্ত অবলা আছেন তিনি।'

'নিতান্ত জরুরী একটা পরামর্শ আপনার সঙ্গে করা দরকার,' পূর্ণিমা মিসেস নাগকে কহিল, 'ভাই বাড়ি ফিরেছেন কিনা খোঁজ করতে এসেছিলাম।'

'বেশ করেচ, ভাল করেচ', মিসেস নাগ খুসীর সঙ্গে কহিলেন।

মিসেস গুপ্ত আর চুপ থাকা প্রয়োজন মনে করিলেন না। অথচ তার ঠোঁট ফাঁক হইতেই রায় বাহাদুর গণেশবাহন প্রমাদ গনিলেন কিন্তু মিসেস নাগের মুখটা গর্ব্বোজ্জল হইয়া উঠিল।

'তোমরা শুনে খুশী হবে', মিসেস গুপ্ত কহিলেন, 'আমি আসার একটু আগেই মিসেস নাগ আর রায় বাহাদুর গণেশবাহন পরস্পরকে বিবাহ করা স্থির করেছেন।'

'মিসেস নাগ!' বজ্রাঘাত-স্তম্ভিতের মত পূর্ণিমার মুখ দিয়া বাহির হইল।

'রায় বাহাদুর গণেশবাহন!'—কৌতূহলী হইয়া শশাঙ্ক কহিয়া উঠিল।

রায় বাহাদুর গণেশবাহন এতক্ষণে দেওয়ালের এক কোণায় যাইয়া ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছে,—আর সরিতে পারিতেছে না।

'বুড়ো বয়সে', বিব্রত রায় বাহাদুর অস্ফুট গর্জ্জন করিবা কহিলেন, 'দেউ দেখাশুনা করবার না থাকলে বড় অসুবিধে হয়।'

শশাঙ্কের চোখ দুইটাই বড় ভয়ঙ্কর। রায় বাহাদুর আড় চোখে তাকাইয়া দেখিলেন এ ন্যায্য কৈফিয়তেও বিদ্রূপ-হিংস্র দৃষ্টিটা একটুমাত্র নরম হইল না। কোন প্রকারে এক বিব্রত কৈফিয়ৎ দিয়া পলাইয়া তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

পূর্ণিমা এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। একবার বিস্ময় প্রকাশ ছাড়া তার গলা দিয়া আর একটা কথাও বাহির হয় নাই। কিন্তু মিসেস নাগের এতটা বয়সে এমন একটা নাটকীয়তায় তার আদর্শবাদ বিষম একটা আঘাত খাইল,—নিশ্চিন্ত সমুদ্রের মধ্যে চলিতে চলিতে যেন প্রচ্ছন্ন এক পাহাড়ের সঙ্গে জাহাজ ধাক্কা খাইয়াছে—তেমনি আকস্মিক ও ভয়ানক।

'মিসেস নাগ',—এক মিনিট মিসেস নাগের চোখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া রুক্ষস্বরে পূর্ণিমা ডাকিল।

মিসেস নাগ এর জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। রায় বাহাদুরের মত তিনি লাজুকও নন।

'কেন, দোষটা কি হয়েছে শুনি!'—কড়া করিয়াই মিসেস নাগ কহিয়া উঠিলেন, 'বিধবার বিবাহ কি আমাদের সভ্য থেকে বিশেষ অনুমোদিত নয়? তবে আর কি?—যা বল তা বল বাপু, বিয়েই মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম। আপনি কি বলেন মিসেস গুপ্ত?'

'তা বটে', পৃষ্টপোষকতা চাওয়ায় মিসেস গুপ্ত কহিলেন, 'কিন্তু—, যাক্‌, তবে এবার থেকে মিসেস নাগকে আর সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ি চড়তে হবে না।'

মিসেস নাগ ঢোক গিলিলেন। কিন্তু আজ তার একটা বিশেষ দিন। এই দিনটার জন্য কম তপস্যা করিতে হইয়াছে নাকি তাহাকে? তাই আনন্দের আতিশয্যে তিনি সমবেত সবাইকে চা খাইতে আমন্ত্রণ করিলেন। মিসেস গুপ্তকে লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন জলযোগের ব্যবস্থা করিতে।

'আপনার বিয়ে বার বার হোক', শশাঙ্ক বলিতে যাইতেছিল কিন্তু মায়ের কাছে বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত আর বলিল না।

প্রথমে শশাঙ্ক খুব এক চোট হাসিল। সেই হাস্যকে নায়গ্রা জলপ্রপাতের সঙ্গে তুলনা না করিয়া ফুজিয়ামার অগ্নুদগারের সঙ্গে বেশি উপমা দেওয়া যায়—পূর্ণিমার কাছে তাই মনে হইয়াছিল। বজ্রাহত পূর্ণিমার নড়িবার শক্তি ছিল

না, প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা ছিল না; চেয়ারের হাতলে কনুই ভর করিয়া হাতের উপর মাথা কাৎ করিয়া সে বসিয়াই রহিল।

'এইবার করে যে', শশাঙ্ক সম্মুখের দেওয়ালটাকেই কহিল, 'সঙ্ঘের সম্পাদক মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম্মে মন দেবে, তার প্রত্যাসায় বসে আছি।'

এ-কথা হয়তো পূর্ণিমার কানেই গেল না। আঘাত তার কত গভীর, বেদনা তার কত মর্ম্মান্তিক তা ধারণা করিতে পারিলে এমন কি শশাঙ্কেরও দয়া হইত।

'সঙ্ঘের শত্রুরা' অনেকক্ষণ পরে প্রায় স্বগতোক্তির মতন পূর্ণিমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, 'এইবার টিটকিরি দেবার কি সুযোগই পাবে!—

'পুরুষেরা', আশ্বাস দিয়া শশাঙ্ক কহিল, 'এ ত ব্যঙ্গ করবার মতন কিছুই নতুন খুঁজে পাবে না। এ ত মেয়েদের চিরকেলে স্বভাব। অনেক বিদ্রোহ টিদ্রোহ করে সুবিধা মতন একটা স্বামী যোগাড় হলেই বনভূমি হ'তে স'রে পড়া সকল স্বাধীনা মেয়েরই চরম লক্ষ্য।'

'সব মেয়েরই', আঘাত খাইয়া চটিয়া পূর্ণিমা কহিল, 'চরম লক্ষ্য তুমি জানো যেন!'

'নয়ত কি', শশাঙ্ক কহিল, 'মেয়ে জাতটাই হিসেবী, হিসেব করে দরকার হলে বিদ্রোহ ও তারপর সুবিধে মনে করলেই আবার আপোষ করে নিতে দেরি করে না। যারা যত বেশি স্বাধীনা তারা তত শীগগীর ডিগবাজী খায়। আমার তো মনে হয় স্ত্রী-যুদ্ধের পাণ্ডাদেরও রায় বাহাদুর উপাধি দেওয়া উচিত।'

'বলে নাও, বলে নাও', ক্রুদ্ধভাবে পূর্ণিমা কহিল, 'বলবার একটা অবকাশ পেয়েছ,—ছাড়বে কেন? এতটা বয়সে মিসেস নাগের এই আচরণ অশোভন হ'তে পারে, কিন্তু সঙ্ঘের আদর্শ ও নয়, মিসেস নাগ নন।—মিসেস নাগের ব্যবহারে সঙ্ঘ তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করবে।'

'কিন্তু পূর্ণিমা', শশাঙ্ক গম্ভীর হইবার প্রচেষ্টা করিয়া কহিল, 'এ যে প্রেম। প্রেম কি বয়স বিচার করে কোনদিন?

'প্রেম?' বিস্মিত হইয়া পূর্ণিমা কহিল।

'প্রেম ছাড়া আর কি', শশাঙ্ক বুঝাইতে লাগিল, 'রায় বাহাদুরের এত টাকাতেও যদি মেয়েদের প্রেম না হয়, তবে কিসে আর হবে? চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, বড় ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স তেমনি করে প্রত্যেক মেয়ের ভালবাসাকে।'

শশাঙ্কের ব্যঙ্গের নির্দ্দয়তায় পূর্ণিমা স্তব্ধ হইয়া গেল। মনের ভিতরে প্রতিকারের অস্ত্র শানাইতে লাগিল,—ইচ্ছা হইতে লাগিল শশাঙ্ককে সমান কুশলতার সঙ্গে আঘাত নিক্ষেপ করে।

'এই যে তুমি পূর্ণিমা', হঠাৎ নতুন এবং কিছু মৃদু স্বর লাগাইয়া, অবশ্য কিছু ব্যঙ্গের সঙ্গে শশাঙ্ক কহিল, 'কিছুতেই আমাকে বিয়ে করতে রাজী হচ্চো না, তার কারণ খোঁজা তো কঠিন নয়। তার কারণ এই যে—অন্ পিন্সিপ্‌ল্ আমি উপার্জ্জন করি না।'

'পৃথিবীতে এমন মেয়ে যথেষ্ট আছে', পূর্ণিমা তেজের সঙ্গে কহিল, 'যারা টাকাকে ঘৃণা করে।'

'তবে আমার আশা যে নিতান্তই নাই,—তা নয়—' শশাঙ্ক মন্তব্য করিল।

'দেখো পূর্ণিমা', কতক্ষণ পরে শশাঙ্ক গম্ভীর স্বরে কহিল, 'এইবার আর তোমার বিয়ে করতে আপত্তি থাকা উচিত নয়।'

'পায়ে ধরে', পূর্ণিমা মিনতি-মিশ্র কণ্ঠে কহিল, 'আজ আর আমাকে বিব্রত করো না। আমি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছি, আজ আমাকে দয়া করো।'

বলিতে বলিতে পূর্ণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখটা লাল হইয়া উঠিয়াছে, ঠোঁট দুইটা বারম্বার শিহরিয়া উঠিতেছে, চোখ দুইটি হইয়া উঠিয়াছে আসিক্ত।

'আচ্ছা থাক্ থাক্', শশাঙ্ক কহিয়া উঠিল, 'রায় বাহাদুরের সঙ্গে একই দিনে আমার বিয়ে ঠিক হয় এ আমি নিজেও পছন্দ করি না। কিন্তু আজ বোধ হয়,—চা খাবে না?'

পূর্ণিমা কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াও বলিল না। ধীরে ঘর হইতে হাঁটিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুবোধ বসু

ব্রতের ফল

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম-এ

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র "আমরা চাই"। পৃথিবীর জন্মদিন হইতে সেই যে চাওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহার আর শেষ নাই। পৃথিবীর জীবদ্দশায় কামনার মৃত্যু হইবে না।

আমাদের বংশের আদিপুরুষটি মর্ত্ত্যের মাটীতে কবে যে প্রথম পা দিয়াছিলেন জানি না। কোন ঐতিহাসিক তাঁহার জন্ম মৃত্যুর তারিখ লইয়া বিবাদের ভরসা করে না, কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের উর্ব্বর মস্তিষ্কও তাঁহার অবয়বের পরিকল্পনা দিতে পারে না। তাঁহাকে বুঝিবার, তাঁহাকে চিনিবার তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা করিবার কিছুমাত্র উপায়ই নাই। সেই বিস্মৃত দিবসের পরিচয় দিবার কোন সাক্ষ্যই আজ অবশিষ্ট নাই। সবই গিয়াছে, আছে কেবল একটী প্রদীপ, কামনার লেলিহান শিখা জ্বালাইয়া সে চির-জাগ্রত। এই অনির্ব্বাণ প্রদীপে সর্ব্বপ্রথম অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন আমাদের এই মানবগোষ্ঠির প্রথমতম জনক। কালপ্রভাবে তাঁহার স্মৃতি আমাদের মন হইতে হয়ত একেবারে মুছিয়া যাইত, কিন্তু সে অকৃতজ্ঞতার পাপে তিনি আমাদের লিপ্ত হইতে দেন নাই। তাঁহার স্বহস্তে জ্বালা এই রক্ষা প্রদীপের উত্তাপ আজও আমরা, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের মত সমভাবেই অনুভব করি।

মনের মধ্যে পাইবার ইচ্ছা যখন জাগিয়া উঠিল তখন মানুষ মানুষের কাছে চাহিল, চাহিয়াও যখন পাওয়া গেল না তখন যুদ্ধ করিল; যুদ্ধও যখন বিফল হইল, তখন আর কি করিবে—তখন সে তাহার অপরিতৃপ্ত পিপাসা, পুঞ্জীভূত আকাঙ্খা, অনির্ব্বাপিত বেদনা সমস্তই জানাইয়া দেবতার করুণা ভিক্ষা করিল। সে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল—'আয়ু দাও, যশ দাও, ভাগ্য দাও'।

নিরুপায় ও নিরাশ্রয় হইলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা সকলেই করে। আবার যে যত দুর্ব্বল, যে যত অসহায় তাহারই বিশ্বাস তত গভীর, তাহারই প্রার্থনা তত করুণ. তাহারই ব্যকুলতা তত মর্ম্মস্পর্শী। তাই দেখি, ব্রত ও ব্রতকথা এই দুইটী বস্তু একান্তভাবে নারীজাতিরই সম্পত্তি। সহায়সম্বলহীন নারী জাতিই ইহাদের জন্ম দিয়াছেন তাঁহাদের হাতেই ইহারা পুষ্টিলাভ করিয়াছে। এই ব্রতকথাগুলির মধ্যে আছে বাঙ্গলাদেশের প্রতিচ্ছবি। পটুয়ার পটের মত এক একটি ব্রত কথা এক একটি গ্রাম্য চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেয়। তাহাতে দেখিতে পাই বাঙ্গালী মাতার অপার সন্তান বাৎসল্য, বাঙ্গালী ভগ্নীর অপরিমেয় ভ্রাতৃস্নেহ, বাঙ্গালী দুহিতার ঐকান্তিক পিতৃভক্তি, বাঙ্গালী বধূর মধুময় পতিপ্রেম। অন্যদিকে দেখি বাঙ্গালী রমণীর সপত্নীর প্রতি নির্ম্মম বিদ্বেষ, সপত্নীপুত্রের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার, নিজের বা আত্মীয়স্বজনের মঙ্গলের জন্য পরকে উপেক্ষা। একদিকে দেখি,—"তুঁষলি গেল ভেসে। আমার বাপ ভাই এল হেসে॥" "তুঁষ তুষলি কাঁধে ছাতি। বাপ মার ধন যাচাযাচি॥" "কালো ধানে রাঙা পুতে। জন্ম যায় যেন এয়োস্ত্রীতে॥" আবার অন্য দিকে দেখা যায়, "তাল গাছেতে বাবুই বাসা। সতীন মরে দেখতে খাসা॥" "থুতকুড়ি থুতকুড়ি। সতীন বেটি ঝাঁটকুড়ি।" "আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে। অন্যের ভাই কুড়িয়ে খায়।" ইত্যাদি।

ব্রত ও ব্রতকথা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ প্রবন্ধে আমার লক্ষ্য হইতেছে ব্রতের অনুষ্ঠান, ব্রতকথা ও তৎসম্বন্ধে প্রবীণাদের উক্তি এই কয়টি উপাদানের মধ্য দিয়া সে যুগের (অর্থাৎ যে যুগে ঐ সমস্ত ব্রতাদির প্রচলন আরম্ভ হয়) বঙ্গ-রমণীর মানসিক অবস্থার একদিকের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া—তাঁহাদের আকাঙ্খার একটী তালিকা প্রস্তুত করা।

সেঁজুতি (১)

সেঁজুতির ছড়াগুলিকে বিষয় অনুযায়ী কয়েকটী ভাগ করিয়া লইব। প্রথম ভাগে থাকিবে পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির কুশল কামনা। দ্বিতীয় ভাগে থাকিবে ভাল বর কামনা এবং তাহার মঙ্গল প্রার্থনা। তৃতীয় ভাগে থাকিবে সপত্নীর অমঙ্গল কামনা। চতুর্থ ভাগে থাকিবে নানা বিষয়ের ছড়া। এমন কতকগুলি ছড়া আছে, যে গুলির মধ্যে দুই তিন বা ততোধিক বিষয়ের প্রার্থনা আছে। খণ্ড খণ্ড করিয়া বিষয় অনুসারে বিশেষ বিশেষ বিভাগে না দিয়া, সেগুলিকে এই চতুর্থ বিভাগে স্থান দিয়াছি। এই বিভাগে অন্যান্য বিষয়ের সহিত ব্রতী বালিকাগণের নিজ নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে যে জিনিষের প্রয়োজন এবং আকাঙ্খা ছড়ার মধ্য দিয়া সে সকলেরও একটী নাতিবৃহৎ তালিকা পাওয়া যাইবে।

১। সেঁজুতি পূজার প্রথম মন্ত্রে ব্রতী (বর্ত্তি) কুমারী নিজের জন্য কিছু না চাহিয়া পিতামাতার ধন ও পুত্র প্রার্থনা করিয়া সেঁজুতিকে আরাধনা করিলেন, বলিলেন—

"বর্ত্তি হয়ে মাগি বর।
ধনে পুত্রে বাপ-মার ঘর।"

অন্য একটি মন্ত্রে কুমারী সুপারি গাছের নিকটে পিতার জন্য দিল্লীশ্বরত্ব এবং ভ্রাতার জন্য রাজত্ব প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—

"গুয়া গাছ সুপারি গাছ মুঠিয়ে ধরে মাজা।
বাপ হয়েছে দিল্লীশ্বর ভাই হয়েছে রাজা।" (২)

সেঁজুতির ব্রতে আরও অনেক ছড়া আছে যেগুলি 'বাপ ভাই'যের মঙ্গল কামনার প্রসঙ্গেই রচিত। যেমন—

"বাঁশের কোড়া।
রূপের ঘোড়া।
বাপ রাজা।
ভাই প্রজা।"

আকাশে নক্ষত্র যতগুলি, কুমারী ততগুলি ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন—

"যতগুলি নক্ষত্র ততগুলি ভাই।
বসোধা পূজা কোবে ঘরে ফিরে যাই।"

অন্যত্র সপ্ত ভ্রাতার ভগ্নী হইবার প্রার্থনা—

"ইন্দ্রপুজি বুড়ু হোয়ে।
সাত ভাইয়েব বোন হোবে।"

'বাপ'কে রাজা এবং 'ভাই'কে বাদ্সা করিবার জন্য শঙ্খকে অনুরোধ—

"শাঁখ শেত্তল, গাজ নেত্তল্।
বাপ রাজা, ভাই বাদ্সা।"

শর গাছকে আহ্বান করিয়া কন্যা বলিতেছেন—

"শর, শর, শব।
আমার ভাই গাঁয়ের বর। (৩)
বর বর ডাক পাড়ে।
গুবা গাছে গুয়া ফলে।
আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে।
অন্যের ভাই কুড়িয়ে খাব।"

বেনা গাছকেও প্রায় ঐ ধরণেরই কথা বলা হইয়াছে।

"বেনা, বেনা, বেনা।
আমার ভাই গাঁয়ের সোনা।
সোনা সোনা ডাক পাড়ে।
গা গুচিগুবা বাড়ে।"

---

(১) এটি কুমারিদের ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের ১লা হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রত্যহ বিকালে মেজের উপর আলিপনা দিয়া শিব-ঠাকুর, দোলা, গুয়াগাছ, অশদ (অশ্বত্থ) গাছ প্রভৃতি, নানারকম আঁকিয়া অঙ্কিত প্রত্যেকটি চিত্র পূজা করিতে হয়। এই সব চিত্র-গুলি পূজা করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রগুলিব মধ্য দিয়া কুমারী-মনের কামনার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পূজার মন্ত্রগুলি সংস্কৃত নয়, বাঙ্গালা ছড়া।

(২) এই ছড়ায় 'হবেছে' শব্দটির হউক অর্থ ধরিতে হইবে। যাহা পাই নাই, অথচ পাইবার ইচ্ছা আছে, তাহা পাই-য়াছি বলিলে মনে অন্ততঃ ক্ষণিক আনন্দও হয়। এইরূপ অতীত সমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা গঠিত অনেক বাক্য ছড়াব মধ্যে দেখা যায়, যাহাদের আকুঞ্চিত অর্থ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক; যথা, 'মোহর এল ছালা হালা তাই তুলতে এত বেলা, ইত্যাদি। এই পংক্তিটির 'এল' শব্দটি আর কিছুই নয়, কুমারীমনেব 'আসুক' শব্দটিরই রূপান্তর।

(৩) বর=শ্রেষ্ঠ

আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে।
অন্তের ভাই কুড়িয়ে খায়।"

একখানি 'ঘি ঝরঝরে' 'আম কাঁঠালের পিঁড়ি', ইহাতে কেবল কন্যার ভ্রাতাই বসিতে পারেন,—

"আম কাঁঠালের পিঁড়িখানি ঘি ঝরঝর করে।
আমার ভাই··(৪) সে বসতে পাবে।"

২। স্বামী সম্বন্ধে কুমারীর প্রথম প্রার্থনা—

"হে হর শঙ্কর দিনকর নাথং।
কখনো না পড়ি মূর্খের হাতং।" (৫)

বাঙ্গালী বালিকা শৈশব অতিক্রম করিতে না করিতেই বুঝিতে শিখে যে সংসারে তাহার মূল্য কিছুই নাই। কাহারও না কাহারও গলগ্রহ হইয়া তাহাকে সারাজীবন কাটাইতে হইবে, এবং এই পরাশ্রয়ী জীবনের অধিকাংশই কাটিবে স্বামী নামধেয় একটি অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া। সে অল্প বয়সেই বুঝিতে পারে যে তাহার সুখ শান্তি, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা, তাহার দুঃখ কষ্ট, তাহার বলিতে যাহা কিছু সবই নির্ভর করে সেই স্বামীর উপর। তাই বাঙ্গালার কুমারী শিবপূজা করিয়া ভাল বর কামনা করে। আমাদের সৌভাগ্য পূজারিণী বিশেষ বুদ্ধিমতী। তিনি ভাবী বরের সম্বন্ধে ভাল কি মন্দ কিছু না বলিয়া শুধু বলিলেন যে কোন মূর্খ যেন তাঁহার পাণিগ্রহণ না করে। ইনি বুঝেন যে, যে ব্যক্তি মূর্খ নয়, সে অবশ্যই ভাল হইবে। স্বামী সম্বন্ধে কুমারীর আকাঙ্ক্ষা এইখানেই শেষ হয় নাই। চতুর্থ বিভাগে দেখিব কোন কোন ছড়ায় কন্যা 'রাজার বউ' হইবার অভিলাষ করিয়াছেন। একটি ছড়ায় সভা সুন্দর বরের প্রার্থনা আছে—

"ধাতা কাতা বিধাতা তুমি যাও বর।
আমার জন্য খুঁজে রাখ সভা-সুন্দর বর।"

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ক ছড়ার মধ্যেও স্বামী সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায়। স্থানে স্থানে সেগুলির আলোচনা করা যাইবে।

৩। সপত্নী বিদ্বেষের কয়েকটী নিদর্শন।

"অশ্বত্থ তলায় বাস করি।
সতীন কেটে নির্ম্মূল করি।"

এই ছড়াটির অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলেও যদি বাস করিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি কন্যা সপত্নীর মূলোচ্ছেদ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না। আর একটী ছড়া,—

"সাত সতীনের সাত কৌটা।
তার মাঝে আমার এক অব ভরের (অভ্রের) কৌটা।
অব ভরের কৌটা নাড়ি চাড়ি।
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি।"

অভ্রের কৌটা নাড়িতে নাড়িতে সাত সতীনের স্বর্গবাস কামনা করিয়া কুমারী ফুলগাছকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

"ফুল গাছটি বাঁকড়ি।
সতীন বেটি মাকড়ী।" (৬)

অনন্তর পাখীকে ডাকিয়া কন্যা মনের গোপন অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন,—

"পাখী, পাখী, পাখী।
সতীনকে গঙ্গায় নিয়ে যায়
আমি ঘাটে (৭) বসে দেখি।

সতীনের গঙ্গাযাত্রা ঘাটে বা বারান্দায় বসিয়া দেখার মধ্যে আনন্দ থাকিতে পারে কিন্তু অসপত্ন জীবনের যে অনাবিল শান্তি সপত্নীর মৃত্যুতে ত আর তাহার অপেক্ষা অধিক আনন্দ হইতে পারে না। তাই ময়নাকে ডাকিয়া কন্যা বলিলেন,—

"ময়না, ময়না, ময়না।
সতীন যেন হয় না।"

কিন্তু মনে মনে তিনি ভাল রকমই জানেন যে, সপত্নী হওয়া সম্বন্ধে তাঁহারই মত ময়না বেচারারও কোন হাত নাই। ছুয়ে ছুয়ে চার হওয়া সম্বন্ধে যেমন মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না সে যুগে পুরুষ মানুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সম্বন্ধেও সেইরূপ কোন সন্দেহ উঠিতে পারিত না। সুতরাং স্বামীর অন্যান্য

(৪) এখানে কুমারীরা আপন আপন ভ্রাতার নাম বলে।

(৫) এরূপ সংস্কৃত দেখিয়া বিস্মিত হইলে চলিবে না। "রহ ধৈর্য্যং···" প্রভৃতি বহুপ্রচলিত কীর্ত্তনের পদ স্মরণ করুন।

(৬) মাকড়ী মাকড় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। মাকড় > মকড > মকট > মর্কট—বানর। মেদিনীপুর জেলার এই ছড়াটির আরও দুইটি চরণ আছে। যথা, "ছাঁচতলে গুল। টুক্ ক'রে মল।"

(৭) অন্যত্র 'বারান্দায় বসে দেখি।'

পত্নীগুলির মস্তকের দুই একজন খাদক সংগ্রহ করিয়া রাখা পূর্ব্বাহ্নেই প্রয়োজন। অতএব হাতাকে ডাকিয়া বলা হইল,—

"হাতা, হাতা, হাতা।
খা সতীনের মাথা।"

উৎবেরালীকেও ঐ প্রকার অনুরোধ করা হইল কিন্তু তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল যেন সতীনকে খাইতে গিয়া স্বামীর কিছু অনিষ্ট না করিয়া বসে,—

"উৎবেরালি উৎ খা।
স্বামী বেখে সতীন খা।" *

এই অনুরোধ উপরোধগুলি সমাপন করিয়াও যখন বিপদের আশঙ্কা কমিল না তখন স্বয়ং সপত্নীর মৃত্যু ও বন্ধ্যাত্ব কামনা করিয়া কুমারী বলিলেন,—

"তাল গাছেতে বাবুই বাসা।
সতীন মরে দেখতে খাসা।।" (৮)
"খুত্‌কুড়ি, খুত্‌কুড়ি।
সতীনবেটি আঁটকুড়ি।" (৮)

৪। বিবিধ বিষয়ের ছড়া। এই বিভাগে প্রথম ধরা গেল রান্নাঘর পুজার ছড়াটি।

"রান্নাঘর পুজ্যন।
সোনার থালে ভোজ্যন।
সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু।
শাঁখের আগে সুবর্ণের খাড়ু।।"

সরলা বালিকা রান্নাঘরকে 'পুজ্যন' করিয়াই সোনার থালে 'ভোজ্যন' করিবার আশা মনে পোষণ করিয়া রাখে। শুধু রান্নাঘর নয়, গোয়াল ঘরকে 'পুজ্যন' করিয়াও ঐরূপ বর প্রার্থনা করিয়া থাকে। সোনার থালে ভোজন করাকেই তাহারা সৌভাগ্যের চূড়ান্ত বলিয়া মনে করিত। ক্ষীরের নাড়ুই ছিল তাহাদের রসনাতৃপ্তিকর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আহার্য্য। আর শঙ্খ বলয়ের সম্মুখে একখানি সুবর্ণের খাড়ু—অলঙ্কার সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত আর কিছু প্রার্থনা করা বোধকরি তাহারা অনাবশ্যক মনে করিত। আরও দুই এক স্থানে গহনার কথা শুনি বটে, কিন্তু অলঙ্কারের আড়ম্বর কোথাও নাই। কেবল দেখি, কুমারী পিটুলীর গহনা দিয়া দেবতার কাছে সোনার গহনা প্রার্থনা করিতেছেন,—

"আমি দিই পিটুলির গয়না।
আমার হোক সুবর্ণের গয়না।।"

আর এক স্থানে,—

"আমি দিই পিটুলির শাঁখা।
আমার হোক্ সুবর্ণের শাঁখা।।"

পানের বাটা বাঙ্গালীর বাড়ীর একটি নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাব, এখনও আছে—তখনও ছিল। কাজেই পিটুলির বাটা দিয়া দেবতাকে প্রার্থনা করা হইল,—

"আমি দিই পিটুলির বাটা।
আমার হোক্ সোনার বাটা।"

ইহা ছাড়া ধান আছে, ঢেঁকি আছে, গাই আছে, চন্দনের বাটি আছে, পাটের কাপড় আছে, খাট পালঙ্ক আছে, ঘরসংসার করিতে গেলে এমনি 'নটর খটর' 'সাত সতের' রকম জিনিষ ত চাই-ই। সুতরাং সেগুলিও দেবতার কাছে চাহিয়া রাখা ভাল। সেঁজুতির ব্রতে সে রকম অনেক বস্তুর খবর পাই। যথা,—

"শতেক ঢেঁকি পড়ন্ত।
শতেক গাই বিয়ন্ত।
শতেক উনুন জ্বলন্ত।।
কালো ধানে রাঙা পুতে।
জন্ম যায় যেন এয়োস্ত্রীতে।।" *

আলোচ্য ছড়াগুলির বেশীর ভাগেই দেখি, এয়োস্ত্রী থাকিবার প্রার্থনা। বৈধব্যটাই যে তাহাদের জীবনের পরমতম দুঃখ, ইহা ঐ ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালিকাগণ শৈশব হইতেই উপলব্ধি করিয়াছে, তাই তাহারা যখনই ভগবানের কাছে কিছু চাহিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছে, 'ঠাকুর হাতের নোয়া আর সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় হোক্।' যেমন—

"আতা পাতা, কুল দেবতা।
সিঁথির সিঁদুর পায়ে আলতা।"
"পাড়াপড়সী প্রতিবেশী মোঁ বর্ধে সুখে।
জন্ম এয়োস্ত্রী, পুত্রবতী, জন্ম যায় সুখে।।"

---

* "উৎ বেরালি খুদ খাব। সোয়ামি বেখে সতীন খাব।।"

(৮) 'তালগাছেতে বাবুই বাসা' এবং 'খুতকুড়ি খুতকুড়ি' এই দুইটি চরণ ছন্দ রক্ষার জন্য।

* কোথাও কোথাও কেবল ঢেঁকি পড়ন্ত, গাই বিয়ন্ত এইরূপ আছে, শতেক শব্দের যোগ।

সে যুগের বাঙ্গালীর সম্পত্তি ছিল ধান, আর 'আয়রণ চেষ্ট' ছিল মরাই ও গোলা। সেঁজুতির পুজারিণী তাই পিটুলির গোলা আঁকিয়া বলিলেন,

"আমি দিই পিটুলির গোলা।
আমার হোক সত্যিকারের গোলা॥"

রূপের প্রার্থনা এখানে সেখানে দেখা যায় বটে, কিন্তু সংস্কৃত যুগের 'তিলফুল জিনি নাসা' এবং 'পক্কবিম্ব তুল্য অধরোষ্ঠের' কামনা কুমারীদের মনে স্থান পায় নাই। তাহারা 'স্বামী-সোহাগিনী' হইবার জন্য বড়জোর 'ঘট্টা ডুমুরের মত কাঁকাল-খানি চাহিয়াছে'। যথা,—

"ঘট্টা ডুমুরের মত কাঁকালখানি।
আমি যেন হই স্বামী সোহাগিনী॥" (১)

একটি ছড়ায় সেঁজুতির পুজারিণী জন্মসুখী হইবার জন্য শুয়া পাখীর কাছে অনুরোধ জানাইতেছেন,—

"শুয়া পাখী, শুয়া পাখী।
আমি যেন হই জন্ম সুখী॥"

আর একটি ছড়ায় হিন্দু কন্যার এক অদ্ভুত প্রার্থনা শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয়। পরে যখন ভাবিয়া দেখি যে এ ছড়াগুলি দুই দিনেই সারা বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত হয় নাই, একাধিক শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী রমণীর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের সাহায্য লাভে ইহারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, যখন ভাবিয়া দেখি যে মুসলমান রাজত্ব কালেই এই ব্রতগুলির কোন কোনটির উৎপত্তি হওয়া খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক তখন আর সে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না। যে ছড়াটীর কথা বলিতে-ছিলাম সেটি এই,—

"আর্শী, আর্শী আর্শী।
আমার স্বামী পড়ুক ফার্সী।

একটি মন্ত্রে মহাদেবের নিকট এই বর প্রার্থনা করা হইয়াছে যে স্বামী যেন রাজ্যেশ্বর হন এবং সতীন যেন দাসী হয়। নিজের রাণী হইবার ইচ্ছা আছে কিনা তাহা ছড়ায় বলা হয় নাই। ঐ ছড়ায় বৎসরান্তে একবার করিয়া বাপের বাড়ী আসিবার ইচ্ছাও জানান হইয়াছে। বৎসরে মাত্র একবার করিয়া বাপের বাড়ী আসিতে পারিলেই কন্যা সন্তুষ্ট হইবেন, কারণ বোধ হয় এই যে ঘন ঘন আসিলে তাঁহার অনুপস্থিতিতে সপত্নীগণ শ্বশুর ঘরে জাঁকাইয়া বসিতে পারেন। ছড়াটি এই,—

"হে হর, মাগি বর।
স্বামী হোক্ রাজ্যেশ্বর॥
সতীন হোক দাসী।
বছর অন্তর একবার করে
বাপের বাড়ী আসি॥"

বাপের বাড়ী ও শ্বশুর বাড়ী যাতায়াত করিবার জন্য যান বাহনেরও ত প্রয়োজন আছে। সে বিষয়েও প্রার্থনা আছে। কুমারী চাহিয়াছেন যে বাপের বাড়ীর দোলাটিই যেন তাঁহাকে লইয়া আসা যাওয়া করে। অবশ্য তাঁহাকে বহন করিবার মূল্য স্বরূপ দোলার জন্যও ঘৃত এবং মধুর ব্যবস্থা করা হইবে। ঐ ছড়ায় 'সোনার দর্পণে মুখ' দেখিবার ইচ্ছাও প্রকাশ পাইয়াছে।

"দোলায় আসি দোলায় যাই।
সোনার দর্পণে মুখ চাই॥
বাপের বাড়ীর দোলাখানি শ্বশুর বাড়ী যায়।
আসতে যেতে দোলাখানি ঘৃতমধু খায়॥"

সোনার দর্পণ সম্বন্ধে আর একটি ছড়া,—

"দর্পনাশী দর্পণে চায়।
সোনার দর্পণে মুখ চায়॥"

সেঁজুতি পুজারিণীর মনে অপরের সর্ব্বনাশ করিবার ইচ্ছাও কিছু কিছু আছে। এই দর্প যে রূপ সম্বন্ধে তাহা বেশ

(১) ঘট্টা ডুমুরটি যে কি বস্তু তাহা প্রথমে জানিতে পারি নাই। দুই একজন গ্রাম্য বৃদ্ধার নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া-ছিলাম, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই। পরে একদিন এক পল্লীতে গ্রাম্যবালিকাগণের সেঁজুতি পুজা দেখিতে দেখিতে ঐ শব্দের অর্থ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গেল। পিটুলির দ্বারা অঙ্কিত যে চিত্রটি তাহারা ঐ মন্ত্র বলিয়া পুজা করে সেটি অনেকটা ডমরুর অনুরূপ। অর্থের দিক দিয়াও ইহা বেশ খাটে, কারণ ডমরুর মধ্যদেশ সরু। কটিদেশ ডমরুর মধ্যদেশের মত ক্ষীণ হউক এরূপ প্রার্থনা স্ত্রীলোকের পক্ষে খুবই সম্ভব। ডুমুর ডমরু হইলেও ঘট্টা শব্দটির মূল অর্থ অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। কোন কোন প্রদেশে 'ঘট্টা ডুমুরের' স্থানে 'ঘোর ডুমুরের' বলা হয়। ঘোর ডুমুর এক প্রকার ডুমুরের নাম। তাহার সহিত কোমরের যে কি সাদৃশ্য থাকিতে পারে তাহা বুঝা গেল না।

অনুমান করা যায়, যেহেতু দর্পণ প্রসঙ্গেই ইহার কথা উঠিয়াছে।

রাজার বৌ, রাজার ঝি ইত্যাদি হইবার জন্য একটি মন্ত্রে কুমারী কৌড়ার (১০) মাথায় ঘি, মৌ প্রভৃতি ঢালিয়াছেন,—

"কৌড়ায় মাথায় ঢালি মৌ। আমি যেন হই রাজার বৌ॥
কৌড়ার মাথায় ঢালি ঘি। আমি যেন হই রাজার ঝি॥
কৌড়ায় মাথায় ঢালি মধু। আমি যেন হই রাজার বধু॥"

কোন কোন প্রদেশে 'কৌড়ার মাথায় ফুল' দিয়া 'সৃষ্টি সংসার হুলথুল' করিবার প্রার্থনা আছে, যথা,—

"কৌড়ার মাথায় দিয়ে ফুল।
সৃষ্টি সংসার হুলথুল॥"

আর একটি ছড়ায় রাজার বৌ, ঝি ইত্যাদি হইবার প্রার্থনা আছে,—

খৌ খৌ খৌ। খৌয়ে দিলাম মৌ॥
আমি যেন হই রাজার বৌ॥
খৌ খৌ খৌ। খৌয়ে দিলাম ঘি।
আমি যেন হই রাজার ঝি॥
খৌ খৌ খৌ। খৌয়ে দিলাম আক।
আমি যেন হই রাজার নাগ॥"

আর কতকগুলি ছড়া আছে ভাবী স্বামীর জন্য প্রার্থনাই সেগুলির বিষয়বস্তু। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। যেমন,—

"আমসত্ত পাকা পান।
আমার সোয়ামী নারায়ণ॥"

একটি ছড়ায় শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী দেবর ইত্যাদি পাইবার কামনা আছে। এই ছড়ায় কুমারীদের শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, দেবর প্রভৃতির কিরূপ আদর্শ তাহাও জানা যায়।

"রামের মত পতি পাব।
সীতার মত সতী হব॥
লক্ষণের মত দেবর পাব।
দশরথের মত শ্বশুর পাব॥
কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব।
দুর্গার মত ঘরণী হব॥ (১১)
লক্ষীর মত রাঁধুনী হব। (১২)
কার্ত্তিক গণেশ বেটা হবে॥
লক্ষ্মী সরস্বতী ঝি হবে,
ষষ্ঠীর মত যেঁওজ হব।"

পুত্র ও সুখের কামনা,—

"হাতে পো কাঁখে পো।
পৃথিবীতে পড়েনি যেমন চক্ষের লো॥" (১৩)

সপত্নীর মোহে স্বামী হয়ত ভুলিয়া যাইতে পারেন এইজন্য আমসত্ত্বের মত পুরু ও লাল 'পাকা পান' তাহাকে অনুরোধ করিয়া রাখা হইয়াছে যে কন্যার জীবনে সেই দারুণ দুঃসময় যদি কোন দিন আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পাকা পানটি যেন তাঁহার কথা তাঁহার স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

"আমসত্ত পাকা পান।
আমার সোয়ামী নারাণ॥
যদি জান পাসুরে।
তবে দিও সুমুরে॥"

এই ছড়াগুলির মধ্যে কোথাও 'মেঘডুম্বুর' বা 'অগ্নিপাটের' শাড়ীর নাম পাই নাই। তবে রাত্রিবাসের জন্য 'পাট-কাপড়ের' প্রার্থনা একটি পংক্তিতে দেখিয়াছি।

এই পূজার শেষ মন্ত্রটির দ্বারা 'কুঁচ কুঁচুতি'র (১৪) পূজা হয়। ইহাতে ঐ দেবী পূজারিণীর পিতামহী বা মাতামহীরূপে

(১০) একজাতির পক্ষী।

(১১) কোন কোন স্থানে 'দুর্গার মত সোহাগী হব।'

(১২) কোথাও কোথাও 'দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব।'

কোথাও কোথাও আবার ষষ্ঠ বা সপ্তম পংক্তির স্থানে 'পৃথিবীর মত ভার সইব' এই পংক্তিটিও দেখা যায়। এই ছড়াটি বলিয়া কুমারীরা 'দশ পুতুল' নামক আর একটি পৃথক পূজা করিয়া থাকে। তফাত এই যে, প্রত্যেকটি পংক্তির আগে 'মরিয়া মনুষ্য হব' এই বাক্যটুকু যুক্ত থাকে।

(১৩) এই ছড়াটি মেদিনীপুর জেলার তমলুক অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। ঐ জেলার পশ্চিম দিকের কিয়দংশ ব্যতীত অন্য সর্ব্বত্রই 'না' স্থানে 'নি' ব্যবহৃত হয়। যথা,—কলিকাতার 'সে রাত্রে ভাত খায় না' মেদিনীপুরে 'সে রাত্রে ভাত খায়নি'।

(১৪) শ্রীমতী কুঁচ কুঁচুতিটি যে কোন দেবী তাহা এখনও আবিষ্কার করিতে পারি নাই। ইঁহার নামে যে আলিপনা দেওয়া হয় তাহা হইতেও এ বিষয়ে কিছু সাহায্য পাইলাম না। সম্ভবতঃ কুঁচ ফলের গাছই এই মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা। ছড়ার প্রথম চরণে 'বন' শব্দটি থাকায় ঐ ধারণাই বলবতী হয়।

কল্পিত হন। মন্ত্রটি আর কিছুই নহে, দিদিমা ও নাতিনীর(১৫) প্রশ্নোত্তর মাত্র। দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নাতিনী, এত বেলা হইল কেন?' নাতিনী উত্তর করিলেন, 'ছালা ছালা মোহর, টাকা, ধান ইত্যাদি আসিল, সে সব মাপিয়া ও তুলিয়া রাখিতে বেলা হইয়া গেল।' কুমারী এতক্ষণ ধরিয়া যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন তাহার অনেক কিছুই যেন পাইয়া গিয়াছেন—ইহাই বোধ হয় এই ছড়াটির ভাবার্থ। পাউন বা না পাউন পাইয়াছি বলার আনন্দেই পূজার শেষে পূজারিণীর মন পূর্ণ হইয়া যায়। মন্ত্রটি এই,—

কুঁচ কুঁচুতি কুঁচুই বন। কেন রে নাতি এতক্ষণ॥
মোহর এল ছালা ছালা। তাই তুলতে এত বেলা॥
টাকা এল ছালা ছালা। তাই মাপতে এত বেলা॥
ধান এল ছালা ছালা। তাই মাপতে এত বেলা॥
চাল এল ছালা ছালা। তাই মাপতে এত বেলা॥
ডাল এল ছালা ছালা। তাই মাপতে এত বেলা॥"

তুঁষতুষালি

অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতেই সেঁজুতির ব্রত শেষ হয়। তুঁষতুষালি পূজা আরম্ভ হয় ঐ দিন হইতে। এ পূজাও পৌষের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত চলে। পূজার নিয়ম ও অনুষ্ঠান আদি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিব না। এখানে কেবল মন্ত্রগুলি তুলিয়া দেখিব কুমারীগণ সে যুগে দেবতার নিকট বা দেবতা জ্ঞানে গাছ-পালা, হাতা-খুন্তি ইত্যাদিকে পূজা করিয়া তাহাদের নিকট কি কি প্রার্থনা জানাইতেন। সেঁজুতির ন্যায় এ ব্রতেও পিতা মাতা ও স্বামীর সুখের জন্য নিবেদন আছে, 'দরবার শোভা বেটার' কথাও ইহার মধ্যে আছে, উপরন্তু 'রূপকৌটা ঝি' এবং 'সভা আলো জামাই' এর উল্লেখও পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও 'রূপকৌটা ঝি'য়ের জায়গায় 'হাঁড়িশাল-আলো ঝি' য়ের প্রার্থনাও আছে। এই ব্রতে ভক্তির আধিক্য কিছু বেশী বলিয়াই মনে হয়, কারণ তুঁষতুষালি পূজার ফল হাতে হাতেই ফলিতে আরম্ভ হয়। পূজা শেষ হইলেই 'ছব্‌ড়ি ছটা' (ছ'বুড়ি ছ'টা) ক্ষীরের নাড়ু খাইতে পাওয়া যায়। মন্ত্রটি নিম্নে দেওয়া গেল,—

"তুঁষ তুষালি কাঁধে ছাতি। বাপ মার ধন যাচাযাচি॥
স্বামীর ধন নিজ পতি॥
ধন করব নগরে। মরব গিয়ে সাগরে॥
জন্মাব উত্তম কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে॥
(তুষলি গো মাই। তুষলি গো মাই॥
তোমার পূজিবা আমি কি বর পাই॥
অমরগুরু বাপ চাই। ধনসাগরে মা চাই॥
রাজ্যেশ্বর স্বামী চাই॥
সভা-আলো জামাই চাই।
সভাপণ্ডিত ভাই চাই॥
দরবার শোভা বেটা চাই।
রূপকৌটা ঝি চাই॥
সিঁতের সিঁদুর দপ্ দপ্ করে।
হাতের নোয়া ঝক্ ঝক্ করে॥
আলনার কাপড় ঝলমল্ করে॥
ঘটিবাটি ঝলমল্ করে॥
সিঁতের সিঁদুর মরাইয়ের ধান।
সেই যুবতী এই বর চান॥)
তুষলি গো মাই। তুষলি গো মাই॥
তোমার পুজিবে আমি ছোব্‌ড়ি ছটা খাই॥
ছোব্‌ড়ি ছটা ক্ষীরের নাড়ু।
শাঁখের আগে সুবর্ণের খাড়ু॥"

উপরের ছড়াটির বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশের স্থানে কোন কোন প্রদেশে নিম্নলিখিত চরণগুলি শোনা যায়।

"...লাউয়ের পাতাটি চালা চালা।
মায়ের কাণে সোনার তালা॥
(অথবা, মায়ের কোলে সোণার থালা।)
আড়াই মাপা সিঁদুর পাব।
দেব-আলো স্বামী পাব॥
দরবার আলো বেটা পাব।
সভা আলো জামাই পাব॥
হাঁড়িশাল-আলো ঝি পাব।
মেজা আলো ঝি পাব॥
(অথবা ঘর আলো ঝি পাব।)
হাঁড়িশাল আলো বৌ পাব॥..."

(১৫) মন্ত্রে 'নাতিনী' নাই 'নাতি' আছে কিন্তু আমরা ঐ নাতিকে 'নাতিনী'ই ধরিয়াছি, কারণ এ পূজাটি বালিকাদেরই পূজা।

লিখন পঠন, নৃত্যগীত, সূচীশিল্প বা অন্যান্য কারুকার্য্যে বিদুষী 'ঝি' 'বৌ' এর প্রার্থনা কোথাও দেখা যায় না। রন্ধন কর্ম্মে নিপুণতাই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া মনে করা হইত। 'হাঁড়িশাল-আলো' 'বৌ' 'ঝি'র প্রার্থনা হইতে তাহাই বুঝা যায়।

যমপুকুর

এই ব্রতের মন্ত্রে 'বাপ ভাই লক্ষেশ্বর' হওয়া এবং 'ধনে পুত্রে ঘর' বাড়া এই দুইটি আকাঙ্ক্ষাই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 'রূপার কৌটা' এবং 'সোনার খিলের' কথা আছে বটে কিন্তু কিসের সহিত যে তাহাদের সম্বন্ধ তাহা ঠিক বুঝা গেল না। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে ব্রতের ছড়াগুলির সহিত আমাদের দেশে প্রচলিত ছেলে ভুলান ছড়াগুলির আকৃতি ও রচনাগত অনেক মিল আছে। ছেলে ভুলান ছড়ার মত আলোচ্য ছড়ার অনেকগুলির মধ্যে দেখা যায় যে কোন কোন চরণের সহিত অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী চরণটির অর্থগত কোন সামঞ্জস্যই নাই। পরে এই দুই প্রকার ছড়ার তুলনা মূলক আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল, এখন এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলা হয়ত অবান্তর হইবে। যমপুকুরের মন্ত্রটি এই—

"...যারণ পক্ষী হুকার বিল।
রূপার কৌটা সোনার খিল॥
খিল খুলতে লাগল ছড়।
আমার বাপ ভাই হোক্ রাজ্যেশ্বর।
লক্ষ লক্ষ দিলে বর।
ধনে পুত্রে বাড়ুক ঘর।"

এই ব্রতের একটি ব্রতকথাও আছে। উহা হইতে বুঝা যায় যে এই ব্রত করিলে ইহলোকে পরম সুখ এবং অন্তিমে নরক যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেশের মেয়েরা বহুদিন পুর্ব্বেই বাল্য বয়স হইতে অন্তিমের ভাবনা ভাবিতে শিখিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কুমারীদের তুলসী পূজার মন্ত্রটি তুলিয়া দিতেছি। তাহাতেও অন্তিমের ভাবনার প্রমাণ আছে। যথা—

"...তোমার শিরে ঢালি জল।
অন্তিম কালে দিও স্থান॥"

পূজার শেষ দিনে তুঁষতুষালিকে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। ভাসানের একটি পৃথক মন্ত্র আছে। ঐ মন্ত্রটির দ্বারা তুঁষতুষালিকে ভাসাইয়া কন্যা প্রবাসী আত্মীয়বর্গের নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগমণ প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহারা অবশ্য শুধু হাতে ফিরিবেন না, ধন দৌলতও সঙ্গে থাকিবে।

তুষলি গেল ভেসে।
আমার বাপ ভাই এল হেসে॥
আমার শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী পুত্র এল হেসে॥
তুষলি গেল ভেসে।
ধন দৌলত টাকা কড়ি এল হেসে॥"

পোষোরি

ধান, গোরু, টাকা, মোহর ইত্যাদির কথা অনেক ব্রতেই আছে কিন্তু কাবাস (কার্পাস) তুলার কথা পোষোরির ছড়া ব্যতীত আর কোথাও পাই নাই। পোষোরির ব্রত করিয়া কন্যা 'ধান কাবাসে' ঘর করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছে,—

"পোষমাসে পোষোরি।
ধান কাবাসে ঘর করি॥
এস পোষ যেও না।
জন্মে জন্মে ছেড়ো না॥"

পুণ্যি পুকুর

ইহার মন্ত্রটি প্রশ্নোত্তরের আকারে। প্রশ্ন হইল "দুপুর বেলা কে পূজা করে?" উত্তর হইল,—

"আমি সতী লীলাবতী।
সাত ভাইয়ের বোন্ ভাগ্যবতী॥

আবার প্রশ্ন হইল,—"এ পূজলে কি হয়?" এ প্রশ্নের উত্তরটি একটু বড়। কারণ, এ পূজা করিয়া কুমারী যাহা যাহা কামনা করেন, পূজার ফল শুনাইতে গিয়া তাঁহার মুখ দিয়া সেইগুলি সবই বাহির হইয়াছে। উত্তরটি এই—

"নির্দ্ধনীর ধন হয়।
সাবিত্রী সমান হয়॥
স্বামী-আদরিণী হয়॥
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে।
মরণ হয় তার এক গলা গঙ্গাজলে॥"

ইহাতেও দেখা যায় ধনাগম, ভ্রাতৃলাভ, পাতিব্রত্য প্রভৃতির সহিত একগলা গঙ্গাজলে মরণ কামনাও আছে।

হরির চরণ

যে যুবতী এই ব্রত গ্রহণ করেন তিনি চান রাজ্যেশ্বর স্বামী, দরবার জোড়া বেটা, সভাসুন্দর জামাই, সর্ব্বসুন্দরী কন্যা, তাহা ছাড়া, ধান, গোরু, কাপড়, বাসন এ সবও আছে। তিনি যেন জীবনে কোন শোক না পান এবং স্বামী পুত্রের ও বন্ধুবান্ধবের মৃত্যু যেন তাঁহাকে না দেখিতে হয় এ প্রার্থনাও আছে। বন্ধুবান্ধবের পর্য্যন্ত শুভ কামনা কুমারীমনের কোমলতারই পরিচয় দেয়। এই মন্ত্রটিও প্রশ্নোত্তরের আকারে।

"আজ কেন গো শীতল পা॥
কোন্ যুবতী পুজে পা॥
সে যুবতী কি চায়।"

উত্তর

"রাজ্যেশ্বর স্বামী চায়।
দরবার জোড়া বেটা চায়॥
সভাসুন্দর জামাই চায়।
ঘরনী গৃহিনী বৌ, চায়॥
সর্ব্বসুন্দরী ঝি চায়॥
আল্‌নায় কাপড় দল্‌মল্ করে॥
ঘরের বাসন ঝল্‌মল্ করে॥
গোয়ালে গরু মরায়ে ধান।
বছর বছর পুত্র পান॥
না দেখেন স্বামী পুত্রের মরণ।
না দেখেন বন্ধু বান্ধবের মরণ।
এক হাঁটু গঙ্গার জলে ম'রে।
পায় যেন হরির চরণ।"

এ ব্রতেও অন্তিমের ভাবনা আছে।

আশুদ (অশ্বত্থ) পাতা

ইহার মন্ত্রও প্রশ্নোত্তরের আকারে। হর বলেন গৌরীরে "এ ব্রত ক'রলে কি হয়?" তখন ভগবতী উত্তর দিলেন,—

"পাকা পাতাটি মাথায় দিলে পাকা চুলে সিঁদুর পরে।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে কাঞ্চন মূর্ত্তি হয়।
শুক্‌না পাতাটি মাথায় দিলে সুখ ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়।
ছেঁড়া পাতাটি মাথায় দিলে হীরা মুক্তার ঝুরি পায়।
কচি পাতাটি মাথায় দিলে কমল পুত্র হয়।
উজাইতে পারে ইন্দ্রের শচী হয়,
না পারে ভগবানের দাসী হয়।"

ইহাতে অবৈধব্য, রূপ, সুখ, ঐশ্বর্য্য, সুশ্রী সন্তান এ সকলের আকাঙ্ক্ষা ত' আছেই, বেশীর ভাগ দেখি এ ব্রতের ফলে 'হীরা মুক্তার ঝুরি' পাওয়া যায় এবং তদুপরি ইন্দ্রের শচী হইবারও সম্ভাবনা আছে। ইন্দ্রের শচী যদি নিতান্তই না হওয়া যায় তাহা হইলেও আশঙ্কার কোন কারণ নাই, যেহেতু সে স্থলে 'ভগবানের দাসী' হওয়া সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত।

পৃথিবী পূজা

এ ব্রতের মধ্যে 'রাজার রাণী' হইবার প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন প্রার্থনা নাই।

"...খাওয়াব ক্ষীর মাখাব ননী।
আমি যেন হই রাজার রাণী॥"

গোকাল

এই ব্রতে আছে কেবল স্বর্গবাসের প্রার্থনা। যথা—

"...গোরুর মুখে দিয়ে ঘাস।
আমার যেন হয় স্বর্গে বাস॥"

জয়মঙ্গল বা মঙ্গলচণ্ডী

এ ব্রতে সেঁজুতি প্রভৃতি ব্রতের ন্যায় কোন বিশেষ মন্ত্র নাই। তবে ইহার ব্রতকথা হইতে ব্রতের ফল জানা যায়। পূজার ফল নিয়ে দেওয়া হইল,—

"হারালে পাওয়া যায়। ম'লে জিয়ান যায়। খাঁড়ায় কাটে না। আগুনে পুড়ে না। জলে ডুবে না। সতীন মেরে ঘর হয়। রাজা মেরে রাজ্য পায়।"

জষ্টি চাঁপা

এ ব্রতের উদ্দেশ্য—সুখ, শান্তি, স্বতন্ত্র শয্যা, নি-সতা ঘর, এবং শঙ্করের ন্যায় অক্ষয় ও অমর স্বামী লাভ। মন্ত্র,—

চাঁপা চন্দনে পূজলাম হরি।
শোক দুঃখ না পান নারী॥
স্বতন্ত্র শয্যে নি-সতা ঘর।
শঙ্কর স্বামী অক্ষয় অমর॥
এই কথা বোলো শ্রীমধুসূদনের পায়।
—(১৬) ব্রত করে শিব মাথায় নিয়ে যায়॥"

---

(১৬) ব্রতী রমনী এই স্থানে নিজের নাম উল্লেখ করেন।

প্রবীণাগণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যেক ব্রতের আরও দুই চারিটি করিয়া ফল জানা যায়। "জষ্ঠি চাঁপার" সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধা 'ঠাকুমা' বলিলেন, "এই ব্রত করিলে স্ত্রীলোকের এয়োস্ত্রীতে মৃত্যু হয়। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়।"

ফল গছান

এ ব্রতের ফল পুত্রলাভ। ইহার কোন মন্ত্র নাই।

নিত্যি সিঁদুর

এই ব্রত করিলে পাকা মাথায় সিঁদুর পরিবার সৌভাগ্য হয়। হাতের 'নোয়াখাড়ু' অক্ষয় হয়। এবং স্বামী পুত্রের সম্মুখে একগলা গঙ্গাজলে মৃত্যু হয়।

অক্ষয় সিঁদুর

ইহার ফলও ঐরূপ।

অক্ষয় ঘট

এ ব্রতের ফলে পুকুরের জল শুকায় না, মরাই ভরা ধান থাকে, গোলা ভরা চাল থাকে, গোয়াল ভরা গরু থাকে, জীবনে শোক দুঃখ পায় না এবং অন্তে স্বর্গবাস হয়।

মধু সংক্রান্তি

যে রমণী এ ব্রত করেন তাঁহার মুখে মধু ঝরে।

ছাতু সংক্রান্তি

এ ব্রত যিনি করেন ভরা মরায়ে, ভরা গোলায় সুখে শান্তিতে তাঁহার দিন কাটে।

দর্পণ সংক্রান্তি

ইহার ফল অবৈধব্য।

আদা-হলুদ ব্রত

ইহারও ফল অবৈধব্য।

তেজ দর্পণ

যে রমণী এই ব্রত করেন তিনি স্বামী পুত্র লইয়া তেজের সহিত ঘরকর্না করেন।

রূপ হলুদ

এই ব্রতের ফল কাঞ্চন বর্ণ লাভ।

আদর সিংহাসন

এ ব্রত করিলে স্বামীর আদর পাওয়া যায়।

যাচা পান

এ ব্রত করিলে যশ ও সম্মান লাভ হয়।

মিষ্টি পূর্ণিমা

যিনি এই ব্রত করেন তাঁহার কথা মধুর মত মিষ্ট হয়।

পদ্ম পূর্ণিমা

যে রমণী পদ্মপূর্ণিমার ব্রত করেন তাঁহার পদ্মের মত মুখশ্রী হয়।

বৈশাখী পূর্ণিমা এবং ফল পূর্ণিমা

এই দুইটি ব্রতের ফল অক্ষয় ফল লাভ।

কলা ছড়া এবং ষোল কলার ব্রত

ফল—অক্ষয় ফল লাভ।

অক্ষয় কুমারী

যে রমণী অক্ষয় কুমারী ব্রত করেন তিনি কখনও বৈধব্য যন্ত্রনা ভোগ করেন না।

সৌভাগ্য চতুর্থী

এই ব্রত করিলে ভগবতী প্রসন্ন হইয়া ধন, পুত্র, সুখ, সৌভাগ্য, যশ ও মান দান করেন। ইহার ব্রত কথা হইতে এইরূপই বুঝা যায়।

নখছুটের ব্রত

যে রমণী এই ব্রত করেন তাঁহাকে অনেকগুলি প্রার্থনা করিতে হয়। প্রত্যেক প্রার্থনার সহিত এক একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। প্রার্থনাগুলি এই,—

"দুধে আলতার মত রঙ্ হোক্।"
"পানের মত মুখ হোক্।।"
"কলার মত আঙ্গুল হোক্।"
"পাটের মত চুল হোক্।। (১৭)

(১৭) এইরূপ উপমা প্রয়োগ সম্ভবতঃ বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কন্‌ভোকেশন (১৯৩৬)

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহামান্য স্যার জন অ্যাণ্ডারসন, আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

স্যার যদুনাথ সরকার এ, এফ, রহমান সাহেব

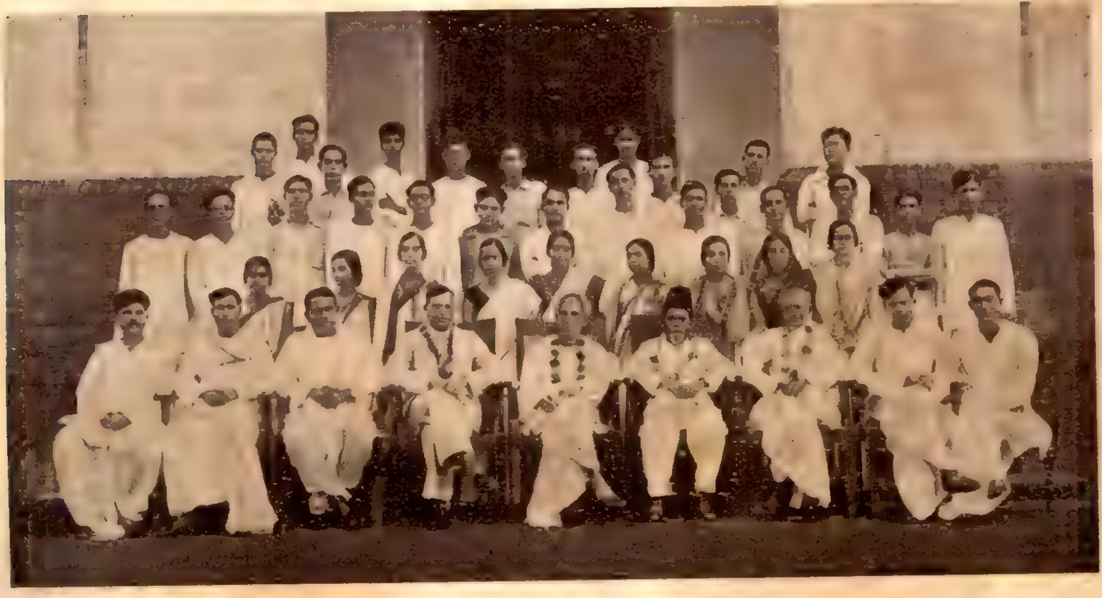

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — বাঙলা বিভাগ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ডক্টার সুশীল দে ডক্টার শহীদুল্লাহ্

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ তিনটি প্রার্থনা সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন হইতে পারে। 'পানের মত মুখ' এই কথাটির দ্বারা নধর, নিটোল, মসৃণ এবং সূক্ষ্মাগ্র চিবুক সমন্বিত একখানি মুখের কথাই বলা হইয়াছে। তৃতীয় পংক্তিতে কলার মত আঙুল চাওয়া হইয়াছে। কলা যেরূপ পুষ্ট ও মসৃণ অঙ্গুলি সেইরূপ মাংসল এবং চিক্কণ হউক ইহাই পূজারিণীর প্রার্থনা। রুগ্ন অঙ্গুলির অস্থিগুলি চামড়ার অন্তরাল হইতেও বুঝা যায় এবং এরূপ অঙ্গুলি সত্য সত্যই রূপের হানি করে। সেই জন্যই সুপুষ্ট অঙ্গুলির প্রার্থনা। কলা যতখানি মোটা আঙুলগুলিও যে ততখানি মোটা চাওয়া হইয়াছে ইহা যেন কেহ না মনে করেন। তৃতীয় প্রার্থনায় পাটের সহিত উপমা দিয়া ঘন ও লম্বা চুলেরই আকাঙ্ক্ষা জানান হইয়াছে।

ষষ্ঠী

নোটন ষষ্ঠী, চাপড়া ষষ্ঠী, দুর্গা ষষ্ঠী, গোঠ ষষ্ঠী, পাটাই ষষ্ঠী, মূলা ষষ্ঠী প্রভৃতি বহু প্রকারের ও বহু নামের ষষ্ঠীব্রত এদেশে প্রচলিত আছে। ইহাদের কোনটির বাঙ্গালা মন্ত্র নাই অন্ততঃ আমি পাই নাই। কোনটিতে ষষ্ঠী দেবীর সংস্কৃত ধ্যান বলিয়াই কাজ চালান হয়, আর কোনটিতে মন্ত্রের কিছু প্রয়োজনই হয় না কেবল অনুষ্ঠানাদির দ্বারাই চলে। নোটন, অরণ্য প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকার ষষ্ঠীর পূজায় 'তের বাট' দেওয়া হয়। তের বাটের বারটি ছড়া আছে সব কয়টিই প্রায় এক সমান। বাট দেওয়ার অর্থ যাহাদের নামে বাট দেওয়া হয় তাহাদের বিপদ, আপদ, দুঃখ, শোক ও অকাল মৃত্যু নিবারণ করা। একটি বাটের মন্ত্র নিয়ে দেওয়া হইল।

"জষ্ঠি মাসে অরণ্য বাট্। ঘুরে ফিরে এল বাট্॥ বার মাসে তের বাট্। বাট্-বাট্-বাট্॥ ঝি-চাকর, গরু-বাছুর, পশু-পক্ষী, কর্ত্তা, ছেলে-মেয়ে, বৌ ঝি, নাতি-নাতনি, বাট্—বাট্—বাট্॥"

ষষ্ঠীপূজা সাধারণতঃ পুত্রবতীর পূজা। সুতরাং এ ব্রতের অনুষ্ঠাত্রীগণ অপেক্ষাকৃত বয়স্কা। 'ঘট্টা ডুমুরের মত কাঁকাল খানি', 'দুধে আলতার মত রং' বা 'পানের মত মুখ' চাহিবার বয়স তাঁহারা অতিক্রম করিয়াছেন। উপরের ছড়াটির মধ্যে তাই বালিকার চাঞ্চল্য দেখা যায় না দেখিতে পাই নারীর গাম্ভীর্য্য। ষষ্ঠীর পূজারিণীর যে চিত্রটি আমাদের কল্পনার পটে ফুটিয়া উঠে সেটি পুত্র কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত একটি স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি। তিনি যে শুধু 'বৌ-ঝি, নাতি-নাতনি', ইত্যাদির অমঙ্গল দূরীকরণের জন্য ব্যস্ত তাহা নহে, 'ঝি-চাকর' এমন কি 'গরু-বাছুর' ও 'পশু-পক্ষী' পর্য্যন্ত তাঁহার করুণা লাভে বঞ্চিত হয় নাই। তাঁহার নিজের কথা একটিবারও উল্লেখ না করিয়া দেবতার কাছে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন। ষষ্ঠী পূজার অনেক ব্রতকথা আছে। ঐগুলি হইতে গৃহস্থের মঙ্গল ব্যতীত আরও কয়েকটি ফলের কথা জানা যায়। সেগুলি এই—পুত্রের দীর্ঘ জীবন লাভ, মৃতবৎসার সুস্থ ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভ, বন্ধ্যার পুত্রপ্রাপ্তি। এতদ্ব্যতীত সাংসারিক উন্নতি, মানসিক শান্তি, সুখ যশ ইত্যাদিও ঐ পূজার ফলে পাওয়া যায়।

ইতু

এই পূজার ফল ধনে, ধান্যে, দৌহিত্রে, পৌত্রে গৃহস্থের শ্রী-বৃদ্ধি।

এতদ্ব্যতীত নানা নামের চণ্ডী ও লক্ষ্মীর ব্রত আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এই সব ব্রতের কোনটির ফল বিপদ হইতে মুক্তি, কোনটির ফল ধন ধান্য লাভ আর কোনটির ফল বা পুত্রকন্যা প্রাপ্তি।

এই প্রবন্ধে বাঙ্গালার ব্রতের একটি দিক্ মাত্র আলোচিত হইল। বারান্তরে ব্রত ও ব্রতকথা সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

স্বর্গের আলো

শ্রীসুশীলকুমার দেব

সুগঞ্জ থেকে মাধবকুণ্ড রেলে দু'ঘণ্টার রাস্তা। তারপরে পয়দল একঘণ্টা হাঁটলেই উঁচু-নীচু টিলার মধ্য দিয়ে রাস্তা গিয়ে শেষ হয়েছে মাধবকুণ্ডের প্রস্রবণের পাহাড়ে। তারও পরে যে পাহাড় সে অতীব জঙ্গলময় এবং মনুষ্য-গমনের অযোগ্য।

মাধবকুণ্ডের টিলায় একজন শঙ্কর সম্প্রদায়ের সাধু থেকে তপস্যা করতেন। কয়েকমাস হলো সেথান থেকে তিনি নিরুদ্দেশ। কিন্তু এখনো রয়েছে তাঁর স্বহস্ত-রোপিত তরু-বীথিকা, অগণ্য ওষধি লতা-গুল্ম, ছোট্ট একখানি একচালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। সেই টিলার মাথা থেকে এক ঝর্ণা ঝর্ ঝর্ করে নিরবধি পড়ছে টিলার পাদমূলে। যে নীচু জায়গায় ঝর্ণার জল পড়ছে সেখানে জলের বাষ্পতে কালো পাহাড়ের গায়েও সাদা রঙের ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে। এই বাষ্প-ধবল প্রস্রবণ-তীর্থে স্নান করতে এসেছে একটি বন্ধু-গোষ্ঠী: অসিত, সিতাংশু, হৃদেশ, চন্দ্র ও অনিল। কেউ তারা ষোলোয় পড়েনি আবার কেউই চোদ্দর নীচেও নয়।

সকাল বেলা। এসেই সকলে প্রথম রান্নার আয়োজন করলে—খিঁচুড়ি ও পেঁয়াজ সিদ্ধ। ঝর্ণার জলে চাল, ডাল পেঁয়াজ ধুয়ে সাধুর কুঁড়ে ঘরে হাঁড়ি চাপিয়ে রান্না বসালে সিতাংশু ও অনিল। ততক্ষণ অসিত এস্রাজের কান টিপে গানের আয়োজন করছে। চন্দ্র ঘরের সামনে সবুজ ঘাসে মোড়া ফাঁকা জায়গাটায় কয়েকখানা ইটের গায়ে কচি লতা-পাতা বিছিয়ে তার পরে সদ্য তোলা পাহাড়ে কুন্দলতা ও কাঠমল্লিকা ফুলে সাজানো রামকৃষ্ণদেবের একখানা ফটো বসিয়েছে। ধূপ-কাঠি সঙ্গে আছে এক ডজন। তারি দু'টো জ্বলছে ফটোর দু'পাশে।

কিশোর বন্ধুরা স্নান করলে শ্বেতবর্ণাভা শীর্ণায়তা কলস্বনা ঝর্ণায় হৈ-চৈ করতে করতে। অসিত চেঁচিয়ে করলে মহিম্নঃ স্তোত্র পাঠ। সবাই মিলে লাফালে ঝাপালে। তারপর কাপড় শুকুতে দিয়ে বন্ধুরা শুধু কৌপীনবন্ত হয়ে পাহাড়-ময় ঘুরে বেড়াতে লাগলে।

সাধুর পরিত্যক্ত শাল-বীথিকার মাঝে ছুটোছুটি করতে করতে একেবারে চেঁচিয়ে উঠছে কেউ—"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" বলতে বলতে।

সায়াহ্নে কিছুক্ষণ অসিতের এস্রাজ বাজানোর পরে উঠল কথা।

অনিল বল্লে, 'আমি ফস করে "মুক্ত" হয়ে যেতে চাইনে। কেন জানিস? কতো সুন্দর সুন্দর জিনিষ অনুভব করবার আছে। সে সব অনুভব করে সবিতর্ক সানন্দ সবিকল্প প্রভৃতি যতো সমাধি আছে, জ্যোতি দর্শনাদি যতরকম অন্তর্বিভূতি আছে সব কিছু উপলব্ধির শেষে নিরবচ্ছিন্ন মুক্তির আনন্দ লাভ করব, এই আমার ইচ্ছে।'

সিতাংশু বল্লে, 'সত্যি! দেখিস্ নি?—পতঞ্জলির সূত্রে কত রকমারি অনুভূতির কথা আছে! তারই একটা কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনে—বিশোকা চ জ্যোতিষ্মতী। মানে কি জানিস? যোগ অভ্যাস করতে করতে তুই অনুভব করবি যে, কোনো এক পদ্মের দলের মধ্যে জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা, বল্ দেখি হৃদয়ের শতদল যদি এমনি-তরো উপলব্ধি হয় তাহলে—আঃ কি মজা! মুক্তি হলে তো সবই শেষ!'

এমনি কতো কথা হয়। প্রত্যেকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, সাধু হবে, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করবে, মুক্তি লাভ করবে।

সুগঞ্জ সহরের রামকৃষ্ণ আশ্রমে এদের নিত্য আসা-যাওয়া। এরা পড়ে স্কুলে; মাষ্টার ঠকিয়ে পাশ করে প্রমোশন পায় এবং আশ্রমে জমায়েত হয়ে গীতা উপনিষৎ চর্চা করে, বিবেকানন্দের "পত্রাবলী" পড়ে উদ্দীপিত হয়; বলে—বিয়ে

কর্‌ব না, স্বামিজীর মত নর-নারায়ণের সেবায় জীবন পাত কর্‌ব।

বাড়ীতে মা-বাপেরা বকেন—কেন আশ্রমে যাস্ ? ছোটো ভাই-বোন্‌গুলিকে বাড়ীতে থেকে পড়াতে পারিস্‌নে ? স্কুলের পাঠ মুখস্থ না করে ভোর না হতেই লণ্ঠন জেলে গীতা মুখস্থ কর্‌তে বসে শরীর খারাপ করিস্ কেন ? অতো সকালে স্নানই বা করিস্ কেন ? তাতে কি স্বাস্থ্য থাকে ?

অভিভাবকদের কাছে নালিশ শুনে স্কুলের হেডমাষ্টার মশাই তাঁর নিজের কোঠায় সবাইকে ডেকে এনে শাসিয়ে দেন্—তোমরা আশ্রমে যেয়ে দিনরাত কি করো ? ছাত্রানাম্ অধ্যয়নম্ তপঃ। ধর্ম্মের দিন তো পড়েই আছে। বাড়ীতে মা-বাপকে কষ্ট দেওয়া পাপ, ইত্যাদি।

অনিল বলে, 'হেড্‌মাষ্টার মশাই বাবাকে বড্ড ভয় করেন। মাস মাস বাড়ী-ভাড়া রীতিমতন দিতে পারেন না কিনা তাই বাবার কাছ থেকে যাতে তাগাদা দেরীতে আসে অথবা ঘন ঘন না আসে সেজন্যে বাবার কথায় আমাকে হয়তো বেত-ও দিতে পারেন। দেখ্‌বি তোরা আমাকে একদিন বেত খেতেই হবে।

চন্দ্র বলে, রেখে দাও তোমার হেড্‌মাষ্টার। পাশ তো করেছেন মোটে বি-এ; তাতেই দেমাকে বাঁচেন না। আবার কোত্থেকে মাথায় থিওসফি এসে চেপেছে। কেন বাপু, রামকৃষ্ণ বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্য ছেড়ে কর্ণেল্ অল্‌কট্ কেন ? ভাঁড়ামি যত্তো!

* * *

চন্দ্র আশ্রমিকদের মধ্যে 'ভক্ত' টাইপ। রোজ ভোরে আশ্রমে এসে পূজোর জন্যে ঠাকুরঘরের শিকৃলি খুলে ঢোকে যখন, তার প্রায়ই মনে হয়, আজই বুঝি এই নির্জ্জন অবকাশে তাঁর আরাধ্য ইষ্টের দেখা মিল্‌বে! আশ্রমের—যাকে বলে—'সেবাইত' সে। উৎসবে, পর্ব্ব-পার্ব্বনে ঠাকুরঘরের কাজের ভার থাকে চন্দ্রর ওপর। ভোর না হতেই চন্দ্র সাজি নিয়ে ফুল তোলে, বেলপাতা আনে, তুলসী তোলে, মালা গাঁথে, ঠাকুরঘরের পাকা মেঝে ভিজে ন্যাক্‌ড়া দিয়ে পূজোর আগে ধুয়ে-পুছে রাখে, চন্দন ঘসে, ধুনো জ্বালায়, দীপ জ্বালায়—অবশেষে আসনপীড়ি হয়ে রামকৃষ্ণদেবের ফটোর সাম্‌নে বসে পূজো আরম্ভ করে। পূজোর শেষ দিকে ফুল ছড়ায়, একটি ছোটো রূপোর পাত্রে ভোগ নিবেদন করে, ঘণ্টা বাজিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম স্তর পূজো শেষ করে।

স্বদেশ কিন্তু কর্ম্মী। আশ্রমের জন্যে বাড়ী-বাড়ী মেম্বার-দের কাছ থেকে সে চাঁদা সংগ্রহ করে; স্বামিজী ও পরমহংস-দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে সভা ঠিক করে—কে সভাপতি হবেন, কোন্ উকিল কোন্ মাষ্টার কোন্ ডাক্তার বক্তা হবেন, কারা প্রবন্ধ পাঠ কর্‌বে; সভার উদ্বোধন ও বিদায় সঙ্গীতের জন্যে কোরাসের বন্দোবস্ত করে; শব-দাহের খবর এলে স্কুলের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে শ্মশানে নিয়ে পোড়াবার কর্ম্মী জোটায়। দু'টো নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনাও তারই কাজ।

স্বদেশ বলেছে, আগামী স্বামিজীর মিটিং-এ তাদের ক্লাসের ফার্ষ্ট বয় সুনীতিকে দিয়ে থিওসফির বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখাবে। সুনীতি নাকি এখন থেকেই—তিন মাস আগে—লিখ্‌তে সুরু করে দিয়েছে। হেড্‌মাষ্টার্‌কে একজন বক্তা করা হবে। ভারী মজা হবে!

সিতাংশুর সঙ্গে অনিলেরই বোধ করি ভাব জমেছে খুব। প্রত্যূষে অনিল এসে সিতাংশুর বিছানার খিড়্‌কিতে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে; সিতাংশুর ঘুমটা একটু বেশী-কিনা, তাই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ওঠার এই ব্যবস্থা হয়েছে—অনিল এসে সিতাংশুকে তুল্‌বে। খিড়কি খুলেই সিতাংশু বিছানা গুটিয়ে রাখে। দুজনে একসঙ্গে 'এক্‌সার্‌সাইজ' করে; যখন ঘামে শরীর ভিজে যায় দু'জনেই পাশের নদীর ঘাটে স্নান করে আসে; তারপর দু'খানা কম্বলাসন বগলে রওনা দেয় আশ্রমের দিকে। ততক্ষণে চন্দ্র ঠাকুরঘর জমিয়ে বসেছে।

আসন পেতে সবাই ধূপ-ধুনোর সুগন্ধের মধ্যে বসে যায় ধ্যান কর্‌তে। ধ্যান চলে প্রায় ঘণ্টাবধি।

অসীত ধ্যান-শেষে শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী থেকে সুললিত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করে।

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রর দৈনন্দিন পূজারম্ভ হয়। অসিত সবার মধ্যে ভালো গাইয়ে। অধিকন্তু এস্রাজ ছেড়ে কিছুকালাবধি সেতারে হাত পাকা করছে। অসিতরা ব্রাহ্ম। তার সব চেয়ে প্রিয় শিব-সঙ্গীত, বিশেষত গিরীশ ঘোষের প্রথম প্রণতি পঞ্চ-বদন হর তার অতি প্রিয়।

অনেক কবিতা সে সুর করে আবৃত্তি করতে পারে। সভা-সমিতিতে অসিতের আবৃত্তি না থাকলে প্রোগ্রামই সম্পূর্ণ হয় না। তাছাড়া অসিত সাহিত্যরসবেত্তা—বাঙ্‌লা সাহিত্যে 'পরিব্রাজকের স্থান নির্দ্দেশ' নাম দিয়ে সে স্বামিজীর 'পরিব্রাজক' নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্তের একটি চমৎকার সমালোচনা করেছিলো; রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত 'উদ্বোধন' পত্রে সেটী ছাপা হয়ে বেরিয়েছে।

অসিতের দোষের মধ্যে যা ভয়টা একটু বেশী।

আশ্রমে যাবার পথে একটা পড়ো বাড়ী আছে। ঐ বাড়ীর সাম্‌নে এলেই এক দৌড়ে পেরিয়ে যাওয়া অসিতের রীতি।

অসিত একদিন বলছে, 'ভয়ডরই যদি রইলো, তা হলে আর মুক্তির সম্ভাবনা কোথা ?'

চন্দ্র বল্লে, 'অসিত! ঐ বাড়ীর সাম্‌নে এসে মনে মনে ভগবানের নাম জপ করিস্ তো ? তবে আর ভয় কিসে ?'

সবাই মিলে পোঁ ধর্‌লে, সত্যিই তো! এদ্দিনেও ভয় গেলো না! বিগতভীঃ হবো কবে ? একটা কাজ করা যাক্—রাত দুপুরে শ্মশানে চলো, ভয় কেটে যাবে। যেমন কথা তেমন কাজ। সবাই অগ্রণী। সুতরাং ঠিক হলো, রাতে বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার পর আশ্রমে এসে সবাই জুটবে—অতঃপর সরাসরি শ্মশান।

কৃষ্ণপক্ষের রাত তখন একটা।...ঐ তো শ্মশানের বট-গাছ! তার পাতায় ঝোপে-ঝোপে, ডাল-পালা-ঝুরির ফাঁকে-ফাঁকে কতো আশঙ্কা, কতো ভয়, কতো দুর্ভাবনা, কতো বুকধড়ফড়ানি জড়িয়ে আছে।...তবু মাভৈঃ হয়ে আত্মার সর্ব্বশক্তিমত্তাকে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব কর্‌বার এই অবসর!

অনিল বল্লে, 'আয় ধ্যান করি।'

চন্দ্র দিলে উত্তর, 'আগে এই 'প্রসাদ' কিছু খেয়ে নাও।' এই বলে প্রসাদী মিশ্রী একটা কৌটো থেকে হাতে হাতে বেঁটে দিলে।

সবাই ধ্যানে বস্‌ল। অনেকক্ষণ কাটল। তারপর মনের আনন্দে গল্প কর্‌তে কর্‌তে যখন তারা ফিরল তখন রাত অবসানপ্রায়। চুপি চুপি তারা বাড়ীতে গিয়ে ঢুক্‌ল—কেউ জান্‌লা-পথে, কেউ বা অন্য উপায়ে—বাড়ীর লোকেরা যাতে কিছু টের না পায়।

ভূত-প্রেতের চেয়েও বেশী ভয়ের হেতু—অভিভাবকেরা।

তাঁরা বলেন, 'অপোগণ্ড কতোগুলো মিলে ধর্ম্মাচরণের আড়ম্বর দেখাবে, আর তাঁরা বয়োবৃদ্ধরা—যাঁরা কেউ কেউ তিন কাল পেরিয়ে এককালে গিয়ে ঠেকেছেন—ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে ছেলেপিলেদেরকে যা করতে বলেন, তা ওরা কোরবে না, এ কী অনাচারের যুগ পড়েছে! দিনকাল গেছে উল্‌টে! তাঁদেরকে কিনা "ধর্ম্ম" শেখাতে আসে নাবালকের দল...'

আশ্রম সমিতির সম্পাদক নীলকণ্ঠ বাবু বলেন, 'নবযুগ এসেছে। তরুণেরাই জাগ্‌ল, বয়স্কেরা রইলো ঘুমিয়ে। বাইবেলের কথা: পুরোণো বোতলে নতুন মদের ঠাঁই হবে কেন ?'

* *

সেদিন হৃদেশের 'নার্সিং'।

সাইকেলের সঙ্গে লণ্ঠন বেঁধে চলেছে হৃদেশ। রাত সাড়ে এগারোটা। বাড়ীর লোকেরা যার-যার ঘরে শুয়ে পড়তেই সে রওনা দিয়েছে; নচেৎ তারা জান্‌লে হাঙ্গামা বাঁধাবে। পীরগ্রামে মহেন্দ্রের বাড়ীতে কলেরা।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথ কাদায় কাদাময়। আবার বৃষ্টি নাম্‌বে নিশ্চয়। আকাশে কালো মেঘ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছেয়ে আছে। হৃদেশ চলেছে নির্ভীক মনে। হঠাৎ পথের কাদার তালে সাইকেলের চাকা দু'টো বসে গেলো। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে হৃদেশ সাইকেল থেকে নাম্‌লে। কিছু কাদা ছিট্‌কে এসে লাগ্‌ল তার গায়ে। বাতাসে লণ্ঠনের আলো এতক্ষণ খালি কাঁপছিলো, এখন নিভ্‌ল।

এই নিশীথে পথ দেখাবে কে ? হৃদেশ ভাবলে সে রোগী-নারায়ণের সেবা করতে যাচ্ছে, নারায়ণ তাকে দেখাবেন পথ।

সাইকেল টেনে তুলে ক্ষিপ্রগতিতে হৃদেশ অন্ধকার ভেদ করে চল্ল। কিছু পথ অগ্রসর হয়ে কদার পথে কাদার তালের

সঙ্গে লাগল ধাক্কা। লণ্ঠনটা ঝন্‌ঝন্‌ করে ছিট্‌কে পড়ল কাদায়। একহাতে রয়েছে সাইকেল, অন্য হাতে লণ্ঠন তুলতে যাবে—এমন সময় হাত পিছলে সাইকেলটাও কাদায় পড়ল। যখন দু'টো জিনিষ আবার টেনে তুল্ল তখন হৃদেশের ধুতি কাদায় জবজবে। অতএব ধুতিখানা খুলে নিয়ে সাই-কেলের হ্যাণ্ডেলের ওপর ভাঁজ করে রাখলে। তারপর অন্ধকারের মধ্যে পাঞ্জাবী ও কৌপীন পরা অবস্থায় বাধা ঠেলে প্রাণপণ শক্তিতে ছুট্‌ল মজুমদারের বাড়ীতে।

সে রাত্রিতে শুশ্রূষার সময় হৃদেশের একটিবারও ঘুমের আবেশ হয়নি। বার বার মনে হয়েছে, সে যেন বীর হনুমান, অসাধ্য সাধন করতে পারে।

হৃদেশের জন্যে ছোটো-খাটো নার্সিং সহরে তো নিত্য লেগেই আছে। একদিন নীলকণ্ঠ বাবু আশ্রমের অফিস টেবিলে বসে ডাকলেন, 'হৃদু! তোমার নার্সিংএর রিপোর্ট দাও। কি লিখ্‌ব—শুধু জ্বর, না টাইফয়েড্‌?

হৃদেশ রান্নাঘরে একটি রোগীর জন্যে সাগু সিদ্ধ কর্‌-ছিলো। চেঁচিয়ে বল্লে—লিখুন টাইফয়েড্‌।

'রোগী না রোগিনী?'

'এই রেঃ, এইবারই সেরেছেন। এ তো জিজ্ঞেস্‌ করিনি।'

'জিজ্ঞেস্‌ কোর্‌বে কি হে? তুমি নিজে আজ এই ক'দিন ধরে যাচ্ছো...ক'দিন গেলে?

'তিন দিন।'

'এই তিন দিনেও রোগী কি রোগিনী চিন্‌লে না।'

'রাত্রিরে মশারী টাঙানো থাকে কিনা' বলেই হৃদেশ লজ্জায় চুপ করল।

তারপর ভেবে বল্লে, 'মাথা কামানো, কি দেখে চিন্‌ব? ...কালই আপনাকে খবরটা এনে দিচ্ছি।'

'আর ভাই, তোমরা ব্রহ্মচারী মানুষ। স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান তোমাদের নেই।' এই বলে নীলকণ্ঠ বাবু হাসতে লাগলেন।

লোকেন বাবু এসে এমন সময় হাজির।

'কি নীলকণ্ঠ! বড়ো আনন্দে আছো হে! আমাদের যে প্রাণ যায়। ভাই আমার বাড়ীতেও অসুখ। নার্স দিতে হবে দু'জন। হেড্‌মাষ্টারের বাড়ীতে থাম্‌ল আর আমার বাড়ীতে আরম্ভ হলো।

'ভালো কথা।' নীলকণ্ঠ বাবু বল্লেন, 'হেড্‌মাষ্টারের বাড়ীতে অসুখ কার ছিলো হে?

'তাঁর মেয়ের আর কি!'

'বটে?' বলেই হাস্‌তে লাগলেন। 'আরে মজার কথা শোনো: হৃদু আজ সমানে তিন দিন নার্সিং-এ যাচ্ছে, বল্‌তে পারলে না রোগী না রোগিনী। এখন এর একটা বিহিত যা হয় করে।' বলেই হেসে কুটিকুটি।

লোকেন বাবুও মুখ টিপে হাসলেন।

কিন্তু দু'জনেই মনে মনে এই নিষ্কাম আশ্রমিক কর্ম্মী বালককে প্রণাম করলেন।

এর পরে সাত দিন। হেড্‌ মাষ্টার বাবুর বাড়ীতে একটা নতুন কাণ্ডর সূচনা হয়েছে। মেয়ে বায়না ধরেছে, আশ্রমে আসবে। আশ্রমের কর্ম্মী যেরকমটি নার্সিং করতে জানে তা কেউ পারে না। বড়দি তো পাখা হাতে বসলেই ঢুলছে। মা যা পাখার বাতাস করেন তাতে মাথাতে মোটেই লাগে না; হয় মাথার এক পাশ দিয়ে নয়তো ওপর দিয়ে বাতাসগুলো পার হয়ে যায়। হৃদেশ বাবু যেমনটি বাতাস করেছেন তাতেই তো মাথার ব্যথা সেরেছে।...না, আশ্রমে যাবেই সে: দেখে আসবে তারা সেখানে কি করে।

আপত্তি সত্ত্বেও একদিন সন্ধ্যাবতির সময় ইন্দিরা এসেছো চন্দ্রর আরাত্রিক তার ভয়ানক ভালো লাগল। উপরন্তু ঠাকুর ঘরের সাত্ত্বিক সজ্জা, কিশোর কুমারদের নিরলস কর্ম্ম-ক্লান্তি দেখে ইন্দিরার টান বেড়ে গেলো। সেই থেকে সে আশ্রমের লাইব্রেরীর বই ছোটো ভাই টুনুর হাতে আনিয়ে পড়ে। গার্ল স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী সে।

আরেকদিন ইন্দিরা এসেছে সন্ধ্যারতির সময়। ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় খিড়কির পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চন্দ্রর আরাত্রিক দেখছে। চন্দ্র বাঁ হাতে ঘণ্টা বাজায়, ডান হাতে পঞ্চপ্রদীপ হেলিয়ে দুলিয়ে ঘোরায়, কর্পূর জ্বেলে আরতি করে, ঠাকুরকে শঙ্খের জলে স্নান করায়, নীলাভ সিল্কের রুমাল দিয়ে মনে মনে ঠাকুরের গাত্র মার্জ্জনা করে, চামর ব্যজন করে, সুগন্ধ একটি আশ্রমোদ্যানজাত গোলাপ নিবেদন করে দেয়;—সঙ্গে সঙ্গে করতাল-কাঁসি-ঘণ্টা-পাখোয়াজ-হার-মোনিয়ামের ঐক্যতান বাজে। ইন্দিরার চিত্ত আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়ে ওঠে।

আরাত্রিক শেষে সবাই ঠাকুর ঘরের ভেতরেই ধ্যান জপ করতে বসেছে। নীলকণ্ঠ বাবু প্রায়ই আরাত্রিকে থাকেন। একটু পরেই উঠে যেয়ে তিনি অফিস ঘরে বসলেন। আস্তে আস্তে দু'একজন করে ঠাকুরঘর ছেড়ে বাইরের ঘরে নীলকণ্ঠ বাবুর সঙ্গে যোগদান করছে। চন্দ্র মাঝখানে একবার উঠে এসে ইন্দিরাকে একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একখানা কমলাসন এগিয়ে দিয়ে বল্লে, 'বসুতে পারেন।' ইন্দিরা আসনখানা মেজেয় পেতে আসনপীড়ি হয়ে বসলে; দু'হাত কোলে শিথিল করে রাখলে, তারপর চোখ বুজে স্থির হয়ে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে অফিস ঘরেরই এক প্রান্তে শীতল পাটি বিছিয়ে বাদ্য-যন্ত্র মাঝখানে রেখে সকলে ঘিরে বসলে। অসিত হারমোনিয়াম্ টেনে ধরলে গান—

হরিরস সুধা পিয়ে মম মানস মাতো রে

ইন্দিরা তখনো আসনে বসে। গানের প্রতি মীড় মূর্চ্ছনা তার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পৌছে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

বিদায় নেবার সময় চন্দ্র প্রসাদী সন্দেশ ইন্দিরার হাতে তুলে দিলে।

রাত হয়ে যাচ্ছে এখনি বাড়ী যেতে হবে। অবশ্য ইন্দিরাদের বাড়ী আশ্রম থেকে পাঁচ মিনিটের রাস্তাও নয়,—তবু তাড়াতাড়ি যেতে হবে, তা না হলে মা বকবেন, বড়্দি বকবে, বাবা বকবেন।

চন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনাদের গানের বই আছে?'

'আছে বৈকি—"গীতিগুচ্ছ"। টুনুকে পাঠাবেন কালই। এসে নিয়ে যেতে পারে।'

'আজ গান করলেন কে?'

'ও আমাদের অসিত!'

'আচ্ছা আসি আজ।

ইন্দিরা চলে গেলো।

* * *

কিছুদিনের মধ্যেই আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব। "দরিদ্র-নারায়ণ সেবা"র জন্যে চাঁদা তুলতে হবে। প্রায় চারশ টাকা চাঁদা উঠল। সহরবাসীদের উৎসাহতেই চাঁদা ওঠে। তাছাড়া উৎসবের দিন গণ্যমান্য সহরে মহিলারা উৎসবের গান, কালী-কীর্ত্তন, প্রসাদ বিতরণের সময় উপস্থিত থাকেন এবং চিকের আড়ালে বসে কীর্ত্তন শ্রবণাদি ব্যাপারে যোগদান করেন।

এবার যেয়ে স্কুলে চাঁদা তুলছে ইন্দিরা। হেড্ মাষ্টার দশরথ বাবু এটা কিছুতেই পছন্দ করেন না যে, তার মেয়ে আশ্রমের জন্যে চাঁদা তুলবে। কিন্তু তিনি তো আর মেয়ে-স্কুলে যেয়ে ইন্দিরাকে বারণ করতে পারেন না—অগত্যা চুপ করে রইলেন। দু' চার পাঁচ দিন অন্তর একদিন করে নিজেই আশ্রমে এসে ইন্দিরা যা উঠেছে তাই দিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে দশরথ বাবুর স্কুলে চাঁদা তুলছে অনিল, চন্দ্র, সুদেশ, সিতাংশু ও অনিল। ক্লাসের রেজিষ্টার বই থেকে তারা ছাত্রদের নাম টুকেছে; প্রত্যেককে আগামী মাইনে দেবার তারিখে আট আনা করে আনতে বলেছে; চাই-কি, মাষ্টার মহলেও দিয়েছে চাঁদার তাগিদ।

শ্রীযুক্ত দশরথ চক্রবর্ত্তীর "থিওসফিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি"তে অনেক মাষ্টাররাও সভ্য। শুধু চাঁদা দেবার বেলাই নিমরাজী অথচ এই আশ্রমে তাঁরা বেশ খুসিতে এবং সোৎসাহে চাঁদা দিচ্ছেন দেখে হেড্ মাষ্টারের রাগ বাড়্ল এবং পড়্ল গিয়ে অনিলদের দলে।

অনিলকে নিজের খাস-কামরায় তলব করে বুঝিয়ে দিলেন, স্কুলের ডিসিপ্লিন তিনি ভাঙতে দেবেন না। যখন ক্লাস বসে তখন তারা কিছুতেই চাঁদা তোলার ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ করতে পারবে না।

অনিল বল্লে, 'আমরা তো হৈ-চৈ কিছু করিনে সার্।'

হেড্ মাষ্টার বল্লেন, 'না করো ভালো। কিন্তু সত্যিই পড়ায় অমনোযোগী হয়েছো কিনা বোঝা যাবে আগামী টেষ্ট্ পরীক্ষায়।

অনিল নিরুত্তর থাকল। তারা সকল পরীক্ষাতেই বিশ পঁচিশ দিন আগে তৈরী হয়ে পাশ করে এসেছে। আর টেষ্টের এখনো বাকী একমাস। সুতরাং অনাবশ্যক এমনিধারা উপদেশ।

ইতিমধ্যে স্কুলে রব উঠ্ল প্রশ্ন 'আউট'। হেড্ মাষ্টারের খাস কামরায় সাক্ষী সাবুদের দল এপক্ষের দোষ ওপক্ষের ঘাড়ে

চাপাচ্ছে। হেড্ মাষ্টারের ক্রুর দৃষ্টি যে বরাবরই অনিলদের ওপর আছে ছেলেরা তা জানত। সেই সূত্রে টেষ্ট পরীক্ষার্থী একদল রব তুললে যে, প্রশ্ন 'আউট' করেছে অনিল: তার কাছ থেকেই ধীরে ধীরে জানাজানি হয়ে সবার কাছে প্রশ্নগুলি বেরিয়ে গেছে।

এদিকে ইন্দিরার আশ্রম-পক্ষপাতিতা অন্যদিকে অনিল প্রভৃতি আশ্রমিকদের দোষ সংস্পর্শ। সুতরাং আর যায় কোথা? সব ঝাল ঝাড়লেন হেড্মাষ্টার এই আশ্রমিক দলটিকে দণ্ড দিয়ে। অনিলদের দশ-পাঁচটা করে বেতের ব্যবস্থা হলো।

স্কুলের ছুটীর পরে আশ্রমে তারা মিলেছে এসে।

অনিল বল্লে, 'দেখ্লি, মিছিমিছি বেত মারলে।'

চন্দ্র নীচের ক্লাসে পড়ত। সুতরাং সে টেষ্ট পরীক্ষার্থী নয়। বেত থেকে রেহাই পেয়েছে। বল্লে, 'অনিলদা! হেড্মাষ্টার তোমাদের বাড়ীভাড়া দিয়েছে?'

'পাগল! বাড়ীভাড়া দেবে? এই মাস নিয়ে তিন মাস। ...দাঁড়া না, ইন্দিরা তো পাশ কোরবে? তাকে কলেজে পড়াতেও আবার ইচ্ছে, অথচ সম্পত্তিটুকুন নেই। চাঁদ্ টাকা জমাচ্ছেন বোধ হয়।'

উৎসবের দিন এলো ঘনিয়ে। রবিবার দিন উৎসব, তার আগের সভা শনিবার। স্বদেশের কাজ-কর্ম্মের আর বিরাম ঘটে না। প্রথমতঃ সুনীতির প্রবন্ধ খুব জবরদস্ত গোছের হওয়া চাই। হলোও তাই। হেড্মাষ্টার দশরথ বাবু ছিলেন সভার বক্তা। অতএব, তাঁরি সুযোগ্য ছাত্র যখন তাঁরি সুমুখে থিওসফি হেন বিষয়ের বিপক্ষে প্রবন্ধ পাঠ করতে লাগল তখন তিনি ধৈর্য্য হারালেন। রাগের মাথায় বক্তৃতার সময় পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দের মতামত-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা সুরু করলেন। সভাপতি ছিলেন রায় বাহাদুর বিরাজমোহন গুপ্ত, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং আশ্রম সমিতির স্থায়ী সভাপতি। তিনি দিলেন বাধা। তাতে হেড্মাষ্টার বাবু ত্রস্ত খরগোষের মতো একাধিকবার সভার বিপক্ষ গুঞ্জনের দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি পরিচালনা করে আসন প্রতিগ্রহণ করলেন।

ইন্দিরা চিকের আড়ালে থেকে পিতার অপমান দেখ্ছে। প্রথম হলো তার লজ্জা, তারপর সে বড়্দির গা টিপে বল্লে, বাবার সবটাতেই বোকামি।'

বড়্দি খেঁকিয়ে উঠলে, 'বাঁদরি, চুপ কর্। ঢের জ্যাঠামি হয়েছে।'

ইন্দিরার গৃহে সহানুভূতির অভাব বিশেষতঃ পিতার সঙ্গে তার আড়ি। ইন্দিরা ভাবলে, সে কেন বেটাছেলে হয়ে জন্মালো না! তাহলে নিজেকে অতো অসহায় বলে ভাবত না!...

কাল উৎসব—আজ তার গৌরচন্দ্রিকা: কুটনো কোটা, বাট্না বাটা, ঠাকুরঘর সাজাবার ফুল-লতা-পাতার সন্ধান নেওয়া, কাঙালী-নারায়ণদের ভোজন-পর্ব্বে নিমন্ত্রণ করা, আরো কতো কাজ! রাত দশটার সময় ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় বুড়ি ঝুড়ি আলু, বেগুন, কাঁচকলা, কুমড়ো, কপি, শালগোম নিয়ে বসেছে কর্ম্মীরা কুট্নো কাট্তে। বারান্দার ছাদ থেকে ঝুলছে দীপ্যমান্ একটি পেট্রল লাইট্—উৎসবের বৈজয়ন্তী।

চন্দ্র হাঁকছে, 'আগে আলু ছাড়াও। ওটাতেই যতো সময় লাগে!'

স্বদেশ দিলে উত্তর, 'নাইট্-স্কুলের ছেলেদের দিকে দেনা এগিয়ে ঝুড়িটা চন্দ্র। ওরা যে বসে আছে, দেখ্ছিস্ না।'

অসিত কোত্থেকে হঠাৎ বারান্দায় উঠ্ল।

বল্লে, আমার একটা প্রস্তাব আছে। তোমাদের যদি মত থাকে তাহলে—'

অনিল ও সিতাংশু একসঙ্গে উত্তর করলে—'কী ছাই, বলো না?'

'তোমাদের তো লোকের অভাব নেই দেখ্ছি। আমি ভাই তোমাদের সেতার বাজিয়ে শোনাচ্ছি। তোমরা কাজ কোরবে, শুনবে—আমি বাজাবো।'

স্বদেশ বলে উঠ্ল, 'কই সেতার? বোকারাম! সেতার সঙ্গে এনেই না-হয় বল্তিস্।

সকলেরই মনেই আজ আনন্দ। অসিত যে মুখচোরা তারও হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার খুলি-খুলি করছে। অসিত বাজাচ্ছে একটি গান—

মাতিয়ে দেমা!! আনন্দময়ী একেবারে মেতে যাই

মাঝে মাঝে সুর টেনে দু'একটা লাইন্ গানও করছে। কখনো কখনো বা অনিল সীতাংশু প্রভৃতির মধ্যে যার ইচ্ছে হয় সে-ই অসিতের দোয়ার হয়ে গায়।

নীলকণ্ঠবাবু একেকবার এসে খবরাখবর নিচ্ছেন—কে কি কাজের ভার নিলে ইত্যাদি। আশ্রম উৎসবানন্দে গম্‌গম্ করছে।

চন্দ্র একবার অনিলকে কানে কানে কি সুধোলে।

তারপর রাত যখন দু'টো তখন বিশ্রামের জন্যে আগের ব্যবস্থামতো ঘুমানোর ঘণ্টা বাজ্‌ল। কেউ পাটি পেতে, কেউ চট বিছিয়ে, কেউ সতরঞ্চি টেনে—অফিসঘরে, ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায়, যে-যেখানে পারে শুয়ে পড়্‌ল।

চন্দ্র পেট্রল্ লাইট্‌টি নিভিয়ে একটা মোমবাতি জ্বালালে। ঠাকুর-ঘরের ভেতরে কমলাসনে বসে মোমবাতিতে ধরালে একটি ধূপকাঠি। ধূপের রেখায়িত বাষ্প ঘরকে করলে সুগন্ধময়। অবশেষে চন্দ্র মোমবাতিটি ফুঁ দিয়ে নিবালো এবং রজনীর নিঃসীম নির্জ্জনতায় সুরু করলে জপ।

রবিবার ভোরে অনিলেরা যথারীতি স্নান করলে, ফুল তুললে, চন্দ্র প্রাতঃকালীন আরাত্রিক করলে।

অনিল জিজ্ঞেস্ করলে চন্দ্রকে নিরিবিলিতে, 'কি, জপ কতো হলো?'

চন্দ্র বল্লে, 'দশ হাজার করেছি।...অনিল দা, আমার আজ যেন কেমন কেমন লাগ্‌ছে। মনে হচ্ছে, বাড়ী গিয়ে আর কাজ নেই। আমি আর বাড়ী যাবো না ভাব্‌ছি। আশ্রমেই থাকব।'

অনিল বল্লে, 'তুই যে আমাদের আগে সাধু হবি তা আমার দৃঢ় ধারণা হয়েই আছে অনেক দিন থেকে।'

সেদিন দরিদ্রনারায়ণ-সেবার সময় ইন্দিরা তার সহপাঠিনী একদল মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা নিয়ে উপস্থিত। বল্লে, তারা পরিবেশন করবে।

নীলকণ্ঠ বাবু শুনে বল্লেন, 'এঁরা যদি ইচ্ছে করেন, আমাদের বাধা দেবার কি আছে? তবে যাতে তাঁদের অভিভাবকদের সম্মতি থাকে সেটা আমাদের দেখা উচিত।'

মহিলা-ভক্তদের মধ্যে লোকেনবাবুর স্ত্রী প্রধানা। লোকেনবাবু সুগঞ্জের নামজাদা উকিল। যখন তাঁর স্ত্রী খিচুড়ির ডেক্‌চি ও দু'খানা করে হাতা স্বেচ্ছাসেবিকাদের হাতে বেঁটে দিয়ে তিন চারটি জোড় বেঁধে দিলেন তখন উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে কেউই আপত্তি করলেন না। মেয়েরা দু'জনে একটা করে ডেক্‌চি নিয়ে পরিবেশনে নাম্‌লে।

ইন্দিরা লোকেন বাবুর স্ত্রীকে সুধোলে, 'মাসীমা, আপ্‌নিও তো বেগুনভাজা আলুভাজাগুলো দিতে পারেন।' অনন্ত উৎসাহ ইন্দিরার।...

...উৎসব শেষ। কলকোলাহল গেছে। চন্দ্র আর বাড়ী গেলো না। তার আত্মীয়ের মধ্যে আছেন একজন দূর সম্পর্কের কাকা। সুতরাং বাড়ীর লোকের বাধা-বিপত্তি বল্‌তে তেমন কিছু নেই।

ইন্দিরা পেলে এই সংবাদ। সে-ও মনে মনে স্থির করলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর আর কলেজে যাবে না। স্বামিজীর ত্যাগের আদর্শ কি শুধু ছেলেদের জন্যে, মেয়েদের জন্যে নয়?

মার কাছে বল্লে, মা আমি আর পড়ব না। আমায় তোমরা "নিবেদিতা স্কুলে" পাঠিয়ে দাও। সেখানে হয় আমি মিসট্রেসের কাজ করব নয়তো আর যে কাজ করতে পারি তাই করব।'

মা কাঁদাকাটি করলেন। মেয়েকে অনেক করে বোঝালেন: বিয়ের আলাপ চলছে, এখন আপাতত তার কলেজে যাওয়াই উচিত। শেষে নিরস্ত হলেন মেয়ের এক-গুঁয়েমিতে। কথাটা হেড মাষ্টার বাবুর কানে উঠল। তিনি তো রেগে-মেগে আগুন। পরে বল্লেন, এমন আখাটা মেয়ে তাঁর ঘরে—পূর্ব্ব জন্মে না-জানি কি পাপ করেছিলেন!

যাই হোক ইন্দিরা ভয়-ত্রাসে নয়—সে টলল না; নিবেদিতা স্কুলে যাবেই সে। বড়দি বকাবকি করলে, ছত্রিশ রকমের যুক্তি ফেঁদে বোঝাতে বসলে, ভয় দেখালে এবং অবশেষে ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ করে কাঁদলে। মা আদ্যন্তমধ্য কেঁদেই কাটালেন। বাপ মেয়ের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বন্ধ করলেন এবং বল্লেন যে, একটি পয়সা দিয়েও তাকে সাহায্য করবেন না; মেয়ে এখন যা-ইচ্ছে-হয় করুক।

দেখতে দেখতে ম্যাট্রিকের ফল বেরুলো। ইন্দিরার কপাল ভালো; তার ভাগ্যে মেয়ে স্কুলের কুড়ি টাকা একটা

জলপানিও জুটেছে। এবার আবার বাপের আদর ধরে ন। আগে একজন এম-এ পাশ বর ঠিক ক'রে রেখেছিলেন; তার জায়গায় চাই কি এম-এ, বি-এল বরের সঙ্গে আলাপ চলে। ইন্দিরা তবু বাম—নিবেদিতা স্কুলে যাবেই। সুতরাং বাপের মনে দুশ্চিন্তার শেষ হয় না। অগত্যা নিজেই খরচ পত্র করে পাঠালেন মেয়েকে কল্‌কাতায়; বুঝিয়ে বল্লেন, 'কলকাতায় কিছুদিন ঐ স্কুলেই থাকো, তারপর ইচ্ছে করেই বাড়ীতে ফেরবার কথা মনে উঠ্‌বে'খন্। নতুন যে আলাপটা এসেছে সেটা আপাতত মুলতুবি থাক্‌লেও বহাল রইলো।'

ইন্দিরা কল্‌কাতায় এসে যেন বাঁচ্‌ল।

যেদিন সে কলকাতায় যাবে সেদিনই ট্রেণে অসিতও যাচ্ছে। অসিত ভর্ত্তি হবে কলেজে। ইন্দিরাকে নানারূপে সাহায্য করতে করতে এগোচ্ছে সে কলকাতার দিকে। শেষাশেষি সে-ই তাকে নিবেদিতা স্কুলে নিয়ে হাজির করলে। তখন থেকে মাঝে মাঝে অসিত ইন্দিরার খবরাখবর নেয়।···

ইন্দিরা এখন ত্যাগের কঠোর পথে পা বাড়িয়েছে শিক্ষাকে জীবনে সেবাব্রতরূপে গ্রহণ করে। তারই মধ্যে গেলো চার বছর অতীত হয়ে।···

স্বপ্নেও ভাবেনি অসিত, একদিন ইন্দিরা তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলবে, 'আমায় বিয়ে করো তুমি।'

স্বগ্রামে থাকতে ইন্দিরা নিষ্কামকর্মী অকামহত বন্ধুত্বময় কিশোর কুমারদের এক-প্রাণতা দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল—ভগবানের নামে তো তার মন-প্রাণ-চিত্ত মজেনি! তার মুখ চেয়ে সে সংসার-সুখ ত্যাগ করবে? নাম শুনে তার কৃষ্ণের প্রতি মন গিয়ে লিপ্ত হয়েছে: কৃষ্ণের বাঁশি তো সে শোনেনি—যে বাঁশীর ডাকে রাধা কুলকলঙ্কিনী, মীরাবাঈ রাজৈশ্বর্য্যে পরিপালিতা হয়েও বৈরাগিনী।...উপায় কি ইন্দিরার? প্রাণ তার চায় সহানুভূতি, চায় আশ্রয়। এদিকে সে বুঝেছে, যে-পথে তার চলা সে-পথ সহজ নয়—সে-পথ বন্ধুর। তাকে সাহস দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এমন লোক সে পায় কোথায়? সেটি কে? অসিত যদি তাকে—

একদিন মরীয়া হয়ে সত্যি সত্যি ইন্দিরা অসিতকে মিনতি জানালে, 'তুমি আমায় বিয়ে করো।'

অসিতও হয়তো বা টের পেয়েছিলো। সে বল্লে, 'তোমার তো খুব দুঃসাহস!'

জোর করে ইন্দিরা বল্লে, 'দুঃসাহস হবে না? এই দুঃসাহস আর কারু কাছে আমি করতে পারিনে—তোমার কাছে ছাড়া।'...কেন? ইন্দিরার ভার কি অসিতের চেয়েও শক্তিমান্ কোনো সত্তার 'পরে ন্যস্ত নয়? ইন্দিরা ভেবে কূলকিনারা পেলে না।

অসিত সুধোলে, 'বিয়ে আমাদের মঙ্গলময় হবে ইন্দিরা?'

ইন্দিরা উত্তেজিত হয়ে যেন প্রতিজ্ঞা করার স্বরে দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে, 'হবে, হবে নিশ্চয় হবে।'...

অসিতের মনোনীতা স্ত্রী গ্রহণে তার অভিভাবকদের অমত নেই। সুতরাং ফাল্গুনের শেষে একদিন শাস্ত্র অনুযায়ী ইন্দিরা-অসিতের বিয়ে হলো। ইন্দিরা কক্ষ ছেড়ে উঠে এলো অসিতদের বাড়ীতে।

ওদিকে ইন্দিরার বাবা মেয়ের সংস্রব ছাড়লেন—রাগে না অভিমানে, ইন্দিরা সে খবর পেলে না।

ইন্দিরার প্রথম আশ্রয় স্বামী আর ভগবান্। বিয়ের পরে ইন্দিরা বলছে, 'ওগো, মেয়েমানুষের স্বামিহীন জীবন বড়ো দুর্ব্বহ।—'

অসিত স্ত্রীকে আদর করে বলছে, 'ইন্দিরা, তুমি আমার জীবনপথের সহযাত্রিনী হয়েই থাকো। তবে এও জেনো, স্ত্রীলোক বল্‌তেই অবলা নয়। এমন মহিয়সী নারীও আছেন পুরুষরা যার সহধর্ম্মী হলে, তিন পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। তবে তুমি সেই দলের নও।' বলে একটু হাসল।

ইন্দিরা রাগ করে বলে, 'কি?'

অসিত প্রত্যুত্তরে আদর করে, বলে, 'কিছু না।'

* * *

এদিকে স্বদেশ করেছে গৃহত্যাগ।

সিলেটে মামার বাসায় থেকে সে কলেজে পড়্‌ত। আই-এ পাশ করার পরই সে ছুটীতে বাড়ী এলো। তার মনে এখন নতুন চিন্তা: তাইতো কলেজী ঢং ঢাং তার আদর্শের ধারে কাছেও যায় না। কোথায় সে ভেবেছিলো, "দীন-দরিদ্র-অজ্ঞ-মুচি-মেথরের"—শিক্ষা-স্বাস্থ্য-শ্রীর বিধান সে করবে, তা না হয়ে কিনা তার মনেও কলেজী হাওয়া লাগ্‌তে

সুরু করেছে। এম্‌নি তার অবস্থা, অথচ, তার আদর্শের কথা কোনো কলেজী বন্ধুর কাছে মুখ ফুটে বল্‌তেও পারে না। মনে মনে আওড়ায়—যত মত তত পথ; এবং নতুন পরিচিত-দের বিরুদ্ধে সঞ্চিত বিদ্বেষকে যথাসাধ্য মন থেকে উন্মূলিত করতে চেষ্টা করে। সুগন্ধের নদীর পারে একা সে ঘুরে বেড়ায় আর খালি ভাবে ভাবে আর ভাবে। অতঃপর একদা সে বাস্তবিকই গৃহত্যাগ করে সাধু হয়।

তার বাবা অমিতপ্রতাপ জমিদার। থাকতেন গাঁয়ে। খবর শুনে এলেন সহরে। সম্পাদক নীলকণ্ঠবাবুকে বাড়ীতে ডেকে আনালেন কিসে ছেলেকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারা যায় তারই ব্যবস্থা করতে।

নীলকণ্ঠবাবু বল্লেন, 'দেখুন, সাধু হয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় হৃদেশ নিজের বিবেক অনুযায়ীই কাজ করেছে। তাকে কি আমরা ফেরাতে পারি?'

হৃদেশের বাবা প্রথম পরামর্শ চাইলেন, শেষে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে বল্লেন, 'আপনার বিরুদ্ধে আমি ছেলে-ভাগানোর মামলা দায়ের করছি।'

কিছুক্ষণ সওয়াল জবাবের পর নীলকণ্ঠবাবু লোকেনবাবুর পরামর্শ মতন শুধু বলে এলেন, 'এ ছেলে ভাগানো নয়।'

হৃদেশের বাবা মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখলেন। পরে জানলেন, হৃদেশ আছে কাশী সেবাশ্রমে—বোধ হয় সুখেই আছে।

* * *

আর অনিল যে কবে সাধু হয়ে বেরিয়েছে বন্ধুদের মধ্যে তা কেউ জানে না। যাহোক্ সিতাংশুর খবরটা জানা গেছে। সে 'তিন ধাম' করে এখন বদ্রীনারায়ণের পথে।

*

বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে।

অসিত ও ইন্দিরা গ্রীষ্মের ছুটীতে কলকাতা থেকে এসেছে দার্জ্জিলিঙ্। একদিন পাহাড়ে বেড়াতে গেছে দু'জনে। অদূরে আলথাল্লা ও গেরুয়া পাগ্‌ড়ি পরা এক সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ—আশ্চর্য্য এ যে অনিল! দেখ্‌তে দেখ্‌তে সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, প্রত্যালিঙ্গন ও গল্পের মধ্যে অসিত-অনিল মসগুল হয়ে পড়্‌ল।

অনিল সন্ন্যাসী, নাম তাঁর কৃপানন্দ। অসিত সংসারী, পুত্র কন্যার পিতা, বিদ্বজ্জনের কাছে খ্যাতি প্রতিপত্তিশীল অধ্যাপক।

ইন্দিরার অতিথি আজ সন্ন্যাসী। সে নিজে রান্না করেছে; খাবার ঘরের নতুন সজ্জা রচনা করে গালিচার আসন পেতে দিয়েছে; পাথরের থালা-বাটিতে নিজে পরিবেশন করবে।

কৃপানন্দ টিপ্পনি করলেন, 'খুব দিশি ষ্টাইলে আয়োজন দেখ্‌ছি!'

ইন্দিরা বল্লে, 'যখন যেমন, তখন তেমন।'

খেতে বসে অসিত বল্লে, 'ভাই অনিল, তুমি তো সন্ন্যাসী হলে, আধ্যাত্ম জগতে তোমার কতো না অনুভূতি হয়েছে, আর আমি—"

ইন্দিরা বল্লে, 'স্বামিজী, আমার তো ভয় হয় কবে উনিও আপনার মতন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যান। তাঁরও যোগী হবার আজন্ম সাধ এখনো যায়নি। আমি তো তাঁকে বরাবোর মনে করিয়ে দিই, 'স্বধর্ম্মে নিধনও' শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ।'

কৃপানন্দ বল্লেন, 'এইতো সহধর্ম্মিণীর কাজ, বৌদি।'

অসিত বয়সে অনিলের বড়ো, তাই ইন্দিরাকে 'বৌদি' বলে ডাকলে।

ইন্দিরা হেসে স্বামীর প্রতি জবাব দিলে, 'ওগো শুনছ, সন্ন্যাসীরাও গৃহস্থ ধর্ম্ম মানেন। আমায় বৌদি বলে ডাকলেন। শুনছ, না, যোগী হবার কথা ভাব্‌ছ?'

অনিল ও অসিত মৃদু হাস্‌ল।

অসিত বল্লে, 'অনিল! তোমাদের সমাজ-ধর্ম্ম মানা এম্‌নি-এম্‌নি। বন্ধনের গরজ তো নেই। আমাদের ভাই আলাদা। এই দেখো না সিতাংশু দুনিয়াকে গ্রাহ্য না করে বদ্রীনারায়ণ চলে গেলো। আমি কি তাই পারব?'

ইন্দিরা কাট্‌লে টিপ্পনী, 'তোমার কী দরকার?'

অনিল বল্লে, 'বৌদি তো সত্যিই বলছেন। অসিত, তুই ভাই পণ্ডিত হয়ে এই বল্লি? পরমেশ্বরের ইচ্ছাই যে তোকে সংসারী করেছে? তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুই চলবি? তোর পক্ষে ভোগই হচ্ছে ঈশ্বরের বিধান।'

অসিত বল্লে, 'যে নিতান্ত ভোগবন্ধনে শৃঙ্খলিত তারই জন্যে এ উপদেশ। তাই নয়? ভোগ প্রেয় ত্যাগ শ্রেয় নয়?

অনিল হেসে বল্লে, 'তোর জন্যে আরেকটা পথ তো

রয়েছে: ভোগ করবি বাইরে, অন্তরে করবি ত্যাগ।'

ইন্দিরা স্বামীকে লক্ষ্য করে বল্লে, 'এইবার হেরেছো, স্বীকার করো।...না তা করবেন কেন?...এই যে চুপ করে আছো। তুমি হেরেছো!'

অনিলকে বল্লে, 'আপনাকে একটু পায়েস দি?'

অনিল বল্লে, 'বৌদি সন্ন্যাসীকে অতো লোভে ফেলছেন কেন? জানেন তো আমাদের পথ হচ্ছে—ত্যাগে অমৃতত্ব লাভ।'

ইন্দিরা পণ্ডিতের বৌ পণ্ডিতানী।

বল্লে, 'তাই বলে আমার পায়েসামৃত তুচ্ছ হলো?'

আরেকটু মিষ্টান্ন পরিবেশন করে বল্লে, 'আচ্ছা স্বামিজী! আমার কি হবে? আপনাদের দু'জনেরই না হয় পথ ঠিক হয়ে আছে। আমার বেলাই কি কানাগলি?'

'আপনি অসিতদার সহধর্ম্মিনী। তাঁর হবে মুক্তি, তার আপনার হবে না? এও একটা কথা?'

'ওগো শুনছ, আমারও হবে।' অনিলকে পুনঃ প্রশ্ন করল, 'সকলের হবে?'

অনিল গম্ভীর হয়ে বল্লে, 'তা বৈকি। আত্মোপলব্ধি তো আমাদের তিনজনের এক-চেটে নয়; ইচ্ছে করে একে ঠেকিয়ে রাখতে কারু সাধ্য নেই।'

খাওয়া-শেষে বিশ্রাম চলছে।

কথার জের টেনে অনিল বিবেকানন্দের "সখার প্রতি" থেকে একটি লাইন আবৃত্তি করলে

'ত্যাগ ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন।'

অনিল বল্লে, 'অসিত, তুই একটু আবৃত্তি কর।'

অসিত করল আবৃত্তি তাঁর নিজের লেখা একটি কবিতা থেকে:

রবির কিরণ নিতুই আঁখিতে
তবু সৌখীন অন্ধত্ব',
প্রাণ-উচ্ছ্বাস প্রতিটি অঙ্গে
তবু রহে হায় পঙ্গুতা,
একী খেলা—
আপনারে লয়ে আপনার অবহেলা!

মাঝখান থেকে ইন্দিরা কথা কেড়ে নিয়ে বল্লে, 'বাকি-টুকুন আমি পূরণ করছি।' বলেই কোমল কণ্ঠে সুর করে কবিতাটি শেষ করলে:

নিজেরে লুকায়ে খুঁজি পুনঃ নিজে
কৌতুক ছাড়ি' বঞ্চনা,
আছে যে হারায়ে মর্ম্মের মাঝে
তার লাগি পাই লাঞ্ছনা,
একি বৃথা
সৃষ্টির ভুলে নাই বুঝি অন্যথা!

তারপর অনেক্ষণ ধরে অসিতের সেতার বাজনা চল্ল;—ঠিক স্বপ্নের পুরোনো দিনের মতন।

শ্রীসুশীলকুমার দেব

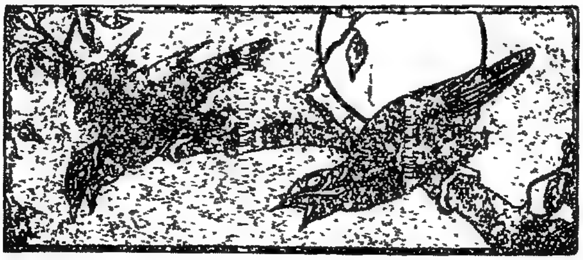

পাঁজির ভুল

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৃষ্টির যখন দাঁত ওঠেনি তখন থেকেই মুনি ঋষিরা ব'লে আসছেন যে মানবদেহটা কিছুই নয়। এ মাটী। মাটীর দেহ মাটীতেই মিশবে। বাইবেলেও আছে "Dust thou art to dust thou returnest." এখনও অনেকে এ বুলি আওড়ান। তবে কিনা এখন বিজ্ঞানের রাজত্ব। তাই শুধু ও মতটা এখন আর চালকলা বাঁধতে পারছে না। ওর একটা পরীক্ষিত সত্যতা চাই; কেননা, বিজ্ঞান বড় একগুঁয়ে, বড় একরোখা। ও পরের মুখে ঝাল খায় না। তাই ও মানব-দেহকে রাসায়নিক ভাবে বিশ্লেষণ করেছে। তাতে যে যে জিনিষ পেয়েছে, তার একটা হিসেব দিই। বিজ্ঞানের খতিয়ান দেখেই এটা তুলে দিচ্ছি।

মানব শরীরে আছে "দশ গ্যালন জল, সাতখানা খুব বড় বড় সাবান হওয়ার মত চর্ব্বি, ন'হাজার লেড্‌পেন্সিল হওয়ার মত কার্ব্বন, ২২০০ খানা দেশ্‌লাইয়ের কাঠি হওয়ার মত ফস্‌ফরাস, মাঝারি ধরণের একটা পেরেক গড়বার মত লোহা, ছোট একটা মুরগীর ঘর চুণকাম করবার মত চুণ, সামান্য কিছু ম্যাগনেসিয়াম আর সালফার।"

এই হিসেবটা অবশ্য সাধারণ সূত্র। বিশেষ বিশেষ স্থলে এর কিছু অদলবদল হতে পারে। এটা দেখে একটা কথা মনে পড়ে। আগে মৃত মানবশরীরের দাম যে চৌদ্দসিকা ঠিক হয়েছিল, আজকাল বোধহয় আর কেউ তা স্বীকার করতে চাইবে না। এ সব জিনিষ যে আহার থেকেই আসে তার ভুল নেই; কিন্তু গাছ থেকেই আমরা এই আহার পাই; এটাও খুব সত্যি। তবু যাঁদের সন্দেহ, তাঁরা দয়া ক'রে একবার গাছেদের ডিনার টেবিলে বসে যান। অবশ্য এতে জাতও যাবে না, আর প্রায়শ্চিত্তও করতে হবে না; কারণ, গাছেদের মধ্যে শতকরা প্রায় সাতানব্বই জন নিরামিষভোজী। আর তাদের মধ্যে যারা নিরামিষ খায় তাদের আহারের প্রধান উপকরণ হচ্ছে কার্ব্বন-দ্বি-অম্লজান (carbon dioxide)। বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসটা প্রচুর। গাছের পাতায় সূর্য্যকিরণ পড়লে পাতাগুলো তাদের ক্লোরোফিলের সাহায্যে ঐ গ্যাস-টাকে রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে ফেলে। তারপর গাছ কার্ব্বনটা খেয়ে নেয়। আর দয়া ক'রে অম্লজানটা মানুষের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এই কার্ব্বনটা গাছের শিরা উপশিরা দিয়ে যেতে যেতে অনেক অর্গ্যানিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা সবুজ রঙের রসের সৃষ্টি করে। এটাকে গাছের রক্ত বলতে পারা যায়। এই থেকে মানুষেরও রক্ত আসে। তাই বলা যায়, মানুষ গাছপালা খেয়েই বেঁচে থাকে। আবার অনেকে মাংস খায়। তাহলে কি হয়। তবু তাদের গাছপালা খাওয়াই হয়; কারণ, ভক্ষ্য জন্তুর মাংস ঐ জন্তুর দ্বারা ভক্ষিত গাছপালার চরম পরিণতি ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই বলা যায় আমাদের খাদ্য জোগানার কাজটা গাছপালাদের একচেটে বা মনোপলি। এই খাদ্য কি ক'রে আমাদের মেদ, মজ্জা ও অস্থিতে পরিণত হয় এবার তাই বলা হবে।

কিছু খেলেই সেটা পরিপাক হ'তে আরম্ভ হয়। পরিপাক হওয়ার জন্যে একটা যন্ত্র আছে। এর নাম পরিপাক যন্ত্র। মানব শরীরের ভিতরে এর অবস্থান। এটা প্রায় কুড়ি হাত লম্বা। কারখানার মতই এর সেকসান (Section) বা বিভাগ আছে। এরা সংখ্যায় পাঁচটী; যথা—

(১) মুখ গহ্বর,
(২) অন্ননলী,
(৩) পাকস্থলী,
(৪) ক্ষুদ্র অন্ত্র, আর
(৫) বৃহৎ অন্ত্র।

এক এক বিভাগে অনেক কর্ম্মচারীও খাটে; তবে কাউকে

স্যাবাথ (Sabbath) ভোগ করতে হয় না। খাদ্যকে দেহ গঠনের কাজে লাগতে হলে, ঐ পাঁচটী বিভাগেই ধরা দিতে হয়। প্রথমেই তাকে পড়তে হয় মুখগহ্বরের খপ্পরে। এখানে দাঁত ত তাকে চিবিয়ে মারে। পরে লূতাতন্তুর আঠার মত লালারসেও জড়িয়ে যায়। তখন ঐ চর্ব্বিত খাদ্য অন্ননলীর আশ্রয়ে আসে। অন্ননলীর স্বভাব ভাল। সে এদের পাকস্থলীতে পৌঁছে দেয়। পাকস্থলীর মেজাজ ভারী চড়া। এখানে সে ঐ গিলিত খাদ্যকে পেরিষ্টালটিক মোসানের চাকায় জুড়ে দেয়। এখানে আনীত এই খাদ্য খানিকটা রূপান্তরিত হয়ে ক্ষুদ্র অন্ত্রে চলে যায়। এখানে ডিওডিনাম জেজুনাম, ও ইলিয়াম এই তিনটীর এলাকায় ঐ খাদ্যকে অনেক বেগ পেতে হয়। তার মানে ওখানে ঐ খাদ্যকে পাঁচ পাঁচটী ট্রায়াল বাই অর্ডিয়াল অফ্ ফায়ার (Trial by ordeal of fire) অর্থাৎ অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়। সোজা কথায় বলতে হ'লে ঐ ডিওডিনাম, জেজুনম ও ইলিয়াম পিত্তরস, ক্লোমরস, গ্যাষ্ট্রিকরস ও অন্ত্ররস এই চারটে রসের আমদানি করে, আর লালারস ত আগে থেকে হাজির আছে। এই পাঁচটী রসই আগুণের কাজ করে তাই এদের পঞ্চাগ্নি বলে। ঐ অগ্নি পরীক্ষার শেষে ঐ গিলিত খাদ্যের যে অবস্থা ঘটে তাকে কাইল (chyle) বলে। এর রং সাদা। ঐ গিলিত খাদ্যের অসার অংশ এবার বৃহদন্ত্রে মল হয়ে চলে যায়। আর ক্ষুদ্র অন্ত্রের যে অসংখ্য কোমল গুটিরা আছে তারা ঐ কাইলকে চুষে নেয়। তখন শরীরস্থ অর্গ্যানিক অ্যাসিডের সাহায্যে ওর রং সবুজ হয়ে যায়। তামার (copperএর) উপর গন্ধকদ্রাবক (Sulphuric acid) পড়লে যেমন একটা সবুজ রংয়ের ছোট ছোট গুটিকা অর্থাৎ Globules পাওয়া যায়, তেমনিভাবে আমাদের শরীরের পূর্ব্বোক্ত অপরিষ্কৃত রক্তে সবুজ কণা সৃষ্ট হয়। বলতে গেলে ঐ সবুজ কণার সৃষ্টিপ্রকরণটা বিজ্ঞানের দানা বাঁধার (crystallisationএর) অনুরূপ। ঐ সবুজ রঙের জিনিষটাই আমাদের অপরিষ্কৃত রক্ত। এই রক্ত আমাদের heartএ চলে যায়। সেখানে আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে যে অম্লজান নিই তা রক্তকে পরিষ্কার করে দেয়। এই পরিষ্কার রক্ত আমাদের শরীরের শিরা উপশিরায় চলে যায়। শেষে এই রস থেকে রক্ত, রক্ত থেকে মেদ, মেদ থেকে মজ্জা, আর মজ্জা থেকে অস্থি হয়। এই রকমে আমাদের শরীর গঠন হয়। নিয়তই এই ব্যাপার চলছে। ঐ রক্ত থেকে কতদিনে মেদ মজ্জাদির উদ্ভব হয় এবার তার আলোচনা দরকার।

এই যে রক্তের কথা বলা হ'ল এ মাংসে পরিণত হ'তে এক চান্দ্রমাস বা (৩০) ত্রিশ দিন লাগে। এই রক্ত মাংস আমাদের বাবার দেওয়া বলে এক চান্দ্রমাসে বা আমাদের (৩০) ত্রিশ দিনে এক পিতৃদিন হয়। কৃষ্ণপক্ষ আর শুক্ল-পক্ষ এই দু'টীতে এক চান্দ্রমাস হয়। প্রথমটী কাজের জন্যে আর দ্বিতীয়টী বিশ্রামের জন্যে। মৌমাছিদের কার্য্যকলাপ দেখলেই এটা বেশ বোঝা যায় ; কেননা, এরা প্রকৃতির নিয়ম কানুনগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। যাক, এখন আসল কথা হচ্ছে প্রতিদিনই আমাদের ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হ'য়ে হ'য়ে এক চান্দ্রমাসে বা আমাদের (৩০) ত্রিশ দিনে, ঐ ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ রসে, তারপর এই রস রক্তে, তারপর এই রক্ত মাংসে পরিণত হয়। বরাবর এই রকম কাজ চলতে চলতে (১২) বারটী চান্দ্রমাসে বা আমাদের (৩০ × ১২) বা (৩৬০ তিন শ' ষাট দিনে আমাদের ধমনী, শিরা ও স্নায়ুতে একটা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। আমাদের ধমনী শিরা ও স্নায়ুতে এই নূতন পরিবর্ত্তনের জন্যে আমাদের দশ ইন্দ্রিয় আর পঞ্চ-প্রাণও একরকম নূতন হয়ে যায়। এই দশ ইন্দ্রিয় আর পঞ্চ-প্রাণ ঈশ্বরের দান, আর এই দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ দৈব দেহ। তাই (১২) বার চান্দ্রমাসে বা আমাদের (৩৬০) তিন শ' ষাট দিনে এই দৈব দেহ পরিবর্ত্তন ঘটে বলে বার চান্দ্রমাসে বা আমাদের (৩৬০) তিন শ' ষাট দিনে এক দৈব দিন হয়। এই দৈব দিনের দু'টী ভাগ—একটি উত্তরায়ণ (Winter solstice) অপরটী দক্ষিণায়ন (Summer solstice)। এই উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন, আর দক্ষিণায়ন তাঁদের রাত্রি। মনু বলেন :—

'পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ।
কর্ম্মচেষ্টাস্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী ॥ ৬৬
দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নং ॥" ৬৭

কুল্লুক এই শ্লোক দু'টীর ব্যাখ্যা করেছেন এই রকম :—

"পিত্রে ইতি। মানুষাণাং মাসঃ পিতৃনামহোরাত্রে ভবতঃ। তত্র পক্ষদ্বয়েন বিভাগঃ। কর্ম্মানুষ্ঠানায় পূর্ব্বপক্ষ ইহ স্বাপার্থং শুক্লপক্ষো রাত্রিঃ ॥ ৬৬ ॥ দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষমিতি। মানুষাণাং বর্ষং দেবানামহঃ। তত্র পায়েন দৈবকর্ম্মানামনুষ্ঠানং দক্ষিণায়ন্ত রাত্রিঃ।' ৬৭ (প্রথম অধ্যায়।)

কুল্লুকের এই ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম এই যে আমাদের (৩০) ত্রিশ দিনে একটী পিতৃদিন, আর আমাদের এক বৎসরে বা তিন শ' ষাট দিনে একটী দৈব দিন হয়। আমাদের দিনকে মাপকাঠি (unit) ধরেই কুল্লুক বা মনু উভয়েই পিতৃদিন আর দৈবদিন হিসাব করেছেন। এতে কোন রকম সংশয়ের সুযোগ নেই ; কারণ কুল্লুক খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন "মানুষাণাং মাসঃ পিতৃনামহোরাত্রে ভবতঃ।" (মানবগণের অর্থাৎ আমাদের একটী মাসে পিতৃপুরুষদের দিনরাত হয়)। তিনি আরও লিখেছেন "মানুষাণাং বর্ষং দেবানাং রাত্রিদিনে ভবতঃ।" (মানবগণের অর্থাৎ আমাদের একটী বৎসরে বা (৩৬০) তিন শ' ষাট দিনে দেবতাদের একদিন। তা হ'লে আমাদের (৩০) ত্রিশ বৎসরে দেবতাদের একমাস। কাজেই আমাদের (৩০×১২) বা (৩৬০) তিন শ' ষাট বৎসরে দেবতাদের এক বৎসর। এই সঙ্গে আমাদের আরও বুঝতে হবে যে, মনুর প্রথম অধ্যায়ের (৬৬ম ও ৬৭ম) ষটষষ্টিতম ও সপ্তষষ্টিতম শ্লোকে আমাদের বৎসরকে মাপকাঠি করে "পিতৃদিন" আর "দৈবদিন" গণনা করে মনু এই শ্লোকদুটীতে যে সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন, এদের ঠিক পরবর্ত্তী চারটী শ্লোকেও ঐ একই সম্বন্ধ রেখে অর্থাৎ আমাদের বৎসরকে মাপকাঠি ধরে মনু যুগকাল নির্ণয় করেছেন। এ বিষয়ে অন্য কোন রকম ধারণা করবার কোনই হেতু নেই বা থাকতেই পারে না। মনুর যুগকাল বর্ণনা এইরূপ :—

''চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রানি বর্ষানান্তু কৃতং যুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ৬৯
ইতরেষু স সন্ধ্যেষু স সন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রানি শতানি চ ॥ ৭০
যদেতৎ পরিসংখ্যাতমাদাদেব চতুর্য্যুগং।
এতদ্বাদশ সাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে ॥ ৭১
দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসংখ্যয়াঃ।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্জেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ ॥ ৭২

মনুর এই শ্লোক গুলির সারার্থ এই যে, সত্যযুগের পরিমাণ (৪০০০) চার হাজার বৎসর, এর সন্ধ্যা আর সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে (৪০০) চার শ' বৎসর। তাহলে সত্যযুগের পরিমাণ আমাদের (৪০০০+৪০০+৪০০) বা ৪৮০০ চার হাজার আট শ' বৎসর। আর তিনটী যুগকাল হিসাব করবার সময়, যুগের পরিমাণ বৎসরের সঙ্গে তার সন্ধ্যা আর সন্ধ্যাংশের পরিমিত বৎসরগুলি যোগ করতে হবে। আর এক কথা, যুগে যত সহস্র বৎসর থাকবে, তার সন্ধ্যা আর সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে তত শত বৎসর হবে, আর প্রত্যেকে শত আর সহস্রে এক করে কম হবে। কাজেই ত্রেতার পরিমাণ (ত্রেতাযুগবর্ষ ৩০০০ তিন হাজার+তার সন্ধ্যা ৩০০ তিন শ' +তার সন্ধ্যাংশ ৩০০ তিন শ' বৎসর) বা আমাদের ৩৬০০ তিন হাজার ছ শ' বৎসর। দ্বাপরের পরিমাণ (দ্বাপর যুগবর্ষ ২০০০ দু হাজার+তার সন্ধ্যা ২০০ দুশ'+তার সন্ধ্যাংশ ২০০ দুশ' বৎসর) বা আমাদের ২৪০০ দু হাজার চার শ' বৎসর। কলির পরিমাণ (কলিযুগবর্ষ ১০০০ একহাজার +তার সন্ধ্যা ১০০ এক শ'+তার সন্ধ্যাংশ ১০০ এক শ' বৎসর) বা আমাদের ১২০০ বার শ' বৎসর। এই চার যুগের পরিমাণ (৪৮০০ চার হাজার আট শ'+৩৬০০ তিন হাজার ছ শ'+২৪০০ দু হাজার চার শ'+১২০০ একহাজার দু শ') বা আমাদের ১২০০০ বার হাজার বৎসর। এই আমাদের ১২০০০ বার হাজার বৎসরে এক দৈবযুগ। এই রকম এক হাজার দৈবযুগে অর্থাৎ (১২০০০×১০০০) বা আমাদের ১,২০,০০,০০০ এক কোটী কুড়ি লক্ষ বৎসরে ব্রহ্মার একদিন, আর তাঁর রাত্রিও আমাদের ১,২০,০০,০০০ এক কোটী কুড়ি লক্ষ বৎসরে।

শ্রীমৎ কুল্লুক ভট্ট ঐ চারিটী শ্লোকের টীকা লিখেছেন। তাঁর টীকা অনুসারে সত্যযুগের পরিমাণ ৪০০০ চার হাজার দৈববৎসর। আমরা আগেই পেয়েছি যে আমাদের ৩৬০ তিন শ' ষাট বৎসরে এক দৈব বৎসর। তাহলে কুল্লুক মতে সত্যযুগের পরিমাণ (৪০০০ চার হাজার দৈববৎসর বা আমাদের ৪০০০×৩৬০ বা ১৪,৪০,০০০ চোদ্দ লক্ষ, চল্লিশ হাজার বৎসর+তার সন্ধ্যা ৪০০ চার শ' দৈববৎসর বা আমাদের ৪০০×৩৬০ বা ১,৪৪,০০০ একলক্ষ, চুয়াল্লিশ হাজার বৎসর

+তার সন্ধ্যাংশ ৪০০ চার শ' দৈববৎসর বা আমাদের ৪০০×৩৬০ বা ১,৪৪,০০০ একলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার বৎসর) বা ১৭,২৮,০০০ সতের লক্ষ, আটাশ হাজার আমাদের বৎসর। আমাদের বৎসর না ধরে মাত্র দৈববৎসর অনুসারে হিসাব ক'রে তিনি ত্রেতার পরিমাণ করেছেন ১,২৯,৬০০ একলক্ষ, উনত্রিশ হাজার, ছ শ' আমাদের বৎসর। দ্বাপরের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ আট লক্ষ, চৌষট্টি হাজার আমাদের বৎসর আর কলিযুগের পরিমাণ করেছেন ৪,৩২,০০০ চার লক্ষ বত্রিশ হাজার আমাদের বৎসর। পঞ্জিকাকারেরা কুল্লুকের এই টীকার উপর নির্ভর ক'রেই পাঁজিতে যুগকালের হিসাব দিয়েছেন। মনু তাঁর সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৬৬ম ও ৬৭ম ষটষষ্টিতম ও সপ্তষষ্টিতম শ্লোকে যে সম্বন্ধ রেখেছেন তাঁর ঐ অধ্যায়ের ৬৯ম হইতে ৭২ম উনষষ্টিতম হইতে দ্বিসপ্ততিতম শ্লোকেও সেই সম্বন্ধ রেখেছেন। এই রকম ধারণাই সঙ্গত ও ন্যায্য। আর কুল্লুক মনুর প্রথম অধ্যায়ের ৬৬ম ও ৬৭ম ষটষষ্টিতম ও সপ্তষষ্টিতম শ্লোকে যে সম্বন্ধ রেখে ব্যাখ্যা করেছেন, ৬৯ম হইতে ৭২ম উনষষ্টিতম হইতে দ্বিসপ্ততিতম শ্লোকে সে সম্বন্ধ উল্টে দিয়েছেন। তাই কুল্লুকের এই শ্লোক চারিটীর ব্যাখ্যায় সত্যের ছোঁয়াচ নেই বলেই মনে হয়। যুগকাল নির্ণয় সূচক শ্লোক চারটীর প্রথমটীর কুল্লুক কৃত টীকা এইরূপ :—

"চত্বারি বর্ষ সহস্রানি কৃতযুগং কালং মন্বাদয়ো বদন্তি। তস্য তাবদ্বর্ষ শতানি সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ভবতি। যুগস্য পূর্ব্বা সন্ধ্যা, উত্তরশ্চ সন্ধ্যাংশঃ। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে। তৎ প্রমাণৈঃ শতৈঃ সন্ধ্যা পূর্ব্বা অত্রাভিধীয়তে। সন্ধ্যাংশকশ্চ তত্তুল্যা যুগস্থানন্তরো হি যঃ। সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশয়োরন্তর্বর্ষঃ কালো মুনি সত্তম। যুগাখ্যঃ স তু বিজ্ঞেয় কৃত ত্রেতাদিসংজ্ঞকঃ। বর্ষসংখ্যা চেয়ং দিব্যমানেন তসৈবান্তর প্রকৃতত্বাৎ। দিব্যৈর্ব্বর্ষ সহস্রস্তু কৃত ত্রেতাদি সংজ্ঞিতম্। চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্বিভাগং নিবোধ মে। ইতি বিষ্ণুপুরাণ বচনাচ্চ।৬৯।।"

আমরা আগেই দেখেছি, কুল্লুক (৬৬ম আর ৬৭ম) ষটষষ্টিতম আর সপ্তসষ্টিতম শ্লোকের টীকায় পিতৃদিন আর দৈবদিন হিসাব করেছেন আমাদের বৎসরকে মাপকাঠি (unit) ধরে। ঠিক তার পরবর্ত্তী শ্লোক চারটীতে যুগকাল নির্ণয়ের সময়ও আমাদের বৎসরকে মাপকাঠি (unit) ধরাই নিতন্ত সঙ্গত। তবেই শ্লোকগুলি পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়। যাঁরা লেখক তাঁরা এই নিয়ম মেনেই চলেন। কিন্তু কুল্লুক যুগকাল নির্দ্ধারণের সময় সুর বদলে দিলেন। তিনি যেন খেই হারিয়ে ফেলেছেন; কেননা, পিতৃদিন নির্দ্দেশের সময় তিনি টীকা লিখলেন "মানুষানাং মাসঃ পিতৃণামহোরাত্রে ভবতঃ"; আবার যুগকাল নির্ণয়ের সময় শ্লোকগুলির পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে তিনি হঠাৎ লিখলেন "বর্ষসংখ্যা চেয়ং দিব্যমানেন তস্যৈবান্তর প্রকৃতত্বাৎ।" অর্থাৎ শ্লোকগুলির অন্তর্গত অর্থ অনুসারে দৈববর্ষকে মাপকাঠি ধরে যুগকাল হিসাব করতে হবে। এই দৈববর্ষকে ইউনিট ধরে যুগকাল নির্ণয় করলে ঠিক হবে কি না, এ বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহও হয়েছিল। তাই তাঁর উক্তি সমর্থন করবার জন্যে তিনি বিষ্ণু-পুরাণের আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু পুরাণ প্রক্ষিপ্তে ভরা। তা ছাড়া, আমরা না হয় মানি যে কর্ণের এক একাঘাতিনী অস্ত্রের মত পুরাণ তার প্রতিপক্ষকুল নির্ম্মূল করিতে পারে, কিন্তু সত্য যে অশ্বত্থামাদির ন্যায় অমর। এর কাছে সকলে নতশির। যা নয় তা হওয়ান একদম অসম্ভব। টাকায় আনায় কোন জিনিষের একাংশের দাম কযে তার বাকী অংশটার দাম পাউণ্ড সিলিং হিসাবে কষলে চলে কি? এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। আমাদের বৎসরকে ইউনিট ধরে পিতৃদিন আর দৈবদিন নির্দ্দেশ করতে করতে হঠাৎ দৈববর্ষকে ইউনিট ধরে যুগকাল নির্ণয় করা যেমন অসঙ্গত, তেমন অন্যায়। এ যেন পুরাণ পাঠের সঙ্কল্প করে পাঁচালি পাঠ। কুল্লুকের এক্‌স্‌রে (X'ray) চক্ষুতে এই সামান্য সত্যটুকু এড়িয়ে গেল কি করে তা ভাববার কথা। যাই হোক এতে কুল্লুকের অসীম জ্ঞান সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে ধরা পড়ে গেছে; কিন্তু বাস্তবিক এরকম হওয়া উচিত ছিল না। যাঁর কথায় লোকে ঘুরে ফিরে, চারদিক দেখেই তাঁর মত জাহির করা উচিত ছিল। যুগকাল জ্ঞাপক শ্লোকগুলি টীকায় খাদ মিশিয়ে কুল্লুক এক মহাসত্যের ভ্রূণহত্যা করেছেন নিশ্চয়। তাঁর ভুলের জের এখনও চলে আসছে। আর এক কথা, দৈববর্ষকে ইউনিট ধরে যুগকাল নির্ণয় করতে গিয়ে কুল্লুক যে মহাভুল করেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারতের বনপর্ব্বে ১৮৮ একশ' অষ্টাশি

অধ্যায়ে "মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ে"। এখানে ভগবান্ মার্কণ্ডেয় বলছেন :—

"চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রানি বর্ষাণাং তৎ কৃতং যুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্॥
ত্রীনি বর্ষ সহস্রানি ত্রেতাযুগমিহোচ্যতে।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্॥
তথা বর্ষ সহস্রে দ্বে দ্বাপরং পরিমাণতঃ।
অস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্॥
সহস্রমেকাং বর্ষাণাং তথা কলিযুগং স্মৃতং।
তস্য বর্ষ শতং সন্ধিঃ সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্॥"

মার্কণ্ডেয় মুনির ঠিক এই সুর আমরা মনুতেও শুনেছি। মনুর যুগকাল বর্ণনার সঙ্গে মার্কণ্ডেয় মুনির এই বর্ণনার, বলতে গেলে অক্ষরে অক্ষরে মিল। এই উক্তির মধ্যে কোথাও দৈববর্ষের নাম গন্ধ নেই। মানববর্ষকেই মাপকাঠি ধরে যে মুনিপ্রবর যুগকাল নির্ণয় করেছেন তার স্পষ্ট উল্লেখও এখানে নেই। অথচ মানববর্ষ হিসাবে ঐ যুগকাল নির্ণিত হয়েছে বল্লেও আপত্য করবারও কোন উপায় নেই। তবু এই সন্দেহ একেবারে দূর করবার জন্যে এই যুগকাল সম্বন্ধে ব্যাসদেব মহাভারতে যা বলেছেন তা উদ্ধৃত হল।

"যে তে রাত্র্যহনী পূর্ব্বে কীর্ত্তিতে জীবলৌকিকে।
তয়োঃ সংখ্যায় বর্ষাগ্রং ব্রাহ্মো বক্ষ্যামহক্ষরে॥
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রানি বর্ষাণাং তৎ কৃতং যুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥
ইতরেষু স সন্ধ্যেষু স সন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন হীয়ন্তে সহস্রানি শতানি চ॥
এতাং দ্বাদশ সাহস্রং যুগাখ্যং কবয়ো বিদুঃ।
সহস্র পরিবর্ত্তন্তদ্ ব্রাহ্মং দিবসমুচ্যতে॥

ব্যাসদেব নারায়ণ বিশেষ। আমরাও জানি "ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং"। ইনি এখানে স্পষ্টই বলেছেন যে "যে তে রাত্র্যহনী পূর্ব্বে কীর্ত্তিতে জীবলৌকিকে তয়োঃ সংখ্যায় ইত্যাদি" অর্থাৎ দিবারাত্রির বিষয় যা বলেছি সেই মানববর্ষকে ইউনিট ধরে ব্রহ্মার দিবারাত্রির পরিমাণ বলছি। বাকী শ্লোকগুলি অবিকল মনুর শ্লোক। ব্যাসদেবের এই উক্তিতে ব্রহ্মাদি ক্রিমি পর্য্যন্ত জীব শব্দবাচক। কাজেই, নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে মানববর্ষকে ইউনিট ধরেই যুগকাল নির্ণিত হয়েছে; কারণ, আমরা ব্যাসদেবের উক্তিতে বেশ বুঝতে পেরেছি যে জীব-লোকের অহোরাত্রির গণনায় ব্রহ্মার অহোরাত্রির পরিমাণ নির্ণিত হয়েছে। সুতরাং কুল্লুক মানববর্ষকে ইউনিট ধরে যুগকাল হিসাব না করে, দৈববর্ষকে মাপকাঠি ধরে যুগকাল হিসাব করে মহাভুল করেছেন। ভগবান ব্যাসদেবের প্রতি-নিধি মহর্ষি বৈশম্পায়ন হরিবংশের যেখানে মানববর্ষকে ইউনিট ধরে যুগকালের নির্ণয় হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন তা উদ্ধৃত করছি। মহাত্মা কুল্লুক যে ভুল করেছেন তা এতে বেশ বোঝা যাবে।

"অহোরাত্রং বিভজ্যন্তে মানবং লৌকিকং পরং।
তামুপাদায় গণনাং শৃণু সংখ্যামরিন্দম॥
চত্বার্য্যেব সহস্রানি বর্ষানান্তু কৃতং যুগং।
তাবৎ শতী ভবেৎ সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথা নৃপ॥
ত্রীনি বর্ষ সহস্রানি ত্রেতা স্যাৎ পরিমাণতঃ।
তস্যাশ্চ ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥
তথা বর্ষ সহস্রে দ্বে দ্বাপরং পরিকীর্ত্তিতং।
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চৈব তদ্বিধঃ॥
কলিবর্ষ সহস্রঞ্চ সংখ্যাতোঽত্র মনীষিভিঃ।
তস্যাপি শতিকা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ"॥

মহর্ষি বৈশম্পায়নের উক্তির প্রথম শ্লোকটীর ব্যাখ্যা জানলেই যথেষ্ট। এর বাকী শ্লোকগুলি মনুর বর্ণনার মত। এই প্রথম শ্লোকটীতে তিনি বলছেন, "হে অরিন্দম, মানববর্ষকে ইউনিট ধরেই যুগকালাদির গণনা করছি, শুন।" তা হলে, মানববর্ষকে ইউনিট ধরেই দৈববর্ষকে ইউনিট না ধরে যুগকাল নির্ণয় হয়েছে। এ বিষয়ে আর কোন রকম সন্দেহই নেই বা থাকতে পারে না। অনেকটা গড্ডালিকা প্রভাবেই আমাদের পঞ্জিকাকারেরা কুল্লুকের তথাকথিত ভুলের উপর নির্ভর করেই তাঁদের পঞ্জিকাতে চারযুগের পরিমাণ লিখে দিয়েছেন। আমরাও কেন যে পঞ্জিকাকারদের এই ভুল মেনে নিই, তার কারণ আমাদের বর্ত্তমান গুরুকুলের মারফত যা পেয়েছি, তাই বলছি।

মিষ্টার বাক্লের নাড়ীজ্ঞান টন্‌টনে। তিনি তাঁর সভ্যতার ইতিহাসে (History of civilizationএ) যা লিখেছেন,

তা লিখছেন সকল জাতের নাড়ী টিপে। পৃথিবীর সকল জাত সম্বন্ধে তাঁর যে অভিজ্ঞতা তা তিনি অক্ষরের স্বাক্ষরে পাকা করে গেছেন। আমাদের দিকে তাঁর নজর নেই এমন নয়। আমাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষ করেই বলেছেন। তাঁর মতে আমরা, অর্থাৎ ভারতবাসী, বড়ই ধর্ম্মপ্রবণ। তার মানে ধর্ম্মের নামে আমাদের চোখ জলেই ভরে আছে। তিনি এর কারণ দেখাতেও ছাড়েন নি। এখানে আছে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত হিমালয়, আর আছে গঙ্গা যমুনার মত বড় বড় নদ নদী, সাগর সমুদ্র, আর অনেক রকম গাছপালা। এগুলি দেখে দেখে আমাদের মনে ভক্তিরস টলমল করছে। তাই আমরা "ক" দেখে কেঁদে ফেলি, সাগর দেখে একে কৃষ্ণ বলে এব বুকে ঝাঁপাই। এই রকম করে করে আমরা সব শূন্য হয়ে শূন্যে ঘুরি। ফলে আমরা হয়ে থাকি "তৃণাদপি" হেয় অর্থাৎ আমাদের শিক্ষা বিশ্বের প্রণিপাত ক'রে থাক। কাজেই ছাই ভস্ম যাই হোক না কেন, তাতে যে কোন মুনি কি ঋষির সই দেওয়া ট্রেডমার্কা মেরে দিলে তা আমাদের বেশ চলে। এই যেমন, পানা পুকুরের পচাজলও আমরা অমৃত বলে পান করি যদি তায় নারায়ণের স্নান হয়। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। দেবকল্প কুন্তুকের লেখা টীকায় ভুল হ'তে পারে! এমনি আমরা অন্ধ বিশ্বাসী। মানুষ মাত্রেরই ভুল আছে, এ কথা কুন্তুকের সম্বন্ধেও যে খাটতে পারে তা যেন আমাদের ধারণায় আসে না; কেননা পাছে ধর্ম্মহানি হয়। বরং নামে বিশ্বাস আনিয়ে গোরাদের গোবাজের দলে ভিড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু কুন্তুকের ভুল হয়েছে এ কথা বিশ্বাস করান যায় না। কুন্তুকের উপর এই অগাধ বিশ্বাসের ফলেই তাঁর ভুল এতদিন বেশ চলে আসছে।

আর এক কথা, চন্দ্র সূর্য্যের সাক্ষ্য নিয়েও কুন্তুকের যে কত বড় ভুল হয়েছে তা দেখান যায়। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে প্রত্যেক বৎসর বিষুব সংক্রান্তি (Vernal equinox) একই সময়ে হয়নি। তার মানে প্রতি বৎসর বিষুব রেখার ছেদবিন্দু দুটী ভচক্রের একই জায়গায় দেখা যায় না। ঐ কাটাকাটি বৎসর বৎসর একটু পিছিয়ে হয়। আমাদের প্রাচ্য জ্যোতিষীগণের মত, যে মহাবিষুব সংক্রান্তি প্রতি বৎসর ভচক্রের ৫৪ বিকলা অংশ পথ সরে সরে যায়। কিন্তু আমরা জানি ভচক্রে বা অয়নমণ্ডলে বা সূর্য্যের গতি-পথে মাত্র ৩৬০ তিন শ ষাট অংশ অর্থাৎ (৩৬০ × ৬০ × ৬০) বা ১২,৯৬,০০০ বার লক্ষ, ছিয়ানব্বই হাজার বিকলা। কাজেই এই অয়নমণ্ডল বা ১২,৯৬,০০০ বার লক্ষ, ছিয়ানব্বই হাজার বিকলা অতিক্রম করতে সূর্য্যের (১২,৯৬,০০০ ÷ ৫৪) বা ২৪,০০০ চব্বিশ হাজার বৎসর লাগে। তা হলে এই ২৪,০০০ চব্বিশ হাজার বৎসরের মধ্যে চারযুগ হওয়া দরকার নিশ্চয়; কিন্তু পাঁজিতে আছে মাত্র কলিযুগের পরিমাণ ৪,৩২,০০০ চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর। এ কি করে হ'তে পারে! আমার মনে হয়, এ রকম বলা আর কলকাতার মধ্যে ভারতবর্ষ বলা একই। আমাদের মধ্যে কেহ যদি এরকম লেখেন, তা হলে সকলেই বলবেন যে ও সব ছোট কলমের আবিষ্কার। যাক, এখন কথা হচ্ছে—মানববর্ষকে মাপকাঠি করে অর্থাৎ ইউনিট ধরে মনুর যুগকাল জ্ঞাপক শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করা দরকার। কারণ সত্যের ভিত্ত থেকেই ঐ যুগকাল গণনার থামগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে। কাজেই ধ্রুব সত্য যে, সত্যযুগের পরিমাণ ৪৮০০ বৎসর, ত্রেতাযুগের ৩৬০০ বৎসর, দ্বাপরের ২৪০০ বৎসর আর কলির ১২০০ বৎসর।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আলতা-কাব্য

শ্রীসরোজকুমার মজুমদার

স্থলবসন্তপুরে রথের মেলা বসিয়াছিল। প্রতিবছরই এখানে রথের মেলা বসে—আশপাশের গাঁয়ের লোকের মন নূতন আনন্দে সঞ্জীবিত হইয়া ওঠে। বিপিন রথের দু'দিন আগে গিয়াছিল স্থলবসন্তপুরে। এই মরশুমে রথতলায় ছোট্ট একটি দোকান বসাইয়া চা, পান, বিড়ি, সোডা আর পুঁতি ও বেলোয়াড়ী চুড়ী বেচিয়া সে তিন চার মাসের জন্য পর্য্যাপ্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এবারও সে রথের মেলায় দোকান দিতে স্থলবসন্তপুরে গেছে—আসিতে তার দেরী আছে। রথের সাতদিন পরে উল্টারথ হইবে। উল্টারথ ভাঙিয়া যাইবে—স্থলবসন্তপুরে ভিন্‌-গাঁয়ের লোকের ভীড় পাত্‌লা হইবে—তারপর আসিবে বিপিন, তিন ক্রোশ দূরে তার নিজের গ্রামে।

বাড়ীতে একলা থাকিতে আলতার ভালো তো লাগেই না, সময়-সময় ভয়ও হয় খুবই। বিশেষ করিয়া, এই ঝড়-বাদলের সন্ধ্যায় থমথমে অন্ধকার রাতে তার মনে সাহসের শেষ কণাটি পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বিপিনকে প্রতিবারই আলতা অনুনয় করিয়া বলে, এবারও বলিয়াছিল,—একদিন নয়, দু'দিন নয়—দশ দিনের ধাক্কা! এক চাঁদে যাচ্ছো, ফিরবে সেই আরেক চাঁদে। এত-দিন আমি একা এই বাড়ী আগ্‌লে থাকি কি ক'রে বলতো? মনিষ্যি মাত্রেরই ভয় ডর ব'লে সামগ্রী আছে। কেন, আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে তোমার দুঃখটা কি শুনি, যে তুমি গর-রাজী হচ্ছো? কি, নেবে আমায় তোমার সঙ্গে? আমার এই ডুরে-পাড় শাড়ী আর ও-বছরের সেই কস্তা-পেড়ে শাড়ীটা পুঁটুলির মধ্যে ভরে নিই, কেমন?

বিপিন ধমক দিয়া বলিয়াছিল,—যাওয়ার সময় বিঘ্ন ঘটাসনি আলতা! বুঝিসনা কেন? সেখানে তোর যাওয়া চলে না—মেয়েমানুষের সেখানে যেতে নেই!

আলতা সেই যে মুখ বাঁকাইয়াছিল, আর সে দ্বিতীয়বার মুখ ফুটিয়া কিছু বলে নাই। পান চিবাইতে চিবাইতে এবং দুর্গানাম জপিতে জপিতে দাওয়ার থেকে যখন বিপিন উঠানে নামিয়া আসিল তখন আলতা চট্‌ করিয়া উঠিয়া আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া বিপিনের পায়ের কাছে গড় করিয়া খালি বলিয়াছিল,—বছর বছর কটা পেন্নামই শুধু তুমি আমার কাছ থেকে পাও—ভক্তি-ছেদ্দা পেতে হ'লে এতো হেনস্তা করতে নেই, জানো!

উত্তরে বিপিন ফিক্‌ করিয়া শুধু ঠোঁটের কোণে হাসিয়া-ছিল, যেমন করিয়া হাসে আলতা। তারপর তার ঐ অপ্রশস্ত বক্ষের সবটুকু ভালবাসা যে, ছেলেমানুষী করিয়া ঢালিয়া দিয়া-ছিল তার প্রিয়াকে, সে-কথা ভাবিতে দু'দিন আগেও লজ্জায় আলতার কান দুটি রাঙা হইয়া উঠিত। কিন্তু উল্টারথ শেষ হওয়ার চারদিন পরেও যখন ফিরিল না বিপিন, না-বা সে পাঠাইল কোন সংবাদ, তখন হইতে আলতা সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হইয়া গেছে। ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ বাঁকাইয়া নিজের মনেই আজ সারাদিনের মধ্যে না-হোক্‌-তো বিশবার বলিয়াছে,—ঢং! ঘেন্না-পিত্তির নাম-গন্ধ নেই!

আকাশ কালো করিয়া বিপুলাকার একটি মেঘ গাঁখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—খানিক বাদেই দুরন্ত বৃষ্টি নামিল। বিপিনের বাড়ীর খড়ের চালের অজস্র ফুটা দিয়া বৃষ্টির জল গড়াইয়া আসিয়া সারাটি মেঝে দিয়াছে ভাসাইয়া। আলতা তার তক্তাপোষের উপরে এককোণায় জড় দেহের মতো কোন রকমে গুটাইয়া বসিয়াছিল।

ঘেন্না! টাকাপয়সা নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলা হয়! ফি-বছরই দেবতার দুর্য্যোগে এই কষ্ট পোয়াতে হবে! কেন? কিসের জন্যে শুনি! রোজগার ত তুমি এদিক ওদিক করে কম করোনা—টাকাগুলো দিয়ে কি করা হয় শুনি! বিড়ি রে,

সিগারেট রে,—আবার গাঁজা রে, আফিম রে! ছোটলোক কোথাকার! ঘরের মনিষ্যিকে যে সুখ-সোয়াস্তি দিতে পারে না তার এতো নেশা করতে নেই। হ্যাঁ! কেন—দু'টো টাকা খরচ ক'রে তুমি ঘরটা মেরামত করাতে পারতে না বুঝি! তা পারবে কেন? তাহ'লে যে আলতার দুঃখু একটু কমবে! পারবে খালি "আলতারাণী, আলতারাণী" বলে আদিখ্যেতা করতে! ভর-বিষ্যুদ্‌বারে সোণা কেউ কখনো ঘরের বার করে? তোমার জন্যে আমি তাও করলাম। নথ্‌টা বিক্রী করলে তুমি ঘর সারাবে ব'লে, সে টাকাগুলো তিন তুড়িতে কোথায় উড়িয়ে দেওয়া হলো, শুনি!

রাগ হইলে আলতা উপোস করে—সারাদিন দাঁতে কিছু কাটেনা। আলতা স্থির করিল আজ রাত্রে সে কিছুই খাইবে না। 'সোয়ামী' যার ফুর্ত্তি করিয়া এ-গাঁ, ও-গাঁ করিয়া বেড়ায়, না খাইয়া সে মরিয়া গেলেই বা ক্ষতি কি! 'আয়েস' করিয়া তাই সে কাঁথা দিয়া সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া দেওয়ালের কোণ ঠাসিয়া বসিল।

কড়্‌-ড়্‌-ড়্‌, কড়াৎ! আলতার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। বসাকদের পুকুরপারের ঝাউগাছের উপরই বাজটা পড়িল হয়তো। এই ঘরের চালার উপরে পড়িল না কেন? আলতা যেমন করিয়া বসিয়া আছে ঠিক তেমনি করিয়াই বসিয়া থাকিত। আজ রাত্রেই হয়তো স্বলবসন্তপুর হইতে ফিরিয়া আসিত বিপিন—ঘরে ঢুকিয়া আলতার গায়ে আস্তে ঠেলা দিয়া যেই সে বলিতে যাইত 'কী ঘুম তোর আলতা, ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না' অমনি আলতার বজ্রাহত মৃত দেহ গড়াইয়া পড়িত নীচে, এই এখানটায়! কী মজাটাই না হইত তখন! বিপিন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিত নিশ্চয়ই "আলতা, আলতা—একী হলো—!"

আলতার তন্দ্রা যেন কে কাড়িয়া নিল। সত্যই তো সে এইমাত্র বিপিনের ডাক শুনিতে পাইল। চোখ রগড়াইয়া সোজা হইয়া বসিতেই স্পষ্ট তার কাণে আসিল সদর দরজায় ঘন ঘন কে যেন আঘাত করিতেছে।

যাক্! বাবুর তাহ'লে দয়া করে ফেরবার ফুরসৎ হয়েচে—ধন্যি!

তক্তাপোষ হইতে আলতা লাফাইয়া উঠিল। বিস্রস্ত শাড়ী গায়ে কোনরকমে জড়াইতে জড়াইতে সারা পিঠ ছড়ানো এলোচুল নাচাইয়া ঘর হইতে সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

'এসেচো বাঁদীকে উদ্ধার করতে!' বলিয়া দুয়ার খুলিবা-মাত্র যে অস্পষ্টমূর্ত্তি আলতার চোখে পড়িল, সে মূর্ত্তি যারই হোক না কেন, বিপিনের কখনই নয়। আতঙ্কে বিবর্ণ হইয়া আলতা দু'পা পিছাইয়া গেল, এবং চকিতে দরজায় দিল হুড়কা লাগাইয়া।

বাহিরের প্রাণীটির স্বর শোনা গেল,—ওকি! দোর বন্ধ করলে যে বড়ো। দেখছোনা ভিজে নেয়ে গেছি প্রায়! খোল গো মেয়ে, দরজাটা একটু খোলই না কেন! ভয় নেই—আমি পুরুষমানুষ নই।

আলতা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কপাট খুলিয়া দেয়। আগন্তুক ভিতরে প্রবেশ করিতে আলতা দেখে সে নারীই বটে। কিন্তু, মেয়েরাও যে ছাতি মাথায় দেয় আলতা তা' আজ প্রথম জানিল।

—ভিজছেন কেন, আসুন, ভেতরে আসুন! আলতা তাকে পথ দেখাইয়া তার শোবার ঘরে নিয়া আসে।

ঘরের মধ্যে মিটমিট করিয়া যে হারিকেনটি জ্বলিতেছিল তাহা উসকাইয়া দিয়া আলতা তার এই সান্ধ্য-অতিথিটিকে বেশ করিয়া দেখিয়া নিল, এবং যতোই সে মেয়েটিকে দেখিতে লাগিল ততই তার বিস্ময় ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

ছাতাতো মেয়েটি ব্যবহার করেই, আলতা তার পায়ে একজোড়া জুতাও দেখিতে পাইল। এ-জুতা পরিয়া মানুষে হাঁটে কি করিয়া—গোড়ালী এত উঁচু, পায়ে ব্যথা করে না? পরণে মেয়েটির কালো নক্সাপেড়ে শাড়ী—ফিন্‌ফিনে পাতলা, ফুঁ দিলেই যেন গলিয়া যাইবে। ভিন্‌গাঁয়ে বা রথের মেলায় যাইতে হইলে বিপিন যেমন সার্ট পরে, মেয়েটির গায়ে ঠিক তেমনি 'ফুল হাতা' সার্ট দেখিয়া আলতার যা' হাসি পাইল! আলতার হাসি পাইলে কী হইবে, প্রসাধনের প্রাচুর্য্য মেয়েটির বিশেষ নাই বাঁহাতের কব্জিতে ক'গাছি কাঁচের ও সোণার চুড়ী, আর ডান হাতে একটি মাত্র চুড়ী সোণার। গলায় বোধ হয় কাঁচেরই একটার মালা, আর দুই কাণে আলতার কাছে আশ্চর্য্যকররূপে লম্বা দুইটি দুল! বাঁহাতে

ছোট একটি চামড়ার ব্যাগ। বয়স তার যদিও পঞ্চাশের কাছাকাছি হইবে, তবুও সিঁথীতে তার সিঁদুর নাই—অথচ, চেহারা দেখিয়া বিধবা বলিয়াও তো বোধ হয় না। আলতা ভাবে—এ কে!

মেয়েটি নিজেই তক্তাপোষের একপাশে বসিয়া পড়িয়া বলে,—নন্দনগাছীতে প্রচার করতে গিয়েছিলাম। ফিরতে হয়ে গেল দেরী—এদিকে বৃষ্টির কাণ্ডটা একবার দেখ! আঃ, জামা কাপড় আর শুক্‌নো নেই কোথাও!

জানলা দিয়া বাহিরে হাত বাড়াইয়া আলতা বলে,—বিষ্টি তো ধ'রে এসেচে দেখচি।

—ধরেচে? ধরুক। মৃ—মা! পা-দুটো ব্যথায় কন্‌কন্ করচে! একটু জিরিয়ে নিই। তোমার সঙ্গে ভাব করি—কেমন? তোমার নামটি কি বলতো মেয়ে!

—আলতা! আলতার একটু লজ্জাই করে।

—বেশ! বেশ! খাসা নাম! মেয়েটি নড়িয়া বসিয়া বলে,—তোমার বর আছে তো? কোথায় সে? ও! রথ দেখতে গেছে বুঝি? দোকান দিয়েচে। বেশ, বেশ! এদিক ওদিক চাহিয়া আবার সে শুধায়,—তোমার বরের নামটি কি বাছা? ওহো! মাই লর্ড! তোমরা বুঝি আবার তোমাদের স্বামীর নাম নাও না! তোমরা হিঁদু তো? বেশ! বেশ! হিঁদুও যা, আমাদের ক্রিশ্চিয়ানও তাই।

···আপনারা খিরিস্তান? আলতা চমকাইয়া উঠিল, এবং তার অতিথির থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া নিয়া আর একটু দূরে সরিয়া বসিল।

মেয়েটি কিন্তু স্বচ্ছ হাসিয়াই জবাব দেয়,—হ্যাঁগো! কিন্তু দোষ কী তাতে? বলিয়া খপ্‌ করিয়া আলতার একটি হাত তার ডান হাত দিয়া ধরিয়া বলে,—এই দেখ, তোমার আর আমার হাত পাশাপাশি রয়েচে—দুটোতে কোন তফাৎ দেখতে পাচ্ছো কি যে একটা হাত হিঁদুর মেয়ের, অন্যটি ক্রিশ্চিয়ানের? না, পাচ্ছো না। আমরা সবাই মানুষ—প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভাই বা বোন। নয়? বলবে হয়তো আমরা অখাদ্য কুখাদ্য খাই। আমি বলবো, না। একজনের কাছে যে জিনিষ অখাদ্য অন্যের কাছে তা নয়। ধরোনা কেন—তোমাদের হিন্দুদের মধ্যেও তো কত রকমের লোকে কত-কিছুই খায়, আবার আরেক দলের হিঁদুরা হয়তো সে সব স্পর্শও করে না। তাইতো বলছিলুম, হিঁদুও যা, ক্রিশ্চিয়ানও তা, আবার মুসলমানও তাই। যেমন, খোদা, প্রভু আর ঈশ্বর! নামেই শুধু তিন, আসলে কিন্তু সবই তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাকে, আমাকে এবং—এবং ঐ বেড়ালটাকে।

স্ত্রীলোকটি বলিল সে এই অঞ্চলে আসিয়াছে প্রচার কার্য্য করিতে, অর্থাৎ পাপী যাদের আত্মা, তাদের সদুপদেশ দিতে, ধর্ম্মের দিকে সত্যের দিকে তাদের মন নিয়োজিত করাইতে, এবং পৃথিবীর যে-কোন দুইটি লোক যে পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ এবং ইহাই যে যিশুর বাণী এই বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত করিতে। চারিদিকের গ্রামে গ্রামে সে ঘুরিয়া বেড়াইবে আরও পাঁচ ছয় দিন, তারপর চলিয়া যাইবে কলিকাতায়। সে বলিল, নাম তার আইরিণ্ বিশ্বাস। এই নামে ডাকিতে কষ্ট হইলে আলতা যেন তাকে 'এণা' বা 'এণাদি' বলিয়াই ডাকে।

আরও অনেক গল্প করিয়া চলিয়া যাইবার সময় আইরিণ বলিল আলতাকে তার খুব ভাল লাগিয়াছে, আজকালকার দিনে নাকি আলতার মতো 'সরল' আর 'মিষ্টি' মেয়ে পাওয়া যায় না। সে আবার কাল পর্শুই আসিবে এখানে, আলতার সহিত গল্প করিতে।

উঠানে নামিয়া আইরিণ বলিল,—যাই বলো ভাই আলতা, তোমার বরের কিন্তু এ খুব অন্যায়! সোমত্ত বউকে একাটি বাড়ীতে রেখে নিজে পাখীর মতো উড়ে উড়ে বেড়ানো, ছিঃ! তোমাদের হিঁদুর বাড়ীর এই দোষটুকুন আর যাবে না। কেন গা—মেয়েরা কি খোলামকুচি নাকি, তাদের সুখ শান্তি থাকতে নেই? কী বলো?

সমবেদনা শুনিয়া আলতার চোখদুটি ছলছল করিয়া উঠে। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া আইরিণকে প্রণাম করিয়া বলে,···আপনি আসবেন দিদি আবার। ভগবান যে আমায় কত দুঃখ দিয়েছেন বলবো আপনাকে।

আইরিণ আলতার গালে সহসা একটি চুমা খাইয়া বলে,—ভগবানের দোষ দিতে নেই বাছা। যীশু কারো অনিষ্ট করেন না। বলো—আমেন্!

…এণাদি' প্রথম আসিয়াছিল সেদিন, তারপর আসিয়াছিল কাল…আজও আবার আসিতে পারে। বেশ লোকটি কিন্তু এণাদি,…দেমাক অহঙ্কারের নাম নেই। এণাদি' নাকি সাহেবদের সাথেও ঠিক বাঙলার মতো করিয়া ইংরাজীতে কথা বলিতে পারে…তার নাকি একটুও ভয় করে না। এণাদি আজ আসিলেও পারে…বেশ হইবে! কথা কওয়ার একটি দোসর পাওয়া যাইবে। সুখদুঃখের দুটো কথাতো হইবেই, ঐ সুযোগে দু-দণ্ড ভগবানের নামও করা যাইবে।

এণাদি' যা বলে তা' কিন্তু ঠিকই। কই, কোন সাহেব তার বউকে এতটুকু কষ্ট দিকতো দেখি…মেমসাহেব তাকে দশটা কথা শুনাইয়া জুতার খট্‌খট্ শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যাইবে অন্য কোথাও! মেমসাহেবরাই মেয়েদের মান রাখিয়াছে যাহোক্! বিপিনের মতো যদি কোন খিরিস্তান মেয়ের স্বামী থাকিত তবে সে অমন স্বামীর নাম ভুলাইয়া দিত না! এণাদিইতো বলিয়াছে!…আর ইনি! ইনি যেন নবাব খাঞ্জাখাঁ হইয়া গেছেন রাতারাতি! উল্টাবথ ভাঙিয়া গেল ও-মাসের সেই সাতাশে, আর আজ দোশরা শ্রাবণ বাবু খবর পাঠাইলেন ফিরিতে তাঁর আরও পাঁচছয় দিন লাগিবে। …কোন ভালমানুষের মেয়ের সঙ্গে আড্ডা জমাইতে তিনি গেলেন উল্লাপাড়া! বেশ, সেখানে না হয় গেলেই, কিন্তু চন্দরঠাকুরপোকে দিয়া যখন এত খবর পাঠাইতে পারিলে, তখন তার হাতে তুমি একটা টাকা দিয়া দিতে পারিতে না? বলিতে পারিতে না "চন্দর, আলতার হাত একেবারে খালি. বাজারটা-আসটা করে দিস্ তুইই; পাওনা গণ্ডা আমি গিয়ে চুকিয়ে দেবো"? তার কি এতটুকু বুদ্ধি হইল না যে সাত "পাখি" চা'লে একটা লোকের কয় দিন চলতে পাবে? ঘরে যে এতদিনে লক্ষ্মী "বাড়ন্ত" হইয়া গেছে, এই সামান্য অনুমানটুকুও কি তার নাই! আশ্চর্য্য!

কিসের শব্দ শুনিয়া কপালের উপর হইতে রুক্ষ চুলের রাশি সরাইতেই আলতার চোখ পড়িল আইরিণের উপর।

কণ্ঠস্বরে দরদ দিয়া আইরিণ বলিল,·· কেঁদে কেঁদে যে মেয়ের চোখদুটি ফুলে গেল দেখচি। বরের জন্যে কষ্ট হচ্ছে বুঝি? হবে না! কিন্তু যাই বলো ভাই আলতা, এমন অমানুষ স্বামী কিন্তু আমাদের মধ্যে নেই।

চোখ মুছিয়া আলতা উঠিয়া বসিল, এসেচেন আপনি? বলিয়া আইরিণকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেই সে বাধা দিয়া বলিল,…থাক্। প্রণাম করতে হবে না। পায়ে হাত দেওয়া কেন ছিঃ! ঈশ্বরের রাজত্বে কেউ বড়ো নয়—কেউ ছোটো নয় জানোতো? যীশু তোমার মঙ্গল করুন! আইরিণ তার দক্ষিণ বাহু আলতার মাথার ঊর্দ্ধে রাখিল।

আইরিণ বলিল,—আজ তোমায় কটা গান শোনাবো আলতা। আমার মুখে গান, ভগবানের গান, তোমার ভালো লাগবেনা আলতা?

আলতা অনেকটা ঘাড় কাত করিল।

এণা তার হাতব্যাগ খুলিয়া লাল মলাটের ছোট ছোট কয়েকটি বই বাহির করিয়া তারই একটির কোন এক পৃষ্ঠা খুলিয়া অনুচ্চ স্বরে সুর করিয়া গান ধরিল :—

যীশু পরম দয়ালু—

বাহির হইতে কয়েকটি অকালপক্ক বালকের ঐক্যতান শোনা গেল শীতকালে খায় শাঁকালু, ও সে পরম—

এণা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—ছেলেমানুষ! নির্ব্বোধ এরা—প্রভু এদের ক্ষমা করবেন। সে পুনরায় গানের বেশ টানিয়া নিল :—

পাপীর ত্রাতা, সাধুর পিতা
অন্ধকারে স্নিগ্ধ আলো
সবাই তারে বাসে ভালো,
তাই, সবারই সে মিতা—
সে যে পরম দয়ালু!

এণা তিনটি গান গাহিল এবং আলতাকে একটির সুর শিখাইয়া দিল।

—জামাই আসবে কবে? এণা শুধায়।

—আর এসেচে! পাঁচ ছয়দিন পরে, যদি মর্জ্জি হয়—

—মর্জ্জি হয় মানে? তার খুসী মতো সে আসবে, খুসী মতো সে যাবে, এমন কোন আইন আছে নাকি? পরম পিতা এদের কখনো ক্ষমা করবেন না আলতা—এ তুমি জেনে রাখো!

আইরিণই আবার বলে,—তোর সুখ শান্তিতে থাকতে ইচ্ছা করে না ভাই আলতা? করবেনা কেন—সবারই করে!

কে চায় বলো মুখ্যু সুখ্যু হ'য়ে, আধ-পেটা খেয়ে, ছেঁড়া কাপড় কোমরে জড়িয়ে, স্বামীর অবহেলা সহ্য করে সংসারে থাকতে। কেউ না—কেউ না! আলতা, তুই জানিস্ তুই কতো সুন্দর? এত রূপ এই সংসারের জন্য নয়—এত রূপ এই মাটির ঘরে থাকবার জিনিষ নয়। তোর এই কাঁচা বয়স—এখনো বাঁচবি কত দিন! অনেক—অনেক বছর! কিন্তু, জীবনে শান্তি পাবি না কখনো! এ বাঁচায় লাভ কি আমায় বলতে পারিস তুই আলতা?

আলতা কোন জবাব দেয় না—ভাবে, এ-বাঁচায় তার লাভ কি! এত রূপ লইয়া স্বামীর গঞ্জনা সহিতেই বুঝি তাকে সৃজন করিয়াছেন তার ভগবান!

এণা অন্তর্যামী, বলে,—না, না, এমনি ভাবে নষ্ট হওয়ার জিনিষ তুই ন'স আলতা! ভগবান তোকে পাঠিয়েছেন মহৎ কিছু করবার জন্যে, পাপীদের মনে জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত করাতে। একটু দম নিয়া সে আবার বলে,—এবং তোমাকে দিয়ে আমি তাই করাতে চাই আলতা! কিছুক্ষণ ভাবিয়া নিয়া আইরিণ অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, উড়োজাহাজ দেখেছিস্ আলতা? আকাশে যে জাহাজ ভোঁ করে চলে?

আলতা ঘাড় কাত করিলে এণা বলে,—দেখেছিস্, চড়িসনি তো কখনো! চড়তে সাধ হয় না?

আহ্লাদীর মতো আলতা বলে,—সাধ হয় বৈকি, কিন্তু ভয় করে দিদি!

—ভয়? ভয়ের কিচ্ছু নেই এতে! আমি নিজে ক-তো চড়েচি। চ'ড়ে চ'ড়ে কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে। চড়তে কেমন মজা লাগে, নীচেকার বাড়ীঘর, গাছপালাকে মনে হয়—দ্যাখ দ্যাখ,—এই এইটুকুন! আর আমোদ যা' লাগে! তুই উড়োজাহাজে চড়িস আলতা, গরুর গাড়ীতে চাপতে তখন ঘেন্না হবে! চল আমার সঙ্গে তুই কলকাতায়—তোকে আমি উড়োজাহাজে চড়াবো, ভাসাপুল দ্যাখাবো, বায়স্কোপে নিয়ে যাবো—। বায়স্কোপ কাকে বলে জানিস তো? ছবি—কেমন সব মজার মজার ছবি তারা হাসে, খেলে, দৌড়ায়, মটোর চালায়, নাচ গান করে, চুমো খায়—কতো।

আইরিণ বলিল, আলতাকে সে বি-এ পাশ করাইবে; তখন সাহেব মেমরা তাকে দেখিয়া ভয়ে তিন হাত দূর হইতে সেলাম ঠুকিবে। সে ইংরাজীতে এমন চমৎকার কথা বলিতে পারিবে যে দেশের লোক নির্ব্বাক বিস্ময়ে তার দিকে চাহিয়া থাকিবে। দেশ বিদেশ হইতে তার নিমন্ত্রণ আসিবে, বিচিত্র ও বহুবিধ যানে চড়িয়া সে ভূপর্য্যটন করিয়া বেড়াইবে··· সভাসমিতিতে তার বক্তৃতা শুনিয়া সবাই যাইবে চমকাইয়া! দিকে দিকে রাষ্ট্র হইয়া যাইবে আলতা নাম নিয়া ভারতবর্ষে এক দেবকন্যা অবতীর্ণা হইয়াছেন! বিপিনের জন্য সে দুঃখ করিয়া করিবে কি? বিপিন যদি আর না-ই ফেরে কোনোদিন, তখন কী হইবে আলতার? বিপিন না-ও তো আসিতে পারে—আলতাকে যে সে ভালবাসেনা একটুও, একথা আইরিণ তার বুকের ক্রশ স্পর্শ করিয়া বলিতে পারে, নইলে এতদিন সে কখনই আলতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। আচ্ছা, আসিলই না-হয় বিপিন ফিরিয়া—তবুও, যা' তার স্বাস্থ্য, ভগবান না করুন, কবে যে সে চোখদুটি বুজিয়া ফেলিবে ত'রই কোন স্থিরতা আছে নাকি? আলতা তখন দাঁড়াইবে কোথায়,—পেটে ক্ষুধা, এক-গা যৌবন, আর এই চাহিয়া-দেখিবার মতো রূপ লইয়া সে কার বাড়ী ভিক্ষা করিয়া খাইবে? তার চেয়ে, এণার সাথে গেলে সে রাজরাণী হইয়া যাইবে, কত চমৎকার দেখিতে জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট সাধিয়া তাকে বিবাহ করিতে চাহিবে!

আইরিন বলে,—তোমায় দেখে, আলতা, মা'র পেটের বোনের মতো লেগেচে। আর, প্রথমে তোমায় দেখেই কেমন মায়া পড়ে গেছে—তাই না এতো কথা কইচি, তোমার উন্নতির জন্যে, তোমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এতো উৎকণ্ঠিত হয়েচি! জানো আলতা, আমার এক বোন ছিল, বললে বিশ্বাস করবে না, অবিকল তোমার মতো দেখতে। কোলে পিঠে করে তাকে মানুষ করেচি, বেঁচে থাকলে আজ সে তোমার মতো এত বড়টাই হতো। কিন্তু, তার স্রষ্টা তাকে অসময়ে কেড়ে নিলেন,...এ পাপরাজ্যে থাকবার মেয়ে তো সে নয়! আমেন!...আমাদের কাছে কলকাতায় আরেকটা মেয়ে থাকে আলতা···তারও ঠিক তোরই অবস্থা ছিলো। এমনি দরিদ্র সংসার, এমনি রূপ, আর এমনি অমানুষ ও নিষ্ঠুর এক স্বামী! এখন···এখন সে কি হয়েচে

জানিস্! এক সাহেবের আপিসে টাইপ করে। ও! টাইপ এক রকমের যন্তর ভাই···খাটুনী নেই, কিছু নেই, গদীর চেয়ারের ওপরে বসো, মাথার উঁচুতে বোঁ বোঁ করে কলের পাখা ঘুরচে, কাজের মধ্যে শুধু এই, যে, সেই যন্তর তুমি চালিয়ে দেবে। মাস গেলেই দু'শো টাকা মাইনে! দু'শো টাকা কি কম? দশ কুড়ি টাকা! শুনলুম, তার আগের বর নাকি আবার কোন এক মেয়েকে বিয়ে করে দিব্যি হাসি তামাসার সঙ্গে উপোস দিচ্ছে। আর এই মেয়েটির কেমন "ষ্টারস্" দ্যাখ, আপিসের বড়ো সাহেব, খাস বিলেতের দুঁদে সাহেব, তাকে বিয়ে করতে পাগল! আমায় এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে সাহেব ইংরাজীতে বলে । যাকৃগে, তুই তাহ'লে যাচ্ছিস্ তো আলতা আমার সঙ্গে?

চোখের সুমুখে আলতা নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছে, সে আলোর উগ্রতায় সে সম্মোহিত হইয়া পড়ে। ভাবে, সত্যই তো, বিপিন তার জন্য করিয়াছে কী?...ভালো খাওয়াইতে পরাইতে পারে নাই, সে না হয় ভুলিয়া যাওয়া যায়। তাই বলিয়া দুটি স্নেহের কথা, একটু আদর, এগুতো সে কখনও আলতাকে উপহার দেয় নাই। স্বলবসন্তপুরের মেলায় কিছু কাঁচা পয়সা তার হাতে আসিয়াছে, অমনি বাবুর মেজাজ গিয়াছে "দিলদরিয়া" হইয়া! তিনি উড়াইয়া চলিলেন উল্লাপাড়া! উল্লাপাড়ায় কিসের এতো টান শুনি? আলতা কিছু জানেনা বুঝি···সেতো আর কচি খুকীটি নয়। উল্লাপাড়ার আকালু বোষ্টমের মেয়ে সৈরভীর সঙ্গেই না প্রথম যৌবনে বিপিনের কণ্ঠি বদলের কথা পাকাপাকি হইয়া গিয়াছিল। সে অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হইবার সুযোগ পায় নাই, তাই সময় পাইলেই বিপিন যায় উল্লাপাড়া। টাকা কড়িগুলি সৈরভীর পায়ে ঢালিয়া দিয়া বাবু বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে আলতার কাছে আসিয়া আহ্লাদে যেন গলিয়া যান! বেশ! আলতাও নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিতে জানে। বিপিন তার কে যে সে তার সমস্ত জীবন নষ্ট করিয়া ফেলিবে স্বাস্থ্যহীন, অন্তবহীন এই পুরুষটির জন্য?

আলতার মুখে কে যেন দুই হাতে আলতা মাখাইয়া দেয়। অন্তরের সমস্ত বেদনা, সবটুকু বিতৃষ্ণা একীভূত হইয়া তার মুখ দিয়া বাহির হয়, হ্যাঁ, আমি যাবো···যাবো আপনার সাথে এণাদি! আমায় আপনি নিয়ে চলুন। এখানে আমি আর থাকবো না। কেন, কিসের জন্য? এণার কোলের মধ্যে মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া সে কাঁদিতে থাকে।...

···সন্ধ্যার পরে আইরিণ আবার আসিল একটি বড়ো ব্যাগ হাতে নিয়া। আলতার পরণে চড়িল নূতন ধরণের এক শাড়ী। আলতার হাতে দু'গাছি করিয়া বেলোয়াড়ী চুড়ী পরাইয়া দিয়া তার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে আইরিণ খিড়কীর দরজা পার হইয়া গেল।

যাইতে যাইতে আইরিণ বলিল,—তোর স্বামী উল্লাপাড়া থেকে এসে যখন তোর বিছানার ওপরে আমার লেখা ঐ চিঠিটা দেখবে তখন কি "ফানি থিং"-ই না হবে! না?

আলতা কোন কথা বলে না। জোড়া বটতলার সুমুখে আসিয়া পিছন ফিরিয়া শেষবারের মত্নে তার পরিত্যক্ত কুটীরের দিকে সজল দৃষ্টি রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে এণাকে শুধায়,—কিন্তু আমায় তোমরা খিরিস্তান করে নেবে না তো দিদি?

—পাগল! আইরিণ্ আলতার হাতে একটু চাপ দিয়া বলে।

শ্রীসরোজকুমার মজুমদার

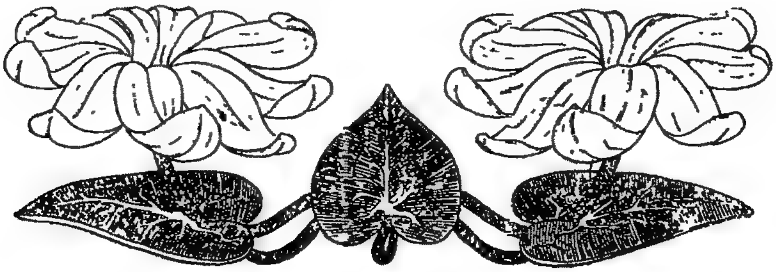

১৩

কলকাতায যাওয়াব দিন ঘনিয়ে এল—আর মাত্র একদিন বাকী। কাল বিকেলে গরুবগাড়ী কবে মাধবপুব থেকে খুলনা রওয়ানা হতে হবে এবং বাত্রেব ট্রেন ধরে পবশুদিন ভোরে কলিকাতায় পৌছিব। ঠিক হল দাদা আমাব সঙ্গে কলকাতায় যাবেন এবং কয়েক দিন কলকাতায় থেকে আমাকে গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে ফিরে আস্‌বেন। বাবা প্রথমটা ঠিক করেছিলেন দাসমশাই বলে আমাদের একটি পুবাণো কর্ম্মচারীকে আমার সঙ্গে দেবেন; কিন্তু দাদাব বিশেষ ইচ্ছে তিনি নিজেই আমার সঙ্গে যান এবং আমাকে দিয়ে বাবাকে বলালেনও সেকথা। তাই শেষ পর্য্যন্ত দাদাই আমাব সঙ্গে যাবেন সাব্যস্ত হল।

যাওয়ার সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগ্‌ল ততই মনটা খারাপ বোধ করতে লাগলাম। সাবিত্রী ত আছেই, তাচাডা মা, মণ্টী বোঠান, সকলের জন্যই প্রাণটা হুহু করতে লাগল যেন কতদিনের জন্য এদের ছেড়ে চলেছি, দূব দূব বহুদূর এক বিদেশে এক নতুন জীবনযাত্রার মধ্যে। অবশ্য সবচেয়ে বড করে ব্যথা পাচ্ছিলাম প্রাণে সাবিত্রীকে ছেড়ে যেতে হবে বলে। সাবিত্রীর কাছ থেকে এই মাধবপুরে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যে আনন্দটুকু খুড়িয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম, কলকাতায় গেলে ত আর তা পাব না। সাবিত্রীর অভাব ভরিয়ে দিয়ে প্রাণখানাকে সরস করে রাখতে পারে এমন লোক কি কলকাতায় পাওয়া যাবে?—কখনও না।

যেদিন রওয়ানা হলাম, তার আগের দিন সকালবেলাটা সাবিত্রী অনেকক্ষণ আমাদের বাড়ীতে ছিল। কিন্তু নিবিবিলি একটুও তাকে পাওয়া গেল না। মা প্রায় সব সময়ই আমাব সঙ্গে সঙ্গে আছেন, যেন ছাড়তেই চাইছেন না; এবং তাছাডা দাদাও বেশীব ভাগটা বাড়ীব মধ্যেই কাটালেন—আমার পাশে পাশে, কলকাতায় আমাব সঙ্গে কি কি দেওয়া হবে—না হবে এই বিষয় মাব সঙ্গে বোঠানেব সঙ্গে আলোচনা করছেন। এক ফাঁকে শুধু সাবিত্রীকে বলে দিলাম, দুপুর বেলা খেয়ে দেয়েই সে যেন একটু সকালে সকালে আসে। সাবিত্রী চাপা গলায় উত্তর দিয়েছিল "আচ্ছা"।

দুপুব ফিরে বিকেল হ'ল, সাবিত্রী কিন্তু এল না। সমস্ত বিকেলটা আমি ছট্‌ফট্‌ করে কাটালাম, একবার ঘরে একবার বাইরে—সাবিত্রী কিন্তু এল না। ক্রমে সন্ধ্যা হলো, এবং সন্ধ্যার পরেই শুক্লপক্ষের সপ্তমী কি অষ্টমী তিথির চাঁদ আকাশে ভেসে উঠ্‌ল তবুও সাবিত্রী এল না। বুঝলাম রাত্ত হয়ে গেছে, সাবিত্রী আজ আর আস্‌বে না।

মনটা বড়ই খাবাপ বোধ করতে লাগ্‌লাম। ভাব্‌লাম যাই, চাঁদের আলোয় শেষবারের মতন নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি। মুকুন্দর পডাশুনার জন্য আজকাল বাড়ীতে একজন মাষ্টার রেখে দেওয়া হয়েছে, তাই সেও সন্ধ্যা হতে না হতে বাড়ী চলে গিয়েছে।

একলা একলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। নদীর ধারে গিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল জ্যোৎস্না আলোকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল জলের ছলাৎ ছলাৎ একটা শব্দ। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, দেখতে

পেলাম ওপারের সেই হুয়ে পড়া বাঁশ ঝাড়টা। কাল এসব ছেড়ে চলে যাব।

বাড়ী থেকে বেরুবার সময় এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল—যাই সাবিত্রীদের বাড়ীর দিকে, দেখে আসি কেন সে এল না কিন্তু কাল আমি চলে যাব, আর আজ তাকে অমন করে বলে দিলাম একটু সকাল সকাল করে আসতে—আর সে একবার এলই না। এমন কি তার বাধা হতে পাবে যে একবার একটুখানির জন্যও সে ঘুরে যেতে পাবেনি।

অভিমান হয়েছিল, দারুণ অভিমান হয়েছিল, তাই গেলামই না সাবিত্রীদের বাড়ীব দিকে। এলাম নদীর ধারে কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, নদীর ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে ওপারের ঐ হুয়ে-পড়া বাঁশ ঝাড়টার দিকে চাইতে চাইতে প্রাণ কেমন যেন আপনা থেকে কোমল হয়ে গলে গেল সাবিত্রীর উপর রাগ অভিমান কোথায় যেন গেল উড়ে মনটা পাগল হয়ে উঠল সাবিত্রীর জন্য। চললাম ত্বরিত-পদে সাবিত্রীর বাড়ীর দিকে।

ফিরে, আমাদের বাড়ীব উপর দিয়ে না গিয়ে সদর রাস্তা ধরে বাজারের মধ্য দিয়ে ঘুরে গিয়ে পড়লাম জেলা-বোর্ডের পাকা রাস্তার উপরে। খানিকটা উত্তর মুখে গিয়ে একটা সরু গ্রাম্য রাস্তা ধরে ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালাম সাবিত্রীদের বাড়ীর সামনে পথের উপর।

তখন চারিদিক নিস্তব্ধ—গ্রাম্য পথ জনহীন। ফুটফুটে চাঁদের আলোর মায়ামন্ত্রে সমস্ত গ্রামখানি ঘুমিয়ে পড়েছে—একটা অলস মাধুরীর শান্ত ভঙ্গীমায়। দূরে, সাবিত্রীদের বাড়ীর উত্তরের সেই উন্মুক্ত জলাভূমিব প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে আছে ৪টী বড় বড় তালগাছ—জ্যোৎস্নালোকে নীবব নিথর স্পন্দনহীন। আর সেই দিক দিয়ে আকাশে বাতাসে ভেসে ভেসে আসছে একটী পাখীর করুণ আবেদন, মর্ম্মস্পর্শী বিলাপ—

"বৌ কথা কও," "বৌ কথা কও"
"বৌ কথা কও"

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। দূরে তালগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে এই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নালোকে কেমন যেন আমার গা ছম্ ছম্ করে উঠ্‌ল—গ্রামছাড়া এত নিরিবিলি সেই দিকটা। একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সাবিত্রীদের বাড়ীর ফটকের দিকে যেমন একলা এগিয়েছি, মিষ্টি গলায় কানে এল—

"শান্তদা!"

চমকে উঠ্‌লাম। চেয়ে দেখি ফটকের একটু উত্তরে বেড়ার উপর ভর দিয়ে ভিতরের দিকে দাঁড়িয়ে, পথের দিকে চেয়ে আছে সাবিত্রী। বেশী দূরে নয়, দুপা এগুলেই তার কাছে যাওয়া যায়। আমি একটু এগিয়ে বেড়ার বাইরে পথেব উপর দাঁড়ালাম। বল্‌লাম "তুমি এইখানে একলা দাঁড়িয়ে আছ সাবি? ভয় করে না?"

বল্‌লে "না। তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আসতে এত দেরী করলে কেন শান্তদা?"

বল্‌লাম "এই রাত্রিবেলা, একলা, এরকম নিরিবিলি পথেব ধারে দাঁড়িয়ে আছ, তোমাব সাহস ত খুব!"

বল্‌লে "ও আমার অভ্যেস আছে তুমি আসতে এত দেরী করলে কেন শান্তদা?"

বল্‌লাম "বাঃরে! আমার কি আসবার কথা ছিল?"

বল্‌লে "তাত ছিল না। কিন্তু আমি গেলাম না দেখে ত তুমি একবার দেখতে আসবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি গেলে না কেন শুনি?"

বল্‌লে "কি করে যাই! মাকে নিয়ে সমস্তদিন যেভাবে কাট্‌ল। হঠাৎ আজ দুপুর বেলা জ্বর এল। এইত সন্ধ্যা-বেলায় একটু ঘুমিয়েছেন।"

সাবিত্রীর দিকে একটু ভাল করে চেয়ে দেখলাম। সাবিত্রী আজ সেজেছে। আজ তার বাড়ীতে তাকে সাজিয়ে দেওয়ার ত কেউ ছিল না। নিজেই সেজেছে। সুন্দর পরিপাটী করে নিজেই চুল বেঁধেছে। খোঁপায় জড়িয়েছে একটী জবাফুলের মালা। ধবধবে সাদা চওড়া একখানি লাল পেড়ে সাড়ী পরেছে—বোধহয় এইখানিই ওর সবচেয়ে ভাল সাড়ী। আজ আর ধারকরা পোষাক নয়—এসবই ওর নিজের।

সাজের দিকে চেয়ে একটু অবাক হলুম। বাড়ীতে ত দ্বিতীয় প্রাণী নেই। মার ঐ রকম অসুখ, তাকে নিয়েই সমস্তদিন অস্থির হয়ে ছিল। কখন এমনি পরিপাটী করে সাজবার সময় পেলে আজ?

সাবিত্রীর অবস্থাটা কল্পনা করে মনটা কেমন যেন আজ হু হু করে কেঁদে উঠ্‌ল।—ঐ অতটুকু মেয়ে এই নীরব নিস্তব্ধ একটা পোড়ো বাড়ীতে একেবারে একলা জ্বরে বেঁহুস মাতাকে নিয়ে সমস্তদিন কাটিয়েছে। নিশ্চয়ই ছট্‌ফট্‌ করেছে অন্ততঃ একবারটী আমাদের বাড়ী যাওয়ার জন্য —কিন্তু কোনও উপায় করতে পারেনি। তারপর সন্ধ্যাবেলা মা ঘুমিয়ে পড়লে এই নিস্তব্ধ অন্ধকার পুরীতে ছোট একটী তেলের প্রদীপের সামনে, একখানি ছোট ভাঙ্গা আরসী রেখে পরিপাটী করে চুল বেঁধেছে। ভাঙ্গা একটী তোরঙ্গ খুলে সযত্ন রক্ষিত সব চেয়ে তার ভাল সাড়ীখানি বার করে পরেছে। গাছ থেকে জবাফুল তোলা ছিল বোধ হয় তাই দিয়ে মালা তৈরী করে জড়িয়েছে খোঁপায়। তারপর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে অঙ্গন পেরিয়ে চুপটী করে দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে, এই নীরব নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না আলোকে। চেয়ে আছে পথের পানে একপ্রাণ আশা নিয়ে—আমি আস্‌ব।

বল্‌লাম "তাইত! তাহলেত আজ তোমার বড় কষ্ট হয়েছে সাবি ?"

সে কথার কোনও উত্তর দিলে না।

জিজ্ঞাসা করলে "কালকেই তুমি চলে যাবে শান্তদা ?"

বললাম "হ্যাঁ, সবই ত ঠিক, কাল বিকেলে যাব। তুমি কিন্তু তখন নিশ্চয়ই আসবে সাবি।"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে "আবার কবে আস্‌বে ?"

ইতিমধ্যে বেড়ার একটা খুঁটীর উপর সাবিত্রীর হাত দু'খানিতে রেখেছিলাম আমার হাত দুটী। সাবিত্রী "আবার কবে আসবে" প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথাখানি কাত করে বাঁ গালখানি রাখ্‌ল আমারই হাতের উপরে, বেড়ার খুঁটীতে।

বল্‌লাম "পূজোর ছুটীর আগে যে আর আসা হয়ে উঠ্‌বে বলেত মনে হয় না।"

সাবিত্রী আর কোনও কথা কইলে না। সেই ভাবে মাথাটী এলিয়ে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সাবিত্রীর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটী দেখে করুণায় আমার বুকের মধ্যে দুলে দুলে উঠতে লাগল। ভাবলাম সাবিত্রীর মার কথাই ঠিক। এমন মেয়ে পাব কোথায় ? সাবিত্রীকে বিয়ে করব।

সাবিত্রী তার মাথাটী কাত করে রেখেছিল আমার হাতের উপরে—আকাশের দিকে তুলে দিয়েছিল তার ডান গাল খানি। আমি ধীরে ধীরে নিজের গালখানি রাখলাম—সাবিত্রীর গালের উপরে। আদর করে ডাক্‌লাম "সাবি ?"

কোনও উত্তর নেই। ক্রমে টপ টপ করে সাবিত্রীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আমার হাতখানি ভিজে যেতে লাগল। আমিও চুপ করে সেইভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোনও কথা কইনি।

আমাদের মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশ—আমাদের চারিধারে পরিষ্কার চাঁদের আলো। বেড়ার ওপাশে সাবিত্রী, এ পাশে আমি, সাবিত্রীর মুখের উপর—আমার মুখ। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। কেবল দূর থেকে কাণে ভেসে আসছে—"বৌ কথা কও" "বৌ কথা কও"

"বৌ কথা কও"।

আজ ভাবি জীবনের সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে আমাদের জীবনের ভাগ্যবিধাতা কি প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে দেখেননি—করেননি কি আশীর্ব্বাদ ?'

কতক্ষণ এইভাবে কেটেছিল মনে নাই। হঠাৎ সাবিত্রী মুখ তুললে। আঁচলের খুঁটে চোখ দুটী পুঁছে বললে,

"মা এখন জ্বরে বেঁহুস। নইলে তোমাকে নিয়ে যেতাম বাড়ীর ভিতরে—মাকে প্রণাম করে যেতে।"

হঠাৎ একটা কথা ভেবে চমকে উঠ্‌লাম। বল্‌লাম "সাবি! তুমি সমস্ত রাত বেঁহুস রোগী নিয়ে একেবারে একলা এ বাড়ীতে থাক্‌বে ?"

বল্‌লে "প্রায়ই ত থাকি।"

বল্‌লাম "সেকি! তুমি খবর দাওনা কেন ? তা হলে ত শৈলিঝি এসে তোমার কাছে থাকতে পারে। মণ্টী বোঠানকে বল্লেই ত ব্যবস্থা করেন।"

সেকথার কোনও উত্তর না দিয়ে সাবিত্রী এক দৃষ্টে চেয়ে রইল দূরে তালগাছগুলোর দিকে।

বল্‌লাম "আমি আজকে গিয়েই বোঠানকে বলে শৈলি

ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—এরকম একলা তোমার থাকা হতে পারেনা।"

কিছু বল্লে না। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম—চোখ দুটী আবার সজল হয়ে উঠল। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

* * *

তারপরদিন সকাল বেলা সাবিত্রী একটুখানির জন্য এসেছিল। বেশীক্ষণ থাকেনি। একফাঁকে বলে দিয়েছিলাম—খেয়ে উঠেই চলে আসে যেন, কেননা আমি বেলা ৩ টার মধ্যেই রওয়ানা হব। শুনলাম ওর মার জ্বর সকাল বেলা ছেড়ে গেছে—তাই আসতে কোনই বাধা হবে না।

সেদিন দিনটা ছিল মেঘাচ্ছন্ন—কিন্তু বৃষ্টি ছিল না। দুপুরে খেয়ে ওঠার পর থেকেই খালি আকুল নয়নে আমাদের অন্দরের উঠানের দরজার দিকে চাইছিলাম—এইবার সাবিত্রী আসবে। বেলা ১টা বাজল, ২টা বাজ্‌ল, বাড়ীর মধ্যে যাত্রার বন্দোবস্ত হতে লাগল—কিন্তু সাবিত্রী এলনা। বেলা যখন আড়াইটা, তখন মনের মধ্যে একটা ভীষণ অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলাম। সাবিত্রীত এলনা। ভাবলাম একটা খবর নিলে হ'ত, হয়ত আবার দুপুরে তার মার জ্বর এসেছে। কিন্তু সাবিত্রীর কথা কাউকে বলতেও একটা যেন কেমন লজ্জা বোধ হচ্ছিল।—মুকুন্দটাকে বল্লে হ'ত—একটা খবর নিয়ে আসে। কিন্তু কেমন যেন বলতে পারলাম না।

বেলা যখন পৌনে তিনটা—আর মিনিট ১৫।২০ পরেই আমাকে রওয়ানা হতে হবে। মণ্টী বৌঠানকে একটু নিরিবিলি পেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম

"বৌঠান। সাবিটা এল না।"

বৌঠান বল্লেন "তাই ত.—এল নাইত দেখছি।"

বল্লাম "হয়ত ওর মার আবার জ্বর এসেছে।"

বৌঠান বল্লেন "না। একটু আগে লোক পাঠিয়েছিলাম। সাবির মা ভালই আছেন।"

বললাম "তবে?"

বৌঠান বল্লেন "কি জানি। মেয়ের ভাব বোঝাই ভার।" বৌঠানের মুখ গম্ভীর। রাগে দুঃখে অভিমানে আমার বুকের মধ্যটা তখন তোলপাড় করছিল। এলনা, কালকে অত করে আসতে বলেছি, আজ সকালেও বলে দিয়েছি, মাও ভাল আছে—তবুও একবারটী আমার যাওয়ার সময় এলনা।

বাবা, মা, মণ্টী বৌঠান সকলকে প্রণাম করে গরুর-গাড়ীতে রওয়ানা হলাম। মা চোখের জল পুঁছতে পুঁছতে আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলেন। মণ্টী বৌঠানও সঙ্গে সঙ্গে সদরে এসেছিলেন মুখের উপর একটু ঘোমটা টানে—আর থেকে থেকে আঁচলের খুঁটে চোখ পুঁছছিলেন।

গাড়ী চলতে লাগ্‌ল। দাদা গাড়ীর সামনের দিক্‌টাতে বস্‌লেন। আমি গাড়ীর ছৈয়ের মধ্যে গিয়ে পিছন দিক দিয়ে চেয়ে রইলাম। যতক্ষণ দেখা গেল চেয়ে দেখেছিলাম আমাদের সদরের একটা জামগাছতলায় দাঁড়িয়ে মা একদৃষ্টে গাড়ীর দিকে চেয়ে আছেন; পাশে মণ্টী বৌঠান চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, কপালের উপর একটু ঘোমটা টানা—মুখখানা বিষণ্ণ।

গাড়ী ঘুরে এসে নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে চলতে লাগ্‌ল। খানিকটা পূব মুখো গিয়েই জেলা-বোর্ডের পাকা রাস্তার উপরে পড়ল। চল্‌ল সোজা উত্তরমুখে। সদরের দিকে।

আমি চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্ছি। সেই চিরপুরাতন মাধবপুরের দৃশ্য আজ যেন নতুন করে চোখে ভাল লাগ্‌ছে। এবং যে দিকটা মাধবপুরের আমি কোন কালেই দেখ্‌তে পারি না—অর্থাৎ মাধবপুরের বাজার, তাও যেন আজ চোখে মধুর লাগ্‌ল।

পাকা রাস্তা ধবে চলেছি। হঠাৎ দেখ্‌তে পেলাম, পাকা রাস্তা থেকে কিছু দূরে পশ্চিমে একটা বেতবনের ধারে, বেশ বড় বড় ঘন আগাছার জঙ্গলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাঁঠাল গাছের তলায় সাবিত্রী চুপ্‌ করে দাঁড়িয়ে আছে—চেয়ে আছে পাকা রাস্তার দিকে। শিউরে উঠ্‌লাম, মুখখানা বাড়িয়ে ভালকরে চেয়ে রইলাম। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে গরুর গাড়ী চল্‌তে লাগ্‌ল—ধীরে ধীরে সাবিত্রীকে রেখে চল্‌ল চোখের আড়ালে।

সাবিত্রীদের বাড়ীর পিছন দিকে, অর্থাৎ পূবের দিকে বেশ খানিকটা ঘন জঙ্গল। সেদিকটায় মানুষের চলাচল নেই বল্লেই হয়। ভেবে অবাক হলাম—সাবিত্রী সেই জঙ্গল ভেঙ্গে এই বর্ষাকালের দিনে রাস্তার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল—শুধু একবার আমাকে দেখ্‌বার জন্য।

আসার সময় সাবিত্রীর সঙ্গে না দেখা হওয়ার দরুণ যে দুঃখ ও অভিমান হয়েছিল প্রাণে, জল হয়ে গেল সব। ভাব্‌লাম অসাধারণ মেয়ে, সাবিত্রী অসাধারণ মেয়ে—ঐ জঙ্গল ভেঙ্গে এগিয়ে এসেছে, প্রাণে কি ভয়ডর একেবারেই নেই? আবার ভাব্‌লাম সাবিত্রীকেই বিয়ে করব, অমন মেয়ে পাব কোথায়?

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ভারতবর্ষ ঃ দেশীয় ও ব্রিটীস

সমগ্র ভারতবর্ষের আয়তন ১৮,০৮,৬৭৯ বর্গমাইল। ইহা ব্রিটেনের প্রায় ২০ গুণ এবং রাশিয়া ব্যতীত ইওরোপের প্রায় সমান।

ইহার মধ্যে ব্রিটীসভারতের আয়তন ১০,৯৬,১৭১ বর্গমাইল এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের আয়তন ৭,১২,৫০৮ বর্গমাইল।

সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা ৩৫,২৮,৩৭,৭৭৮। ব্রিটীস-ভারতের ২৭,১৫,২৬,৯৩৩ ; এবং দেশীয় রাজ্যগুলির ৮,১৩,১০,৮৪৫।

সমগ্র ভারতের আয়তনের শতকরা ৬১ এবং জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৭ ভাগ ব্রিটীসভারতের অন্তর্ভুক্ত।

সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার একচতুর্থাংশের কাছাকাছি এবং আয়তনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত। দেশীয় রাজ্যের অনেকগুলি যেমন খুবই ক্ষুদ্র তেমনই অনেকগুলি আবার জনসংখ্যা ও আয়তনে অনেক প্রদেশ অপেক্ষা বড়। হায়দ্রাবাদের আয়তন প্রায় বাংলা প্রদেশের সমান ; ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। আসাম একটি বড় প্রদেশ, তাহার জনসংখ্যা মাত্র কিঞ্চিদধিক ৯২ লক্ষ ; বার্ম্মার জনসংখ্যা ইহার সমান।

দেশীয় রাজ্যগুলির ৮ কোটী লোকের ভাগ্যকে আমরা কখনই উপেক্ষা করিতে পারি না ; ইহাদিগকে ফরাসীভারত বা পর্ত্তুগীজভারতের অধিবাসীদের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্তও করিতে পারি না।

সমগ্র এসিয়াখণ্ডে এক চীন ব্যতীত আর কোন দেশের জনসংখ্যা ইহাদের অপেক্ষা অধিক নহে। সমগ্র জাপান সাম্রাজ্যের কথা ধরিলেও, তাহার জনসংখ্যা ইহাদের অপেক্ষা অল্প কিছু বেশী হয় মাত্র। ইওরোপেও এক রাশিয়া ব্যতীত আর কোন দেশের জনসংখ্যা ইহাদের সমান নহে। ভারত-বর্ষের কোন প্রগতিমূলক প্রতিষ্ঠানই ইহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।

সমগ্র ভারতবর্ষের অব্যাহত ঐক্য

এই বিপুল ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত এবং পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত অবিভাজ্য এক নহে। ভাষার, আচার ব্যবহারের, জাতিধর্ম্মের, ভূপ্রকৃতির বহু ভিন্নতা ইহার মধ্যে আছে ; এইজন্য ভারতকে মহাদেশ এবং ভারতীয়দের জাতিসমষ্টি বলা হইয়া থাকে। এক দিক দিয়া কথাটা মিথ্যাও নহে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ এই ভিন্নতা থাকিলেও বাহিরের সহিত তুলনা করিলে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ঐক্যের ধারা দেখা যাইবে। ভাষায় আচার ব্যবহারে, মানব প্রকৃতিতে, সর্ব্বত্রই এই ঐক্য আছে। ঐতি-হাসিক, ভৌগলিক, ধর্ম্মসম্পর্কীয় নানাকারণে এই ঐক্য দানা বাঁধিয়াছে এবং রাজনীতিক স্বার্থও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই ঐক্য আমাদিগকে অক্ষুণ্ণও রাখিতে হইবে। যাহা কিছু আভ্যন্তরীণ ব্যবধানকে বাড়াইয়া দুরতিক্রম্য করিতে চায় তাহা ভারতের স্বার্থের অনুকূল নহে।

কিন্তু ভারতবর্ষের যে সকল বৈচিত্র্যের কথা বলা হইল, ব্রিটীস ও দেশীয় ভারতকে এইপ্রকার ভিন্নতার কোন সীমা-রেখা অবলম্বন করিয়া পৃথক করা হয় নাই। ভারতে পৃথক পৃথক ভাষা আছে, কিন্তু দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের ভাষা ব্রিটীসভারতের অধিবাসীদের ভাষা হইতে ভিন্ন নহে। তাঁহারা ভারতের যে অংশের অধিবাসী, ব্রিটীসভারতের সেই অংশের

অধিবাসীদের সহিত তাঁহাদের ভাষার কোন পার্থক্য নাই জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ যেদিক দিয়াই ধরা যাক সেই দিক দিয়াই এই একই কথা। এই সকল দিক দিয়া দেশীয় রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যেও কোন ঐক্য নাই। অর্থাৎ কোন দিক দিয়াই স্বাভাবিক এমন কোন বিশিষ্টতা দেশীয় রাজ্যগুলির নাই, যাহার দ্বারা সেগুলিকে ব্রিটিস ভারত হইতে পৃথক মনে করা যাইতে পারে। কাজেই যে অর্থে আমরা ব্রিটিস ভারতকে অবিভাজ্য মনে করিয়া থাকি সেই অর্থে দেশীয় ও ব্রিটিস এই উভয় ভারতও অবিভাজ্য এবং এক বর্ত্তমানের ব্রিটিসভারতের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক প্রদেশের মধ্যেই একটা করিয়া কাল্পনিক রেখা টানিয়া যদি তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত করা যায় এবং প্রত্যেক প্রদেশের বিভক্তাংশগুলিকে অবশিষ্ট ভারত হইতে পৃথক করিয়া পৃথক শাসনতন্ত্রের অধীনে আনিবার চেষ্টা করা হয় তবে, তাহা যেমন অদ্ভুত অসঙ্গত এবং ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে মারাত্মক বলিয়া বিবেচিত হইবে, দেশীয় এবং ব্রিটিসভারতের বিভাগও অনেকটা অনুরূপ প্রকারে মারাত্মক ও অদ্ভুত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ যে দেশীয় ও ব্রিটিস এই উভয় বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে তাহা একটা ঐতিহাসিক আকস্মিকতা মাত্র। সেই ঐতিহাসিক আকস্মিকতাকে যে স্থায়ী করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং যাহাতে তাহার স্বাভাবিকতা, সঙ্গতি ও অধিকার সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদয় না হয় সেজন্য নিখুঁত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমাজের সর্ববিভাগে ও সর্বস্তরে পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘর্ষের ফলাফল আমরা নিত্য দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র বিভাগ অপেক্ষাও ভারতের এক তৃতীয়াংশকে এবং অধিবাসীদের এক চতুর্থাংশকে যে অনেকটা স্থায়ীভাবে পৃথক করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ইহাদের শক্তি ও অর্থপুষ্ট একদল লোককে ভারতের প্রগতির পথে বাধাস্বরূপ স্থাপন করা যাইতেছে, তাহাই ভারতের ঐক্য ও মুক্তিপথের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিঘ্ন হইয়া রহিয়াছে।

দেশীয় নৃপতিরা আগামী শাসনতন্ত্রে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পোষকতা করিয়া যে ক্ষতি করিতে পারিবেন তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হইয়াছে, এই কৃত্রিম বিভাগের ফলে এবং আমাদেরও এই বিভাগকে স্বীকার করিয়া লইবার ফলে।

দেশীয় নৃপতিরা আমাদেরই দেশের লোক। তাঁহাদের হাতে শক্তি, ক্ষমতা ও অর্থ সঞ্চিত হইবার ফলে, দেশের লোকের উপর, বিশেষ করিয়া নেতৃবৃন্দের উপর—প্রভাব বিস্তারের তাঁহারা বিশেষ সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রভাবের ফলে তাঁহাদের স্বার্থের প্রতিকূল কথা বলা নেতাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি বরাবরই এই অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ যে অবিভাজ্য ও সর্ব্বতোভাবে এক, দেশীয় ব্রিটিশ নির্বিশেষে গোটা ভারতবর্ষের অধিবাসীদের রাষ্ট্রীক স্বার্থ যে অভিন্ন, একথা মুখে অবশ্য স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু, সকল ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে একই রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে আনয়ন করিবার চেষ্টা যে স্বাধীনতাকামীদের এ সম্পর্কে একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, ব্রিটিস ও দেশীয় ভারতের অধিবাসীদের আনুগত্য, আমাদের রাষ্ট্রীক প্রতিষ্ঠানগুলির সমভাবে দাবী করা এবং তাঁহাদের রাষ্ট্রিক স্বার্থের দায়িত্ব সমভাবে গ্রহণ করা যে একান্ত উচিত, একথা দৃঢ়তার সহিত স্পষ্টভাবে কখন বলা হয় নাই এবং এই উদ্দেশ্যে কাজও করা হয় নাই। ব্রিটিশ ভারত হইতে এখানকার রাষ্ট্রীক অবস্থা পৃথক হওয়ায়, এখানকার কর্মপন্থার হয়ত কিছু পার্থক্য থাকিবে এবং বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের যেমন নিজ নিজ প্রদেশের কর্মভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এখানেও তেমনই প্রত্যেক রাজ্যের প্রজাদের নিজ নিজ স্থানের কর্মভার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু, সে কথার অর্থ ইহা নহে যে, সেই কর্মপন্থা পরিচালনার অথবা এসকল স্থানের ঘটনাবলীর চরম দায়িত্ব কংগ্রেস গ্রহণ করিবেন না।

কংগ্রেস যে এই মনোভাব এবং সাহস দেখাইতে পারেন নাই ইহা কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিশেষ দুর্ব্বলতার পরিচায়ক হইয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অনেকেই তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে অথবা তাঁহাদের গণজীবনের অন্যান্য বিভাগে এই সব নৃপতিদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়াই এই সাহস দেখাইতে পারেন নাই। অনেকে হয়ত ভুলভাবে এই কথা মনে করিয়াছেন যে, নৃপতিরাও যখন ভারতবাসী তখন তাঁহাদের ও তাঁহাদের প্রজাদের স্বার্থ পৃথক নহে এবং ভারতের কল্যাণের জন্য তাঁহারও সাধারণ ভারতবাসীর ন্যায়

উৎসুক হইবেন এবং ভারতের কল্যাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের ও তাঁহাদের প্রজাদের ধারণা ভিন্ন হইবে না। বরং তাঁহারা যদি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উপর সহানুভূতিসম্পন্ন হন তবে হয়ত তাঁহাদের অর্থ ও শক্তির সহায়তায় জাতীয় আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। দেশীয় রাজ্য বলিতে নেতৃবৃন্দ নৃপতিদের কথা, তাঁহাদের শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের কথা মনে করিয়াছেন কিন্তু, ইহার কোটি কোটি প্রজার কথা মনে করেন নাই, তাহাদের চরম দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা মনে করেন নাই, তাহাদের অব্যবহৃত বিপুল শক্তির কথাও মনে করেন নাই। ঐতিহাসিক ঘটনার জের টানিয়া ইহাদ্বারা যে গোটা ভারতের ঐক্যকে অস্বীকার করা হইতেছে, তাহার শক্তিকে পঙ্গু করিয়া রাখা হইতেছে, যাহারা সর্ব্বতোভাবে আমাদের, তাহারা যে পর এই ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে, আমাদেরই এক বৃহৎ অংশের নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত দাবীসমূহকেও কার্য্যতঃ অস্বীকার করা হইতেছে, এসকল কথাকে কংগ্রেসের নেতারা এপর্য্যন্ত গুরুত্ব দান করেন নাই।

সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক স্বার্থের জন্য শক্তি ও ঐক্যের জন্য সকল ভারতবাসীর সর্ব্বতোমুখী মুক্তির জন্য যে সকল ভারতবাসীরই প্রত্যক্ষভাবে একই রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে আসিবার, বহু খণ্ড কর্ত্তৃত্বের ও খণ্ড ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার, নানাভাবে ও নানা আকারে বিদ্যমান ব্যক্তিপ্রভুত্বের সুযোগের ধ্বংস সাধন করিবার প্রয়োজন আছে, একথা দেশের প্রকৃত কল্যাণকামীদের দৃঢ়তার সহিত বলিবার দিন আসিয়াছে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ এই সাহস ও দৃঢ়তা দেখাইবেন বলিয়া আমরা আশা করিলেও, সে আশা বারে বারেই বিফল হইতেছে।

দেশীয় রাজ্য জনসম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণের কয়েকটি কথা

দেশীয় রাজ্য জনসম্মিলনের সভাপতি ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া তাঁহার অভিভাষণে কংগ্রেসকে প্রশ্ন করিয়াছেন, "লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে উক্ত হইয়াছে যে, কংগ্রেস ভারতের প্রত্যেক অংশের একই প্রকার নাগরিক রাষ্ট্রীক ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা চাহেন। তাহা হইলে, কেন কংগ্রেস আবার বলেন যে, দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার সংগ্রাম এখানকার অধিবাসীদের নিজেদেরই চালাইতে হইবে? হইতে পারে, দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে আগত প্রতিনিধিদের সংখ্যা ব্রিটিশ প্রদেশ সমূহের প্রতিনিধিদের সংখ্যা হইতে অল্প। কিন্তু, কংগ্রেস সমভাবেই সমগ্র ভারতীয় জাতির কংগ্রেস।" এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ দিতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করিনা।

আমাদের অপেক্ষা দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকার অনেক কম; দুঃখ দুর্দ্দশা অনেক বেশী। এমন কি কোন দেশীয় রাজ্যের সীমার মধ্যে তাঁহাদের এই সম্মিলনের অধিবেশন পর্য্যন্ত সম্ভব হয় না। দুঃখ কষ্ট সহিয়া এই অধিকার অর্জ্জনে তাঁহাদের অক্ষমতার কথা বিদ্রূপের সহিত বলা হইয়া থাকে। ডক্টর সীতারামিয়া ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, "আমরা কি সসম্মানে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি না যে, যে-ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের সকল অংশের রাষ্ট্রীক গণতান্ত্রিক ও নাগরিক স্বাধীনতা চাহেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই কংগ্রেস তাঁহাদের একটি অধিবেশনেরও অনুষ্ঠান কোন দেশীয় রাজ্যে কেন করেন নাই? আমরা শুনিয়াছি ১৯৩১ সালের কোন সময়ে এইরূপ একটা চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ফলপ্রদ হয় নাই। আপনারা কেমন করিয়া আশা করিতে পারেন যে, কংগ্রেসের পক্ষে যাহা সম্ভব হয় নাই, তাহা তাহার একটা অংশের পক্ষে সম্ভব হইবে? 'সমগ্র' সব সময়েই তাহার অংশ অপেক্ষা বড় এবং 'সমগ্র' নিজে যাহা করিতে পারে নাই তাহা করিতে না পারিবার জন্য কখনই ইহার অংশকে দোষী করিতে পারে না।"

চিন্তা, বাক্য অথবা কর্ম্মের স্বাধীনতার ক্ষেত্র ব্রিটীস-ভারতেও খুব প্রশস্ত নহে। কিন্তু, এখানেও যে অবস্থা আমাদের কল্পনাতীত দেশীয় রাজ্যগুলির সেই অবস্থা দূর করিবার দায়িত্ব কংগ্রেস কোন প্রকারে এড়াইতে পারে না। ইহা এড়াইতে যাইয়া তাঁহাদের যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা চতুর বাক্যজাল বিস্তার করিয়া দেশীয় রাজ্যসমূহের অধিবাসীদের স্বাবলম্বনের উপদেশ দান করিয়া, অথবা নিজেদের অক্ষমতা তাঁহাদের ঘাড়ে চাপাইয়াও কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ঢাকিতে পারেন নাই।

ইনি কংগ্রেসকে সোজাসুজি আরও একটা প্রশ্ন করিয়াছেন :—

"আপনারা কি ভারতবর্ষকে সংযুক্ত রাষ্ট্র করিতে চেষ্টা করিতেছেন অথবা আপনারা ব্রিটীসভারতের প্রদেশগুলির স্বরাজের জন্য চেষ্টা করিতেছেন? যদি প্রথমটি হয় তবে, দেশীয় রাজ্যসমূহের জনসাধারণ এবং তাঁহাদের সমস্যা সম্পর্কে আপনারা সহানুভূতিহীন বা অনুগ্রহশীল মনোভাব অবলম্বন করিবেন না। আর যদি শেষোক্তটি আপনাদের উদ্দেশ্য হয় তবে, তাহা বলুন এবং আমরা আপনাদের সাফল্য কামনা করি এবং সেখান হইতে শক্তি সংগ্রহের আশা করি। আমরা আপনাদের অভিনন্দিত করি, কিন্তু, এখান হইতে এবং এখন হইতে আমরা ভিন্ন পথে যাত্রা করি।"

প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কংগ্রেস যে আশ্বাস দিয়া থাকেন সে সম্পর্কেও সভাপতি বলিয়াছেন, 'আপনারা ডান হাত দিয়া যাহা দিয়াছেন, বাম হাত দিয়া তাহা ফিরাইয়া লইবেন না। আমাদের কানের কাছে আপনারা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, হৃদয়ের কাছে আনিয়া সেসব ভাঙ্গিয়া দিবেন না।"

যে কৃত্রিম রেখা টানিয়া ভারতকে খণ্ডিত করা হইয়াছে, ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান তাহাকে অস্বীকার করিবার মত নৈতিক সাহস অন্ততঃ অর্জ্জন করুন, ইহা আমরা দেখিতে চাই।

পণ্ডিত জওহরলালের উত্তর

দেশীয় রাজ্য জনসম্মিলনে, কিছু বলিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া পণ্ডিত জওহরলাল যাহা বলেন তাহাতেও তাঁহার মতের কোন দৃঢ়তা প্রকাশ পায় নাই। দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে কংগ্রেসে যে মতভেদ আছে, পণ্ডিতজী তাহাকে কংগ্রেসের জীবনের লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহারা কংগ্রেসের সমর্থন পাইবেন, এ আশ্বাস দিয়াও পণ্ডিতজী বলিতে ভুলেন নাই যে, ইঁহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য ইঁহাদের নিজেদেরই কাজ করিতে হইবে।

নিজ নিজ দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার কাজ সকলকেই করিতে হইবে, একথায় কাহারও আপত্তি করিবার কিছু নাই। ব্রিটীসভারতেরও প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীদেরও নিজ নিজ প্রদেশের জন্য কাজ করিতে হয়; বাংলার কাজ পাঞ্জাবের লোকেরা অথবা বঙ্গের কাজ বাংলার লোকেরা করিয়া দিয়া থাকেন না। তবুও যেমন ব্রিটীসভারতের কাজের দায়িত্ব কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছেন, দেশীয় ভারত সম্বন্ধেও তাঁহারা যদি সেই একই নীতি অবলম্বন করিতেন তবে, কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না।

কংগ্রেস দেশীয় নৃপতিদের মোহ ত্যাগ করুন, আমরা তাহাই দেখিতে চাহিতেছি।

দেশীয় রাজ্যে প্রজাদের অধিকার

শ্রীযুক্ত পট্টভি সীতারামিয়া দেশীয় রাজ্য জনসম্মিলনের সভাপতিত্ব করিয়া করাচী হইতে ফিরিয়া ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন :—

"....ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ ও ধারণা পৃথক। নিজামরাজ্যে শিক্ষাসম্মিলনও পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথায় সাধারণতঃ কোন জনসভাও হইতে পারে না। ...উত্তর ভারতীয় রাজ্যগুলির সহিত দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। ইহাদের অধিকাংশ গুলিতেই জনমত পদদলিত হইয়া থাকে। আমাদের তুলনায় দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের ভাগ্য অত্যন্ত মন্দ; জীবনযাপন প্রণালী অধিক সীমাবদ্ধ। তথাপি তাঁহারা ব্যক্তিস্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার এবং গার্হস্থ্য জীবনের শুচিতা রক্ষার জন্য বীরোচিত সংগ্রাম চালাইতেছেন। ...দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের সহযোগিতা ভিন্ন আমরা স্বরাজের পথে একপদও অগ্রসর হইতে পারিব না। এই যাত্রাপথে তাঁহারা আমাদের অবিচ্ছিন্ন সাথী।"

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মানসূচক উপাধি লাভ

বাংলাদেশের সর্ব্বজনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক 'ডক্টর অব-লিটারেচার' উপাধি দান করিয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যে শরৎবাবুর স্থান ও দান, বাঙ্গালী পাঠকসমাজে তাঁহার

সর্ব্বজনপ্রিয়তা, বাংলা ও ভারতের বাহিরেও তাঁহার খ্যাতিব বিস্তার, তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় ও গৌরব; বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাঁহার জন্য যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসন প্রতিষ্ঠিত আছে তদপেক্ষা অধিক সম্মান তাঁহাকে আর কেহ দিতে পারিবে না। অন্য সকল উপাধি ও পরিচয়ের কথা লোকে ভুলিয়া যাইবার বহুদিন পরেও তাঁহার এই পরিচয় ও সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় দুইটি যে তাঁহাব এই প্রতিভার শক্তিকে এতদিন সরকারিভাবে স্বীকার করিতে পারেন নাই, ইহা তাঁহাদেরই দৈন্যের কথা। যাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবতঃ 'ডকটর' উপাধি দিতে পারিবেন, তাঁহাকে তাহা দিতে না পরিবার কারণ সাধারণ লোকের নিকট দুর্জ্ঞেয়। যাহা হউক, বিলম্বে হইলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে বাঙ্গালী সাহিত্যিকের যোগ্যতাকে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহাতে বাংলা সাহিত্যানুরাগীমাত্রেই আনন্দিত হইবেন। এই সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীরা যে শরৎবাবুর নিকট সম্পর্কে আসিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহাদেব পক্ষে কম লাভের কথা নহে।

বাংলাসাহিত্য বাংলার মুসলমান সমাজের চিত্র

বাংলার সর্ব্বজনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র (ডকটর) ঢাকা জগন্নাথ হলে সম্বর্দ্ধনার উত্তরে বলিয়াছেন যে, এতদিন তিনি বাঙ্গালী হিন্দুর চরিত্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু এইবার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি বাঙ্গালী মুসলমানদের পারিবারিক ও সামাজিক চিত্র আঁকিয়া কাটাইবেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এতদিন মুসলমান সমাজের কথা, সাহিত্যে বড় একটা স্থান পায় নাই। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নিখুঁত চিত্র যদি নিরপেক্ষভাবে পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়া দেখান হয় তবে তাহা দ্বারা উভয় সমাজেব মিলন হইতে পারে। প্রকাশ, বাংলার গভর্ণর স্বয়ং শরৎবাবুকে তাঁহার এই সঙ্কল্পের সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি যেভাবে হিন্দু সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, মুসলমান সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং সুখদুঃখের চিত্রও তিনি সেই প্রকার সহানুভূতিপূর্ণ ভাবে অঙ্কিত করিবেন।

আমরা আশা করি এই সংবাদে দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দিত হইবেন। বাংলা, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ভাষা, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের স্থান সমান নহে। বাঙ্গালী মুসলমানের মনে স্বভাবতঃই এজন্য ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। আমরা তাঁহাদিগকে উত্তরে বলিয়াছি, যে, বাংলাসাহিত্যে মুসলমানের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি যদি না থাকে, তাঁহাদের সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার চিত্র যদি অঙ্কিত না হইয়া থাকে তবে তাহার দায়িত্ব হিন্দু লেখকদের নহে; তাহা মুসলমানদেরই ঔদাসীন্য ও অক্ষমতার ফল। ইহার উত্তরে মুসলমানেরা অবশ্য কিছু বলিতে পারেন নাই। কিন্তু উত্তর দেবার মত কথা না থাকিলেই ক্ষোভ নিবৃত্ত নয় না; অক্ষমতার জন্য বঞ্চনা স্বাভাবিক হইলেও, লোকে তাহাকে সুস্থ স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না; অথবা হিন্দু সাহিত্যিকেরা সমানই দরদের সহিত যদি মুসলমান সমাজের চিত্র আঁকিতেন, মুসলমানদের মনোভাবেব উপর তাহার যে ফল হইত, সহানুভূতিহীন কথার দ্বারা তাঁহাদিগকে নিরুত্তর করিয়া দিতে পারিলেই কখন সে সুফল প্রত্যাসা করা যায় না। মানুষেব মন যখন ক্ষুব্ধ থাকে তখন সে কখনই নিবপেক্ষ বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে না। অতিরিক্ত পরিমাণে আরবী ফার্সী শব্দ চালাইয়া অথবা হিন্দু আদর্শের প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখাইয়া বাংলাভাষার ইস্‌লামী করণের যে একটা বিপথগামী চেষ্টা চলিয়াছে, এই ক্ষোভ হইতেই তাহার উৎপত্তি হইয়াছে। শরৎবাবুর শক্তি ও প্রতিভা, বঞ্চিত ও উপেক্ষিতের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি যদি মুসলমান সমাজের চিত্র অঙ্কনে নিযুক্ত হয়; শরৎবাবুর লেখনীর অপরূপ মায়াবলে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের অন্তরপ্রবাহ যদি বাংলা সাহিত্যে মূর্ত্তি পায়, তাঁহাদের মানসলোক ইহাতে প্রতিফলিত হয়, বাংলা সাহিত্যে যদি তাঁহাদের নিজ সমাজের মানবাত্মার মহিমার দীপ্তি তাঁহারা দেখিতে পান তবে, আমরা আশা করি, অনেক বিতর্ক ও যুক্তির অপেক্ষা তাহার ফল অনেক ভাল হইবে। ইহা বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধেই শুধু বাঙ্গালী মুসলমানদের মনোভাবকে

পরিবর্ত্তিত করিবে না; ইহা হিন্দু মুসলমানের মিলনের পথ প্রশস্ত করিবে এবং তাঁহাদের মধ্যের অপরিচয় ও উপেক্ষার আবরণ সরাইয়া দিবে।

নারীর উপর অত্যাচার

বাংলাদেশে নারীর উপর অত্যাচারের বহুলতা—বিশেষ করিয়া দলবদ্ধভাবে,—বাঙ্গালীজাতির পক্ষে গভীর লজ্জা ও কলঙ্কের কথা হইয়া রহিয়াছে। ইহার লজ্জার বা ইহা দূর করিবার দায়িত্বের অংশ হিন্দু-মুসলমানের কাহারও, একের অন্য অপেক্ষা কম নহে। এই সমস্যার সহিত কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন জড়িত আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। অত্যাচারিতারা সকলেই যদি হিন্দু হইতেন এবং অত্যাচারকারীরা সকলেই যদি মুসলমান সমাজের লোক হইতেন তবুও, কোন নিরপেক্ষ ন্যায়পরায়ণ লোকের ব্যাপারটিকে সাম্প্রদায়িক মনে করিবার সঙ্গত কারণ থাকিত না। আমাদের সমাজে সাধারণভাবে নারীর মর্য্যাদা পুরুষ অপেক্ষা অনেক কম হওয়ায়, একশ্রেণীর লোকে নারীর উপর অত্যাচার করিতে পারাকে পৌরুষের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকে এই প্রকার নিম্নস্তরের লোক সব সমাজেই কিছু কিছু আছে কিন্তু কোন সমাজেরই ভদ্র ও উচ্চস্তরে এই মনোবৃত্তি সংক্রামিত হইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। কোন এক সমাজের নারীরা মাত্র অন্য সমাজের পুরুষদের দ্বারাও যদি নির্য্যাতিতা হইতেন এবং তাহাতে অত্যাচারকারীদের সমাজের লোকেরা যদি মনে করিতেন যে, তাঁহাদের লাভ হইতেছে, তবে নিজ সমাজের স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে অন্ধ ব্যতীত আর কিছু মনে করা যাইত না। কারণ, যাহার উপর অনুষ্ঠানের ফলেই হউক না কেন, কোন এক সমাজের লোক যদি পাপ ও দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয় এবং সেই পাপের বিরুদ্ধে সমাজ সজাগ না হইয়া উঠে তবে একদিন সেই পাপ সমগ্র সমাজদেহে বিস্তৃত হইয়া যে তাহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি অত্যাচারিতারা সকলেই বা অধিকাংশই কোন এক বিশেষ সমাজের লোক হইতেন তবুও পূর্ব্বোক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত করা যাইত। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হইতেছে এই যে, অত্যাচারিতারা কোন এক বিশেষ সমাজের লোক নহেন; হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের নারীরা প্রায় সমসংখ্যায় দুর্ব্বৃত্তদের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকেন। ঢাকা পুলিশ প্যারেড উপলক্ষ্যে বাংলার গবর্ণর উভয় সম্প্রদায়ের নির্য্যাতিতা নারীদের গত বৎসরের সংখ্যা প্রদান করিয়া বলিয়াছেন:—

"ইহাকে কখন কখন যে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমি ২।১টি কথা বলিব। যে অঙ্ক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে অপরাধের যে সকল সংবাদ গত বৎসর আসিয়াছে তাহার মধ্যে ৫০৪টি ক্ষেত্রে অত্যাচারিতারা মুসলমান এবং ৩৩৬টি ক্ষেত্রে অত্যাচারিতারা হিন্দু। দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদের রক্ষার প্রয়োজন যে সমান, তাহা দেখাইবার পক্ষে উক্ত অঙ্কগুলি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত।"

এই প্রসঙ্গে বেত্রদণ্ডের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের উপর দলবদ্ধভাবে অত্যাচার অথবা পাপকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে চালাইবার সম্পর্কেই মাত্র ইহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকার ক্ষেত্রে, যে-শাস্তি ইহা প্রশমনের পক্ষে বিশেষভাবে ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ের সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরই সমর্থন সরকার আশা করিতে পারেন।

এণ্ডারসন খাল

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনসাধারণ নিজেদের কায়িক শ্রমের দ্বারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুরুলিয়া খালের সংস্কার সাধন করিয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা বাংলার পল্লী অঞ্চলের সকল স্থানের, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের লোকের অনুকরণীয়। খালটির দৈর্ঘ প্রায় তিন মাইল; ইহার এক পাড় দিয়া একটা রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে এবং মাটী কাটা হইয়াছে প্রায় ৭৪ লক্ষ ঘন ফুট। সাধারণ মজুরির হার অনুসারে ইহার মূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা হইতে পারে। এ সকল কাজই সম্পন্ন হইয়াছে লোকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমের দ্বারা। সর্ব্বশ্রেণীর লোকই এ কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। উদ্যম ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা যে কতটা কাজ হইতে পারে স্বাস্থ্যহীনতা, শস্যহানি প্রভৃতির কারণ যে আমাদের চেষ্টার ফলে কিছুপরিমানে দূর হইতে

পারে, পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের মরণোন্মুখ পল্লীগুলি যে ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার ফলে কতকটা নবজীবন লাভ করিতে পারে ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ার উদ্যোগী লোকেরা আমাদের সকলের সম্মুখে তাহার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। ইঁহাদের এই অনন্যসাধারণ কৃতিত্বে আকৃষ্ট হইয়া বাংলার মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর এই খালটির প্রতিষ্ঠা ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য গমন করেন এবং তাঁহার নামানুসারে ইহার এণ্ডারসন খাল নামকরণ হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে লাট সাহেব বলিয়াছেন যে, বিধ্বস্ত পল্লী-অঞ্চল, স্বাস্থ্যহীনতা, আলস্য ও দারিদ্র্য বাংলাদেশে যে অশুভ বেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছে অন্ততঃ একটা ক্ষেত্রেও তাহা ভগ্ন হইয়াছে। এইপ্রকার ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা যে কতটা সুফল পাওয়া যাইতে পারে, সেদিকেও তিনি বঙ্গবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরাও বলি, যদি আমাদিগকে বাঁচিতে হয়, ক্ষয়ের, রোগপ্রবণতার ক্রমবর্দ্ধমান গতিকে রোধ করিতে হয় তবে, অবিলম্বে আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে এবং বাধা যখন দুর্লঙ্ঘ্য, বাহির হইতে সাহায্য পাইবার ক্ষীণ আশাও যখন নাই তখনই স্বাবলম্বী হইবার শক্তি আমাদিগকে দেখাইতে হইবে। সম্পূর্ণভাবে না হউক, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার ফলে, আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতি যে অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। গবর্ণর বাহাদুরের কথায়, "এই একই উপায়ে জঙ্গল পরিষ্কার করা যাইতে পারে, অস্বাস্থ্যকর গ্রামগুলিকে পরিচ্ছন্ন করা যাইতে পারে; ম্যালেরিয়ার জন্মস্থানগুলিকে আক্রমণ করা যাইতে পারে, মজা পুকুরগুলি পুনরায় খনন করা যাইতে পারে, বা অস্বাস্থ্যকর ও বদ্ধ জলাগুলির জল নিষ্কাশন করার বা সে গুলিকে ভর্ত্তি করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে এবং এই উপায়ে কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলার পল্লী অঞ্চলকে উদ্যানে পরিণত করা যাইতে পারে। পল্লী অঞ্চল পরিচ্ছন্ন হইলে স্বাস্থ্য দেখা দিবে, স্বাস্থ্যের সহিত আসিবে বর্দ্ধিত উদ্যম, এবং যাঁহারা দীর্ঘকাল ব্যাপী গঠন মূলক প্রচেষ্টায় নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছেন, অসুবিধার বিরুদ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইবার অভ্যাসের সহিত তাঁহাদের আসিবে চরিত্রের শক্তি ও স্বাধীনতা।" আমাদের দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ, স্বাস্থ্যহীনতা এত বহুব্যাপক হইয়াছে যে, শুধু জনসাধারণের চেষ্টার দ্বারা তাহা সম্পূর্ণভাবে দূর হইবার সম্ভাবনা নাই এবং পূর্ব্ব বর্ণিত আশাপ্রদ চিত্র জনসাধারণের চেষ্টায় বাস্তবে পরিণত কখনই হইবে না। তবুও বাঁচিবার জন্য আমাদিগকে একবার শেষ সংগ্রাম করিয়া দেখিতে হইবে।

কিন্তু যখনই কোন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ আমাদের উদ্যম ও চেষ্টার অভাবকে ধিক্কার দিয়া আমাদিগকে সচেষ্ট ও স্বাবলম্বী হইতে উপদেশ দেন এবং আমাদের চেষ্টার দ্বারা দুঃখ কষ্টের অবসান হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন তখন তাহা নিষ্ঠুর পরিহাসের মত শুনায়। বাংলার বিশেষ করিয়া পশ্চিম ও মধ্য বাংলার পল্লীগুলির অবস্থা দীর্ঘ দিন হইতেই ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। নানাবিধ রোগের—ইহার মধ্যে ম্যালেরিয়াই প্রধান—প্রাদুর্ভাব এত বেশী হইয়াছে যে, কোন লোকই এই আবহাওয়ায় সুস্থ থাকিতে পারেন না। দীর্ঘ রোগ ভোগে এই সকল স্থানের অধিবাসীদের জীবনীশক্তি প্রায় শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, উৎসাহ, উদ্যম, নূতন কাজের ইচ্ছা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তদুপরি এ সকল স্থানের নদী মরিয়া যাওয়ায় ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বহুপরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, এবং দেশের সাধারণ-যে-দারিদ্র্য, তাহার অত্যাধিক অংশ এই সকল স্থানের লোকদের বহন করিতে হইতেছে। আমাদের দেশের দরিদ্র লোকদের জীবনযাত্রার মান কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে। সেই অবস্থাতেই যখন কোন প্রকারেই দুমুষ্টি অন্ন ও কটিবস্ত্রের সংস্থান হয় না, তখন দৈনন্দিন জীবনের আশু প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন কাজে যে লোকে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে, এ আশা নিতান্তই অমূলক। তাহার পর সমস্যা এমন বহুব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, এক সঙ্গে এত বিস্তৃত স্থানের লোকের পক্ষে একত্রিত হইয়া ধারাবাহিকভাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কোন ফলপ্রদ কার্য্য করা সম্ভব নহে। পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত বহু জটিল সমস্যা এত বড় বিস্তৃত স্থানে দেখা দিলে, তাহার সমাধানের জন্য যে সংঘ ও প্রণালীবদ্ধ কার্য্যের প্রয়োজন হয় তাহা এক রাজসরকার ব্যতীত অপর কোন লোক বা প্রতিষ্ঠানের সাধ্যের বাহিরে। নদীগুলির সংস্কারের উপর স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং দারিদ্র্যের প্রতিকার বহুপরিমাণে নির্ভর করিতেছে, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সে কাজে

হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নহে; তাহা যে নিরাপদও নহে সেকথা লাটসাহেবও তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন। শ্রম ব্যতীত জমির ক্ষতিপূরণ, পুল নির্ম্মাণ প্রভৃতির জন্যও বহু অর্থের প্রয়োজন হয়—এখানেও হইয়াছে।

রাষ্ট্রই মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির সর্ব্বাপেক্ষা বড় কেন্দ্র। যে কাজের জন্য মানুষের সংঘবদ্ধ চেষ্টার প্রয়োজন হয়, যাহা কর মানুষের একক শক্তিতে কুলায় না বুঝিতে হইবে সে কাজের দায়িত্ব সাধারণ লোকের নহে, দেশের রাজসরকারের। অথব দেশের লোকের শক্তির যে অংশ রাষ্ট্রের মধ্যে রূপ পাইয়াছে তাঁহাদের শক্তির সেই অংশকেই এই সব কাজের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

মানব সভ্যতার প্রথম যুগে যখন রাষ্ট্র দুর্ব্বল ছিল, তাহার শক্তি শৃঙ্খলা ও ক্ষমতা অনেক কম ছিল তখন, এব বহির্শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা ব্যতীত আর সব কিছুর জন্যই মানুষকে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইত। সভ্যতার অগ্রগমনের সহিত যতই শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল ততই দেশ রক্ষা ও শৃঙ্খলা রক্ষা হইতে রাষ্ট্রের কার্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য জীবিকা, রাস্তাঘাট, নদী নালা প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতির দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। এখনও যে দেশ যত সভ্য, যেখানে রাজশক্তি যত শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল সে দেশে মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্ব তত কম। পূর্ব্বে যে সব কাজ লোকে নিতান্তই ব্যক্তিগত বলিয়া মনে করিত, ক্রমেই সে সকল কাজের ভার রাজসরকারের উপর যাইয়া পড়িতেছে। রাষ্ট্রের শক্তি ও ক্ষমতার প্রসারের সহিত মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্ব আরও অনেক হ্রাস পাইবে।

মহামেডান স্পোর্টিংএর শীল্ডে সাফল্য

পর পর তিন বৎসর লীগে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া এবং একই বৎসরে লীগ ও শীল্ড প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া, মহামেডান স্পোর্টিং ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে নূতন গৌরবের অধ্যায়ের সূচনা করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত আমরাও তাঁহাদিগকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ক্রীড়াজগতে তাঁহারা ভারতের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছেন। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে তাঁহারা আরও অধিকতর সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হইবেন এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিস্তৃততর ক্ষেত্রেও তাঁহারা ভারতবর্ষের জন্য নূতন সম্মান ও মর্য্যাদা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। শীল্ড খেলায় তাঁহারা যে নৈপুণ্য, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

আমরা পরাধীন জাতি, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই পরাজয়ের গ্লানি আমাদিগকে ছোট করিয়া রাখিয়াছে এবং আত্মবিশ্বাস হরণ করিয়াছে। কলিকাতার ফুটবল প্রতিযোগিতা দুইটি অনেকটা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। ইহাতে জয়লাভ করিয়া মহামেডান স্পোর্টিং ভারতীয়দের মনে যে আত্মবিশ্বাস ও গৌরববোধ জাগাইয়াছেন তাহা ক্রীড়ার ক্ষেত্র ছাড়াইয়া জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইবে।

কংগ্রেসের ইতিহাস

শ্রীযুক্ত পট্টভি সীতারামিয়া কর্ত্তৃক লিখিত এবং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক সংশোধিত কংগ্রেসের ইতিহাসে বাংলার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে বলিয়া বাংলা কংগ্রেস কমিটি এই পুস্তকের সমালোচনা করিয়া যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাহার ফলাফল দেখিবার জন্য উৎসুক আছি। কিন্তু ডাঃ সীতারামিয়া করাচীতে এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে এই বিবৃতিটি তাঁহার পুস্তকের ভাল সমালোচনা হইয়াছে এবং ইহাতে সমালোচকদের মতামত প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যেক সমালোচকেরই নিজ মতের স্বাধীনতা আছে। আমাদের মনে হয় ডক্টর এই উক্তির দ্বারা বাংলার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কংগ্রেসের ইতিহাসে বাংলা সম্বন্ধীয় আলোচনা সম্পর্কে বাংলা কংগ্রেসের সুচিন্তিত অভিমতকে সাধারণ সমালোচনার পর্য্যায়ে ফেলিয়া বাংলার কংগ্রেস ও জনমতের প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন সম্ভবতঃ তাহা কংগ্রেস-ইতিহাসে বাংলার প্রতি তাঁহার কার্পণ্য প্রদর্শনের কারণ নির্ণয়ে সহায়তা করিবে।

হিন্দুদের প্রতি অবিচারের প্রতিবিধানের জন্য আবেদন

স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা আমাদের জাতীয়

ঐক্যের পথে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধার সৃষ্টি করিবে। এখনই ইহা দেশের মধ্যে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে, হিন্দুদের দুই দলের মধ্যে যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে; দেশকে যেসব কৃত্রিম দলে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে পূর্ব্বে তাহা অজ্ঞাত ছিল। ইহা গণতান্ত্রিকতার বিরোধী, গণতান্ত্রিক মনোভাবকেও ইহা নষ্ট করিয়া দিবে।

দেশে যে ইহা কিপ্রকারে কৃত্রিম দলবোধের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা হিন্দু আবেদনের (যাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে) স্বাক্ষরকারীগণের নামের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া অবসর প্রাপ্ত জেলা-জজ ও জেলাম্যাজিস্ট্রেটগণ পর্য্যন্ত সকল দলের সকল মতের রাজনীতিকগণ, বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, জমিদার ও প্রজাস্বার্থের সমর্থকগণ, অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ, একসঙ্গে সাক্ষর করিয়া, একই প্রার্থনা জানাইয়াছেন। ইহাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের একস্তর, তাঁহাদের স্বার্থবিরোধী অন্যস্তরের সহিত মিলিত হইয়া অন্যসম্প্রদায়ের নিজস্তরের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রার্থনা জানাইয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা দলবোধের মোহে ভারতের স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী হিন্দু রাজনীতিক ভুলিয়া গেলেন যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক ভেদ সত্ত্বেও তাঁহার পক্ষে একজন অবসর প্রাপ্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (শুধু তিনি হিন্দু বলিয়া) অপেক্ষা, তাঁহার সমমতাবলম্বী একজন মুসলমান রাজনীতিকের সহিত একযোগে কাজ করা অনেক সহজ এবং অনেক স্বাভাবিক। শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত, সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী হিন্দুদের উপরই ইহার প্রভাব যখন এই প্রকার হইয়াছে তখন অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর মুসলমান বা অন্যদের উপর ইহার প্রভাব যে অনুরূপ বা এতদপেক্ষাও খারাপ হইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কাজেই এই নিতান্ত অনিষ্টকর সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন বিধি এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন শাসনতন্ত্রের স্বরূপ যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে, যাহাতে ইহা নাকচ হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা সকল দলের, সকল সম্প্রদায়ের দেশহিতকামী ব্যক্তিদের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইবে। কিন্তু, বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে, কাহার ভাগ্যে কতটা জুটিল, কাহার পর কিছু অবিচার হইল, কাহারা অনুগ্রহ পাইল, তাহা লইয়া যদি আমরা আত্ম-কলহে প্রবৃত্ত হই তবে তাহার দ্বারা সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা বাড়িয়া যাইবে এবং আমাদের রাজনীতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে মাত্র।

দেশের কল্যাণের পক্ষে, জাতিধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রভৃতির কথা বাদ দিয়া, বিশিষ্ট রাজনীতিক মতের উপর, অর্থনীতিক স্বার্থের ভিত্তির উপর দল গঠনের অনিবার্য্য প্রয়োজন রহিয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ফলে যদি দেশে সাম্প্রদায়িক কলহ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়িয়া গিয়া থাকে এবং নানা সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং আমাদের কর্ম্মের ফলে যদি এই সকল কৃত্রিম ব্যবধানকে আমরা আরও বাড়াইয়া তুলিয়া থাকি তবে, তাহার দ্বারা আমরা ইহাই প্রমাণ করিয়াছি যে, রাজনীতিক কূট কৌশলের প্রতিযোগিতায় ইংরেজদের কাছে আমরা এখনও অনেক শিশু। এই সকল কারণে ভাগ বাঁটোয়ারার লাভ ক্ষতি, বিচার অবিচার লইয়া কোনপ্রকার আন্দোলন দেশের পক্ষে আমরা ক্ষতিকর মনে করি। এবং এই কারণেই হিন্দুরা 'সেক্রেটারি-অব-সটেট্‌স্‌'এর নিকট যে আবেদন পাঠাইয়াছেন (এবং যাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে) এবং বাহিরে যে আন্দোলন করিতেছেন আমরা তাহা সমর্থন করিতে পারি না।

হিন্দুরা নিজেদের বরাবর জাতীয়তার সমর্থক ও সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী বলিয়া আসিয়াছেন এবং ধর্ম্ম অপেক্ষা দেশ এবং সম্প্রদায় অপেক্ষা জাতিকে বড় স্থান দিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা সহজে একথা মনে করিতে পারিতেন যে, প্রতিনিধিরা যে সম্প্রদায় হইতেই আইন সভায় যান না কেন, তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালী। অবশ্য ইহা মনে করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা হইতেছে এই যে, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার ফলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ আইন সভায় আসিবেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং অসাম্প্রদায়িক কার্য্য আশা করা যাইবে না। এই সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক মনোভাব লইয়া যাঁহারা আইন সভায় যাইবেন কার্য্যতঃ দেশের কতটা ক্ষতি তাঁহারা করিতে পারিবেন তাহা একবার খতাইয়া

দেখা দরকার। তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা এই বড় ক্ষতি করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় যে, তাঁহারা নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবেন। যাঁহারা ইহাকে জাতীয়তা ও গণতান্ত্রিকতার বিরোধী বলিয়াছেন, তাঁহারাও নিশ্চয়ই এই ক্ষতিটাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ক্ষতি মনে করিবেন। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা অক্ষুণ্ণ থাকিলে, দুই একটি আসনের যদি রদবদল হইতও, তাহা হইলেও এই ক্ষতির সম্ভাবনা কিছুমাত্র কমিত না। বরং এই চেষ্টা করিতে যাইয়া যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বা হইতেছে, তাহার দ্বারাই দেশের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতার ভাব পাকা হইয়া যাইতেছে এবং তাহার ফলে অধিকতর সাম্প্রদায়িক লোকদের আইন সভায় আসিবার সুযোগ বাড়িয়া যাইতেছে। এই প্রকারে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের ক্ষতির দিকটা আমরা বুদ্ধির দোষে বাড়াইয়া দিতেছি।

নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের অসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালী মনে করিবার পক্ষে অসুবিধা হইতেছে যে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে যে ভাল হইত তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যাহাতে ইহা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার জন্য সকলকেই নিরলস ভাবে চেষ্টাও করিতে হইবে, কিন্তু, তাহার সহিত অন্যান্য দাবী মিশাইলে (যাহা হিন্দু আবেদনে মিশান হইয়াছে) সংযুক্ত নির্ব্বাচনের দাবী দুর্ব্বল হইয়া যাইবে এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভিতরে ভিতরে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়িয়া উঠিবে যাহাতে সংযুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে আরও বিলম্ব হইবে; এবং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক হইবার, নিজেদের অসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালী মনে না করিবার অধিকতর সুযোগ পাইবেন। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক অবিচারের জন্য যদি হিন্দুরা আন্দোলন হইতে বিরত হন তবে, আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা কমিয়া যাইবার ফলে, অধিকতর অসাম্প্রদায়িক লোকেরা আইন সভায় যাইবার অধিকতর সুযোগ পাইবেন। পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা যখন আপাততঃ আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইতেছে তখন তাহার অশুভ প্রভাব যাহাতে সর্ব্বনিম্ন হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টা করিতে হইলে, কোন প্রকার ক্ষোভ প্রদর্শন বাদ দিতে হইবে এবং সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্ব্বাচিত সদস্যদের নিকটও অসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালীত্বের দাবী করিতে হইবে। এই ব্যবহার এবং এই দাবীর ফলেই তাঁহাদিগকে অসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালী হইয়া উঠিতে হইবে।

যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতাকে বিশেষ অনিষ্টকর বলিয়া মনে করেন এবং সেই জন্যই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার অবসান দেখিতে চান, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সাময়িক লাভ ক্ষতি অপেক্ষা যাহাতে সাম্প্রদায়িক প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে পারে তাহা (যাহার উপর সংযুক্ত নির্ব্বাচন প্রথার প্রবর্ত্তনও নির্ভর করিতেছে), তাঁহাদের পক্ষে অনেক বড় কথা। তাঁহারা যদি পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা রহিত করিবার আন্দোলনের সহিত সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি অবিচারের কথা মিশাইয়া ফেলেন তবে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগিবে এবং তাঁহাদের আন্দোলনও সে দিক দিয়া শক্তিশালী হইবে না।

হিন্দুদের মধ্যে অনেকে বোধ হয় এই মনে করিয়া ভীত হইয়াছেন যে আইন সভায় তাঁহাদের শক্তি কমিলে হয়ত, তাঁহাদের সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে। কিন্তু এখানেও মনে রাখিতে হইবে, আমাদের সামাজিক জীবনে অহরহ যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে, এবং যাহাকে আমরা নানাভাবে বাড়াইয়া তুলিতেছি সেই প্রতিযোগিতাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সেখানেও বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের মনে যদি এই প্রতিযোগিতার ভাব না থাকিত তবে, হিন্দুর সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোন অযৌক্তিক কথা বলিয়া মুসলমানের নিকট অথবা মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন অযৌক্তিক কথা বলিয়া হিন্দুর নিকট কেহ বাহবা বা সমর্থন পাইত না। কাজেই, সংস্কৃতি যদি বিপন্ন হইয়া থাকে বা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়া থাকে তবে, তাহার মূলে রহিয়াছে একের সম্বন্ধে অপরের মনের অবস্থা। ব্যবস্থাপক সভায় অধিকসংখ্যক আসনের দ্বারা এই বিপদ দূর করা যাইবেনা; প্রীতি এবং সদ্ভাবের চর্চ্চাই ইহা দূর করিবার একমাত্র উপায়। যদি ধরা যায় যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দ্বারা

মুসলমানদের কিছু লাভ হইবে এবং হিন্দুদের কিছু ক্ষতি হইবে তাহা হইলে সাধারণভাবে হিন্দুদের ততটা ক্ষোভের কারণ এইজন্য থাকিত না যে, দেশের লোকের যাহাদেরই প্রকৃত লাভ হউক তাহা দেশের লাভ। কিন্তু সম্ভবতঃ এই জন্য তাঁহারা একথা মনে করিতে পারিতেছেন না যে, লাভের লোভ তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করিবে, এবং দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে এইটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতির ব্যাপার হইবে। অর্থাৎ কথাটাকে যেদিক দিয়াই দেখা যা'ক ইহার এই ক্ষতির দিকটাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া দেখা যাইবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে সেই লোভ পূর্ব্বেই জাগ্রত হইয়াছে কাজেই, যাহাতে অপর পক্ষের মনে এই সন্দেহ না জন্মায় যে তাঁহাদের লাভে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াই হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করিতেছেন, সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

এই প্রসঙ্গে আমাদের সর্ব্বোপরি মনে রাখিতে হইবে যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় বর্ত্তমানে হিন্দুদের ক্ষতি যতই হউক, এই উপলক্ষ্যে একটা কলহের সৃষ্টি হইলে এবং ইহা লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা স্থায়ী বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখা দিলে (যাহার দোষেই হউক) তাহা দেশের মুক্তি সম্ভাবনাকে অনেক পিছাইয়া দিবে এবং তাহাতে তাঁহাদের এবং সমগ্র দেশের যে ক্ষতি হইবে তাহার তুলনায় বর্ত্তমান ক্ষতি নিতান্তই তুচ্ছ। অপর পক্ষের যদি অন্যায় জেদও থাকে তবুও, তাহার উত্তরে জেদ দেখাইয়া কোন লাভ হইবে না বরং নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই ইহার ক্ষতিকর দিকটা উদ্‌ঘাটিত করিয়া, আমাদের নিজেদের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের প্রশ্নটা বড় নহে কার্য্যক্ষেত্রে তাহার প্রমাণ দিয়া ইহার ক্ষতিকর প্রভাবটা কমাইবার চেষ্টা করা অনেক লাভের হইবে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমান লোকেরাও এই কথাটা ভুলিয়া আত্মহত্যাকর নীতির অনুসরণ করিতেছেন এবং এমন ভাব দেখাইতেছেন যে, আমাদের মুক্তির সম্ভাবনা পিছাইয়া যায় যাক, পরাধীনতা স্থায়ী হয় হ'ক তবুও নিজের লোকের অন্যায় জেদকে আমরা কিছুমাত্র সহ্য করিতে রাজী হইবনা।

অন্যদিকে, মুসলমানদেরও মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা আপাত লাভের যে সম্ভাবনা দেখিতেছেন তাহা তাঁহাদিগকে অধিক দূরে লইয়া যাইতে পারিবে না—এক ধর্ম্মের লোক বলিয়াই তাঁহাদের সকলের স্বার্থ এক নহে। সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত বড় হইয়া উঠায় অন্য ধর্ম্মের সমস্বার্থ-বিশিষ্ট লোকদের মিলিত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িতেছে এবং দেশের বৃহত্তর কল্যাণ হইতে যেখানে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক কল্যাণ (আপাত দৃষ্টিতে) যেখানে পৃথক আসনে সেখানে তাহা কল্যাণের ছদ্মবেশ মাত্র। সেখানে তাঁহারা কতকগুলি লোকের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছেন। তাঁহাদের পক্ষেও সহিষ্ণুতার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা ভাবাবেগহীন বিচারের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটাইবার প্রয়োজনীয়তা সমানই আছে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর হইলেই তবে, সকল সম্প্রদায়ের লোক লইয়া বিশেষ রাজনীতিক মত বা অর্থনীতিক স্বার্থকে ভিত্তি করিয়া দল গঠন করা যাইবে এবং তাহার দ্বারাই একমাত্র তাঁহাদের ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল সম্ভব হইবে। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত যে তাহার পক্ষে অন্তরায় একথা তাঁহাদিগকেও বুঝিতে হইবে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

পল্লী-বর্ষা

শ্রীশান্তি পাল

আকাশ হ'য়েছে ঘোলা,—
আজিকে আষাঢ়ে প্রাণের দুয়ারে কে যেন দিতেছে দোলা।
ঘন কালো মেঘ চলিতে চাহেনা—ছলছল জলধারা,
কাননকুমারী মাটির গন্ধে হইয়াছে ঘর ছাড়া।
বাদল বাতাসে উতলা আকুল, বাহিরিয়া আঙিনায়,
পিপাসা-কাতর চাতকের মত জলদের পানে চায়।
কালিয়া মেঘের কোমল কাজল সজল বরণ দেখে,
বেড়ার গায়েতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া নখের আঁচড় লেখে।
মুখের উপর উড়িয়া পড়িছে দীঘল আউল কেশ,
মনের আড়ালে নয়নের জলে ভিজায় বুকের বেশ।
ভিন্-দেশী তার বন্ধুর লাগি কাজল গলিয়া যায়,
বাদলের জলে ভিজিয়াছে মাটি—আল্তা রঙীন পায়।

উড়িছে গোলের ছৈ,—
মাঠের কিনারে কানায় কানায় জল করে থৈ থৈ।
ক্ষেত-খোলা সব ভরিয়া গিয়াছে—সবুজে ঘোলাটে ছেয়ে,—
গাঁয়ের ওপারে অশথের শিরে বরষা নামিছে ধেয়ে।
দূরে গাছপালা ঝাপ্‌সা হ'য়েছে, ঝাপ্‌সা শ্যামল বাট,
বাঁশের কেরুলে ঝিঁঝিঁর ঝাঁঝর, জনহীন পথ ঘাট।
বেতসের বনে বাঁশরী বাজিছে বাউল বিভোল বায়,
শুকনো পাতারা ভাসিয়া ভাসিয়া লুটায়ে পড়িছে পায়।
কৃষাণ কুমার ছিপ্‌টি লইয়া ঘুরিছে বিলের ধারে,—
গুগ্‌লী টোপের জাওলা জাগায়ে নেউটিয়া তারে নাড়ে।
চিড়া ও চাউল কোঁচড়ে ভরিয়া বাটিয়া গুটিয়া খায়,
টোপের টানায় নয়ন নিমেষে ডাঙায় তুলিছে তায়।
কৃষাণ কিশোর নাবল জমিতে হাওড় হাবড় ঠেলে,
কটিতে কসিয়া কাছ্‌লা কাপড় বীজের ধান্য ফেলে।
কৃষাণ কনেরা ঘুণী বসাইয়া ভাঙনের ধারে ধ'রে,
আওড় জলেতে দোয়াড় ফেলিয়া চিতল কাতল মারে।
এ-হেন বাদলে বিউনী বাতাস আছাড়ি' বিলের 'পরে,
বিরহী বালার প্রথম চুমার সরস শবদ করে।

গুরু গুরু ডাকে দেয়া,—
শালুক ফুটেছে, শাপলা ফুটেছে, কাননে ফুটেছে কেয়া।
যুঁই চাঁপা বেল, কদম কেশর, কাঞ্চন লতা কত,
রজনী-গন্ধা কাঠ-মল্লিকা বকুল মালতী শত।
আজিকে আষাঢ়ে পথ ঘাট সব পিছল হ'য়েছে ভারি,
বকুল কুড়াতে কাননকুমারী শাখায় জড়াল শাড়ী।
পথের মায়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটিরে দলিয়া চলে,—
শতেক কাজের মাঝারে থেকেও বুকের আগুণ জ্বলে।
জানিনা সে আগ্‌ কেমনে নিভিবে, কখন গাঁথিবে মালা,
কোকিল কুহরে যাও যাও ঘরে, বিরহী কাননবালা।

আশায় বাঁধিয়া বুক,—
পথের কিনারে দাঁড়ায়ে ক্ষণেক ভাবিল কাহার মুখ।
সে-মুখ চাঁদের বিমল জোছনা যেমনি পড়িল মনে,
কানন ছাড়িয়া চকিতে চলিল মাটির ঘরের কোণে।
কত না ছন্দে কবরী বাঁধিল, বকুলের মালা তাতে,
সিঁথায় সিঁদুর আঁকিল যতনে, কাজল আঁখির পাতে
ভিন্-দেশী তার বন্ধুর লাগি সাজায়ে ফুলের ডালা,
উছল নয়নে দাঁড়ায়ে রহিল কিশোরী কাননবালা।
মাটির প্রদীপ জ্বালিল কতই তুলসী মঞ্চ তলে,
প্রণাম করিল আলায়ে বালায়ে আঁচল জড়ায়ে গলে।
দু'হাত যুড়িয়া কি কথা কহিল, কি গান গাহিল তারা,
কি ভাষা তাহার, কি সুর কি ছাঁদ, কে জানে কেমন ধারা!

অচল প্রেম

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

৪

ডাক্তারী পাশ করিয়া হিমাংশু প্রায় এক বৎসর ঘরে বসিয়া আছে। ঘরে বসিয়া থাকা অর্থে পিতৃপিতামহের অধ্যুষিত প্রসাদপুর গ্রামে নিছক বসিয়া থাকা নহে। কারণ, সে সর্ব্বদা সেখানে থাকিত না,—কখনও গ্রামে, কখনও বা কলিকাতার বাসায় থাকিত। তবে এটা ঠিক যে, সে নিকর্ম্মা বসিয়াছিল। ডাক্তারী ব্যবসায়ে তাহাকে মনোযোগ দিতে বলিলে সে পরম আগ্রহ ও উৎসাহভরে স্ব-গ্রামের ও আশ-পাশের গ্রামের এ পাড়া সে পাড়া করিয়া বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করিত,—এমনকি দরিদ্রদের বিনা মূল্যে ঔষধ পথ্যাদিও বিলাইত। সেজন্য তাহাকে এক বৎসর যাবৎ কেহ একটি পয়সাও উপার্জ্জন করিতে দেখে নাই। গ্রামে কংগ্রেস কমিটী গঠনে, জাতীয় পতাকা উত্তোলনে, শোভাযাত্রা পরিচালনে, সভাধিবেশনে সে অগ্রণী হইত, এবং পূজা-পার্ব্বণে ও শবদাহাদি কার্য্যে তাহাকে সর্ব্বাগ্রে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাইতে দেখা যাইত।

ইহার কারণও ছিল, কেন না হিমাংশুর অর্থোর্জ্জন করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। তাহার পিতৃপুরুষরা গ্রামের ছোটখাটো ভূস্বামী, তাহার উপর হিমাংশুর পিতা চন্দ্রমাধব বাবু মুনসেফী হইতে সেসন জজিয়তি পর্য্যন্ত সরকারী চাকরী করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের পর মোটা টাকা পেনসন পাইতেন। আলিপুরে সবজজ থাকিবার কালে তিনি ভবানীপুরে বলরাম বসু ঘাট ষ্ট্রীটে একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার একাংশ ভাড়া দেওয়া হইত, অপরাংশ দ্বারবানের জিম্মায় চাবী দেওয়া থাকিত, পিতা বা পুত্র কলিকাতায় থাকিলে সেই অংশে বাস করিতেন। ইদানীং কর্ত্তা যোগেযাগে ছাড়া প্রায়ই কলিকাতায় যাইতেন না, হিমাংশুই কখনও কখনও কলিকাতায় যাতায়াত করিত।

চন্দ্রমাধব বাবু বিপত্নীক। তাঁহার সংসারের মধ্যে পুত্র হিমাংশু এবং কন্যা রেখা। তা ছাড়া দূর সম্পর্কের কয়জন পোষ্য-পোষ্যাও যে ছিলেন না তাহা নহে। কিন্তু সংসারে অর্থের অনটন না থাকিলেও এবং হিমাংশু একমাত্র পুত্র হইলেও চন্দ্রমাধব বাবু উপযুক্ত পুত্রের অলসভাবে জীবন যাপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রকাশ্যে পুত্রকে কিছু না বলিলেও অন্তরে তিনি পুত্রের প্রতি এজন্য অসন্তুষ্টই ছিলেন। বিশেষতঃ তাহার দায়িত্বহীন, উদ্দেশ্যহীন, ফলহীন গ্রাম-সর্দ্দারীতে তিনি কিছুদিন হইতে তাহার প্রতি বিরক্তই হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দীপ্তিরা কল্যাণপুরে আসিবার কিছুদিন পরে হিমাংশু পিতাকে নির্জ্জনে একটি প্রস্তাব করিবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল। বলি বলি করিয়াও সে সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া কথাটা বলিতে পারে নাই। কারণ, চন্দ্রমাধব বাবুর অন্তরে পুত্রস্নেহ যতই থাকুক, বাহিরে তাহা প্রকাশ পাইত না—তিনি ছিলেন অতিমাত্র রাসভারী মানুষ। এজন্য পিতা-পুত্রে বিশ্রম্ভালাপ প্রায়ই হইত না।

একদিন সে সাহসে বুক বাঁধিয়া কথাটা পাড়িবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তাহার সাহসে কুলাইল না, দুই একটি কথার পর পিতার গম্ভীর মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তাহাকে কিছুই বলিতে হইল না, কর্ত্তা চন্দ্রমাধব বাবু স্বয়ং বলিলেন, "বোসো, কথা আছে।"

হিমাংশুর বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল, সে শয্যার একপ্রান্তে কোনরূপে উপবেশন করিল।

চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন, "দেখো, অনেক দিন থেকে মনে

করছি তোমায় বোলবো, কোথাও স্থিতভিত হয়ে বসে প্র্যাকটিস করবার চেষ্টা দেখ। এমন ক'রে হৈ-হৈ করে বেড়িয়ে ত আর চিরকাল কাটবে না।"

হিমাংশু বিনীত কণ্ঠে বলিল, "যে বিষম কম্পিটিশন—ঘর থেকে প্রথম মুখে কিছু বেশী রকমের টাকা ফেলতে না পারলে—"

কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন,—"কি রকম? একেবারে বাথগেট এণ্ড-কোঁ না হলে চলে না বুঝি?"

হিমাংশু বলিল, "না, তা বলছি না। ছোটখাটো খুলে ডিসপেনসারী করলেও ত দাঁড়ায় না এ কালে।"

কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন, "তা বলে ত বসে থাকলেও চলে না। এ বয়সে কাজে লাগতে না পারলে চির জীবনটাই আলস্যে কাটে, আমার ত এই বিশ্বাস।"

"না, ব'সে নেই, চেষ্টা করছি, তাই বোলবো বলেই এসেছিলুম।"

"বটে? তা, কি চেষ্টা করেছো শুনি? নীরদ বাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলে?"

"না। শুনলুম তাঁর এক জামাই এবার এম্-বি-র ফাইনাল দিয়েছে। সে পাশ হলে তিনি তাঁকেই ডিসপেনসারীতে বসাবেন, ব্যাক করবেন।"

"সে কথা ভাববার তোমার দরকার নেই। আমার ছেলে ব'লে পরিচয় দিলে তিনি রিটায়ার্ড সিভিল সার্জ্জন, সার্ভিসও যোগাড় ক'রে দিতে পারতেন ত।"

"চাকরী আমি কোরবো না,—বিশেষ সরকারী চাকরী"

চন্দ্রমাধব বাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তবে কি করবে? মিটিং ক'রে নিশেন উড়িয়ে ত দিন চলবে না তোমার। বাপের পয়সায় ব'সে ব'সে ভাত খাওয়া ত আর পৌরুষের কথা নয়। আর তা ছাড়া, সেই বাপই যখন সরকারী চাকরে, এখনও পেনসন খাচ্ছে!" কথাটায় বেশ একটু ঝাঁঝ ছিল।

হিমাংশু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "চেষ্টা করছি যাতে স্বাধীন ভাবে রোজগার করতে পারি। তবে তাতে কিছুদিন সময় নেবে, আর প্রথম মুখে ঘর থেকে কিছু খরচও করতে হবে।"

কর্ত্তা বুঝিলেন পুত্র অন্তরে ব্যথা পাইয়াছে। ব্যথা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। যদি উপযুক্ত পুত্র হাতের কাছে সব পায়, মুখের কথা খসিলেই যদি পাঁচটা দাস-দাসী ছুটিয়া আসে সেবা পরিচর্য্যা করিতে, তাহা হইলে সে ছেলে কখনও মানুষ হয় না, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। তথাপি ছেলেকে জীবনের প্রথম সংঘর্ষে একটু ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া না দিলে এই বিষম প্রতিযোগিতার দিনে সে যে বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না, ইহাও তিনি বুঝিতেন। তবে সে জন্য ছেলেকেও উদ্যোগী হইতে হইবে, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। তাই মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, কি স্বাধীন ব্যবসা করবে বল না, চাকরী যে করতেই হবে এমন কথা ত বলিনি। যা হোক, একটা কোনো কাজে লেগে যাও, এই আমার ইচ্ছে।"

"আজ্ঞে হাঁ, তারই চেষ্টা করছি। একটা মুখোমুখি বন্দোবস্তও এক রকম করে ফেলেছি এক জনের সঙ্গে—"

কর্ত্তা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, না, অমন কাজটি করো না, বকরাদারী কাযে যেও না, বাঙ্গালীর ধাতে পার্টনারসিপ সয় না।"

হিমাংশু বলিল, "না, ঠিক ভাগীদার না। আমারই থাকবে ডিসপেনসারী, তবে এই মিড্‌ওয়াইফ ও লেডি ডক্টরটি আমার কাছে কমিশন নিয়ে কাজ করবেন, পেসান্ট যোগাড় ক'রে দেবেন—আর ওঁর একটি এজেন্ট আছেন, খুব ভাল ক্যানভাসার, বিলেত টিলেত ঘুরে এসেছেন—ক্রেডিটে ওষুধ কেনবার আর ওষুধ বিক্রি করবার কায়দা-কৌশল জানেন, বিজ্ঞাপনেও এক্‌সপার্ট—

কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন, "রোসো, রোসো, তুমি না মিড্‌উইফারীতে ফার্ষ্ট হয়েছিলে?"

হিমাংশু মস্তক অবনত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

কর্ত্তা প্রসন্নমুখে বলিলেন "হুঁ! তা, একজন পাকা ধাই ব্যাক করলে মন্দ হবে না, বিশেষতঃ ওতে নতুন ডাক্তারের সুবিধে হতে পারে বটে। তবে, দেখতে হবে, ওরা লোক কেমন। আগে ওদের খবর নিতে হবে ভাল ক'রে—আমি বাপু কলকাতার জোচ্চোরদের বড্ডো ভয় করি।"

হিমাংশু বলিল, "না, না,—ইনি গঙ্গাজল মুবারকা হাঁস-পাতালের সিনিয়র নার্স—নিজে লেডী ডক্টর, তা ছাড়া

এঁদের রাসবিহারী এভেনিউয়ে চেম্বার আছে। সম্প্রতি প্রসাদপুরে এসেছিলেন কলে, আমি তার পরে তাঁকে সনৎদার অনুরোধে পাশের গাঁয়ের জমিদার বাড়ীতে কলেরা পেসান্টকে নার্স করবার কল জুটিয়ে দিয়েছিলুম; আমিও সেখানে সদরের ডাক্তার বাবুর এসিষ্টান্ট হয়ে গিয়েছিলুম; সেইখানেই কথাবার্ত্তা হয়েছে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "জমিদার বাড়ী? কাদের, দীপ্তিময়ীদের বাড়ী?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"হুঁ, ভাল কথা। দেখো হিমু, তোমার বয়সে সংসারে ঢোকবার সময় একটা বড় রকমের নোঙর থাকা ভাল—আমি তোমায় থিতভিত ক'রে দিতে চাই—তা হলেই সংসারের উপর একটা টান হবে, রোজগারের দিকেও মন যাবে।"

হিমাংশু এ হেঁয়ালির অর্থ বুঝিল না, সংশয়াকুল মনে নীরবে বসিয়া রহিল।

কর্ত্তা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "কি জান, আমি তোমার বিবাহ দিতে চাই—আমার সংসারে লক্ষ্মীশ্রী নেই, আমি সেই অভাব বড়ই অনুভব করি—"

হিমাংশু কাঠ হইয়া বসিয়া এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিল, বলিল, "বিবাহ আমি এখন কোরবো না।"

চন্দ্রমাধব বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঈষৎ রুষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার মানে? সন্ন্যাসী হবে না কি?"

হিমাংশু ঘামিয়া উঠিল, ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "না, তা না, তবে এখনও বিবাহের সময় হয়নি।"

কর্ত্তা রুষ্ট স্বরে বলিলেন, "সে আমি বুঝবো। কেন সময় হয়নি শুনি?"

"একটা কাজে ঢোকবার মুখে—"

"দেখো, আমি ওসব কথা মানিনে—ঐ যে বলে, রোজগার না ক'রে বিয়ে করলে চিরকালটা একপাল ফুপোষ্য নিয়ে হা-হা ক'রে বেড়াতে হয়, আমি তা বিশ্বাস করিনে। আমার মনে হয়, ঘাড়ের উপর ভার না পড়লে মানুষ কাজে এগুতে চায় না। তা ছাড়া তোমার এমন অবস্থা নয় যে, আজই তোমার রোজগার করে এনে পরিবার প্রতিপালন করতে হবে।"

হিমাংশু ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এই যে বললেন, আমার রোজগার করার দরকার হয়েছে?"

চন্দ্রমাধব বাবুও হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "হাঁ, তা হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা তোমার নিজের জন্যে, সংসার বা পরিবারের জন্যে নয়, বুঝেছো? লেখা পড়া শিখে বসে থাকা ভাল নয় বলেই বলছি। বিয়ে করলে সে ভার তোমার এখনই নিতে হবে নাত।"

হিমাংশু বলিল, "এতবড় একটা দায়িত্ব—না ভেবে চিন্তে—"

কর্ত্তা গুড়গুড়ির নলটি নামাইয়া কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিবার পর বলিলেন "একশোবার এক কথা ব'লে কোনো লাভ আছে কি? দায়িত্ব—দায়িত্ব—আরে ব'লেই ত দিচ্ছি, সে দায়িত্ব তোমায় ঘাড়ে করতে হবে না। চিরকাল এদেশে মা-বাপই দায়িত্ব নিয়ে দেখে শুনে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে আসছেন, দায়িত্ব ছেলে মেয়েরা নেয় না। তোমাদের জন্যে কি নতুন সৃষ্টি হবে?"

হিমাংশু মাথা নীচু রাখিয়াই মৃদুস্বরে বলিল, "সেটা কি ভাল করেন?"

চন্দ্রমাধব বাবু এবার সত্যই ক্রুদ্ধ হইয়া শয্যার উপর চপেটাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "পাঁচশোবার! যাক্, তর্কো আমি করতে চাইনে। আমার যা বলবার সবই বলছি। সম্বন্ধ আমি ঠিক করছি—আর ঠিক করছি কেন, আমার পক্ষে এক রকম ঠিকই করাই হয়েছে, এখন অপর পক্ষের মত হলেই হয়। যদি কথা দিই, তা হলে তার এক চুলও নড়চড় হবে না, বলে রাখছি। যাও।"

কর্ত্তা ঘন ঘন নল টানিতে লাগিলেন।

হিমাংশু জানিত, যদি আকাশও ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার পিতার হুকুম নড়িবে না। সুতরাং সে বিষয়ে আর কোন কথা না তুলিয়া কেবল বলিল, "তা হলে কল্‌কাতায় ডিস্‌পেনসারী খোলার কি হবে?"

কর্ত্তা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বলেইছিত, আগে ভাল করে খোঁজ খবর নাও, তার পর যা হয় করা যাবে। টাকার জন্যে ভাবতে হবে না।"

হিমাংশু কতকটা স্বস্তি অনুভব করিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সে একটা কথা মনের মধ্যে তোলা পাড়া করিতে লাগিল। জানিতে সত্যই কৌতুহল হইল, সম্বন্ধ কোথাকার, বিবাহের পাত্রীটি কে?

৫

সেদিন নীহারদের, পাশের গ্রামে রেখাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ। নীহার নিজের শয়ন কক্ষে এক রাশ কাপড় চোপড়ের মধ্যে বসিয়া আছে, এখনই সাজ গোজ করিতে হইবে। বাছাই আর হয় না! এখনই হয় ত গ্রামের মেয়েরা ডাকাডাকি জুড়িয়া দিবে।

হঠাৎ দীপ্তি অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বার পথে আসিয়া দাঁড়াইল। নীহার সমস্ত ফেলিয়া দিয়া আহ্লাদে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিল। দুই বন্ধুতে বসিলে পর নীহার বলিল, 'তার পর? কেমন লাগছে পাড়াগাঁটা? সেই যে একদিন এসে দেখা করে গেলি, তারপর আর মনিষ্যির উদ্দেশ নেই—"

দীপ্তি বলিল, "বারে! উল্টো চাপ বুঝি? মামাবাবুর অতবড় অসুখ, আমি কি করে আসি বল দিকি? আমি ত এসেছিলুম একদিন, তুই ক'দিন গেছিস বল ত?"

নীহার বলিল, "কি করি ভাই, পাঁচজনের সংসার, তোর মত ত স্বাধীন নই—"

দীপ্তি বলিল, "মরণ! এর নাম বুঝি বিয়ে?"

নীহার বলিল, "দেখিস্—আবার ঐ মুখেই একদিন উল্টো কথা শুনবো। সত্যি, মনটন ফিরলো? বিয়ের ফুল ফুটবে, না থুবড়ী বুড়ীই থাকবি?"

দীপ্তি তাহার খোঁপায় একটা টান দিয়া বলিল, "তোর মুণ্ডুতে মনটন ফিরবে। পোড়ারমুখী! তোরা বিয়ে নিয়ে করেই গেলি! যেন বাঙালীর মেয়ের বিয়ে ছাড়া অন্য কাজ নেই আর কিছু! ও কথা ত সেদিনও বলেছিলি।"

নীহার বলিল, "ওমা, বিয়ে ছাড়া আবার মেয়েদের কাজ কি আছে শুনি? তুই কি করবি বল দিকি—ভেক নিয়ে বষ্টুমী হবি না চিমটে নিয়ে গেরুয়া রুদ্রাক্ষী পরবি?"

দীপ্তি অবজ্ঞাভরে বলিল, "না, তা কেন,—তোর মত ছি-চরণ সেবিকা দাসী হয়ে রেঁধে বেড়ে খাওয়াবো, নিজে পাদোদক খেয়ে স্বর্গে যাবো, আর দুখানা সাড়ী এনে দিলে কি নমাসে ছমাসে টকি সিনেমা দেখিয়ে আনলে আদরে গলে যাবো! তুই হলি কি,বল দেখি?"

নীহার বিন্দুমাত্র রুষ্ট বা অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "আমরা ভাই মুখখু মানুষ, তোর মত ত পাশের উপর পাশ দিইনি। আমাদের এই শ্রীচরণ সেবিকা হওয়াটাই বেশ লাগে।"

দীপ্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, "এঁ্যা, বলিস কি? এই পাড়াগাঁয়ে একঘেয়ে একটানা রাঁধাবাড়া"—

নীহার বলিল, "মন্দ কি? একঘেঁয়ে বলিসনে, ভাই, এখানে যে পরশ পাথর আছে, তা ত জানিসনে।" নীহার মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

দীপ্তি বলিল, "পরশ পাথর?—সে আবার কি?"

নীহার তাহার রক্তকমলদলতুল্য কোমল গণ্ডে ছোট একটি টোকা মারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বুঝবি লো বুঝবি—যখন বিয়ের ফুল ফুটবে তখন বুঝবি!"

দীপ্তির মুখখানি অকস্মাৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। কথার অর্থ বুঝিবামাত্র সে যেন দর্প করিয়া জলিয়া উঠিয়া বলিল, "তোদের পরশমণি তোদেরই থাক্। তোদের মত ন্যাজ কাটা শেয়াল কেউ হতে চায় না। পরশমণি! উঃ একেবারে দাসী ব'নে গেছিস?"

নীহার সদা হাস্যাননা। সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, "দাসী বনা কাকে বলে জানিনে ভাই—দুটি প্রাণ এক হওয়ার নাম, ভালবাসার নাম যদি দাসী বনে যাওয়া হয়, তাহলে তাই বনে গিয়েছি বটে।"

দীপ্তি বলিল, "জানিস ত, কলেজের সুরোদিদি বল্তো, আমাদের দেশে বিয়ে আর ভালবাসার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। বিয়েটা সন্তানের জন্যে, সংসারের জন্যে, বংশের জন্যে, সমাজের জন্য। ভালবাসা আলাদা জিনিষ।"

নীহার অবজ্ঞাভরে বলিল, "কেন, অন্য দেশের মত আমাদের পূর্ব্বরাগের সুবিধে নেই ব'লে?"

দীপ্তি বলিল, "হাঁ ভাই। সুরোদিদি আমাদের চেয়ে ঢের বেশী পড়েছিল, অনেক কিছু বেশী জানতো। সেই বলতো না, জাতটা ঠিক রাখবার জন্যে, আর সমাজে শান্তি রাখবার জন্যেই বিবাহের সৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই বিয়েটা উঠিয়ে দেওয়া চলে না, ওটা রাখতেই হয়। কিন্তু ওতে ভালবাসা হয় না—বিয়েটা বেড়ীর মত পায়ে আটকে থাকে বটে, মনটাকে আটকাতে পারে না।"

নীহার অবাক হইয়া তাহার কথা শুনিয়া যাইতেছিল। সুরোদিদিরা তাহাদের উপরের ক্লাসে পড়িত। তাহারা অনেক কিছু বলিত। হয়ত তাহারা যে সমাজের মানুষ অথবা যে সমাজে চলাফিরা করে, তথায় এসব অভিনব ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু নীহারের কাছে সে সকল কথা উদ্ভট বলিয়াই মনে হইত। সে যে-আবেষ্টন ও আবহাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাই হওয়া সম্ভব ছিল। দীপ্তিও যে তাহাদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত, তাহা নীহার জানিত। তবে তাহার সংসারের আবহাওয়া ভিন্ন প্রকৃতির। বলিতে গেলে তাহার মাথার উপর কেহ ছিল না, সে ছিল স্বেচ্ছাচারিণী, নির্ব্বন্ধপরায়ণা। পাঁচজনকে লইয়া ঘর করা তাহার অভ্যাস ছিল না। কাজেই কলেজে সে যে-সব ধারণা সংগ্রহ করিয়া আনিত, তাহাই যে তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা আজ সে এ-সব উদ্ভট কথা তুলিয়া তর্ক করিবে কেন?

নীহার তাই শ্লেষের সুরে বলিল, "বোধ হয় সুরোদিদি অন্য দেশের যে পরীক্ষা-বিবাহের কথা বোলতো, সেইটেই তাহলে তোমার মতে ভাল, না?

দীপ্তি বলিল, 'সে কথা সুরোদিদি বলতে পাবে, আমি জানিনে। সুরোদিদিই বোলতো না, অন্যদেশে ঐ বিবাহের এখনও পরীক্ষা চলছে? ওকথা ছেড়ে দে, আমার আসল কথা হচ্ছে, ভালবাসা হ'ল স্বর্গের জিনিষ, ওর সঙ্গে মানুষের মনগড়া পুরুতের মন্তোর পড়া বিয়ের কোন সম্পর্কই নেই।"

নীহার মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাহলে সুরোদিদি আরও যা বোলতো তাও তুই মানিস?

দীপ্তি বলিল, "কি?"

নীহার বলিল, "এই বিয়েটা আটপৌরে, ভালবাসাটা পোষাকী; বিয়ে একজনের সঙ্গে করা যায়, ভালবাসা দশ বিশ জনের সঙ্গেও হতে পারে; বিয়েটা আইন, ভালবাসাটা স্বভাব, আইনের শাসন সমাজের দরকার হয়, কিন্তু স্বভাব যে গণ্ডী মানে না, আইনের চেয়ে তার জোর ঢের বেশী—"

দীপ্তি বাধা দিয়া বলিল, "থাম, থাম, বাঁদরী এতও মনে রাখতে পারিস!"

নীহার বলিল, "বারে তুইই ত কথা পাড়লি। চাস যদি, 'মঞ্জুষা' পত্রে সুরোদিদির তখনকার লেখা আর্টিক্লটাও তোকে এনে দিতে পারি এখনই পড়তে"—

দীপ্তি বলিল, "তোর মুণ্ডু এনে দিবি পড়তে! এখন বলদিকি, যাওয়া হচ্ছে কোথায়? এত সব জামা কাপড়ের স্তূপ ছড়িয়ে বসে আছিস কেন?"

নীহার তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "ওমা! কথায় বসলে ত আর উঠতে পারিনে। নে, একখানা সাড়ী বাছ দিকি এর ভিতর থেকে—তোর পছন্দ সব চেয়ে ভাল ছিল। আমি খপ করে একবার মার কাছ থেকে আসছি।"

নীহার চলিয়া গেল। দীপ্তি সাড়ী বাছিতে বলিল বটে, কিন্তু তাহার মনটা রহিল অন্য দিকে। কি মন্ত্রে সহচরীর এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন? ইহাই কি বিবাহ-বন্ধনের পরিণাম? ছিঃ ছিঃ! কিন্তু—

দীপ্তি আপন মনে হাসিয়া ফেলিল। মামাবাবুর কি অসম্ভব প্রস্তাব! বলিতে তিনি সাহস করিলেন কিরূপে? এই নিভৃত পল্লীর একটানা জীবনের সহিত তাহার ভাগ্যসূত্র গ্রথিত করিতে হইবে? তাও, যাহার সহিত কোন পরিচই হয় নাই? দূর!

কথাটা কি বন্ধুকে বলা উচিত? যদি সে পল্লী-স্বভাব-সুলভ স্বভাবের গুণে উহা প্রকাশ করিয়া ফেলে! না, একথা না বলাই ভাল।

"কিলো, হোলো পছন্দ?" নীহার আসিয়া পাশে বসিল।

দীপ্তি একখানা আসমানি রঙের সৌখীন সাটী বাছিয়া রাখিয়াছিল,—সেখানি বাড়াইয়া দিতেই নীহার বলিল, "না ভাই ওখানা না, নীলাম্বরী একখানা দে।"

দীপ্তি নীলাম্বরীখানা সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "কেন বল্ ত? ওটার উপর ঝোঁক কেন? আসমানিখানা কি অপরাধ করলে?"

নীহার নীরবে অবনত মস্তকে রহিল, তাহার মুখ চক্ষু রাঙা হইয়া উঠিল।

দীপ্তি বলিল, "বারে, চুপ করে রইলি যে? আমি বলছি, আসমানিখানা তোকে সুন্দর মানাবে।"

দীপ্তি সাটীখানা কুঞ্চিত করিয়া নীহারকে আগাইয়া দিল, কিন্তু নীহার তথাপি তাহা স্পর্শও করিল না, সে একখানি নীলাম্বরী পরিধান করিতে লাগিল।

দীপ্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, "হারে, পছন্দটা কি গঙ্গা পার হবার সময় ওপারে রেখে এসেছিলি? নীলাম্বরী যে পাড়াগাঁর ভূতরাই পরে থাকে!"

নীহার ব্লাউজের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে বলিল, "না, তা না, তবে—তবে—"

দীপ্তি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। নীহারের মুখখানি আবার রাঙা হইয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "আমার পছন্দ অপছন্দে ত কিছু এসে যায় না—ওঁরা যে নীলাম্বরী ভালবাসেন. ভাই!"

নীহারের মুখখানি সদ্যোপ্রস্ফুটিত কমলদলের মত গৌরব ও তৃপ্তির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দীপ্তি প্রথমে কথাটা তলাইয়া বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "ওঁরা?" মুহূর্ত্তপরেই বলিল, "ওঃ তাইবল, সনৎদা!"

দীপ্তি হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল, নীহার তাহার ভাব দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া খুবই অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

দীপ্তি হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা ওঁরা কি খাওয়া পরা সবই পছন্দ করে দেন? তাহ'লে দেখছি, এর ভিতর মস্ত একটা রোমান্স রয়েছে, কেমন না?"

নীহার জবাব দিবার কোন কিছু না পাইয়া বলিল, "হাসবার কি পেলি এতে?"

দীপ্তি বলিল, "হাসবো না? ওঁরা! যেন সেকেলে বুড়ো ঠাকুর্মা ঠানদি কথা কইছে। মরণ. হাঃ হাঃ হাঃ কেন, নাম ধরতে কি হোলো? লেখাপড়া শিখেও কী জন্তুই হয়েছো তুমি!"

নীহার বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ বা রুষ্ট না হইয়া বলিল, "তুই ত মস্ত সভ্য মানুষ হয়েছিস, তা হলেই হোলো। আমাদের মত দুচারটে অসভ্য জন্তু জানোয়ার থেকে গেলে সমাজের কোন ক্ষেতি হবে না। যাকগে, তুই যাবিনে নেমন্তন্ন? শুনছিলুম, তোদেরও নেমন্তন্ন হয়েছে? তাই বুঝি সেজেগুজে এসেছিস? তা চল, একসঙ্গেই যাওয়া যাবে'খন।"

দীপ্তি বলিল, "ঠিক বুঝতে পারছি না, নেমন্তন্ন কি না। মামার কাছে শুনেছিলুম বটে, কি একখানা চিঠি দিয়ে হিমাংশু বাবু আমাদের নেমন্তন্ন করে গেছেন। কিন্তু তাঁর বৌদিটি আমাদের বাড়ী আসেনি, তিনিও আমার জন্যে অপেক্ষা করেন নি—আমি তখন বাড়ী ছিলুম না। একে যদি তোমাদের এখানকার ভদ্রতায় নেমন্তন্ন বলা হয়, তা হলে নেমন্তন্ন। তবে আমার দুর্ভাগ্য, ও নেমন্তন্নটা আমি হজম করতে পারলুম না, আমার ধাতে ওটা কেমন বরদাস্ত হোচ্ছে না।"

নীহার সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি, রেখা তোর ওখানে যায় নি? কখখোনো হোতে পারে না—"

দীপ্তি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তা হলে আমিই মিথ্যে বলছি।"

নীহার বলিল, "না, তা বলছিনা, তবে হিমুদারা অত সামাজিক হয়ে—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে তা হলে, তুই একবার মামাকে ভাল করে জিজ্ঞাসা করে দেখিস দিকিন—"

দীপ্তি ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "বটে? তা. হলে কর্ত্তব্য জ্ঞানটা কেবল আমাদের মত সহুরেদেরই নেই, তোমাদের পাড়াগাঁর ভদ্রতার পাণ থেকে চুণটি খসে না? উঃ কি কর্ত্তব্য জ্ঞান! মা ডাকলে হুঁড়তে ফুঁড়তে রোদে পুড়ে বড়ী ভুলতে ছোটো, ওঁরা পছন্দ না করলে কাপড় পরা হয় না"—

নীহারও পাল্টা জবাবে বলিল, "বড্ডো অন্যায় কাজ করা হয় ত! না হয় দুদিন মাষ্টারী ক'রে বুঝিয়েই দাওনা, কি করলে সহুরে সভ্য হওয়া যায়!"

দীপ্তি সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা, হাজার বার বুঝিয়ে দিতে পারি আমি। ভেবেছিলুম বলবো না, কিন্তু তুইই আমায় না বলিয়ে ছাড়লিনে। আচ্ছা বল দিকিনি, কোন্ সভ্যতার আইনে আমায় না জানিয়ে আমার মতামত না নিয়ে আমার বিয়ের ঠিকঠাক করেন তোমাদের পাশের গাঁয়ের চন্দ্রমাধব বাবু তাঁর ছেলের সঙ্গে?" দীপ্তির নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল, রুদ্ধ ক্রোধে সে ফুলিয়া উঠিল।

নীহার অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর সাগ্রহে সানন্দে বলিয়া উঠিল, "এ্যাঁ, সত্যি বলছিস? সত্যি পিসে মশাই হিমুদার সঙ্গে বিয়ের এই প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন? এ যদি সত্যি হয়, তা-হলে এতে আমি যত আনন্দ পাবো তত আর কিছুতে নয়। আহা তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, এ সম্বন্ধটা পাকা হয়ে যাক!"

দীপ্তি এতক্ষণ অন্তরে গরজাইতেছিল, এইবার চীৎকার

করিয়া বলিল, "বটে নাকি? তা হলে চিড়িয়াখানার অপূর্ব্ব চিজ হয়ে তোকে আনন্দ বিলিয়ে ধন্য হলুম ত। ছিঃ ছিঃ তুই হলি কি?"

নীহার বলিল, "কেন, হবো আবার কি? আমি ত বলছি না যে, তোর বিয়ে ঠিক ঠাক হয়ে গিয়েছে। তবে এটা হলে যে কি চমৎকার হয় তা আর বল্‌তে পারিনে। তোদের দুটিতে যা মানাবে!"

দীপ্তি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল; ক্রোধে, অভিমানে, আহত আত্মসম্মানে সে প্রায় বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল। অনেক কষ্টে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিল, "বাড়ীতে পেয়ে আমায় এমন ক'রে অপমান করবি, জানলে আমি আসতুম না—যাক্ আমিই চ'লে যাচ্ছি।"

নীহার ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "পোড়ারমুখী! ঠাট্টা বুঝিস নে? এর নাম তোর লেখা পড়া শেখা? যাক্, ও কথা আর তুলেই কাজ নেই। বল্, রাগ করলি নে, আমার মাথা খাস, বল রাগ করলি নে, আমার মাথাখাস, বল রাগ করলি নে?"

তাহার ভীত চকিত শুষ্ক মুখ দেখিয়া দীপ্তি হাসিয়া ফেলিল, সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না, অত বড় মাথাটা আমি চিবিয়ে খেতে পারবো না, গিলতেও পারবোনা, গলায় অত চুল আটকে গেলে দম আটকে মরে যাবো—"

নীহার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, প্রফুল্লমনে বলিল, "সত্যি যাবি নে নেমন্তন্ন? না যাস না যাবি, তা বলে হিমুদার নিন্দে করিস নে; আমি নিশ্চয় বলছি, একটা কিছু হয়েছে, যে জন্যে দেখা না ক'রে চিঠি দিয়ে চলে এসেছিল।"

দীপ্তি বলিল, "যাকৃগে, ওকথা নিয়ে আর হাঙ্গামা কেন? আয় দিকি চুলটা বেঁধে ভাল করে সাজিয়ে দি—"

"কে গো, কে কাকে সাজায় গো? আমরাও বাদ পড়ি কেন গো?"

বলিতে বলিতে একটি সুসজ্জিতা তরুণী কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার পশ্চাতে আরও দুই তিনটি। তাহারা দীপ্তিকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল এবং বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। প্রথমোক্তা তরুণী বলিল, "ওমা, এটি বুঝি তোমার কলকাতার বন্ধু? বাঃ দিব্বিটি!"

নীহার অপ্রতিভ হইয়া সশঙ্ক দৃষ্টিতে দীপ্তির দিকে চাহিল। দীপ্তি যে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাহা তাহার মুখ চক্ষুর ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিল। তরুণীটি কিন্তু সরলভাবেই বলিয়া যাইতে লাগিল, "আপনি যাবেন না? আপনাদেরও ত নেমন্তন্ন হয়েছে শুনেছি। চলুন না।"

আর একটি তরুণী বলিল, "চলুন না, বেশ এক সঙ্গে আমোদ করে পাল্লা দিয়ে খাওয়া যাবে, ওরা নাকি কলকাতা থেকে ভীম নাগের সন্দেশ আনিয়েছে—"

অপরা তাহার কথায় সায় দিয়া বলিল, "আর নাগ-বাজারের রসগোল্লা।"

ঘৃণায় দীপ্তি নাসিকা কুঞ্চিত করিল। কি অসভ্য এই পল্লীগ্রামের নারীরা। এই পাড়াগাঁটা কি বিশ্রী! ছিঃ ছিঃ!

তরুণীরা কিন্তু দীপ্তির কোন ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে নাই। প্রথমোক্তা পুনরায় বলিল, "চলুন না আপনি—সাজা গোজা ত রয়েইছে।"

অপর একটি তরুণী সরলভাবেই বলিল, "আর আপনার সাজাগোজারই বা দরকার কি ভাই—এমনই ত দুর্গো পিত্তিমে!"

দীপ্তি এবার আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না। অতিরিক্ত ঝাঁঝের সহিত বলিয়া ফেলিল, "আর আপনি কি,—চালচিত্তির না চোরা?"

কথাটা বলিয়াই সে আর দাঁড়াইল না, দর্পিত পাদ-বিক্ষেপে কক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

তরুণীরা বিস্মিত। প্রথমোক্তা বলিল, "ওঃ মেজাজ!"

আর একজন বলিল, "সাধে বলে গুমরে মাটিতে পা পড়ে না? জমিদারী চাল ওসব!"

নীহার ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "না ভাই, তোমরা ওকে জান না—ও মুখে ঐরকম, মনে আসলেই না।"

নীহার বন্ধুর দোষ ঢাকিবার জন্য যাহাই বলুক, অন্তরে কিন্তু তাহার প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইল। মনে মনে বলিল, পোড়ারমুখী মুখের দোষই মলেন!—মন এত ভাল, তবু বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে মরে কেন?

৬

মিঃ এস, সানিয়্যাল অর্থাৎ শশাঙ্কমোহন সান্যাল বিলাত

যাত্রার নাম করিয়া দিন কতক রাজধানী কলিকাতা হইতে গা ঢাকা দিয়াছিলেন, একথা তাঁহার মক্কেল মহলে অনেকেই জানে। তাঁহার অর্ডার সাপ্লাইং এজেন্সি, এডভারটাইজিং এজেন্সী, ইনসিওরেন্স বিজনেস, ব্যাঙ্কিং বিজনেস—একে একে অনেক কিছু কারবার বর্ষাকালের ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিয় আবার সময়ে মিলাইয়া গিয়াছিল। অনেক মক্কেল হাঁটাহাঁটি করিয়া পায়ের জুতা ছিঁড়িয়াছে, অনেকে কাঁদিয়া কাটিয়া হাতে পায়ে ধরিয়াছে, অনেকে মামলার ভয় দেখাইয়াছে, আবার কেহ কেহ আইন আদালতও করিয়াছে,—কিন্তু কেহই এযাবৎ স্থানুর মত অচল শশাঙ্কমোহনকে টলাইতে পারে নাই। আদালতে তাঁহার বিপক্ষে মামলার ডিক্রী হইয়া গেলেও তিনি আদালতে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন,—আবে ডিক্রী ত আদালত দিয়েছে, কিন্তু টাকা ত আমার বাক্সের মধ্যে; ডিক্রীর কাগজে বাক্সের চাবী খোলে কি না একবার পরীক্ষা করে দেখ্‌লেই পারো!

বৎসর খানেক গাঢাকা দিবার পর সহরে ফিরিয়া আসিয়া শশাঙ্কমোহন ক্যানভাসিং লাইন খুলিয়াছেন। এবার তাঁহার যোগ্য সহকর্মীও জুটিয়াছে দুইটি। সহকর্মিণী বলিলেই ঠিক হয়, কেননা নামে একজন পুরুষ—তাঁহাব সহিত কাববার করিতেন বটে, কিন্তু আসলে তাঁহাব দুইটি ভগিনীই ছিলেন কারবারেব মালিক। তাঁহাদের একজন লেডী ডাক্তার ও মিডওয়াইফ, অপরা লেডী পামিষ্ট ও আর্টিষ্ট। রাসবিহারী এভেনিউএ ছিল তাঁহাদের বাসা। হেড আফিস, ষ্টুডিও চেম্বার,—যাহা ইচ্ছা বল তাই। তাঁহাদের পরিচয় পাঠক ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

আজ হেড আফিসে অংশীদারদের গুপ্ত বৈঠক বসিয়াছে। সভায় উপস্থিত আছেন তিনজন, লেডি পামিষ্ট ও আর্টিষ্ট মিস কল্পনা দেবী ও তাঁহার ভগিনীব 'ভ্রাতা' মন্মথনাথ এবং ক্যানভাসার মিঃ সানিয়াল বা শশাঙ্কমোহন বাবু। চতুর্থ অংশীদারটির আজই আসিয়া পৌছিবার কথা, তাঁহারই জন্য অংশীদাররা আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি মফঃস্বলে 'টুরে' বাহির হইয়াছিলেন, কার্য্য সমাধানান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন।

রিষ্টওয়াচের দিকে চাহিয়া মিঃ সানিয়েল ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন, "নাই জোভ্—সাড়ে দশটা? আই এম অফ্!"

মন্মথনাথ বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "কদ্দিন বলেছি শশাঙ্ক, যখন আমাদের প্রাইভেটে কথাবার্ত্তা হবে, তখন তোমার ঐ বিলিতি বুকনিগুলো ছেড়ে দিয়ে সোজা বাঙ্গলায় কথা কোয়ো—কালাপানি পার হয়েছো কিনা, তার পরীক্ষা ত আমাদের দরকার হবে না।'

কল্পনা দেবী একরাশি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বিরক্তির সুরে বলিলেন, "আঃ থাম না তুমি—ওসব তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝগড়া বাঁধাবার অবসর আমাদের নেই। সত্যি শশাঙ্ক বাবু ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বুঝতে পেরেছি; পাকপাড়ার ক্লায়েন্টটার সঙ্গে আজই এনগেজমেন্ট আছে, না? তা, কি জানেন, ঐ কল্যাণপুর থেকে সদরের রেল ষ্টেশনে আসতে হলে যে মোটররাস্তা আছে, সেটা একেবারেই ভাল না, প্রায়ই এক্‌সিডেন্ট হয় বলে শুনতে পাওয়া যায়"—

মন্মথনাথ বলিলেন, "তার উপর একটা নদী বিশ কোশ।" কাজেই ওখানকার লোকাল ট্রেণ প্রায়ই লেট হয়।"

কল্পনা দেবী বলিলেন, "তা যতই লেট হোক, এক আধ ঘণ্টার বেশী—হবে না। দশটায় ডিউ, না হয় আধ ঘণ্টাই লেট্ হোক। তা, বাণী দিদি এলো বলে, একটু বসে যান।"

মিঃ সানিয়াল সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন, "হুঁ। তা, ঐ কল্যাণপুরের জমিদারের ইনকাম্ কত?"

কল্পনা দেবী বলিলেন, "কার কথা বলছেন, দীপ্তিময়ীর? তার অনেক ইনকাম। ও অঞ্চলের মধ্যে সব চেয়ে বড় জমিদার—"

শশাঙ্কমোহন বাধা দিয়া বলিলেন, "আহাহা উনি না, —ঐ যে যিনি ডাক্তার—কি হিমাংশু না কি—"

কল্পনা বলিলেন "ও: তাই বলুন! তা তারা ত জমিদার নয় তবে পাড়াগাঁয়ে যেমন সবারই দুচার বিঘে জমিজমা থাকে, ওদেরও তাই আছে। দীপ্তিময়ীরা অনেক পুরুষে জমিদার। হিমাংশু ডাক্তারের বাপ ছিল জজ, তাই অনেক নগদ টাকা জমিয়েছে, অনেক জমিজমা বাড়িয়েছে—"

মিঃ সানিয়াল হর্ষোৎফুল্ল মুখে বলিলেন, "বস! ঐটুকুই চাই। জমিজমা আজকাল টাকা প্রসব করে না, নগদ

টাকাই টাকা প্রসব করে থাকে। সেবার শিমলার ম্যাল রোডে বেড়াতে বেড়াতে ভাইস্‌রয়ের ফিনান্স মেম্বারের সঙ্গে দেখা—তিনি তখন ঘোড়ায় চ'ড়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন। দেখেই ইসারা ক'রে ডেকে বললেন—"

মন্মথনাথ এতক্ষণ মুখ বুজিয়া শুনিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কি বললেন, কি বললেন? ম্যাল রোডে ঘোড়ায় চড়বার অধিকার ভাইসরয়, পাঞ্জাবের লাট আর প্রধান সেনাপতি ছাড়া আর কারও যে নেই। তবে সে কি রকম ফাইনান্স মেম্বার ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ত! ভৌতিক নয় ত?"

মিঃ সানিয়্যাল মহা খাপ্পা হইয়া উঠিলেন। কেবল চোখের দৃষ্টিতে যদি এখনকার কালে মানুষকে ভস্ম করিয়া ফেলিবার সুবিধা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টিতে বোধহয় মন্মথনাথ এতক্ষণ ভস্ম হইয়া যাইতেন। মিস কল্পনা দেবী কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আঃ কি কর? যাও না, আর একবার চায়ের যোগাড় দেখ না—এখানে ব'সে কি করছো?"

শশাঙ্কমোহন কণ্ঠস্বরে অসম্ভব উদারতা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "ওঃ মিঃ গাঙ্গুলী তাঁর প্রিয় ছোট বোনটির কাছে এমন কঠোর আদেশ পাবার যোগ্য এমন কাজ কি করেছেন, মিস্ ব্যাটাব্যাল?"

মন্মথনাথ উঠিয়া কক্ষান্তরে যাত্রাকালে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বোনটি আমার উপস্থিতি কতটা পছন্দ করেন—বিশেষ তোমার মত পরম বন্ধুদের সঙ্গে নির্জ্জন আলাপ কালে, তা ত আমায় চা আনবার হুকুম হতেই বুঝতে পারছো, শশাঙ্ক!"

কথাটার মধ্যে যে তীক্ষ্ণতা ঢালিয়া মন্মথনাথ কক্ষত্যাগ করিলেন, তাহাতে যে, অপর দুইজনের চিত্ত কটুতায় ভরিয়া গেল, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাহিরের ফটকে একখানা গাড়ীর হরণ বাজিয়া উঠায় উভয়ে সেইদিকে আগ্রহান্বিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহাদের মনও সেইদিকে স্বভাবতই ধাবিত হইল।

মিঃ সানিয়্যাল এই সময়ে যেন অতিরিক্ত আগ্রহে মিস গাঙ্গুলীর দিকে একটু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন, "দেখুন ত মিস্ ব্যাটাব্যাল, আপনার ঘড়ীতে কটা, আপনার ঘড়ীটা আপনাকে কেরেক্ট টাইম দিচ্ছে ত?"

মিস্ বটব্যাল মৃদু হাসিয়া তাঁহার দেহে মিঃ সানিয়েলের স্পর্শ যেন অনুভবই করেন নাই, এইভাবে বলিলেন "তোপের সঙ্গে ঠিক যাচ্ছে—এই দশটা চল্লিশ। আপনার?"

ঠিক সেই সময়ে মন্মথনাথ চায়ের কাপ লইয়া উপস্থিত, তাঁহার চোখে নরকের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার পশ্চাতেই মিস বাণী গাঙ্গুলী। তিনি বাহির হইতেই বলিলেন, "এই যে শশাঙ্ক বাবুও হাজির। বাঃ সুন্দর যোগাযোগ! তারপর?"

লেডিস ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিয়া মিস বাণী গাঙ্গুলী আসন গ্রহণ করিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে বলিলেন "আর এক কাপ ভাই মোনা। ওঃ প্রায় আধমরা! কি বিশ্রী রাস্তা।

ভৃত্য বেডিং, সুটকেশ ও হোল্ড-অল তুলিয়া দিয়া গেল।

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, "তারপর ত আপনার কাছেই শুনবো বলে আমরা ছটফট করছি। কত দূর কি করে এলেন?"

সে কথায় সায় দিয়া কল্পনাদেবীও আগ্রহভরে বলিলেন, "হাঁ, ও দিকে কতটা কাজ এগুলো? মাছ ডাঙ্গায় তুলতে পারা যাবে কি?"

মিস বাণী হাত দুখানি উল্টাইয়া উপর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সবই অদৃষ্টের কথা! আঃ এই যে চা!"

কিছুক্ষণ সব কথাবার্ত্তাই বন্ধ রহিল। মিস বাণী দেবী তৃষিত চাতকের মত পরপর দুই কাপ চা উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন, অন্য সকলেও চা পানে অবহিত হইলেন। চায়ের আসর বেশ সরগরম হইয়া উঠিল। বাণী দেবীর ঐ সঙ্গে দুই এক পিস কেক বিসকুটও চলিল। শেষ মুখে চায়ের মজলিসে আলাপ আলোচনা আরম্ভ হইল।

বাণী দেবী বলিলেন "দেখে এলুম, ডাক্তারটির অবস্থা বেশ শাঁসালো। নিজে একটি আইড্‌ল্ ড্রোন, বাপের অন্নধ্বংস করছেন ব'সে ব'সে, তবে বাপ কাজে বসিয়ে দেবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছে, টাকাও ছাড়ছে মন্দ নয়,—তা দশ বিশ হাজারের কমে নয়।"

কল্পনা ও শশাঙ্ক সমস্বরেই বলিয়া উঠিলেন, "এঁ্যা!"

বাণী দেবী বলিলেন, "এ ত প্রথম মুখে—দরকার হবে আরও ছাড়বে শুনে এসেছি। তবে একটা মস্ত বাধা আসছে, ঐটেতেই ভয়।"

শশাঙ্ক বলিলেন, "বাধা? কেন, কিসেব বাধা?"

"বুড়ো বাপ ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করছে পাশের গ্রামের জমিদারের মেয়ে দীপ্তিময়ীর সঙ্গে।"

কল্পনা বলিলেন, "সে ত আরও ভাল। যদি বিয়ে হ'য়ে যায়, তা হলে আরও মূলধন বার করতে পাবা যাবে—দীপ্তিময়ীরা ত খুব বড় জমিদার ব'লে তুমিই লিখেছিলে। অনেক আয় না ওদের?"

বাণী বলিলেন, "হুঁ, তা বটে, কিন্তু চিজখানি বড় বেয়াড়া বাঁকা!"

শশাঙ্ক বলিলেন, "তার মানে? আমাদের মত বিজ্‌নেস্‌-ম্যান থাকতে এই ডাক্তারের মত ড্রোণগুলোর সদগতি হবে, এতে বাধা দেবে একটা মিয়ার গার্ল? ছোঃ!"

কল্পনাও সে কথায় সায় দিলেন।

বাণী বলিলেন, "হুঁ একরত্তি মেয়েই বটে! এখনও তোমার আমার মত পাঁচ সাত জন বিজ্‌নেস্‌-ম্যানকে সে দড়ি বেঁধে খেলিয়ে বেড়াতে পারে, এমনি মেয়ে সে!"

সকলে বিস্মিত হইলেন। একটা মেয়ে—তাও বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের মেয়ে—তার দ্বারা বাধা?

কল্পনা বলিলেন, "তা যদি বিয়েই হয়, তা হলে সে বাধা দেবে কেন ডাক্তারের ডাক্তারী ব্যবসাতে?"

বাণী বলিলেন, "কেন? সে নিজের অত বড় জমিদারী ম্যানেজ করছে একটা বড় রকমের ডিসেবনবিশের মত, আদায় পত্তোর করছে কড়ায় ক্রান্তিতে, সমস্ত জমিদারী তার নখদর্পণে। সে যদি ডাক্তারের গিন্নী হয়—"

শশাঙ্কমোহন গম্ভীর মুখে বলিলেন, "হুঁ, ভাবিয়ে তুললেন দেখছি। তা আপনার মত শিক্ষিতা মহিলারাও যদি একটু স্বার্থত্যাগ ক'রে এই সমস্ত আইড্‌ল্ ড্রোণদের হাত ধ'রে পথ দেখিয়ে না দেন, তা হলে ওরাই বা ষ্ট্যাণ্ড করে কি করে?"

মন্মথনাথ নীরবে আলাপ শুনিয়া যাইতেছিলেন, এইবার আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, "আহা, কি অপার করুণা!"

কল্পনা দেবী ধমক দিয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি ত ভারী অসভ্য!"

বাণী দেবীও মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "তাই ত!"

মন্মথনাথ কিন্তু এবার নীরবে তিরস্কার হজম করিলেন না, বলিলেন, "কাজেই! ঐ আইড্‌ল্ ড্রোণ ডাক্তারটিকে হাড়িকাঠে ফেলছো ফেলো, কিন্তু বেচারীকে দয়া ক'রে উদ্ধার করে দিচ্ছ,—একথা বল কেন? এ ত সাফ জুচ্চুরি!"

মিঃ সানিয়াল লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি—জুচ্চুরি? জান গাঙ্গুলী, অন্য লোক হলে ডিফামেশান কেশ আনতুম?"

মন্মথনাথ বলিলেন, "ওরে বাপু, তোমার ইংরিজি ডিফামেশান এতে হয়ত হতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মত বল দিকি বাঙ্গলা ক'রে, এটা জুচ্চুরি কিনা?"

কল্পনা দেবী আবার ধমক দিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি থাম বলে দিচ্ছি, না হয় চলে যাও এখান থেকে, রান্নাবান্না দেখ গিয়ে। জুচ্চুরি? জুচ্চুরি কাকে বলে? জগতের সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে কার উপর?—সেরেফ জাল জুচ্চুরি—সেরেফ মিথ্যা কথা, সেরেফ লোক ঠকানের উপর, নয় কি? আর সেই জুচ্চুরীকেই ত বলে ব্যবসাবুদ্ধি।"

শশাঙ্কমোহন টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "আলবৎ!"

মন্মথনাথ বলিলেন, "কি রকম?"

কল্পনা দেবী বলিলেন, "রকম আবার কি? জগতে একদল মানুষ ঠকিয়ে খাচ্ছে আর এক দলকে, আর এক দল ঠকছে অন্য দলের কাছে, এই ত চলে আসছে চিরকাল। যাদের রেস্ত আছে তারা ঠকিয়ে খান ব্রেণওয়ালাদের, আবার যাদের ব্রেণ আছে তারা ঠকিয়ে খায় রেস্তওয়ালাদের,—আসলে মানুষ মানুষকে তার ভিতরটা লুকিয়ে রেখে মেকিটা চালিয়ে দেয়—"

শশাঙ্কমোহন তাঁহার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বলিলেন, "ঠিক,—ঐ যাকে সোজা কথায় বলে থাকে ডিপ্লোমেসি—বুঝলে হে গাঙ্গুলী!"

কল্পনা দেবী বলিলেন, "হাঁ, ডিপ্লোমেসিই বটে। রাজা বাজড়াদের বেলায় যা ডিপ্লোমেসি, আমাদের উলুখাগড়াদের বেলায় সেটা ধাপ্পাবাজী আর চালবাজী। কেউ খেটে মরে গাধার মত- আর কেউ বা কাঁঠাল ভাঙ্গে তার মাথায়।"

বাণী দেবী বলিলেন, "আমাদের সবজান্তা ভায়া সব জেনে শুনেও মাঝে মাঝে হাঁদারাম দাদা সাজেন কেন জানিনে।" মিথ্যের টানা পোড়েন বিয়ে না বুনলে কোন বড় বমমের দাঁও মারার কেস্ দাঁড় করান যায় কি ভাই? নইলে পেট চলতোই বা কি করে আমাদের মত পনেরো আনা মানুষের?"

মন্মথনাথ বলিলেন, "মানি। আমরা যে আমাদের নরকের দরজা খুলে রাখবার সহজ উপায় করছি তাও জানি। কিন্তু সত্যিই কি জগতে অনেষ্টি—সাধুতা—দয়া মায়া বলে কোন জিনিষ নেই? এই ধরোনা, ঐ ডাক্তার হিমাংশুকে। ওর খোঁজখবর নিতে গিয়ে যতটা সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতে ত মনে হয়, লোকটা একেবারে সাদা—গরীব দুঃখীদের উপর ওর খুব দয়ামমতা—"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শশাঙ্কমোহন হাসিতে হাসিতে আসনে শুইয়া পড়িলেন, তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। তিনি প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হইবার মত অবস্থায় কোনরূপে বলিলেন, "সাধুতা—অনেষ্টি? থাকবেনা কেন—পাদরী সাহেবদের লেকচারে আছে, মরাল ক্লাস বুকে আছে, আমাদের কুষ্ঠী টিকিওয়ালাদের পাঁজী পুঁথিতে আছে, কিন্তু জগতে? ওঃ ডাক্তার হিমাংশু!"

মন্মথনাথ করযোড়ে বলিলেন, "ঘাট হয়েছে, এই নাকে কানে খৎ! আর কোন কথা বোলবো না। তবে তোমরা ওর সম্বন্ধে যা বল্লে, তাতে ওকে নেহাৎ গোবেচারা ব'লে মনে হচ্ছিল বলেই এত কথা বলেছিলুম—আর বোলবো না।"

কল্পনা দেবী বলিলেন, "তাই ভাল, কথা কোয়োনা তুমি। এখন কি করা যায়? বাণী দিদি বলছিলে না, সে শিগ্‌গীরই কলকাতায় আসছে ডিস্‌পেন্‌সারি খুলতে?"

বাণী বলিলেন, "হাঁ আসছে বটে। আমি চার ফেলে এসেছি, মাছ গাঁথতে হবে এখন শশাঙ্ক বাবুকে আর মোনোকে। তার পর আমি আছি, কল্পনা তুমি আছো।"

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, "আমি ত আছিই, কিন্তু আপনাদেরও উঠেপড়ে লাগতে হবে এতে। গেলো কেসটাতে আপনারা যেমন করে পলাশডাঙ্গার রাজাটাকে খেলিয়েছিলেন—ঐযে যার রিষ্ট ওয়াচটা এখনও আপনার হাতে রয়েছে—"

বাণী দেবী বাধা দিয়া বলিলেন, "আঃ, ওসব কথা আবার কেন? কল্পনা ওর ছেলের কুষ্ঠি তৈরী করে পুরশ্চরণের ব্যবস্থা দিয়ে হাজার টাকা খরচ করেছিল না?"

কল্পনা দেবী বলিলেন, "যাক, বেলা হয়েছে, আজ আর শশাঙ্ক বাবুকে বসিয়ে রাখবো না, এর পর আর একদিন যা হয় ঠিক করা যাবে। কি বলেন?"

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, "হাঁ, তাই ভাল। আজ উঠি। মন্মথবাবু কিছু ভেবো না হে, সব ঠিক হয়ে যাবে। তা হলে চলি আজ।"

টুপিটা লইয়া শশাঙ্কমোহন হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেলেন। বাণী দেবীও একটু গা হাত পা ছড়াইতে উঠিলেন। তখন কল্পনা দেবী উঠিয়া গিয়া মন্মথনাথের কণ্ঠলগ্না হইয়া সোহাগভরে বলিলেন, "ছিঃ, এখনও ছেলেমানুষি গেল না? বিজ্‌নেস্ ইজ্ বিজনেস্—এর সঙ্গে লভটা'কে মেশাও কেন ডিয়ার? মুখই বা ভার ক'রে থাকো কেন?"

মন্মথনাথ গাঢ় আলিঙ্গনে কল্পনাকে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আর যা কর সহ্য করতে পারি, কল্পনা! কিন্তু ঐ মর্কটটা?" উঃ!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

"প্রসূতি ও গর্ভকালীন পরিচর্য্যা

ডাক্তার শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি; এম, এস, এস; এফ্, আর, ই, এস

ছেলে বেলা থেকে আমাদের দেশের বালিকাদের মধ্যে পুতুল নিয়ে খেলা করবার একটা প্রবল ইচ্ছা দেখা যায়। তারা ছোট ছোট পুতুলকে তাদের নিজের ছেলে মেয়ে মনে করে এবং সেইমত পরিচর্য্যা করে। তারা যখন পুতুল নিয়ে খেলা করে, মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে না, যে যেটাকে নিয়ে তারা খেলা করছে সেটা পুতুল। যদি বিশেষভাবে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে তাদের মধ্যেও সে সময় কেমন মাতৃত্বের মধুর ভাব ফুটে ওঠে। এই ভাব শিশুকাল থেকে তাদের মধ্যে নিহিত থাকে, তারপর বালিকারা যখন ক্রমে যৌবনে পা দেয়, তখন পরের ঘরে গিয়ে 'বৌ' হয়—তখন তাদের জানা উচিৎ যে দু'দিন বাদে তাদের সত্যিকারের ছেলের 'মা' হতে হবে। খেলাঘরের পুতুল খেলার দিন তাদের চলে গেছে। "মা" হতে গেলে অনেক কিছুই শিক্ষার দরকার, অনেক কিছুই তার জানা উচিৎ। এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রাচীনাদের ওপর। তাঁরা 'বৌমাদের' দৈনন্দিন কার্য্যের অবসানকালে অতি সংক্ষেই অতি প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে অনেক বিঘ্নের শান্তি করতে পারেন। এ ছাড়া তাদের আরও কিছু শিক্ষা পাওয়া দরকার। নাটক নভেল না পড়ে ঐ সময়টা এই সকল বিষয় একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ে, তাদের সেই উপদেশগুলি স্মরণ করে রাখা কর্ত্তব্য, যাতে প্রয়োজন উপস্থিত হ'লে সেগুলিকে তারা কাজে পরিণত করতে পারে।

নারী যখন অন্তঃসত্ত্বা হয় তখন তার প্রথম কাজ গর্ভচর্য্যা করা; এই গর্ভচর্য্যা করতে হ'লে তাদের অনেক কিছু বিষয় জেনে রাখা উচিৎ। অনেকগুলি নিয়ম পালন করা উচিৎ। 'মা' হবার বড় আশা রেখে, মনে মনে চাঁদপানা দুলালের কামনা করে, যদি তাঁরা ঐ সকল নিয়ম ব্যতিক্রম করে চলেন তাহলে তাদের শিশুহত্যার মহাপাপে লিপ্ত হতে হবে।

বাড়ী পত্তনের প্রথমাবস্থায় আমরা বনিয়াদ কেটে থাকি; সেই বনিয়াদ যত শক্ত করে গড়া হয়, বাড়িখানি তত মজবুত হয় এবং অনেক দিন টিকিয়া যায়, সেইরূপ এই গর্ভাঙ্কুরই মানুষের শরীরের গোড়ার বনিয়াদ। ডিম্বাণু ও বীজাণু পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া জীবাঙ্কুরকে গড়ে তোলে। এই কারণেই শিশুদের স্বাস্থ্য বেশীটাই মাতাপিতার উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ মাতার স্বাস্থ্যের উপরই বেশী নির্ভর করে। কারণ ছেলের উপর মায়ের প্রভাব খুবই প্রবল। মাকে ছেলের জন্য প্রায় সবই কর্ত্তে হয়। ছেলেকে খাওয়ান, ধোয়ান, মুছান, শয্যায় শোয়াইয়া ঘুম পাড়ান, তাহার মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা প্রভৃতি সকল কাজের ভারই মায়ের উপর। অতএব মাকে এমন কিছু শিক্ষা পেতে হ'বে, তাদের চরিত্রটীকে এমন আদর্শে গড়ে তুলতে হবে যে যার প্রভাবে—যার গুণে—যার তেজে—যার মাধুর্য্যে শিশুকাল থেকে ছেলের মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

ছেলেকে "স্বাস্থ্যবান" কর্ত্তে হ'লে গর্ভাবস্থা হতেই পোয়াতিকে (অর্থাৎ মাকে) ভাল খেতে ও সংযত ভাবে থাকতে হবে। ছেলেকে উচ্চ আদর্শের পাত্র করে গড়ে তুলতে হ'লে, নিজের মনটিকে সেইরূপে উচ্চ ভাবাপন্ন কর্ত্তে হবে; ধর্ম্মের দিকে ছেলেটিকে টেনে নিয়ে যেতে হ'লে নিজেকে ধার্ম্মিক হ'তে হ'বে, ধর্ম্ম বিষয় আলোচনা কর্ত্তে হবে, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ কর্ত্তে হ'বে—কারণ মায়ের রক্তের সহিত পেটের ছেলের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আজকাল যে ছেলেরা সে রকম মানুষ হয়ে গড়ে উঠছে না, তাদের মনে ধর্ম্মভাবের অভাব হ'য়ে পড়ছে, তারা বিশৃঙ্খল হ'য়ে গড়ে উঠছে, তার প্রধান কারণ "মায়েদের" শিক্ষার অভাব। মায়েরা আজকাল অতিশয় বিলাসী হয়ে উঠছেন, নভেল নাটক পড়ে তাঁদের মন কলুষিত হয়ে উঠছে। এইরূপ অবস্থায় আদর্শ সন্তান আশা করাই

বৃথা। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কালের শিক্ষারও কিছু প্রভাব আছে। অনেকে ভাবেন যে ধর্ম্মমূলক শিক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই সেই কারণে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। আজকাল যে সব ছেলেরা গড়ে উঠছে, তাদের ভিতর নম্রতা, বিনয়ীভাবের অভাব কেন? ইহার কারণ কি? শিক্ষাই কি ইহার জন্য দায়ী নয়? আধুনিক কালে শিক্ষা ও সভ্যতার বিকারে আমরা কিছু কম-মজবুত হয়ে পড়ছি। তাই বলি, পেটের ছেলের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল মা বাপের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে। সুতরাং আগে মা বাপকে সেই রকম ভাবে গড়ে উঠতে হবে, তাহলে তখন আদর্শ সুসন্তানের জন্ম হ'তে বিলম্ব হবে না। আমাদের দেশের জননীরা মানুষ গড়তে শিখলে নিশ্চয়ই দেশে উপযুক্ত সন্তান জন্মাবে।

মায়েরা অন্তঃসত্বা থাকার সময় সুসন্তানবতী হবার ইচ্ছা থাকলেও আধুনিক অনাচার, অনভিজ্ঞতা, অসুস্থতা প্রভৃতি অনেক কারণে অকালে অপুষ্ট সন্তান প্রসব ক'রে থাকেন। তাহার প্রধান কারণ, প্রথমতঃ সুখাদ্যের অভাব, স্বাস্থ্যের পতন, দারিদ্রের কঠোর নিষ্পেষণ। আজকাল মেয়েরা অনেকে উচ্চ শিক্ষা পাচ্ছে, বিবাহও খুব ছেলে বয়সেও হয় না, গৌরী দান ত এক রকম আইনের চাপে বা পণপ্রথার পেষণে উঠেই গেছে বলতে হবে, তবু কেন নবজাত শিশুরা একপ ভগ্নস্বাস্থ্য, কৃশ বা বালাস্থিবিকৃতি রোগে (Ricketic) রুগ্ন হয়ে জন্মায়? তাহার প্রধান কারণ মা বাপের নষ্টস্বাস্থ্য।

আধুনিক কালে স্কুল কলেজের মেয়েদের যদি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটি তালিকা (Statistics) নেওয়া যায়, তা হলে দেখতে পাওয়া যাবে যে শতকরা ৮০ জন ছাত্রীর স্বাস্থ্য ভগ্ন, চক্ষুঃ জ্যোতিহীন, কৃশভাবাপন্না (Tendency to Leanness), সর্ব্বক্ষণই শিরঃপীড়ায় আক্রান্তা, মুখমণ্ডল প্রায় দুষ্টব্রণে পরিপূর্ণ এবং স্ত্রীরোগে রুগ্না। এই সকলের সংশোধন না করলে, এই সকলের উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি না রাখলে, সুসন্তানের আশা করাই বৃথা। আজকাল গর্ভস্রাব, নবজাত শিশুর অকালমৃত্যু কেন এত হচ্ছে?—ইহার একমাত্র উত্তর, মাতাপিতার ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য। অনেক পিতা দুরনীয় ঘৃণ্য ব্যাধি গোপনে সৃষ্টি করে নিজেদের শরীরের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। তাঁহারা ঐ রোগের দুষ্টবীজ অনেক সুস্থকায়া মায়েদের দেহে গোপনে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাদের নির্ম্মলদেহটিকে একেবারে চিরজন্মের মত নষ্ট করে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন অস্বাস্থ্যকর রুগ্ন ছেলেদের জন্ম দিয়ে থাকেন, যারা হয় চিরজন্মটাই নানা প্রকার রোগে ভুগে সংসারে একটা অশান্তির সৃষ্টি ক'রে তোলে কিংবা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় বা সময়ে সময়ে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুষ্ট ও সবল হয় না। অতএব বধূমাতারা যখন সন্তান পেটে ধরেন, তখন বাড়ীর সকলেরই কর্ত্তব্য—পোয়াতির উপর সদা দৃষ্টি রাখা, যাহাতে ছেলের পরিপুষ্টির কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে এবং গর্ভিনীর দেহ ও মন স্ফূর্ত্তিতে থাকে ও স্বাস্থ্যটা ভাল থাকে। তাহা হইলে গর্ভিনী নিশ্চয়ই সুসন্তানবতী হবেন। যে সকল স্ত্রীলোকের শরীর রুগ্ন ও দুর্ব্বল, গর্ভাবস্থায় তাঁদের ভগ্নস্বাস্থ্যকে ভাল চিকিৎসকের দ্বারা সারিয়ে নেওয়া দরকার। দেহটিকে পুষ্ট ক'রে তোলা আবশ্যক। "পোয়াতীকে" পুষ্টিকর ও লঘুপাক খাদ্য দিতে হবে। গর্ভাবস্থায় গর্ভিনীদিগের কোন কোন বিশেষ বিশেষ বস্তু খাবার আগ্রহ হয়ে থাকে। পোড়ামাটী, অম্বার, ভাজামসলা ইত্যাদি কতকগুলা অপদার্থ জিনিষ খাইবার দিকে তাহারা এত আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে যে সেগুলি খাইবার একটু প্রশ্রয় পেলে অনেক সময়ে অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে আক্রান্ত হ'তে দেখা যায়। ঐ সকল জিনিষ কোনমতেই বেশী দেওয়া উচিত নহে। গর্ভিনীর আহার সম্বন্ধে একটা আমাদের কুসংস্কার আছে, যে গর্ভিনীরা যে সকল জিনিষ খেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে—তাহা ভালই হোক বা মন্দই হউক, স্বাস্থ্যকর হউক, বা অস্বাস্থ্যকরই হউক, তাদের তখন খেতে দেওয়া উচিত, তা না হলে পেটের ছেলে কাঁদে বা অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে গর্ভিনীকে একই পাকস্থলী হ'তে দুটী শরীরের 'খোরাক' যোগাতে হয়, সুতরাং আহারের মাত্রা গর্ভাবস্থায় কিছু বাড়িয়ে দেওয়া দরকার—বাস্তবিক ইহা একটা মস্ত ভুল ধারণা। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য গর্ভিনী যে পরিমাণ আহার করিয়া অনায়াসে পরিপাক কর্ত্তে পারে, সেইটুকুই পেটের ছেলের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য। গর্ভিনীর পক্ষে, খাদ্য একদিকে যেমন পরিমিত হবে,

অন্যদিকে তেমনই লঘুপাক হওয়া উচিত। বাসি, পচা, অধিক মসলা ও ঘৃত সংযুক্ত গুরুপাক আহার, ঝালছোলা বা চানাভাজা ইত্যাদি গর্ভিনীকে কখনও খেতে দেওয়া উচিত নয়। তাদের খাদ্যগুলি খুব নির্ব্বাচিত, পরিমিত এবং সাদা সিধা গোছের অথচ পুষ্টিকর হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া আমাদের সাধারণ বাঙ্গালীর মেয়েরা যা খেয়ে থাকে, তাকে বলতে গেলে একরকম কিছুই নয়। সকলকে খাওয়াইবার পর যৎসামান্য কিছু পড়ে থাকে, তাই নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটরা করে নিয়ে থাকে। সেই কারণে পোয়াতিদের খাওয়ার প্রতি একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। গর্ভাবস্থায় গর্ভিনীকে খুব অধিক পরিমাণ জল খেতে দেওয়া উচিত। তাহা হলে যকৃত ও মূত্রগ্রন্থির নিকাশের পথগুলি পরিষ্কার থাকে। কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা এবং প্রত্যহ নিয়মিতরূপে স্নান করা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা খুবই দরকার।

আমাদের দেশের মেয়েদের একদিকে যেমন সুখাদ্যের প্রয়োজন অন্যদিকে আবার শারিরীক পরিশ্রম বা ব্যায়াম কিছু কিছু পরিমাণে দরকার। গরীব গৃহস্থের মেয়েদের সকাল থেকে সেই রাত্রি পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। অবশ্য পরিশ্রম করা খুবই ভাল, তাতে শরীর ভালই থাকে কিন্তু সমস্ত দিনরাত কাজে ব্যস্ত থাকায় বিশুদ্ধ বায়ুসেবন প্রায় একরকম ঘটে উঠে না—সর্ব্বদা রান্নাঘরে তাঁদের আটক থাকতে হয়। ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। তার উপর যাদের সহরের গলি এবং আবর্জ্জনাপূর্ণ 'বস্তির' (Bustee) ভিতরে বাস, সেখানে কদাপি সূর্য্যের আলোক প্রবেশ ক'রে থাকে এবং সর্ব্বদাই ঐ স্থান থেকে একটা দুর্গন্ধ বার হয়—এরূপ স্থান গর্ভিনীর পক্ষে অস্বাস্থ্যকর এবং শরীরের পক্ষেও অত্যন্ত অনিষ্টকর।

বেশ ফাঁকা যায়গায় যদি সামান্য রকমের একটু পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা যায়, অন্ততঃ খুব সকালে উঠে একটু পার্কে কিংবা ছাদের উপর বেড়াইলেও শরীরের মাংসপেশী সমূহ দৃঢ় হয়ে থাকে, শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্যের উন্নতি ঘটে এবং সন্তান প্রসব কার্য্যটা অতি সহজেই হয়। আর পেটের ছেলেও খুব প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন (Oxygen) পাইয়া বেশ হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়ে জন্মায়। সুস্থ শিশুর সুপ্রসব করতে হ'লে রীতিমত ব্যায়াম চর্চ্চা, উন্মুক্ত বায়ু ও প্রচুর সূর্য্যকিরণ নিত্য সেবন করা চাই।

গর্ভাবস্থায় পরিশ্রম করা খুবই দরকার। তবে বেশী উপর নীচ অর্থাৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠা নাম করা উচিত নহে। কারণ কার্য্যক্ষমতার গুণে (active habit) প্রসবকালীন খুব বেশী কষ্ট পেতে হয় না। আমরা দেখতে পাই, গরীবের ঘরে গর্ভিনী বধূরা কেমন সহজেই প্রসব হয়ে থাকে। এমন কি 'দাই' (ধাত্রী) ডাকবার সময় থাকে না। কিন্তু বড়-লোকের বাড়ীতে বধূদের এত কষ্টপ্রসব হ'য়ে থাকে কেন? তাহার প্রধান কারণ বিলাসের স্রোতে তাঁরা গা ঢেলে দিয়ে থাকেন, একটু নড়িয়া বসিতে চাহেন না। অবশ্য গুরুতর পরিশ্রম একেবারে নিষিদ্ধ, গর্ভাবস্থায় যাহাতে কোনরূপ আঘাত বা পেটে চাপ বা ধাক্কা না লাগে সে বিষয় খুব সাবধানে থাকা ভাল। কলতলায় খুব ধীরে ধীরে সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া চলা উচিত। যেন অসাবধানে পড়ে না যায়। গর্ভাবস্থায় পড়ে যাওয়া খুবই খারাপ। কোন ভারী জিনিষ কখনও তোলবার চেষ্টা করা উচিত নয় গর্ভাবস্থায় কোন জনতাপূর্ণ স্থানে যাওয়া বা রাত্রি জাগরণ একেবারে নিষিদ্ধ।

গর্ভিনীর মনটীকে সর্ব্বাই প্রফুল্ল রাখা দরকার। গর্ভিনীর মনের অবস্থা ভাল থাকিলে তাহার স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। গর্ভাবস্থায় যেন কোনরূপ ভয়, দুঃখ বা শোক না পায় সে বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। গর্ভবতী মাতার নিরুদ্বেগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। গর্ভিনীর শুইবার ঘরে জানালা দরজা যেন খোলা থাকে এবং অনায়াসে হাওয়া খেলতে পায়। আর ঐ ঘরের মধ্যে সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তির ছবি যেন দেওয়ালে টাঙ্গান থাকে। কোন একটি সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ শিশুর প্রকৃতি ঘরে এমন একটি স্থানে রেখে দেওয়া উচিত যেন গর্ভিনীর নজরে সকল সময়ই উহা পড়ে। ঐ ছবিটির দিকে তাকানর ফলে, প্রসূতিকে সুন্দর, সুস্থ পুত্র-সন্তান প্রসব করিতে অনেক সময় দেখা গেছে।

প্রসূতির পরিচ্ছদ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় এবং সেমিজ পরিধান করা একেবারে নিষিদ্ধ। মনটীকে প্রফুল্ল রাখার জন্য সময় সময় একটু গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে। শাড়ী একটু ঢিলা করে পরা উচিত অধিক আঁটিয়া পরা কোন মতেই উচিত নয়।

গর্ভাবস্থায় স্তনে দুগ্ধ আসে, সে সময় প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্তনের বোঁটাটী পরিষ্কার জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলা দরকার। স্তনের বোঁটা ছোট হ'লে প্রত্যহ অঙ্গুলী দ্বারা খুব আস্তে আস্তে একটু অলিভ অয়েল (olive oil) কিংবা একটু সরিষা তেল দিয়ে টানিলে পরে তাহা বড় হয়—আর শিশুর স্তন্যপানকালীন কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

গর্ভাবস্থায় কয়েকটী রোগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং কোন কোন গর্ভিনীর হয়েও থাকে। সেই কারণে খুবই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য এবং মধ্যে মধ্যে চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকাও দরকার। প্রায় সকল গর্ভিনীর গর্ভাবস্থায়, প্রথম কয়েক মাস আহারে অতিশয় অরুচি ও বমনেচ্ছা বা বমনও হয়ে থাকে। বমনের মাত্রা অধিক হ'লে পর, যদি রোগিনী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে তখন দু'এক মাত্রা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া যেতে পারে। ঐ সময় ঔষধ যত কম দেওয়া যায় ততই ভাল। খালি পেটে থাকতে দেওয়া একেবারেই উচিৎ নয়। সকালে অন্ততঃ কিছু খেতে দেওয়া দরকার। বমনেচ্ছা অনেক সময় অল্প গরম জল সেবনে নিবারিত হয়ে থাকে। অধিকবার বমন হ'লে পর, হোমিওপ্যাথিক মতে "Symphoricarpus Racemosa" দু'এক মাত্রা সেবন করতে দেওয়া যেতে পারে। তাতে অনেক সময় খুবই ভাল ফল পাওয়া গেছে। গর্ভাবস্থায় অনেকেরই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না এবং প্রস্রাবও কমে যেতে দেখা যায়। সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। ছয়মাস পড়লেই একবার প্রস্রাবটী পরীক্ষা করা আবশ্যক। প্রস্রাবের মাত্রা কম হলেই এলবুমেন থাকা (albumen) সন্দেহ হওয়া উচিৎ, কারণ গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর কোন কোন রোগিনীর তড়কা (Eclampsia) হতে দেখা যায়। ঐ রোগ বড় বিপদজনক। পূর্ব্ব হতে খুব সাবধান হতে হবে এবং তার সুব্যবস্থা করা উচিত। মাংস ও গুরুপাক দ্রব্য খাওয়া একেবারে উচিৎ নয়। এলবুমেনের মাত্রা অধিক হ'লে বা পদদ্বয় স্ফীত থাকলে নুন একেবারে বন্ধ করে দেওয়া দরকার। গর্ভাবস্থায় মধ্যে মধ্যে Arnica (হোমিওপ্যাথিক ওষধ) সেবন করা ভাল। তাতে অনেক সময় রোগিনীকে প্রসবকালে খুব কম কষ্ট পেতে দেখা যায়, এবং সহজেই প্রসব করে থাকে।

পরিশেষে আর একটী বিষয়ের প্রতি বাড়ীর সকলেরই দৃষ্টি রাখা দরকার। সেটী আমরা যাকে বলে থাকি "আঁতুড় ঘর।" প্রসূতি ও শিশুর জীবন-মরণ অনেক পরিমাণে ঐ আতুড়ঘরের উপর নির্ভর করে। আতুড় ঘরটী পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। ঘরটীর ভিতরে যাতে বেশ সূর্য্যের আলোক এবং হাওয়া প্রবেশ করতে পারে এরূপ ঘরেই সূতিকাগৃহ (অর্থাৎ আঁতুড় ঘর) করা দরকার। স্বভাবতঃ আমাদের পল্লীগ্রামে (এমন কি সহরের মধ্যেও দেখা যায়) আতুড় ঘর হয়ে থাকে, বাড়ীর মধ্যে নীচের তলায়—যে ঘরটী অস্বাস্থ্যকর, অপরিচ্ছন্ন, অন্ধকার, সূর্য্যকিরণ মোটেই প্রবেশ করে না এমন কি বায়ু সঞ্চালনও অপর্য্যাপ্ত। নীচের তলায় দালানে দরমা দিয়া ঘিরে—তার উপর খড় পেতে দিয়ে প্রসূতীকে শুতে দেওয়া হয়। আতুড় ঘর আমাদের নিকট এত অগ্রাহ্যের জিনিষ যে উহার ভিতর প্রসূতির হাত পা ছড়াইবার স্থান সঙ্কুলান হয় না। উহার মেজে ভিজা ও স্যাঁতসেতে থাকে। আর ঐ সকল ঘরে প্রসূতির ক্লেদ রক্ত প্রভৃতি অপবিত্র দ্রব্য পচে ঘরটি এমন দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর হয় যে তার ফলে কত প্রসূতি বা নবজাত শিশু অকালে প্রাণ হারাইয়াছে। যারা অবস্থাপন্ন নয়, কিংবা যাদের ঐরূপ ভাল আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়, তাহাদের পক্ষে প্রসূতিকে হাসপাতালে (যেখানে সম্ভব, সেখানে) পাঠান উচিৎ। আর যেখানে হাসপাতাল নাই বা সেরূপ ভাল আলোপূর্ণ ঘর নাই, সেখানে যতদূর সম্ভব বাড়ীর দালানেই হউক বা ঘরের মধ্যেই হউক, পরিষ্কার বা স্বাস্থ্যকর স্থান সূতিকাগারের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা উচিৎ। আর যেখানে আতুড় ঘর নির্ম্মিত করে নিতে হয়—তাহা যেন প্রশস্ত, শুষ্ক, পরিস্কৃত ও দুর্গন্ধবিহীন হয় এবং ঐ ঘরের দক্ষিণ দিক্ যেন খোলা থাকে। আঁতুড়ঘরে প্রসবকালীন যে সকল ছেঁড়া কাপড়ের দরকার হয়, সেগুলি যেন আগে থেকে গরমজলে ভাল করে ফুটিয়ে নিয়ে ব্যবহৃত করা হয়। প্রসবের সময় যেন ভাল পাশ করা ধাই অর্থাৎ (qualified midwife) ডাকা হয়। আঁতুড় ঘরে চাই শিক্ষিতা ও পরিচ্ছন্ন ধাত্রী—ইহারি অভাবে আজ আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ সন্তান ও মা অকালে প্রাণ হারাইয়া থাকে। কারণ ঐ সময় পরিচ্ছন্নতা নিতান্তই প্রয়োজন। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতা, মূর্খ ও কুসংস্কারাপন্ন ধাইদের যেন ডাকা না হয়—কারণ তাদের না আছে দক্ষতা, তারা না জানে পরিচ্ছন্নতা। অবশ্য যাঁরা অবস্থাপন্ন নন্—বা যেখানে হাসপাতাল নিকটে নাই বা পাশ করা ধাত্রী পাওয়া যায় না—ঐসকল ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর ধাইদের উপরই নির্ভর করতে হয়, সেখানে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিয়া ঐ ধাইরা কার্য্য করে এ বিষয় যেন লক্ষ্য রাখা হয়। প্রথমতঃ তাহাকে যেন হাতদুখানি ভাল করে কার্ব্বলিক সাবান ও গরম জলে ধৌত করে নিতে বলা হয় এবং ময়লা দুর্গন্ধ ও রোগবীজাণু পরিপূর্ণ কাপড় যেন ছেড়ে ফেলতে বলা হয়। প্রসূতির পরিধেয় বস্ত্র যেন নিত্য গরম জলে কার্ব্বলিক সাবান কিংবা Lysol দিয়ে কাচা হয় এবং বিছানার চাদর যেন প্রতিদিন বদলে দেওয়া হয়।

অনেক প্রসূতির প্রসবের পর শেঁক দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যে সকল ধাই আঁতুড়ঘরে কাজ করে, শেঁক তাপ দিয়ে থাকে, তারা যেন ঘরের মধ্যে দরজা জানালা বন্ধ করে গুলের অগ্নি প্রজ্বলিত না করে। ঐ ধোঁয়াতে প্রসূতীর বা নবজাত শিশুর অনিষ্ট হতে দেখা গেছে। এমন কি, অনেক সময় শিশু ও প্রসূতি মারাও গেছে। ঘরের বাহির হতে আগুন ধরিয়ে নিয়ে যেন ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাপ দেবার সময় যেন দরজাটী খুলে রাখা হয়। আর মধ্যে মধ্যে ধুনা বা গুগ্‌গুল প্রভৃতি সুগন্ধি ঘরের ভিতরের দুর্গন্ধ নাশ কর্ব্বার জন্য পোড়ান উচিৎ।

জরায়ুর সঙ্কোচনের ও আভ্যন্তরিক ব্যাথার উপশমের জন্য হোমিওপ্যাথিক মতে 'আর্ণিকা' ৩০ (Arnica 30) কিংবা এলোপ্যাথিক মতে Ergot (আর্গট) দেওয়া উচিত। প্রসবের পর প্রসূতিকে উঠে বসা কিংবা পাশ ফেরা করতে দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। প্রসবের দু'দিন পরে Castor oil (ভাল রেড়ীর তৈল) খাওযাইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করে দেওয়া বিধি।। এই সময় প্রসূতিকে যথাসম্ভব সাবধানে থাকিতে হইবে।

উল্লিখিত নিয়মগুলি যত্নপূর্ব্বক পালন করিলে প্রসবকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইবে, এবং শিশু ও প্রসূতির মৃত্যু-সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে। বলা বাহুল্য, এতদ্ব্যতীত মধ্যে মধ্যে স্বাস্থ্য-পরিদর্শক (Lady Health Visitor) অথবা অপর কোন বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করিলে সুফল পাওয়া যায়।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাজারে
"ম্যালেরিয়ার মহৌষধ"
নানা প্রকার পাইবেন---কিন্তু
সাবধান!
যা'তা বাজে ঔষধ সেবনে
দেহের অধিকতর অপকার করিবেন না॥
এপাইরিন
ম্যালেরিয়া আদি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের
সুপরীক্ষিত অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ॥
এপাইরিন
—ব্যবহারে কোন কুফল নাই—
ভাল ডাক্তারখানায় পাইবেন
ল্যাড কো
কলিকাতা

আলোচনা

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা

মান্যবর বিচিত্রা সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু

যে দেশে আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায় রহিয়াছি, যে সাহিত্যে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বা ঐতিহ্যগত প্রকাশ আছে, তাহা গ্রহণ করিতে যদি আমরা অস্বীকার করি, তবে গণ্ডীবদ্ধ জীবনে আমরা কেবল যে জাতীয় ঐক্য ব্যাহত করিব তাহা নহে, নিজেদিগকেও প্রকৃত সাহিত্য-সম্পদে বঞ্চিত করিব। ইহা বাঞ্ছনীয় তো নহেই, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের শতবিধ অলঙ্ঘনীয় বাধ্যবাধকতার মধ্যে ইহা আদৌ সম্ভব বলিয়াও বোধ হয় না।

তারপর, যে সাহিত্যে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি কোনো-রূপ বিদ্বেষের পরিচয় আছে, কালের বিচারে তাহা কতদিন টিকিবে? কিন্তু এই কথাটাও মনে রাখা দরকার যে কোনো রচনায় আপাতবিদ্বেষমূলক কোনো কথা থাকিলেই যে রচয়িতার বিদ্বেষ প্রমাণিত হইল, ইহা সত্য নহে কারণ, তাহার কাজ শুধু আত্মপ্রকাশ নহে, অপরের প্রকাশও। দেশকালপাত্রানুসারে মানুষের চিন্তা—তাহা বর্ত্তমানে যতই বিকৃত বলিয়া আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না কেন—তাহাকে ভাষা দেওয়াও সাহিত্যিকের কাজ, বিশেষতঃ যখন তাহাকে কোনো ঐতিহাসিক দুর্ঘটনাকে বাণীরূপ দিতে হয়। সে স্থলে প্রাসঙ্গিকভাবেই যে অপ্রীতি আসিয়া থাকে, রচনার সমগ্র পরিপ্রেক্ষণ যদি তাহার অনুকূল না হয়, তবে কেন রচয়িতাকে দোষ দিব?

কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাও সত্য বলিয়া মনে হয় যে জাতির জীবনধারায় যতই পঙ্কিলতা মিশিয়া থাকুক না কেন, দেশের ভবিষ্যৎকে তাহা হইতে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য এবং তাহা হইলে কোনোরূপ বিদ্বেষের অস্তিত্ব বা ইঙ্গিতসূচক রচনা ভবিষ্যদ্বংশীয়দের পাঠ্য করা উচিত নহে। পাঠ্য নির্ব্বাচনকালে তবে প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য রচনা হইতেও এমন রচনা বাদ দিতে হইবে যাহাতে আন্তর্সম্প্রদায়িক বিভেদের কোনো পরিচয়—এমন কি, নিছক প্রকাশ আছে। বলা বাহুল্য, আমাদের ভাণ্ডারে এমন সুসাহিত্যের কোনোই অভাব নাই যাহা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মানবতায় নিহিত, কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর-পরিচয়ের অবদানে সমৃদ্ধ বা আন্তর্সাম্প্রদায়িক মিলনোপলব্ধির সহায়ক। একটু মনোযোগ দিলেই কি এইরূপ সাহিত্য নির্ব্বাচন অক্লেশে সম্ভব হয় না।

সাহিত্য আপনি আপনার পথ করিয়া লইবে, যুগে যুগে যেমন করিয়া লইয়াছে; মানুষের মনকে সে নিয়ন্ত্রিত করে, আবার মানুষের মন দিয়াই সে নিয়ন্ত্রিত হয়। সে সম্বন্ধে ভাবনার কিছুই নাই; কিন্তু সাহিত্যের ব্যবহারিক দিক দিয়া কি আমরা স্বাতন্ত্র্যের মোহ ও বৈশিষ্ট্যের জেদ সমভাবে বর্জ্জন করিয়া সকলের মঙ্গলে যাহাতে প্রত্যেকের মঙ্গল, প্রীতিসহকারে ও দ্বিধামুক্তচিত্তে তাহাকেই বরণ করিয়া লইব না?

বিনীত

বসুধা চক্রবর্ত্তী

শিশুদের সর্দ্দি কাশি
কখনও উপেক্ষা করিবেন না।
তাহারা কাশিলেই ইহা সেবন করিতে দিবেন
সিরোলিন রোচি
সম্পূর্ণ নির্ভর যোগ্য ও নিরাপদ।
খাইতে সুস্বাদু বলিয়া ছেলে মেয়েরা ইহা আনন্দের সহিত খাইয়া থাকে।

সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্তুত। ৫

খেলা ধূলা

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী এম্-এ

ফুটবল

আই, এফ, এ, শীল্ড টুর্ণামেণ্ট ঃ

নামজাদা মিলিটারী টীম এবং বহু খ্যাত ও অখ্যাত সিভিলিয়ান টীম নিয়ে জুলাইয়ের গোড়ার দিকে শীল্ড খেলা আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় রাউণ্ডে জুনিয়ার টীমরা কেউ পাঁচ গোল কেউ নয় গোল খেয়ে বিদায় নেয়। ঢাকা হ'তে এবারও তিনটী টীম যোগদান করেছিল। পুরোনো ওয়ারি এবং ঢাকা ফার্ষ্ট মন্দ খেলে নি। কিন্তু ভিজে মাঠে ভিক্টোরিয়া কম করে ইষ্টবেঙ্গলের কাছে ৯ গোল খায়। সেদিন ভিক্টোরিয়ার খেলা খুব নিকৃষ্ট হয়েছিল তবে মাঠের অবস্থা ইষ্টবেঙ্গলকে বিশেষ সাহায্য করেছিল সন্দেহ নাই। কোয়াটা সাইনিং ক্লাব ও আজমীর শীল্ডের গোড়ায়ই অতি বাজে খেলে বিদায় নেয়। ফুঠবলের অতি উচ্চাঙ্গের খেলার সাথে এদের এখনও পরিচয় হয় নি বলে মনে হল। কুমিল্লা ও ফরিদপুর বোধ হয় এই প্রথম শীল্ডে খেলতে আসে এবং প্রথম রাউণ্ডেই পরস্পরকে সাক্ষাৎ করে। দুই দলের খেলার বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তবে কুমিল্লা বেশীক্ষণ চেপে খেলেও শুধু ফরওয়ার্ডের দোষে এক গোলে পরাজিত হয়। গত বছর খুলনা স্পোর্টিং অতি সুন্দর খেলা দেখিয়ে ক্রীড়ামাঠে কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছিল। এবার কিন্তু তার বিপরীত দেখা গেল। ফিল্ড বিগ্রেড অতি

লীগ ও শীল্ড বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং দল

সহজেই খুলনা স্পোর্টিংকে হারিয়ে ৪ গোলে জয়লাভ করে। খুলনার খেলা তত সুবিধাজনক হয় নি। বিগ্রেড অতি উৎকৃষ্ট টীম সন্দেহ নাই কিন্তু খুলনার কাছে আমরা আরও কিছু আশা করেছিলাম। এর পরেই খুলনা টাউন ক্লাবের নৈরাশ্যজনক ক্রীড়ার ফলাফল চোখে পড়ে। ডারহাম্ কম করে ৭ গোলে জয়ী হয়। কালিঘাট ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলা বেশ উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। প্রথম দিন খেলা ড্র হয়। দ্বিতীয় দিনে দুই দলেই প্রবল আক্রমণে খেলতে আরম্ভ করে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে সাক্ষাৎ করে। ১৯২৩ সালের পর শীল্ডে আবার দুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিভিলিয়ান টীম ক্যালকাটা ও মোহনবাগান পরস্পরকে সাক্ষাৎ করে। সকলের উৎসাহ নিয়ে কর্দ্দমাক্ত মাঠে দুই টীম খেলতে নাবল। সেদিনকার মাঠের অবস্থা ক্যালকাটার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছিল সন্দেহ নেই। মোহনবাগানের ১১ জন খেলোয়াড়ই সেদিন বুট পরে খেলে। খেলার অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এস্ দত্তের দোষে মোহনবাগান একটি সেম-সাইড গোল খায়। তাতেই

শীল্ড রানার্স আপ ক্যালকাটা দল

শেষ পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল ৩—২ গোলে জয়ী হয়। এরিয়ান্স ও কষ্টমসকে অতি সহজেই হারিয়ে চতুর্থ রাউণ্ডে মোহনবাগান ইষ্টকেণ্টকে সাক্ষাৎ করে। প্রথম দুটী গেমে মোহনবাগানের খেলা বেশ সন্তোষজনক হয়েছিল। ইষ্টকেণ্টকে ১ গোলে হারিয়ে মোহনবাগান বহুদিন পর আবার ক্রীড়ামোদীদের মনে এক নতুন আশা জাগিয়ে দেয়। কিন্তু সে আশা যে কত ক্ষণিকের তা পরবর্ত্তী সেমিফাইনাল খেলায় প্রমাণ হয়েছিল। "বেষ্ট শীল্ড-ফাইটার" ক্যালকাটা প্রথমে ডুরাণ্ড-বিজেতা নর্ফোক এবং পরে ফিল্ড বিগ্রেডকে হারিয়ে সেমিফাইনালে টীমের আশা ও উৎসাহ অনেকখানি নিবে যায়। দ্বিতীয় হাফে মোহনবাগান অপেক্ষাকৃত উৎসাহের সহিত প্রবল ভাবে আক্রমণ করে খেলতে থাকে। এ গাঙ্গুলি অতিসুন্দর ১টী গোল দেয়; কিন্তু সকলকে বিস্মিত করে রেফারী ডানকান গোলটী অফসাইড দেন। এ গাঙ্গুলির গোলটী কোন নিয়ম অনুসারে অফসাইড হল তা আমাদের বুদ্ধির বাইরে। তারপর মোহনবাগান একটী পেনালটী পেল; মাঠ তখন নীরব সকলেই একটা গভীর উল্লাসের জন্যে উসখুস করছে। হঠাৎ একটা নিরাশ নিশ্বাসে সারামাঠ ভরে গেল। এস্ দত্তের পেনালটী

সট আর্ম্মষ্ট্রং অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে ফিরিয়ে এ-যাত্রা ক্যালকাটাকে বাঁচায়। এত বড় সুবর্ণ-সুযোগ মোহনবাগানের নষ্ট হল। ক্যালকাটা ফাইনালে উঠল। অন্যদিকে লীগ-বিজয়ী মহমেডান দল এক নতুন রেকর্ডের আশায় জীবন পণ করে খেলছিল। এরা গত বছর সেমি ফাইনালে ইষ্ট ইয়র্কের কাছে মাত্র ১ গোলে পরাজিত হয়ে বিষণ্ন মনে মাঠ থেকে বিদায় নিয়েছিল। এবার শীল্ড বিজয়ী হবার উচ্চ আশা নিয়ে প্রথম হতেই বেশ উচ্চাঙ্গের খেলা খেলতে থাকে। প্রথমে বি, ডিভিসন চ্যাম্পিয়ান ভবানীপুর মহমেডান দলকে চেপে খেলে প্রায় বিজয়ের পথে এগিয়ে গিয়েছিল। কয়েকটী অব্যর্থপ্রায় গোল নষ্ট না করলে সেদিনের খেলার ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গে এবারের শীল্ডের খেলার ফলাফল সম্পূর্ণ অন্য রকম দাঁড়াত। মহমেডান অতি কষ্টে এক গোলে জয়লাভ করে। তারপর লাইট ইন্‌ফ্যানটারীকে হারাতেই মহমেডানের বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। প্রথম দিন খেলা ড্র হয়। দ্বিতীয় দিন অতিরিক্ত সময়ে মহমেডান ৩-২ গোলে জয়লাভ করে। তারপর সাক্ষাৎ করল ডারহাম। খেলায় ডারহাম প্রথমে একটি গোল দেয় এবং পরে পেনালটি পেয়েও একটি অব্যর্থপ্রায় গোল নষ্ট করে। মহমেডান শুধু সৌভাগ্য বশতঃই সেদিন ২-১ গোলে জয়ী হয়ে ফাইনালে পৌচল। জুনিয়ার টীম হাওড়া নামজাদা মিলিটারী টীম ডি, সি, এল, আই এবং ইষ্ট ইয়র্ককে হারিয়ে সেমি ফাইনালে উঠল। হাওড়ার ফুটবল ইতিহাসে এই জুনিয়ার টীমের পক্ষে সেমি-ফাইনালে উঠা কম গৌরবের নয়। এদিকে ইষ্ট ইয়র্কের পরাজয়ের পর শীল্ডে আর কোন মিলিটারী টীম রইল না। অথচ কিছুদিন আগেও শীল্ড-বিজয়ী হওয়া এই মিলিটারী টীমদের প্রায় একচেটিয়া ছিল। সেমিফাইনালে ক্যালকাটা ও মোহনবাগান এবং মহমেডান ও হাওড়া স্পোর্টিং উঠতে শীল্ডে এক নতুন রেকর্ড হল। এর পূর্ব্বে বোধ হয় সেমিফাইনালে স্থানীয় চারটী টীম—এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্য সিভিলিয়ান টীম উঠতে পারেনি। হাওড়াকে অতি সহজেই ৫ গোলে হারিয়ে মহমেডান ফাইনালে ক্যালকাটাকে সাক্ষাৎ করল।

এবারকার মিলিটারী টীমের খেলা তত চিত্তাকর্ষক বা প্রশংসনীয় হয়নি। রেফারির সম্বন্ধে কোন প্রশংসা করবার সাহস রাখি না। এবার রেফারীর খেলার দোষে জেতা গেমগুলি নষ্ট হয়েছে। আই, এফ, এ ভাল রেফারি নিযুক্ত

শীল্ড সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ও ক্যালকাটার ক্যাপ্টেনদ্বয় (এস্, চৌধুরী ও ডেন্ট্‌স্) খেলার পূর্ব্বে করমর্দ্দন করছেন। মধ্যস্থলে রেফারি সি, ডান্‌কান্

করতে পারে না, এ তাদের পক্ষে লজ্জার কথা। উপযুক্ত রেফারীর অভাবে ভাল মিলিটারী ও সিভিলিয়ান টীমদের আজকাল শীল্ডে দেখা যায় না।

শীল্ড ফাইনাল

অসংখ্য দর্শকের সম্মুখে, শুকনো মাঠ, পরিষ্কার আকাশের তলায় ১লা আগষ্ট দুই দল খেলতে নাবে। কিন্তু প্রথমদিনের খেলা ড্র হয়। দ্বিতীয় দিনে অতিরিক্ত সময় খেলার পরও ফলাফল অমিমাংসিত ভাবেই থাকে। তৃতীয় দিনে আবার

আর্মষ্ট্রং আমেদ নুরমহম্মদ নোবল্ সাবু গোল্ড

খেলা আরম্ভ হয়। ১৯০৩ সালে শীল্ড-ফাইনালে ২ দিন ড্র-এর পর তৃতীয় দিনে ক্যালকাটা জয়ী হয়েছিল। অনেকে হয়ত এবারও আশা করেছিল যে ক্যালকাটা আবার সেই কীর্ত্তিই রাখবে। কিন্তু তৃতীয় দিনের খেলায় রসিদ (জুনিয়ার) প্রথমে একটি গোল দেয়। খেলা শেষ হতে মাত্র দুই মিনিট বাকি এমন সময় ক্যালকাটা গোলটি শোধ করে। তৃতীয় দিনেও খেলা অমিমাংসিত থাকে দেখে অতিরিক্ত সময় খেলা আরম্ভ হয়। তখন রহিম আরো একটা গোল দিয়ে ক্যালকাটার

দ্বিতীয় টেষ্টে মার্চেন্ট খেলছেন। ইনি ১১৪ রান্ করেন।

সব আশা ভেঙ্গে দেয়। মহমেডানের বিজয়-উল্লাস তখন মাঠ ছাড়িয়ে সারা কলকাতা ছড়িয়ে পড়ে। ২-১ গোলে জয়ী হয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ফুটবলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ট্রফি' লাভ করল। সেই ১৯১১ সালে মোহনবাগানের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির পাশে ২৫ বছর পর মহমেডানের গৌরবময় রেকর্ড স্থান পেল। তারপর একই বছরে লীগ ও শীল্ড বিজয়ী হয়ে ক্রীড়ামাঠে ভারতীয় দলের মান রাখল মহমেডান দল। ক্যালকাটার আর্ম্মষ্ট্রং, টমসন, টেলার, গ্রসম্যান এবং বিজয়ী দলের নূরমহম্মদ, আব্বাস, সফি রহিম অতি সুন্দর খেলেছিল। আমরা বিজয়ী মহমেডান দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ক্রিকেট

২৬শে জুলাই ম্যাঞ্চেষ্টার ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ভারতীয় বনাম ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয়। লর্ড গ্রাউণ্ডে ইণ্ডিয়া টস জিতায় সুন্দর আকাশ ও সূর্য্যালোকের মধ্যে মুস্তাক ও মার্চ্চেণ্ট খেলতে নাবে। ১৩ রানে মুস্তাক রাণ আউট হল। অমর সিংহ নেবে রান তুললে ২৭। সে, কে নাইডু মাত্র ১৬ রানে আউট হয়ে যায়। মার্চ্চেণ্ট ৩৩ রানে বিদায় নেয়। জলযোগের পর ওয়াজির আলি ও রামস্বামী কোন মতে টীমটিকে বাঁচিয়ে রাখে। দুর্দ্দান্ত বোলারের বিরুদ্ধে বেশ সুন্দর খেলে উভয়ে রান করে ৪২ ও ৪৩। রামস্বামীর

দ্বিতীয় টেষ্টে ভারতীয় দল ফিল্ড করতে নামছেন।

পরই দ্রুত উইকেট পড়তে লাগল। জাহাঙ্গীর সি, এস, নাইডু, ভিজিয়ানাগ্রাম ক্রমেই বিদায় নিলে। ২০৩ রানে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস শেষ হল। ভেরেটী ৪ উইকেট ৪১ রান নেয়। এই অল্প রানের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে মোট রান উঠল ৮ উইকেটে ৫৭১। গিমব্লেট ৯, ফ্যাগোর ৩৯ রানের পর ইংলণ্ডের খেলার গতি ঘুরে যায়। বিখ্যাত হ্যামণ্ড ভারতীয় বাছা বাছা বোলারদের জব্দ করে রানের পর রান তুলতে লাগল এবং অতি উৎকৃষ্ট খেলে রান তুলল

অলিম্পিক শিবিকায় ভারতীয় হকি দল পোকার খেলছেন।

১৬৭। হার্ডষ্টাফও কম গেল না। ক্রীড়া-দক্ষতার পরিচয় দিয়ে রান করল ৯৪। তারপর রবিনস ও ভেরেটী এই সুদক্ষ জুটী দুর্ব্বল ও ক্লান্ত বোলারদের বিরুদ্ধে অতি অনায়াসে খেলে ৫০০ শতের কোঠা অতিক্রম করে গেল। এই দীর্ঘ রানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করল। অনেকে ভেবেছিল দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের ফলাফল আরও নিকৃষ্ট হবে। কিন্তু ভারতীয় দলের মান রাখল দুই উৎকৃষ্ট খেলোয়াড় মুস্তাক ও মার্চেন্ট। এ্যালেন্, রবিনস, ভেরেটী প্রভৃতি নামজাদা বোলারদের বিরুদ্ধে মার্চেন্ট ও মুস্তাক অপ্রতিদ্বন্দী হয়ে রইল। ইংলণ্ডের আক্রমণ ব্যর্থ হল। মার্চেন্ট ১১৪ ও মুস্তাক ১১২ রান করে বিপুল হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় পক্ষ হতে এক রেকর্ড করল। তারপর রামস্বামীর ৬০ সি, কে, নাইডুর ৩৪ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অমর সিংহ অতি অল্পক্ষণ খেলেই রান করল ৪৮। তখন অপরিষ্কার আকাশের জন্য এবং আলোর অভাবে খেলা বন্ধ হয়। ভারতীয় ৫ উইকেটে রান করেছিল ৩৯০। ভারতীয় দলের খেলা খুব সন্তোষজনক সন্দেহ নাই। যদিও শেষ পর্য্যন্ত খেলার ফলাফল ড্র হয়।

প্রথম ইনিংস—ভারতীয় দল

মার্চেন্ট কটহ্যামণ্ড, ব ভেরেটী	৩৩
মুস্তাক রান আউট	১৩
অমর সিংহ কট ডাকওয়ার্থ, ব ওয়াদ্দিংটন	২৭
সি, কে, নাইডু এল, বি, ডবলিউ, ব এ্যালেন	১৬

অলিম্পিক ক্ষেত্রে ব্যায়ামনিরতা ইটালীর মহিলাগণ

প্রথম ইনিংস—ভারতীয় দল

ওয়াজের আলি কট ওয়ার্দ্দিংটং, ব ভেরেটী	৪২
রামস্বামী ব ভেরেটী	৪০
জাহাঙ্গীর খাঁ কট ডাকওয়ার্থ, ব এ্যালেন	২
সি, এস নাইডু ব ভেরেটী	১৩
ভিজিয়ানাগ্রাম ব রবিনস	৬
মেহরমজী নট-আউট	০
নিশার কট হার্ডষ্টাফ, ব রবিনস	১৩
অতিরিক্ত	১
মোট	২০৩

বোলিং

এ্যালেন	,,	৩৯ রানে	২ উইকেট
রবিনস	,,	৩৪ ,,	২ ,,
ভেরেটী	,,	৪১ ,,	৪ ,,

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস

লিমব্রেট ব নিশার	৯
ফ্যাগ এর বি ডবলিউ ব মুস্তাক	৩৯
হ্যামণ্ড নট আউট	১১৮
ওয়ার্দ্দিংটন কট সি কে নাইডু, ব সি এস নাইডু	৮৭
ফিসলক ব সি, কে, নাইডু	৬
হার্ডষ্টার্ফ কট ও ব অমর সিংহ	৯৪
এ্যালেন কট মেহের হোমজী ব অমর সিংহ	১
রবিনস কট মার্চ্চেন্ট ব নিশার	৭২
ভেরেটি নট আউট	৬৬
ডাকওয়ার্থ নট আউট	১০
অতিরিক্ত	১৬
মোট (আট উইকেট ডিক্লেয়ার্ড)	৫৭১

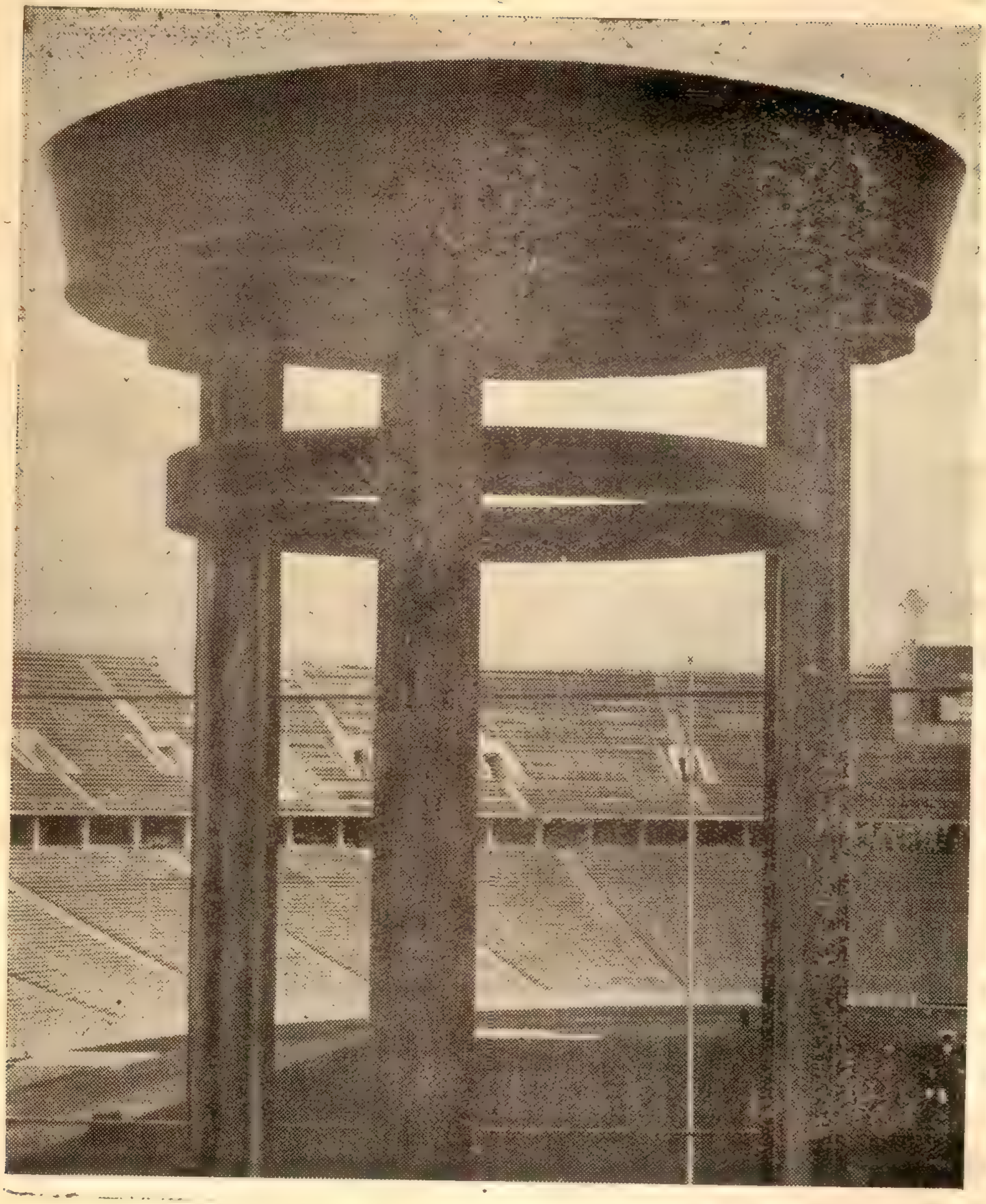

১লা আগষ্ট জার্ম্মান-প্রেসিডেণ্ট হার হিটলার লক্ষাধিক দর্শকের সম্মুখে অলিম্পিক বাতি জ্বালান। উপরের পাত্রে আলোটি জ্বলছে।

ভারতীয় দল—দ্বিতীয় ইনিংস

মার্চেন্ট এল বি ডবলিউ ব হ্যামণ্ড	১৪
মুস্তাক কট ও ব রবিনস	১১২
রামস্বামী ব রবিনস	৬০
সি কে নাইডু কট ডাকওয়ার্থ ব ভেরেটি	৪১
ওয়াজের আলি ব রবিনস	৪
অমর সিংহ নট আউট	৪৮
ভিজিয়ানাগ্রাম নট আউট	০
অতিরিক্ত	১৮
মোট (৫ উইকেটে)	৩৯০

অলিম্পিক স্পোর্টস

১৯৩৬ সালে জার্মেনিতে ওয়ার্ল্ড অলিম্পিক স্পোর্টস আরম্ভ হয়েছে। এথেন্সে গ্রীসের রাজা জর্জ্জ প্রথম অলিম্পিক আলো জ্বালান। বার্লিনে উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট হার হিটলার। প্রায় এক লক্ষ দর্শকের সামনে উৎসবের সূচী অনুষ্ঠান ১লা আগষ্ট হতে আরম্ভ হয়ে ১০ই আগষ্টে সম্পন্ন হবার কথা। এবার ভারতীয় পক্ষ হতে হকি খেলো টীম এবং স্পোর্টসে এথলেটিকরা যোগদান করেছে। বার্লিনে ভারতীয় এথলেটিকদের নৈরাশ্যজনক ক্রীড়ার ফলে সকলেই দুঃখিত। ভোলা স্বামী, হরমন সিংহ, রসিদ প্রভৃতি কোন প্রতিযোগিতায় সেমি ফাইনাল কিংবা ফাইনালে উঠাত দূরের কথা, অনেকেই "হিট" এ পর্য্যন্ত জয়ী হতে পারেনি। প্রতিযোগিতায় মুখে প্রথম ভারতীয় এথলেটিকদের অযোগ্যতা প্রমাণ করে যে স্পোর্টস- মহলে বিদেশের তুলনায় আমরা কত পেছিয়ে আছি। ভবিষ্যতে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে এদের পাঠান শুধু পয়সা ব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। একমাত্র থাকিতে ভারতীয় দল দেশের মর্য্যাদা ও কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। আমেরিকাকে ৭ গোল এবং জাপানকে ৯ গোল দিয়ে ভারতীয় দল ফাইনালে উঠেছে। একমাত্র জার্ম্মেনী ছাড়া ভারতীয় দলের আর কেউ যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বললেই চলে।

শ্রীবিনয় রায় চৌধুরী

মিনতি

ইন্দুবালা মজুমদার

বিশ্ব তোমার চপলতা পরিহরি,
বসিয়া সৌম নিবিড় নিঝুম রাতি ;
সৃষ্টি চাতুরী ভুবনের শোভা হেরি ;
লাগে বিস্ময় আঁখি পাতা আসে মুদি !

গত জীবনের ভুলে যাওয়া কত কথা,
মরা পৃথিবীর নিঝুম শিয়রে বসি ;
সুধু ভাবি, প্রাণে ঢালে যত আকুলতা ;
নিথরে বসিয়া তাই শুনি সারা নিশি !

তরু তৃণরাজি আকাশ জলধিগিরি,
চন্দ্র তপন বন প্রান্তর সবে ;
স্তব্ধ, বর্ণে মহিমা সবে তোমারি ;
বিরাট শক্তি বুঝি না কেন গো তবে।

রিক্ত তনয়া নিবেদন পদে প্রভু,
নিজ ব্যথা ভুলি যেন তব দয়া স্মরি ;
নিজে ভুলি, তবু তোমারে না ভুলি কভু ;
নিজে নগণ্য, তোমারে মহান্ বরি।

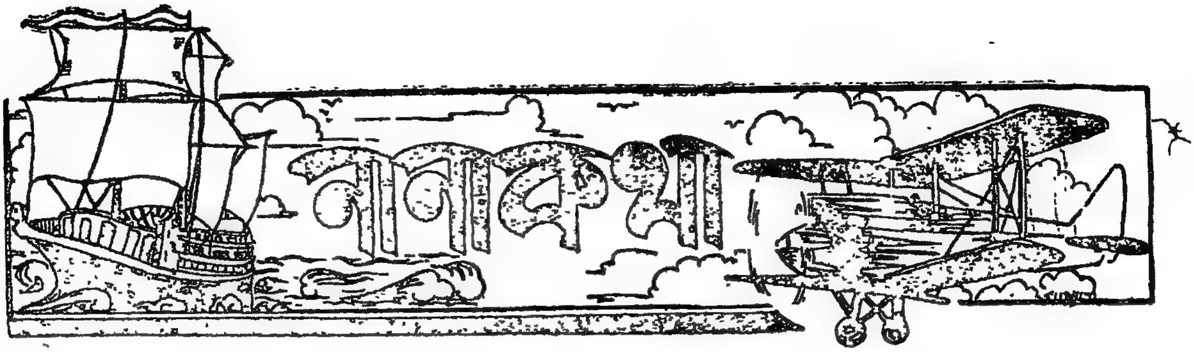

সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের প্রাণনাশের চেষ্টা

ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের প্রাণনাশের চেষ্টায় সমস্ত জগৎ বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হয়েছে। ভগবানের কৃপায় এই পৈশাচিক আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং ঘটনার পর সম্রাট সম্পূর্ণরূপে অবিচলিত থাকেন। সম্রাটের এই বিপদ মুক্তির উপলক্ষ্যে আমরা তাঁর সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রদান

বর্ত্তমান বর্ষের বাৎসরিক কনভোকেশন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নোক্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গকে কয়েক প্রকারের সম্মানিত উপাধি প্রদান করেছেন। বাঙলার গভর্ণর মাননীয় সার জন এণ্ডারসন এবং ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি সার আবদর রহিমকে "ডক্টর-অফ-ল"; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সার মহম্মদ ইকবাল এবং সার যদুনাথ সরকারকে "ডক্টর-অফ্-লিটারেচার"; এবং সার জগদীশচন্দ্র বসু ও সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে "ডক্টর-অফ্-সায়ান্স্"।

উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে এইরূপে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনপ্রিয় হয়েছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিপত্তির প্রভাবে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইতি-পূর্ব্বেই নানাবিধ উপাধি এবং পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে জগত্তারিণী সুবর্ণপদক লাভের পর এই দ্বিতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক সম্মানিত হ'লেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিকের এই মর্য্যাদা-স্বীকৃতি সমগ্র সাহিত্যিক মণ্ডলীর পক্ষে আনন্দদায়ক হয়েছে, এবং আমরা বিশেষভাবে বিচিত্রার পক্ষ হ'তে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রকে বিচিত্রার বহুমান্য লেখক হিসাবে আমাদের আনন্দাভিবাদন জ্ঞাপন করছি।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়

আমেরিকাবাসী স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী, সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি গ্রন্থ লেখক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় গত ১৫ই জুলাই ইউ-নাইটেড ষ্টেট্সের নিউ ইয়র্ক নগরে প্রাণত্যাগ করেছেন। এ সংবাদ বাঙালী মাত্রেরই পক্ষে মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ,—বিশে-ষতঃ এই জন্য যে, স্বাভাবিক কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটেনি, অনির্দ্দেশ্য মানসিক উত্তেজনা হেতু তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছিলেন। দেশের মুখোজ্জ্বলকারী এই বাঙ্গালী সন্তান এমন কি অসহনীয় বেদনায় নিজের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করলেন, বাঙ্গালী পাঠকের মনে তা জানবার সবিষাদ কৌতূ-হল চিরদিন থাকবে।

আমেরিকানদের নিকট আমেরিকাবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে ধনগোপালই বোধকরি সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত এবং সমাদৃত ছিলেন। কিন্তু অতিশয় সামান্য অবস্থা হ'তে কেবল মাত্র নিজের সাহস অধ্যবসায় এবং দৃঢ়চিত্ততার গুণে সুদূর বিদেশে কিরূপে তিনি এই সম্মানার্হ স্থান অধিকার করতে সমর্থ হন, তার ইতিহাস যেমন কৌতুকাবহ তেমনি উৎসাহদায়ক।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতা সহরে ধন-গোপাল জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় তমলুকে ওকালতী করতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে ধনগোপাল পিতামাতার অজ্ঞাতসারে জাপান গমন করেন।

তথায় কোনো প্রকার শিল্প বিষয়ে শিক্ষা লাভ করবার বাসনা ছিল। কিন্তু সে বিষয়ে তেমন কৃতকার্য্য না হওয়ায় জাপান-বাসী কয়েকজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর সহায়তায় আমেরিকা গমন করেন। সেখানে ধনগোপাল শস্যক্ষেত্রে এবং ফলের বাগানে মালীর কাজ, এবং হোটেলে ও গৃহস্থ-গৃহে বাসন মাজা ভৃত্যের কাজ করে জীবিকা অর্জ্জন করেন, এবং সেই সুযোগে বিদ্যার্জ্জন করতে করতে অবশেষে ক্যালিফোর্ণিয়ার লেল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হন। অতঃপর তিনি সাহিত্য সেবায় মনোযোগ প্রদান করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী লেখকরূপে আমেরিকা এবং ইয়োরোপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ধনগোপাল শিশু-সাহিত্যেও একজন যশস্বী লেখক ছিলেন, তাঁর লিখিত গদ্যে এবং কবিতায় বিংশাধিক পুস্তকের মধ্যে দশখানি বালকবালিকাগণের জন্য লিখিত। তন্মধ্যে Gay Neck পুস্তকখানির জন্য তিনি ১৯২৭ সালের "The most distinguished Children's Book" হিসাবে জন নিউবেরী পদক লাভ করেন। ধনগোপাল তাঁর পুস্তকাবলীর আয় হ'তে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁর কয়েকটি পুস্তক তাদের প্রকাশের বৎসরের সর্ব্বাধিক বিক্রীত পুস্তকাবলীর মধ্যে স্থান লাভ করে। মিস্ মেয়ো লিখিত 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকের প্রতিবাদে তিনি তাঁর "A Son of Mother India Answers" নামক পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকের প্রভাবে আমেরিকানগণের মন হ'তে মিস্ মেয়োর পুস্তকজনিত বিষাক্ত ক্রিয়া অনেকাংশে অপনোদিত হয়।

শুধু পুস্তকলেখক হিসাবেই নয়, বক্তা হিসাবেও ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভূত যশ অর্জ্জন করেন। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের অনেক স্থানে এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সাহিত্য ধর্ম্ম ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় স্বামী শিবানন্দ ধনগোপালের মন্ত্রগুরু ছিলেন।

১৯১৭ সালে ধনগোপাল একটি মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করেন, নবেন্দ্রগোপাল নামে তাঁর একটি ষোড়শ বৎসর বয়স্ক পুত্র আছে।

ইনডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল অ্যাসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্

পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রাপ্ত এই জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের গত ১৯৩৫ সালের বার্ষিক বিবরণী এবং উদ্বৃত্ত-পত্র আলোচনা ক'রে কোম্পানীর ক্রমোন্নতি লক্ষ্য ক'রে আমরা সুখী হয়েছি। গত তিন বৎসরের হিসাব পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেক বৎসরে প্রত্যেক বিষয়েই পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে উন্নতি সাধিত হয়েছে। গত ১৯৩৫ সালে কোম্পানী বিরূপ উন্নতি করেছেন, নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে।

আলোচ্য বৎসরে সাধারণ বিভাগে মোট ১,০১,৫৮,৫০০৲ টাকা এবং ৫০০ পাউণ্ড মূল্যের ৫৫৬৯ টি প্রস্তাব কোম্পানীর নিকট উপস্থিত হয়েছিল, তন্মধ্যে কোম্পানী ৮৩,৫৩,২৫০৲ টাকা এবং ৫০০ পাউণ্ড মূল্যের ৪৭৫১টি পলিসি মঞ্জুর করেন। তৎপূর্ব্ব বৎসরের মোট পলিসি মূল্য ছিল—৭৮,৭৭,৭০০৲ টাকা ও ২০০ পাউণ্ড।

আলোচ্য বৎসরে ৩,৭২,১৩,১০১।৶৮ মূল্যের ১৭,৩৯৭ টি পলিসি কোম্পানীর খাতায় মজুত ছিল।

আলোচ্য বৎসরে সাধারণ বিভাগে কোম্পানীর নিকট হ'তে মৃত্যুজনিত দাবী ১৪৩টি এবং বীমাকাল পূরণ দাবী ৭৪টি ছিল। এই দুই হিসাবে লভ্যাংশ সহ কোম্পানীর দেয় যথাক্রমে ৩,৫৭,৫২১৲ টাকা ও ২,৩৬,২৪৫৴০ টাকা।

কোম্পানীর রেভেনিউ হিসাব থেকে দেখা যাবে যে, জীবন বীমা ভাণ্ডারের তায়দাদ ৫৩,৩৬,১৪৬৮১ হ'তে ৬২,৯১,৯৩৭৮/৬ টাকায় বর্দ্ধিত হয়েছে। এতদ্ভিন্ন কোম্পানীর ১,২৮,৮০৩।/১০ টাকার রিজার্ভড্ ফণ্ড ও ১,০৪,৩৯০৲ টাকার স্পেশিয়াল রিজার্ভড্ ফণ্ড আছে।

এই কোম্পানীর টাকা খাটাবার ব্যবস্থা সুবিবেচিত এবং নিরাপদ, এবং পরিচালনার ব্যয় পরিমিত এবং আয়ের তুলনায় অল্প। ১৯১৩ সালে স্বর্গীয় সার ফেরোজ শা. মেটা কর্ত্তৃক এই কোম্পানী স্থাপিত হয়, এবং বর্ত্তমানে বোম্বাইয়ের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী,—যথা সার লালুভাই শ্যামলদাস, সার হুকুমচাঁদ স্বরূপচাঁদ, সার চিমনলাল শীতলবাদ, সার গুলাম হুসেন হিদায়েৎ-উল্লা প্রভৃতি কর্ত্তৃক ইহা পরিচালিত।

এই কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা যে অতিশয় সন্তোষজনক এবং সেজন্য ভারতীয় প্রথম শ্রেণীর বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এটি যে অন্যতম তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম কলিকাতার একটি অতিশয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান একথা অনেকেই অবগত আছে। এই ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির বিষয়ে সাধারণে মনোযোগী হোন্—এ আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। নিম্নোদ্ধৃত "নিবেদন"টি হ'তে এ প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান প্রয়োজনের বিষয়ে সকল কথা জানা যাবে ব'লে আমরা ইহা মুদ্রিত করলাম।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যা সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীগৌরীপুরী দেবী মাতাজীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তির বলে ১৩০১ সালে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের উদ্দেশ্য :—(১) হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজ অনুযায়ী স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার, (২) সদ্বংশজাতা দুঃস্থা বালিকা এবং বিধবাদিগকে আশ্রয় দান, এবং (৩) নারীদিগকে আদর্শ জীবন-যাত্রার পথে সহায়তা করা। সেই সঙ্গে গৃহকর্ম্ম ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার জন্য শিক্ষা দানেরও সুব্যবস্থা থাকায় প্রতিষ্ঠানটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বর্ত্তমানে আশ্রমবাসিনীদের সংখ্যা প্রায় ৫০ ; ইহাদের অধিকাংশের যাবতীয় ব্যয়ভার আশ্রম, সাধারণের দানলব্ধ অর্থ হইতে বহন করেন। আশ্রম সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ৩০০ ; শিক্ষা অবশ্য অবৈতনিক।

আশ্রম-পরিচালক-মণ্ডলীতে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি, আই-ই এস, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, এম-এল-সি, স্যার হরিশঙ্কর পাল, মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন, প্রভৃতি মহানুভব এবং বিচক্ষণ ভদ্রমহোদয়গণ এবং শ্রীযুক্তা ননীবালা দেবী (লেডী ব্রহ্মচারী), শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দে (মিষ্টার পি, সি, দে ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন জজ মহাশয়ের পত্নী), শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী, সাংখ্যতীর্থা, বি-এ, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিতা মহিলাগণ আছেন। শ্রীশ্রীমাতাজী এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ('মাতৃসঙ্ঘ" নামে) একদল একনিষ্ঠ নারী-কর্ম্মী গঠন করিয়াছেন, যাঁহারা কোনও প্রকার অর্থের প্রত্যাশা না রাখিয়া এই মহান্ ব্রতে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীমাতাজীর এই দুরূহ কার্য্য চালাইবার যোগ্যতাও তাঁহাদের আছে। শিক্ষাদান এবং আভ্যন্তরীণ কার্য্য পরিচালনার ভার উপযুক্ত মহিলাদিগের উপর ন্যস্ত। আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি বৎসর উপযুক্ত পরীক্ষকগণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। আশ্রমের বার্ষিক বিবরণীর সহিত ঐ হিসাবও সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হয়।

শ্রীশ্রীমাতাজীর অক্লান্ত চেষ্টায় এবং দেশবাসীর সহৃদয়তায় কলিকাতায় ২৬নং মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটে আশ্রমের নিজস্ব জমিতে ১৩৩১ সালে একটী ত্রিতল ভবন এবং মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ছাত্রী-সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। আশ্রমের কাজের পরিধিও বিস্তৃত হইতেছে। সেজন্য আশ্রম ও বিদ্যালয় উভয়ত্র স্থানের অভাব। স্থানাভাব এবং অর্থাভাব হেতু প্রতি বৎসর অনেক দুঃস্থা বালিকা এবং বিধবাকে গ্রহণ করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং আশ্রম ভবনের আয়তন বৃদ্ধি করা অবিলম্বে প্রয়োজন। সৌভাগ্য-বশতঃ আশ্রম-ভবনের সংলগ্ন একখণ্ড জমি আছে, উহা এই উদ্দেশ্যে ক্রয় করিবার চেষ্টা হইতেছে। জমির মূল্য এবং তদুপরি গৃহনির্ম্মাণাদি বাবদ অন্যূন ৩০,০০০৲ টাকার প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত যাহাতে প্রতিষ্ঠানটী সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং ইহার কর্ম্মক্ষেত্র দিন দিন প্রসার লাভ করে তজ্জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন।

সমাজের হিতৈষী, স্ত্রী-শিক্ষার অনুরাগী এবং আমাদের দুঃস্থা মাতা ও ভগিনীগণের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন সহৃদয় নরনারীর প্রতি আমাদের সনির্ব্বন্ধ নিবেদন,—যিনি যাহা পারেন আশ্রমের সাহায্যে তাহা দান করুন। তাঁহাদের এই সহৃদয়তা দেশবাসী, তথা নিখিল জগতের কল্যাণকামী ভবিষ্যযুগের নরনারীগণ অবশ্যই সকৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে স্মরণ রাখিবেন। দান সামান্য হইলেও সাদরে গৃহীত এবং

যথারীতি স্বীকৃত হইবে। অর্থ পাঠাইবার ঠিকানা :—
(১) শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী, আশ্রম সম্পাদিকা, ২৬ নং মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা, অথবা (২) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সলিসিটার, ৬নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইতি—

শ্রীরূপেন্দ্রকুমার মিত্র,
(বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট)
শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
(এম-এ, বি-এল, ব্যারিষ্টার-অ্যাট-ল, এম-এল-সি, ভাইস্-চ্যান্সেলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
(চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন)
শ্রীদুর্গাচরন সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (মহামহোপাধ্যায়)
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,
(নাইট, এম-এ, এম-ডি, পি-এইচ-ডি)
শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দত্ত,
(ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল, আসাম)
শ্রীবদ্রীদাস গোয়েঙ্কা,
(নাইট, সি-আই-ই)
শ্রীদেবীপ্রসাদ খৈতান,
(প্রেসিডেণ্ট, ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স)

স্বর্গীয় ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় ও মিলিটারী ক্রস্ পদক

গত মহাযুদ্ধের সময়ে মেসোপটেমিয়ায় বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য স্বর্গীয় ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন একথা অনেকেরই স্মরণ আছে। বীরত্ব অর্জ্জন ক'রে যে সকল বাঙালী বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল করেছেন তন্মধ্যে কল্যাণকুমারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশের এই সুসন্তান এই খ্যাতি অর্জ্জনের পর দেশে প্রত্যাগমন করতে পারেন নি। কুট এল-আমারার যুদ্ধে তুর্কীরা তাঁকে বন্দী করে, এবং টাইফস্ রোগে আক্রান্ত হ'য়ে তিনি ১৯১৭ সালে তুর্কী প্রদেশে প্রাণত্যাগ করেন। কল্যাণকুমারের বিধবা পত্নী শ্রীমতী বিভা মুখোপাধ্যায় স্বামীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২৩,০০০৲ টাকা দান করতে প্রস্তুত হয়েছেন। ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য এই টাকার সুদ থেকে একটি বৃত্তি স্থাপিত হবে। জাতি ধর্ম্ম এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে কেবলমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণ এই বৃত্তির অধিকারী হ'তে পারবেন।

সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য বাঙালীদের মধ্যে কল্যাণকুমারই সর্ব্বপ্রথম মিলিটারী ক্রস্ পদক পান, সে বিষয়ে সম্প্রতি দেরাদুন হ'তে শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ সোম এবং কলিকাতা Teachers' Training Cclegeএর অধ্যক্ষ ডক্টার সত্যানন্দ রায় এম-এ,-পি-এচ-ডি আমাদিগকে পত্র লিখেছেন।

শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ সোম লিখেছেন, "গতকল্য তারিখের [৫-৮ ১৯৩৬] পাইওনিয়ার সংবাদপত্রের এক অংশ] [It will be recalled that Captain Mukherjee who was the first Bengali to be awarded the Military cross in 1915 for distinguished services in Mesopotamia, was taken prisoner at Kut-el Amara during the great war and died in a small town in Turkey in March 1917.] আপনার অবগতির নিমিত্ত এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই বাঙালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এম-সি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পর লেঃ কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন ও লেঃ কর্ণেল মণীন্দ্রনাথ দাস মহাশয়দ্বয় বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই উপাধি পান। আর সেদিন ক্যাপ্টেন পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয় এই উপাধি পাইয়াছেন। গত ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের 'বিচিত্রা'তে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।"

ডক্টার সত্যানন্দ রায় লিখেছেন,—

"গত ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের বিচিত্রায় বাঙ্গালী আই-এম-এস দিগের মধ্যে যিনি প্রথম মিলিটারী ক্রস লাভ করেন এই বিষয়ে প্রতিবাদ বাহির হয়।

'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এপ্রিল মাসে

ওই পত্রিকায় লিখিত বিষয়ের প্রতিবাদে যে মাসে লিখিয়াছেন 'ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার মুখার্জ্জি আই-এম-এস বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম এই সম্মান লাভ করেন।' ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমারকে আমি চিনিতাম।

বিচিত্রায় এপর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোন প্রতিবাদ বাহির হয় নাই; সে জন্যে আমি এতদিন পর লিখিতে বাধ্য হইলাম।

১৯১৫ সালে বিলাতের সংবাদপত্র London Times এ যে লেখা বাহির হয় উহাও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উহা ব্যতীত পরলোকগত কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাহসিকতা ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠার বিষয়ে সৈন্য বিভাগের উচ্চতর কর্ম্মচারীগণ দুইবার Despatchএ উল্লেখ করেন। এবং তিনি একবার সমরক্ষেত্রে আহত হয়েন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি সুদূর তুর্কী প্রদেশে বন্দী শিবিরে টাইফাস রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯১৭ সালে প্রাণত্যাগ করেন। দেশে ফিরিয়া আসিবার আর সুযোগ হয় নাই। ইহার পর হইতে ১৯১৭ সালে ক্যাপ্টেন (এক্ষণে Lt. Col.) জ্যোতিলাল সেন, ক্যাপ্টেন (এক্ষণে Lt. Col.) মণীন্দ্র দাস মহাশয় এবং ১৯৩৬ সালে ক্যাপ্টেন পতিতপাবন চৌধুরী উক্ত সম্মান লাভ করেন।

M. C. for Bengali officer

"Captain K. K. Mukerji I. M. S. has been awarded the Military Cross for distinguished service in Mesopotamia. During the investment of Kut-el-Amara he displayed great bravery in helping the wounded under heavy shell fire.

He was taken prisoner when General Townshend surrendered. He is the first Bengali decorated for distinguished service in the field and Bengalis have every reason to be proud of him.

—London Times—

শীল্ড বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং

উপর্য্যুপরি তিন বৎসরের লীগ বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং এবার শীল্ডও জয় ক'রে ফুটবল ক্ষেত্রে তাঁদের অপরাজেয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভারতীয় টীমের এই বিজয় লাভে আমরা সকলেই অতিশয় আনন্দিত হয়েছি এবং বিজয়ী দলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

'দেবতার হাসি' গল্প ও শ্রীযুত কুড়নচন্দ্র সাহা

শ্রীযুত কুড়নচন্দ্র সাহা লিখিত 'দেবতার হাসি' গল্পটি গত বৈশাখের 'বিচিত্রা'য় এবং 'বঙ্গশ্রী'তে একসঙ্গে মুদ্রিত হয়েছিল এবং তদ্বিষয়ে জ্যেষ্ঠের বিচিত্রায় শ্রীযুত অশীষ গুপ্ত পত্র লিখেছিলেন, এ কথা বিচিত্রার পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কুড়নচন্দ্র সাহা এই গোলযোগ হওয়ার বিষয়ে তাঁর পক্ষ থেকে কৈফিয়ৎ দিয়ে একটী পত্র লিখেছেন। কুড়ন বাবুর কৈফিয়ৎ পাঠ ক'রে তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের অনুযোগের প্রায় সবটাই অপনোদিত হয়েছে।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের বিচিত্রা

শারদীয় পূজা উপলক্ষে আগামী আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের বিচিত্রা যথাক্রমে ৩০শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর এবং ২০শে আশ্বিন, ৬ই অক্টোবর প্রকাশিত হবে। উক্ত দুই সংখ্যার প্রকাশের জন্য প্রকাশ তারিখের পাঁচ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফর্ম্মার বিজ্ঞাপন এবং দুই দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ষ্টিচ বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা চল্‌বে।

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Bishnupada Chakravarti at the Sahitya-Bhaban Press, 21, Holwel Lane, Calcutta and Published by Saratchandra Mukherjee from 27-1, Fariapooker St. Calcutta.

বিদায়কালে

শ্রীচিন্তামণি কর

বিচিত্রা

দশম বর্ষ, ১ম খণ্ড	আশ্বিন, ১৩৪৩	৩য় সংখ্যা

পত্র-কথা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Shepheard's Hotel,
Cairo.

কল্যাণীয়াসু,

নিজের কীর্ত্তি সম্বন্ধে glowing account প্রচার করতে হ'লে বেনামে করা উচিত, শাস্ত্রে এই কথা বলে। কিন্তু আমার বিশ্বাস মনুসংহিতা খুঁজে দেখলে এমন কথাও পাওয়া যাবে যে, উপযুক্ত সাঙ্গো-পাঙ্গের অভাব ঘটলে নিজের কলমেও এ কাজ করা চলে। মোট কথা হচ্ছে এই যে, আমার পশ্চিম অভিযানের অন্তিম বিভাগে জয়ধ্বনিতে কিছুমাত্র সুর কম পড়েনি। কিন্তু তার বিস্তৃত বিবরণ লেখবার মত সখ আমার নেই, কখনো এ কাজ করিনি। তার কারণ, নিজেকে বিশেষ কোনো একজন মনে করতে আজও পারিনে—এ সম্বন্ধে আমার স্বদেশের অনেক লোকের সঙ্গেই আমার মতের মিল হয়। আমার অন্তরলোকে কোন একটা অগম স্থানে একজন কেউ বাস করে—সে কোথা থেকে কথা কয়—সে কথার মূল্যও আছে—কিন্তু আমিই যে সে, তা ভাবতেও পারিনে—আমার মধ্যে তার বাসা আছে এই পর্য্যন্ত। যে-আমি প্রত্যক্ষগোচর সে নিতান্তই বাজে লোক—তাকে সহ্য করা শক্ত, বন্দনা করা দূরের কথা। তাকে কোনরকম করে তফাতে সরিয়ে দিতে পারলে তবেই আমার অন্তরতর মানুষটির মান রক্ষা হয়। সেই চেষ্টায় আছি।

যাই হোক্, এদেশে বেশ একটু আন্দোলন করা গেছে। একটা সুবিধে, জর্ম্মণ বলবার দরকার হয়নি। তুমি থাকলে তোমার একটা মস্ত সুবিধে হত, পঁচিশ ত্রিশ পাতা চিঠি লেখার পূরো খোরাক

পেতে—তাতে আমারো জয়ঘোষণা হত। বৌমার দ্বারা এ কাজ হবার জো নেই—রথীর কলমেরও তেমন দৌড় নেই। অতএব এই পালার উপসংহার ভাগের ইতিবৃত্ত বঙ্গভাষার মধ্যে কোথাও স্থান পেল। ইংরেজী ভাষায় ছাড়া ছাড়া ভাবে ছড়িয়ে আছে খবরের কাগজের ছাঁটা টুক্‌রোয়। সেগুলো হয় ত আমাদের জার্ণালের বুলেটিন বিভাগে জমা হবে।

এ জায়গায় অনেক দেখবার আছে। আমি তেমন দেখ্‌নেওয়ালা নই, এই দুঃখ। কিন্তু তবু ম্যুজিয়মে যাবার লোভ সামলাতে পারিনি। দেখবার এত জিনিষ খুব অল্প জায়গায় পাওয়া যায়। একটা ব্যাপার এখানে খুব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েচে—শুনে অধ্যাপক বিস্মিত হবে। গ্রীসের যে পার্থেনন্‌ গ্রীসের স্বকীয় কীর্ত্তি বলে এতদিন চলে এসেছে সেই পার্থেননের মূল প্রতিরূপ ইজিপ্টের ভূগর্ভে পাওয়া গেছে। যে স্থপতি এই রীতির স্তম্ভ প্রথম তৈরী করেছিলেন অতি প্রাচীন ইজিপ্টে তিনি একজন অসামান্য রূপকার বলে পূজা পেয়েছিলেন। গ্রীকরা তাঁরই কাজের অনুকরণে নিজেদের মন্দির নির্ম্মাণ করেছিল। এই ব্যাপার নিয়ে আবো অনেক মাটি ও মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি চল্‌ছে। মানুষ যে কত সুদূর যুগেও আপন প্রতিভা প্রকাশ করেচে তা ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়—কত অজানা সভ্যতাব কত বিচিত্র গৌরব মাটির নীচে সমুদ্রের তলায় সর্ব্বভুক্‌ কালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তারই বা ঠিকানা কে জানে। আমাদের কাহিনীও একদিন লুপ্ত ইতিহাসের নীচের তলায় কবে অদৃশ্য হয়ে যাবে। যতদিন উপরের আলোতে আছি ততদিন কিছু গোলমাল করা গেল—সম্পূর্ণ চুপচাপ করবাব সুদীর্ঘ সময় সাম্‌নে আছে।

ইতি ২, ডিসেম্বর ১৯২৬ শ্রীরবীন্দ্রনাথ

S. S. Falda.

কল্যাণীয়াসু,

কাল সুয়েজে এসে খবর পেলুম যে, সন্তোষ মারা গেছে। মৃত্যুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যে এত কঠিন তার কারণ অন্যের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমি আছি, অথচ আর যে-একজন আমার সঙ্গে এমন একান্ত মিলিত ছিল সে একেবারেই নেই, এমন বিরুদ্ধ কথা ঠিকমত মনে করাই শক্ত। আমরা নিজেকে অনেকখানি পাই অন্যের মধ্যে—সন্তোষ সেই তাদেরই মধ্যে অন্যতম ছিল। আমার মধ্যে যা-কিছু সত্য ও শ্রদ্ধেয় জিনিষ ছিল তার প্রতি এমন অকৃত্রিম ও সুগভীর শ্রদ্ধা সন্তোষের মত এমন খুব কম লোকেরই দেখেছি। প্রতি বুধবারে সকালে তার সেই শান্ত মুখে যে আগ্রহ প্রকাশ পেত এমন কারো না। প্রত্যেক ৭ই পৌষ ও ১লা বৈশাখ তার কাছে বড় মহার্ঘ্য ছিল। আমার মুখের প্রত্যেক তুচ্ছ আলোচনাও সে বড় আদরের সঙ্গে সঞ্চয় করে রাখত। আমি যখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোনো ক্লাস করেছি সন্তোষ তার সব কাজ ফেলে তাতে যোগ দিয়েছে। আমার জীবনের একটা বিভাগ, সকলের চেয়ে বড় ও সত্য বিভাগ—তাকে নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল। আমার মনে হচ্চে সেইখানে যেন ফাঁক পড়ে গেল। এবার ৭ই পৌষের কল্পনা আমার কাছে দরিদ্র হয়ে গেছে। কেননা অনেকেরই কাছে এই ব্যাপারটা

একটা অনুষ্ঠান মাত্র, কিন্তু সন্তোষের পক্ষে এ ছিল প্রাণের অনুষ্ঠান। বাইরের সত্য আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরের সত্য দানকে আকর্ষণ করে। তার অভাব ঘট্‌লে নিজেরই মধ্যেই দৈন্যের কারণ ঘটে। সন্তোষের প্রতি আমার একটি যথার্থ নির্ভর ছিল কেননা আমার গৌরবে সে একান্ত গৌরব বোধ করত—আমার প্রতি কোনো আঘাত তার নিজের পক্ষে সব চেয়ে বড় আঘাত ছিল। কিন্তু এ আমি কেবল নিজের দিক থেকে বল্‌চি। তার মধ্যে যে অকৃত্রিম সৌজন্য ও মহত্ত্ব ছিল, যে সরল নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা তাকে নিয়ত সাধনার পথে প্রবৃত্ত রেখেছিল তার মূল্য অনেকেই বুঝত না। কিন্তু তার স্বভাবের সেই সুন্দর দিক্‌টা আমার কাছে ভারি মনোরম ও মূল্যবান ছিল। সেই জন্যে তার অনেক অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আমি তাকে এত গভীর স্নেহ করতে পেরেছিলুম। কেননা তার মধ্যে যে একটি বিশিষ্টতা দেখেছিলুম সে আমি অনেকের মধ্যেই দেখিনি। আমার সমস্ত আশ্রয়ের মধ্যে আর কেউ নেই যে তার অভাব পূরণ করতে পারবে। সুতরাং আমার পক্ষে আমার এক অংশের মৃত্যুই হল। যাই হোক্‌, মৃত্যুই আমাকে নূতন প্রাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই আশা করে এবার শান্তিনিকেতনে যাচ্চি। কিন্তু যে একজন ব্যক্তি বাইরের দিক থেকে শ্রদ্ধার দ্বারা আমাকে ডাক দিতে পারত সে রইল না। ইতি—

৫, ডিসেম্বর ১৯২৬ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Falda

৭ই ডিসেম্বর

ভেবেছিলুম জাহাজ এডেনে দাঁড়াবে তখন তোমার চিঠি ডাকে দেব। খবর পেলুম সুয়েজ থেকে কলম্বোর মধ্যে জাহাজ কোথাও দাঁড়াবে না। তাই ভাবচি আরো একটুখানি লিখি। কেননা শান্তিনিকেতনে পৌঁছেই নানা আন্দোলনের মধ্যে গিয়ে পড়ব—বিশেষত এবারে। সামনে একটা বিপ্লব আছে—অনেক ভাঙ্গাগড়ার পালা। যতটা সম্ভব এড়াতে ইচ্ছে করেছিলুম—কিন্তু কর্ম্মফলের যতটা বাকি আছে তার সমস্ত ভোগ শেষ না করলে মুক্তি পাওয়া যায় না। এবারে ঠিক করেছি শান্তিনিকেতনের কর্ত্তৃপদ থেকে ষোলো আনা ছুটি নেব। যাবার আগে আমার আসনটাকে পরিষ্কার করে দিয়ে যেতে হবে—সেই জন্যে যা হাঙ্গামা।

মৃত্যুর কথাটা মন থেকে কিছুতে যাচ্চেনা। নিজের এই সংসারটা থেকে যা-কিছু বাদ পড়ে সেটা কিনা নিজেরই মৃত্যু। এই আমাদের আপন সংসারের প্রত্যেককে নিয়ে বিশেষ কোন-না-কোনো আকারে আমিই বিস্তৃত হয়ে আছি—কোথাও গভীর কোথাও অগভীর ভাবে। সেই সবটা নিয়েই আমার জীবন। কোনো ভালোবাসার লোক চলে গেলে আমিই সেখানে ফাঁক হয়ে পড়ি—সেই জন্যেই মানুষ এত কষ্ট পায়। আমরা যেখানে ভালোবাসি সেখানে যে আমাদের এত গভীর আনন্দ তার কারণ সেই ভালোবাসায় আমাদের নিবিড় বিস্তার, তাতে আমাদের সত্তার ব্যাপ্তি। তাইত যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, নবা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃপ্রিয়ো ভবতি—আত্মনস্তুকামায় ইত্যাদি। আমি জানি, আমার সত্তা বহুবিস্তৃত, নানাশাখায় নানা

প্রশাখায়। বিশ্বজগতে আমার প্রায় কোনো কিছুতেই ঔদাসীন্য নেই, তার মানে আমি খুব ব্যাপকভাবে বেঁচে আছি। কিন্তু যত ব্যাপ্তি—তত তার আনন্দও যেমন, দুঃখও তেমনি। প্রাণের পরিধি যেখানে প্রসারিত মৃত্যুর বাণ সেখানে নানা জায়গায় এসে বিদ্ধ হবার জায়গা পায়। কিন্তু গভীর ভালোবাসার একটা গুণ এই যে, মৃত্যু ও ক্ষতির ভিতর দিয়ে তার সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয় না। মৃত্যু আমাদের জীবনব্যাপী খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতাকে জোড়া দিয়ে দেখায় ; সন্তোষের একটি পরিপূর্ণ রূপ আজ আমার কাছে প্রকাশিত—তার মধ্যে থেকে যা কিছু তুচ্ছ যা কিছু অসঙ্গত অসম্পূর্ণ তা আপনিই বিলুপ্ত হয়ে যা তার সত্য ও স্থায়ী তাই আমার কাছে সুসম্বদ্ধ হয়ে উঠেছে। যাজ্ঞবল্ক্য বিত্ত সম্বন্ধেও বলেছেন যে, বিত্তের মধ্যে বিত্তশালী নিজেকেই দেখেন বলে বিত্ত তাঁর কাছে প্রিয়। কিন্তু বিত্ত যখন যায় তখন কিছুই বাকি থাকে না—অন্য ভালোবাসার মত বিত্তের ভালোবাসায় অসীমের স্পর্শ নেই। এই জন্যে বিত্তেতেই যাদের জীবন তারাই যথার্থ কৃপণ, তারাই কৃপাপাত্র। জীবনের সত্য সাধনা হচ্চে অমরতার সাধনা অর্থাৎ এমন কিছুতে বাঁচা যা মৃত্যুর অতীত। অনেক সময় প্রিয়জনের মৃত্যুতে যে বৈরাগ্য আনে তার মানে হচ্চে এই যে, তখন আহত প্রাণ এমন কিছুতে বাঁচতে চায় যার ক্ষয় নেই বিলুপ্তি নেই। পিতৃদেবের জীবনীর প্রথম অধ্যায়ে সেই কথাটাই পাই। মৃত্যু যখন জীবনের সামনে আসে তখন এই কথাটাই প্রশ্ন করে, "তুমি অমৃত কী পেয়েছ, আমি যা নিলুম তার ভিতরকার কী বাকি আছে। কিছুই যদি বাকি না থাকে তাহলে সম্পূর্ণ ঠকেচ।" প্রাণকেই চায়, সে কোনোমতেই মৃত্যুর দ্বারা ঠকতে চায় না—যেই ঠিক মত বুঝতে পারে ঠকেচি, অমনি সে ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠে "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।" মানুষ কতবার এই কথা বলে আর কতবার এই কথা ভোলে। ইতি ৭, ডিসেম্বর ১৯২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* পত্রগুলি শ্রীযুক্তা রাণী মহলানবীশকে লিখিত

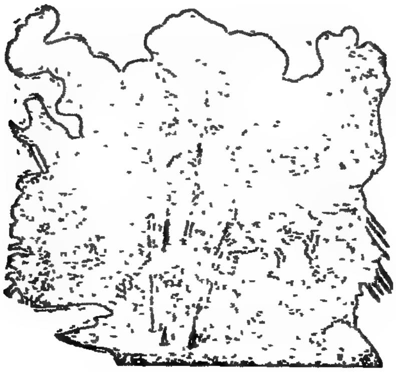

১৪

কলকাতায় এলাম,—ইট-কাঠ-ট্রাম পাথরের কলকাতায়। শিবনারায়ণ দাস লেনের একখানি পুরাতন বাড়ীর দোতালার একটী ঘরে আমার থাকার বন্দোবস্ত হল। দাদা দুচারদিন কলকাতায় আমার সঙ্গে থেকে দেশে ফিরে গেলেন।

কলকাতায় এসে প্রথম সব সময়েই যেন কান্না পেত। সমস্ত কলকাতা সহরটা যেন আমার বুকের উপর চেপে বসেছে; থেকে থেকে যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আস্ত। মাটির সঙ্গে কোথাও এতটুকু যোগ হওয়ার উপায় নেই। একটা পুকুর, এমন কি একটা ডোবা পর্য্যন্ত, কোথাও দেখতে পাই না। দুটো গাছ পালা দেখতে গেলে আমার বাড়ী থেকে ৩।৪ মাইল দূরে যেতে হয়। দুটো ঘাস—মাঠের দুটো সবুজ ঘাস—সেও এখানে অমূল্য সামগ্রী; চোখ চাইলেই দেখা যায় না, খুঁজে বেড়াতে হয়।

প্রথম প্রথম ভাবতাম, এখানে মানুষ বাস করে কি করে। একটা কোলাহল, দিন রাত একটা অবিশ্রান্ত কোলাহলের মধ্য দিয়ে জীবন এখানে চলেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও একটু নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে দাঁড়ায় না। সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেতাম বাড়ীর উঠানে কলের ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্ একটা জল পড়ার শব্দ, হয় চৌবাচ্ছা বোঝাই হচ্ছে, নয় কেউ হাত মুখ ধুচ্ছে: তারপর খালি কোলাহল, খালি কোলাহল, রাস্তায় একটার পর একটা ফেরীওয়ালার চীৎকার—হয় "চানাচুর ঘুগনী দানা," না হয় "বোম্বাই আঁব," না হয় ঐ রকম আর একটা কিছু; থেকে থেকে ট্রামের ঘড ঘড় শব্দ, পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে যেন শরীরের অস্থি মজ্জা প্রাণ গুঁড়িয়ে দিয়ে; খট্ খট্ শব্দ করে বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে ঠিকে গাড়ীগুলো চলেছে, সকাল থেকে সমস্ত দিন সমস্ত রাত, যেন এদের আর শেষ নেই অন্ত নেই।

প্রথম-প্রথম দিন কতক বড়ই খারাপ লেগেছিল। বাড়ীর জন্য প্রায়ই প্রাণটা হুহু করত, সেই মাধবপুর, সেই মা, সেই উঠান, আর সবচেয়ে বড় ক'রে সেই সাবিত্রী। কিন্তু ক্রমে ধীরে ধীরে মন বাসা বাঁধ্‌ল কলকাতার সহরে। বাহিরে শুষ্ক রুক্ষ খোলসের ভিতরে যে প্রচণ্ড প্রাণের লীলা দিনরাত তরঙ্গায়িত হচ্ছে কলকাতায়, তার একটা মাদকতা আছে। কোনও দিক দিয়ে তার সঙ্গে এত-টুকু যোগ হলেই, অফুরন্ত রসের ধারায় প্রাণ ভেসে চলে একটা অনাবিল নেশার তরঙ্গে। যার যাই প্রাণের ধর্ম্ম হোক্ না কেন, সব প্রাণেরই লীলাভূমি কলকাতা সহরে আছে, খুঁজে নিতে পারলেই হয়।

কলকাতায় প্রথম আমার মনকে আকৃষ্ট করেছিল কলকাতার থিয়েটার। মনে আছে মেসের দুইএকটি বন্ধুর সঙ্গে প্রথম যে দিন আমি কলকাতায় থিয়েটার দেখি সে যে কী আনন্দ কী তৃপ্তি পেয়েছিলাম বোঝাতে পারব না। থিয়েটারে যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে জগৎটী আমার চোখে ভেসে উঠেছিল, সে যে কোনও দিন মনুষ্য চক্ষে দেখা যায় এ আমার ধারণাই ছিল না। প্রথম থিয়েটার দেখেছিলাম "আলিবাবা"। দৃশ্যপট উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে মর্জ্জিনার

"ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল" গানখানি, নাচের সঙ্গে আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল। মেসে ফিরে এসে কদিন দিন রাত মর্জ্জিনার কথাই ভাবতাম। তারপর কয়েক দিন বাদে মেসেরই ছেলেদের সঙ্গে আলোচনায় যখন শুনলাম যে মর্জ্জিনার ভূমিকায় যে অভিনয় করেছিল, সে আসলে অত্যন্ত কুৎসিত, কেবল সাজ গোজ রং এবং আলোর মায়ায় তাহাকে অমন রূপসী দেখিয়েছিল, তখন সত্য সত্যই অবাক হয়েছিলাম।

দিন কয়েক, প্রায়ই মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখি এবং মেসের ছেলেদের সঙ্গে থিয়েটারের আলোচনা করি। কে সব চেয়ে ভাল গান গায়, কে সব চেয়ে বড় অভিনেতা—অমুক না অমুক—এই নিয়ে আলোচনা তর্ক মারামারিতে সময় কেটে যায়—বাড়ীর কথা ভেবে মন খারাপ হওয়ার ফুরসুৎই হয় না।

দিন যায়। কলকাতার নেশা ক্রমেই যেন জমে উঠতে লাগল প্রাণে। ক্রমেই বুঝতে লাগলাম, শুধু থিয়েটার নয়, নানান দিকে নানান রকম আনন্দের উৎস আছে, কলকাতা সহরে আনন্দ কুড়িয়ে নিলেই হয়। আর মেসের ছেলেদের সঙ্গে যখন বেশ ভাব জমে গেল তখন দিন রাত্ত যে কোন দিক দিয়ে যেত টেরই পেতাম না। তাস খেলা, গল্প গুজব, তর্কাতর্কি, একসঙ্গে বিকেলে বেড়ান, মাঠে গিয়ে ম্যাচ দেখা, আমাদেরই মেসের কাছাকাছি গিরিশের দোকানে চপ্ কাট্‌লেট খাওয়া, ইত্যাদি নানান রকম ব্যাপারে দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাট্‌ছিল। কলেজে দু-তিন ঘণ্টা গিয়ে লেকচার শুনে আসি, বাকী সমস্তদিনই ফুরসুৎ। পরীক্ষার বৎসর নয়, তাই পড়াশুনার চাপও বিশেষ কিছু ছিল না।

* * * *

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সময় কেটে যেতে লাগ্‌ল। মাঝে দুদিনের কি একটা ছুটীতে বাড়ী গেলাম। সাবিত্রীর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। মণ্টী বোঠান সাবিত্রী মুকুন্দ—এদের কাছে কলকাতার নানান রকম গল্প করেছিলাম, বিশেষ করে কলকাতার থিয়েটারের গল্প; সবাই তারা অবাক হয়ে শুনেছিল। কিন্তু এর বেশী উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেছিল বলে আমার মনে নাই।

কলকাতার কলেজে দিনকয়েক যাতায়াত করতে করতে একটী ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বিশেষ ভাবে জমে উঠ্‌ল। ছেলেটীর নাম 'ললিত'। সে আমাদেরই কলেজে আমাদেরই ক্লাসে পড়ত। থাকৃত ও আমাদেরই মেসের কাছাকাছি—সিমলে ষ্ট্রীটে। আমি ললিতদের বাড়ী প্রায়ই যেতাম এবং ক্রমে ললিতদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল।

ললিতদের বাড়ীতে সব চেয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছিল—ললিতের দিদি সুলোচনা। তাঁর বিয়ে হয়েছিল। এলাহাবাদে ছিল তাঁর শ্বশুর বাড়ী। সেই খানেই তাঁর স্বামী ডাক্তারী করতেন। সেই সময়টা তিনি মাসখানেকের জন্য কলকাতায় বাপের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলেন। স্পষ্ট মনে আছে—যেদিন প্রথম তাঁকে দেখি, সেই দিনই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কলেজের ছুটীর পরে বেলা তিনটা আন্দাজ একদিন আমি ও ললিত ললিতদের বাড়ীতে তার বাইরের পড়বার ঘরে বসে গল্প করছি, এমন সময় হঠাৎ ললিতের দিদি সেই ঘরে ঢুকে, আমাকে সামনে দেখে একটু থম্‌কে চুপ করে দাঁড়ালেন। তারপর ললিতের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "হ্যাঁরে ললিত! এ ছেলেটী কে? তোর বন্ধু বুঝি?"

ললিত বল্‌লে—"হ্যাঁ দিদি! ওর নাম সুশান্ত। আমার সঙ্গে এক ক্লাশেই পড়ে।"

দেখেই আমার বড় ভাল লাগল। বয়স এই ২৫।২৬ হবে। ধবধবে ফর্সা গায়ের বর্ণ। মোটা সোটা গড়নের উপর বেশ লম্বা চেহারা। মুখখানির মধ্যে, বিশেষ করে চোখ দুটীর মধ্যে ছিল একটা অত্যন্ত সরল সহজ মমতা, যার দিকে চোখ তুলে চাইলেন তাকেই যেন আপনার করে নিলেন, সেই চোখ দুটীর মমতাভরা চাহনিতে। পরিধানে ছিল তাঁর একখানি লালফুলের চওড়া পেড়ে ঢাকাই সাড়ী এবং গায়ে ছিল এক গা সোণার গহনা—গায়ের বর্ণের সঙ্গে সত্য সত্যই সুন্দর মানিয়েছিল।

তিনি এসে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে সহজ সুরে ললিতকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, চাইলেন সহজ মধুর দৃষ্টিতে আমার পানে, কোন জড়তা নাই সঙ্কোচ নাই—আমার বিশেষ ভাল লেগেছিল। এবং আমি ললিতের একজন

ঘনিষ্ঠ বন্ধু শুনেই, বিনা দ্বিধায় বসলেন সেই ঘরে আর একখানি চেয়ারে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আমার বাড়ীর খবর।

বললেন, "আচ্ছা! চিরকাল তুমি বাড়ীতে বাপ মায়ের কাছে ছিলে, আর এখন মেসে তোমার একেবারে একলা একলা থাকতে মন কেমন করে না?"

আমি একটু হেসে চুপ করে রইলাম। কি আর বলব।

খানিকটা আবার একথা-ওকথার পর হঠাৎ বললেন, "দেখ সুশান্ত! তুমিও আমাকে দিদি বলে ডেক। কেমন?"

আমি আস্তে বললাম, "আচ্ছা!"

তারপর থেকে যখনই ললিতদের বাড়ী যেতাম সন্ধ্যাটা ললিত ও সুলোচনাদিদির সঙ্গে নানান গল্পে বেশ আনন্দে কাটত।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। প্রায়ই সুলোচনা-দিদির সঙ্গে দেখা হয়। প্রাণ দিয়ে অনুভব করতাম তিনি আমাকে ঠিক ছোট ভাইয়ের মতনই স্নেহ করতেন এবং এত অল্পদিনের আলাপ তবুও আমার যেন মনে হ'ত তিনি আমার নিতান্ত আপনার, যেন ছেলেবেলা থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়।

একদিন সুলোচনাদিদি কথায় কথায় আমাকে বললেন, "সুশান্ত! এইবার ত তোমার বিয়ে হবে না? বড়লোকের ছেলে একটা পাশ দিয়েছ। তোমাদের মধ্যে ত অল্প বয়সেই ছেলেদের বিয়ে হয়?"

বললাম, "কি জানি। বাবার যা মত তাইত হবে।"

বললেন, "কিন্তু একটা যা-তা বিয়ে করে ফেলনা যেন। খুব ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে হলে তবে বিয়ে কোর।"

আমি একটু হাসলাম। কি আর বলব। সুলোচনা-দিদি আবার বললেন, "আর সুন্দরী মেয়ে তোমার জুটবেই বা না কেন?—বড়লোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছ, অমন সুন্দর চেহারা—"

বললাম, "তা দিদি! আপনি দেখে শুনে আমার জন্য মেয়ে পছন্দ করবেন—কেমন?"

সুলোচনা দিদি পরম উৎসাহভরে বললেন, "বেশ ত। সেই কথাই বেশ। তোমার বাবা মা তোমার বিয়ের কথা বললে বলো—সুলোচনা দিদি যাকে পছন্দ করবেন আমি তাকেই বিয়ে করব।"

একটু হেসে বললাম, "আচ্ছা"।

বললেন, "মনে থাকবে ত সুশান্ত? একথা কিন্তু ঠিক রইল, আমাকে না দেখিয়ে বিয়ে করতে পারবে না।—পরমা-সুন্দরী মেয়ে না হলে আমি কিছুতেই তোমাকে বিয়ে করতে দেব না।"

মেসে ফিরে সে দিন রাত্রে সুলোচনা দিদির কথাগুলি বারে বারে মনে পড়তে লাগল। "পরমাসুন্দরী মেয়ে—" সাবিত্রী? সে কি পরমা সুন্দরী? আর একটী মেয়ের কথা মনে হ'ল। সেই বিষয় একটু বলি।

* * * *

ইতিমধ্যে কলকাতা সহরে আর একটা ব্যাপারের সঙ্গে একটু জড়িয়ে পড়ছিলাম। আমাদের মেসের ৩।৪টী ছেলে প্রত্যেক রবিবার বিকেল বেলায় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সেজে গুজে ব্রাহ্ম-সমাজে যেত। ব্রাহ্ম সমাজে আমি কখনও যাইনি এবং আমার কেমন একটা বিশ্বাস ছিল—আমি হিন্দু—ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়া আমার পক্ষে অন্যায়।

কিন্তু একদিন সকাল বেলা সেই তিন চারটি ছেলের সঙ্গে আলোচনায় বুঝতে পারলাম যে তারা ব্রাহ্ম সমাজে যায়, তার সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তারা যায় মেয়েদের গান শুনতে, এবং ভাল ভাল লোকদের বক্তৃতা শুনতে। অনেক হিন্দু সেখানে যায় এবং ব্রাহ্ম সমাজে গেলেই যে হিন্দুর কোনও দোষ হয়—তার কোনও মানে নাই।

শুনে কেমন কৌতূহল হল। ভাবলাম একদিন যাই না—দেখে আসি ব্যাপারটা কি। কিন্তু আমার মেসের ছেলেদের সঙ্গে যেতে আমার কেমন ইচ্ছে হল না। কেন না সেই তিনচারটি ছেলেকে আমার কোনও দিনই ভাল লাগেনি। কেমন যেন অতিরিক্ত ফাজিল।

পরের রবিবার দিন বিকেল বেলা আমি একলাই ব্রাহ্ম সমাজে গেলাম। মেয়েদের গান হ'ল, উপাসনা হ'ল বক্তৃতা হ'ল। মোটের উপর আমার ভালই লাগল। সবই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক।

কিন্তু আমাকে বিশেষ করে আকৃষ্ট করেছিল—এতগুলি মেয়ের একত্র সমাবেশ। এর আগে এতগুলি বাঙালী মেয়েকে এক সঙ্গে এরকম স্বাধীন মুক্তভাবে কখনও দেখিনি, সকলেই কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত, কেমন মধুর তাদের ধরণ ধারণ ভাব ভঙ্গী সকলেই যেন সুন্দরী।

সভা শেষ হলে আমি সমাজের বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে

বোধ হয় মেয়েদের চলে যাওয়া লক্ষ্য করছিলাম। দলে দলে তারা গাড়ী করে করে চলে যাচ্ছে—সকলকেই যেন ভাল লাগছে চোখে। এমন সময় হঠাৎ একটী মেয়ের দিকে চোখ পড়তেই আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

মেয়েটী সুন্দরী। যাকে বলে "পরমা সুন্দরী। আমার মনে হল, এত রূপ এর আগে আমি কখনও দেখিনি। মেয়েটির বয়স হবে পনেরো ষোল বৎসর। একখানি কচিকলাপাতা রংয়ের সিল্কের সাড়ী তার পরিধানে, উজ্জল গৌরবর্ণ রংয়ের সঙ্গে আশ্চর্য্য মানিয়েছিল। কালো চুলে বেণী বাঁধা পিঠের উপর ঝুলছে। মুখখানি যেন বিধাতা নিজের হাতে সুনিপুণ করে গড়ে তুলেছেন—তুলি দিয়ে এঁকেছেন দুটি ভুরু, কালো দুটী আঁখি তারা। লীলায়িত গড়নের ভঙ্গি একহারা। সুগোল বাহু যুগলের মধ্যে লাবণ্যের জোয়ার এসেছে—কানায় কানায় ভরে উঠেছে অপরূপ অঙ্গ শ্রী।

মেয়েটী চলে গেল আমার চোখের সামনে দিয়ে।

তারই বয়সী আর একটী মেয়ে তার পাশে পাশে যাচ্ছিল, তার গায়ে ঈষৎ একটু ধাক্কা দিয়ে কি যেন কি একটা বললে, শুনে, একটা মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখখানা—আমার বুকের মধ্যে তড়িৎ খেলে গেল। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

বাড়ী ফিরে এসে উঠতে বসতে শুতে প্রাণের মধ্যে একটা কাঁটা ফুটতে লাগল—একটা হতাশার বেদনা। ঐ মেয়েটীর সঙ্গে একটুখানির তরে একদিন একটা কথা কইতে পারি, তাহলেই যেন জীবন সার্থক হয়, আর যেন কিছুরই প্রয়োজন নাই। জীবনে সেটুকু পাওয়াও যেন অসম্ভব বোধ হতে লাগল্।

একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিন গেল কিন্তু কৈ সে মেয়েটির স্মৃতি ত এতটুকুও মলিন হলনা প্রাণে। খালি ইচ্ছে করে সেই মেয়েটীর কথা আলোচনা করি—কিন্তু বলিই বা কাকে! ললিতের সঙ্গে আলোচনা করা চলে না—মেয়েটীর কথা বললেই সে হা হা করে হেসে ওঠে, আমার মনের এত বড় কথাকে উপহাস করে উড়িয়ে দেয়—আমলই দেয় না।

পরের রবিবার ঠিক সময় আবার গিয়ে সমাজে হাজির হলাম। খানিকক্ষণ আগে থাকৃতে গিয়েই বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম—মেয়েরা যখন আসবে লক্ষ্য করব। দলে দলে পুরুষরা এল, দলে দলে মেয়েরা এল—কিন্তু কৈ সে মেয়েটীত এল না।

সভা আরম্ভ হল। ঘরের মধ্যে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে চাইছি কিন্তু সে মেয়েটীকে দেখতে পেলাম না। গান হলো, উপাসনা হলো, সভা ভঙ্গ হলো, আবার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। যাওয়ার সময় একটী একটী করে সমস্ত মেয়েকে লক্ষ্য করলাম—সে মেয়েটী—আসেনি।

ধীরে ধীরে মেসের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম—একটা বিষণ্ণ প্রাণ নিয়ে। সে যে কে, কি তার নাম, কোথায় তার বাড়ী, কে তার বাপ, কিছুই জানিনা। এত বড় বিরাট কলকাতা সহরে প্রাণখানা যেন দিশাহারা হয়ে উঠল—আকুল সমুদ্রে যেন আমার তরী ডুবে গিয়েছে কোনও দিকে কোনও কুল কিনারা নাই।

একটা সপ্তাহ আবার কাটল। এর মধ্যে দুবার সুলোচনা দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল তাঁকে সব বলি। কিন্তু বলি বলি করেও বলতে লজ্জা হলো—কিছুই বলিনি।

পরের রবিবার দিন বিকেল বেলা সুলোচনা দিদি ডেকে পাঠালেন। বেলা তিনটে আন্দাজ ললিত এসে আমার মেস থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। সুলোচনা দিদি ছাড়লেন না। সমাজে যাওয়া হলোই না।

তার পরের রবিবার অবশ্য গিয়েছিলাম। কিন্তু সে মেয়েটীকে দেখতে পাইনি।—কিন্তু এবার যেন এর জন্য মন প্রস্তুতই ছিল।

বিশেষ কোনও ব্যথাত বাজেনি প্রাণে। কখন যে মন ইতিমধ্যে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছিল—টের পাইনি।

* * *

যে রবিবার সুলোচনা দিদি ডেকে পাঠালেন, ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়া হল না, সেইদিন তিনি বলেছিলেন, "সুশান্ত! আর ত পাঁচ সাত দিন পরেই আমি চলে যাব। পূজোর ছুটীতে কোথায় যাবে?"

বল্লাম "কেন? বাড়ী।"

দিদি বল্লেন, "বাড়ী ত ফি পূজোয়ই থাক। এবার এসনা এলাহাবাদ—ললিতও যাবে।"

বল্লাম, "তা কি হয়—বাবা মা যেতে দেবেন কেন? বাড়ীতে পূজো হয়।"

দিদি বল্লেন, "পুজোর কটা দিন না হয় বাড়ীতে কাটিয়ে তারপর এস।"

ভাবলাম—এলাহাবাদ, নতুন দেশ, কলকাতা থেকে অনেকদূর। তা পূজোর পরে দিন কতক বেড়াতে গেলে মন্দ হয়না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ

শ্রীমতী ঊষা বিশ্বাস এম্‌-এ, বি-টি

আজকাল অনেকেই অনুভব ক'রছেন ও বলছেন যে আমাদের মেয়েদের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি, অনেক অসম্পূর্ণতা আছে—অদূর ভবিষ্যতে যা দূর করা অত্যন্ত দরকার হ'য়ে পড়েছে। আমাদের সমাজে আজ-কালকার শিক্ষিতা মেয়েদের অতি-আধুনিকতার যে নব কুফল দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে তার জন্যেও আমরা অনেকে আধুনিক শিক্ষাকেই দায়ী ক'রে থাকি। জানি না প্রচলিত শিক্ষাবিধি এজন্যে কতটা দায়ী। কিন্তু অনতিবিলম্বে মেয়েদের শিক্ষার যে আমূল সংস্কার আবশ্যক একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। বাস্তবিকই আমাদের মেয়েদের শিক্ষার আদর্শ যে কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে ভাববার সময় এসেছে। কিন্তু এ জটিল সমস্যার সমাধান আদৌ সহজ ব'লে মনে হ'চ্ছে না। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের মনীষিগণ অনেকেই ভাব্‌ছেন ও শিক্ষার ত্রুটি সংশোধনের জন্যে অনেকে অনেক উপায় নির্দ্দেশ ক'রছেন। আমরা যে এবিষয়ে ভাবতে সুরু ক'রেছি এটাও একটা সুলক্ষণ—আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। আমাদের নির্ব্বাচিত পন্থা হয়ত ঠিক পথ না ও হতে পারে। কিন্তু তবু আশা করা যায় যে, ভুল ক'রতে ক'রতেই একদিন হয়ত আমরা ঠিক পথটি খুঁজে পাব ভ্রান্তির মধ্যে দিয়েই ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে চ'লব। ভুল ক'র্‌বার আশঙ্কাতেই যদি পথ-চলা বন্ধ ক'রে দি তাহ'লে আমরা ত' আর এগুতেই পার্‌ব না। শিশু যখন প্রথম চ'ল্‌তে শেখে তখন ত সে বার বার আছাড় খাবেই। কিন্তু তাই ব'লে যদি সে হাঁটাই ছেড়ে দেয়, তবে ত আর কোনদিনই সে চ'ল্‌তে শিখবে না।

শিক্ষা সংস্কারে প্রবৃত্ত হ'তে হ'লে প্রথমেই আমাদের দেখ্‌তে হবে বর্ত্তমান শিক্ষাবিধিতে প্রকৃত গলদ কোনখানে। সেটা ধরতে না পার্‌লে শিক্ষা সংস্কার সম্ভব হবে না। আজকাল নব্যশিক্ষিতাদের বিরুদ্ধে কতগুলি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। অভিযোগগুলি কতখানি সত্য সে কথা ভালো ক'রে বিচার ক'রে দেখা উচিত। আমরা শুন্‌তে পাই আজকালকার নবালোক প্রাপ্তা উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা নাকি বড় স্বার্থপর, স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, অবিনয়ী, গৃহকর্ম্মে অপটু ও উদাসীন, বিলাসিতা ও আমোদপ্রিয়, ধর্ম্মকর্ম্মে নিষ্ঠাহীন।

প্রথম অভিযোগের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কালধর্ম্মের মাহাত্ম্যেই হ'ক বা যে কারণেই হ'ক আজকাল স্ত্রীপুরুষ সকলেই অল্প-বিস্তর স্বার্থপর হ'য়ে উঠেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা যে ক্রমে ক্রমে উঠে যাচ্ছে তার অন্যতম কারণ বোধহয় আধুনিককালের স্বার্থপরতা। অনেক সময় অল্প শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যেও ঘোরতর নীচতা, স্বার্থপরতা দেখা যায়; আবার অনেক উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তও এসংসারে বিরল নয়। তাছাড়া আজকাল পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাবে আমাদের ব্যক্তিগত পরিবারগত অভাবও বহুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে—আমরা আর আগেকার মত অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট, বেকার সমস্যাও কতকটা বোধহয় এজন্যে দায়ী। কাজেই আমরা পরের জন্যে আর বিশেষ ভাব্‌তে পারি না—সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীতে আবদ্ধ। এই স্বার্থপর ভাবটি যদি আমাদের মেয়েদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে থাকে তবে তার জন্যে আমরা কতটা শিক্ষাকে দায়ী ক'র্‌তে পারি আর কালধর্ম্মকেই বা কতটা দায়ী করতে পারি সেকথাও ভেবে দেখা দরকার। বর্ত্তমান ইংরিজী শিক্ষার ফলে মেয়েরা হয় ত' নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নিজেদের অভাব অনটন

সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হ'য়েছে। কিন্তু কালধর্ম্ম প্রভাবে এ অবস্থাবৈষম্য অবশ্যম্ভাবী ব'লে মনে হয়। আজ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। মেয়েরা আজকাল বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে পরার্থে আপনাদের নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার সুযোগই বা বিশেষ পায় কোথায়?

আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ যে তারা স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। কথাটা হয় ত' খানিকটা সত্য। আজকাল প্রায় বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থাতেই মেয়েদের বিবাহ হয়। এজন্যে বিবাহের পূর্ব্বেই তাদের নিজস্ব মতামত গঠিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়—বিশেষতঃ এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে। তাছাড়া, ইংরিজী শিক্ষার দ্বারা আমাদের কাছে একটি নূতন বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার জলুষ আমাদের চোখকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছে। জগদ্ব্যাপী স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ আমাদের রক্ষণশীল সমাজের উপর দিয়েও ব'য়ে গিয়েছে—আমাদের মেয়েদের বুকেও নব চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছে। যুগধর্ম্মকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না কিংবা কালের গতিকেও আমরা রোধ করতে পারি না। বহির্জগতে আজকাল যা ঘট্‌ছে সে সম্বন্ধে যদি আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা উদাসীন থেকে যাই, তাতে হয় ত' আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শ অক্ষুণ্ণ থেকে যেতে পারে। কিন্তু তাতে কি আমাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হ'বারই বেশী সম্ভাবনা নেই? যা কিছু আমাদের নিজস্ব তাই যে সব ভালো, আর পাশ্চাত্য সব কিছুই যে মন্দ একথা ব'ল্লে কি সত্যের অপলাপ করা হয় না? গতিশীলতাই সুস্থ মনের লক্ষণ। যুগ যুগান্তর ধরে যদি আমরা একই চিরন্তন আদর্শ আঁকড়ে ধরে থাকি তাহলে হয় ত' আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় থাকতে পারে—কিন্তু তাতে আমাদের মনের বদ্ধ জলের মত পঙ্কিলতায় আবিল হ'য়ে উঠবার আশঙ্কা আছে। আমরাও তাহ'লে কালের গতিতে পেছিয়ে পড়ব। তাই আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা হ'চ্ছে কেমন ক'রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে, প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যেতে পারে। বিপ্লবের প্রথম অভিঘাতে যে উদ্দাম চঞ্চলতা, উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচারিতা সময় সময় আমাদের প্রগতিশীলা ভগিনীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তা হয় ত' সাময়িক উপসর্গ মাত্র। স্বাধীনতার প্রথম উচ্ছ্বাসের আবেগ যখন ক্রমে শান্ত, সংযত হ'য়ে আসবে, তারাও তখন আস্তে আস্তে স্বস্থানে ফিরে আসবে, বিচার-বুদ্ধির স্থিরদৃষ্টিতে তারা তখন দেখবে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার শাঁসটাকে বাদ দিয়ে তারা তার বাইরের খোলাটাকেই সত্য ব'লে গ্রহণ করছে—ক্ষীর ছেড়ে নীরকেই নিচ্ছে। তখন তারা বুঝতে পারবে যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে তাদের মুক্তি নেই—নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন না ক'রেও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করা যায়। আমার মনে হয় পাশ্চাত্য শিক্ষার যদি কোনও কুফল হ'য়ে থাকে ত' সেটা পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষ নয়—দোষ আমাদের শেখাবার। আমরা বিদেশী শিক্ষাকে আপন করে, দেশীয় শিক্ষার অঙ্গীভূত ক'রে নিতে পারি নি—জাপান যেমন ক'রে নিয়েছে তাকে। আমরা শিক্ষাকে পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালাই ক'রতে চেয়েছি। তাই বর্ত্তমান শিক্ষার সঙ্গে আমাদের দেশের মনের যোগ স্থাপিত হয় নি—সব কিছুর জন্যে আমরা তাই শিক্ষাকেই দায়ী করি। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে শিক্ষার ফলে চিত্তের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাধীনচিন্তা শক্তিও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শিক্ষিতা মেয়েদের কিছু মানসিক স্বাধীনতা ও নিজত্ব অনিবার্য্য। অজ্ঞা, অনভিজ্ঞা, অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মত হয়ত তারা সব বিষয়ে গতানুগতিকভাবে চিন্তা ক'রতে ও পরাধীনতা স্বীকার ক'রতে সম্মত হবে না। কিন্তু পরিমিত মাত্রায় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা কতদূর দূষণীয় সে কথাও বিবেচ্য। শিক্ষিতা মেয়েদের স্বাধীনতা যখন স্বেচ্ছাচারিতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার রূপ ধারণ করে তখনই তা নিন্দনীয়। সব সময়ই নির্ব্বিচারে পরমতানুবর্ত্তী হ'য়ে না চ'লে সময় সময় যদি তারা ভদ্রভাবে নিজ মত ব্যক্ত করে, তাতে ক্ষতি কি? যদি সংসারে মেয়েরা সর্ব্ব বিষয়ে অন্ধ দাসত্বের বশবর্ত্তী হয়ে পুরুষের অধীনতাই মেনে নেয়, তবে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হবার সুযোগ ত' হবেই না, অধিকন্তু অপর পক্ষে পুরুষের প্রভুত্বপ্রিয়তা বেড়ে চলবে সুতরাং আমাদের শিক্ষিতা মেয়েরা যাতে সব বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করে—শ্রী এবং হ্রী বজায় রেখে চলতে পারে তাই তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শিক্ষিতা মেয়েদের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ যে তারা

অবিনয়ী। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্"—এই নীতির ব্যতিক্রম যদি মেয়েদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে তবে তা' অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মনে হয় যথার্থই যদি তথাকথিত শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে নম্রতা ও শালীনতার অভাব দেখা যায়, তাহলে উপযুক্ত শিক্ষাই বোধ হয় তার একমাত্র প্রতিকার। কারণ প্রকৃত শিক্ষিত যে, সে জানে জ্ঞানসমুদ্র অনন্ত, অপার—আমরা তার তীরে কেবল নুড়ি কুড়াচ্ছি মাত্র। একটা কথা আছে—"বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা।" সমগ্র দেশের লোক-সংখ্যানুপাতে এখনও উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় বললেই হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে তাদের মনে অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষাভিমান জাগা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু আজকাল "এম-এ", "বি-এ" উপাধি ধারিণীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমার বিশ্বাস কিছুদিন পরে আমাদের মেয়েরা আপনিই বুঝতে পারবে যে তাদের অহঙ্কার করবার কিছুই নেই।

নব্য শিক্ষিতাদের বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযোগ যে, তারা গৃহকর্ম্মে অপটু ও অনাসক্ত। জানি না এ অভিযোগ কতখানি সত্য। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যেও অনেক সুগৃহিণী দেখেছি, আবার অল্প শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যেও গৃহকর্ম্মনৈপুণ্যের যথেষ্ট অভাব দেখেছি। ব্যতিক্রম উভয় পক্ষেই থাকা সম্ভব। তবে একথা স্বীকার ক'র্‌তেই হবে যে আজ কাল স্কুল কলেজের মেয়েরা গৃহকর্ম্ম শিখ্‌বার বড় বেশী সুযোগ পায় না। যেটুকু সময় তারা বাড়ীতে থাকে তা' ত ক্লাশের পড়া তৈরী ক'রতে, পরীক্ষার পড়া মুখস্থ ক'র্‌তেই কেটে যায়। আমার মনে হয় বিদ্যালয়ের ঘাড়েই সব দোষ চাপালে চ'ল্‌বে না, গৃহশিক্ষাও কতক পরিমাণে এজন্যে দায়ী। গৃহে মায়ের দৃষ্টান্ত, তাঁর শিক্ষাও মেয়েদের গৃহিণীপনা শিখ্‌বার যথেষ্ট সহায়তা করে। গৃহই নারীর যথার্থ কর্ম্মক্ষেত্র ব'লে গণ্য হয়। কাজেই যা'তে মেয়েদের গৃহিণীজনোচিত গুণগুলি নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত। শিক্ষা মানে শুধু কতকগুলি বই মুখস্থ করা বা কতকগুলি বিশেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া নয়। শিক্ষাকে যদি আমরা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি, তবে মেয়েদের তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মোপযোগী ক'রে গ'ড়ে তোলাই বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এজন্যে গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা থাকা অত্যাবশ্যক। শিক্ষাকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা অত্যন্ত ভুল। আমার মনে হয় আমাদের বালিকা বিদ্যালয়-গুলিতে যদি গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার সমুচিত ব্যবস্থা করা হয় তাহ'লে ছাত্রীদের মনে স্বতঃই গৃহকর্ম্মানুরাগ জন্মাবে। এর ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে যখন তারা গৃহিণী পদে অধিষ্ঠিতা হবে তখন তারা দক্ষতা ও সুশৃঙ্খলার সঙ্গে গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ ক'র্‌তে সক্ষম হবে ব'লে আশা করা যায়।

আজ কালকার শিক্ষিতা মেয়েদের বিরুদ্ধে পঞ্চম অভিযোগ যে তারা বিলাসিতা ও আমোদপ্রিয়। মেয়েদের সৌখীনত্বের অপবাদ বোধ হয় আবহমান কাল থেকেই চ'লে আসছে। সে কালের মেয়েরা হয় ত' গহনা প'রতে ভালোবাসতেন, আজ কালকার মেয়েরা হয় ত' শাড়ী অথবা অন্য সৌখীন জিনিষ ভালোবাসে—পার্থক্য এই যা। কিন্তু অসভ্য সাঁওতালবালাও সরলা পার্ব্বত্য রমণী—যাদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক আজও প্রবেশ করে নি—তাদের মধ্যেও যখন নিজ দেহকে শোভন, সুন্দর সাজে ভূষিত ক'র্‌বার প্রয়াস দেখ্‌তে পাই তখন মনে হয় বিলাসিতা বোধ হয় নারী মাত্রেরই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার বাহ্য প্রকাশ। বিলাসিতা যদি আয়ের অতিরিক্ত হয়, তবেই তা দূষণীয়। আমোদপ্রিয়তাও যে কতদূর নিন্দনীয় সে কথাও বিবেচনা করে দেখা ভালো। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্যে আনন্দের কোন প্রয়োজনই নেই কি? আমাদের জীবন যদি কেবল কঠোর কর্ত্তব্যের সমষ্টি মাত্র হয়, তা'তে যদি আনন্দের লেশ মাত্র স্থান না থাকে, তবে তা' একবারে শুষ্ক, মরুময় হ'য়ে উঠ্‌বে না কি? আর আমরাও তাহ'লে ক্রমে ক্রমে কাজ ক'র্‌বার যন্ত্রবিশেষ হ'য়ে প'ড়্‌ব না? আমার মতে নির্দ্দোষ, সুরুচিসম্মত আমোদ আহ্লাদে কোন ক্ষতি ত' নেই—বরং আমাদের মনের আনন্দ বিধানের জন্যে তারও আবশ্যকতা আছে। কিন্তু আমোদ প্রমোদের জন্যে আমরা যখন নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবহেলা করি, তখনই আমরা অন্যায় করি।

আজকালকার শিক্ষিতা মেয়েদের বিরুদ্ধে আর একটি

অভিযোগও প্রায়ই শোনা যায়। সেটা হ'চ্ছে এই যে তারা নাকি ধর্ম্মকর্ম্মে নিষ্ঠাহীন। অভিযোগটি হয়ত' অংশতঃ সত্য। কিন্তু তবু আমার মনে হয় ধর্ম্মবিশ্বাস শৈথিল্য মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যেই বেশী লক্ষিত হয়। মেয়েরা স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল। মেয়েদের মনে যদি নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রতি সত্যই অনাস্থা জন্মে থাকে, তবে তার জন্যে কতটা বিদ্যালয়ের শিক্ষা দায়ী ও কতটা গৃহশিক্ষা দায়ী সে কথা বলা কঠিন। যদি তাদের মনে ধর্ম্মনিষ্ঠা আবার জাগিয়ে তুল্‌তে হয়, তবে প্রথমেই আমাদের গৃহের আবহাওয়া বদলান দরকার ব'লে মনে হয়। অনেকেই মনে করেন মেয়েদের ধর্ম্মভাব হ্রাসের মুখ্য কারণ বোধ হয় ইংরিজী শিক্ষার প্রভাব। ইংরিজী শিক্ষার ফলে আমাদের কতগুলি প্রাচীন সংস্কারে ও বিশ্বাসে হয় ত' বা আঘাত লাগ্‌তে পারে। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার অভাবও অন্যতম কারণ হ'তে পারে। কিন্তু ধর্ম্মমত বৈষম্যের জন্যে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ কোনও ধর্ম্মবিধি শিক্ষা দেওয়াও সব সময় সম্ভবপর হয় না। তবু সব ধর্ম্মের সার নীতি ও বিশেষ আদর্শগুলি আমাদের মেয়েদের চোখের সাম্‌নে তুলে ধ'র্‌লে বোধহয় তাদের মনে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হ'তে পারে।

আদর্শ ব্যতীত কোন উন্নতিই সম্ভব নয়। তাই বর্ত্তমানে শিক্ষাবিধি সংস্কার কর্‌বার আগেই ঠিক ক'রে নিতে হবে কোন আদর্শে আমরা আমাদের মেয়েদের গ'ড়ে তুল্‌তে চাই। আমাদের মেয়েদের সাম্‌নেও তুলে ধর্‌তে হবে সেই বিরাট ব্যাপক আদর্শকে, যাতে তারা লক্ষ্যভ্রষ্টা হ'য়ে না পড়ে। আমাদের মেয়েদের শিক্ষার আদর্শ যে চিরদিনই এক থাকবে এমন কথা আমি বল্‌ছি না। আজ যা' আদর্শ ব'লে বিবেচিত হ'চ্ছে কাল তা নাও হ'তে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আদর্শের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষার আদর্শও বদ্‌লিয়ে যাওয়া সম্ভব। হয় ত' বা আমাদের আদর্শকে আংশিকভাবেও কার্য্যে পরিণত ক'র্‌তে আমরা সক্ষম হব না। আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ, অর্থবলও অকিঞ্চিৎকর। দেশব্যাপী অশেষ দুঃখ দারিদ্র্য, অন্নাভাব, অস্বাস্থ্য, অকালমৃত্যু, অনৈক্য, অন্তর্দ্বন্দ্ব, রক্ষণশীলতা, সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কারাসক্ততা হয় ত' পদে পদে আমাদের কাজে বাধা দেবে। কিন্তু তবু একটা আদর্শ আমাদের চোখের সাম্‌নে খাড়া রাখ্‌তে হবে—যা'তে আমরা উদ্দেশ্যহারা, লক্ষ্যহীন হ'য়ে না পড়ি। মানুষ চিরদিনই এম্‌নি ক'রে আদর্শের পিছন পিছন ছুটেছে, যদিও আদর্শের নাগাল বোধহয় সে কোনদিনই পায়নি। এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে আমরা যারা আমাদের মেয়েদের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুল্‌বার ভার নিয়েছি কি আদর্শ তাদের সাম্‌নে তুলে ধর্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ব। আমাদের দেশে আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারিণীদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটাও যে একটা সুলক্ষণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আমাদের মনের গতি কোনদিকে। আমাদের দেশের লোকেরা ক্রমশঃই স্ত্রীশিক্ষার মর্য্যাদা ও আবশ্যকতা অনুভব ক'র্‌ছেন। তবু কারও কারও মনে এতে ভীতির সঞ্চারও হ'চ্ছে। ছেলেদের মত আমাদের মেয়েরাও আজকাল অর্থকরী বিদ্যা অর্জ্জন ক'র্‌তে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভই হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের শিক্ষার চরম ও পরম উদ্দেশ্য। তারপর চাক্‌রীর জন্যে ছুটাছুটি। তাদের মধ্যেও ক্রমে প্রতিযোগিতা ও বেকার সমস্যা বেড়ে চলেছে। উচ্চশিক্ষিতা অনেক মেয়েই আজকাল তাদের পাশ্চাত্য ভগিনীদের মত স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন ক'র্‌তে চাচ্ছে—বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হতে, সংসার ধর্ম্ম পালন কর্‌তে অনিচ্ছা প্রকাশ ক'র্‌ছে। অবশ্য অবস্থাভেদে মেয়েদের এক এক সময় স্বাবলম্বী উপার্জ্জনক্ষম হওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আজ এই অর্থসঙ্কটের দিনে মেয়েরা যদি অর্থকরী বিদ্যা শিখে প্রয়োজন হ'লে কঠিন জীবনসংগ্রামে পুরুষের সহযোগিতা ক'র্‌তে পারে তাহ'লে বোধ হয় একটি জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার আংশিক সমাধান হয়।

কিন্তু তবু সাধারণভাবে বিচার ক'র্‌তে গেলে পুরুষ ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একথা সর্ব্ববাদিসম্মত—বিশেষতঃ আমাদের দেশে, যেখানে আবহমান কাল থেকে লোকে বিবাহকে একটি অবশ্যপালনীয় অনুষ্ঠান ব'লে মেনে নিয়েছে। আমাদের দেশে শতকরা নিরানব্বই জন মেয়েই

বিয়ে ক'বে সংসারী হ'য়ে থাকে। সুতরাং আমাদেব দেশে গৃহকেই নাবীর সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্র বলা যেতে পারে। যদি গৃহধর্ম্মই নারীজীবনের চরম উদ্দেশ্য হয় তবে তাকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলাই আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষাব আদর্শ হওয়া উচিত নয় কি? ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে সে সুগৃহিণী হ'তে পারে—সন্তানের আদর্শ জননী, স্বামীর আদর্শ সহধর্ম্মিণী হতে পারে—বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-তালিকায় তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। আমরা সংসারে আমাদের মেয়েদের দেখতে চাই সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপে—সেবায় লক্ষ্মী, গৃহ-লক্ষ্মী, যার কল্যাণহস্তের স্পর্শে গৃহস্থালীর প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজ শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে—পরিবারে সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যার নিয়ত সস্নেহ, সজাগ দৃষ্টি থাকবে—যে সন্তানের ভবিষ্যৎ শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন ক'রবে, যে সকল অবস্থায় স্বামীর উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী হবে।'

আজ এই বিশ্বমানবিকতার যুগে গৃহই আমাদেব মেয়েদের সকল চিন্তা সকল ভাবনা অধিকার ক'রে থাকলে চ'লবে না। পরিবারের বাইরেও তাদের চিত্ত ও কর্ম্মক্ষেত্রকে প্রসারিত ক'রতে হবে—সমাজেব বিবিধ কল্যাণকাজে। তাদের "কর্ম্মজীবনের পরিধি" আজ কেবল গৃহ ও পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না। বিশ্বের দুঃখ ভার মোচনে প্রত্যেক নারীকেই আজ তার সাধ্য ও শক্তি অনুসারে চেষ্টা ক'রতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন—"সাধারণতঃ আমরা যখন খাঁটি বাঙালী মেয়ের আদর্শ খুঁজি তখন গৃহ-কোণচারিণীর 'পরেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে। গৃহ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ যে সঙ্কুচিত জীবন তাহারই সঙ্কীর্ণ আদর্শের বহুবেষ্টনরক্ষিত উৎকর্ষ দুর্লভ পদার্থ নহে। তাহার উপাদান অল্প, তাহার ক্ষেত্র অপ্রশস্ত, তাহার পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত অকঠোর। * * *

* আজ কালকার দিনে যে নারী কেবল একান্তভাবেই গৃহিণী তিনি আমাদের আদর্শ নহেন, ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই যিনি কল্যাণী তিনিই আদর্শ, যাঁহার জীবন কেবলমাত্র চিরাগত প্রাদেশিক প্রথা ও সংস্কারের ছাঁচে ঢালা তিনি আদর্শ নহেন কিন্তু যাঁহার মধ্যে বৃহৎ বিশ্বের জ্ঞান ও ভাবের বিচিত্র ধারা গভীর ও সুন্দর ভাবে সঙ্গতি লাভ করিতে বাধা না পায় তিনিই আদর্শ।" ঘর ও বাইরের মধ্যে কেমন করে এই "সুন্দর সমন্বয়" রক্ষা করা যেতে পাবে আজ:কের দিনে তাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের মেয়েদের জীবনেব এক কঠিন সমস্যা। এই উভয়ের কারও দাবীই আজ তারা উপেক্ষা করতে পারে না।

আমরা যদি মনে কবি আমাদের মেয়েদের এই আদর্শে গ'ড়ে তুলতে হ'লে বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন নেই, তাহলে আমরা অত্যন্ত ভুল কবুব। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে আমাদের মেয়েদের ও ছেলেদের শিক্ষাপদ্ধতিতে পার্থক্য অতি সামান্যই। আমার মনে হয় প্রচলিত শিক্ষা-বিধির এটাই একটা মস্তো বড় অসম্পূর্ণতা। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই ব'লছি, আমাদের দেশে এখনও এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা মেয়েদের স্বতন্ত্র শিক্ষাপদ্ধতির পক্ষপাতী নন্। তাঁদেব মতে বিদ্যালয়েব সাহায্য ব্যতীতও মেয়েরা গৃহে জননী কিংবা অন্য আত্মীয়ার নিকট এই প্রকার শিক্ষালাভ ক'রতে পারে। কিন্তু তাঁদেব কথার উত্তবে বলা যেতে পারে যে আমাদের মেয়েদের যদি বিদ্যালয়ে গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্য অর্জ্জন ক'রবার যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা না দেওয়া হয়—যদি তাদের ভবিষ্যৎ মাতৃত্বেব দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান কোন শিক্ষাই দেওয়া না হয়—তবে তারা ভবিষ্যৎ জীবনের গুরুদায়িত্ব বহনোপযোগী হয়ে গড়ে উঠ্‌বে কি করে? আমাদের দেশের ভাবী জননীগণ—শিশুদের কুসুমকোরকতুল্য নবীন সুকুমার জীবনগুলি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলবার ভার যাঁদেব হাতে—তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের সেই কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের জন্যে প্রস্তুত ক'রতে হলে কোন শিক্ষারই প্রয়োজন নেই কি? আর প্রথম জীবনের অনভ্যাস ও অশিক্ষাবশতঃ গৃহস্থালীর কাজেও তাদের কিছু অপটুত্ব অবশ্যম্ভাবী নয় কি? আমার বক্তব্য এ নয় যে নারী মাত্রকেই সকল প্রকার উচ্চাঙ্গ শিক্ষালাভে বঞ্চিত করতে হবে। কিন্তু কোনও বিশেষ শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তন ক'রবার সময় আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে অধিকাংশ শিক্ষার্থিনীর প্রয়োজন কি।

আমার মতে আমাদের উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়-গুলিতে মাট্রিকুলেশান্ পর্য্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা থাকলেও মেয়েদের পাঠ্যতালিকার অনেকাংশে পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

রোগী পরিচর্য্যা ও প্রাথমিক সাহায্য (First aid) শিশু মঙ্গল, মাতৃত্ব সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান (Mothercraft) সঙ্গীত সূচীকর্ম্ম ও রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম মেয়েদের অবশ্য শিক্ষণীয় হওয়া উচিত। আমাদের দেশের সব মেয়েরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভের সুযোগ পাবে না অথবা তাদের সকলেরই সে যোগ্যতা নাও থাকতে পারে। তাদের মধ্যে অনেককেই হয়ত কিছুদূর প'ড়েই পড়া ছেড়ে দিয়ে সংসারে প্রবেশ ক'রতে হবে। তাদের জন্যেই বিশেষ ক'রে ম্যাট্রিকুলেশানের পরিবর্ত্তে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষার (Domestic Science Course এর) ব্যবস্থা থাকা দরকার। আজকাল অনেকেই মেয়েদের জন্যে এই প্রকার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রছেন। দিল্লীর Lady Irwin Girls Collegeএ মেয়েদের এই রকম উচ্চাঙ্গের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। আমাদের দেশেও কোন কোন বালিকা বিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা হ'য়েছে। বাঙ্‌লা দেশে আরও অধিক সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়ে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে। এইজন্যে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরও খুব দরকার এবং তাঁদের উপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়ারও সুবন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

আমার মতে এই গার্হস্থ্যবিজ্ঞান পদ্ধতিটি মেয়েদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হবে ও এতে বিশেষ ক'রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি যথাসম্ভব ব্যবহারিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হবে :—

(১) খাদ্যতত্ত্ব (Dietetics and dietary)
(২) শরীরতত্ত্ব (Physiology)
(৩) শিশুপালন (Child care)
(৪) শিশুমনস্তত্ত্ব (Child study)
(৫) স্বাস্থ্য (Health and Sanitation)
(৬) রোগী পরিচর্য্যা (Home nursing)
(৭) রন্ধন (Practical Cookery)
(৮) গৃহসজ্জা (Home decoration) এর মধ্যে আলপনা, ঘর সাজান ইত্যাদি থাকবে।
(৯) কাপড় ধোওয়া ও ইস্ত্রী করা (Laundry work)
(১০) সূচীকর্ম্ম ও অন্যান্য হস্তশিল্প।
(১১) সংসার পরিচালনা (Household management) এর মধ্যে হিসাব, আয়ানুসারে ব্যয়নির্দ্ধারণ ইত্যাদিও থাকবে।

আমার মনে হয় মেয়েদের জন্য দুইরকম শিক্ষা পদ্ধতিরই ব্যবস্থা থাকা দরকার—যার ইচ্ছা সে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হবে, যার ইচ্ছা সে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান প'ড়বে। কারণ মেয়েদের জন্যে স্বতন্ত্র শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তিত হ'লেও এমন কতগুলি মেয়ে থাকবেই যাদের জ্ঞানলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল। আমার মতে তাদের পুরুষদের মতই জ্ঞানার্জ্জনের সুযোগ দেওয়া উচিত। আজ এই সাম্যের যুগে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগে নারীকে তার এই ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ন্যায়-সঙ্গত হবে ব'লে মনে হয় না। আমি আগেই ব'লেছি ম্যাট্রিকুলেশান পর্য্যন্ত কতগুলি বিষয় মেয়েদের অবশ্য শিক্ষণীয় হওয়া দরকার। পরে তারা কলেজে গিয়ে নিজ নিজ রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী ইচ্ছামত বিষয় নির্ব্বাচন ক'রে নিতে পারে। এতে আমাদের প্রাচীন আদর্শ থেকেও বিচ্যুতি ঘট্‌বার সম্ভাবনা নেই। পুরাকালে খনা, লীলাবতী, মৈত্রী, গার্গী প্রভৃতি আমাদের দেশের বিদুষী মহিলারা বিদ্যাবত্তায় পুরুষের সমকক্ষ হ'তে পেরেছিলেন ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পুরুষের সঙ্গে প্রকাশ্যে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েও জয়ী হয়েছিলেন। আজকের দিনে যদি আমাদের দেশে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত কোনও বিরাট ব্যবধান থাকে, তাহলে নারী আজ কি ক'রে অর্জ্জুন-পত্নী চিত্রাঙ্গদার মত পুরুষের সমকক্ষতা ও সাহচর্য্য দাবী করে ব'লবে ?—

"দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায় সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহচিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে

যদি তাদের দৈহিক শক্তির সম্যক পরিচালনা করবার সুযোগ দেওয়া না হয়। মেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের মানসিক উন্নতির যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি তাদের দৈহিক স্বাস্থ্যেরও প্রয়োজন আছে। অবরোধ প্রথা, বাল্য বিবাহ ও অপরিণত বয়সে মাতৃত্ব, উপযুক্ত ব্যায়ামের ও মুক্ত বায়ুর অভাব প্রভৃতি আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্যহানির কয়েকটি বিশেষ কারণ ব'লে বিবেচিত হয়। এই কারণগুলি দূর করতে না পারলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সন্তানদের স্বাস্থ্যোন্নতির আশা অতি অল্পই। স্বাস্থ্য সম্পদহীনা দুর্ব্বলা জননীর সন্তান কখনও সুস্থ, সবল হতে পারে না। তাই আমাদের দেশের ভাবী জননীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। সবলা স্বাস্থ্য শ্রীমণ্ডিতা নারীই আজ আমাদের আদর্শ—স্বাস্থ্যলাবণ্য-বিহীনা অবলা মেয়ে নয়। আমাদের মেয়েদের মধ্যে আজকাল দেহ-চর্চ্চার যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে এটা অতিশয় আনন্দের বিষয়। আমাদের দেশের মেয়েরাও আজ সন্তরণ প্রতি-যোগিতা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা প্রভৃতিতে যোগ দিচ্ছে—নৃত্যাদি ব্যায়ামানুশীলনও ক'রছে।

আমাদের মেয়েদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়াও অতি আবশ্যক। শিক্ষা দ্বারা শুধু যে তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে, ধীশক্তির উৎকর্ষ সাধিত হবে তা নয়। শিক্ষার দ্বারা তাদের বিবেকবুদ্ধি মার্জ্জিত হবে—তারা নীতির মানদণ্ডে ভালো মন্দ, হিতাহিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করতে সক্ষম হবে—তাদের মানসিক উদারতা, মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পাবে—তারা অন্ধ সংস্কার ও যাবতীয় কু-অভ্যাস পরিহার করতে শিখ্‌বে—এই আমরা চাই। আমরা চাই তাদের নারীসুলভ চিত্তবৃত্তিগুলি—নিষ্ঠা, সংযম, দয়া দাক্ষিণ্য, স্নেহ করুণা, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি অক্ষুন্ন থাকবে। তারা কোন অবস্থায়, কোন সংসর্গে পড়েই নারীধর্ম্মের অমর্য্যাদা ক'রবে না—হৃদয়ের কোমল বৃত্তি-গুলি নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে না। এইজন্যে তাদের চোখের সামনে তুলে ধ'র্‌তে হবে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের কতগুলি নৈতিক আদর্শ।

বাঙালী মেয়ের বুক ফাটলেও মুখ ফাটবে না আজ আর সেদিন নেই। আমরাও আজ জগতের কাছে নিজেদের অভাব অভিযোগ, নিজেদের দাবী জানাতে শিখেছি। জগতের অন্যান্য নারীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও কেউ কেউ আজ পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার দাবী ক'রছি। আজ আর আমাদের পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে ব'সে থাকলে চলবে না। আমরা নিজের ভাগ্য নিজে জয় করব এই হবে আমাদের পণ। শিক্ষার আলোক শুধু আমাদের পথ দেখিয়ে দিতে পারে মাত্র। কিন্তু নিজেদের জীবন সার্থক, সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলার ভার সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের হাতে। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়ে।

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা?
পথপ্রান্তে কেন রবো জাগি'
ক্লান্ত ধৈর্য্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি,
দৈবাগত দিনে?
শুধু শূন্যে চেয়ে রবো? কেন নিজে নাহি লব চিনে?
সার্থকের পথ?"

আজ আমরা দেখ্‌তে চাই নারীর ক্ষেমসুন্দর কল্যাণী-মূর্ত্তি—স্বাস্থ্যশ্রীসম্পন্না, বুদ্ধিদীপ্তা, আত্মশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিতা, নৈতিকবলদৃপ্তা, জ্ঞানগরিমায় মহিয়সী, স্নেহ মমতা সেবায় দেবীপ্রতিমা। আমাদের মেয়েদের চোখের সম্‌নে থাক্‌বে এই সুমহান আদর্শ—তাতেই অনুপ্রাণিত হ'য়ে তারা অগ্রসর হ'য়ে চ'ল্‌বে শক্তির পথে, কল্যাণের পথে, মনুষ্যত্বের পথে, সার্থকতার পথে। *

শ্রীঊষা বিশ্বাস

---

* ২৩শে মে, ১৯৩৬, তারিখে প্রদত্ত বেতার বক্তৃতা।

কবি আমি নই

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

তোমার দু হাতে ধরি—ভুলো মোরে. করো মোরে ক্ষমা,
ভুলো আমি কবি,
বিস্মৃতির শূন্যগর্ভে হোক লুপ্ত স্মৃতি নিরুপমা,
মুছে যাক সবি ;
বর্ষার পূর্ণিমারাতে জেনো আমি কবি নই শুধু,
তোমার হৃদয় পাত্রে আসি নাই ঢেলে দিতে মধু,
নাহি সাধ পুষ্পমাল্যে, এতদিন সঞ্চিত অমিয়ে
ছন্দোময় হিয়ে।

ভুলো—যদি কোন দিন আনন্দের সুধাপ্রস্রবণে
ঢালিয়া হৃদয়ে
করে থাকি চিত্তজয়, চুপি চুপি তোমার শ্রবণে
উৎকণ্ঠিত হয়ে
কয়ে থাকি কোন কথা যদি কভু বিবশ অধীরে
তোমারে জাগায়ে থাকি কল্লোলিত বেদনার তীরে,
উন্মোচি' হৃদয় তব কুণ্ঠামৌন লাজত্রস্ত ক্ষণে
কবির লিখনে।

জীবনের কোন দিন অনন্তের ক্ষণেক আভাস
পারিবেনা কবি
আঁকিয়া দেখাতে তোমা' বৃথা খুলি বাহিরের বাস—
অসম্পূর্ণ ছবি।
যে কথা ব্যথায় ভরি' কহিয়াছি—অলস সঞ্চয়,
আনন্দ যা' সে ত শুধু কল্পনার দীন পরিচয়,
একান্ত যা আপনার রহিল তা' গভীর গোপনে
নিশান্ত স্বপনে।

তাই আমি কিছু নহি, নহি স্রষ্টা, প্রকাশের দূত,
কবি আমি নই ;
কত চেষ্টা করিলাম রচিতে যা সুন্দর অদ্ভুত,
কোথা ছন্দোময়ি।
ভুলে যাও কেবা কবি, কে সাজায় অপরূপ ডালা,
মুগ্ধ মনে বসিল কে পূজাপীঠে, মন্দারের মালা
ধন্য হল কার গলে ; খুঁজিও না তোমার কবিরে
বহুজন ভীড়ে।

হেথা ক্ষুদ্র গৃহকোণে নাই সভা, নাই কোলাহল,
উৎসুক নয়ন
বাহিরে ঘুরিয়া ফিরে ; অশ্রু চিন্তা বিয়োগ বিফল ;
কুসুম চয়ন
করিতে হবে না হেথা প্রয়োজনে আদেশে মাগিয়া,
তোমার রজনীগন্ধা বিকশিবে আমারি লাগিয়া,—
বিলায়ি' লোচন মন নেহারিবে প্রেমমুগ্ধ ছবি ;
নহি আমি কবি।

অনন্যপূর্ব কবিতার অসমাপ্ত ভূষণ-শিঞ্জনে
ডুবায় কথারে ;
প্রাণ যাহা দিতে চায় বারে বারে হৃদয়রঞ্জনে
এ নীরবতারে
নাই বা ভাঙিনু ভুলে ভাষা দিয়ে ; যাক্ যাক্ দূরে ;
পারি না যে সাধ তোর মিটাইতে কবিতা মধুরে ;
তুমি শুধু তৃপ্ত রও ফুটাইয়া প্রেম পদ্মরাগ—
সেই সত্য থাক্।

শিল্পী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ রায় চৌধুরীর একখানি ছবি

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

রাতের অন্ধকার ফিকে হ'য়ে এসেছে, সূর্য্যের আলোও ভাল ক'রে ফোটেনি, নীল সমুদ্র কালো ব'লেই মনে হচ্ছে তখনও,—সমুদ্রের তীর, বালুর চরের রঙ খয়েরি। জল, জমি, আকাশ সবই যেন প্রকৃতির খুব পাতলা একখানি কালো ওড়নায় ঢাকা।—পট খুললেই প্রথমে নজরে পড়বে এমনিতর একখানি মনোমুগ্ধকর, স্নিগ্ধ ও আবছা আবহাওয়া।

আড়ে প্রস্থে এক বিঘৎ কাগজের উপর বিশ্বব্যাপী বিরাট প্রকৃতির খানিকটা টুকরো যেন জীবন্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছে। সমুদ্রের ধার, নদীর মোহানা থেকে ছবির সুরু। জলই জীবন, জলের ওপরই জমি ভাসছে, জলের ওপরই ভগবান অনন্তশয্যায় শায়িত, তাই ছবি এঁকে জীবনের বন্দনা, জগন্নাথের উপাসনা কর'তে হ'লে প্রথমেই করতে হবে জল থেকে সুরু।

ধুলট উৎসব

শিল্পী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ রায় চৌধুরীর একখানি ছবি

বন-ভোজন

তার পরই দেখা যাচ্ছে এক, দুই, তিন খণ্ডে বিভক্ত হ'য়ে সাক্ষাৎ প্রকৃতিই যেন তিনটী নারীর রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছেন—দুজনের কাঁখে পূর্ণকলস আর একজন হাতে প্রদীপ নিয়ে আগে চ'লেছেন। প্রদীপের আলো ফেলছে কালো ছায়া—আলোয় কালোয় ফুটে উঠছে জীবনের রূপ—সুখ, দুঃখ, হাসি কান্না, জীবন মৃত্যুর ভরা কলস কাঁখে নিয়ে উঁচু বালির চর ভেঙ্গে পৃথিবীতে ঘর বাঁধতে আসছেন প্রকৃতি। এই ভাবে ৫৭ ফুট লম্বা একটী কাগজের বাণ্ডিল—

রথযাত্রা

গঙ্গা পূজা

যতই খোলা যাবে দেখা যাবে খালি ছবি—জীবনের সব কিছুর ছবি। আকাশ, বাতাস, জল, জমি, ফল, ফুল, পোকা, মাকড়, পশু, পাখী, নদী, পাহাড়, তাদের স্বভাবের—চরিত্রের সমস্ত ভাব ভঙ্গী ও খুটীনাটী নিয়ে ছবিতে ফুটে উঠেছে।

চিরকালের জীবন-প্রবাহ যেন শিল্পীর রেখার ইন্দ্রজালে বাঁধা পড়েছে—অসীম বাঁধা প'ড়েছে রূপ-রসের সীমা-রেখায়। তারপরই গ্রামের ছবি। বাংলা দেশের খড়ের চালা আর ধানের মরাই এ ভরা নদীর তীরের মাঠের ধারের গ্রাম। যারা

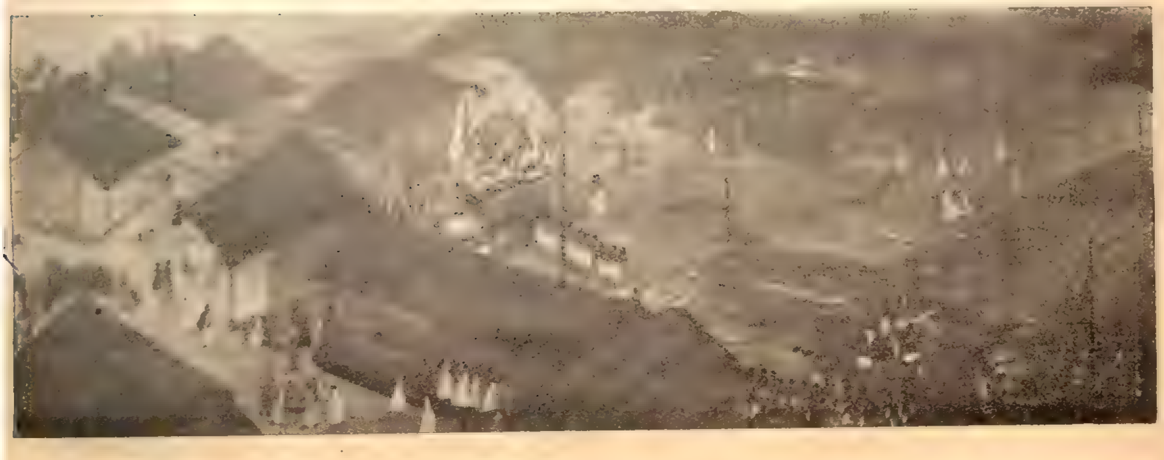

দুর্গা পূজা

কালী পূজা

ছবি দেখতে অভ্যস্ত তাদের এই অংশে চোখ পড়লেই মনে হবে রোদের তাপে মাটী গরম হ'য়ে উঠেছে, আগুনের হলকা ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়, আর সেই তপ্ত বসুন্ধরার বুকের ওপর সমস্ত গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই খোল

করতাল শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে ধুলট উৎসবে মেতে উঠেছে। উৎসব-মত্ত জনস্রোতের গতি নদীর দিকে। নদীর ওপারে আবছা চক্রবালরেখা আর তার ওপরেই চৈত্রের রুক্ষ ধূসর আকাশের কোণে কালো রঙের এক ঝলক পেঁজা তুলোর মত

কার্ত্তিক পূজা

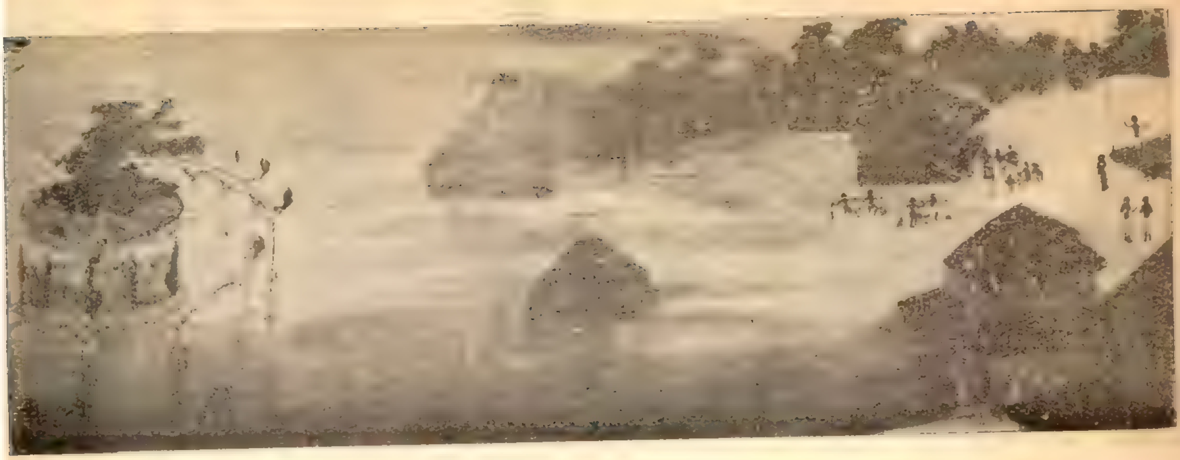

রাস উৎসব

কাল বোশেখির ঝড়ো মেঘ মানুষের এই ধূলট উৎসবে যোগ দেবার সংকল্প করছে।

এমনি ক'রে ছবির পাক যতই খুলবে ততই নজরে পড়বে প্রকৃতির ষড় ঋতুর উৎসবময়ী রূপমাধুরী। তারপর গ্রাম্য

সমাজ তাদের ভয় ভাবনা আশা ভরসার কথা শুনিয়ে ছবি দেখিয়ে সেই গ্রামের নদীতীর ধরে ধরেই কেমন ক'রে গভীর বনের মাঝে গিয়ে মনের মধুময় ছবি দেখতে পেলে—নদীর উৎসে নিজেকে উৎসর্গ করে মুক্ত হ'ল—তারই ছবি।

পৌষ পার্ব্বণ

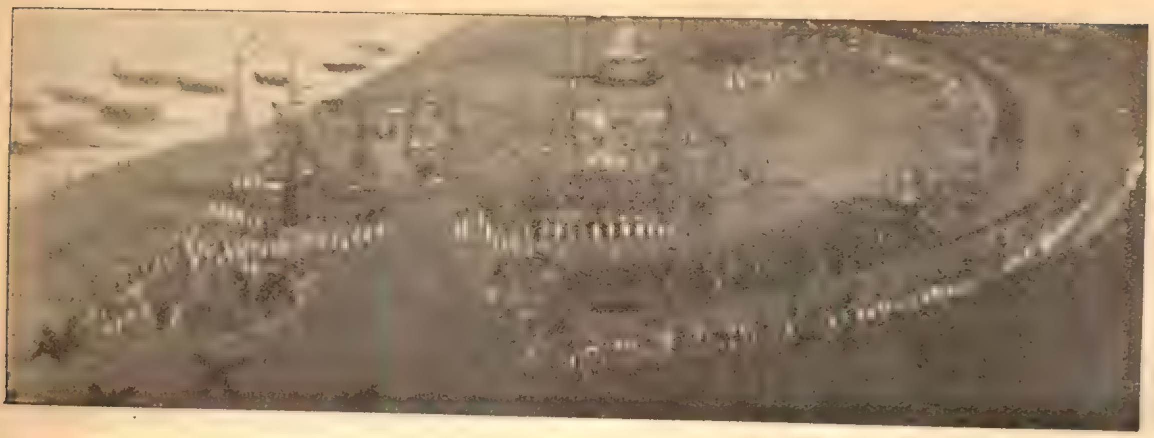

শিবের গাজন

প্রকাশ যখন সার্থক, তখন প্রকরণের কথাই ওঠে না। তবে এক কথায় বলা যেতে পারে যে,—ছবিখানিতে রেখা ও রঙ সন্নিবেশ অপূর্ব্ব—বাংলা সংস্কৃতির একটী অপূর্ব্ব রূপভাষ্য শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ রায় চৌধুরীর এই চিত্রখানি। ভবিষ্যতে কোনও কালে বাংলা দেশে জাতীয় চিত্রশালা গ'ড়ে উঠলে বিষ্ণুচরণের এই চিত্রখানি সেখানে একখানি শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গণ্য হবে সন্দেহ নাই। তাই একজন অব্যবসায়ী শিল্পরসিক অর্থাৎ যাঁরা যশ বা অর্থের জন্য নয় কেবল শিল্পের জন্যই শিল্প সাধনা করেন, তাঁদের মধ্যে একজন, এই শিল্পীর কাজের দিকে তাঁদের সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

দ্বৈতী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তোমার ঘরে কি সন্ধ্যা জলেনি ? দুয়ারে পড়েনি জল
আজি নাই কেন ধূপের গন্ধ, মোছনিক গৃহতল
সূর্য্য কখন অস্ত গিয়েছে,—বন্ধ জানালা খোলো
দিনের আলস এখনো ঘোচেনি ?—দেখি মুখখানি তোলো !

এলোচুলে শুয়ে কাটাইলে দিন,—এলোমেলো বিছানায়
আলু থালু বেশ দেখিলে তোমার, আমার লজ্জা পায় !
না না না লজ্জা এরে বলে নাক'—এ বোধ হয় অভিমান
মনে হয় বুঝি আর কারো তরে কাঁদিছে তোমার প্রাণ ;

প্রাণ ত তোমার কেঁদেছে সত্য, দাগ পড়িয়াছে চোখে
কেন আসিলাম এখানে এমন মিথ্যা নেশার ঝোঁকে।
অমন করিয়া চেয়ে আছ কেন ? কিছু বলিবার আছে ?
আমি জানি এলে আর এক জন হৃদয় তোমার নাচে ;
বিউনি বাঁধার ধুম তারি তরে ; এলো খোঁপা আমি এলে
জর্জ্জেট শাড়ী পরো তাড়াতাড়ি আমি ফিরে চলে গেলে।
'নেকলেস' খুলে গলায় দুলিও তখন ফুলের মালা
খোঁপায় গুঁজিও রজনীগন্ধা প্রেমের গন্ধঢালা।

বিধি দিয়েছেন সুন্দর আঁখি কাজল পরিও তায়,
কৃষ্ণ পাথায় টানা ভুরু-জোড়া, ভুল যদি হয়ে যায়
মিনতি করিয়া তাই বলে রাখি, 'টিপ' পরো সযতনে
তাম্বুল রাগে রাঙিও অধর, যদি ধরে তার মনে।
ঝুমকো দুলিও দু'কানে তোমার, 'ফ্যাসান' সে আধুনিক
করতলে মাথা রাখিয়া বসিও চাহিয়া পথের দিক।
মাঝে মাঝে উঠে অলিন্দ হ'তে চেয়ে দেখো আঙিনায়
তোমার বঁধুয়া এপথ ভুলিয়া যদি আনবাড়ী যায়,
তর্জ্জনী তুলি ডাকিও তাহারে করো মৃদু ভর্ৎসনা,
কলহান্তরে চুম্বন দিয়ে করো তারে মার্জ্জনা।
আনমনা হলে সঙ্গ করো না, তোমাগত প্রাণ তার
ত্রুটি যেন কভু করো না তাহার আরতি অর্চ্চনার।
তব নদীকূলে আমি লাগিয়াছি,—স্রোতে ভেসে আসা ফুল
মোরে ভালবেসে কেন মিছে তুমি করিবে এমন ভুল ;
জোয়ারের জলে কবে ভেসে যাব, ঠিকানা নাহিক তার
তারে কেন তুমি যতন করিয়া বহিবে বুকের ভার ?

আমি ভালবাসি সেই ভাল, তুমি মোরে ভালবেস না'ক
যারে ভালবাস তারে নিয়ে তুমি সুখে আনন্দে থাক!
তবু অবসরে চাহিও তোমার চিত্তের বিনোদন
মিঠে কথা কয়ে ভুলিয়ে ভুলিয়ে কাটাও বিরহ-ক্ষণ।
যেমন করিয়া উন্মুখ হবে প্রিয়ের সন্নিধানে
বসিয়া থাকিবে অথবা বিমুখ হতে চাও অভিমানে,
প্রাণ থেকে প্রেম ফুটায়ে তুলিবে যত আদরের কথা,
সোহাগে কেমনে গলিয়া পড়িবে, কেমনে জানাবে ব্যথা,
দুটি বাহু দিয়ে কণ্ঠ জড়ায়ে প্রেমের আলিঙ্গনে
বঁধুরে কেমনে ভুলায়ে রাখিবে আশ্লেষ-চুম্বনে,
গভীর নিশীথে নীরব ধরার নিবিড় সুযোগ লভি,
কেমনে নিজেরে দিবে বিলাইয়া—সবই জানে মূঢ় কবি।
জেনে শুনে তবু পাগল হয়েছে, তাই ফিরে ফিরে আসি,
তোমার বুকের শীতল পরশ,—তবু তাই ভালবাসি।

হেসে বল মোরে ভালবাস তুমি, জানি সে মিথ্যা কথা
মিনতি করিয়া বল—"ফের এস"—তাতে পাই আরো ব্যথা;
অবনত আঁখি তুলিয়া তাকাও,—মনে লাগে বিস্ময়,
ওরে মায়াবিনী, তোরই কাছে মোর বারবার পরাজয়।

তুমি কি জানিবে কি বেদনা মোর কাঁদিছে বক্ষতলে,
সুখ-স্বপনের ছায়া ভেসে যায় কেন এ অশ্রুজলে,
তুমি কি বুঝিবে প্রাণের গভীরে জ্বলে যে বিষের জ্বালা
সারা দেহে মোর নিশিদিনমান তারই যন্ত্রণা ঢালা।
যন্ত্রণা পাই, তবু ভুলি নাই—আমি কারে ভালবাসি,
আমারে ভুলায় মোহিনী মায়ায় কোন সে সর্ব্বনাশী
অভিশাপ নিয়ে জানি কারে আমি করেছি আশীর্ব্বাদ
অমৃত পাত্র কাহার হেলায় হইয়াছে বিস্বাদ,
জ্যোৎস্না-মদির মধুযামিনীর কোন্ সে বীণার তার
জানি ছলনায় আবেশে ডুবায় তুলি' মধু ঝঙ্কার;
যন্ত্রণা সনে ওঠে মূর্চ্ছনা নয়ন মুদিয়া আসে
শুধু মনে হয় যদি সে কখনও আমারেই ভালবাসে;
যদি কোনও দিন ভুল ভাঙ্গে তার একেলা আমারে চায়
দেখিব সে পথে একা বসে আমি তাহারি প্রতীক্ষায়।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ইয়োরোপা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস
আলোকচিত্রশিল্পী লেখক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সভ্যতার মধ্যে ফিরে এলাম। কিন্তু এ কোন্ লণ্ডন ? যাকে রেখে গিয়েছিলাম সেই পত্রপুষ্পভূষিতা উৎসবময়ী নগরীকে দেখতে পাচ্ছি না। বহুদিনের প্রোষিতভর্ত্তৃকার মত তার রূপ ; তাকে আজ চিনে নিতে মনের মধ্যে একটা ব্যথা লাগে। যে পরিপূর্ণ যৌবনে তাকে দেখে গিয়েছিলাম সে পরিণত শোভা আর নেই ; বসন্ত সজ্জা তার একে একে খসে যাচ্ছে উৎসবের নিশান্তে দীপমালার মত। স্বল্পস্থায়ী হতে থাকে। তবু এ হেমন্ত কালও কম প্রাণময় নয়। নাই বা থাকুক তার প্রথম বসন্তের মাধুর্য্য, পরিণত গ্রীষ্মের ঔজ্জ্বল্য। কখনো বৃষ্টি, কখনো মেঘ, কখনো কুয়াসা আসে, তবু বাতাসে একটা মৃদুভাব পাই। সূর্য্য এখনো চোখ জুড়ানো আলো দেয়, হরিদ্রাভ পাতাগুলিকে কোমলভাবে স্পর্শ করে পাছে রূঢ় স্পর্শে তা একদিন আগেই বা খসে যায়। অভিশপ্তা পাষাণীভূতা অহল্যার স্বপ্ন দেখবার সময় এখনো

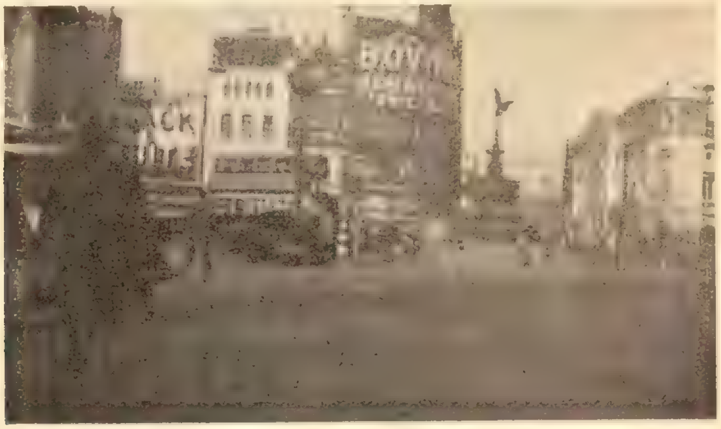

পিকাডিলি

আমাদের শরৎ আর ইউরোপের 'অটাম' ঠিক একরকম নয়, যেমন ভারতবর্ষের ও ইউরোপের ঋতুবিভাগ এক রকম নয়। বরং অটামে হেমন্ত কালের আভাস পাই। আমাদের শরতে মেঘের খেলা যা কিছু আকাশে থাকে তার প্রকাশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে, আর লঘু শাদার ভিতর থেকে অম্লান মোহন নীলিমা ফুটে উঠে। এদের শরতে আকাশটুকু ছোট হয়ে দেখা দেয়, দিনের আলো ক্ষীণ ও প্রকৃতির আসে নি। এখনো যে

"হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার।"

কিন্তু এ কোন্ আমিই বা লণ্ডনে ফিরে এলাম ? সমস্ত মন নিজের অজ্ঞাতসারে বদলাতে বদলাতে যে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তার হিসাব দিতে পারিনা। প্রসন্ন আকাশের উদার নির্নিমেষ দৃষ্টি দিয়ে সব নিরীক্ষণ করতে চাই ; সবকটী ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ইউরোপকে পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতে

চাচ্ছে ; পুরাতনকে পিছনে বিস্মরণের মধ্যে রেখে আসতে চায় পাছে পুরাতনের মায়ায় নূতনের ছায়াটুকুও বাদ দিয়ে যাই। আমার মন যেন ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধানে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় এত দূর দেশান্তরে চলে এসেছে যে আর পিছনে তাকিয়ে কিছুই দৃষ্টিগোচর হওয়া সহজ নয়।

এখনো আমার ছুটী ফুরিয়ে যায়নি ; কিন্তু সংবৎসরে যারা পনের দিন মাত্র ছুটী পায় তারা সবাই যে-যার কাজে ফিরে এসেছে। তাদের দিকে কি আমি কৃপার দৃষ্টিতে তাকাব ? যে দুই চোখ প্রথম থেকেই বিরাট বিস্ময়ে ও চোখের হাসিতে মুখের কথায় ক্ষণিকের সাহচর্য্যে যেটুকু সুখ তা-ও এই কর্ম্মের আনন্দ-তীর্থের যাত্রীদল বাদ দিতে চায় না। জীবনে হয়ত এদের অনেকেরই অদৃষ্টে বিবাহ নেই, অন্তত প্রথম জীবনে নেই ; কিন্তু তবু কর্ম্মস্রোতে এরা পুরুষ ও নারী পাশাপাশি ভেসে চলেছে। পুরুষ নারীকে নরকস্য দ্বারং বলে এড়িয়ে যায়নি ; নারী পুরুষকে ভয়ের সামগ্রী বলে পিছিয়ে যায়নি ; আর সমাজ দেয়নি এদের মধ্যে আগুন আর ঘির একটী মাত্র সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে। স্ত্রী-পুরুষে সান্নিধ্যের ফলে রূপ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক গুণের চর্চ্চা এদের মধ্যে

টেম্‌স্‌ থেকে পালামেণ্ট

সহানুভূতিতে সমস্ত ভুবন পর্য্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করেছিল তারা এখনো একটুও ক্লান্ত হয়নি। বিদেশ যেন কোন রহস্যে ভরা যাদুকরের ইন্দ্রজালের কাঠি ঠেকিয়ে তাকে মাধুরী দিয়ে রেখেছে ; তাই দেখে দেখে পুরাতন হয় না। অতিভোরের চাকরাণীর কর্ম্মব্যস্ততা, দুধওয়ালার দ্বারে দ্বারে দুধ রেখে যাওয়া, কুলীমজুরের বাস বা আণ্ডার গ্রাউণ্ডের পথে দৌড়ানর মধ্য দিয়ে লণ্ডনের জাগরণের চিহ্ন পাই। তারপর দলে দলে লোক যে-যার কাজে যাবে—পুরুষ ও নারী, যুবক ও বালক কত বিচিত্র সজ্জায় কত বিভিন্ন ভঙ্গীতে চলবে ; কত দীর্ঘ ঋজু বীরের মত সুঠাম দেহ, চঞ্চল লীলায়িত ফুলের মত সুন্দর মুখের শোভাযাত্রা চলবে। তারি মধ্যে হয়ত কোন যুবক পথে একটী যুবতীর সঙ্গে মিলে একসঙ্গে যেতে লাগল, হয়ত দুজন বন্ধু বা এক আপিসের লোক। পথে যেতে যেতে মনের অগোচরেই বেড়ে গেছে। তার ফলে পুরুষের অহরহ সাধনা নারীর চোখে জনতার মধ্যে একটী জন হয়ে উঠবার ; নারীরও সেই সাধনা। তার ফলে পশ্চিমে মানবজাতিরই উন্নতি হয়েছে সর্ব্ববিধ। আমাদের মত ক্ষীণজীবী বা অসুন্দর হবার লজ্জা ও গ্লানি ইউরোপে দেখা যায় না।

কথা উঠেছে যে বয়স মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার রূপ কমিয়ে দিতে পারত না বা পরিচয়ের গ্লানি তার বহুমুখী আকর্ষণ নষ্ট করতে পারত না বটে, কিন্তু তাকে এই সব সহর তলীর ছোট ছোট গৃহস্বামিনীর কাজ করতে হলে দুটী বছরে তার রূপ ও আকর্ষণ সাফ হয়ে যেত। যে বেচারী ৪০০।৫০০ পাউণ্ড বছরে উপায় করে তার গৃহশ্রমে ক্লান্তা কান্তার কথা স্মরণ করে সবাই দুঃখ করছে। কিন্তু আমি ত তার দুঃখের কারণ বুঝি না। যতদিন তার যৌবন আছে এবং এদেশে

যৌবন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হচ্ছে—ততদিন সে একটা ঘর বা ফ্ল্যাট নিয়ে বেশ স্বাধীনভাবে থাকতে পারত বটে, কিন্তু তার জন্য স্থায়ী কিছু থাকত না। বরং তার স্বামীদেবতারই ভাগ্য হয়ত খারাপ। সে যে আপিসে একটানা খাটে তার কোন ফল সে হাতে হাতে দেখাতে পায় না; কিন্তু গৃহিণী একটা গৃহ দেখাবে যা তার নিজের হাতের তৈরী, নিজের পরিকল্পনার ছাপ তাতে আছে সুরুচিসম্পন্ন সৌষ্ঠবের মধ্যে। ইলেক্‌ট্রিক আর গ্যাস তার পরিশ্রমকে লঘু ও ভদ্র করে দিয়েছে। তবে তার দুঃখ কিসের? আসল কথা হচ্ছে যে এ যুগে বাইরের

'ক্যাথিড্রালের' সহর বলে। সে কথা আজ কেহ মানতে চাইবে না। রোম, সেভিল, কলোন ঘুরে এসেই যে মানুষ সে কথা অস্বীকার করেছে তা নয়, লণ্ডনের গায়ে আজ কাল কোথাও একটু 'ক্যাথিড্রালে'র ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। সেণ্টমার্টিন্‌স এমন কি সেণ্ট পল্‌স কারই বা নজরে পড়বে? লণ্ডনের বসতি পল্লীর নাম-করা ছোট ছোট বাগানগুলি পর্য্যন্ত আজকাল উৎসবের বেশ হারিয়ে ফেলছে। ব্লুমস্‌ব্যরীর বাগান ত ইউনিভার্সিটিই গ্রাস করেছে। কাজের দাবীর সঙ্গে সৌন্দর্য্যের দাবীর একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে।

বেদের আস্তানা

জগৎ সবাইকে টানছে; ঘরমুখো কেহ নয়; পায়ে এদের বাঁধা আছে রথচক্র, মুখে বুলি

"যাব না যাব না যাব না ঘরে
বাহির করেছে পাগল মোরে।"

পদব্রজে বের হওয়া গেল। তা নাহলে আমার আজকের মানস ভ্রমণটুকু ব্যর্থ হবে। চলার প্রেমে মেতে জনস্রোতে ভেসে ভেসে গিয়েও নিজের উদ্দেশ্যের ঘাটে ভিড়তে হবে তা না হলে আঁখির পিপাসা মেটেনা, মনের অভিযান পূর্ণ হয় না। ভারতীয় ছাত্র ইংলণ্ডে এসে লণ্ডন দেখে না, দেখে কিন্তু প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা। তার কারণ হচ্ছে কাছের গঙ্গা ঘাটের পাণী। কলকাতার বাসিন্দা কজনই বা গঙ্গাস্নানে যায়?

কোথায় যেন পড়েছিলাম যে লণ্ডনের আগে নাম ছিল

তার উপরে লণ্ডন যেমন ভাবে ব্যবসায়ের দস্যুদের হাতে পড়ে বদলিয়ে যাচ্ছে তাতে এর স্বার্থ বৃদ্ধি হচ্ছে বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্য-নাশও হচ্ছে। জগৎ-জোড়া ব্যবসার কল্যাণে লণ্ডন হয়েছে কসমোপোলিটান' কিন্তু কমনীয়তা কমেছে। এ নির্ম্মাণ-কৌশলের দৃষ্টান্ত, কিন্তু স্থপতির স্বপ্ন-সৃষ্টি নয়। তার বিলাস-লীলার কেন্দ্র পিকাডিলির সর্ব্বাঙ্গ লাল নীল বিজ্ঞাপনের দৌলতে বাঁধা পড়েছে, সেগুলি সুষ্ঠু কিন্তু সুরুচির চিহ্ন নয়। সে বিজ্ঞাপনের আলোর বাহার এমন কি Eros এর মূর্ত্তি থেকেও পথিকের প্রশংসমান দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে। লণ্ডন মহাসহর কিন্তু মহানগরী নয়; তার টেমস নিয়ে বা দানিয়ুব নয়। ফ্লীট ষ্ট্রিট দিয়ে এগোতে এগোতে সেণ্ট পল্‌স যে কোথায় দুপাশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অফিসের ছায়ায় চাপা পড়ে থাকে তা টেরই পাওয়া যায় না। নদীর পথ দিয়ে না এসে ভিক্টোরিয়া

দিয়ে অসলে ওয়েষ্টমিনষ্টার য়্যাবি ও পার্লামেণ্টেরও প্রায় সেই দশা হয়। পৃথিবীময় বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের আওতায় এর ইতিহাসময় আভিজাত্য লোপ পেতে বসেছে।

তবু ভাল, যারা এ দস্যুতা করছে তাদেরও কিছু শিক্ষার অভাব নেই। তারা যা বানাচ্ছে তাকে বড় জোর 'ভালগার' বলা যায়; কিন্তু তা ভাঙ্গবার মত নয়। সেণ্ট পল্‌সের কাছেই যে বিরাট সাংবাদিক গৃহ উঠেছে তাকে সৌধ বলব না, কারণ তার মধ্যে না আছে সুধার সৌন্দর্য্য, না তার সাঙ্গোপাঙ্গ ইষ্টক বা প্রস্তর। বিরাট সরল রেখাময় কাঁচময় একটা দানব, কিন্তু আকর্ষণকর দানব মাথা তুলে উঠেছে। ব্রাইটনের একটা নূতন বাড়ীর কথা ধরা যাক। আগেকার টিউডর গৃহের অন্ধ অনুকরণ থেমে গেছে; তার স্থানে এসেছে কোন জটিল কারুকার্য্য নয়, সরল সৌন্দর্য্য। এই হচ্ছে "ফিউচারিষ্ট আর্টের" মূল মন্ত্র। প্রাচীর হতে প্রাচীর পর্য্যন্ত কাঁচের জানালা চলে গেছে, ভিতর থেকে মনে হয় আকাশ ও সাগরের একটা বিরাট অংশ চোখকে ডাকছে। বাইরে থেকে এই জানালাগুলি একটার উপর একটা প্রতি তলে খিলানের মত চলে গেছে; রাত্রে সমান্তরালভাবে আলোর সারি দেখা যাবে। তাকে কিন্তু দীপমালা বলব না। এই জানালাগুলি কেবলি জানালা, বাতায়ন নয়, এই কাঁচও স্ফটিক নয়। এই শিল্পে সারল্য আছে, শালীনতা নেই; কৌশল আছে, কল্পনা নেই; আবশ্যকতা আছে, আভিজাত্য নেই।

Folk-dancing

ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ স্থপতির ভাবীকালের গ্রামের নিষ্ঠুর পরিকল্পনা হচ্ছে যে গ্রামের চার্চ্চটীর উপরেই তলায় তলায় প্রকাণ্ড ভাড়াটে ফ্ল্যাটের শ্রেণী; তারি মধ্যে থাকবে গ্রাম্যলোক আর তাদের বেতার, টেলিফোন ও ডাকঘর। বিল্ডিং সোসাইটী গুলির কল্যাণে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মটর গাড়ীর অহরহ আক্রমণে গ্রাম্য ইংলণ্ডের রূপ বদলাতে বাধ্য। তবু এখনো লণ্ডন ছাড়িয়া দূরে গেলেই গ্রাম না হোক গ্রামের অখণ্ড শ্যামলিমা ও অক্ষুণ্ণ শান্তি পাওয়া যায়; এমন কি কোন কোন গ্রামে অপ্রত্যাশিতভাবে বেদের (জিপ্সি) আস্তানাও পাওয়া যায়। এই 'রোমানি' বংশকে গ্রাম্য ইংলণ্ডে একটুও বেমানান মনে হয় না। কোথাও বা পাই আগেকার সুন্দর সরল folk dancing-এর উদাহরণ। গ্রামের লোক ও সহরের লোক মিলে পুরাতন সাধারণ লোকের আনন্দের জিনিষ গুলি পুনর্জ্জীবিত করছে। এই পুরাণো জিনিষকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস ভবিষ্যতের গ্রামেও থাকবে; কিন্তু হয়ত থাকবে না তার মধ্যে প্রাণ, থাকবে না প্রাচীন আইভি ঢাকা গৃহের প্রান্তরে অপরাহ্নের দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর বিলীয়মান ছায়ায় বাঁশীর সুরের তালে তালে স্বচ্ছন্দ আপনা-ভুলানো নাচ। গ্রাম হবে তখন গোল্ডারস্ গ্রীণের পল্লী সংস্করণ। তার মধ্যে থাকবে না সেই সবুজ উদার প্রান্তর, না সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুটীরগুলি তাদের গীর্জ্জা ও ইউ উইলো পপলারে ছায়াচ্ছন্ন সংলগ্ন অঙ্গনটুকু। তার পরিবর্ত্তে আসবে কোন কোন বাছা জায়গায় জাতি ও

সরকারের তরফ থেকে যত্নরক্ষিত খানিকটা 'বিউটি-স্পট' যেটা রবিবারে মটর ও সাইকেলের আরোহীতে ভরে যাবে। আর সেখানে স্লটমেশিনে চকোলেট থেকে আরম্ভ করে জুতা বুরুষের সরঞ্জাম পর্য্যন্ত সব মজুত থাকবে। তবু সান্ত্বনার কথা এই যে, যেরকম ভাবে লোক সংখ্যা কমতির মুখে চলেছে তাতে দু চার পুরুষের মধ্যে গ্রামে Skyscraper বা ফ্ল্যাটের কোন প্রয়োজনই হবে না।

অতবড় কর্ম্মচঞ্চল সহরও বিশ্রামটুকুর কথা ভোলে নি। তাই পাড়ায় পাড়ায় মাঠ, বাগান, ফুলের মেলা। আর সে সব কারো তাতে হৃদ্‌স্পন্দন ভয়ে দ্রুত, বা চরণ পলায়নে চলনশীল, হয়ে উঠল না। পুলিশ হচ্ছে লণ্ডনের একটী প্রধান দ্রষ্টব্য; শালপ্রাংশু সে পথের সবাইকে আশ্রয় দিবার জন্য প্রস্তুত; আর সবাই তাকে সাহায্য করবার আশ্বাস দিচ্ছে সতত, এমন কি পথের ভীড়েও। এও হচ্ছে এদেশের একটা প্রধান গুণ। পাঁচটা ছটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে যে যার গৃহে ছুটবে; হয়ত রাত্রে কারো সঙ্গে দেখা হবে, হয়ত নাচ বা থিয়েটার আছে, আর কিছু না থাকুক নীড়ের বা ক্লাবের টান ত আছেই। সে বিরাট জনতার মধ্যে গতির প্রাচুর্য্য আছে

দাঁড় বেয়ে যাওয়া

হচ্ছে সকলের জন্য তাই তার মধ্যে যে সার্থকতা আছে প্রাচ্যের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উদ্যানগুলির মধ্যে তা ছিল না। এ গুলি অসাধারণ ব্যাপার কিছু নয়। মোগল উদ্যান দেখে অভ্যস্ত চক্ষু এতে তৃপ্তি পাবে না; কিন্তু সে সব বস্তু অসামান্য—সামান্যদের সমানভাবে উপভোগের জন্য ত তৈরী হয় নি। হাইড পার্কে যেখানে রাজা স্বয়ং ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছেন তার পাশ দিয়েই সার্পেন্টাইনে এক শিলিং-এর খদ্দের সাধারণ লোক নৌকা বাইছে। তার পারে কত ছেলেমেয়ের খেলা, ভীড়ে বক্তৃতাবাগীশের মেলা, ও দূরে তারুণ্যের লীলা। জলে কটী হাঁস ভাসছে, তাদের খাওয়াতে গিয়ে একটী খুকী তার রুমালটী খুইয়ে বসল, অমনি একজন পুলিশ এসে তার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে দিল। ইতিমধ্যে প্রাবল্য নেই, তাড়াতাড়ি সকলেরই আছে, তাড়াহুড়ো নেই কারো; শৃঙ্খলা সবাই মেনে চলে, কারণ শৃঙ্খলা তাদের পথের বন্ধু, পায়ের শৃঙ্খল নয়, গতির বন্ধন নয়।

* * *

লণ্ডনের লোক এ যুগে কবিতা পড়ে না; জীবনে রোম্যান্স আছে কিছু, কিন্তু তা কাব্যের ধার ধারে না। গত যুদ্ধের প্রভাব এখন আর চোখে বাজে না; কিন্তু তার শিক্ষা এরা ভোলে নি। ঘোর আশানাশ ও স্বপ্নভঙ্গের ভিতর দিয়ে এখনো এদের জীবন যাচ্ছে। যারা প্রৌঢ় তারা যুদ্ধ দেখেছে, যারা যুবক তারা বাবার ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়েছে, চারদিকে ত্রাসের আভাস দেখে কচি মুখ শুকিয়ে গেছে কতবার; মাথার উপর মৃত্যুর রথচক্র নির্ঘোষ শুনতে পেয়েছে বারবার। আর দেখেছে ইংলণ্ডের পরিবার ভঙ্গের

ক্রমান্বয়ে পরিণতি। লণ্ডনে 'ফ্যামিলি' খুব কম; 'হোম' আরও কম। সামাজিক রীতি নীতি বন্ধন সব যেন আধুনিকতার বন্যা স্রোতের মুখে একে একে ভেসে গেছে। তার ফলে ঘরকে পর করে পুরুষ বেরিয়েছে একা; নীড় থেকে নারী এসেছে বাহিরে একাকিনী। পুরুষের হৃদয়ের বিচরণ ক্ষেত্র বেড়ে গেছে অনেক, আর নারী হয়েছে সাহসিনী। সে আর পুরুষের কাছে অর্দ্ধেক সৃষ্টি ও অর্দ্ধেক কল্পনা নয়। পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে সে, জীবিকা অর্জ্জনেও, তাই তার সম্মানের আসনটুকুও প্রতিযোগিতার বাজারে নেমে সসম্মানে সঙ্গীদের সাহচর্য্যের কথা লিখবে। কিন্তু গৃহ ও একনিষ্ঠ প্রেম কবিতার উপজীব্য হিসাবে অচল হয়ে একমাত্র চলচ্চিত্রের পর্দ্দাতেই চলমান হয়ে রয়েছে। কবিতা গৃহকে ছেড়ে দেশকে ধরেছে; স্থানীয় ভূমিখণ্ডটুকুকেও আশ্রয় করেছে। বন্ধুদের সঙ্গ ও জীবনের আসক্তি খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে; loyaltyর চেয়ে বড় কথা আর নেই; কিন্তু নারী ও পুরুষের সম্বন্ধের বেলায় তা তেমন প্রবল নয়।

পুরুষ ও নারী যদি এত পরস্পর থেকে স্বাধীন ও সুদূর হয়ে যায় জীবিকার প্রয়োজনে ও জীবনের আহ্বানে—প্রেমের

রাজহংসের জলকেলি

লোপ পেয়ে গেছে। এখন আর কেহ তাকে বাসে বা ট্রেণে অভিবাদন করে বসবার জায়গা ছেড়ে দেবে না; সে তা চায়ও না। সে চায় পুরুষের কাছে সমান ব্যবহার; সে হচ্ছে সহকর্ম্মিণী, সহধর্ম্মিণী হওয়া তার কাছে আজ বড় কথা নয়। সে হচ্ছে আগে কমরেড, পরে কামিনী। নারী হারিয়েছে তার লালিত্য, যদিও যৌবনের লাবণ্য তার বেড়েই গিয়েছে হয় ত। সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে তার মধ্যে খেলায়, ব্যায়ামে ও নানাভাবে প্রাণ স্ফূর্ত্তি পেয়েছে; কিন্তু প্রাণপ্রিয়া মূর্ত্তি নিয়ে উঠতে পারছে না। তাই সে আর বিপুল রহস্যের অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নেই। সে হচ্ছে তবু নারী, কবিতার নায়িকা সে নয়। আধুনিক কবি, কবিতায় তার স্কুল ও ইউনিভার্সিটির দানের প্রতি সম্মান দেখাবে, শ্যামল দেশে ঘুরে বেড়ানর মধ্যে যে উল্লাস তার কথা, কবিতার প্রয়োজনও কমে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। আর একনিষ্ঠ বা জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার প্রেম অনুভব করা ফ্ল্যাপারদের কাছে কেবল ভাবাবেগের বাষ্পময় সেন্টিমেণ্টালিটী বলেই গণ্য হবে। টেনিসনের আদর্শ একালের জন্য নয়; ব্রউনিং-এরও একটা দিক সম্পূর্ণ অচল। একালের কোন প্রেমিক যার প্রতি ইহজীবনে প্রেম নিবেদন করা ঘটে উঠেনি সেই মৃতা প্রেয়সীর হাতের মুঠার মধ্যে একটী পাতা রেখে জন্মজন্মান্তরের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোনদিন তাকে লাভ করবে এ বিশ্বাসে সান্ত্বনা পাবে না; ইহলোকের উপরই যার দাবী দৃঢ় নয় অন্য কোন ভাবী জন্মের উপর তার আস্থা থাকবে কেমন করে? 'That it fades from kiss to kiss' একথা যে জেনেছে তাকে মূল্য দিতে হয়েছে বহু; তার হৃদয় তাই হয়ে উঠেছে চঞ্চল ও অনেক-

নিষ্ঠ। পথে পথে কত নব পরিচয়, নব অনুভব; স্মৃতির পথ বেয়ে কত মূর্ত্তির আনাগোনা; একটী আগেরটীর চরণ চিহ্ন মুছে লোপ করে দিয়ে যেতে পারে; সে অবস্থায় কাকে মর্ম্মের মন্দির তলে অনন্ত জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়? এ হচ্ছে হিরাক্লিটাসের দর্শনবাদের যুগ। এই মুহূর্ত্তে নদীর যে জল-বিন্দুটা এখানে আছে পরমুহূর্ত্তে ঠিক সেটুকু আর সেখানে নেই। কিন্তু দুটা বিন্দুই একটী আর একটীর চেয়ে কম সত্য নয়। নবীনা কারো সঙ্গে দেখা হল "পথে যেতে যেতে পূর্ণিমা রাতে"; পুরাতনার কথা মনে হল, সে বলে গেছে বৃক্ষশাখায় পত্রের মতন সহজ ভাবে প্রেমকে নিতে: সে বলে গেছে আঁধার রাতে তারা দুটী তরণী আলোক ফেলতে ফেলতে সৌহার্দ্দের বাণী ঘোষণা করে অন্তরালে মিলিয়ে যেতে পারে; তখন নবীনার আহ্বান ও পুরাতনার আসনে দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য। বিশেষ করে যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর পালা উঠে গেছে। এ নিয়ে কিন্তু আধুনিকার জালা কম নয়। স্বাধীনতার কল্যাণে না টিকল তার ঘর, না জুটল বর, না ঘটবে হয়ত জীবনে প্রিয়তমের আবির্ভাব। তাই সে জীবনকে যেমন লঘুভাবে গ্রহণ করছে তেমনি একবার আঘাত পেলেই নুয়ে পড়ে না, অশ্রু মুছে জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ করে। তবে কি এদের প্রেমধারায় কোন তত্ত্ব নেই? তা বললে ইউরোপের যৌবনকে ভুল বুঝা হবে। এদের মন্ত্র কবির ভাষায় বলতে গেলে

I have been faithful to the, Cynara,
in my fashion.

ইংরেজ চরিত্রের হিসাব এত সহজে দেওয়া যায় না। তার দেহ যেমন বিশাল, তার হৃদয়ও তেমন গভীর। সে কথা কয় কম, আলাপ করে আরো কম, আর হৃদয়ের অনুভূতি বাহিরে প্রকাশ করতে চায় না। চিত্তের সুখে মত্ত আত্ম-প্রসাদময় যার দিনগুলি বর্ষার গঙ্গায় উৎসর্গ করা শতদলের মত স্বচ্ছন্দভাবে ভেসে যাচ্ছে বলে মনে করছি একটা দুর্লভ মুহূর্ত্তে একটা আন্তরিক সহানুভূতির বাণীতে হয়ত তার বেদনাবিদ্ধ নূতন একটা স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে যাবে। শৈলসম অচপল প্রেম এত গভীর ভাবে কি করে লুকান থাকে?

একটি বিবাহিতা নারীর পুরুষালি

জনবুলের চরিত্র বিচিত্র। একটি অধ্যাপককে পুস্তক-কীট বলেই জানতাম। তার রুক্ষ মনটী প্রাচীন বটগাছের ঝুরির মত জনবুলের দেশের মাটীতে সহস্র দিক দিয়ে শিকড় গেড়ে আছে ও সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের চরিত্রের সব রকম সম্ভব কোণীয়তা (angularities) যেন তার অযত্নরক্ষিত বহিরাকৃতির ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ ফলার মত উঁকি ঝুঁকি মারছে। সেই বৃদ্ধকে ব্যঙ্গচিত্রবিশারদদের নিষ্ঠুর তুলিকার মুখে মনে মনে কতদিন যে সমর্পণ করেছি তার ঠিক নেই। সেই তিনি পয়লা মে সকাল বেলা যখন তাঁর সামনের দিকের বাগানে সোনার আলো ফুলের উপর হিল্লোলিত হচ্ছিল আর সেই নির্জ্জন পল্লীতে গাছে গাছে পাখীর ডাকে উৎসবের সাড়া

চেরীর হাসি

পাওয়া যাচ্ছিল তখন সংগোপনে তাঁর গৃহের পিছনে ফুলে-ফুলে শুভ্র হাস্যে উচ্ছ্বসিত একটি চেরীগাছের নীচে নতজানু হয়ে হাউসম্যানের কবিতা পাঠ করছিলেন। পাণ্ডিত্যের ও বার্দ্ধক্যের সহস্র রুক্ষতার ছদ্মবেশের ভিতর থেকে একটি কবিপ্রাণের কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ অশ্রুবিন্দুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

স্ত্রী-যুদ্ধ

শ্রীসুবোধ বসু এম্‌-এ, বি-এল্‌

নয়

বাজারে যতপ্রকার পাঁজি পাওয়া সম্ভব সবগুলিই মিসেস নাগ কিনিয়া আনিলেন। যে পাঁজিতে সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী বিবাহের দিন পাওয়া যাইবে, তার গণনাই যে নির্ভুল সে সম্বন্ধে মিসেস নাগের কোনও সন্দেহ নাই।

হিন্দুশাস্ত্রের মত পাঁজিগুলি অতিশয় উদার, এবং এ উদারতার জন্য মিসেস নাগের পক্ষে অদূরবর্ত্তী এক শুভদিন পাওয়া দুষ্কর হইল না,— অরক্ষণীয়া কন্যাদের জন্য যে বিশেষ বিবাহের তারিখগুলি দেওয়া থাকে, তারই একদিন তিনি নিজের বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন, এবং এতে রায়বাহাদুরেরও অমত হইল না।

বিবাহের দিন পাকা করিবার পর তবেই বিবাহের বেশ-ভূষা সম্বন্ধে মিসেস নাগ মনোনিবেশ করিলেন,—এর আগে নয়। রাজ্যের ক্যাটালগ ঘাঁটিয়া ও সহরের সমস্ত মিছিমিছি-বেশি-দাম-চাওয়া দোকানগুলি ঘুরিয়া বিস্তর দামী পছন্দ করিয়া আসিলেন। স্থির করিলেন, জিনিষগুলি সবই বর্ত্তমানে বাকীতে কেনা হইবে, এবং দাম শোধ দেওয়া হইবে বিবাহের পর। এই দূরদর্শিতা মিসেস নাগের চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য।

সেদিন সকালবেলায় যখন মিসেস নাগ এক সাহেবী দোকানের ক্যাটালগে প্রসাধন-দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেখিতে-ছিলেন এবং ঠোঁটে রং লেপিতে পারিলে ওষ্ঠাধর কেমন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে তাহা কল্পনা করিয়া দেখিতে-ছিলেন, এমন সময় হুড়মুড় করিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল শশাঙ্ক।

'এসো শশাঙ্ক, এসো'...দেখিয়া সোৎসাহে মিসেস নাগ কহিলেন।

হাতের ক্যাটালগে প্রসাধনবিভাগ তৎপর দক্ষতার সঙ্গে উল্টাইয়া গেল,...বাহির হইল আসবাবপত্রের বিভাগ। 'এতো ভোরে তুমি উঠ্‌তে পারো?' শশাঙ্কের উপর পুনঃ-প্রশ্ন হইল।

'চাকরটাকে চার আনা পয়সা বকশিষ কবুল করায় উঠিয়ে দিয়েচে' শশাঙ্ক চেয়ারে বসিতে বসিতে স্বীকার করিল।

'এতো জরুরী!'

'জরুরী বৈকি' শশাঙ্ক কহিল, 'নইলে আজ সারাদিন আমায় অনিদ্রার জন্য কষ্ট পেতে হবে। কিন্তু যে-দুঃখে কত লোক সারারাত ঘুমোতেই পারে না, বিছানাটাকে কণ্টকাকীর্ণ মনে হয়, তার সম্মানে যদি আমি সামান্যও কিছু আগে উঠেই থাকি, তাতে এত বিস্ময় কেন?'

'শোনো কথা', মিসেস নাগ সস্নেহে কহিলেন, 'তোমার আবার দুঃখ কিসের?'

'জগত স্বার্থপর', দার্শনিকের মত শশাঙ্ক কহিল, 'এতে আর আমার কোনও সন্দেহ নাই। নিজের দুঃখটা আপনি ঠিকই বুঝলেন, রায়বাহাদুর যোগাড় হলো,...আর আমাকে জিজ্ঞেস করছেন দুঃখ আমার কোথায়? আপনারা কি মনে করেন, বিয়ে না করলেও আমার চলবে?'

শশাঙ্কের অন্যান্য পরিহাসের ন্যায় এটাও একটা পরিহাস, তাতে মিসেস নাগের সন্দেহ নাই। বিয়ের জন্য শশাঙ্কের যে তাঁর শরণাপন্ন হইতে হইবে না তা তার জানা আছে।

'বিয়ে করবার ইচ্ছেই যদি তোমার থাকবে,' ব্যাপারটাই অবিশ্বাস করিয়া মিসেস নাগ কহিলেন, 'তবে আর মিসেস গুপ্ত এত দুঃখ করে মরবেন কেন!'

'ক্রমশই বুঝ্‌তে পরেছি মায়ের মনে আর কষ্ট দেওয়া কিছুতেই উচিত হচ্ছেনা,'...শশাঙ্ক বিজ্ঞের মত কহিল।

'টুক্‌টুকে একটী মেয়ে দেখে এইবার বিয়ে করে নাও,' মিসেস নাগ উপদেশ দিলেন, 'মা খুসি হবেন, নিজে সুখী হবে।'

'কিন্তু কী রকম ঔদাসীন্যটা আপনারা দেখাচ্ছেন,' শশাঙ্ক কৌতুক-গম্ভীর অভিযোগ করিয়া কহিল, 'দেখুন তো ভেবে। আত্মীয়স্বজন আর কিসের জন্য বলুন,...বিবাহ মৃত্যু এসবে তাদের সাহায্য ছাড়া কি করে আর চলে।'

বিবাহ সম্বন্ধে শশাঙ্কের এই ফিলজফি প্রচলিত ছিল যে স্ত্রী এবং মোটরগাড়ি বড় বেশি বিগড়ায়। অথচ মোটরগাড়ি না হইলে চলে না, কিন্তু স্ত্রী ছাড়া অনায়াসেই চলিতে পারে। এখন বিবাহের প্রতি তার কিঞ্চিৎ আগ্রহ দেখিয়া মিসেস নাগ শশাঙ্কের মায়ের বন্ধু হিসাবে সামান্য উৎসাহিত হইলেন। প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, কেমন মেয়ে শশাঙ্কের পছন্দ।

'আমার পছন্দ',...শশাঙ্ক চোখ বুজিয়া কল্পনার অভিনয় করিয়া কহিল, 'উদ্ধত, অবিনীতা, তীব্র-ভাষিণী মেয়েকে, যে যুদ্ধ সঙ্গে করে আনতে পারবে এবং বজায় রাখতে পারবে। কিন্তু যে হেতু অতটা খুঁজে পেতে বিলম্ব হবে, তখন যে কোনও তেজী মেয়েতেই চলতে পাবে। যেমন পূর্ণিমা।'

'পূর্ণিমাকে?'—মিসেস নাগ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলেন, 'বলো কি? এত সুন্দরী মেয়ে থাকতে?'

'পূর্ণিমাকে',—শশাঙ্ক জোর দিয়া কহিল।

'নিশার স্বপন সম' এই বার্তা শুনিয়া মিসেস নাগ স্তম্ভিত হইলেন। স্ত্রী-সুলভ এক স্বাভাবিক নির্দোষ পরশ্রীকাতরতায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন,...এবং এই ভাবিয়া সবিশেষ ব্যথিত হইলেন যে, সৌভাগ্যকে তিনি এক-চেটিয়া রাখিতে পারিলেন না, পূর্ণিমার ভাগ্যও প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

'ঢের ভালো মেয়ে পাওয়া যাবে একটু খুঁজলেই,'... শশাঙ্কের হিতের জন্য মিসেস নাগ কহিলেন।

'বহুবিবাহে আমার কোনও প্রেজুডিস নেই'—শশাঙ্ক মন্তব্য করিল।

'কিন্তু পূর্ণিমার মতামতগুলি কি বিশ্রী, জান তো,' মিসেস নাগ যুক্তি দেখাইয়া কহিলেন, 'ও-রকম যার আইডিয়া, তাকে কি ঘরের বউ করা ঠিক হবে? বিশেষ, স্বামী-স্ত্রীতে মতের মিল না হলে বিয়েতে সুখ হয় না।'

'স্বামীতে স্ত্রীতে মতের মিল হলেই বরঞ্চ সুখের আশা প্রায়ই করা যায় না,' শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি কহিল, 'বিবাহের অবসাদ কেবল মাত্র কলহ ও মতবিরোধের দ্বারা দূর করা সম্ভব।'

'পূর্ণিমাকে বিয়ে করা যখন ঠিকই করেচ' মিসেস নাগ ঔদাসীন্য সহকারে কহিলেন, 'তখন আমার পরামর্শে আর লাভ কি।'

'কিন্তু পূর্ণিমা বিয়ে করতে চাচ্ছে না যে আমাকে?'—শশাঙ্ক গুরু অভিযোগ করিয়া বলিল, 'কম দুঃখে এসেছি আপনার কাছে?'

শুনিয়া মিসেস নাগ এতটা আশ্চর্য্য হইলেন যে কিছুক্ষণ তাঁর মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না,—চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়াই রহিলেন।

'অবাক করলে শশাঙ্ক,' ফুসফুস হাওয়াতে পূর্ণ করিয়া লইবার পর তিনি কহিলেন, 'তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে পূর্ণিমা? আমার কাণকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'প্রত্যাখ্যান করেনি বটে', শশাঙ্ক কহিল, 'কিন্তু ওকে যদি আপনারা এবার সুবুদ্ধি না দেন, তবে ওর মেয়েলী বুদ্ধিতে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেই হয়তো ও বীরত্ব জানাবে।'

'কিন্তু দেমাকটা দেখ একবার', মিসেস নাগ অত্যন্ত আক্রোশের সঙ্গে কহিতে লাগিলেন, 'পাশ করা ধাড়ী মেয়ে হয়েছে, বর জোটে না বলেই মিটিং করে বেড়ায়,—তার আস্পর্দ্ধা দেখ একবার।'

'তবেই বুঝুন, রেগে যাওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল', শশাঙ্ক হাই তুলিয়া কহিল, 'কিন্তু যে হেতু আমি অত্যন্ত সং-যমী ব্যক্তি সেই জন্যই রেগে উঠি না। রাগ হতে থাকলেই এক হতে কুড়ি পর্য্যন্ত গুণতে থাকি,—তাতে ফল হয়। কিন্তু অনুরাগের বেলায়-ই তো মুস্কিল,—এক হতে কুড়ি গুণলে চাপা না পড়ে বরঞ্চ আরো বেড়ে যায়। দেখুন তো, মিসেস নাগ, কি বিষম মুস্কিল।'

মিসেস নাগ অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, অদ্ভুত জীব পুরুষেরা, একজনার উপরে ঝোঁক পড়িলে আর জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না,—সম্পূর্ণ অ-হিসেবীর মত প্রেম করিয়া বসে। অন্ততঃ এদিক দিয়া স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের চাইতে বেশি বুদ্ধিমান।

শশাঙ্কের প্রস্তাব এই যে পূর্ণিমার মত করিতে মিসেস নাগকে সাহায্য করিতে হইবে। মিসেস নাগের ক্ষমতা

চমৎকারিনী এবং মহাপ্রাচ্য স্ত্রী-সঙ্ঘের তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্যা। মিসেস নাগ অবশ্য এই ভাবিয়া বিস্মিত হন যে কোন্ সাহসে পূর্ণিমা বিবাহের এমন একটা সুযোগ পাইয়া উপেক্ষা করে। কিন্তু সত্যি কথা বলিতে কি পূর্ণিমার মত জেদী মেয়েকে বুঝানোও যে খুব সহজ নয়, ত তিনি বেশ জানেন। বিশেষ, মিসেস নাগের স্বামী-সংগ্রহটা যে পূর্ণিমা সন্তোষের চোখে দেখে নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

'আমার কথায় এখন কাজ হবে কিনা, তাই সন্দেহ হচ্চে',—মিসেস নাগ স্বীকার করিলেন, 'এই ধর,—তোমার —অর্থাৎ আমার বিয়ের খবরটা ও তেমন খুসি মনে নিতে পারেনি। অথচ, তুমিই বলো তো শশাঙ্ক, এতে আপত্তিটা কোথায়?'

'কিছু নয়, কিছু নয়', শশাঙ্ক সায় দিল, 'রায়বাহাদুরের মতন অমন বর সচবাচর পাওয়া যায় না কি? আমার প্রা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় এই মহাদেবটীর জন্য কতদিন ধরে আপনাকে তপস্যা করতে হয়েছিল।'

'কথা শোনো একবার!' মিসেস নাগ মৃদু প্রতিবাদ করিলেন, 'গরজ বুঝি আমারই ছিল? আবার বিয়ে করতে তো আমার ইচ্ছেই ছিল না।'

শশাঙ্ক সে সম্বন্ধে আর গবেষণায় নিযুক্ত হইল না,—বরঞ্চ যাহাতে মিসেস নাগের সাহায্য আয়ত্ত করা যায়, এমন সব রুচিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করিল। এবং সম্পূর্ণ আধ ঘণ্টা বক্তৃতার পর বুঝিতে পারিল যে কথা আরও কিছুক্ষণ চালাইতে হইলে একটু আরাম করিয়া বসা দরকার।

'সোফাটাতে', চেয়ার হইতে উঠিয়া শশাঙ্ক কহিল, 'একটু আরাম করে' বসে নি।'

'ওটার একটা পায়া আবার ভেঙে গিয়েছে'—মিসেস নাগ তাড়াতাড়ি সাবধান করিলেন।

শশাঙ্ক ক্ষান্ত হইল। 'ঠিক কথা', চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সে কহিল, 'আগের বছরই আপনি একদিন বলেছিলেন বটে। ভুলে গিছলাম। বড্ড ভুলে যাই।'

কিন্তু আলোচনা করিয়া সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল মিসেস নাগের দ্বারা সাহায্য প্রচুর হইবে না,—তিনি সহায়তা মাত্র করিতে পারেন। নিজের পথ তাকে নিজেই দেখিয়া নিতে হইবে।

'আপনাকে একটা কথা চুপে চুপে বলে রাখি', সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত শশাঙ্ক কহিয়া উঠিল, 'দেশ ছেড়ে আমি চলে যাব মনস্থির করেছি,—ফিলিপাইন দ্বীপের এক কলেজে প্রফেসারি নিয়ে। মা বাবা কেউ আমাকে বেঁধে রাখতে পারছেন না,—যাবই আমি, যাবই।'

'ফিলিপাইন দ্বীপ? সে আবার কোথায়?'—মিসেস নাগ জিজ্ঞাসা করিলেন।

'ভূগোল জিজ্ঞাসা করে বিব্রত করবেন না', শশাঙ্ক স্থির চোখে কহিল, 'তবে সেটা যাকে বলে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে,—এটা নিশ্চিত।'

'কী সর্বনেশে কথা', সাতঙ্কে মিসেস নাগ কহিলেন, 'কোন্ দুঃখে তুমি চাকরি নিতে ছুটবে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে?'

'আমাকে বাধা দেবেন না'—প্রায় যাত্রা সুরু করিয়া শশাঙ্ক কহিল—'আমি মনস্থির করে ফেলেছি—পালিয়ে যেতে চাই সুদূরে, সুমেরু কুমেরু সাহারা বা গোবিতে।'

'ওসব পাগলামো করো না'—শঙ্কিত হইয়া মিসেস নাগ কহিলেন, 'বেশ তো, পূর্ণিমাকে বিয়ে করতে যদি এতই ইচ্ছে, তার জোগাড় করা যাবে, কিন্তু সেই জন্য কি দেশত্যাগী হবে না কি?

শশাঙ্ক আবার বসিয়া পড়িল। এবং আবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরামর্শের পর স্থির হইল যে আজ সন্ধ্যায় চা খাইবার জন্য মিসেস নাগ পূর্ণিমাকে নিমন্ত্রণ করিবেন,—অবশ্য সঙ্ঘের কাজের অজুহাত দিয়া এবং চা পানের পূর্ব্বে পূর্ণিমাকে তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন যে, শশাঙ্কের জীবনের এমন একটা শোচনীয় পরিণতি যেন না ঘটে, এজন্য পূর্ণিমার প্রয়োজন হইলে কিছুটা আত্মত্যাগ করা দরকার। চায়ের সময় শশাঙ্ক উপস্থিত থাকিবে, এবং উত্তম দার্জ্জিলিং চা পান করিবার পর নিজেও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে। তাতে ফল লাভ যদি কিছু না হয়, তবে রইল ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

দশ

একজন মেয়ের পক্ষে অসন্তুষ্ট মুখে ড্রেসিং টেবিলের সমুখে বসিয়া থাকা স্বাভাবিক নয়, কেন না নিজের চেহারা সম্বন্ধে ধারণা তাতে খারাপ হয়, কিন্তু ঐরকম করিয়া বসিয়া থাকিবার কারণ পূর্ণিমার ছিল।

একে তো নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে তাকে মিসেস নাগের বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছে, সঙ্ঘের বিশেষ প্রয়োজনের কথা উল্লেখ না থাকিলে তার আমন্ত্রণ পূর্ণিমা কিছুতেই গ্রহণ করিত না। তার উপর মা এইমাত্র আসিয়া অত্যন্ত সব অপ্রীতিকর কথা বলিয়া গেলেন।

মায়ের অভিপ্রায় মিসেস গুপ্তের ছেলের সঙ্গে পূর্ণিমার বিবাহের তিনি প্রস্তাব করেন। মিসেস গুপ্তের ছেলে অর্থে শশাঙ্ক। পূর্ণিমার জানিতে বাকি নাই যে শশাঙ্ক সমাজের বহু মা এবং তাদের মেয়েদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার গৌরীশৃঙ্গ, কিন্তু সাধারণ প্রজাপতিদের চাইতে সে যে উচ্চশ্রেণীর অন্ততঃ সেইটা প্রমাণ করিবার জন্যই সে চিরকাল এই গৌরীশৃঙ্গের প্রতি গভীর ঔদাসীন্য দেখাইয়া আসিয়াছে।

তারপর যখন শশাঙ্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল তখন তার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণিমা ভয় করিতে সুরু করে। স্ত্রী-সঙ্ঘের সেক্রেটারি পূর্ণিমা, নারী-স্বাধীনতা ও নারী-প্রগতি প্রচার করিয়া বেড়ায়। শশাঙ্ক নির্ব্বিচারে দ্বিধাহীন ব্যঙ্গ করে স্ত্রী আন্দোলনকে, তার ব্যক্তিত্বের তরবারি দিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার এমন তীব্র উপাসিকাকে পর্য্যন্ত জয় করিবার উপক্রম করে।

নিজের দুর্ব্বলতা টের পাইবার পর হইতেই পূর্ণিমা শশাঙ্ককে বিশেষ অবজ্ঞা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। নিজের দৌর্ব্বল্য ঢাকিবার এটা চমৎকার কৌশল সন্দেহ নাই, কিন্তু শশাঙ্কের কিছু মাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই এই চেষ্টাকৃত অবহেলায়,... অবলীলাক্রমে একই সময়ে সে স্ত্রী-সঙ্ঘকে ব্যঙ্গ ও পূর্ণিমাকে যাচ্ঞা করিয়া আসিতেছে। হতাশায় ও পরাজয়ে পূর্ণিমা আরও ক্ষেপিয়া উঠিল।

কাজেই এমন একটা সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রস্তাব লইয়া আসিয়াও পূর্ণিমার মা মেয়ের নিকট তিরস্কৃতা হইয়া গেলেন। মেয়েদের বেশি লেখা পড়া শিখানো যে ঠিক নয়, এতদিন পরে আজ সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন।

এলো খোঁপা করিয়া বাঁধা হইল পূর্ণিমার কুঞ্চিত চুল, পরা হইল সবুজ চীনাংশুকের পূর্ণ-হাত ব্লাউস, ক্রিম্-ঘষা মুখে পাউডারের তুলিটা সামান্য বুলাইয়া লইল, শাড়ির আঁচলে গুঁজিয়া দিল কট্‌কি কাজ করা মস্ত রূপার একটা ব্রোচ্।

সমালোচকের বিচারে পূর্ণিমা সুন্দরীর কোঠায় পড়ে না। তার সাজ সজ্জা প্রচুরও নয়, আড়ম্বরপূর্ণও নয়, কিন্তু যে সহজ সাবলীলতা ও যে অনিচ্ছাকৃত লীলা তার প্রকৃতিলব্ধ সম্পত্তি, তাতে সাধারণ মেয়ে পূর্ণিমাকে অসামান্যতা দান করে, রমণীয় করিয়া তোলে। আজ সামান্য প্রসাধনেও সেই রমণীয়তা পূর্ণিমার খুলিয়া গেল। সন্দেহ রহিল না যে সে সুন্দরী।

দোতলার বারান্দায় যেখানটায় গোলাপ লতাটা নিচ হইতে সর্পিল ভঙ্গিতে উঠিয়া আসিয়াছে, সেখানটায়ই মিসেস নাগ চায়ের জায়গা করিতে বলিয়াছেন। বংশীলোচন সারা দুপুর চেষ্টা করিয়া গোটা চারেক চেয়ার, একটা টেবিল ও একটা ফুল-গাছ সেখানে চালান দিতে সমর্থ হইয়াছে। আজকাল তার রান্না সম্বন্ধে ভাবিতে হয় না। বিয়ে সুস্থির হইয়া যাওয়ার পর হইতেই মিসেস নাগ একজন বাবুর্চ্চি রাখিয়াছেন।

চা এখনো দেওয়া হয় নাই। মিসেস নাগ খুব নিচু স্বরে পূর্ণিমার কাছে শশাঙ্কের হইয়া ওকালতি করিতেছেন। বেশ একটু বাতাস আসিতেছে, দুলিতেছে গোলাপ লতাটা আর খোঁপা হইতে মুক্তি পাওয়া পূর্ণিমার কয়েকটা চুল, এবং দ্রুত-তর হইতেছে মিসেস নাগের জিহ্বা।

'এমন ছেলেকে কেউ বিরাগী করে দেয় ?' মিসেস নাগ কহিলেন,'এর জন্য যে যুগ যুগ ধরে তপস্যা করতে হয় পূর্ণিমা। কি ক্ষ্যাপার মতন চেহারা হয়ে উঠেচে শশাঙ্কের তা কি দেখ্‌তে পাওনা তুমি ?'

'আমি তার কি করবো ?,' পূর্ণিমা প্রতিবাদ করিল, 'আমার জন্য কাউকে আমি ক্ষ্যাপা হতে বলিনি। কেউ যদি তা হয়, দায় কি আমার ?'

'দয়াও কি তোমার হয় না পূর্ণিমা !' মিসেস নাগ আবেদন করিলেন, 'এমন একটা চমৎকার জীবন তোমার অবহেলাতেই ঝরে পড়ে যাবে, তোমার অবজ্ঞাতে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে, ...করুণা কি হয় না ?'

'জগতে সকলকার দুঃখ ঘোচাবার ভার আমার নয়'.. পূর্ণিমা চেষ্টা করিয়া কহিল।

'শশাঙ্ক কি সকলকার সমান ?' মিসেস নাগ বুঝাইলেন, 'তা ছাড়া বিয়ে না করে চিরকাল তো তুমিও থাকতে পারবেনা...বিবাহ স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, তবে শশাঙ্ককেই করবে না কেন ?'

'জগতে এমন মেয়েও আছে, কোনও দিন যারা বিয়ে করেনি।'

'সুযোগ পায়নি তারা' শুষ্ক করিয়া মিসেস নাগ কহিলেন, 'কিম্বা যদি সুযোগ পেয়েও থাকে হারিয়ে অনুতাপ করে মরেচে।'

পূর্ণিমা গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। মিসেস নাগের ফিলজফি যে তার নয়, সেটা কড়া করিয়া শুনাইয়া দিবার একবার বড় প্রলোভন হইল, কিন্তু চেষ্টা করিয়া সে চাপিয়া গেল।

মিসেস নাগ এই মৌনের কোনও বিশ্লেষণ করিলেন না, অনর্গল উৎসাহের সঙ্গে পূর্ণিমাকে সদুপদেশ দান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এ-কথাও পূর্ণিমাকে জানান হইল যে শশাঙ্ককে বিবাহ করিলে সঙ্ঘের আর্থিক অবস্থারও কিছু উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। 'রায়বাহাদুরকে বিয়ে করবার আমার এও একটা কারণ'...মিসেস নাগ মন্তব্য করিলেন। কিন্তু যেমন ছিল, পূর্ণিমা তেমনি চুপ করিয়া রহিল।

সময়কে ন্যায্য সুযোগ দিবার জন্য অবশেষে মিসেস নাগ চুপ করিলেন। আদেশ হইল চা পরিবেষণ করিবার, শশাঙ্ক এখনো কেন আত্মপ্রকাশ করিতেছে না, বিস্মিত হইয়া ইতস্তত তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময় আকাশ হইতে শশাঙ্ক ঠিক চায়ের টেবিলের কাছটায় পড়িল। চমকাইয়া শিহরিয়া উঠিল পূর্ণিমা, বিস্ময় দুই চোখে টানিয়া আনিলেন মিসেস নাগ।

'অসময়ে এলাম কি, মিসেস নাগ ?' শশাঙ্ক প্রশ্ন করিল।

'না না, মোটেই নয়,' মিসেস নাগ কহিয়া উঠিলেন, 'বসো, বসো তুমি এই চেয়ারটায়, চা খাবে এসো।'

'ধন্যবাদ', বসিতে বসিতে শশাঙ্ক কহিল, 'ভালো আছ তো, পূর্ণিমা ?'

'ভালো', সংক্ষেপে পূর্ণিমা জবাব দিল।

শশাঙ্কের বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল, 'বেশ একটু মুটিয়েচ, ...ভাল বুঝতেই পেরেছিলাম, তবু মামুলি জিজ্ঞাসা করতে হয়',...কিন্তু শঙ্কিত হইয়া প্রবৃত্তিটাকে সে দমন করিল। বেফাঁস কথা সজ্ঞানে আজ সে বলিবেনা, তাহা ঠিক করিয়া আসিয়াছে।

চা-পান প্রায় নিঃশব্দেই সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যা হইয়াছে,... পক্ষটা পূর্ণিমার দিকের ছিল, ফিকা জ্যোৎস্নায় সামনের লনটা ভরিয়া উঠিল এবং বারান্দার কোথাও কোথাও ভাঙা-টকরা আলো আসিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

গোলাপ লতাটা দেওয়ালের গায়ে বড় চমৎকার দেখায়।

কালটা যখন এমনি উপযুক্ত এবং আবেষ্টন যখন এমন মধুর তখন মিসেস নাগের উঠিয়া স্থানান্তরে যাইবার সুযোগের অভাব হইল না।

পূর্ণিমা সামান্য দ্বিধা করিল। কিন্তু উঠিয়া গেল না। এই সুদূরের যাত্রীর উপর অকরুণতা দেখাইয়া চলিয়া যাইবার মত রূঢ়তা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইল না, সামান্য একটু দয়া হইল। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া সেও কোনও কথা বলিল না, শশাঙ্কও নয়।

'শুনেছ বোধ হয় পূর্ণিমা,' পূর্ণিমার প্রথমে নীরবতাভঞ্জন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া শশাঙ্ক কহিল, 'ফিলিপাইন দ্বীপে আমি চলে যাচ্ছি কলেজে একটা চাকরী নিয়ে। হয়তো আর কোনও দিন দেখা হবে না।'

শশাঙ্ককে পূর্ণিমা চিরকাল পরিহাস করিতে শুনিয়াছে, ব্যঙ্গের সুরে সে সর্ব্বদা কথা বলে, এই সে জানে। কিন্তু এমন একটা করুণ এবং আন্তরিকতার স্বরে শশাঙ্ক কথা বলিল যে পূর্ণিমা চমকাইয়া উঠিল।

'অত দূরে কেন যাচ্ছো,'—নিজের অজ্ঞাতে পূর্ণিমার মুখ দিয়া প্রশ্ন বাহির হইয়া গেল।

'কেন যাচ্ছি,' গম্ভীর ভাবেই শশাঙ্ক কহিল, 'ভেবেছিলাম তা তুমি বুঝতে পারবে, অথচ তুমিও সন্দেহ করলে না,—হ্যাঁচ্চো,...বড় সর্দ্দি করেচে, আমার কাছে বাংলা দেশও যা সুমেরু কুমেরু, সাহারা গোবিও তাই '

পূর্ণিমা চুপ করিয়া রহিল।

'যে জিনিষ মানুষকে ঘরে বাঁধে,' পূর্ণিমার দিকে একবার আড়চোখে তাকাইয়া শশাঙ্ক কহিল, 'তাই আমাকে ঠেলে ঘর ছাড়া করে দিল। আমাকে প্রত্যাখ্যান করে' তুমি কী করছ পূর্ণিমা জান না, আমাকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিচ্ছ।'

'আমি?'···পূর্ণিমা করুণ ভাবে কহিয়া উঠিল।

'হ্যাঁ, তুমি,' শশাঙ্ক পূর্ণিমার দিকে আর একবার তাকাইয়া দেখিয়া চোখ বুজিয়া কহিল, 'দূর দেশে বন্ধুহীন পরবাসে রোগে ভুগে হয়তো মরে' যাব, দেখবার, মুখে জল দেবার কেউ থাকবেনা...উঃ বড্ড মশাতো এখানটায়, কলকাতার মশায়-ই এতো কষ্ট হয়, অথচ শুনেছি, ফিলিপাইনে বাজ পাখীর মতন নাকি এক একটা মশা, সত্যি কিনা ঠিক জানি না। কিন্তু যদি সত্যি হয়, পূর্ণিমা? মরতে আমার বড় ভয় ছিল পূর্ণিমা, কিন্তু মরীয়ার মত নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে কেন চলেছি, তা কি তুমি বুঝতে পারো না, স্ত্রী-সঙ্ঘ তোমাকে এতটা হৃদয়হীন করেছে?'

পূর্ণিমা স্থাণুর মত বসিয়া রহিল,...হাঁ বলিল না, না বলিল না,···শুধু বারম্বার তার ঠোঁট দুইটা কাঁপিতে লাগিল।

'তোমাকে পাওয়া,' চোখ খুলিয়া একটু তাকাইয়া দেখিয়া ও তৎক্ষণাৎ বুজাইয়া ফেলিয়া শশাঙ্ক কহিয়া গেল, 'জীবনের সব চেয়ে বড় অভিলাষ ছিল, কিন্তু চাঁদকে তো ধরা গেল না, আমার প্রেমের বদলে পেলুম, প্রত্যাখ্যান, ঘৃণা, সজোর পদাঘাত। সাত সমুদ্রের পারে অজানা দেশে, অনিশ্চিত অন্ধকারে, নিশ্চিত মৃত্যুর আলিঙ্গনের মধ্যে তাই ছুটে চলেছি, পূর্ণিমা।'

'একটী মেয়ের জন্য', দুরন্ত ক্রন্দনাবেগ ঠেলিয়া দিয়া পূর্ণিমা কহিয়া উঠিল, 'জীবনটাকে তুমি নষ্ট করে ফেলবে? নারীকে তো তুমি চিরকাল কৃপার পাত্র জ্ঞান করে এসেছ।'

'ভুল করেছিলাম,' শশাঙ্ক স্বীকার করিল, 'শোচনীয় একটা ভুল করেছিলাম,...চলেছি চলেছি তার প্রায়শ্চিত্তে। 'কী বিষম তার প্রায়শ্চিত্ত!'

'আমাকে যদি এতই প্রয়োজন মনে করো,' তীব্রভাবাবেগে কাঁদিয়া পূর্ণিমা কহিয়া উঠিল, 'নাও তবে আমাকে।'

'ব্রে ভো, ব্রে ভো' বলিয়া চীৎকার করিয়া শশাঙ্ক লাফাইয়া উঠিল। সসার শুদ্ধ একটা চায়ের কাপ ফেলিয়া দিল জোরে, ছুঁড়িয়া দিল চেয়ারটাকে, চীৎকার করিয়া ডাকিল মিসেস নাগকে।

'কী ব্যাপার?—' মিসেস নাগ দরজার আড়াল হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন।

'দুর্গ অধিকৃত' শশাঙ্ক বিজয়ী বীরের মতন করিয়া কহিল 'ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যেতে আর হলো না,—আমার অভাবে সেখানকার কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এতে আমার সন্দেহ নাই—কিন্তু পূর্ণিমা আমাকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছে।''

মিসেস নাগ পূর্ণিমার দিকে স্মিত হাসিতেই পূর্ণিমা কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিল,—শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি কহিল যে একবার কথা দিয়া পূর্ণিমা যদি তাহা প্রত্যাহার করে তবে মহাপ্রাচ্যের নারীর সম্মান গুরুতর রকম জখম হইবে। পূর্ণিমা নির্জ্জীবের মত চেয়ারে এলাইয়া পড়িল।

'কী রকম অসম্ভব কাণ্ড একটা সাধন করে নিলুম', শশাঙ্ক মিসেস নাগকে কহিল, 'প্রায় নিজের পিঠটাই চাপড়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'বেশ সুখী হলুম শুনে,' মিসেস নাগ মন্তব্য করিলেন, 'তোমাদের দুজনে মানাবে চমৎকার।'

'তাতে আর সন্দেহ নাই,' শশাঙ্ক স্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল, 'হাত যেমন দস্তানায় ঢাকা পড়ে, তেমনি করে বিবাহিত পুরুষ নারীর প্রকোপে লুপ্ত হয়ে যায়।'

এমন সময় সিঁড়িতে একটা পদধ্বনির পর মিসেস গুপ্ত দেখা দিলেন।

'আরেঃ · মা যে।' আতঙ্কে শশাঙ্ক কহিল।

'ঈস্ আমার কি সৌভাগ্য,' অভ্যর্থনা করিয়া মিসেস নাগ কহিলেন, 'আসুন মিসেস গুপ্ত। আপনার তো আমরা এক উপকার করে দিলুম,···শশাঙ্কের আর ফিলিপাইন যেতে হলে না।'

'ফিলিপাইন? সে কোথায়!'···বিস্মিত মিসেস গুপ্ত প্রশ্ন করিলেন।

শশাঙ্ক উঠিবার একবার চেষ্টা করিয়া চায়ের টেবিল কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া বসিয়া পড়িতে বাধ্য হইল। একটু আগে চায়ের যে পেয়ালাটা নীচে ফেলিয়া ভাঙিয়া ছিল, তার টুকরাগুলি কুড়াইতে লাগিল।

'বলেন কি?'...সমান বিস্ময়ে মিসেস নাগ কহিলেন, 'আপনি জানতেন না না কি? শশাঙ্ক না কি ফিলিপাইন দ্বীপের এক কলেজে প্রফেসারি নিয়ে যাচ্ছিল, শনিবার দিন?'

'পাগল!', মিসেস গুপ্ত স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন, 'ফিলি-পাইনে ওকে আমি যেতেই বা দেব কেন? শনিবার শশাঙ্ক আমার সঙ্গে চেপ্তে যাচ্ছে দার্জ্জিলিঙে।'

'ব্যাপার কি শশাঙ্ক?'...যারপর নাই বিস্মিত হইয়া মিসেস নাগ প্রশ্ন করিলেন শশাঙ্ককে।

'ও কথা আর তুলবেন না, মিসেস নাগ', শশাঙ্ক সবিনয়ে জানাইল, 'ফিলিপাইন যাত্রার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি।'

ইতিমধ্যে পূর্ণিমার সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে আর বাকি নাই। নিরুপায় হইয়া সে ভাবিতে লাগিল এবারও শশাঙ্ক তার উপর জয়ী হইয়াছে। কিন্তু নিরুপায় হতাশার জন্যই হোক্ বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক পরাজয়টা অসহ্য মনে হইল না।

এই ছলনার সপক্ষে শশাঙ্ক পরে এই যুক্তি দেখাইয়াছিল যে যুদ্ধে নীতির স্থান নাই।

এমন সময় সিঁড়িতে পুনর্ব্বার পদশব্দ হইল, এবং সামান্য পরে লক্ষ্য করা গেল একটা টাকের অগ্রভাগ। কিন্তু অমনি টাক মিলাইয়া গেল, এবং পুনরায় নিচের দিকে নামিয়া যাওয়ার পদশব্দ উঠিল।

'রায় বাহাদুর না?'...শশাঙ্ক কহিয়া উঠিল, 'কিন্তু হঠাৎ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন মনে হচ্চে।'

'বোধ হয়',...মিসেস নাগ তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইয়া ডাকিবার ইচ্ছা দমন করিয়া কহিলেন।

'নিশ্চয়ই আমাদের দেখে লজ্জা পেয়েছেন', শশাঙ্ক উদারতার সঙ্গে কহিল, 'চল পূর্ণিমা, আমরা এখন সরে পড়ি, নইলে রায় বাহাদুরের ওপর অত্যন্ত নির্দ্দয়তা করা হবে। এ বাড়িতে আসার অধিকার ওঁরই তো সবার চাইতে বেশি।'

'তোমরা উঠবে কেন,' মিসেস নাগ দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিলেন, 'আমিই ওঁকে ডেকে নিয়ে আসচি।'

'একটু শীগগির মিসেস নাগ,' শশাঙ্ক কহিল, 'রায় বাহাদুর আবার পালিয়ে না যান। মোটরটা আবার ষ্টার্ট দিল নাকি,...শব্দ শুনচি যেন। শীগগীর, পালিয়ে যান না যেন, আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।'

মিসেস নাগ সজোরে ধাবিত হইলেন এবং শশাঙ্ক গেল পিছনে পিছনে।

'এই বুড়ো বয়সে', মিসেস গুপ্ত পূর্ণিমাকে কহিলেন, 'মিসেস নাগের কাণ্ড দেখেছ? তাইতেই তো বলি, সঙ্ঘের কাজে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বড়। আর সত্যি বলতে কি, ঐ বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাবটা আমি সহ্য করতে পারিনে, ওটাকে তোমরা উঠিয়ে দিতে পারো না, পূর্ণিমা?'

'ব্যক্তিগত-ভাবে,' পূর্ণিমা কহিল, 'আমিও ওটা পছন্দ করি না।'

'সত্যি বলচো?' অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া সহর্ষে মিসেস গুপ্ত কহিলেন, 'শুনে বড় আনন্দিত হলাম, বড় সুখ হ'লো। বড় ভালো লাগে মা তোমাকে আমার, শুধু মাত্র এই বিদ্‌-ঘুটে খেরেস্তানী মতগুলোর জন্য ভয় ছিল বড়। তোমার সত্যিকারের মত শুনে বড় আশ্বস্ত হলুম। চল, আমরা এবার উঠে পড়ি, মুখে কিছু নাই বলুন মিসেস নাগ এবার আমাদের ওঠাই চান্।'

পূর্ণিমা বিবাহ বিচ্ছেদের একজন প্রবল সমর্থক ছিল, কিন্তু বর স্থির হইবার পরই অকস্মাৎ একাগ্র একনিষ্ঠতা তাকে পাইয়া বসিল, অনায়াসে সে মিসেস গুপ্তের মতে সায় দিতে পারিল, মতের কোনও অসামঞ্জস্য বোধ করিল না। এটা মেয়েদের বিশেষত্ব...যাকে স্ত্রী-সুলভ বলা হয়। দুজনে নামিয়া গেল নিচে। ইতিমধ্যে শশাঙ্ক ও মিসেস নাগ রায় বাহাদুর গণেশবাহনকে ধরিতে সমর্থ হইয়াছে। লাজুক ছেলেটির মতন দুজনের মধ্যে তিনি সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সিঁড়ির মুখে পূর্ণিমা ও মিসেস গুপ্তের সঙ্গে দেখা হইল এবং মামুলি সম্ভাষণের পরেই মিসেস গুপ্ত তাড়াতাড়ি বিদায় লইলেন।

পূর্ণিমাকে লইয়া মিসেস গুপ্ত অগ্রসর হইলেন মোটরের দিকে। এবং ছাড়া পাইয়াই রায় বাহাদুর গণেশবাহন উপরে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। শশাঙ্ককে তিনি আন্তরিক ভাবে এড়াইতে চেষ্টা করেন।

'ধন্যবাদ মিসেস নাগ,' শশাঙ্ক সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া মিসেস নাগকে কহিল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'আমি আর কি করলুম', হাসিয়া মিসেস নাগ কহিলেন, তুমি নিজেই সব তো করেছ।'

'বারান্দাটা ধার দিয়েছিলেন তো,—জ্যোৎস্না মাখা বারান্দাটা',—কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শশাঙ্ক কহিল, 'স্থান মাহাত্ম্যও আছে বৈকি। কিন্তু বাকি সব বেশ সহজেই হয়েছে। একটু চাটুবাদ করেছি, একটু করুণ রসের অবতারণা করেছি, আর অমনি এতদিন যা সহজ বুদ্ধিতে হয়নি, তাই সুসম্পন্ন হয়ে গেল। এটা নারী প্রকৃতি,—সব দুর্ব্বল লোকই চাটুবাদ পছন্দ করে। যান্ আর দেরি করবেন না,—রায়বাহাদুর অনেকক্ষণ একা বসে আছেন, বিশেষ ওরা যদি মোটরটা ছেড়ে দেয়, তবে এতটা রাস্তা আমাকে হেঁটে যেতে হবে।'

শশাঙ্ক ছুটিল মোটরের পিছনে এবং মিসেস নাগ দোতলায়। মিসেস নাগ সহজেই উপরে পৌঁছাইয়া গেলেন, কিন্তু ব্যর্থচেষ্ট শশাঙ্ক সুপ্রসন্ন ভাগ্যকে গালাগালি দিতে দিতে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। সহসা আজিকার যুদ্ধজয়ের কথাটা মনে পড়িয়া গেল,—সুরু হইল মার্চ্চ, সম্পূর্ণ মিলিটারি কায়দায়। লেফ্‌ট্ রাইট্, লেফ্‌ট্ রাইট্।

'হায় বেচারী পূর্ণিমা',—শশাঙ্ক সহানুভূতির সঙ্গে কহিল।

কার্ত্তিক মাসে মিসেস নাগের ও অগ্রহায়ণ মাসে পূর্ণিমার বিবাহ হওয়ায় পৌষ মাসের বড়দিনের ছুটিতে মহাপ্রাচ্য স্ত্রী-সঙ্ঘের মহাধিবেশন করা সেইবার আর সম্ভবপর হইল না। তবে ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা রহিল।

(সমাপ্ত)

শ্রীসুবোধ বসু

গান

শ্রীমমতা মিত্র

আজ কী আবেশ ঘনায় তোমার
বিভোল দু'চোখে ?
চিত্ত-তলে রক্ত-ধারা
উতল পুলকে।
আজিকে কোন্ উৎসবেতে
সাজ্‌লি মাল্যায় চন্দনেতে,
কুসুম শোভে কাজল-কালো
শিথিল অলকে।
তরুণ বুকে কিশোরী প্রেম
ফির্‌ত গুঞ্জরি,
আজ্‌কে সে কা'র পরশ আশায়
উঠ্‌ল মুঞ্জরি'।
যে ছিল তোর গোপন-ধ্যানে
তারেই বধূ পাবি প্রাণে,—
সলাজ নয়ন তুলিয়া দেখ
অতিথ এল কে।

———

তামিল জাতির উৎপত্তি ও প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্‌-এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন

৩১। তামিল শিল্প ও কলা। (১)

প্রাচীন কালে তামিল দেশে যথেষ্ট শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চা ছিল। সঙ্গীত উচ্চ শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই কারণে সঙ্গীতের বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল। নৃত্য উচ্চকলার মধ্যে পরিগণিত ছিল। 'কুববাই' নৃত্যে ৮।১০ জন লোক গোল হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইত এবং পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা উভয়েই যোগ দিত।

অভিনেত্রীদের শিক্ষা পাঁচ বৎসর বয়সেই আরম্ভ হইত। নাটকের মধ্যে কতকগুলি দেবতাদের ও রাজাদের প্রশংসা-সূচক, কতকগুলি উপহাসাত্মক, কতকগুলি জীবজন্তুর অনুকরণাত্মক এবং কতকগুলি প্রণয়মূলক।

চিত্র বিদ্যা ও ভাস্কর্য্যেও প্রাচীন তামিলেরা অনেক উন্নতি করিয়াছিল। দেবতাদের, মনুষ্যের ও জীবজন্তুদের চিত্র সাধারণ গৃহস্থদের বাটীর দেওয়ালে চিত্রিত হইত। কাষ্ঠের দ্বারা নানারূপ সুন্দর সুন্দর খেলনা তৈয়ার হইত। মঠে ও মন্দিরে নানাস্থানে চুণ ইত্যাদি মসলা জমাইয়া দেবতাদের মূর্ত্তি গঠিত হইত। এই কার্য্যে ধাতু বা প্রস্তর ব্যবহৃত হইত না। এই কারণে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বের কোনো ভাস্কর্য্য তামিল দেশে বিদ্যমান নাই।

৩২। তামিল গৃহ। (২)

দরিদ্র ব্যক্তিদের গৃহ মাটীর দেওয়ালের উপর চাল দিয়া নির্ম্মিত হইত। নগরের গৃহগুলির দেওয়াল ইষ্টকদ্বারা এবং ছাদ টালি দ্বারা নির্ম্মিত হইত। দেওয়ালে চুণ বালির আস্তরণ দেওয়া হইত এবং তাহাতে গোলাকার গবাক্ষ থাকিত। সদর দরজা, বাটীতে সংলগ্ন না হইয়া, আবেষ্টনকারী প্রাচীরের একাংশে বৃহৎ ও আড়ম্বরযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত হইত। নগর ও বড়বড় গ্রামগুলি শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাচীর দিয়া ঘেরা থাকিত। মাদুরা, করুর ও কাঞ্চীর দুর্গের প্রাচীরের উপরিস্থ সছিদ্র প্রাকারের ছিদ্র-মুখে নানা প্রকারের যন্ত্র রক্ষিত হইত, এবং তদ্দ্বারা আক্রমণকারীদের উপর প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইত।

তামিল সৈনিক রমণীর বীর হৃদয়।

সৈনিকেরা রাজার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। সৈনিক রমণীরা পর্য্যন্ত বীর-হৃদয়ের পরিচয় দিত। এক চারণ কোনো বীর প্রৌঢ়ার উল্লেখ করিয়া বলিতেছে—গত পরশ্ব তাহার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে একটী হস্তীকে খণ্ডিত করিবার পর শত্রুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ধরাশায়ী হয়, কাল তাহার স্বামী একটী বিপক্ষ হস্তী সেনাদল ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার পর হত হইয়াছে। তথাপি আজ প্রাতে রণবাদ্য শুনিবামাত্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে তাহার একমাত্র পুত্রকে শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত করিয়া, চুল আঁচড়াইয়া দিয়া এবং তাহার হস্তে একটী ভল্ল দিয়া তাহাকে রণক্ষেত্রে যাইতে আদেশ করিল।

আর একজন গাথা-রচয়িতা বলিতেছে—অপর একটী যোদ্ধৃবংশীয়া বৃদ্ধার কথা শুন। সেই শীর্ণদেহা কম্পান্বিত-হৃদয়া বৃদ্ধা যখন শুনিল যে তাহার পুত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ক হইয়াছে, তখনই শপথ করিল যে যদি সত্য-সত্যই সে শত্রুগণকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহা হইলে যে স্তনদ্বয় তাহার পুত্র পান করিয়াছে তাহা সে ছেদন করিয়া ফেলিবে। এই বলিয়া সে হস্তে একখানি তরবারি গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রণক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইল এবং এখানে সেখানে খুঁজিয়া যখন সে এক মৃতদেহের স্তূপে তাহার পুত্রের

(১) V. Kanak sabhai.

(২) V. Kanak sabhai.

ক্ষতবিক্ষত শরীর দেখিতে পাইল, তখন উহার জন্ম সময়ে যত আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক আনন্দ প্রকাশ করিল। (১)

তামিল যোদ্ধৃগণের ধর্ম্ম বিশ্বাস। (২)

যোদ্ধগণের এই ধারণা ছিল যে যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয়। অতএব তাহারা প্রাণ দিতে পারিত। স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু আসন্ন দেখিলে রাজারা ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহাদের দেহ ঘাসের উপর শায়িত করাইয়া ঘাতককে তাহা ছেদন করিতে আদেশ দিত, এই বিশ্বাসে যে যোদ্ধার ন্যায় তাহাদের মৃত্যু হইল।

৩৩। মাদুরার একটী প্রাচীন চিত্র। (৩)

প্রাচীন তামিল কবিদের কাব্য পাঠ করিলে, মাদুরার একটী জলন্ত ছবি মানস নেত্রে উদিত হয়—

উষার অনেক পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্গীতানুশীলনকারীরা স্ব স্ব যন্ত্রে সুর বাঁধিয়া স্বর সাধন করিতেছে। পিষ্টক প্রস্তুতকারীরা তাহাদের পণ্যশালা সম্মার্জ্জনে ব্যস্ত হইয়াছে। তাড়ী বিক্রেতারা তাহাদের পানশালার দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছে। বৈতালিকেরা পথে পথে বিচরণ করিয়া মাঙ্গলিক স্তোত্র শুনাইতেছে। দেবালয়ের, মঠের ও রাজপ্রাসাদের শঙ্খ-ধ্বনিতে ও দুন্দুভি-নিনাদে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে। কিছু পরেই বাল-সূর্য্য-কিরণচ্ছটায় দুর্গশিখর স্বর্ণাভ হইয়া গেল এবং নগরায়তন লোকলোচনে উদ্ঘাটিত হইল। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে নদীর অনুরূপ প্রধান প্রধান নগর-সরণীর উভয় পার্শ্বস্থ বহু বাতায়নযুক্ত দ্বিতল ত্রিতল উচ্চ ভবনগুলিতে ও প্রত্যেক দেব মন্দিরে পতাকা উড়িতেছে। প্রত্যেক শৌণ্ডি-কালয়ের উপর ভাসমান তরীর প্রতিকৃতি আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর পণ্যশালার উপর বিশেষ বিশেষ পতাকা উড়িতেছে। প্রত্যেক বিজয়ান্তে রাজসৈন্য দলে এত অধিক সংখ্যায় উজ্জ্বল বর্ণের পতাকা-শ্রেণী প্রসারিত হইত যেন নগর কোনো উৎসবের জন্য সজ্জীকৃত হইয়াছে। বিজয়ান্তে অশ্ব, হস্তী এবং শত্রুদুর্গের কারুকার্য্যমণ্ডিত বিশাল তোরণদ্বার ইত্যাদি লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার লইয়া রাজসৈন্য শোভাযাত্রা করিয়া নগরে প্রবেশ করিত। প্রজ্বলিত শত্রু গৃহ সমূহ হইতে উত্থিত অগ্নিশিখার আলোক সাহায্যে ভল্ল দ্বারা তাড়িত মেষের পাল সম্মুখে করিয়া সেনাদল নগরে ফিরিত। সামন্ত রাজারা, স্ব স্ব উপঢৌকনের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া পাণ্ড্য রাজাকে তাহা উপহার দিত।

পুষ্প বিক্রেতা পরবর্ত্তীকালে অগ্রথিত পুষ্প ডালায় সাজাইয়া এক বাহুতে পুষ্পমাল্য ঝুলাইয়া; এবং সুগন্ধ দ্রব্য চূর্ণ ও পান সুপারি বিক্রেতারা পথে পথে ঐ সকল দ্রব্য ফেরি করিয়া বেড়াইতেছে অথবা কোন সৌধছায়ায় বসিয়া গ্রাহক আহ্বান করিতেছে। ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রৌঢ় রমণীরা সুস্বাদু ফল ও খাবার এবং সুগন্ধি পুষ্প লইয়া দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া ক্রেতার অনুসন্ধান করিতেছে। সম্পন্ন ব্যক্তিরা অশ্বোড় রথে বা ললিতগতি তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেছে। পদব্রজে গমনকারীরা, ফেরী ওয়ালারা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা মত্ত হস্তীর আগমন সংবাদে প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া দ্রুত বেগে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। মাতাল, সিপাহিরা পথ দিয়া গমন কালে চীৎকার দ্বারা পথের ও পল্লীর শান্তি ভঙ্গ করিতেছে। সন্ধ্যার শীতলতায় অভিজাতগণ রথারূঢ় হইয়া বায়ু সেবনে বহির্গত হইতেছেন। তাঁহাদের রমণীরা রুনু ঝুনু নিনাদী মল পরিয়া প্রাসাদ-পৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে, এবং শরীরের সুগন্ধে নিকটস্থ বায়ুমণ্ডল সুরভিত করিতেছে।

কল্পনার চক্ষে দেখুন—নগর মধ্যস্থ এক বিস্তীর্ণ চতুষ্কে যে

(১) রাজস্থানের এক বীর পত্নী বলিয়াছিলেন, "নাইন, আজনসাও পগ, কাল সুনা জে জঙ্গ। ধারা লাগে সো ধনী, তব দীজৈ ঘন রঙ্গ।" হে নাপীতিনী, শুনিতেছি কাল যুদ্ধ হইবে, তাহা হইলে আজ আর আল্‌তা পরাইও না। যখন আমার পতিদেব যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন, এবং তাঁহার শরীর হইতে লাল শোণিত-ধারা ছুটিবে, তখন তুমিও উল্লাসের সহিত খুব লাল আল্‌তা আমার পায়ে পরাইও।

(২) V. Kanak sabhai.

(৩) V. Kanak sabhai

হাট বসিয়াছে তাহাতে নানা প্রকারের পণ্য বিক্রীত হইতেছে——শকট, রথ, অলঙ্কার, বর্ম্ম, লৌহ কোমরবন্ধ, চর্ম্মপাদুকা, চামর, বর্শা, গদা, ঢাল, হস্তীর অঙ্কুশ ; তামা ও পিত্তলের বাসন ; করাত, কুঁদিবার যন্ত্র শ্রম শিল্পের নানা উপকরণ ; সুরভী পুষ্প ও চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য ; মণিকার পটিতে হীরা চুনি, পান্না ইত্যাদি এবং বহুমূল্য রত্ন, মুক্তা ও প্রবাল ; সোনা-পটিতে স্বর্ণ ; বস্ত্র বীথিতে নানা প্রকারের, নানা উপাদানের ও নানা আদর্শের (পাটকরা ও সাজান) তুলার রেশমের ও পশমের বস্ত্র ; বস্তা বস্তা ধান, ছোলা, মটর, তিল, ধনে, গোলমরিচ ইত্যাদি । দালালেরা দাঁড়ি পাল্লা হাতে লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ।

ধর্ম্মাধিকরণে বিচারকেরা রাগ বা বিরক্তি বর্জ্জন করিয়া অবিচলিত চিত্তে বিচার কার্য্য করিতেছেন । মন্ত্রীসভার সদস্যেরা নিবিষ্ট চিত্তে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন [রাজপথে নানাবর্ণের লোক বিচরণ করিতেছে—শঙ্খ বণিক, স্বর্ণকার, তাম্রকার, সীবনকার, তন্তুবায়, গন্ধ বণিক, চিত্রকর, মালাকর ইত্যাদি ।

হোটেলে ও বিশ্রামাগারে গ্রাহকেরা স্বাদু কাঁটাল আম, কলা, নারিকেল, কন্দ, মিষ্ট্রী, পিষ্টক ও সুপাচিত মাংস খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে।

ইতিমধ্যে সঙ্গীতের ও বাদ্যের মধুর ধ্বনি কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিয়া জন সাধারণকে সান্ধ্য উপাসনায় আহ্বান করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা বেশভূষা করিয়া স্ব স্ব পুত্র কন্যা ও স্বামীর সহিত বৌদ্ধ মঠে ধূপ, ধূনা, অগুরু ইত্যাদি লইয়া যাইতেছে । নিগ্রন্থরা তাহাদের সম্প্রদায়ের আচার্য্যের মঠে একত্রিত হইতেছে। অন্যেরা ব্রাহ্মণদের দেবমন্দিরে আসিয়া দেবোদ্দেশে ফল, মূল, পিষ্টক নিবেদন করিতেছে

রাজপ্রাসাদের নানাভাগ নানা রূপে ব্যবহৃত হইত সিংহদ্বারের ঐশ্বর্য্য অপূর্ব্ব। প্রাসাদের একদিকে এক প্রশস্ত বালুকাস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে, চমরী, রাজহংস ইত্যাদি বিচরণ করিতেছে। আর এক অংশে অশ্বশালায় নানা জাতীয় অশ্ব রাজব্যবহারের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে। রাণীর কক্ষ সমূহ নানা সাজে সজ্জিত। কক্ষ ভিত্তিগুলি মার্জ্জিত কাঁচ পিত্তলের কান্তিবিশিষ্ট এবং লতাপাতার চিত্রে শোভিত।

দরবার গৃহে রূপবান, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ পাণ্ড্যরাজা উপবিষ্ট। তাঁহার কটিদেশ পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ড দ্বারা আবদ্ধ, তদুপরি মণিময় কোমরবন্ধ. উপর বাহুতে কারুকার্য্যময় সোনার তাগা। তাঁহার চন্দনলিপ্ত বক্ষোদেশে মণিময় কণ্ঠহার। বলবান রক্ষিদ্বারা তাঁহার শরীর সুরক্ষিত। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অভিনেতৃগণ, গায়কগণ, বৈনবিকগণ স্ব স্ব চাতুর্য্য দেখাইতে ব্যস্ত।

৩৪। তামিল সাহিত্যের বিবরণ।(১)

প্রাচীন কালের অনেক কাব্যগ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ আকারে বিদ্যমান আছে। তাহাদের নাম, রচনা কাল, ও পংক্তি সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রথম খানির বিশেষ বিবরণ এই ভূমিকাতে পরে দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়খানিও কুরলের ন্যায় অতি প্রসিদ্ধ। তাহাদের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। তামিল দেশের সামাজিক ইতিহাস এই দুইখানি গ্রন্থে সবিস্তারে ও স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। এই হিসাবে কুরল অপেক্ষাও ইহাদের মহত্ব অধিক। অপরাপর কাব্যের বিবরণ দেওয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

গ্রন্থের নাম	পংক্তি সংখ্যা	গ্রন্থকার	রচনা কাল
কুরল বা মপ্পাল	২৬৬০	তিরু বল্লু বর	১০০—১৩০
মনি মেগলই	৪৮৫৭	চিত্ত নৈচ্-চাওনর	১১০—১৪০
চিলপ্পদিকরম্	৪৯৫৭	ইলঙ্কো আদিবল	১১০—১৪০
কলিত-তোকই	৪৩০৪	নল্লন্থ্ বনর	
ইন্নই-নারপতু	১৬০	পুপন-চেন্থনর	১১০—১৩০
পেরুক-কুরিঞ্জি	২৬১ }	কবিলর	৯০—১৩০
কুরিঞ্জি-পদ্দই	৪০০ }		
তিরু-মুরু কর্প-পদই	৩১৭ }	নক্কিরর	১০০—১৩০
নেদু-নল্-বদই	১৮৮ }		
পোরুনর্-অর্প-পদই	২৪৮	মুদুত তাসক কন্নিযর	৬০—৯০
পেরুম্-পান-অরূপ-পদই	৫০০ }	উরুত-তিরন্ধ	৪০—৭০
পদ্দিনপ-পালই	৩০১ }	কন্ন নর	
মাদুরৈক-কাঞ্চি	৭৮২	মঙ্গদি-মরুতানর	৯০—১৩০
মলই-পদু-কদাম্	৫৮৩	পেরুঙ্ক কৌশিক নর	১০০—১৩০
পতিরুপ-পত্তু	৬০০		১১০—১৪০
পুর-নানুরু-অকম্-নানুরু করুন্তোকই ও নর্রিনই গ্রন্থে প্রাপ্ত ৩০০ শ্লোক	৪০০০		১০০—১৪০

(১) V. Kanak sabhai

চিলপ্প দিকরম্—যেখানে কাবেরী নদী সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থানে পুকার নামক একটী মহা সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। ঐ নগরে এক ধনী ও বদান্য বণিকের পরমা-সুন্দরী ও অশেষ গুণসম্পন্না কন্নকী নামে একটী কন্যা ছিল। সেই নগরের আর এক ধনী বণিকের কোবিলন নামে কার্ত্তি-কের ন্যায় রূপবান ও নানা গুণে গুণান্বিত এক পুত্র ছিল। কোবিলনের সহিত কন্নকীর বিবাহ হইল। কোবিলনের পিতা এক প্রশস্ত উদ্যান মধ্যস্থ দাসদাসী-পরিবৃত সুসজ্জিত অট্টালিকাতে তাহাদের বাসভবন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন সেই গৃহে উভয়ে অতি আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। দম্পতি পরস্পরের প্রেমে সর্ব্বদা বিহ্বল থাকিত। এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর রাজসভায় মাধবী নামক এক নর্ত্তকীর গান শুনিয়া ও রূপলাবণ্য দেখিয়া কোবিলন মোহিত হইয়া গেল এবং তাহার প্রেমে আবদ্ধ হইল। কোবিলন আর গৃহে যায় না ও স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করে না এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য হারাইয়া বসিল। তাহার সাধ্বী স্ত্রী তাহার সমস্ত অলঙ্কার একে একে খুলিয়া দিল; অবশিষ্ট থাকিল তাহার পায়ের দুগাছি সোনার মল। একদিন মাধবীর একটী গান শুনিয়া কোবি-লনের মনে সন্দেহ হইল যে, সে আর তাহাকে ভালবাসে না। সে মাধবীর গৃহে গমনাগমন বন্ধ করিয়া দিল। ইহার পূর্ব্বেই মাধবীর গর্ভে কোবিলনের একটী কন্যা হইয়াছিল, তাহার নাম মণিমেখলই। একদিন কোবিলন কন্নকীর নিকট তাহার গত দুষ্কর্ম্মের জন্য পরিতাপ করিল এবং বলিল যে সে বিশ্বাসঘাতিনী বেশ্যার কুহকে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এখন তাহার এমন কিছু নাই যাহা দ্বারা তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কন্নকী বলিল, "কেন, এখনও আমার মণিময় সোনার মল আছে। তুমি তাহা লও।" "আমি মাদুরা নগরে গিয়া তোমার সোনার মল বেচিয়া যাহা পাইব তাহাকে মূলধন করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিব এবং নষ্ট সম্পদের পুনরুদ্ধার করিব। তুমিও আমার সঙ্গে যাইবে।"

কন্নকী অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং পরদিন প্রত্যূষে কাহাকেও না বলিয়া তাহারা পদব্রজে মাদুরাভিমুখে যাত্রা করিল। কোমলাঙ্গী কন্নকীর পক্ষে এই পথশ্রম অতি কষ্টকর হইয়াছিল। যাহা হউক কোনো ক্রমে তাহারা মাদুরায় উপস্থিত হইল এবং গোপপল্লীতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিল। একদিন কন্নকীর পায়ের একগাছি মল লইয়া বাজারে বেচিতে গিয়া কোবিলন চোর বলিয়া ধরা পড়িল, কারণ ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে রাণীর ঠিক ঐরূপ একগাছি মল চুরি গিয়াছিল। কোবিলনের বিরুদ্ধে চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাহার শিরচ্ছেদ হইল। কন্নকী এই সংবাদ শুনিয়া ক্ষিপ্তার ন্যায় বাহির হইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার অপর মল গাছটী দেখাইয়া বিচার প্রার্থনা করিল। রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভুল হইয়াছে এবং অনেক পরিতাপ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। কন্নকীর শাপে রাজপুরী অগ্নিসাৎ হইল। কন্নকী শোকে এতই অধীর হইয়াছিল যে ১৪ দিন পরে তাহার মৃত্যু হইল। তাহার মৃত্যুর পর তামিল দেশে সে দেবীর ন্যায় সম্মান পাইয়াছিল এবং তাহার মূর্ত্তি গঠিত হইয়া মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মণিমেগলই—ইহা পাঁচখানি তামিল মহাকাব্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে লিখিত হইয়াছিল। রচনা-নৈপুণ্যে ইহার স্থান অতি উচ্চ এবং ইহার অনেক স্থল অতি সরস। ইহার ভাষা সরল এবং সুললিত। প্রকৃতি বর্ণনায় কবি অতিশয় দক্ষতা দেখাইয়াছেন। চিল-প্পধিকরমে যে নর্ত্তকী কন্যা মণিমেখলইর উল্লেখ হইয়াছে, সেই এই কাব্যের নায়িকা। তাহার চরিত্র অতি নিপুণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নর্ত্তকী কন্যা হইয়াও এবং রূপ লাবণ্য ও যৌবনের অধিকারিণী হইয়াও সে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল। সে দেশের রূপযৌবনসম্পন্ন রাজপুত্র তাহার প্রণয় প্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু সে ব্রতে অটল ছিল। সে রাজপুত্রকে অবজ্ঞা না-দেখাইয়া প্রকৃত রমণীর ন্যায় তাঁহার অন্তরের বেদনা অনুভব করিত এবং তাঁহাকে মাংস চর্ম্মের বিকার হইতে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে এবং পবিত্র ও আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিত। এই কাব্যের শেষের চারি পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার প্রধান প্রধান দর্শন শাস্ত্রের বিবরণ দিয়া তাঁহার অসীম কুশাগ্রীয় বুদ্ধির ও জটিলতায় প্রবেশের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

গ্রন্থ সমাপনান্তে তিনি কেরল রাজা চেঙ্কখুদ্দিরণ ও তাঁহার বিদ্বান্ ভ্রাতা ইলঙ্কো-অদিকলনের অতিথি হইয়াছিলেন। রাজভ্রাতা আদিকলন যৌবনের প্রারম্ভেই সংসার ত্যাগ করিয়া নিগ্রন্থ-সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিলেন এবং নগরের বহির্দ্দেশে বাস করিতেন। বহু বৎসর পরে যখন মণিমেখলই প্রণেতা চীত্ত লেচ্ চাওনার কেরল রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার কাব্যের আবৃত্তি করিয়াছিলেন তখন এই রাজসন্ন্যাসী মণিমেখলইর মাতা পিতার জীবন অবলম্বন করিয়া একখানি মহাকাব্য রচনা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি চিলপ্পথিকরম্ গ্রন্থ রচনা করেন, যাহার বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

৩৫। কুরল।

তিরুবল্লুবর লিখিত তিরুক্কুরল (১) সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় ও বেদের ন্যায় সম্মানিত গ্রন্থ। পরবর্ত্তী বংশ-পরম্পরার উপর ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তিরুবল্লুবরের জীবনী সম্বন্ধে অল্পই জানা গিয়াছে। লোকে বলে যে বল্লুবর শব্দের অর্থ 'বল্লবাজাতিয়'। মাদ্রাজ প্রদেশে বল্লবা জাতি অস্পৃশ্য জাতি সমূহ মধ্যে পরিগণিত।

তিরুবল্লুবরের পরিচয়।

জনশ্রুতি এইরূপ যে বল্লুবরের পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার নাম ছিল ভগবান। তাঁহার মাতার নাম ছিল অভি, এবং তিনি অস্পৃশ্য পৈরিয়া জাতির কন্যা ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ অভিকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং তিনিই ভগবানের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই দম্পতির সাতটি সন্তান হইয়াছিল, চারিটী কন্যা ও তিনটী পুত্র। তন্মধ্যে বল্লুবরের ওয়্যার নামক ভগ্নী প্রতিভাশালী কবি ছিলেন।

এই পৈরিয়া ব্রাহ্মণ দম্পতি কোনো সময়ে দেশাটনে বহির্গত হইয়া মাদ্রাজের নিকটবর্ত্তী ময়লাপুর গ্রামে উপস্থিত হন, এবং সেখানকার এক উদ্যানে বল্লুবরের জন্ম হয়। কথিত হয় যে কোনো কারণে বল্লুবর চিরদিনের জন্য সেই স্থানেই থাকিয়া যান। তাঁহার বাল্য ও কৈশোর জীবনের ইতিহাস অপরিজ্ঞাত। কেবল এই পর্যন্ত জানা গিয়াছে যে, বস্ত্র বয়ন কার্য্য অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ বলিয়া তিনি তন্তুবায়ের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সেখানে এলেলা সিঙ্গন নামক এক ধনী ব্যক্তির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। সে জাহাজের অধিকারী ছিল এবং সমুদ্রপথে বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিত। সে বল্লুবরের শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত ছিল।

(১) বল্লুবর বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম বাসুকী ছিল। বাসুকী ব্রাহ্মণ কন্যা বা অস্পৃশ্য-জাতি-সম্ভবা ছিলেন তাহা জানা যায় নাই, কিন্তু তামিলেরা তাঁহার চরিত্র আদর্শ চরিত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করে, এবং বলে তিনি সত্যসত্যই একজন পূজনীয়া আর্য্যা দেবী ছিলেন। তাঁহার অসামান্যা পতিভক্তিই এই শ্রদ্ধার কারণ। তিনি পতিতে এতই অনুরক্ত ছিলেন যে তিনি তাঁহার নিজ ব্যক্তিত্ব পতির ব্যক্তিত্বে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। পতির আজ্ঞা পালন করাই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম ছিল। যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি অনন্যা শ্রদ্ধার সহিত পতিসেবায় নিরত ছিলেন। যতদিন বাসুকী বাঁচিয়াছিলেন, তিরু বল্লুবর অতি আনন্দে গার্হস্থ্য জীবনের সুখ অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর বল্লুবরের জীবন নিরানন্দময় হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি জীবনের অবশিষ্ট কাল উদাসীনের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

৩৬। কুরলের বিশেষ বিবরণ

কুরল বা মপ্পালের বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম। প্রথম দুই ভাগেও কাম বিষয়ক সামান্য কিছু আলোচনা আছে। প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডে নিম্নলিখিত কয়েকটী পরিচ্ছেদে পারিবারিক জীবন, সহধর্ম্মিণী, সন্ততি, প্রেম, পরস্ত্রী, কামনার দমন; এবং দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদ গুলিতে—স্ত্রীর শাসন, মদ্যে ঘৃণা, বেশ্যা এই সকল বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

---

(১) এই গ্রন্থখানির ১০খানি টীকা আছে, তন্মধ্যে পরিমেলন্ কর-কৃত টীকাই অধিক আদৃত। 'তির' শব্দ সম্মান-সূচক এবং 'শ্রী' শব্দের কাজ করে।

(১) ক্ষেমানন্দ রাহত কৃত হিন্দী অনুবাদের ভূমিকা।

তিরু বল্লুবর অতি ওজস্বী ভাষায় পারিবারিক জীবনের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি স্ত্রী সুযোগ্যা ও আজ্ঞাকারিণী হয়, তাহা হইলে বিদ্বান্ ও ভক্তিমান্ সাধুদিগের পক্ষেও বিবাহ বাঞ্ছনীয় ও পরমোপযোগী। নতুবা একক থাকাই ভাল। স্ত্রী বাস্তবিকই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রাণ। গৃহস্থের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণকে সে স্বর্গের রূপ দান করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে বল্লুবর বলিয়াছেন, "স্ত্রী যদি সুযোগ্যা হয় তাহা হইলে দারিদ্র্য কাহাকে বলে? আর স্ত্রী যদি অযোগ্যা হয় তবে ধনী হইয়া লাভ কি? যে স্ত্রী শয্যা হইতে উত্থান করিবামাত্র পতিসেবায় ব্রতী হয়, জলপূর্ণ মেঘও তাহার আজ্ঞা পালন করে।" বোধ হয় তিনি নিজের অনুভব হইতেই এই সকল কথা বলিতে পারিয়াছেন। যেখানে তপোমূর্ত্তি বাসুকী প্রসন্নসলিলা মন্দাকিনীর ন্যায় জীবন-উদ্যানকে পত্রপুষ্পে সজীব করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানে স্ত্রীলোকের গ্লানি-সূচক উক্তির (১) প্রয়োগ কি প্রকারে সম্ভব? বল্লুবর নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা তাঁহার বাৎসল্য রসানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, "বংশীধ্বনি মধুর বীণাধ্বনিও মধুর—যাহারা নিজ শিশু-সন্তানের আধ আধ কথা শুনে নাই, তাহারাই এরূপ বলে।" যাহারা বেশ্যাসক্ত হবে, তাহাদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "বেশ্যার কপট আলিঙ্গন অন্ধ ঘরে শবদেহ আলিঙ্গন করার সমান।" ব্যভিচারকে তিনি অতিশয় নিন্দার্হ বলিয়াছেন। স্ত্রৈণ ব্যক্তিকে তিনি অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর চরণার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকে সে কখনও মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে না। এরূপ লোক ধর্ম্মোপার্জ্জনও করিতে পারিবে না। স্নেহের আস্বাদনও তাহার ভাগ্যে নাই।"

কুরলগ্রন্থ পদ্যে রচিত নীতিবিষয়ক সূত্রের সমষ্টি। বল্লুবর (জৈন) নিগ্রন্থ (২) সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি নিজ সম্প্রদায়ে সম্পূর্ণ আস্থাবান থাকিয়াও নির্ভীকভাবে নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মত ছিল, "যে জ্ঞানে মনুষ্য-সমাজের সুখ বৃদ্ধি হয় তাহাই যথার্থ জ্ঞান।" তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন এ বিষয় লইয়া এক সময়ে ঘোর মতবৈষম্য উপস্থিত হইয়াছিল। শৈব, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকলেই তাঁহাকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন। এই সকল সম্প্রদায়ের কিছু কিছু মত তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় সত্য, তথাপি ইহা বলা যায় না যে তিনি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি উদার মতাবলম্বী স্পষ্টবাদী ব্যক্তি ছিলেন, এবং মত মতান্তরের বন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ হইতে দেন নাই। তিনি যেখানে যে রত্ন পাইয়াছিলেন তাহা দ্বারাই নিজ ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন। ভ্রমরের ন্যায় তিনি নানা পুষ্পের রসাস্বাদন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কোনও পুষ্পবিশেষে আবদ্ধ হন নাই।

তিরু বল্লুবর বলিয়াছেন, "দান গ্রহণে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে, তথাপি দান গ্রহণ অনুচিত। যদি স্বর্গ না-ও থাকে, তথাপি দান করা ভাল। নির্ভীক সাহসে বীরত্ব আছে বটে, কিন্তু একজন অভাগাকে দয়া দেখানতে তদপেক্ষা অধিক মহানুভবতা আছে।" সকল ব্যবসায়ের মধ্যে তিনি কৃষকের ব্যবসায়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, "যাহারা ভূমি কর্ষণ করে তাহারাই প্রকৃত সুখী; অন্যেরা বড়লোকের অনুসরণ ও সেবা করিয়া জীবন যাপন করে।" তিনি অদৃষ্টবাদীদের উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, "যাহারা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে তাহারা ভাগ্যের উপর জয়ী হইবে," "একটা কাজ কঠিন বোধ হওয়াতে সাহস হারাইও না। পরিশ্রমই লোককে বড় করে।"

তিনি মনুষ্যগণকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে উৎসাহিত করিয়া বলিয়াছেন, "অজ্ঞ লোকেরা বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্য নয়। পশুতে ও মনুষ্যে যে প্রভেদ, অজ্ঞ লোকে ও বিদ্বানে সেই প্রভেদ।" "অজ্ঞ লোকেরা জীবিত থাকে বটে, কিন্তু উষর ভূমির ন্যায় কিছুই উৎপন্ন করে না।" "জ্ঞানীরা যাহা ইচ্ছা করে তাহাই পায় কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা সব থাকিতেও দরিদ্র।" তিনি নিগ্রন্থ ছিলেন বলিয়া, কাহারও জীবন না লওয়াকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ভাবিতেন, এবং ব্রাহ্মণদের পশুবলিকে অতি

(১) Frailty thy name is woman—Shakespeare.

স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্ দেবা ন জানন্তি।

(২) যে ব্যক্তি সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে।

ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। "একটী প্রাণীরও জীবন নষ্ট না করা সহস্র যজ্ঞ করিয়া ঘৃতাহুতি দেওয়া অপেক্ষা ভাল।" তিনি প্রতিফলে (অর্থাৎ পাপ করিলে দণ্ড পাইতে হয় এই মতে বিশ্বাস করিতেন। "যদি পূর্ব্বাহ্ণে কাহারো অনিষ্ট কর, অপরাহ্ণে তোমার অপকার হইবে।" বিদ্যার অহঙ্কারে কেবল মত্ত না থাকিয়া, বিদ্বান ব্যক্তিগণকে তিনি শ্রম করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে বলিয়াছেন। যে কর্ম্মে কোনো লাভ নাই তাহা না করিয়া তিনি তাহাদিগকে যে জ্ঞানময় সত্তা এই বিশ্ব-চরাচরের নিয়ন্তা তাঁহার সম্মান ও আজ্ঞাপালন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। "হায়! সে বিদ্যায় লাভ কি, যদি বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই সর্ব্বজ্ঞ সত্তার চরণ পূজা না করে?"

মলয়পুরের এই অস্পর্শ্য তাঁতি যে আচার-ধর্ম্মের মহিমা ও শক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জগতের কোনো ধর্ম্ম-সংস্থাপক এতদপেক্ষা অধিক শিক্ষাপ্রদ ও প্রভাবশালী উপদেশ দিতে পারেন নাই। ইহা মনুষ্যসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী এক সাধু-হৃদয়ের সৃষ্টি। জীবনকে উচ্চ ও পবিত্র করিবার নিমিত্ত যে সকল বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন, যথা মিথ্যা ও প্রতারণার অনিষ্টকারিতা, সত্যের উচ্চতা ও উপকারিতা, ক্রোধের বিষময় ফল, অহিংসার গুণ এবং সাংসারিক পদার্থের অসারতা, ধর্ম্মের প্রকরণে ইহাদের সূক্ষ্মতা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। রাজনীতির অর্থাৎ রাজা ও রাজতন্ত্রের গভীর তত্ত্বসমূহ অতি নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে, এবং গার্হস্থ্য প্রেমের পবিত্র ও স্নিগ্ধ আভা কুরলের অন্তিম প্রকরণে বিকীর্ণ হইয়াছে। এই গ্রন্থ মনুষ্য-চিন্তার এক উচ্চতম ও পবিত্রতম ফল। বেদ ইত্যাদি মহান্ ধর্ম্ম-গ্রন্থের ঠিক নিচেই ইহার আসন।

৩৭। মাদুরার সাহিত্য পরিষদ্। (১)

তিরু বল্লুবর তাঁহার কুরল গ্রন্থ রচনা করিয়া উহা মাদুরার বিদ্বৎ পরিষদ্ দ্বারা অনুমোদিত করাইবার জন্য ময়লাপুর হইতে মাদুরায় গমন করেন। অনেক কবি এই সমাজভুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ মাদুরার অধিবাসী ছিলেন, কেহ কেহ চোল রাজ্যের উরইয়ার ও কবি বিরাম্ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, কেহ কোঙ্গনদের চেঙ্কুর হইতে, কেহ খোন্দাইনাদের বেঙ্কটম্ হইতে এবং অন্যেরা তামিল দেশের নানা স্থান হইতে আসিয়াছিলেন। এই কবি-পরিষদে ইনিয়-নার-পতু নামক নীতি বিষয়ক কাব্য-রচয়িতা পুথন চেন্থনর; তিরিক দুকম্ নামক নীতি বিষয়ক কাব্য-রচয়িতা পুথন-চেন্থনর; তিরিক্কদুকম্ নামক নীতিবিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ-রচয়িতা নল্লাদনর; কলিথ্-থোকাই সংগ্রহীতা নল্লন্থুবনর; শৃঙ্গার-রসাত্মক কবিতা সমূহের অকাপ্পাবল নামক ব্যাকরণ বচয়িতা ইরইনর; কুরিঞ্চিপ পদ্দু ও ইন্না-নারপতু দুইখানি মনোমুগ্ধকর কাব্য রচয়িতা কপিলর; মদুদি মরুত-নর যিনি অলঙ্কানম্- বিজয়ী পাণ্ড্যরাজ নেদুঞ্জ চেন্দিনের উদ্দেশে মদুরইক-কাঞ্চি নামক গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; পরম বিদ্বান নক্কিরর যিনি নেদুনল-বদই তিরু-মুরুকাক্রপ্ পদই নামক পশুপাল-জীবন মূলক ছোট ছোট পদ রচনা করিয়াছিলেন; গভীর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বৌদ্ধ-বিদ্বান চীদলনইচ চাদনর, যিনি মণি-মেগলই নামক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন—এই সকল বড় বড় বিদ্বানেরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বড় বড় চিকিৎসাশাস্ত্রাচার্য্যগণ, জ্যোতিষাচার্য্যগণ, সাহিত্যাচার্য্যগণ যাঁহাদের রচিত গ্রন্থ আজিও হস্তগত হয় নাই—উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ের অগ্রগণ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর ও প্রসিদ্ধ কবিমণ্ডলীর মধ্যস্থলে পণ্ডিত-কুলপোষক পাণ্ড্যরাজ উগ্র-পেরু বলুদী (উগ্রবেরু-বল্লুদী) বিরাজমান ছিলেন। এই মহাসভায় বিচারের জন্য দণ্ডায়মান বল্লুবরের হৃদয় উৎকণ্ঠায় কম্পিত হইতেছিল সন্দেহ নাই।

৩৮। কুরল সম্বন্ধে পরিষদের অভিমত (১)

তামিল কবিদের পরিচিত কোনো ভাষায় এরূপ গ্রন্থ পূর্ব্বে কখনো রচিত হয় নাই। পরিষদ্ এই গ্রন্থ প্রশংসার্হ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, এবং উপস্থিত প্রত্যেক কবি রাজাকে সম্বোধন করিয়া এই গ্রন্থের প্রশংসা-সূচক এক একটী কবিতা রচনা করিলেন। ইরাইনর সাহসের সহিত এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, বল্লুবরের গ্রন্থ অবিনশ্বর হইবে এবং ভবিষ্যদ্ বংশাবলীর শিক্ষার মূল স্বরূপ হইবে। যে ছয়টী ধর্ম্ম সম্প্র-

(১) V. Kanaksabhai

(১) V. Kanaksabhai.

দায় সতত পরস্পরের সহিত বিবাদে নিযুক্ত থাকিত, তাহারা সকলেই একবাক্যে বল্লুবর রচিত গ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করিল দেখিয়া সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

একজন কবি বলিলেন, বল্লুবরের মুখ হইতে যে সকল বাক্য আজ শুনিলাম, তাহা আমরা পূর্ব্বে কখনো শুনি নাই। তাহা শুনিয়া ধর্ম্ম কি, অর্থ কি, এবং কাম কি বুঝিতে পারিলাম, এবং আজ চিরসুখের পথ আমাদের নিকট স্পষ্ট হইল। আর একজন কবি বলিলেন, "ব্রাহ্মণেরা বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন এবং অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন না পাছে এরূপ করিলে তাহার আদর কমিয়া যায়। কিন্তু বল্লুবরের মুপ্পাল (কুরল) সামান্য তালপত্রে লিপিবদ্ধ হইলেও কখনো ইহার মূল্যের হ্রাস হইবে না।" এক জ্যোতিষী বলিলেন, 'সূর্য্য, চন্দ্র, শুক্র, বৃহস্পতি ইহারা পৃথিবী হইতে সত্বর অন্ধকার বিদূরিত করে, কিন্তু বল্লুবরের কুরল মানবমনের অন্ধকার দূর করে।' এক বৈদ্য শাস্ত্রী চমনকে (১) লক্ষ করিয়া বলিলেন, 'মধুর সহিত সম্মিল লবণ ও শুণ্ঠী মাড়িয়া খাইলে শিরঃপীড়া নিবারিত হয়; 'কিন্তু বল্লুবরের মুপ্পাল পাঠ করিয়া চমনেরও শিরঃপীড়া দূর হইল।' আর একজন কবি বলিলেন, 'ছন্দে, ভাষায় ও ভাবে এই মধুর কুরল নির্দ্দোষ। ইহাতে সকল লেখকের ও সর্ব্বকালের জ্ঞান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।'

কুরলের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদীসম্মত দেখিয়া রাজা উগ্র গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের প্রশংসায় এইরূপ বলিলেন, "চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বল্লুবরের ছদ্মবেশে আসিয়া মুপ্পাল দ্বারা আমাদিগকে চারি বেদের শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব এই গ্রন্থ মস্তক দ্বারা আদৃত হইবে, মুখের দ্বারা পঠিত হইবে, কর্ণের দ্বারা শ্রুত হইবে এবং মানব দ্বারা চিন্তিত হইবে।"

৩৯। কুরলের রচনা কাল।

উপরি বর্ণিত জনশ্রুতি পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত এস, শ্রীনিবাস অয়্যাঙ্গর উগ্রপেরু-বরুদির রাজ্যারম্ভকাল ১২৫ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী বলেন। এতদ্ব্যতীত—'শিলপ্পদি-করম্' ও 'মণি মেগলই' নামক দুইখানি তামিল গ্রন্থে কুরলের ষষ্ঠ প্রকরণের পঞ্চম পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। কতকগুলি বিদ্বানের মতে এই দুইখানি গ্রন্থ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত এম, রাঘব অয়্যাঙ্গর বলেন যে "ঐ গ্রন্থদ্বয় সম্ভবতঃ খৃষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর রচনা।" কিন্তু উহারা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইলেও দুই শতাব্দী পূর্ব্বের রচিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধরণ হওয়ার কোনো বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না।

মহাবংশ হইতে জানা যায় যে, চোল রাজ শিঙ্গম খৃষ্টের ১৪০ বৎসর পূর্ব্বে সিংহল আক্রমণ করিয়া বিজয় প্রাপ্ত হন এবং সেখানে রাজ্যস্থাপন করেন। এক এক পুরুষ ৩০ বৎসর ধরিলেও ইহা প্রমাণিত হয় যে, কুরল খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল।

এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত বী, বী, এস, অয়্যর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে খৃষ্টিয় প্রথম ও তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে তিরু বল্লুবরের জন্ম হইয়াছিল।

৪০। কুরলের উপর আর্য্য সাহিত্যের প্রভাব।

সম্ভবতঃ তিরু বল্লুবর স্বকীয় গ্রন্থের মতামতের জন্য কোনো আর্য্য শাস্ত্রের নিকট ঋণী নয়। আমি কুরলের ধর্ম্ম প্রকরণ সম্বন্ধে বাশিষ্ঠ ও বৌধায়ন ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত, অর্থ-প্রকরণ সম্বন্ধে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সহিত এবং কাম-প্রকরণ সম্বন্ধে বাৎস্যায়নের কামসূত্রের সহিত উহাদের মিল করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু উভয় মধ্যে কোন সাদৃশ্য পাই নাই। তিরু বল্লুবরের উক্তিগুলি সরল, জটিলতাবিহীন ওজস্বী এবং উপযোগী। তিনি স্বাধীনভাবে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কুরল পাঠ করিলে তাঁহার অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও অসাধারণ সাংসারিক অভিজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যায়। কাম প্রকরণে তাঁহার ভাবুকতার ও উচ্চ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাপ্ত

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল

(১) চমন চিন্তা করিবার সময় সর্ব্বদা তাঁহার লেখনী দ্বারা নিজ মস্তকে আঘাত করিতেন।

যাত্রাশেষে

শ্রীঅচ্যুত রায়

১

আমরা ছিলাম চারবন্ধু শ্যামল বঙ্গভূমির এক নিভৃত পল্লীতে। আমাদের মন ছিল নীল আকাশের মত উদার, আমাদের প্রাণ ছিল সবুজ ঘাসের মত কাঁচা, আমরা ছিলাম একেবারেই বাঙ্গালী। বাইরের কোন খবর আমাদের কানে আসত না। দশ বারো বছরের চারটি ছেলে, বাঙ্গলা মায়ের নিভৃতপল্লীর চারটি রত্ন। সমস্ত জীবনটা গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখে, আরও পাঁচজনের সাথে হেসে কেঁদে বড় হয়ে বিয়ে করে সংসারধর্ম্ম পালন করে একদিন গোপনে মরে যাওয়াই আমাদের উচিত ছিল। আজ মনে হয় তাহলেই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হত।

কিন্তু তা হলনা, আমাকেই ছাড়তে হল সকলের আগে। এমন সোনার গ্রাম, এমন নদী, এমন ছায়া—কি কান্নাটাই কেঁদেছিলাম সেদিন।

পোষা শালিকটা দিয়েছিলাম সতীশকে। লাটাইটা পেয়ে রমেশ হয়ত খুবই খুশী হয়েছিল, ভাঙ্গা ডিঙ্গিখানা মধুকে দিয়ে বলেছিলাম, এটা বিক্রী করে কটা টাকাই আর পাবো, আমায় মনে করে তোরা এতে চড়িস। ওরা তিনজনেই আমাকে বিদায় দিতে এলো। বাঁড়ুয্যে মশাই কলকাতায় যাচ্ছেন নৌকা করে। দেশের ঘাট থেকে উঠে একেবারে কলকাতায় গিয়ে নামবেন। আমি নৌকার মধ্যে, ওরা তিনজন চলেছে তীর ধরে। কতদূর ওরা এলো, তারপরে পথবন্ধ। নদীটা হঠাৎ বাঁক নিয়ে যেখানে একটা ছোট অন্তরীপ সৃষ্টি করেছে সেখানে ওরা দাঁড়াল। নদীকে আড়াআড়ি ভাবে পার হয়ে আমাদের এখন আর একটা নদীর মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। আমি শুধু চেয়ে রইলাম। ঐ দূরে অপস্রিয়মাণ শ্যামল কূলের উপর তিনটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, একটু পরেই যাবে অদৃশ্য হয়ে, আবার দেখা হবে কিনা কে বলতে পারে। এদিকে সুনীল আকাশ, তার পানে ছুটে চলেছে নদীর গৈরিক জল। প্রভাতকিরণে বাষ্প উঠে দিগন্তকে যেন একটু কাঁপিয়ে তুলছে। তার ওপারেই কলকাতা—গাড়ীঘোড়া লোকজন, টাকাকড়ি, কত কি। সেখানে আমাকে যেতে হবে, এই এগার বছর বয়স থেকে টাকা রোজগার করতে হবে। সমস্ত জীবন আমার সম্মুখে, একদিন আমি কত বড়লোক হয়ে বসব। মস্ত বাড়ী হবে আমার, কত চাকর, কত লোকজন, আমার মত কত ছেলেদের আমি বাড়ীতে স্থান দেব। খুব সুখে রাখব ওদের, দুঃখ কাকে বলে আমি জানি। আমি ওদের না দেখলে কে দেখবে ?

কিন্তু আমার সবচেয়ে দুঃখ হয়েছিল বাঘা কুকুরটার জন্য। সেটা হয়ত খাবার খুঁজে বাড়ী বাড়ী ঘুরবে। হয়ত খেতে পাবে না কোথাও। অস্থিচর্ম্মসার হয়ে কত কাঁদবে ঘেউ ঘেউ করে আমার জন্য। শেষে একদিন মরে থাকবে ঐ নদীর কূলে কাক শকুনের আহার হয়ে। হয়ত ওর শেষ গতি তাই হয়েছিল। ওর কান্না যেন এখনও আমার কানে ভেসে আসছে—দূরের আকাশে করুণ চোখে চেয়ে শেষ দীর্ঘশ্বাসগুলি মমতার সাথে ছাড়তে ছাড়তে অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ...

ও সব কথা আর ভেবে কি হবে।

২

কলকাতায় এসে পৌছুলাম। বাঁড়ুয্যে মশাই তাঁর বাড়ীতে আমায় স্থান দিলেন। দেশে তাঁর মস্ত কারবার। সমস্ত গ্রামের তেল, নুন, চাল আরও কত কি তিনি একা সরবরাহ করেন। জমিদারীও খুব ছোট নয়। আমাকে স্থান দেবেন তার আর আশ্চর্য্য কি। খাওয়া পরার দুশ্চিন্তা আমার হয়নি বললে সত্য বলা হবে না। তিনি যেদিন নিজেই আমাকে সে কথা বললেন সেদিনের আনন্দ আমি কোনদিন

ভুলব না। ভগবানকে তখনো ডাকতে শিখিনি, কিন্তু যে ভাবে আমি বাঁড়ুয্যে মশাইর দিকে তাকিয়েছিলাম ভগবান সত্যি কোথাও থাকলে তিনি আমার মনের সব কথা নিশ্চয় টের পেয়েছেন, সে রকম দ্বিতীয় মুহূর্ত্ত আমার জীবনে কখনো হয়নি। জীবনের বাকী কটা বছরের বিনিময়ে সে রকম আর একটী মুহূর্ত্ত পেলে তা নিতে আজ আমি সঙ্কোচ করব না। জীবন মধুর সন্দেহ নেই, কিন্তু যে জীবনকে মধুর করে তার তুলনা কোথায়?

দুপুরবেলায় ছাদে বসে কত কথাই ভেবে যেতাম কলকাতা যেন অনেকটা জায়গা জুড়ে আটকে থাকা খানিক বানের জল, বাড়ীগুলি যেন এক একটি ঢেউ, আমি কূলে বসে ঢেউ গুণছি। আমার ভাঙ্গা ডিঙিখানা কেউ পাঠিয়ে দিতে পারে না?

বাড়ীগুলি দূরে মিশে গেছে আকাশের সাথে। তার ওপারে কত নদী মাঠ জঙ্গল পার হয়ে অনেক দূরে, অনেক দূরে আমার গ্রাম। সেখানে এই দুপুরে আমবাগানের ছায়ায় বসে আমার সাথীরা খেলছে, গল্প করছে আমার জন্য কত দুঃখ করছে হয়ত। কি সুখেই ওরা আছে ছোট ছোট খাল গুলির মধ্য দিয়ে নৌকা বেয়ে, পরস্পরের সুখ দুঃখের কথা শুনে, পরস্পরকে ভালোবাসা দিয়ে। তাছাড়া যে কোনো কাজ নেই ওদের, আর কিছু ওরা জানেও না। অলস দুপুরে একটু তন্দ্রা আসে চোখে—আমি যেন একটী পাখী, বাসার দিকে উড়ে চলেছি। সেখানে সকলে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, সেই স্নিগ্ধ নীল আকাশের নীচে। এ ঝড়ের ঝাপট ভাল লাগেনা, আমি যাবো সেখানে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শুধু গান গাবো—প্রাণ খুলে, উদার আকাশে, অবাধ বাতাসে, সমস্ত জীবন ধরে...

বাঁড়ুয্যে মশাই একদিন ডেকে বললেন, আমি আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারব না। আমাকে স্কুলে পড়তে হবে। কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠলাম, ছেঁড়া ধারাপাত আর ছোট ছোট শ্লেটপেন্সিলগুলির কথা মনে পড়ল। আমাদের মধ্যে সতীশই কেবল পড়ত। ওর বইয়ের ছবিগুলির দিকে আমি কতদিন হাঁ করে চেয়ে থাকতাম। কত জিনিষের কত রকমের কত রংয়ের ছবি। কত কি লেখা আছে ওর বইতে। কান্নাকাটি করলে কে শুনবে। হাটের পয়সা থেকে দুটি পয়সা চুরি করেছিলাম একখানা ধারাপাত কেনার জন্য, নতুন মলাট ময়লা হয়ে ছিঁড়ে যাওয়া পর্য্যন্ত কত যত্নে লুকিয়ে রাখতাম। তাকে আমার পড়া হয়নি। 'একে চন্দ্র' থেকে 'দশদিক' পর্য্যন্ত মুখস্থ করেছিলাম। তারপরে আমায় দেখিয়ে দেবে কে?

সেই লেখা-পড়া আমি শিখব। সতীশের সাথে দেখা হলে তাকে একদিন তাক লাগিয়ে দেব। এর চেয়ে আহ্লা-দের জিনিষ আমার আর কি হতে পারে? বাঁড়ুয্যে মশাইর উপর দয়া হল; বেচারীর ছেলেপিলে নেই।

রমেশকে একখানা চিঠি দিলাম অনেকদিন পরে রিপ্লাই কার্ডে। তা নাহলে হয়ত উত্তর পাবোনা, দুখানা চিঠি লেখার পয়সায় গ্রামের এক হাটের খরচ চলে। কত আশা করে উত্তরের অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকতাম। দেশের খবর পাবো, আমার সঙ্গীদের খবর। আমার চিঠি পেয়ে ওরা হয়ত আশ্চর্য্য হয়ে গেছে। সতীশ আমার লেখাপড়া শেখার খবর শুনে দমে গেছে একটু। ওর গর্ব্ব করার কিছু নেই আর। ওর ছবির বইর দাম আমি বুঝেছি, কিছু নেই ওতে। আমার বইতে একটিও ছবি নেই, যা আছে সবই পড়ার জিনিষ, আমার সে চিঠিখানা নিয়ে ওরা হয়ত কত জল্পনা করছে; দুপুরবেলা সময় কাটানোর একটা জিনিষ পেয়ে গেছে। নদীর তীরে বেড়াতে বেড়াতে হয়ত ভাবছে ওপারের অস্পষ্ট শ্যামরেখার পানে চেয়ে—তার অনেক ওদিকে লোকভরা কলকাতায় আমি কত বড় হয়েছি, কেমন করে লেখাপড়া করছি, হয়ত একদিন ওদের মধ্যে গিয়ে উপ-স্থিত হব, আমায় ওরা কেউ চিনতে পারবে না। চেহারায় পোষাকে আমি একেবারে বদলে গেছি, সে-আমি আর নেই।—কিন্তু চিঠির উত্তর ত এলো না।

তবে কি ও আমার চিঠি পায়নি? পোষ্টকার্ডখানা হারিয়ে ফেলেছে? লিখে দিতে কেউ রাজী হয়নি? আর যদি তাই হয়ে থাকে?—না না, তা কখনো হয়নি। আমার দুচোখ ছাপিয়ে কান্না এলো। কিছুতেই আটকাতে পারলাম না। ছেলেগুলি টিফিনের ছুটিতে বাইরে হৈচৈ করছে। আমি বেঞ্চে বসে কাঁদতে লাগলাম খুব গোপনে।

কেউ দেখে ফেললে আমার লজ্জার শেষ থাকবে না। তা কক্ষনো হয়নি, হতে পারেনা, রমেশ নিশ্চয়ই বেঁচে আছে।

বাঁড়ুয্যে মশাইকে জিজ্ঞেস করলাম, দেশ থেকে কোন লোক এসেছে কিনা। লোক এসেছে, তারা রমেশকে কেউ চেনেনা। গ্রামের উত্তরপাড়ায় থাকে ছোট একখানা পাটখড়ির চালায় ও আর ওর মা; খুব সুন্দর একটা লাটাই আছে ওর, খুব সুন্দর, আমি ওকে দিয়েছিলাম। কেউ চিনল না ওকে, ওর খবর কেউ দিতে পারল না।

৩

লেখাপড়ায় মন বসালাম। সহরের আবহাওয়ায় এসে কত নতুন জিনিষের সাথে পরিচয় হল। পৃথিবীটা একখানা ছোট গ্রামের নদী মাঠ আর লোকের বসতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কত পাহাড়, কত সমুদ্র, কত মরুভূমি আছে এর উপর। সে সকলকেই মানুষ দেখেছে, অধিকার করেছে। কোনো বাধাই মানুষের চেষ্টাকে ব্যর্থ করতে পারেনি। চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই আর ওর মধ্যে বুড়ী বলে কোনো পদার্থ নেই। ওসব চাঁদের গুহা, যার মধ্যে সূর্য্যের আলো যেতে পারে না। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে, আর চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে। কবে এদের ঘোরা আরম্ভ হয়েছে, আবার কবে ঘুরতে ঘুরতে এরা থেমে যাবে। সূর্য্য নিভবে, চাঁদ নিভবে, আকাশের সব তারা যাবে নিভে। এই পৃথিবীতে তখন কেউ থাকবে না। এই কলকাতা সহরের এত বাড়ী, এত গাড়ী, এত গোলমাল, এতো আলো কিছুই থাকবে না। দেশের আম বাগানেও আর ঝিঁঝি ডাকবে না, নদীর তীরে বসেও কেউ বাঁশী বাজাবে না। তখন চারিদিকে অন্ধকার, কিছুই নেই কোথাও—

তা হলে বাঘা কুকুরটার জন্য দুঃখ করে কোন লাভ নেই। সমস্ত পৃথিবী আমার দিকে চেয়ে না দেখলেও আমার কিছু যায় আসে না। এ লেখাপড়া শিখেই বা আমার কি হবে? আমি যদি পৃথিবীর কাছে নিজেকে বিখ্যাত করে তুলি, সমস্ত পৃথিবী আমার গুণগানে মুখর হয়ে ওঠে, আমার মৃত্যুর পরও আমাকে বাঁচিয়ে রাখে, তা হলেও আমার কি লাভ আছে? যেদিন কেউ থাকবে না, সে দিনের কাছে যে সকলেই মাথা নত করবে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলকেই সেদিকে ছুটতে হবে, চিরকালের জন্য চুপ করে থাকতে হবে।

স্কুল থেকে চিঠি এলো আমি একমাস স্কুল কামাই করেছি। বাঁড়ুয্যে মশাই আমার মাথায় ছোট একটি চাঁটি মেরে একটু তিরস্কার করলেন। ভয় দেখালেন এ রকম হলে আমায় আবার গ্রামে ফিরে যেতে হবে, কলকাতায় থাকতে পারব না।

কথাটার মধ্যে মস্ত বড় একটা প্রলোভন। লেখাপড়া ভালো লাগে না। পুরাণো সাথীদের জন্য মাঝে মাঝে আকুলতা আসে। সেই লেখাপড়া বাদ দিয়ে চললেই আমি গ্রামে পৌঁছুতে পারব। এর চেয়ে সোজা পথ বোধহয় আর কিছুতেই হতে পারবে না। একটু হাসিও এলো। —বাঁড়ুয্যে মশাই কি আমায় গ্রামে পাঠাতে পারবেন? গ্রাম থেকে কি তিনিই আমায় এনেছিলেন?—তিনি আমায় তা হলে সত্যি সত্যি ভালবাসেন।

একদিন স্কুল থেকে এসে দেখি আমার নামে একখানা চিঠি এসেছে এনভেলপে; উপরে গোটা গোটা অক্ষরে আমার ঠিকানা লেখা। প্রথমটা কেমন লাগল, আমার কাছে চিঠি লিখবে কে?—খুললাম চিঠিখানা। ঠিক তাই, রমেশ লিখেছে, অল্প কয়েকটা কথা, কিন্তু তার মানে অনেকখানি। রমেশ লেখাপড়া শিখছে, সতীশের বাবা ওর লেখা পড়ার ভার নিয়েছেন। ওরা দুজনে আসছে কলকাতায়। এখানে ওরা পড়বে। সকলের শেষে আর একটি কথা লেখা আছে, রিপ্লাই কার্ডে চিঠি লেখার দরকার নেই।

দেশে থাকতে শুনেছি রমেশ সতীশদের খুব দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়। পল্লীসমাজের মধ্যেও সম্পর্কের দূরত্বটা অনেক বেশী।

এই চার বছর পরে ওরা আমাকে তাহলে ভুলে যায়নি। কবেকার সেই রিপ্লাইকার্ডের কথাও ওর মনে আছে। লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়া আমার তা হলে চলবে না।

বিকেল বেলা বেড়াতে বের হলাম। মন আনন্দে ভরা, গ্রামের সেই স্নিগ্ধ শান্তি সহরের এই গণ্ডগোলের মধ্যেই ফুটবে। আমাদের জীবন আবার মধুময় হয়ে উঠবে

সহরের বুকে। সন্ধ্যা তখনো ফোটেনি। মনে হল এই রাস্তাটা একটা প্রকাণ্ড নদী, গাড়ীগুলি যেন এক একটি নৌকা, তারা সকলে আপন মনে ভেসে চলেছে কাজের স্রোতের তালে। চারিদিকের গোলমালের মধ্যে বনগানের মধুরতা। আমি তার কূলে বেড়াচ্ছি যেমন বেড়াতাম ছেলেবেলা। আমার সাথীরা আমায় ছেড়ে চলে গেছে কোন দূরদেশে। তারা আবার আমায় মনে করেছে আবার তারা আসবে এখানে, আবার নিশীথ রাত্রির অন্ধকার আমাদের ভাটিয়ালী গানে মুখর হয়ে উঠবে।

৪

জীবনের সেই একটা দিন যেদিন সতীশ আর রমেশ আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল কলকাতার বাসায়। ওরা আগের থেকে কত বড় হয়ে গেছে। ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়তে লাগল। ভাবলাম, আমিও অনেক বড় হয়েছি।

কত কথা হল ওদের সাথে। বাঁড়ুয্যে মশাইর কথা, আমার স্কুলের কথা, কি কি বই পড়ায় আমাদের ক্লাসে, আমি কি কি অঙ্ক করছি এখন—গ্রামের স্কুল ভাল নয়, মাষ্টারেরা জানেই না কিছু তার আবার পড়াবে কি, সেইজন্যই ত সতীশের বাবা ওদের এখানে এনেছেন—সেই বুড়ো বট গাছটা কেটে চাটুয্যেরা তাদের বাড়ী তুলছে সেখানে।—আরও কত। ওদের বাড়ী আমি দেখে এলাম, কথা দিলাম কাল যাবো।

আরও একটা কথা রমেশ বলেছে, মধু মারা গেছে। বেচারা মায়ের এক ছেলে। সেবার গ্রামে খুব বসন্ত হয়, ওর মার হয় প্রথম, তিনি সেরে ওঠেন। মধুর দেখা দিল দুদিন পরে, সে আর উঠল না। নদীর পারে ওকে পোড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, হঠাৎ এলো ঝড় বৃষ্টি। লোকেরা সেই আধপোড়া শবকে নদীতে ফেলে দিয়ে চলে আসে।

আমার সেই ভাঙা নৌকাখানির কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। বাঘা কুকুরটার কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। ঘরে ফিরে অন্ধকারে চেয়ারে বসে পড়লাম। চোখ বুজে দেখতে লাগলাম মধুকে। ও চলেছে আমার সেই ডিঙিখানা বেয়ে অজানা এক নদীতে। কি তীব্র তার স্রোত।—ও চলেছে, সে চলার আর শেষ নেই—ওকে যেতে হবে দূরে, অনেক দূরে, একমনে বেয়ে যাচ্ছে ও। ওকে একবার ডাকলাম—শুনল না আমার কথা—আরও জোরে ডাকলাম—ফিরেও চাইল না—চেঁচিয়ে উঠলাম। ওর মা কাঁদছে ওর জন্য, ও তার একমাত্র ছেলে, তাকে দেখার যে কেউ নেই আর! কোথায় যাচ্ছে ও এভাবে—

বাঁড়ুয্যে মশাই এসে বললেন, ঘুমিয়েছিস্? লেখাপড়া নেই?

আমি গা মোড়ামুড়ি দিয়ে ঠিক হয়ে বসলাম।

লেখাপড়া আমায় করতে হবেই। আজ আমরা তিনজন পৃথিবীতে। যে চলে গেছে তার জন্য কাঁদার সময় নেই। রমেশের মৃত্যুর খবর শুনলে বোধ হয় কিছু যেত আসত না আমার। আমিও অনেকটা তাই ভেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু ও এসেছে কলকাতায় সতীশের সাথে। সমস্ত জীবন আমাদের সামনে। আমার চিঠির উত্তরে প্রায় তিন বছর পরে লিখেছে, ও-ও লেখাপড়া শিখছে—লেখাপড়া আমায় করতে হবেই।

বাঁড়ুয্যে মশাইকে বলে রাজী করিয়ে ওরা যে স্কুলে ভর্ত্তি হল আমিও সে স্কুলে গেলাম। আমরা তিনজন পড়ি এক ক্লাসে।

এই ত ভালো। জীবনে যদি কিছু ভালো থাকে সে এই পরস্পরকে ভালোবাসার মধ্যে। কলকাতায় প্রথমে এসে মনে হয়েছিল পল্লীজীবন সমতল প্রদেশের একটা ক্ষীণতোয়া নদীর মত। চুপ করে পড়ে থাকলেই হল, জল আপন মনে গড়িয়ে একদিন সমুদ্রে মিশবেই। সহর যেন একটা পার্ব্বত্য প্রদেশ। এখানে আমাদের চলতে হবে উদ্দাম গতিতে বঙ্কিম পথে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে শত শত জলপ্রপাত আর আবর্ত্তন সৃষ্টি করে। ও-সব আমার সয়ে গেছে। সময়ের চাহিদা আমি মেনে নিয়েছি, পুরানো সাথীদের ফিরে পেয়েছি। জীবনের সবটুকু আশীর্ব্বাদ আজ আমাদের মাথায়।

বাৎসরিক পরীক্ষার ফল বের হল। সতীশ পাশ করেছে, রমেশ তিন নম্বরের জন্য দ্বিতীয় হয়েছে, আমি হয়েছি প্রথম। বাঁড়ুয্যে মশাই শুনে পিঠে একটু হাত বুলিয়ে

দিলেন। ছেলেপিলের মুখ তিনি দেখেন নি, কিন্তু সেদিন তিনি পৃথিবীর কোনো পিতার চেয়ে কম আনন্দ পান নি। তাঁর সেই তৃপ্তিভরা চোখ যেন এখনো আমার দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু এতে আমার আনন্দ মোটে হয়নি। এ যেন আমার সকল আনন্দকে হঠাৎ এক কলসী জল ঢেলে নিভিয়ে দিল। আমি দেখতে লাগলাম, সমস্ত জীবন ধরে আমি ছুটে চলেছি প্রথম হয়ে; রমেশ সেই তিন নম্বরের ব্যবধান কিছুতেই ঘোচাতে পারছে না। সতীশ আমাদের সংগে আছে, অনেক পিছনে। অনেক দূর গেছি আমরা, তবু আমাকে ছুটতে হবে, থামার যো নেই আমার; তিন নম্বরের এই ব্যবধানকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কত প্রলয় হল, কত সৃষ্টি হল, এ পৃথিবী আর সে পৃথিবীতে কত পার্থক্য, আমাদের ছোটার বিরাম নেই। নতুন সূর্য্য নতুন তারার সাথে আমরা নতুন বন্ধুত্ব পাতাচ্ছি, নতুন দেশে গিয়ে নতুন কথা বলছি, যখন যা দরকার হয়েছে সকলকে মেনে নিয়েছি, শুধু ছুটে চলতে। তারপরে একদিন সব যেন কেমন হয়ে গেল। সময় বুঝি ফুরিয়ে এসেছে। পিছনে চেয়ে দেখলাম, রমেশ নেই, সতীশকে দেখা যায় না, আমিও যেন পথ হারিয়ে…

৫

অনেক দুঃখ পেয়েছিলাম সেদিন যেদিন খবর এলো সতীশ ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি। আমি পাশ করেছি, রমেশ পাশ করেছে। ছেলেদের মুখে গুজব শুনলাম আমি স্কলার্শিপ পাবো।

সতীশকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন এমন হল। ও আমার কথার উত্তর দিল না। বসে থাকল গম্ভীর হয়ে। রমেশও একদিন এক কলেজে ভর্ত্তি হয়ে বসল। আমি কোথায় পড়ব সে কথা জিজ্ঞেস করা উপযুক্ত মনে করেনি।

সে বিষয় নিয়ে আমিও কোনো কথা বলিনি। এর মধ্যে আমরা আরও একটু বড় হয়েছি, বুঝতে শিখছি মানুষের জীবন একটা প্রকাণ্ড শৈশব নয়, শৈশব শুধু শৈশবেই থাকে।

সে কথা আরও ভালো করে বুঝেছিলাম যেদিন হঠাৎ বাঁড়ুয্যে মশাই মারা গেলেন। ব্যবসা দেখতে তাঁর ছোট ভাই এলেন দেশ থেকে। তিনি সাদাসিধে লোক, ঘোর প্যাঁচ ভালোবাসেন না। সোজা বাংলাতেই আমাকে ব্যবসায়ের অবনতির কথা এবং আমাকে পড়ানোর অসামর্থ্যের কথা জানিয়ে দিলেন। বললেন, কলকাতায় চাকরী বাকরীর অভাব কি; কত লোক মেসে থেকে চাকরী করছে। মনে পড়ল, একদিন বাড়ী ফিরতে রাত হওয়াতে বাঁড়ুয্যে মশাই আমায় তিরস্কার করেছিলেন। আমি মুখ ভার করে স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখছিলাম।

ইচ্ছে হল সতীশকে কথাটা সোজা ভাবেই বলি। কিন্তু সতীশ যখন সকল শুনে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করলে না, আমিও কোনো ইঙ্গিত দেইনি। বাঁড়ুয্যে মশাইর ছোট ভাইই কুড়ি টাকা মাইনের একটা কাজ আমাকে জুটিয়ে দিলেন।

একটা বছর কেটে গেল। রমেশের সাথে বড় একটা দেখা হত না। সতীশ মাঝে মাঝে আমার খবর নিত; আমি ভাল আছি, ও কেমন আছে, এতেই সব আলাপ।

গ্রীষ্মকালের রবিবার। দুপুরে ঘুমাবার আয়োজন করছিলাম। সতীশ হাসিমুখে ঢুকল ঘরের মধ্যে। এবার ও খুব ভাল ভাবে পাশ করেছে। শীগ্‌গীর কলেজে ভর্ত্তি হবে। আই এ তে স্কলার্শিপ নেবেই। তারপরে আমাকে এক অদ্ভুত অনুরোধ। আমাকে কলেজে ভর্ত্তি হতে হবেই। টাকা পয়সার কথা আমাকে কিছু ভাবতে হবে না, অবশ্য আমি যদি কিছু মনে না করি।

ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, হয়ত ও শুনে খুব খুসী হবে পশ্চিমে চল্লিশ টাকা মাইনেতে একটা কাজ পেয়েছি। খুব বড় কাপড়ের কল। এ সপ্তাহেই আমাকে রওনা হতে হবে।

৬

আজ জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে অনেক কথাই মনে পড়ছে। কলের সেই একঘেয়ে শব্দের পাশে বসে, নিজের মনের কথাগুলি তার ছন্দে ছন্দে আউড়ে কত বছর কেটে গেছে। চল্লিশ টাকায় আমার কি হবে? বাড়ী ভাড়া

লাগে না, পনের টাকাতেই সব খরচ কুলিয়ে ওঠে। কি হবে আমার এত টাকা? মাস কাবারে মাইনে পেয়ে টাকা দিয়ে কত ছিনিমিনি খেলেছি।

সকাল বেলা বাঁশীর শব্দে ঘুম ভেঙ্গেছে। ছুটে গেছি কলে সেই বড় চাকাটার পাশের ঘরে, মস্ত বড় একটা চাকা, অসংখ্য তার দাঁত। এক একটি দাঁতে যেন কলের এক একটা কর্ম্মীর প্রাণ বাঁধা—রূপকথার রাক্ষসপুরীর রুদ্ধঘরের পাখীর মত, পাখীটাকে মারলে রাক্ষস মরবে, নইলে ওরা অমর।—শুধু শেষ দিকটাতেই আমাদের মিলত না।

পশ্চিমের একটা ব্যাপার আমাকে আজ হাসিয়ে তোলে, রাগও হয় নিজের উপরে। বড় সাহেব আর বড়বাবুতে বনিবনা হতনা, দুজনেই মাতাল। বড়সাহেব একটু শান্ত ধরণের; বড়বাবু রুদ্রমেজাজ। নেশার ঝোঁকে তিনি একাই বোধহয় সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করতে পারেন! বড়সাহেব তাঁকে যা কিছু বলার বা তিরস্কার করার তা সময় বুঝে করতেন। তিনি আমায় খুব স্নেহ করতেন, বোধহয় সেই জন্যই বড়বাবু আমায় দেখতে পারতেন না। হয়ত তিনি ওখানে না থাকলে আমায় কলকাতায় ফিরে আসতে হত।

বিলেত থেকে সাহেব এসেছেন কাজকর্ম্ম দেখতে। বড়বাবু সেদিন একটু মাত্রা বাড়িয়েছিলেন। আগের রাতে বোধ হয় ঘুমও তেমন হয়নি। বড়সাহেব ঠিক আছেন। দুজনের কর্ত্তব্যজ্ঞানের পার্থক্য দেখে দুঃখ হল মনে, হাজার হলেও বড়সাহেব সাহেব বড়বাবু বাবু। আমার সেই সুদূর বঙ্গভূমিতেই মানুষ হয়েছেন। চেষ্টা করলে হয়ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কুটুম্বিতার একটা হারানো সূত্রের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। তাঁকে আমি মনে মনেও কোনোদিন অশ্রদ্ধা করিনি।

বিলেতের সাহেবের কাছে পরিচয় দিলেন আমিই এই অফিসের বড়বাবু। আমাকে আগে থেকে সে ভাবে শিখিয়ে নিয়েছিলেন। অবস্থা সুবিধে নয় দেখে বড়বাবুর হাতটি ধরে বড়সাহেব তাঁকে লাঞ্চরুমে নিয়ে শুইয়ে দিলেন। দোরে তালা লাগিয়ে দিলেন। বড়বাবু সেদিন কোনো হৈ চৈ করেন নি।

শুনলাম বড়বাবুর উপর সাহেব বেজায় খাপ্পা হয়ে আছেন। একটা গুজব রটল, তাঁকে আর কাজে রাখা হবে না। বুকের ভিতরটা একটু কেঁপে উঠল। বড়বাবু তাঁর চেয়ারে বসেন বলেই বড়বাবু। নইলে কাজকর্ম্মের দিক দিয়ে আমি তাঁর চেয়ে কম কিসে?—ভাবলাম, কালথেকে কি চল্লিশ টাকা আড়াই শতে পরিণত হবে?

তারপরের কথা বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। বড়বাবুর কাজ যেতে দেইনি। আমাকে কেউ বলেছে ভীরু, কেউ ভেবেছে বোকা, আরও কতলোকে কতকি ভেবেছে। কিন্তু ব্যাপারটা যে সত্যিকারের কি তা' আমি কাকে বোঝাব?

সতীশের চিঠি মাঝে মাঝে পেতাম, খুব অনুযোগ করে লেখা, পশ্চিমে আসা আমার ভালো হয়নি। কলেজে পড়াই উচিত ছিল। আমার মত ছেলের পক্ষে চল্লিশটাকার লোভের কাছে মাথা নত করা সাজে না। ওর জীবনে খুব বড় একটা উদ্দেশ্য আছে। কখনো আমার সাথে দেখা হলে তা আমাকে বলবে, কখনো কখনো উপদেশ দিত। কখনো লিখত জীবনটা ওর কাছে আর ভাল লাগেনা। ও কি যে চায় বুঝে উঠতে পারেনি। যা চেয়ে এসেছে ও তাই পেয়েছে, কিছু চাইতেও আর ইচ্ছে করেনা। যে গুলি ওর নাগালের বাইরে তাদের জন্য আগ্রহ হয় মাঝে মাঝে; কিন্তু সেগুলি পেলে ও আর তাদের প্রয়োজন দেখেনা।—একরকম মাথামুণ্ডু অনেক কিছু। এসব চিঠির উত্তর দিতাম না, ভাবতাম পরের চিঠি-খানা হয়ত ওর বিয়ের নেমন্তন্ন নিয়ে আসবে।

বছরের পর বছর কাটতে লাগল। সতীশের বিয়ে হয়ে গেছে। আমি যাইনি দেখে দুঃখ করে চিঠি দিয়েছিল। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, হয় ত আমার অন্যায়ই হয়ে গেছে; অবেশ বৌদির কাছে সেজন্য মাপ চাইছি। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের বিচার মনে রেখে চাকরী করতে গেলে সবদিকের সামঞ্জস্য বজায় থাকেনা। সে চিঠির উত্তর পাইনি। তার পরপর আরও অনেক চিঠির কোনো উত্তর আসেনি।

৭

পশ্চিমের জীবনটা খুবই একঘেয়ে ছিল। কিন্তু সেটা যে একঘেয়ে সে কথা ভেবে একটু আনন্দ হত। ভাবতাম

এভাবে কতদিন চলবে এই বিদেশে, এই কলের শব্দ শুনে, খাতার পর খাতা লিখে, ঘড়ির কাঁটার সাথে জীবনকে খুব শক্ত করে বেঁধে ?—

অনেকদিন পরে সতীশের একখানা চিঠি পেলাম। রমেশের বিষয় লেখা। একটা প্রেমের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে ও এসিড্ খেয়েছিল। মেডিকেল কলেজের চেষ্টায় বেঁচে গেছে। কতদিন ধরে ওকে দেখা যাচ্ছেনা। বোধহয় পশ্চিমের দিকেই এসেছে। চেহারা ওর খুবই খারাপ হয়ে গেছে। আমার সাথে দেখা হলে আমি যেন ওকে আটকে রাখি আর সতীশকে একখানা টেলিগ্রাম করে দেই।

মন থেকে যেন একটা কালো মেঘ সরে গেল। এও ত জীবনের মস্ত একটা দিক। কতলোকের সকল জীবন এই নেশাতেই কেটে গেছে। একে ছেড়ে তাদের দেখতে গেলে তাদের অস্তিত্বের কোনো মানে হয়না। কত কবি এর উপর অমর কবিতা লিখে গেছে, আর এসিড খাবার প্রেরণাও রমেশ পেয়েছে এর থেকে। ভাবলাম, ওসব ভেবে আর কি হবে, রমেশের খোঁজেই থাকব আজ থেকে। যদি ওর সাথে দেখা হয়, যদি ওকে বলে বোঝাতে পারি।

রমেশের জন্য দুঃখ করে সতীশকে একখানা চিঠি লিখলাম। আমাকে যেন ও ব্যাপারটা একটু খুলে লেখে। সতীশ আমার চিঠির উত্তর দেয়নি।

রেলষ্টেশনে অনেক ঘোরাঘুরি করেছি; শূন্য নদীর তীরে, নির্জ্জন মাঠে অনেক বেড়িয়েছি; রমেশের দেখা কখনো পাইনি। বছরের পর বছর কেটেছে। বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে খোলা হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে চেয়েছে;—তাকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারিনি। কতবার ইচ্ছে হয়েছে ফিরে যাই দেশে, সেখানে থাকব সেই নদীর কূলে জীবনের বাকী কটা দিন লোকচক্ষুর অন্তরালে, একদিন শুভমুহূর্ত্তে চিরকালের তরে চোখ বোজার জন্য — আবার সেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়েছে। ভেবেছি সেই ছোট গ্রামটীর বুকে এখনো মেঘের ছায়া খেলে; নির্জ্জন দুপুরে এলোমেলো হাওয়া হুহু শব্দে বয়ে যায়; নদীর কুলকুল ধ্বনি দুই তীরকে কাঁদিয়ে তোলে; সবই আছে আগের মত শুধু সেই চারটি ছেলেকে আর হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছে দেখা যায় না। তাদের কথা হয়ত ওখানে কেউ মনে রাখেনি। কিন্তু তারা যদি আবার একসাথে সেই নদীর তীরে মিলতে পারে, বনের পথে খেলতে পাবে, চারিদিকে একটা মহান উৎসব লেগে যাবে। পাখীগুলি গান আরম্ভ করে দেবে যে গান তারা কোনোদিন গায়নি; নদীর তরঙ্গে নতুন নৃত্য ফুটে উঠবে আর দখিন হাওয়া সবচেয়ে মৃদু গতিতে ফুলের মধুরতম গন্ধ বয়ে ছুটে আসবে।

আর দেরী করতে পারিনা। চুলে পাক ধরেছে। কলের ডাক্তারবাবু চশমা পরার ব্যবস্থা দিয়েছেন। এদের মতনই হঠাৎ একদিন ডাক এসে পড়বে। কাজ ছেড়ে দিলাম। চড়লাম কলকাতার ট্রেণে। বাঁড়ুয্যে মশাইত নেই, সতীশের ওখানেই উঠব।

শেষের ব্যাপারগুলি আর তেমন কিছুই নয়। আমার চোখে তারা খুব বড় আকার ধরতে পারে, কিন্তু গোড়া থেকে তাদের আমি ঠিকভাবে দেখতে শিখিনি, সেটাকে আমি আমার নিজের দুর্ব্বলতা বলেই বলব।

মস্ত বড় বাড়ী সতীশের, ও কলকাতার নামজাদা ব্যবসদার। বাড়ীর দরোয়ান আমাকে ঢুকতে দিলনা প্রথমে। অনেক চেষ্টায় সতীশের সাথে দেখা করেছিলাম। আমায় দেখে ও বলল—"কাকে চান ?"

কাকে চাই—অনেক করেও তা ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। ওর সাথে আর অল্প যে কয়টি কথা হয়েছিল তা বলতেও সাহস হয় না। চুপ করে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

এই রাস্তাকেই একদিন মস্ত বড় একটা নদী ভেবেছিলাম। আমার চোখে ভেসে উঠল আর একটা নদী। বাধা কুকুরটা সাঁতরে সাঁতরে তাতে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মধুকে আর একবার ডাকলাম, খুব জোরে প্রাণের সব কান্না ফুটিয়ে—"ওরে দাঁড়া, তোর বৈঠা একটু থামা, নৌকার মধ্যে আমায় একটু স্থান দে। চাইনা পৃথিবীকে, আমরা তিনজন অনন্তকাল ধরে এই নদীতে বেয়ে যাবো, কেউ আমাদের বাধা দিতে আসবে না…

শ্রীঅচ্যুত রায়

রৌদ্র-সমুদ্র

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

গগন-কোলে
যেন সাগর দোলে—
ওরে রোদের বারি।
যেন কপালি স্রোতে
ঝরে অসীম হ'তে,
আহা, ফোয়ারা-ঝারি!
ভরি' মাঠে ও গাছে
পাতায় নাচে
রোদের ধারা;
ভরিয়া দিশি,
ধূলায় মিশি'
বহে প্লাবন পারা।
আজ যেখানে দেখি—
মরি একি রে একি
বড় সাগর যেন
প্লাবিয়া ধরা
রাজে আকুল করা
হরষ হেন।
ওরে ভুবন-প্লাবী
আর গগন-ব্যাপী
মহাসাগর সম
রহে রোদ দাঁড়ায়ে,
লহে ধরা ভাসায়ে,
ভাসে এ দেহ মম।

শরতের গান

শ্রীফাল্গুনী রায়

বল্ কোন্ দেশে এতদিন ছিলি লুকায়ে,
আজ এলি হেথা ধরণীরে ঝলমলায়ে।
অধরের হাসিটুক
ভরে দিল সারা বুক,
দেখ চঞ্চল মৌমাছি গুনগুনায়ে,
তোর কাছে এসে দেয় যেগো গান শুনায়ে।

তুই ভুলেছিলি কেন বল এ-পৃথিবীরে,
জুঁই কেঁদে কেঁদে সারা হয় নয়ন-নীরে।
পাহাড়িয়া ছোটনদী
ছলছলে নিরবধি;
আজ নবতান তুলিলিরে বীণার মীড়ে,
তাই হেসে হেসে শিউলিরা ঝরেগো ধীরে।

নীল পদ্মেরা খেলা করে দীঘির জলে,
চিল ডানা মেলে আকাশেতে উড়িয়া চলে।
মালতীর লতাগুলি
বাতাসেতে ওঠে দুলি'—
বনে বেণু বাজে মৃদুস্বরে ছায়ার তলে;
যেন সবুজের বান এলো—প্রতিটি পলে।

আয় বুক জুড়ে—ওরে আয় আমার ঘরে
তোর সাদা কেশ খুলে দেরে কানন-পরে!
আশ্বিনে সারা প্রাণ,
গেয়ে ওঠে তোরি গান;
চোখে ক্ষণে ক্ষণে হরষেতে বাদল ঝরে!
আয় বুক জুড়ে ওরে আয় আমার ঘরে!!

কাব্যের ভূমিকা

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

আবার জ্যোৎস্নাবাসে বর্ষা নামিয়াছে।

দামোদরের রৌদ্রতপ্ত শুষ্ক বালিরাশির উপর দিয়া ঘন গেরুয়া জলের তীব্র স্রোত আবার বহিতে আরম্ভ করিল; আবার জেলেপাড়ায় নূতন জাল বুনিবার এবং পুরাতন জাল মেরামত করিবার ধুম পড়িয়া গেল। কেহ-কেহ ইহারই মধ্যে গ্রামের দিকের তার বেড়িয়া এখানে ওখানে সেখানে বড় বড় বাঁশ পুঁতিয়া পোনা ধরিবার জন্য জাল বাঁধিতেও লাগিয়া গেছে।

এখন নদীতে খুব অল্প জল। জল একটু বাড়িলেই রতন, বংশী প্রমুখ জেলেরা ইলিশ মাছ ধরিবার তোড়-জোড় লইয়া মাঝ-নদীতে 'তিয়াই' পুঁতিয়া তাহার উপর উপু হইয়া বসিবে। মানার উপর লজ্জাবতীলতাগুলির কাছে দাঁড়াইয়া কত বর্ষায় শৈলবালা তাহাদের মাছ ধরা দেখিয়াছে। জলে ভিজিবে, রৌদ্রে পুড়িবে, তথাপি তাহাদের নড়ন-চড়ন থাকিবে না; জলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠায় বসিয়া থাকিবে। গাঢ় গৈরিক রঙের কর্দমাক্ত ঘোলা জলের ভিতর মাছের গতি কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবে কে জানে, মাথার উপর জাল ঘুরাইয়া ঝপ্ করিয়া জলে ফেলিয়া দিবে—সারা দিনে মাত্র দুই-তিন বার; কিন্তু প্রায় অব্যর্থ! গুটাইয়া তুলিলে মানার উপর হইতেও দেখিতে পাওয়া যাইবে—জালের ভিতর রূপালি মাছ ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিয়াছে।

দামোদরের জন্যই এ গ্রামের বর্ষার সৌন্দর্য্য এত মনোহর।

হু হু করিয়া রাত্রিদিন পুবে বাতাস নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বহিয়া চলিয়াছে; আকাশে মেঘের পরে মেঘ। কখন আলো, কখন ছায়া; কখন ঝম্‌ঝম্ ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি, কখন বা ঝিরঝির করিয়া আকাশ হইতে অবিরাম জলের গুঁড়ি ঝরিয়া-পড়া। তীরে দাঁড়াইয়া অনুকূল, প্রতিকূল যেদিকে ইচ্ছা চাহিয়া দেখ—দূরে, নিকটে, এখানে, ওখানে নদীর বুক ঝাপসা করিয়া ধারাজলের ঝালর নামিয়াছে।

এমনই বর্ষার ক্ষণিক বর্ষণ-ক্লান্ত এক ছায়া-স্নিগ্ধ সুন্দর প্রভাতে, দামোদরের তীরে, বর্ষণ-ধৌত বনানীর সবুজ পট-ভূমিকায় আমাদের কাব্যলক্ষ্মীকে এই দেখিতে পাইলাম।

দেখিলাম—শৈলবালা আর সে শৈলবালা নাই। তাহার রূপে ও যৌবনে, ভরা দামোদরের মত দেহের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতায় একদা নির্ঝরিণীর মত চঞ্চল ফুটফুটে ছোট মেয়েটি কবে-না-জানি ডুবিয়া গেছে, আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া দায়! তাহার সেই নিয়ত-চঞ্চল বড় দুটি চোখের দীর্ঘপক্ষ্ম পল্লব দুইটি এখন শান্ত গভীরতায় আষাঢ়ের বিদ্যুদ্‌-গর্ভ ঘন মেঘেরই মত গম্ভীর। তাহার কথায় বেশে ও গতি-ভংগিতে এখন একটি আত্মবুদ্ধ সত্তার শান্ত ও সংযত প্রকাশ।

দুই

সকালে ঘাট সারিয়া শৈলবালা বাড়ি ফিরিতেছিল। পাড়ের উপর সরু পায়ে-চলা পথটির পাশে বাবলা গাছটার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইল—অনতিদূরে খালি গায়ে গাড়ু হাতে দাদামশায় পাড় ভাঙিয়া নদীর কোলে নামিয়া যাইতেছেন আর চিৎকার করিয়া বলিতেছেন—"বলি, ও জেলের পো, ইলিশ ধরতে কবে থেকে লাগবে বল দিকি? পয়লা নম্বরের মাছগুলো আমার দুয়ারেই রেখে এসো কিন্তু; বড় কুটুম আসছে আবার আজ কালের মধ্যে।"

কথাটা সে ইহার আগেই মণিমালার নিকট শুনিয়াছে। মণি তাহার সই, দাদামশায়ের মেয়ে:—শুনিয়াছে যে, অমল আসিবে। অমল দিদিমার ভাই, কলিকাতায় থাকে।

অমলকে সে জানে। সেই সে-বছর এমন দিনেই সে এখানে আসিয়াছিল। একটি সুন্দর মত ছেলে। বাঁকা করিয়া বোতাম দেওয়া জামা, সদা বিনয়পূর্ণ হাসিমাখা মুখ-ভাব, কেহ তাহার সহিত কথা কহিলেই চোখ নামাইয়া একটুখানি হাসিয়া-ফেলা,---সে এক অদ্ভুত। কিন্তু ভারি ভাল লাগিয়াছিল সত্যি।

শৈলবালা দিদিমার কাছেও শুনিয়াছে যে,অমল আসিবে; কিন্তু দাদামশায়ের কাছে এখনও শোনে নাই আসলে দাদামশায়ের মুখে কথাটা শোনাই কিন্তু তার মনের সাধ। না জানি তিনি কত-কি রংগ-ভঙ্গি করিয়া কথাটার উত্থাপন করবেন, না-জানি তিনি হয়তো-বা তাহাকে এমন সব মধুর লজ্জায় জড়াইয়া ফেলিবেন যে, শেষ পর্য্যন্ত লজ্জা চাপিয়া থাকাও হয়তো বা তাহার পক্ষে দায় হইয়া উঠিবে।

শৈলবালা চুপি চুপি দাদামশায়ের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

দাদামশায়কে শৈলবালা বড় ভালবাসে। দাদামশায় মণির বাবা; দূর সুবাদে তাহার দাদামশায়। যদিও দাদামশায় হইবার উপযোগী বয়স তাঁহার নয়; শৈলবালার বাবার চেয়েও বয়সে তিনি ছোট।

আস্তে কথা বলা তাঁহার কোষ্ঠীতে নাই; চিৎকার করিয়া তিনি জেলের-পো'দের বলিতেছিলেন---"চিরটা জম্মো কেলে হাঁড়ি ভাসিয়ে ভাসিয়েই তোদের বুদ্ধি ভেসে গেল! বলি, পরামোশ দিই শোন্;—ঐ হোতা একটা বাঁশ আর হোতা একটা বাঁশ পুতেদে---"

দিক্ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শৈলবালার দিকে তাঁহার চোখ পড়িয়া গেল। শৈলবালা জিজ্ঞাসা করিল—"আপ-নাদের বাড়ীতে কে আসবে দাদামশাই?"

পরম বিস্ময়ে দাদামশায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া গেল :— "জাননা? রাজপুত্তুর আসচেন যে, আমাদের গাঁয়ে মৃগয়া করতে!"

যাহা সে ভাবিয়াছিল ঠিক তাহাই! সকৌতুক আগ্রহে শৈলবালা প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল; দাদামশায়ের গল্প আরম্ভ হইয়া গেছে।

এক বর্ষার দামোদরে ময়ূরপঙ্খী ভাসাইয়া যাইবার সময় এই গাঁয়েরই নদীর ধারে কোন্ এক মেয়েকে দেখিয়া-যাওয়া অবধি রাজপুত্রের নাকি মন-ফস্‌ফসানি ব্যামো। সে এক ভারি কঠিন ব্যামো। সমস্ত দিন-রাত্রিই নাকি মনের ভিতর ফস্‌ফস্ করিয়া একরকম শব্দ হইতে থাকে। এক সন্ন্যাসী আসিয়া বলিয়া গেছেন—সেই মেয়েরই মনের কাননে মৃগয়া করিতে না পাইলে না-কি এ-ব্যামো সারিবে না। সেইজন্যই রাজপুত্রের এ-গাঁয়ে আসা। নতুবা এ-গাঁয়ের বনে তো শুধু ব্যাং আর শ্যাল! এক সাপ কিংবা 'ভূতো' হইয়া আসিতে না পারিলে এখানে বাছাধনের কোন জারিজুরিই চলিবে না।

তা সে যাহাই হউক, এখন মহা দুশ্চিন্তার কথা এই যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও সে-মেয়েটির কোন হদিস কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। শৈল কি এ-বিষয়ে তাঁহাকে কিছু সাহায্য করিতে পারে?

আগেকার দিন হইলে দাদামশায়ের মুখে হাত চাপা দিয়া, অথবা নিজের কানে অঙুল টিপিয়া চিৎকার করিয়া কথার মধ্যপথেই শৈল তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিত; আজকাল সে শুধু লজ্জা পাইতে পারে। কি-জানি-কেন এই ধরণের লজ্জা পাইতে আজকাল তাহার খুবই ভাল লাগে।

আরক্ত মুখে হাসি টানিয়া "জানিনা আমি কিচ্ছু" বলিতে বলিতে পিছন ফিরিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দাদামশায়ের ধরণই এই!

সেবারে অমনি ফস্ করিয়া একদিন বলিয়া বসিলেন— "তোমাকে তো অমলের খুবই পছন্দ; শুধু তুমি তাকে পছন্দ কর কি না এইটুকু জানলেই—" বলিতে বলিতে তখনই আবার অমলকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই দেখ ভাই আমাদের শ; মানে শৈলবালা। এর বড় ইচ্ছে যে, তুমি এর বর হও; শুধু তোমার একে পছন্দ হয়েছে কি না সেইটুকু জানলেই—"

লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া ঘর ছাড়িয়া অমলের চলিয়া যাওয়ার সুন্দর ছবিটি আজও শৈলবালার স্পষ্ট মনে পড়ে।

আর একদিন—এক পেয়ালা চা ও একটি পিরিচে কিছু পান ও মসলা দিয়া দিদিমা তাহা অমলকে দিয়া আসিতে

বলিয়াছিলেন। খুব মন দিয়া লজ্জা সামলাইয়া যখন সে সদরঘরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দিদিমার ভাই তখন দুই হাতে জানালার গরাদে ধরিয়া তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া বাহিরে কি যেন দেখিতেছিলেন। সমুখে যাইবার উপায় ছিল না, পাশে গিয়া দাঁড়াইতেও তাহার সাহসে কুলায় নাই; দুই হাতে দুই পাত্র ধরিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া তাহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

ইহারই মধ্যে ফাজিলের শিরোমণিটি চুপিচুপি কখন্ যে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা মোটেই শৈলবালা টের পায় নাই।

"—তাই তো' বলি! কানে দুল, মাথায় ফুল, আলতা পায়ে, এলোচুল—এমন পরিপাটি সজ্জা করে—চুপুচুপু এ-ঘরে এসে—মানে—এইবার কিন্তু হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলে ভাই!"

এমনিই সে অনেক লজ্জাকর কথা।

যেম্‌নি দাদামশায়ের কথার ছিরি, মোটা ধ্যাব্‌ড়া গলায় চিৎকার করিয়া হাসিবার ভংগিও কি ঠিক তেম্‌নি। চকিতে অমলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছিল—অমল তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছে। সে যেন মাটিতে মিশিয়া গেল!

অপরিসীম লজ্জায় অসহায়ের মত ডুবিয়া যাইবার অভিজ্ঞতা জীবনে সেই তাহার প্রথম!

লজ্জা তাহার করিত না নিশ্চয়ই, যদি না সকলে দুষ্টুমি করিয়া অমলকে তাহার বর বলিয়া ঠাট্টা করিত। নতুবা, তাহার না-কি তখন অমলের কথা অমন করিয়া ভাবিবার বয়েস!

বলিতে গেলে, সে তখন তবু ছেলেমানুষই! যত তার লজ্জা হইত তাহার চেয়ে, সে-সব দিনে, রাগই হইত তাহার বেশি। আজ কিন্তু এই সব কথা ভাবিতে গেলেও গায়ে কাঁটা দেয়, অকারণ আবেশে তাহার চোখ মুদিয়া আসে।...আশ্চর্য্য!

তিন

স্মৃতি ও স্বপ্নে আবিষ্টচিত্ত শৈলবালা যখন ঘরে আসিয়া উঠিল, ঝিরঝির করিয়া তখন বৃষ্টি নামিয়া গেছে। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মল্লিকদের চঞ্চলা-দি ঠাকুমার সহিত গল্প আরম্ভ করিয়াছেন:

তাঁহার কোন্ এক প্রজার নিকট বাকি খাজনার তাগাদা করিয়া পাঠাইতে, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিবার অনুরোধ জানাইয়া সে দুইজোড়া বেশ বড় দেখিয়া কুমড়া পাঠাইয়া দিয়াছে। দেড় টাকার আলু কেনাই আছে, কিছু বেশি পরিমাণে পোস্ত জোগাড় করিতে পারিলেই আগামী জল-কাদার দিনগুলায় আর তরকারির ভাবনা ভাবিতে হইবে না।...

শৈলবালার খোঁপার দিকে চোখ পড়িতেই তাঁহার অন্য ভাবনা আরম্ভ হইয়া গেল। বলিতে লাগিলেন—"কাণ-দুটোকে অমন করে তোরা চুল দিয়ে ঢাকিস ক্যানে বল্‌তো? কী বাহার হয় ওতে? বললে, বলবি ট্যাঁক্ ট্যাঁক্ করে! তা বাছা অত্যেরণ সইতে পারিনে!—চুল বাঁধ না ছাই! আমাদের রাজুকেও দেখি চুল বাঁধতে বসে চার পহর ধরে এমনি করে কাণই ঢাক্‌চে, কাণই ঢাক্‌চে—"

কাণ ঢাকিবার ভংগিতে তিনি বাড়াবাড়ি করিয়া হাত নাড়িতে লাগিলেন।

কাণ ঢাকা দিয়া চুল-বাঁধা চঞ্চলা-দি দু-চক্ষে দেখিতে পারেন না। ঠাকুরমার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন—"আজকালকার মেয়েদের, দিদি, পোড়া দেহে আর লজ্জা শরম রইল না; যত লজ্জা কাণে। তা অতই যদি লজ্জা করে বাছা কাণ দেখাতে ও-দুটো কেটে ফেল্লেই পারিস!"

ঠোঁট-কাটা চঞ্চলা-দি'কে শৈলবালার বড় ভয়। কোন্ কথা হইতে কখন্ কোন্ কথা বলিয়া বসিবেন কিছুরই ঠিক নাই। শৈলবালা তাড়াতাড়ি তাঁহার চোখের সামনে থেকে সরিয়া বড় ঘরে জামা কাপড় ছাড়িতে ঢুকিয়া গেল। আজকালকার মেয়েদের ধরণ-ধারণের বিরুদ্ধে চঞ্চলা-দির তীব্র সমালোচনা কিন্তু থামিল না:

আসছে কালের মেয়েদের লজ্জা হয়তো নাকে গিয়া ঠেকিবে; হয়তো তাহারা বলিবে—কিছুর-মধ্যে-কিছুনা, ঠোঁটের উপর বিধাতা নাকটাকে অমন উঁচু করিয়া গড়িলেন কেন? এই-আর-কি ঢাক নাক! কিন্তু মাথার চুল দিয়া

নাক ঢাকিবার অসুবিধা বিস্তর। অতএব পরম হৃষ্টচিত্তে চঞ্চলা-দি আঁতুড়েই মেয়েদের নাক কাণ কাটিয়া দিবার বিধান রচিতে আরম্ভ করিলেন। শৈলবালা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, তিনি বলিতেছেন "নাক-কাণ-কাটা মেয়েদেব আর লজ্জার বালাই থাকবে না দিদি; সব-রকম ধিংগিপনা করে বেড়াতে তখন আর তাদের আপত্তি থাকবে না!---"

লজ্জায় শৈলবালা দাঁত দিয়া জিভ চাপিয়া ধরিল। চঞ্চলা-দির রকমই ওই! সেদিন শৈলর 'গলার হার' আশালতা শ্বশুরবাড়ী থেকে প্রথম ফিরিয়া আসিলে শৈল তাহার সহিত দেখা করিয়া আসিতে চাহিয়াছিল। এই আর কি, একঘর লোকের সম্মুখেই চঞ্চলা-দি ঠাকুমাকে বলিয়া বসিলেন--- "নতুন বর-উলি মেয়েদের সংগে নাতনিকে যখন-তখন মিশতে দিও না দিদি; মাথাটিকে একেবারে 'ভাঁটা-চিবুন' করে ছেড়ে দেবে, সে আমি এই বলে দিলুম।"

বিবাহিতা বান্ধবীদের সংগে মিশিতে তাহার সত্যই কিন্তু একটু ভয়-ভয় করে। অথচ এই ভয়টুকু মনে পুষিয়া তাহাদের সহিত না মিশিয়াও সে থাকিতে পারে না। প্রতিদিন দুপুব বেলায় হয় গংগা, নয় রাজলক্ষ্মী, না হয়তো আশালতাদের বাড়িতে কি-এক দুর্নিবার আকর্ষণে যেন তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইবেই!

ঘরে খিল দিয়া সেখানে তাহাবা যে-আলোচনাই আরম্ভ করুক, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাদের ববের কথা আসিয়া পড়িবেই। কাহার বব নাম ধরিয়া ডাকে, কাহার বর বলে 'ওগো', কাহার বর বলে 'শুনচ?'—এই সব।

ভালবাসার ক্ষমতা লইয়া যদি প্রশ্ন উঠিয়া পড়ে তো শেষ পর্য্যন্ত একে একে সকলেই প্রমাণ করিয়া দেয় তাহার বর-ই এ-বিষয়ে সকলের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান্।

বিমলা হয়তো চালাকি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসে--- "চিঠির নীচে '৩' একটা গোলপানা দাগ কেন কেটে দেয় বলতে পারিস?" রংগিনী ততোধিক ন্যাকামি করিয়া উত্তর দেয়---"তাই নাকি?—কেন বল্ দিকি?---আমার শুনোতেও ভাই একটা করে ঢ্যাঁড়া কাটা থাকে।"

ইতিমধ্যে আশালতা হয়তো গলার কাছে জামাটা ফাঁক করিয়া বুকের ভিতর হাত ঢুকাইয়া একটা টাটকা চিঠিই বাহির করিয়া ফেলে। মেলিয়া ধরিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, অসংখ্য চুম্বনেব প্রতীকস্বরূপ চিঠির নীচে অনেকগুলা বিন্দুপাত করা আছে।

"আমার শুনোতে ভাই, খালি ফুট্কি।"

তাহার পর কাড়াকাড়ি করিয়া ফুট্কি গণনার ধুম! কেহ বলে পঁচাত্তর, কেহ বলে এক-শ চার, কাহারও গণনায়-বা দাঁড়ায়—আড়াই শ'!

এতক্ষণ পরে রাজলক্ষ্মীর মুখ ফোটে; গভীর বিস্ময়ের ভাণ করিয়া গালে হাত দিয়া হয়তো বলে—'ও মা! অ-ত-কু-গু-নো?"

এই আব কি! ঘবে একেবারে হাসির প্রলয় ভাঙিয়া পড়ে; কে কাহার গায়ে গড়াইয়া পড়ে তাহাব আর ঠিক থাকে না। পেট মুঠিতে ধরিয়া কেহ বলে---"পেট গেল মা!" কেহ বলে, "দম বন্ধ হয়ে গেল রে বাবা!" কেহ বা হতবাক্ হইয়া শুধু গোঙাইতেই থাকে।

হাসিব প্রলয় থামিতে-না-থামিতে দেখা যায়, ওদিকে আর এক নূতন আলোচনা উঠিয়া পড়িয়াছে। গংগা রংগিনীকে বলিতেছে—"সকালে আমার ঘুম ভাংতে দেরী হলে ওর বব কি করে জানিস?—কানে সুড়সুড়ি দিয়ে ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।—তোর?"

রংগিনী বলে—"চোখেব উপর নুয়ে প'ড়ে বলে— 'মেলি—রাগো—অলসো—আঁখি—সখি—জাগো'। —আর তোর?"

উত্তবে গংগা রংগিনীর কাণেব কাছে মুখ লইযা যায়; শৈলর বুক ঢিপ্ করিয়া ওঠে।

আবার হাসির ধুম!...

ক্রমে তাহাদের কণ্ঠস্বর মৃদু হইয়া আসে। আলোচনার বিষয় মোড় ফিরিতে ফিরিতে ক্রমে এমনই সংকেতময় গহন গতি লাভ করিতে থাকে যে, শৈলবালা ঘামিতে আরম্ভ করিয়া দেয়; ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে থাকে; আনত দৃষ্টিতে অতি দ্রুত-স্পন্দিত বক্ষের উপর দুই হাত চাপিয়া সে কেবলই ভাবিতে থাকে—আর না, যথেষ্ট হইয়াছে! এইবার নিশ্চয়ই সে বাড়ি চলিয়া যাইবে;—এইবার সে উঠিবে নিশ্চয়ই!

কিন্তু হায়! তাহার অধুনাজাগ্রত দুর্মদ, অবাধ্য মনের বহুগুণ শক্তিশালী বিরুদ্ধ ইচ্ছা জোর করিয়া তাহাকে সেই ঘরে ধরিয়া রাখে; তাহার নড়িবার ক্ষমতা থাকেনা।

অবশেষে যখন সে বাহিরে মুক্ত বাতাসে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন পায়ের তলায় পৃথিবী টলিতে থাকে, সমগ্র দেহ মন তাহার মদির আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

চার

একটির পর একটি করিয়া দিন কাটিতে থাকে আর দাদামশায়ের বাড়িতে অমলের অভ্যর্থনার আয়োজন বিস্তৃততর হয়। শৈলবালার একটি কান ও একটি চোখ সকলের অলক্ষ্যে, বোধ করি তাহার নিজেরও অলক্ষ্যে সেই দিকে পড়িয়া থাকে। কোন ঘরটিতে সে থাকিবে, কোন্ বিছানায় সে শয়ন করিবে, কোন্ বরটি সে পছন্দ করিবে বেশী —এই সব লইয়া দাদামশায় অধিকাংশ সময় ব্যস্ত। দিদিমা দাদামশায়ের এইসব কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মাঝে-মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন—"বিনি কাজেই দিনরাত ব্যস্ত!... আদিখ্যেতা দেখে বাঁচিনে!" ইত্যাদি।

এত ব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু শৈলবালার প্রতি দাদামশায়ের দৈনন্দিন কর্তব্যের ত্রুটি নাই। সকালে ঘুম থেকে উঠিয়া বিছানায় শুইয়া থাকিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিবেন— "ও ভাই শ, ঘুম তোমার ভাংল? তুমি না উঠলে যে আমি উঠতে পারিনে ভাই!"

পাশের বাড়ি থেকে শৈলবালা কোনদিন উত্তর দেয়, কোনদিন হয়ত দেয়না। সে জানে, সে ঘুমাইয়া থাকিলেও দাদামশায় কিছু বিছানায় পড়িয়া থাকিবেন না।

তেমনি দুপুর বেলায় "ও ভাই শ, খাওয়া তোমার হল? তুমি না খেলে যে আমার মুখে অন্ন রুচবে না।" শৈলবালা ভাল করিয়াই জানে, আহারাদির পর দাদামশায় পান চিবাইতে-চিবাইতেই ঐ-কথাটি বলিতে বেশী ভালবাসেন

রাত্রেও এমনি, দাদামশায়ের উদ্দেশে শৈলবালাকে চিৎকার করিয়া জানাইয়া দিতে হয় যে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নতুবা, তিনি বলেন, সে-রাত্রে তাঁর চোখে না-কি আর ঘুমই আসেনা।

পাঁচ

দু-এক দিনের মধ্যেই অমলের আসিবার দিনটি নির্দিষ্ট হইয়া গেল। মাঝে আর একটি মাত্র দিন বাকি।

সন্ধ্যায় নদীতে জল আনিতে যাইবার জন্য তাহার সাধ করিয়া কেনা ছোট পিতলের কলসীটি কাঁখে লইয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই দাদামশায় সদর ঘরের রোয়াক হইতে ডাকিলেন—"ও ভাই শ, এই অবেলায় কলসী কাঁখে জলকে চলেছ বুঝি?"

তাঁহার কথার ধরন শুনিয়া শৈল হাসিয়া ফেলিল।

দাদামশায় বলিলেন, "তোমার আজকালকার হাসিটি দেখে ভাই, ভা-রি ভাবনা জুটেছে মনে। মৃগয়া করতে তো আসছেন বাছাধন, শেষে নিজেই না ঐ হাসির খোঁচায় চিৎপাত হয়ে পড়েন!"

শৈলবালা মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি ঘাটের পথে পা বাড়াইয়া দিল।

আসিবার পথে দেখিল বায়েদের ছোট্ট ছেলেটি পিছনের দিকে হাতদুটি জড় করিয়া কাঠমল্লিকা গাছটির তলে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শৈল তাহাকে ডাকিয়া বলিল— "এই বুলটু বিসকুট নিবি?"

বুলটু একমুখ হাসিয়া ধূলাকাদামাখা হাতখানি শৈলর দিকে বাড়াইয়া দিল। শৈলবালা খানিকটা কলসীর জল লইয়া তাহার গায়ে, মাথায় ছিটাইয়া দিল। বলিল, "এই নে।"

বুলটু বলিল, "তুমি যে বললে বিসকুট?"

শৈলবালা ছেলেমানুষের মত খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল ··"বা রে! আমি তো বলনু বি-স্-টি!"

কী সুন্দর ছেলেটি!

মেয়েদের শৈলবালা মোটেই পছন্দ করিতে পারে না। খেলাঘর বানাইয়া রাজ্যের জঞ্জালের মধ্যে ন্যাতাজোবড়া হইয়া বসিয়া হাত মুখ নাড়িয়া কেবল গিন্নিপনা আর পাকামি! ছেলেদের দেখ দেখি, কেমন সুন্দর! সারাদিন বনে-বাদাড়ে ছুটোপাটি করিয়া সন্ধ্যা হইতে না হইতে দাওয়ায় উঠানে, ধূলায় বালিতে যেখানে হোক গড়াগড়ি দিয়া জগৎ সংসার ভুলিয়া ঘুম!

কাল নিশ্চয়ই বুলটুকে ওপার থেকে সে ভাল বিসকুট আনাইয়া দিবে।

ছেলেবেলায় শৈলর বুদ্ধি ছিল না, তাই মেয়েরাই ছিল তাহার খেলায় সাথি। আজ কল্পনায় শৈল তাহার সে ভুল শোধরাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সেখানে আজও যখন সে ঝড়ের পর মিত্তিরদের বাগানে দাপাদাপি করিয়া আম কুড়াইতে যায়, কোমর বাঁধিয়া কারকুন পুকুরে সাঁতার কাটিতে নামে, তখন যে-সাথিটি তাহার সঙ্গে থাকে সে দস্তুরমত বেটাছেলে। নাম তাহার শৈলবালার ইচ্ছা ও অভিরুচি-অনুযায়ী পরিবর্ত্তনশীল; কখন আলোক, কখন খোকা, কখন বা আবার বসন্তকুমার। বয়স তাহার দশ, এগার, বড় জোর বার; ইহার বেশি অগ্রসর হইবার সাহস তাহার নাই। বন্ধুটির বয়সের সংগে সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া তাহার নিজের বয়সকেও প্রায় ছয়-সাত বছর পিছাইয়া দিতে হইয়াছে।

ছেলেটি ভারি লক্ষ্মী, এবং কখন-সখন পাজি; একেবারে ডাকাত।

চৈত্র মাসে ঝিরঝিরে বাতাসে ভরা সন্ধ্যায়, চাঁদের আলোয় মানার উপর তেতুল গাছের ডালে দোলনা বাঁধিয়া দুজনে পাশাপাশি হয়তো দুলিতে বসিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ শৈলর গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিয়া উঠিবে—"বড্ড ভয় করচে ভাই!"

শৈলবালা কণ্ঠস্বরে নিঃশেষে আদর ঢালিয়া দিবে। বলিবে "ছুৎ, ভয় কিসের? মেয়েদের মত ভারি ভিতু তো তুই!" তাহার মুখের দিকে চাহিতে গেলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠিবে—কী লজ্জা! ছেলেটির বয়স দ্বিগুণ বাড়িয়া গেছে।

কারকুন পুকুরে সাঁতার কাটিতে কাটিতে জলে হাত এলাইয়া দিয়া ছেলেটি যদি বলে "হাত ভেরিয়ে পড়ল ভাই, মলুম ডুবে!" শৈলবালা তাড়াতাড়ি তাহার অবসন্ন দেহটিকে বাম হাতে পরম যত্নে বুকের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া ডান হাতে তীর লক্ষ্য করিয়া সাঁতার কাটিতে গিয়া দেখে ছেলেটি ক্রমেই বড় হইয়া উঠিতেছে। লজ্জায় বুক গুর গুর করিলেও, সে লজ্জার চেয়ে যে ছেলেটির জীবনের মূল্য বেশি, ভাগ্যিস এ বুদ্ধি তাহার আছে!

কিন্তু কল্পনার মুখের লাগামকে কঠিন মুঠিতে ধরিয়া থাকিবার কৌশলটুকুই যা তাহার জানা নাই। অতটুকু কারকুন পুকুরের কূলে পৌছিতে অনাবশ্যক ভাবে তাহার দেরি হইতে থাকে; এবং মনের ভুলে তাহার নিজের বয়সও কোন ফাঁকে না-জানি বর্ত্তমান কালে উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

অবশেষে তীরে পৌছিবার তীব্র অনিচ্ছায় সে নিজের কাছেও যখন সন্দেহভাজন হইয়া পড়ে, তখন চরম লজ্জায় আত্মস্থ হইয়া দেখিতে পায়, হয়তো সে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছে এবং চঞ্চলা-দি ঠাকুমাকে অতিশয় গম্ভীর মুখে জানাইয়া দিতেছেন যে, শৈলবালার মত সোমত্ত আইবুড়ো মেয়েদের পক্ষে এমন কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইয়া পড়া, একলা ঘরে মুখ টিপিয়া হাসা এবং এক ডাকে সাড়া না দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণগুলি মোটেই সুবিধাজনক নয়। এমন অবস্থায় অবিলম্বে তাহাদিগকে পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা করাই শাস্ত্রসম্মত।

ছয়

বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া গেল। রান্নাঘরের দাওয়ায় ঘড়ার জল একটু ঢালিয়া তাহার উপর ঘড়াটা বসাইয়া দিয়া বৃষ্টি মাথায় করিয়াই শৈলবালা গা ধুইতে বাহির হইয়া গেল।

কারকুন পুকুরে সে যাইবে না। নিশ্চয়ই রংগিনীরা এতক্ষণে সেখানে আসিয়া জুটিয়াছে। সংকেতে এবং অতিশয় সংক্ষেপে কমলকে কেন্দ্র করিয়া শৈলবালার প্রতি তাহাদের পরিহাসের ধারা আজকাল এমনই একটু বিশেষ পথ গ্রহণ করিয়াছে যে, লজ্জায় সে যথাসম্ভব তাহাদিগকে এড়াইয়া চলিতে চায়।

কাল দুপুর বেলায় গংগাদের বাড়ি গিয়া দাঁড়াইতেই বিমলা বলিয়াছিল—"কাপড়ে তোর হলুদের দাগ কেন রে?" কথাটার মর্ম্ম শৈল প্রথমে অতটা তলাইয়া দেখে নাই।—"কই রে? কোনখানটায়?" প্রভৃতি বলিতে বলিতে হলুদের দাগের অনুসন্ধানে লাগিতেই সকলে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল।

সেইদিনই সন্ধ্যায় একটি কেয়া ফুলের ছোট পাপড়ির

ভিতর দিকে কেয়া-কেশরের রেণু মাখাইয়া মুড়িয়া সে মাথায় পরিয়াছিল বলিয়া রংগিনী বলিয়াছিল—"খোঁপায় কি ওটা কাজললতা গুঁজেছিস নাকি লো ?"

সংগে-সংগেই বিমলা বলিয়াছিল—"মুখখানা দেখ্ শৈলির, —অমনি সিঁদুরপানা হয়ে গেল !"

তাহার চেয়ে কাজ নাই কাবুকুন পুকুরে গিয়া ; মনিমালাদের পাতকো-ই তাহার ভাল।

সাত

সেখানে, কুয়া-তলায়, মণিমালার সংগে তাহার দেখা।

মণি বলিল—"জানিস ? পুৎকি এসেচে কাল ; কোলে তার টুকটুকে একটি ছেলে।"

শৈলবালা বলিল..."জানি ; কাল বিকেলে গেছলুম দেখা করতে। কী আদিখ্যেতা ভাই, ছেলে যেন কখন কারো হয় না !"

মণিমালা হাসিয়া বলিল, "তোর হয় বুঝি ?"

"যাঃ ফাজিল কোথাকার !" বলিয়া শৈল চুপ করিয়া গেল। মণিমালা অনেক অনুরোধ করিল, কথাটা শেষ করিতে ; শৈল বলিল..."আর কথাই নেই তো শেষ করব কি !"

কথা কিন্তু ছিল।

কাল সে যখন পুৎকির কাছে গিয়াছিল, সেইমাত্র সে তাহার নবজাত শিশুপুত্রটিকে পেট ভরিয়া দুধ খাওয়াইয়া শোয়াইয়া রাখিয়াছে। শৈলকে দেখিয়া নিদ্রিত শিশুটিকে সে কোলে তুলিয়া ঘুম ভাঙাইয়া 'ট্যাংকো আমার ! ঝ্যাংকো আমার !' প্রভৃতি নিতান্তই অশ্রুতপূর্ব্ব সে-এক বিস্তৃত ভাষায় তাহাকে আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার এই লোক-দেখান বাড়াবাড়ি শৈলবালার ভাল লাগে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল—শুধু শৈলকে দেখাইবার জন্য সকলের সামনেই পট্ করিয়া জামার বোতাম খুলিয়া ছেলেটিকে পুৎকির স্তন্যদান।

কথাটা সে ইহার আগে কথা প্রসংগে রাজলক্ষ্মীকেও বলিয়াছিল। উত্তরে সে শৈলবালার চিবুকে হাত দিয়া বলিয়াছিল...'হয় লো, অমন হয় ! তোরও যখন হবে তখন বুঝবি।"

রাজলক্ষ্মী আজকাল বরের সংগে কলিকাতায় থাকে। তাহার কথাবার্ত্তার ধরনই ভিন্ন। রাগ করিলে গায়ে মাখিবেনা, উল্টো হোহো হাহা করিয়া হাসিয়া এমন সব কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিবে যে, কানে আঙুল দেওয়া ছাড়া শেষ পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় পথ থাকিবেনা।

চুল বাঁধিয়া দিতে বসিলে বলে..."খোঁপা করিস কেন বল দিকি ? আইবুড়ো মেয়ে খোঁপা করলে প্রজাপতি রাগ করেন ; শিগগির তাদের বিয়ে হয় না। বেণীর ডগায় ফিতের প্রজাপতি বানিয়ে পেছুন দিকে ঝুলিয়ে দিই, বুঝলি ? চলবার সময় মেয়েদের বেণি দুলতে দেখলে ছেলেদের বুক দুর দুর করে, মাথা ঘুরে যায়।..."

লজ্জায় শৈলবালা যেন এতটুকু হইয়া যায় ; বলে..."যাঃ ভাই, তুমি ভারি ইয়ে। অমন করে ঐ সব কথা বলচ... তোমার পাপ হবে কিন্তু দেখে নিও।"

রাজলক্ষ্মী খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠে ; বলে, "পাপ না হাতি !"

গা-ধোয়া শেষ হইলে মণিমালা তাহাকে নিজের ঘরে বসাইয়া দিয়া বলিয়া গেল..."রাত্রে এইখানেই খাবি ; তোর ঠাকুমাকে বলে আসচি থাম্।"

মণিমালার ঘরে ঢুকিলেই দুই জানালার মাঝের দেওয়াল টুকুতে টাঙান একটি চার পাঁচ বছরের পুরাতন দেওয়াল পঞ্জি চোখে পড়ে। পঞ্জির পাতাগুলি নাই ; শুধু রাধাকৃষ্ণের রঙিন ছবিটি আজও কোন মতে বাঁচিয়া আছে।

ছবিটি পটের ছবি নয় ; তাহার চিত্র-সজ্জা অত্যন্ত আধুনিক। যমুনা, কদম গাছ প্রভৃতির বালাই তাহাতে নাই ; কোন যুবক যুবতীর হাফ্ লেংথ্ আলোকচিত্র অবলম্বনে ছবিটা আঁকা। একখানি বইয়ের ফাঁকে তর্জ্জনী রাখিয়া সুডৌল সুন্দর বাম হাতখানি কৌচের হাতায় এলাইয়া দিয়া শ্রীরাধা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কাণে দুল, গলায় 'চেন,' হাতে দুইগাছি করিয়া সোনার চুড়ি এবং ডান হাতটি কোলের উপর আলস্যন্যস্ত।

শ্রীকৃষ্ণ পাশে নাই ; পিছন থেকে আসিয়া শ্রীরাধার দেহ বেষ্টন করিয়া তাঁহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়াছেন

মাথায় শিখিপুচ্ছ; প্রশস্ত উন্মুক্ত বক্ষের সবটুকু ছোঁয়া শ্রীরাধার পিঠ ঘিরিয়া আছে। হাসি হাসি মুখখানি শ্রীরাধার দক্ষিণ স্কন্ধের উপর এমনই কৌশলে ন্যস্ত যে, পিছনের লোকটিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে গেলেই শ্রীরাধাকে লজ্জায় পড়িতে হইবে।

সন্ধ্যার মায়াময় আবেষ্টনে, কম-করিয়া জ্বালা লণ্ঠনের স্বল্পালোকে বহুদিনের এই পুরাতন ছবিখানি শৈলবালার চোখে যেন আজ জীবন্ত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল... এমন ছবি সে জীবনে দেখে নাই। সে তন্ময় হইয়া গেল।—

কী সুন্দর শ্রীকৃষ্ণটি!

ছেলেটিকে সে চেনে। এই ছেলেটিই তাহার কল্পনার বালক-বন্ধু। ইহারই নাম, আলোক...খোকা...বসন্ত কুমার ইহারই নাম অ-ম-ল!

ছেলেটির কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতে করিতে শৈলবালার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। ছেলেটি চালাকের শিরোমণি! অমন করিয়াও আবার বুঝি মানুষকে লজ্জায় ফেলিতে হয়!

শ্রীরাধার মুখে কিন্তু লজ্জার ছায়ামাত্র নাই। এমন নির্লজ্জ মুখভাব শৈলর ভাল লাগিল না।—আর এতক্ষণে শৈলর চোখে পড়িল যে,—শাড়িটি শ্রীরাধার দেহের উপর একটুও সংযত অবস্থায় নাই।

তাড়াতাড়ি শৈলবালা নিজের আঁচলখানি বুকের কাছে সম্বরণ করিয়া লইল। অমলের উচিত হয় নাই এমন অবস্থায় শ্রীরাধার পিছনে আসিয়া দাঁড়ান। এমন অভদ্র অমলকে সে কিন্তু মোটেই সহ্য করিতে পারিবে না।...

—এমনি করিয়াই বোধ হয় মানুষ জগৎ ভুলিয়া যায়; এমনি করিয়াই বোধ হয় মানুষ আত্মহারা হইয়া পড়ে।—

তাই পিছন থেকে আসিয়া অমল অবশেষে শৈলবালারই কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জাজড়িত অনুযোগের সুরে শৈলবালা বলিল—"যাঃ—এমন চমকে দিস!"

মণিমালার নিম্নকণ্ঠস্বর যেন অনুনয়ে ভাঙ্গিয়া পড়িল—"কী দেখছিলি ভাই, অমন আপনহারা হয়ে?—বলবিনা?"

"তোর বরকে।" শৈলবালা হাসিয়া ফেলিল।

"ও! বুঝেছি।"

"কী বুঝেছিস্?"

"বলব?"

শৈলবালা মণির চোখে কী দেখিল কে জানে, বলিল "ন্-না।"

আট

সন্ধ্যা আসন্ন। নিজের ঘরে শৈলবালা চুল বাঁধিতে বসিয়াছে।

সামনের খোলা জানালার দিকে চাহিলে প্রথমেই নিয়ত অপস্রিয়মাণ মেঘমালার দিকে চোখ পড়িয়া যায়। তাহার নীচেই দূরে মিত্তিরদের নদীতীরবর্ত্তী আম-কাঁঠাল-গাছগুলার শীর্ষদেশ চোখে পড়ে: অবিশ্রান্ত বাতাসে কেবলই লুটোপুটি খাইতেছে।

কী সুন্দর!

এমন সুন্দর দিনে থাকিয়া থাকিয়া অকারণেই তাহার মন কেমন করিয়া ওঠে; বুকের ভিতরটা কেমন যেন খালি খালি বোধ হয়। আগে কিন্তু কোনদিনই এমন মনে হইত না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ-কথা কাহাকেও শৈলবালা খুলিয়া বলিতে পারে না; মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে কোথায় যেন খুব স্পষ্ট সে এক ভয়মিশ্রিত সংকোচ মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।

মনের গতিও কি হইয়াছে এক সৃষ্টিছাড়া এলোমেলো পথে! কোন মতেই তাহার ধরা ছোঁয়া পাওয়া দায়। চিরদিন শাসন ও সংস্কারের মধ্যে যে মেয়েটি বড় হইয়া উঠিল, সেই মেয়েটিরই মনের ভিতর এই শাসন-না-মানা দুরন্ত সত্তার নির্দ্দয় প্রকাশ মেয়েটিকে নিজের কাছেই যেন নিরন্তর অপরাধী করিয়া রাখিয়াছে। কথায় কথায় শৈলবালা লজ্জা পাইবে, কথায় কথায় তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিবে, তথাপি মনের নানা নিষিদ্ধ আচরণে চিত্তলোকের গোপন পুলককে সে প্রতিরোধ করিতেও পারিবে না।

শৈলবালার মানস-লোকে এই মেঘমেদুর শ্যামল আকাশ, বর্ষাসজল বনানীর এই স্নিগ্ধ সবুজ পরিবেশের পটভূমিকায়, যৌবনের নবজাগ্রত মায়ামন্ত্রে, যে-সুন্দর ছবিগুলি আজ বারং-

যার আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাদের কথা লজ্জার মাথা খাইয়া সে সহজে কাহাকেও বলিতে পারে না। কেননা, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই ছবিগুলির প্রকাশ, সে দিদিমার ভাই, সে অমল। কাল সকালের প্রথম খেয়ায় সে এ-গ্রামে পদার্পণ করিবে।

ছিপছিপে সুন্দরমত ছেলেটি; কী সুন্দর দুটি চোখ! পুরুষ মানুষের অমন টানা চোখ সে কখনও দেখে নাই। বুদ্ধিতে দীপ্ত, বিনয়ে আনত, সে কী গভীর দৃষ্টি! সত্যি, জগতে নারী ও পুরুষের মধ্যে সুন্দর যদি কেউ থাকে তো সে পুরুষ। দীর্ঘ তাহার দেহের আয়তন, সুগঠিত তাহার দেহ; দীর্ঘ তাহার যৌবন কাল, সর্ব্বাবয়বে সে সম্পূর্ণ! পোড়া কপাল সে মেয়ের, পুরুষের তুলনায় যে নিজেকে রূপবতী বলিয়া ভাবে।

তাহার মনের সমস্ত মধুবন ব্যাপিয়া এই সুন্দর ছেলেটির স্মৃতির রঙে দোল-খেলা সুরু হইয়া গেল।—

ঠিক যেন মনে হয়, সেদিনের কথা। সকাল বেলায় লোহার-তার দিয়া তৈরি সাজি ভরিয়া আঁশের রঙিন ফুল লইয়া সে দাদামশায়ের সদর-ঘরের পাশের গলি দিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। দিদিমার ভাই বাহিরেই বসিয়াছিলেন। তাহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"ও খুকি শোনো!"

খুকি তখন দাদামশায় সে-তল্লাটে আছেন কি না, চকিত দৃষ্টিতে একবার দেখিয়া লইয়া মাথা হেঁট করিয়া অমলের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিয়াছিল—"কি বলচেন?"

"তোমার মাথায় ওটা কি?"

বন-কচুর পাতাকে টুপির মত করিয়া মুড়িয়া কখন্-যে সে মাথায় পরিয়াছিল, তাহা খুকির মনেই ছিল না। লজ্জায় হাসিয়া ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি সে তাহা মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছিল। তিনি পুনরপি বলিয়াছিলেন—"বেশ সুন্দর সাজিটি তো তোমার! আমাকে দেবে?"

পোড়ারমুখী খুকির মুখে আগুন লাগিয়াছিল। মুখপুড়ি কি করিয়া বলিয়াছিল কে জানে যে—'আমি বলে বাবাকে দেব ব'লে এত কষ্ট করে তৈরি করলুম!"

মুখপুড়ি খুকি-শৈলর ঘটে তখন এক রতিও বুদ্ধি ছিল না। থাকিলে কৃতার্থমন্যের মত নিশ্চয়ই সাজিটি সেই প্রিয়দর্শন ছেলেটির হাতে তুলিয়া দিয়া সে বাড়ি ফিরিয়া আসিত।

শৈলবালার ইচ্ছা হয়, সেই নির্ব্বোধ খুকি-মেয়েটার দেখা পাইলে তাহাকে বেশ কিছু শিক্ষা দিয়া দেয়। ঘাড় ধরিয়া ঘরে আনিয়া ভাঙা আলমারিটার মধ্যে 'রাক্কুসি'র মাথা ঢুকাইয়া দেখাইয়া দেয়—'অত কষ্ট করে তৈরি-করা' সাজিটি তাহার ধূলায় এবং মাকড়সার জালে জড়িত হইয়া কেমন পরম সমাদরে সেখানে পড়িয়া আছে।

ছি, ছি, অমন আদর-করিয়া-ডাকিয়া বলা কথার ওই কি উত্তর?

আসল কথা, খুকি-শৈলকে সে হিংসা করে। সে শুধু, অমল তাহার সহিত কথা বলিয়াছিল বলিয়া। আর কি অমল তাহাকে ডাকিয়া কথা কহিবে? না, সে-ই অমলের অত কাছে গিয়া অমন বেহায়ার মত বলিতে পারিবে—"কি বলচেন?"

হিংসা হয় না ছাই! বয়ে গেছে তাহার হিংসা করিতে। বরঞ্চ মাঝে মাঝে মুখপুড়ি খুকি-শৈলটার জন্য তাহার মন কেমনই করে। এবং এক-এক সময় খুব বেশি।

কেন যে মন কেমন করে, সে কথা সে কেমন করিয়া সবাইকে বুঝাইবে বল! এই ভিজে বাতাসের ঝড়ে দোদুল্যমান পেয়ারা গাছের ডালে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পেয়ারা খাওয়ায় যে কী সুখ সে কথা কি কেহ জানে? কেহ কি জানে—বৈশাখী ঝড়ে দামোদরের বালুকাময় শুষ্ক বক্ষে খুব শক্ত করিয়া কোমর বাঁধিয়া চোখ মুদিয়া ঝড়ের প্রতিমুখে ছুটিয়া চলায় কী আনন্দ? বুঝিতে কি পারিবে কেহ—ঝড়ের ধাক্কায় বালির উপর গড়াগড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া ওঠায় কতখানি রোমাঞ্চকর পুলক সঞ্চিত আছে?...বালিকা শৈলবালার জন্য কিছু সাধ করিয়া তাহার মন কেমন করে না।

সে নাই। সে থাকিলে, তাহার পরিত্যক্ত অনাদৃত রঙিন সাজিটি আজ বুকের আঁচলে ঝাড়িয়া মুছিয়া শৈলবালা তবু তাহার হাতে তুলিয়া দিতে পারিত; বলিতে পারিত—তাহার দিদিমার লক্ষ্মী ভাইটির প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া একদিন সে যে-ভুল করিয়াছিল, এইবার যেন সে তাহা সংশোধন করিয়া নেয়।

কিন্তু তাহা হইবার নয়। রূপকথার জগতে মায়াবলে সোনার পাখি কথা বলিতে পারে, হীরার গাছে মুক্তা ফলিতে পারে, সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগিয়া বহু সহস্র বর্ষের নিদ্রা-অন্তেও চোখ মেলিয়া রাজকন্যা রাজপুত্রকে দেখিতে পায়, কিন্তু শৈলবালার জগতে কোন মেয়েরই মধু-শৈশব মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার সমুখে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে না।

পারিলে তো আরও অনেক কিছুই হইতে পারিত! তাহার মনের মধুবনে তাহারই মনের মধুর লজ্জার প্রতীক-রূপে নূতন রীতিতে যে-নূতন রাঙা ফুলকয়টি আজ ফুটিয়া উঠিয়াছে, চুপিচুপি তাহারই কয়েকটি সে কি আর খুকির সাজিতে রাখিয়া দিতে পারিত না? খুব পারিত। শরমে মধুর, আবেগে আনত তাহার স্পর্শাতুর নম্র মনের অনেক রোমাঞ্চকর সুকুমার কথা অমলকে গিয়া বলিবার জন্য চুপিচুপি খুকিকে শিখাইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে কিছুই এমন অসম্ভব ছিল না।

নয়

ফুলের ঐ সাজিটির কথা মনে পড়িতে এমনই বর্ষার আরও একটি রাত্রির কথা স্বতই তাহার মনে পড়িয়া যায়। বহুদিন পরে কর্ম্মস্থল হইতে সে তাহার বাবার আসিবার কথা। বন্যায় ভরিল নদীর বুক, আনন্দে ভরিল তাহার। আদরে সোহাগে সে তাহার বাবার বুকে লুটাইয়া পড়িবে, গল্প করিবে, সাজি উপহার দিবে এবং আরও কত-কি করিবে; বলিবে—'জান বাবা? দিদিমার ভাই এসেচে—অমল; ভারি লক্ষ্মী ছেলে!'

দামোদর উচ্ছ্বসিত হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল; শেষের খেয়ায় ভরা নদের বুক বাহিয়া তাহার বাবাও আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর—তাহার পর স-ব ওলটপালট হইয়া গেল।

আগের দিনের মত স্নেহ-উদার বক্ষে শৈলবালাকে আর তিনি হাত বাড়াইয়া বন্দী করিয়া লইতে পারিলেন না। শৈলবালাও সেই প্রথম বুঝিতে পারিল—তাহার সুমধুর বালিকাজীবনের আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া গেছে; আহ্লাদিপনা তাহার চির দিনের জন্য ঘুচিয়া গেল। সেই প্রথম সে এক বিচিত্র ও অননুভূতপূর্ব লজ্জায় তাহার সমগ্র দেহ মন ভরিয়া গেল; আগের দিনের মত ছুটিয়া গিয়া বাবার কণ্ঠলগ্ন হওয়ার আর সাধ্য রহিল না।

বাবার প্রতি এবং তাহার চেয়েও বেশি তাহার নিজের প্রতি অভিমানে শৈশবেই মাতৃহীনা এই অভিমানিনী মেয়েটির মন ভরিয়া গেল। বাবার বিদায়-বেলায় তাঁহার পদতলে মাথা রাখিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে প্রতিজ্ঞা করিল—সে আর কাহারও সহিত কথা কহিবে না, কোথাও যাইবে না, প্রিয়জনদিগের নিকট বিদায় লইয়া বসিয়া আসিবে—শৈল বালা মরিয়া গেছে।

সে তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছে। দ্রুতপরিণতিমুখী দেহের কাবাকক্ষের মেঝেয় আঁচল পাতিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই-যে বালিকাটি ঘুমাইয়া পড়িল, আজও তাহার আর ঘুম ভাঙিল না।

সেই থেকে সাজিটি তাহার ভাঙা আলমারির এক কোণে ধূলিধূসরিত হইয়া পড়িয়া আছে, শৈলবালা তাহাতে হাত দেয় নাই। যাহার সাজি সে নাই; সে চলিয়া গেছে। এবং যে চলিয়া গেছে সে আর ফিরিয়া আসিবে না।

শৈলবালার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে। সামনের আরসিতে সে নিজের ভারি চোখের প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া লজ্জায় চোখে আঁচল চাপিয়া ধরিল।

ইহাতে চোখে জল আসিবার কী আছে? তাহার অভাব কিসের? রূপে যৌবনে সে সমৃদ্ধ; তাহার সারা দেহ মন ব্যাপিয়া আজ বসন্তের সমারোহ! কোন্ মেয়ে বাল্যজীবনের কথা স্মরণ করিয়া এমন সর্বাংগীন সমৃদ্ধির দিনে বোকা মেয়ের মত চোখের জল ফেলে?

সে মুখে হাসি টানিয়া আনিল। চিরুনি দিয়া পরিপাটি করিয়া কানের কাছের চুলগুলি টানিয়া কান ঢাকিয়া দিল। আরসির দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—সিঁদুরের মত টকটকে লালপাথরের লম্বা দুল দুইটি ঠিক যেন চুলের প্রান্ত ধরিয়া কাঁধের কাছে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সে অনেক্ষণ ধরিয়া নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে চাহিয়া রহিল:

খুকি-মুখপুড়ি আজ অনেক বড় হইয়া গেছে। দেখিতেও

এমন সুন্দর হইয়াছে যে, চিনিতে পারা দায়। চোখের চাহনি আর সহজ নাই ; সেখানে নিবিড় রহস্যের ছায়া । নাক ও ঠোঁটদুইটির গঠন অতিশয় সুন্দর।—রাঙা টুকটুক করিতেছে দুইটি ঠোঁট।

রাজলক্ষ্মী সেদিন তাহাকে বলিয়াছিল—"দিব্যি বলটি ভাই, তোর ঠোঁট দেখে আমার হিংসেয় বুক ফাটে। ভগবান যেন ওদুটি শুধু ইয়ে খাবার জন্তেই সিষ্টি করেচেন।"

সত্যি! একটুও মুখের বাঁধ নাই রাজলক্ষ্মীর। চঞ্চলা দি কিছুই মিথ্যা বলেন না যে, বিয়ে হইলেই মেয়েরা বেহায়া হইয়া যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিল; আর্সিতে আর ভাল করিয়া মুখ দেখা যাইতেছে না। তাছাড়া আকাশে আবার মেঘ করিয়াও আসিয়াছে; আজ আর তাহার গা ধুইতে গিয়া কাজ নাই।

প্রসাধন শেষ করিয়া সে মণিমালার কাছে চলিয়া গেল

দশ

বাড়ী ফিরিয়া শৈলবালা আজ একটু সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সারিয়া লইল। আজ তাহার অনেক কাজ। মাথার কাছের জানালা খুলিয়া, আলো নিভাইয়া দিয়া নরম বিছানাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া অন্ধকারে নিশ্চিন্তে আজ তাহার অনেক রোমাঞ্চকর কথা ভাবিবার আছে। সে সব-ই অমলের কথা। তাহার কথা আজ সে এমন করিয়া ভাবিবে যেমন করিয়া সে ইহার আগে আর কখনও ভাবে নাই। ভাবিতে যদি সংকোচ হয় তবুও সে ভাবিবে; লজ্জায় যদি মুখ রাঙা হইয়া ওঠে তথাপি সে থামিবে না। এই যে ঝম্‌ঝম্‌ ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া আবার জল পড়িতে সুরু হইয়া যাওয়া ; এই যে ঘনায়মান রাত্রির সংগে সংগে গাছে পালায় বায়ুবিতাড়নজনিত মর্মরধ্বনির ক্রমজাগরণ ; ঝিল্লীরব-মুখরিত সজল অন্ধকারের মধ্য দিয়া সমস্ত গ্রামখানির-ই উপর এই যে সুপ্তির যবনিকার শান্ত অবনতি, ইহার কি তুলনা আছে? এমন সুন্দর রাত্রে, এমন বয়সে, যৌবনের এই মোহময় আবেগকে কেন্দ্র করিয়া যেন একটি স্বপ্নময় গীতি-কাব্যের এমন বাস্তবোত্তর আয়োজনের পরিবেষ্টনে একটি চারুদর্শন যুবকের কল্পনাকে গোপনে যদি-বা বুকের কাছটিতে সে একটু লালন করিতেই চায়, তো, তাহাতে কাহার কী-ই বা এমন ক্ষতি। কী-ই বা এমন মহাভারত তাহাতে অশুদ্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু, আশ্চর্য, রাত্রে যখন সে ঘুমাইতে গেল তখন প্রথমেই অমলের কথা সে ভাবিতে পারিল না; রাজ্যের যত ছিন্নসূত্র চিন্তার জালে তাহার মন জড়াইয়া গেল :

খুব ছেলেবেলায় ছাঁচ-তলায় পড়িয়া গেলে কে একজন মেয়েছেলে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া খানিকটা জল ছাঁচের উপর ছুড়িয়া দিতেন। তাহাই গড়াইয়া পড়িলে আঁজলায় ধরিয়া শৈলকে খাওয়াইয়া দিয়া 'ষাঠ ষাঠ' বলিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেন। তিনিই বোধ হয় তাহার মা। শুধু তাঁহার শাড়ির কাল পাড়টুকুই শৈলর মনে পড়ে—আর কিছু না...

চালের বাতা থেকে বৃষ্টির জল টিনের উপর গড়াইয়া পড়িলে কেমন সুন্দর একটি টিং টিং করিয়া একঘেয়ে শব্দ হয়।—রাত্রে কাণ পাতিয়া শুনিতে গেলেই ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসে···

কপালে টিপ পরিবার জায়গার কাছে আঙুল তুলিয়া ধরিলেই অমন বিশ্রী বোধ হয় কেন?—কে জানে।

শৈলবালা আর কিছুই ভাবিতে পারিল না, তন্দ্রায় তাহার চোখের পাতা ক্রমেই ভারি হইয়া গেল। স্বপ্নে দেখিল—নাচ-দুয়ারের পাশের নারিকেল গাছ দুইটার পাতা সব যেন কলাপাতার মত হইয়া গেছে এবং সব নারিকেলেই যেন একটি করিয়া স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা।

খাওয়া-দাওয়ার পর ও-বাড়ি থেকে দাদামশায় যথানিয়মে শৈলকে অনেক ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু আজ সে তাহা শুনিতে পাইল না; গভীর নিদ্রায় তাহার সমস্ত চৈতন্য তখন আচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

* * *

কাল সকালের প্রথম খেয়াতেই সে আসিবে।

সে ভারি সুন্দর, ভারি লক্ষ্মী ছেলে।—দাদামহাশয় আবার তাহার নূতন নাম রাখিয়াছেন, —রাজপুত্র।

রাঙা-আলোয় ভরা সুন্দর সকালে, ভরা নদীর জলে

তাহাকে বুকে করিয়া খেয়া নৌকাখানি স্রোতের অনুকূলে দাঁড় ফেলিয়া নিমেষে নিমেষে গ্রামের অভিমুখে নক্ষত্র গতি লাভ করিবে হয়তো, শৈলবালা কিন্তু তাহা দেখিতে পাইবে না। দিনের খোলা আলোয় ঘটা করিয়া অমলকে দেখিতে যাওয়ায় তাহার বড় লজ্জা!—চঞ্চলা-দির ধারাল ঠেঁটকে হয়তো অগ্রাহ্য করা চলিবে না; সখীরা হয়তো পরিহাস করিবে; রাজলক্ষ্মী হয়তো সকলের সামনেই বলিয়া বসিবে—শৈলিকে মরণ-দশায় ধরিয়াছে।

আজ শৈলবালা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কাল সকালে প্রথম চোখ মেলিতেই যে-দিনটি শৈলর চোখে পড়িবে, এই গ্রামে অমলের শুভাগমনের সেই দিনটির সূচনা। এই গ্রামে তাহার আগমন, শৈলবালার জী-ব-নে তাহার আগমনের সমান; এবং শৈলবালার জীবনে তাহার আগমন, সে আগমন নয়,—আবির্ভাব! হে ভগবান্ সোনার আলোয় যেন দিনটিকে ঝলমলে করিয়া দিও!

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

যৌবন-বিভা

ফজলুস্ সালাম

মানব মনের লালসা যখন পূর্ণাহুতির অনল হ'তে—
এলে জগতের কামনা-লতিকা মূর্ত্ত মাধবী!—মানস-রথে!
চল-চরণের গুঞ্জর-রোলে দোলে বিশ্বের অযুত ভাষা,
তব অঞ্চল-পথ বাহি আসে মরতের নব মদির আশা!
চারু-নয়নের আলো ঝলমল্ মানব হিয়ার কমল জাগে,
শত সাহারার বেদনা বিথারি' তৃষিত অধর অমিয়া মাগে!
মানসকুঞ্জে মুঞ্জরি তব কণ্ঠকাকলী তুলিছে দোলা—
চির ফাগুয়ার কল-হিল্লোলে চিত্ত মুরছি' আপন ভোলা!
বুকে বুকে শত পুষ্প-বিতানে নব মল্লিকা ফুটিয়া হারা,
রচি' মায়াজাল মরত কামনা গন্ধে অধীর পাগল পারা!
জ্যোৎস্না-মদির অম্বর-পথে অমিয়া-লহরী শিহরি' ভাসে,
স্তব্ধ নিশীথে, কূল দোলাইয়া কল কল তান উলসি' আসে!
জাগে উৎসব চল-কল্লোল রচে মায়া স্মৃতি কামনা ভাতি,
যৌবন-বিভা আবেশ মদিরে অধীর করিছে মরত রাতি।
দূরে গেছে আজ নীতি-ক্রন্দন অক্ষমতার অযুত গ্লানি,—
দূরে গেছে আজ চিন্তা বেদনা বাত জাগা মুখে বিলাপ বাণী।
ঢেকে দেবে কার পরশ-প্রলেপে চিরাহত মন বেদনা-ক্ষত;—
মম মরমের দোল-হিন্দোল বেদনা-সিন্ধু তন্দ্রাহত।
হ'কনা ক্ষণিক, হকনা স্বপন, তবু যে মানস-কালিমা হরে;
মানব-মনের মলয় পরশ কারে চাও আজি পরাণ ভরে।

বন্দী ভগবান

শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী

মানুষের অন্তরেতে কেঁদে' মরে রাত্রি দিনমান—
মানুষের স্রষ্টা ওই, বন্দী ভগবান।
পিপাসিত ওষ্ঠ তা'র,
ক্ষীণ কণ্ঠে কহে বারম্বার,
ওরে ফেল, ভেঙে' ফেল দ্বার।…
মানুষ চাহেনা ফিরে,'
অবরুদ্ধ দ্বার তা'র ঘিরে,'
জ'মে ওঠে জঞ্জালের, পাষাণের স্তূপ,
ভগবান নিশ্চল, নিশ্চুপ!
কাল চক্র ঘর্ঘরিছে ভুলি' সুখ দুখ,
তা'র তলে দেয় মাথা যত সব মুক।
অস্পষ্ট ক্রন্দন শুধু জাগে হায়, ব্যথায় অপার,
ছিন্ন-ভিন্ন পিষ্ট করি' কালনেমি ঘুরে অনিবার।
তবুও রাত্রির স্তব্ধ জমাট আঁধারে
কান পাতি' শুনি ক্ষীণ স্বর বারে বারে,—
আহ্বানিছে কা'রে!
ওরে খোল, খুলে দেরে দ্বার!
তোদের জীবনে হোক্ বিকাশ আমার!
সেই আর্ত্ত স্বরে সুপ্ত চমকিয়া ওঠে,
মুখে তা'র তীব্র ব্যথা ফোটে…
মানুষ ঘুমায় ফিরি' পাশ,
জীবনের তীব্র উপহাস!

আবার প্রভাতে নভে রক্তজবা ধীরে ধীরে ফোটে,
সাগর তরঙ্গ সম, নিজ পথে যে যাবার ছোটে।
ছোটার বিরাম নাই, নাই পতনের,
ধূলা বালি লিপ্ত দেহে ফেরে
আঁধারেতে ফের।
এ দিকেতে ক্রমে রুদ্ধ হৃদয়ের অমৃত দুয়ার,
গভীর নিশায় কই, আসেনাক আহ্বান তাহার।
তবে কী ঘুমা'বে দুখে
মানুষের বুকে
বন্দী ভগবান্।
ওঠো, জাগো প্রবোধিত করি, কর—বরে বলীয়ান।
ওঠো, ওঠো তমসায় আবৃত আকাশে
জ্যোতির্ম্ময় তোমার বিকাশে
পথভ্রষ্ট ছন্নজনে দাও—
দাও আলো, দাও প্রাণ, স্নিগ্ধ চক্ষে চাও!
জেগে ওঠো তুমি বিবস্বান,
মানুষের অন্তরেতে সুপ্ত ভগবান।
দিকে দিকে জয়শঙ্খ ঘোষুক তোমার জয়রব,
প্রেমৈশ্বর্য্যে প্রকাশিত অসীম বৈভব
হোক্ সনাতন!
নবরূপে দাও দেখা দেব পুরাতন!!

———

উপন্যাসের উপযোগিতা

শ্রীরাইমোহন সামন্ত এম্‌-এ

পৃথিবীর সকল সাহিত্যে যেমন, তেমনই বাংলা সাহিত্যেও নভেল পরে দেখা দিয়েছে কিন্তু এই নভেলই এখন সাহিত্যের মোটা আসর দখল করে নিয়েছে। নভেলের থেকে কবিতা বা নাটক বয়সে অনেক বড় কিন্তু নাটক কোন রকমে বজায় থাকলেও সাহিত্যের প্রথম সন্তান যে কবিতা সে যেন আর ঠাঁইই পাচ্ছে না—মাসিক পত্রের পাতার নীচে কোন রকমে একান্তে একটু স্থান করে নিয়ে বেঁচে আছে। দেখলে মায়া হয়, আহা রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, ওডিসি, প্যারাডাইস লষ্ট, ডিভাইন কমেডির বংশধরদের এই দুর্দ্দশা!

বঙ্কিমের পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে নভেলকে কে চিনতো। দুর্গেশনন্দিনী লেখা হয় ১৮৬৫ সালে। বাংলা নভেলের সত্তর বৎসরেরও বেশি বয়স হবে না, এরই মধ্যে সে গোটা সাহিত্য দখল করে ফেলেছে; কিছুদিন পূর্ব্বেও যাকে সাহিত্য বলে গণ্য করা হবে কি না সে বিষয়ে মহা তর্ক চলেছিল, সেই আজ সাহিত্যে সর্ব্বে-সর্ব্বা। ইংরাজি সাহিত্যেও নভেল আড়াই শ' বৎসর পূর্ব্বে জন্মায় নাই। নভেল যে সাহিত্য-জগতে নূতন তারকা তা তার নামেই বুঝা যায় কারণ ইংরাজি novel মানে নূতন। নভেলের এই প্রতিপত্তির দিনেও অনেকেই একে সাহিত্য মন্দিরের মধ্যে আনতে নারাজ। কোন ছেলে যদি একটা কবিতা পড়ে, তা সে যত খারাপই হোক না কেন, তার যে সময়ের সদ্ব্যবহার হচ্ছে সে সম্বন্ধে কেউ সন্দিহান হবেন না, কিন্তু যদি বলা যায় যে সে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত বা রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি বা চোখের বালি পড়ছে তৎক্ষণাৎ বুঝা যাবে যে সময়টাকে সে একেবারেই বাজে নষ্ট কচ্ছে। এটা শুধু ছেলেদের পক্ষে নয়,—নভেল পড়ায় পরিণত বয়স্কদেরও সময় বাজে ছাড়া অন্যথা কাটে বলে অনেকেই স্বীকার কর্বেন না। কিন্তু এটা আমাদের একটা কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। হয়ত এর মূলে রয়েছে নভেলের বাল্যাবস্থার হাস্যকর অসম্ভাব্যতা, যার জন্যে এর আর এক নাম ফিক্‌শন (fiction) কিন্তু তোতার ইতিহাস আরব্যোপন্যাস প্রভৃতির যুগ কেটে গেছে, বাল্যের চটুলতা দিয়ে এখন নভেলকে বিচার করা সমীচীন হবে না। সাহিত্য বলতে আমরা যদি জীবনকে প্রতিফলিত করা বুঝি তবে উপন্যাসেও তা বেশ ভাল ভাবেই হতে পারে এবং হয়েছে। জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করাই যদি সাহিত্যের লক্ষ্য হয় তবে সেটা যে কর্ত্তে পাবে সেই সফল সাহিত্য। ধীরে ধীরে লোকে বুঝেছে যে সাহিত্যের উদ্দেশ্যটাই আসল, উপায়টা গৌণ, তাই উপন্যাস সম্বন্ধে বিরূপতা দিন দিন কমে আসছে। এখনও যেটুকু বিরূপতা আছে এর বিরুদ্ধে তাকেও পরাজয় করবার সামর্থ্য নভেলের আছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

নভেল বা উপন্যাসের এই প্রসারলাভের কারণ কি খুঁজলে আমরা দেখতে পাব ডারুইনের Survival of the fittest নিয়ম এ ক্ষেত্রেও প্রমাণিত হয়েছে। এককালে ছিল, অন্ততঃ ইংরাজি সাহিত্যে নাটকই কবি-শক্তি প্রকাশের ক্ষেত্র কিন্তু এখন নাটক ক্রমশঃই বাস্তবের দিকে এগিয়ে চলেছে, কাজেই কাব্য সেখানে আর স্ফূর্ত্তি পায় না। অভিনয়, রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট, বেশভূষা, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতির পথেই নাটক বিকাশলাভ কর্চ্ছে এবং করতে থাকবে। নাটকই পূর্ব্বে ছিল জ্ঞান প্রচারের বা মত প্রচারের বা শিক্ষা প্রচারের প্রধান বাহন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও নাটকের প্রাধান্য কমে গেছে—এখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী বক্তৃতা, খবরের কাগজ, এবং নভেল। জীবনকে প্রতিফলিত করবার পক্ষেও নাটকের কতকগুলা প্রকৃতিগত বাধা আছে। আজকালের জীবন দিন দিন হচ্ছে ভয়ানক বিস্তৃত, নানামুখী এবং জটিল; একটা আধুনিক কর্ম্মবহুল জীবনের সমগ্রতা দেখান নাটকের ক্ষমতার একরকম বাহিরে।

যদিও বিজ্ঞানের সাহায্যে এ পথে নাটক খুবই আগিয়েছে বলতে হবে—তবুও সব পারা অসম্ভব, যেমন একটা চলন্তগাড়ী বা উড়ো জাহাজ, বা একটা সত্যকার সামুদ্রিক ঝড় বা একটা ছুটন্ত পার্ব্বত্য ঘোড়া, এই রকম কত কি। এই দিকে পাদপীঠ থেকে চলচ্চিত্রের সুবিধা বেশি এবং তাই চলচ্চিত্র নাটককে অনেকটা হটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে উপন্যাসের উপযোগিতা উভয়ের থেকেই বেশি, কারণ উপন্যাস জীবনকে নাটকের মত একেবারে সোজাসুজি দেখায় না, ভাষার সাহায্যে দেখায়। আমরা উপন্যাসের দৃশ্যাবলী চোখে দেখি না, কল্পনায় দেখি; তাই এখানে উপন্যাসের ক্ষমতা অসীম,—সে পৃথিবীর সব কিছু জিনিষ দেখাতে ত পারবেই, তা ছাড়া পৃথিবীতে যা কেউ কখনও দেখে নাই তাও সে দেখাতে পারে। কাজেই সমগ্র জীবনকে গোটাগুটিভাবে দেখাতে, উপন্যাসের মত কেউ পারে না।

এই ত গেল বাহিরের জীবনের কথা। মনোজীবন সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। বিংশ শতাব্দীতে আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা যেমন আশ্চর্য্য রকম বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে, সেই রকম আমাদের মনটাও অতিমাত্রায় জটিল হ'য়ে উঠেছে,—সূক্ষ্মতা, গভীরতা, এবং পরিসর সবই এ অর্জ্জন করেছে বহুল পরিমাণে। আর মানুষকে জানতে হ'লে তার মনটাকে জানতেই হয় আগে, কারণ আজ আমরা বুঝেছি মানুষের বাহিরের কার্য্যকলাপ থেকে মানুষের মনের কার্য্যকলাপেই মানুষকে জানবার পক্ষে বেশি দরকার। এখানেও নাটকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, সে বাহিরের ঘটনাই চোখের সামনে মোটামুটি এক রকম ধরতে পারে, কিন্তু ভিতর দেখাবে কি করে? বাহিরের কার্য্য দিয়ে অবশ্য ইঙ্গিত কর্ত্তে পারে—কিন্তু ইঙ্গিত করা এক আর উজাড় করে দেখিয়ে দেওয়া আর। উপন্যাসে কিন্তু ভাষার সাহায্যে মনোজগতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সবই উদ্ঘাটিত করা যায়। আজকালের সাহিত্য আলোচনার পরিভাষায় যাকে psycho analysis বলে, নাটক থেকে উপন্যাসে তার যে কত বেশি সুযোগ তা শরৎচন্দ্রের যেকোন একখানা বইকে মনে মনে নাটকীয় রূপ দিতে চেষ্টা করলেই বোঝা যাবে। এই বাধাকে এড়াবার জন্তে আগে soliloquy, aside প্রভৃতির আশ্রয় নেওয়া হত কিন্তু এগুলো অস্বাভাবিক বলে এ যুগে বর্জ্জন করা হয়েছে, অভিনেতার হাবভাবে যতটা বুঝান যায় তার অধিক নাটক অপারগ, উপন্যাস ও নাটকের সামর্থ্যের তুলনা কর্লে দেখা যাবে উপন্যাসে নাটকের সব ক্ষমতাই আছে কিন্তু তার limitations গুলো নাই। নাটক তার stage পোষাক, দৃশ্য, গীত, অভিনয় দিয়ে যা কর্ত্তে পারে উপন্যাস অন্য কোন সাহায্য ব্যতিরেকেই তা আরও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে। তাই না একজন উপন্যাসকে বলেছিল pocket theatre.

উপন্যাস একদিকে যেমন নাটকের কাছথেকে তার অনেকখানি প্রাধান্য কেড়ে নিয়েছে তেমনি কাব্যের কাছ থেকেও সে অনেকখানি পেয়েছে, এটা কিন্তু দানসূত্রে। এককালে কাব্যই চরিত্র চিত্রণ, নিসর্গ-বর্ণন, গল্প বলা প্রভৃতি সব কাজ করত—কিন্তু ধীরে ধীরে কাব্য এগুলো সবই কাব্যোচিত কাজ নয় বলে ছেড়ে দিয়েছে। পুরাকালের কাব্য রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি এমন কি এ যুগের প্যারাডাইস লষ্ট, ডিভিনা কমেডি এবং আরও পরের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, মেঘনাদবধ, বৃত্রাসুরবধের দু এক পাতা পড়লেই বোঝা যাবে কথাটির সত্যতা। সে সকলের বহুল অংশ মাত্র বিবরণ যা গদ্যেও শেষ দেওয়া যেত। কাব্য এখন সেগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে—ধীরে ধীরে—সে বিবরণ-মূলক থেকে ভাবমূলক (reflective) হয়ে পড়েছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যে মাইকেল, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্রের মহাকাব্যগুলোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দুএকটি গীতিকবিতার তুলনা কর্লেই আমার বক্তব্য প্রমাণিত হবে। জীবনের যে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা গদ্যের আয়ত্তের বাইরে কাব্য এখন তাদিকেই প্রকাশ করবার আকাঙ্ক্ষা করে, যা গদ্যের আয়ত্তের মধ্যে তাকে কাব্যরূপ দেবার চেষ্টায় শক্তির অপব্যয় মাত্র, যেমন ক্ষুর দিয়ে ধান কাটবার চেষ্টা। জীবনের গভীর উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা কতখানি করল সেই দেখেই কাব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হবে, স্থূল কাব্য ছেড়ে মানব মনের সূক্ষ্ম পলাতক ভাবনাকে প্রকাশ করাই কাব্যের এখন লক্ষ্য। এককথায় বলিতে গেলে বলা যায় কাব্যের দৃষ্টি এখন অন্তর্সন্ধানী (introspective), ব্যাপকতা ছেড়ে সে এখন গভীরতা অর্জ্জন করেছে।

কাব্যের আপন এলাকায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কাব্য বিষয়ের

বাহিরে যা থাকে তা অনেক এবং তার পক্ষে উপন্যাসই বেশি উপযোগী। সেই উপযোগিতার জোরেই উপন্যাস তার আজকের প্রাধান্য পেয়েছে। এই প্রাধান্য যে অক্ষমে বর্ত্তেছে তা উপন্যাসের সাফল্যের দিকে চেয়ে কিছুতেই বলা যায় না। ভাব প্রকাশ ক্ষমতাকে যদি সাহিত্য সৃষ্টির raison de etre বলে ধরে নেওয়া যায় তা হ'লে টলষ্টয়, টুর্গেনিভ ইত্যাদি পড়লে স্বীকার কর্ত্তেই হয় সে উপন্যাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। উপন্যাসের ভাষা স্বীকার কবি ছন্দোবদ্ধ নয় কিন্তু তাই বলে সে সাহিত্য পদবাচ্য হবে না এ কোন কাজের কথা নয়। নভেলের ভাষা ছন্দোবদ্ধ না হলেও যে কম ফলপ্রসূ ও মুগ্ধকর হয় না তা যে-কোন একজন বড় সাহিত্যিকের উপন্যাস পড়লেই বোঝা যায়। ছন্দঃস্থজনে যে ক্ষমতা ব্যয়িত হয় তা গদ্যের ভাব প্রকাশ ক্ষমতার দিকে নিয়োজিত হয় বলে তার ভাষা আরও সুনির্দ্দিষ্ট ও পরিস্ফুট। তা ছাড়া এতে কারুকার্য্যও কম দেওয়া যায় না— রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতার" বহুস্থান কবিতার মতই অলঙ্কারবহুল।

তার জন্মের পর থেকে উপন্যাসের বিকাশের ইতিহাস আশ্চর্য্য হ'লেও সে তার শ্রেষ্ঠ পরিণতিতে এসেছে বললে তার আয়ুষ্কাল শেষ হয়েছে বলা হয়, কারণ যে জিনিষ বিকাশের অবকাশ হারিয়েছে তার মৃত্যু সন্নিকট। নভেলকে যদি বাঁচতে হয় তবে তাকে বিকাশের পথ খুঁজতে হবে। উপন্যাসের বিবর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনা কর্লেও বোঝা যায় যে সেই পথই সে খুঁজতে খুঁজতে চলেছে। দানব, দৈত্য, রাক্ষস, যুদ্ধ, গিয়েছে; বঙ্কিম স্কটের যুগও গিয়েছে যখন বিগত যুগের ইতিহাসকে রঙীন আলোকে দেখে নভেল আনন্দ পেত—এখন সে চায় আমাদের একান্ত কাছের জীবনকে আরও গভীর ভাবে বুঝতে। ইংরাজিতে যাকে বলে philosophy of life সেইটাই এখন উপন্যাসকে বিকাশের পথে নিয়ে চলেছে। Meredith বলেছিলেন এটাই উপন্যাসের Skeleton anatony বা হাড়ের কাঠামো। এটা না থাকলে উপন্যাসের অবয়ব তথা আত্মা সুগঠিত হতে পারে না। বাংলা উপন্যাসও যদি বাঁচতে চায় তবে তাকে ভাবতে হবে এবং ভাবাতে হবে।

শ্রীরাইমোহন সামন্ত

অপরিচিতা

শ্রীনির্ম্মল মুখোপাধ্যায়

বসিয়াছিলাম জানালার ধারে দ্রুতগামী রেলগাড়ীতে,
নিমেষের তরে দেখিনু তোমারে চলে গেনু তাড়াতাড়িতে।
তোমার ও কালো নয়ন দুখানি,
তোমার মোহন মধুর মু'খানি,
চকিতের তরে দেখিলাম আমি, ভরি গেল মোর চিত্ত,
সে নিমেষ আজ জীবনে আমার হয়েছে পরম বিত্ত।

পরিচয় তব জানিনাক কিছু তার তরে ক্ষোভ মানি না,
তোমারে নিকটে পাই নাই ব'লে অনুযোগ আমি আনি না।
হয় ত তোমারে পাইলে কাছে গো
তোমাতে যা কিছু কুশ্রী আছে গো,
উঠিত ফুটিয়া আমার চক্ষে, লাগাইত মনে দ্বন্দ্ব;
যে মধুছন্দ বাজিছে হিয়ায় ভেঙে যেত সেই ছন্দ।

হয়েছে ভালই তব সাথে মোর পুনরায় দেখা হয় নাই,
ভাল লাগে যারে বারে বারে তারে দেখিবারে আমি ভয় পাই।
বাতায়ন পাশে নিমেষে দে'খছি
মোহন মূরতি মনেতে এঁকেছি,
স্মৃতিটুকু আজ বড় ভাল লাগে, জাগায় হিয়ায় হর্ষ,
কাজল আঁখির চকিত চাহনি আজ করে যেন স্পর্শ।

অসীমের প্রতি

শ্রীনির্ম্মল গুহ

বিচিত্রা
আশ্বিন, ১৩৪৩

অন্তরাল

শ্রীআলোক রায়

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল— 'ওগো শুনছো ?"

বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনা যাইতেছে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বোধহয় নিকটেই কোথাও বজ্রপাত হইয়াছিল তাহার বিকট শব্দে স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়াছিল, নিদ্রালস চোখে যেটুকুও বা নিদ্রার লেশ ছিল সুনন্দার কাতর আহ্বানে তাহা নিমেষে টুটিয়া গেল। কহিলাম,—"শুনছি, ভয় পেলে নাকি নন্দা ?"

ভিতরে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে একটা লণ্ঠন স্তিমিত নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে, তাহারই অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম সুনন্দা উঠিয়া বসিয়াছে। আমার ঘুম ভাঙিতে দেখিয়া কাণের নিকট মুখ লইয়া অধীর কণ্ঠে কহিল ;—"শুনছো ?"

শুনিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বারি পতনের একঘেয়ে শব্দ ব্যতীত কিছুই শুনিতে পাইলাম না ; কহিলাম, "কি শুনবো ! বৃষ্টির শব্দ !"

সুনন্দা আরো নিকটে সরিয়া আসিল—"নাগো না শুনছোনা বাইরে কে কাঁদছে ?"

"কাঁদছে ?" চকিতে উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু কই না কাহারও ক্রন্দন ধ্বনি ত শুনা যায় না ? তবে কি সুনন্দা স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়াছে ? পুনরায় শুইয়া পড়িলাম। লেপটাকে বেশ করিয়া অঙ্গে জড়াইয়া কহিলাম—"ও কিছু নয়, স্বপ্ন দেখেছ বোধহয় !"

অধীর কণ্ঠে উত্তর আসিল,—"উঁহু, স্বপ্ন নয়, একটা বেড়াল কাঁদছে শুনতে পাচ্ছ না !"

এই ব্যাপার ! এইবার আমার হাসি পাইল। "বেড়াল চেঁচাচ্ছে তো আমার শুনে কি লাভ ?"

সুনন্দা কিন্তু তখনো বসিয়া আছে,—"আহা নিশ্চয় বেড়ালের বাচ্চা হবে, বোধহয় মাকে হারিয়ে ফেলেছে, বোধহয় খিদে পেয়েছে, বোধহয় অন্ধকার রাতে ভয় পেয়ে..."

এইবার সত্যই বিরক্তি বোধ করিলাম। বিড়াল জীবটার প্রতি কোন দিনই যে আমার অনুরাগ ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সুনন্দার প্রকৃতি একেবারে উল্টা। কোথায় কোন বিড়ালের পা ভাঙিল, কোন কুকুরের গাড়ীতে ল্যাজ কাটা পড়িল—বেতারে সংবাদ আসে তাহার নিকট। অগ্রহায়ণের শীতের এই বর্ষণমুখর গভীর রাত্রে নিদ্রা ভাঙাইয়া কোথায় কোন্ বিড়াল চীৎকার করিল, তাহাই কাণ পাতিয়া শুনিয়া, সম্ভব এবং অসম্ভব কাহিনী রচনায় তাহার বিড়াল প্রীতি সুনির্দ্দিষ্টরূপে প্রমাণ হইয়া গেল বটে—কিন্তু আমি বিরক্ত হইলাম। তাহার কথা শেষ না হইতেই বাধা দিয়া কহিলাম—"আমারো বোধহচ্ছে যে তোমার কথার ঠিক নেই। এবার তোমার "বোধহয়" রেখে চুপচাপ শুয়ে পড়ো।"

পুনরায় করুণ কণ্ঠ শুনা গেল—"কিন্তু ওর যে ভারি কষ্ট হচ্ছে, লক্ষীটী তুমি একটু উঠে দেখো না...।"

উঠিয়া দেখিব ? বিরক্তির মাত্রা আমার বাড়িয়া গেল, বেশ রাগিয়া কহিলাম,—"সত্যিই পাগল হলে দেখি তুমি, এই রাত্তিরে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে...না ! তোমার আব্দারের মাত্রা বড়ো বেড়ে চলছে..."

বলিয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এইবার স্পষ্ট শুনিলাম, নিকটেই কোথাও একটা বিড়াল শব্দ করিতেছে—"ম্যাও—মিঁ—য়্যা—ও।"

সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া চোখ বুজিয়াছি, সহসা মনে হইল সুনন্দা খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। ধীরে মাথাটা একটু ওদিকে ফিরাইয়া দেখিলাম, সত্যই সুনন্দা শয্যা হইতে নামিয়াছে এবং দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

নাঃ ! নন্দা পাগল হইতেই চলিল দেখি ! এ রকম ছেলেমানুষ লইয়া আর সব চলিতে পারে, কিন্তু সংসার চলে

না। কহিলাম—"নন্দা! এই রাতে বাইরে যেওনা, ঠাণ্ডা লাগিয়ে এক কাণ্ড করে বস, তারপর ভুগে মরি আমি।"

"বাইরে যেও না" বলিলেও আমি নিশ্চিত জানিতাম এই অন্ধকার রাত্রে একাকী বাহিরে যাইবার মত সাহস আর যাহারই থাকুক, আমার এই জীবনসঙ্গিনীটীর নাই। উনিশটী বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া—আজিও সে ঘরের বাতি নিভিয়া গেলে অন্ধকারে কোন অশরীরী আত্মার আগমন অনুভব করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠে, স্বপ্ন দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া ভাসায়, এবং শুব্ধ রাত্রে বাহিরে বৃক্ষশাখার মর্ম্মরধ্বনিকে ডাকাতের বিজয়োল্লাস অনুমান করিয়া আমার অতি নিকটে সরিয়া আসে।

কিন্তু আমার কথা শেষ না হইতেই দেখিলাম সুনন্দা বাহির হইয়া গেল, দ্বার খুলিতেই বিজলীর আলোকে বাহিরের বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রির ভয়াবহ মূর্ত্তিটা একেবারে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার আকাশের তারাগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে, মাঝে মাঝে বিজলীর তীব্র আলোক ব্যতীত বিশ্বের সকল প্রদীপ বুঝি আজ নিভিয়া গিয়াছে।

সুনন্দার কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। কিন্তু আর ত শয্যাগ্রহণ শোভা পায় না, বাহিরে অন্ধকারে ভয় পাইয়া ও যদি কিছু একটা করিয়া বসে।

শঙ্কিত চিত্তে সুখশয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। একটা ভিজা বাতাস কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া হাড়ে কাঁপন ধরাইয়া দিল, আর একবার বিদ্যুৎ চমকাইতেই সেই আলোকে দেখিলাম অদূরে একটা বিড়ালছানা কোলে করিয়া ক্ষিপ্রপদে সুনন্দা ছুটিয়া আসিতেছে।

তাহার হাত ধরিয়া ভিতরে আনিয়া দরজাটা বন্ধ করিলাম, এবং এই গভীর রাত্রে একাকিনী বাহিরে যাওয়া যে তাহার একেবারেই সঙ্গত হয় নাই, সেই কথা বলিবার উপক্রম করিতেই, বিড়ালছানাটির আর্দ্র দেহ নিজ অঞ্চল দিয়া মুছিতে মুছিতে সে কহিল—"আহা, দেখেছ কি ভেজাই ভিজেছে। ভাগ্যিস্ আমি গিয়েছিলাম, নইলে এ শীতে ও নিশ্চয়ই মারা পড়তো। কি চমৎকার দেখতে, ছাখো!"

তাহার পর ক্ষিপ্রহস্তে একটা ষ্টোভ জ্বালাইয়া সে বিড়াল ছানাটিকে সেঁকিতে লাগিল। এইবার চাহিয়া দেখিলাম, অত্যন্ত কৃশ, সর্ব্বাঙ্গে ধূলা কাদামাখা এক অপূর্ব্ব পদার্থ!

গরম পাইয়া বোধহয় ও একটু আরাম বোধ করিল, সুনন্দার কোলের ভিতর মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া গর্‌গর্ করিয়া বুঝিবা কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল। কোথা হইতে এক প্লেট দুধ আনিয়া এইবার সুনন্দা মহোৎসাহে অতিথি সেবায় মনোনিবেশ করিল, এবং হঠাৎ আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই একটু হাসিয়া যেন মহা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, "ওমা! আমার কি খেয়াল! আহা এত রাত্তিরে তোমার ঘুম ভাঙালাম। তা আর তোমার জেগে কাজ নেই গো, আবার তো সেই বোন্ ভোরে উঠতে হবে, ভারি কষ্ট হল তোমার।"

নিঃশব্দে পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিলাম। কিন্তু শুইয়া শুইয়াই শুনিলাম, আহারান্তে অতিথিকে লইয়া সে পাশের কক্ষে প্রবেশ করিল। তথায় তাহার আর একটি অতিথির কয়েকদিন পূর্ব্বে শুভাগমন হইয়াছে, নাম তাহার ভুলো। সুনন্দার কণ্ঠস্বর কাণে গেল,—"ও ভুলো ছাখ্ কি সুন্দর বেড়াল, তোর সাথে খেলবে রে বুঝলিনে? ওমা! আবার কেঁউ কেঁউ করা হচ্ছে, খুব স্ফুর্ত্তি হয়েছে নয়! কিন্তু খবর্দ্দার কক্ষনো ওকে কামড়াস্‌নে যেন…"।

* * * *

সে দিন অফিসে একটা সুখবর শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—"নন্দা! ও নন্দা!"

কিন্তু নন্দার সাড়া মিলিল না। ভিতরে বারান্দায় আসিয়া দেখি চারিদিকে তুলা, জল, আইডিন, কাঠি ছড়াইয়া রহিয়াছে, এবং তাহারই মাঝখানে বসিয়া সুনন্দা তাহার নবাগত অতিথির পদদ্বয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতেছে।

কহিলাম—"ওকি! কি হচ্ছে!" আমাকে দেখিয়া পাকা গৃহিনীর ন্যায় মুখভঙ্গি করিয়া সুনন্দা কহিল,—"আর তোমার ভুলোর জ্বালায় পারিনে বাপু! কি কুকুরই হয়েছেন আমার, রোজ রোজ ঠেঙাই তবু যদি মুখপোড়ার আক্কেল হয়! ছাখতো কি ভীষণ কামড় দিয়েছে মিনির পায়, এখন ভালোয় ভালোয় সেরে উঠলে বাঁচি।"

তরুণী গৃহিণীর এ হেন বিপদের সময় আর সুসংবাদ দিবার প্রবৃত্তি রহিল না, ভৃত্যকে চা আনিতে আদেশ করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া ঘরে আসিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্যের

সহিত সুনন্দা আসিয়া প্রবেশ করিল। পরণের কাপড়টার একদিক অনেকটা জলে ভিজিয়া গিয়াছে, মস্তকের একরাশ চুল বিস্রস্তভাবে পিঠের চারিপার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলটা শুদ্ধ চাবিটাকে ঝনাৎ করিয়া পিঠের উপরে ফেলিয়া দিয়া ক্লান্তস্বরে সে প্রবেশ করিয়াই হাঁকিল—"ও রামসিং, বাবুর খাবারটা আনলেনা। শুধু শুধু যে চা এনেছো! নাঃ কি সব চাকর-বাকর, যদি একটু চোখ ফিরিয়েছি তো একেবারে সর্বাঙ্গ প্রাপ্তি।"

তাহার পর নিকটে বসিয়া খাবারের তত্ত্বাবধান করিতে করিতে সে অনর্গল বকিয়া বকিয়া যাহা কহিল তাহাতে বুঝা গেল যে আজ একটা ভীষণ রকম কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সুনন্দার অনেক হিতোপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও ভুলো মিনির প্রতি কয়েকদিন হইতে নিতান্ত অসদ্ব্যবহার করিতেছে, এবং নিকটে কেহ না থাকিলে মিনিকে ধাওয়া করিয়া বীরত্বের পরিচয় দেয়। মিনিও "যঃ পলায়তে স জীবতি" পন্থা অবলম্বন করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করে না, ছুটিয়া গিয়া সুনন্দার আশ্রয় লয়।

আজ সুনন্দা আমার জন্য রন্ধন কক্ষে খাবার করিতেছিল, এবং মিনি বাহিরে রৌদ্র পোহাইতেছিল, এমন সময় বেরসিক ভুলো আসিয়া তাহার হস্ত মর্দ্দন না করিয়া নরম নরম পায়ে দন্তের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষার কার্য্যে লাগিয়াছিল, মিনির চীৎকারে ভাগ্যে সুনন্দা আসিয়া পড়িয়াছে নহিলে সুনন্দার ভাগ্যে যে আজ কি ছিল, তাহা ভগবানই জানেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি নিঃশব্দে আহার করিয়া চলিলাম। আমার মুখের পানে চাহিয়া বোধ হয় সুনন্দা মনের ভাব বুঝিল, ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"মিনি তোমাকেও খুব ভালোবাসে, আর ক'দিন পরে দেখো তোমার কাছ ছাড়বেনা, একেবারে চিনে ফেলবে তোমায়।"

অন্তর্য্যামীর নিকট প্রার্থনা জানাইলাম, সে শুভদিন যেন আমার শীঘ্র না আসে।

* * *

কয়েকদিন পরের কথা। বারান্দায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছি, রবিবার—তাই আফিস বন্ধ। সহসা পশ্চাতে দ্রুত পদশব্দ শুনিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিলাম, দেখি মিনি এবং ভুলো উভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। সুনন্দার সেদিনকার কথা মনে পড়িল, এবং এসকল তুচ্ছ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র উদ্বেগ না থাকিলেও, পাছে আবার এই লইয়া সুনন্দার কান্নাকাটি আরম্ভ হইয়া যায় তাই রামসিংকে ডাকিয়া কহিলাম "দ্যাখ তো ভুলোটা বুঝি মিনিকে খেল।"

চীৎকারে সুনন্দা ছুটিয়া বাহিরে আসিল, পরক্ষণেই একেবারে হাসিয়া খুন—"ওমা দ্যাখো দ্যাখো, মিনির কাণ্ড দেখ।"

চাহিয়া দেখি, ভুলো মিনিকে তাড়া করে নাই, করিয়াছে মিনিই ভুলোকে। ক্ষুদ্র দেহটি লইয়া মিনি ভুলোর পশ্চাৎ-ধাবন করিয়াছে, এবং ভুলো যেন মহাভয়ে অস্থির হইয়া উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া ছুটিতেছে। দাঁড়াইবার উপায় নাই, দাঁড়াইলেই মিনি ছুটিয়া আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থাবা দিয়া ভুলোর মুখে আঁচড়াইয়া দিতেছে এবং ভৎর্সনা করিয়া চলিয়াছে—ফ্যাঁস, ফ্যাঁস—ফোঁ...সঙ্গে সঙ্গে ভুলোর করুণ ক্রন্দন এবং পলায়ন।

দেখিবার উপযুক্তই বটে। হাসিয়া সুনন্দাকে কহিলাম,—"একেবারে তপোবন বানিয়ে তুললে দেখছি।"

সুনন্দার রহিয়া রহিয়া হাসি তখনো থামে নাই। আমার পানে চাহিয়া কহিল—"দেখে নিয়ো তুমি, এই আমি বললুম, ওদের ভীষণ ভাব হবে। বাবা! কি ভীষণ বুদ্ধি হয়েছে মিনির! আবার ভুলোকে দ্যাখো, ওর চোখ দেখেই বোঝা যায় ও সব বুঝতে পারে...।"

বুঝিলাম এইবার উৎসাহ দেখাইলে আজিকার সমস্তটা মধ্যাহ্ন মিনি এবং ভুলোর অসম্ভব বুদ্ধির কাহিনী শুনিতে শুনিতেই কাটিয়া যাইবে, অতএব কালবিলম্ব না করিয়া সংবাদ পত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গেলাম।

* * * *

শরীরটা ভাল ছিল না সেদিন। সমস্ত দিন আফিসের খাটুনীর পর ক্লান্ত দেহে বাহিরে আরাম কেদারায় শুইয়া আছি। ক'দিন হইতে বেশ শীত পড়িয়াছে। একটা মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ জড়াইয়া ম্লান জ্যোৎস্নায় গ্রাম্য শীতের বাতাসটি বেশ ভাল লাগিতেছিল, নিদ্রার প্রথম আবেশের ন্যায় উহার স্পর্শ সর্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতেছিলাম।

চাকরটা কি একটা কাজে বাহিরে আসিতেই কহিলাম,— "তোর মাইজীকে একটু ডেকে দে তো।"

অনেকক্ষণ পরে মাইজীর আগমন। বাহিরের ম্লান আলোতেও স্পষ্ট বুঝা গেল তাহার মুখে কেমন একটা উদ্বেগের চিহ্ন। আমার নিকটে আসিয়া কহিল,—"ডাকছিলে আমায়?"

কহিলাম—"হ্যাঁ প্রায় আধঘণ্টা আগে।"

একটু অপ্রস্তুত হইয়া ম্লান হাসিয়া সে কহিল,—"আসতে পারিনি আগে, ক'দিন থেকে মিনিটার যে কি হয়েছে কিছু খায় না, রাতদিন কেবল হাঁচছে। নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লেগেছে, চারদিকে আবার যা ইনফ্লুয়েঞ্জা আরম্ভ হয়েছে।"

কেবল ঐ এক কথা। মিনি এবং ভুলো, ভুলো এবং মিনি। মনে পড়িল আমার একটু মাথা ধরিলে যাহার উদ্বেগের অন্ত থাকিত না, একটু গা গরম হইলে সমস্ত রাত্রি যাহার নিদ্রা আসিত না, আমার মুখ দেখিয়া আমার পূর্ব্বেই যে আমার শরীরের অসুস্থতা বুঝিয়া ফেলিত, আজ তাহার আমার প্রতি যেন লক্ষ্যই নাই। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর আমার কর্ম্মক্লান্ত অসুস্থ দেহটার এত নিকটে বসিয়াও আজ না বলিয়া দিলে সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না— বুঝি বা বুঝিবার চেষ্টাও করে না।

অন্তরের ভিতর একটা অভিমান মাথা নাড়িয়া উঠিল— একি অপরিসীম ঔদাস্য! সঙ্গে সঙ্গে, স্বীকার না করিলে মিথ্যা বলা হইবে, সব রাগ গিয়া পড়িল মিনি এবং ভুলোর উপর। আমার প্রাপ্য অধিকার ছিনাইয়া লইয়া আমাকে নিঃস্ব করিবার জন্যই যেন উহাদের আগমন।

কিন্তু মনের ভাব মনেই চাপিয়া রাখিলাম। কহিলাম,— "ডাকছিলুম তোমার একটা গান শুনবার জন্যে। মনে আছে কতদিন তুমি গাও নি?"

আমার এ অনুরোধ কিন্তু সুনন্দাকে স্পর্শই করিল না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে কহিল—"ওমা! এই কথা! কিন্তু এখন তো আমার সময় নেই, যা ঠাণ্ডা পড়েছে আজ রাতে মিনিটাকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাইয়ে ওর বিছানায় রেখে তারপর আসবো তোমার কাছে।" অবশেষে চলিতে চলিতেই গলাটা খাটো করিয়া কহিল—"বাড়ী ভর্ত্তি চাকর বাকর! এর মাঝে বুঝি গাইতে পারি আমি! বুড়ো হয়েছি না এখন?" বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

হায় রে! মিনির অসুখের জন্য এত! আর এদিকে আমার যে শরীর খারাপ, একটা প্রশ্নও করিল না সে সম্বন্ধে। সহসা অত্যন্ত ছেলেমানুষের ন্যায় মনে হইল হইত আমার একটা শক্ত অসুখ, দেখিতাম তোমার ঔদাস্যের সীমা কতখানি।

* * * *

নেহাৎ খেয়াল বশেই কথাটা মনে মনে কহিয়াছিলাম, কিন্তু যিনি অন্তর্যামী জোরে না কহিলেও নাকি তিনি সকল বাক্য শুনিতে পান, তাহারই প্রমাণ পাইলাম যেদিন ডাক্তার আসিয়া বুক পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন— "নিউমোনিয়া"।

এ আশঙ্কা যে আমারও না হইয়াছিল তাহা নহে। দেহের উত্তাপ এবং বক্ষের বেদনা দুইটাই আমার অসুস্থ অন্তরে পুনঃ পুনঃ এই কথাটাই কহিতেছিল, কিন্তু গৃহে সুনন্দা একা, হয়ত অনর্থক ভয় পাইয়া যাইবে ও, তাই কোন কথা কহি নাই।

সমস্ত দিনটা কেমন মোহাচ্ছন্নভাবে কাটিয়া গেল, দেহের উত্তাপও বাড়িয়া চলিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও চিন্তার কোন সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেছি না, ছিন্নভিন্ন চিন্তার টুকরা মনটাকে অধিক পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। মাথার নিকট পাখা হাতে বসিয়াছিল সুনন্দা, মাঝে মাঝে তাহার শীতল হাতটা দিয়া আমার ললাটের উত্তাপ দেখিতেছিল। সহসা ঠিক মানুষের ন্যায় কাশির শব্দ শুনিলাম। মাথাটা একটু সরাইয়া দেখি মিনি আমার খাটের পার্শ্বেই ঠিক মানুষের ন্যায় খক্ খক্ করিয়া কাশিতেছে।

কি যেন মনে হইল, সুনন্দার পানে চাহিয়া কহিলাম— "ওকে এ ঘরে ঢুকতে দিওনা, বোধ হয় ওর ছোঁয়াচ লেগেছে... জানোতো ডাক্তাররা বলেন বেড়ালের রোগ বড্ড ছোঁয়াচে।"

একটা কথাও কহিল না সুনন্দা। ধীর পদে উঠিয়া মিনিকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম, এই কয়েক মিনিটের মধ্যে যেন তাহার উপর দিয়া কী একটা ভীষণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে। মুখের সমস্ত রক্ত কে যেন শুষিয়া লইয়াছে।

অত্যন্ত অনুশোচনা হইল। ভাবিলাম কথাটা বলা আমার উচিত হয় নাই। আমিত দেখিয়াছি আমার অসুখের এই বাড়াবাড়ির সময় কি প্রাণ দিয়া যত্ন করিয়াছে সে, গভীর রাত্রে যখনই ঘুম ভাঙিয়াছে দেখিয়াছি নিদ্রাহীন দুই চোখে সমস্ত অন্তরের ব্যাকুলতা লইয়া পলকহীন দৃষ্টিতে আমারই পানে চাহিয়া রহিয়াছে। হয়ত তাহার ভীত কোমল অন্তরে কথাটা অনেক কঠিন, অনেক ভয়ঙ্কর হইয়াই বাজিয়াছে।

তাহার পর কয়দিন কেবল ডাক্তার এবং ঔষধ। সুনন্দা কহিয়াছিল টেলিগ্রাম করিয়া মাকে আনাইতে, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে মাকে টানিয়া আনিয়া কেবল কষ্ট দিবার পক্ষপাতী আমি ছিলাম না। মাতো কিছুই করিতে পারিবেন না, কেবল চিন্তা আর ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিবেন।

যাহা হউক যম মহারাজের দরবারে দেনা পাওনার হিসাব মিটাইবার আহ্বান আর সেবার আসিল না, অনেক দিন পরে ক্লান্ত দেহে আমি শয্যার বাহিরে পা বাড়াইলাম।

বাহিরে রৌদ্রে একটা আরাম কেদারায় আমাকে বসাইয়া সুনন্দা রন্ধন গৃহে বোধহয় আমারই জন্য একটা পথ্য তৈয়ার করিতেছিল, এমন সময় ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে ভুলো আসিয়া উপস্থিত। অনেক রোগা হইয়া গিয়াছে, বোধহয় আমাকে লইয়া ব্যস্ত থাকাতে উহার প্রতি দৃষ্টি দিবার সময় পায় নাই সুনন্দা। ভুলোকে দেখিয়া মিনির কথা মনে পড়িল, সেই অসুখের সময় হইতে মনে হইল উহাকে যেন দেখি নাই। রামসিং নিকটেই ছিল ডাকিয়া কহিলাম—ভুলোটার সাথে মিনি এখনো তেমনি খেলে ত রে?"

রামসিং হাতমুখ নাড়িয়া নিজের এবং অপরের ভাষার সহযোগে যাহা বিবৃত করিল তাহার মর্ম্মার্থ হইল এই যে, "মাইজীর আদেশে সে মিনিকে পার করিয়া দিয়াছে। বিশ্বাস হইল না কথাটা; পুনরায় প্রশ্ন করিতে জানা গেল যে, মাইজী কহিয়াছিল কাহারও বাড়ীতে দিয়া দিতে, কিন্তু কেহ স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া রামসিং বুদ্ধিমানের ন্যায় সহরের বাহিরে জঙ্গলের ভিতর মিনিকে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে। অধীর কণ্ঠে কহিলাম, "সেকি রে! মাইজী বকুনি দেয়নি তোকে? কান্নাকাটি করে নাই?"

রামসিং কহিল, "মাইজী একটি কথাও কহেন নাই।"

কথাটা আমাকে বিঁধিল। ইহাও কি সম্ভব! আমার বিরক্তি এবং অনুরোধ সত্ত্বেও যে উহাকে ত্যাগ করে নাই আজ স্বেচ্ছায় তাহাকে বিসর্জ্জন দিল কি করিয়া?

কিন্তু নারীচরিত্র সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবানও অজ্ঞ, আমি ত সামান্য মানুষ মাত্র। অতএব আর বাক্যব্যয় না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। সুনন্দাকেও এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলাম না।

* * * *

আমি বেশ সারিয়া উঠিয়াছি। পুনরায় যথাপূর্ব্ব কাজ-কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছি। সেদিন আমার কক্ষে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছি, সুনন্দা আসিয়া সুমুখের চেয়ারটায় বসিল। অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিলাম, কথা কহিলাম না, কিন্তু অনেকক্ষণ পরে তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিলাম। জানালাটা দিয়া বাহিরে যেখানে বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরের শেষ সীমায় শ্যামল বনানীর রেখা নির্ম্মল আকাশের কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, পলকহীন শূন্য দৃষ্টিতে ও তাহারই পানে চাহিয়া রহিয়াছে।

অনেকক্ষণ ও সেদিকে চাহিয়াছিল, তাহার পর আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল;—"দ্যাখো, তোমার না একটা বন্দুক ছিল?"

অতীব বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—"কেন, শীকার করবে নাকি?"

ও একটু হাসিল, সে হাসি দুঃখের কি আনন্দের ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। পুনরায় জানালার বাহিরে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল,—"না, বলছিলুম কি! তুমি যদি বন্দুকটা দিয়ে ভুলোটাকে মেরে ফেলতে পারতে…" কথাটা শেষ না করিয়াই ও চুপ করিয়া গেল।

বিস্ময়ের মাত্রা আমার সীমা ছাড়াইয়া গেল, উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলাম—"কেন, ও পাগল হয়ে গিয়েছে নাকি?"

সুনন্দা তেমনই ভাবে চাহিয়া কহিল,—"না, পাগল হয়নি। মিনিটাকে তাড়ানোর পর থেকে ওর যে কি হয়েছে, খায় না দৌড়াদৌড়ি করে না, রাতদিন চুপ করে পড়ে থাকে, আর আমার দিকে এমন বিচ্ছিরি করে চেয়ে থাকে,

একটুও ভালো লাগে না আমার ওকে দেখতে।" তাহার পর একটু থামিয়া তেমনই অবিচলিত কণ্ঠে কহিল—"ওকে তুমি মেরেই ফেলো, সেই ভালো হবে।"

মারিয়া ফেলিব আমি? কোথা হইতে একঝলক আলো আসিয়া আমার দৃষ্টিশক্তিটাকে প্রখর করিয়া দিল। এতদিন যাহা দেখিতে পাই নাই সুনন্দার আজিকার কথাগুলা যেন চোখে আঙুল দিয়া সেদিকটা দেখাইয়া দিল। দেখিলাম সুনন্দার জীবনের যে বিরাট স্থানটা জুড়িয়া আমার আসন পাতা ছিল, কখন সেস্থান হইতে আমারই অজ্ঞাতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছি আমি। অন্তহীন পথে চলিয়াছে সে, তাহারই পাশাপাশি বন্ধুর পথে চলিয়াছি আমি—সঙ্গীবিহীন। এত নিকটে সে, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাই না, গগনস্পর্শী প্রস্তর প্রাচীরের অন্তরাল রহিয়াছে দুইজনের মধ্যে—শত চীৎকার শত অনুরোধ করিলেও আমার বাণী আর তাহার নিকট পৌঁছিবে না।

কিছু কহিলাম না, কলমটা তুলিয়া লইয়া পুনরায় কর্ম্মে মন দিলাম, কিন্তু তখনও সুনন্দা তেমনই বাহিরের পানে চাহিয়া রহিয়াছে।

রামসিংকে কহিলাম, যেমন করিয়া হউক মিনিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে—বহুৎ বখ্‌শিশ মিলিবে। রামসিং কয়েকদিন মহোৎসাহে খোঁজাখুঁজি করিল, কিন্তু অবশেষে আসিয়া জানাইল যে মিনিকে নিশ্চয়ই কোন বন্যজন্তু খাইয়া ফেলিয়াছে—অনেক অনুসন্ধানেও তাহার সন্ধান মিলে নাই। সুনন্দা কিন্তু একেবারে নির্ব্বাক এ বিষয়ে, মিনির সম্বন্ধে একটা প্রশ্নও করে নাই সে রামসিংকে।

দিন চলিয়াছে যেমন করিয়া চলে সকলের। আমি আমার আফিসের কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছি, সুনন্দা করিতেছে গৃহের দৈনন্দিন কর্ম্ম। অফিস হইতে আসিলে খাবার দিতে আজকাল আর বিলম্ব হয় না, একবার হাঁকিলেই ত্রস্তপদে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং একটু ম্লানমুখে বসিয়া থাকিলেই ললাটের উপর হাতখানি রাখিয়া ব্যগ্রভাবে আমার পানে চায়। কিন্তু সেদিন যে কাঁটাটা আমার অন্তরে বিঁধিয়াছিল, সকল কর্ম্ম সকল চিন্তার ভিতরে রহিয়া রহিয়া উহার অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়! মনে হয় প্রাণময়ী সুনন্দা আর নাই—এ যেন এক মোমের পুতুল, কলের যন্ত্রের ন্যায় কাজ করিয়া চলিয়াছে মাত্র।

* * * *

কয়দিন হইতে চারিদিকে খুব ঝড় বৃষ্টি হইতেছে। শীঘ্র আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছি। ঘুমাইয়াছি কতক্ষণ মনে নাই—সহসা একটা অতি ক্ষীণ শব্দে আমার গভীর নিদ্রা ভাঙিয়া গেল। নিজেই বিস্মিত হইলাম, বাহিরে ঝড় এবং বৃষ্টি উভয়েই সমান তালে সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে, ইহার শব্দ ডুবাইয়া একটা অস্পষ্ট ক্ষীণশব্দ যে আমার নিদ্রার এমন প্রগাঢ়তা ভাঙাইতে পারে তাহা সেদিন এমন করিয়া অনুভব না করিলে আমি কোনদিনই বিশ্বাস করিতাম না।

ঝড়ের দাপটে নিকটেই একটা বৃক্ষ বোধহয় ভাঙিয়া পড়িল, সেই সঙ্গে ঝড়ো বাতাসের সহিত মিলিয়া কেমন একটা করুণ আর্ত্তনাদের ন্যায় চারিদিকে হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আমি স্পষ্ট শুনিলাম—'মি'-য়াও'। অবিকল মিনির কণ্ঠের ন্যায়, উঠিয়া বসিলাম। পার্শ্বে সুনন্দা অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোক তাহার সুপ্ত আননে পড়িয়া স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। নাঃ! তবে সে শুনে নাই কিছু। শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলাম। টর্চ্চটা লইয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইলাম এবং বিদ্যুৎ ও টর্চ্চের আলোকে স্পষ্ট দেখিলাম অদূরে একটা বৃক্ষের নীচে বসিয়া ভিজা গায়ে মিনি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষীণকণ্ঠে শব্দ করিতেছে।

প্রকৃতির এই ধ্বংসলীলার বিভীষিকা ডুবাইয়া মুহূর্ত্তে আমার সুমুখে যেন পুলকের বন্যা বহিয়া গেল, ত্বরিতপদে মিনিকে লইয়া ঘরে ঢুকিলাম। ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে সুনন্দা যেমন করিয়া উহাকে গরম করিয়াছিল, আমার অনভ্যস্ত হস্তে তেমনি করিয়া উহার অঙ্গ গরম করিতে লাগিলাম। সহসা শয্যার উপরে একটা শব্দ শুনিয়া দেখি সুনন্দা শয্যার উপরে উঠিয়া বসিয়াছে এবং দুই চোখে অপরিসীম বিস্ময় লইয়া সে একবার মিনির পানে এবং আর একবার আমার পানে চাহিতেছে।

পরক্ষণেই সুনন্দা ছুটিয়া আমার নিকটে আসিল, অঞ্চলটা

কাঁধের উপর হইতে খসিয়া ভূমিতে লুটাইতেছে কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। আমার কোল হইতে ক্ষিপ্রহস্তে মিনিকে লইয়া ও যেন এতদিনের সমস্ত কথা একেবারে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"ওমা! আমি কোথায় যাবগো! কি আশ্চর্য্যি, ওকে পেলে কোথায় তুমি, এঁ্যা? আহা, কি রোগাই হ'য়ে গিয়েছিস তুই রে মিনি, ছিলি কোথায় এতদিন পোড়ার মুখো! চোখের মাথা খেয়েছিলি নাকি? আসতে পারিস নি এতদিন?"

তাহার পরে আমার পানে চাহিয়া দুই চোখে অপূর্ব্ব মায়া মাখিয়া স্নিগ্ধ হাসিতে মুখখানা ভরিয়া সে কহিল,—"এই রাতে আনলে নাকি তুমি ওকে! এই ঝড়ের রাতে, এই বৃষ্টি মাথায় করে! জলে যে চুলগুলো একেবারে ভিজে গেছে গো!" বলিয়া এক হাতে মিনিকে লইয়া অপর হাতে নিজের অঞ্চলটা দিয়াই সে সযত্নে আমার বেশ হইতে বারিবিন্দু সকল মুছিয়া লইল।

আমি আসিয়া পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিলাম। আবার সেই প্রথমদিনের ন্যায় মিনিকে লইয়া সুনন্দা ভুলোর কক্ষে প্রবেশ করিল,—"ওরে ও ভুলে! কুম্ভকর্ণ নাকি তুই, এঁ্যা? মিনি এসেছে যে রে! একবার চাইতেও নেই, খালি ভোঁস ভোঁস করে ঘুম!" ভুলোর বোধহয় এ হেন অপবাদে আপত্তি ছিল, ভেউ ভেউ করিয়া সে তাহাই জানাইল।

গায়ের চাদরটা টানিয়া লইলাম। অপর কক্ষ হইতে সুনন্দার কণ্ঠস্বর কাণে গেল,—"দেখলিতো! কেমন ভালবাসেন তোদের, মুখেই শুধু দেখান ওরকম। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কত কষ্ট করে এনেছেন মিনিকে—এখন থেকে সব সময় ওঁর কথা শুনবি, বুঝলি?"

কথাটা যেন বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় আমার অন্তরে বাজিয়া উঠিল। ঠিক একবৎসর পূর্ব্বে এমনই দিনে আসিয়াছিল মিনি, চলিয়া যাইবার সময় যে বিরাট অন্তরালের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিল আমাদের উভয়ের মধ্যে, আজ যেন তাহারই সমাপ্তি সাধন করিবার জন্য, এই ঝটিকাক্ষুব্ধ গভীর রাত্রে দেবদূতের ন্যায় সে আসিয়া পুনরায় আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিল।

শ্রীআলোক রায়

প্রতীক্ষা

শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী এম-বি

১

আর কি মোদের মিলন হ'বে, আর কি বাসর হাস্‌বে সই?
আশায়-আশায় দিন চলে যায়—আশার বাণী ফল্‌ল কই?
তোমার লাগি অশ্রু দিয়ে, গেঁথেছিলাম মাল্য প্রিয়ে,
সাধের মালা শুষ্ক হ'ল, ভুল ভেঙে' আর ক'দিন বই?

২

দিনের আলো ডুব্‌ছে রোজ্-ই রাতের আঁধার হচ্ছে ভোর,
বছর শেষে আস্‌ছে বরষ—অচল শুধু ভাগ্য মোর!
আঁখির আগে বর্ষা নামে, এলিয়ে দিয়ে চিকুর-দামে,
শরৎ হাসে শীত-বিলাসে, মন-টি মাতায় চৈত্র-চোর।

৩

ছায়ার ছবি চল্‌ছে ছুটে, অনেক হেরে' পলক-হীন,
আঁখির পাতা ভার হ'ল আর আঁখি-দুটির দৃষ্টি ক্ষীণ!
এখনো এই সাঁঝ্‌লা কালোয়, সখি, তোমার রূপের আলোয়
জাগ্‌তে যদি নয়ন পথে···আবার চোখে জাগ্‌ত দিন।

৪

এই জীবনের কয়-টা দিবস, শ্বাস ফেলিতে হারায় শ্বাস,
তা'র মাঝে এই একটু মাগি প্রিয়ে, তোমার বাহুর পাশ,
ফেল্‌তে গিয়ে চোখের পলক, ফুরিয়ে যাবে প্রাণের ঝলক,
আস্‌বে কি সেই মিলন-লগন, ক্ষণিক লাগি' মিট্‌বে আশ?

মুঘল রাজ্যে গুপ্তচর বিভাগ

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী এম-এ, পি-আর-এস্

আদিম যুগে যখন তুর্কমুঘল রাজগণ মাত্র শৌর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্য বিস্তার করিত, তখন গুপ্তচরের বিশেষ কোন প্রয়োজন অনুভূত হইত না। তাই আমরা জেঙ্গিস্ খাঁন, হলাগু খাঁন, মন্গু খাঁন, তিমুর লঙ, শাহরুক্ প্রভৃতির রাজত্বকালে বিশেষ কোন গুপ্তচরের সংবাদ পাই না। অবশ্য শত্রু-রাজ্যের সৈন্যবল, সৈন্য সমাবেশ, বিদেশের পথ ঘাট ইত্যাদির সঠিক সংবাদের জন্য অগ্রদূত (অথবা Scout) নিযুক্ত হইত। ইহারা সাময়িক ভাবে রাজকার্য্য করিত। কোন প্রতিষ্ঠান স্বরূপ রাজ্যে তাহাদের কোন স্থান ছিল না। প্রয়োজনানুবোধে তাহাদের নিযুক্তি ও বিচ্যুতি হইত। তুর্কমুঘল সম্রাটগণ নিজেদের কীর্ত্তি-কাহিনী ও সাম্রাজ্যের বিস্তারকে চিরন্তন করিয়া রাখিবার প্রয়াসে একদল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিত তাহারা ওয়াকেয়া নবীশ (Recorder of events) এর কাজ করিত। ইহারা এক হিসাবে সংবাদিকের কাজ করিত। এবং অন্যদিকে অনেকটা রাজ-ঐতিহাসিকের কাজ করিত। প্রাদেশিক কেন্দ্রসমূহেও ওয়াকীয়া নবীশ সুবেদারের দপ্তরে নিযুক্ত থাকিত। বিস্তৃত মুঘল রাজ্যের সুদূরতম প্রদেশের খবরা-খবরের জন্য সম্রাট তাহাদের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেন। মাঝে মাঝে সম্রাট তাঁহার কোন বিশ্বস্ত সেনাপতিকে বিজিত রাজ্যে বশ্যতা স্বীকারোক্তি গ্রহণের জন্য ও রাজকর আদায়ের জন্য প্রেরণ করিতেন। তাহারা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাদের ফলাফল নিবেদন করিত। এই সকল সংবাদ ওয়াকীয়া নবীশ তাহার দপ্তরে সংগ্রহ করিয়া রাখিত। প্রাদেশিক ওয়াকীয়া নবীশ প্রতি সপ্তাহে সম্রাটের নিকট গুপ্তভাবে প্রদেশের প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রেরণ করিত। এই সকল গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। এবং নিশাকালে সাধারণতঃ নয় ঘটিকার সময় রাজান্তঃপুরিকা কোন বিশ্বস্ত মহিলা কর্ত্তৃক পঠিত হইত। (Ref. Manucci Vol. II. p. 331. Irvine), বাবরের আত্মজীবন চরিতে শত্রুর সংবাদ সংগ্রাহক কয়েকজন গুপ্ত কর্ম্মচারীর নাম পাওয়া যায় (Ref. Bevridge Vol. III p 663)।

কিন্তু ওয়াকীয়া নবীশ সময়ে সময়ে সম্রাটকে ভুলসংবাদ দিয়া অথবা সত্য সংবাদ গোপন করিয়া বিপর্য্যস্ত করিতেন। যখন মুঘল সাম্রাজ্য মাত্র রাজ্যজয়ে নিবদ্ধ না থাকিয়া সুনিয়ন্ত্রিত শাসনধারায় পর্য্যবসিত হইল, তখন সম্রাটগণ এই ওয়াকীয়া নবীশের উপর পরিপূর্ণ নির্ভর না করিয়া সত্যতর সংবাদের জন্য কিংবা ওয়াকীয়া নবীশের কার্য্য পরিবেক্ষণ করিবার জন্য আর একজন গুপ্ত সংবাদক সংগ্রাহক নিযুক্ত করিতেন। এই জাতীয় সাংবাদিককে মুঘল রাষ্ট্রপরিভাষায় খুফিয়া নবীশ বলিত। 'খুফিয়া" অর্থ "গুপ্তসংবাদ"। "ওয়াকীয়া" অর্থ "ঘটনা"। "খুফিয়া নবীশ" গণের নাম হইতে বুঝা যায় যে তাহাদের কার্য্য গুপ্তভাবের ছিল; এই জাতীয় কর্ম্মচারীগণ গোপনে কাজ করিত—তাহাদের নাম ধাম কার্য্যাবলী সম্রাটের নিকট জ্ঞাত থাকিত—এবং তাহাদের প্রেরিত সংবাদ সম্রাটের গুপ্ত দপ্তরে থাকিত। অথচ ওয়াকীয়া নবীশের কাজ প্রায়ই সদরে ও প্রকাশ্যে হইত। এবং তাহারা সর্ব্বসাধারণের নিকট উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরূপে পরিচিত ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে এই গুপ্ত বিভাগ সাম্রাজ্যে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানরূপে স্থান পাইল।

এই গুপ্ত বিভাগের কর্ম্মচারীকে বর্ত্তমান Imperial Mail Service এর মতন কাজ করিতে হইত, এই ডাক সরবরাহের জন্য প্রতি কর্ম্মচারীর অধীনে ২০ জন করিয়া অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত। এই অশ্বারোহিদিগের দ্বারা সম্রাটের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইত। এই বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীকে হরকরা বলা হইত। তাহার প্রেরিত সংবাদ সরকারী ডাক কর্ম্মচারীও

বহন করিত। সম্রাটের নামে মুদ্রাঙ্কিত পত্রাবলী কোন ডাক বিভাগের দারোগা কর্তৃক খোলা হইত না। দারোগার উপর সরকারী ছাড়পত্র প্রদানের (Passport) ভার ন্যস্ত ছিল, গুপ্তবিভাগের কর্ম্মচারীকে কখনো কোন সরকারী কর্ম্মচারী কোন কাজে বাধা প্রদান করিতে সাহস করিত না। তাহারা কোন সংবাদ চাহিলে নিষেধ করিতে সাহস করিত না। পথে সরকারী থানার দারোগা, জায়গীরদার অথবা জমীদার তাহাদের খাওয়া দাওয়া বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য ছিল। ডাকবিভাগের সঙ্গে গুপ্তচর বিভাগের বিশেষ নিকট সম্বন্ধ ছিল—তাহারা প্রায়ই একযোগে কাজ করিত।

সম্রাট আকবর এই বিভাগের ভিতর শৃঙ্খলা ও বিশেষ নিয়মের প্রবর্ত্তন করেন। জাহাঙ্গীরের ও শাহ্‌জাহানের সময়ও এই দুই বিভাগ সাম্রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইত। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবন চরিতে গুপ্তচর বিভাগের সুন্দর সুন্দর গল্প পাওয়া যায়। কিন্তু ঔরংজেবের সময় এই গুপ্ত বিভাগ বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে, ঔরংজেবের রাষ্ট্রশাসনতন্ত্রে গুপ্তচরের প্রাধান্য এত বেশী ছিল যে তাহাদের সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া ঔরংজেব রাজপুত্র কামবক্সের শিবির ধ্বংস করিতে আদেশ দেন। এই জাতীয় রাজকর্ম্মচারীগণ এত নির্ভয়ে কাজ করিত যে চারহাজারী মনসবদার হামিদখানের বিরুদ্ধেও মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহস করিয়াছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের ভিতর আর এক প্রকার কর্ম্মচারী ছিল—তাহারা চিরকাল অপ্রকাশিতভাবে কাজ করিত। তাহারা গোয়েন্দা নামে পরিচিত ছিল। "গোয়েন্দা"র ধাতুগত অর্থ হইল বোলনেওয়ালা—ধাতু "গোয়ান" অর্থ "বলা"। যখন ওয়াকীয়া-নবীশ অথবা কুফিয়া-নবীশ রাজকর্ম্মচারীরূপে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত হইল, তখন তাহারা প্রকাশ্যভাবে সম্রাটের জন্য গুপ্ত খবর সংগ্রহ করিতে পারিত না। এবং প্রায়ই ওয়াকীয়া-নবীশ ও কুফিয়া-নবীশ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের সহিত একত্রিত হইয়া সত্যসংবাদ গোপন করিত অথবা মিথ্যা সংবাদ সম্রাট দরবারে প্রেরণ করিত। এই জন্য ঔরংজেব গোয়েন্দা বিভাগের উপর বিশেষ নজর দিলেন। সেই ষড়যন্ত্রের যুগে বহুদূর বিস্তৃত সাম্রাজ্যে রাস্তা ঘাটের অসুবিধায় বিশ্বাসের অভাবে এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে ঔরংজেব গোয়েন্দা বিভাগের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করিলেন। ঔরংজেব তাঁহার পিতা, পিতামহের বিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়া এবং নিজের অতীত জীবনের কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার পুত্রদের গতিবিধি অনুসন্ধানের জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেন। হাসিম-উদ্দিন কৃত আহাকাম্‌-ই-আলমগিরি নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। মহবৎখাঁনের বিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়া ঔরংজেব প্রত্যেক সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত গুপ্তচর প্রেরণ করিতেন, যেমন ফরাসী বিদ্রোহের সময় Convention সেনাপতির গতিবিধি নির্ণয়ের জন্য Representatives on Mission নিযুক্ত করিয়াছিল। অবশ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে কৌটীল্যের সময় আমরা গুপ্তচর বিভাগের বহুবিধ সংবাদ পাই, ঔরংজেবের পূর্ব্বেও গোয়েন্দা ছিল, আলাউদ্দিনের সময় গোয়েন্দার কার্য্য এত নিখুঁত ছিল যে তাহাদের সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সম্রাট বলিতে পারিতেন যে, কোন্‌ আমীর কোন্‌ দিন কি খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামী স্ত্রীর নিভৃত আলাপ পর্য্যন্ত সম্রাটের অগোচর ছিল না। ঔরংজেবের সময় সকলে বলিত even walls have ears, (প্রাসাদ-প্রাচীরের শ্রবণ ক্ষমতা আছে)। একজন গোয়েন্দার চিঠিতে আমরা দেখিতে পাই যে লাহোরে মালবেরী ফলের মিষ্টত্ব খুব বেশী ছিল। এই রকম পুঙ্খপুঙ্খানু সংবাদ সম্রাটের জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত।

অবশ্য সব সময়ে যে গোয়েন্দারা সঠিক সংবাদ দিত তাহা নহে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার সংবাদ ওয়াকীয়া-নবীশের সংবাদ দ্বারা ওজন করা হইত। সেই সংবাদের সত্যতা কুফিয়া-নবীশের সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া নির্ণয় করা হইত। তারপর যখন দেখা গেল যে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, ওয়াকীয়া নবীশ ও কুফিয়া নবীশ প্রায়ই এক প্রকার মিথ্যা অথবা সত্য সংবাদ দিত, তখন সম্রাট গোয়েন্দার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতেন। গোয়েন্দার নাম ধাম প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা অথবা ওয়াকীয়া-নবীশ বা কুফিয়া-নবীশের নিকট জ্ঞাত ছিল না। বার্ণীয়ার বলেন যে গোয়েন্দারাও মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত সংবাদ দিত। ক্রায়ার বলেন যে গোয়েন্দার প্রেরিত সংবাদ

শেষে প্রায়ই মিথ্যা সংবাদ দিত। ক্রায়াবের মতে ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রধান কারণ এই যে গোয়েন্দারা সম্রাটকে শত্রুর গতিবিধি ও সৈন্য সমাবেশের সঠিক সংবাদ দেয় নাই। গোয়েন্দাগণের সংবাদ যাচাই করিবার জন্য ও প্রদেশের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য সম্রাট বা সম্রাটপুত্র অনেক সময় রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইতেন।

যাহা হউক সেই যুগে মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে গোয়েন্দারা একটী বিশেষ প্রতিষ্ঠানরূপে বিবেচিত হইত। ফৌজদার, কাজী, কোতোয়াল প্রভৃতির অত্যাচারের বিষয় গোয়েন্দারা গোপনে সম্রাটের নিকট সংবাদ দিত। এই সমস্ত অত্যাচারের জন্য সম্রাট অনেক সময় দোষীকে শাস্তি দিতেন। আবার যদি কখনো গোয়েন্দা ভুল সংবাদ দিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইত, তবে তাহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। দানেশ-মন্দ্ খাঁন বলেন যে ঔরংজেবের রাজ্যে ৪০০০ গোয়েন্দা ভারতের নানা স্থানে নিযুক্ত ছিল। তাহাদের প্রধান কর্মচারীর নাম ছিল—দারোগা-ই-হরকরা। তাহার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

সনেট

শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায়

বিরহের শতদল ফোটে মোর ব্যথার সায়রে,
তারে ঘেরি উঠিতেছে অন্তহীন যে সুর-ঝঙ্কার,
সে ত নহে গান সখা, সে যে ছন্দে বিলাপ আমার ;
মর্ম্মের নিরুদ্ধ অশ্রু, গন্ধাবে কাঁদিয়া শুধু মরে!
দীপালী নিভেছে, আছে সাথীহীন শূন্য অন্ধকার ;
নীরব নূপুর দুটি গৃহকোণে পড়ে' অনাদরে!
রজনীগন্ধার গন্ধ বৃথাই দুয়ারে কেঁদে মরে!
শীতের হিমেল বায়ে, ঝরে ফুল বরণমালার!
কথা আজ শেষ হল, মন মোর হয়েছে মুখর!
তোমারে ধরিতে চাই পাই নাক তোমার নাগাল,
মিতালি পাতালো তাই পথসাথে নয়ন কাঙাল ;
জীবনের বেলাভূমে নামে সন্ধ্যা বিষণ্ণধূসর!
স্মরণের ফুল-ভরা নীরব পূজার উপচার
হে মোর দূরের প্রিয়, হেথা হতে দিই উপহার।

সূর্য্যাস্ত

(ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়)

নেমেছে দুইটি ছায়া স্বপ্ন সম ক্ষণিকের তরে
স্রোতের উছল্ জলে,—সকরুণ কল্প্র কলেবরে।
উদ্বেলিত বেণুবন সূর্য্যাস্তেরে দিতেছে বিদায়,—
কৃষ্ণ সায়রেতে যেন দলে দলে বলাকারা যায়।

ঢলে-পড়া তরুচ্ছায়া, আর হায় স্নিগ্ধ সমীরণে,
সুমন্দ তরঙ্গগুলি বক্ষে বহে প্রণয়-বন্ধনে।
মুহূর্ত্তেকে কারো পানে চাহিবার সময় যে নাহি ;
আনন্দ-দোলায় চলে শুভ্রতার জয়গান গাহি'।

বাণী তার থাকে শুধু আবরিয়া ঘন-অন্ধকার।
যে-জন গিয়াছে, হায়, ফিরে কভু আসিবে না আর।
ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন-কথা!—চলে যায় ফেলি অশ্রু-নীর,
কেঁদে যায় ব্যর্থতায় সেই মত নিশির শিশির।

শ্রীপ্রমথনাথ কুণ্ডার

অচল প্রেম

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

৭

কল্যাণপুর হইতে জেলার সদরে আসিতে হইলে গঙ্গাপার হইয়া প্রায় দশ মাইল পথ গোযান, অশ্বযান অথবা ট্যাক্সি বা বাসে যাইতে হয়। আবার সদর হইতে রেলষ্টেশন ছয় মাইল পথও ঐ যান বাহন ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

একদিন এই পথে সন্ধ্যার পর একখানা ট্যাক্সি হেলিয়া পড়িয়া ছিল। গাড়ীর হুড ফেলা ছিল বলিয়া গাড়ীর ভিতরে আরোহী ছিল কি না বুঝা যাইতেছিল না। গাড়ীর সম্মুখ-ভাগের আসনে ড্রাইভার বা অন্য কোন লোকও ছিল না। অথচ গাড়ীর আলোকগুলি ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া রজনীর অন্ধকার দূর করিতেছিল, সেই উজ্জ্বল আলোকে নিকটবর্ত্তী কতকটা স্থান আলোকিত হইতেছিল। ড্রাইভারের আসনের সম্মুখে একটা বিছানা ও দুই একটা খুচরা মাল ছিল বলিয়া বুঝা যাইতেছিল।

ভোঁ ভোঁ করিয়া হরণের আওয়াজ দিয়া আর একখানা ট্যাক্সি উহার পশ্চাতে আসিয়া থামিয়া গেল, এখানিও কলিকাতা যাত্রী গাড়ী। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, "কি হোলো হে?"

ড্রাইভার বলিল, "একখানা ট্যাক্সী রাস্তায় হেলে পড়ে পথ আটকে রেখেছে, একটু ঘুরে গরুর গাড়ীর পথ দিয়ে না গেলে এগুনো যাবে না।"

আরোহী জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ীতে কে রয়েছে? হরণ দাও না।"

ড্রাইভার বলিল, "গাড়ীতে কেউ নেই বোধ হচ্ছে, দেখি নেমে।"

ড্রাইভার নামিয়া পড়িল, আরোহীও সঙ্গে সঙ্গে অবতরণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "তাইত হে, গাড়ী হেলে পড়েছে, লোক জন নেই, অথচ আলো জলছে, মানে কি?"

ড্রাইভার তাহার গাড়ীর দিকে ফিরিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "ভাল বোধ হচ্ছে না, বাবু। কি একটা হাঙ্গামা—"

বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "হাঙ্গামা? এ পথে হাঙ্গামা? কি, ডাকাতি রাহাজানি নাকি?" তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, শেষে বলিলেন, "তুমি ত আচ্ছা আহাম্মখ হে! এখান থেকে সদর কতটা পথ হবে বল দিকি?"

ড্রাইভার বলিল, "আজ্ঞে, তা মাইল তিনেক হবে।"

কথাটা শুনিয়া আরোহী হেলা ট্যাক্সীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "গাড়ীতে কেউ আছেন কি?"

প্রশ্নের কোন জবাব না পাইয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। হুডের দুই পার্শ্বে পর্দ্দা ফেলা—তবে কি মহিলা আরোহী রহিয়াছেন ভিতরে? এমন অসহায় অবস্থায় নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে?

বাবুটি মৃদু হাসিয়া আপন মনে বলিলেন, "মন্দ নয়, রাতের আঁধারে রীতিমত রোমান্স!"

যেন তাঁহার মনের কথার উত্তর দিয়া অকস্মাৎ পর্দ্দা সরাইয়া একখানি সুন্দর ঢলঢলে কাঁচা মুখ তাঁহার করধৃত টর্চ্চ লাইটের আলোকমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া অপরিমেয় বিস্ময়ের উদ্রেক করিল। তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার ধমনীর রক্ত দ্রুত সঞ্চালিত হইল, টর্চ্চ লাইটটা কম্পিত মুষ্টি হইতে চ্যুত হইবার উপক্রম করিল, জীবনে কখনো এমন বিস্মিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। আর সেই আলোকমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনীর প্রস্ফুটিত কমলদল তুল্য মুখখানির মধ্য হইতে ভাসা ভাসা টানা চোখ দুটি নিষ্পলক অবস্থায় তাঁহার দিকে নিবদ্ধ হইয়া রহিল—সেই আয়ত কৃষ্ণতার নয়নেও বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

ক্ষণকাল মাত্র। বাবুটি সসঙ্কোচে অপলক নেত্রের দৃষ্টি অবনমিত করিয়া লইলেন। তাহার পর মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি? আপনি এখানে—একলা—এই রাত্তিরে?"

আরোহিণীর নয়নকোণে দুষ্ট হাসির রেখা খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "আপনিও বোধ হয় যে-কারণে এখানে, আমিও সেই কারণে,—আমারও কলকাতায় যাবার তাড়াতাড়ি ছিল।"

বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না, স্ত্রীলোকটি দীপ্তি—আর অপর ব্যক্তি হিমাংশু। উভয়ের এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ উভয়েরই মনে কৌতূহলের উদ্রেক করিয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

হিমাংশু বলিল, "তা এ অবস্থায় এখানে প'ড়ে—"

দীপ্তি বলিল, "সবই আপনাদের এই পল্লীজননীর চমৎকার ব্যবস্থার কৃপায়!" কথাটায় যে একটু ক্রোধের ঝাঁঝ ব্যঙ্গের সহিত মিশ্রিত ছিল না, এমন কথা বলা যায় না।

হিমাংশু যেন জন্মভূমির অপরাধে নিজেই অপরাধী, এইরূপ মনে করিয়া সঙ্কুচিতভাবে বিনীতকণ্ঠে বলিল, "দেখুন, এ সময়ে রাস্তাটা বরাবর মেরামত হয়ে থাকে। দিনে হ'লে কোন অসুবিধা হোতো না আপনার। রাস্তার খোয়ায় আর কাদায় আপনাদের বড় কষ্ট হয়েছে বোধহয়? তা আপনি একলা যে? যদুবাবু সঙ্গে নেই? ওঃ তিনি সবে অসুখ থেকে সেরে উঠেছেন বটে। তা—"

দীপ্তি বলিল, "সেরে ঠিক ওঠেন নি, তাঁকে একটু ভাল হলেই কলকাতায় পাঠিয়েছিলুম। খবর পেয়েছি, সেখানে তাঁর হার্ট ট্রাব্‌ল্ আরম্ভ হয়েছে, তাই যাচ্ছি। তবে একলা না, সঙ্গে নিতাইচরণ আছে।"

হিমাংশু বলিল, "তাই ত। তা নিতাইচরণ গেল কোথায়? ড্রাইভারকেও দেখছি না। কি, ব্যাপার কি?"

দীপ্তি বলিল, "গাড়ী আটকে গেল মাঠের মাঝখানে—ড্রাইভার গেল কোথায় মাইলখানেক দূরে কি গঙ্গাপুর না কি গ্রাম আছে, সেখানে লোকজন ডাকতে। তার দেরী দেখে নিতাইচরণকে পাঠিয়েছি তার খোঁজে।"

হিমাংশু বিস্মিত হইয়া বলিল, "আর আপনি রয়েছেন এই তেপান্তর মাঠের মাঝখানে একলা এই ভাঙা গাড়ীতে বসে?"

দীপ্তি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তাতে কি হয়েছে? আপনিও ত দেখছি একলা—"

হিমাংশু অনুযোগের সুরে বলিল, "তা বলে আপনি? আসুন নেমে, ও গাড়ীতে যাওয়া যাক।"

দীপ্তি মৃদু হাসিয়া বলিল, "কেন বলুন দিকি? আপনি গাড়ীখানা ছেড়ে দেবেন নাকি আমায়? আপনি কি করবেন? এই মাঠেই থেকে যাবেন?"

হিমাংশু বলিল, "না, তা বলছি না। দুজনেই ঐ গাড়ীতে যাওয়া যাবে—আমি ড্রাইভারের পাশে বসবো। আসুন।"

দীপ্তি বলিল, "এর জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু তার দরকার হবে না—আমার লোকজন এসে পড়লো বলে। আপনি যান, হয়ত আর দেরী করলে গাড়ী ধরতে পারবেন না।"

হিমাংশুর নয়নে একটা কঠোর দৃঢ়তাব্যঞ্জক দৃষ্টি দেখা দিল, সে গম্ভীরস্বরে বলিল, "না, তা হয় না, আপনাকে এই মাঠে একলা ফেলে আমি এক পাও নড়বো না। আসুন, নেমে আসুন। সহদেব! মায়ীজীর লগেজপত্র ও গাড়ীতে নিয়ে যাও।"

কথাটা বলিয়া কোন জবাবের বা ওজর আপত্তির অপেক্ষা না রাখিয়া সে স্বয়ং একটা মাল উঠাইয়া লইয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দীপ্তির নির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দীপ্তি বিস্মিত। এই ভদ্রলোকটি কি প্রকৃতির লোক? সে ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলিল, "না, না, আমি—"

হিমাংশু বাধা দিয়া বলিল, "আপনি কি পাগল হয়েছেন? আপনার লোকজনের আশা করছেন? তারা না হয় গঙ্গাপুর থেকে দশ পনেরো জন লোক নিয়ে এল, গাড়ীখানা না হয় তারা সোজা করে পথে তুললে। কিন্তু তারপর? যদি একখানা এক্সল্ ভেঙে থাকে? কিম্বা অন্য কোন গিয়ার বিগড়ে থাকে? তা হলে কি তারা তিন মাইল পথ এটাকে ঠেলে নিয়ে সদরে পৌঁছে দেবে? পৌঁছে দিলেও কি সেখানে তখনি ট্যাক্সী পাবেন ষ্টেশনে যেতে? আর সে কতক্ষণে?

লাষ্ট ট্রেণ তা হলে আজ ধরতে পারবেন কি ? আসুন, নেমে আসুন।"

দীপ্তি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল, এরূপ নির্ব্বন্ধপরায়ণ মানুষ ত দেখিতে পাওয়া যায় না,—বার বার প্রত্যাখ্যান করিলেও ছাড়িতে চাহে না। আশ্চর্য্য ! কিন্তু কথাগুলি যাহা বলিতেছে, তাহার যুক্তি অখণ্ডনীয়। কি করি ?

হিমাংশু ক্রমে অধীর হইয়া উঠিতেছিল। সে এবার আরও দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "দেখুন, আপনাকে আমি না নিয়ে যাবো না যখন, তখন অনর্থক দেরী করছেন কেন ? এর পর ট্রেণটা ফেল হতে হবে। যে জন্যে তাড়াতাড়ি রাত্তিরে যাচ্ছেন, তা পণ্ড হয়ে যাবে। আসুন নেমে।"

প্রথমে ক্রোধে দীপ্তির মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হিমাংশুর কঠোর দৃষ্টির সম্মুখে সে নিজের দৃষ্টি অবনমিত করিয়া লইতে পথ পাইল না। সে আর কোন ওজর আপত্তি না করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। রুদ্ধ ক্রোধ ও অভিমানে তাহার তখন কান্না পাইতেছিল, এমন ত কখনও হয় না।

হিমাংশুর ট্যাক্সী বায়ুবেগে উড়িয়া চলিল, গাড়ীতে উঠিবার সময় সে ড্রাইভার সহদেবকে সে বিষয়ে বিশেষ অনুজ্ঞা দিয়াছিল। গাড়ী রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া ঝড়ের বেগে উড়িয়া চলিয়াছে, কাহারও কথা কেহ শুনিতে পায় না। উভয়েই নিস্তব্ধ। উভয়ে পরস্পর হইতে দূরে একবারে দুই পার্শ্বে সরিয়া বসিয়াছিল। হিমাংশু যদি গাড়ীর পিছনের আসনে না বসে, তাহা হইলে দীপ্তি গাড়ীতে উঠিবে না, এই সর্ত্তে হিমাংশুকে সম্মত করাইয়া দীপ্তি গাড়ীতে উঠিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী গঙ্গাপুরে পৌছিল। হিমাংশুর আদেশে সেখানে গাড়ী থামিল। ক্ষুদ্র গ্রাম, মাত্র দুইখানি দোকান ঘর, তাহারই একখানিতে কয়জন লোক বসিয়া হল্লা করিতেছিল। তাহারা নিতাইচরণ ও ট্যাক্সী ড্রাইভারের সংগৃহীত লোক। হিমাংশু গাড়ী হইতেই ড্রাইভারকে সংক্ষেপে অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া, সে পরে ভাড়া তাহার কাছে পাইবে, ইহা জানাইয়া নিতাইকে নিজের গাড়ীর ড্রাইভারের পার্শ্বে উঠাইয়া লইল, গাড়ী আবার বায়ুবেগে উড়িয়া চলিল।

ভগ্ন ট্যাক্সির ড্রাইভার হিমাংশুকে সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে এই ডাক্তার বাবুটির 'বুঝানব' অর্থ বিলক্ষণ বুঝিত, কারণ ইতিপূর্ব্বে একটি ঘটনায় একজন অসভ্য বাসচালক হিমাংশুর নিকট যাহা 'বুঝিয়াছিল', তাহা এই ড্রাইভার আরও কয়জনের সহিত প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

এত হুড়াহুড়ি তাড়াতাড়ির কিন্তু কোন প্রয়োজন ছিল না। যখন তাহারা ষ্টেশনে পৌছিল, তখনও গাড়ী আসিতে অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। ওয়েটিং রুমে দীপ্তিকে বসাইয়া রাখিয়া হিমাংশু ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে জানিয়া আসিল, ট্রেণ আজ লেট, বোধ হয় এক ঘণ্টার কমে ষ্টেশনে আসিতে পারিবে না।

তখন দুইজনে হাসিয়া ফেলিল,—অনর্থক কি ছুটাছুটি! হিমাংশু লেডিস্ ওয়েটিংরুমের বাহিরে একখানা চেয়ার আনাইয়া বসিয়াছিল, নিতাইচরণ তাহার পদতলে বসিয়া ঢুলিতেছিল। ক্ষণপরে সে বেডিংএর উপর কাত হইয়া পড়িয়া বিষম নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিল। হিমাংশু একটু সরিয়া গিয়া বসিল। সে অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, হঠাৎ দীপ্তির মিষ্ট আওয়াজে চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া চেয়ারখানা আগাইয়া দিল।

বিশ্রামকক্ষের বাহিরে আসিয়া দীপ্তি বলিতেছিল, "ঘুমুলেন ?"

হিমাংশু বলিল, "না। আপনি বসুন।"

দীপ্তি বলিল, "না, না, আমি এখনই যাচ্ছি ঘরে। বলছিলুম কি, এ লাইনের রেলগাড়ীগুলোও কি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে—আমি পাড়াগেঁয়ে নই বলে ?"

হিমাংশু হাসিয়া ফেলিল। তাড়াতাড়ি আর একখানা চেয়ার আনিয়া দীপ্তিকে বসিতে দিল এবং নিজেও উপবেশন করিল। তাহার পর বলিল, "বোধ হয় তাই। এই পাড়াগাঁটা নিজেও যেমন বুনো অসভ্য, তেমনি এর গাড়ী, ঘোড়া, মানুষ সবই,—এই যেমন ধরুন না আমিও।"

দীপ্তি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ বা আহত না হইয়া প্রফুল্লচিত্তে বলিল, "রাগ করবেন না, মিথ্যে কিছু বলিনি।

এখনও যে আমাদের পাড়াগাঁ আর পাড়াগাঁর মানুষ অনেক পিছনে পড়ে আছে, তা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন? অবশ্য আপনার মতো হয় ত দু'চার জন তার ভিতরে সহরের কালচার পেয়ে অন্য রকম হয়েছেন, সে কথা আলাদা।"

হিমাংশু মনে মনে ক্রুদ্ধ হইতেছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে সহজ ভাবেই বলিল, 'সহরের কালচার কাকে বলেন?"

দীপ্তি বলিল, "যদি রাগ না করেন, তা হ'লে একটা কথা বলবো—বলুন রাগ করবেন না?"

হিমাংশু বিস্মিত হইয়া বলিল, "রাগ? কেন, রাগ করবো কেন?—তাও আপনার উপর—বিশেষ যখন আপনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই।"

দীপ্তি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নরম করিয়া কথা কহিতে জানিত না। তাই সরাসরি হিমাংশুর বুকে কথার হুল ফুটাইয়া বলিল, "এই যে আপনারা আমার কোন মতামতের অপেক্ষা না রেখে আমার সঙ্গে আপনার বিবাহের সম্বন্ধটা একেবারে পাকা করে ফেলেছেন, এটা কি পাড়াগাঁয়ের কালচারের অভাবের জন্য হয় নি বলতে চান?"

দীপ্তির অধরোষ্ঠ কম্পিত হইল, চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল।

হিমাংশু অতিমাত্র বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া উঠিল—তাহার মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল না। সে তখন মনে মনে তাহার পিতার সহিত সেদিনের বিশ্রম্ভালাপের কথা স্মরণ করিতেছিল। তবে কি পিতা এই সম্বন্ধের কথাই ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন?

দীপ্তি বলিল, "কি চুপ ক'রে রইলেন যে? কথাটা সত্যি ব'লে খুবই লেগেছে বুঝি? আপনারা মেয়েছেলেদের এমনি ক'রে ঘটি-বাটীর মত বিতরণ করে দেন, কিন্তু তাদের মনে কি রকম লাগে, তা কি ভেবে দেখেন একবারও? কি সুবাদে—কি আলাপ পরিচয়ের জোরে আপনারা এ রকম ক'রে একতরফা বন্দোবস্ত করেছেন আমার সম্বন্ধে?—এ বিষয়ে আপনার কি কিছুই বলবার নেই?"

হিমাংশু সত্যই আঘাতের পর আঘাতে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল, তাই নীরব ছিল। এইবার আপনাকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "দেখুন, আমি স্বীকারও করছি না কিছু, অস্বীকারও কিছু করছি না। আসলে কথাটা হচ্ছে এই যে, বাবা আমার একটা বিবাহের সম্বন্ধের কথা পেড়েছিলেন, আমাকে তাতে রাজী হতেও বলেছিলেন, আমি তাতে রাজী হই নি। তবে সে সম্বন্ধ কার সঙ্গে ঠিক করেছেন তা বলেন নি। এতে যদি আমার বা আমার বাবার কোন অপরাধ বা কালচারের অভাব হয়ে থাকে, তা হলে আমায় মাপ করুন।"

এই ক্ষমা প্রার্থনা যেরূপ কঠোরকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, তাহাতে অন্য কাহারও বুঝিতে নিশ্চিত বাকী থাকিত না যে, হিমাংশুর আত্মসম্মানে খুবই আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু দীপ্তি ছিল ভিন্ন ধাতুতে গঠিত। সে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া বলিল, "এতে ত' ক্ষমা করবারও কিছু নেই, প্রশংসা করবারও কিছু নেই। কথাটা হচ্ছে কালচার নিয়ে। আমার বলবার কথা এই যে, আমাদের ধারণা এক রকমের, আর আপনাদের অন্য রকমের,—এ দুয়ে কখনও মিল হওয়ার সম্ভাবনা নেই।"

হিমাংশু অন্যমনস্কভাবে বলিল, "হুঁ, তা নেই বটে।"

দীপ্তি বলিল, "রাগ করলেন না বোধহয়? সত্যি কথা অনেক সময়েই বিশ্রী লাগে।"

হিমাংশু গম্ভীরভাবে বলিল, "রাগ বা অন্য কিছুর কথা ভাবছি না আমি। আমি কেবল ভাবছি, কতটা অশ্রদ্ধার ভাব আপনার মনে দেখা দিলে আপনি আমার বাবার সম্বন্ধে এমন ছোট ধারণা করতে পারেন।"

কথাটা বলিয়া সে বিক্ষিপ্তমনে প্লাটফরমের প্রান্তদেশের দিকে চলিয়া গেল। দীপ্তি তখনও বুঝিতে পারে নাই, তাহার অসংযত রসনা হিমাংশুকে কি কঠোর আঘাত দিয়াছে। মুক্তপ্রান্তরে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় যে তাহাকে অযাচিতভাবে যথাসাধ্য সাহায্যদান করিয়াছে, সে তাহার প্রতিদানে তাহাকে কি দিতেছে?—অসম্মান, অপমান! কিন্তু আশ্চর্য্য! বিধাতা তাহাকে যে ধাতু দিয়া গড়িয়াছেন, তাহাতে উহাও বুঝিবার সামর্থ্য বোধহয় তাহার ছিল না।

৮

দীর্ঘ পত্র,—পত্রখানি কল্যাণপুর হইতে আসিতেছে। লিখিয়াছে সেথানি বন্ধু নীহারবালা, দীপ্তি তাহাতেই তন্ময় হইয়াছিল।

তাহার তাঙ্গীপুত্রের প্রকাণ্ড প্রাসাদ 'অমৃতধামে' পৌছিয়া সে তাহার মাতুল যদুগোপাল বাবুর অবস্থা দেখিয়া সত্যই শঙ্কিত হইল,—দেশে তাঁহার বিসূচিকা রোগ দেখা দিলেও এমন ভয় তাহার হয় নাই। অতি কষ্টে তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে, ডাক্তার প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া যাইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন,—তিনি একেবারে শয্যাগত।

দীপ্তি প্রথম দুই একদিন দাসদাসীর সাহায্যে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল; কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শে সে পরে নার্স নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইল। নার্সটি তাহার জানা, কল্যাণপুরেই পরিচয় হইয়াছিল তাহার সহিত—সে-ই তাহার মাতুলকে সেখানে নার্স করিয়াছিল। হৃদ্‌রোগে নার্সের বিশেষ প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু ঐ নার্সটি তাহার মাতুলের প্রকৃতি জানিত বলিয়া দীপ্তি মাতুলের রোগশয্যাপার্শ্বে তাহার উপস্থিতি দুই চারি দিনের জন্য বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিল।

নার্সের উপস্থিতি হেতু আজ দীপ্তি একটু আরাম করিয়া শুইয়া ছিল; শুইবা মাত্রই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ইহা তাহার স্বভাবের ব্যতিক্রম, কেন না সে দিবানিদ্রায় কখনও অভ্যস্ত নহে। নিদ্রাভঙ্গের পর সে তাহার চিঠির ট্রের উপর একখানা ডাকের চিঠি দেখিল। চিঠির উপর তাহার বন্ধু নীহারের হস্তলিপি দেখিয়া সাগ্রহে সেইখানিই প্রথমে তুলিয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিল।

নানা অপ্রয়োজনীয় কথার মধ্যে দুই একটি কথা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নীহার লিখিয়াছে, এমাসের "বঙ্গ-তরুণী" পত্রখানা লাইব্রেরী হইতে আনাইয়া পড়িবার সময় তাহাতে কুমারী কল্পনাদেবী নামে এক লেখিকার একটা গল্প পড়িয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে; গল্পটির নাম "প্রতিশোধ।" এই কল্পনাদেবীর ছবি ও নাম ধামের পরিচয় ঐ সঙ্গে দেওয়া আছে। তাহা হইতে নীহার জানিয়াছে, সে লেডি আর্টিষ্ট ও পামিষ্ট, রাসবিহারী এভেনিউ তাহার ঠিকানা। গল্পটি এমনই চমৎকার যে, সে পড়িয়া ঐ লেখিকাকে দূর হইতে কি পুরস্কার দিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। তাই দীপ্তির উপর সেই কার্য্যের ভার দিতেছে। দীপ্তির বাড়ী রাসবিহারী এভেনিউ হইতে বেশী দূর নয় বলিয়া সে জানে। সুতরাং অবসর মত দীপ্তি একদিন ঐ কল্পনার বাড়ী গিয়া যেন তাহার মুখে দশঘা ঝাঁটা মারিয়া পুরস্কার দিয়া আসে!

দীপ্তি বিস্মিত হইল। কি এমন গল্প; আর রাসবিহারী এভেনিউ?—লেডি আর্টিষ্ট? তাহার বেতনভুক নার্সের বাসাও ত রাসবিহারী এভেনিউ না?—সেও না একজন লেডি আর্টিষ্টের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে বাস করে?

কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল, কাজেই সে ভাবিল একখানা "বঙ্গ তরুণী" এই অপরাহ্ণেই আনাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু ততক্ষণ তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না, নীহার তাহার পরেই সেই গল্প হইতে কতক রচনাংশ উদ্ধৃত করিয়াছে। তাহা এইরূপ:—

তরুণ ও তরুণীর স্বভাবই হচ্ছে ভালবাসা। সে ভালবাসা যে বিয়ের মধ্য দিয়ে দেখা দিতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। বিয়েটা আটপৌরে কাপড়ের মত, রাতদিনই প'রে থাকতে হয়। ওটা হ'ল মানুষের গড়া একটা সামাজিক নিয়ম। ওটা না মেনে চললে সংসার ঠিক সচল থাকে না, সমাজের একটু ওলট-পালোট হয়ে যায়।

কিন্তু ভালবাসা হ'ল অন্য জিনিষ। ওটা পোষাকী কাপড়ের মত দামী, তুলে রাখতে হয়, নমাসে ছমাসে দরকার হলে তখন পরতে হয়। ওটা আইন নয়, মানুষের স্বভাব, যাকে বলে ইনষ্টিংক্ট। সমাজ ওটাকেও বিয়ের মত অনেক রকম গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখতে চায়—কিন্তু ঝড়তুফানকে কেউ আটকে রাখতে পারে কি? মন যখন যাকে চায়, তখন কি আর গণ্ডী মানতে চায়, না স্বামী পুত্রের মুখ চেয়ে বসে থাকে গণ্ডীর মধ্যে? তখন মনের মধ্যে যে প্রলয়-নাচন আরম্ভ হয়, তা কি আর সমাজ সংসারের ঠেকো দেওয়া খোড়ো-ঘর সহ্য করতে পারে? বিরাট বিপুল নায়েগ্রা প্রপাতের মত পাষাণ প্রাচীরের বাঁধনকে তুচ্ছ করে অসহ উদ্দাম পুলকে শৈল হতে শৈলান্তরে কম্পিত আগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৃত্যছন্দে ছুটে চলে যায়,—এই ত' ভালবাসা

ওভারল্যাণ্ড মেল যেমন ছোটখাট ষ্টেসনগুলোকে কটাক্ষে অতিক্রম ক'রে একটা বড় ষ্টেসনে মুহূর্ত্ত মাত্র থেমে পুরাতনকে ঝেড়ে ফেলে আনন্দে বাঁশী বাজিয়ে আকাশে বাতাসে সিগারের ধূমরাশি ছড়িয়ে বিদ্যুৎদৃষ্টি হেনে বিরাট দৈত্য-দানবের মত—বাঁধনহারা পাগলের মত—আবার নূতনের সন্ধানে ছুটে চলে যায়—কারও সন্তোষ অসন্তোষের অনুগ্রহ নিগ্রহের ধার ধারেনা, ভালবাসা তেমনই। সেও তার উদ্দাম প্রলয়নাচনে কোনও বাধা বিপত্তি ঝঞ্চা ভ্রূকুটির ধারই ধারে না। ভালবাসার ত বাঁধা-ধরা আসা-যাওয়া নেই—সে আসে ঘন কৃষ্ণ মেঘের বুক চিরে বিজলীর চকিত চমকের মত অতর্কিতে আচম্বিতে পথচারীর নয়নের দৃষ্টি ঝল্‌সে দিতে। অচেনা নাম-না-জানা দয়িতের চরণ প্রান্তে নিজেকে বিলীন করবার জন্যে দুর্গম গিরি কান্তার মরুর বুকের উপর দিয়ে অনাস্বাদিত আশঙ্কার স্পন্দনে বুকখানা দুরু দুরু কাঁপিয়ে দেয়—এই ত ভালবাসা। উদার মহান অনন্ত মহাসমুদ্রের অবিরাম অবিশ্রান্ত জলকল্লোল বেলাভূমিকে গ্রাস করতে ছুটে আসে, আবার প্রীতিভরে সেই দয়িতের চরণ চুম্বন ক'রে ফিরে চলে যায় নূতন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে,—এইত ভালবাসা। ভালবাসা হ'ল মানুষের মনের অবাধ অনন্ত অসীম উচ্ছ্বাস। সে উচ্ছ্বাস ধরে রাখবে মানুষের গড়া বিবাহের বিধি নিষেধ ? অসম্ভব !

বিদ্যুৎপ্রভা যতই এসব ভাবতে লাগলো, ততই অচলায়তন ঘরসংসারের বাঁধন কেটে তার মনটা ছুটে চলে যেতে চাইলো নীরেন রায়ের বাহুবন্ধনের ভিতর। কিন্তু অচলায়তন বাধা তার বিবাহিত জীবন। যতই দিন যেতে লাগলো, ততই বাড়তে লাগলো তার আটপৌরে স্বামীর স্বামীত্বের দাবী। ইডিয়টটা নামেও যেমনি, কাযেও তেমনি। হরিনারাণ। ছিঃ ছিঃ একেবারে আউট অফ ডেট্‌। এখনও থাকতে চায় কপোত কপোতী যথার মত।

সেদিন একটা পার্টি ছিল,—ইডিয়ট আগলে বসে রইলো, পায়ে ধরতে লাগলো, আগে থেকে কথা দিয়েছে, তাকে নিয়ে ননদের ছেলের অন্নপ্রাশনে যাবে। তার কান্না পেতে লাগলো। কি করে, বাধ্য হয়ে ব্রুট্‌টার সঙ্গে তাকে যেতে হ'ল। কিন্তু ফিরে এসেই এ অত্যাচারের প্রতিশোধ যা সে নিলে, ইডিয়ট্‌টা জন্মেও তা ভুলবে না।

পার্টিতে গিয়েই সে নীরেন রায়ের সঙ্গে গা ঢাকা দিলে। কি লুভী মানুষ। তাকে দেখলেই নীরেন ডাক্তারের চোখ দুটো যেন গিলে খেতে আসে। কাছে গেলেই পোষা কুকুরটী, লেজ নাড়ছে, পা চাট্‌ছে, কেঁউ কেঁউ করছে।

ইহার পর অবশিষ্ট অংশের উপর ত্বরিত দৃষ্টিপাত করিয়া দীপ্তিরও আর পড়িবার প্রবৃত্তি থাকিল না। সে এতদিন নির্ব্বিকল্প স্বাধীনতার অতিমাত্র পক্ষপাতী ছিল, কোন কিছু বিন্দুমাত্র বন্ধন মনের উপর পড়িলেই আগুন হইয়া উঠিত। সে এখন ভাবিতেছিল, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা—কিন্তু সেই স্বাধীনতারও কি একটা মর্য্যাদা বোধ থাকে না ? মনকে বন্ধন দেওয়া অত্যাচার, এ কথা ঠিক, কিন্তু মনের শুচিতা, পবিত্রতা রক্ষা করা কি উহার অন্তরায়? এ সমস্যার সমাধান কে করিয়া দিবে?

নীহারের আর একটি কথাও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। পত্রে আছে :—হিমুদা কলকাতায় ডিস্‌পেনসারী খুলছে, তার দরুণ পিসেমশাই নাকি অনেক টাকা দিচ্ছেন। এদিকে শুনছি, বাপ বেটায় দুটো জিনিষ নিয়ে খুব ঝগড়া হয়ে গেছে। গাঁয়ে হিমুদার একটা কীর্ত্তনের দল আছে নিশ্চয় শুনে গেছিস। তাদের সঙ্গে ওপারের পাথরঘাটার দলের পাল্লা হয়েছিল, যে জিতবে সে নিশেন পাবে। এই নিশেন নিয়ে মারামারি হয়েছিল পরে। পিসেমশাই তাই নিয়ে হিমুদাকে যাচ্ছেতাই কনেন, সব কাযে মুড়ুলী ক'রে হৈ হৈ ক'রে বেড়ায় ব'লে খুব বক্লেন। তা ছাড়া তাকে বিয়ে করতে বলেন, আর বলেন যে তিনি কনে ঠিক করেছেন। হিমুদা তাতে মুখের উপর 'না' বলেছিল। তাইতে পিসে মশাই ভয়ানক রেগে গেছেন। এখন টাকা দেন কি না সন্দেহ। কেউ বলছে, হিমুদাকে বিষয় দেবেন না, কেউ কেউ বলছে সর্ত্ত করে দেবেন। কিন্তু হিমুদাকে আমি জানি। ও বড় একগুঁয়ে। নিজে যা বুঝবে তাই করবে, বিষয় গ্রাহ্যই করবে না। কিন্তু আমি ভাবছি, একি হ'ল। পিসেমশাই কোথায় কনে ঠিক করলেন ? সে মেয়েটা কত জন্ম তপস্যা করেছিল যে, হিমুদার জন্যে তাকেই পিসেমশাই পছন্দ করলেন ? যদি এখন পিসেমশাই ঐ জেদ ধরে বসেন, তা হলে হিমুদাকে হারাবেন, এ কথা বলে রাখলুম। গাঁয়ে আর কোন কথা নেই, কেবল ঐ এক কথা। একটা কথা বলি, রাগ করিস নি। জানি এটা হবে না,

তবুও বলি, যদি পিসে মশাই তোকে পছন্দ করেন, আর যদি তোদের দুজনের মিলন হয়, তা হলে আমার যত আহ্লাদ হবে, এত আর কারু নয়।”

পত্রে আর বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু এইটুকু পড়িয়াই দীপ্তি পত্রখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল, শেষটুকু আর পড়িলই না। শয্যাত্যাগ করিয়া সে কিছুক্ষণ কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইল। মনে তখন তাহার কি চিন্তার খেলা চলিতেছিল, তাহা সে-ই জানে। চিঠিখানা তাহার মুষ্টির মধ্যে পিষ্ট হইতে লাগিল।

মুক্তার মা কক্ষদ্বার হইতে বলিল, “ঘরের বাতি জেলে দোবো কি, দিদিমণি?”

দীপ্তি অন্যমনস্কভাবে বলিল, “না, থাক্। কি, আলো জ্বালবে? তা দাও।”

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল ছটা বাজিয়া গিয়াছে। ইস্ সে এতক্ষণ ঘুমাইয়াছে? না, পত্র পাঠ করিতেই বিলম্ব হইয়াছে। পত্র?—হাঁ, মুষ্টিমধ্যে এই ত পত্র রহিয়াছে। পত্রখানাকে টেবিলের টানার মধ্যে রাখিয়া দিয়া দীপ্তি মুক্তার মাকে বলিল, “মামার ঘরে কে আছে? নার্স এসেছে কি?”

মুক্তার মা তখন দীপ্তির শয়ন কক্ষের পাট সারিতেছিল, সেখান হইতে বলিল, “হাঁ এসেছে দিদিমণি। এই খানিকক্ষণ ওষুধ খাইয়ে, ফলটল ছাড়িয়ে দিয়ে গেল।”

“চলে গিয়েছে?”

“না বোধ হয়। দেখে আসছি, দিদিমণি।”

দীপ্তি বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাজপথের অসংখ্য যান বাহনের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাণী দেবী কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, “আমায় ডেকেছিলেন আপনি?” এই মেয়েটিকে দেখিলেই কি জানি কেন বাণী দেবী কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন, অথচ অপ্রতিভ হইবার মত মানুষের সাক্ষাৎ তিনি আজিও জীবনে পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

কোন জবাব না পাইয়া তিনি আর একটু উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ডাকছিলেন আপনি?”

দীপ্তি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “বসুন। কখন এসেছেন?”

বাণী দেবী ঈষৎ শঙ্কাজড়িত স্বরে বলিলেন, “আমি? ঠিক চারটের সময়েই এসেছি—আমায় যেমন বলে দিয়েছেন—”

বাধা দিয়া দীপ্তি বলিল, “না, তা বলছি না, দু চার মিনিট এদিক ওদিক হলেই যে পৃথিবী উল্টে যাবে, তা মনে করিনি। দেখুন বাণী দেবী, কাজ করে মন। জিজ্ঞাসা করছিলুম কি জানেন, চারটে থেকে ছটা পর্য্যন্ত দু ঘণ্টা মামাবাবুর হার্টব্রিদিং একটুও লক্ষ্য করছেন কি?”

“না, একটুও ছিল না। তবে বড় দুর্ব্বল এখনও—সেরে উঠতে টাইম নেবে।”

“তা নিক্। তাতে এসে যায় না। আমি শুধু জানতে চাই, একটু একটু ক’রে ভালর দিকে যাচ্ছেন কি না।”

বাণী দেবী বলিলেন, “সবে আজ দু’ঘণ্টা কাছে ছিলুম, রাতটা না দেখলে বলতে পারিনে। তবে যেটুকু দেখেছি তাতে ভালই দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। এ বিষয়ে ডাক্তার গাঙ্গুলী আমার চেয়ে ভাল বলতে পারবেন—”

“তা জানি। কিন্তু ডাক্তারেরা যে সবাই ধন্বন্তরী, সে বিশ্বাস আমার নেই। আমার মনে হয়, নার্সরা হাতে করে রোগীকে ঘাঁটেন বলে তাঁদের অভিজ্ঞতাটা বেশী হয়। তাই আপনার কাছে জানতে চাইছি। আরও দুদিন দেখুন, সেবা করুন।”

বাণী দেবী যে এ কথায় একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন না, তাহা নহে। মানুষ মাত্রেই করিয়া থাকে। তিনি প্রসন্নমুখে বলিলেন, “কথাটা বল্‌লেন যদি ত বলি। অবশ্য ডাক্তার গাঙ্গুলীর কথা বলছি না, কিন্তু অধিকাংশ ডাক্তারই যে দায়িত্ব বুঝে চলেন, তা বলতে পারি না। আমি যে ব্যবসা করি, তাতে এমন হাজার হাজার ডাক্তারের সংস্পর্শে আসতে হয়। দেখি, তাদের বেশীর ভাগই আমাদের পরামর্শ নিয়ে চ’লে থাকে। বিশেষ যারা একবারে নভিস্—এই যেমন ধরুন না ডাক্তার হিমাংশু মিত্তির—আপনাদেরই পাশের গাঁয়ে বাড়ী—”

দীপ্তি সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, “হ্যাঁ, তা কি করেছেন তিনি? আমি ত যতদূর জানি, মামার অসুখের সময় দুই একদিন দেখতে এসেছিলেন ব’লে আপনার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। প্র্যাকটিশ ত তিনি আজও আরম্ভ করেন নি—”

বিনীত কণ্ঠে বাণী দেবী বলিলেন, "না, তা না। তবে কাগজে পড়ছিলুম, কলকাতায় এসে সেদিন মনুমেন্টের কাছে মজুদুর সভার কি একটা ঝাণ্ডা উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন বলে তিনি গ্রেফতার হয়েছেন—"

দীপ্তি সোজা হইয়া বসিল, উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিল, "গ্রেফ-তার হয়েছেন? পুলিসে?"

বাণী দেবী বলিলেন, "হ্যাঁ, পুলিসে গ্রেফতার করেছিল, জামিনে খালাস আছেন। মামলার দিন পড়েছে আসছে মাসে। কিন্তু যাঁরা ডাক্তারী ব্যবসা করবেন, তাঁদের পক্ষে এ সব কি ভাল? এসব ডাক্তারের কতটুকু দায়িত্বজ্ঞান আছে?"

দীপ্তি অন্যমনস্কভাবে বলিল, "হুঁ, তা বটে। আচ্ছা, কল্পনা দেবীকে জানেন? তিনি আপনার কে?"

বাণী দেবীর মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল,—সে মুখ তখন ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত হইবার যোগ্য। কি অতর্কিত অদ্ভুত প্রশ্ন। কোথায়—কোন কথা হইতে কি কথা আসিল। এ মেয়েটির কি সবই অদ্ভুত?

বাণীদেবী আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "কল্পনা দেবী? হাঁ—না—হাঁ—কৈ না—ওঃ কল্পনা দেবী?"—

দীপ্তি শ্লেষের ভঙ্গীতে বলিল, "হাঁ, হাঁ, কল্পনা দেবী—শুনতে পাননি নামটা? ঐ যিনি আর্টিষ্ট ও এট্রলজার না পামিষ্ট না কি—ঐ রাসবিহারী এভেনিউতে যাঁর ষ্টুডিও। আপনারও ওখানে চেম্বার না?"

মহা ফাঁপরে পড়িয়া বাণী দেবী গলদঘর্ম্ম হইলেন। বাণী দেবী—যাঁহার চারে কত বড় বড় রুই কাতলা খেলিয়া বেড়ায়, তিনি এই "একরত্তি" মেয়েটির কাছে সত্যই হাঁপাইয়া উঠিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "হাঁ, তিনি আমার কেউ না—একফ্লাটে তাঁরও ষ্টুডিও আছে বটে আমার সঙ্গে—তা, তা, তাঁর কথা"—

দীপ্তি বাধা দিয়া বলিল, "কিছু না, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলুম। আপনি দশটায় আসছেন ত? আমি চললাম এখন মামার ঘরে, আপনি যেতে পারেন। বেলা চারটে থেকে ছটা, আর রাত দশটা থেকে রাত শেষ আপনার ডিউটি, বুঝলেন?"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া দীপ্তি চলিয়া গেল, বাণী দেবী উদ্বিগ্ন মনে কত কি চিন্তা করিতে করিতে মোটরে গিয়া উঠিয়া বসিলেন। জমিদার বাড়ীর মোটরে তাঁহাকে লইয়া আসিত ও পৌঁছাইয়া দিত। এই মেয়েটিকে বাগে আনা যে নিতান্ত সহজ নয়, বাণী দেবী তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া গেলেন।

রোগীর ঘরে গিয়া দীপ্তি দাসদাসীদের ইঙ্গিতে কক্ষত্যাগ করিতে বলিল। পরে শয্যাপার্শ্বে আসনগ্রহণ করিয়া বলিল, "এখন কেমন আছ, মামা?"

যদুবাবু মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "বেশ আছি মা, তোমার ব্যবস্থায় মন্দ থাকবার যো আছে কি?"—

দীপ্তি বাধা দিয়া বলিল, "হার্টট্রাবলের ব্যায়রাম—একেবারে পুরো বিশ্রাম নিতে বলে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু, বেশী কথাও কইবে না বুঝেছো?"

যদুবাবু বলিলেন, "না মা, আমি ত একটুও নড়িচড়িনি। তবে আজ বেশ সুস্থ বোধ করছি বলে উঠে বসেছি, কথা কইছি। জান মা, মজা এ ব্যায়রামের? যখন ধরে তখন যাই যাই, যখন ব্যথা ছেড়ে যায়, তখন একেবারে সহজ মানুষ! তা মা, এ দুদিনে তুমিও ত শুকিয়ে গিয়েছো, বুড়ো বড় কষ্ট দিচ্ছে তোমায়, না মা?"

দীপ্তি সে কথার কোন জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মামা, প্রসাদপুরের চন্দ্রবাবু হঠাৎ তোমার কাছে আমার সঙ্গে ছেলের বিয়ের কথা বলে পাঠালেন কেন? তুমি কি তাঁর কাছে আগে থেকে কথা পেড়েছিলে?"

যদুবাবু হতভম্ব। একি অতর্কিত প্রশ্ন! তা দীপ্তির সকল কাজই এই রকমের। কেমন সহজ সরলভাবে নিজের বিবাহের কথা কহিয়া যাইতেছে।

তিনি কোন কথা গোপন না রাখিয়া বলিলেন, "না মা, হঠাৎ কিছু এর মধ্যে নেই, আর আমি এ সম্বন্ধে প্রস্তাব করিনি। প্রস্তাব হয়েছে প্রায় একই সঙ্গে দুপক্ষ থেকে।"

দীপ্তি বিস্মিত হইল, বলিল, "কি রকম? এই বলছো তুমি প্রস্তাব করনি, আবার বলছো দুপক্ষ থেকেই প্রস্তাব হয়েছে এক সঙ্গে। তার মানে?"

যদুবাবু বলিলেন, "সব বলছি মা, যা জানি। এই প্রস্তাবটা চন্দ্রমাধব বাবু করে পাঠিয়েছেন ব'লে আমি কর্ত্তব্য

মনে করে তোমায় জানিয়েছিলুম। কিন্তু যখন দেখলুম তুমি ও বিষয়ে আর কোন দ্বিতীয় কথা শুনতে চাইলে না, তখন গোড়াকার কথাটা বলবার সুবিধাও পেলুম না।"

দীপ্তি বলিল, "গোড়াকার কথাটা কি?"

যদুবাবু বলিলেন, "দেখ মা, তোমার বাবা আর চন্দ্রমাধব বাবু একসঙ্গে একই পাঠশালায়, পরে ইস্কুলে কলেজে, পড়েছিলেন, একসঙ্গে খেলাধূলো করতেন। তারপর অনেক দিন ছাড়াছাড়ি, তোমার বাবা গেলেন নাগপুরে, আর চন্দ্রমাধব বাবু এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তবে দুজনার মধ্যে প্রায় চিঠিপত্র লেখা চলতো। তোমাদের দুজনের বিয়ের সম্বন্ধ দুজনের মধ্যে একরকম ঠিকঠাকই হয়ে গিয়েছিলো।"

দীপ্তি মৃদুস্বরে বলিল, "আমিত কিছুই জানতুম না।"

যদুবাবু বলিলেন, "না, তা জানবার উপায়ও ছিল না কর্ত্তারা বরাবর একথা আপনাদের মধ্যে গোপন রেখেছিলেন —কেন তা জানিনে। তবে এই বুড়ো সে কথা জানতো।"

দীপ্তি বলিল, "হুঁ, তারপর?"

যদুবাবু বলিলেন, "গেল বোশেখের আগের বোশেখে তোমাদের বিয়ে হবার কথা। তোমার বাবা গেলেন হঠাৎ নাগপুরে চলে জরুরী বিষয় কর্ম্মে, এসেই পড়লেন ব্যায়রামে —আর ঐ ব্যায়রামই হ'ল কাল। মরবার আগে কিছু বলে যেতে পারলেন না, কেবল এই বুড়োর উপর দিয়ে গেলেন হিমালয় পর্ব্বতের ভার চাপিয়ে।"

হঠাৎ দীপ্তির চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল, সে সস্নেহে মাতুলের একখানি হাত ধরিয়া বলিল, "আর সেই অপদার্থ বোঝা যে তুমি প্রাণ দিয়ে বইছো মামা, তা কি আমি জানিনে?"

যেমন আসিয়াছিল তেমনি অতর্কিতভাবে দীপ্তি চলিয়া গেল। যদুগোপালবাবুরও চক্ষু অনার্দ্র ছিলনা। তিনি এমন ভাবে দীপ্তিকে কোনদিন বিচলিত হইতে দেখেন নাই। তাহার মনে যে এমন স্নেহ করুণার উৎস লুকাইয়া আছে, এ ধারণা বস্তুতই যদুগোপালবাবুর ছিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রবালপুরীর মেয়ে

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

তোমার মনের গভীর গহনে গাহন করি',—
সাঁতার কাটিব অতল সাগরে তিমির মত;
প্রবাল রচিত পাতালপুরীতে স্বপনপরী
নীরব ভাষায় মনের বারতা কহিব কত।

তুমি রবে সেথা মৃণালের শিরে কমল সম,
মর্ম্মকোষের সুরভি রেণুতে তপন তারা,
লুকায়ে রহিবে কুহেলি তিমিরে গোপনতম
রূপের আলোকে পরাণ হ'বে গো সকল হারা;

আলয় আমার রাত্রি এবং দিনের দেশে
প্রখর আলোক, নৈশ আঁধার ভয়ঙ্করী
ঋতুর নিত্য নূতন বেদনা যেথায় এসে
বোঝায় পূর্ণ করিছে শূন্য প্রাণের তরী।

মীনেরা যেথায় পাখ্‌না মেলিয়া সাঁতার কাটে
সোনালী মনের কামনা যেথায় করিছে খেলা—
ডুবিব সেথায়; আমার তপন বসেছে পাটে
অস্তসাগরে ভাসিয়া চলেছে প্রাণের ভেলা।

হাঙর এবং অক্টোপাসের ভীষণ দেশে
ফিরিছে মরণ তোমার শান্ত আলয় যেথা,
সেথায় তোমারে লভিব ভয়াল পথের শেষে
তবুও ধরায় র'বনা সহিতে মরুর ব্যথা।

র'বনা ধরায় সহিতে ভীষণ ঝড়ের দোলা,
মরিব তোমার গভীর গহনে গাহন করি',
প্রবালপুরীর দুয়ার সেথায় রাখিয়ো খোলা—
সোনার কাঠিটি রাখিয়ো শিয়রে হে সুন্দরী।

গরীবের বৌ

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

পায়ে পায়ে কেন ? আরো জোরে হাঁটো।
তাড়াতাড়ি চল চ'লে।
ছেলেটাকে ধরো। ছাতাটাকে নাও।
খুকীটাকে করো কোলে।
টর্চ্চ্‌টা কে নেবে ? আমি ? কী যে বলো।
দেখছনা ছড়ি হাতে ?
খাব সিগারেট্‌।
মিথ্যে তোমায় এনেছি বক্তিনাথে।
আরো জোরে এসো। বেড়াতে পাওনা। থাকো ত' অন্ধকূপে।
চেয়ে এসেও চলো পায়ে-পায়ে। ঐ দেখ আসে ভূপে।
ঘোম্‌টাটা টানো। দেখে ফেল্‌লেই ভারী মুস্কিল হবে।
বল্‌বে, 'এমন ক্যাড্‌ মেয়ে দেখে কী ক'রে পড়লি লভে।'
ওদের বৌরা পাশ-করা মেয়ে। কতকী ফ্যাশন জানে।
স্যাণ্ডেল নয়, হিল উঁচু জুতো ঠমকে ঠমকে টানে।
পার্শীশাড়ীটা ভাটিয়ার মত কেমন ঘুরিয়ে পরে।
মাথার কাপড় খসলে কেমন বাঁ-হাতে কোণটি ধরে।
তুমি কি তা পারো ? ঐ যে সাম্‌নে মেয়েটি দেখ্‌তে বেশ।
ছোঁড়াটার দিকে অত কি দেখ্‌চ ? বেহায়ার এক-শেষ।

বছর বছর ছেলে আর মেয়ে। দেখ্‌তে পারিনা চোখে।
জানিনা মুখ্যু মেয়ে কী দুঃখে বিয়ে ক'রে আনে লোকে।
কালো চেহারা যে দেখ্‌তে পারিনা। তুমি হলে সেই কালো।
আমার কী রূপ ? আমি যে পুরুষ। পুরুষের সবি ভালো।
বিদ্বান্‌ নই ? গুণবান নই ? কি দেখে যে মেয়ে দেবে ?
সতী নও তুমি। স্বামীর বিষয়ে এতই রেখেছ ভেবে।
আমি যা হইনা। স্বামী ত তোমার ? স্বামীরে দেবতা জানা
মেয়েমানুষের প্রধান ধর্ম্ম। দোষ দেখা তার মানা।
মুখ্যু বা কিসে ? পড়েছি কলেজে। আই-এ না হয় ফেল্‌।

গুম্‌টি এসেছে। ফটক বন্ধ। ঐ দেখ আসে রেল।
ফুলের গন্ধ পাচ্ছ কি তুমি ? মিষ্টি ফুলের বাস ?
টর্চ্চ জ্বলছেনা। ব্যাটারি গিয়েছে। এই রে। সর্ব্বনাশ।

ফিরে চল রাণী। এ অন্ধকারে চল্‌তে কষ্ট হবে।
হাঁপ ধ'রে গেছে ? বুড়ো মেয়েটাকে কোলে রাখা কেন তবে ?
দাও ত' আমায়। ছাতাটাও দাও। ছড়িটাকে ধরো, এই।
এখন লজ্জা করবেনা আর। পথে যে কেহই নেই।
বেশী আসোনি ত'। কতটুকু পথ। চল্‌তে কষ্ট হ'ল ?
মাথা ধরেছে কি ? পা-টা টিপে দোব ব্যথা হয় যদি, বোল।

কত কষ্টের পয়সা, ছুটিটা কত কষ্টের পাওয়া।—
সবি সার্থক। যদি রোগ সারে লেগে পশ্চিমে হাওয়া।
তুমি সেরে ওঠো। কথা নেই কেন ? কতকি বলেছি ব'লে ?
আর বক্‌বনা। মাপ চাইছি যে। এবারেত' খুসি হ'লে ?

অভিনেতা ও অভিনয়

শ্রীদ্বিজেন আচার্য্য

পথ দিয়ে চলছিলাম।

হঠাৎ দেখি, একটা লোক চট্ করে আমার পাশ দিয়ে পাশের সরু গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সন্দেহ হ'ল ;—

স্পাই নাকি ?

অন্ধকার অপরিষ্কার গলি। শালপাতার ঠোঙ্গা, উনুনের ছাই, তরকারির খোসা, পুঁজ রক্ত মাখা ছেঁড়া নেকড়া প্রভৃতি গলিটাকে বীভৎস করে তুলেছে। চোখ মেলে চাহিলে গলিটার একটা ঐতিহাসিক বয়সের কথা সহজেই লোকের মনে আসে—কতদিনের ?—বোধ হয় কোম্পানীর যুগের।

ভয়ে ভয়ে ঢুকে পড়লাম। ভয় ও কৌতূহল তখন বুকের মাঝে দ্বন্দ্ব চালিয়েছে, কার প্রভাব বেশী তাই প্রমাণ করবার জন্য। জীর্ণ এক দেওয়াল আলিঙ্গন ক'রে গলির মুখে এক শীর্ণ গ্যাস জ্বলছে। কালি পড়া, ভাঙ্গা তার কাচের নাঝ দিয়ে যে টুকুও আলো বার হচ্ছে তাও যেন ভয়ে সেই গলির মধ্যে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। তাই হাত দশেক গিয়েই থমকে দাঁড়িয়েছে।

আশপাশের নোনা ধরা, বালি খসা বাড়ীগুলি থেকে একটা ঝাঁঝাল ভ্যাপ্‌সা গন্ধ বার হচ্ছিল, যাতে মানুষের দম আটকে আসে।

একটু এগিয়ে ভাবলুম, ফেরা যাক।

ভয়কে হারিয়ে কৌতূহলের হ'ল জয়। সেই বিজয়ী কৌতূহল আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও টেনে নিয়ে চলল।

চলতে চলতে হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। হাত বাড়িয়ে পাশের দেয়ালটাকে ধরবার চেষ্টা করতে, একটা জীবন্ত কঙ্কালের গায়ে হাত ঠেক্‌লো।

চমকে চিৎকার করে উঠ্‌লাম,—কে-এ ?

একটা নিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর এলো,—ভিখিরী।

উত্তরের নূতনত্বে চমকে উঠ্‌লাম। আজ পর্য্যন্ত কোন ভিখারীর কাছ থেকে ঠিক্ এমন উত্তর পাইনি।

বল্লুম, তা রাস্তা ছেড়ে, এ গলির মধ্যে কেন ?

কোন উত্তর এলো না।

আবার বল্লুম, কোথায় থাক ?

—মেছবাজার।

বল্লুম, কোন কাজ করতে, না জন্ম থেকে এই ব্যবসা ধরেছ ?

উত্তর এলো, করতুম—অভিনয়।

—অভিনয়!

—হ্যাঁ অভিনয়। এ'কশ' রাত্রি ধরে প্রেমের অভিনয়, বুঝলে ?—চন্দ্রশেখরে প্রতাপের ভূমিকায়—"সন্ধ্যাকালে আম্রকাননে বসে আমি ভাগীরথীর জলকল্লোল শ্রবণ করতুম, আর আমার পদতলে নবদূর্ব্বাদল শয্যায় শয়ন করে শৈবলিনী, নীরবে, আমার মুখের পানে চেয়ে থাক্‌তো। বালিকা ক্ষুদ্র করপল্লবে বন্যকুসুম চয়ন করে, মালা গেঁথে আমার গলায় পরিয়ে দিত * * *" আর আজ—একটা পয়সা বাবা।

বল্লুম, কেন এমন হলো ?

আমার কথায় তখন তার ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের খেয়ালেই ও তখন বলে চলেছে :—

—মাতাল ? মাতালের অভিনয় করবো, অথচ মদ খাব না। এ'কশ' রাত্রি ধরে প্রেমের অভিনয় করবো অথচ ভালবাসব না।—এ যুক্তি মন্দ নয়, কি বল ?

বল্লুম, আচ্ছা পয়সা দিলে মদ খাবে ?

—খাবনা ? মদ না খেলে কেমন করে বুঝ্‌বো আমি প্রতাপ। আমি শৈবলিনীকে ভালও বাসব আবার ভুলবোও। কেমন মজার ব্যাপার নয় ?

ফিরে আসব বলে পিছন ফিরলাম; দুপা এগিয়েও ছিলাম। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, পাগল।

—আমি, না তুমি ? সকাল থেকে কিসের খেয়ালে ঘুরে মরছ তা তুমি নিজেই জান ?

থমকে দাঁড়ালাম।

এবার গলার স্বরটা যেন চেনা বলে মনে হলো। * * * * * বিমলেশ ? * * অসম্ভব! * * কিন্তু গলার স্বর ? উত্তেজনায় তখন আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে।

তার হাত ধরে একটা ঝাঁকনি দিয়ে বল্লাম, বিমলেশ ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর এলো, হ্যাঁ।

স্তব্ধ হয়ে দুজনে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি বা বলবার আছে? সাম্‌নের ইট্ বার করা জীর্ণ দেয়ালটার মতন তার জীবন-ইতিহাসের ছিন্ন পাতাগুলো তখন এক এক করে আমার সাম্‌নে খুলে যাচ্ছে * * বিমলেশ * * উদীয়মান অভিনেতা * * যুগপ্রবর্ত্তক * * যার নামে প্রেক্ষাগৃহে একদিন স্থানাভাব ঘট্‌তো * * আর আজ? * * অন্নাভাবে একদিন একখানা নাটক হাতে তার শরণাপন্ন হয়েছিলাম, সেই সূত্রে আলাপ। তারপর আমার মেসে সে প্রায় আসত, লেখা শুনত', উৎসাহ দিয়ে বল্‌তো, তোমার লেখায় প্রাণ আছে, বুঝলে * * আর আজ?

—কি ভাবছ?

বল্লুম, ভাববার কি আছে বল?

—কিছু না। . তবে না ভেবেই বা থাকা যায় কই?

তারপর একটু থেমে বল্লে, যাবে,—গঙ্গার ধারে?

বল্লুম, চল।

দু'জনে পাশাপাশি চল্‌ছিলাম। গলি থেকে বেরুতে গ্যাসের আলোয় তার মুখ দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। খোঁচাখোঁচা দাড়ি' ঢাকা মুখের যতটুকু দেখা যায় গভীর বসন্তের দাগে ভর্ত্তি। একটা চোখের তারা নিশ্চল ঘোলাটে হয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, বসন্ত হলো কবে?

—প্রায় বছর তিনেক হলো। ডান্ চোখটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। বেশী জোরে কথা বল্‌তে গেলে হাঁপ ধরে, তাই অভিনয় ছাড়তে হলো। অন্য চাকরির চেষ্টা করে-ছিলাম, কিন্তু অভিনেতার যে সুনাম তাতে কেউ সুপারিস্ কল্লে না—অগত্যা ভিক্ষা।

হঠাৎ একটা কথা মাথায় এলো।

তাকে বল্লুম, ঐ ঘাটের সিঁড়িটায় একটু বস্, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আস্‌ছি।

ছুটে খানিকটা এগিয়ে এসে একটা গ্যাসের কাছে দাঁড়ালাম। পকেট থেকে নোটবইটা বার করে,ওর জীবনের একটা স্কেচ লিখে সম্পাদকের আপিসের দিকে ছুটলাম। এ ছাড়া কীই-ই বা আর করতে পারি?

শ্রীবিজন আচার্য্য

কুন্তলা
*
রক্তকমল
*
ক্যাষ্টর অয়েল
*
আদি গন্ধ-তৈল
*
লাইম-জুস
গ্লিসারিন
*
গ্লিসারিন সোপ
*
ফেস-ক্রিম
*
স্নো
*
ইত্যাদি—॥
ল্যাড্‌কো
কলিকাতা

শারদীয়ার আনন্দে—
উপহারের ডালি সাজাইবার
শ্রেষ্ঠ সম্ভার
"ল্যাড্‌কো"
প্রসাধন দ্রব্যাদি

প্রেমের অভ্যুদয়

শ্রীমমতা মিত্র

তোমারি ওই সোনার কাঠির পরশখানি লভি'
চিত্তে আমার ফুটল প্রেমের ছবি।
আমার হিয়ার মৃণালে যে আশা-মুকুল দোলে
একটি একটি ক'রে সে তা'র পাপড়ি আজি খোলে।
তোমায় ঘিরে মুঞ্জরিছে হৃদয়-শতদল,—
খোঁজে তোমার প্রীতির পরিমল।

উষা যেমন হয় গো রাঙা অরুণ-অনুরাগে
তেম্‌নি এ প্রাণ তোমারি রঙ মাগে।
প্রতিপদের সাঁঝে যেমন ভীরু চন্দ্রোদয়,
তেম্‌নি আমার হৃৎ-কমলে প্রেমের অভ্যুদয়।
তোমার প্রণয়-পরশ-মণি দিল আমায় প্রাণ,
তাইত জাগে আনন্দেরি গান।

তোমার চোখের কিরণ-ধারা আমার আঁখি ঘিরে
স্বপন কাজল পরায় ধীরে ধীরে।
দেহে আমার নাইক মাণিক রতন-অলঙ্কার,
পরেছি যে কণ্ঠে, প্রিয়, তোমার প্রীতির হার।
তোমার রূপে পেয়েছি রূপ সকল রূপের সার,—
সেই ত' আমার পরম অহঙ্কার।

নট নারায়ণ

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য

সকাল বেলা ; পড়িবার ঘরটিতে টুলের উপর সমাসীন বিশ্বনাথ। দুহাতে সামনের টেবিল বাজাইতে বাজাইতে মাথা নাড়িয়া বলিতেছিল,-'তেরে কেটে—কেটে তাক্, ধাগ্ ধিন্—কেটে তাক্—' এটা সকালবেলাকার অধ্যয়ন পালার গৌরচন্দ্রিকা।

পাশের ঘর থেকে কাকামশাই ধমকাইয়া উঠিলেন—ও কি হচ্ছে রে,—বিশে ? বাদ্য অমনি থামিয়া গেল। ভব্য সভ্য হইয়া সামনের একখানি বই খুলিয়া বিশ্বনাথ উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিল, "হা-হাহাঃ, হাঃ হাঃ—হাহাহাঃ হাঃ-হাহাঃহাঃ-হাঃ-হাঃ—"

কাকামশাই পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—এই ও—কি ফাজলেমি করছিস্—হতভাগা।

বিশ্বনাথ সমান পরদায় কণ্ঠস্বর তুলিয়া উত্তর দিল, "পড়া করছি কাকাবাবু!"

দেখলে,—কেমনতর বেয়াদবি! সমুচিত শাসন মানসে কাকা উঠিয়া এ ঘরে দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় দেখা দিলেন। সঙ্গীনভাবে বিশুর কাছে আগু হইয়া বলিলেন,—হা হা করছিস্, আর বলছিস পড়া হচ্ছে ?—শুয়ার-গাধা!—

বিশু সতর্ক ছিল, কাকার উদ্যত পাণি দেখিয়া তড়াক করিয়া লাফ দিয়া ওপাশে পড়িল। কাকা মশাইর অভীপ্সিত চড় আশ্রয় না পাইয়া শূন্যে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়া আসিল।

বিশ্বনাথ ন্যায় বলে বলীয়ান, সে নিরাপদ ভূমি থেকে বইখানা টানিয়া কাকার মুখের সুমুখে কায়দা করিয়া তুলিয়া ধরিল। বলিল,—পণ্ডিত মশাইর পড়া, না শিখলে নাড়ু গোপাল করেন,—এই যে ত্যাখো—

চকিতে কাকা মাথা পিছনে সরাইয়া লইয়া সরোষ খেদোক্তি করিলেন, উহুঁঃ। নাকের ডগায় হাত বুলাইতে বুলাইতে দেখিলেন, ব্যাকরণকৌমুদী, স্বরান্তশব্দ, আকারান্ত পুং—হা হা শব্দের রূপ।

কাকা রোষকষায়িত লোচনে ভাইপোকে দেখিতেছিলেন, কি পাজি ছেলে! নির্ব্বিকারে বিশু বুঝাইতে লাগিল, "হা হা মানে গন্ধর্ব্ব, কাকাবাবু! তারা স্বর্গে বসে' হা হা-হাহা রাগিণী করে কিনা, তাই ঐ নাম,—পণ্ডিত মশাই ব'লেছেন।"

কাকা বলিলেন,—থাম বাঁদর, তোর পণ্ডিতও একটা হাহা! পড়্ ব'সে ভাল ক'রে।

বিশ্বনাথ স্বস্থানে বসিতে বসিতে বলিল,—তাই তো কর্‌ছিলাম কাকা, তুমি এসে মিছামিছি মারতে চাইলে—।

কাকা চোখ পাকল করিয়া আর একবার তাকাইয়া মানে মানে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিলেন। দেখিয়া বিশ্বনাথ ঘোর রাবে চীৎকার করিতে লাগিল—হাহাঃ—হাহাঃ-হাঃ-হাঃ হাহাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—।"

গন্ধর্ব্ব রাগিণী ভাঁজিয়া অবিলম্বে বিশ্বনাথ শ্রান্ত হইয়া পড়িল। সে কৌমুদী উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল, ইকারান্ত হি-হি শব্দটা কোথায়।

হঠাৎ সে উৎকর্ণ হইয়া পাতা উল্টানো বন্ধ করিল। তার ঘরের মধ্যেই কোথায় মৃদুস্বরে ঝুম্ ঝাম্ বাদ্য বাজিতেছে। শব্দটা আসিতেছিল ঘরের কোণ থেকে।

কোণে একটা ভাঙ্গা বাক্স,—তার উপরে একগাদা পুরাণো খবরের কাগজ, পাশে একটা কেরোসিনের কানেস্তারা। বিশু গুটি গুটি উঠিয়া গেল, উঁকি মারিয়া দেখিল, কানেস্তারার মধ্যে এক নেংটি ইঁদুর। কবেকার রাখা আতপ চাউলের যৎকিঞ্চিৎ টিনের নীচে পড়িয়া আছে, তাহারই লোভে মূষিক-পুত্র কারাবন্দী হইয়াছেন, অধুনা মুক্তি লাভার্থ লাফালাফি করিতেছেন।

বিশ্বনাথ কাছে যাইতেই নেংটি উন্মত্ত নাচন সুরু করিল, আর মুক্তির সীমান্ত ছুঁইয়া ছুঁইয়া ধুপ্ ধাপ্ নীচে পড়িতে

লাগিল—বাদ্য দ্রুত তালে বাজিতে লাগিল,···খুম্ খাম্-ঝুম্ ঝাম। দেখিয়া বিশুর চমৎকার ঠেকিল ; পাড়ার আশ্রমে নিত্য দেখে ভক্তদল 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' গাহিয়া মুক্তিকচ্ছে নাচে ঠিক এমনি তর। সে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুহাতে টিনের গায়ে ধাঁই ধাঁই বাজাইতে বাজাইতে তার স্বরে গীত সুরু করিল, 'নেতাই গউর-রা-আধে-শে য়াম্।' তালে তালে নেংটি ভক্ত প্রাণপণে নাচিতে লাগিল।

পড়িবার ঘরের সংলগ্ন এদিকে একখানি ছোট চালা, সেটা বিশুদের ঠাকুর ঘর। ঠাকুর মা সেখানে নিত্যকর্ম্মের আয়োজন করিতে আসিতেছিলেন। তিনি ডাকিয়া বলিলেন, ও কি রে বিশু! বিশু উত্তর করিল, ঠাকুরের নাম করছি বুড়ো মা,—গোলমাল কোরো না।

এদিকে নেংটির নামে অরুচি ধরিল, অর্থাৎ হাঁপাইয়া থামিয়া গেল। বিশু ভাবিল, ভক্ত ইঁদুর বটে, হরিনাম শুনে নাচে ; এটাকে ছাড়া হবে না, সবাইকে দেখানো চাই। সে কোঁচার কাপড়ে হাত মুড়িয়া থাবা দিয়া ইঁদুর তুলিয়া আনিল। কাপড় সরাইয়া নেংটির মুখ বাহির করিতেই সেটা বলিল, কিচি-কিচি-কিচি। বিশু ভাবিল এটা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নাকি? ইকারান্ত শব্দের রূপ আওড়ায় দেখছি! আচ্ছা, এটাকে রাখি কোথা?

এদিক ওদিক চাহিতেই বিশুর চোখে পড়িল, পুঁটির ডল কুকুর টেবিলের নীচে চিৎপাত পড়িয়া আছে, আর তার গলার ছোট ঘুঙুর দুটী উল্টাইয়া সেটার হাঁ মুখে ঢুকিয়া গিয়াছে। বিশ্বনাথ একহাতে নেংটিকে সাবধানে ধরিয়া ঘুঙুর দুটী পুতুল কুকুরের গলা থেকে ছিনাইয়া আনিল, সেই সুতা দিয়াই সেদুটী নেংটির গলে বাঁধিয়া দিল। নেংটি আবার প্রার্থনা জানাইল, কিচি কিচি কিচ্ কিচ্, অর্থাৎ ঢের হয়েছে, এখন ছেড়ে দেনা দাদা!

বিশু মাথা নাড়িয়া বলিল 'উঁহু' সেটী হচ্ছে না। এই-এই ঐ যাঃ···।' মাথা নাড়িতে গিয়া হাতের মুঠি কেমনতর আলগা হইয়া গিয়াছিল, নেংটি সয়তান এক লাফে ঝুম্ করিয়া টেবিলের উপর পড়িল এবং নিমেষ মধ্যে চাটাইর বেড়া বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। ওপাশেই ঠাকুর ঘরের চাল, হতভম্ব বিশু চাহিয়া দেখিল, সেই চালের নীচে যে চাটাইর আচ্ছাদন তার মধ্য দিয়া নেংটি টিন্ টিনাটিন্ শব্দ করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এমন মজাটা হাতছাড়া হইয়া গেল। পুঁটির কুকুরটা পায়ের কাছে চিৎ হইয়া মুখ হাঁ করিয়া মজা দেখিতেছে দেখিয়া বিশু রাগ করিয়া সেটাকে দিল একটা পেনালটি কিক। বেচারা ছিটকাইয়া বাহিরে গিয়া পড়িল।

ঠাকুর ঘরে সিলিঙ-এর উপর নেংটির বাসস্থান, সেখান থেকে সে নিম্ন জগতের ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। তত্র কয়েকটী দেবতা বাস করেন, যথা শালগ্রামরূপী নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, একখানি লক্ষ্মীঠাকুরাণী, প ঙ্কর কাছে বড় একটা পেঁচা! দেয়ালে ফ্রেমে আঁটা কয়েকটী পটদেবতা, সম্মুখে ঝুঁকিয়া দেহধারী দেবতাদের ভোগ আরতি দেখেন। বিশুর বাবা (রামনাথ) ও ঠাকুর মা এই দেবতাকুলের নিত্য সেবা ও পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। উর্দ্ধলোকে থাকিয়া নেংটি তা ভক্তিভরে নিরীক্ষণ করে এবং সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া বেড়া বাহিয়া ঐ নিম্নলোকে নামে নৈবেদ্যের চাল কলার লোভে। নিতাই কিছু না কিছু প্রসাদ পায় ; কণিকা লইয়াও সে তুষ্ট। কাজেই বিশু যা-ই বলুক নেংটি বস্তুত ভক্ত মূষিক।

ঘুঙুর গলায় পরিয়া নেংটির প্রথমটা অস্বোয়াস্তি ঠেকিতে-ছিল। ফেলিবার চেষ্টা করিতে যথাসাধ্য লম্ফ ঝম্প করিল, দেখিল, নড়িলেই টুন্ টুনাটুন্ বাজে। অগত্যা সে অলঙ্কারটা স্বীকার করিয়া নিল।

রামনাথদের গৃহদেবতা গদাধর নামে খ্যাত। ইনি বর্ত্তুলকার গণ্ডশিলা, কাজেই অপাণিপাদ ;—সুতরাং নামটী অযথার্থ। ইনি পূর্ব্বে জাগ্রত দেবতা ছিলেন, যখন রামনাথ-দের অবস্থা ভাল ছিল। আজকাল অঘোরে ঘুমাইতেছেন, নহিলে এখন এত অনটন কেন? দেবতাটি আজকাল তাঁর গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছে, সকাল সকাল নিয়মিত আফিস করিতে গিয়া পদ্ধতি মত নিত্য পূজা করা পোষায় না। তবু নিয়ম রক্ষাটা করিয়া আসিতেছিলেন তাঁর মায়ের সাহায্যে। কনিষ্ঠ ভাই গোপীনাথ গোঁয়ার গোবিন্দ—পাড়ায় তাস পাশা ও তামাক চর্চ্চা করিয়া দিন কাটায়। একটা দিন যদি তাকে দিয়া ঠাকুর পূজাটা সমাধা হয়! অগত্যা বিশুর ঠাকুর মা-ই

ঠাকুরঘরের সেবাকার্য্য সম্পন্ন করেন, নিত্য পূজা এবং সন্ধ্যারতির আয়োজন করিয়া দেন। রামনাথ শুধু শালগ্রামকে শোয়ান বসান আর পূজাটা সারেন।

রামনাথের গৃহদেবতা এতকাল শান্তশিষ্টভাবে নিত্য পূজা খাইয়া হৃষ্ট ছিলেন, হঠাৎ দেখা গেল ঠাকুর ঘরের মধ্যে দুষ্টামি নষ্টামি সুরু হইয়াছে। সেদিন প্রাতঃকালে ঠাকুর মা হরিমন্দির মার্জ্জনা করিতে আসিয়া বাহির থেকে শোনেন, ঘরের মধ্যে টিনিক টিন্ ধ্বনি। ব্যাপারটা কি? দরজা খুলিয়া চারি দিক চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না, দেবতারা যে যার স্থানটীতে চুপ চাপ রহিয়াছেন। কেষ্ট ঠাকুরের কোন লীলা-খেলা নয়তো,—যে জাগ্রত দেবতা। ঠাকুরমার মনে একটা ধোঁকা লাগিল। তখনকার কাজ সারা করিয়া গেলেন, কিন্তু কাণ তাঁহার সজাগ রহিল। নিত্য পূজা সমাধা করিতে আসিয়া রামনাথও ঐরূপ অশরীরী ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য করিলেন না,—তাঁর আফিসের বেলা হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যাকালে আরতি দিতে গিয়া ঠাকুর মা আবার শুনিলেন নূপুরধ্বনি। তিনি আস্তে ব্যস্তে দরজা খুলিয়া প্রদীপ ধরিয়া চারিদিক দেখিলেন, কই কোথাও কেহ নাইতো। এবারে তাঁহার ঘোর সংশয় উপস্থিত হইল, তিনি গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিলেন।

পাড়ার আশ্রমে তিনি ধর্ম্ম কথা শুনিতে যান। সেখানে বহুবার শুনিয়াছেন, ভক্তকে অনুগ্রহ করিতে দেবতা কত রকম বিচিত্র লীলাই যুগে যুগে করিয়া আসিতেছেন। সেই সরল বালক ভক্তের কথা,—পূজা সারা করিয়া নারায়ণকে বলিল, ঠাকুর, এখন নৈবেদ্য খাও। সরলহৃদয় ভক্তের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, ঠাকুর এড়াইতে পারিলেন না। লীলাময়ের অচিন্ত্য লীলা কে বুঝিতে পারে? সেই বর্ত্তুলাকার শিলাখণ্ড থেকে হাত বাহির হইল, আস্য প্রকাশ্য হইল, নৈবেদ্যের চাল কলা সকলই ঠাকুরের গিলিতে হইল। নূপুরধ্বনি কত ভক্তই শোনেন। ঐ আশ্রমেই তো গভীর রাত্রে ঠাকুর-ঘরের মধ্যে রাস-লীলা হয়, ভাগ্যবান দু চার জন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। কত কথাই ঠাকুরমার মনে ভাসিয়া গেল। এ বাড়ীতে কি কাহারও অমন ভক্তি আছে? ঠিক মত সেবাও হয় না, তবু ঠাকুরের ইচ্ছায় কি না ঘটিতে পারে? ঠাকুর মা এত সৌভাগ্য কল্পনা করিতেও ভরসা পাইলেন না।

ঠাকুর দেবতার উপর বরাবরই তাঁর অগাধ বিশ্বাস। কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ আশ্রমে জগন্নাথের এক অপূর্ব্ব লীলা-কাহিনী শুনিয়াছিলেন। পুণ্যক্ষেত্র উৎকলদেশে কোনও এক ভক্ত রাজার বয়ঃপ্রাপ্তা অনূঢ়া কন্যাকে দর্শন করিয়া রসিক-শেখর স্বয়ং জগন্নাথ মুগ্ধ লুব্ধ হইয়া পড়িলেন। তদন্তর রহস্য-ময় প্রেম প্রসঙ্গ ঘটিল। আত্মীয় স্বজন অভাজন, তাহারা দৈবী লীলা বুঝিতে না পারিয়া পার্থিব কদাচার সংশয় করিল। জগন্নাথ স্বপ্ন দেখাইয়া জানাইলেন, ভক্তানুগ্রহার্থ তাঁর এই রহসি লীলা। ঐ রাজকন্যা তাঁর গোলোকেরি কাচিৎ নর্ম্ম সখী, অতএব ইত্যাদি।

এই লীলা কাহিনী শুনিয়া ঠাকুরমার একদিকে যেমন ভক্তির অবধি রহিল না, অপরদিকে অসোয়াস্তিরও একশেষ হইল। সেটা হইল বিশুর ছোট বোন পুঁটিকে লইয়া। মেয়েটার বয়স ১০।১১ বছর মাত্র, ফ্রক পরিয়া ছুটাছুটি করে। কিন্তু কচি মেয়ে হ'লে কি হয়, সে যে যখন-তখন একা একা ঠাকুর ঘরে আনাগোনা করে, এটা তাঁর ভাল ঠেকিল না, কে জানে বাপু কখন দেবতার কি খেয়াল চাপে। পুঁটির আবার ঠাকুর-ভোগের প্রসাদের উপর যা অহৈতুকী ভক্তি,—ঠাকুর মা কিছুদিন তাকে চোখে চোখেই রাখিতেছিলেন। সাবধানের বালাই নাই।

উপস্থিত সমস্যা বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠাকুরমা স্থির করিলেন, আরও বিশিষ্ট নিদর্শন কিছু না পাওয়া পর্য্যন্ত এই ব্যাপার গোপন রাখিবেন। কিন্তু বাহির হইবার কোন ছিদ্র না পাইয়া দেবতার লীলা তাঁর পেটের মধ্যে সারারাত্র গিজ গিজ করিতে লাগিল।

পরের দিন সকালবেলা ঠাকুর ঘরের সামনে যাইতেই আগেকার দিনের মত নূপুর নিক্কণ তাঁর কাণে আসিল। নিশ্চয়ই দেবতা নৃত্য করিতেছেন। কিন্তু নাচেন কে? শাল-গ্রামের হাত পা নাই, তাঁর নাচটা কেমনতর অসঙ্গত ঠেকে। লক্ষ্মীঠাকুরাণী ভার-ভার্ত্তিক মেয়েমানুষ, নামেই তো লক্ষ্মী, তাঁরও নাচটা শোভা পায়না। পেঁচাটা বড় জোর ইঁদুর ধরে,

—ওটা আবার নাচবে কি? আরে দূর! বাকী রাধা-কেষ্ট; ইতিহাসেও লেখে এঁরাই রাসনৃত্য করেন, তাহ'লে নাচটা এঁদেরই কর্ম্ম।

ঠাকুরমা ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে রাধা-কেষ্টর চারিখানি পা পরখ করিয়া দেখিলেন, কিছুই বোঝা গেল না। ফুলজল পড়িয়া পায়ের রং স্থানে স্থানে উঠিয়া গিয়াছে, বিগ্রহের উপাদান কারণ দেখা যাইতেছে, কিন্তু সদ্য নৃত্যের কোন লক্ষণ নাই। তবু ঠাকুরমা শ্রদ্ধা ভক্তিবশে প্রত্যক্ষ তুচ্ছ করিয়া ভাবিলেন, মায়ামোহে নয়ন অন্ধ রহিয়াছে, ঠিক ঠিক দেখা যাইবে কেন?

বড় ছেলে রামনাথ তামাক খাইতেছিলেন, তাঁকে গিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, বাবা, অদেষ্ট বুঝি ফিরল, নারায়ণ বোধহয় এতদিনে মুখতুলে চাইলেন।

ঘটনা শুনিয়া রামনাথ বিস্মিত হইয়া বলিল, বল কি মা!

মা বলিলেন, দুদিন ধ'রে শুনছি বাবা! আর কিছু নয়, এ কেষ্ট ঠাকুরের কর্ম্ম। আগে বলিনি, ভেবেছিলাম এত সৌভাগ্য কি আমাদের হবে! কিন্তু আজ আর সংশয় নেই; এখন ঠাকুরের সেবার ভাল আয়োজন করতে হয়।

রামনাথের তখন স্মরণ হইল, তিনিও কাল টুন্‌ টুন ধ্বনি শুনিয়াছিলেন। হুঁকা কলকে রাখিয়া তিনি একবার দেখিতে আসিলেন, কিন্তু তখন ঠাকুরের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

নিত্য পূজা সমাধা করিতে দরজা খুলিতে গিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। শোনেন, টিনিক্‌ টিন্‌—টিনিক্‌-টিন্‌—ঠাকুরের পায়ের নূপুর ধ্বনিই তো বটে! আবারও সেই ধ্বনি! তিনি চট্‌ করিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিলেন, নূপুর শব্দ তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল। রামনাথ রাধাকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যেখানকার মূর্ত্তি সেখানেই তো আছে, নড়চড় হয় নাই। কেষ্ঠঠাকুর বরাবরকার মত মাথা কাত করিয়া বাঁশীটি মুখের কাছে ধরিয়া আহাম্মুকের মত হাসিতেছেন, আর পাশে রাধাঠাকুরাণী একান্ত উন্মুখ হইয়া সম্মুখে চাহিয়া আছেন, যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পয়সায় কটা কলা দিবি? দেবতারা কি ধূর্ত্ত! লোকের সাড়া পাইলেই ভব্য সভ্য হইয়া বসেন দেখছি।

রামনাথ মাকে ডাকিয়া বলিলেন, যথার্থই কেষ্ঠঠাকুর নাচেন। দুই এক দিন পরেই প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে। এখনও লজ্জা ভাঙে নাই, সবার সামনে নাচিতে চান না।

মা বলিলেন, বলেছি তো বাবা, ঠাকুর আমার ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু,...এই লম্বা কথাটা বুড়ী আশ্রমে শুনিয়াছিল।

রামনাথের মনে অনেক কথা খেলিয়া গেল। তাঁর গৃহে কেষ্ঠঠাকুর নৃত্য করেন; ফলে গোষ্ঠী সমেত মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিবে; পরকালের বিষয় নিশ্চিন্ত। আর ইহকালটা, সেদিকে কত কত সৌভাগ্য সূচনা! এই সংবাদ প্রচার করিলে তাঁর ঠাকুরের, তথা তাঁর নিজের কতখানি খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িবে, সেট যে তিনি বোঝেন না এত বোকা রামনাথ নহেন। লোকের কাছে ভক্তকুলতিলক হইবেন, পসার বাড়িবে, অর্থাগম হইতে থাকিবে, 'ফিউচার প্রস্‌পেক্ট' তো যথেষ্টই আছে। সেদিন তিনি ভক্তিভরে বহুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া স্তব স্তুতি করিলেন, মানত করিলেন কাল থেকে বিশেষ আয়োজন করিয়া পূজা ও ভোগ দিবেন; এ অধমকে কৃপা কর করুণাময়!

পরের দিন থেকে ঘটা করিয়া ঠাকুর পূজা হইতে লাগিল:—প্রসাদের ব্যবস্থাও উৎকৃষ্টতর হইল। বিশ্বনাথ অতশত জানেনা, প্রসাদের অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া খোঁজ লইয়া শুনিল, ঠাকুর ঘরে কেষ্ট নাচেন তাই এত সমারোহ। শুনিয়া সে প্রথমটা বড় করিয়া হাঁ করিল। তার পরে কৃষ্ণনৃত্য দেখিতে ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া শুনিতে পাইল অন্তরীক্ষে নূপুর বাজিতেছে। মাথার উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চারণ করিল তালব্য 'শ' য়ে আকার—! কিন্তু কি সুবুদ্ধিটাই সেদিন তার মাথায় খেলিয়া গিয়াছিল। সে চুপ করিয়া গেল, ভক্তের নন্দন কিনা?

সুখবরটা কেমন করিয়া পাড়ায় রাষ্ট্র হইল। পুরুষদল আসিয়া রামনাথকে ধরিল, হ্যাঁ ভাই, সত্যি নাকি? রামনাথ নীরবে প্রেমাশ্রু মুছিতে লাগিলেন, অনেক কষ্টে সামলাইয়া গদগদ কণ্ঠে ব'লিলেন,—এমন কি সুকৃতি আমার আছে ভেবে পাইনা। পাষণ্ড ভক্তাধম আমি, তবু কিনা অহেতুক কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু পতিতপাবন আমাকেই দয়া করলেন,—এই ভাঙা ঘরেই এসে নৃত্য লীলা করছেন! নিজেরই যে বিশ্বাস হয়না,

সত্যি-মিথ্যে তোমাদের কি বোঝাবো ভাই! রামনাথের আবার বাক্‌রোধ হইল, কোঁচার খুঁটে চক্ষু ঢাকিলেন।

মেয়েদের দল বিশুর মা ও ঠাকুরমাকে পাকড়াইল। তাঁরা কি সহজে ঠিক কথা বলিতে চান? নিজেদের অযোগ্যতার বহু পরিচয় দিয়া নারায়ণের অযাচিত করুণাকাহিনী কীর্ত্তন করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রোত্রীদল অশ্রু মুছিতে মুছিতে ঠাকুর ঘরের দাওয়ায় গড়াগড়ি দিল। অনেকেই অনেক কিছু মানত করিয়া গেল।

এদেশে বরাবর প্রত্যক্ষের চেয়ে শ্রুতি প্রমাণ বলবত্তর। ঠাকুরের নাচ অনেকেই দেখিতে আসিল, কিন্তু দর্শন ঘটিল না। অত লোকের সামনে কৃষ্ণচন্দ্র নৃত্য করিতে চাহিলেন না, অগত্যা বাহির থেকে নূপুর নিক্কণ শ্রুতিগোচর করিয়া ভক্তদল কৃতার্থ হইয়া ফিরিল।

দেখিতে দেখিতে রামনাথের বাড়ী একটা ছোটখাট তীর্থস্থানে পরিণত হইল। তিন চারি দিন পরে ঘোর রোলে খোল করতাল বাজিয়া উঠিল; শতাধিক ভক্ত কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিল। দেবতাকে ভোগ দিবার জন্য ভক্তগণ প্রভূত আহার্য্য সামগ্রী আহরণ করিয়া আনিল;—এক মহোৎসব ব্যাপার। রামনাথের আফিস করাই দায় হইল। বাড়ীর আনন্দোৎসব ফেলিয়া আফিসে যাওয়া—এদিকে টানে ভক্তি, ওদিকে রূপার চাকতি, রামনাথ দোটানায় পড়িয়া গেলেন। স্থির করিলেন কয়েকটা দিন ছুটি লওয়া দরকার।

সংবাদটা পাড়ার আশ্রমে যথাসময়েই পৌঁছিয়াছিল। সেখানকার স্বামী মহারাজ যুবক গ্রাজুয়েট, চশমাধারী, কাজেই প্রথমে বলিলেন, সব বাজে কথা। ভাবিলেন এই আশ্রম বিদ্যমানে রামনাথের বাড়ী যাবেন ঠাকুর নাচতে। কিন্তু যখন দেখিলেন, আশ্রমভুক্ত ভক্ত মেয়েপুরুষে ওবাড়ীতে দল বাঁধিয়া যাতায়াত করিতেছে, ঠাকুর প্রণামীও নাকি অনেক সংগৃহীত হইতেছে, তখন তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। রামনাথের বাড়ী ঠাকুরের উৎপত্তি ঘটিলে আশ্রম যে অচিরাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে। যাই হউক ব্যাপারটা একবার দেখিতে হয়।

বিকালবেলা; মহোৎসবে সমাগত লোকজনের প্রসাদ গ্রহণের শেষ পর্ব্ব এখনও চলিতেছে। ওদিকে পট্টবস্ত্র পরিহিত রামনাথ ঠাকুরঘরের দাওয়ায় কুশাসনে বসিয়া আবেশাকুল নয়নে ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। পাড়ার ভক্তদল নীচে সতরঞ্চে বসিয়া তামাকু ও ভক্তিকথা সেবন করিতেছে। এমন সময়ে আশ্রমের স্বামী মহারাজ সেখানে উপস্থিত হইলেন। রামনাথ আড়চোখে দেখিতেছিলেন, মনে মনে পুলকিত হইলেন, তাঁর বাড়ীর ঠাকুরের প্রতিপত্তি গৌরব সত্য সত্য বাড়িয়া যাইতেছে।

রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজকে বলিলেন, আমার এমন সৌভাগ্য! মহারাজ বক্রমুখে তাঁর সৌভাগ্য কথন উপেক্ষা করিয়া ইচ্ছা করিলেন, একবার ঠাকুর দর্শন করিবেন।

রামনাথ বলিলেন, বাধা কি, আসুন ঘরের মধ্যে।

মহারাজ প্রবেশ করিলেন, দুচারজন লোক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিয়া গেল, আর বহু ভক্ত উঁকি দিয়া দেখিবার চেষ্টায় দোরের কাছে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। মহারাজ চারিদিক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর কখন নাচেন?

রামনাথ বলিল, ঠাকুরের ইচ্ছা কখন হয় তা কি কেউ জানে?

উত্তর শুনিয়া মহারাজ গোঁফ বাঁকাইলেন, রামনাথকে বলিলেন, আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই?—

রামনাথ মাথা দুলাইয়া বলিলেন,—"প্রত্যহই তো দেখি, আমি দেখি, মা দেখেন, আর—" পিছনে বিশ্বনাথ দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিয়া উঠিল,—"আমিও দেখেছি মহারাজ, ঐযে কিষ্টঠাকুর, উনি নৈবিদ্যি থেকে কলা তুলে খাচ্ছেন, আর ধিন্ তা-ধিন নাচ করছেন—"

মহারাজ পিছু ফিরিয়া তাকে ধমক্ দিলেন,…চুপ কর ফাজিল!

ঠিক সেই শুভক্ষণে সকলের কানে আসিল টিনিক্ টিন্-টিনিক্-টিন্। মাথার উপর থেকে শব্দটা আসিতেছিল। সকলে উৎকর্ণ হইয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিল। দেখিল, দক্ষিণ দিকের বেড়া বাহিয়া ঘুঙুর গলে নেংটি ইঁদুর নামিয়া আসিতেছে।

নেংটির অপরাধ ছিল না। লোকলজ্জা তার বরাবরই খুব বেশী। এতক্ষণ গোলেমালে ভক্তসমাগমের দরুণ প্রসাদ গ্রহণের জন্য নীচে নামিতে পারে নাই। এখন দেখে ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়, অর্থাৎ উদরের তাপ শান্তি হয় না। তাই সে অগত্যা লোক সমক্ষেই দেখা দিয়াছে।

স্বামী মহারাজ সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, ঐ যে কেষ্ট ঠাকুর নাচতে এলেন। রামনাথ চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সমাধিস্থবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন, দর্শকগণও নির্ব্বাক নিস্পন্দ।

মহারাজ ভীড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন, বাহিরের জিজ্ঞাসু ভক্তগণকে কহিলেন, ঠাকুর নাচছেন দেখগে।

এদিকে নেংটি ঠাকুর লক্ষ্মীঠাকুরাণীর কোলের উপর লাফাইয়া পড়িল, তারপরে পেঁচা ঠাকুরের মাথায়, তারপরে long jump দিয়া সন্দেশের রেকাবীর উপর পড়িল এবং নিমেষে এক টুকরা গ্রহণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের পদতলে আশ্রয় লইল। সেখানে নিশ্চিন্তমনে পিছনের তুপায়ে ভর দিয়া বসিয়া সামনের তুপায়ে প্রসাদ লইয়া ভক্তিভরে খাইতে লাগিল।

নিশ্চেষ্ট রামনাথের চোখের উপর দিয়া নেংটির কাণ্ড স্বপ্ন দৃশ্যবৎ ভাসিয়া গেল। তাঁর কাণে গেল দোরের কাছে ভক্ত কলরব, সেদিক পানে চাহিয়া অকস্মাৎ তাঁর কর্ম্ম-প্রেরণা জাগিল। নিমেষ মধ্যে কোণ থেকে দরজা আঁটিবার ঠেঙ্গাটা তুলিয়া নিলেন, এবং নেংটিকে উদ্দেশ করিয়া প্রাণপণে এক ঘা কষিলেন। শব্দ হইল,—ধপাস্ ধুপ্, ঝন্ ঝনাৎঝন্।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে? ঠেঙ্গার বাড়ি কেষ্ট ঠাকুর স্বয়ং হাত পাতিয়া গ্রহণ করিলেন, বিষম চোট খাইয়া তিনি উবুড় হইয়া সশব্দে পূজার বাসন কোশনের উপর পড়িয়া গেলেন। রাধা ঠাকুরাণী কৃষ্ণের দশম দশা দেখিয়া টলিতে টলিতে সামাল দিলেন। তাঁর ডান হাতখানা ভগ্নাবস্থায় নিরালম্ব ঝুলিতে লাগিল।

ঠেঙ্গাপাণি রামনাথ হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, নেংটি পলক মধ্যে লাফ দিয়া প্রথমে চড়িল পেঁচাটার মাথায়, তারপর লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর মুকুটের উপর, অতঃপর বেড়া বহিয়া গৌর নিতাই ঠাকুরের পটের উপর উঠিল। এ পর্য্যন্ত নিরাপদ যাত্রা, কিন্তু নিতাই গৌর নেংটিকে সহজে ছাড়িয়া দিলেন না, সেখানে সে পাশবদ্ধ হইয়া থামিয়া গেল।

ফ্রেমে আঁটা ছবিখানি সূতো দিয়া খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছিল, তাতে কেমন করিয়া নেংটির গলার ঘুঙুর আটকাইয়া গেল। নেংটি ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে লম্ফ ঝম্প করিতে লাগিল,—ঘুঙুর বাজিতে লাগিল, টিনিক্ টিন্ টিন্,—টিনিক্ টিন্

সুবোধ বিশ্বনাথ এতক্ষণ সামলাইয়া ছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া অকস্মাৎ অকারণে তার হা হা শব্দের রূপটা মনে পড়িয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে সেটা আবৃত্তি করিতে করিতে সে ভীড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

রামনাথের মাথায় খুন চাপিয়া গেল, তিনি লাফ দিয়া আগু হইয়া পুনরায় ঠেঙ্গা মারিলেন। ফ্রেমের কাঁচ-খণ্ড ঝন্ ঝন্ শব্দে চারিদিকে ছিটকাইয়া গেল, নিতাই গৌর মুখ থুবড়িয়া নীচে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু নেংটি কোথা?

রামনাথ পটখানা তুলিয়া ধরিলেন, ছিন্নসূত্রে ঘুঙুর তুটী গড়াইয়া পায়ের কাছে পড়িয়া গেল। নিষ্প্রবাবরণে মালিক অন্তর্হিত হইয়াছে।

নেংটি ততক্ষণে সিলিঙের উপর বসিয়া হাত তুটা চাটিয়া আচমন শেষ করিল। স্বগতোক্তি করিল, কিচি কিচি কিচ্,—অর্থাৎ, আহাম্মুকের কাণ্ড যত!

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য

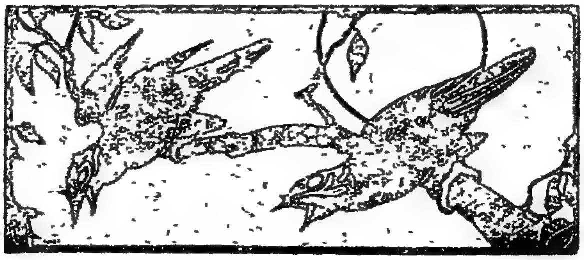

অন্ধকার

শ্রীশান্তি পাল

অন্ধকার—
অবশেষে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার—
মেলি' জটাভার
নিঃশব্দ চরণে,
তিমির বরণে
দুর্গম কুটিল পথে নির্জ্জন দেউলে ;
মহাতীর্থ লাগি যেথা একদিন গিয়াছিনু ভুলে।

দেখেছিনু বাতায়ন 'পরে
সন্ধ্যাদীপ করে
ছল ছল দুটি কালো আঁখি ;
ক'য়েছিনু ডাকি'
হে বন্ধু আমার, চেয়ে দেখ দূর দিগন্তের তলে,
আষাঢ়ের অপরাহ্ণ বেলা যায় চলে' ;
ম্লান সান্ধ্য-করচ্ছায়া খণ্ড মেঘ হতে
ঢলে পড়ে দুই মধ্যপথে।

উড়ে যায় বলাকার দল,—
মুখর চঞ্চল।

মুক্ত শির 'পরে
সায়াহ্নের মন্দ বায়ু ভরে
কাঁপে থরথরে—
নারিকেল পত্রগুচ্ছগুলি।

বক্ষ উঠে দুলি
চঞ্চলিয়া
উদ্বেলিয়া
ঝরে অশ্রু মন্দাকিনী দু'কপোল বাহি'।
মনে পড়ে সেই দিন উঠেছিলে কি সঙ্গীত গাহি'
কহি দম্ভভরে
স্পর্শ-ব্যগ্র সুকোমল দু'টি কর ধরে',—
ভয় নাই—ভয় নাই, হে পান্থ নবীন
কেন এ সংগ্রাম তব দীর্ঘ রাত্রি দিন !

মনে পড়ে
সেইদিন কৌতূহল ভরে
অকস্মাৎ দীপ নিভাইয়া
অয়ি মোর প্রিয়তম প্রিয়া,
ঢেকেছিলে অসম্বৃত অঞ্চলের প্রান্ত দিয়ে মোরে,
তারপরে
ঝিল্লীমন্দ্র রজনীর গাঢ় অন্ধকারে
প্রেমের ঝঙ্কারে
গলাইলে তনু-মন-প্রাণ
শুনাইলে নব নব গান।—

তারপরে
তন্দ্রালস ভরে
সেই অন্ধকারে
চকিত ঝঙ্কারে

লাবণ্যের দৃপ্ত জ্যোতি হতে
শ্যাম-শষ্প পথে
হেরিলাম শুভ্র বক্ষ তব
অভিনব
কটিদেশ, সুনন্দিত উরু
নিত্যদ্বন্দ্বরতা দু'টি অতনুর ভুরু
পাশবদ্ধ নয়ন-চকোর
বিহ্বল বিভোর।

মনে পড়ে তুলেছিলে শতলক্ষ সুর
সুতীব্র মধুর,
কপোত-কূজন-কণ্ঠ—আনন্দের ধ্বনি!
উঠি রনরনি
লেপি দিয়া সর্ব্ব অঙ্গ মোর
আঁখি প্রান্তে ঢেলে দিলে গাঢ় ঘুমঘোর,
হ'ল একাকার—
অন্ধকার
অন্ধকার!

বক্ষে গুরু ভার
স্বপনে শুনিনু দূরে মুহুমুহু ডাকি
উড়ে যায় নিশাচর পাখী,
তিমির গহ্বরে
অস্তাচল শিখরের 'পরে
জনশূন্য পাষাণের ঘরে;

প্রেতলোক যেথা করে বাস
যাহাদের উত্তপ্ত নিশ্বাস
জন্ম লভি বাষ্পরূপে
চুপে চুপে
উড়ে উড়ে
ঘুরে ঘুরে
তুলি মেঘভার
সমস্ত বিশ্বের বুকে ঢালে অন্ধকার;
পশি' প্রিয়াহীন ঘরে,
শিশুহারা মাতৃবক্ষ 'পরে,
যুগ যুগ ধরে'।

ভারানত, শুনি শতবার
সঙ্গীত তোমার,
ওই তব মৌন-অভিসার
অয়ি অন্ধকার!

শান্তি পাল

রথের দিনে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

রথযাত্রার দিন, ভোর হইতেই টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল। বাহিরের ছোট ডাক্তারখানা ঘরটীতে বসিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া ছিলাম। ভাবিতেছিলাম, লোকজনের চলাচল বন্ধ নাই, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমার কাছে ত কেহ আসিল না। দরকার মত কুইনাইন, ক্যাষ্টরওয়েল বা সোডা দিয়া, রোজ সকালেই অন্ততঃপক্ষে দশ বার গণ্ডা পয়সা রোজগার করিয়া থাকি, আজ একবারে শুধু হাতেই উঠিতে হইবে দেখিতেছি। ছোট টাইম পিস্ ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, প্রায় এগারটা বাজে। ভাঙ্গা চেয়ারটি ছাড়িয়া উঠিব মনে করিতেছিলাম, দূরে একখানি পাল্কি আসিতে দেখিয়া আবার বসিয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে বেয়ারারা আমার দরজার সম্মুখেই পাল্কি নামাইল। মুখুজ্যে মশায়ের বাড়ি হইতে আমার ডাক আসিয়াছে, এখনই যাইতে হইবে। কয়েক গণ্ডা পয়সার আশা করিতেছিলাম, একবারে দুইটী টাকার ব্যবস্থা হইয়া গেল। ভিতরে গিয়া গৃহিণীকে শুভ-সংবাদটা জানাইয়াই, তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম। বেয়ারারা পাল্কি কাঁধে করিল, আমিও জগন্নাথদেবের উদ্দেশে একটী প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলাম।

চার পাঁচ খানা গ্রামের মধ্যে বর্ত্তমানে নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে মুখুজ্যে মশায়ই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। কাপড়ের কারবারে তিনি অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। জমিদার বাবুদেরও মধ্যে মধ্যে অর্থের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হয়। গ্রামের কাহারও কাছে আমি এক টাকার অধিক দর্শনী পাই না, অনেকস্থলে আবার গোপনে আট আনাও লইতে হয়। কিন্তু মুখুজ্যে মশায় বরাবরই আমায় দুইটী করিয়া টাকা দিয়া থাকেন। অতি সামান্য বিদ্যা লইয়াই পল্লীগ্রামে চিকিৎসা ব্যবসায় করি। আমার যে দুই টাকা দর্শনী দাবী করিবার যোগ্যতা নাই, তাহা আমি বিশেষরূপেই জানি। মুখুজ্যে মশায় যে আমায় কৃপার চক্ষে দেখেন সেজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পাল্কি হইতে নামিয়া, আমাকে একবারে মুখুজ্যে মশায়ের শয়নঘরেই হাজির হইতে হইল। দেখিলাম, তিনি তাঁহার পুরাতন অম্বলের ব্যথায় শয্যার উপর ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। সঙ্গে করিয়া সামান্য যে ঔষধ আনিয়াছিলাম, তাহারই মধ্য হইতে বিবেচনা মত কয়েকটী মিশাইয়া তাঁহাকে খাইতে দিলাম। অল্পক্ষণ পরে তাঁহার যন্ত্রণার উপশম হইল। তিনি নিজেকে অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন। বলিলেন—"ডাক্তার, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।" ঘরে অন্য যাহারা ছিল, তিনি তাহাদের বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি একবারে তাঁহার শয্যার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। তিনি হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া করুণ কণ্ঠে বলিলেন—"ডাক্তার, আমি এখনই বাবুগঞ্জের রথের মেলায় যেতে চাই। তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। তুমি যা চাও, আমি তাই দেবো।"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। মুখুজ্যে মশায়ের মত প্রবীন বিবেচক লোকের এ কি খেয়াল। ঔষধের যাহা ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহা ত সাময়িক। খানিক পরে আবার যন্ত্রণা আরম্ভের সম্ভাবনা রহিয়াছে।—বলিলাম "এ যে অসম্ভব কথা। আপনাকে আজ বিছানা ছেড়ে উঠতে দেওয়াই অনুচিত।" মুখুজ্যে মশায় আমার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন—"কেন রকমে হয় না ডাক্তার, রথের দিন যে আমার ওখানে হাজির না হলেই নয়।"

মুখুজ্যে মশায় প্রতি বৎসরই রথের মেলায় বড় কাপড়ের দোকান খুলিয়া বসেন, এ আমার জানা ছিল। কিন্তু তাঁহার ত লোক জনের কোন অভাব নাই, বিশেষতঃ বড় ছেলেও বেশ কাজের লোক হইয়াছে। সেখানে যে মুখুজ্যে মশায়কে

যাইতেই হইবে, ইহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, তিনি আবার বলিলেন—"ডাক্তার, তুমি যদি সব কথা শোনো, তাহলে তুমিই আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইবে! গত বত্রিশ বছর ধরে রথের দিনটা যে আমি সেখানেই কাটিয়ে আসছি।"

অজানা বিষয় জানিবার আগ্রহ কাহার না হয়! আমিও শুনিবার জন্য বিশেষ উদগ্রীব হইলাম। মুখুজ্যে মশায় ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

* * * * *

আমার যখন একুশ বছর বয়স, তখন প্রথম রথের মেলায় কাপড়ের দোকান করি। সঙ্গে তাঁতীদের একটি ছেলেকে লইয়াছিলাম। গোড়ার কয়দিন অল্প-স্বল্প বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু রথের দিন সকাল হইতেই বেশ খরিদ্দার জমিতে লাগিল। সমস্ত দিনের মধ্যে আমাদের আর অবসর রহিল না। রন্ধনের কোন সুযোগ পাইলাম না, বৈকালের দিকে কিছু জলযোগ মাত্র করিয়া লইলাম। সকালে দোকানে পুরুষেরই ভিড় ছিল, বৈকাল হইতে দলে দলে মেয়েরা আসিতে লাগিল। রঙ্গিন শাড়ী অনেকগুলি লইয়া গিয়াছিলাম, একটু চড়া দামেই সেগুলি ছাড়িতে লাগিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কেরোসিনের জোর আলো টাঙ্গাইয়া দিলাম। মেয়েদের ভিড় আরও বাড়িয়া গেল, দুইজনে সকলদিক সামলান দায় হইয়া পড়িল। রাত্রি আটটার পর একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, ভিড় তখন কমিয়া আসিতেছে। প্রায় নয়টা আন্দাজ মেয়েদের একটা বড় দল দোকানে আসিল। এতক্ষণ কাহারও দিকে ভাল করিয়া চাহিবার অবকাশ পাই নাই, এইবার দেখিলাম সকলের পিছনে একটি বার তের বছরের অপূর্ব্ব সুন্দরী কুমারী দাঁড়াইয়া আছে। কাপড় দেখাইবার মাঝে তিন চার বার তাহার সঙ্গে চখোচোখি হইয়া গেল। কতক্ষণ পরে দলের সকলে চলিয়া গেল, কিন্তু বালিকাটী তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। তাহার দিকে আরও ভাল করিয়া চাহিতেই মেয়েটী একটু আগাইয়া আসিয়া কাঁদকাঁদ স্বরে যাহা বলিল, তাহা হইতে বুঝিলাম যে, সে মেলায় হারাইয়া গিয়াছে। তাহার বাবা ও ছোট ভাই সঙ্গে ছিল, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তাঁহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন আমাকেই তাহার বাড়িতে পৌছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে, সে ব্রাহ্মণ কন্যা, তাহাদের বাড়ি হরিপুর, এখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে। তখনই পৌছাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলাম। তাঁতীর ছেলেকে পাঠাইলাম একখানি গরুর গাড়ির সন্ধান করিতে।

বালিকা যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। তাহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে বলিল—"চাঁপা, চম্পকবরণী।" চম্পকবরণীই বটে, যিনি নাম রাখিয়াছেন, তাঁহার নাম রাখা সার্থক হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে পিতার নাম ও অন্যান্য বিষয় জানিয়া লইলাম। সকালে অল্প অল্প ও দুপুরে একবার মাত্র জোর বৃষ্টি হইয়া এতক্ষণ আকাশ পরিষ্কারই ছিল। আবার একটু বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। মেলা যেন আরও খালি হইয়া আসিল। হঠাৎ বৃষ্টির জোর বাড়িয়া গেল, দোকানের ছড়ান মালপত্র লইয়া একা ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সামনের ঝাঁপটা টানিয়া দিতে দিতেই তাঁতির ছেলে একবারে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। শুনিলাম একজন গাড়োয়ান যাইতে রাজি হইয়াছে, বৃষ্টি কমিলেই রওনা হইবে। আমি কিছু বলিবার আগেই চাঁপা বেশ সহজভাবেই বলিল—"আচ্ছা, বৃষ্টি একটু কমুক।"

বৃষ্টি কিন্তু ক্রমশঃই আরও বাড়িতে লাগিল। উপরে টিনের চাল ছিল বলিয়া অনেকটা রক্ষা হইলেও, পাশের হোগলার বেড়া দিয়া একদিকে জলের ছাট আসিতে লাগিল। সে দিকে দুই তিন খানা কোরা থান টাঙ্গাইয়া দিলাম।

বোধহয় রাত তখন সাড়ে দশটা হইয়া গিয়াছে। চাঁপা করাসের একধারে বসিয়া ঢুলিতেছিল, তাহাকে ততক্ষণ একটু সরিয়া শুইয়া পড়িতে বলিলাম। কয়েকটা কাপড়ের মোট সরাইয়া একটু জায়গা করিয়া দিতেই, সে একবার মাত্র আমার মুখের দিকে চাহিয়া আর কোন কথা না বলিয়াই নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে শুইয়া পড়িল। আমরা দুইজনে বসিয়া রহিলাম।

ক্লান্ত বালিকা অঘোরে ঘুমাইতেছে, সুন্দর মুখখানিতে কোন ভয় ভাবনার চিহ্নমাত্র নাই। তীব্র আলোকে একদৃষ্টে

তাহাই দেখিতেছিলাম। মনে কত রঙ্গিন কল্পনা উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল যে, চিরজীবন কি এই সুন্দর মুখখানি দেখিবার আশা করিতে পারি না। তাঁতীর ছেলে আমার পাশে বসিয়া ঢুলিতেছিল, তাহাকে একধারে শুইয়া পড়িতে বলিলাম। অল্পক্ষণ পরেই তাহার নাক ডাকিতে লাগিল। বাহিরে বৃষ্টির বিরাম নাই। আমিও মনে মনে প্রার্থনা করিতেছিলাম, বৃষ্টি যেন এইভাবে সমস্ত রাত ধরিয়াই চলে। ভগবান সেদিন আমার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন, বৃষ্টি আর থামে নাই। আমার ঘুম যে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল বলিতে পারি না, সমস্ত রাত চাঁপার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াই কাটাইয়া দিয়াছি।

ভোরের দিকে চাঁপার ঘুম আপনিই ভাঙ্গিয়া গেল। ভিতরে আলো তখনও সমান ভাবেই জ্বলিতেছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া সে একবার চারিদিক চাহিয়া সমস্ত ঘটনাটা যেন স্মরণ করিয়া লইল। তারপর ধীরকণ্ঠে বলিল—"কত রাত্তির, এখনও কি বৃষ্টি কমেনি?" বলিলাম—"রাত্তির শেষ হয়ে গেছে, বৃষ্টিও কমেছে। এইবার আমরা রওনা হবো।" খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—"বাবা মা সমস্ত রাত্তির আমার জন্যে জেগে কাটিয়েছেন, আপনিও ঘুমতে পেলেন না!" একথায় আমার আর কোন উত্তর যোগাইল না।

তাঁতীর ছেলেকে জাগাইয়া তুলিলাম। সে অল্পক্ষণের মধ্যে গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া আসিল। তাহাকে দোকানে রাখিয়া আমরা দুইজনে হরিপুরের দিকে রওনা হইলাম। তখন ভোরের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গাড়ীর ছইয়ের নীচে দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া যাইতেছি। বাড়ী ফিরার আনন্দে চাঁপার সমস্ত সঙ্কোচ যেন কাটিয়া গিয়াছে, অতি পরিচিতার মত অনর্গল কত কি বলিয়া যাইতেছে। দুই পার্শ্বের গ্রাম, পুকুর, বাগান, ক্ষেত সবই তাহার চেনা, এপথে সে বহুবার যাওয়া আসা করিয়াছে। বাড়ীতে পৌঁছিলে বাবা মায়ের যে কত আনন্দ হইবে, তাঁহারা যে আমাকে কত আদর যত্ন করিবেন এবং এবেলা না খাইয়া কিছুতেই ফিরিতে দিবেন না—নানাকথাই শুনিয়া যাইতেছি। মনে হইতেছিল, গরুর গাড়ীটা যেন বড় তাড়াতাড়ি চলিতেছে, এখনই হয়ত রাস্তাটা ফুরাইয়া যাইবে। যদি রাস্তাটা আরও বেশী হইত, ভাল হইত। চাঁপা দুই পার্শ্বের কত কি দেখাইতেছে, আমি কেবল তাহার সুন্দর মুখের দিকেই চাহিয়া আছি। সে বলিয়া চলিতেছে, তাহার ছোট ভাই গোপালের বয়স মোটে দশ বৎসর, তাহার অপেক্ষা ঠিক তিন বৎসরের ছোট। লেখাপড়ায় সে ইতিমধ্যেই নাম করিয়াছে। দিদিকে খুব ভালবাসে, বোধহয় সমস্ত রাত সেও কাঁদিয়াছে। হঠাৎ আবেগভরে দুই হাতে চাঁপার একখানি হাত চাপিয়া ধরিলাম, চাঁপা আমার মুখের দিকে চাহিয়া শিশুর মত হাসিয়া উঠিল। গাড়োয়ানটা পিছন ফিরিয়া দেখিতেই তাড়াতাড়ি হাত খানি ছাড়িয়া দিলাম। আমার মনের ভাব কিছু বুঝিল কি না জানিনা, কিন্তু আমি নিজেকে খুব সামলাইয়া লইলাম। সুন্দর গালে যে একটি চুম্বন আঁকিবার তীব্র ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহা অপূর্ণ রহিয়াই গেল। রাস্তায় লোক চলাচল তখনও আরম্ভ হয় নাই। দূরে একজন লোককে আসিতে দেখিয়া চাঁপা বলিয়া উঠিল—"ঐ আমার বাবা আসছেন।" একবারে গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছিলাম, একটু সরিয়া বসিলাম। লোকটা গাড়ির কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিতেই চাঁপা চেঁচাইয়া বলিল—"বাবা, এই যে আমি।" মধ্যবয়সী গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ, রাত্রি জাগরণের চিহ্ন চোখে মুখে সুস্পষ্ট, থমকিয়া দাঁড়াইয়া গাড়ীর মধ্যে আমার দিকে চাহিলেন, যেন বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে। আমরা দুই জনেই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। ব্রাহ্মণ আগাইয়া আসিয়া দুই হাতে কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন, চোখের জল তাঁহার মানা মানিল না। চাঁপাও কাঁদিয়া ফেলিল। প্রভাতের উজ্জ্বল আলোকে পিতা-পুত্রীর এই অপূর্ব্ব মিলন দৃশ্য, অতি মধুর বলিয়া বোধ হইল। ভাবের ঘোর কাটিলে তিনি চোখ মুছিয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলাম।

সেই পথের ধারেই একটি বড় গাছের তলায় বসিয়া তিনি আমাদের নিকট হইতে সকল কথাই শুনিলেন। আমার পরিচয় শুনিয়া অতি আপনার জনের মত আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। স্বর্গীয় পিতৃদেবের অজস্র প্রশংসা করিয়া বলিলেন, আমি মহৎচরিত্র পিতার উপযুক্ত পুত্রের মতই কাজ করিয়াছি। আমার অনুগ্রহেই ব্রাহ্মণ কন্যার মান-সম্ভ্রম রক্ষা

পাইয়াছে, তিনি নিজেও মহাবিপদ হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন। পিতার আনন্দ ও প্রশংসাবাণীতে চাঁপারও মুখ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সে একবার তাহার পিতার দিকে ও একবার আমার দিকে চাহিতেছিল।

ভাবিলাম, আমার কর্ত্তব্য ত আমি শেষ করিয়াছি, কন্যাহারা পিতার হাতে কন্যাকে সমর্পণ করিয়াছি, এইবার বিদায় গ্রহণই মঙ্গল। ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় চাহিলাম। তিনি কিছু বলিবার আগেই চাঁপা বলিয়া উঠিল—"সে হবে না, আপনাকে আমাদের সঙ্গে বাড়ি পর্য্যন্ত যেতে হবে। মার সঙ্গে দেখা করতে হবে, গোপালকে দেখবেন না ?" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা, সেই ভালো, যখন এতটা পথ এসেছ, তখন বাড়ি পর্য্যন্তই একবার চল। তারপর না হয় এই গাড়ি করে ফিরলেই হবে।" তাঁহার মুখের কথা শেষ না হইতেই, চাঁপা আগাইয়া আসিয়া দুই হাতে আমার একখানি হাত ধরিল। অতি সঙ্কোচের সঙ্গে গাড়ির মধ্যে একবার মাত্র চাঁপার হাত ধরিয়া তখনই ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার পরশে যেন সমস্ত শরীরে একটা আনন্দ বহিয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—"অনুমতি করুন, এখন ফিরেই যাই। ক্রোশ খানেক মাত্র রাস্তা সহজেই ফিরে যেতে পারবো। একলা ছেলেমানুষকে দোকানে রেখে এসেছি, অনেক টাকার মালপত্র, সেই জন্যেই বলছি। মেলার শেষে একদিন আপনাদের বাড়ি হয়ে তবে ঘরে ফিরবো, কথা দিলুম।" কি ভাবিয়া ব্রাহ্মণ অনুরোধ করিলেন না। বলিলেন—"আচ্ছা বাবা, তাই ভালো। তোমার যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকেও দেখতে হবে। কিন্তু মেলা ভাঙলে ঠিক আসা চাই।" চাঁপা হাত ছাড়িয়া দিয়াছিল। অভিমান হইল কি না বুঝিতে পারিলাম না, তবে তাহার মুখে যেন আর হাসি নাই বলিয়া মনে হইল। তাঁহারা গাড়িতে উঠিবার আগে ব্রাহ্মণকে আবার প্রণাম করিলাম, তিনি মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। চাঁপাও দেখাদেখি আমার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল, আর একবার তাহার স্পর্শলাভ করিলাম। তাঁহারা গাড়িতে উঠিলে গাড়ি ছাড়িয়া দিল; আমিও বিপরীত দিকে জোরে অগ্রসর হইলাম। চলিতে চলিতে একবার পিছন ফিরিয়াছিলাম, দেখিলাম চাঁপা এইদিকেই চাহিয়া আছে।

দোকানে পৌঁছিয়া আবার কাজে লাগিয়া গেলাম। মালপত্র সাজাইয়া বসিতেই দুই একজন করিয়া খরিদ্দার আসিতে লাগিল। গত কাল রাঁধিয়া খাইতে আর অবসর হয় নাই, আজ যথাসময়েই তাহা সমাধা করিলাম। একদিন অতিরিক্ত বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় রকম কম পড়িয়া গিয়াছিল, সেজন্য সকলকে পছন্দ মত কাপড় যোগাইতে পারিতেছিলাম না। চাঁপার কথা সকল সময়েই মনে পড়িতেছিল, তবুও স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহাদের বাড়িতে আর যাইব না। সন্ধ্যার পর তাঁতীর ছেলে বলিল—"দাদাঠাকুর, আর কিছু মাল না হলে ত চলতে পারে না। আপনি একদিন একলা দোকান করুন, আমি সকালেই গিয়ে গাঁ থেকে খুঁজে পেতে কিছু ধুতি শাড়ী যোগাড় করে আনি। পরশু সকালে নটা নাগাদ ঠিক আবার হাজির হবো।" বলিয়া ফেলিলাম—"অত হাঙ্গামায় আর কি দরকার। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, চল্ দোকান তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। যা বিক্রি করেছি, তাতেই যথেষ্ট হয়েছে।" তাহারও বোধ হয় বাড়ি ফিরিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে সানন্দেই আমার কথায় সায় দিল। দুইজনে স্থির করিলাম, দোকান তুলিয়া দিয়া বাকি মালপত্র লইয়া কাল দুপুরে আহারাদির পরই আমরা বাড়ি রওনা হইব। গত রাত্রে জাগিয়াই কাটাইয়াছি, সেজন্য বিশেষ ঘুম পাইতেছিল। নয়টার পরই শুইয়া পড়িলাম।

খুব ঘুমাইয়াছিলাম। কিন্তু সমস্ত রাত্রি চাঁপার সেই সুন্দর মুখখানিই স্বপ্ন দেখিয়াছি। ভোরে ঘুম ভাঙিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম, তাঁতীর ছেলেকেও তুলিলাম। তখন হইতেই দুইজনে মিলিয়া মালপত্র গুছাইতে সুরু করিয়া দিলাম। দশটার মধ্যেই ঠিক হইয়া গেল। রন্ধন ও আহারাদি সারিয়া, দুপুরের পরই আমরা বাড়ির দিকে রওনা হইলাম।

বাড়ি পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। সমস্ত রাস্তাটা আমরা হাঁটিয়াই আসিয়াছিলাম। মাল বোঝাই গরুর গাড়ির সঙ্গে ধীরে ধীরে চলিতে না হইলে, আরও আগেই পৌঁছাইতে পারিতাম। নির্দ্দিষ্ট দিনের আগে বাড়ি ফিরিতে মায়ের খুবই আনন্দ হইল। সঙ্গের টাকাকড়ি সমস্ত মায়ের হাতে দিয়া যখন তাঁহাকে জানাইলাম যে, এই অল্প কয়দিনের

মধ্যেই উপায়ও যথেষ্ট হইয়াছে, তখন তিনি বারবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, জলযোগাদি সারিয়া নিজের ঘরে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। কেবল চাঁপার কথাই মনে উদয় হইতেছিল। ভাবিতেছিলাম, একবার তাহাদের বাড়ি ঘুরিয়া আসাই উচিত ছিল। কথা দিয়া কথা না রাখা, আমার পক্ষে বিশেষ অন্যায় হইয়াছে। হঠাৎ বাহির হইতে যেন কাহার ডাক শুনিলাম, চিন্তার স্রোতে বাধা পড়িল। তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে অবাক হইয়া গেলাম—সম্মুখে চাঁপার বাবা দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই, তিনি আমার দুইটী হাত ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"বাবা, আমি বড় বিপদে পড়েই এতদূর এসেছি, এ বিপদে একমাত্র তুমিই আমার রক্ষাকর্ত্তা।" মনে যেন একটা আঘাত লাগিল,—চাঁপার কিছু ঘটে নাই ত ?

তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে আনিয়া বসাইলাম। একটু বিশ্রাম করিয়া তাহার পর সরলভাবে সকল কথাই বলিয়া গেলেন। শুনিলাম, চাঁপাকে ফিরিয়া পাইয়া তাঁহারা যখন গৃহে আনন্দ করিতেছিলেন, সেই সময় গ্রামের প্রবীণেরা সমাজপতির গৃহে মিলিত হইয়া, বিবাহযোগ্যা সুন্দরী কুমারী এক রাত্রে যে অপরের সঙ্গে কাটাইয়া আসিল, তাহার কি ব্যবস্থা করা যায় সেই চিন্তাতেই রত ছিলেন। সন্ধ্যার পর আবার যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার ডাক পড়িয়াছিল। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, অকপটে সব বিষয়ই তিনি সেখানে জানাইয়াছেন। আমার নাম ও পিতৃপরিচয়ও সকলকে বলিয়াছেন। অনেক বিচার বিবেচনার পর সমাজপতি মহাশয় বিশেষ কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন যে, যদি আগামী লগ্নের মধ্যে আমার সঙ্গে চাঁপার বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে এ বিষয় লইয়া সমাজে আর কোন আন্দোলন হইবে না এবং ব্রাহ্মণ পরিবারেরও মান সম্ভ্রম রক্ষা পাইবে।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ব্রাহ্মণদম্পতি এই বিষয় লইয়া চিন্তা করিয়াছেন এবং আমি রাজি না হইলে তাঁহারা যে কি উপায় অবলম্বন করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। আমাকে ধরিবার জন্য ব্রাহ্মণ যে সময় মেলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তাহার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই আমরা বাড়ির দিকে রওনা হইয়া পড়িয়াছি। অগত্যা তাঁহাকে ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া কষ্ট করিয়া আমাদের বাড়িতেই আসিয়া হাজির হইতে হইয়াছে। মেলা হইতেই তিনি নিজের গ্রামের একজন লোককে দিয়া বাড়িতে খবর পাঠাইয়া দিয়াছেন যে, আজ তিনি আর ফিরিতে পারিবেন না।

আমার উপর যে ভগবানের এত কৃপা হইবে, আমার মনের কল্পনা যে এত শীঘ্র সফল হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি নিজে ব্রাহ্মণকে আর কি উত্তর দিব। ভিতরে যাইয়া মাকে সকল কথা জানাইলাম। আমার মা যেমন স্নেহশীলা, তেমনই বুদ্ধিমতী ছিলেন। সব শুনিয়া, আমার মনের ভাব বুঝিতে তাঁহার আর বাকি রহিল না। তিনি তখনই বিপন্ন ব্রাহ্মণকে এ বিবাহে তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মতির কথা জানাইয়া দিতে বলিলেন।

ব্রাহ্মণ আশাপথ চাহিয়াছিলেন। বাহিরে গিয়া তাঁহাকে মায়ের সম্মতি জানাইতেই, তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া আমাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। চোখে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে রাত্রে ব্রাহ্মণের সেবার কোনরূপ ত্রুটী হইল না। চণ্ডীমণ্ডপ ঘরেই তাঁহার শয়নের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই তিনি আনন্দিত মনে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পাঁচ দিন পরেই শুভলগ্নে আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। মনের মত সুন্দরী পুত্রবধূ পাইয়া মায়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না। ফুলশয্যার রাত্রে চাঁপাকে বলিলাম—"মেলাতে হারিয়ে গিয়ে যদি অন্য দোকানে আশ্রয় নিতে তাহলে ত আর তোমায় পেতুম না।" চাঁপা ধীরে ধীরে বলিল—"যেখানে সেখানে ত যেতুম না। তোমায় দেখে আমার কেমন বিশ্বাস হয়েছিল। ফতুয়ার গলা থেকে একটু পৈতে বেরিয়েছিল, তাই দেখে বুঝেছিলুম যে তুমি বামনের ছেলে। সে দিন হারিয়ে গিয়ে সত্যিই কি ভয় যে আমার হয়েছিল।" বলিলাম—"ভয় কৈ। বেশত অচেনা লোকের কাছে সমস্ত রাত্তির নির্ভাবনায় ঘুমলে।" চাঁপা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর করিল—"তখন করেনি, আজ—"। আর বলিতে দিলাম না।

"আজ ভয় হচ্ছে" বলিয়াই হাসিয়া তাহাকে বক্ষের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলাম।

আনন্দের মধ্য দিয়াই একটা বৎসর চলিয়া গেল। আবার রথের সময় আসিল। মেলায় দোকান করিতে যাইব বলিয়, চাঁপার নিকট হইতে কয়েক দিনের বিদায় চাহিলাম। সে অতি ছেলেমানুষের মত ধরিয়া বসিল, আমার সঙ্গে মেলায় যাইয়া থাকিবে। গৃহস্থের বৌ মেলায় যাইয়া বাস করিবে, সে কখনও হইতে পারে না। মা শুনিলেই বা বলিবেন কি? কত বুঝাইলাম, কিন্তু কোন ফলই হইল না। শেষে আমাকে রাজি হইতেই হইল। কথাটা কিন্তু গোপন রাখিলাম।

আগে হইতে লোক পাঠাইয়া মেলায় দোকানঘরের পিছনে আর একখানা ঘরও বাঁধাইয়া লইলাম। যেদিন মালপত্র লইয়া দোকান করিতে রওনা হইলাম, সে দিন চাঁপাও সঙ্গে চলিল। মায়ের মত করাইয়া লইয়াছিলাম যে, রথের এই কয় দিন বাপের বাড়ি রাখিয়া, ফিরিবার সময় তাহাকে আবার সঙ্গে করিয়া আনিব। মেলায় পৌঁছিয়াই আমি দোকান সাজাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম, চাঁপাও নিজের বাসের ঘর সাজাইতে লাগিয়া গেল। তাহার যে কি আনন্দ দেখিলাম, বলিতে পারিনা।

পরদিন হইতেই মেলা আরম্ভ হইল। আমার দোকানের কাজ আর চাঁপার ক্ষুদ্র সংসারের কাজ রীতিমত চলিতে লাগিল। স্থানের অভাবে নানা অসুবিধা হইলেও তাহার কোনও অভিযোগই ছিল না। রথের আগের দিন রাত্রে চাঁপা বলিল—"গত বছর রথের রাত্তিরে তোমার প্রথম দেখা পেয়েছি, তোমার কাছেই রাত কাটিয়েছি। ফি বছরই রথের রাত্তিরে কিন্তু তোমার কাছেই থাকবো, কোন বারণ শুনবো না।" আমি আদর করিয়া বলিলাম—"আচ্ছাগো, তাই হবে, রথের দিন তোমায় ছেড়ে থাকবো না।"

ভোর রাত্রি হইতেই চাঁপার ভেদবমি আরম্ভ হইল। বিশেষ ভীত হইয়া পড়িলাম। মেলার মাঝেই ডাক্তারের তাঁবু পড়িয়াছিল, তাঁহাকে খবর দিতেই তিনি আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। চাঁপা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাকে কালরোগে ধরিয়াছে। এক সময় সে আমায় বলিল—"রথের দিনই তোমার কাছে এসেছিলুম, আবার রথের দিনেই বিদায় নিয়ে যাচ্ছি। আবার কিন্তু আসবো!" এ কথার আর কোন উত্তর দিতে পারি নাই। সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া চাঁপা সত্যই চলিয়া গেল। জগন্নাথদেব যে কি দোষে আমায় এ সাজা দিলেন, বুঝিতে পারিলাম না।

তাহার দুই বৎসর পরেই আবার বিবাহ করিয়াছি। সেও প্রায় ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল। স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া আনন্দেই সংসার করিতেছি, তাহাদের সকলকে যথেষ্ট ভালবাসি। অর্থ সঞ্চয়ও করিয়াছি, কোন কষ্ট নাই। ব্যবসায়ে আমাকে আর তত খাটিতে হয় না। জ্যেষ্ঠ পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে, কর্ম্মচারীরও অভাব নাই। সারা বৎসর বেশ থাকি, কিন্তু রথের সময় আসিলেই আমি যেন কেমন হইয়া যাই। সেই বত্রিশ বছর আগের চাঁপার কথা মনে পড়িয়া যায়, আমি আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারি না। প্রতি বছর রথের রাত্রি আমাকে মেলাতেই কাটাইতে হয়। নইলে পিছন দিকের ঘরখানি যে শূন্য পড়িয়া থাকিবে! প্রত্যেক বৎসরই সে ঘর তৈরী করা হয়। চাঁপা যে যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে—"আবার কিন্তু আসবো!" আসিয়া যদি ফিরিয়া যায়?

* * * * * *

দুই ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছিল। মুখুজ্যে মশায়ের আবার যেন যন্ত্রণা আরম্ভ হইল, তিনি মুখ বিকৃত করিতে লাগিলেন। আমিও তাড়াতাড়ি ঔষধ মিশাইতে বসিলাম।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

বঙ্গদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম-এ

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি আমাদের প্রধান অবলম্বন। আমাদের দেশে শতকরা ৮০ জন লোকের উপর কৃষিজীবি। ১৯২০-৩০ সাল পর্য্যন্ত কৃষিজাত ফসল হইতে প্রতি বৎসর বাংলার আয় হইত অন্যূন ৪৪ কোটি টাকা এবং এই অর্থের সাহায্যেই প্রয়োজনীয় শিল্প দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে ক্রয় করা হইত। কিন্তু গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে সমগ্র সভ্যজগৎ ব্যাপী যে দুর্নিবার অর্থনীতিক দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষেও পুরামাত্রায় সংক্রামিত হইয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, এমন কি ধনিক-প্রধান দেশ আমেরিকাতেও, এই আর্থিক দুর্ঘটনার প্রভাব ভয়াবহ আকারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। গ্রেটব্রিটেনে অনেক বড় বড় কল কারখানা চিরতরে অথবা সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায়। ফলে হাজার হাজার লোক বেকার অবস্থায় উপযুক্ত খাদ্য ও বস্ত্রাদির অভাবে বিশেষ কষ্ট পাইয়া থাকে। আমেরিকাতেও অনুরূপ আর্থিক দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান বলিয়া এই জগদ্ব্যাপী Economic depressionএর প্রথম ধাক্কাটা কোন ক্রমে সামলাইয়া লইয়াছিল। বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যের statistics হইতে জানা যায় যে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত পাটের বাজার ভালই চলিয়াছিল এবং কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়ের দ্বারা বাঙ্গালার কৃষক সম্প্রদায়ের আয় হইত অন্যূন ৪৪ কোটী টাকা। কিন্তু ১৯৩১ সাল হইতে economic depressionএর প্রভাব প্রবলভাবে অনুভূত হইতে থাকে। ফলে ১৯৩২-৩৩ সালে কৃষিজ পণ্য হইতে বাংলার আয় কমিতে কমিতে একেবারে ১৫ কোটীতে আসিয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে বাংলা দেশে আর্থিক অনটন দেখা দেয়। যদিও সমাজে প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই এই আর্থিক দুর্ঘটনার প্রভাব কম বেশী অনুভব করিয়াছিল তথাপি বাংলার দরিদ্র কৃষক-সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশাই একান্ত শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছিল। বাংলা সরকার দেশের এই আর্থিক দুরবস্থার প্রতি অমনোযোগী থাকেন নাই।

"পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ"

বাংলার দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়কে অকাল মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সরকারী ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী নবাব স্যার মহিউদ্দিন ফারোকী নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে প্রধান তাঁহার প্রবর্ত্তিত পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ প্রথা। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতি অর্থনীতি-বিশারদগণের মতে দেশে ও বিদেশে পাটের চাহিদা ক্রমশঃ হ্রাস এবং উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি এই দুই কারণে পাটের বাজার দর নামিয়া যাইতেছে। উপরন্তু অধ্যাপক সরকার বলিয়াছেন যে ১৯৩০-৩১ সাল হইতে ভারতীয় পাটকল-গুলিতে প্রায় এক বৎসরের প্রয়োজন পরিমাণ পাট মজুত রাখা হইতেছে। এই অতিরিক্ত পরিমাণ মজুত পাট থাকার দরুণ কলওয়ালারা ইচ্ছানুরূপভাবে পাট ক্রয় করিতে সমর্থ থাকিয়া পাটের বাজার দর মন্দা করিয়া দিতেছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে বর্ত্তমান অবস্থায় পাটের বাজার দর বৃদ্ধি করিয়া দরিদ্র কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণই একমাত্র উপায়। ১৯৩৫ সালে বাংলা সরকার অর্থনীতিজ্ঞদিগের পরামর্শ অনুসারে কেবলমাত্র প্রচার কার্য্যের দ্বারা পাটের চাষ শতকরা ৩ ভাগ কমাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। অবশ্য এক বৎসরকাল মাত্র সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা অবলম্বন করায় পাট ব্যবসায়ে আশানুরূপ উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। তথাপি ইহা নিশ্চিন্ত বলা যাইতে পারে যে উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত সরকারী পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ প্রথা বহাল থাকিলে পাট ব্যবসায়ের যথোপযুক্ত উন্নতি-

সাধন অবশ্যম্ভাবী। দেশহিতকর এই চাষ-নিয়ন্ত্রণ প্রথা অবলম্বনের জন্য বাংলার দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় কৃষিমন্ত্রীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

কৃষি পদ্ধতির সংস্কার

সম্প্রতি স্যর মহিউদ্দিন ফারোকী ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে কৃষি বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত উপায়ে দেশের কৃষক মণ্ডলীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন :—

(১) কৃষি পদ্ধতির সংস্কার।

(২) উৎকৃষ্ট বীজ যন্ত্রপাতি ও সার ব্যবহারে ফসলের ফলন বৃদ্ধি।

(৩) গবাদি পশুর উন্নতি সাধন।

বর্ত্তমানে কৃষি বিভাগে যথেষ্ট গবেষণা কার্য্য চলিতেছে Imperial Council of Agricultural Research যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়াছেন তাহার ফলে গবেষণা কার্য্যে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। গবেষণা কার্য্যের গণ্ডীও অনেকখানি বিস্তৃত করা হইয়াছে। এইরূপ গবেষণা কার্য্যের দ্বারা বাংলার প্রাচীন কৃষি পদ্ধতির যথেষ্ট সংস্কার সাধন হইতে পারে।

প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য বাংলা সরকার দেশের নানা স্থানে কতকগুলি কৃষিকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল কৃষিকেন্দ্র হইতে উন্নত ধানের বীজ বিতরণ করা হয় এবং কি ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফসলের ফলন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। ১৯২৮-২৯ সালে ২০০টী ধানের কেন্দ্র ছিল। বর্ত্তমানে সমগ্র বাংলায় ৩৩৪ টী ধানের কেন্দ্র রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ১১৪ টী Union Board ধানের বীজ উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়াছে।

সরকারী কৃষি বিভাগ কেবল মাত্র পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। পাটের পরিবর্ত্তে কি কি ফসলের চাষ হইলে বাংলার কৃষকদিগের আর্থিক সুবিধা হইতে পারে সে বিষয়েও যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছেন। নবাব বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশে পাটের চাষ কমাইয়া দিয়া তৎস্থলে ইক্ষু, তামাক ও চিনাবাদাম প্রভৃতি প্রচলিত হইলে কৃষকের আয় অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। সম্প্রতি ভারত সরকার চিনির উপর আমদানী শুল্ক ধার্য্য করায় চিনির ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষুর চাষও বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে সমগ্র বাংলায় ২৭৬২০০০ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হয়। পূর্ব্বে বাংলায় "টানা" নামক ইক্ষুরই চাষ হইত। উহার দণ্ড কঠিন বলিয়া পশুতে সহজে নষ্ট করিতে পারিত না বটে, কিন্তু উহাতে রসের ভাগ অল্প হইত। এখন কৃষি বিভাগের চেষ্টায় "Coimbatore 213" প্রচলিত হওয়ায় এ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখন আমাদের দেশে ছোট বড় মোট ৪৫টী চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬টী বড় কলে সাদা চিনি প্রস্তুত হইতেছে।

এখন বাংলায় বিহার হইতে প্রচুর পরিমাণে মতিহারী তামাক আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু রংপুরে কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে বাংলা দেশেও উৎকৃষ্ট তামাকের চাষ চলিতে পারে। ইহার ফলে কোন কোন স্থানে তামাকের চাষও কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার দ্বারা কৃষকের আয় প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। চিনা বাদামের চাষ প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিভাগ হইতে গত বৎসর ৭০০ মণ চিনা বাদামের বীজ বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন কৃষিজাত পণ্য বাজারে চালান দিবার কি প্রকার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য গত বৎসর সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। তাহারা চাউল, ডাল, তামাক, ডিম, দুধ, ঘি প্রভৃতির ব্যবসার সম্পর্কে সন্ধান করিতেছেন।

গবাদি পশুর উন্নতি সাধন

বাংলায় গো মহিষাদির সংখ্যা ২½ কোটির উপর। ইহার উন্নতি সাধনও একটী গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আজকাল প্রতি বৎসর বাংলার কৃষকগণ বাংলার বাহির হইতে অসংখ্য মহিষ ও বলদ ক্রয় করিয়া থাকে। ইহার ফলে তাহাদের মোট আয়ের একটা বড় অংশ বাংলার বাহিরে চলিয়া যায়।

বঙ্গদেশ হইতে এই অর্থ নিষ্ক্রমণ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সরকার মালদহ, রাজসাহী, হুগলী, বগুড়া প্রভৃতি দশ জেলার প্রত্যেকটীতে ১০০টী সবল ষাঁড় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার ফলে বাংলায় গোজাতির উন্নতি সাধিত হইবে এইরূপ আশা করা যায়। বর্ত্তমানে বাংলা দেশে প্রতিবৎসর বহু-সংখ্যক গো মহিষাদি বসন্ত প্রভৃতি রোগে মারা যায়। ফলে কৃষকদিগকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ইহার প্রতিকার-কল্পে শীঘ্রই কলিকাতায় একটী Goat Tissue Vaccine Depot স্থাপন করা হইবে। Goat Tissue Vaccine গো-বসন্তের প্রতিষেধক। তাই আশা করা যাইতে পারে যে Vaccine Depot স্থাপনের ফলে গবাদি পশুর জীবন রক্ষা পাইবে এবং কৃষি সম্প্রদায়ও আর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

সমবায় সমিতি

দেশের নানাস্থানে সমবায় সমিতি গঠন করিয়া দরিদ্র কৃষকদিগকে নামমাত্র সুদে ঋণ দানের জন্য সরকার পক্ষ হইতে ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু গত সাত বৎসর কাল ব্যাপী সমবায় সমিতিগুলির উন্নতির ও কার্য্যা-বলীর একটা হিসাব করিতে হইলে সমিতিগুলি কিরূপ আর্থিক মন্দার ভিতর দিয়া চলিয়াছে এবং নানা কারণে তাহাদের দুরবস্থা কিরূপ উগ্র হইয়া উঠিয়াছে তাহাও বিচার করিতে হইবে। দীর্ঘকাল আর্থিক দুর্দ্দশার ফলে অনেকগুলি সমবায় সমিতি liquidationএ গিয়াছে। তাহার দরুণ সমবায় আন্দোলনের মূলধনের একটা মোটা অংশ আটক পড়িয়াছে। একমাত্র Bengal Provincial Co-operative Bankএর ২০ লক্ষের উপর টাকা এইরূপে আটক পড়িয়াছে। এইরূপ দুরবস্থার মধ্যেও দেশে কোন আতঙ্কের সৃষ্টি হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায় আন্দোলনের শক্তি কত। ১৯২৯ সালে সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা ছিল ২২৫০০ এবং তাহাদের মোট সভ্য সংখ্যা ছিল ৭৫০১৩৭। তৎস্থলে বর্ত্তমানে ২৩৯২০টী সমবায় সমিতি এবং মোট ৮৩০২৪৬ জন সভ্য আছে। ১৯২৯-৩০ সালে সমিতিগুলির একত্রে মূলধন ছিল ১৫ কোটীর কম, কিন্তু আজকাল তাহা ১৮ কোটীর উপরে উঠিয়াছে। পৃথিবীব্যাপী আর্থিক অনটন বিধায় সমবায় আন্দোলনের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি সমবায় আন্দোলনের বিস্তৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা খুবই আনন্দের বিষয় যে সমবায় সমিতিগুলির সংরক্ষণ কল্পে সরকার ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ দানে সম্মত হইয়াছেন।

Central Bankগুলির depositorগণ সুদের হার কমাইয়া দিতে সম্মত হওয়ায় Bankএর অধীনস্থ সমিতি-গুলিকে অনেক সুবিধা দান করা সম্ভব হইয়াছে। প্রাথমিক সমিতিগুলির দেয় সুদ মোটের উপর প্রায় ২½ লক্ষ টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ সুবিধা পাওয়ায় প্রাথমিক সমিতিগুলিও নিজ নিজ সভ্যগণকে যথেষ্ট সুযোগ দানে সক্ষম হইয়াছে। ফলে সমবায় সমিতির সুদের হার শতকরা প্রায় ৩৲ টাকা কমিয়া গিয়াছে। মোটের উপর হিসাব করিলে দেখা যায় যে সমবায় সমিতিগুলির কৃষক সভ্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্য মোট সুদের পরিমাণ ১২½ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হইয়াছে। ইহাতে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অদূর ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার এবং সমবায়ের নীতি সমূহ শিক্ষা দিবার জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। পাট ও ধান বিক্রয়ের জন্য সমবায় সমিতি গঠনের পরিকল্পনাও সরকারের বিবেচনাধীন।

ময়মনসিংহ, পাবনা ও কুমিল্লায় ৩টী এবং যশোহর ও বীরভূমে দুইটী জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলির নিকট ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ২০৫৫০টী ঋণের দরখাস্ত আসিয়াছে। এই সমস্ত দরখাস্তে প্রার্থিত ঋণের পরিমাণ ৯৬০১৪৫৲ টাকা। এই দরখাস্ত-গুলির মধ্যে ৪৪৬০টী মঞ্জুর হইয়াছে এবং মোট ২৫৩০৭১৲ টাকা ঋণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। বাংলার ঋণগ্রস্ত দরিদ্র কৃষকদিগের আর্থিক দুর্গতি নিবারণে সরকারের এই সাধু প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

বাংলায় শিল্পের উন্নতি

Handloom Industry ও Home Industry বাংলার দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রধান সম্বল। যদিও বর্ত্তমান জগতের

সঙ্গে সমতালে চলিতে হইলে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় বড় বড় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিবিধ শিল্পের উন্নতি সাধন একান্ত প্রয়োজন; তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে কৃষিপ্রধান দেশ দরিদ্র ভারতবর্ষে ইউরোপের ও আমেরিকার অনুকরণে বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করিবার জন্য উপযুক্ত মূলধন যোগাড় করিতে অনেক সময় লাগিবে। কিন্তু ছোট-খাট কুটীর শিল্পগুলিকে অল্প মূলধনের সাহায্যেই উন্নত ও সঞ্জীবিত করা যাইতে পারে। এবিষয়ে বাংলা সরকার যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতেছেন। Handloom Industry উন্নতির জন্য সাতটী সমবায় কেন্দ্র গঠন করা হইবে। এই কাজের জন্য মোট দুই লক্ষ টাকার উপর বরাদ্দ করা হইয়াছে। যদিও এ বিষয়ে সরকারী কার্য্য পদ্ধতি বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই তথাপি কতকগুলি কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। Waterproof lining cloth, envelop lining cloth, canvas, bed sheet, প্রভৃতি এই সকল সমবায় তাঁত কেন্দ্রে প্রস্তুত হইতেছে। নানাপ্রকার ফুলদার ও বুটিদার শাড়ী প্রস্তুত করিবার চেষ্টাও চলিতেছে। এই সকল কেন্দ্রোৎপন্ন পণ্য যাহাতে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বিক্রয় হইতে পারে তদনুরূপ ব্যবস্থাও করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শিল্পগুলিকে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য সরকারী আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। অবশ্য গত কয়েকবৎসর যাবৎ আর্থিক অনটন বিধায় এবিষয়ে সরকার আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তথাপি ভবিষ্যতে সরকারী সাহায্যে দেশের বিভিন্ন শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে এইরূপ আশা করা যায়।

গৃহশিল্পের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অধুনা বেকার সমস্যারও কথঞ্চিৎ সমাধান হওয়া সম্ভব। পাট ও পশমের বুনান, সাবান প্রস্তুত, ছাতা প্রস্তুত, কাঁসা, চামড়া ও মাটির দ্রব্যাদির প্রস্তুত প্রণালীর শিক্ষা দিবার জন্য ২৮টী প্রদর্শক দল সংগঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ৭টি দল রহিয়াছে। তাহারা চামড়া tanning এবং weaving শিক্ষা দিয়া থাকেন। সরকারী প্রচার কার্য্যের ফলে বাংলার নানাস্থানে মোট ১৩৪টী Technical School স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এইরূপে দেশে বৃত্তি শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা খুবই আশাপ্রদ।

রাজবন্দীদিগের বৃত্তি শিক্ষা

বর্ত্তমানে বাংলা দেশে যুবক ও অল্পবয়স্ক অনেক রাজবন্দী আছে। ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা বেকার অবস্থায় অন্নকষ্ট না পায় সেজন্য সরকার রাজবন্দীদের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে এই উদ্দেশ্যে ৪টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও ৩টী স্থাপিত হইবে। রাজবন্দীগণের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সরকার সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে নবাব স্যার মহিউদ্দিন ফারোকী গত সাত বৎসর কাল কৃষি ও শিল্প বিভাগের সরকারী ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকিয়া দেশ হিতকর বিবিধ কার্য্যপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ সকল কার্য্য-প্রণালীর ফলে দেশে শিল্প ও কৃষির প্রভূত উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যার দিনে দরিদ্র বাংলার দরিদ্রতম কৃষি সম্প্রদায়ের দুঃখ মোচনে সচেষ্ট থাকিয়া সুযোগ্য মন্ত্রী মহাশয় দেশের ও দশের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

পলাশ ফুল

শ্রীমোহিনীমোহন পাল

উপন্যাসটা প্রায় শেষ ক'রে এনেছে বিভাস, বাইরের বারান্দায় জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ এল। বই থেকে মুখ তুলে দরজার দিকে তাকাতেই অপর্ণা একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়াল। বিভাস মেজেতে ব'সে বই নিয়ে পড়ছিল, ওকে দেখে অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বলিল, "এস।"

অপর্ণা হেসে বললে, "বাব্বাঃ, কী বই-ই আপনি পড়তে ভালবাসেন। যখনই আসি, দেখি কেবল বই, আর বই।"

বিভাস চুপ ক'রে রইল। কোন কথাই সে বলতে পারলে না।

অপর্ণা জানলার ধারে বসতে বসতে বললে, "কী, চুপ ক'রে রইলেন যে—পাঁচটা বাজল, বেড়াতে যাবেন না? না, আবার চুপ ক'রে ব'সে বই নিয়ে পড়বেন? কী যেন আপনি!"

"সত্যই। একবার বই পড়তে আরম্ভ করলে আর কিছুই মনে থাকে না। ভারি লজ্জিত আমি।"

"তা হ'লে নিন্ চট্‌পট্‌ ক'রে। রাস্তার দিকে দেখছেন একবার—সকলেই বেরিয়ে পড়েছে।"

"একটু চা খাবে না?"

"না না, চা খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।"

"আমি যে একটু খাব। তুমি ঐ ষ্টোভটা জ্বালতে পারবে না? আমি ততক্ষণে, চায়ের যোগাড় করে দিই। বেশী দেরি হবে না- -আর দেরি হ'লেই বা কি?"

এবার বিভাস দুষ্টুমীর হাসি হাসলে।

"নাঃ, পারা যাবে না আপনার সঙ্গে। নিন্ আপনি চট্‌পট ক'রে।"

বিভাস বাইরে চ'লে গেল।

বেশ পরিবর্তন ক'রে বিভাস ভেতরে এসে দেখলে, অপর্ণা চায়ের পেয়ালায় চিনি মেশাচ্ছে। তার সামনে সেই পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে ও নিজের জন্যে চা তৈরি করতে লাগল।

দুজনে নির্লিপ্ত মনে চা খাচ্ছে। কোন কথা নেই। তবু যেন ঐ চা খাবার মধ্যে ওরা পরস্পরকে অনুভব ক'রছে। বিভাস দেখছে শাড়ীর জল্‌জলে পাড়ের নীচে অপর্ণার ছোট্ট অনাবৃত পা দু'খানি, আর মেজেয় লুণ্ঠিত অঞ্চল প্রান্ত।

অপর্ণা তার শূন্য পেয়ালাটি নাবিয়ে উঠে দাঁড়াল। একবার জানালার কাছে এল, পরক্ষণেই বিভাসের টেবিলের কাছে এসে ওর বইগুলো একবার নাড়াচাড়া করলে। উল্টে পাল্টে একবার দেখলে, আবার যথাস্থানে রেখে দিল।

তারপর সে চঞ্চল হয়ে বলে উঠল, "আপনি বসে চা খান, আমি একবার মাসিমার সঙ্গে দেখা করে আসছি।"

অপর্ণা জুতো পরে বারান্দা দিয়ে খট্‌খট্‌ ক'রে মাসিমার সন্ধানে চলে গেল। বিভাস বসে বসে চা খেতে লাগল।

চা শেষ করে সে উঠে এল নিজের বই রাখবার টেবিলের কাছে। ছোট্ট আরশিটা তুলে নিয়ে একবার নিজের মুখখানাকে চকিতে দেখে নিল। উস্ক-খুস্ক চুলগুলোকে বুরুশের কয়েক টানে সভ্য করে তুললে। আবার বুরুশটা তুলেছে বাইরে জুতোর আওয়াজ এল। তাড়াতাড়ি কাগজের স্তূপের মধ্যে আরশি, বুরুশ লুকিয়ে রাখলে।

বাইরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে বললে, "চল, যাই—আর দেরি করব না।"

অপর্ণা ওর সামনে এসে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে একবার ওকে আপাদমস্তক দেখে নিল। পরে সে বললে, "কাল আপনার জ্বর হয়েছিল, অথচ আমাকে বলেন নি?"

"জ্বর! হ্যাঁ রাত্রে হয়েছিল বটে। আর তুমি কি আমাকে শুধিয়েছিলে সে কথা?"

"বাঃ, আপনি বেশ লোক! না বললে জানব কি ক'রে? মাসিমা এইমাত্র বললেন বলেই ত জানলাম।"

"আমার ধারণা ছিল যে মেয়েদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।"

"মনে করবেন না যে আপনারাই বুদ্ধিতে সেরা। মাঝে মাঝে আমাদের বুদ্ধিটা আপনাদের কাজে লাগে।"

"সে সাংসারিক ক্ষেত্রে। জীবনের ক্ষেত্রে নয়।"

"তার মানে জীবনটা কি আপনাদেরই এক চেটে? ওতে কি আমাদের কিছু ভাববার নেই—আপনারাই কি সব?"

"নাঃ, তোমার সঙ্গে পারা যাবে না। বেড়াতে যাবে, না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করবে?"

"আজ আপনি কি করে বেড়াতে যাবার নাম করছেন? তার চেয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসুন।"

"তার চেয়ে আত্মহত্যা করা সহজ। ঐ ঘরে আবার? চল, চল একটু ঘুরে আসি বাইরে। বেশী দূর নাই বা গেলাম আজ।"

দু'জনে বাড়ির সামনে বাগানে নেমে পড়ল।

রান্নাঘর থেকে মাসিমা বলে উঠলেন, "বেশী দূর যাস্ নি আজ।"

ওরা বাগানের ফটক পার হয়েছে। ফাল্গুনের অপরাহ্ণ। পশ্চিমাকাশে সূর্য্য তখনও অস্ত যায় নি। আকাশে বাতাসে কিসের চঞ্চলতা। এই সাঁওতাল পরগণার পার্ব্বত্য উঁচু নীচু জমির ওপর পড়েছে দিনের শেষ রোদ্দুর। বিশেষ ক'রে শীত অবসানে এই সময়টি প্রকৃতি নতুন সাজে আপনাকে অপরূপ ক'রে তোলে। রাস্তায় বিচিত্র শ্রেণীর নরনারীর ভীড়, মাঠে সাঁওতাল রমণীদের সম্মিলিত গানের সঙ্গে অনাবিল হাস্যধ্বনি—জাগিয়ে তোলে মনের মধ্যে এক নব অনুভূতি।

অপর্ণা বললে, "রাস্তায় উঠবেন না।"

"কেন?"

"আজ ঐ সব ভীড় ভাল লাগছে না আমার। চলুন না কেন, মাঠের পথ দিয়ে কিছুদূর যাই।"

"তবু কোন দিকে?"

"ঐ যে শালবন রয়েছে নদীর ওপারে। যাই নি কোন দিন, তবে শুনেছি ভারি চমৎকার জায়গা।"

"চমৎকার।"

"এখান থেকে দেখাচ্ছে ত' বেশ। আর নয়-ই বা কেন?"

"চল তবে।"

দু'জনে পাশাপাশি চলে। বিভাসের কাঁধের কাছে অপর্ণার মাথা। দেখায় ওর মুখখানি সূর্য্যমুখী ফুলের মত যেন কিসের জন্যে সদাই উন্মুখ হয়ে রয়েছে। ওর চোখদুটি ঝক্‌ঝক্ করছে, পাতলা লালচে দু'খানি ঠোঁট, একটু কথা কইলেই বা হাসলেই ওর দাঁতগুলি মুক্তোর মত ঝল্‌মল্ করে ওঠে। রেশমের মত ওর নরম চুলগুলি ঘাড়ের কাছে এসে জড় হয়েছে, যেন তাতে বিশেষ পারিপাট্য চোখে পড়ে না, তবে সেই অগোছাল কবরী ওকে স্বাভাবিক করেছে—ক'রেছে ওকে আরও সুন্দর। বয়স ওর কুড়ি, কিন্তু দেখায় তার চেয়ে কম। মনে হয় ওকে দেখে যেন যৌবন ওকে স্পর্শ করেছে মাত্র, এখনও ওর দেহের দু'কূল ছাপিয়ে ওঠেনি। বাঙ্গালীর ঘরের সাধারণ মেয়ের দেহের রঙ যেমন হয়ে থাকে উজ্জ্বল শ্যাম, তাকে ঘসে মেজে সেই ঔজ্জ্বল্যে এসেছে তড়িৎ-শক্তির মত এক ঝল্‌মলানি। কিন্তু সেটা তার দেহে রূপ নিয়েছে, মনে তার কোন রঙ ধরেনি। বড়লোকের মেয়ে। লেখাপড়া বেশী শেখেনি, তবে ফ্যাশনটা দুরস্ত করেছে আর পাঁচজন মেয়ের দেখে। এখনও বিয়ে হয়নি উপযুক্ত পাত্র দেখতে দেখতে আর না দেখতে দেখতে। বয়সটা কারও জন্যে দাঁড়ায়নি। বিভাস তার বাবার বন্ধুর ছেলে। তাই এই প্রবাসে এদের পরিচয়টা থামে নেমে যায়নি, বরং ঘনিষ্ঠতার পর্ব্ব চড়েছে উঁচু পর্দায়। কলকাতায় থাকলে এতটা দু'জনে হয়ত কেহই আশা ক'রতে পারত না, কিন্তু স্বজন-বর্জ্জিত এই প্রবাসে দু'জনের আলাপ হতে দেরী লাগেনি।

সামনে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য তটিনী। নৃত্যরতা অপ্সরীর মত নূপুর ধ্বনি ক'রে চ'লেছে দুই কূলকে আলোড়িত ক'রে। এই স্রোতের গতি আছে, তবে এর গভীরতা নেই।

দুজনে জুতো খুলে নদীতে নেমে সে-কী হাসি! অপর্ণার হাসি যেন আর থামতে চায় না। বিভাস সামনে, অপর্ণা পিছনে।

শাড়ী ভিজিয়ে অপর্ণা ওপারে এল। তারপর জুতো পরে চলতে আরম্ভ করলে বিভাসের পিছনে পিছনে।

কাছে এসেছে শালবন। পরিচ্ছন্ন তলদেশ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ের সমতল স্তব।

ওরা দু'জনে সেখানে পা ছড়িয়ে বসল।

অপর্ণা বলে উঠল, "ওঃ, কী চমৎকার! দেখেছেন এমন সূর্য্যাস্ত? কি বল্ব আপনাকে—ভারি ভাল লাগছে, আমার।"

"এ ত' রোজই হয়।"

"রোজ হয়! আচ্ছা কলকাতায় কোনদিন সূর্য্যাস্ত দেখেছেন?"

"দেখেছি সূর্য্যাস্ত কলকাতায়, দেখেছি পাহাড়ে-সমুদ্রে, তার চেয়ে আর একটা জিনিষ দেখছি। সূর্য্যাস্তের চেয়ে বড়।"

"কি আবার?"

"কেন বুঝতে পারছ না? আজ তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"আঃ, আবার কম্প্লিমেন্ট!"

"নয়ই বা কেন? অসুন্দরকে কি কোনদিন সুন্দর বলতে গেছি?"

"আচ্ছা আপনার প্রাকৃতিক দৃশ্য ভাল লাগে না?"

"সব সময়ে নয়—কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে।"

"আমার সকল সময়েই ভাল লাগে। কেন তা' জানি না।"

"হয়ত তুমি গ্রাম থেকে সহরে এসেছ অল্পদিন ব'লে।"

"গ্রাম কি আপনার ভাল লাগে না?"

"লাগবে না কেন? কিন্তু গ্রামকে ছেড়েছি অতি শিশু-কালে। তারপর মাত্র একবার গ্রামে গিয়েছিলাম।"

"ওঃ, তখন আপনি কী ছেলেমানুষ আর কী দুরন্ত ছিলেন! আপনাদের জালায় পাড়ার লোক অস্থির হ'য়ে উঠেছিল।"

"আর তুমি? বছর বার-তের তোমার বয়স। প্রথম কথা কইতে গিয়ে ত' তোমার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। একবার সাঁতার কাটতে গিয়ে ত' গভীর জলে গিয়ে পড়েছিলে?"

"ওঃ, সে কথা আমার এখনও ভাল ক'রে মনে আছে। ভারি ভয় হ'য়েছিল। আপনার সাহায্য না পেলে ডুবতাম নিশ্চয় সেদিন।"

"সবই ছিল ভাল, সবই লাগত ভাল। এখন গ্রামের নামে আমার প্রাণে কোন সাড়াই আসে না। মনে হয়, সব গেছে—সব মুছে গেছে আমার জীবন থেকে।"

"কেন একথা আজ বলছেন?"

"জান না তুমি? ঐ গ্রামেই আমার সব ছিল একদিন। আমার বোন মিন্টুকে তোমার মনে পড়ে?"

"তা' আর পড়ে না। আহা! আমরা তখন হাজারীবাগে। শুনে কী-যে ব্যথা পেলাম, কি আপনাকে বলব?"

"তারপর মা বাবা সব এক এক ক'রে গেলেন কলেরায়। খবর এল কলকাতায়। তখন সব শেষ। আমার তখন কি অবস্থা। একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম পর্য্যন্ত। তারপর কয়েক বছর পাগলের মত ঘুরেছি—ওঃ, ঐ গ্রামের কথা আমাকে বল না। সব সহ্য করতে পারি—এ বেদনা পারিনা সহ্য করতে।"

"আচ্ছা, তারপর আপনি কেন এলেন না আমাদের কলকাতার বাড়িতে? বাবা ত' আপনাকে আসতে বলেছিলেন।"

"পারিনি অপর্ণা। তখন কারুর অনুকম্পা বিষের মত মনে হত। বিশেষ করে কারুর কাছে কোনদিন সাহায্যের জন্যে হাত পাতিনি। সেই দুঃখের সময় আমার পৌরুষ কেন মাথা নীচু ক'রবে অন্যের কাছে?"

"বুঝেছি আপনার কথা।"

"কী আর বল্লাম তোমাকে? কী আর বুঝবে তুমি? জীবনটা এক একবার এত নিঃস্ব মনে হয় যে কোন কূল খুঁজে পাই না। তাই ত বইএর মধ্যে দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে চলেছি এই জীবনে কী না হওয়া সম্ভব ছিল, কী না হ'তে পারতাম? মাঝখান থেকে কে আমার হৃৎপিণ্ডটা বক্ষ থেকে যেন ছিঁড়ে উপড়ে নিয়ে চ'লে গেছে। তাই-ত মাঝে মাঝে হই অসহিষ্ণু, তাই ত' অকারণে কা'কেও আঘাত দিয়ে বসি।"

অপর্ণা কোন উত্তর দেয় না। আর সে বলবেই বা কি? ব্যথার ক্ষতে হাত বুলিয়ে শান্ত করতে সে চায় না। কেবল ওর প্রদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আবার কিছুক্ষণ কাটে নিঃশব্দে।

আকাশে একটি একটি ক'রে তারা উঠছে। উতলা বাতাস মর্ম্মর ধ্বনি তুলে গাছের পাতাগুলি দিচ্ছে নাড়া। কোথা থেকে আসছে ফুলের মৃদু সৌগন্ধ।

অপর্ণা শান্তস্বরে বললে, "চলুন এবার।"

বিভাস উঠল নীরবে। ওরা চলতে লাগল পাশাপাশি মুগ্ধের ন্যায়—আনন্দে নয়, বেদনায়।

নিঃশব্দে তারা সেই ক্ষুদ্র নদী পার হয়েছে, নীরবে চ'লে এসেছে অনেকদূর পথ, বিভাস খেয়ালই করেনি।

মাঠপথে অপর্ণাদের বাড়ির কাছে এলে অপর্ণা বলে উঠল, "যাচ্ছি আমি।"

চকিত হয়ে বিভাস বললে, "যাচ্ছো, আবার কবে আসছ ?"

মুহূর্ত্তেই অপর্ণার মুখখানি বেদনায় পাণ্ডুর হয়ে এল। কি বলবে সে বিভাসকে ? এতক্ষণে সে কি ঐ দরকারী কথাটা বলতে পারত না ?

আঁচলের খুঁটটা বাঁ হাতে জড়াতে জড়াতে নতনেত্রে অপর্ণা বললে, "কাল আমরা বাড়ি যাচ্ছি।"

"কালই ! এতক্ষণে বলনি ত' আমায় ? কাল ! কখন ?"

"ভোরের ট্রেণে।"

"তা হলে ত' আর তোমার সঙ্গে দেখাই হবে না আমার। ঠিক ত' ? না...।"

"সত্যিই, কাল ভোরে যাব।"

"ভোরে যাবে চলে ! কিন্তু আমার যে অনেক কথা তোমাকে বলবার ছিল ? এখনও যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই।"

তু'জনে ক্ষণকাল মুখোমুখি নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু সেই স্বল্পান্ধকারে ওদের চোখ কি কথা কইলে—তা' ওরাই জানে।

পাশে খোয়াই নেমেছে। তাতে ঢেকে গেছে পলাশের অগণ্য তরুশ্রেণী, তাতে ফুটেছে ফুল, ধরেছে কত কলি—চাঁদের আলোয় দেখাচ্ছে স্বপ্নলোকের মত—কিসের আবছাওয়ায় ঢাকা।

পলাশের নুয়ে পড়া একটা ডাল থেকে বিভাস পল্লব সমেত লাল টকটকে একগুচ্ছ ফুল ছিঁড়ে অপর্ণার সামনে এল।

সে তাকে বললে, "আজ আমার কণ্ঠ রুদ্ধ—কথা আসছে না। যাবার দিনে এটা দিচ্ছি—ফেলে দিয়ো না।" এই বলে সে অপর্ণার কাছে এগিয়ে এসে ওর ব্লাউসের মধ্যে গুঁজে দিল মুকুলিত পলাশের সেই পল্লব দল।

অপর্ণার মুখখানিও পলাশ ফুলের মত রাঙা হ'য়ে উঠল—দুলে উঠল ওর বুক।

অপর্ণা বিভাসের আরও কাছে এসে বললে, "আজ কি আর তোমাকে বলব ? আবার দেখা হ'বে কলকাতায়।" এই ব'লে সে আপন তু' হাতে বিভাসের ডান হাত খানি মুহূর্ত্তকাল চেপে ধরে পরক্ষণেই এক রকম ছুটতে ছুটতে বাড়ির ফটকের মধ্যে প্রবেশ করলে।

শ্রীমোহিনীমোহন পাল

তবু, কিছু কি বলে ?

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

কিছুই কি বোঝেনি "ও",—ভাবে তাই "সে",
এমন নিষ্প্রাণ ওরে করিল কিসে ?
না জানি কেমন আছে
শুধাবে সে কার কাছে !
কিছু মনে করে পাছে আর সকলে !
শুধু থেকে-থেকে বাজে মনেরি তলে,—
তবু,—কিছু কি বলে ?

কদাচিৎ সে-কি আর হয় না দেখা !
সখীদলে মিশে চলে, থাকে না একা।
না শুধালে নয় ওরে,
—কেন "ও" অমন করে !—
দেখা হোলে পথ 'পরে আগের থেকে
নিজেরেই দেখে লয় তারে না দেখে' !
"ও" কি বোঝে না "সে" কে ?

দেখে রাগে জ্বলে যায় সারাটা দেহ ;
ওর কাছে সে-ও যেন দশেরি কেহ !
এত ভরা ওর থালি
দিতে কি পারে না ঢালি'
হেন কিছু যাহা খালি একেলা তারি ;
কাছে যাবে,—মন বলে—"গরজ ভারি !"
চলে সে-পথ ছাড়ি'।

দোদুল বেণীটি ওর গাঁথা করবী,
দুলায়ে দুলায়ে চলে কত গরবই !
দেখে' মনে সাধ আনে,—
পিছু হতে একটানে
বেণী নেড়ে বলে কানে একটি কথা,—
"শোনো মেয়ে, ভালো নয় উচ্ছলতা,
কিছু কম কোরো তা।"

ভেসে ওঠে সেই দুটি আঁখির ছায়া,
রাগিতেও লাগে এক কেমন মায়া !
কী বা আর করিবে "সে"
হেরে গেছে ভালোবেসে ;
মনোমত মনই শেষে আনিয়া মনে,
কী যে "ও" বলিতে পারে কোন্ সে-খনে
ব'লে, নিজেই শোনে ॥

আবরণ

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

ক্লান্তপদে ঘরে ঢুকে লণ্ঠনের আলোটা একটু উজ্জ্বল করে দিয়ে মৃণাল ডাকল,—গৌরী! শোন একবার।

মাথার কাপড়টা টেনে ঘরে ঢুকে গৌরী বলল, কি জন্যে তলব হ'ল শুনি। মৃণাল গৌরীর হাত ধরে বলল, এত তাড়া কেন, বস বলছি!

নিতান্ত সাধারণভাবে গৌরী বলল, বসবার অবকাশ এখন আমার মোটেই নেই। যা বলবে বলে ফেল।

মৃণাল হেসে বলল,—একটা ভাল সংবাদ এনেছি। এ সপ্তাহের 'দীপ্তি' কাগজে আমার একটি ভাল কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সন্ধ্যের ভেতরেই সব কাগজ নিঃশেষ।

বিরক্ত কণ্ঠে গৌরী বলল, ও হরি! এই তোমার শুভ সংবাদ! আমি ভাবলাম তোমার একটা চাকরী যোগাড় হ'য়েছে। কাজ খোঁজবার নাম করে দুপুর থেকে বেরিয়ে বুঝি তোমার কাব্য চর্চ্চা হচ্ছিল? কাব্য করলে পেট ভরে না। কাজের চেষ্টা দেখো। মেশোমশাই এসে বলে গেছেন তোমাকে দেখা করতে,—কোন এক আপিসের বড় বাবুরে তোমার কাজের জন্যে চিঠি দেবেন।

সে কথায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে মৃণাল বলল, রাগ করছ কেন গৌরী! একটু বস।

ঝাঁঝাল স্বরে গৌরী বলল, বসবার এখন আমার সময় নেই। খোকা কাঁদছে দুধ গরম করে খাওয়াতে হ'বে। বাজে কথা এখন রাখ।

মিনতির স্বরে মৃণাল বলল, লক্ষ্মীটি দু'লাইন শুনে যাও।

কোন কথাই গৌরী শুনল না, হন হন করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অবসাদগ্রস্ত মৃণাল দীর্ঘ হাই তুলে জানালার বাইরে দৃষ্টিপাত করল। অপ্রশস্ত স্যাঁত সেঁতে পথ। স্তূপীকৃত ময়লার দুর্গন্ধ। এ ছাড়া জানালার বাইরে আর বিশেষ কিছু দৃশ্য নেই।

মৃণালের আজ সত্যই অভিমান হ'ল। গৌরী তাকে আজ অপমান করেছে। আজ সে হেয়,—পৃথিবীতে তার প্রয়োজনের অবসান হয়েছে। পৃথিবীতে থাকতে গেলে চাই অর্থ—প্রচুর অর্থ! যার বিনিময়ে তবে সে পাবে ভালবাসা, প্রেম, স্নেহ, সেবা!

কাব্য চর্চ্চা! এটাও আজ দোষের মধ্যে গণ্য। মদ্যপান প্রভৃতি বদ্‌নেশার মত এটাও ঘৃণ্য!

দেওয়ালের গায়ে একটা ভাঙা আয়না টাঙান ছিল। মৃণাল আয়নার সামনে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তার নিজের চেহারাটা দেখতে লাগল।

প্রথম দৃষ্টিতে সে আঁতকে উঠল। এই সে মৃণাল রায়, যে চার বছর আগে দাস দাসী পরিবেষ্টিত হয়ে ত্রিশ হাজার টাকার বাড়ীতে বাস করত, করকরে লক্ষ টাকার উপর যার ব্যাঙ্কের খাতায় ছিল। গাড়ী মোটর কিছুরই অভাব ছিল না। সুন্দর সুগঠিত দেহ, উজ্জ্বল গৌর বর্ণ রং। একি চেহারা আজ তার! কোটরগত চোখ, গালের হাড়দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে, শীর্ণ মাংসপেশী, মাথার মাঝে চুল উঠে টাক পড়ে গেছে! তামাটে রং,—শ্রীহীন! আলো বাতাসহীন বারটাকা ঘরে বাস করা প্রাণীর মতই তার চেহারা হ'য়েছে,—কিছুমাত্র বেমানান হয়নি।

তার সঙ্গে কথা কইতে গৌরীর আজকাল ভাল লাগে না! সত্যিই না লাগবারই কথা,—তার নিজেরই ভাল লাগছে না! আর সে'ত একটা বিভিন্ন সত্তা, তার নিজস্ব রুচি, আকাঙ্ক্ষা আছে।

পরিপূর্ণ আশা, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে কোন্ নারী চায় একটা অপদার্থ শ্রীহীন পুরুষের দিকে।

যখন তার রূপ ও ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য ছিল, এক নিমেষের জন্যে গৌরী তাকে কাছ ছাড়া করত না! তার কবিতা

তখন তার খুব ভাল লাগত। তার প্রতিটি কার্য্য ও ব্যবহারের মধ্যে ছিল সুসামঞ্জস্য,—সৌজন্য। গৌরী ত্রুটি ধরতে পারত না। আর আজ তাকে ঘিরে আছে বিশৃঙ্খলতা, অভদ্র নীচতা। শুধু একটী জিনিষের অভাবে। সেটা হ'ল অর্থ।

জীর্ণ কোটের পকেট থেকে একখানা ভাঙা চিরুনি বার করে সে চুল আঁচড়াতে লাগল। অবিন্যস্ত কেশ কোন মতেই বাগ মানল না। কাপড়ের কোঁচা নিয়ে মুখ মুছতে লাগল, তামাটে রং আরো ঘোর বর্ণ হ'য়ে উঠল। শ্রী ফেরান অসম্ভব,—বৃথা প্রয়াস মাত্র।

তিন বছরের খোকা মিণ্টু সহসা ঘরে ঢুকে মৃণালের কাছে এসে বলল, বাবা, আমায় ভাল জামা, খেলনা, মোটর গাড়ী এনে দাও। মোটর গাড়ী দাও বাবা।

সদ্য স্বপ্নভাঙার মত চোখ দুটি করে, মিণ্টুকে সে কোলে তুলে নিল। দোবো বাবা, সব দোব। বড় গাড়ী এনে দোব।

—আমি রোজ বেড়াতে যাব।

—নিশ্চয় যাবে। রোজ যাবে।

—মাকে নিয়ে যাবে?

—হাঁ বাবা। তোমার মাকেও নিয়ে যাব।

মিণ্টু কোল থেকে নেমে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর উচ্চ কণ্ঠে বলল, মা, বাবা মোটর গাড়ী আনবে,—মস্ত বড়, তোমাকেও বেড়াতে নিয়ে যাব।

মৃণাল শুনতে পেল মিণ্টুর কথা শুনে গৌরী কর্কশ স্বরে বলল, হ্যাঁ, তোমার বাবা সব দেবে, ঐটে এবার বাকি আছে। তোমার বাপকে বল মোটরের বদলে এখন চাল ডাল নিয়ে আসুক তা না হলে রাতে উপোস করে থাকতে হবে।

এটা পরিহাস। বিদ্রূপ। মৃণালের মনে হ'ল। তার স্বপ্ন, বাসনা, সবই মিথ্যা হ'য়েছে। চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে,—হয়ত বা হয়ে গেছে চিরতরে সমাধিস্থ। বাকি জীবনটা তাকে কাটাতে হ'বে এই দারিদ্র্য, নীচতা, বিদ্রূপ, অপমানকে সঙ্গী করে। আরো অনেক দিন বাঁচতে হ'বে এইটে ভেবে সে শিউরে উঠল। মানুষের ইচ্ছামৃত্যু হয় না কেন। যদি হোতো এক মুহূর্ত্তের জন্য সে এখানে থাকত না। বিষাক্ত নিশ্বাসে তার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে। শরীর ও মন পঙ্গু,—চেতনাহীন।

চিন্তার সূত্রকে ছিন্ন করে ঘরে ঢুকল গৌরী।

মৃণাল নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

গৌরী বলল, আর এরকম করে আমাদের কত দিন চলবে। শেষ পর্য্যন্ত অনাহারে মরতে হ'বে। আমাদের পোড়া পেটকে না হয় বাগিয়ে রাখব, কিন্তু বাচ্ছাটার কি হ'বে সেটা ভাবছ।

উদাসীনভাবে মৃণাল বলল, আমাদের যা হ'বে ওরও তাই। গৌরী কথাটাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারল না। রাগ ও অভিমানের সুরে গৌরী বলল, পোড়া কপাল আমার! কি বরাত করেই জন্মেছি। ছেলেটাকে কোলে নিয়ে কাল থেকে ভিক্ষে করতে বের হ'ব। পুরুষমানুষ এমন নিশ্চিন্ত ভাবে বসে থাকতেও পারে।

মৃণালের মুখখানা রাঙা হ'য়ে উঠল রাগে ও অভিমানে। ক্রোধ ও বিদ্রূপের সুরে মৃণাল বলল, চার বছর আগে তুমিই বলতে গৌরী, আমার মত ভাগ্যবতী কেউ নেই। আমার কপাল দেখে পাঁচ জন হিংসে করে। আজ বুঝেছি আমার নয়, আমার প্রচুর অর্থকে তুমি ভালবাসতে,—তারই মধ্যে তুমি নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করতে। অর্থের সঙ্গে আমার তখন মূল্য ছিল।

গৌরীর ঠোঁট দুটী কেঁপে উঠল। কি একটা কথা বলতে গিয়ে সে কেঁদে ফেলল। তারপর দ্রুত পদে ঘর থেকে বের হ'য়ে গেল।

* * *

ঘণ্টা কয়েক মৃণাল চুপ করে বসে রইল। তার মনে হচ্ছিল এই চার বছরে কত পরিবর্ত্তনই না হয়েছে,—আকাশ পাতাল প্রভেদ চার বছরের আগেকার গৌরীর সঙ্গে আজকের মুখরা গৌরীর। গ্রাম্য নদীর মত যে ধীর মন্থরতা গৌরীর ভেতর ছিল আজ সেটা কর্পূরের মত উপে গেছে, আজ তার ভেতর বইছে পঙ্কিল উগ্র জলের স্রোত।

চাকরি তাকে খুঁজতে হবে, বেঁচে থাকার জন্যে। মৃণাল হন হন করে বের হ'য়ে গেল। রাস্তার উপর যখন সে পড়ল, দেখল সে, বিচিত্র জনতার মাঝে, বিস্তৃত পথের উপর।

চার পাশের বৈদ্যুতিক আলোকে তার চোখ ঝলসে এল। নিজের পরিচ্ছদের দিকে একবার সে দৃষ্টিপাত করল; তার হাসি পেল। শত ছিন্ন কোট, তালি-দেওয়া, আধময়লা কাপড়, এই প'রে তাকে অর্থ সঞ্চয় করতে হ'বে।

পিছনে তীব্র স্বরে মোটরের হর্ণ বেজে উঠল। মৃণাল চমকে উঠে পাশে দাঁড়াতেই মোটরের ভেতর থেকে তাকে ডেকে কে বলল,—কে! মৃণাল না?

মৃণাল মৃদু হেসে বলল, বিনয়! কেমন আছ ভাই? কি করা হ'চ্ছে?

বিনয় বলল, কিন্তু তোমার একি অবস্থা! আমি এখন ব্যবসা করছি। শ্বশুর মশায়ের বিরাট কাপড়ের কারবারের আমি হলুম আট আনা অংশীদার। কথাগুলি খুব গর্ব্বের সঙ্গে বিনয় বলল।

মৃণাল বিনয়ের মুখের কাছে মুখ এনে বলল, আমায় একটা চাকরি দে না ভাই, যে কোন কাজ। আমায় বাঁচতে হবে, ব্যবসায় আমার সব গেছে। কথাগুলি বলবার সময় তার মুখ লজ্জায় ও সংকোচে লাল হয়ে উঠল।

বিনয় নিতান্ত উদাসীন ভাবে উত্তর দিল। তোমার জন্মে সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে, বাঙ্গালীরা ব্যবসা করতে জানে না। কিন্তু চাকরি'ত আমার ওখানে খালি নেই।

মৃণাল মিনতির সুরে বলল,—কোন রূপ সাহায্য।

বিনয় হেসে বলল, অসম্ভব। টাকা দিয়ে যে সাহায্য করব তাও হ'য়ে উঠবে না। পরশু ফিরপোতে বিরাট পার্টি দিচ্ছি ব্যবসা উপলক্ষে, অনেক টাকা খরচা। অন্য সময় দেখা কোর। মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে ড্রাইভারকে সে গাড়ী চালাতে বলল।

দুঃখে অপমানে মৃণালের সারা দেহ থর থর করে কঁপতে লাগল, গলা শুকিয়ে উঠল। বিনয় তাকে অপমান করল। তাকেই সে একদিন বিপদে এক হাজার টাকা ধার দিয়েছিল বিনা লেখা পড়ায়। অকৃতজ্ঞ সেটাও ভুলে গেছে।

মোটর মাত্র চলতে সুরু করেছে, মৃণাল ছুটে গিয়ে মোটরের দরজাটা চেপে ধরে বলল, বিনয়! সেই হাজার টাকা থেকে কিছু যদি দাও।

ক্রোধের সুরে বিনয় বলল, আমি ভয়ানক ব্যস্ত, বিরক্ত কোর না। দ্রুতগতিতে মোটর চালিয়ে দিল।

মৃণাল পিছু পিছু খানিকটা ছুটে চেঁচিয়ে বলল, দয়া কর বিনয়, আমায় বাঁচাও!

অসংখ্য কলরোলে সে আওয়াজ ডুবে গেল।

মাথাটা তার বন বন করে ঘুরে উঠল। একটা বাড়ীর রোয়াকের উপর সে বসে পড়ল।

ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর তার ভ'রে গেছে। অপমান সে কোন মতে সইতে পারবে না,—হয়'ত তাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

একটা মৃদু আওয়াজে সে সামনে ফিরে চাইল। দেখতে পেল এক ভদ্রলোকের পকেট হতে একটা মানি ব্যাগ তার সামনে ফুটপাতের উপর পড়ল। চোখদুটো তার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, সেই চোখে ফুটে উঠল লালসা ও আনন্দ।

ভদ্রলোক যখন দূরে এগিয়ে গেল, মৃণাল একবার এদিক ওদিক চেয়ে ছুটে গিয়ে ব্যাগটি তুলে পকেটে পুরল। তারপর চলন্ত জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিল।

একটু নির্জ্জন স্থানে এসে ব্যাগটা খুলে সে দেখল, তার ভেতর পাঁচটা টাকা আছে। এতে তার পাঁচদিন সংসার চলে যাবে, মিণ্টুর ছুটো জামাও হবে। মহা আনন্দে সে বাড়ী মুখো রওনা হ'ল।

বাড়ীর ভেতর ঢুকে সে সোজা ঘরে ঢুকে ডাকল, মিণ্টু, মিণ্টু! শুনে যাও বাবা।

মিণ্টুকে কোলে নিয়ে সে খুব আদর করল, ব্যাগ থেকে একটা টাকা বার করে মিণ্টুর হাতে দিয়ে বলল, যাও বাবা, মা কে টাকাটা দিয়ে এসো, বল সন্দেশ খাব।

টাকাটা হাতের মুঠোর ভেতরে জোর করে ধরে মিণ্টু বলল, আমার মোটর গাড়ী, খেলনা।

মিণ্টুকে বুকে চেপে ধরে মৃণাল বলল, পাবে বাবা। এখন যাও, মার কাছে যাও।

মিণ্টুর ঘর থেকে বের হ'য়ে গেল, মৃণাল একটু প্রাণহীন হাসি হাসল। সে বুঝতে পারল না, তার অন্তরে তৃপ্তির ছায়া একটুও পড়েছে কি না।

সেদিন গৌরীর সাথে একটা ছোটখাট বচসার পর মৃণালের মনে হ'ল এই আলো বাতাস ভরা পৃথিবী থেকে

মৃণাল ও গৌরীর মৃত্যু হ'য়েছে। এ রকম পরিণাম কি সম্ভব।

দরজা ঠেলে যে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে মৃণাল চমকে উঠল। তারপর বলল, বরেন কি মনে করে! লজ্জার রক্তিম আভা তার সারা মুখখানায় ছড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ বিস্ময় ও নির্ব্বাক হ'য়ে বরেন দাঁড়িয়ে রইল। চোখ তার ছল ছল করে উঠল। অস্ফুট স্বরে সে বলল, তোকে এ অবস্থায় দেখব আমি যে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। তোর এ কি চেহারা হ'য়েছে!

মৃণাল হেসে বলল, শুনিসনি চার বছর আগে মৃণালের মৃত্যু হ'য়েছে। প্রেতাত্মা তার তোর সামনে বসে আছে। ভয় পাসনি।

বরেন বলল, গৌরী কোথায়?

সেও আছে, উদাসীন ভাবে মৃণাল বলল।

বরেন ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত করল। মানুষ খুব কষ্টে না পড়লে এ ঘরে বাস করতে পারে না। কড়ি-কাঠের একদিক ফাঁক হ'য়ে গেছে, সেখান থেকে নীল আকাশের খানিকটা অংশ চোখে পড়ে। অপরিচ্ছন্ন কয়েক-খানা শাড়ী আলনায় ঝুলছে, এক কোণে একটা ছোট কাঠের আলমারী, একখানা ভাঙ্গা চেয়ার। বরেনের মনে হ'ল এ অবস্থাতে মানুষ এসেও বাঁচতে পারে।

অবারিত আকাশের তলায়, উর্ব্বর মাটীর বুকে এ রকম এক খণ্ড পৃথিবীরও জন্ম হয়। এ সব পৃথিবীর পরমায়ুও হয় দীর্ঘ।

মৃণাল বলল, কি ভাবছিস? দু'দিন পর এখানে তুইও হাঁপিয়ে উঠবি। কোথায় রয়েছিস এখন!

বরেন বলল, জীবনের ধারা আমার সমানই আছে। মুসাফির জীবন এখনও যাপন করছি। যেখানে থাকি সে-খানেই বাসস্থান। বিরাট আকাশের তলায় স্থানের অভাব কি কিছু আছে ভাই। এই বলে সে হো হো করে হেসে উঠল।

মৃণাল দেখল, হাসির ভেতর তার আড়ষ্টতা নেই। চোখে মুখে খুসীর সুগভীর ছাপ। তার নিজের অবস্থার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

মৃণাল বলল, জীবনকে স্থায়ী করবি কবে?

বরেন বলল, বেশ আছি। প্রাণভরে নিশ্বাস ফেলতে পারি। চিরকালের অভ্যেস বাঁধন হারা হ'য়ে ঘুরে বেড়ান,—বাঁধা পড়লে তিলে তিলে মরে যাব। জীবনের পাতায় সীমা-বদ্ধ সংসারের ইতিহাস আমি লিখতে চাই না।

মৃণাল কথায় কথায় অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, তাকে বেরোতে হ'বে। অর্থের ভাণ্ডার তার নিঃশেষ। আলনা থেকে ছেঁড়া কোটটা নিয়ে গায় দিয়ে বরেনের দিকে চেয়ে বলল, চললুম, তুই ভেতরে যা, গৌরী আছে।

মাথার উপর উত্তপ্ত আকাশ, কড়া রৌদ্র, ছন্দহীন বিচিত্র জনতা। প্রশস্ত পথের উপর মৃণাল এসে দাঁড়াল।

পাশে এক ফালি উঠানের উপর চারিপাশ টিন ঘিরে একটা ছোট ঘর হয়েছে। ঘুমন্ত মিণ্টুর পাশে গৌরী তার অবসাদগ্রস্ত দেহটা এলিয়ে দিয়েছে।

বরেন ঘরের সামনে এসে ডাকল, গৌরী! কোন সাড়া না পেয়ে সে দরজা ঠেলে ভিতরে উঁকি মারল।

গৌরীর নিদ্রিত মুখের দিকে চেয়ে সে চমকে উঠল। এই কি তার সেই পরিচিত গৌরী। সে মুখের সঙ্গে এ মুখের ত কোন সাদৃশ্য নেই। শীর্ণ দীপ্তিহীন মুখ।

বরেন ডাকল, গৌরী!

গৌরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বসে মাথার কাপড় টেনে দিল। দু'হাতে চোখদুটি রগড়ে সে বরেনের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল,—বরেনদা আমাদের মনে পড়েছে? কেমন আছ!

বরেন দেখল গৌরীর হাসির ভেতরে লাবণ্যটুকু নাই, হাসবার সময় শীর্ণ চোয়াল দুটী বিকৃত ভাব ধারণ করে। নিষ্প্রভ চোখ দুটীর সে স্থৈর্য্য অন্তর্হিত হ'য়েছে। নিঃশেষিত যৌবনের সীমারেখায় সে।

—মানুষের এত পরিবর্ত্তন হয় গৌরী!

গৌরী দেখল বরেনের কোন রূপান্তরই হয়নি। গায়ের রংটা একটু তামাটে ভাব হ'য়েছে, দেহ হ'য়েছে ঈষৎ কৃশ।

বরেন বলল, আমি ভেবেছিলাম গৌরী, তোমাদের এসে

দেখতে পাব সুখ সমৃদ্ধির সব চেয়ে উচ্চ সোপানে। নির্ভাবনা, সুখ, সুস্থ দেহ, অপরিসীম শান্তির আবহাওয়ার মাঝে। কিন্তু এ কি!

গৌরী বলল ও ঘরে চল বরেনদা। আমাদের জীবনের যা কিছু প্রয়োজনের বস্তু এখন ঐ ছোট একখানা ঘরেই ধরে গেছে।

বরেন বাইরের ঘরে বসল। একটু পরে গৌরী মিণ্টুকে শুইয়ে দিয়ে বরেনের সামনে এসে বসল।

দীর্ঘ চার বছর পর তারা আবার সামনা সামনি বসবার সুযোগ পেল।

বরেনের কাতর দুটী চোখ গৌরীর মুখে নিবদ্ধ।

গৌরী হেসে বলল, এই দীর্ঘ চার বছর কোথায় ছিলে বরেনদা?

বরেন হেসে বলল, কোথায় ছিলাম না তাই বল গৌরী। কখনও আরাকানের দুর্গম জঙ্গলে, কখনও সাঁওতাল পরগণার সারি সারি গিরি তলে, কখনও পল্লীর স্নিগ্ধ শ্যামলতার মাঝখানে। জানত চিরকালই আমি ভালবাসি মুক্তিকে। লোকে বলে ভবঘুরে! আমার তাতে কিছুই যায় আসে না। পৃথিবীর কোন ইঙ্গিতকেই আমি গ্রাহ্য করি না। আমার ভেতর যেদিন পরিবর্ত্তন আসবে, সেই দিনই হবে আমার মৃত্যু!

গৌরী বলল, বস, আমি চা করে নিয়ে আসি।

বরেনের মনে পাঁচ বছর পূর্ব্বের একটী মধুর মুহূর্ত্ত জেগে উঠল।

এমনি একটি সময়ে বিস্তৃত বারাণ্ডায় বৈদ্যুতিক পাখার নীচে, বেতের দুটী চেয়ারে বসেছিল সে আর গৌরী। সামনে ছোট টেবিলে এক ঝাড় রজনীগন্ধা ও আরো বিচিত্র সাময়িক পুষ্প। অপূর্ব্ব সৌরভে উভয়েই আমোদিত। মৃণাল তখনও বাড়ী ফেরেনি। দু'জনার হাতে দু কাপ চা।

গৌরীর ছিপ ছিপে সুন্দর দেহ ঘিরে ছিল, ধূসর রঙয়ের পাতলা একখানা শাড়ী। সারা দেহে মনোরম স্বচ্ছতা। মুখে ফুটে উঠেছিল আকাশ বিস্তৃত খুসি, আশা, আকাঙ্ক্ষা। পল্লীর সন্ধ্যার মত চোখ দুটীতে সলজ্জ ভাব। চারিদিক ঘিরে ছিল একটা নীরব স্বচ্ছতা।

গৌরী বলল, সত্যি আমি খুসী বরেনদা। নারীর যা কিছু কাম্য সবই আমি পেয়েছি। কিন্তু তোমার মত নিষ্ঠুর লোক আমি দেখিনি।

বরেন হেসে বলল, কেন!

গৌরী হেসে বলল, কেন, জিজ্ঞেস করছ! বাবার সঙ্গে যখন আমি পুরীতে ছিলাম, সমুদ্রের বেলাভূমির উপর আমাদের কত সন্ধ্যা মধুর ভাবে কেটেছে বলত'। তোমার মধুর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে চারিপাশের লোক এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াত। একটা সন্ধ্যায় তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে শপথ করেছিলে, তোমার সঙ্গে রোজ একবার করে দেখা করব গৌরী। কোথাও আর পালিয়ে যাব না।

সে দিন ছিল আমার জন্ম-দিন, বুক ভরা উল্লাস নিয়ে ঠিক সেই সন্ধ্যার সময়টিতে তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ছুটে গেলাম সমুদ্রের ধারে।

কিন্তু কোথায় তুমি! সমুদ্রের বুকভরা ফেনিল উচ্ছ্বাস, দুর্দ্দমনীয় তরঙ্গ, বিস্তৃত বালুরাশি। একা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করলাম। অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠল, পৃথিবীর স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে বারিধির বিকট গর্জ্জন উর্দ্ধায়িত হতে লাগল। ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলাম বাড়ীতে।

বাবা বললেন, গৌরী, বরেন হঠাৎ চলে গেছে বম্বেতে, কবে ফিরবে কিছু ঠিক নেই।

অস্ফুট স্বরে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল! পাষাণ, নিষ্ঠুর! জানিনা বাবা শুনতে পেয়েছিলেন কি না।

আমাদের বিবাহের দিনও তুমি যখন এলে না, তখন প্রতিজ্ঞা করলাম, জীবনে তোমার মুখ দেখব না। উনি বলতেন, বরেন এলে বোল, বাড়ী ঢুকতে তাকে দেওয়া হবে না।

বরেন মৃদু হাসতে হাসতে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। তারপর বলল, এবার কোথাও আর যাব না গৌরী! মৃণালকে বলে তোমাদের এখানে একটা ঘর নিয়ে আমি থাকব। তোমার আপত্তি নেই'ত?

গৌরী দুষ্টামির হাসি হেসে বলল, খুব আপত্তি আছে। মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক লোককে বাড়ীতে স্থান দেওয়া কোন মতে যুক্তিসঙ্গত নয়।

বরেন গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, আমার ভেতরে এক উন্মাদ আছে, তার মাঝে মাঝে খেয়াল হয়। এবার তাকে আমি হত্যা করব। এক পা আমি আর এখান থেকে নড়ব না।

গৌরীর চোখে মুখে শান্ত লাবণ্যশ্রী। সন্ধ্যা-দীপের মত পরিপূর্ণ পবিত্রতা।

সহসা গৌরীর ডাকে তার চমক ভাঙল।

ক্ষীণ হাসি হেসে বিবর্ণ মুখখানা বরেনের দিকে ফিরিয়ে গৌরী বলল, চা খাও বরেন দা। দেরী করলে বাটী খালি হয়ে যাবে। দু' জায়গায় ফুটো আছে।

স্বপ্ন ভাঙ্গা চোখদুটী গৌরীর মুখের দিকে ফেলে বরেন কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে রইল। সেই মুহূর্ত্তের সঙ্গে আজকের এই মুহূর্ত্তের কি রূঢ় পরিবর্ত্তন। গৌরীর সঙ্গে সে দিনের গৌরীর কি অকরুণ সাদৃশ্য। বরেনের চোখ দুটী জলে ভরে উঠল।

গৌরী বলল, এত দুর্ব্বল তুমি বরেনদা। তুমি কাঁদছ? গৌরীর স্বর দৃঢ়।

বরেন বলল, আজ দেখছি, সত্যি আমি তোমাদের চেয়ে দুর্ব্বল গৌরী।

গৌরী বলল, এই সংগ্রামে জয়ী হ'তে পারলে তবেই'ত বাঁচার সার্থকতা।

বরেন নির্ব্বাক।

দীপ্ত রৌদ্রে পথের মাঝে মৃণাল খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার আজন্ম লালিত আশা, আজ সমাধিস্থ, ভবিষ্যতের উদার কল্পনা আজ ধূলিসাৎ। ভাবল, কোথায় আজ সে যাবে। প্রাপ্য হবে'ত তার ঘৃণা, অপমান। মিণ্টুর মুখখানা তার মনের মাঝে ফুটে উঠল, পবিত্র কোমল সে মুখখানা। তার কি হবে। হয়ত আরো কিছুদিন পর, তার চোখের সামনে ঘুরবে রুগ্ন কঙ্কালসার একটী ছেলে, মুখে চোখে লোভী ক্ষুধাতুরের ছাপ। তার বুকের ভেতর একটা তীব্র বেদনা উঠল। বুকখানা দু'হাতে চেপে ধরে সে চলতে সুরু করল।

রৌদ্রে দগ্ধ অনাহার ক্লিষ্ট বিবর্ণ মৃণাল এসে দাঁড়াল বিনয়ের বিরাট অট্টালিকার সামনে।

পোষাক পরা তকমা আঁটা পশ্চিমা দরওয়ান, তার দিকে একবার কটাক্ষপাত করে মুখখানা ঘুরিয়ে নিল।

মৃণাল দেখতে গেল, ড্রয়িংরুমে বিনয় বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে বসে আছে। দরওয়ানকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে ড্রয়িং রুমের ভেতর ঢুকল। সোজা বিনয়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

বিনয়ের মাংসবহুল মুখে পরিপূর্ণ আরাম ও আলস্যের ছাপ। মৃণালকে দেখে খুব তাচ্ছিল্য ভরে বিনয় মুখখানা ঘুরিয়ে নিল। ছিন্ন পরিচ্ছদ, তাম্রাভ ঘর্ম্মাক্ত দেহ, মৃণালকে নাসিকা কুঞ্চিত করে বিদ্রূপের স্বরে বিনয় বলল, রাজা হরিশ্চন্দ্র যে। অসময় এখানে?

কঠিন শিলাখণ্ডে চিড় খাওয়ার মত হাসি হেসে মৃণাল বলল, না এসে থাকতে পারলাম না বিনয়।

ব্যঙ্গের স্বরে বিনয় বলল,—এত কৃপা। নিশ্চয় একটা মতলব আছে,—কি বল হে?

মৃণালের সমস্ত দেহটা রাগে থর থর করে কেঁপে উঠল। মুহূর্ত্তের জন্য কোটরগত চোখ দুটী জ্বলে উঠল। কম্পিতস্বরে সে বলল, একদিন আমি তোমায় কৃপা করেছিলাম ভাই, নিশ্চয় তুমি ভোলনি? আজকে আমি সত্যই তোমার দয়া পাবার জন্যে এসেছি।

বিস্ময় ও ধমকের সুরে বিনয় বলল, তোমার সাহস দেখে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। কি রকম ভাবে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে হয় তুমি জান না। তোমার কাছে কৃপা প্রার্থনা করবার প্রয়োজন আমার কোন দিন হয়েছিল বলে মনে হয় না। আমার পদ মর্য্যাদা আছে,—একজন হেয় অভদ্র...

দৃঢ় কণ্ঠে মৃণাল বলল, পাঁচ বছর আগে আমারই কাছে তুমি করযোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলে, মিনতি-ভরে আমার কাছে হাজার টাকা ভিক্ষে চেয়ে ছিলে। অস্বীকার করবার চেষ্টা কোর না বিনয়।

রূঢ় কণ্ঠে বিনয় বলল, মিথ্যাবাদী, অভদ্র, এখুনি তুমি বাড়ী থেকে বের হ'য়ে যাও। না হ'লে...।

বিকট হাস্যে মৃণাল বলল, না হ'লে মিথ্যাবাদীর উপর বল প্রয়োগ করে ঘাড় ধরে বার করবে, কি বল?

ক্ষণকাল সে বিনয়ের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শিথিল মাংসপেশী দৃঢ় হয়ে উঠল,—তামাটে মুখ হ'য়ে উঠল ঘোর রক্তবর্ণ, চোখ দুটী হয়ে উঠল আগুনের গোলার মত জ্বলন্ত।

সে মূর্ত্তি দেখে বিনয় শিউরে উঠে বলল, এখনও দাঁড়িয়ে আছ! যাও!

ক্রোধকম্পিত স্বরে মৃণাল বলল, যাচ্ছি, যাবার আগে..!

সহসা বিনয়ের কণ্ঠ সে সজোরে চেপে ধরল। তারপর বলল,—টাকা আমার এখুনি চাই শয়তান।

প্রাণপণ শক্তিতে বিনয় মৃণালের হাতখানা সরাবার চেষ্টা করল। দানবের মত সে হস্ত তখন দৃঢ়! ভয়ার্ত্ত স্বরে সে আর্ত্তনাদ করে উঠল।

মৃণাল এক হাতে তার গলা চেপে ধরে অপর হাত তার জামার পকেটে পুরে একতাড়া নোট বার করে নিয়ে নিজের জীর্ণ কোটের পকেটে রাখল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সজোরে তার মাথায় কে লাঠি দিয়ে আঘাত করল। তার মনে হ'ল, সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হ'য়ে আসছে, চোখের সামনে থেকে উজ্জ্বল দিবালোক ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হ'চ্ছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করল। তারপর কি হ'ল আর সে জানে না।

পৃথিবীর বুকে গভীর অন্ধকার নেমে এসেছে। মুখর কলিকাতার কোলাহল অন্তর্হিত হ'য়ে চারিদিক নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করেছে। মৃণালের ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে এল।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, অসহ্য যন্ত্রণা তখনও রয়েছে, সারা দেহ দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে মৃণাল বুঝল বিনয়েরই ড্রয়িংরুমে একখানি খাটের উপর সে শুয়ে আছে। ঘরের দরজা সামনে খোলা। শয্যা ছেড়ে সে উঠল, তারপর টলতে টলতে ঘর থেকে সে বেরিয়ে রাস্তার উপর এসে দাঁড়াল।

মাথার উপর নক্ষত্রালোকিত উদার আকাশ। প্রশস্ত নির্জ্জন পথ। মৃণাল পকেটে হাত দিয়ে দেখল, নোটের তাড়াটা নেই, তবে দশ টাকার দু'খানি নোট তার পকেটে রয়েছে।

মনটা তার আনন্দে নেচে উঠল। নোট দু'খানা হাতের মুঠোতে চেপে ধরে বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগল।

বাড়ীর দরজার সামনে ক্ষণমুহূর্ত্ত সে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, ভেতরে হয়ত অপেক্ষা করছে আগ্রহান্বিত দুটি ছোট বাহু, একটি কচি মুখ, আধস্বরে আব্দার। রিক্তা গৌরী! শীর্ণ মুখ, কোটরাগত দুটী করুণ চোখ!

অকরুণ গৌরী,—দারিদ্র নিপীড়িত কাঠিন্য! যতই সে কর্কশ হোক, মমতাহীন হ'য়ে যাক, তাকে ভালবাসে পূর্ব্বের মতনই। বরেনও হয়ত এখনও আছে।

মাথার ভেতর সে আবার তীব্র যাতনা অনুভব করল। সজোরে সে দরজায় ধাক্কা দিল,—দরজা খুলে গেল।

ঘরের কোণে প্রদীপের স্তিমিত আলো। মাঝখানে অনাহারক্লিষ্ট সজল চোখে বসে আছে গৌরী, সামনে বরেন, —ঘুমন্ত মিণ্টুর গালে তখনও কয়েক ফোঁটা অশ্রু ক্ষীণ আলোকে চিক্ চিক্ করছে।

গৌরীর বিস্ফারিত সজল চোখ তার প্রতি ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্য নিবদ্ধ হ'ল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে গৌরী দেখল, মৃণালের চোখে-মুখে রক্তের দাগ, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, রক্তের আধিক্যে সেটাও হয়ে গেছে গাঢ় লাল। কোট হয়েছে শত ছিন্ন, শীর্ণদেহের অনাবৃত কিয়দংশ দেখা যায়।

তীব্র স্বরে গৌরী আর্ত্তনাদ করে ছুটে এসে মৃণালকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরল।

উত্তেজিত ও ব্যথিত স্বরে মৃণাল বলল,—হাতে টাকা আছে নাও, মিণ্টুর জামা কাপড় কেনা হবে। বন্ধুর কাছে গেছলাম, দারিদ্র-অপরাধের জন্যে কঠোর শাস্তি পেয়েছি।

স্বর তার কেঁপে উঠল। তারপরই চেতনা বিলুপ্ত হ'ল।

মূর্চ্ছিত দেহটা গৌরী সজোরে বুকের মাঝে চেপে ধরল। তারপর অস্ফুট স্বরে শুধু বলল,—আমায় ভুল বুঝো না।

* * *

ঘরের কোণের একটা ছিদ্র থেকে নক্ষত্রালোকিত আকাশের কিয়দংশ দেখা যায়। নিস্পন্দ নির্ব্বাক বরেন সেই দিকে চেয়ে থাকে। সেখানে আকাশের কোন বর্ণান্তরই হয়নি।

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

জীবনের জয়যাত্রায়

শ্রীকালীচরণ মিত্র

নিছক কল্পনার বিলাস? হয় ত। কিন্তু নয় কি একান্ত বাঞ্ছিত এই ত্রয়ী অনাদিকাল হইতে—চির যৌবন, অমরত্ব ও পরশ-পাথর?

পরশ-পাথর খুঁজিয়া হয়রাণ নর-নারী প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে। শেষে কামধেনু মুনিঋষির স্কন্ধে চাপাইয়া কবি খালাস। সোনার কাঠির স্পর্শে মরামানুষের প্রাণের স্পন্দন জাগে, স্পর্শমণির ছোঁয়াচ লাগিলে বিলকুল সব সোনা। সন্ধানী অচেনা পাথরের অভিযানে সদাই উন্মুখ এখনও। ক্ষ্যাপা খুঁজে মরে পরশ-পাথর।

কাহার না সাধ অমর হইবার। ভবের খেলায় সম্ভাবনার সীমার বাহিরে উহা—বুঝিয়া মানুষ কল্পলোকে অমরাবতীর সৃষ্টি করিল। এই মানুষই মরিয়া ভূত-প্রেতিনী হয়, আবার দেবলোকে অমর বনিয়া যায়। বসুন্ধরার বহুলাংশ জুড়িয়া এই মতবাদের প্রবল প্রচার। কিন্তু অমরত্ব 'যে তিমিরে সেই তিমিরে।' অনেক দুঃখেই অভিজ্ঞ কবির কাতরোক্তি —"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে?"

বাকি রহিল চির-যৌবন লাভ। সত্যেন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন,—'যৌবনে দাও রাজটীকা।' এই যৌবনকে চিরস্থায়ী দেখিতে কাহার না বাসনা? বিচিত্র কি, যযাতি রাজা আত্মজেরও কাছে যৌবন যাচঞা করেন; যৌবন পুনর্লাভের দুর্দ্দমনীয় অকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক বৃদ্ধ ভূপতি। জগতের সেরা কবি গেটে রচিত ফাউষ্ট পালা। মনীষী ফাউষ্ট সয়তানের সঙ্গে চুক্তি করেন আত্ম-বিক্রয়ের—যৌবন প্রাপ্তির বিনিময়ে। কিন্তু সেই গল্পও ম্লান হইয়া যায় পৌরাণিক কাহিনীর পার্শ্বে। চেতনারূপী প্রাণ-পাখীটা উড়িয়া গেল, পড়িয়া রহিল খাঁচা; এই খাঁচা বা কায়াকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞানে মিশরীয়েরা 'মমি' প্রস্তুত করিত। হউক প্রাণহীন, তবুত সুন্দরীর সেই মুখ, সেই চোখ, সেই অবয়ব, রূপ—যৌবন; হইলই বা পুত্তলী নির্ব্বাক।

বিজ্ঞান আলোকচিত্র সাহায্যে মানবের আলেখ্য স্থায়ী করিয়াছে, গ্রামোফোনে স্বর ও শব্দ ধরিয়াছে, এখন চেষ্টায় আছে বার্দ্ধক্যের ক্ষয় ও লয় নিবারণের। বার্দ্ধক্যের ছাপ লাগিবার পূর্ব্বে যৌবনসীমা অতিক্রমের সীমান্ত রেখায় দাঁড়ি টানিতে প্রয়াস, যৌবনের সক্রিয় যত দেহযন্ত্রকে অক্ষয় বাঁধনে বাঁধিতে প্রাণপণ যত্ন। সেই বিচিত্র বিবরণ নিম্নের আলোচনায়।

রজনীগন্ধার কুসুম-সম্পদ বাড়াইতে হইলে চাই কি? প্রশ্ন করিলেই পাকা মালী উত্তর দিবে—মাটী হইতে মূল উপড়াইয়া রাখ খর রৌদ্রে, দিনের পর দিন মাসের পর মাস রৌদ্রস্নানে 'আমসী' হইয়া গেলে রোপন কর সেই শুক্না মূল আবার মৃত্তিকায় বর্ষার ধারায়, ঝাড়ে ঝাড়ে ডাঁটায় ডাঁটায় কুঁড়ি ধরিবে অসংখ্য, মিঠা গন্ধে আকাশ বাতাস ভরিয়া দিয়া অরসিককেও কবিত্বের বন্যায় প্লাবিত করিয়া তুলিবে।

শুধু রজনীগন্ধা কেন, এমন অনেক উদ্ভিদই উক্ত নিয়মের বশে। প্রাণী-জগতেও সেই রীতি পদ্ধতি না খাটিবে কেন? খাটিয়া যে থাকে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 'কেঁচো' ভেক সর্প-প্রমুখ জীব (arthropoid tardigradum) রৌদ্রদগ্ধ করিয়া লইলে উহাদের অন্তর্নিহিত রসসঞ্চারিনী শক্তির ক্রিয়া বন্ধ থাকিয়া যায়। Metabolismএর কথাই বলিতেছি। শারীরিক যে ক্রিয়া দ্বারা দৈহিক সজীব মূল পদার্থ সমূহ শোণিত হইতে স্ব স্ব পুষ্টি সাধনের দ্রব্যাদি গ্রহণ করে তাহারই নাম মেটাবলিজম্। উহা বন্ধ হইয়া গেলে সুপ্ত জীবন সংরক্ষিত হয়। এই সুপ্ত জীবনকে যৌগিক ভাষায় সমাধিস্থ বা সমাহিত অবস্থা বলা চলে। প্রাণ-বায়ু অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তখন শুম্ভিত থাকে। রৌদ্র-দগ্ধ জীবগুলিকে কিছুদিন পরে জলসিক্ত করিলে মৃতসঞ্জীবনের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, ক্রমশঃ তাহারা পুরাপুরি পুন-

জীবিত হইয়া স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে।

ঐ প্রণালীতে মানুষকেও সহস্রায়ু করা সম্ভব। দীর্ঘ-কালের মত কৃত্রিম উপায়ে চেতনার লোপ করিতে হইবে, অচৈতন্য অবস্থায় 'গুদামজাত' করিয়া রাখিতে হইবে কতক বৎসর, আবার উদ্বোধিত করিয়া সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে হইবে। এই ভাবে কিছুকাল চলিল; যেমনই ক্ষয়ের চিহ্ন প্রকাশ সুরু হইল, আবার ওইরূপে লুপ্তচৈতন্য করিয়া নর-নারীকে ফেলিয়া রাখা আবশ্যক, কিছু কাল পরে পুনরায় পুনরুজ্জীবন প্রণালীর প্রয়োগ। এই প্রকারে রূপযৌবন অটুট রাখিয়া নরনারীকে শত শত বৎসর বাঁচাইয়া রাখা বিচিত্র নয়।

তারপরে এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন ডাক্তার এলেক্সিস কেড়েল খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে—মার্কিণ নিউ-ইয়র্ক একেডেমি অফ্ মেডিসিন্ সভায়। প্রবন্ধের নাম—'মৃত্যু-রহস্য', সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে 'নিউইয়র্ক টাইম্স্' পত্রিকায়। ডাঃ কেড়েল পৃথিবীপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ ও নোবেল প্রাইজধারী।

সেকালে গুরুজনের আশীর্ব্বচন—শতায়ু হও, এখন হইতে হইল সহস্রায়ু। ডাঃ কেড়েল বলিতেছেন—প্রকৃতি ও বিজ্ঞান উভয়েই হৃতচেতনার অবস্থা বিধান করে। আপাততঃ অতি-বিজ্ঞেরা কথাটা শুনিয়া বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার হাসি হাসিলেও দুইদিন পরে যে ইহা বাস্তবের কোঠায় ধরা না দিতে পারে, কে বলিবে! উড়ো-জাহাজ প্রভৃতির আদিম ইতিহাস স্মরণ করিলেই মনের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যাইবে।

এই সঙ্গে সাহেব rejuvenation বা দৈহিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। বলেন,—কায়িক গ্রন্থি অপসারণে ও অপরের (মানব বা বানর আদির) গ্রন্থি সংযোজনে মৃত্যু নিবারণ না হউক, স্থগিত করা যে চলে তাহার দৃষ্টান্ত আজকাল বিরল নয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে বৃদ্ধকে যুবকে, যুবককে বালকে রূপান্তরিত করা সম্ভব। অন্তর্গূঢ় রস-নিঃসরণ গ্রন্থি (Endocrine Gland) যদি জরাগ্রস্তের অঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার রক্তের রসভাগ যথাযথ প্রস্তুত সমাবেশক শোণিতরসে বারবার সিক্ত করা হয় তাহা হইলে বৃদ্ধেরও পক্ষে যৌবনের অথবা যে-কোন বয়সের অনুরূপ অবস্থা লাভ ঘটিতে পারে। কর্ণেল চার্ল্স্ লিণ্ডবার্গ রকফেলার ইন্‌ষ্টিটিউটে এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যন্ত্রটি কাচের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস, ইহাতে স্বাভাবিক শোণিতের অনুকরণে কৃত্রিম রক্ত (Synthetic Blood) চলাচল হইতেছে। এই জীবনী-কক্ষে গ্রন্থি, মূত্রাশয়, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি জীবন্ত অবস্থায় কাজ করিতে থাকে—মানব-দেহে যেরূপ, ঠিক সেই ভাবেই। মৃত্যু নিবারণ কল্পে যে চারিটি প্রণালীর একান্ত প্রয়োজন এই যন্ত্রে সেই সমস্তই নাকি বর্ত্তমান।

পরমায়ু বৃদ্ধির গৌণ সহায়ক—বিশিষ্ট পৈতৃক ধারা, খাদ্যাদি, জীবনযাত্রার রীতিনীতি ও মানসিক ভাব। এই সকল বিষয়ের বিচার জটিল, সূক্ষ্ম গবেষণার এখনও শৈশবাবস্থা। কত বিতর্কে যুগযুগান্তে সকল তথ্যের নির্ণয় হইবে, বলা কঠিন।

মৃত্যুর জয় সম্ভব কি না,—মুখ্য প্রশ্ন এই। সম্ভব যে তাহা এখন প্রমাণসিদ্ধ। জন্মগ্রহণের পর হইতে শিশুর দেহে গঠনের ও বৃদ্ধির বিধিব্যবস্থা যেমন সুস্পষ্ট, ক্ষয় ও লয়েরও তেমনই—ভ্রূণের মধ্যেও বৃদ্ধের মৃত্যুবাণ জাজ্জ্বল্যমান। পেশীতে রুধিরে রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ অবিশ্রান্ত, তাহাতে যেমন শারীরিক উত্তরোত্তর বৃদ্ধির তেমনই জরা ও মৃত্যুর নিত্য ক্রিয়া। অনুমান হয়, কালক্রমে নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে দৈহিক পুনর্গঠনের নানা পন্থা হয়ত আবিষ্কৃত হইতে পারে। সাহেব দৃঢ়তার সহিত ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিতেছেন যে মৃত্যুঞ্জয়ের দিক দিয়া মানবের সংগ্রাম বহুলাংশে জয়মণ্ডিত হইবে নিঃসন্দেহ, বৃদ্ধের যৌবনলাভ সহজ সম্ভাবনার সীমায় আসিতে বাধ্য।

কিন্তু আসল কথা এই, কিসের এত ত্রাস? আশীর্ব্বাদ না হউক, বিপত্তিও ত নয় মৃত্যু। ইহজীবনের অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য বিধান—মৃত্যু। জনসংখ্যার বাহুল্য প্রতিরোধ করে ইহা, অতিরিক্ত প্রজার ভিড় দেয় কমাইয়া। তাহাতেই না বৃদ্ধের বোঝা নামিয়া আসিয়া তরুণের স্থান সংকুলান করে, প্রয়োজন মত আহার্য্য যোগান দেয়। কে দিল মৃত্যুকে বীভিষিকার রূপ? "উপরি"-আপদ বলিয়া মৃত্যুকে গণ্য করা অকারণ নয় কি? আমাদেরই যে অংশবিশেষ উহা—

ভ্রূণের ছাঁচের আদিতেও বর্ত্তমান। মৃত্যু-বীজ পেশী ও শোণিতের ভিতর সর্ব্বদাই ক্রিয়মান, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা অপেক্ষা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বে এবং শৈশবকালে বেশী কর্ম্মঠ। সাহেবের মতে মৃত্যু নিবারণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত যদি কখন নাও হয়, উহাকে পিছাইয়া দেওয়া, শত শত বৎসর নরনারীকে বাঁচাইয়া রাখা ও অটুট যৌবন রক্ষা ইন্দ্রজালের কুহক নিশ্চয়ই নয়—আধুনিক বিজ্ঞানের দপ্তরে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন।

সাহেবের প্রিয় বাক্য সত্য হইলেই মঙ্গল—অবিশ্বাসী এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইবেন, মৃত্যুর সংস্কার যে মজ্জাগত। ইহা ত অস্বীকার করিবার যো নাই যে, ঘুরিয়া ফিরিয়া মৃত্যুর ভয়াল রূপ আমাদের মনের কবাটে ধাক্কা দেয়। প্রত্যেকেরই কাছে অথচ মৃত্যুর রূপ ভিন্ন, অর্থও বিভিন্ন। চলতি সংজ্ঞায় অতি সাধারণ নিরানন্দ দিবসের অবসান এই মৃত্যু। কাহারও মতে গিরিশৃঙ্গে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিপূর্ণ শান্তি তাহাই মৃত্যুর সহিত তুলনীয়। কাহারও বা কাছে রণোন্মাদনার পরে বীর পুরুষের সম্পূর্ণ বিশ্রাম ইহা। বিশিষ্টস্থলে পরমেশ্বরে বিলয়, বৌদ্ধমতে পরিনির্ব্বাণ। জন্মমৃত্যুর রহস্য কোন মহামানব কোনদিন হয়ত সমাধান করিতে সক্ষম হইবেন, কে জানে! তবে মৃত্যুর ভয় যে শুধুই মানসিক বিকার ইহা প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত।

সাহেব বলেন,—মৃত্যুর পর সমগ্র চিত্তের বা আংশিকভাবে মনের এবং আত্মারও বাঁচিয়া থাকা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, অথচ এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের এখনও একান্ত অভাব, তবে প্রমাণ নাই বলিয়া ইহা যে অসম্ভব এমন কথা জোর গলায় জাহির করিবার অধিকার কাহারও নাই।

কেড্রেল সাহেবের শেষ কথা—মৃত্যুঞ্জয় আদৌ মনুষ্যের করায়ত্ত হইবে কিনা নিকট ভবিষ্যতে অথবা সুদূরে, সে সম্বন্ধে বহু জল্পনা-কল্পনা ও যুগান্তরব্যাপী সাধ্যসাধনার প্রয়োজন, কিন্তু শত শত বৎসর নরনারীকে বাঁচাইয়া রাখার ও অটুট যৌবন রক্ষার দিন যে সন্নিকটে এই কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়।

ইহাই জীবনের জয়যাত্রা নয় কি? কাহার পক্ষে?—জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন এই। অসুখী যে, দুঃখের পসরা যাহার শিরে, অস্বস্তি ও অশান্তি যাহাকে ঘেরিয়া তাহার পক্ষে নিশ্চয়ই নয়! কিন্তু সুখী যে, ধরণীর শ্রীসম্পদ, কায়িক স্বাস্থ্য ও মানসিক তৃপ্তি যাহাকে বেড়িয়া, ভোগবিলাসের স্পৃহা যাহার অশেষ, তাহার পক্ষে জয়যাত্রা অবশ্যই। পরবর্ত্তী প্রশ্ন হয়ত—কয়জন এই কোঠায় পড়ে? —'কোটিকে গোটিক?' হউক; হাসিতে যাহারা আসিয়াছে হাসুক তাহারা সাহেবের বর্ণিত শত শত বা সহস্র বর্ষ—'ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা এই বসুন্ধরা' যে তাহাদেরই জন্য, তাহাদের জয় হউক।

শ্রীকালীচরণ মিত্র

দার্জ্জিলিঙ পাহাড়

অগ্নিমিত্র

দার্জ্জিলিঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে বসলে অনেকের কাছে সেটা হয় তো কলকাতা ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মত হাস্যকর ঠেকবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কলকাতার এত কাছের এই স্বপ্নরাজ্য সম্বন্ধে অপরিচয় এত বেশি লোকের যে, ইচ্ছে করে যতটা সম্ভব কথায় ও রেখায় এর 'স্বাদগন্ধ' জ নিয়ে দিই।

এটা কৃতজ্ঞতার ঋণ। পাহাড়ের বুকের যে-ইন্দ্রপুরী ছবি দিয়ে, সুর দিয়ে,—কত অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্ত দিয়ে, পাইনের মর্ম্মর ও ঝরণার কলস্বর দিয়ে কতবার আতিথ্যে মুগ্ধ করেচে, তার পরিচয় ছন্দ দিয়ে বা তুলি দিয়ে দিতে পারলে তবে উপযুক্ত হতো।

মনে পড়ে প্রথমবার দার্জ্জিলিঙ যাওয়ার কথা। পাহাড়ের পরিচয় হল শিলিগুড়িতে ট্রেণ পৌছবার আগেই। প্রথমে মেঘ বলে ভুল করেছিলাম, যতই কাছে এগিয়ে এলাম, বুঝতে পারা গেল, আকাশের বুকে এ জলদমালা নয়,—পর্ব্বতমালা, মাটী যেন তরল হয়ে উঠে আকাশে তরঙ্গ তুলে ধরেচে।

শিলিগুড়ি থেকে হিমালয়'ন রেলপথে ৫৫ মাইল চড়াই পথে দার্জ্জিলিঙ। প্রথম দশ মাইল প্রায় সমতল ভূমি,—তারপর সুকনা ষ্টেশান। এখান থেকে প্রকৃত পর্ব্বতারোহণটা সুরু হয়।

আমার মতে এই আরোহণটাই দার্জ্জিলিঙ যাওয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আনন্দ। ছোট গাড়িটা একটা প্রকাণ্ড সরীসৃপের মত আঁকা বাঁকা পথে সর্পিল ছন্দে চলেছে উপরের দিকে। বনের পর বন চলেছে, বলিষ্ঠ শালগাছের অন্ত নেই। মনে হচ্ছে, এই সুন্দর পাতার গন্ধ ভরা অরণ্যানীতে লুকোচুরি খেলে চলেছে, গাড়িটা। তারপর অকস্মাৎ একবার চেয়ে দেখি পাহাড়ে অনেকটা উঠে পড়েছি, নিচে দেখা যাচ্ছে, এদিকে চায়ের বাগান আর ওদিকে সমতল ভূমিতে মহানদী একটা রূপালী রেখার মতন।

একটু একটু শীত করচে। ফগ এসে লাইনের সামনের দিক শুভ্র অস্পষ্টতায় ঢেকে দিলে। মনে হল ট্রেণটা অতলে

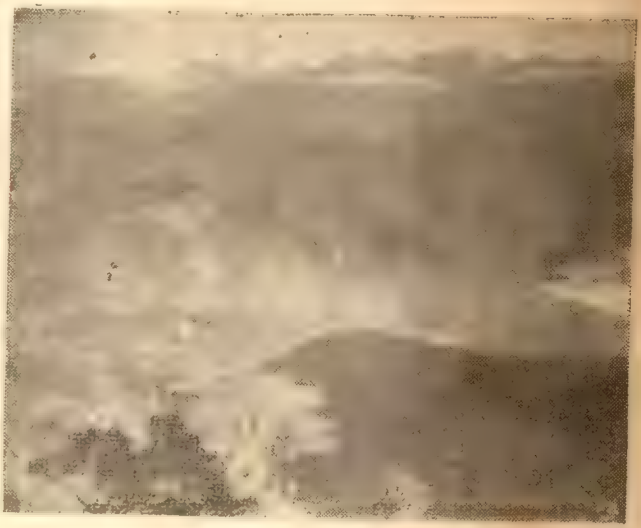

বার্চ্চহিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য

গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবার। তারপর দেখা গেল, অপূর্ব্ব এক তরুবীথিকার মধ্য দিয়ে এঞ্জিনটা ফোঁস ফোঁস করতে করতে আমাদের বয়ে নিয়ে যাচ্চে। কার্ট রোড দিয়ে একটা মোটর এগিয়ে গেল। পাহাড়ের ছোঁয়া লেগেচে ওর আরোহী-দের চোখে মুখে,—হাত নেড়ে তারা হেসে জানিয়ে গেল—'তোমাদের হারিয়ে দিয়েছি।' আমরা মনে মনে বল্লুম—এই ছবির রাজ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে চাইনে।

ছবি, ছবি,—সর্ব্বত্র ছবির ছড়াছড়ি। ধরণীর কত যে

বিচিত্র ভঙ্গিমা হতে পারে, কত মধুর হ'তে পারে অরণ্য, কত মনোরম হতে পারে তরুবীথি, তার পরিচয় পেতে পেতে চলেছি। চমৎকার মধুর শীত লাগচে,—সম্পূর্ণ পাহাড়ী আবহাওয়া দেখা দিয়েচে, বাংলাদেশের আবহাওয়া ছেড়ে নতুনতর এবং মধুরতর আবহাওয়ায় এসে পড়েছি, তাতে আর সংশয় রইল না। কার্ট রোডে যে পাহাড়ীরা চলেছে, এই আবহাওয়ায় সুন্দর তারা খাপ খেয়েচে। ট্রেন দুয়েক জায়গায় পাহাড়ের এত কিনার ঘেঁষে যাচ্চে যে শিউরে উঠতে হয়। উপরে তাকিয়ে দেখি বনানীর শিখরে এঞ্জিনের ধূয়ার মত কি সব লেগে রয়েচে। প্রথমে বুঝতেই পারিনি' এরা মেঘ।

ম্যাল-এ চৌরাস্তার দৃশ্য—দার্জ্জিলিঙ্

তারপর গাড়ি আবার মোড় ফিরতেই হঠাৎ একটা রূপালী ঝরণা এক পাহাড়ের থেকে লাফিয়ে পড়ে কোথায় নিচে পালিয়ে গেল।

আলোছায়ার ভিতর দিয়ে চলেছি। ফগ-মাখা কত দৃশ্য, রৌদ্রলিপ্ত কত সুন্দর পাহাড়, পাইন-ঢাকা কত বীথিকা, কত দুষ্ট ঝরণা চোখের সামনে দিয়ে চলচ্চিত্রের মত ছুটে চলেছে। কত বিচিত্র এঞ্জিনিয়ারিং কৌশল করা হয়েচে ট্রেনের পাহাড় চড়া সম্ভবপর করবার জন্য। একবার বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখি, সুদূর হিমাদ্রির একটা শৃঙ্গ—গলান রূপার মতন চক চক করে' উঠেচে। কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়।

তারপর এক সময় কার্শিঙও ষ্টেশানে ট্রেন উপস্থিত হয়। ময়লা বিচিত্র পোষাকপরিচ্ছদপরা ফর্শা হৃষ্ট সব পাহাড়ি মেয়েরা কাঁসার বাসনে চা ঢেলে বিক্রি করতে এসেচে। কেউ বা ফল বেচতে এসেচে। কোনও জন্মে ওদের কাছ থেকে চা কিনে খাইনি, কিন্তু কার্শিয়ঙের ছবি কল্পনা করতে হলে ওদের বাদ দেওয়া যায় না।

ষ্টেশানে পৌঁছবার আগেই ছোট ছোট অনেকগুলি সুন্দর হোটেল চোখে পড়ে। প্রায় সবগুলিই য়ুরোপীয়ন্ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। তবে দামও তাতে বেশী নয়, আর সবাই গিয়ে থাকতে পারে। একজন বন্ধু এমন একটা হোটেলে ছিলেন। 'কোন্ হোটেলটায় আছ?'—একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। 'যে হোটেলের ল্যাণ্ডলেডীর চাইতে, বুঝতে পারলি' জবাব হল, 'তার কুকুরটা সুন্দর, আছি সেই হোটেলে।'

চুপচাপ সহরটি কার্শিঙও। হিমালয়ান্ রেলওয়ের হেড অপিস এখন কার্শিয়ঙে। কতগুলি বিখ্যাত ইস্কুল প্রভৃতি আছে। বাজারের মধ্য দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। বড় বড় সব দোকানই মাড়োয়ারীদের। একটা সিনেমার বাড়ি আছে। পাহাড়ের গায়ে দূরে দূরে ছড়ান চমৎকার বাংলোগুলো। যারা নির্জ্জনতা ভোগ করতে চায়, এমন অনেকে দার্জ্জিলিঙের চাইতে এই মহকুমা-সহরটি বেশি পছন্দ করেন। কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখা যায়, আবার নিচের সমতল ভূমিও চোখে পড়বে। শীত দার্জ্জিলিঙের চেয়ে কম। জনতা কম এবং সেই কারণে বাড়ি ভাড়াও কম।

তারপর শৈলপথে আরো চলে এসে একসময় এক কুয়াসার রাজ্যে ট্রেন থামল। ঘুম ষ্টেশান। এখান থেকে ট্রেন কিছু নিচে নেমে দার্জ্জিলিঙ প্রবেশ করে। ঘুম্-এ এসে একসঙ্গে বেশি দিন কখনো থাকিনি,—অথচ এই ছোট্ট নির্জ্জন জায়গাটা বড় ভালো লাগে। একসঙ্গে পাঁচ মিনিট ঘুম্‌কে কখনো পরিস্কার দেখিনি। রৌদ্র-দীপ্ত দিনেও

অহরহ ফগ্ ঘনিয়ে এসে এক রহস্যলোকের সৃষ্টি করে দিয়ে যায়। এমন পরিবর্তনশীল চেহারা দার্জ্জিলিঙেরও নয়।

য়ুরোপীন্ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কটা বিখ্যাত হোটেল এখানে আছে। এগুলিতে অপেক্ষাকৃত সস্তায়ও থাকা যায়। অনেক নির্জ্জনতাবিলাসী ভারতীয়ও এখানে এসে বাস করেন।

এই পাহাড়ী গ্রামটার একটা নিজস্ব রূপ আছে। এখান থেকে রিজার্ভ ফরেষ্টের পাইন-ঢাকা চমৎকার পথে সিঞ্চল লেকে যাওয়া যায়। সেখান থেকে দার্জ্জিলিঙের কলের জল সরবরাহ হয়। ঘুম্ থেকে টাইগার হিল্-এ গিয়ে প্রত্যুষে এভারেষ্টে সূর্য্যোদয় দেখতে হয়। তাগদার পাহাড়ী বস্তিতে ঘুম্ হয়েই যেতে হয়, আর কালিমপঙেও যাওয়া যায়।

ঘুম্-এ আমার কাছে মস্ত আকর্ষণ একটি বৌদ্ধ বিহার। পোষ্টাপিসের সামনে দিয়ে ভুটিয়া বসতি পার হয়ে যে রাস্তাটা গেছে, তা দিয়ে আধ মাইল

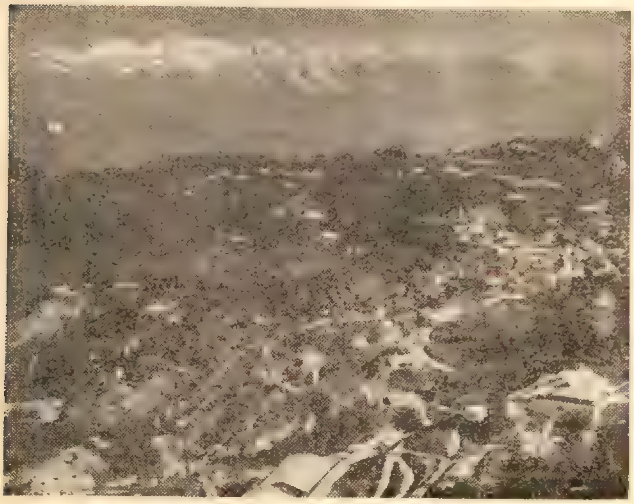

উড্ল্যাণ্ড থেকে দার্জ্জিলিঙ্

আন্দাজ গিয়ে এই বিহার। এখানে ভগবান তথাগতের একটি বিরাট মূর্ত্তি আছে। এটা লামাদের একটা মস্ত বড় আখড়া।

ট্রেন এসে এবার একেবারে ইন্দ্রপুরীতে পৌঁছল। কোন্ ময়দানব পাহাড় কুঁদে এই স্বপ্নের সৃষ্টি করেচে! স্বর্গ কেমন জানিনা, কিন্তু মনে হয়, দার্জ্জিলিঙের সঙ্গে তার কিছু সাদৃশ্য আছে। সহরের শিয়রে রজতবর্ণ কাঞ্চনজঙ্ঘা পৃষ্ঠপটের মতন দাড়িয়ে কী শোভার যে সৃষ্টি করেচে, তার

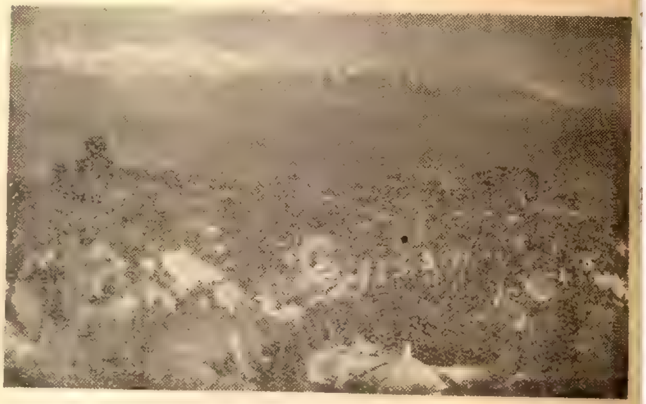

জলাপাহাড় থেকে দার্জ্জিলিঙ্

তুলনা নেই। ছবির মত সব বাড়িগুলি পাহাড়ের উপরে, হয়তো পাইন গাছ ঢাকা পড়েছে বা পড়েনি। দার্জ্জিলিঙের বাড়ীর গায়ে নম্বর নেই, আছে নাম। কী সুন্দর যে নামগুলি।

দার্জ্জিলিঙ সহরটাই একটা ছবি। চৌরাস্তার বেঞ্চে বসে থাক, আর ম্যাল্ দিয়ে অবজারভেটির পাহাড় প্রদক্ষিণ করে এস বা নিচে লিবং-এর ঘোড়দৌড়-মাঠ বা দূরদূরান্তের পাহাড়ের দিকে চেয়েই দেখ, মনে হবে ছবির মধ্যে বাসা বেঁধেছ। ফগ হচ্চে, পরিষ্কার হয়ে যাচ্চে, দলে দলে ছেলেরা মেয়েরা পথগুলিকে কলহাস্যমুখরিত করে' চলেছে, ক্যামেরাতে ছবি নিচ্চে কেউ, ছোট্ট শিশুরা নেচে নেচে দুষ্টুমি করে বেড়াচ্চে—আর প্রসন্ন কল্যাণ হাস্যে এদের চেয়ে দেখচে সুদূর কাঞ্চনজঙ্ঘা।

দার্জ্জিলিঙ আকৃতিতে অনেকটা বাঁকা চাঁদের মতন। তাতে প্রধানতঃ তিনটে স্তর আছে। সবচেয়ে উঁচুস্তর জলাপাহাড়। এখানে সৈন্যদের ঘাঁটি। জলাপাহাড় রোড দার্জ্জিলিঙের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ। দুদিকে বাগানওয়ালা

চমৎকার সুন্দর বাড়িগুলি, কী চমৎকার সব গাছের বীথিকা. কাঞ্চনজঙ্ঘা পিছু পিছু আসচে, চড়ছি উঁচু থেকে আরো উঁচুতে। এই পথ থেকে সমস্ত দার্জ্জিলিঙের চমৎকার বিহগাক্ষি দৃশ্য দেখা যায়। প্রভাতে যেমন সুন্দর, রাতেও তেমন—যখন বিজলী আলোর দেয়ালি সুরু হয়।

আরেকটী সুন্দর রাস্তা অকল্যাণ্ড রোড,—এ রাস্তা থেকেও নিচেকার সহরের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। কার্ট রোডের বাজার, লাউইস জুবিলি স্যানিটোরিয়াম, ম্যাকেঞ্জি রোড প্রভৃতি ভারি সুন্দর দেখতে লাগে। জলাপাহাড় রোড আর অকল্যাণ্ড রোড দুই দিয়েই হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে ঘুম্-ও যাওয়া যায়।

ম্যাল্ দিয়ে হাঁটা একটা কবিতার চরণের মধ্য দিয়ে হাঁটা। কি সুন্দর বাড়ি, কত চমৎকার সব দৃশ্য, কত মনোরম হোটেল, তার সংখ্যা নেই। এই পথ দিয়ে গবর্ণমেণ্ট-হাউস ডাইনে রেখে বার্চ্চহিল্ উদ্যানে চলে যাওয়া যায়। নিচে পড়ে রইল ব্যোটানিকেল গার্ডেন্স্,—তারপর হ্যাপি ভ্যালি চা-বাগান। চক্ষু যেন এতগুলি সুন্দর দৃশ্য ধরে রাখতে পারে না। বিশ্বশিল্পীর উপর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

দার্জ্জিলিঙে এলে মানুষের মন পর্য্যন্ত কম আড়ষ্ট হয়ে ওঠে দেখিছি। আত্মীয়তার ইচ্ছা বেড়ে যায়। হোটেলে রাস্তায় মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়, অন্তরঙ্গতা হয়।

একটা বুড়ো সাহেব ছিল। রিক্‌সাতে বেড়াত। কেউ তাকে আমার সঙ্গে কখনও পরিচয় করে দেয়নি, অথচ দেখা হলেই চীৎকার করে' বলে উঠে,—'সুপ্রভাত,—কী চমৎকার দিন হয়েচে।' কিম্বা—'কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্য্যাস্ত দেখেচ,—ম্যাগনিফিসেণ্ট।'

রৌদ্রালোকিত দার্জ্জিলিঙকে যখন ফগ্ এসে ঢেকে দেয়, তখন আমার বড় ভালো লাগে। এই শুভ্র অস্পষ্টতাকে এক বন্ধু বলতেন—ধবধবে অন্ধকার।

প্রতি বৎসর বাঙালীরা দুর্গাপূজো করেন,—সে উপলক্ষে খুব উৎসব হয়। সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী হতে আরম্ভ করে দার্জ্জিলিঙ ও আশেপাশে এমন কোন হিন্দু নেই যে পূজায় যোগদান না করে। দশমীর দিন কাকঝোরার ঝরণা জলে প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় সমস্ত দার্জ্জিলিঙ সেখানে ভেঙে পড়ে।

একটি মনোরম দৃশ্য—দার্জ্জিলিঙ্

দেয়ালির দিনটিও দার্জ্জিলিঙে বড় উৎসবের দিন।

সিনেমা আছে, টেনিস প্রতিযোগিতা হয়, দিশী বিদিশী অভিনয় হয়ে থাকে। ঘোড়দৌড়ে মোটেই লোকের অভাব হয় না। কিন্তু আমি ওদিকে কখনও বিশেষ যাই না। অন্তহীন এই চিত্রশালার মধ্য দিয়ে বেড়ান আমার সব চেয়ে বড় আনন্দ,—যতটা পারি চোখ আর মন ভরে নিই

তুষারমালা

দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ের সৌন্দর্য্যে। মেঘলোকে এক সৌন্দর্য্যপুরীর অনুসন্ধান পাওয়া গেছে। এই তুষারের ছবি, এই পাইনের ছায়া, সুদূর পাহাড়ের তরঙ্গ, ছবির মতন দেখতে বাড়িগুলি, এই অতুলনীয় ফগ্, মানুষের আনন্দ ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাসি,—দার্জ্জিলিঙের এই সম্পদগুলি আমাকে মুগ্ধ করে।

অগ্নিমিত্র

অমানিশা

শ্রীপ্রিয়তোষ দাশগুপ্ত

হে অসূর্য্যম্পশ্যা, অমাবস্যা রাত্রি!
স্পর্শে তব জলে ওঠে লক্ষ লক্ষ বাতি
নভ মঞ্চোপরে।
পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে,
প্রান্তান্তরে ছুটিতেছ আপনার আবর্ত্তন পথে
যুগ-যুগান্তর ধরে।
তোমার ঐ কালো রূপখানি
ধরিত্রীর বক্ষোপরে দাও যবে টানি'
দিক বিস্তারিয়া—
বিশ্বের বিমুগ্ধ হিয়া
লুপ্ত হয় সে-সৌন্দর্য্য-রহস্যের গূঢ় অন্তরালে,
নাহি পায় দিশা।
ওগো অমানিশা!
সৃষ্টির শৈশব হ'তে যে বিরাট বিপুল বিস্ময়
তব মাঝে রয়,
মর্ম্ম তার কে জানিতে পারে?
অজ্ঞাত রেখেছ আপনারে
বিশ্বগ্রাসী অন্তহীন অন্ধকারে ঘেরি'।
আমি যবে হেরি
সে-রহস্যের সুবিশাল অশেষ সাহারা—
রই বাক্যহারা।

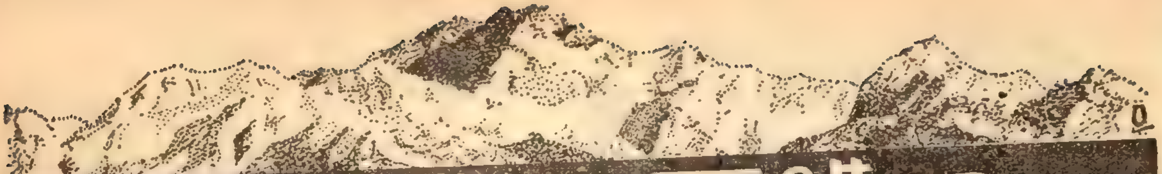

দেশের কথা

শ্রীসুশালকুমার বসু

মেয়েদের স্বাধীনতা

দেশের অর্থনীতিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটার ফলে আমাদের সামাজিক জীবনে যে সকল বিপ্লব ঘটিয়াছে, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাধীনতার বিস্তার তাহার মধ্যে অন্যতম। বর্ত্তমানে আমাদের জীবনযাত্রা যেরূপ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে, সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর বহুসংখ্যক লোককে পল্লীবাসের নিশ্চিন্ততা পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে, দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা শিথিল হওয়ায় বহুসংখ্যক নারীর বাধ্য হইয়া স্বাবলম্বী হইবার যেরূপ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও তাহা কল্পনাতীত ছিল। ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও লোকে ইহা ভাবিতে পারে নাই। সপরিবারে যাঁহাদের সহরে যাতায়াত করিতে হয়, অবস্থার চাপে পড়িয়া তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটে, রক্ষণশীলতা ও সঙ্কীর্ণতা আঘাত প্রাপ্ত হয়, চিরাভ্যস্ত আটঘাট বাঁধা জীবনযাত্রার পরিসর বিস্তৃত হয়। কাজেই এই সকল পরিবারের মধ্যে নারীদের স্বাধীনতা ও অধিকার অনেক বাড়িয়া যায়। পূর্ব্বে সাধারণতঃ শিক্ষিত অবস্থাপন্ন লোকেরাই সহরে যাইতেন : তাঁহাদের সহিত গ্রামের সম্পর্ক বড় একটা থাকিত না ; থাকিলেও তাঁহাদিগকে সাধারণ লোকে একটু অন্যপর্য্যায়ের লোক বলিয়া মনে করিত এবং তাঁহাদের কাজ-কর্ম্ম নিজেদের অনুকরণীয় বলিয়া মনে করিত না। কিন্তু বর্ত্তমানে সমাজের মধ্যস্তরের দরিদ্র লোকদেরই অধিক সংখ্যায় জীবিকার্জ্জনের জন্য সহরে যাইতে হইতেছে, আবার জীবিকার্জ্জনের কঠোরতার জন্য অনেক লোককে স্থায়ী বা সাময়িকভাবে পল্লীতে ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। ফলে পল্লী এবং সহরের সম্পর্ক বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নিকট হইয়াছে এবং পল্লীজীবন নাগরিক জীবনের দ্বারা অনেক বেশী প্রভাবিত হইতেছে। সহরগামী পরিবার সমূহের নারীদের বর্দ্ধিত স্বাধীনতা ও অধিকার সমাজের সর্ব্বস্তরেই ব্যাপ্ত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতার যে বৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে, তাহা এইরূপে দেশের পরিবর্ত্তিত অর্থ-নীতিক অবস্থার অনিবার্য্য ফল হইলেও, আমরা ইহাকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ বলিয়া গালি দিতেছি। দেশের অর্থনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন অনেক পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে এবং সামাজিক পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্রও এই সময় হইতে অলক্ষ্যে প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু সকল পরিবর্ত্তনের স্রোত কেই দানা বাঁধিয়া উঠিতে এবং লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয় বলিয়া, সমাজের এই পরিবর্ত্তনকে আমাদের কাছে আকস্মিক বলিয়া মনে হইয়াছে।

গত রাষ্ট্রিক আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে অন্য কোন ছাপ রাখিয়া যাক বা না যাক ইহা আমাদের নারী-প্রগতিকে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিয়া জাতীয় মুক্তির পথ যে সুগম করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অবশ্য এই রাষ্ট্রিক আন্দোলনের পশ্চাতেও এই অর্থনীতিক বিপর্য্যয়ের ইতিহাস আছে, এবং অর্থনীতিক বিপর্য্যয়ের ফলে, ভিতরে ভিতরে যে সামাজিক পরিবর্ত্তন আসন্ন হইয়াছিল এবং যাহা মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিতেছিল রাষ্ট্রিক আন্দো-লনকে যে তাহা মুক্তিলাভের সুযোগস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বের তুলনায় দেশে ইংরাজী শিক্ষার বহু বিস্তৃতি ঘটিয়াছে, এবং শিক্ষার যে ফল তাহা ত সমাজের সর্ব্বস্তরে

দেখা দিয়াছে। শিক্ষা, বিশেষ করিয়া আধুনিক শিক্ষার ফলে মানুষের গতানুগতিক মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং সব জিনিষকে বিচার করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি জাগিয়াছে। শুধু অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই কোন অন্যায় জিনিষকে লোকে সহিতে চাহিতেছে না। আমাদের সমাজে ও পরিবারে নারীদের যে স্থান তাহা যে কোন প্রকারেই সমর্থন-যোগ্য নহে, অন্যায় ও অবিচারের উপরই যে তাহার ভিত্তি, তাহা যে নারী ও পুরুষ উভয়েরই মনুষ্যত্বের পক্ষে অপমানকর, তাহা যে তাঁহাদের আত্মবিকাশের পথ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের অশিক্ষা ও অবরোধের ফলে যে সমাজ অনেকাংশে পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে, আমাদের জনসংখ্যার অর্দ্ধাংশের কর্ম্মশক্তি যে অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে তাহা যে পারিবারিক ও দাম্পত্যজীবনের সমাপিত সুখ সুবিধা হইতে আমাদিগকে অনেকখানি বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, শিক্ষা সে কথা বহুলোককে বুঝাইয়া দিয়াছে। নারীদের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রসার এই সকল কারণের সমবেত ফলেই বাড়িয়া যাইতে পারিয়াছে। শিক্ষিত পরিবার সমূহে স্ত্রীস্বাধীনতার সুযোগে স্ত্রীশিক্ষা প্রবেশ করিয়াছে, শিক্ষা আবার অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে এবং তাহাও আবার স্বাধীনতাকে প্রসারিত করিয়াছে।

আমাদের ছেলেরা শিক্ষিত ও মেয়েরা অশিক্ষিতা হওয়ায় দাম্পত্যজীবনে অনেকদিন হইতেই একটা অসামঞ্জস্য চলিয়া আসিতেছে। শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে স্বভাবতঃই শিক্ষিতা মেয়ে বিবাহের ঝোঁক আছে; এজন্য ভাল এবং সহজ বিবাহের জন্যও পিতামাতারা মেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে মেয়ের বিবাহ অর্থসাপেক্ষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট বয়সে মেয়ের বিবাহ দেওয়া অনেকের পক্ষেই কষ্টকর হইয়াছে, অথচ মেয়েকে পড়াইতে পারিলে নির্দ্দিষ্ট বয়সে বিবাহ দিবার তাড়া কমিয়া যায়। বিবাহ সম্পর্কীয় এই অবস্থাও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে সহায়তা করিয়াছে এবং শিক্ষা আবার স্বাধীনতাকে বাড়াইয়া দিয়াছে। মুসলমান ও তথাকথিত অনুন্নত হিন্দুরা স্ত্রীশিক্ষায় বিশেষ করিয়া উচ্চশিক্ষায় অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্বর্ত্তী আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন।

এই সকল অবস্থার ফলে যাহার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের ফল মনে করিয়া আমরা বৃথা গালি দিতেছি। পাশ্চাত্যদেশে যে কারণ যে ফল প্রসব করিয়াছে এদেশেও সেই কারণ সেই ফল প্রসব করিবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। যুক্তি অনুগামী মানুষের মন পাশ্চাত্যের সমাজ-জীবনে যে মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে আমাদের দেশেও তাহার অন্যথা হইবে না।

মেয়েদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশের মনোভাব

মেয়েদের নবলব্ধ স্বাধীনতা সম্বন্ধে পুরুষদের মনোভাব প্রশংসনীয় নহে। তাঁহাদের মনোভাব অনেকটা এই প্রকারের যে, মেয়েরা যখন স্বাধীনতা চাহিতেছেন এবং অনেকক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভও করিতেছেন তখন তাঁহারা এই ব্যাপারে আর পুরুষদের সাহায্য সহানুভূতি পাইতে পারেন না। এতদিন যে সকল অধিকার মাত্র পুরুষদেরই ছিল, এখন যখন তাঁহারা সে সকল অধিকার চাহিতেছেন তখন তাঁহাদের কোন দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা বা ত্রুটিকে আমরা সহানুভূতির চোখে দেখিব না, আমাদের সহযোগিতার দ্বারা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিব না; বরং এই সকল অধিকার লাভ করিতে চাহিবার যে মজা কতটা তাহাই দেখাইয়া দিব।

এই মনোভাব যদি শুধু অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত তবে, এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন হইত না। কেন না, স্থিতিশীলতা এবং স্বার্থপরতা মানবপ্রকৃতির কতকটা প্রাথমিক ধর্ম্ম। এতদিন মেয়েদের যে অবস্থা দেখিতে সকলে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের সঙ্গত ও স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। তাহার যে পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা কেহ ভাবেন নাই। অজ্ঞাতসারে এই বিশ্বাস মনের মধ্যে দৃঢ় হইয়াছে যে, এই ব্যবস্থাই একমাত্র কল্যাণকর এবং ইহার কোন পরিবর্ত্তন সমাজের পক্ষে মারাত্মক। তদুপরি মেয়েদের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা পুরুষদের স্বার্থের অনুকূল, এই অবস্থার পরিবর্ত্তনে পুরুষদের প্রভুত্বে কিছু হ্রাস ঘটিবেই। কাজেই, এই দুই কারণের সমবায়ে সাধারণ পুরুষদের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে মনোভাব গড়িয়া উঠা অস্বাভাবিক নহে।

কিন্তু, শিক্ষা বুদ্ধি ও যুক্তিকে শক্তিশালী করে বলিয়া শিক্ষিত লোক সহজেই মনের অভ্যাসজাত সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতকে গড়িয়া তুলিতে পারেন, নূতনের ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন, পরিবর্ত্তনকে সাহসের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন। কাজেই নারীস্বাধীনতা সম্পর্কে শিক্ষিত লোকদের প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব শোচনীয় এবং নৈরাশ্যজনক। যাঁহারা পুরুষের সহিত সমান অধিকার চাহিতেছেন, অথবা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতেছেন, তাঁহারা যে বেশীর ভাগ পুরুষের নিকট হইতে সহানুভূতি পাইতেছেন না, বহুদিনের অভ্যাস হইতে সঞ্জাত দুর্ব্বলতার জন্য পুরুষের নিকট হইতে সাহায্যের পরিবর্ত্তে অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্রূপ ও শ্লেষ পাইতেছেন, তাহার মূলে পুরুষের এই প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব রহিয়াছে। ইহা আমাদের পৌরুষের পরিচায়ক নহে।

নারীরা যে এতদিন সমাজের মুখ্যক্ষেত্র হইতে দূরে ছিলেন, পুরুষের প্রভুত্বপ্রিয়তাই তাহার প্রধান কারণ। ইহাতে একদিকে যেমন মেয়েরা তাঁহাদের অতি সাধারণ পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার সমূহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদের আত্মবিকাশের, আত্মোন্নতির, আত্মস্বাতন্ত্র্যের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি সমাজ জনশক্তির অর্দ্ধাংশের কর্ম্মশক্তি হইতে, সেবা হইতে বঞ্চিত আছে, এবং নারীদের অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা অশিক্ষা ও পঙ্গুত্ব পুরুষদেরও শক্তিকে বহুপরিমাণে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে। নিজেদের কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবার, নৈতিক দায়িত্ব পুরুষদের আছে। নিজেদের সাধ্য ও সুবিধামত নারীদের বন্ধনমোচনে সহায়তা করিতে হইবে এবং যাঁহারা স্বাধীন হইয়াছেন বা হইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের প্রতিও সহানুভূতি দেখাইতে হইবে। যাঁহারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতেছেন, তাঁহাদের যখন সাহায্যের দরকার হয় তখন এই মনে করা কাপুরুষতা হইবে যে, ইহারা স্বাধীন হইতে, সমান অধিকার লাভ করিতে চাহিতেছেন, কাজেই, আবার পুরুষের সাহায্যে প্রয়োজন কেন, সমান অধিকার দাবী করিতে আসিয়া আবার অপরের সাহায্য প্রার্থনা করা কেন। বরং ইহাই মনে করিতে হইবে যে, নিতান্ত সঙ্গত জিনিষের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এবং যাহারা সঙ্গত কাজ করে তাহাদের ন্যায় সকল লোকেরই সহানুভূতি তাঁহারা দাবী ও আশা করিতে পারেন। যে সব বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত লড়িয়া, বহুদিনের যে সব অভ্যাস ও সংস্কার বর্জ্জন করিয়া, যে প্রকারের সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে অধিকার অর্জ্জন করিতে হইতেছে তাহাতে অতি বড় শক্তিমানেরও অপরের সাহায্য ও সহানুভূতির প্রয়োজন হইত। তাঁহারা স্বাধীনতা চাহিয়াছেন বলিয়া সমাজের বহুদিনের অবৈধ হৃদয়হীন, কঠোর যে সব বন্ধন তাঁহাদের দেহ মনকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে, এবং এখনও দিতেছে তাহার প্রভাব তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন নাই ; কেহই পারে না। কাজেই, তাঁহারা সকলেরই সহানুভূতির অধিকারী।

ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভের জন্য যাহারা সংগ্রাম করিয়া থাকে, তাহারা সকলেরই প্রশংসা ও সহায়তা পাইয়া থাকে। স্বাধীনতাকামী নারীরাও শুধু এই হিসাবেই সকলের নিকট হইতে সহৃদয় ব্যবহার পাইতে পারেন। এ ক্ষেত্রে পুরুষেরা তাঁহাদের দুর্গতির কারণ (একমাত্র না হইলেও প্রধান) হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে। নারী-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইবার আরও কারণ পুরুষদের আছে। নারীদের সমানাধিকার লাভ হইলে, তাহাদের সেবার ফলে সমাজের যে অতিরিক্ত লাভ হইবে, পুরুষেরাও তাহার ফলভাগী হইবেন। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পূর্ণতর ও সুন্দরতর হইবে। মাতা স্ত্রী কন্যা ও ভগিনীরা যদি শিক্ষায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে এবং অন্য নানাগুণে শ্রেষ্ঠতর ও যোগ্যতর মানুষ হন তবে পুরুষদের পক্ষেও তাহা কম লাভের হইবে না। নারীদের সমানাধিকারের দাবী যে অন্যায় ও অসঙ্গত নহে, তাহা যে নিতান্তই সঙ্গত এবং যুক্তি ও ন্যায়ানুমোদিত, এই কথা মনে করিতে পারিলেই সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও স্ত্রীলোকের সংখ্যানুপাত

আমরা সাধারণতঃ ছেলেকেই বংশরক্ষক বলিয়া জানি

এবং পুত্রের সংখ্যাধিক্য শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কিন্তু, জাতির বৃদ্ধির পক্ষে এই কথাটা সম্পূর্ণ বিপরীত। জাতির কন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি তাহার বর্দ্ধিষ্ণুতার পরিচায়ক এবং পুরুষের সংখ্যাধিক্য তাহার ক্ষয়ের সূচনা করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দুদের বৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা কম। হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা কম নহে। কিন্তু, তাঁহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলন না থাকায়, সন্তানযোগ্য বিধবারা কার্য্যতঃ জন সংখ্যা হইতে বাদ পড়িয়াছেন।

সন্তানযোগ্য বয়সের হিন্দু স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫,৪৪ ৭৩,৪৪৮ এবং পুরুষের সংখ্যা ৫,১৪,৫০,২৬৬। অর্থাৎ স্ত্রীলোক প্রায় ৩ লক্ষ বেশী : প্রতি হাজার পুরুষে ১০৫৯ জন স্ত্রীলোক আছেন। কিন্তু সমাজের আত্মহত্যাকর প্রথার ফলে এই বাড়তি ঘাটতিতে পরিণত হইয়াছে। ৮৩ লক্ষ বিধবাকে (সন্তানযোগ্য বয়সের) বাদ দিলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ কম পড়ে। হিন্দু সমাজ ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিতেছেন।

হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের স্ত্রীলোকের আনুপাতিক সংখ্যা ও বৃদ্ধির হার নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

২০-৫০ বৎসর পর্য্যন্ত	বৃদ্ধি	বৃদ্ধি
প্রতি হাজার পুরুষের ১৫-৪৫		
পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যা	১৯২১-৩১	১৮৮১-১৯৩১
হিন্দু ৮৯৭ (বিধবাদের সংখ্যা বাদ দিয়া)	১০'৪	২৩'৮
মুসলমান....১,০২৬	১৩'০	৫৫'০
খ্রীষ্টান...১,০৮০	৩২'৫	২৩৮'১

ইণ্ডিয়ান রিভিয়ু পত্রিকায় শারদ ত্রিম্বক কর্ণিক হিন্দুদের ক্ষয়িষ্ণুতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জনবৃদ্ধির সহিত মেয়েদের সংখ্যানুপাতের সম্পর্কের গুরুত্বের কথা আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যৌনবিষয়ক আধুনিক লেখকদের মতে পুরুষের বৃদ্ধি ক্ষয়িষ্ণু জনশক্তির পরিচায়ক। তাঁহার মতে হিন্দুদের বৃদ্ধির স্বল্পতার কারণ তাঁহাদের নারীর সংখ্যাল্পতা। হিন্দুদের মধ্যে নারীর সংখ্যা প্রকৃত পক্ষে কম না হইলেও বিধবা বিবাহের প্রচলন না থাকায়, কার্য্যতঃ নারীর সংখ্যা কম হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাঁহারা তাহার কুফল ভোগ করিতেছেন।

উক্ত লেখক ওয়েস্টারমার্কের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জাতির মিশ্রণের ফলে কন্যার জন্ম সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর নানাস্থানে পরীক্ষার দ্বারা ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ নেগেল্‌স্ উদ্ভিদের স্বতঃপ্রজনন পরীক্ষায় পুংপুষ্পের আধিক্য লক্ষ্য করিয়াছেন ; যে সকল পশুপালের মধ্যে প্রজনন আভ্যন্তরীণ সে সকল স্থলে পুংবৎসের সংখ্যা অধিক হইতে দেখা গিয়াছে। অশ্বের বেলায়ও দেখা গিয়াছে যে, পিতামাতার বর্ণ যত ভিন্ন হইয়াছে, বাচ্চার মধ্যে স্ত্রী-জাতীয়ের সংখ্যা তত বেশী হইয়াছে। ইহুদীদের ভিতর নিকট সম্পর্কীয়দের মধ্যে বিবাহের প্রচলন আছে। ইহাদের মধ্যে কন্যার জন্ম অপেক্ষা পুত্রের জন্ম অনেক অধিক হইয়া থাকে। এই মতবাদের সমর্থনে আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে এবং ইহা সঠিকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বর্ণসাঙ্কর্য্যের ফলে কন্যার জন্ম বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের হিন্দুদের অনেক শ্রেণীর মধ্যে দারুণ কন্যাভাব দেখা দিয়াছে। বিধবা বিবাহের প্রচলন না থাকা যেমন ইহার একটি প্রধান কারণ হইলেও, অনেক শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃতই কন্যার সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। শিক্ষায় অগ্রসর সহরবাসী কয়েকটি বর্ণের কথা বাদ দিলে, বাঙ্গালী হিন্দুদের (অধিকাংশ জাতি সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য) কোন এক জাতির বেশী সংখ্যক লোক একগ্রামে বাস করেন না। দারিদ্র্য, দূরে যাতায়াতের অভ্যাসের অভাব প্রভৃতির জন্য বিবাহাদি সাধারণতঃ পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে ; অর্থাৎ কয়েক শত করিয়া লোকের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বিবাহ হইতেছে। এই অত্যন্ত সংকীর্ণ বৈবাহিক-মণ্ডলীসমূহ নানা জাতির হিন্দুর মধ্যে কন্যাভাবের কারণ হইয়াছে এবং তাঁহাদের জীবনী শক্তিকেও ক্ষীণ করিয়াছে।

হিন্দুদের মধ্যে যদি জন্মগত জাতিভেদ প্রথা লোপ পায় বা বহু পরিমাণে শিথিল হয় এবং অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন হয় তবে জন্মগত বৈষম্য হইতে উদ্ভূত অন্য নানা সমস্যার সহিত এ সমস্যারও সমাধান হইতে পারে। কিন্তু হিন্দু সমাজে পরিবর্তনবিরোধী স্থিতিশীল মনোভাব এত প্রবল

যে, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও জাতিভেদ প্রথা লুপ্ত করিতে যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইবে ততদিন শক্তিক্ষয়কারী নানা বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত লড়িয়া হিন্দু সমাজ বাঁচিয়া থাকিবে কিনা তাহাই সন্দেহের বিষয়।

কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান বিচারপতির পদে বাঙ্গালী

ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সার লালগোপাল মুখার্জ্জী বিচারপতি দালালের স্থানে কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পদ গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন।

কাবুলে প্রথম ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি

সীমান্ত সরকারের প্রচার বিভাগের মিঃ মহম্মদ আস্‌লাম ঘটক ভারত সরকার কর্তৃক কাবুলে প্রথম বাণিজ্য প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

জে-টি-সাণ্ডারল্যাণ্ডের পরলোক গমন

বিখ্যাত লেখক ও গ্রন্থকার ভারতের একজন প্রকৃত হিতৈষী জে-টি-সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেব আমেরিকায় তাঁহার পুত্রের বাসভবনে গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৪ বৎসর হইয়াছিল। মডার্ণ রিভিয়ু প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার লেখক হিসাবে এবং সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ পুস্তকের প্রণেতা হিসাবে তিনি ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসীদের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার ভারতপ্রীতি, ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি সুবিদিত ছিল। যে বয়স পর্য্যন্ত তিনি যোগ্যতা ও শ্রমের সহিত লেখনী চালনা করিয়াছেন, কাজ করা ত দূরের কথা ততদিন পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকাই ভারতবাসীদের পক্ষে বিরল ঘটনা। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবাসীরা আমেরিকায় একজন প্রকৃত বন্ধু হারাইলেন। প্রায় একই সময় ধনগোপাল মুখার্জ্জী ও সাণ্ডারল্যাণ্ডের মৃত্যুর ফলে আমেরিকার সহিত ভারতের সংস্কৃতিমূলক সংযোগ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

রহস্যময়ী

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

তোমারে সুন্দর লাগে এ মুগ্ধ নয়নে ।
তবু ভাবি 'ইহ বাহ্য', তুমি শুধু নহ
নয়নের সম্মোহন, সঙ্গোপনে রহ
যবনিকা-অন্তরালে ; তোমার গহনে
তোমার স্বরূপখানি মোরে ক্ষণে ক্ষণে
আকুল করিছে নিত্য । ওই অহরহ
মিলনের ছদ্মবেশে তোমার বিরহ
আঁমারে অধীর করে অটুট গুণ্ঠনে ।

চাহি ধরণীর পানে । সে তোমারি মত
সৌন্দর্য্যের আবরণে রাখিয়াছে ঢাকি'
অজ্ঞাত রহস্যখানি মৌন ইসারায় ।
ব্যাকুল জিজ্ঞাসা মোর জাগে অবিরত,
অজানারে বারে বারে কত নামে ডাকি !
প্রতিধ্বনি কাঁপে শুধু তারায় তারায় ।

———

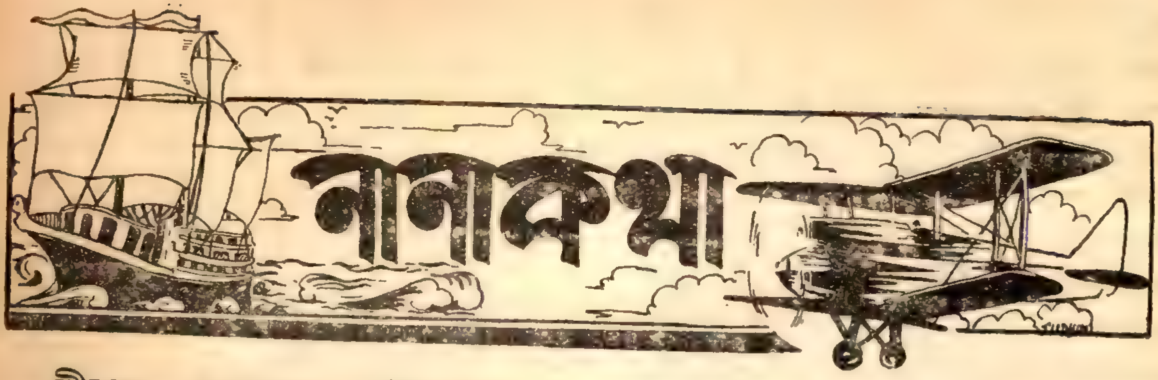

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একষষ্টিতম জন্ম দিবস

বর্ত্তমান ৩১ ভাদ্র ১৩৪৩ ভগবানের অনুগ্রহে শরৎচন্দ্র তাঁর বয়ক্রমের ষাট বৎসর পূর্ণ করে একষষ্টিতম বৎসরে পদার্পণ করলেন। আমরা ঐকান্তিক চিত্তে প্রার্থনা করি তিনি এখনও বহু বহু বর্ষ সুখে-স্বাস্থ্যে সৌভাগ্যে-গৌরবে দিনাতিপাত করুন। কিছু কাল হ'তে তাঁর স্বাস্থ্য তেমন ভাল যাচ্ছিল না, তদুপরি সম্প্রতি ঢাকা হ'তে জরাক্রান্ত হ'য়ে আসার পর এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌তে পারেন নি। অচিরে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে আরোগ্য লাভ করুন, এই আমাদের একান্ত কামনা।

ইন্টারন্যাশনাল পি-ই-এন কংগ্রেস

প্রত্যেক বৎসর পৃথিবীর কোন-না-কোন স্থানে পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানের একটি করে আন্তর্জাতিক অধিবেশন হয়। পৃথিবীর সকল স্থানের পি-ই-এন কেন্দ্র এবং শাখা হ'তে এই অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ সমবেত হ'য়ে পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করবার সুযোগ লাভ করেন। বর্ত্তমান বৎসরে সাউথ আমেরিকার আরজেনটাইনের অন্তর্গত বিউনেস এয়ার নগরে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে এই অধিবেশন হবে।

আগামী অধিবেশনে ভারত-কেন্দ্র হ'তে ম্যাডাম সোফিয়া ওয়াডিয়া এবং বঙ্গীয় পি-ই-এন্ হতে ডক্টার কালিদাস নাগ নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাক্‌বেন। ডক্টার নাগ কিছুদিন হ'ল যাত্রা করেছেন। ম্যাডাম সোফিয়া ওয়াডিয়া ভারত পি-ই-এন্-এর প্রতিষ্ঠাত্রী এবং The Indian P. E. N. পত্রিকার সম্পাদিকা। ভারত-কেন্দ্রের কার্য্যালয় বোম্বাই নগরে।

পি-ই-এন্ বিখ্যাত সাহিত্যিক Mr. H. G. Wells কর্ত্তৃক স্থাপিত বিশ্বলেখকসংসদ। পৃথিবীর সমস্ত কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধলেখক ও সম্পাদকগণের মধ্যে মৈত্রী এবং সদ্ভাবের যোগসূত্র স্থাপন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

"আলতা কাব্য" ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম

গত ভাদ্র মাসের বিচিত্রায় "আলতা কাব্য" নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটিতে "খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনকে জাতিনির্ব্বিশেষে সকলের সমক্ষে হেয় ও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন" করবার চেষ্টা হ'য়েছে,—এই অভিযোগে ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট মিশন হ'তে রেভারেণ্ড মণীন্দ্রকুমার পাত্র বি-এ, বি-ডি মহাশয় প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছেন। রেভারেণ্ড পাত্র মহাশয় তাঁর পত্রে লিখেছেন, "বিচিত্রা জাতি নির্ব্বিশেষের একটি উচ্চাঙ্গের আদর্শ মাসিক পত্রিকা, সুতরাং বঙ্গের খ্রীষ্টিয় সমাজের বিরুদ্ধে এবংবিধ গল্পের মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্বন্ধে যথাবিহিত প্রতিকার বাঞ্ছনীয়, নচেৎ ভারতের বিবিধ ধর্ম্ম-সমস্যা ও সাম্প্রদায়িক-সমস্যা চিরকালই অমীমাংসিত ও ব্যর্থ থাকিয়া যাইবে এবং ফলে কোনো দিনই ভারতের বিভিন্ন জাতি সাম্য মৈত্রী ও সন্ধির বন্ধনে মিলিত হইতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং বঙ্গের খ্রীষ্টিয় সমাজ আপনার নিকট এই আশা

করেন যেন আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার আগামী সংখ্যার "বিচিত্রার" "নানা কথা" শীর্ষক স্তম্ভে আমার এই প্রতিবাদ লিপি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া আমাদের সমাজের ন্যায় ও সত্যের দাবী রক্ষণে সহায়তা করেন এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই প্রকার গল্প বা প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে আপনি আপনার মতামত উল্লেখ করিয়া ভবিষ্যতে যেন আপনার লেখক ও লেখিকাগণ এই প্রকার বিদ্রূপাত্মক গল্পাদি লিখিয়া আমাদিগকে মর্ম্মাহত না করেন, এতদুদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সতর্ক করাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি"

"আলতা কাব্য" গল্প পাঠ ক'রে রেভারেণ্ড পাত্র মহাশয় এরূপ ক্ষুব্ধ হওয়ায় আমরা আন্তরিক দুঃখিত হয়েছি। কথা-সাহিত্যের, বিশেষতঃ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কথা সাহিত্যের, এক মাত্র উদ্দেশ্য—জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমগ্র পাঠকসমাজকে আনন্দ প্রদান করা। তৎপরিবর্ত্তে তদ্দ্বারা যদি সম্প্রদায় বিশেষের মনে দুঃখ এবং বেদনার উৎপাদন করা হয়, বিশেষতঃ ধর্ম্ম অথবা সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বিদ্রূপ এবং অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের দ্বারা, তা হ'লে তদপেক্ষা গর্হিত এবং শোচনীয় ব্যাপার আর কিছুই হ'তে পারে না। কিন্তু কথা-সাহিত্যের বিষয়ে এ সম্বন্ধে অন্য একটা কথা মনে রাখাও একান্ত প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করি। গল্পের অথবা উপন্যাসের কোনো পাত্র পাত্রীর দ্বারা কথিত কোনো মত অথবা মন্তব্যকে লেখকের নিজস্ব মত অথবা মন্তব্য ব'লে মনে করা সব সময়ে সমীচীন নয়; এ বিষয়ে আমাদের আর একটু বিচারশীল এবং সহনশীল হওয়া উচিত। প্রত্যেক জাতি এবং ধর্ম্মের অন্তর্গত এমন দু-চারটি বিবেকবর্জ্জিত ব্যক্তি থাকা অসম্ভব নয় যারা নিজেদের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য, তা সে অভিপ্রায় যতই শ্লাঘনীয় হ'ক না কেন, অন্যায় এবং অসরল পন্থা অবলম্বন করতে ইতস্ততঃ করে না। তেমন একটি চরিত্র অঙ্কিত করলেই যে সেই চরিত্রের অবলম্বিত ধর্ম্মকে হেয় অথবা নিন্দিত করা হ'ল, তা বলা যায় না। আলোচ্য গল্পের আইরিন বিশ্বাস বড় জোর সেই রকম একটি চরিত্র, তদপেক্ষা বেশি কিছুই নয়। আইরিন বিশ্বাসের উক্তির মধ্যে এমন কথা হয় ত আছে যা তার নিজের ব্যক্তিত্বকে হেয় করে, কিন্তু এমন কোনো কথাই নেই যদ্দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবনমিত হয়। বরং এমন অনেক কথা আছে যদ্দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মহত্ত্বই প্রকাশ পায়। আলতার মুখে, কি স্বপক্ষে কি বিপক্ষে, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিষয়ে কোনো কথাই নেই। একমাত্র ছেলেদের মুখে একটা ব্যঙ্গোক্তি আছে বটে কিন্তু লেখক নিজেই তাদের অকালপক্ক ব'লে অভিহিত ক'রে তাঁর অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। আমার মনে হয়, এটা দেওয়া হয়েছে অশিক্ষিত পল্লী সমাজের চিত্রাঙ্কণের উদ্দেশ্যে।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে নিন্দিত করবার কোনো অভিপ্রায় লেখকের মনে যে সম্ভবতঃ নেই, তার দুটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, "আলতা-কাব্য" নামটির মধ্যে তার সামান্যমাত্রও ইঙ্গিত নেই; এবং দ্বিতীয়তঃ, তেমন কোনো অভিপ্রায় যদি থাকত তা হ'লে লেখক কখনই ক্রীশ্চান আইরিন বিশ্বাসের অপেক্ষা বহুগুণে জঘন্যতর হিন্দু বিপিন চরিত্র অঙ্কিত করতেন না।

সে যাই হোক, এ সকল যুক্তি তর্কের অবতারণার উদ্দেশ্য, রেভারেণ্ড পাত্র মহাশয়ের প্রতিবাদকে যে-কোনো প্রকারে খণ্ডিত করা নিশ্চয় নয়; এর একমাত্র উদ্দেশ্য যথোচিতভাবে তাঁর মন হ'তে দুঃখ এবং বেদনার কারণ অপসৃত করা। স্পষ্ট এবং সরল ভাবে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত ক'রে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, কারণ হয় ত এতদ্দ্বারা আমরা তাঁর মতো আরও কারো কারো মন থেকে বেদনা অপনোদিত করবার সুযোগ লাভ করলাম। শুধু খ্রীশ্চান ধর্ম্মের প্রতিই নয়, সকল ধর্ম্মের প্রতিই যে আমরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন সে-কথা বোধ করি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই।

সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ভাবে হলেও, রেভারেণ্ড পাত্রের মনঃ-ক্ষোভের কারণ হওয়ার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত, এবং তজ্জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ক্যাপ্টেন অতুলকৃষ্ণ কর

শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার ঘোষ আমাদের পত্র লিখে জানিয়েছেন যে, মাঝে মাঝে বিচিত্রায় মিলিটারী ক্রস্ ভূষিত কৃতী বাঙালীদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে ক্যাপ্টেন

অতুলকৃষ্ণ কর মহাশয়ের নাম বাদ প'ড়ে গেছে। তালিকাটি পূর্ণতর করার বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করার জন্য সুধাংশু বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

উপস্থিত ক্যাপ্টেন অতুলকৃষ্ণ কর হিজলী ডিটেন্‌শন ক্যাম্পের মেডিকাল অফিসার পদে নিযুক্ত আছেন। ১৯২১ সালে ২৮ পাঞ্জাবী পল্টনের মেডিকাল অফিসাররূপে তিনি Wana অভিযানে সাহুর নদীতটের ভীষণ যুদ্ধে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে আর্ত্ত, আহত এবং মৃত ব্যক্তিগণকে নিয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে ক্যাম্পে প্রত্যাগমন করেন। এই অসমসাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি সম্রাট কর্ত্তৃক মিলিটারী ক্রসের দ্বারা ভূষিত হন। প্রমাণ স্বরূপ সুধাংশু বাবু ১১ই নভেম্বর ১৯২১ সালের ইণ্ডিয়া গেজেটে ২১৫৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ইস্তাহারের যে অংশ নকল ক'রে পাঠিয়েছেন আমরা তা নিম্নে মুদ্রিত করলাম।

War Office
28th September 1921

His Majesty the King has been graciously pleased to approve of the undermentioned rewards for distinguished service in the field with Waziristan Force in India.

Awarded the Military Cross

Captain Atul Krishua Kar I. M. S. attached (to the) 28th Punjabis I A on the 10th April 1921 during the action below Haidarikach this officer was sent out of the camp to bring in the wounded. All ranks of the regiment testify to his devotion to duty and personal disregard to danger while binding up the wounded and despatching them to the camp under a heavy fire. Owing to his coolness and splendid organization the wounded were systematicaly evacuated under difficult circumstances.

সার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়

আমরা অবগত হ'য়ে বিশেষভাবে আনন্দিত হলাম যে, সুপ্রসিদ্ধ প্রবাসী বাঙালী এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সার লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাশ্মীর ষ্টেটের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হয়েছেন। সার লালগোপাল যে সর্ব্বতোভাবে এ পদের উপযুক্ত যে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং সেজন্য তাঁর নিয়োগে সকল সম্প্রদায় আনন্দিত।

ব্রহ্মদেশে বিশিষ্ট বাঙালী

বর্ম্মার সিনিয়র ডেপুটি এ্যাকাউন্টেন্ট্ জেনারেল রায় বাহাদুর এইচ্, এম্, রায় মহাশয় ৩২ বৎসরের কার্য্যের পর সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন। ১৯০৪ সালের ২২শে জুন ৬০৲ টাকা মাহিনায় রেঙ্গুন একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে তিনি কর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং তৎপরে স্বীয় প্রতিভাবলে চাকরীর এই অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হন। অবসরহীন কর্ম্মজীবনেও তাঁর অনেক জনহিতকর ব্যাপারে যোগ ছিল। আমরা আশা করি তাঁর অবসরপ্রাপ্ত জীবন বর্ম্মার বাঙালী সম্প্রদায়ের হিতসাধনে ব্যয়িত হবে। তিনি বর্ম্মায় অতিশয় জনপ্রিয় এবং সম্মানিত ব্যক্তি, সুতরাং এদিকে কার্য্য করবার সুযোগও তাঁর যথেষ্ট।

একাদশ অলিম্পিকের ফলাফল

গত ১৬ই অগষ্ট বার্লিনে এ বৎসরের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সমাপ্তি হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় মোটের উপর জার্ম্মানী হয়েছে প্রথম, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় এবং ইটালী তৃতীয়।

হকি খেলায় ভারতীয় হকিদল জার্ম্মানীকে ৮—১ গোলে হারিয়ে তৃতীয় বার সমগ্র জগতের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

"অলক্ শোভা" কেশ তৈল

ডক্টার শীলের অলক-শোভা কেশ তৈল উপহার পেয়ে ব্যবহার ক'রে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। তৈলটি সুমিষ্ট সুরভি সংযুক্ত এবং কেশের এবং মস্তিষ্কের উপকারক। সুতরাং ঔষধ সামগ্রী এবং প্রসাধনের বস্তু উভয়তঃই তেলটি সাধারণের নিকট আদৃত হবার উপযুক্ত। মূল্য প্রতি শিশি দশ আনা কমই মনে হয়।

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Bishnupada Chakravarti at the Sahitya-Bhaban Press, 21 Holwal Lane, Calcutta and Published by Saratchandra Mukherjee from 27-1 Fariapooker St. Calcutta.

বিচিত্রা

সুরের রেশ

শ্রীসুধীর খাস্তগীর

কার্ত্তিক, ১৩৪৩

CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY.

বিচিত্রা

দশম বর্ষ, ১ম খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৪৩ | ৪র্থ সংখ্যা

রবিবাসর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"UTTARAYAN"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু

আজ তোমার চিঠি পেলুম পর্শু তোমাদের অনুষ্ঠান। নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছি। পর্শু এখানে কয়েকজন মাননীয় অতিথি আসবেন। যাবার জো নেই। নিজের জরুরি কাজে আমাকে ৮।৯ অক্টোবরের কাছাকাছি কলকাতায় যেতে হবে। তার পরবর্ত্তী রবিবারে যদি তোমরা শরতের ষষ্টিতম সাম্বৎসরিক করো তবে আমি সশরীরে উপস্থিত থেকে তাঁর অভিনন্দনে যোগ দিতে পারি। পরে পরে দু দিন মাল্যদান করলে তো দোষ নেই। রবিবাসর একদিনেই নিঃশেষিত হবে না। পঞ্জিকাতে লিখচে ১১ই তারিখেও একটা রবিবারের সমাগম সম্ভাবনা আছে, সেদিন রবীন্দ্রের সমাগমও অসম্ভব হবে না। ইতি ৯ আশ্বিন ১৩৪৩

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত ১১ই আশ্বিন রবিবাসরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিচিত্রা-সম্পাদককে লিখিত পত্র। রবিবাসরের পরবর্ত্তী অধিবেশনও ১১ই তারিখে পড়িয়াছে, কিন্তু অক্টোবর মাসের ১১ই। উক্ত পত্রের শেষাংশে কবি এই যোগাযোগ লইয়াই কৌতুক করিয়াছেন। : সম্পাদক

নদী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম-এ

বসেছিনু নদীকূলে সেদিন সন্ধ্যায়।
সায়াহ্নের অস্তরাগ ধীরে ধীরে আকাশে মিলায়
বুলায়ে কাজল-তুলি নদীজলে।
শুনি তার তরঙ্গে উথলে
অশ্রান্ত মর্ম্মর ধ্বনি,
বিদেশীর ভাষা সম শুধু গুঞ্জরণি
আমার শ্রবণে অর্থহারা।
তবু মধুময় লাগে,
প্রশ্ন জাগে,
—কী কহিছে প্রবাহিণী ধারা ?
আমার আনন্দে তার ফোটে না কি কোনো মর্ম্মাভাস,
স্বপ্রকাশ ?

কেন হেন ভাবাবেশে
সে মোরে করিছে মুগ্ধ ? শুধু যায় ভেসে
অন্ধ মূক জড়রাশি গড়ায়ে গড়ায়ে,
তটেরে জড়ায়ে
তরঙ্গে তরঙ্গে ছেড়ে যায়
মাড়িয়া বিদায় ?

ছলকি ছলকি
অনর্গল কহিছে কত কি !
শুনিতে শুনিতে যেন শব্দ তার শ্রবণে আমার
ভাষা হয়ে ফোটে ধীরে, করি আবিষ্কার
তটিনীর মর্ম্মবাণী,
কি যে সে বলিতে চায় জানি।
এমনি ত শুনিয়া শুনিয়া,
শিশু হিয়া
বাক্য হ'তে অর্থ লয় খুঁজি,'
আলোড়িয়া শব্দভরা ক্ষুদ্রতার স্মৃতিময় পুঁজি।

মনে হল দীর্ঘকাল ছিলেম প্রবাসী,
চিরন্তন স্বদেশের এই কূলে আসি'
শুনিলাম মাতৃকণ্ঠে স্নেহোচ্ছল বাণী।
ভুলে গেছি মাতৃভাষা, তাই নাহি জানি
কল্লোলে কল্লোলে
অন্তর্গূঢ় কী বারতা আলোড়িয়া তোলে ?
এই মাটি এই আলো এই জলবায়ু
দিল মোরে আয়ু,
বৈশিষ্ট্যের গণ্ডী মাঝে
রূপ হ'তে রূপান্তরে কত ঘুরিয়া যে
এসেছি হেথায়,
সৃজনের বিবর্ত্তন পরম্পরা লঙ্ঘি' পায় পায়।

অপ্রতিহত সে গতি ঘূর্ণ্যাবেগে তরঙ্গ প্রবাহে
নবতর পরিণতি পানে যেতে চাহে,
পূর্ণচ্ছেদ নাহিক কোথাও,
ছুটেছে উধাও,
আবেগে অমর শুধু, উর্ম্মিদলে উঠিয়া পড়িয়া
চলেছে সে বাঁচিয়া মরিয়া।

আঁখি মুদি' অন্ধকারে শুনি কলতান।
মনে হয় আমি বহমান্
এই স্রোতে,
কোন আদি গঙ্গোত্তরী হ'তে
চিরযাত্রী আসিয়াছি উত্তরিতে অনাদি সাগরে।
সাগর ? সেও ত যাত্রী অসীম অম্বরে,
বাষ্পাকারে
উড়িয়া চলেছে অভিসারে
মাটির উদ্দেশে,
এড়ায়ে সবার দৃষ্টি শূন্যে ভেসে ভেসে।

ঘনীভূত হয় বাসনায়
পুঞ্জমেঘে নভোনীলিমায়,
আরবার বাদল ধারায় নেমে আসে
ধূলিরে বাঁধিতে বাহুপাশে।

নক্ষত্র জটলা ওই অন্ধকারে চলেছে ছুটিয়া
উদ্‌ভাসিয়া নভস্তল, চক্ষে মোর পড়িছে লুটিয়া
শব্দহারা কলরব অনন্তের ক্ষণিক কম্বরে,
অস্তিত্বের পদধ্বনি আকাশ ভরিয়া
গতিভরে ওঠে মর্ম্মরিয়া।
ওগো নদী,
জানি আমি তোমা সনে বহিয়া চলিব নিরবধি।
বহু স্মৃতি বিস্মরণে জন্ম হ'তে নবজন্মান্তরে।
ছিলাম, রহিব আমি, এমনি রহিব চিরদিন,
চিরবিবর্ত্তন মাঝে রব আমি শাশ্বত নবীন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

অপরিচিতা দেবী

শ্রীনবগোপাল দাস আই-সি-এস্

অপ্রত্যাশিত ঘটনা মানুষের জীবনে অনেকই ঘটে থাকে, কিন্তু সে দুপুর রাতে অনল যখন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে চলনোন্মুখ ট্রেণের একটা সেকেণ্ডক্লাশ কামরায় ছোট একটি সুটকেশ হাতে নিয়ে উঠে পড়্‌ল তখন সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে তখ্‌খুনি অতি অপ্রত্যাশিত একটা কাহিনীর উপকরণ সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্ভার নিয়ে তার সাম্‌নে ছড়িয়ে পড়বে।

ট্রেণ তখন পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে। কামরার অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে সুইচটা খুঁজে পেয়ে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেটা টিপে দিলে, আর বিদ্যুতের আলোয় ছোট কম্পার্টমেণ্টটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

পলকের মধ্যে অনল লক্ষ্য করলে, কামরার মধ্যে সে একা নয়।

বাইরের ম্লান জ্যোৎস্না যেখানে ঠিক্‌রে এসে পড়েছে সেখানে বার্থটার উপর শুয়ে রয়েছে একটি তরুণী।

আবক্ষ তার শাদা একটি চাদরে ঢাকা, শুধু মুখের উপর কোন আবরণ নেই। আলো জ্বলে উঠতেই তার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল।

অনল রীতিমত হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। ভুল করে সে যে রিজার্ভ কোন কামরায় উঠে পড়েছে সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। মেয়েটি হয়ত ভয় পেয়ে কী একটা কাণ্ড করে বস্‌বে—অনল মনে মনে প্রমাদ গুণছিল।

মেয়েটি কিন্তু অভিনয়সূচক কোন ব্যবহারই কর্‌লেনা। অচঞ্চল শান্তস্বরে শুধু বললে, দরজাটা কি খোলা ছিল ?

এতক্ষণে অনলের মুখে ভাষা জোগাল। বল্‌লে, হ্যাঁ, আমি তাড়াতাড়িতে না দেখে উঠে পড়েছি...এর পরের ষ্টেশনেই নেবে যাব...

হাসির একটা বিদ্যুৎ মেয়েটির ঠোঁটের কোণে খেলা করে গেল। বল্‌লে, আমার অসুবিধে হবে ভাবছেন ?... কিছুমাত্র না। আমি এখ্‌খুনি ঘুমিয়ে পড়ব, এই দুপুররাতে আপনি অনর্থক আর কামরা বদ্‌লাতে ব্যস্ত হবেন না।

অনল প্রতিবাদের সুরে কী যেন বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে কোন কথা বল্‌বার অবসর না দিয়েই মেয়েটি বল্‌লে, ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ কর্‌তে আমার মনে ছিলনা, আপনি দয়া করে বন্ধ করে দিন্‌না···

আমি অকৃত্রিম ঔৎসুক্য নিয়ে অমলের গল্প শুন্‌ছিলাম। বল্‌লাম, এ যে রীতিমত রোম্যাণ্টিক...

অনল ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, রোম্যান্সের মাত্রা বোধ হয় একটুখানি বেশী ছিল বলেই শেষ পর্য্যন্ত তা পর্য্যবসিত হ'ল একটা খণ্ডদৃশ্যের অশান্ত উজ্জ্বল স্মৃতিতে !

আমি কী যেন বল্‌তে যাচ্ছিলাম, অনল আমাকে বাধা দিয়ে বল্‌লে, সেই কাহিনীই আমি বল্‌ব এখন, তোমায় ধৈর্য্য ধ'রে শুনতে হবে।

অধীর আমি যে হইনি, তা অনলের বোঝা উচিত ছিল। তবে হয়ত বুঝতে চাইবার মত মানসিক অবস্থা তার নয়। তার স্মৃতিপথে হয়ত তখন ঘুর্‌ছে সেই একটি রাতের বিচিত্র বেদনা,অশ্রু, গান, হাসি !

অনল নীরবে মেয়েটির আদেশ পালন করে এদিককার বার্থের উপর এসে বস্‌লে। মেয়েটির দিকে আড়চোখে একবার তাকাতেই সে লক্ষ্য করলে যে সেও তারই দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি কিন্তু তার চোখ নরিয়ে নিলেনা।

অনলের মনে হ'ল একটা কথা বলা দরকার। অন্য কিছু মাথায় তখন তার জোগালনা, খানিকটা বোকার মত সে প্রশ্ন করলে, বাতিটা আপনার চোখে লাগছে কি ? নিবিয়ে দেব ?

—হ্যাঁ।

ছোট্ট একটি উত্তর। তার মধ্যে আদেশের সুরটাই যেন বাজল বেশী।

বার্থের উপর একটা বালিশ টেনে নিয়ে হেলান দিয়ে অনল বাইরের দিকে তাকালে। সেখানে যান্ত্রিকসভ্যতার গর্জ্জনের সাথে মিশেছে প্রকৃতির গান—জ্যোৎস্নাপুলকিত বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে দিয়ে সদম্ভে চলেছে তাদের মেল্ ট্রেণ।

জ্যোৎস্নার আলো ওদিককার জানালা দিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে এসে মাঝে মাঝে পড়ছিল মেয়েটির মুখে। অন্ধকারের মধ্যে অনল অনুভব করছিল সে যেন রয়েছে এক স্বপ্নপুরীর বহিরাঙ্গণে, আর সেখানে ভেসে আস্ছে অচিন্ দেশের কোন্ এক রাজকন্যার অঙ্গসৌরভ।

অনল চঞ্চল হয়ে উঠল। কে ওই ব্রীড়াহীনা তরুণী যার কথা বলা এবং না-বলা তার মনে তুল্ছে তরঙ্গ? কী ভয়লেশশূন্য অসঙ্কোচ তার ব্যবহার!

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত অনলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ বলে উঠলাম, এযে রীতিমত রূপকথা হ'তে চল্ল…

অনল আমার এই অস্বাভাবিক অসহিষ্ণুতায় একটু উষ্ণ হয়ে বল্লে, ধৈর্য্য ধর বন্ধু, কাহিনীর climaxএ এখনও পৌছইনি!

অনল বল্তে লাগল, মাথার মধ্যে তখন কত কী যে চিন্তা ভেসে উঠছিল তা' বল্তে পারি না। তবে এটুকু মনে আছে ঐভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাক্তে থাক্তে আমার চোখের পাতা আস্ছিল মুদে, আর আমি বেশ শান্ত নির্ভরে পড়লাম ঘুমিয়ে। সেদিন রাতটা ছিল রীতিমত গুমোট, তাই সেই চলন্ত ট্রেণের খোলা জানালা দিয়েও তেমন বাতাস আস্ছিল না।

সেকেণ্ডক্লাশের কামরা, একটিমাত্র পাখা সেখানে, আর সেটিও ছিল অনলের সহযাত্রিণীর দিকে ঘোরানো। লম্ব একটা বার্থএ পা ছড়িয়ে দেওয়ার আরাম ছাড়া আর কোন আরামই অনল পাচ্ছিল না।

যখন তন্দ্রা ভাঙ্গল অনল দেখলে একটা ষ্টেশনের আলো ধীরে ধীরে তার পাশ থেকে সরে যাচ্ছে। ট্রেণের গতি দেখে সে অনুমান করলে, ষ্টেশনটায় গাড়ী থেমেছিল, আবার চলেছে।

সে ওদিককার বার্থটার দিকে তাকালে। দেখলে, সহযাত্রিণী উঠে বসেছে, আর তার সবচেয়ে কাছের জানালাটার উপর তার রহস্যময় মুখখানা রেখে একটা বইএর দিকে তাকিয়ে আছে। জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে বইএর পাতার উপর।

পরমুহূর্ত্তেই অনলের নজর পড়ল তাদের কামরার পাখাটার দিকে। কামরার ভিতরটা তখনও অন্ধকার, কিন্তু বাতাসের স্রোত এসে যেভাবে তার চুলের উপর পড়ছিল তা' থেকে সে অনুভব করলে যে তার ওই তন্দ্রার অবসরে কে যেন পাখাটা তার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

অদ্ভুত মেয়ে! অনলের মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল।

মেয়েটি সেই শব্দে একটু যেন চম্‌কে উঠে তার দিকে তাকালে। তারপর প্রশ্ন করলে, আপনার ঘুম হ'লো?

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে অনল জবাব দিলে, হ্যাঁ, কিন্তু আপনিই কি পাখাটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন?

হেসে মেয়েটি জবাব দিলে, তাছাড়া আর কে দেবে বলুন?…সারা পথটা ত আমিই ওর বাতাস উপভোগ করেছি, আপনাকে খানিকটা অংশ না দিলে যে নগ্ন স্বার্থপরতায় গিয়ে দাঁড়াত!

অনল বল্লে, কিন্তু আপনি শুধু শুধু কষ্টভোগ করলেন কেন বলুন ত?

—ওঃ, তাই? তা ধন্যবাদ দিন্, আমি হাসিমুখে নেব।…আর যদি এখন আপনার অনুশোচনা এসে থাকে তাহ'লে আপনাকে রেহাই দিচ্ছি।…

ব'লে হাতের বইখানা রেখে বার্থ থেকে উঠে অনলের সহযাত্রিণী পাখাটা আবার নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলে।

অনল রীতিমত অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির সপ্রতিভ ব্যবহার—যাকে প্রগল্‌ভতার সংজ্ঞার মধ্যেও খানিকটা ফেলা যায়—তার পরিচিত বাঁধাছন্দের জীবনের বাইরে। সে বুঝতে পারছিলনা কী ভাবে জবাব দিলে তার কথাগুলো বেসুরো হবেনা।

বার্থের উপর আবার আগেকার ভঙ্গীতে বসে বইটা হাতে নিয়ে যেন একটুখানি ইতস্ততঃ করে মেয়েটি বল্‌লে, আমি আপনার উপর রাগ করে পাখাটা ঘুরিয়ে দিয়েছি এমন যেন মনে করবেননা।

অনলের সত্যি-সত্যিই কথা জোগাচ্ছিলনা। সে কোন মতে বল্‌লে, না, না, ওরকম আমার মনে মোটেই হয়নি।

তারপর গভীর গম্ভীর নীরবতা। দানবের শক্তিতে লোহার চাকাগুলোকে পিষে পিষে চলেছে মেল্‌ট্রেণ, আর তার একটি কামরায় বসে ওই বিচিত্রলীলাময়ী মেয়েটির কয়েকঘন্টার সাথী অনল অনুভব করলে যে ছায়ামেশানো অস্পষ্ট আলোর প্রহেলিকায় পড়ে মনের ভাষাকে সে খুঁজে পাচ্ছেনা।

ট্রেণের দোলানিতে তার চোখ যখন আবার জড়িয়ে আস্‌ছে তখন সে তার লুপ্ত-প্রায় সাহসটুকু সঞ্চয় করে পাঠনিরতা সহযাত্রিণীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, আপনি কতদূর যাচ্ছেন?

বইএর পাতা থেকে চোখ না সরিয়েই মেয়েটি জবাব দিয়েছিল, অনেকদূর…

ভোরের আলো ফুটবার সাথেসাথেই অনলের ঘুম ভাঙ্গল নীলকুর্ত্তিপরা কুলীদের চেঁচামেচিতে। যেন মস্ত বড় একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে এম্‌নিভাবে অনল ধড়মড় করে উঠে বস্‌লে।

ট্রেণ একটা ষ্টেশনে থেমেছে আর তারই কামরা থেকে জিনিষপত্র নামিয়ে নিতে গিয়ে দুটো কুলী চীৎকার করছে। প্ল্যাটফরম্‌এর উপর দাঁড়িয়ে রাত্রির সেই সহযাত্রিণী। ভোরের শুচিস্নিগ্ধ আলোয় তার মুখখানা দেখাচ্ছিল একটি স্ফুটনোন্মুখ পদ্মের কুঁড়ির মত। অনল মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইল।

অনল ঘুম থেকে উঠে পড়েছে দেখে মেয়েটি জানালার কাছে এগিয়ে এসে বল্‌লে, চল্‌লাম…নমস্কার।

ট্রেণ তখন ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করেছে। অনল বাইরের দিকেই তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ তার চোখ পড়ল, একটা কুলী তার কামরার দিকে ছুটে আস্‌ছে। অনলের দিকে তাকিয়ে সে চীৎকার করে বল্‌লে, বাবু, একঠো কিতাব…

তাড়াতাড়ি অনল পাশের বার্থের দিকে তাকালে। দেখলে, একখানা বই এককোণে পড়ে আছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে বইখানা হাতে তুলে নিয়ে অনল তার প্রথম পৃষ্ঠাটি খুলে দেখলে। সুশ্রী পরিচ্ছন্ন হাতে লেখা আছে একটি নাম—শ্রীঅপরিচিতা দেবী।

বাইরে কুলীটা তখনও ছুটে আস্‌ছে অনলের কামরা লক্ষ্য ক'রে। অনল তাড়াতাড়ি বইটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলে।

ট্রেণ তখন প্ল্যাটফরম্‌ ছেড়ে চলে এসেছে। অনল মাথাটা বাড়িয়ে যতদূর দেখা যায় তাকিয়ে লক্ষ্য করলে, মেয়েটি সকৃতজ্ঞ চোখে আবার তাকে নমস্কার করলে এবং কী যেন বল্‌লে…

আমি অনলের দিকে স্তব্ধভাবে তাকালাম। দেখি, অজানা এক ব্যথায় তার মুখখানা হয়ে উঠেছে বিবর্ণ, পাণ্ডুর।

বললাম, চুপ করে রইলে যে অনল?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বললে, এ যেন হয়ে গেল একটা রহস্যময় লুকোচুরীর খেলা। যবনিকার অন্তরালে যা' ছিল তাকে নগ্ন আলোতে নিয়ে আসবার দম্ভ এবং সাহস আমার ছিলনা বলেই বোধ হয় আমার অপরিচিতা দেবী হয়ে রইলেন আমার কাছে চির-অপরিচিতা!

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তোমার অপরিচিতা দেবী?

উষ্ণ হয়ে অনল জবাব দিলে, আমার নয় ত কি? সেই আলোছায়াপূর্ণ অখণ্ড অবসরে অপরিচিতা দেবীকে যেমন নিবিড় করে পাবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম এমন সুযোগ কি আর কারও হয়েছে কোন দিন?

অনলের লজিকএর সাথে আমি তর্ক করিনি।

অনলের এই কাহিনী তোমরা হয়ত বিশ্বাস করবেনা, কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি, আমি একেবারে অবিশ্বাস করতে পারিনি। নিশুতিরাতে এমন লীলাময়ী যাত্রাসহচরীর সাথে এক কামরায় ভ্রমণ করবার সৌভাগ্য আমার কখনও হয়নি সত্য, কিন্তু তাই বলে অনলের জীবনের যে ঘটনাটুকু ঘটেছিল তা' আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়না। আমার অভিযোগ শুধু এই যে, এই রোমান্সের সাথে পরিচয়ের আকস্মিকতা যদি অনলকে অমনভাবে বিহ্বল ক'রে না তুলত তাহ'লে তার অপরিচিতাদেবী আজ হয়ত আমাদের কাছে চিরপরিচিতা হয়ে থাকৃতেন!

শ্রীনবগোপাল দাস

আগমনী

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

জাগো নিদ্রিত, জাগো নিৰ্জ্জীব,
চেতনাবিহীন জাগো !
পদতলে দলি অসুর-অশিব
মলিন মর্ত্ত্যবাসে,
দৈত্যদলনী আসে,
বিঘ্ন-হরণ সার্থক বর
মুক্তকণ্ঠে মাগো।

রুদ্ধ ঘরের ভাঙো অর্গল
ক্রুদ্ধ মনের তেজে,
পঙ্গু করিল যত শৃঙ্খল
বজ্রকঠিন ডোরে,
দূর করি দাও জোরে,
বাঁধন-ভাঙার ঝন্‌ঝনা আজি
ধরায় উঠুক বেজে।

উদ্যত ওই দশ প্রহরণ
মরণ-হরণ হাতে,
আয়ুধে আয়ুধে অভয় লিখন
বিজলী চমকে ঝলে,
হৃদয়ে তার আলো জ্বলে,
সান্ত্বনা তাহে ফুটিয়া উঠিছে
আশীর্ব্বাণীর সাথে।

কোথা প্রেমহীন, অশ্রুমলিন,
মৃত্তিকালীন ওরে !
কাঙালপনায় হোলো আয়ু ক্ষীণ
ভিক্ষা পাত্র বহি,
চির অসহায় রহি,
যে গ্লানি লভিলি ধুয়ে মুছে ফ্যাল্
আজি নিঃশেষ ক'রে।

দিকে দিকে মার জাগে রাঙা পা'র
গভীর রক্ত-রেখা !
আজি আনন্দ সীম নাহি তার,
শ্রদ্ধায় করো নতি,
আসিছেন ভগবতী,
কোটি ভাই বোন লিখুক বক্ষে
শক্তির নব লেখা।

———

বাড়ীর মেয়ে

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

তারে দেখিলাম,—(জানিয়াছি নাম ;
বলিতে কেমন বাধে,)—
ঘুরায়ে আঁচল বেড়ি' কটিতল
গৃহকাজ তার সাধে।

একরাশ চুল করেছে আকুল
খোঁপা খুলে যায় ভারে,
কাজে জোড়া হাত, ভারী উৎপাৎ,
কে অত বাঁধিতে পারে !

অন্দরদ্বার খোলা একধার
ভিতরে ছবির মতো,—
খাট আল্‌মারী বাক্সের সারি,
সাজানো আরো কী কত !

টেবিলেতে বই, দোল্‌নাটি ঐ
টাঙানো ঘরের মাঝে,
ফটো খানকয় দেয়ালেতে রয়,
আল্‌নাটি কোণে রাজে।

মেঝে চৌকাঠ, সবই ফিট্‌ফাট্
ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে,
ঝুল্, ধূলাবালি, ন্যাকড়া বা কালী
পড়ে না কোথাও চোখে।

চৌকির পরে পরিপাটি ক'রে
সেলায়ের কল রাখা,
নূতনইবা হবে ধোয়া ধব্‌ধবে
ফুলতোলা তার ঢাকা।

বিছানার কাছে টিপয়েতে আছে
পিতলের ফুলদানী,
জল আছে গ্লাসে, তারি এক পাশে
মস্‌লার বাটাখানি।

খোলা জানালায় পর্দার গায়
আঁকা লতাপাতা পাখী,
সকালবেলাতে আলোর খেলাতে
রঙে সব মাখামাখি।

ছেলেপিলে সব তুলি' কলরব
এধারে ওধারে ছোটে,
—ভাইবোন ওরা মুখ হাসিভরা
মধু ঝরে কচি ঠোঁটে।

ছোটো যে সবার তারি আব্‌দার
একবার চড়ে কোলে ;
দেয় চকোলেট্, খেল্‌নার সেট্,
তবু কি মর্জ্জি ভোলে !

ফুরসুৎ কই, কাজে থৈ থৈ,
বেলা যায় বেড়ে বেড়ে,
তবু ছোটোভাই, খুশি করা চাই—
তুলে লয় বাহু-ঘেরে।

আজ রবিবার পড়া করিবার
আছে কিছু কম তাড়া,
ইস্কুল নাই, ঘরে আজ তাই
বহু কাজ চাই সারা !

যত ছেঁড়া খোঁড়া চাই রিপুকরা,
বুনিতে রয়েছে মোজা,
হবে রোদে দিতে বিছানাপাটিতে
মস্ত সে এক বোঝা !

ছোটোদের স্নান মাখানো সাবান,
সাথে ল'য়ে ব'সে খাওয়া,
আছে থালামাজা, পরে পানসাজা ;
কাজ সেরে কাজে ধাওয়া !

না জানে শ্রান্তি, কোথাও ভ্রান্তি
নাই তার এতটুক্
ঘর হতে ঘরে যেতে ক্ষণতরে
খেলে গেল সেই মুখ।

সরল হৃদয় নাই দ্বিধা ভয়,—
কে দেখে, কে বা কী বলে !
দেখিলাম চেয়ে সহজে সে মেয়ে
বাড়ীতে কেমনে চলে !

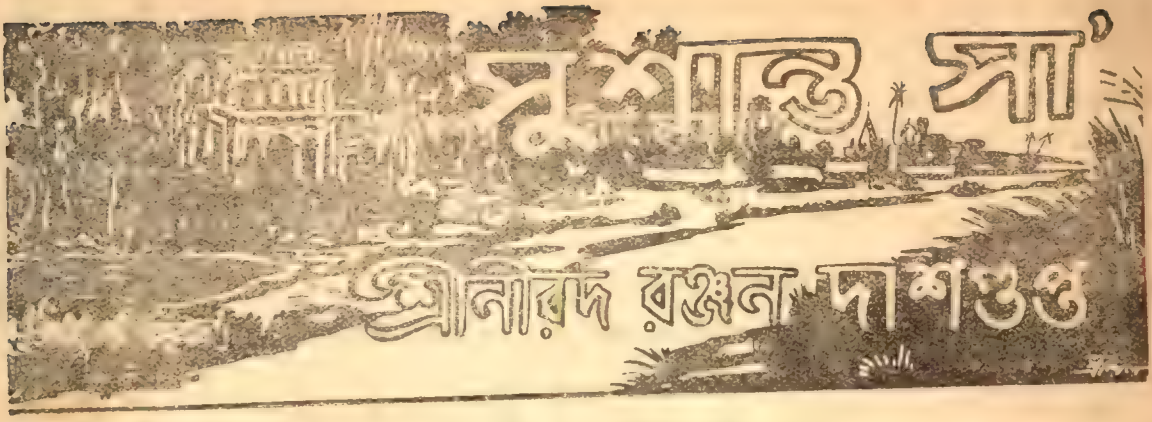

১৫

সুলোচনা দিদির সঙ্গে এলাহাবাদ যাওয়ার কথাবার্ত্তা হওয়ার ৭।৮ দিন পরেই হঠাৎ বাড়ী থেকে মণ্টীবোঠানের এক চিঠি পেলাম।

মাধবপুর ছেড়ে কলকাতায় আসার পর মণ্টীবোঠানের চিঠি এই প্রথম। প্রায় দেড়মাস হতে চল্‌ল, কলকাতায় এসেছি, এতদিন দেশ থেকে এক বাবাই আমার কাছে চিঠি পত্র লিখতেন। মার চিঠি পত্র লেখার অভ্যাস একেবারেই ছিল না এবং দাদা-বোঠানও এতদিন আমার কাছে কোনও চিঠিপত্র লেখেন নি। তাই বোধহয় হঠাৎ মণ্টী-বোঠানের কাছ থেকে খামে এক চিঠি পেয়ে একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম। বিশেষ আগ্রহ ভরে চিঠি খুলে পড়তে লাগলাম—

ভাই ঠাকুরপো!

আশা করি এখনও আমাদের একেবারে ভুলে যাননি। প্রথমবার আপনার কলকাতায় যাওয়ার পরে আশা করেছিলাম দুলাইন চিঠি নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে পাব; কিন্তু দিনের পর দিন যখন কেটে যেতে লাগল, চিঠি যখন এলই না, তখন আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বাবার কাছে লেখা চিঠিতেই আপনার খবর নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে বাধ্য হয়েছিলাম। তারপর মাঝে বিশেষ ইচ্ছে হয়েছিল, আপনাকে একখানা বড় চিঠি লিখি—এদিককার সব খবর দিয়ে।

লিখ্‌তে বসেও ছিলাম—এমন সময় হঠাৎ সাবিত্রী এসে হাজির। সে এসে সব মাটী করে দিলে, কিছুতেই চিঠি লিখতে দিলেনা। বল্‌লে "খবর না চাইলে আগে থাকতে গায়ে পড়ে কেন খবর দিতে যাবে বোঠান?" যা দুচার লাইন লিখেছিলাম, আমার কাছ থেকে টেনে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। ভেবে দেখ্‌লাম, সাবিত্রীর কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। খবর তাকেই দেওয়া উচিত যার খবর নেওয়ার আগ্রহ আছে। নইলে গায়ে পড়ে খবর দিতে যাওয়া—সাবিত্রী বলে "ছিঃ ছিঃ কি ঘেন্না।" আমি বলি "তার প্রয়োজনই বা কি?"

যাই হোক, এই সব নানান কারণে আমারও চিঠি লেখা হয়ে ওঠেনি। তারপর আপনি এলেন, এসে দুদিন থেকেই চলে গেলেন। ভেবেছিলাম বলে দেব "গিয়ে চিঠি লিখ্‌বেন।" তাও বলা হলনা ঐ সাবিটার জন্য। বল্‌লে "খবরদার বোঠান—কখনও বল্‌তে পাবেনা।" ভাবলাম—তাই বেশ, সাবির কথাই শুনি। দেখিনা কদ্দিনে মনে পড়ে!

কিন্তু কিছুতেই যখন মনে পড়ল না, তখন বাধ্য হয়ে চিঠি লিখ্‌তে বসেছি। জানেন ত ঠাকুরপো, সাবির মতন একগুঁয়েমী আমার নেই। সাবির স্বভাব—ভেঙ্গে যাবে তবু মচকাবেনা।

চিঠি লিখ্‌তে বাধ্য হয়েছি কেননা চিঠি না লিখে আর উপায় নেই। আপনার দাদার কড়া হুকুম হয়েছে "এখুনিই সুশনকে চিঠি লেখ।" ব্যাপারটা একটু খুলে বলি।

সাবির মার দিন দিন যেরকম অবস্থা হচ্ছে, তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন বলে আমাদের একেবারেই ভরসা নেই।

দিন দিন যেন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তাঁর শরীর এবং জ্বর কিছুতেই ছাড়চে না। ওষুধ পত্র খেতে চাননা, জোর করে কবরেজী ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে—কিন্তু ফল হচ্ছে না কিছুই।

তিনি মারা গেলে সাবিটার কি অবস্থা হবে এই ভেবে তিনি দিনরাত কান্নাকাটি করছেন। বুঝতে ত পারেন ঠাকুরপো,—সত্যিই ত সাবির অবস্থা ভাবলে আমাদেরই বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে, আর তাঁর ত মার প্রাণ। তিনি চলে গেলে সাবির কি হবে এই ভাবনায় ভাবনায় তিনি যেন আরও ভেঙ্গে যাচ্ছেন।

দিনরাত কেবল কাঁদেন আর আমাদের বলেন "তোমরা সাবিকে নাও। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরি।"

এখন মার, আপনার দাদার, এবং আমার একান্ত ইচ্ছে সাবিকে আমাদের ঘরে আনি। ছোট 'যা' করে সাবিকে আমাদের ঘরে আন্‌তে পারলে আমি যে কি খুসী হব ঠাকুরপো, তা আর আপনাকে নতুন করে বোঝাতে হবে আজ?

তাই আপনার দাদার পরামর্শে আমি আর মা একদিন বাবাকে জোর করে ধরেছিলাম। কিন্তু তিনি উচ্চবাচ্য কিছুই করলেন না। চুপ করে আমাদের কথা শুনে গেলেন। জানেন ত কি রকম গম্ভীর লোক। তারপর আবার কাল মা যখন সেই কথাটা তুলে বিশেষ করে চেপে ধরলেন তখন খালি বললেন "দেখা যাক কি হয়।"

এখন আপনার দাদা বলেন "বাবা কিছু বলছেন না কারণ সুশনের এ বিষয় মত আছে কিনা আগে বোঝা দারকার। হাজার হলেও ত পাশ করা ছেলে, তার মতের বিরুদ্ধে বাবা কিছু ঠিক করতে পারেন না।" হয়ত আপনার দাদার কথাই ঠিক। তাই কাল রাত্রে আপনার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে আজ আমি আপনাকে এই চিঠি লিখ্‌ছি।

পাশ করা ছেলের যে কি মত, তা আর কেউ না জানলেও আমি ত জানি, কি বলেন ঠাকুরপো? কিন্তু যাই হোক আপনার হাতের একখানা চিঠি দরকার। সেই চিঠি পেলে আবার বাবার কাছে কথাটা পাড়ব।

খুব শীগগীর চিঠির উত্তর দেবেন। বুঝতেই ত পারছেন সব অবস্থা। সাবিত্রীর মার যে রকম শরীর তাতে করে আমাদের সকলেরই ইচ্ছে, যদি ঠিক হয়, আজত শ্রাবণ মাসের ১৮ই, এই শ্রাবণ মাসের ২৯শে বেশ ভাল দিন আছে, সেইদিনই শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়। নইলে সামনে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক তিনমাস কাজ হতে পারেনা। তারপরে সেই অগ্রহায়ণ মাস, ততদিন সাবিত্রীর মা যে বাঁচবেন—এ ভরসা নেই। আর ভগবান না করুন, তিনি যদি এই কাজের আগে মারা যান, তাহলে আপশোষের আর সীমা থাকবে না। আর সাবিটার দশাই বা হবে কি?

আপনাকে বেশী লেখা বাহুল্য। সবই বুঝতে পারছেন।

এদিককার আর সব খবর ভালই। ছোড়দার পড়াশুনার উপর পিসেমশাই বোধহয় একটু বেশী নজর দিচ্ছেন আজকাল, তাই সে বড় একটা আর এ বাড়ীতে আসেনা। আর সাবিত্রীর খবর? অনেক আছে। কিন্তু পত্রপাঠ চিঠির উত্তর না পেলে কিছুই দেবনা।

চিঠির আশায় পথ চেয়ে রইলাম। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা
মণ্টীবোঠান

চিঠিখানা পড়ে খানিক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলাম। আজ শ্রাবণ মাসের ১৮ই আর এই ২৯শে তারিখ রাত্রেই সাবির সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে। আর মাত্র ১১ দিন বাকী। আর ১১ দিন পরেই একদিন শুভক্ষণে সাবি হবে 'আমার'—একান্ত আমারই আপনার, চিরজীবনের জন্য। ভাবতে প্রাণখানা আনন্দে শিউরে শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল খানিক্ষণ।

সাবিকে একান্ত আপনার করে পেলে, জীবনটাকে প্রতি মুহূর্ত্তে কী রকম করে নানান রসের মধ্য দিয়ে উপভোগ করব—এই কল্পনায় সমস্ত প্রাণমন ভাসিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ। কত ছবিই না গড়লাম ভাঙ্গলাম প্রাণে প্রাণে! সেই মাধবপুর গ্রাম, সেই আমাদের বাড়ী, সেই আমাদের পুকুরঘাট, সকলের মধ্যে সাবি, আমাদেরই ঘরের বৌ, আমাদের বাড়ীর সকলের একান্ত আদরের জিনিষ এবং বিশেষকরে আমারই সঙ্গিনী। এই সব নানান রকম কল্পনায় মজগুল হয়ে রইলান খানিক্ষণ।

ভাবতে ভাবতে মন নানান চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে কোথা

দিয়ে যে কোথায় এসে দাঁড়াল এতদিন পরে ঠিক ধাপে ধাপে তাকে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। শুধু এইটুকু মনে আছে যে কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছে বলে যখন স্নান করবার জন্য নীচে কল তলায় নেমে এলাম, তখন মনের সেই কল্পনার পুলকে ভাঁটা পড়েছে, নানান বিবেচনা, নানান হিসেব নিকেশ চলছে আমার প্রাণে প্রাণে—সাবিত্রীকে নিয়ে। কলকাতার সহরের মেয়েদের বাজারে, বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজের সেই অচেনা সুন্দরীর পাশে ফেলে, সাবিত্রীকে যাচাই করে দেখে নিলাম। সুলোচনা দিদির চোখের কষ্টিপাথরে সাবিত্রীর ঠিক মূল্য বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম, এবং সেদিন রাত্রে আমাদের মেসের ছাতে, আমাদের মেসের একটী ছেলে তার একটী বন্ধুর বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসে বন্ধুর স্ত্রীর যে রূপ বর্ণনা করেছিল, সেই বর্ণনার মাপ কাঠিতে সাবিত্রীকে মেপে দেখে নিলাম; কিন্তু কোন দিক দিয়েই যেন কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারিনি।

বিশেষ অন্যমনস্ক ভাবে সমস্ত দিনটা কাটল। ক্লাশে গিয়েছিলাম, কিন্তু লেকচার এক বর্ণও শুনিনি। ভাবলাম সুলোচনা দিদির সঙ্গে একবার পরামর্শ করতে পারলে ভাল হত।

বিকেল বেলা কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে কেমন বেরুতে ইচ্ছে করল না। নিজের ঘরে গিয়ে খাটের উপর চুপ করে শুয়ে রইলাম। সমস্ত দিনের নানান রকমের এলোমেলো চিন্তার ভারে মনটা তখন বেশ ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে, সূর্য্যদেব যখন পশ্চিম গগণের প্রান্তভাগে একেবারে ঢলে পড়লেন, তখন ধীরে ধীরে উঠে আমাদের মেসের ছাদের উপর গেলাম।

চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, আশে পাশের নানান বাড়ীর ছাদে ছাদে পুরুষ মেয়েতে ভরে গিয়েছে। বিকেল বেলা কাপড় কেচে, খোঁপা বেঁধে, ফর্সা সাড়ী পরে কত মেয়ে যে আমার চারিদিকে একটু দূরে দূরে ভিন্ন ভিন্ন ছাদে বেড়াচ্ছে! আজ আমি তাদের একটু বিশেষ করে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলাম। একটুখানি লক্ষ্য করার পরেই খানিকদূরে একটা ছাদের উপরের একটী মেয়েকে যেন একটু বিশেষ রকম ভাল লাগল। দূর থেকে তার মুখের প্রত্যেক প্রত্যঙ্গটী পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু অস্ত-রবির রক্ত আভায় তার গায়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, তার পরিধানে লালপেড়ে সাড়ীর সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গিয়ে একটী মধুর রূপলাবণ্যের সৃষ্টি করেছিল। মাথায় তার ঘোমটা ছিল না, এবং তার দীর্ঘ শরীরের গড়নের মধ্যে তার যৌবনের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য এতদূর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। মনে পড়ে গেল এক ইংরাজ কবির একটি কবিতার এক ছত্র—কালই কলেজে পড়েছি—

"Most Devinely Tall and devinely fair"

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সাবিত্রীর কথা, আর মনে হ'ল এই ২৯শে সাবিত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ে।

বিয়ে—একটা আজন্মের বন্ধন, এই অল্প বয়সেই আমার জীবনকে বেড়ী দেবে। তারপর ব্রাহ্ম সমাজের সেই অচেনা সুন্দরীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখাও হবে আমার পক্ষে মহাপাপ। প্রাণখানা সব দিক দিয়ে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে আসতে লাগল ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে।

এখন ভাবি সাবিত্রীর সঙ্গে আমি প্রেমের খেলা খেলে এসেছি, কিন্তু সাবিত্রীকে আসলে আমি কি এতটুকুও ভালবাসিনি? সবই কি ছিল একটা নেশার মোহ? একটা বুভুক্ষু প্রাণের ক্ষণিকের তৃপ্তি?

* * * *

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরের দরজা বন্ধ করে বোঠানের কাছে চিঠি লিখতে বসলাম। অনেকক্ষণ বসে নানান রকম ভেবে শেষ পর্য্যন্ত লিখলাম—

শ্রীচরণকমলেষু—

বোঠান!

এতদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে বিশেষ সুখী হয়েছি। কলকাতায় এসে আমি তোমাকে কোনও চিঠি লিখিনি, কেননা আমিও অপেক্ষা করছিলাম—দেখি, কতদিনে তোমার আমাকে মনে পড়ে। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত তোমার যে আমাকে মনে পড়ল, সেইটেই আমার সৌভাগ্য

—যদিও জানি আমাকে তুমি মনে করতে বাধ্য হয়েছ—আমার জন্য নয়, আর একজনার জন্য।

সাবিত্রীর মার অবস্থার কথা শুনে বিশেষ দুঃখিত হলাম।

আমার মনে হয় অন্য জায়গা থেকে একজন ভাল ডাক্তার ডাকিয়ে তাঁর চিকিৎসা করান উচিত। যদু কবরেজের চিকিৎসায় বিশেষ কিছু হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। এ বিষয় তুমি বাবাকে জোর করে বোল—বলে একটা ব্যবস্থা করো। তুমি না করলে আর কেউ গা করবে না। তুমি এ বিষয় কি করলে না করলে পত্র পাঠ আমাকে জানিও। আমি বিশেষ ব্যস্ত রইলাম।

তারপর বিয়ের বিষয়। তুমি ও কথা আমাকে লিখেছ কেন বুঝতে পারলাম না। আমার মতে কি হবে? এ বিষয় বাবা বর্ত্তমানে আমার কোনও মতামত দেওয়াই ধৃষ্টতা। তোমরা পাচজন আমার মাথার উপর রয়েছ। এ বিষয় আমার চিন্তা করবারই বা দরকার কি!

তবে, তোমাকে বলতে আমার কোনও বাধা নেই, এখুনিই বিয়ে করে একটা বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে আমার বিশেষ ইচ্ছে নেই। তাতে লেখাপড়ার বাধাই হবে। লেখাপড়া শেষ করে, বিয়ে করব—এইটেই আমার চিরকালের ইচ্ছে।

তোমাদের বিস্তারিত খবর দিয়ে, সাবিত্রীর মার খবর জানিয়ে পত্রপাঠ উত্তর দিও কিন্তু।

ইতি—

স্নেহের
ঠাকুরপো
সুশান্ত সা

চিঠি শেষ করে, আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ইতিমধ্যে কখন যে সমস্ত আকাশ ছেয়ে মেঘ করেছিল লক্ষ্য করিনি।

আলো নিভিয়ে খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে লক্ষ্য করলাম সমস্ত আকাশখানা কালো মেঘে থম্ থম্ করছে আর থেকে থেকে বিদ্যুত চম্‌কে চম্‌কে উঠছে।

বিছানায় শুয়ে আকাশের ঐ রকম অবস্থা দেখে মনটা যেন কেমন খারাপ হয়ে গেল—কেমন যেন একটা উদাস উদাস ভাব। চুপ করে শুয়ে আছি, ঘুম আসছে না,—কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হ'ল।

নিঝুম রাত্রি—চুপ করে জানালা দিয়ে বাইরে বৃষ্টির দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে ক্রমেই যেন প্রাণটা আকুল হয়ে উঠতে লাগল। নানান স্মৃতি—অতীতের স্মৃতি—প্রাণের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগল। সেই আমার—মাধবপুর গ্রাম, সেই তার বর্ষার রাত্রি—কতদূরে? সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের মধ্যে ভেসে উঠল সাবিত্রী। এই গভীর রাত্রির ঘন বর্ষায় সে কোথায়, কত দূরে! এক দূর নিভৃত পল্লীগ্রামে একখানি জঙ্গলাকীর্ণ পোড়ো বাড়ীতে রুগ্না মাতাকে পাশে নিয়ে নিতান্ত একাকিনী ঘুমিয়ে আছে সাবিত্রী—কেউ নেই, জগতে কেউ নেই তার। আকুল আগ্রহে সে জড়িয়ে ধরতে চায় আমাকেই, আর আমি তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি। নিষ্ঠুরের মত তীক্ষ্ণধার ছুরি পাঠাচ্ছি বৌঠানের চিঠির মধ্যে, তারই বুকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য।

অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইলাম। বাইরে অন্ধকারে আকাশ ভেঙ্গে সমানে বৃষ্টি পড়ছে আর আমার প্রাণ আকুলতায় ভরে উঠছে কাণায় কাণায়—সাবিত্রীর জন্য।

উঠলাম বিছানা ছেড়ে। আলো জ্বালালাম। যে চিঠি-খানা লিখেছি, বার করে আবার একবার পড়লাম।

"তবে তোমাকে বলতে আমার কোনও বাধা নেই"—ইত্যাদি নীচের দিকটা সবই দিলাম কেটে,—এমন ভাবে যে বৌঠান যেন পড়তে না পারেন। তার পরিবর্ত্তে লিখলাম—

"তবে তোমার কাছে চুপি চুপি বলতে আমার কোনও বাধা নেই, সাবিত্রীর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয় ত আমি বিশেষ সুখী হব। সাবিত্রীকে তুমিও জান আমিও জানি—অমন মেয়ে পাব কোথায়! সত্যি কথা বলতে গেলে সেত আমাদেরই বাড়ীর একজন। তাকে কি এখন আর পর করা যায়!"

* * *

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে দেখি মেঘ কেটে গেছে, রোদ উঠেছে আকাশ জুড়ে। কলেজে যাওয়ার সময়,

কাল রাত্রে ঝোঁকের মাথায় আগের লেখা কেটে দিয়ে যা নতুন লিখেছিলাম, সবই আবার কেটে দিলাম। কেন ঠিক মনে নাই। উচ্ছ্বাসটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল, তাই লজ্জা হল কি? জানিনা। তার পরিবর্ত্তে আবার লিখলাম—"তবে তোমরা পাঁচজনে যদি মত করে সাবিত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও, আমার দিক দিয়ে আর আপত্তির কারণ কি থাকতে পারে।"

* * *

কলেজে যাওয়ার সময় চিঠি ডাকে দিয়ে গেলাম। চিঠি ডাকে দেওয়ার পর থেকে কেমন যেন একটা চাঞ্চল্যে ভরে উঠল সারা প্রাণখানা। কলেজ থেকে ফিরে সমস্ত বিকেলটা কোথাও যেন একদণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না। ললিতদের বাড়ী গেলাম, খবর নিলাম, স্বলোচনা দিদি বাড়ীতে নাই। ললিত রাজী হল না, তাই একলাই ট্রামে উঠে বেড়াতে চলে গেলাম— গড়ের মাঠে।

বিয়ে—সাবিত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ে; শেষ পর্য্যন্ত তাই হ'ল। আমি যখন মত দিয়েছি এবং বোঠান মা সকলেরই যখন একান্ত ইচ্ছা, তখন বাবা কোনও আপত্তি করবেন না—এ বিশ্বাস আমার ছিল। কাজেই আর দশ দিন পরেই সাবিত্রী হবে আমার—একান্ত নিজের।

ঠিক যখন হলই তখন সব হিসেব নিকেশ ভুলে গিয়ে মন আবার রঙ্গিন হয়ে উঠল। সাবিত্রীকে নিয়ে নানান পুলকের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম,—কল্পনা-রাজ্যে। এবং বেড়িয়ে যখন রাত্রে মেসে ফিরে এলাম, তখন প্রাণ আমার সাবিত্রীকে নিয়ে ভরপুর।

পরের দিন কলেজে যাওয়ার সময় মেসের চাকরটাকে বিশেষ করে বলে গেলাম যে আমার নামে যদি কোনও টেলিগ্রাম আসে, তাহলে যেন সে রেখে দেয়—ফিরিয়ে না দেয়। কেননা মনে মনে হিসেব করে দেখে নিয়েছিলাম, আমার চিঠি বেলা ১২টা ১টার সময় মণ্টী বোঠান পাবেন, এবং বেলা ১২টা ১টাতেই বাবা খেতে ভিতরে আসেন, নিশ্চয়ই কথাটা তখুনিই উঠবে; তখুনিই যদি ঠিক হয় এবং বিকেলেই যদি বাবা আমাকে তার করতে লোক পাঠান,—তবে বিকেলেই, হয়ত আমি কলেজ থেকে ফিরে আসবার আগেই টেলিগ্রাম এসে যেতে পারে।

যাই হোক সে দিনটার বিষয় আমার একটু সন্দেহ ছিল কিন্তু পরের দিন আমি প্রায় নিশ্চিতই ছিলাম যে আজ টেলিগ্রাম আসবেই। তাই যখন পর পর ৩।৪ দিন কেটে গেল কোনও তার এলনা তখন আমি সত্য সত্যই ব্যকুল হয়ে উঠেছিলাম।

মন তখন আমার ষোল আনা আকুল হয়ে উঠেছে সাবিত্রীকে জীবন সঙ্গিনী করবার জন্য। বোঠানকে চিঠি লেখার পর থেকে দিন রাত প্রায় সাবিত্রীর কথাই ভাবি এবং নিত্য রাত পোহানের সঙ্গে সঙ্গেই এক একটা নতুন আশার পুলকে পাগল হয়ে উঠি।

যাই হোক, ২৪শে ২৫শে ২৬শে ২৭শে কেটে গেল কোনও খবর এল না। ক্রমেই মন হতাশায় ভরে উঠছিল এবং ২৯শে সকালবেলা সত্য সত্যই প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম।

* * *

শ্রাবণ মাস কেটে গেল। ভাদ্র মাসেরও ৭।৮ দিন হয়ে গেছে। মণ্টী বোঠানের চিঠির কোনই জবাব এলনা। ইতিমধ্যে বাবার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি, কিন্তু তাতে ওসব বিষয় কোন কিছুরই এতটুকু আভাষ ইঙ্গিত পর্য্যন্ত ছিলনা।

কি হল? মনকে বোঝাই, হয়ত পূজোর সময় আমার বাড়ী যাওয়া পর্য্যন্ত বাবা অপেক্ষা করছেন। পূজোর সময় যা হয় একটা কিছু ঠিক হবে। কিন্তু মন কিছুতেই বোঝে না। মণ্টী বোঠান চিঠির জবাব দিলে না কেন? সাবিত্রীর মার যে রকম অসুখ তাতে এ বিবাহ পূজো পর্য্যন্ত রাখাত মোটেই যুক্তির কাজ হচ্ছে না। বাবা কি সেটুকু বিবেচনা করেননি?

যাই হোক ১৩ই ভাদ্র মণ্টী বোঠানকে আর একখানি চিঠি লিখলাম। একটু অনুযোগ দিয়েই লিখলাম চিঠির উত্তর না দেওয়ার জন্য। এবং বারে বারে বিশেষ করে অনুরোধ করে লিখলাম পত্র পাঠ চিঠির উত্তর দেওয়ার জন্য।

১৯শে ভাদ্র সকাল বেলা মণ্টী বোঠানের চিঠি পেলাম। তৎক্ষণাৎ আমার ঘরে গিয়ে জানালার কাছে আমার খাটের উপর বসে চিঠিখানা পড়লাম। লেখা ছিল—

ভাই ঠাকুরপো!

চিঠি লিখিনি বলে রাগ করেছেন। কি লিখ্‌ব! লেখার কিছু ছিল না। তাই এতদিন কোনও চিঠি লিখিনি।

লেখার কিছুই ছিলনা—একথা বললে অবশ্য ঠিক সত্য কথা বলা হবে না। লেখার ছিল অনেক। কিন্তু আপনাকে সে সব কথা লিখতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। তাই এতদিন চুপ করে ছিলাম।

আপনার চিঠিখানা পড়ে বুঝতে পারলাম, কি রকম অস্থির ভাবে আপনি দিন কাটাচ্ছেন। তাই ভেবে দেখলাম আপনার কাছে সমস্ত খুলে বিস্তারিত লেখাই ভাল, আর আমি না লিখলে সব কথা খুলে আপনার কাছে লিখবেই বা কে?

আমার চিঠির উত্তরে আপনি যে চিঠিখানা লিখেছিলেন পেয়েই আমি মাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। মা চিঠিখানা পড়ে অত্যন্ত সুখী হলেন, এবং আমাতে মাতে পরামর্শ হল আমরা দুজনেই একসঙ্গে বাবাকে বিশেষ করে ধরব যাতে শ্রাবণ মাসের ২৯শেই বিয়ে হয়।

সেইদিনই রাত্রে বাবা যখন খেতে এলেন আমি ও মা দুজনেই বাবার সামনে কথাটা তুলে বাবাকে বিশেষ করে অনুরোধ করলাম। বাবা সমস্ত শুনে, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "সাবিত্রী মেয়েটীর সঙ্গে তুমি ত বেশ ভাল করেই মিশে দেখেছ বৌমা! তোমার কি মনে হয় মেয়েটী সত্যই ভাল?"

উত্তরে আমি অবশ্য উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সাবির প্রশংসা করতে লাগলাম বাবার কাছে। এবং শুধু তাই নয়, বাবাকে বলেও দিলাম যে সাবির সম্বন্ধে আপনিও খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।

বাবা শেষ পর্য্যন্ত বললেন "তোমাদের সকলেরই যখন ইচ্ছে তখন আর আমার অমতের কি কারণ থাকৃতে পারে। মেয়েটি দেখতে ত বেশ।"

ঠাকুরপো! শুনে আহ্লাদে আমার প্রাণ নেচে উঠল। বাবা যখন একবার মত দিলেন, তখন যে সে মত আর সহজে ওল্টাবে না—বাবার বিষয় এ আর কে না জানে?

সেদিন রাত্রে আর কোনও কথা হল না। পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তিনি যখন বাইরে যাচ্ছিলেন হঠাৎ আমাকে ডাকলেন। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন "বৌমা! কাল রাত্রে সুশনের বিয়ের বিষয় যে সব কথাবার্ত্তা হয়েছে, এ নিয়ে তোমরা আর কিছু উচ্চ বাচ্য বা আলোচনা করোনা। আমি আর একটু বিবেচনা করে দেখি, তারপর যখন সময় হবে, আমিই সকলকে বল্‌ব।"

এই বলে বাইরে চলে গেলেন।

আমি আর কাকেই বা বল্‌তাম। এক আপনার দাদা। —তা তিনি ত সব খবরই জান্‌তেন। আর এক সাবি স্বয়ং। তাকে অবশ্য সুখবরটা দেওয়ার জন্য মনটা ছটফট করছিল। যাই হোক, বাবা যখন বারণই করলেন—চেপে গেলাম, সাবিকেও কিছু বল্‌লাম না।

মাকে জিজ্ঞাসা করলাম "মা! বাবা আবার কি বিবেচনা করছেন। কিছু গোলমাল আছে নাকি?"

মা হেসে বললেন, "না রে না। ওঁর নিজেরও মনে মনে খুব ইচ্ছে। সাবিকে উনিও খুব পছন্দ করেন। তবে বিশেষ হিসেবী লোক, ২।১ দিন বিবেচনা না করে কোনও কথা দেবেন না।"

আমি বল্‌লাম "মা! ২৯শে ত কাজ হওয়া দরকার।"

মা বল্‌লেন "হ্যাঁ রে হ্যাঁ। যদি হয় ত ২৯শেই হবে।"

তার পরের দিন কাটল, কোনও কিছু কথা হলো না। সেইদিন রাত্রে আপনার দাদার কাছে শুনলাম যে তার পরের দিন সদর থেকে সরকারী বড় ডাক্তার সাহেব আস্‌চেন সাবির মাকে দেখবার জন্য। বাবা বিকেলেই লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন সদরে। শুনে যে কি রকম আনন্দ হ'ল প্রাণে, সহজেই বুঝতে পারেন। বাবা এর মধ্যেই মনে মনে ওদের আপনার করে নিয়েছেন।

পরের দিন বেলা ১২টা ১২॥ টা আন্দাজ ডাক্তার সাহেব এলেন। বাবা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন সাবিদের বাড়ী। সাবির মা ত এখন একেবারে শয্যাশায়ী—উঠে দাঁড়াবারও আর শক্তি নেই। সেখানে তিনি নাকি অনেকক্ষণ সাবির মাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন।

ঠাকুরপো! এই ডাক্তার আনাই হ'ল কাল। ডাক্তার ত

দেখে শুনে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে বাবার কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তিনি যে একটা জীবনের সর্ব্বনাশ করে দিয়ে গেলেন, তাকি তিনি বুঝে ছিলেন!

সেইদিন রাত্রে খেতে বসে দেখলাম বাবার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। জানেন ত বাবার সেই রকম একটা গম্ভীর ধরণ,— যখন আমরা কেউই বাবার সঙ্গে কথা কইতে সাহস করি না।

রাত্রে খেয়ে দেয়ে বাড়ী শুদ্ধ সবাই যখন শুয়ে পড়েছে, হঠাৎ শৈলিঝি এসে আমাদের শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলে। বল্লে "বৌমাকে বাবু ডাকছেন।"

তাড়াতাড়ি উঠে বাবার শোবার ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখি বাবা চুপ করে বিছানায় শুয়ে আছেন আর মা বিছানার একপাশে বসে আঁচলের খুঁটে চোখ পুঁছছেন। বাবা আমাকে দেখে বল্লেন "বৌমা! এস বসো।"

আমি চুপ করে গিয়ে বাবার পায়ের কাছে বস্লাম।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা বল্লেন "বৌমা! তোমাকে একটা কথা বলি। একথা আমি এবং উনি,—এ ছাড়া আর কেউ জানে না এবং এখন তোমায় বল্‌ব। কিন্তু বিশেষ সাবধান, কেউ যেন টের না পায়।"

আমি চুপ করে বসে রইলাম। আমার বুকের মধ্যটা কি রকম কেঁপে উঠল।—

বাবা একটু চুপ করে থেকে আবার বল্‌তে লাগলেন "আজ জেলার ডাক্তার সাহেব এসে সাবির মাকে দেখে গেলেন, জান বোধহয়। তিনি আমাকে চুপি চুপি বলে গেলেন—সাবির মার যক্ষ্মা হয়েছে, এবং অত্যন্ত খারাপ জাতীয় যক্ষ্মা। এ রোগে আর নিস্তার ত নেইই, বড় জোর আর মাস খানেক বাঁচবেন। শুধু তা-ই নয় ডাক্তার সাহেব আরও বল্লেন এ জাতীয় যক্ষ্মা বংশ পরম্পরায় চলে।"

বাবা একটু চুপ করে রইলেন। আমার চোখের সামনে সমস্ত জগৎটা যেন বন্ বন্ করে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল।

একটু পরে বাবা আবার বল্লেন "কাজেই বুঝ্‌তে পারছ, সুশনের সঙ্গে সাবির বিয়ে দেওয়া অসম্ভব। শুধু তাই নয়, একথা যদি প্রকাশ হয় সাবির বিয়ে দেওয়াই সম্ভব হবেনা। তাই আমি ঠিক করেছি আমি কাল থেকেই উঠে পড়ে লাগব—সাবির মা বেঁচে থাকতে থাকতে মেয়েটার একটা বিয়ে দিয়ে ফেলতে পারি কি-না। এতে যদি আমার কিছু টাকা যায়, উপায় কি? মেয়েটার কথা ভাবলে সত্যিই বড় দুঃখ হয়।"

তিনি চুপ করে গেলেন। আমিত খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে যখন আর বসে থাকা অসম্ভব হ'ল "আচ্ছা যাই" বলে কোনও রকমে নিজের ঘরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। ঠাকুরপো! সমস্ত রাত কিভাবে কেটেছে—কি আর লিখব।

বেশী আর কি লিখব! আর বিস্তারিত লিখতেও ইচ্ছা করছে না। দু একটা কথায় বাকী খবরগুলো বলে দি।

সাবির বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে—একটি দ্বিতীয় পক্ষ বৃদ্ধের সঙ্গে। শুনলাম বয়স তার প্রায় ৫০ হবে। আগের পক্ষের ছেলে মেয়ে আছে। কিছু দূরে "গাবহাটী" বলে একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামে বাড়ী। অবস্থা না কি ভাল, জমিজমা আছে, তেজারতি কারবার আছে, আরও কি কি সব আছে। তবে না কি ভয়নক কৃপণ। এবং তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—বাবার কাছ থেকে বেশ মোটা হাতে টাকা নিয়ে তবে বিয়ে করবে। সাবিকে অবশ্য দেখতে আসেনি, বলেছে তার দরকার নেই। শুনেছে নাকি মেয়ে সুন্দরী। তাই নাকি বিশ্বাস করেছে।

সাবির বিয়ে—আমাদের সাবির বিয়ে—এই পরশুর পরের দিন অর্থাৎ ১৯শে ভাদ্র। মার অসুস্থতার দরুণ, অরক্ষনীয়া কন্যা বলে ভাদ্র মাসে বিয়ে হতে পারে—বামুনরা নাকি বিধান দিয়েছেন। তবে বর, ভাদ্র মাসে বিয়েতে নাকি রাজী হচ্ছিলেন না এবং শেষ পর্য্যন্ত বাবাকে পণের টাকা বাড়াতে হ'ল—তাই রাজী হয়েছেন।

আর কি লিখব। সবইত লিখলাম। এখন পরশুর পরের দিন দাঁড়িয়ে থেকে গোধূলী লগ্নে সাবির বিয়ে দেখব; সেই আনন্দে আছি ঠাকুরপো!

তবে হ্যাঁ—একটা কথা হয়নি। সেটা আপনাকে আমার খুলে বলা উচিত। সাবি অবশ্য জানেনা তার মার অসুখের ঠিক খবরটি। তাকে সেকথা আমি কিছু বলিনি। বাবা

যখন উঠে পড়ে লেগে সম্বন্ধ ঠিক করলেন, তারপর থেকে সাবি বড় একটা আর আমাদের বাড়ী আস্‌ত না—মাকে নিয়েই থাকৃত দিনরাত।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ঘোর সন্ধ্যে বেলা কাপড় কেচে, ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বেলে প্রণাম করে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম, অন্ধকারে বারান্দার খুঁটীর পাশে কে যেন একজন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল বুঝতে পারলাম না। মনে হ'ল যেন একটি মেয়ে। সন্দেহ হ'ল—সাবি বোধহয়। তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে গেলাম।

সাবি ডাকলে "বোঠান!"

আদর করে কাছে টেনে নিলাম। ঠাকুরপো! ওকে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখেই হঠাৎ কেন যেন আমার চোখ জলে ভরে এল। কোনও কথা কইতে পারলাম না।

শান্তগলায় সাবি বল্লে—"বোঠান! তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

তাকে ওপরে আমার শোবার ঘরে নিয়ে গেলাম। আলো না জেলেই ওকে কাছে নিয়ে চুপ করে খাটের উপর বসে রইলাম।

হঠাৎ সাবি জিজ্ঞাসা করলে "বোঠান! শান্তদাকে চিঠি লিখেছ? জানেন তিনি সব?"

বল্লাম "না।"

বল্লে "লিখে দাও একখানা চিঠি কালই।"

ঠাকুরপো! এই সাবিই একদিন আমাকে সেধে আপনার কাছে চিঠি লিখতে বারণ করেছিল। আজ তার সে গৌরব সে অভিমান গেল কোথায়?

চেষ্টা করে একটু হেসে বল্লাম "তোর বিয়ের খবর। তা দেব এখন লিখে। বিয়েতে শান্তদা না এলে ভাল লাগবে না বুঝি?"

একটু চুপ করে রইল। পরে বললে "হ্যাঁ, আমার বিয়ের খবর! লিখবেত কালই?"

আমি বল্লাম "আচ্ছা।" একটু পরেই চলে গেল।

এর পরে আর আসেনি। কাল বিকেল বেলা আমি গিয়েছিলাম সাবিদের বাড়ীতে। চিরকালই ত মুখ বোজা ভাব, এখন যেন আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। বিশেষ কিছু কথাই কইলে না। যখন চলে আস্‌ছি, ওদের বাড়ীর ফটকের কাছে এসে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে:

"শান্তদার কোনও চিঠি পেয়েছ?" হঠাৎ কি বলব খুঁজে পেলাম না। আগে সে আমাকে চিঠি লিখতে বলেছিল মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি হেসে কথাটাকে চাপা দিলাম। বল্লাম "হ্যাঁ রে হ্যাঁ। খুব খুসী হয়েছেন তোর বিয়ের খবর শুনে। তোর বিয়েতে আস্‌বার খুব চেষ্টা করবেন, লিখেছেন।"

বাড়ী চলে এলাম। পথে ভাবতে ভাবতে এসেছি ঠিক যে কথাটি বলা উচিত ছিল তাইকি বলেছি।—মিথ্যে কথা বলাটা কি ঠিক হয়েছে! জানিনা ঠাকুরপো! আপনার বিষয় ও কথাটা ওরকম করে বলে ভুল করেছি কিনা।

সবই ত লিখলাম। চিঠি পড়ে আপনি ব্যথা পাবেন জানি। ভেবে বড় কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কি করব। ভেবে দেখলাম সব কথা খুলে বলাই ভাল।

মাঝে সাবির সঙ্গে খুব কমই দেখা হত। সে এক রকম ছিল ভাল। পরশুর পরের দিন বিয়ে—রোজই আমাকে সাবিদের বাড়ী যেতে হচ্ছে। ঠাকুরপো! আমি ওর মুখখানার দিকে চাইতে পারিনা।

ইতি—

মন্টীবোঠান।

চিঠিখানা শেষ করে খাণিক্ষণের জন্য কিরমক যেন বোধশক্তি লোপ পেয়ে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল ১৯শে ভাদ্র। আজই ত ১৯শে। আজই সাবিত্রী চল্‌ল বিদায় নিয়ে আমার জীবন থেকে চিরকালের জন্য, চিরদিনের জন্য। চল্‌ল পরের ঘরে—পিছন ফিরে কখনও চাইবে না।

আজ সাবিত্রীকে হারাতে বসে বুঝতে পারলাম আমার জীবনে সাবিত্রীকে হারান একেবারেই চলে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

ইউরোপের ক্ষুদ্রতম রাজ্য এণ্ডোরা

স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে যে পার্ব্বত্য অঞ্চল আছে, এণ্ডোরা রাজ্য সেখানে একটা পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত। সম্রাট চার্লস দি গ্রেটের সময় থেকেই এণ্ডোরা স্বাধীন। যাতায়াতের পথঘাট ভাল নয় বলে মার্কিন ভ্রমণকারীদের ভিড় এখানে তেমন নেই, প্রকৃতপক্ষে এণ্ডোরার অস্তিত্ব অনেকের কাছে অজ্ঞাত।

কাজেই বিংশশতাব্দী এই দেশে প্রবেশের সুযোগ পায়নি। এণ্ডোরার অধিবাসীরা এখনও সে হিসেবে মধ্যযুগে আছে। অতি সহজ সাদাসিধে জীবনযাত্রা প্রণালী এদের, কোনোপ্রকার বিলাসিতা এরা জানে না, বিলাসিতা করবার পয়সাও নেই। নির্জ্জনতা যাঁর ভাল লাগে, অনাড়ম্বর, অপেক্ষাকৃত দরিদ্রজীবন যাঁরা দেখতে ইচ্ছুক, তাঁরা এণ্ডোরায় যেতে পারেন।

হাজার বছর ধরে এণ্ডোরাতে একই ধরণের শাসনপ্রণালী চলে আসচে। একই রীতি এক হাজার বছর যে বজায় আছে, এতেই বোঝা যাবে অধিবাসীরা তাদের দেশ ও জাতীয় রীতিনীতি কতদূর ভালবাসে।

ভূমধ্যসাগরের দিকে পিরেনিজ্ পর্ব্বতমালার যে প্রান্ত, এণ্ডোরা সেখান থেকে হবে ষাট মাইল। উত্তরে ও দক্ষিণে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটী কুড়ি মাইল, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে প্রায় আঠারো মাইল-দেশের সর্ব্বত্রই বনময় উপত্যকা, দুদিকে উঁচু পর্ব্বত, মাঝে মাঝে ছোট বড় পার্ব্বত্য নদী ও ঝরণা, মাথার ওপরে সব সময়েই চিরতুষারাবৃত পিরেনিজ পর্ব্বতমালা।

এণ্ডোরা যদিও স্বাধীন রাজ্য, তবুও ফ্রান্স ও স্পেনের রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব মেনে চলে। ফ্রান্সকে বার্ষিক নয়শো ফ্রাঁ ও স্পেনকে চারশো ষাট ফ্রাঁ নজরানা স্বরূপ দিতে হয়। তবে এই কর দেওয়ার ব্যাপারটা নিতান্তই নামমাত্র ও

এণ্ডোরার কৃষক

মামুলি ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স ও স্পেন এণ্ডোরার রাজনৈতিক ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করে না।

এণ্ডোরা রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত আছে। কেউ বলে সম্রাট চার্লস দি গ্রেটের ছেলে লুই, মুরদের জয় করে এই জঙ্গলের পথে ফ্রান্সে ফিরছিলেন,

এই বনবেষ্টিত শুষ্ক উপত্যকায় অনেকগুলো সৈন্য বসবাস করবার অনুমতি প্রার্থনা করে। লুই দেখলেন ব্যাপারটা বেশ হবে, ফ্রান্স ও মুর রাজ্যের মধ্যে এমন একটী শক্ত মানুষের দেওয়াল গড়ে রাখা মন্দ নয়। এণ্ডোরার বর্ত্তমান অধিবাসীগণ সেই প্রাচীনকালের ফরাসী সৈন্যদের বংশধর। [illegible] বলেন মুরদস্যুদল আমিনের ভয়ে পালিয়ে এসে ঐ [illegible] আশ্রয় [illegible], তারপর এদের দ্বারা এণ্ডো[illegible] রাজ্য স্থাপিত হয়। দস্যুরা মুররাজকেও কর দিত আবার ফ্রান্সকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে ফরাসী সম্রাটকেও কিছু কিছু উপঢৌকন পাঠাতো সেই উপঢৌকনের মূল্য শেষে বার্ষিক [illegible] মুরিশ ভাষায় 'আল্ডাবা' কথার [illegible] কথাটার উৎপত্তি সম্ভবতঃ তা থেকেই। কেউ বলেন প্লিনি তাঁর ইতিহাসে এণ্ডোরিস বলে একদল

স্পেনে যাইবার পার্ব্বত্য পথ

জিপ্‌সি জাতির উল্লেখ করেচেন, এরা ছিল দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির যাযাবর জাতি, অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়, তারাই কোনো প্রাচীন যুগে নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে এই ঘন অরণ্যময় উপত্যকায় বসবাস্ করে।

বর্ত্তমানে এণ্ডোরা রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন একজন প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর মন্ত্রণাসভা। চব্বিশজন সভ্য নিয়ে এই মন্ত্রণাসভা গঠিত। এঁরা কেউই মাইনে পান না। শাসনকার্য্য চালাবার খরচ অনেক কমে গিয়েচে এতে। বার্ষিক রাজস্বের অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। বিচার

ভ্যালিরা নদী

বিভাগের জন্য একজনও বিচারক রাখবার দরকার হয় না, অপরাধীর সংখ্যা নিতান্তই সামান্য। যা দু একটা অভিযোগ আসে, রাজ্যের বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ অনুসারে তাদের বিচার করা হয়। লিখিত আইন বলে কিছু এখানে নেই।

ফ্রান্স ও স্পেন থেকে দুজন কর্ম্মচারী এদেশে প্রেরিত হয়, তাদের কাজ উভয় দেশের প্রাপ্য বার্ষিক কর আদায়ের ব্যবস্থা করে টাকাটা স্ব স্ব দেশে পাঠানো। নরহত্যা সাধারণতঃ ঘটে না, কিন্তু যদি কখনো হয়ে পড়ে তবে শহরের মেয়র এক মজার ব্যাপার অনুষ্ঠান করেন। বহুকাল থেকে

এণ্ডোরাতে এ প্রথা অনুষ্ঠিত হয়ে এসেচে; আজ তাকে বদলানো যায় না।

সহরের মেয়র ফ্রান্স ও স্পেনের প্রেরিত কর্ম্মচারী দুজনকে ডেকে পাঠান, অন্যান্য গণ্যমান্য লোকও উপস্থিত থাকেন। তারপরে মেয়র হতব্যক্তির মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করেন—ওঠো হে, মৃত্যু থেকে জেগে উঠে বলো কে তোমাকে মেরেচে—এবং তাকে কি শাস্তি দেবো—বলা বাহুল্য মৃতদেহ মেয়রের প্রশ্নের জবাব দেবার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখায় না।

তখন মেয়র সমবেত দর্শকদের মুখের দিকে চেয়ে বলেন—লোকটা মরে গিয়েচে, ওর কাছে কথার উত্তর পাওয়া যাবে না।

এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে মেয়র অবিশ্যি আধুনিক যুগের পুলিশের হাতেই খুনের তদারকের ভার দেন।

এণ্ডোরা পর্ব্বতময় দেশ, আগেই সে কথা বলা হয়েচে—ঐটুকু তো দেশ, যে কোনো পথেই হাঁটা যাক্ না কেন, সর্ব্বদা চোখে পড়বে পর্ব্বত। কিন্তু অন্য দেশের সঙ্গে এণ্ডোরার তফাৎ এখানে যে এণ্ডোরাতে পথিকের দৃষ্টি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য, কারণ সামনে পেছনে এবং ওপারের দিকে ছাড়া অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি পাহাড়ের বিরাট দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খায়। অনেক সময় সামনে, পিছনেও পাহাড় থাকে, সে সব জায়গায় সত্যিই মানুষের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

যাঁরা আধুনিক ধরণের হোটেল খুঁজবেন, এণ্ডোরাতে গিয়ে তাঁদের হতাশ হতে হবে। সেকেলে ধরণের সরাইখানা ছাড়া আর কোনো থাকবার স্থান মিলবে না। রেডিও ও টকি খুব কমই ঢুকেচে। এই জন্যেই মার্কিন ভ্রমণকারীর দল ওমুখো হয়না কখনো। এমনকি এণ্ডোরার পর্ব্বতগুলির মধ্যে লাবণ্যভরা সৌন্দর্য্যের অভাব আছে। এখানকার পাহাড় পর্ব্বত যেন যোগীপুরুষ, নিরহঙ্কার, নিস্পৃহ কিন্তু উদাস নয়। মানুষের অনিষ্ট করবার সুযোগ পেলে ছাড়বার পাত্র নয়। মানুষের মনের কঠিন প্রবৃত্তিগুলি এ ধরনের দৃশ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে, কোমল বৃত্তিগুলি কোথায় লুকিয়ে পড়ে।

আর কি সে গভীর নির্জ্জনতা। সেখানে নির্জ্জনতা যেন শব্দময়ী, পর্ব্বতের ওপর থেকে ঝর ঝর ধারে পতনশীল যে ঝরণা তার শব্দের সঙ্গে নির্জ্জনতার শব্দ যেন পাল্লা দিয়ে চলতে চায়।

এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামের পথ প্রায়ই সংকীর্ণ পার্ব্বত্য গিরিবর্ত্ম দিয়ে। পুলিশের সংখ্যা খুব কম, কিন্তু পথে চুরিডাকাতির আদৌ ভয় নেই। মোটর গাড়ী

লা মাসানা নদী

এ রকম রাস্তায় অচল, নীচের সমতল ভূমিতে অবিশ্যি আধুনিক প্রণালীর পিচ্‌ঢালা রাস্তা আছে, কিন্তু তার সংখ্যা বেশী নয়।

পাহাড়ের ওপরে মাঝে মাঝে মাটি পাওয়া যায় তাতে ছোট ছোট গমের ক্ষেত। তারও ওপরে কোনো কোনো স্থানে বড় বড় ফার গাছ, কিন্তু বেশীর ভাগ পাহাড় অনাবৃত,

রুক্ষ, সেখানে গাছপালা জন্মাতে পারে না। উপত্যকার শ্যামল বনানী নানা বর্ণের ফলে সমাচ্ছন্ন, সেখানে নাইটিংগেল ডাকে সব সময়। ছোট ছোট পাহাড়ী নদীর ধারে ও মাঠে ফুল খুব ফোটে।

এণ্ডোরা যদিও খুব ছোট দেশ, এখানে কয়েকটি ভাল লেখক ও সাহিত্যিক তাঁদের দেশ নিয়ে পিয়ের লোতির মত সুন্দর বই লিখেচেন। ইসাবেল স্যাভি একজন লেখিকা, এণ্ডোরার কৃষক ও শিকারীদের জীবন নিয়ে ইনি একখানা

সোলডানের পশুচারণ ভূমিতে যাইবার গিরিবর্ত্ম

ভাল উপন্যাস লিখেচেন। কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর বই মুদ্রিত হয়েচে।

এণ্ডোরার লোকে বেশী কথাবার্ত্তা বলতে ভালবাসে না। দেশের নির্জ্জনতা ও জীবনযাত্রা প্রণালীর কঠোরতা তাদের কম কথা বলতে শিখিয়েচে। তা বলে তারা অসামাজিক নয়। সকল শ্রেণীর লোকেই এখানে অতিথি সৎকারপ্রিয়, সব গ্রামে সাধারণের জন্যে সরাইখানা নেই—সেখানে গৃহস্থের

এণ্ডোরা ও স্পেনের সীমান্ত

বাড়ী আশ্রয় পাওয়া যায়, তারা খুব যত্ন করে এবং অনেক সময় টাকাকড়ি নিতে চায় না।

বার্ণার্ড নিউটন তাঁর 'Round about Andorra' নামে বইতে লিখেচেন :—এণ্ডোরার লোকদের প্রতি বাইরের লোকে ঠিক সুবিচার করতে পারে না, কারণ বাইরের লোকে তাদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পায় খুব কম। একথা খুব খাঁটি যে প্রথম দর্শনে এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা মনে জাগবে। এদের মুখশ্রী রূঢ়, গলার স্বর কর্কশ, কথ্য ভাষা ফ্রেঞ্চ ও স্পেনিশে মিশ্রিত খিচুড়ী কিন্তু ওদের বাড়ীতে ওদের সঙ্গে মিশে কিছুদিন বাস

করলেই বোঝা যাবে যে ওরা কত ভদ্র, কত সৎ ও কত কর্ম্মনিপুণ।

অধিবাসীদের মধ্যে খুব ধনী নেই, খুব দরিদ্রও নেই। যার বেশী জমি আছে, এদেশে সেই বড় লোক। পশুপালন কৃষি ও বে-আইনি মদ বিক্রী করা এদেশের লোকের প্রধান উপজীবিকা। অনেকে সস্তা ইউরোপীয় মালের আমদানি করে। ভিখারী ও ফিরিওয়ালার সংখ্যা খুব বেশী নয়।

দেশটা শুধু পাথরের, মাটীর পরিমাণ বেশী নেই, সুতরাং জমির দাম চড়া। শস্যক্ষেত্র বলতে অন্য দেশে যা বোঝায়, এখানকার শস্যক্ষেত্র সে জিনিষ নয়। কয়েক গজ মাত্র জমি পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা এই মাত্র ব্যাপার।

চোরাই মদের ব্যবসার স্থান কৃষির পরেই।

স্পেন ও ফ্রান্সের সীমান্ত প্রদেশ নিকটেই হওয়াতে বে-আইনি মদ ও কোকেনের ব্যবসা করার সুবিধে বেশী। এদের উপদ্রবে স্পেন ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট মহা ব্যতিব্যস্ত, নানা রকম নতুন আইন পাশ করে এদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েচে অনেকবার—কিছুতেই কিছু হয়নি।

গোলডেন গ্রামের ওপরে পর্ব্বতের মালভূমিতে স্পেন থেকে অনেকে মেষপাল চরাতে আসে। বহুশতাব্দী ধরে গোলডেনের পশুচারণ ভূমি প্রসিদ্ধ হয়ে আছে—তার ঘাসের জন্যে নয়, কারণ ঘাস বেশী জন্মায় না এখানকার পাথুরে মাটীতে—কিন্তু মে মাসের শেষ থেকে দক্ষিণ স্পেনে বড় গরম পড়ে, সেখানে তখন ভেড়ার দল রাখলে তাদের নানারকম রোগ হয়, শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে যায় সুতরাং লা মাঞ্চা প্রদেশের মধ্য দিয়ে তাদের নিয়ে এসে ঢোকানো হয় এণ্ডোরাতে এবং সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত গোলডেনের মালভূমির পশুচারণ ভূমিতে তারা মোলায়েম শীতের আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে হৃষ্টপুষ্ট হয়।

বড় বড় গ্রামে দু একজন লোক প্রায়ই পাওয়া যায় যারা স্পেনিশ্ কিংবা ফরাসী ভাষা বোঝে বা বলতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে কাটালান্ ভাষায় কথা বলে। বাইরের লোকের পক্ষে এ ভাষা দুর্ব্বোধ্য, তবে ইসারায় ইঙ্গিতে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। এরা খুব ভদ্র ও বিনয়ী, বিদেশীরা এদের কাছে খুব খাতির পায়, অনেক সময় বাড়ীতে জায়গা দিয়ে ও খেতে দিয়ে অতিথির কাছে দাম নেয় না।

এণ্ডোরা যাওয়ার কোনো ভাল রাস্তা ছিল না এতদিন, কিন্তু সম্প্রতি স্পেন ও ফ্রান্স পরস্পর পাল্লা দিয়ে দুদিক থেকে দুটো বড় রাস্তা তৈরী করচে। ভ্যালিরা নদীর ধার বেয়ে, একটা বিরাট পাহাড়ের তলা দিয়ে এক দুর্গম পার্ব্বত্য পথ ছিল এণ্ডোরা যাবার একমাত্র রাস্তা সে পথে অশ্বতর ছাড়া আর কোনো বাহন নিরাপদ ছিল না, এখন নিউ দুর্গেলের দিক থেকে স্পেন যে চওড়া পথ তৈরী করে দিচ্চে, তাতে মোটর চলবে। ইউরোপের সভ্য দেশসমূহ থেকে এণ্ডোরা যাওয়ার ভাল চওড়া মোটরের রাস্তা তৈরী হোলে মার্কিন ভ্রমণকারীরা কি করে বলা যায় না, কারণ দুনিয়ায় তাদের অগম্য স্থান নেই।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গলার চিত্রকলা

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

স্মরণাতীত কাল হ'তে বাঙ্গালা দেশের চিত্রবিদ্যার একটা খ্যাতি আছে। সে খ্যাতিটা ইদানীং মলিন হয়ে গেছে। বাঙ্গলার রূপবিদ্যা ও রূপশিল্প আলোচনার পথ নানা কারণে নিষ্কণ্টক নয়। এ সমস্ত বিষয়ে আদর্শের ভেদাভেদ আছে, রুচির বৈচিত্র্য আছে—সবচেয়ে বেশী আছে অর্থহীন গোঁড়ামি—যা ভালমন্দ বিবেচনায় নিজের খেয়ালকে বাড়িয়ে ফেলে। নিজের ভাল জিনিষ বোঝবার অধিকার কার কতটুকু এ বিচারের অপেক্ষা থাকে না। অরসিককে রসের নিবেদন করতে গিয়ে শেষে ঘটে হিতে বিপরীত। আধুনিক যুগে এদেশে ও পশ্চিমে আদর্শের সঙ্ঘাত ঘটেছে—তাই ভালমন্দ বিচারের মাপকাটি বদলে গেছে। ভেল্‌কীর দণ্ডের মত আজ নানাদেশে তা' অঘটন ঘটন করে তুলছে। এজন্য বাঙ্গলা দেশের চিত্রকলা আলোচনায় বহু সন্তর্পণে অগ্রসর হ'তে হয়।

পরিব্রাজক শরৎ দাস মহাশয় Pog-Sam-Zom-Zam নামক তিব্বতীয় গ্রন্থ হ'তে উদ্ধার করে দেখান যে, গ্রন্থে বাঙ্গালীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বলা হয়েছে—তাদের পরে স্থান হয়েছে নেপালের নেওয়ারদের এবং তিব্বতীয় শিল্পীদের। তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে—চৈনিক শিল্পীদের। ইদানীং ষ্টেপলটন সাহেব কোন গ্রন্থের ভূমিকায় এই উক্তিটি উদ্ধার করেছেন—তাতে দেখা যায় ইউরোপীয়দের কেউ কেউ এ বিষয় স্বীকার করতে কতকটা প্রস্তুত।

ইদানীং বাঙ্গালার চিত্র বল্‌তে কেউ কেউ বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত চিত্রাদির ধারা বোঝেন। কেউবা অন্যরকমের ধারণাও পোষণ করেন। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালীর চিত্রকলা সম্বন্ধে ধারণা অনেকের অস্পষ্ট ও বায়বীয়। এজন্য অনেকে বাঙ্গলার পল্লীকলার (Cottage Art) ছন্দ নিয়ে চর্চ্চা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। সাতকোটি বাঙ্গালীর ইতিহাসে নানাস্তরের অধিকার ও রস গ্রহণের বৈচিত্র্য ভেদে এখানে কোন একটি বিশেষ ধারা মুখ্য হয়নি। বাঙ্গালী জাতির রক্তে আর্য্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রন হয়েছে, নৃতত্ত্ববিদেরা একথা বলে থাকেন। তাঁদের উক্তির যে ভিত্তি নেই এমন বলা যায় না। বাঙ্গালীর চরিত্রে তাই ত্রিবেণী-সঙ্গম হয়েছে। আর্য্যের অসংলগ্ন অবিশেষবাদ (Generalisation) এবং নির্গুণ (abstract) ভাববিলাসে যে মুক্তি আছে বাঙ্গালীর বিচারে ও চরিত্রে তা' দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

পুঁথির মলাট—ঝুলন

অসংলগ্নভাবে বাঙ্গালী সকল দেশের ও কালের সহিত বোঝা-পড়া কর্‌তে পারে কোন রকমের নোঙ্গর তাকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারেনা। সে নানাদেশের বসনভূষণ পরে' আমোদ পায়—বিজাতীয় ও বিদেশীয়গণের সহিত সামাজিকতা কর্‌তে

পুঁথির মলাট—সংকীর্ত্তন

প্রাচীন বাঙলা চিত্রকলা—শ্রীদুর্গা

সে ক্ষুণ্ণ হয় না। এদিক্ থেকে সে চিরমুক্ত···বাঙ্গলা দেশের উপর কারও একচেটে ভাবাধিপত্য চলেনা—যা' কিছু হয় তা' সাময়িক—এ সত্য আমরা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাহিত্য জগতে বার বার দেখ্‌তে পাই। বাঙ্গালীর দ্রাবিড়রক্ত তাকে জড়বাদের বিরাটত্বের সম্মুখীন করতে উৎসাহিত করে অথচ বিশুদ্ধ দ্রাবিড়ের স্থূলতা সে উৎসাহে থাকেনা। মঙ্গোলীয় সম্পর্কে এসেছে সূক্ষ্মতা—অতি লঘু হাতের নিপুণতা (deftness)। শুধু তা' নয় মনোজগতেও সে নিপুণতার জাল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার চুল-চেরা ন্যায়শাস্ত্রে আছে দ্রাবিড়ের ঐহিকতা ও মঙ্গোলীয় সূক্ষ্মতা.. এ সমস্ত কারণে বাঙ্গালী একান্তভাবে ভাববিলাসীও নয় ভোগবিলাসীও নয়। বাঙ্গলার জীবনে বার বার ভাবের পটক্ষেপ হয় ··এর কারণ সে বৃহত্তের সম্পর্কে ক্ষুদ্রকে অহরহ পরিমাপ কর্‌তে অগ্রসর হয়···এজন্য বাঙ্গালী একঘেয়ে জীবনে তৃপ্ত নয়। এজন্য বাঙ্গলার প্রাচীন শিল্পকলায় বৈচিত্র্য এসেছে নানাভাবে···তা' না হয়ে যায় না।

ইদানীং ইউরোপে একটা নূতন ভাববিপ্লব হয়েছে তাতে করে হুবহু রচনা বা অনুকরণাত্মক শিল্প সেখানে অবজ্ঞাত হচ্ছে। কোন কোন শিল্পী যেমন Gaudier Brzska গ্রীক শিল্পকে 'D-d' বা অভিশপ্ত বল্‌তেও ইতস্তত করেনি। এজন্য আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পে অদ্ভুত সৃষ্টি হচ্ছে। পরিচিত বস্তুর স্বরূপ বর্জ্জন করে' শুধু রেখা ও বর্ণের লীলা দেখানই সেখানে মুখ্য হয়েছে। এজন্য সেখানে ইদানীং নিগ্রো শিল্পেরও সমাদর হয়েছে। একান্তভাবে প্রজ্ঞা বা বিচারমূলক বলে' ইউরোপের নব্যধরণ সর্ব্বত্র রসযুক্ত হতে পার্‌ছেনা। কিন্তু তাদের মূলতত্ত্ব আমাদের সেকেলে কুটির-কলার সারল্য ও

সংকীর্ত্তন

ঋজুতাকে বরণ কর্‌ছে। উড়িষ্যা ও বাঙ্গলা দেশের পটশিল্পে এই স্বাধীন প্রেরণা আছে যা বস্তু নিরপেক্ষভাবে অন্তরে গভীর অনুভূতি জাগ্রত করে। একসময় সাধারণ লোক কৃত্তিবাসের রামায়ণের উড্‌কাঠ দেখে প্রচুর আনন্দ লাভ কর্‌ত। এতে উদ্‌ঘাটিত হয় সহজের জয় ও সারল্যের শক্তি! অসভ্য জাতির রূপালঙ্কার এজন্য আমাদের তাক্‌ লাগিয়ে দেয়—তা'তে সত্যিকার শিল্পায়ুধের অমোঘ আয়োজন হয়ে থাকে—এজন্য তাদের নৃত্যাদি শিখ্‌তে তথাকথিত সভ্য জাতিরা অগ্রসর হচ্ছে। এদের বর্ণপ্রয়োগ ও রেখা-বিস্তারের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গ (Impressional) হেতু আছে—তা' সহজভাবেই সঞ্চারিত হয়। কৃত্রিমভাবে বর্ণসঞ্চার করে যে ফল লাভ করা যায় না, নৈসর্গিক প্রেরণায় রঙের ব্যবহার তার চেয়ে বেশী জয়যুক্ত হয়। এজন্য কুটির কলার সহজশ্রী আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

জটিল বিদ্যা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির সাহায্যে তুলিকা প্রয়োগ ও ব্যবহারে সাময়িক ফল লাভ হয় মাত্র। কোন বিশেষ সভ্যতা একটা বিশিষ্ট উপায়ে নিজের চিত্তবিনোদন কর্‌লে তা চিরন্তন শ্রী লাভ কর্‌তে পারেনা। তাতে সুগুপ্ত রস-প্রেরণা হয়ত কিছু থাকে বলেই কেউ সহজে তা' ভোলেনা, কিন্তু তা বলে তাকে নিয়ে চিরকাল কেউ সংসারধর্ম্ম চালায় না। এজন্য নানাযুগে নানা রীতির ফ্যাশান আসে এবং ক্রমশঃ তা অন্তর্হিত হয়।

কুটির কলার ভিতর এই সাময়িকতা বা বর্ত্তমানের বন্ধন নেই বলে সকল দেশে ও কালে এই ধারাটি চলে এসেছে। আদিম

বস্ত্রহরণ

ভ্রাম্যমাণ জাতিগুলির বিশ্বব্যাপী রঞ্জনোৎসাহ, বৈজন্তীয় চিত্রকলা (Byzantine) মোজেয়িকের রচনা (Mosaic) মিশরীয় ও আসীরীয় চিত্রকলার ভিতর এরকম অনাড়ম্বর ও প্রগল্‌ভ সৃষ্টির ছায়াপাত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ভারতের সর্ব্বত্র লোককলার স্তরে এই আদিম রঞ্জনের প্রেরণা বুদ্ধিবাদকে (Intellectualism) প্রত্যাখ্যান করে অগ্রসর হয়েছে।

বাঙ্গলা দেশের চিত্রকলাকে অভিনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করলে দেখ্‌তে পাওরা যাবে এতে তিনটি স্তর আছে এবং এ তিনটি স্তর তিন দিকে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ন্যায় অগ্রসর হয়ে এসেছে। এর কোনটা বাঙ্গালীর নয় বলা চলেনা। প্রথম হল পটশিল্পের ধারা। প্রাচীন পটে মুখশ্রীর স্বাভাবিকতা

কৃষ্ণ বলরাম (কালীঘাট)

তেমন নেই। পুঁথির পটেও এই প্রাকৃতবাদকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে—অথচ এগুলি অতি প্রাণবান্ সৃষ্টি—আধুনিক কাল পর্য্যন্ত অগণ্য জনতার চিত্তবিনোদন করছে। এ সমস্ত সৃষ্টিতে বর্ণ ও রেখার যুগ্মসম্বর্দ্ধনা আছে।

দ্বিতীয় ধারা—কালীঘাটের পট ভিন্নরকমের সৃষ্টি। এ সমস্ত চিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক। কিন্তু সমগ্র চিত্রই

রাধাকৃষ্ণ (কালীঘাট)

একটি রেখার অভ্রান্ত টানে রচিত—জগতের ইতিহাসে এক বাঙ্গলাদেশ ছাড়া এরকমের রচনা আর কোথাও নেই। বাঙ্গলার ত্যুরেণীয় (Turanian) রক্ত এই সূক্ষ্মতার প্রেরণা দান করেছে।

তৃতীয় রীতি দেখ্‌তে পাওয়া যায় চালচিত্রে। সেটা এখনও জীবন্ত কারণ প্রতি বৎসরই প্রতিমা রচনার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকরদের চালচিত্র রচনা করতে হয়। এ সমস্ত lyric নয়, রাজপুত চিত্রাদির মত কোন খণ্ড বিষয় নিয়ে টুকরো টুকরো বিষয়ের অবতারণা নয়। এটা হল dramatic—এ ক্ষেত্রে আছে একটা বিষয়ের পারম্পর্য্য বা ধারা। একই কাপড়ের উপর ক্রমশঃ ধারাবাহী চিত্রপর্য্যায়ের রচনা। অজান্তা বা বাগগুহার দেয়ালে যেমন ধারাবাহী বিষয়ের অবতারণা করা, চালচিত্রেও তাই করা হয়। এ রকমের ধারা

সকল বাঙ্গালীর পরিচিত। এ রকমের রচনা পুঁথির পাটার রচনার আদর্শ গ্রহণ করেনি। এখানকার চিত্রগুলিও কালীঘাটের পটের মত অনেকটা স্বাভাবিক।

কাজেই দেখা যাচ্ছে এ তিনটি ধারাতে বাঙ্গালা দেশ হৃদয়ের তিনটি বৃত্তিকে বারবার তৃপ্তি দান করেছে। বাঙ্গলার চিত্রকলা বল্‌তে এর কোন-একটিকে মনে করা ভুল হবে। এ কথা বলাই বাহুল্য যদিও ইদানীং বিশ্ববিশ্রুত হয়েছে তবুও অজান্তার চিত্রকলা প্রাক্‌ভারতীয় চিত্রকলার উপর অতি সামান্য প্রভাবই বিস্তার করেছে। গুপ্তযুগের উষ্ণ সভ্যতা একটা ফেনিল মত্ততা ও বিলাসব্যসনের ধূমায়িত আবর্ত্ত সৃষ্টি করে সব সময় তা' তৃপ্তিদান করতে পারেনি। এজন্য বাঙ্গালা দেশ সে আদর্শ গ্রহণ করেনি। গৌড়ীয় ভাস্কর্য্য যেমন স্বাধীন পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে মুক্তির ঐশ্বর্য্যে নিজকে পুষ্ট করেছে তেমনি বাঙ্গলার চিত্রকলা যে অফুরন্ত সম্পদ রচনা করে এসেছে তা' যে-কোন সভ্যতা ও শীলতার পক্ষে গৌরবজনক। রেখা প্রয়োগের অতুলনীয় কারিগর হচ্ছে চৈনিক ও জাপানীশিল্পী। তাদের অক্ষর জটিল বলে ছোটকাল থেকে সকলেই রেখাবিদ্যা (Callgiraphy) অভ্যাস করে। জাপানে ও চীনে প্রায় ছত্রিশ রকমের তুলিকার টান

শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের রচনা

(Brush stroke) প্রচলিত আছে। এজন্য সুদক্ষ কারিগরেরাও একটি রেখার টানে অভ্রান্ত ও অস্খলিতভাবে জটিল ও ভাবরস পরিপূর্ণ চিত্র আঁকতে সাহস করেনি। যে শিল্পীরা কালীঘাটের পট এঁকেছে তারা বাঙ্গলা দেশে বৈষ্ণব কবিদের ন্যায় সম্মান পাওয়ার অধিকারী। এরূপ মনোহর ভাবাত্মক রেখার কারিগরী কোথাও দেখা যায় না অথচ এতে

দুগ্ধপান যশোদা-গোপাল (কালীঘাট)

কৃত্রিম জটিলতা নেই অবান্তর ফাঁদ নেই, মনোহরণের অপ্রাসঙ্গিক অঙ্গভঙ্গী নেই। অজান্তার চিত্রকলার পরিণামে দেখ্‌তে পাওয়া যায় একটা ক্লান্তি ও একটা প্রাচুর্য্যের জটিলতা। সব সভ্যতাই পরিণামে ক্লেদ ও গ্লানিযুক্ত হয়ে বিদায় গ্রহণ করে। মৃচ্ছকটিকের আবহাওয়ায় দেখা যায় এরূপ একটা গলিত দুষ্পাচ্য সভ্যতার পঙ্কিল কর্দ্দম। যৌবনশ্রী অন্তর্হিত হলে নটী যেমন নানা হাবভাব, আবেশ ও অলঙ্করণে নিজের রুগ্নতা ঢাক্‌তে চায় তেমনি গুপ্ত সভ্যতার সন্ধ্যাগমে অজান্তায় এসেছিল একটা কৃত্রিম সাজ-সজ্জা—তার পরেই সে আদর্শ একেবারে অন্তর্হিত হয়।

বাঙ্গলা দেশের চিত্রকলার আদিম খ্যাতি কোন বিশিষ্ট সাময়িক পন্থাকে অনুসরণ করেনি। পশ্চিমভারত, মধ্য ভারত ও প্রাক্‌ভারতের রীতিতে প্রচুর পার্থক্য আছে। বাঙ্গলার চালচিত্রে যা আছে রাজপুতকলায় তা নেই। একথা অস্বীকার করা চলে না রাজপুতকলার উপর মোগল সংস্পর্শে পারস্য কলার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে—তাতে

করে' তা' lyric বা খণ্ডপ্রাণ হয়ে গেছে। ছোটখাট ভাবের টুক্‌রো নিয়ে কারবার করাই হচ্ছে এ পদ্ধতির লক্ষ্য। এটার আদি সূচনা হ'ল বইর চিত্র (Book Illustration)। মাঝে মাঝে দুএকটি চিত্র মনোরঞ্জন করে ঠিক, কিন্তু প্রত্যেকটাই একদিক হতে অসংলগ্ন—পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নয়। বাঙ্গলার চালচিত্রের মাধুর্য্য, পরম্পরা ও সৌষ্ঠব অতুলনীয়। এখনও এমন শিল্পী আছে যাদের তুলনা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। হতে রস গ্রহণ করে' চরিতার্থ হয়েছেন। ভাবপ্রকাশের দিক্‌ হ'তে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য রচনার উৎসাহ বাঙ্গলার এই তিনটি ধারায় এমনি পর্য্যাপ্তভাবে প্রকটিত করা যেতে পারে যে এজন্য অন্য কোন আদর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হয়না। তিনটি ধারার এক একটি নিয়ে নানা জায়গায় তোলপাড় হয় অথচ বাঙ্গলা দেশে এই অসীম সম্পদ্‌ সকলের চোখে পড়ছেনা। বাঙ্গলার চালচিত্র রাজপুত কলা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী

বাঙলার চালচিত্র

কাজেই দেখা যাচ্ছে কলা হিসাবে বাঙ্গলার দান অপরাজেয় ও জীবন্ত। চিত্রকলায় বাঙ্গালী যে অদ্বিতীয় তীব্বতীয় গ্রন্থকারের সেই উক্তি এখনও অভ্রান্ত মনে হয়। অথচ বাঙ্গালী আত্মভোলা—পরকে ভালবেসে যে সুখ পায়—নিজকে ও নিজের সম্পদকে সে আদর করতে শেখেনি। ইদানীং তাই অজান্তার চর্চ্চা চলেছে। দুএকজন শিল্পী, যেমন যামিনী রায় ও সুনয়নী দেবী, বাঙ্গলার প্রাচীন উৎসের একটি আয়ুধ। রেখা রচনায় বাঙ্গালী অদ্বিতীয়, চৈনিক কলাকেও হার মানতে হয়। বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গ (Expressional) রচনায় আধুনিক উরোপীয় সৃষ্টি অপেক্ষা মহত্তর জিনিষ সৃষ্টি করে' বাঙ্গলা দেশ ধন্য হয়েছে। গোগ্যাঁ, মাতিস্‌ প্রভৃতির নিগ্রো ও তাহিতী কলার সম্ভাষণ যা দিতে পারেনি বাঙ্গলার অন্তরে সে সৌন্দর্য্যশ্রী বহু পূর্ব্বেই প্রকটিত হয়েছে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

দীনেন্দ্র প্রয়াণ

জসীম উদ্দীন

মঞ্চে দাঁড়ায়ে বক্তৃতা করি দুখিনী বঙ্গমায়ে
উদ্ধার তুমি করিতে চাহনি মামুলি কথার ঘায়ে।
সরস্বতীর কমল বনেতে করি মহাকোলাহল
ভৃঙ্গ দলেরে স্তম্ভিত করি নাড়নি দীঘির জল।
চল নাই কভু রাজপথে তুমি বাজাইয়া ঢোল ঢাক,
দৈনিকে তব সংবাদ পড়ি চক্ষে লাগেনি তাক।
দেশ জুড়ে তাই তোমার স্মৃতির হয় নাই সম্মান,
তোমার মরণে হিসাব হয়নি স্বদেশের লোকসান।
কারণ তুমি ত চাহনি জীবনে সস্তা যশের হার,
সভা ও সমিতি হাততালি আর অভিনন্দন ভার।

ওসব যাহারা ভারে ভারে পায়, তুমি জেনেছিলে তারা
মণির ছলেতে কাঁচের বেসাতি বহিয়া হইছে সারা।
নিজেরে তাহারা সস্তা করিয়া সস্তার মাল কেনে,
ফাঁকা কথা দিয়ে ফাঁকা কথা পায় হাউই বাজীর বেগে।
সভা ক'রে দেশসেবা করে তারা দেশ তাই সভা ডাকি,
যুগ হ'তে যুগে দিয়েই চ'লেছে এ অভাগাদের ফাঁকি।
এ সব তোমার জানা ছিল তাই মুর্খ বেণের দলে
তোমার বাণীর বিপণির দ্বার খোল নাই কুতূহলে।

অথবা এসব কিছু
জানিতেনা তুমি, জীবনের পথে চাহনি ফিরিয়া পিছু
উর্দ্ধ আকাশে বিহার করিতে সুরের ইন্দ্ররথে
তব আনন্দ নীহারিকা হয়ে জড়াইত ছায়াপথে;
রামধনুকের সপ্ততারেতে বাজাতে মেঘের গান,
আলোকে ছায়ায় দোলা দিয়ে তারে দুলিত তোমার
প্রাণ।

তুমি জানিতে না মাটির ধরারে আকাশে ঘুরিতে ব'লে
অঙ্গে মাখনি এ মাটিরে তাই কাদা ক'রে পদতলে।
এ মাটির খেলাঘর,
তোমার নিকটে খেলাঘরই ছিল সারাটি জীবন ভর।
মাটির দেশের সম্মান খ্যাতি খেলা ঘরে অভিনয়,
এর কোন মোহে তাইত তোমার ঘটে নাই পরাজয়।
আজিকে নূতন করে,
ডাকিবনা তাই সুরের দুলাল সেই অভিনয় ঘরে।

জীবন ভরিয়া তোমার রচনা, শুনো বাতাসের পরে,
কোন সে মায়াবী স্বরেরে ছেড়েছ সযতনে ধ'রে ধ'রে।
সেই সুরজাল তখনি মিলেছে অনন্ত নীলিমায়
শিশির ফোঁটারে ধরা যায়, তারে ধরা-ছোঁয়া নাহি
যায়।

এমনি ক্ষণিক সৃষ্টিরে লয়ে ছিল যার কারবার,
মাটির ধরায় স্মৃতি রাখিবারে কিবা প্রয়োজন তার?
যেই পথে তব সুর চ'লে গেছে, সে সুর-নদীর জলে
জীবনেরে তুমি কুসুমের মত ভাসায়েছ কুতুহলে।

আজিকে তোমার মরণ-বাসরে মিলিয়াছি ভাই বোন,
অন্তরীক্ষ হইতে হয়ত শুনিতেছ ক্রন্দন।
আমরা তোমার দেশবাসী নয়, আত্মীয় পরিজন,
আমরা তোমার অতি আপনার মনে কথা কওয়া মন।

তোমার আছিল আকাশের মত সীমা রেখাহীন ঘর
তারো চেয়ে ছিল অনেক উচ্চ প্রসারিত অন্তর।
সেখানে ছিল না আপন পরের বেড়া-ঘেরা ব্যবধান।
যে এসেছে কাছে তাহারই বুকেতে ভরিয়া দিয়াছ
প্রাণ।

বিধাতা তোমারে সন্তান-বর না দিয়ে একটু ছলে,
তোমার ঘরেতে টেনে এনেছিল সব সন্তান দলে।
তাইত তোমার শ্রাদ্ধবাসরে কোরাণের বাণী গাহি
খোদা তাওলার আরস ধরিরা বেহেস্ত তব চাহি।
তোমার চিতায় লোবানের ধুঁয়া আজি আমি ছড়াইব,
সবেবরাতের রজনী জাগিয়া মোমবাতি জ্বালাইব।
মোর মোস্‌জিদে এক কোণে বসি নামাজের ছুরা পড়ি
বিনিদ্র রাতে কাঁদিব কখনও তোমারে স্মরণ করি।

জসীম উদ্দীন

বাংলা দেশে 'মুরাল পেন্টিং'

আজ আমরা বিচিত্রার পাঠকবর্গের নিকট চিত্র-শিল্পের যে বিশেষ বিভাগের উল্লেখ করতে উদ্যত হয়েছি পূর্ব্বকালে তা আমাদের দেশে প্রচলিত থাকলেও পরে বহুদিন ধ'রে এমন অবহেলিত এবং পরিত্যক্ত হয়েছিল যে তার পুনঃ-প্রবর্ত্তনকে একেবারে নূতন আমদানি বলে বিবেচনা করলেও বোধ করি বিশেষ অন্যায় হয় না। এই বিভাগটি 'মুরাল পেন্টিং' (Mural Painting) অর্থাৎ প্রাচীর চিত্র।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশের মন্দির এবং নাট-মন্দিরের দেওয়াল-গাত্রে এবং রাজপ্রাসাদ ও ধনীদিগের অট্টালিকার কক্ষপ্রাচীরে চিত্রাঙ্কন করবার রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু অন্যান্য পদ্ধতির চিত্রাঙ্কনের প্রবর্ত্তনের সহিত, পৃথিবীর অপরাপর দেশের ন্যায়, আমাদের দেশেও প্রাচীরাঙ্কণ পদ্ধতি ক্রমশঃ অবহেলিত হ'তে আরম্ভ করল এবং অবশেষে প্রায় বিলুপ্ত হ'য়ে গেল। অধুনা বিশ পঁচিশ বৎসর থেকে পুনরায়

কৃষ্ণসারথি

শ্রীনির্ম্মল গুহ

এই রীতির প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। আমাদের বাঙ্গলা দেশে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে এর প্রকৃষ্ট নমুনা পাওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারের দেওয়াল-গাত্রেও সম্প্রতি দেশীয় আদর্শে ছবি আঁকা আরম্ভ হয়েছে।

অধিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার মহাশয় তাঁর বাসভবনের দেওয়াল-গাত্রে fresco painting অঙ্কিত করিয়ে এ বিষয়ে সদৃষ্টান্ত স্থাপনের দ্বারা শিল্পী এবং রসিক সম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব

ব্যাসদেব ও গণেশ শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

কিন্তু দেশের শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সাধারণ প্রতিষ্ঠানাদির অট্টালিকা চিত্রণের উপর নির্ভর ক'রে এই বিশেষ চিত্র-বিভাগটি কখনই জীবিত থাকতে পারে না। কলিকাতা বালিগঞ্জের বিশিষ্ট

চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মল গুহ এই ছবিগুলি অঙ্কিত করছেন। তাঁদের প্রস্তুত খসড়া থেকে আমরা তিনখানির প্রতিলিপি বিচিত্রার পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

এই কার্য্য সম্পূর্ণ হ'লে শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার মহাশয়ের

নাম বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকের তালিকায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশেও মুরাল পেণ্টিং পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। প্যারিসের Sorbonne এর দেওয়ালে মিউজিয়মে Lord Leighton কর্ত্তৃক অঙ্কিত "The Arts of War", বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরীতে Edwin Austin কর্ত্তৃক অঙ্কিত "The Golden Tree", S. S. Ille de France নামক অর্ণবপোতে Jean Dupas কর্ত্তৃক অঙ্কিত

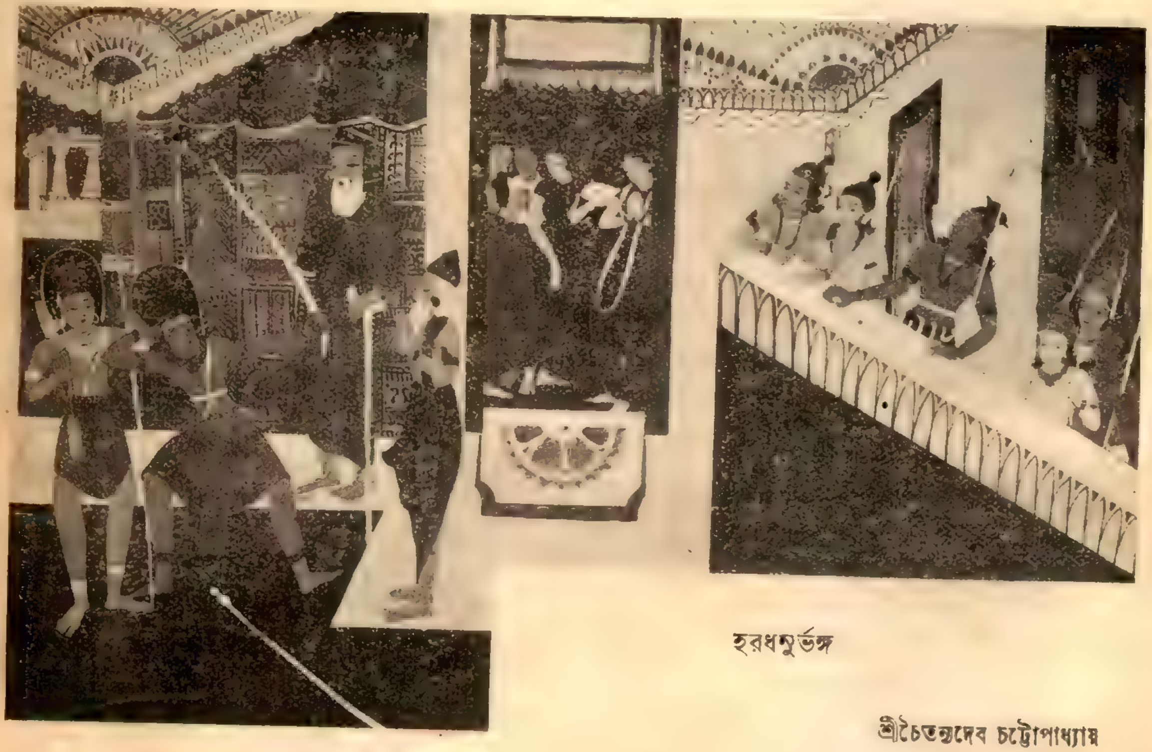

হরধনুর্ভঙ্গ

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

Puvis de Chavannes কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র, ম্যাঞ্চেষ্টার টাউন হলে Ford Madox Brown কর্ত্তৃক অঙ্কিত "The Romans Building", ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট "Sylvie" প্রভৃতি আধুনিক মুরাল পেণ্টিংএর প্রকৃষ্ট নমুনা।

সম্পাদক

পঞ্চমী

অধ্যাপক শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

পাড়া গাঁয়ে সন্ধ্যার পরই রাতের অন্ধকার ছাইয়া আসে। তায় শীতের সন্ধ্যা।

পালংগঞ্জে শূন্য হাটের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া যশোরের বিশীর্ণ পল্লীরূপ দেখিবার সৌভাগ্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। শিবরঞ্জনকে তাগাদা দিলাম, রাত্রি গভীর হইবার পূর্ব্বেই আশ্রয় মেলা চাই-ই।

পালংগঞ্জ হইতে যে রাস্তাটী সোজা পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে সেইটিই গ্রামের রাজপথ। বারো মাইল দূরে একটী ছোটো মহকুমায় পৌছাইয়া তাহার গন্তব্য স্থান মিলিয়া গিয়াছে। আর একটি রাস্তা পূর্ব্বদিকে গিয়াছে, সেটি রামমোহনের ভাবী শ্বশুরালয়ে যাইবার পথ। পরশু সন্ধ্যাবেলায় আমাদের এই পালংগঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া ঐ পথ ধরিয়া রূপচাঁদপুরে বিবাহ সভায় রামমোহনের সহিত মিলিত হইতে হইবে। মাঝে এই আটচল্লিশ ঘণ্টা বন্ধুবর শিবরঞ্জনের শ্বশুরগৃহে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে যাইতে হইলে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া মাইল তিনেক হাঁটিতে হইবে। সিঙ্গীপাড়ায় দারোগা বাবু যে ছোট্ট থানাটীর উপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব করেন, সেইটাই এখন আমাদের ধ্রুবতারা

কিন্তু শিবরঞ্জনের কোনও ব্যস্ততা দেখিলাম না। শ্বশুরবাড়ীর দেশে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভাব-পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। এখন তাহাকে দেখিয়া কে বলিবে এই গ্রাম্য, অলসগতি ভদ্রলোকটীই দুইদিন পূর্ব্বে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ছাত্রাবাসকে হাসি তামাসায় সর্ব্বদা মুখরিত রাখিত। সাপের খোলস পরিত্যাগ করার মত শিবুর ক্ষমতাও অলৌকিক। যখন যে অবস্থায় থাকে, আপনার পরিস্থিতির সহিত তাহার চরিত্র আশ্চর্য্য রকমের মিশ খাইয়া যায়। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে সে পাকাকোঠার রোয়াকে মাত্র একটু চাপিয়া বসিল। বলিল—'শ্বশুর মশাই না এলে ত কোনো বন্দোবস্তই হবে না। তা ছাড়া তোর সামনে যশোরে ত বলেই দিলেন—তোমরা মোটর-বাস্‌এ এগুতে থাকো, পালংগঞ্জে গিয়ে দেখা হবে, তারপর সবাই একসঙ্গে সিঙ্গী-পাড়ায় যাওয়া যাবে।

আমি বলিলাম—'সবই ত বুঝলাম। এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে। তোদের বাড়ী যেতে এমন আর কী দেরী হবে! তার চেয়ে চল্‌না, হেঁটেই এই তিন মাইল পথ চলে যাই!'

শিবু জবাব দিল না, পকেট হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া আকাশের দিকে চোখ রাখিয়া সযত্নে দিয়াশলাই বাক্সের উপর বার বার ঠুকিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে বাহির হইবার সময় তার মুখে যে গ্রামের নিকটত্ব ও বর্ণনা শুনিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে সত্যভাষণের এতটুকু স্পর্শও নাই।

বুঝিলাম আকস্মিক উত্তেজনায় মানুষ মানুষের রক্তলোলুপ হইয়া ওঠে কেন!

রাতের ঘনায়মান অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া সিগারেট খাইতেছি

আকাশ পাতাল ভাবিয়া কোনো কূল কিনারা পাইলাম না। মনে হইল, না আসিলেই বোধ হয় ভালো হইত। পথে বাহির হইয়া অবধি যতগুলি এ যাবৎ বাধা পাইয়াছি, তাহাতে একখানি ছোটোখাটো ফলিত জ্যোতিষের পুস্তিকা রচনা করা যাইতে পারে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—পল্লীগ্রামের নিরন্ধ্র অন্ধকার। জনমানবশূন্য এই গঞ্জের অশরীরী আত্মা যেন শরীরী হইয়া উঠিতেছে। ক্রমশঃ মূর্ত্তি আরো স্পষ্ট, ভয়াবহ হইয়া উঠিতে লাগিল। শিবুর কাছে ঘেঁসিয়া বসিলাম বটে, কিন্তু এ নড়িয়া বসার মধ্যে যেটুকু আরাম অথবা নিশ্চিন্ততা বোধ করিলাম, পরমুহূর্ত্তেই তাহা নষ্ট হইয়া গেল। সহসা মনে হইল এই যে আমি বসিয়া আছি, তাহা যেন সত্য

নয়। শারীরিক উপস্থিতির অকাট্য প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কেমন একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ জাগিল, এ 'আমি' আসল মানুষ নয়।

রাত সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। অবশেষে আমার সকল চিন্তা-জল্পনার দুর্ব্বার সিন্ধু মন্থন করিয়া দারোগা বাবুর আবির্ভাব হইল। দেখিলাম তিনি একটি টাট্টু ঘোড়া চাপিয়া আসিয়াছেন। দূর থেকে মনে হইয়াছিল যে ভদ্রলোকের পা দুটি নাই, কিন্তু কাছে আসিলে ঠাহর করিলাম, পদযুগল পার্শ্বদেশেই বিলম্বিত, কিন্তু বাহনের হ্রস্বতাবশতঃ মাটিতে লুটাইতেছে বলিয়া ঘোড়ার পায়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

সেখান হইতে নামিয়া তিনি আমার দিকে নীরবে স্মিতহাস্য করিলেন অর্থাৎ উপরকার বাহির-করা উঁচু দাঁতগুলির চাপ হইতে অধরোষ্ঠকে মুক্ত করিলেন। দাওয়াতে উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনেক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে বুঝি। কিন্তু আজ আবার শনিবার। রিপোর্ট দাখিল না করে এলে কাল আবার সদরে ছুটতে হত।"

জামাই-এর দিকে চেয়ে কন্‌ফিডেনশিয়াল্ সুরে বলিলেন, "সেই যে হে শিবনাথপুরের কেস্‌টা। ভারী মুস্কিলে পড়া গেছে।"

ভাবটা এই, আসলে মুস্কিল কিছুই নয়। শর্ম্মা যখন তদন্তের ভার লইয়াছে, তখন তাহার শেষ সিদ্ধান্ত করতলগত হইয়া গিয়াছে, সে কথা ধরিয়া রাখাই ভালো।

আমি অত্যন্ত সমীহভরে প্রশ্ন করিলাম—"আমাদের এবার যাবার ব্যবস্থা কী হবে? মাইল তিনেক ত পথ, কতটুকুই বা? পায়ে-পায়ে চলে যাওয়া যাবে। কি বলেন?"

দারোগা বাবু বলিলেন—"তা কি হয়? তোমরা যদি পায়ে হেঁটে যাও, তাহলে, এ অঞ্চলে আমার ত একটা প্রেষ্টিজ্ আছে, হেঁ-হেঁ-হেঁ ··তোমরা একটু ব'সো বাবাজী... আমি এই এলুম বলে।"

মিনিট পনের কুড়ি পরেই দারোগা বাবু ফিরিলেন। তাঁহার কিছু পরেই আসিল একটি বিশ বাইশ বছরের অনুচর। তাহার চেহারায় উল্লেখযোগ্য এমন কিছু ছিল না, কেবল চুলের প্রসাধন ছাড়া। সে কেশবিন্যাস অপরূপ। এমনটি আর কখনো দেখি নাই এবং ভরসা রাখি যে মৃত্যুর পূর্ব্ব মূহূর্ত্তে পার্থিব জগতের এই সর্ব্বোত্তম দৃশ্যটী আমার ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে সর্ব্বশেষে ভাসিয়া উঠিবে। তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা কঠিন, কেবল সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে মাথার উপর ভাগ বদম-ছাঁটা আর নিচেকার অংশ ক্ষুর দিয়ে নিখুঁত রূপে কামানো। ছেলেটী দুই হাতে দুই খানি বাইক লইয়া আসিয়াছে। কণ্ঠে থিয়েটারী গুঞ্জন চলিতেছে—"যারি প্রাণ তারি হাতে, লোকে বলে নিলে নিলে—"

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এ হেন বিজন রাত্রিতে ঐ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ও যান মিলিয়া যাওয়াতে যেরূপ বিস্মিত হইলাম, ভোজবাজী দেখিলেও ততটা হইতাম না। সে যাহাই হোক্, স্থির হইল যেখানি অপেক্ষাকৃত আস্ত গাড়ী সেখানিতে আমি জামাই-এর বন্ধু বলিয়া চাপিব। দেখিলাম ব্রেক্ বা লাইট কোনো কিছুরই বালাই নাই। বৈরাগীর দেহের মতই সম্পূর্ণ রিক্ত, নিঃস্ব। বসিবার চর্ম্মাসনটী আবার এত ক্ষুদ্রাকৃতি ও নৌকার মত ঢেউ খেলানো যে তাহাতে আরাম হইবার কথা নয়। কিন্তু ভিখারীর হাতে পছন্দের ভার থাকে না।

শ্রীদুর্গার নাম প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বে একবার কিশোর মন স্মরণ করিয়াছিল। এইবার লইয়া দ্বিতীয়বার পাপ-মুখে নামোচ্চারণ করিলাম। প্রোসেশ্যনের অগ্রভাগে শিবরঞ্জন, মধ্যে আমি, পিছনে পুলিশের শীর্ণকায় টাট্টুর উপরে দারোগা বাবু। অতি হুঁসিয়ার হইয়া যাইতেছিলাম, কারণ ব্রেক্ নাই। আর শিবুর বাইকে বিলম্বিত ছোটো লণ্ঠনটী যত না আলো দিতেছিল, তার তিনগুণ ধূমশিখা উদ্‌গার করিতেছিল। চারিদিকে অন্ধকার, নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে পায়ের নীচের পথ স্পষ্ট নজরে পড়ে না। অনুমানে বুঝিলাম আধপাকা রাস্তা, অর্থাৎ উপরে এক প্রস্থ মাটির ঢেলা ও সুরকী ছড়ানো আছে। কোনোকালে হয়ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড খোয়া বিছাইয়া ছিল, কিন্তু সে সব যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। গরুর গাড়ীর যাতায়াতের ফলে রাস্তার দুই পাশে দুটি দীর্ঘ ও গভীর খাতের সৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তগামী সমান্তরাল রেখা দুইটীর দিকে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিলাম। কারণ তার মধ্যে সাইকেলের চাকা পড়িলেই কোথায় ছিট-

কাইয়া পড়িব,—সোনাকুড়ে অথবা ঘাঁস্তাকুড়ে, কিছুরই স্থিরতা নাই। পথিপার্শ্বে কচুবন অথবা আশশেওড়ার ঝোপগুলি কখনো পুকুরের পাড় বলিয়া ভ্রম হয়, আবার কচুরী-পানায় আচ্ছন্ন পুকুরকে মনে হয় বিস্তীর্ণ পোড়ো জমি। অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে শিবরঞ্জনকে অনুসরণ করিয়া মধ্যস্থিত উঁচু জায়গার উপর দিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মনে হইল, মাইল তিনেক পথ এতক্ষণে শেষ হওয়া নিশ্চয়ই উচিত ছিল।

প্রথম প্রশ্ন করিয়া নীরবতা ভঙ্গ করিলাম আমি।

"তুই যে বলেছিলি শিবু—সিদ্ধীপাড়া পালংগঞ্জের কাছেই।"

কোনো জবাব পাইলাম না। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"তিন মাইল ত ছেলেবেলাতেও হেঁটেছি, তবু এত দেরী মনে হয় নি।"

উত্তর না পাইয়া আপন মনেই বিরক্তিভরে গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিলাম—"শুনেছি পাড়াগাঁয়ে ভালভাঙ্গা ক্রোশ আছে। কাহিল-করা মাইলও আছে তা'ত জানতাম না।"

"বাজে বকিস্‌নি—"

হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া উঠিলাম। দাঁতের ওপর দাঁত চাপিয়া শিবুর মুণ্ডপাত করিলাম। বলিলাম—"আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্যাড্‌ল্‌ করে যাও, এইটেই কাজের কথা, না?"

"আপাততঃ তাই ত মনে হচ্ছে—যে সময়ের যা··· উঃ···ওরে বাবারে..."

হুড়মুড় করিয়া পরস্পরের ঘাড়ে পড়িয়া গেলাম। চকিতের মধ্যে কি যে হইয়া গেল ঠিক্ বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে ধরাধরি করিয়া বাইক্ সমেত দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিলাম আমরা পাশের জমির আলের উপরে। অনুসন্ধানে জানা গেল, পথটা ঢালু হইয়া হঠাৎ বাঁকিয়া গিয়াছে। অন্ধকারে বুঝিতে না পারিয়া একেবারে সোজা ভূমিশয্যা। সিল্কের পাঞ্জাবীটা ছিঁড়িয়া যাওয়াতে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইলাম, কারণ বিবাহ-বাসরে উপস্থিত হইবার মত দ্বিতীয় পোষাক নাই। শিবুর ডান হাতের কনুই ও ডান পায়ের হাঁটুর কাছে বেশ খানিকটা ছড়িয়া গিয়াছে, আর আমার বিশেষ কিছু আকস্মিক বিপদ্‌পাত না হইলেও পুনরায় বাইক চড়িবার সময় অনুভব করিলাম উদরে ও কোমরে স্ত্রীলোক-সুলভ বেদনা।

পথ চলিতে চলিতে সহসা মনে পড়িল, তাই ত, আমাদের অদ্বিতীয় দারোগা বাবুকে কি পিছন হইতে ভূতে ধরিয়া নিয়ে গেল। তাঁহাকে ত দেখিতেছি না। শিবুকে বলিলাম—"তোর শ্বশুরমশাই কোথায় গেলেন?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর আসিল। "বাড়ী।"

বিস্মিত হইলাম। তাহা হইলে আমরা কি যমের বাড়ী যাইতেছি? পরে শুনিলাম তিনি মাঝপথে ক্রস্ কান্ট্রি সারিয়াছেন। চতুষ্পদের সাহায্যে সম্ভব বলিয়া দ্বিচক্রে চড়িয়া সেই পথবিহীন ধান জমি ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হওয়া সাধ্যাতীত। তাহা ছাড়া আগে পৌঁছাইয়া তাঁহাকে আবার নৌকার জোগাড় করিতে হইবে ত।

নৌকা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। তাহা হইলে বৈতরণীও আছে। এ দেখিতেছি পঞ্চতন্ত্রের গল্প। টানিলেই বাড়ে, কাহিনীও শেষ হয় না। পল্লীগ্রামের পথ জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কলিকাতায় এ সব শিবুর কাছে কিছুই শুনি নাই। ধোঁয়া ধোঁয়া কথা-বার্ত্তার মধ্যে, কোনো অসুবিধা হইবে না, এ গ্রাম আর ও গ্রাম, সবই কাছে-পিঠে, এই টুকুই শুনিয়াছিলাম ও মনে আছে। কিন্তু নব জামাতার উৎসাহী মুখে নূতন শ্বশুর-বাড়ীর গুণ-মর্য্যাদার মত এই পথ ঘাটের নিত্য নূতন রূপ ও পরিচয় বিমূঢ় চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে। আর কত হইতে পারে, হউক। ভাবনার হাল ছাড়িয়া দিলাম।

অবশেষে পথের শেষ মিলিল। এখনও সে বিশুদ্ধ আনন্দা-নুভূতির রেশ আমার প্রাণে লাগিয়া আছে। দেখিলাম দূরে একটি উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, এবং তাহারি পাদদেশে একটি বাড়ীর ছায়া পড়িয়াছে। অনুমানে বুঝিলাম কাছেই নদী আছে। কিন্তু নিকটে আসিয়া দেখিলাম, নদীর জল অল্পই, নৌকা যাতায়াতের জন্য একটুখানি অবিস্তৃত জল-স্রোত দেখা যায় মাত্র। অবশিষ্ট অংশ ঘন দামের নীচে আত্মগোপন করিয়াছে। বাইক হইতে নামিয়া শিবুকে বলিলাম—"পার হ'ব কেমন করে?" শিবু আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল পাশেই বাঁশের সেতু রহিয়াছে। এই অপরূপ

পদার্থটীর সহিত পূর্ব্বে কখনো চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না, কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ করিয়াও বিশেষ ভরসা পাইলাম না। নদীটী এই স্থলে চওড়ায় হাত পঞ্চাশেক হইবে, তাহারি উপর দিয়া বাঁশের পুল নির্ম্মিত। দুইটী বাঁশ পাশাপাশি বাঁধা, তার নীচে আর একটী বাঁশ লম্বালম্বি রাখা আছে। ধরিবার আশ্রয়ের মধ্যে একগাছি মোটা রজ্জু। লক্ষ্যস্থল আবিষ্কার করিয়া প্রাণে যেটুকু অবিমিশ্র পুলক সঞ্চার হইয়াছিল, সেতুটী দেখিয়া তাহা নিঃশেষে বিলুপ্ত হইল। শিবু গাছের পাশে বাইক রাখিয়া বলিল, "চলে আয়।"

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমি মানুষটা নিতান্ত কাপুরুষ নই। সহরের ছেলে পল্লীগ্রামে গেলে যেমন প্রতিপদেই ভীত ও বিমূঢ় হইয়া সাংঘাতিক অনর্থের আশঙ্কা করে, আমার তেমনটি হয় না। কিন্তু সহ্যশক্তিরও সীমা আছে। রাত দশটার সময় ক্লান্ত ও অবসন্ন পদে এই বিজন স্থানে অন্ধকারে ঐ রজ্জু ধরিয়া সঙ্কীর্ণ বাঁশের পুলের উপর দিয়া সার্কাসের তারের খেলা দেখাইতে মন সরিল না। আমি শিবরঞ্জনকে আমার ঘোর অসম্মতি জানাইলাম। তরী কূলে ভিড়াইয়া মিছামিছি ডুবাইতে রাজী নই। শিবু বলিল, "তা হলে অপেক্ষা কর্। আমি ওপারে গিয়ে শ্বশুর মশাইকে বলে নৌকার বন্দোবস্ত করি।" এই বলিয়াই কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া শিবু তর্ তর্ করিয়া বাঁশের পুলে চড়িয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই ওপারে চলিয়া গেল। তাহা হইলে ইন্দ্রনাথ অলীক কল্পনা নয়!

মিনিট দশেক হইয়া গেল, শিবুর ফিরিবার কোনো সাড়া শব্দ পাইলাম না। উপবাসী হৃদয় বউকে দেখিয়া বন্ধুর কথা ভুলিয়া গেল না কি? কিন্তু এ রকম মিথ্যা বর্ণনা দিয়া আমাকে যশোরের ছাব্বিশ মাইল ভিতরে মফঃস্বলে টানিয়া আনিয়া অন্ধকারে একা দাঁড় করাইয়া অদৃশ্য হইবার হেতু? প্রথমে রাগ হইল এই যশোর জেলার লোকগুলির উপর। তারপর রাগটা আরও ব্যক্তিগত হইয়া পড়িল শিবুর উপর। মনে হইল, এ কী ব্যবহার! অহল্যা-উদ্ধারের সময় রামচন্দ্র যদি পাষাণীকে যুগান্তকালের পরও আবো কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া সীতার সহিত সূক্ষ্ম রসচর্চ্চা করিতে সুরু করিতেন, তাহা হইলে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইত তাহাই অনুমান করিতে চেষ্টা করিলাম। অবিবাহিত ব্যক্তির মেজাজটা কিছু উগ্র রকমের হয়,—সময়ে অসময়ে তাহারা অসহিষ্ণু হইয়া ওঠে, একথা বারবার মা ও বৌদিরা আমাকে বিশ্লেষণ সহকারে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। একবার ইচ্ছা হইল কলিকাতা হইতে তাঁদের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনি এবং দম্পতির কর্ত্তব্য ও কাণ্ডজ্ঞানের অপরূপ নমুনা দেখাইয়া দিই।

মাঘের শেষ। পাড়াগাঁয়ে কলিকাতার মত মারাত্মক দখিণা হাওয়া সুরু হয় নাই। শীতের প্রকোপ পুরাপুরি বজায় আছে। চাদরটা গলায় জড়াইয়া লইলে শুধু পাঞ্জাবীতে বিশেষ ঠাণ্ডা অনুভব করিতে লাগিলাম। মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষের দেহ শীতল হইয়া আসে, না? সম্পূর্ণ হিমাঙ্গ হইতে আর কত দেরী? এই চাদরটা দিয়া হয় ত শিবু আমার মৃতদেহ ঢাকিয়া ঐ স্বল্পতোয়া নদীটার ধারে শেষকৃত্য সমাপন করিবে,...সহসা মনে হইল, কানের পাশে কার শীতল নিঃশ্বাস বাহিয়া গেল। শ্মশান-ঘাট এখান হইতে...

গাছতলা ছাড়িয়া বাঁশের পুলের উপর এক পা রাখিয়া মোটা রজ্জুটা চাপিয়া ধরিলাম। এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাই ভালো। যা হয় মুক্ত জায়গায়, সামনা-সামনি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আধ ঘণ্টার পর শিবু নৌকা লইয়া আসিল। পারাপারের জন্য একখানি নৌকা আছে, যেখানি সরকারী বলিয়া সংস্কার করা হয় না। দু চার জায়গায় ফুটা আছে, জল উঠিতে থাকিলে রবিন্সনের বার্লির টিনের সাহায্যে ছেঁচিয়া ফেলা হয়। শিবু ভরসা দিল, আমরা ওপারে পৌঁছিবার পূর্ব্বে নৌকা জলময় হইবে না। ধীরে ধীরে কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ বাহিয়া বাইক সমেত নৌকায় চাপিলাম। এতটা ভার লইয়া বুড়া খাদেম মাঝি জোরে বৈঠা চালাইতে পারিল না। লক্ষ্য করিলাম, একটু একটু করিয়া নৌকার তলদেশে জল সঞ্চিত হইতেছে। শুধু হাতে বসিয়া না থাকিয়া, ভাবিলাম একটু কাজ করিয়া দিই। ওপার নিকটেই আসিয়া পড়িয়াছে, মাত্র হাত দশেক দূর। একটু নিশ্চিন্ত হইয়া অতি সন্তর্পণে কাঠি জ্বালাইয়া সিগারেট ধরাইলাম। নিঃশ্বাস ভরিয়া এক মুখ ধোঁয়া লইতে শরীরটা ধাতস্থ হইল। রঙ-ওঠা টিনের কৌটাটা

হাতে লইয়া যেমন নীচু হইয়া জল ছেঁচিতে যাইব, অমনি শিবু 'সাপ-সাপ' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। অল্পপরিসর নৌকা কোথায় সাপ, কোনদিকে যাইতেছে বা আসিতেছে, কিছুমাত্র না দেখিয়া তিনজনেই একপাশে লাফাইয়া উঠিলাম।

জীর্ণ তরী টাল সামলাইতে না পারিয়া উল্টাইল। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই আবক্ষ জলমগ্ন। সৌভাগ্যের বিষয় জল বেশী ছিল না। কারণ সাঁতার জানিলেও এই শ্যাওলা-আচ্ছন্ন জলে হাত পা ছুঁড়িবার অবকাশ থাকিতনা। ধীর পদক্ষেপে তীরে উঠিলাম। সিক্তবস্ত্রে আমরা দারোগা বাবুর বাসায় হাজির হইলাম। তিনি অবশ্য এতটা আশা করেন নাই। আমাদের মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অবিলম্বেই শুকনো কাপড়, গামছা প্রভৃতি আনিবার ব্যবস্থা করিলেন।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলে যথারীতি পরিচয় ও সম্বর্দ্ধনা হইল। শিবুর স্ত্রীকে পূর্ব্বে দেখি নাই, প্রথম দর্শনে তাহাকে ভালোই লাগিল। একখানি লাল-পেড়ে শাড়ী, হাতে শাঁখা ও মামুলী চুড়িতে প্রকৃত পল্লীবধূ বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। কেবল কানের দুপাশে চুলের সজ্জায় ও ব্লাউজের হাতকাটা ভঙ্গীতে আধুনিকতার স্পর্শ। ভাবিলাম এই সরলা মেয়েটী কি করিয়া তার চপল ও মুখর স্বামীকে বশে আনিয়াছে, ভগবানই জানেন। ক্ষীণাঙ্গী তরুণী এ দুরন্ত গরুকে নিশ্চয়ই চোখের জাদুতে মুগ্ধ করিয়াছে। সত্যই তাই। যতবারই তার দিকে চকিতে চোখ ফিরাইয়াছি, ততবারই তার সলজ্জ ও আবেশভরা মধুর দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টি প্রতিহত হইয়াছে। কি জানি কেন মনে হইয়াছে, এ সৌন্দর্য্যটুকু নীরবে উপভোগ করিয়া কাহার নিকটে যেন অপরাধী হইতেছি।

আলাপ জমিয়া উঠিতে দেরী হইল না। মাংস পরিবেশন সারিয়া পঞ্চমী একটি দই-য়ের হাঁড়ি লইয়া নিকটে বসিল। শিবুর শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া শিবুর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলিলাম—"এইবার একটু জল চাই। আপনারা কি পুকুরের··· ?"

পঞ্চমী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আর একটী গ্লাসে জল আনিয়া দিল। মৃদুস্বরে বলিল—"সিদ্ধজল। আপনাদের অভ্যেস নেই কিনা।" গল্পে, লঘুপরিহাসে আহারপর্ব্ব সমাধা হইল। কোনো দিনই ভোজনপটু নই, তায় শরীর ক্লান্ত। আমার স্বল্প আহারে পঞ্চমী ও তার মা ক্ষুণ্ণ হইলেন ও বিস্তর অনুযোগ করিলেন। পল্লীগ্রামের মেয়েরা কত সহজে ও অল্প সময়ে অতিথিকে নিজেদের পারিবারিক গণ্ডীর ভিতর টানিয়া লয় তাহা ধরা যায় না। সহরের মেয়ে দেখিয়া চিরকাল অভ্যস্ত। এই নূতনত্বটুকু শুধু ভালো লাগিল তাহাই নয়, স্মরণের মণি-কোঠায় জমা রহিল।

রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে শিবু ও তার স্ত্রী আমার ঘরে কিছুক্ষণ গল্প করিল। যেমন হইয়া থাকে, পঞ্চমী অবিলম্বেই প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা, আপনি বিয়ে করছেন না কেন ?" জানি স্ত্রীলোকের অপরিসীম কৌতুহল মিটাইবার সময় এটা নয়, কাজেই কৌশলে তাহার প্রশ্ন এড়াইয়া গেলাম। কিন্তু তবু সে উপদেশ দিতে ছাড়িলনা। এ কাজে সে তাহার স্বজাতির সম্মান বজায় রাখিল, একথা শপথ করিয়া বলিতে পারি। কথা বলার অবসরে শিবু পঞ্চমীর পাশে বসিয়া আমার সামনেই এমন ক্রিয়াকলাপ সুরু করিল যে, হাসিয়া ফেলিলাম। বুঝিলাম, সে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। একটু পরেই বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকে নিদ্রাকর্ষণের অছিলায় রাত্রির মত বিদায় জানাইয়া বিছানায় সটান্ শুইয়া পড়িলাম।

পরিপাটী শয্যা। যত্ন করিয়া পাতা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মাথার শিয়রে একটি কাঁসার গ্লাসে খাবার জল, হাতের কাছে টুলের উপর একটী পাথরের রেকাবীতে পান, সুপারী ও মশলা। দেখিতেছি এরা সেই জাতের মেয়ে যাহাদের নিকট অতিথিচর্য্যা নীরস কর্ত্তব্যমাত্র নয়, এবং সাত বছর পরে দেখা হইলেও যাহারা ক্ষণিকের আলাপ বলিয়া মুখ ফিরাইয়া লয় না, অসঙ্কোচ আন্তরিকতায় ব্যক্তিগত কুশল প্রশ্নও প্রার্থনা করে। ইহাদের নিকটে অভাব জানাইবার পূর্ব্বেই পূরণ হইয়া যায়। আশা করি শিবু ইহাকে লইয়া সুখী হইয়াছে ও থাকিবে।

চাঁচের দেয়াল ও টিনের ছাদ দেওয়া ঘরটীতে কাঠের জানালা লাগানো। মশারীর ভিতরে শুইয়া উন্মুক্ত গবাক্ষপথে দূরে আকাশ ও কাছে নদী দেখিতে পাইতেছি। কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া চাঁদ আজ অনেক দেরীতে উঠিয়াছে। নারিকেল গাছের মাথায় চাঁদের আলোর অকৃপণ সমারোহ। পাতাগুলি নড়িয়া উঠিলে মনে হইতেছে যেন গলিত রজত ধীরে ধীরে গড়াইতেছে। আবার নির্ব্বাত নিষ্কম্প অবস্থায় দীর্ঘ, নতপ্রান্ত পাতাগুলি ঠিক রূপালী তলোয়ারের মত দেখাইতেছে। অনেক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া নিদ্রাকর্ষণ বোধ করিলাম। পাশের বালিশটা টানিয়া লইতে পাশের ঘর হইতে শিবুর কলগুঞ্জন

ভাসিয়া আসিল। সে রাত্রে সুনিদ্রা হইয়াছিল। ভোরের স্বপ্ন যদি অব্যর্থ হয়, তাহা হইলে আমার বিবাহ কোনো এক পল্লীগ্রামে অতি সত্বর নিষ্পন্ন হইবে, সে বিষয়ে আর দ্বিধা নাই।

পরের দিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম, তখনো কেহ ওঠে নাই। মুখ ধুইয়া একলাই বাহির হইয়া পড়িলাম। অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু কয়েকটি গণ্ডগ্রামের কেন্দ্রস্থল বলিয়া সরকার হইতে সিঙ্গীপাড়াকে চৌকী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। পাকা কোঠা মাত্র দুইটি, একটি দারোগা বাবুর কোয়াটার্স সংলগ্ন থানা-আফিস, যেখানে জন পাঁচ ছয় শীর্ণকায় গ্রাম্য কনষ্টেবল বসবাস করে। আরেকটা কোঠা-বাড়ী একাধারে পোষ্ট আফিস, স্থানীয় আপার প্রাইমারী স্কুল, সান্ধ্য বৈঠক এবং গ্রামের একমাত্র মনোহারী দোকান। গ্রাম পরিদর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। দেখি চা তৈরী এবং পঞ্চমী হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করিল। প্রথম দর্শনের ঈষৎ আড়ষ্টভাব কাটিয়া গিয়া সম্বন্ধ সরল ও সহজ হইয়া আসিতেছে।

সেদিনকার একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমাদের তিন জনের সারাদিন ধরিয়া অফুরন্ত গল্পগুজব। মাত্র স্নানাহারের সময়টুকু ছাড়া আর বাকী সময় মজার গল্প, হাসিতামাসা ও সাংসারিক কথায় কোথা দিয়া কাটিয়া গেল ধরিতেই পারিলাম না। রাত্রে আহারাদির পর শিবুর ঘরে বসিয়া তাহার সহিত গল্প করিতেছি, দেখি পঞ্চমী আমার পাঞ্জাবীর ছিন্ন অংশটুকু সুনিপুণ রিপু করিয়াছে। ধুতী ও পাঞ্জাবী কাচিয়া গরম ঘটীর সাহায্যে ইস্ত্রীও সারিয়া রাখিয়াছে।

পরের দিন সোমবারে আমাদের রওনা হইতে হইল। পালংগঞ্জে ফিরিয়া অন্যপথে রূপচাঁদপুর যাইতে হইবে। রামমোহনের বিবাহলগ্ন সন্ধ্যা সাতটায়। কাজেই চারটের মধ্যে চা ও জলযোগ সারিয়া বিদায় নিলাম। শিবুকে কেমন মন-মরা লাগিতেছিল। যদিও হাসি ঠাট্টা করিতেছিলাম, শিবুর বিমর্ষভাব আমাকেও সংক্রামিত করিল। তাহার শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া পঞ্চমীর ঘরে গেলাম।

পঞ্চমী আপনা থেকেই বলিল—"আপনার কত কষ্ট হল। এখানে আসার আগে থেকেইত নাকালের একশেষ। আমাদের কথা মনে পড়লেই, কি অসুবিধায় পড়েছিলেন, সেইটেই শুধু মনে থাকবে—নয়?"

ছোটো মেয়ের মত সুডৌল গ্রীবা বাঁকাইয়া এমন মিষ্টি করিয়া সে বলিল যে, সহসা উত্তর জোগাইল না। অনর্থক ভদ্রতা করিতেও প্রবৃত্তি হইল না, বিশেষ করিয়া পঞ্চমীর বেপথু কণ্ঠস্বরে যখন আন্তরিকতার সুর পাইলাম। শুধু জানাইয়া আসিলাম, শিবু সৌভাগ্যবান্ বটে,—এবং আমিও। যেহেতু পূর্ব্বে তাহাকে দেখি নাই বলিয়া আমার আর ক্ষোভ নাই। এই দেড়দিনের সাহচর্য্য আমার স্মৃতির ঘরে কৃপণের সঞ্চয় হইয়া থাকিবে। আর নমস্কার করিয়া বলিলাম—"মনে রাখবার মানুষ নই, তবু ভুললে ক্ষুণ্ণ হব। প্রার্থনা করি আপনার একটি কন্যা হোক্। তার নাম রাখবেন শ্রী।"

শিবু আর আমি দুজনে যখন নৌকায় চাপিলাম, জানালায় পঞ্চমী দাঁড়াইয়াছিল। চোখোচোখি হইতেই সে হাসিল, কিন্তু তাহা অকৃত্রিম নয়। সে অ-সহজ হাসির পিছনে উদ্গত অশ্রুর আভাস ছিল। অকারণে কল্পনা করিয়া মনে সান্ত্বনা পাইলাম—সে সজলতার এতটুকু ভগ্নাংশও আমারি উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। ভারি ভালো লাগিল ঐ পথপ্রান্তে ক্ষণিকের দেখা অল্পপরিচিতা মেয়েটিকে।

রামমোহনের বিবাহ-ব্যাপার—আর এক অদ্ভুত বিভ্রাট্-কাহিনী। কিন্তু সে কথা থাক্। কলিকাতায় প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলাম। এবং তাহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত শিবুর সহিত সংস্রব ছিল। কালক্রমে সে অন্তরঙ্গতার সূত্র শিথিল হইয়া আসিয়াছে। কর্ম্মোপলক্ষে উভয়েই পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। কখনো কচিৎ সংবাদ পাইয়া থাকি—সে ভালো আছে। মফঃস্বলে কোনো এক মহকুমায় সে ওকালতী করে। পঞ্চমী বাপের বাড়ী হইতে স্বামীর কাছে আসিয়া সংসার করিতেছে। হয়ত তাহাদের উভয়েরই বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শুনিয়াছি একটী কন্যাও জন্মিয়াছে এবং আমারই ভবিষ্যৎবাণী সার্থক করিয়া তাহার নামকরণ হইয়াছে শ্রী। শ্রী তাহার মায়ের মুখের ও চোখের আদল পাইয়াছে কি না কে জানে!

রামমোহনের বিবাহ-উপলক্ষে যশোরের সুদূর পল্লীগ্রামে গিয়া রাত্রিবাস করা আমার মত গৃহকোণবাসী লোকের জীবনে সম্পূর্ণ আকস্মিক ও অসংলগ্ন ঘটনা। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনার মধ্য দিয়া যে অপ্রত্যাশিত মাধুর্য্যের সন্ধান পাইয়াছিলাম, তাহার সহিত বাহ্য বন্ধন ও সামাজিক সংযোগ আজ দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। মনে পড়ে বিদায়কালে পঞ্চমী কেবল হাসিয়া বলিয়াছিল—"যাবার সময় মিষ্টিমুখ করতে হয়। কিন্তু আপনি ত মিষ্টি একেবারেই ভালো-বাসেন না। যেখানে যাচ্ছেন—সে গ্রামে ভয়ানক ম্যালেরিয়া, জানেন? এই নিন্ দুটো তেতো কুইনিনের বড়ি।"

পঞ্চমীর মুখ ক্রমশই ঝাপ্সা হইয়া আসিতেছে। বিশেষ করিয়া এতদিন পরে,—এই সন্ধ্যার আব্ছায়ায় তাহার সম্পূর্ণ রূপ ও ধারণা বড় অস্পষ্ট লাগে। কিন্তু তাহার ঘন পালক-ভরা নরম চোখদুটির স্মিত দৃষ্টি আজিও ভুলিতে পারি নাই।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণেশ্বরে

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

অহরহ সহিয়া দুঃখের পুটপাক
শোকে যারে পাওয়া যায় তাঁরে দেই ডাক।
চারিধারে হেরি মম স-সর্প গহ্বর,
ধূমকেতু পুচ্ছ মেলে মাথার উপর,
কেঁদে ওঠে পশু পক্ষী, উল্কার বর্ষণ,
শান্তি নাই, স্বস্তি নাই, হেরি দুর্লক্ষণ।
কোথা মেলে মহৌষধি এ ভব-ব্যাধির ?
বড় দুঃখী আজি মোরা নৈরাশ্যে অধীর,
উন্মাদের দৃষ্টি হানি' অপমৃত্যু মরি,
বিস্মৃত পাপের লাগি' দণ্ড ভোগ করি।
আলোক-বঞ্চিত চোখে সঞ্চিত অশ্রুর
অবারিত ধারাপাতে কাঁদি ব্যথাতুর ;
স্বকর্ম্ম-বিচার ভুলি' কাঞ্চনের মদে
মাতোয়ারা হ'য়ে ডুবি নরকের হ্রদে।
ভোগ সর্ব্বস্বের দেশে বাড়ে দুর্ব্বাসনা,
ধ্বংসের সঙ্গীতে লুপ্ত শিব-উপাসনা।

সেদিন নির্জ্জনে হেথা এ 'দক্ষিণেশ্বরে'
সাধক 'ভৈরবী-চক্রে' নৈশীথ প্রহরে,
নির্ভয়ে বসিয়া 'পঞ্চমুণ্ডী'র আসনে
দক্ষিণা-কালীর কণ্ঠে স্নেহ-স্বর শোনে।
'পঞ্চবটী'-বিল্বমূলে প্রতিধ্বনি তার,
আলোড়িত জাহ্নবীর এপার ওপার।
পঞ্চগুঁড়ি-আঁকা 'কালী-যন্ত্রেব ত্রিকোণে'
রচি অষ্টদল পদ্ম সাজায় গোপনে
রক্তজবা আরাধ্যার শ্রীপদ-কমলে,
পূর্ণ করে পূজা-ঘট সর্ব্বতীর্থ-জলে।
সে পঞ্চ পল্লব, ফল, সিন্দুর, প্রসূন
অর্ঘ্য দেয় রক্ষা করি' হোমের আগুন ;
বজ্রোদক নিক্ষেপিয়া বিঘ্ন দূর করে,
"হ্রীং কালী শ্রীং করালী"-জপে নিশা-ঘোরে।
সমকায়-শিরোগ্রীব বসে সিদ্ধাসনে,
ভক্ত আর দেবতার ঐক্য ঘটে ক্ষণে।
জ্বালি' মহাদীপ-শিখা পূজে কালিকায়,
চোখ বুজে দ্যাখে তাঁকে হৃদয়-গুহায়,—
যুগ্ম শব যাঁর দুই কর্ণের ভূষণ,
গলে নর-মুণ্ড-মালা ভীষণ-দর্শন,
কটিদেশে শব-হস্ত মেখলা যাঁহার,
মূর্ত্তিমতী ব্রহ্ম শক্তি, ধ্যান করে তাঁর।
চতুর্ভুজা, মুক্তকেশী, রৌদ্রী, দিগম্বরী,
মহামেঘ-প্রভা-শ্যামা বরদা, শঙ্করী,
বালার্ক-মণ্ডলাকৃতি লোচন-ত্রিতয়,
নৃত্য-কালী,—বক্ষপাতি' দেন মৃত্যুঞ্জয়,
শব-রূপী মহাকাল, চন্দ্র-বিন্দু যাঁর
দীপ্ত করে সুরধুনী-ধৌত জটাভার।
"বহিঃ-শিব-হৃদে-কালী" গদাধর যোগী
দেখায় পাষাণী মাকে হিয়া-দগদগি।
শিশু সম মান-হীন নির্ম্মল অন্তর
রোদন করিয়া পায় দেবীর আদর।
লভি' শিরে ভবানীর বরাভয়-পাণি
স্ফুরে রসনার অগ্রে পরমা সে বাণী,—
"যত পথ তত মত," থাকিলে বিদ্বেষ
কদাপি মেলেনা তাঁর করুণার লেশ।
নমো নমো রামকৃষ্ণ, রটে ঘণ্টারোল,
উত্তর-দক্ষিণায়নে উঠিছে কল্লোল,
বিবেক-আনন্দ-জ্যোতি উদ্ভাসিত করি'।—
অবতার-গণনায় দাগ দেয় খড়ি।—
অক্ষয় সে মহাক্ষর 'রামকৃষ্ণ' নাম
মুক্তির ভিখারী তাঁরে করিছে প্রণাম।

উল্কা

শ্রীশরদিন্দু সেনগুপ্ত

কলেজে অপর্ণা ও সুলতাকে লইয়া কত কথাই না হইত। সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্বভাবের দু'টি মেয়েব মধ্যে অমন আদর্শ বন্ধুত্ব বড় একটা দেখা যায় না। অপর্ণা স্বল্পভাষিণী, শ্যামলা, শান্ত, ধীর। সুলতার চোখে-মুখে কথা, গৌরী, চঞ্চলা।

সহরের অন্যান্য মেয়ে-হোষ্টেলের মত 'কুইন্ আলেকজান্ড্রা কলেজ হোষ্টেলে'ও নিয়ম ও বিধিনিষেধের অনুশাসনের অন্ত নাই।···সকল কাজ ঘড়ি ধরিয়া হওয়া চাই। সবই তাহারা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে পারে, শুধু দুইটি ছাড়া: এক আবছা অন্ধকার থাকিতে ঘুম হইতে ওঠা, আর সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই খাইবার ঘণ্টা।

কোনো এক বসন্তদিনের মধ্যরাত্রে হয়তো সমস্ত 'ডর্‌মিটরি'তে মেয়েরা ঘুমাইতেছে, সুলতা অপর্ণাকে জাগাইয়া চুপি চুপি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এত কী যে উহারা বলে!···তারাভরা রাত্রির আকুল বাতাসে হয়তো কয়েকটা কথার ঢেউ অস্ফুট-গুঞ্জনে ধ্বনিত হইয়া ওঠে: সুলতা বলে, "ইচ্ছে করে এক তারা থেকে আর এক তারায়, লোক হ'তে লোকান্তরে, ভীষণ শব্দে ওই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ছুটে ছুটে যাই!···" অপর্ণা শান্তভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে, তারপর হয়তো বলে, "এমন শান্তি তোর ভাঙ্‌তে ইচ্ছে করে?"...সুলতা যেন সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া ওঠে, "করে না?... নিস্তব্ধতা ত' ভাঙ্‌বার জন্যেই, আলো জ্বালবার জন্যেই ত' অন্ধকার!···"

কিন্তু তবু এক-একটা দীর্ঘ অবকাশের পূর্ব্বে বিচ্ছেদের দিনটিতে দু'জনে কাঁদিয়া সারা হয়। দুই গাল বাহিয়া জল পড়িতেছে, ঠোঁটদু'টি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, রুদ্ধকণ্ঠে বারবার চিঠি লিখিবার অনুরোধ,—সব মিলিয়া অপর্ণার সৌন্দর্য্য যেন পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে।···আকাশপথে নক্ষত্রলোকের অভিসারিকা চিরচঞ্চলা সুলতাকে কিন্তু কাঁদিলে একটুও মানায় না।

একবার পূজা-অবকাশের পর হষ্টেলে আসিয়া অপর্ণা সুলতার মুখে অনেক নূতন কথা শুনিল। মুখে বলিবে বলিয়া চিঠিতে সকল কথা সে অপর্ণাকে লেখে নাই। সুলতার চিঠিতে অপর্ণা জানিয়াছিল সে পাটনায় তাহার ছোট মাসির কাছে যাইতেছে। কিন্তু, সুলতা যাহা বলিল তাহার নাম-গন্ধও কোনো চিঠিতেই ছিল না। সেখানে সুশান্তর সহিত পরিচয় হইয়াছে। সুলতার মেশোমহাশয় সুশান্তর মামা। অপর্ণা সুশান্ত মিত্রের নাম জানে না? ইণ্টার-কলেজিয়েট স্পোর্ট্‌স্-এ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে গত বৎসর যে চ্যাম্পিয়ানশিপ ট্রফি লইয়া গেল সেই সুশান্ত মিত্রের নাম অপর্ণা কোনোদিন শোনে নাই?···

অপর্ণার মত এমন আদর্শ শ্রোতা দেখা যায় না। সুলতা যাহা বলিতে চায় তাহার বেশী কিছু জানিবার কৌতূহল তাহার নাই। সুলতা হয়তো ইচ্ছা করিয়াই তাহার কাহিনীর কোনো বিশেষ অংশকে একটু রহস্যময় করিয়া রাখিল, সে রহস্যের আবরণ শেষকালে সুলতাকেই উদ্‌ঘাটিত করিতে হয়। অপর্ণা কোনো প্রশ্নই করে না; বড় বড় চোখদু'টি তুলিয়া শুনিয়া যায়, আর মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে!...

বোকার মত অপর্ণা শেষকালে বলে, "কেমন দেখতে রে?"—সুলতা বলিয়া বসে, "পুরুষমানুষ আবার 'দেখতে কেমন' কি!...লম্বা-চওড়া, আর," একটুও ইতস্তত না করিয়া সুলতা বলে, "আর তোর চেয়েও কালো!" অপর্ণা হাসিতে থাকে। সুলতা আবার বলে, "আমার সঙ্গে অনেকদিক দিয়েই অদ্ভুত মিল আছে।···আমি যেমন আমার মায়ের মুখের আদল খুঁজতে মাসির কাছে যাই, সে-ও তা'র মামার মুখে তা'র মায়ের মুখ খোঁজে। আমি কিছু বলার আগেই সে একথা আমাকে ব'লেছে।" সুলতা একটু থামে। দু'জনের

চোখই অজ্ঞাতে কখন যেন সজল হইয়া আসে। তারপর সুলতা বলিতে থাকে, "তা'রও আমার মত শব্দময়, বাণীময়, মুখর জীবনের আকাঙ্ক্ষা।...ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ ক'রে সে বিলেত যাচ্ছে। ফিরে এসে তার জীবনের সাধনা সুরু হ'বে।...কিন্তু, এইবার সুলতা আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু, দেখলাম আমার মত অনন্ত স্বাধীনতা তার নেই।..."

কথায় কথায় সুলতা যাহা বুঝিয়াছে!—সকল কথা ত' সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করা যায় না। বিলাত হইতে আসিয়া একটা কিছু লইয়া সুশান্ত স্থায়ীভাবে এদেশেই আটকা পড়িয়া যাইবে। কব্হাম, লিণ্ডবার্গ, মলিসন্ বা স্কট্-এর মত গতিময় বেগবান জীবন হয়তো স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে।... সুশান্তর একটি ভাই আছে,—প্রশান্ত। সে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেছে। সুশান্তর মায়ের সাধ ছিল, সে মস্তবড় ইঞ্জিনিয়ার হয়, আর প্রশান্ত হয় বিখ্যাত চিকিৎসক। সুশান্ত তখন স্কুলে পড়ে। স্বর্গগতা পত্নীর প্রিয় আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিবার জন্য সুশান্তর পিতা কোনো ত্রুটিই রাখেন নাই।..ছেলে বিলাতি ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসুক। শিমলা-দিল্লীতে তাঁর অগাধ প্রতিপত্তি; তাহাকে দেশে থাকিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।...স্বার্থপরের মত কাহারো নিজের একার জীবনে প্রতিদণ্ডে রোমাঞ্চ ঘটাইবার পক্ষপাতী তিনি নহেন।

তারপর 'ভিজিটর্স্ লিষ্ট্'-এ নূতন নাম লেখানো হয়। 'ভিজিটিং-ডে' আসিলে সুলতার সকল চেতনা উন্মুখ হইয়া থাকে। সমস্ত সপ্তাহটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কঠোর পরিশ্রম করিয়া সে আসিতেছে।—এই একটা দিন সে একটু অবসর পায়,—সেদিন সে কতদূর হইতে আসে!...সুলতার সকল কল্পনা এখন সুশান্তকে কেন্দ্র করিয়া। তাহার সকল চিন্তায় এক স্বাস্থ্য-সমুন্নত সুন্দর মূর্ত্তি ভাসিয়া ওঠে। তাহার সৃষ্টিছাড়া কল্পনার রথে কে এক তরুণ সারথি সবল হস্তে রশ্মি ধরিয়া আছে। শূন্যপথে তাহারা যেন অনন্তকালের যাত্রী।..

সেদিন রাত্রে সকলে ঘুমাইলে সেই আগের মতই দুই বন্ধুতে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়ায়। কথা আর শেষ হয়না।.. সুলতা প্রতিটি শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া অপর্ণাকে বুঝায়। তাহার নিজের আদর্শের কথা, সুশান্তর কর্ত্তব্যের অনুশাসনের কথা, উভয়ের আত্মোৎসর্গে উভয়ের পরিপূর্ণতার কথা।... শৈশবে সুলতা মাতৃহীনা স্নেহান্ধ ধনী পিতার একমাত্র সন্তান সে। তাহার কোনো অভিলাষ কোনোদিন অপূর্ণ থাকে নাই। দুলালী মেয়ের মতই সে বলিল, "কিন্তু ওকে আমার চাই।...যা' যখন চেয়েছি,—এতকাল পেয়ে এসেছি;—ওকে পাবোনা অপর্ণা?"

অপর্ণা শুধু তাহার অন্তরের গভীরতা দিয়া শুভকামনা জানাইতে পারে, ঈশ্বরের কাছে প্রিয় বান্ধবীর সুখের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে, কিন্তু যুক্তি দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, তাহাকে আশ্বাস দিবার ভাষা খুঁজিয়া পায়না।

জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে অপর্ণার বাবা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন। আগামী মাসে তাহার বিবাহ; সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। অপর্ণাদের বর্দ্ধমানের বাড়ীতেই বিবাহ হইবে। ছেলে কলিকাতায় কোনো কলেজের অধ্যাপক।...অপর্ণার মত এত ভালবাসা তাহার সমসাময়িক কোনো মেয়ে কখনো পায় নাই। চোখের জলে অভিনন্দিত করিয়া স্বল্পভাষিণী অপর্ণাকে মেয়েরা বিদায় দিল। কুইন্ আলেকজান্দ্রা হষ্টেলে অপর্ণা যত মাধুর্য্য ছড়াইয়া গিয়াছিল, বোর্ডাররা তাহার বিদায়ের দিন যেন সব তাহাকে ফিরাইয়া দিল।

* * * *

কয়েকটা বৎসর কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। অপর্ণার বিবাহে সুলতা উপস্থিত থাকিতে পারে নাই। ইহাতে দু'জনের মনেই দুঃখ রহিয়া গিয়াছে। অপর্ণা বিবাহের পর লিখিয়াছিল, "তুই যেমন এলিনা, আমিও যাবোনা তোর বিয়েতে।"...কিন্তু, সে-কথা থাক।

ডিসেম্বরের সন্ধ্যা। কলিকাতার সুবিখ্যাত 'ইঞ্জিনিয়ার্স্ য়্যাণ্ড্ কনট্রাক্টার্স্' জর্জ্জ উইলিয়ামসন্ য়্যাণ্ড্ কোম্পানীর বিশাল অট্টালিকার একটা কক্ষ দিবালোকের মত আলোকিত।...এইমাত্র মোহিত একটা রেখাবহুল প্ল্যান্ আঁকা শেষ করিল। সাতটা বাজিয়াছে। যাক্,—আজ তবু একটু আগে উঠিতে পারিয়াছে। কতদিন ত' ন'টা সাড়ে ন'টা বাজিয়া যায়। উঃ, এমন কাজ যেন কেহ না করে!

জিনিষপত্র গুছাইয়া মোহিত উঠিয়া দাঁড়াইল। মাথার সামনের দিককার কতকগুলি চুল কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; 'টাই'টা বুকের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; গায়ে কোট নাই, শার্ট্-এর উপর শুধু ওয়েষ্টকোট। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কেমন যেন নিষ্প্রভ দেখাইতেছে। ডাম্বেল্ করিবার ভঙ্গীতে হাত দুইটাকে কয়েকবার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিয়া সে পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট একটা ঘরে ঢুকিল।... লাঞ্চ্-এর পর হইতে একমিনিট বিশ্রাম করে নাই। ছ'টায় সুশান্তর সঙ্গে তাহার হোটেলে চা খাইবার কথা ছিল, তাই বিকালে চা-ও খাওয়া হয় নাই।...অথচ কাজটাও ছিল অত্যন্ত জরুরী। একদিন দেরির জন্যই হয়তো লক্ষাধিক টাকার একটা টেণ্ডার ফস্কাইয়া যাইতে পারে। বেতন দিয়া উইলিয়ামসন্ কোম্পানী তাহাকে তবে কী জন্য রাখিয়াছে?......পাঁচ সাত মিনিট পরে সে বাহির হইল। কেশ ও বেশ সুবিন্যস্ত হইয়াছে। বামবাহু দিয়া শিথিলভাবে টুপিটা চাপিয়া ধরিয়া মোহিত লিফ্ট্-এর বোতাম টিপিল।...

অফিস হইতে বাহির হইয়া মোহিতের চোখ দুইটা জ্বালা করিতে লাগিল। মহানগরীর পথে পথে আলো জ্বলিয়াছে। চোখ বন্ধ করিলে কতকগুলি সরলরেখা চোখের পাতায় তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে।...রেখাগুলি যেন ছুঁচ হইয়া এখনি বিঁধিয়া বসিবে!...

মোহিত একটা সিগারেট ধরাইল। বিলাত হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উচ্চ ডিগ্রী লইয়া বহুকাল পরে সুশান্ত আসিয়াছে। আজ তাহার একখানি চিঠি আসিয়া হাজির! লিখিয়াছে, বম্বে হইতে বাবার কাছে শিমলা যাইতে হইয়াছিল। তাড়াতাড়িতে মোহিতকে চিঠি লিখিতে পারে নাই। হোটেলে উঠিতেছে;—মোহিত যেন অবশ্য আসে। অনেক কথা বলিবার ও শুনিবার আছে।...ওয়েষ্ট এণ্ড কোম্পানীর ঘড়িটা জ্বলিতেছে,—নিজের ঘড়িটাও সঙ্গে সঙ্গে মোহিত দেখিয়া লইল। ততক্ষণে একটা ট্রাম আসিয়া পড়িয়াছে।

ট্রামে বসিয়া কত কথা মনে হইতেছে।...ধরা-চূড়া পরিয়া দেখা করিতে মনটা সায় দিতেছে না। একবার বাড়ী হইয়া আসিলে বেশ হইত।...ছ'টায় যাইবে বলিয়া টেলিফোন করিয়াছে, অথচ যাইতে যাইতে প্রায় সাড়ে সাতটা! গিয়া সুশান্তকে পাইলে হয়!...বিলাত হইতে সে সাহেব হইয়া ফিরিতেছে, চাই-কি সময়ের মূল্য সম্বন্ধে দু'কথা কহিতেও পারে।...কলেজে মোহিত লেখাপড়ায় শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিল; কিন্তু সুশান্ত সাধারণ মেধার ছাত্র হইলেও,—অনেকটা অপর্ণা ও সুলতার বন্ধুত্বের মতই বিস্ময়কর,—সে ও মোহিত ছিল অভিন্নহৃদয়।...কথার পর কথা মোহিতের মনে হইতে লাগিল। কুইন আলেকজান্ড্রা হষ্টেল হইতে ফিরিয়া এক একদিন রাত্রে সুশান্ত মোহিতকে কত কথাই না বলিয়াছে।...নৈশ-অন্ধকারে ছায়াপথ রচনা করিবা গঙ্গাবক্ষ হইতে জাহাজের সার্চ্চ্লাইট্-এর আলোকরেখা দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে। কলেজের কাছে গঙ্গাতীরে বসিয়া সুশান্ত যেন কোনো দুইটি রহস্যময় পথের একটিকে বাছিয়া লইবার সঙ্কল্প করিয়াছে।...সুলতা এখন কোথায় আছে? সুশান্ত বিবাহ করিয়া যায় নাই এটা সে জানে। এই দীর্ঘকাল সুলতা কোথায় কি লইয়া আছে? বিলাত যাইবার সময় সুশান্ত মোহিতকে বলিয়াছিল, "সুলতার কথাগুলো এক-একসময় বড় স্বার্থপরের মত শোনায়; আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনা। জানো মোহিত, সে আমাকে আমার বাবার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়।"—মোহিত এ সকল ভাল বোঝেনা। জীবনে যত বই পড়িয়াছে দু'চারখানা ছাড়া আর প্রায় সবই পাঠ্যপুস্তক। পিতার নিকট হইতে পুত্রকে কাড়িয়া লইবার ধারণাটাই কেমন অদ্ভুত মনে হয়!...

সুশান্ত মোহিতকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল। তারপর বলিল, "এই তোমার ছটা?...উঃ! সেই কখন থেকে তোমার আশায় ব'সে আছি!"

সুশান্তর প্রত্যেকটি কথা যেন কেমন বেমানান শুনাইতেছে। তাহার কণ্ঠের সেই আত্মচেতন ভাবটুকু নাই; কেমন একটা অসহায় সুর। মোহিত কহিল,—"পরের চাকরি ক'রে খাই;—আজ তবু আগে উঠতে পেরেছি।...কিন্তু তুমি সিমলা থেকেও ত' একটা চিঠি দিতে পারতে। আমরা দু'-চারজন যা' আছি,—অবনী, প্রকাশ, সুশীল,—ষ্টেশনে গিয়ে হৈ হৈ ক'রে তোমাকে নিয়ে আসতাম।"

সুশান্ত হাসিয়া উঠিল। কিন্তু মোহিত ছাড়িবার পাত্র নয়। চা খাইতে খাইতে কথা চলিতে লাগিল।...অনুযোগের আর অন্ত নাই।...কলিকাতা আসিয়া চিঠি লিখিবার কোনো মানে হয় না। মোহিতের ঠিকানাটা যখন অনুগ্রহ করিয়া ভোলে নাই, তখন তাহার ওখানে উঠিলে সুশান্তর জাত যাইত না। হোটেলে উঠিবার সুপরামর্শ তাহাকে কে দিয়াছে মোহিত তাহা জানিতে চায়।...

সুশান্ত কহিল, "আমাকে একটা কথাও তুমি বলতে দিচ্ছনা!...ক'দিন ক'লকাতা থাকবো কিছু ঠিক নেই। কোথায় 'পোস্টেড্' হ'ব জানি না। শিমলায় একটা ইন্টারভিয়ু দিয়ে এসেছি—যে-কোনো মুহূর্ত্তে টেলিগ্রাম এসে প'ড়তে পারে।...তোমার ওখানে উঠবো ভেবেছিলাম, তা'তে তুমি যে খুব খুসি হ'তে তা' আমি জানি। কিন্তু যে ক'ট দিন এখানে থাকবো, আমার কাছে নানান ধরণের মানুষ আসবে,—আমাকে ভুল বুঝোনা,—আমার যতখানি অসুবিধা, তা'র চেয়ে ঢের বেশি অসুবিধা তোমাদের! তারপর," একটু থামিয়া সুশান্ত কহিল, "তারপর,—যে-কোনো সময় সুলতা এসে প'ড়তে পারে!..."

মোহিত কহিল, "তিনি এখন কোথায় আছেন?"

সুশান্ত কহিল, "কি ক'রে জানবো বল?...তা'র কি কিছু ঠিক আছে?...আজ হয়তো দেখলে ক'লকাতার রাস্তায় গাড়ী নিয়ে ছুটছে, কাল হয়তো দিল্লী থেকে এক টেলিগ্রাম এলো, 'হঠাৎ 'এয়ার মেলে' চ'লে এলাম, রাস্তায় কোনো কষ্ট হয়নি। 'ওয়েদার' চমৎকার ছিল।'...জানো মোহিত, এক-একসময় আমার মনে হয়, এ একটা ব্যাধি! ওর এই 'স্পীড্-ক্রেজে'-এর প্রতিকার দরকার!"

মোহিত কহিল, "অদ্ভুত!..."

সুশান্ত বলিতে লাগিল, "শিবপুরে থাকতে তুমি আমাকে ব'লতে আমার অনেক কথা তুমি বোঝোনা। আমার দশাও আজ প্রায় তাই!...সুলতা ঠিক কী যে চায়, মনে হয়, আজো আমি বুঝতে পারিনি।...গৃহ সে চায়না। সে আমাকে বেরিয়ে আসতে বলে!...হয়তো বলি,—'কোথায় যাবো, কোথা থেকে বেরিয়ে আসতে ব'লছো?'—সুলতা হঠাৎ অত্যন্ত খুসি হ'য়ে ওঠে; তারপর বলে, 'বাইরে, আকাশে, অন্ধকারের পর অন্ধকার পেরিয়ে, দেশ হ'তে দেশান্তরে!...তোমার বাবাকে ভুলে যাও,—তাঁকে মনে ক'রতে বল তুমি নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছ!'...সুলতা কী এক সম্ভাবনায় উল্লসিত হ'য়ে ওঠে!"

সুশান্ত থামিল।...রাত্রি প্রায় দশটার সময় মোহিত উঠিল। সুশান্ত সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা অবধি নামিয়া আসিয়া তা'র হাত ধরিয়া মিনতির সুরে কহিল, "রোজ একবার আসিস ভাই, আপিস থেকে ফেরবার পথে।"

ঘরে আসিয়া সুশান্ত কয়েকটা জরুরী চিঠি লিখিতে বসিল। মিষ্টার উইলিয়াম স্কীনারকে অক্ষমতা জানাইয়া একটা চিঠি দিতে হইবে। সরকারী কাজই যখন হইতেছে, তখন স্কীনার সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া সে-কথা জানানো ভাল। তাহার যোগ্যতার মূল্য সর্ব্বপ্রথম তিনিই দিতে চাহিয়াছিলেন।...বাবাকেও কলিকাতা আসিয়া একটা চিঠি লেখা হয় নাই; হয়তো কত চিন্তাই না করিবেন!...প্রশান্ত লাহোর গিয়াছে ক্রিকেট খেলা দেখতে; সে-ও দাদার একটা চিঠি আশা করবে।...এইরূপ তিন চারখানা চিঠি লিখিয়া সুশান্ত উঠিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল।...আকাশে রাশি রাশি তারা ফুটিয়াছে। যন্ত্র সাধকের কানে এরোপ্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ ধ্বনিত হইতেছে! সুশান্তর চিত্ত ভরিয়া সুলতার তপস্যা প্রতিবিম্বিত হইয়া ওঠে।...সাইবিরীয়ান রাজহংস-দম্পতীর মত আকাশ পথে তাহারা উড়িয়া চলিবে,—নির্ভয়-ভীত কত নীচে পড়িয়া রহিবে নগর, গ্রাম, জনপদ, সমাজ ও সংসার!...কত রাত্রির কল্লোলাকুল সমুদ্র পার হইয়া গৌরীশৃঙ্গে তাহারা বিশ্রাম করিবে, মানস সরোবরের শীতল জল পান করিয়া আবার উল্কার বেগে তাহারা ছুটিয়া চলিবে। সুলতা হয়তো ক্লান্তিতে তাহার বুকে মাথাটি রাখিয়া ঘুমাইতেছে!...ইঞ্জিন হইতে একটা অদ্ভুত শব্দ আসিতেছে না?...প্রত্যেকটা ইণ্ডিকেটার তাহাদের কাজ করিয়া যাইতেছে, সবই ত' ঠিক!...কিন্তু, আবার শব্দ হইতেছে যে!...জাগিয়া সুশান্ত স্বপ্ন দেখিতেছে নাকি?...কোথায় এরোপ্লেনের ইঞ্জিন আর কোথায়ই বা রাশিয়ান্ 'ষ্টেপ্'-সমূহের অন্তহীন প্রান্তর!...তাহার ঘরের দরজায় মৃদু অথচ অসংযত করাঘাত পড়িতেছে!

সুশান্ত দরজা খুলিতেই মূর্ত্তিমতী রহস্যের মত সুলতা ঘরে ঢুকিল। তাহার সমস্ত বেশ-বাস অমাবস্যার মত কালো। পায়ে 'মিডিয়ম্ হিল্'-এর একটা জুতা, সেটাও কালো পেটেন্ট্ লেদারের। ব্লাউজের আস্তিন কব্জি স্পর্শ করিয়াছে—তাহাতে কোন কারুকার্য্য নাই, থাকিলেও কালো বলিয়া হয়তো দেখা যায় না। সুলতার কালো শাড়িতে সরু ফিতার মত রূপালী জরির পাড় মেঘাচ্ছন্ন দুর্য্যোগের আকাশে বিদ্যুদ্‌বহ্নির মত ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিয়া উঠিতেছে। শুধু মুখখানি ছাড়া সুলতা যেন তার উজ্জ্বল বর্ণমাধুরী মসিলিপ্ত করিয়া আনিয়াছে। সে ঘরে ঢুকিয়া ধীরে ধীরে চিঠি লিখিবার টেব্‌ল্-এর সামনের ছোট চেয়ারটিতে বসিয়া পড়িল।…হাতে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ। সুশান্ত অবাক হইয়া দেখিল কোনো কথা না বলিয়াই সুলতা ব্যাগটা একবার খুলিল; কিন্তু আশ্চর্য্য তাহাতে প্রসাধনের সামগ্রী একটিও নাই, নানারকম কাগজপত্র ও চিঠিতে সেটা ভরা।…ঘরের স্নিগ্ধ নীলাভ আলোয় সুশান্তর মনে হইল,—এ আবির্ভাবের তুলনা নাই!…

সুশান্ত প্রথম কথা কহিল, "কবে এলে?"

মুখ না তুলিয়া সুলতা কহিল, "আজ।"

সুশান্ত কহিল, "কোথায় উঠলে?"

এবার সুলতা মুখ তুলিয়া বলিল, "অপর্ণার ওখানে। সারাদিন ত' ঘুরেই বেড়াচ্ছি। নামে মাত্র ওঠা। বেচারী হয়তো এখনো না খেয়ে ব'সে আছে সঙ্গে সঙ্গে ওর ভালমানুষ অধ্যাপক স্বামীটিকেও না খাইয়ে রেখেছে!…"

সুশান্ত কহিল, "সে-কি!…বেশ বন্ধু ত' তুমি!…জেনে-শুনে তাঁদের কষ্ট দিচ্ছ!…"

সুলতা অত্যন্ত লঘুভাবে কহিল, "আমি তা'র কি ক'রবো? আমার কাজ শেষ না হ'লে ত' আমি ফিরতে পারি না। আমি বার বার ওদের ব'লে এসেছি আমার জন্যে অপেক্ষা না ক'রতে!"

সুশান্ত কহিল, "তোমায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। যখন ঘরে ঢুকলে, মনে হল উল্কা!…এখন কথা ব'লছো, মনে হ'চ্ছে—তোমার রহস্যের শেষ নেই।"

সুলতা একবার নিজের কালিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া পরিহাসতরল কণ্ঠে কহিল, "কী যে বল!…হ্যাঁ, আজ একটা গাড়ী কিনেছি, সেটাও মিশমিশে কালো। আজ বিকেল থেকে সমস্ত ক'লকাতা সহরটা প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরচি। অনেকের সঙ্গে দেখা করা সেরে নিয়েছি। দিন কতক গাড়ীটা নিয়ে একলাই যেখানে যেখানে মোটরের রাস্তা আছে ঘুরে বেড়াবো।"…সুলতা একটু থামে, তারপর বলে, "দেখ, আমি নিজে আমার চলা দেখতে পাইনা,—আমার স্পীড্-এর একটা 'ফিল্ম্' তোলানো যায় না?…"

সুশান্ত নীরবে শুনিয়া যাইতেছিল; প্রশ্ন শুনিয়া একটু অন্যমনস্কভাবে কহিল, "যায় বৈ কি!"

সুলতা ঘড়ি দেখিল,—এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। কালো শাড়ির রূপালী জরির আঁচলের একপ্রান্ত আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে সুলতা স্পষ্ট অথচ চাপা কণ্ঠে কহিল, "তুমি কি ঠিক ক'রলে জানতে এসেছি।"

সুশান্ত ধীরে ধীরে সুলতার চেয়ারের পেছনে আসিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে সঙ্গে সুলতা একটু ঘুরিয়া বসিল। শোকার্ত্ত মানুষ যে-ভঙ্গীতে মুখ তুলিয়া বিধাতার উদ্দেশে অভিযোগ জানায়, তেমনি করিয়া সুশান্তর মুখের পানে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সুলতা কহিল, "বল!"…

শত শত 'ড'-হ্যাভিল্যাণ্ড' ইঞ্জিনের প্রোপেলার যেন সুশান্তর মাথায় সশব্দে ঘুরিতে লাগিল।…সুলতার কথা শুনিলে সে-আঘাত পিতাকে কতখানি আহত করিবে সুশান্তর তাহা অজানা নাই। বহুদিন পরে সুলতার ভুল ভাঙিলে হয়তো আবার দু'জনে ফিরিয়া আসিবে,—হয়তো প্রতিষ্ঠাও অর্জ্জন করিবে, কিন্তু, যেমনটি হইতে পারিত তেমনটি আর কিছুতেই হইবে না।…সুলতার প্রেমকে সে অস্বীকার করে না; সেদিক দিয়া সে-ও কার্পণ্য করে নাই। কিন্তু তাহাকে কিছু বুঝাইতে গেলে সে বোঝে না!…প্রেম ও যৌবন আপনাদের দাম্ভিকতায় জয়ী হইতে চায়!…তা-ও কি হয়? আজ সুলতাকে সুখী করিতে গেলে শুধু নিজের পিতার অপমান নয়, জগতের সমস্ত পিতৃত্বের অপমান!… সুশান্ত জানালার কাছে সরিয়া গেল; তারপর বলিল, "হয় না, সুলতা,—তুমি যা চাও তা' হ'তে পারে না!…"

হাঁ, নক্ষত্রলোকের পথে, মেঘের অন্তরালে রথ চালাইবার

সাহস এমন মেয়েরই থাকা সম্ভব।...সুভদ্রার উত্তরাধিকারিণী আজও অন্ততঃ একজন বাঁচিয়া আছে। সুশান্তর কথা শুনিয়া সুলতাকে একটুও বিচলিত হইতে দেখা গেল না। কিন্তু তাহার দুই চোখে যেন বিশ্বের সমস্ত শ্রান্তি নামিয়া আসিয়াছে। সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে বলিয়াই হয়তো।... সুশান্তর কথায় আহত হইবার কিছুই নাই; পরাজয় তাহারও নহে, তাহার প্রেমেরও নহে; পরাজয় তাহার অবুঝ খেয়ালের!

টেবিলের উপর উইলিয়াম স্টীনার প্রভৃতিকে লেখা চিঠিগুলি পড়িয়া ছিল। সেদিকে চাহিয়া সুলতা উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর কহিল, "অনেক চিঠি লিখেছ দেখছি! আমাকে তুমি কতকাল চিঠি লেখ না! কত কষ্টে তোমার খোঁজ পেতে হয়।..." দরজার দিকে এক পা আগাইয়া সুলতা আবার কহিল, "যখন যেখানে থাকি তুমি খবর পাবেই। কি চোখে তোমাকে দেখেছি জানিনা, এমনটি আর কারুকে দেখিনি। সাবেক পথে চ'লতে আমার মন সায় দেয়না,... তাই তোমার কথা ঠেলতে হ'চ্ছে। আমায় তুমি ক্ষমা ক'রো।"

সুশান্ত একটি কথাও কহিতেছে না। জানালায় হেলান দিয়া স্থির হইয়া সে সুলতার দিকে চাহিয়া আছে।...সুলতা দরজার 'নব্'-এ একটা মোচড় দিল, কিন্তু না খুলিয়াই পেছনে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "সামনের সপ্তাহে হয়তো করাচী থেকে 'এয়ার মেল্'-এ আর একবার পাড়ি দেব।...এবার আমার তীর্থ ইংল্যাণ্ড,—আর বিগ্রহ ম্যাল্কম্ ক্যাম্প্বেল্। কেমন ক'রে হ'ক 'ব্লু-বার্ড' এ একবার চ'ড়বই।...স্পীড সম্বন্ধে কত কথা যে জানতে ইচ্ছে করে।..."

সুলতা দরজা খুলিতেই সুশান্ত যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল।...হোটেলের লিফ্ট্ বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—দু'জনে এক সঙ্গে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিল।...সুলতার হাত কখন যেন অজ্ঞাতে সুশান্তর দৃঢ় মুঠির ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে!

গাড়ীতে বসিয়া সুলতা 'ষ্টিয়ারিং' ধরিল। একটু মৃদু গুঞ্জন করিয়া গাড়ীখানি কাঁপিয়া উঠিল।...সুশান্ত সঙ্কুচিতভাবে কহিল, "আপনাদের বাড়ী অবধি আসবো তোমার সঙ্গে?"

সুলতা বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, "কেন বল ত'?"

সুশান্ত কহিল, "না,...এত রাত্তিরে একা যাবে,—তাই!...আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চ'লে আসবো আবার।"

সুলতা হাসিয়া কহিল, "সাড়ে এগারোটা আবার রাত নাকি? তারপর", নির্লিপ্তভাবে সুলতা কহিল, "তারপর আজ এই একটা রাত্রির কতটুকু সময় আমায় একা যেতে দিতে তুমি অস্বস্তি বোধ ক'রছো, কিন্তু, ভবিষ্যৎ-এর কত অনন্তরাত্রির পথে যে একা ছেড়ে দিচ্ছ!..." বিদ্যুৎ-এর মত একটু হাসিতে সুলতার মুখখানি ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; সহজ-কণ্ঠে সে কহিল, "একটু 'কন্সিস্টেণ্ট্' হও।...ভারতবর্ষ তোমাদের মত সন্তানদের কাছে কত কিছু আশা করে। দেশ তোমাদের মুখ চেয়ে আছে।..."

গাড়ী একটু চলিতে সুরু করিয়াছে,—ইঞ্জিনের শব্দে সুলতার কণ্ঠ আর শোনা গেলনা। যতক্ষণ তাহার লাল আলোটুকু দেখা গেল সুশান্ত সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

* * * *

কয়েকদিন পরের কথা। 'ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশ্নাল এয়ার ওয়েজ'-এর বিখ্যাত বিমানপোত 'মিটিয়র' এশিয়ার সীমা পার হইয়া ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়া গ্রীস্ অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে সুলতার ভাগ্যে 'নাইট্ ফ্লাইং' ঘটিয়া ওঠে নাই, তাই যাত্রীদের মধ্যে তাহার উৎসাহটা কিছু বেশি।...শীতে সবাই জমিয়া যাইবার মত হইয়াছে। সকলেই অল্পবিস্তর তন্দ্রাচ্ছন্ন। সুলতা চক্ষু বুজিয়া আছে, কিন্তু সকল অঙ্গ সজাগ রাখিয়াছে।...সুশান্ত সঙ্গে থাকিলে কী আনন্দই না হইত। অনতিদূরে এক নববিবাহিত ইংরেজ-দম্পতি উভয়ে উভয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। নিজের পাশে সুশান্তকে কল্পনা করিয়া সুলতার সারা দেহ আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে!...তাহার দুইচোখে কে যেন তন্দ্রার কাজল পরাইয়া দিতেছে।

সহসা মনে হইল, সেই নৈশগগনবিহারী যন্ত্রদানব যেন অসংযত হইয়া উঠিয়াছে। ছোটোখাটো একটা বাতাসের ঢেউ মনে করিয়া সুলতা চক্ষু মেলিলনা।.. কিন্তু, ক্রমেই 'মিটিয়র' অশান্ত হইয়া উঠিতেছে। সুলতা সাধারণ যাত্রীর মত অনভ্যস্ত নহে। ইঞ্জিনের শব্দটাও যেন কেমন!...

কোথায় যেন ধ্বনিবিন্যাসে তাল কাটিতেছে,—ছন্দপতনের মত মাঝে মাঝে এক একটা ফাঁক পড়িয়া যাইতেছে।…

তীব্র অনুভূতি লইয়া সুলতা চোখ খুলিল। উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতেই মনে হইল 'মিটিয়ার' ভীষণভাবে কাঁপিতেছে! সুলতার চোখের সামনে দিয়া কতকগুলি বিভীষিকার দৃশ্য খেলিয়া গেল। তাহার সমস্ত অন্তর যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; 'সুশান্ত।…সুশান্ত।'… সহসা বিকট শব্দে অর্দ্ধবৃত্তাকারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রচনা করিয়া 'মিটিয়ার' অগাধ জলে মুখ থুবড়াইয়া পড়িল।…এতটুকু চীৎকারের অবসরও সে কাহাকেও দিলনা।…

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দুর্ঘটনার সংবাদ সমস্ত পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল।…

ভারত সরকার হইতে সুশান্তর নামে জরুরী তার আসিয়াছে; 'কোয়েটায় ভূমিকম্পবিধ্বস্ত অঞ্চলে অনতিবিলম্বে সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের পদে যোগদান করুন।'…

কর্ম্মের আহ্বান আসিয়াছে, সুশান্ত যাইবে বই কি?… ভূমিকম্প কি শুধু কোয়েটায়? সমস্ত পৃথিবীটাই ত' কাঁপিতেছে।…ভূমধ্যসাগরের গভীরতম তলদেশে মুক্তার প্রাসাদে সুলতা কী ঘুমই না ঘুমাইতেছে।…

শ্রীশরদিন্দু সেনগুপ্ত

বারতা *

শ্রীমতী সুপ্রভা দত্ত এম্‌-এ

সেই গিরিচূড়ে প্রথম রবির পরশ পড়ে,
অস্তরাগের বিদায়-প্রণতি ঝরে।
প্রতিদানে গিরি অচপল আঁখি,
তুষারকঠিন শীতলতা আঁকি',
সারাদিনমান অনিমেষ চেয়ে রয়;
দোঁহাকার চির-চাহনীর বিনিময়।

সেই গিরিতলে একটি ফুলের দল
অরুণ কিরণে রক্তিম ঝলমল।
রবিরে চাহিয়া কত যে কামনা করি,
রবির জীবন যাপিতে জীবন ভরি
কঠিন প্রয়াসে ফুল-শোভা যায় ঝরি!
সেই গিরি—কত দেশে কত গৌরব ঘোষে তার,
লোকে কয় ফুলে 'সূর্য্যমুখী' সে, নাম-গৌরব সার।
ওগো পূরবের প্রিয়! বেদন-ফেনিল সুদূর জলধি পারে,
মোর ধূসর গোধূলি উজ্জ্বলি' তোল একটি
আলোক ধারে!

সুদূর পথিক, যাবে কি পূরব পুরে?
মিনতি আমার, কহিও করুণ সুরে,
সূর্য্যমুখীর ছল করি তারে জানাই মর্ম্মকথা,
দুর্ব্বল তুলি, চিত্রলেখায় কেবলি অক্ষমতা।

কহিও তাহারে, তাহারে স্মরিয়া সুরের মালিকা গাঁথি,
কুড়াইতে গীতি, কত জন নিতি রহে অঞ্চল পাতি।
কুসুম যেমন ভ্রমরের প্রীতি ভুলিয়া হেলার ভরে,
তপনে চাহিয়া মূরছিত হিয়া মরণ বরণ করে,
তেমনি আমার পূরবের পথে আঁখি চির রহে জাগি'।
মধু মর্ম্মর গুঞ্জন রত মধুকর থাকি' থাকি'।

---

* Browningএর 'Rudel to the Lady of tripoli' অবলম্বনে।

লীলার সাথী তো মোরা নহি

শ্রীপ্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সাগরের তীরে তীরে মানুষের ঘর,
আকাশের বাঁকে বাঁকে,—
নীলিমা কাঁপিছে বন্ধু, সিন্ধু মর্ম্মরিছে,
দ্বীপে দ্বীপে কাঁদিতেছে প্রিয়জন মোর।
বেলা যবে শেষ হয় প্রতি দিন,
সিঁদুর জ্বলিতে থাকে লোণা জলে,
কুটির ছাড়িয়া প্রিয়া আসে
আবার আমারে ভালবাসে,—
বিজন ঘাটে বসিয়া রুক্ষ বেণী দোলাইয়া
শিহরিত দুই হস্ত মেলি
অতীত স্বপ্নের তীর থেকে সন্ধ্যাদীপ ভাসাইয়া দেয়।
তখন রাত্রির আঁখি ভরি
নীল অশ্রু সহসা ঘনায়।
ওগো রূপময়ী প্রিয়, চোখে তন্দ্রা আনো,
বাসর ভাঙ্গিয়া ফেলো, গত জন নাহি ফেরে ঘরে।
সিঁড়িতে আছাড়ে জল, জ্যোৎস্না আছাড়ি'
পড়ে জলে,—
ক্ষুদ্র দ্বীপে জাগে রাত্রি—
উদাসীন তারা চাহি বিরহিনী কাঁদে সিন্ধুপারে।

* * *

নিঠুর নিয়তি, আজি হেন মনে লয়,
নিষ্ঠুর জনম মরণ কথা,—
পথ'পরি ঘোরাফেরা, বেশী কিছু নয়
বেলা শুধু কেটে-যাওয়া প্রবাস-মায়ায়।

এত রঙ কে ছড়ালো জীবনের গায়ে,
ক্ষণস্থায়ী স্বপন বুলালো,—
মৃত্যুদষ্ট প্রেমের কমল কেন ফোটে
জীবনেরে শুধু ছুঁয়ে যেতে!
হে বিধাতা, বলো বলো,
নিদ্রাহীন, হে নিষ্কম্প, বলো ;—
সামান্য এ ধূলির শরীরে
যে ব্যথা বহিয়া চলি মোরা,
তুমিও তা সহিতে নারিতে।

অদৃশ্য রহস্য-শক্তি অনাবৃত কাল-রাত্রিতলে,
তরঙ্গিত-মিথ্যাধারা জন্মধারাতলে
মোদের টানিয়া আনে খেলাঘরে!—
খেলা তার রাত্রি দিনমান চলে :
—লীলার সাথী তো মোরা নহি—
মোদের বেদনা-হাসি, সংসারের ছোট-নীড়-বাঁধা,
উদ্বেজিত রক্তিম বসন্ত, বর্ষাধারা,
উৎসবের ক্ষুদ্র রাগ, অর্থ যশঃ মান,
কবিতা সঙ্গীত শিল্প সভ্যতা বিজ্ঞান,
পায়ে তার ঝরি পড়ে অনিবার্য্য আকর্ষণ স্রোতে,
প্রতি বারে অর্ঘ্য পূর্ণ হয়, প্রতিবারে হয় শেষ,
তুচ্ছ হয়ে যায়,—
ফুল ঝরে, প্রাণ ঝরে, কাল যায় ঝ'রে,
মানুষের প্রেম কাঁদে বিধাতার খেয়ালের ঘরে।

জগদম্বা মেস

শ্রীসুবোধ বসু

প্রথম দৃশ্য

জগদম্বা মেসের ঘর। শম্ভু একা একটা ভাঙা চেয়ারে বসিয়া আছে।

শম্ভু। নাঃ কম্যুনিষ্টই শেষকালটায় হয়ে যেতে হবে। এমন অনিচ্ছুক বেকার-অবস্থা এমন শোচনীয়ভাবে চলতে থাকলে ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্‌-এর মধ্যে কিছুতেই আর থাকা পোষায় না। যত ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়া চাকরির মালিক শালা শালীপো ঢুকিয়ে পারিবারিক বেকার-সমস্যার সমাধান করছে,—আমাদের ফ্যাঁ ফ্যাঁ করে রোদ্রে বেড়ানই সার।

গুণগুণ করিয়া একটু গান সুরু করিল। তারপর সহসা নামিয়া গেল—

শম্ভু। গান ফান ভাল্লাগে না মাইরি। টাকা নেই, পয়সা নেই—একেবারে জড়ভরত অবস্থা যাকে বলে। একমাসের মধ্যে একটা আইস্-ক্রীম্ পর্য্যন্ত খেতে পারিনি,—সিনেমা দেখা তো দূরের কথা। আর এই জগদম্বা মেস্-এ যে কত বাকী পড়েছে হিসেব করতে ইচ্ছে হয় না। মন খারাপ হয়ে যায়।

একটু শিষ দিল।

শম্ভু। 'কেতকী'-সম্পাদকের জন্য আবার একটা কবিতা লিখে দিতে হবে। বাংলা কাগজে লেখা, না ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। অন্তত শ্রীভারত রেকর্ড কোম্পানীতে যদি দুএকটা গান রেকর্ড করবার জন্য নিত তবু royalty হিসাবে দুচার পয়সা পাওয়া যেত। আশ্চর্য্য ছ-ছটা গান পাঠালুম তাদের একটাও পছন্দ হলো না। এখানেও আবার প্রায় সেই শালাশালীপোর ব্যাপার কিনা।

আবার একটু শিষ দিল।

শম্ভু। অনাহারী ব্যাপার হলেও 'কেতকী'-সম্পাদককে পৃষ্ঠার পাদপূরণের জন্য একটা কবিতা লিখে পাঠাতেই হবে। আর কিছু না হোক, কবি হিসেবে একটু পাবলিসিটী হয়। তবে এই পাবলিসিটীরই বা কী মূল্য,—রেকর্ড-কোম্পানীর মালিকেরা আর কখনো মাসিক কাগজ পড়ে না যে কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে রেকর্ড করতে নেবে।

গুণগুণ করিয়া কোনও কবিতার ধুয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল।

শম্ভু। দুর ছাই, কোনও কিছু যদি মনে আসে। পকেটের যা অবস্থা তাতে 'ভাবের মাথায় লাঠি মারলে দেয় না কো সে সাড়া।' পয়সার inspiration না থাকলে প্রেম আসে না, জোৎস্না চোখে পড়ে না, এমন কি ফুলের গন্ধ পর্য্যন্ত নাকের ভেতর প্রবেশ করতে পারে না।

গান :

তোমার কথা ভাববো প্রিয়া
সময় কোথা পাই?
অর্থাভাবের অনর্থতে কবিত্ব আর নাই

খাঃ, বেশ গানটা লিখেছিলুম।

পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে গেল পকেটটার্ও বেশে,
ধুতিগুলি জীর্ণ হয়ে বসেছে সব বেঁতে,
জুতোটাতে তালির সংখ্যা উঠছে বেড়ে ছাই।
এদের জ্বালায় শুকিয়ে গেলেম
কবিত্ব আর নাই।

অর্থাভাবে প্রেম ঢাকা পড়ে যায়, দক্ষিণ বাতাস গায়ে লাগে না।

প্রিয়া তোমার চোখের ভুরু ইন্দ্রধনু-বাঁকা,
প্রিয়া তোমার চোখ দুখানি কাজল দিয়ে আঁকা,
এ-সব কথা ভাবার সময় ছিল আমার মানি
তখন তো আর ছিল নাকো টাকার টানাটানি।
অর্থাভাবের ভস্মতলে তোমার বর্ণ ঢাকা,
প্রিয়া তুমি পরের কথা, তোমার আগে টাকা।

এখন কঠিন বাস্তবের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে ওসব মোলায়েম জিনিষ আর্ত্তনাদ করে উঠছে।

বধ্য দেখি এখন শুধু গুদাম, অফিস-বাড়ী,
ছোট সাহেব, বড় সাহেব, দারোয়ানের দাড়ি
দোদুল-উদর বড়-বাবুদের কথাই পড়ে মনে,
ফিরে আসা ব্যর্থ হয়ে আত্ম অপমানে।
প্রাণের দায়ে দুপুর রোদে হেথায় হোথায় ঘুরি,
বাধ্য হয়ে বর্ত্তমানে প্রিয়ার সঙ্গে আড়ি।

অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হল যে—

অর্থাভাবে প্রেম জমে না রূপ খোলে না ভাই,
কিনব শাড়ি প্রিয়ার তরে অর্থ কোথায় পাই!
অঙ্গরাগের সঙ্গে প্রিয়া মুদ্রা মাখ মুখে,
টাকা দিয়ে কিনতে হবে কে-হার দোলে বুকে।
তপস্যা মোর দিবানিশি টাকার জন্য, তাই
তোমার কথা ভাববো প্রিয়া সময় কোথা পাই?

চটির শব্দে শম্ভু ফিরিয়া তাকাইল। ঘরে প্রবেশ করিলেন মেস-এর ম্যানেজার হ-বাবু।

শম্ভু। এই যে ম্যানেজার বাবু, আসুন, আসুন। সুপ্রভাত সুপ্রভাত। রাতে বেশ ঘুম হয়েছিল তো?

ম্যানেজার। তা হয়েছিল। রোজই যে এই কথা জিজ্ঞেস করেন—শম্ভুবাবু?

শম্ভু। সত্যি বলছি ম্যানেজার বাবু, আপনার চোখ দেখলেই কেন জানি আমার মনে হয় বহু বৎসরের সঞ্চিত এবং দুশ্চিন্তা-সম্ভূত অনিদ্রা ওতে কায়েমী হয়ে বসে আছে। নেশাটেশা আপনি নিশ্চয়ই করেন না।

ম্যানেজার। ও-কথা জিজ্ঞেস করবেন না শম্ভু বাবু। এ-দিকে আপনার কিছু সুবিধে হলো?

শম্ভু। তা প্রায় হয়ে এসেছে,—আর ভাবনার কিছু নেই। আপনাদের শুভেচ্ছায় শীগগিরই টাকার কিছু অভাব থাকবে না। শ্রীভারত রেকর্ড কোম্পানী—

ম্যানেজার। বলছিলুম কিনা, কিছু টাকা পয়সা না দিলে—

শম্ভু। [তাড়াতাড়ি] শ্রীভারতের রেকর্ড নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগে ম্যানেজার-বাবু? যেমন ওদের সুর, তাল, মান, লয়,—তেমনি চমৎকার রেকর্ডিং। সেই গানটা শুনেছেন তো—'ভাঙা মেঘে চাঁদের হাসি?'—বা—'বাদল বায়ু কাজল নভে?'

ম্যানেজার। এবার কিছু টাকা পয়সা না দিলে বড়ই অসুবিধে হয়। গত তিন মাস—

শম্ভু। তা সত্যিই বলেছেন। —শ্রীভারত কেবল প্রথম শ্রেণীর গান রেকর্ড করে,—যা-তা বাজে জিনিষ বাজারে বের করে না। ওদের গানের সব পদগুলি লক্ষ্য করেছেন তো?

ম্যানেজার। গত তিন মাস ধরে পাই পয়সাটি আপনি দেন নি এমন হলে আপনিই বলুন—

শম্ভু। যা বলেছেন আর ভাবনা নেই,—শ্রীভারত আমার লেখা কয়কটা গান খুসির সঙ্গে মনোনয়ন করেছে। আর ভাবনা কি,—royalty অল্পদিনের ভিতরেই পেতে সুরু করবো।

ম্যানেজার। আমাকে এমনি ছেলেমানুষ পেলেন মশায়? রেকর্ডের royalty থেকে আপনার চুরুটেরই কি খরচ উঠবে যে আমার পাওনা শোধ করবার আশ্বাস দিলেন? ভাতের ব্যবসা করে রগের কাছটায় চুল পাকিয়ে ফেল্লুম, আর আয়ের উপায় দেখাচ্ছেন আপনি আমাকে?

শম্ভু। কেবল কি এই! আরোও নানান সব উপায়ের উৎসগুলি প্রস্তুত হয়েই আছে। শুধু মাসখানেক অপেক্ষা করুন,—কড়ায় গণ্ডায় মায় সুদের সঙ্গে আপনার পাওনা শোধ না করি তো আমার নাম শম্ভু চাটুয্যেই নয়।

ম্যানেজার। দেখুন, ও সব ছেঁদো কথায় ভুললে জগদম্বা মেস্ আমার অনেক আগেই বন্ধ করে দিতে হতো।—পরশু পর্য্যন্ত আপনাকে সময় দিলুম। ব্রাহ্মণের ছেলে,—এদ্দিন আছেন—আধাআধি দিয়ে দিতে পারেন তো আর অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনা। নইলে সেদিনই অন্যত্র উঠে যাবার যোগাড় করবেন।—তবে দয়া করে ট্রাঙ্কটা সরাবার চেষ্টা করবেন না,—তিন মাসের পাওনা আমার প্রাপ্য আছে, সেটা না ভোলেন। নিচের দরোয়ানকে অবশ্য বলে রেখেছি,—তবে ব্রাহ্মণের ছেলে, আশা করি ধার হ'ওলাত করে' অর্দ্ধেকটা দিয়ে দিতে পারবেন? এদ্দিন আছেন, অন্য কোথাও আর যেতেও হয় না।

শম্ভু। কতটাকা পাওনা হয়েছে শুনি?

ম্যানেজার। সতেরো টাকা হিসেবে তিন মাসের হলো গিয়ে তিন সতেরোং একান্ন টাকা

শম্ভু। গত মাসেও সতেরো টাকা ধরলেন কি মশায়! গত মাসের প্রথম থেকেই ভাজা দেওয়া বন্ধ করেছিলেন, তারপর পনেরো তারিখ থেকে মাছও বন্ধ করলেন। ডাল আর তরকারিতেই সতেরো টাকা হিসেব ধল্লেন?

ম্যানেজার। জগদম্বা মেসে মশায় এক-রেট্। নিয়মই হচ্ছে, দু-মাসের টাকা পাওনা হলেই ভাজি বন্ধ হবে,—তার পনেরো দিন পরের থেকে মাছ বন্ধ। নিতান্ত দায়ে পড়েই এ-সব করতে হয় মশায়, নইলে আপনারা যদি সময়মত টাকা দিয়ে দেন্ এ সব কঠিন কর্ত্তব্য তবে আর আমার করতে হয় না। বুঝলেন না শম্ভুবাবু, নিতান্ত দায়ে পড়েই এ সব করতে হয়,—নইলে আমারই কি ইচ্ছে ব্রাহ্মণের ছেলে মেস্-থেকে চলে যাক্!

শম্ভু। তা আমি খুব বুঝতে পেরেছি।

ম্যানেজার। [দেখিয়া] ঘরটা বুঝি ঝাঁট দিয়ে যায়নি,—নাঃ, হতভাগা চাকরগুলোকে নিয়ে আর পারি না,—কই, ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করতে বলেছি বলে তো মনে পড়েনা। [হাঁকিয়া] ওরে ঐঃ ভজহরি, কোথায় গেলি—ঝাঁটাটা নিয়ে একবার এদিকে আয় দেখি।

বলিতে বলিতে ম্যানেজারের প্রস্থান।

শম্ভু। [করুণ সুর করিয়া] 'এদের জ্বালায় শুকিয়ে গেলেম কবিত্ব আর নেই।'

২য় দৃশ্য

বিখ্যাত এটর্ণী চঞ্চল মিত্রের পুত্র কুমুদেশ মিত্রের আড্ডা-ঘর। দুইবন্ধু অজিত ও সুকুমার উপস্থিত। অজিত গান গাহিতেছে, কুমুদেশ তবলা লইয়াছে, সুকুমার তাল দিতেছে।

হায়রে চৈতি-হাওয়া,
হায়রে গজল গান।
অচিন প্রিয়ার দিঠি
উদাস করে প্রাণ॥
প্রজাপতি অনুসরি'
জানিনা কেমনে ধরি।
গন্ধপথে বয়ে চলে'
হায়, হবে কি সন্ধান।
হায়গো প্রিয়া অজানিতা,
রয় কেমনে প্রাণ॥

এমন সময় দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল শম্ভু। গান থামাইয়া সকলে চেঁচাইয়া উঠিল।

কুমুদেশ। এই যে কবি-গ্রাজুয়েট। আয় আয়,—তোর যে আর টিকিই দেখা যায় না,—খবর কি?

শম্ভু। খবর শোচনীয়।

সুকুমার। চাকরি বাকরির কিছু সুবিধে হলো?

শম্ভু। শালা ও শালী-পুত্রেরা ভবে যদ্দিন বেঁচে থাকবে, কার সাধ্য চাকরির সুবিধা করে।

অজিত। তবে এখন কি করবি?

শম্ভু। কম্যুনিষ্ট হবো ঠিক করলাম।

কুমুদেশ। ওরে সর্ব্বনাশ। আর যাই করো তাই করো, কম্যুনিষ্টটি হয়ো না। বন্ধু হয়ে শেষে আমার উপর এমন শত্রুতা করবে নাকি?—বাবার অ্যাটর্ণিগিরির টাকাগুলি নিশ্চিন্তে ভোগ করবো ও চারুকলার উৎসাহ দেব এই আশায় বসে আছি, এমন অবস্থায় ও-সব ফ্যাকড়া বাঁধাস্নি শম্ভু। আমার ওপর কি তোর মায়া হয় না একটুও?

শম্ভু। কিন্তু আমার অবস্থাটা দেখছিস্ তো?

অজিত। গানটান লিখতিস্,—তাইতো বেশ ছিল। এ সব হিংসাত্মক ব্যাপারের মধ্যে আর কেন?

সুকুমার। হতাশ হওয়া কিছু নয় শম্ভু। সেই মাকড়সার আর রাজা ব্রুসের গল্প মনে আছে তো? ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন্।

শম্ভু। উপদেশ একটু থামাবি! মোটরে চড়ে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ঘুরে প্রেম করে বেড়াস, চব্যচোষ্য না খেতে পেলে মার সঙ্গে ঝগড়া করিস, ব্যায়ামের মধ্যে শুধু দাড়ি কামাস্,—যাকে বলে—পরভুক। লজ্জা করেনা উপদেশ দিতে?

সুকুমার। এইরে সর্ব্বনাশ, সত্যিই এটা শেষে কম্যু-নিষ্ট হয়ে উঠল যে।

অজিত। দোহাই তোর শম্ভু, এই গানের মজলিসে কার্ল মার্কস্কে আনিস নে।

কুমুদেশ। আজকে ব্যাপার কি বলতো শম্ভু? বড্ড রেগে আছিস্, তাই না। লক্ষ্মীটি বলতো কি হয়েছে। চাকরির উমেদারিতে গিয়ে শেষে সত্যি মারামারি করে এসেছিস নাকি আবার কারুর সঙ্গে?

শম্ভু। জগদম্বা মেস্-এর পাট এবার ওঠাতেই হলো। টাকা বাকি পড়ে আছে,—ম্যানেজার ultimatum দিয়ে গেল। পরশু উঠে যেতে হচ্ছে,—অথচ এ-মাসটা কলকাতা ছাড়তে পারছিনা। এক জায়গায় শালাশালী-পুত্রের সঙ্গে কঠোর প্রতিযোগিতা করছি।

কুমুদেশ। [সদুঃখে] শেষকালে সত্যি তোর এই অবস্থা। কি করা যায় এখন।

শম্ভু। পাওনার অর্দ্ধেক মিটিয়ে দিলে ঐখানেই আবার থাকা যায়। তবে তোদের কাছে ধার চেয়ে আমি বন্ধুবিচ্ছেদ করতে চাই না। কিন্তু যদি একটু অন্যরকম সাহায্য করিস, তবেই হয়ে যায়।

কুমুদেশ। বরঞ্চ আমার এখানেই এসে কদিন থাকুন।

শম্ভু। এই মাসটা অনায়াসেই ওখেনে থাকতে পারি যদি তোরা একটু কাজ করিস,—টাকা চাই না, শুধু অন্য রকম একটু সাহায্য।

সুকুমার। প্রস্তুত।

অজিত। আমিও প্রস্তুত।

কুমুদেশ। কি করতে হবে শুনি ?

শম্ভু। সুকুমার যেন ইন্সুরেন্স অফিসের Pay Officer আমার বাবার এক লাইফ ইন্সুরেন্সের টাকা কোম্পানী আটকে রেখেছিল, এখন দেওয়া সাব্যস্ত করেছে। মেসের ম্যানেজারের আফিসে গিয়ে আমাকে ডেকে এই কথাটা জানাতে হবে।

কুমুদেশ। সুকুমার, রাজী ?

সুকুমার। রাজী,—যদিও ইনসুরেন্সকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।

শম্ভু। অজিত শ্রীভারতের গান সিলেক্ট করে। মেসের ম্যানেজারের অফিসে গিয়ে সে আমায় জানিয়ে আসবে, আমার এই গান কোম্পানী সিলেক্ট করেছে—কোম্পানীর অফিসে আমার নিমন্ত্রণ।

অজিত। আমি রাজী।

কুমুদেশ। আর আমি কি করবো ?

শম্ভু। তুই না হয় কোনও বড় লোকের এক মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যাস্।

কুমুদেশ। তাতে কী হবে ?

শম্ভু। ক্রেডিট তাতে বেড়ে যায়। আর এতগুলি অর্থপ্রাপ্তি সম্ভাবনায় ম্যানেজারটা অনায়াসেই আর একমাস টাকার জন্য অপেক্ষা করতে রাজী হয়ে যাবে।

সকলে। ব্রেভো, ব্রেভো।

কুমুদেশ। আবার গান সুরু হোক্।

[গান সুরু হইল]

তৃতীয় দৃশ্য

শম্ভুদের মেসের অপিস-ঘর। হিসাব-খাতা, রসিদপত্র, দপ্তার আধার প্রভৃতি পূর্ণ টেবিলের সমুখে ম্যানেজার বসিয়া। পাশের চেয়ারে সহকারী সত্য বাবু।

ম্যানেজার। [খাতা দেখিয়া] অন্যায়-রকম খরচপত্র পড়ে যাচ্ছে, সত্য,—ওরকম চললে তো আর ব্যবসা চালানো যায় না। একবার ডালের খরচার দিকেই চেয়ে দেখো,—একজন ভদ্রলোকের বাড়িতেও এর চেয়ে বেশি পড়েনা। বলি, বামুনটা কি মাড়-টাড় আর মিশায় না আজকাল,—সে দিকে চোখ রাখ তো।

সত্য। তা রাখি বৈ কি। তবে বামুনটা মাড়ের পরিমাণ আর কিছুতেই বাড়াতে চায় না বলে, তাতে ডালের চেহারা থাকবে না।

ম্যানেজার। কিন্তু ওদিকে খরচের দিকটাও তো দেখতে হবে। আর শম্ভু চাটুয্যের কাণ্ডটা দেখলে ? তিনতিন মাসের টাকা পাওনা, দেবার নামটী মাত্র নেই। যা হোক কাল নোটিশ দিয়ে এসেছি,—আগামী কালের মধ্যে হয় অর্দ্ধেক পাওনা মিটিয়ে দেবে,—নয়তো পথ দেখ্‌বে।

সত্য। দু-মাসের টাকা বাকী পড়াতেই আমি বলেছিলুম—ঝেড়ে ফেলুন, আর না। আপনিই তো রেখে দিলেন,—ও সব জোচ্চর বেকার, ওদের প্রশ্রয় দিতে নেই।

ম্যানেজার। তা বলেছিলে বটে। আমি ভাবলুম, একজন গ্রাজুয়েট,—টাকা মারবার ইচ্ছে নাও থাকতে পারে। একটা চাকরি বাকরি পেয়ে গেলে সব টাকাই আদায় হয়ে যায়, নইলে তাড়িয়ে দিলেই তো গেল,—দুমাসের টাকাও মারা পড়ল।

সত্য। আপনার কাছে আস্কারা পেয়েই তো ছোকরা আর টাকা দেবার কথা ভেবেও দেখে না। দিব্যি আরামে বসে বসে গিলচে।

ম্যানেজার। আরাম আর কোথায় সত্য। ভাজা বন্ধ করেচি, মাছ বন্ধ করেছি,—এমন কি ঘরের ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করিয়েছি। তবে নিতান্ত বেহায়া, পরের পাওনা মেটাবার দিকে কোনও হুঁস-নেই। এইবার বাছাধনকে এক কাপড়ে পথে বেরুতে হবে। তবে,—তিন মাসের টাকাটাই মারা যাওয়ার জোগাড়। ওর কথায় বিশ্বেস হয় না সত্য, নইলে সত্যি যদি এ মাসে চাকরি বাকরি পেয়ে যেত তবে না এ মাস-টাও থাক্‌তো,—নইলে ৫১৲ টাকাই জলে গেল।

সত্য। ওর ট্রাঙ্কটাতে—

ম্যানেজার। কিছু নেই,—একেবারে ঠন্ ঠন্। ও শুধু নামকে ওয়াস্তে আটকান।

সুকুমারের প্রবেশ। প্যান্ট কোট পরা, হাতে ব্রিফ্-কেস।

সুকুমার। নমস্কার। আমি কমেট এন্স্যুরেন্স কোম্পানীর Pay Officer। এ মেসে শম্ভু চাটুজ্জে নামে কেউ থাকেন ?

ম্যানেজার। হ্যাঁ, আছেন শম্ভু চাটুজ্জে। কি প্রয়োজনটা শুনতে পারি কি ?

সুকুমার। তা পারেন,—মানে, একটা ইন্স্যুরেন্সের টাকা ওঁর পাওনা হ'য়েছে। তবে ওঁকে আগে একটু ডেকে পাঠান। আপনাদের সমুখেই সনাক্তটা আগে হয়ে যাক।

সত্য। [ডাকিয়া] ভজুয়া, শম্ভু বাবুকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় তো।

নেপথ্যে। যাচ্চি।

ম্যানেজার। কত টাকা পাওনা, মশাই ?

সুকুমার। পাঁচ হাজার। শম্ভু চাটুজ্জের বাপ হলে গিয়ে [ব্যাগ হইতে কাগজ বাহির করিয়া দেখিয়া] ইন্দ্র চাটুজ্জে। তাঁর আজীবন বীমায় চার হাজার টাকা বোনাস শুদ্ধ দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার তিনশো সাতায় টাকা ন আনা, ছ পাই।

ম্যানেজার। এক্ষুনি দিয়ে যাবেন নাকি সব টাকা ?

সুকুমার। না, এখন দোব না। আমি এনকোয়ারিতে এসেছি। আগে প্রকৃত লোক ঠিক করে যাব, তারপর ১৫।২০ দিনের মধ্যে চেক পেয়ে যাবেন।—তা ইনিই যে শম্ভু চাটুজ্জে, এ বিষয়ে আপনাদের সাক্ষী থাকতে হবে।

ম্যানেজার। শম্ভু চাটুজ্জে বলেই তো এঁকে জানি। তবে ওঁর বাপের নাম ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন।

বিস্মিত মুখে শম্ভুর প্রবেশ।

শম্ভু। খবর কি ম্যানেজার বাবু, এমন অসময়ে ডেকে পাঠালেন যে ? টাকাটা এখনও জোগাড় হয়নি মশায়।

ম্যানেজার। এই ভদ্রলোক খুঁজছেন আপনাকে।

শম্ভু। [বিস্মিত ভাবে সুকুমারের দিকে চাহিয়া] আমাকে ? কেন বলুন তো ? ডায়মেটার কোম্পানীর সেই চাকরিটার সম্বন্ধে নয় তো ?

সুকুমার আপনার নাম কি শম্ভু চাটুজ্জে ?

শম্ভু। আজ্ঞে হ্যাঁ

সুকুমার। পিতার নাম ইন্দ্র চাটুজ্জে ?

শম্ভু। [ঢোক গিলিয়া] আজ্ঞে তাও ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা কি শুনতে পারি কি ?

সুকুমার। আপনার বাবার কমেট এন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে একটা বীমা ছিল তা জানেন কি ?

শম্ভু। তা জানি বৈকি। নানারকম ছুতো ছাতা করে লক্ষীছাড়া কোম্পানী আমার পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা মেরে দিলে।

সুকুমার। আরে না মশাই, না জেনে একটা বিখ্যাত কোম্পানীর নামে নিন্দে রটাবেন না। বয়স প্রমাণের জন্য আপনার বাবা কুষ্ঠি দিয়েছিলেন,—আজকালকার দিনে সে কি বিশ্বেস করা যায়। তারপর কোম্পানীর সন্দেহ হয়, যে-ডাক্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিল, আপনাদের একই জেলায় তার বাড়ি থাকায় পরীক্ষা নিরপেক্ষ হয় নি। তাছাড়া আপনাদের ডেথ-সার্টিফিকেট কি খাঁটী না জাল সে বিষয়ে কোম্পানী নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিল না।

শম্ভু। তাকেই আমরা জোচ্চুরি বলি মশায়।

সুকুমার। কোম্পানী অনেক বিবেচনা করে আপনাকে পুরা টাকাই দিয়ে দেওয়া সাব্যস্ত করেছে। কাগজ পত্র নিয়ে আজই একবার অফিসে যাবেন,—এক মাসের মধ্যে পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা হাতে পেয়ে যাবেন। তখন বুঝবেন, জোচ্চুরি করা কমেটের ব্যবসা নয়।

শম্ভু। সত্যি বলছেন আপনি ? সে টাকাও পাবো, কে ভেবেছিল।

সুকুমার। তবেই আমাদের কোম্পানীর সততা বুঝুন। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

শম্ভু। নমস্কার। চলুন, আপনাকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। প্রাণে আপনি নতুন আশার সঞ্চার করে' গেলেন।

উভয়ের প্রস্থান।

ম্যানেজার। সত্য, বামুন ঠাকুরকে ডাকো।

সত্য। [হাঁকিয়া] ভজুয়া, ঠাকুরকে ডেকে দেত।

নেপথ্যে। যাচ্ছে।

সত্য। ছোকরা যে রাতারাতি নবাব হয়ে যাবার জোগাড় হলো। বাপটাপ আমাদেরও মরেছে, কিন্তু এমন সুবুদ্ধি করে কেউ মরে নি।

বামুন ঠাকুরের প্রবেশ

বামুন। ডাকছিলেন বাবু?

ম্যানেজার। হ্যাঁ। শোনো, তোমার গিয়ে আজ থেকে শম্ভু বাবুকে আবার মাছ দিতে সুরু করো।

বামুন। যেমন আজ্ঞে। ভাজাও দেব কি?

ম্যানেজার। ভাজা এখন থাক। তবে মাছটা দিতে আরম্ভ করো।

বামুন ঠাকুরের প্রস্থান।

অজিতের প্রবেশ

অজিত। নমস্কার। ম্যানেজার বাবু...?

ম্যানেজার। আমিই।

অজিত। এ-মেসে শম্ভু চাটুজ্জে নামে একজন কবি থাকেন?

সত্য। শম্ভু বাবু ছড়া লেখেন বটে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, শম্ভু চাটুয্যে।

ম্যানেজার। মশায়ের কোথা থেকে আসা হয়েছে

অজিত। আমি শ্রীভারত রেকর্ড কোম্পানীর গান নির্ব্বাচন করি। শম্ভুবাবু কতগুলি গান পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি আমাদের ভারি পছন্দ হয়েছে। অনুগ্রহ করে ওঁকে যদি একটু ডেকে দেন তবে বড় সুবিধে হয়। আমাদের অপিসে যাবার জন্য ওঁকে নিমন্ত্রণ করে যেতে চাই।

সত্য। ভজুয়া, শম্ভুবাবু নিচে গেছেন, ডেকে দে তো।

নেপথ্য। দিচ্ছি বাবু।

ম্যানেজার। [বাহিরে চাহিয়া] এই যে শম্ভুবাবু, শুনে যান মশাই,—এক ভদ্রলোক আপনার খোঁজে এসেছেন।

শম্ভুর প্রবেশ

অজিত। আপনিই কি কবি শম্ভু চাটুয্যে? নমস্কার।

শম্ভু। নমস্কার। কেন বলুন তো?

অজিত। আপনিই তো শ্রীভারতে গান পাঠিয়েছিলেন?

শম্ভু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অজিত। সে গানগুলো আমাদের পছন্দ হয়েছে। আমি শ্রীভারতে গান নির্ব্বাচন করি। আমাদের কোম্পানীর তরফ থেকে আমাদের ইুডিয়োতে আজ আপনাকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি,—ম্যানেজার মশাই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

শম্ভু। তবে গুণগ্রাহী লোকও আমাদের থিয়েটার সিনেমা রেকর্ড কোম্পানী প্রভৃতির কর্ত্তা হয়?

অজিত। বিলক্ষণ। আমাদের উপর এমন নির্দ্দয় ব্যঙ্গ করবেন না, শম্ভুবাবু। আমাদের অনেক রাবিশ ঘাঁটতে হয়,—তাতে কখনো হয়তো পরশ পাথর ফস্কে যায়। কিন্তু এবার তো আপনাকে ঠিক আবিষ্কার করেছে।

শম্ভু। ধন্যবাদ।

অজিত। আচ্ছা, নমস্কার। এখন তবে আসি। অপিসে যেতে ভুলবেন না যেন। Royaltyর কথা তখনই ঠিক করা যাবে। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে খুব ভালো রেট দেওয়া হবে। উঠি এখন।

শম্ভু। চলুন, এগিয়ে দিই।

উভয়ের প্রস্থান।

ম্যানেজার। ভজুয়া, ঠাকুরকে ডাক তো।

নেপথ্যে ভজুয়া। যাচ্ছে।

সত্য। শম্ভুবাবুর যে আজ কপাল খুলে গেছে। একেই বলে বরাত!

বামুনের প্রবেশ

বামুন। ডাকছেন বাবু?

ম্যানেজার। তোমার গিয়ে শম্ভুবাবুকে ভাজিটাও দিয়ে দিও—একটা আটকে রেখে আর লাভ নেই।

বামুন। তখনই তো আমি জিজ্ঞেস করলুম,—বল্লেন

না, ভাজা দিতে হবে না। এক কথায় বার বার ডেকে হয়রান করলে হাঁড়ি ঠেলি কখন।

ম্যানেজার। যা বলছি, করো। বেশি বাজে বকো না।

বামুন। আপনি তো এই বল্লেন। আবার সময় মত রান্না না নামলে আপনিই গজগজ করবেন।

প্রস্থান

ম্যানেজার। শম্ভুবাবুর এমনটা আয়ের সম্ভাবনা যখন দেখা যাচ্ছে তখন ভাল ব্যাভার করাই ভালো, কি বল সত্য।

সত্য। তা মন্দ কথা নয়।

ম্যানেজার। আর ভাবছি বলে দেব, এ মাসটা না হয় এখানে থাকুক। বুঝতে পারলে না;—টাকাগুলো পেলে আমার সব পাওনাই আদায় হয়ে যাবে। আর তাড়িয়ে দিলে তো তিন তিন মাসেরটাই গেল।

সত্য। কথ.টা মিথ্যে নয়। টাকা কিছু হাতে পাবে, বোঝাই তো গেল।

এমন সময় কুমুদেশের প্রবেশ।

কুমুদেশ। নমস্কার মশায়। আচ্ছা, বলতে পারেন, এ মেসে শম্ভু চাটুয্যে নামে একটি গ্রাজুয়েট যুবক থাকেন কিনা।

ম্যানেজার। মশাইয়ের কোথা হতে আসা হচ্ছে?

কুমুদেশ। আমি দিনাজপুরের পুলিশ সাহেব মিঃ চৌধুরীর শালা। তাঁরই মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ সম্পর্কে এসেছি। খবর পেয়েছি, শম্ভু চাটুজ্জে নামে একটা খুব মেধাবী ছেলে এই মেসে থাকে। খুব ভালো পাশ করেছে, অথচ প্রতিযোগিতায় চাকরী পাচ্ছে না। বরও শুনেছি খুব বনেদী,—তবে অবস্থা দৈব-দুর্ব্বিপাকে খারাপ হয়ে গেচে। ছেলেটীর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। আছেন কি কেউ এই রকম নামে?

ম্যানেজার। আছেন। কিন্তু সে যে মশায় একদম বেকার,—আমার তিন মাসের পাওনা বাকী পড়ে আছে, তা পর্য্যন্ত শোধ করতে পারছেন না—তার সঙ্গে আপনারা মেয়ে দেবেন কিরকম?

কুমুদেশ। মেধাবী ছেলেই আমরা চাই। চাকরীর জন্য ভাবনা কি। আমার ভগ্নিপতি সহজেই তাঁর জামায়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তবে স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে খবর জানা দরকার। জানেন কিছু?

সত্য। আজকালকার ছেলে মশাই, সবাই ডুবে ডুবে জল খায়। ভাল মতন না জেনে কি করে আর আমরা সার্টিফিকেট দিই।

ম্যানেজার। শুধু পরের পয়সা না দেবার একটা বিশেষ উৎসাহ দেখতে পাই।

কুমুদেশ। যা হোক্, কত নম্বর ঘরটা ওর বলুন,—একবার দেখে আসি।

সত্য। একুশ নম্বর। পশ্চিম দিকটায়।

কুমুদেশ। নমস্কার।

প্রস্থান।

কুমুদেশ প্রস্থান করিলে ম্যানেজার ও সত্য পরস্পর চোখ ঠারাঠারি করিতে লাগিল।

ম্যানেজার। ব্যাপার কি হে সত্য?

সত্য। আমরাও যেন কেমন কেমন ঠেকছে।

ম্যানেজার। একই দিনে একই বয়সের ছোকরারা এসে শম্ভু বাবুর খোঁজ নিয়ে টাকা পয়সা পাবার সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। অথচ জন্মে কাউকে আপিসে এসে শম্ভু চাটুজ্জের খোঁজ করতে দেখিনি।

সত্য। আর আমার স্পষ্ট মনে পড়েছে শেষের ভদ্রলোককে কোথায় যেন আমি দেখিছি। [চিন্তা করিয়া] দাঁড়ান দাঁড়ান—হয়েচে হয়েছে, চৌরঙ্গীর রেষ্টুরেণ্টে সেদিন এই লোকটার সঙ্গেই শম্ভুকে চা খেতে দেখেছি যে।

ম্যানেজার। তাই নাকি? নিশ্চই এর মধ্যে কোনও জচ্চুরি আছে। আর একি বিশ্বাস-যোগ্য, শম্ভুর মত একটা হাঘরের সঙ্গে পুলিশ সাহেব মেয়ে বিয়ে দিতে পাগল হবে।

সত্য। দাঁড়ান; আরো মনে পড়েছে।—গত মঙ্গল-বার শেষের ভদ্রলোকের সঙ্গে শম্ভুকে ফুটবল খেলার মাঠে দেখেচি।

ম্যানেজার। তবে এ আর কিছু নয়। সব শম্ভুর বদ-মায়েসী। দাঁড়াও চাঁদ, ঘুঘু দেখেচ ফাঁদ দেখনি। ভাতের ব্যবসা করে আমি রগের কাছে চুল পাকিয়ে ফেল্লুম, আমার চোখে ধূলো দেওয়া। হাজার লোকের চোখে ধূলো দিয়ে আমি মাড়কে ভাল বলে চালিয়েছি। সত্য, রামুনঠাকুরকে ডাক।

সত্য। ভজুয়া, ঠাকুরকে আসতে বল একবার।

নেপথ্য [একটু পরে] ঠাকুর যেতে পারবেনা বলছে।

ম্যানেজার। আস্‌তে পারবে না? বড় বাড় হয়েছে বামুনটার। দাঁড়াও, আমি মজাটা টের পাওয়াচ্ছি—সহরে যেন বামুনের অভাব!

সত্য। আহা, রেগে একটা যা তা করে বস্‌বেন না। এই মাইনেয় সারা সহর খুঁজলেও বামুন মিলবে না।

ম্যানেজার। কিন্তু তা বলে, তাজা আর মাছ বন্ধ রাখতেই বলতে হবে যে?

সত্য। তার আর দরকার কি? এমন জোচ্চরকে আর এক মুহূর্ত্ত রাখা চলতে পারে না। যা'ন্ বলে আসুন,—এই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যাক্। শাসিয়ে আসুন,—অকথ্য গালাগালি দিয়ে আসুন।

ম্যানেজার। তুমিও সঙ্গে চল সত্য। বড় গোঁয়ার ছোকরা, মরীয়া হয়ে শেষকালটায় কিছু একটা করে না বসে।

সত্য। তবে একটু অপেক্ষা করুন। ঘরের ঐ ছোকরাটা বেরিয়ে যাক্। বড় গুণ্ডার মতন দেখতে ওটা।

ম্যানেজার। ভজুয়া দেখে আয়তো, একুশ নম্বরে শম্ভুবাবু একলা আছেন কিনা।

চতুর্থ দৃশ্য

শম্ভুর ঘর। শম্ভু ও কুমুদেশ বসিয়া আছে।

শম্ভু। যা করেচিস্, এক মাস থাকার পক্ষে যথেষ্ট।

কুমুদেশ। এইবার খাইয়ে দে। সুকুমার আর অজিত পার্কে বসে আছে, মজুরি পেলেই চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকবে।

শম্ভু। টাকা কোথায় পাব, খাওয়াব যে। ধার দিবি?

কুমুদেশ। ধার চাইলে বন্ধু বিচ্ছেদ হয়, সে ভয় নেই?

শম্ভু। এই সঙ্কটকালে বন্ধুবিচ্ছেদ হলে অতিশয় আনন্দের কথা,—খরচের থেকে বেঁচে যাই।

কুমুদেশ। কিন্তু শোন্, খুব সুখবর আছে।

শম্ভু। সত্যি? কোনও আপিশের কোনও কর্ম্মচারী মরেছে নাকি? ভেকেন্সি হয়েছে?

কুমুদেশ। ভেকেন্সি তো বটেই, তবে কেউ মরে নি। তোর কথা কা'ল খাওয়ার সময় মা'কে বলছিলাম। শুনে তিনি বল্লেন, আহা! কাজেই বাবাও তোর কথা জিজ্ঞেস করলেন। যথাসাধ্য পল্লবিত ক'রে তোর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্বের কথা ব্যাখ্যান করবার পর তিনি বল্লেন, 'দেখা করতে বলিস তো একবার আমার সঙ্গে,—দেখি apprentice হিসেবে আমার অপিশে নেওয়া যায় কি না।' বল্লুম, প্রিমিয়াম্ দিতে পারবে না। বাবা বল্লেন, সে আমি দেখব।

শম্ভু। গাঁজা।

কুমুদেশ। দেখ শম্ভু, তুই বড্ড বাড়িয়েছিস্। তামাক্ পর্য্যন্ত টেনেছি, কিন্তু গাঁজা দেখেছিল্ কোন দিনই খেতে।

শম্ভু। নইলে এটর্ণীর আফিসে বিনে পয়সা'য় আমাকে কখনো apprentice নিতে পারে।

শম্ভু। পারে। কেননা এর্ণীর যে ছেলে, তার চারুকলা ছাড়া আর কিছুতেই আশক্তি নেই। ওই বাবার ইচ্ছে কোনও মেধাবী ছেলেকে শিখিয়ে নেন।

শম্ভু। (সহর্ষে] খাওয়াব। আলবৎ খাওয়াব,—তিন-জনকেই খাওয়াব।

কুমুদেশ। পয়সা পাবি কোথায়?

শম্ভু। হাতের আংটী বাঁধা দেব। তবু এই খবরের পর না খাইয়ে পারবো না।

কুমুদেশ। তবে চল, বেরিয়ে পড়ি। সন্ধ্যায়ই একবার আমাদের বাড়ি যাস্ কিন্তু, বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

কুমুদেশ উঠিল

শম্ভু। তুই আগে বেরিয়ে পার্কে গিয়ে অপেক্ষা কর। তোর সঙ্গে এক সঙ্গে বেরুনো ঠিক হবে না। তাছাড়া যাবার সময় ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে আর এক মাস থাকাটাও মঞ্জুর করে নেওয়া যাবে। তবে সেটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ।

কুমুদেশের প্রস্থান। শম্ভু সহর্ষে শিষ দিতে লাগিল।

ম্যানেজার ও সত্যের প্রবেশ

শম্ভু। এই যে ম্যানেজার বাবু, আসুন। ইন্‌স্যুরেন্সের টাকা পাওয়া মাত্র আপনারটা কড়ায় গণ্ডায় মায় সুদের সঙ্গে—

ম্যানেজার। মশায়, জোচ্চুরির আর যায়গা পান নি। বলি, কচি ছেলে ভোলাতে এসেছেন?

সত্য। আপনার চালাকি আর বুঝি না আমরা? ধান দিয়ে লেখাপড়া শিখেছিলাম?

শম্ভু। ব্যাপার কি?

ম্যানেজার। ব্যাপার আপনি ভাল রকমই জানেন। জোচ্চুরি করতে এসেছেন আমার সঙ্গে,—টের পাইনে আর আমরা কিছু! পুলিশে দেব আপনাকে মশায়?

সত্য। মানে মানে বেরিয়ে পড়ুন। নইলে অপমানের একশেষ করবো বলছি। ভেবেছেন কি আপনার বন্ধু বান্ধবকে চিনতে পারব না আমরা?

ম্যানেজার। ব্রাহ্মণের ছেলে, পুলিশে দিতে চাইনে। সরে পড়ুন। ভাতের ব্যবসা করে রগের কাছের চুল পাকালুম বাটপাড়ি করতে আসেন আমার সঙ্গে। ব্যস্ এই মুহূর্ত্তেই,—আর দেরি নয়।

কুণ্ঠিত শম্ভু আসির ট্রাঙ্কটা উঠাইল।

ম্যানেজার। ওটা কি হচ্চে, মশায়। তিন মাসের পাওনা বাকী সেটা মনে আছে তো!

ট্রাঙ্ক ছাড়িয়া শম্ভু ব্রাকেটের কোটে টান্ দিল।

সত্য। কোটটা রাখুন মশায়।

শম্ভু কোটটাও রাখিল। এক কোণায় ছাতাটা উঠাইল।

ম্যানেজার। ওটা আবার হাতে নেওয়া হচ্চে কেন? তৃণটা পর্য্যন্ত রেখে যেতে হবে—সব বেচেও আমার এক মাসের পাওনা উঠ্‌বে না।

শম্ভু। [কতগুলি কাগজ পত্র উঠাইয়া] এগুলি নিতে পারি কি, না রোখ যাব?

ম্যানেজার। কি ওগুলো?

শম্ভু। কবিতা।

ম্যানেজার। তা ওগুলো সচ্ছন্দে নিয়ে যান্। ও বেচে কানা কড়িও আসবে না।

এক-বস্ত্রে, কবিতা বগলে শম্ভু, দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

শম্ভু। [ফিরিল] অভাবে পড়েই আপনার টাকা দিতে পারা গেল না। তবে যে-দিন সঙ্গতি হবে, এসে শোধ ক'রে যাব, কিছু ভাববেন না, ম্যানেজার বাবু। নমস্কার।

দরজা অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইল

শম্ভু। এটর্ণী চঞ্চল মিত্রের আপিসে apprentice করে আমায় ঢোকান হবে,—এই মাত্র তাঁর ছেলে এসে খবর দিয়ে গেল। শীগগিরই কিছু আয় হ'তে পারে। কোনও আশঙ্কা নেই, মশায়, সব পেয়ে যাবেন।

ম্যানেজার। শেষে যিনি এসেছিলেন তিনিই বুঝি চঞ্চল বাবুর ছেলে? ঐ রকমই চেহারা বটে।

শম্ভু। ঠিক ধরেছেন। নিশ্চিন্ত থাকুন, ওখান থেকে কিছু আয় হওয়া মাত্র আপনার সব টাকা সুদ পেয়ে যাবেন। ভাবনা করবেন না।

ম্যানেজার। নিতান্ত দায়ে পড়েই ব্রাহ্মণের ছেলেকে চলে যেতে বলতে হ'ল, শম্ভু বাবু। নইলে বোঝেন তো—এ আমার অভ্যেস নয়। কিন্তু বলছিলাম কি,—চাকরি বাকরি পেয়ে গেলে স্বচ্ছন্দে আবার এসে এই জগদম্বা মেসেই থাক্‌তে পারেন। জানাশুনো জায়গা, সব সময়েই নিরাপদ।

শম্ভু। নিশ্চয়ই, একশো বার। তা আর বলতে। ট্রাঙ্কটাতো রেখেই গেলাম।

প্রস্থান

যবনিকা

শ্রীসুবোধ বসু

স্কিয়া-সারকিউলারের মোড়ে,
সকাল বেলা,
শীতের সকাল—উষ্ণ মিষ্টি মিষ্টি রোদ
দাঁড়িয়েছিলাম একা।
হাতে হাক্সলির এক বই,
যাব ওপারে 'রামমোহনে'।
রবিবেরে ট্র্যাফিকের লেগেছে জোয়ার;
এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে,
রুটির দোকান থেকে বেরিয়ে এল।
ঢুকল তারই পাশে যে 'জুয়েলারী শপ',
আবার এল বেরিয়ে।
হাতে দশ টাকার এক নোট;
বড় বড় জিজ্ঞাসু দুই চোখে
আমার দিকে চেয়ে বললে,
—দোকানে লোক নেই কেন কেন?
—'হোয়াট'?
ওকে নিয়ে গিয়ে দেখি,
লোকটা আছে 'শো ষ্ট্যাণ্ডের' আড়ালে, নীচে।

ডাকতেই উঠে দাঁড়াল অবাক হয়ে,
ওর নগণ্য দোকানে ও আশা করেনি মেম।
নোটখানা তুলে
বললে মেম মিষ্টি ইংরেজী বুলি।
না বুঝলেও দোকানি বুঝলে;
বললে, না ভাঙানি নেই।
বেরিয়ে এলাম দুজনে,
চেয়ে দেখি
ওর সুন্দর মুখে নেমেছে দুর্ভাবনার ছায়া।
—খুব কি দরকার?
—হ্যাঁ যেতে হবে টালা,
সকালের বাসে খুচরা পাব না নিশ্চয়।
—কাছেই আমার বাড়ী,
যদি যান দিতে পারি টাকা।
'ভ্যানিটি ব্যাগটি' বুকে চেপে কী ও ভাবল খানিক
নীচু মুখে।
ওর অজস্র বিস্রস্ত সোনালী চুলে
জ্বলল সোনার রোদ;
আমার চোখও উঠল জ্বলে।

বয়ে গেল ক'টি নীরব লহমা
সকোলাহল পরিপার্শ্বে আমাদের।
হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে
বললে ও, চলুন।
বইটা আমি বদলিয়ে এলাম।
ও চলেছে আগে আমি পিছে,
পরণে ওর
রঙীন ছিটের স্কার্ট প্রজাপতি আঁকা,
নিটোল দেহের কূলে কূলে প্রসারিত
প্রতি রেখা
স্কার্টের আবরণকে অবহেলা ক'রে
নির্ভুল উঠেছে ফুটে।
অন্তঃশীলা লাবণ্যের ললিত রেখায়
মুগ্ধ সূর্য্যের আলো পিছলে পিছলে যায়।
আর আমার মুগ্ধ চোখ
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখে ওর চলার সুষমা।
সেই আধ-ছায়া আধ-রোদ-পড়া পথ,
দু'ধারে শাড়ীবিচিত্র বাড়ীর শৃঙ্খল;
রকমারি রঙ
র‍্যাপার গায়ে দেওয়া লোকের জোয়ার,
মাঝে মাঝে মোটরের নাক্ষত্রিক গতি,
সব সেই;
কিন্তু এই পথেই আমি যেন নতুন পথিক।
ওর সঙ্গে পথ চলে
কী এক রকম নতুন লাগছিল মন,
আর লাগছিল খুব ভাল।
সেই ভালোলাগার আলো,
সকালবেলার সহাস রোদের মত
যেন ছড়িয়ে পড়েছে
এই আমার চোখের সামনে যা দেখছি কিছু,
করেছে উজ্জ্বল সুন্দর।

—বাঃ কী সুন্দর ঘরটি আপনার!
—থ্যাঙ্কস্, বসুন আসছি উপর থেকে,
বৌদি বললেন, কেন, কিসের জন্য টাকা?
এসে দেখি,
একমনে ও পড়ছে বসে 'ক্রেসেণ্ট্ মুন'।
খেয়াল নেই
কখন এসে রয়েছি আমি দরজায় দাঁড়িয়ে,
পিছনে বৌদি কৌতূহলী।
অপরিচয়ের কাঠিন্য নেই আর মুখে;
সহজ মুখ,
যেন নিজের বাড়ীই পড়ছে বসে বই।
উদ্দীপ্ত সুখে
ঝিকিমিকি নীল দুটি চোখ।
একেবারে বুকটি ঘেঁষে ইংরাজী 'চিত্রা'খানা,
তার উপর
বাঁ হাতের কোমল ক'টি আঙুল
যেন ফুলের মত ফুটে আছে।
একটা পাতা ওল্টাতে
আমার সঙ্গে মিলে গেল চোখ।
চাইল হেসে
স্বচ্ছ বন্ধুর হাসির মত।
এ ক' মিনিটে একেবারে যেন নতুন মানুষ।
—টেগোরের আর কী বই আছে?
ওঃ! ওঁর বই যে আমি কী ভালবাসি?
এশিয়ার নন উনি, পৃথিবীর রাজকবি।
মিষ্টি পরিষ্কার গলা,
বয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অনর্গল।
—গ্যেটে, শেলী, বায়রন, কীটস্,
আপনাদের কালিদাস,
মিল্টন, টেনিসন, ব্রাউনিঙ,
বড় কবি।
তার চেয়েও অনেক, অনেক বড় রবীন্দ্র টেগোর।
মলিন হয়েছে সবাই ওঁর প্রতিভায়।
ভারতবর্ষের কবিতার আত্মা মূর্ত্ত হয়েছে ওঁতে।
পড়েছে টম্সন,
'কোট' করলে কতকগুলি ভাল ভাল লাইন।

—ওঃ! অন্তত গীতাঞ্জলিখানা
বাংলায় যদি পড়তে পেতাম!
আমায় শেখাবেন বাংলা? ভেরী সুইট্ ল্যাঙ্গুয়েজ।
'ক্রেসেন্ট মুন'খানা আমায় দিতে হবে,
আস্‌ছে শনিবার
এদিকে আসব আবার, ফিরিয়ে দিয়ে যাব।
বইটি বুকে চেপে
খুশী মুখে বেরিয়ে এল, বললে 'গুডবাই'।
বললাম, টাকা?
ওঃ থ্যাঙ্কস্ ভুলেই গেছ্‌লাম সে কথা!

বিকেলে চায়ে চুমুক দেব—
—গুড্ আফ্‌টার নুন মিঃ টুহিন রায়!
এই আপনার বই,
এক্‌সেলেণ্ট! টেগোরের আর কী বই আছে?
ওকে আসন নিতে বলে
বৌদির কাছে দৌড়ে গেলাম।
একটু পরেই উনি নিয়ে এলেন চা।
বললাম, মাই সিস্‌টার-ইন-ল।
—ও বৌডি, নমস্কার!
বৌদি হেসে পড়ন্ত ঘোমটা টেনে দিল,
টিপয় টেনে
দিল সাজিয়ে কচুরি আর চা।
এবং দু' মিনিটে
ওদের আলাপ জমে গেল খুবই,
ভাঙা বাংলায় আর ভাঙা ইংরাজীতে।
বৌদির বিদ্যা ক্লাশ নাইন,
আর ওর বাংলা জ্ঞান তার চেয়েও কম।
কিন্তু কথার স্রোতের কমতি হোলনা,
আর অবান্তর হ'লাম আমি।
—দেখুন, খান দুই আমার শাড়ী আছে,
কিন্তু ভাল পরতে পারিনা, শিখিয়ে দেবেন?
কলেজের মেয়েগুলো দ্যায়না কিছুতেই।
খুব ম্যাজেষ্টিক শাড়ী,
প্রায়ই আমার পরতে ইচ্ছে করে।
আর আপনাদের বেগুন ভাজা খুব ভাল
গরম লুচীর সাথে।
লতুড়ি'র বাড়ী গিয়ে চেয়ে খেতাম প্রায়ই।
প্রায় ফি শনিবার যেতাম;
আপনাদের হিন্দু সংসার আমার খুব ভাল লাগে।
বাংলা উপন্যাসের
যত বেরিয়েছে ইংরেজী অনুবাদ
পড়েছি আমি সব।
তাই কেমন একটা আছে মনের টান।
বৌদির কচুরির খুব করলে প্রশংসা।
পরে আমার দিকে চেয়ে,
—বিকেলে একদিন যাবেন দয়া করে।
বলে দিল একখানা কার্ড।
আর আমার বাংলা শেখার ব্যবস্থা কী হবে?
ওর বাবার কার্ড,
'কেয়ার অব' করে ওর নামটিও আছে লেখা,
মিস্ লুসি লিটন।
হেসে ও বিদায় নিয়ে গেল।
আমার ঘরে এসেছে অনেক মেয়ে,
খেয়ে গেছে চা,
আর করেছে গল্প অনেক মিঠা,
হয়েছে অনেক লাস্য, হাস্যও অনেক।
ঘরের এই বাতাসে
সে-সব স্মৃতি স্তব্ধ হয়ে আছে।
লেখা আছে
দেয়ালগুলায়, দেখা যায় না এক লেখায়।
কিন্তু আমার মনের দুয়ার গোড়ায়
করেছে তারা শুধুই কোলাহল।
আর লুসি
যেন রাণীর মত ঢুকে গেল আমার মনের মণিকোঠায়।

একদিন বিকেলটা ছিল ফাঁকা,
লুসির নিমন্ত্রণের কথা মনে হোল।

পরিপাটি সেজে
আর 'দি পোষ্টাফিস' খানা নিয়ে উঠলাম বাসে।
লুসি বাড়ীই ছিল,
বাড়িয়ে দিল এক উষ্ণ অভ্যর্থনা।
বসাল নিয়ে ড্রয়িং রুমে।
ওর বাবা ছিলেন, মা ছিলেন আর ছোট একটি ছেলে।
আমার দিল পরিচয়,
ডবল এম্-এ, বাংলা ইংরাজীতে।
বল্লে, নোট ভাঙানোর গল্প আর ওর বাংলা শেখার কথা।
কণ্ঠে ছিল আবেগের ঝর্ণা খলখল।
ওর মায়ের চোখ কোমল হ'ল,
স্মিত হাসি উঠল ফুটে:
কিন্তু মিঃ লিটন
অবজ্ঞায় মন কঠিন হয়ে তেমনি রইলেন বসে।
ওর মা চা' বল্লেন,
তারপর লুসির নরম হাতটি ঝেঁকে
চলে এলাম বাড়ী,
ভারী মনে।

বৌদি বল্লেন, কে লিখেছে বল?
তবে দেব চিঠি!
লুসির চিঠি,
পেয়ে আশ্চর্য্য হ'লাম খুবই।
এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেল্লাম।
কী মিষ্টি ইংরেজী,
আর সুন্দর কী সারি সারি গোটা অক্ষরগুলি!
ওর স্বচ্ছ হৃদয়ের যেন কাগজে পড়েছে ছায়া।
কাল বারোটায়
'এম্পায়ারে' যেতে হবে বাংলা প্রাইমার নিয়ে।
দরকারী কাজ ছিল,
কিন্তু এই বয়সে এ-ই বা দরকারী কী কম?

সিঁড়িতে ও দাঁড়িয়ে ছিল,
আমাকে দেখে রাস্তায় এল নেমে
হাত বাড়িয়ে,
আর চোখে জেলে খুসীর দীপালি।
বেশভূষা যত্নে করা।
বল্লে, ধন্যবাদ পান্‌ক্‌চুয়েল you are!
বাবার নিষেধ তোমার সঙ্গে আর একোয়েন্টেস করা।
তা-ই ডেকেছি এখানে,
যদি অসুবিধা হ'ল মাপ ক'রো মিঃ রয়!
বলে এমন করে চাইল আমার দিকে,
ওর পেলব ঘাড়টি তুলে,
ওর সুন্দর মুখটি তুলে,
একটি বিষণ্ণ মিনতি ওর চোখে গেল পড়া।
—রাগ করোনি?
ধন্যবাদ! চলো তবে' মেমোরিয়েলের বাগানে।
ঝোপের ছায়ায় ঘাসে বসে
পড়া যাবে।
মিনিট পনেরো সত্যি হ'ল পড়া।
পরে ঘন সবুজের সমারোহে
বিচিত্রিত ফুলে,
ঝিরি ঝিরি' কাল্‌প্টাসের হাওয়ায়,
গা এলান নির্ম্মল আকাশের পানে চেয়ে,
চেয়ে রৌদ্রে জল জল মেমোরিয়েলের ছায়ার দিকে,
ঘাসের ফ্রেমে বাঁধানো জলে,
পড়া হ'ল না।
আর দূর চৌরঙ্গীর পরিস্রুত কোলাহলে
মন উদাস হয়ে যায়।
হাতের ঘড়িটুকুতে ওর হঠাৎ পড়ল চোখ,
—উঃ পঁচিশ মিনিট মোটে বাকী!
চল, 'প্লাজায়' আছে ভাল বই,
যাবে?
মাঠ দিয়ে ও আমাকে নিয়ে গেল।
টিকিট পেলাম।
আলো নিভে গেলে
ও আমার পাশে বসল ঘেঁষে।
মাঝে মাঝে

আমার হাতে ও হাতটি বাড়িয়ে দায়,
ঠোটে এসে ঠোট লাগে যেন।
আর চুম্বনের মত মধুর সেই পরশ।
ইন্‌টারভ্যালে
আবার ও গেল সরে অপরাধী চোখে।
বাবার কানেরে আছে ভয়।

ঠিক এমনি ভাবে এই দিন আবও এল বহু,
আরও মোহ মধুময়।
ইডেনে কি' মেমোরিয়েলে,
চাংওয়া কি দিশি রেস্তোরাঁয়,
গল্পেব ফাঁকে ফাঁকে, বাংলা বিদ্যায়।
সিনেমাও থাকে।
আনন্দের যেন বন্যাস্রোত
দিনগুলি এল গেল হু হু।
আলোচনাও হ'ত অনেক বিষয়ে,
নিজেদের সমাজের ও খুব পক্ষে ছিল না।
বলত কারু কালচারু নেই কোন।
ধীরে ধীরে
আমার সমস্ত জগৎ,
তার শব্দ রূপ বস
যেন ওর মুখে ছোট হয়ে এলো।
ডুবে রইল ওর কণ্ঠে সুমধুর।
বাংলায়,
আমারি শেখান বাংলায়
যখন ও কথা বলে,
রক্তে আমার খেলে যায় আনন্দ-বিদ্যুৎ।

এক দিন শেষ রাতে
ঘুম ভেঙে গেল—বাইরে বৃষ্টি ঝমাঝম্।
নিজেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম,
লাবণ্যের চেয়েও কি লুসীকে ভালবাসি বেশী?
আমারে ও কি সত্যি ভালোবাসতে পারে?
চিরকাল ত ঘৃণার বেড়া খাড়া
ইণ্ডিয়ান আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মাঝে।

ভিন্ন মুখী দুই সমাজেব ধারা।
কিন্তু ভারতবর্ষেব ছেলে,
ইউরোপীয়ান মেয়ে বিয়ে কবে সত্যি সুখে আছে,
এমন জানি অনেক স্বামী-স্ত্রীকে।
লুসিরা ত আধা ইণ্ডিয়ান।
লাবণ্য ভাল মেয়ে,
কিন্তু চিরন্তন নারীর মতই ও কৃত্রিম, 'ককেট'
আর ওরে ঘিরে আছে মেয়েলি কুহেলিকা।
কিন্তু লুসী
যেন শিশুর মত সহজ, স্বচ্ছ, অকপট;
সোজা গিয়ে আঘাত করে লয় প্রাণ মন কেড়ে।

একদিন খেতে বসে
খেলাম বৌদির মিঠে-কড়া গালি,
লাবণ্য গিয়ের পেলাম কড়া চিঠি।
ফিরেও এলাম একদিন দেখা করতে গিয়ে।
'লাবণ্যকে বিয়ে কর'
মা বৌদি করলেন পীড়াপীড়ি।
লুসীর বাড়ী গেলাম,
মিঃ লিটন এক নোট পাঠালেন—
আজ পনেরো দিন
সিমলা গেছে লুসি ওর 'ফিয়াসেঁর' সথে।
আসবে অনেক পরে।
যেন কালো লোহার ছুরি হয়ে
সাদা কাগজটা বিঁধল আমার বুকে,
ভাবলাম তাই সত্যি
মিলন অসম্ভব—আমাদের শাশ্বত ব্যবধান
এর পরে বিয়েটা হ'ল স্বরা।

সিনেমায় যাব, শনিবার—
সিগারেট-কেসে ভরছি সিগারেট।
লুসি,
—পরণে ওর রঙীন একখানা শাড়ী
ঘোমটা দেওয়া।

তবু কানের পাশে গুটি দু' চার 'বব'।
হেসে বল্‌লে, নমস্কার,
খাঁটি ভারতীয় কায়দায়।
শাড়ীতে ওকে দেখিনি আর আগে।
এই বেশে
ও এসে দাঁড়াল যেন একেবারে নিকটতম হয়ে।
একটা বৃহৎ ক্ষতির বেদনায়
ব্যাথার তন্ত্রীতে আমার জোরে লাগল ঘা।
বল্‌লে, অসুখ হয়ে পড়েছিলো,
বাবার জন্তে পারেনি খবর দিতে কোন।
—হ্যাঁ মিঃ রয়, আর্য্য সমাজ জানেন?
শুদ্ধি করে,
কিন্তু সবাই কি—
এমন সময় সেজে লাবণ্য এল নেমে।
বল্‌লাম, আমার স্ত্রী—
—স্ত্রী—
দমকা হাওয়ায় গেল যেন ও নিভে।
পাংশু হ'ল মুখ,
অত্যন্ত শুক্‌নোভাবে পরে
ওদের হ'ল 'কার্টসি' বিনিময়।
লাবণ্য যেন কুইনিন খেল।
চিনল ওর পুরান 'রাইভেলকে'।
—চল না গো সময় হ'ল যে।
বল্‌লাম, মিস্ লিটন,
আমাদের সঙ্গে উত্তরাতে—
—থ্যাঙ্ক্‌স্, আছে অন্য কাজ।
বলে গেল ও চলে
আমার বুক মাড়িয়ে যেন।
ওর প্রতি পাদক্ষেপে,
ওর ধারাল জুতার খুবে
রক্তাক্ত হ'ল আমার বুকের কোমল দেশ।
লাবণ্যর হাত ঠেলে দৌড়ে গেলাম,
তখন ও দূরে, একটা ট্যাক্সি নিয়েছে।
—আমায় ভুল বুঝো না, বলবার আমার আছে,
দিলেম চীৎকার।
বারেক ও মুখ ফিরাল,
কিন্তু ওর গাড়ী থামল না,
ও থামল না—

হৃষিকেশ মৌলিক

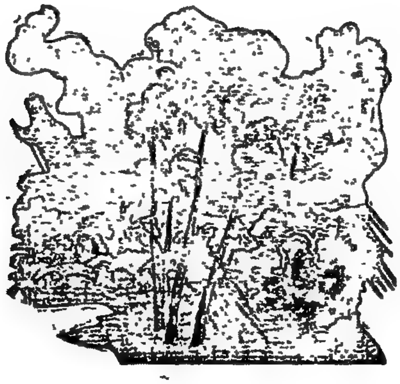

দৈবজ্ঞ

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

আমাদের একটা সিকি দোয়ানি গোছের ছোট খাট সাহিত্যিক মজ্‌লিশ্‌ ছিল। মধু বাবু ছিলেন আমাদের অধিকারী। তাঁর বাড়ীতে আড্ডাটা জম্‌ত প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময়। চায় সদাব্রত ছিল শুধু নামে। আসলে ভূরি-ভোজ, সে রাত্রে বাড়ী ফিরে গিয়ে মুখে কিছু দেবার সামর্থ্য আমাদের কারুরই বড় একটা থাকৃত না। যাবার সময় গৃহিণীকে বারণ করে যেতাম আমার জন্য রাত্রি ভোজনের ব্যবস্থা করতে। আমাদের দলে নবীন প্রবীণের সংমিশ্রণ ছিল। অধিকাংশই বিবাহিত, দুএকটি আইবুড়ো, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি পাশ করে বেকার-পন্থী। কালাপানী ফেরতাবও অভাব ছিল না। মধু বাবু মজলিশি মেজাজের লোক। ওটা পৈতৃক নেশা। বাপ ঠাকুরদার বৈঠকে এখন বসে নবীন সঙ্ঘ। তাঁর আলমারিতে ঠাকুরদার নামে বাঁধানো পুরান বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব. ভ্রমর, প্রচার ইত্যাদি মাসিক পত্রিকাগুলি সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অবিচ্ছিন্ন দন্তপংক্তির মত, একটি দাঁতও খসেনি। কেবল তাদের সনাতন চাকচিক্য আর নাই, একটু ঢিলেঢালা, দাগী। তারপর আছে ভারতী, সাহিত্য, সাধনা, সবুজ পত্র, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা আরও কত কি। সেগুলিতে মধু বাবুর পিতৃনাম মুদ্রিত। এই সঙ্গে নূতন পুরাতন কেতাবের সংগ্রহও বিপুল। মধু বাবু পুরুষানুক্রমিক ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন নূতন পুস্তকাদির সঞ্চয়নে। লেখক না হলেও রসবোধ আছে, অধ্যয়ন আছে এবং জ্ঞানের মেদবাহুল্য আছে শিথিল প্রকৃতির লোক, কেউ-কেটা হবার তাগিদ নাই। তামসিক ও সাত্ত্বিকের ন্যাজা-মুড়া-সম্বলিত রজোগুণ বিবর্জ্জিত ক্ষুদ্র মানুষটি। সাহিত্যিক ভাবখানা কতকটা কোলাব্যাঙের উদ্‌গ্রীব, বিপুলোদর, নিরীহ।

সে দিন কথাপ্রসঙ্গে দীনেশ বল্‌ল, অমুক সন্ন্যাসী তার জেল মুক্তির ঠিক্‌ তারিখটি তার খুড়োর কাছে বলেছিলেন। খুড়ো দেয়ালে পেন্‌সিল্‌ দিয়ে তারিখটা রেখেছিলেন লিখে, অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল মুক্তির দিনে। বলা বাহুল্য, দীনেশ নন্‌-কো-অপারেশনের সময় পিকেটিং করে রাজবন্দী হয়েছিল। বিজলিতে বেনামিতে তার লেখাও মাঝে মাঝে বাহির হত। সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে ভীষণ তর্ক বেধে গেল। রমেশ রসায়নের অধ্যাপক, মেডেল-মার্কা ছেলে। মহেশ বল্লেন, ঈথরের তরঙ্গে শুধু আলোক উত্তাপ বৈদ্যুতি প্রবাহিত হয় না। আমাদের মস্তিষ্কের স্পন্দনগুলি, যাহা চিন্তা হয়ে ফোটে আমাদের চেতনায়, তাদের সেই সূক্ষ্ম কম্পনোদ্ভূত ঢেউগুলি দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঢেউ দোলার ধাক্কা আমাদের সকলেরই মগ্ন-চৈতন্যে গিয়ে লাগে, কিন্তু অনুভূতিতে ফোটে না। তান্ত্রিক সাধনে এমন সব গূঢ় প্রক্রিয়া আছে যাহাদের প্রসাদে আমাদের প্রশ্নগুলি যথা স্থানে তরঙ্গ প্রবাহে উত্তীর্ণ হয় এবং প্রশ্নোত্তর সহ উজানে ফিরে আস্‌তে পারে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হামাগুড়ি দিয়ে তার থেকে যে-তাবে বহু কষ্টে পৌছেচে। এই সঙ্কীর্ণ নদী-নালা দিয়ে যখন সে প্রজ্ঞা-পারাবারে উত্তীর্ণ হবে, তখন বুঝবে উল্টো দিক দিয়ে পিছু হেঁটে যেখানে হাজির হল সেখানে ভারতীয় অধ্যাত্মদৃষ্টি বহুযুগ পূর্ব্বে একেবারে যাকে বলে সাত চিত্তে গোলকধামে পৌছে গেছে।

আমারও একটা পদার্থবিজ্ঞানে ছেঁড়া ডিগ্রি ছিল। মধু বাবু আমাকে ডেকে বল্লেন, আরে গোবিন্দ, তুমি কি বল ভায়া? বহুদিন হল বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়েছি। জীবন-বীমার এজেন্সি করে দিন চলে। মাঝে মাঝে লক্ষ্মীর খুদ্‌-কুঁড়ো যা পাই তাতে পরের কাছে আর হাত পাত্‌তে হয়-না। অবসর মত বইএর পাতা উল্‌টাই, কবিতা লিখে গৃহিণীকে শুনিয়ে বাহবা পাই। মধুবাবুর আড্ডায় এসে

চা খাই, সিগারেট্ পোড়াই, এক সন্ধ্যার মত গৃহিনীর হাঁড়ির চালের সাশ্রয় করি। বল্লুম, মেনে নেওয়া যাক, সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণীটা সত্যই ফলেছিল। কিন্তু দৈবাৎ বলে একটা জিনিষ আছে সে কথা ত অস্বীকার করবার জো নাই। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের সম্ভাবনার একটি সম্ভাবনা দৈবাতে হয় ত সত্য হয়ে যেতে পারে। হয়ত দৈবজ্ঞের আর পাঁচটা অন্ধকারের ঢিল্ যথাস্থানে লাগে নি। কিন্তু সেগুলি আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আন্‌ছি না। বেকন্ সাহেব বলেছেন, men mark when they hit, never mark when they miss। অর্থাৎ যেটা ফলে গেল সেইটা নিয়েই আমরা সোর গোল তুলি, আর যেগুলি ফল্‌ল না সে সম্বন্ধে আমরা রাত-কানা। মধু বাবু একটু ঘাড় নেড়ে বল্লেন, তা ঠিক হল কই ভাই? এ যে বিশেষ একটি লক্ষ্যের উদ্দেশে এক ঢিলেই অব্যর্থ সন্ধানের পরিচয় পাওয়া গেল। আমি তখন তর্কের খোঁচায় একটু খাড়া হয়ে বস্‌লুম। বল্লুম, কোনো একটা বিষয়ের কার্য্যকারণ নির্ণয় করতে গেলে আগা গোড়া ব্যাপারটির সব খুঁটি নাটি তন্ন তন্ন করে পরখ করে নিতে হয়। দেখুন আমি যে এই জীবন-বীমার দালালি করি, কত সংবাদ যে আমাকে তলে তলে সংগ্রহ করতে হয় তা আপনারা জানেন না। লোকের বাড়ী গিয়ে ভবিষ্যৎ গণনা করা যার পেশা সে যে কত রকমের গোয়েন্দাগিরি করে আপনি আমি তার নিশানা পাব কেমন করে? হয়ত আগে সন্ধান পেয়ে জেনে শুনেই বলেছে। সত্যিই খুড়ো মশাই দেয়ালে লিখে রেখেছিলেন কি না তারও প্রমাণাভাব। যদি লিখে রেখেই থাকেন আর সন্ন্যাসী ঠাকুরের সে বাড়ীতে অবাধ গতিবিধি যদি থাকে তবে লেখাটা একটু বদ্‌লে দিতেই বা কতক্ষণ লাগে? মোট কথা, একটা অতি নৈসর্গিক ব্যাপারকে চট্ করে মেনে নেবার আগে একটু অনুসন্ধান করে দেখা উচিৎ নয় কি, মূলেই হাবাত কিনা। তবে যদি মেনে নিই দীনেশ যা বল্‌ল তা অভ্রান্ত সত্য, তবে নিশ্চয়ই অকুণ্ঠিতে স্বীকার করব ব্যাপারটা আশ্চর্য্য বটে। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা মেনে নেবার আগে এই রকম আর পাঁচ দশটা তথ্য সংগ্রহ করে তলিয়ে দেখতে হবে তাদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য আছে কিনা। তারপর আন্দাজ মত খাড়া করে যদি দেখা যায়, সব ঘটনাগুলির সমস্যা সেইখানে এসে সরল হয়ে যাচ্ছে, তবে যা হোক একটা মীমাংসায় হয়ত উপনীত হওয়া যেতে পারে। তা বলে শশধরি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর আমার বড় আস্থা নাই। কারণ, সেটা মেনে নিতে গেলে সব তোলপাড় ঘোল হয়ে যায় যে। তা বলে একথা বল্‌ছি না জোর করে, ব্যাপারটাকে কিছু না বলে উড়িয়ে দিতে হবে। বেছে-চেয়ে একটু দেখা দরকার বৈকি! মানুষের শক্তির অন্ত নাই। সব জ্ঞানের পূর্ণচ্ছেদে এসে পৌঁছতে অনেক দেরী, কোনো দিন মানুষ সেখানে গিয়ে হাঁক্ ছাড়তে পারবে বলে মনে হয় না।

আমাদের তর্কটা যখন কতকটা নৈয়ায়িক বিচারের মূর্ত্তি ধারণ করে উঠেছে, তখন বিভূতি বল্‌ল, আমি একটা গণৎকারের গল্প বলি শুনুন। আমার যখন মহেশপুরে বাসা ছিল তখন একটা মেছুনি আমাদের বাড়ী মাছ বিক্রি করতে আসত। বুড়ি অনেক শোকতাপ পেয়েছে। চমৎকার গুছিয়ে কথা বলে, শুনে টুকে রাখতে ইচ্ছা হয়। মাছ বেচে সে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিত। আমার গৃহিনীর সঙ্গে দিত গল্প জুড়ে। তিনি তার কথাবার্ত্তা বড় উপভোগ করতেন, জিজ্ঞাসা করে করে নানা তথ্য সংগ্রহ করতেন। পাশের ঘরে কথাগুলি দিব্যি পৌঁছাত, আমি মাঝে মাঝে কাণ পেতে শুনতাম। যতীন মিত্তির ছিল আমার জুনিয়ার। আমার সঙ্গে মামলা মকদ্দমার নথিপত্র ঘাঁটত, কেতাব ঘেঁটে নজির বার করত, চালাক ছোকরা। যতটা তাকে বুদ্ধি দিতাম তার চেয়ে বেশী সাহায্য পেতাম তার কাছ থেকে। সে প্রায় প্রত্যহই সকালে আমার কাছে আসত। নেপথ্যে বসে মেছুনী ও গৃহিনীর বিশ্রম্ভালাপ দুজনেই শুনতাম।

একদিন সকালে দেখি সে মস্ত একটা ইলিশ মাছ হাতে নিয়ে উপস্থিত। বললে, দাদা, এই মাছটা তোমার মেছুনির কাছ থেকে উপহার পেয়েছি। কি রকম? ঘটনাটা সংক্ষেপে এই।

যতীন ছোকরা কলেজে পড়বার সময় হোষ্টেলের বার্ষিক থিয়েটারে ছিল সে নাটের গুরু। গান গাইতে, অভিনয় করতে, নানাভঙ্গীতে নানা দেশের কথা কইতে তার জুড়ি ছিলনা কেউ। আমার মেছুনির কুঁড়ে তার বাড়ীর থেকে

মাইল খানেক দূরে। সেদিন সকালে স্ত্রীর সঙ্গে বাজি ফেলে যতীন জেলেপাড়ার দিকে গিয়েছিল। আমার মেছুনী ও তার বিধবা পুত্রবধূর হাত দেখে তাদের ভূতভবিষ্যতের গননা করে নগদ একটি টাকা ও একজোড়া ইলিশ মাছ হাতিয়েছে। আমার ঘরে বসে গৃহিণী ও বৃদ্ধা মেছুনীর কথাবার্ত্তার থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিল, তাদের সদ্ব্যবহার করতে অবশ্য কসুর করেনি। ভবিষ্যদ্বানীর মধ্যে একথাও বলে এসেছিল যে আগামী পূর্ণিমার দিন ভাগ্যবিধাতা তাকে দশটাকা বরদান করবেন। আমাকে হেসে বল্লে, দাদা, স্ত্রীর কাছে বাজি জিতে এই দশটাকার নোট আদায় করে এনেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কী নিয়ে বাজি? সে বল্লে, দোহাই দাদা, সে কথা জিগেগেস্ করবেন না, ছমাস পরে বলব। ফেরে যাবার উপস্থিত প্রমাণ বিশেষ কিছু না পেয়েও খুসী হয়েই টাকাটা দিয়ে ফেলেছেন, বোধকরি শুভ সম্ভাবনার বায়না স্বরূপ এবং সম্প্রতি আমার জেলেপাড়ায় এই অত্যাশ্চর্য্য গননা শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণে। মেছুনীর সেই টাকাটা 'হবিপোদ্দার মাকে' দিয়ে এসেছি। সিঁদুর মাখিয়ে তুলে রেখেছেন। বল্লুম, ধুয়ে সিঁদুর মাখাও, আঁষটে গন্ধ করছে যে। সে কথা কর্ণপাত করে কে?

যতীন অবশেষে বললেন, একটা অনুরোধ রক্ষা করবেন, দোহাই দাদা। ওই মেছুনীটা শুক্রবার দিন (পূর্ণিমা) যখন মাছ দিতে আসবে বউদিদি যেন এই দশটা টাকা বুড়ীকে দেন আর তাকে বলেন, কর্ত্তা একটা বড় মকদ্দমা জিতেছেন তাই এই বকশিশটা দিলেন।

আদালতে যাবার সময় চাপকানের বোতাম আঁটতে আঁটতে গৃহিণীকে যতীনের গণকঠাকুরের অভিনয় বৃত্তান্ত ওই দশ টাকার নোট সমেত নিবেদন করে বললাম, এবার যতীনের বৌকে এনে ঘটা করে সাধ দিও।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

গাহিতে এসেছি গান।

মনস্থর-উর-রহমান

গাহিতে এসেছিগান,
যদিও চিত্ত ভয়-শঙ্কিত, যদিও ক্ষুদ্র প্রাণ।

শ্রাবণের বারিধারা
নৃত্য উছল পারা;
গিরি-কান্তার প্লাবিত করিয়া হয়েছে প্রস্রবণ॥

সন্তাপে হৃদিখানি
যদিও আকুল জানি,
অধরে তবুও হাসির মাধুরী বাহিরে বৃন্দাবন।

লাঞ্ছিত পথমাঝে,
ছিঁড়ে গেছে কত মুকুতার হার দীপ নিভে গেছে সাঁঝে॥

শুধু নয়নের জল
করিয়া গো সম্বল
বিশ্বের মাঝে কত পথচারী হয়ে গেছে মহীয়ান।

আজিকার দিবাশেষে
সন্ধ্যার দ্বারে হেসে
গাহিতে এসেছি, ক্ষুদ্র পরাণে, তাহাদের অভিযান॥

সার্থক হোক গান
যদিও চিত্ত ভয়-শঙ্কিত, যদিও ক্ষুদ্র প্রাণ।

একটি পিক্‌চার পোষ্টকার্ড

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

[দ্বিতলের দক্ষিণ বারান্দার এক কোণে সতেরো-আঠারো বছরের একটি মেয়ে চিত্রাঙ্কণরত। লিওনার্ডো-ডাভিঞ্চির 'মোনালিসা' ছবিটি একটি ছবির পোষ্টকার্ড হইতে বড় করিয়া রঙীন করিয়া আঁকা চলিতেছে। ঈজ্‌লে মোনালিসার প্রতিকৃতি সিন্দুরের দাগে ক্যান্‌ভাসে উঠিয়াছে, এখন তাহাতে বর্ণবিন্যাস করা হইতেছে। প্যালেটে রঙ ছিটানো, সূক্ষ্ম স্থূল ছোট বড় তুলি ইতস্তত ছড়ানো।

মেয়েটির নাম মঞ্জিষ্ঠা। ছবির পোষ্টকার্ডটি তাহাকে আনিয়া দিয়াছে অরুণ লুভ্‌ মিউজিয়াম হইতে। বিলাতের পাঠ সাঙ্গ করিয়া দেশে ফিরিবার কালে সে মঞ্জিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত উপহার আনিয়াছিল, এই ছবির পোষ্টকার্ডটি তাহাদের অন্যতম।

বারান্দার একপ্রান্তে ছায়াঘন বকুলগাছ শাখা প্রশাখা দিয়া রেলিংগুলি ছুঁইয়া আছে। সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে সবুজ মাঠ, তারপর নদীর ক্ষীণ রেখা। নদীর পরপারে গাঢ় সবুজ গাছের সারি নিবিড় মসীলিপ্ত হইয়া আছে।]

মঞ্জিষ্ঠা। কি রহস্যময় মুখ, হাতের কি লীলায়িত ভঙ্গী। ছবিখানি যেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো, একেবারে নিখুঁত, জীবন্ত,—সৌন্দর্য্য যেন রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। ধন্য চিত্রকর। (আঁকিতে লাগিলেন) কি সুন্দর ঠোঁট দুটির ভঙ্গী, তার ভেতর দিয়ে চাপাহাসি যেন উপ্‌চে পড়ছে, কিম্বা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। ঠোঁট দুটি যেন এই বিদ্রূপের বন্যাকে কোনো মতে বাঁধ দিয়ে বেঁধে রেখেছে।...য্যঃ, আর রঙ ধরছে না। বর্ষাকালে তেলের রঙের ছবি আঁকার এই এক মুস্কিল, শুখাতে চায় না। (হাতের তুলি রাখিয়া দিয়া পোষ্টকার্ডের ছবিটির দিকে তাকাইয়া কহিলেন) আহা, না জানি আসল ছবিটি কি সুন্দর। এই সামান্য পোষ্টকার্ডটা থেকেও চোখ আর ফেরান যায় না।

[হঠাৎ বারান্দার প্রান্তসংলগ্ন বকুল গাছ হইতে তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া পড়িলেন এক বৃদ্ধ। লঘুগতিতে একেবারে মেয়েটির সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগন্তুকের মুখে একমুখ দাড়ি-গোঁফ, গায়ের বর্ণ ফ্যাকাশে, কাগজের মতো, দেখিলেই মনে হয় যেন মৃতদেহ।]

আগন্তুক। গ্রাৎসি, গ্রাৎসি, সিনোরিনা, মহা আনন্দ পেলাম, তাই তোমায় নিজে ধন্যবাদ দিতে এসেছি।

মঞ্জিষ্ঠা। এ্যাঁ, ওমা, একে! ভূত নয় ত! যদি অপরাধ না নেন, ত জিজ্ঞেস করি বকুল গাছ থেকে অমন আচম্‌কা লাফিয়ে পড়লেন, অপনি কে?

আগন্তুক। আমি লিওনার্দো-ডাভিঞ্চি, তুও সেরাবুত্তো, তোমার ভৃত্য। (নত হইয়া অভিবাদন করিতে তাঁহার দাড়ি প্রায় বারান্দায় লুটাইয়া পড়িল) খাসা বকুলগাছটি কিন্তু, আমার ভারি পছন্দ হয়েছে।

মঞ্জিষ্ঠা। কি সর্বনাশ! ডাভিঞ্চি? চিত্রকর ডাভিঞ্চি? তিনি ত অনেক কাল আগে—,তবে আপনি কি—

ডাভিঞ্চি। তুমি ধরেছ ঠিক। আমি অনেক কাল আগে মরে গেছি। সে কারণ সর্বত্র গমনাগমন করতে পারি। তোমাদের ধারণা মৃত ব্যক্তি জড়, নিষ্পন্দ। তা ভুল। আমরা স্বচ্ছন্দে সর্বত্র যাতায়াত করি, অধিকন্তু রেল ভাড়া, জাহাজ ভাড়া, বাস্‌ ভাড়া লাগে না।

মঞ্জিষ্ঠা। সে একটা মস্ত সুবিধে।

ডাভিঞ্চি। আর হোটেল খরচাও নেই। এ-গাছে সে-গাছে থাকলেই হল। তোমার এই বকুল গাছটি খাসা।

মঞ্জিষ্ঠা। আপনি ইতালিয়ান হয়ে এমন সুন্দর বাংলা বলেন কেমন করে?

ডাভিঞ্চি। তার কারণ মরে গেলে আমরা বিশ্বমনের একাংশ অধিকার করি, তাতে বিশ্বের সমস্ত লোকের মনের কথা বুঝতে ও বোঝাতে পারি। 'বিশ্বমনের একাংশ'—কথাটা হয়ত ঠিক বুঝতে পারলে না। অতি সোজা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। (হাতের আঙুলগুলি ঘুরাইয়া) রেঞ্চ্‌ কাকে বলে জানত? যা দিয়ে নাট্‌ বোল্ট্‌ টাইট করা যায়?

মঞ্জিষ্ঠা। এই রেঃ, এইবার এঞ্জিনিয়ার ডাভিঞ্চির বক্তৃতা সুরু হল।

ডাভিঞ্চি। ঠাট্টা নয়, কথাটা বোঝ। যে আকারের নাট সেই আকারের রেঞ্চ হওয়া দরকার, তাত জান? এখন সমস্ত সাইজের নাট্ বোল্ট্ যদি একই রেঞ্চে ঘোরাতে পারা যায়, তাহলে কত সুবিধে হয় বুঝতেই পারছ?

মঞ্জিষ্ঠা। অর্থাৎ যেমন আমাদের রান্নায় সরষের ফোড়ন, সব তরকারিতেই দেওয়া যায়।

ডাভিঞ্চি। (সন্দিগ্ধ ভাবে) তা হবে। সেই জন্যে ইউনিভার্সাল রেঞ্চের ব্যবস্থা। বিশ্বমন হল ঠিক ইউনিভার্স্যাল রেঞ্চ, অর্থাৎ—

মঞ্জিষ্ঠা। অর্থাৎ সরষে ফোড়ন।

ডাভিঞ্চি। কথাটা হয় ত এখনো ঠিক বুঝতে পারলে না।

মঞ্জিষ্ঠা। খুব পেরেছি। সরষে ফোড়ন, এতে আর বোঝবার কি আছে।

ডাভিঞ্চি। (সন্দিগ্ধ ভাবে) তুমি হয়ত কথাটাকে তামাসা ভাবছ!

মঞ্জিষ্ঠা। তা হয়ত ভাবছি।

ডাভিঞ্চি। সব জিনিষ নিয়ে এমন তামাসা করা উচিত নয়।

মঞ্জিষ্ঠা। আপনি বললেন ধন্যবাদ দিতে এসেছেন। কিসের ধন্যবাদ?

ডাভিঞ্চি। আমার দেশ থেকে কত হাজার মাইল দূরে বাংলার এক মেয়ে আমার ছবির এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে, তাই আমি আর থাকতে না পেরে নিজে তোমায় ধন্যবাদ দিতে এলাম।

মঞ্জিষ্ঠা। আর আগেই বলেছেন আপনাদের রেল ভাড়া জাহাজ ভাড়া লাগে না।

ডাভিঞ্চি। তোমার সবতাতেই তামাসা।

মঞ্জিষ্ঠা। কোথায় টাস্কেনি আর কোথায় এই বাংলার পল্লীগ্রাম! আপনার 'মোনালিসা' আঁকবার সময় আমার নিজের অক্ষমতা ভেবে মনে হয় আপনার ছবির অবমাননা করছি, আপনি রাগ করেন না ত?

ডাভিঞ্চি। রাগ করব? খুসী হই, খুব খুসী হই। তোমার বেশ আঁকবার হাত আছে দেখছি।

মঞ্জিষ্ঠা। আপনি ঠাট্টা করছেন।

ডাভিঞ্চি। আমরা চাই পৃথিবী আমাদের মনে রাখুক। …তুমি আমার আঁকা ছবির কথা বলছ, কিন্তু সিনোরিনা, আমি যে ছবি আজ নিজের চোখে দেখছি তার তুলনা কোথায়? এই বকুল গাছের ছায়ায় ঢাকা বারান্দার একটি কোণ, এই শ্যামল মাঠের প্রান্তশায়ী জল রেখা, দূরে গাভীদের গলার ঘণ্টা বাজছে, আকাশে আসন্নবর্ষণ মেঘ, এদের মাঝে একটি মেয়ে, গায়ের রঙ যার ইয়েলো-ওকার, চোখ দুটি যার স্নিগ্ধচ্ছায়ার মতো গভীর কালো, ঠোঁট দুটিতে যার ক্রিমসন্ লেকের রঙ, সাড়ীর রঙ ভেরাভার্ত, আহা এ ছবি যে দেখে দেখে আমার আশ মেটে না!

মঞ্জিষ্ঠা। ওমা কি হবে! শেষকালে ভূতে আমার প্রেমে পড়ল!

ডাভিঞ্চি। কেন, ভূতেন কি প্রেমে পড়া বারণ?

মঞ্জিষ্ঠা। বারণ নয়, তবে রেল ভাড়া জাহাজ ভাড়া দিয়ে এলে বুঝতম যে অন্ততঃ আমার জন্যে কিছু ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

ডাভিঞ্চি। মেয়েদের কাছে চিরদিনই কথায় হার মানতে হবে।

মঞ্জিষ্ঠা। আপনার এই অমর ছবির প্রতিলিপি কত নদী কত পর্বত পার হয়ে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে এসে পৌঁছেছে,—কি করে এমন সম্ভব হয়? কে আনে এমন করে বহু অতীত যুগের বার্তা বহু যোজনের অন্তরালে?

[অরুণ প্রবেশ করিল]

অরুণ। তার জন্যে আমাকেই তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত মঞ্জিষ্ঠা, আমিই ত তোমাকে ঐ ছবির পোষ্টকার্ড সংগ্রহ করে এনে দিয়েছি অনেকদূর থেকে। (ডাভিঞ্চিকে দেখিয়া) এটি আবার কে? মঞ্জিষ্ঠা তোমার কোনো লেম্ ডাক্ বুঝি? আপনি কে মশাই?

মঞ্জিষ্ঠা। চিনতে পারলে না, উনি হচ্ছেন (কানের কাছে মুখ রাখিয়া) লিওনার্দো ডাভিঞ্চির ভূত। ভূত বলো না, বললে উনি চটে যান।

অরুণ। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) এ্যাঁ, লিওনার্দো ডাভিঞ্চির—ইয়ে?—তা বেশ বেশ, আপনার ভৌতিক স্বাস্থ্য বেশ ভাল আশা করি?

ডাভিঞ্চি। (বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে অরুণের দিকে চাহিয়া) তুমি কি মেয়েটির স্বামী নাকি?

অরুণ। হ্যাঁ, কেন, আপনার পক্ষ থেকে তাতে কোন আপত্তি আছে না কি?

মঞ্জিষ্ঠা। দুষ্টামি করো না-অরুণ।

ডাভিঞ্চি। (মঞ্জিষ্ঠাকে) আমি ভেবেছিলাম আপনি কুমারী। কি জানি আপনি ওই ননডেস্ক্রিপ্টটাকে কি চোখে দেখেছেন। লোকটি যে বাঙালী পুরুষ মানুষ তা আর বলে দিতে হয় না।

অরুণ। দেখছ মঞ্জিষ্ঠা, ভূত হলে কি হয়, লোকটা হিংসেয় একবারে ফেটে পড়ছে। মশাই, আমিই কষ্ট করে আপনার আর্ট বহুযোজন দূর থেকে নিয়ে এসে মঞ্জিষ্ঠার কাছে প্রচার করলাম; তাতে আপনি কোথায় কৃতজ্ঞ হবেন, না আমার চেহারা সম্বন্ধে এ-রকম কটুক্তি করছেন!

[নীল কোর্ত্তাপরা জাহাজের খালাসী প্রবেশ করিল]

খালাসী। 'রাঁধকে বাড়্‌কে মর গিয়া দো—
হাত লাড়্‌কে পর্শে সো'—

তুম্‌ লে আয়া কাঁহাসে কর্ত্তা, হাম্‌ না থাক্‌নেসে জাহাজ চালাতা থা কোন্‌?

অরুণ। আমার বিংশতিতম পূর্ব্বপুরুষ। এ কি ভাষা তোমার! কে তুমি?

খালাসী। হাম্‌রা বাৎ বুঝনে শুবনে নেহি পারতা? কেই সে পারেগা, ই তো বাংলে নেহি, ই হায় খাস্‌ ফার্সি। হাম মুসলমান, বাংলে নেহি জানতা, খুদ্‌ ফার্সি বোলতা। হাম জাহাজ কো খালাসী।

অরুণ। তা বটে, শুনলে মঞ্জিষ্ঠা।

মঞ্জিষ্ঠা। তাহলে একা খালাসী কেন, ট্রেণের ড্রাইভার, ট্রামের কন্‌ডাক্‌টার, ষ্টেশনের কুলি, ঠিকাগাড়ীওয়ালা এরাই বা বাদ যায় কেন।

অরুণ। অর্থাৎ বিলেত থেকে এখানে আসতে যাকিছু যানবাহনের দরকার সবাই দাবী।

খালাসী। ঐ জাহাজ কো ভোঁ বাজ গিয়া। ভোঁটি যেই বাজেগা, অম্‌নি হামকো আর ডাঙ্গামে থাক্‌নে কো হুকুম নেহি। [প্রস্থান]

অরুণ। শুনলে মঞ্জিষ্ঠা খাস ফার্সি বুলি!

[হঠাৎ বকুলগাছ হইতে আর এক বৃদ্ধ বারান্দার উপর লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহারও একমুখ দাড়ি-গোঁফ।]

আগন্তুক। ও খালাসী ফালাসি কে! সমস্ত সম্মান আমারি প্রাপ্য। আমি না থাকলে ভারতে আসবার রাস্তা দেখাত কে হে বাপু?

অরুণ। আসুন আসুন, আপনাকে যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে। তামাক খান নিশ্চয়ই?—কোথায় দেখেছি ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।

আগন্তুক। আমাকে দেখেছ ইতিহাসের পাতায়। আমার নাম ভাস্কো ডাগামা। পড়নি, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে আমিই প্রথম ইয়োরোপ থেকে জাহাজে করে কালিকাটে এসে পৌঁছাই? আমিই পথ প্রদর্শক।

মঞ্জিষ্ঠা। ভাস্কো ডাগামা! আমাদের এই বকুল গাছে!

ডাগামা। খাসা বকুল গাছটি কিন্তু! দেখলে ভূতমাত্রেরই লোভ হয়

ডাভিঞ্চি। এ বকুল গাছ থেকে লাফাবার অধিকার তোমাকে কে দিলে আমি জানতে চাই। এ বকুলগাছ আমার।

ডাগামা। ওঃ বকুলগাছ ওঁর! উনি কিনেছেন! এ বকুলগাছ আমার।

ডাভিঞ্চি। হোঃ, মোচার খোলার জাহাজে করে ভাসতে ভাসতে কালিকাটে এসেছিলেন, তারি বড়াই দেখ না!

ডাগামা। রঙ আর তুলি নিয়ে হিজিবিজি ছেলে খেলার চেয়ে ত তা ভাল!

ডাভিঞ্চি। বেটা ইঁদুর, শুঁটকি মাছ, বোম্বেটে!

ডাগামা। বেটা টাস্ক্যান, বেটা পোটো!

ডাভিঞ্চি। খবরদার!

ডাগামা। তুমি খবরদার!

ডাভিঞ্চি। অ্যাবেসিল্‌, কর্ক্যা—

ডাগামা। ইদিও, ভলিয়াব—

মঞ্জিষ্ঠা। অরুণ, ও অরুণ, এরা দুই বুড়োতে মিলে হঠাৎ অমন করছে কেন?

অরুণ। হয়েছে কি, বকুল গাছটা দুজনেরই ভারি

পছন্দ হয়ে গেছে, তাই বকুলগাছ নিয়ে ঝগড়া। ওরা উভয়ে উভয়কে গাল দিচ্ছে কসে। আমরা রেগে গেলে শেষে যেমন হিন্দী ধরি, ওরাও তেমনি ফ্রেঞ্চ ধরেছে।

মঞ্জিষ্ঠা। ও বটে! দাঁড়াও তোমাদের বকুল গাছে থাকা বার করছি! (সব থেকে বড় তুলিটা হাতে লইয়া বেত্রের মতো আন্দোলন করিতে করিতে) দেখুন, আপনারা যদি ঝগড়া করেন ত মার খাবেন, তা বলে দিচ্ছি!

ডাভিঞ্চি। ও বকুল গাছ আমার—

ডাগামা। না, ও বকুল গাছ আমার—

মঞ্জিষ্ঠা। ও বকুল গাছ কারো নয়, ও বকুল গাছে কেউ থাকবে না। (ডাভিঞ্চিকে ঠক্ করিয়া এক ঘা মারিয়া) বলুন 'Sorry'—

ডাভিঞ্চি। (মুখ গোঁজ করিয়া) Sorry—

মঞ্জিষ্ঠা। (ডাগামাকে) আপনি বলুন Sorry!

ডাগামা। (মুখ গোঁজ করিয়া) Sorry—

মঞ্জিষ্ঠা। যান, এখন আপনারা যে যার দেশে ফিরে যান।

ডাগামা। বকুলগাছ—

ডাভিঞ্চি। বকুলগাছ—

মঞ্জিষ্ঠা। ও বকুলগাছ কারো নয়। যদি আপনাদের মধ্যে কাকেও ওখানে দেখি, তুলি পেটা করব।

[ডাভিঞ্চি ও ডাগামা উভয়ে অন্তর্হিত হইলেন]

আহা বেচারারা! আমার মায়া হচ্ছে। এদিকে এত বড়, অথচ আবার শিশুর মতো সরল। সামান্য বকুলগাছ নিয়ে ঝগড়া।

অরুণ। খুব বাঁচিয়ে দিয়েছ তুমি মঞ্জিষ্ঠা, তোমার তুলি পেটার ভয়ে ওরা কেউ আর ঘেঁসছে না, নইলে ও বকুলগাছ ভূতের বাসা হত।

[ব্যস্তসমস্ত ভাবে জনবুল প্রবেশ করিলেন]

জনবুল। গুড্ মর্নিং, গুড্ মর্নিং, গুড্ মর্নিং। (টুপিটা খুলিয়া টেবিলে রাখিলেন) আমি বেশী কথার লোক নই, কাজের লোক। ঐ দেড়ে পোর্টুগীজটা বড়াই করছিল না! ওসব হাম্বাগ, হাম্বাগ, হাম্বাগ।

মঞ্জিষ্ঠা। আপনি কে?

জনবুল। জনবুল, জনবুল, জনবুল। সমস্ত ভারতবর্ষ পশ্চিমের চিন্তাধারা স্রোতের মতো বইয়ে দিয়েছে কে? ভারতের দর্শনের সঙ্গে ইয়োরোপের বিজ্ঞান মিশিয়েছে কে? ভারতের জ্ঞান ও ইয়োরোপের কর্ম্ম একসূত্রে বেঁধেছে কে? ইটালীর আর্ট, গ্রীসের ভাস্কর্য্য, জার্ম্মানীর বিজ্ঞান, ফরাসীর সাম্যবাদ, বৃটিশ কর্ম্মতৎপরতা শৌর্য্য তেজ তোমাদের জাতির মধ্যে প্রচার করেছে কে?—আমি, আমি, আমি। তোমরা মানুষ হলে তার জন্যে সবচেয়ে বড় গর্ব্ব কার?—আমার, আমার!

মঞ্জিষ্ঠা। ফরাসী যেখানে হঠেছে, পোর্ত্তুগীজ ড্যানিশ যেখানে পরাজিত, আপনি সেখানে বিজয়ী। আমরা জাতের ও ধর্ম্মের সহস্র বাঁধ বেঁধে মানুষকে পিষে মেরেছি, মানুষকে মানুষের অধিকার হতে বঞ্চিত করেছি, তাকে মন্দিরে ঢুকতে দিই নি, তাকে স্পর্শ করলে পাপ ভেবেছি, তার দাবীকে ঠেলে রেখেছি আপনি কিন্তু জাতিনির্ব্বিশেষে আমাদের সকলের মনুষ্যত্বের অধিকারকে স্বীকার করেছেন, সম্মান করেই। সমস্ত ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্যে আপনি যেমন দায়ী তেমন আর কেউ নয়।

জনবুল। খুসী হলুম, খুসী হলুম, ভারি খুসী হলুম। এখুনি যেতে হবে, গুড বাই, গুড বাই, গুড বাই। (টুপি না লইয়াই প্রস্থানোদ্যত হইলেন)।

অরুণ। (টেবিলের উপর হইতে টুপি লইয়া জনবুলকে দিয়া কহিলেন) আপনার হ্যাট, আপনার হ্যাট, আপনার হ্যাট।

[জনবুল চলিয়া গেলেন]

[কোথা হতে একটা গোলমরীচ হঠাৎ গড়াইতে গড়াইতে হাজির হইল]

মরীচ। তুমি ত সব এনেছ ভারতে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু তোমাকে ভারতে আনলে কে বাপু?

অরুণ। কেন, তুমি নাকি?

মরীচ। নিশ্চয়, আমি গোলমরীচ। জান ত আমার ইতিহাস?

মঞ্জিষ্ঠা। তাহলে আমাদের দেশে ইয়োরোপের শিক্ষা কর্ম্ম ও চিন্তার যে দান তার জন্যে আদিমভাবে দায়ী হল গোলমরীচ!

মরীচ। অবিশ্যি অত বড় দাবী আমি করি না।

অরুণ। ঝাল থাকলে কি হয়, বিনয় নেই একথাটি আর বলা চলবে না!

মরীচ। তবে তোমাদের শ্রদ্ধার যে-ভাগটুকু আমার ন্যায্য পাওনা সেটুকু দিতে কার্পণ্য করো না।

(প্রস্থান)

মঞ্জিষ্ঠা। তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে গোলমরীচ হল কেঅস্ হতে প্রথম কস্‌মস্, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এনার্জির তরঙ্গ হতে সর্বপ্রথম অ্যাটম্?

অরুণ। যেৎ—

হঠাৎ সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো কল্লোলধ্বনি শোনা গেল। যে গতি নিরন্তর নিঃশব্দে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে সহসা তাহা বাণীময় হইয়া আকাশের এপার ওপার মহারথের চক্রঘর্ঘরে মুখরিত করিয়া দিল, তাহার ধ্বনি স্থলে জলে পুষ্পে তৃণে মানুষের বক্ষস্পন্দনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অরুণ ও মঞ্জিষ্ঠা নির্বাক বিস্ময়ে শুনিল সে ধ্বনি যেন বলিতেছে—

"অনন্তকাল ধরে মহাসমুদ্রের মতো তরঙ্গে তরঙ্গে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, দেশ হতে দেশে, পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে পৃথিবীর আর একপ্রান্তে মানুষের উত্থান-পতন, মানুষের জয়-পরাজয়;—কে ভাসিয়ে নিয়ে যায়? সে আমি। পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর আমার পন্থা। আমারি তরঙ্গে প্রবাহিত হয়ে ভারতের সভ্যতা গ্রীসে গিয়ে পৌছায়, গ্রীসের সভ্যতা রোমে, রোমের সভ্যতা বৃটেনে, বৃটেনের সভ্যতা ভারতে। যারা পথ আবিষ্কার করে, যারা সাম্রাজ্য স্থাপন করে, যারা মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ ঘটায়, তারা সবাই আমারি প্রতিনিধি। আমি বিধাতার রথচক্র, আমি অনাদি অনন্ত কালপারাবার।"

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

আবার

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার

ফুট্‌বে আবার কুসুম বনে
আসবো আমি রাতে
ঘুমে তখন থাকবে মগন্
তোমার আঁখি পাতে।

ভাসবো আমি তারায় তারায়
অন্ধ মনের বন্ধ কারায়
পান্থশালার দরদালানে
ব্যথার বাঁশী হাতে।

উঠবে যখন তুমি হেসে
যাবো আমি হাওয়ায় ভেসে
আমার ব্যথা রইবে জেগে
দোলন চাঁপা সাথে।

সর্ব্বব্যাপী প্রেম

শ্রীমমতা মিত্র

এই পথেরি 'পরে
ব্যাকুল আমার অশ্রুবারি
পড়্ল ঝ'রে ঝ'রে।
আস্তে যেতে পথে তোমার প'ড়্বে পায়ের ছবি,—
তপ্ত অশ্রু স্নিগ্ধ হ'বে চরণ-পরশ লভি'।

ঐ যে দূরে আকাশ গায়ে শুকতারাটি জ্বলে—
দৃষ্টি আমার দিলেম রেখে ওরই নয়ন-তলে।
হারাবে পথ যখন তুমি চন্দ্রবিহীন রাতে—
দিশারি ও হ'বে তখন, চ'ল্বে তোমার সাথে।
বন্ধু, তুমি বুঝ্বে কি ও তারার আলো নয়,
গভীর আমার ভালবাসা ওর মাঝেতে বয়।
সেইত' ওকে জাগিয়ে রাখে যত্নে তোমার তরে,
আমার দিঠি মিল্বে, বন্ধু, একটু দেখ্লে পরে।

এই ধরণীর সঙ্গে যে আজ মিশিয়ে আছি আমি,
শ্রান্ত তুমি বিরাম-আশায় ব'স্বে যখন স্বামী—
তোমার পরশ লব আমার সকল অঙ্গে মাখি',
বুঝ্বে কি এই মাটির মাঝে লুকিয়ে আমি থাকি?
আরামটুকু দেব সবই, লব তোমার দুখ,
সর্ব্বংসহা তোমার লাগি,—সেই ত' আমার সুখ।

দূরে দূরে রয়েছি আজ নাই যে তোমার কাছে,
জান্লে না কি পরাণ আমার তোমায় ঘিরে আছে?
খুঁজেছি যে তোমায় আমি কত জনম ধ'রে,
আরাধনায় কেটেছে দিন, চেয়েছি প্রাণ ভ'রে।
দেখ্তে কেহ পায় না মোরে—তোমায় দেখে যাই,
আরাধ্য যে চিরকালের—তাইত' দেখা পাই।

শ্রাবণ হ'য়ে শুনিয়ে যাব অশ্রু-করুণ গান,
গভীর রাতে বৃষ্টি-ধারায় জাগবে তোমার প্রাণ।
নিদ্রা ভেঙে ভাব্বে মনে—"সেই বুঝি বা আসে,"
বাজিয়ে নূপুর তালে তালে আস্ব তোমার পাশে।

শরতকালে সোণার রোদে লুকিয়ে আমি র'ব,
আলো দিয়ে তোমার গায়ের পরশখানি সব।
শরৎ-রাণীর হাসির মাণিক ঝ'র্বে অবিরত,
আমার প্রাণ ও না পেলে কি অমন উজল হ'ত?

শীতের দিনে উত্তরে ওই হিমেল হাওয়ার ভরে
সম্মুখেতে তোমার আমি কাঁপ্ব থরথরে।
তখন তুমি বুঝ্বে না কি আমার বুকের মাঝে
কী রিক্ততা রইল জ'মে—কিসের বেদন বাজে?

আস্বে যখন বসন্ত গো সকল শোভা ল'য়ে,
তখন তোমায় ছুঁয়ে যাব দখিণ হাওয়া হ'য়ে।
আমার অগাধ প্রেম দিয়েছি সমীরণের প্রাণে—
তাইত' সে গো বিহ্বলতা মদির মোহ আনে।

সবার মাঝে আমার হৃদয় মিশিয়ে আজি আছে—
বারেবারে নতুন রূপে আসি তোমার কাছে।
তোমার সাথে ছাড়াছাড়ি কেমন ক'রে হ'বে?
থাক্‌ব না ক' যেদিন আমি প্রেম তখনও র'বে।

শরৎ-সাহিত্যে নারী

শ্রীকনককান্তি ঘোষ বি-এস্-সি

পৃথিবীর সৌন্দর্য্য আলোচনা করিতে গেলে স্বতঃই পুষ্প, পক্ষী ও মানব জাতির কথা মনে উদিত হয়। মানব জাতি ভগবানের সৃষ্টির গৌরব। পুরুষ হইতে নারী অধিক কোমল, অধিক সুন্দর, অধিক রমণীয়। তাই পুরুষ ও নারীর কার্য্য-ক্ষেত্রও বিভিন্ন। নারী স্নেহ ও সেবার প্রতিমূর্ত্তি। কখনও মাতৃরূপে, কখনও ভগ্নিরূপে এবং কখনও পত্নিরূপে নারী পুরুষের সেবা করিতেছে। এই সেবার ও স্নেহের মূল্য স্থূল চক্ষে নিরূপণ করা কঠিন, কারণ ইহা অত্যন্ত সহজ প্রাপ্য। কিন্তু ইহার প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হয় তখনই যখন ইহার একান্ত অভাব ঘটে। কোন্‌রূপ সেবার মূল্য অধিক তাহা অবস্থা বিশেষে পতিত ব্যক্তিই মাত্র উপলব্ধি করিতে পারে। মানুষ যখন সভ্যতা, সমাজ, রাজনীতি, দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিল তার নিজ সাহিত্য, নারীর রূপ ও সুকুমার বৃত্তিগুলি তখন আরও মনোরম হইয়া প্রকাশিত হইল। সত্য, শিব ও সুন্দরের ভাষায় অভিব্যক্তির নামই সাহিত্য। সূত্র হিসাবে সাহিত্যে নারী চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে নারী চরিত্র না হইলে সাহিত্য চলিতেই পারে না। নারী চরিত্রের সৃষ্টি ইহাতে আনিয়াছে রূপ, রস, গন্ধ ও ছন্দের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ।

এতাবৎ কাল সমস্ত সাহিত্যিকই তাঁহাদের রচনায় পুরুষের নীতিজ্ঞান বিবেচনা, শৌর্য্য, চরিত্রবল বিশেষ যত্নের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। তা কি হোমার, ভার্জ্জিল কি ব্যাস বাল্মীকি। তাঁহারা বড় বড় স্ত্রী-চরিত্রের অবতারণা করিতেন মূল পুরুষ চরিত্রকে আরও মহত্তর করিবার জন্য। প্রাচ্য সাহিত্যে এই নিয়মের প্রথম ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমর ও দেবী চৌধুরাণীর চরিত্রে। কিন্তু স্ত্রী চরিত্র রচনায় এমনভাবে প্রাণ ঢালিয়া শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বে কেহই দেন নাই। তাই তাঁহার রচনায় পুরুষ অপেক্ষা নারী চরিত্রই অধিক ফুটিয়াছে। তিনি প্রত্যেক নারী চরিত্রখানি যেন প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। বেণী অপেক্ষা রমা, দিবাকর অপেক্ষা কিরণময়ী, সতীশ অপেক্ষা সাবিত্রী চন্দ্রনাথ অপেক্ষা সরযূ অধিক ফুটিয়াছে।

শরৎ-সাহিত্যের বিশেষত্ব এই যে ইহা বাঙ্গালী হিন্দু সমাজকেই ইহার কেন্দ্র নির্দ্ধারণ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বে অনেকেই বাঙ্গালী সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং তাহাতে দর্শন, নৈপুণ্য ও আন্তরিকতার অভাব ছিল বলা চলে না—বরং প্রচুর পরিমাণেই ছিল। কিন্তু শরৎ-চন্দ্রই প্রথম সমাজের ভিতরের দিকটা লোকচক্ষুর সম্মুখে এইরূপ ভাবে উদ্‌ঘাটিত করেন্। তিনি সমাজকে দেখিয়াছেন ভিতর হইতে। লাঞ্ছিত ও অজ্ঞাত মানবের মহত্ত্বে এত বড় তাঁহার পূর্ব্বে কোন লেখকই লন নাই। তাই দুশ্চরিত্র, মদ্যপ জীবানন্দ, ভবঘুরে শ্রীকান্ত ও চরিত্রহীন সতীশ তাঁহার সাহিত্য-সংসারের প্রধান ব্যক্তি। চরিত্রের এই সামান্য দোষ ত্রুটী মানুষের মানবত্বকে কখনই কলুষিত করিতে পারে না। তাই প্রকৃত মানবত্বকে তিনি এক গৌরবময় উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শরৎ-সাহিত্যে আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীগণের চরিত্র অঙ্কিত দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত সজীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার রচনায় পাই মানব চরিত্রের নিটোল প্রতিমূর্ত্তি, আবহাওয়ার সহজ স্বাভাবিকতা ও ঘটনার পারম্পর্য্য। তাঁহার রচনার বিষয়, পাত্র ও ক্ষেত্র অনেকটা প্রাচীন, সমাজ প্রাচীন, সংস্কার প্রাচীন, চরিত্রের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক বৃত্তিই প্রধান। কিন্তু এই সকলের উপর হইয়াছে আধুনিক বুদ্ধির আলোকসম্পাত; এবং প্রশ্নগুলি উঠিয়াছে আমাদের প্রশ্নকেই আশ্রয় করিয়া। যে সমস্ত চরিত্রের তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন বাস্তবের সহিত তাহাদের তুলনা করিলে দেখা যায়, যে কখনও কখনও তাহা

বিচিত্রা
কার্ত্তিক, ১৩৪৩

কর্ম্মান্তে

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কোথাওই তাঁহার লিখন-ভঙ্গির সরল সহজ গতি ব্যাহত হয় নাই। রচনার এই লীলায়িত গতি ও ভঙ্গিমা, কতকটা আসিয়াছে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির ফলে এবং কতকটা আসিয়াছে তাঁহার লোকচরিত্র অভিজ্ঞতার ফলে। যে ঘটনাটি যে স্থানে সন্নিবিষ্ট করিলে সমগ্র বিষয়টিই চমকপ্রদ হয় তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র পরিদৃষ্টমান। কিন্তু এতখানি অতি-অভিনয়ের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি কৃত্রিম বা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নাই। বরং ইহা যেন সেই জন্যই নিজের ঘ্রাণে ভরপুর। এক কথায় ইহা যেন আমাদেরই মনোবৃত্তির জীবন্ত প্রকাশ।

শরৎচন্দ্র সত্যই শিল্পী। যে সকল গুণ থাকিলে লোককে নিপুণ শিল্পী বলা যায় শরৎচন্দ্রের মধ্যে সে গুণগুলি পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। "সাধারণতঃ তিনটি গুণের সংমিশ্রণে হয় শিল্পের সমগ্রতা। প্রথমতঃ, প্রকাশক্ষম রূপের অনবদ্যতা, সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার; দ্বিতীয়তঃ বস্তুর মূল সত্তা বা অন্তরাত্মা তার অভিব্যক্তি; তৃতীয়তঃ এই দুই অঙ্গ যার বাহন সেই সৃষ্টি-পটু চৈতন্যের ও আনন্দের শক্তি।" * তাঁহার নিপুণ তুলিকা সম্পাতে সুন্দর-অসুন্দর, আলো-আঁধার, স্বর্গীয় ও পার্থিব ভাব এমন অপূর্ব্ব ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে প্রত্যেকখানি চরিত্রই সজীব। নর-নারীর মধ্যে অনাদিকালের যে আকর্ষণ তাহার নিদর্শন শরৎ-সাহিত্যে প্রচুর আছে। তাই বলিয়া তাহাদের সেই একমাত্র সম্বন্ধই তাঁহার রচনার বিষয় হইয়া দাঁড়ায় নাই। প্রণয়ী প্রণয়িনী সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলেও তাহাদের মধ্যে যে সকল সুন্দর ও পবিত্র সম্বন্ধ ও মনোভাব গড়িয়া উঠিতে পারে, শরৎচন্দ্রের রচনায় তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হৃদয়ের স্নেহ, মমতা, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসার গাঢ় প্রলেপ দিয়া তিনি বাঙ্গালী পরিবারের মা, [illegible]নী, পত্নী, সখী ও প্রণয়িনীর প্রাণমোহিনী চিত্র অঙ্কিত [illegible]য়াছেন। তাহার লেখার মধ্য দিয়া নারীর প্রেমের যতগুলি দিক আছে তাহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মে।

প্রথমতঃ নারীর বাৎসল্য-প্রেম—আমাদের দেশে মাতৃস্নেহ সর্ব্বদাই একটা উচ্চ খ্যাতি লাভ করিয়া আসিয়াছে। সত্যই মাতৃস্নেহের তুল্য সামগ্রী পৃথিবীতে বিরল। সন্তান গর্ভে সঞ্চারিত হইবার মুহূর্ত্ত হইতেই নারী-জাতির মাতৃভাব জন্মলাভ করে। দিনে দিনে ইহা পুষ্টি লাভ করে, পরে সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সেই মাতৃত্ব পূর্ণত্ব লাভ করে। ইতর প্রাণীর মধ্যেও এই মাতৃস্নেহ প্রভূত পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। নিজের সন্তানের উপর মায়ের যে আকর্ষণ তাহা নিতান্ত জৈব ধর্ম্ম। ইতর প্রাণীরা নিজের সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। আহার, নিদ্রা ও ভয়ের মত নারীজাতির ইহা একটা প্রকৃতিগত মানসিক বৃত্তি মাত্র। ঔদার্য্য ও মাতৃহৃদয়ের মাধুর্য্যের পরিচয় পাই তখনই যখন নিতান্ত অপরের সন্তানকে নিজের মাতৃস্নেহ দিয়া নিতান্ত আপনার করিয়া লইতে দেখা যায়। নারীর স্নেহপ্রবণতার মহৎ সত্তা তখনই নির্দ্ধারিত হয় যখন সে জন্মগত আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া চলিতে সমর্থ হয়। এইরূপ বাৎসল্য-প্রেম আমরা দেখিতে পাই বিন্দুর মধ্যে, দেখিতে পাই "রামের সুমতির" নারায়ণী ও "মেজদিদি"র হেমাঙ্গিনীর মধ্যে। "পল্লীসমাজের" জ্যোঠাইমার মধ্যেও ঐ ভাবের কথঞ্চিত পরিচয় পাই।

প্রখরভাষিনী, ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা, উদ্ধতা বিন্দুর দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ ও উত্তেজনাপ্রবণ প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই না ঘটিতে দেখা যায় কোমল বাৎসল্য রসের সংস্পর্শে। এই সকল ত্রুটীসম্পন্না বিন্দুর সমস্ত দোষ ত্রুটীর অন্তরালে ছিল এক অপরিসীম মমতাময়ী স্নেহকোমলা মাতৃ হৃদয়। বাৎসল্যরসের সংস্পর্শে স্ত্রীচরিত্রের কি আমূল পরিবর্ত্তনই না হয়, তাহার আরও উদাহরণ পাওয়া যায় বিন্দুরই চরিত্রে। যে বিন্দু দাসী রাঁধুনীকে মধ্যস্থ রাখিয়া কথাবার্ত্তা বলার বিরুদ্ধে বরাবর তীব্র ঘৃণাপূর্ণ প্রতিবাদই জানাইয়াছে, অমূল্য-বিচ্ছেদে কাতর সেই বিন্দুই দাসী কদমকে তাহার নির্দ্দোষিতার সাক্ষ্য স্থির করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বিবাহিত স্ত্রীর পতি-প্রেম—পত্নীর প্রকৃত প্রেমেই সংসার স্বর্গে পরিণত হয়। আকণ্ঠ

---

* শ্রীঅরবিন্দের 'শিল্প শিল্পের জন্যই' প্রবন্ধ হইতে।

দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও, দিবসব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর গৃহে ফিরিয়া যদি একজন প্রকৃত দরদীর সেবা পাওয়া যায়, তবে সে দারিদ্র্য ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির কি সত্যই অধিকাংশ অপনীত হয় না? শরৎ-সাহিত্যে এইরূপ আদর্শ পত্নীরূপে আমরা দেখিতে পাই "চরিত্রহীনের" সুরবালাকে ও বিরাজ বৌকে। তাহারা স্বামী ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না। স্বামীই তাহাদের নিকট ধ্যান জ্ঞান, স্বামীই দেবতা। অপরের চক্ষে স্বামীর কত-টুকু সেবা শোভন হইবে সে দিকে তাহাদের ভ্রুক্ষেপও নাই। উপীনদার কলিকাতায় কিরণময়ীর স্বামীকে দেখিবার জন্য যাত্রার আয়োজন হইতেছে "সঙ্গে সুরবালা যে নিশ্চয়ই যাইবেন, স্বামীর অসুস্থ দেহটা কিছুতেই চোখের আড় করিবে না, ইহাতে আর উপেন্দ্রের অনুমাত্র সংশয় রহিল না। * * * কোথায় গিয়া উঠা যাইবে? হারাণদার ওখানে? অসম্ভব। কারণ শুধু যে স্থানের অভাব তাহা নহে। সেখানে কিরণময়ীর স্বামী মরিতেছে, তথাপি তাহারই চখের উপর সুরবালা যে নিজের স্বামীর বিন্দুপরিমাণ পীড়াটুকু উপেক্ষা করিবে না, শোভন অশোভন কিছুই মানিবে না, শিষ্টাশিষ্ট সমস্ত আচরণ ডিঙ্গাইয়া মাড়াইয়া স্বামীর স্বাস্থ্যটুকু অনুক্ষণ সতর্ক প্রহরা দিয়া ফিরিবে; ব্যাপারটা মনে করিতেও তাঁহার লজ্জা বোধ হইল।"

তাহারা ধনীর কন্যা এবং ধনী গৃহস্থের বধূ। কিন্তু ধনগর্ব্ব কখনও তাহাদের স্বামী-প্রীতিকে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই। স্বামীর জীবনেই তাহাদের জীবন, স্বামীর কল্যাণেই তাহাদের কল্যাণ। তাহারা অনায়াসে নিজের সমস্ত সত্ত্বাকে স্বামীর চরণে বিসর্জ্জন দিতে পারিত এবং দিয়াও-ছিল। নিজের ক্ষুধার গ্রাস লইয়া স্বামীর উদর পূর্ণ করিতেই তাহারা আনন্দ পায়।

তৃতীয়তঃ নারীর পুরুষ-প্রেম—নারীর যাহা চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা—পুরুষের সাহচর্য্য, পুরুষের সংস্পর্শ, প্রিয় পুরুষের মধ্যে নিজেকে একবারে বিলীন করা—তাহা বহু আয়াসেও দাবাইয়া রাখা যায় না। প্রকৃতির যাহা ধর্ম্ম, বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহার বিপরীত ফলই ফলে। কখনও কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের আশ্রয় লইয়া সেই লুক্কায়িত মনোভাব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবেই। কিরণময়ীর চরিত্রই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যুক্তি তর্ক কথাবার্ত্তার দৃঢ়তা আমাদিকে চকিত করে। নারীর দেহ ও মনের যাহা আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাধ, কিরণময়ী সমস্ত কিছুরই অধিকারিণী। রূপে যৌবনে সে ষোলকলায় পূর্ণা। ভগবৎদত্ত ঐশ্বর্য্যের তাহার কোন অপ্রাচুর্য্যই নাই। এই অতুল ঐশ্বর্য্যময়ী বধূ-জীবন কোথায় কি ভাবে কাটাইয়াছে? দারিদ্র্য-প্রপিড়ীত সংসার, রুগ্ন অর্দ্ধমৃত স্বামী, শাশুড়ীর অনাদর এবং সকলের উপর লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্ধকার গলির মধ্যে একটি অপচ্ছিন্ন ও অপরিসর বাড়ী, যে-বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বেও সূর্য্যদেব কখনও প্রবেশলাভ করেন নাই, যাহার দুয়ারে কখনও একটি ভিখারীও মা বলিয়া আসিয়া দাঁড়ায় নাই, অতিথি ত দূরের কথা। জেলের বন্দীগণও লোকের মুখ দেখিতে পায়, সহকর্ম্মীদিগের সহিত দুই চারিটা সুখ দুঃখের আলাপ করিবার অবকাশ পায়, কিন্তু কিরণময়ীর? সেই দশবৎসর বয়সে এই বাড়ীতে ঢুকিয়াছে আর তাহার মুক্তি নাই। নিজের সংসারের তিনটি প্রাণী বাহিরের দাসী ও ডাক্তার ভিন্ন অন্য মুখ সাত আট বৎসরের মধ্যে দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। তাহার ভোগের বা নিজের জীবনের ব্যর্থতা ভুলিবার অবসর ছিল কি! ধর্ম্মগ্রন্থ ও বেদপাঠ আনিয়াছে তাহার মনে শুধু বিদ্রোহ। রূপ যৌবনের সার্থকতা নাই, আশা আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই। তাহার রূপ, যৌবন, আশা, আকাঙ্ক্ষা অন্তরেই বাড়িয়াছে, অলক্ষেই গুমরিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। ভোগের বা জীবনের ব্যর্থতা ভুলিবার অবকাশ না দিয়া তাহার রুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলিকে একদিন জ্বলিয়া উঠিবার সাহায্যই করিয়াছে। রুদ্ধ প্রকৃতি তাহার উপর বহুদিনের সঞ্চিত অপরাধের উপযুক্ত প্রতিশোধই লইয়াছে। কিরণময়ীকে উপেন্দ্রকে ভালবাসিতে দিয়া তাহার নারীত্বের প্রকৃত সম্মান করা হইয়াছে।

এইরূপ প্রেমের আরও একটি দৃষ্টান্ত পাই পল্লী-সমাজের রমার চরিত্রে। রমা বালবিধবা। সে রমেশের প্রত্যেক কার্য্যই পরোক্ষভাবে সমর্থন করিত। কিন্তু পল্লীগ্রামের দলাদলি ও বিপক্ষদলের নেতৃস্থানীয়া হইয়া প্রকাশ্যে রমেশকে

প্রেম নিবেদন করা নিতান্ত অশোভন হইত। তাই প্রকাশ্যে সে রমেশকে নির্ম্মমভাবে আঘাতই করিয়াছে। এবং সে আঘাতে রমেশ প্রকৃতই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পরোক্ষে সে আঘাতের গুরুত্ব বুঝিয়া দ্বিগুণ ব্যথিতা হইয়া ছ। একপক্ষে ইহা লোকমত স্বপক্ষে রাখিবার প্রকারান্তর। কিন্তু সত্য যাহা তাহা প্রকাশ পাইবেই।

চতুর্থতঃ কুমারীর প্রেম—নারীর যৌবনের প্রথম উন্মেষে যখন মনে ভালবাসার ভাব প্রথম অঙ্কুরিত হয়, তখন কোন পুরুষকে হৃদয় দান করিলে বাস্তব-জগতে তাহার মূল্য কতটুকু? ভবিষ্যত জীবনে অতীতের সেই কৃতকার্য্য কোন ছায়াপাত করে কি? কুমারীর পুরুষ-প্রেমের দৃষ্টান্ত পাই "দেবদাসের" পার্ব্বতীর চরিত্রে, পাই "পরিণীতার" ললিতা ও "দত্তার" বিজয়ার চরিত্রে।

পার্ব্বতী অতি অল্প বয়সেই দেবদাসকে ভালবাসিয়াছিল। দুইজনেরই বয়স ক্রমে বাড়িয়াছে। দেবদাস কলিকাতায় গিয়া কর্ম্মের তাড়নে ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদে পার্ব্বতীকে অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু পার্ব্বতী তাহার নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন পল্লীজীবনে এতদিন শুধু দেবদাসকেই ধ্যানে পতি-রূপে বরণ করিয়া আসিয়াছে। তাই রাত্রি দ্বিপ্রহরে দেব-দাসের শয়নকক্ষে একা যাইতে দ্বিধা করে নাই। যদিও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে হাতীপুরের জমিদার-গৃহিনী হইতে বাধ্য হইল, তবু মনে প্রাণে সে দেবদাসকেই ভালবাসিয়াছে। অবশ্য সে কখনও কাহাকে তাহার দৈহিক সতীত্বের উপর সন্দেহ করিবার অবকাশও দেয় নাই। এই নির্ম্মল প্রেমের অর্ঘ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া দেবদাসের সমস্ত জীবন কেবল সাহারার মরুভূমির ন্যায় অনন্ত তৃষ্ণায় দগ্ধ হইয়াছে। পার্ব্বতী যখন জানিল যে দেবদাসের মদ্যপানের কারণ তাহার অন্তরের গভীরতম বেদনা, তখন নিজের মনে কি বেদনাই সে পাইয়াছে! তাহাকে সুপথে ফিরাইয়া আনিতে তাহার সে কি আপ্রাণ চেষ্টা! পার্ব্বতীর প্রেমে স্বার্থের গন্ধমাত্র ছিল না। প্রকৃত প্রেমের মূল্য অনেক, ভালবাসা হইতে রূপের মোহ ও যৌন-পিপাসা বিভিন্ন। যে যথার্থ ভালবাসে সে সহ্য করিয়াই থাকে। শুধু অন্তরে ভালবাসিয়াও কত সুখ কত তৃপ্তি কত অনুভূতি যে পায় সে নিরর্থক সংসারের মাঝে দুঃখ অশান্তি আনিতে চায় না।

শেখরকেও ললিতা অল্প বয়সে ভালবাসিয়াছিল। দুইজনের মধ্যে এক জ্যোৎস্নাহাসিত শুভ্র নির্জ্জন রাত্রিতে মাল্য বিনিময় হইয়াছিল। ললিতা ও শেখর পরস্পর পরস্পরকে ভিন্ন বিবাহ করিবেনা বলিয়া বাক্‌দান করিয়াছিল। যদিও দুইজনের মিলনের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান ছিল প্রচুর; কিন্তু দুয়ের একনিষ্ঠ প্রেমই দুইজনকে শেষে মিলনের পথে আনিতে সক্ষম হইয়াছিল।

বিজয়ার পিতা ত তাহার জন্মের পূর্ব্বেই নরেন্দ্রের জন্য তাহার পিতাকে বাক্‌দান করিয়াছিলেন। যদিও বিজয়া ও নরেন্দ্রের মধ্যে আদৌ পরিচয় ছিল না, কিন্তু পরিচয়ের পর বিজয়া নরেন্দ্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিল।

সর্ব্বশেষে পতিতা নারীর প্রেম—সাধারণতঃ দেখা যায় পতিতারা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের দেহ বিক্রয় করে। পুরুষের দল পতিতাদিগের নিকট আসে সুখের আশায় কিন্তু সে সুখে শান্তি নাই আছে দাহ। পতিতারা জগতের চক্ষে ঘৃণ্য। সত্যই যদি জীবনের কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নিজের মনের শক্তি হারাইয়া থাকে, তাই বলিয়া তাহারা যে সারা জীবন সেই ভ্রমের মূল্য দিয়া যাইবে, কোন সভ্যসমাজই এতখানি দাবী করিতে পারে না। যে নারী সমাজের নিষেধের গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, হইতে পারে তাহার মন্দ ভাগ্য, কিন্তু অহর্নিশ তাহাকে আরও মন্দের দিকে ঠেলিয়া দিবার স্বপক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে? তাহার মধ্যেও নারীর প্রকৃতিজাত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ত্তমান। একদা যে তাহার জীবনের বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল এবং এই বিচ্যুতির মূলে যে মুহূর্ত্তের দারুণ ভ্রম রহিয়াছে তাহাও তাহার জীবন-আকাশকে নিরবচ্ছিন্ন কালিমাময় করিয়া রাখিতে পারে না। তাহারাও সুযোগ পাইলে দেবী হইতে পারে। কোন সোনার কাঠির স্পর্শে যে তাহাদিগের ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাই সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী ও রাজলক্ষ্মী দেবীত্বের মহিমায় গৌরবান্বিতা।

চন্দ্রমুখী যেদিন দেবদাসকে প্রথম দেখিল—যদিও দেবদাস

তাহাকে তখন কুৎসিত, অন্তঃকরণহীনা ইত্যাদি বলিয়া অপমান করিয়া চলিয়া আসিল—সেইদিন হইতে চন্দ্রমুখী কেমন যেন নিজের অজ্ঞাতেই দেবদাসকে ভালবাসিয়া ফেলিল। চুনী বাবুকে আর একদিন দেবদাসকে তাহার নিকট লইয়া যাইতে সেই রাত্রেই সে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিল। চন্দ্রমুখী জানিত, দেবদাস ধনীর সন্তান, কিন্তু ধনের আশায় তাহার দিকে আদৌ সে আকৃষ্ট হয় নাই। সেই ভালবাসার সংঘাতে চন্দ্রমুখী তাহার দোকানপাট এবং আসবাবপত্র বেচিয়া দিতে ও বহু লোভনীয় প্রাপ্য প্রত্যাখ্যান করিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হন নাই। সমস্ত সম্বন্ধ চুকাইয়াও কিন্তু আর একবার দেবদাসকে দেখিবার লোভে সে কলিকাতা ছাড়িতে পারে নাই। যে চন্দ্রমুখী মদ অত্যন্ত ঘৃণা করিত যে বলিয়াছে "মদে আমার বড় ঘৃণা। কেউ মাতাল হলে তার উপর আমার বড় রাগ হ'ত। কিন্তু তুমি মাতাল হলে রাগ হ'ত না। বড্ড দুঃখ পেতাম।" শেষে দেবদাস নিরুদ্দেশ হওয়ার পর তাহার দেখা পাওয়ার জন্য চন্দ্রমুখী না করিয়াছে এমন কাজ নাই। যাহার পূর্ব্ব চরিত্র হইতে বর্ত্তমান চরিত্রের পার্থক্য নরক ও স্বর্গ। সে শুধু দেবদাসের খোঁজে কেমন করিয়া পুনরায় ঐ জঘন্য পল্লীর মধ্যে বাস করিতে লাগিল। তাহার জীবন-সর্ব্বস্বর সংবাদ পাওয়ার জন্য তাহার সে কী আন্তরিক আকুলতা! রোগশয্যায় দেবদাসের কি অকাতর শুশ্রূষাই না সে করিয়াছে! এবং এই একনিষ্ঠ ভালবাসা দিয়াই যে দেবদাস তাহাকে ঘৃণা করিত তাহারই নিকট হইতে শান্ত মধুর ভালবাসা আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

সাবিত্রীও সতীশকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। সাবিত্রীর চরিত্রের মধ্যে ছিল একটা সংযম, যাহার সম্মুখে বদমেজাজী সতীশও কখন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে সাহসী হইত না। বস্তুতঃ সে সাবিত্রীকে ভয়ই করিত। সাবিত্রী উচ্ছৃঙ্খল সতীশকে সর্ব্বদাই গুরুজনের ন্যায় শাসন করিত। কিন্তু গোপনে সে সতীশকে কতখানি ভালবাসিত তাহার নিদর্শন পাই তাহার সেবা যত্নের ভিতর দিয়া। সাবিত্রী ভালবাসার প্রতিদান কোনদিনই চাহে নাই। ভালবাসিয়াই শুধু ক্ষান্ত হইয়াছে। শেষে একদিন সে সতীশকে জানাইয়াছে যে "এ জীবনে এই অপবিত্র দেহটা দিয়া তোমার পূজা করিতে পারিলাম না, কিন্তু আমি জীবনে মরণে তোমারই রহিলাম।"

ইহারা সমাজে অনাদৃতা, উপেক্ষিতা, ও স্নেহবঞ্চিতা কিন্তু মনুষ্যত্বের খাঁটি আদর্শে যে ইহারা কাহারও অপেক্ষা হীন নয়, ক্ষুদ্র নয়, শরৎচন্দ্র তাঁহার রচনার মধ্যে বার বার তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। এই যে পতিতারা, ইহারা যেন জীবনের চরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছে। তাহারা তাহাদের প্রেমাস্পদকে অতি নিকটে পাইয়াও ভোগ করিতে পারে নাই কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা নিজেদের অতৃপ্ত মনে করে না। কলসী উজাড় করিয়া তাহারা প্রেম নিবেদন করিয়াছে অথচ তাহাতে রহিয়াছে কঠোর সংযম ও আত্মভোলা ত্যাগ। তাহাদের প্রেমে রহিয়াছে গভীর আবেগ কিন্তু আকাঙ্ক্ষা নাই; নীরবে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে কিন্তু কোথাও চাঞ্চল্য নাই। ইহাতেই ইহাদের বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব। এই একান্ত নিঃস্বার্থ প্রেমের কি কোন মূল্য নাই? যদি না থাকিত তবে সতীশের ও দেবদাসের চরিত্রের পরিবর্ত্তন আমরা দেখিতে পাইতাম না। যাহারা সতীশ ও দেবদাসের মত চরিত্রহীনকেও সংযমের পথে আনিতে পারে তাহাদের শক্তি না জানি কি অসাধারণ।

শরৎ-সাহিত্যের প্রতি পংক্তিতে স্ত্রী জাতির উপর তাঁহার সহানুভূতি যেন উঁকি মারিতে দেখা যায়। পরাধীন বাংলার অধঃপতিত সমাজের অধিকতর পরাধীনা অসহায়া অন্তঃপুরচারিণীদিগের অন্তরের মূক বেদনা তিনি ভাষায় মূর্ত্ত করিয়াছেন। তাহাদের দুর্গতিপূর্ণ জীবনের সকল সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলিকে নিবিড় সহানুভূতির রসরাগে সাহিত্যে বাস্তবরূপে সত্য করিয়া তুলিয়াছেন। বঞ্চিত-স্নেহ ও উপেক্ষিত প্রেমের নির্দয় আঘাতে বিপর্য্যস্তা সংযত ধৈর্য্যকে বিনম্র শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়া মহিয়সী করিয়া তুলিয়াছেন। কত গভীর অনুভূতি দিয়া তিনি যে বাংলার বিভিন্ন স্ত্রী-চরিত্রগুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা তাঁহার সাহিত্যের প্রতি ছত্রেই পরিদৃষ্ট হয়। এই হীনবল স্ত্রী জাতির জন্য প্রাণে তিনি কত গভীর বেদনাই না অনুভব করেন! সমাজের নিষ্ঠুর অনুশাসন সর্ব্বকালেই ছিল, আজও নাই তাহা বলা চলে না। সমাজ চিরদিনই মানুষকে তাহার রক্ত চক্ষু দেখাইয়া

শাসন করিয়া আসিয়াছে ; তাহাদিগকে লক্ষ নিষেধের ডোর বাঁধিয়া জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। চতুর্দ্দিকে সমাজের এই তাণ্ডব লীলা দেখিয়া, তিনি সমাজের বিরুদ্ধে শেষে যুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সমাজ যাহাদিগকে কোন রূপেই স্থান দিবে না, তাঁহার হৃদয়ের করুণা তিনি নিঃশেষে তাহাদিগকে বিলাইয়া দিয়াছেন। তাই যখন তিনি কোন পতিতার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেখানে তাহার নারীত্বের ও সর্ব্বোপরি তাহার মানবত্বের সত্যরূপই তিনি দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচনার মধ্যে দেখা যায় যে পতিতার উপরই তাঁহার স্নেহ অধিকতর প্রগাঢ়।

শরৎচন্দ্র নারীকে তার চিত্তের সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃত্তি দিয় আঁকিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত নারী চরিত্রেই আমরা তাহা দর গভীর আত্মসম্মান জ্ঞান দেখিতে পাই। যখনই কেহ তাহাদের কোন অবমাননা করিয়াছে তখনই তাহারা তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ লইয়াছে। এই আত্মসম্মান জ্ঞানের দৃষ্টান্ত পাই কিরণময়ী, কমল, পার্ব্বতী, চন্দ্রমুখী, বিজয়া প্রভৃতির চরিত্রে।

কিরণময়ী উপেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল। নারীর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইলে সে যে অতি ভীষণ আকার ধারণ করে, চরিত্র দর্শনের ইহা একটি বড় কথা। তাই উপেন্দ্রের উপর কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ লওয়ার উদ্দেশ্যে সে দিবাকরকে লইয়া আরাকানে পলাইল।

হারানচন্দ্র যখন মৃত্যু শয্যায়, অনঙ্গ তখন তাহার ডাক্তার-বিদায়ী বলিয়া কিরণময়ীর হৃদয় পাইতে চাহিয়াছিল। ইহাতে কিরণের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল যথেষ্ট, কিন্তু কিরণময়ী ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তারকে দিয়াছিল আরও কঠিন আঘাত ; যে আঘাতের বেদনা অনঙ্গ ডাক্তার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মনে রাখিবে।

কমলের নিকট বিবাহ অনেকগুলি দৈব ঘটনার মত একটি ঘটনা বিশেষ। ইহারই ভুল অথবা দুর্ভাগ্য লইয়া একজন নারীর পূর্ণ মনুষ্যত্ব মাপা যায় না। কমল নিরন্তর সমাজের বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক মতবাদ প্রচার করিয়াছে বলিয়াই সে যে সহজেই সকলের উপভোগের সামগ্রী হইতে পারে ইহা মনে করাও অত্যন্ত ভুল। শিবনাথের বঞ্চনার পর হইতে কমল কি ভাবে দিনপাত করিয়াছে এবং কতখানি তেজ থাকিলে তাহা সম্ভবপর হয় তাহা আর নূতন করিয় বলিতে হইবে না। শিবনাথের বঞ্চনার জন্য সে কাহাকেও দায়ী করে নাই, কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নাই।

দেবদাস পার্ব্বতীকে যখন জানাইয়া দিল যে বংশ হিসাবে তাহারা অনেক ছোট এবং পার্ব্বতীর জন্য সে পিতামাতার বিরূপভাজন হইতে পারিবে না। পার্ব্বতী সে সংবাদ কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা আমাদের জ্ঞাত নহে। কিন্তু এই দারুণ অবমাননার প্রতিশোধ সে লইল যে দিন দেবদাস পুকুরঘাটে পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার সম্মতি তাহার নিকট চাহিয়াছিল।

চন্দ্রাকে যে দিন দেবদাস বলিল "লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, অত্যাচার ও উপদ্রব স্ত্রীলোকে যে কত সইতে পারে তোমরাই তার দৃষ্টান্ত।" সেই দিন চন্দ্রমুখীর সুপ্ত আত্মসম্মান সহসা চেতনা লাভ করিল। সে তাহার দোকান পাঠ তুলিয়া দিয়া কোথায় অশথঝুরি গ্রামে গিয়া অজ্ঞাত বাস করিতে লাগিল।

বিলাসবিহারী সময় অসময়ে নিতান্ত অভদ্রের মত বিজয়াকে অবমান করিত। বিজয়া সমস্ত সহিয়া সেই দিন তার প্রতিশোধ লইল যে দিন গৃহভৃত্য নায়েব গোমস্তার সম্মুখে বিলাসকে সে সামান্য চাকরমাত্র বলিতে দ্বিধা করিল না।

তারপর সতীত্ব ও নারীত্ব।

সমাজে সতীত্বের মূল্য বড় অসাধারণ। যৌন শুদ্ধাচারের মূল্য আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে সর্ব্বব্যাপী করিয়া কোন ফল হয় না। যদিও এই শুদ্ধাচারের উপর সমাজের অনেক সুখ দুঃখ নির্ভর করে কিন্তু তাহার বিনিময়ে অপরের জীবন ব্যর্থ করিবার কোন অধিকার কেহ কখনও দান করে নাই। নারীত্ব সতীত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব যাহাকে আমরা নারীত্ব বলি তাহা সতীত্বের সহিত একান্ত এক নহে। পরন্তু ইহা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাঙ্গীন সে কথা সমাজ এবং সাংসারিক দিক দিয়া না হউক অন্ততঃ সাধারণ বুদ্ধির দিক দিয়া সকলেই সহজে অনুমাণ করিয়া লইতে পারে। কেবল দেহের উপর সতর্ক প্রহরা রাখা স্ত্রী জীবনের চরম সার্থকতা নহে। তথাকথিত সতীত্বের চিরকালই নারীত্বের নিকট পরাজয় হইয়াছে। যদিও সামাজিক নীতি নারীর নারীত্বকে দাবাইয়া রাখিবার প্রয়াসই পাইয়া থাকে, কিন্তু

সুযোগ পাইলে নারীত্ব মাথা নাড়া দিয়া উঠিবেই। নারীর নারীত্বই একমাত্র তাহাকে তাহার পূর্ণ সম্মান দিতে পারে। যে নারী অন্তরের বিকাশোন্মুখ নারীত্বকে দাবাইয়া সমাজে সতীত্বের পতাকা উড্ডীন করে, প্রকৃত পক্ষে সে যে কি পরিমাণ আত্মবঞ্চনা করিল, তাহা অন্তের চক্ষে যত ক্ষুদ্রই হউক নিজের জীবন এই ভ্রমের মূল্য দিতেই কাটিয়া যায়। যাহারা অতি শৈশব হইতে নিজেদের চতুষ্পার্শে সংযমের প্রাচীর গড়িয়া তোলে তাহারা যে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিল তাহা নহে। যৌবনের চপলতা তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবেই কিন্তু সংযমের নিগড়ে নিজের হস্তপদ শৃঙ্খলিত রাখার জন্য উহা কিছু বিলম্বে আসিবে। এবং কখনও কখনও এত বিলম্বে আসে যে তখন মন যুবা থাকিলেও দেহ যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

"দেনা পাওনার" ষোড়শী পরিপূর্ণা যুবতী। জীবানন্দের সহিত সম্যক পরিচয় হইবার পর তাহার মনে প্রবল এক দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল তাহার দেবীত্বের সংস্কারে ও পরিপূর্ণ নারীত্বের আকাঙ্ক্ষায়। শেষে নারীত্বেরই জয় হইল। দেবী ষোড়শী মানুষের সংসারে তাঁহার নারী চরিত্রের স্বাভাবিক বৃত্তি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও মানসিক দ্বন্দ্বের নিকট সামাজিক বাধা যে কত তুচ্ছ তাহার আর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় শেষ-প্রশ্নে মনোরমার চরিত্রে। কমল ও শিবনাথের সহিত পরিচয়ের পর মনোরমার পক্ষে প্রাচীন আদর্শকে চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই নারীত্বের তাড়নেই যুবতী কুমারীগণ কোন কোন পুরুষের গুণে মুগ্ধ হইয়া অভিভাবকের অলক্ষ্যে তাহাদিগকে পতিত্বে বরণ করে।

সাহিত্য রচনার প্রধাণতঃ উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমতঃ রস-সৃষ্টি, দ্বিতীয়তঃ সমাজের উন্নতি সাধন করা। রসসৃষ্টি হয় বিভিন্ন চরিত্রসৃষ্টির মধ্য দিয়া। বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যে রসের অনাধিক্য নাই সত্য কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের সম্যক অভাব অনেক স্থলেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রত্যেক উপন্যাসেই মানুষের ভয়, ভক্তি স্বর্গ নরক মিলাইয়া এক অপূর্ব্ব রসের প্লাবন আনিয়াছে; শুধু তাহাই নহে, তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাসে সমাজ-সংস্কারের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পরিস্ফুট রহিয়াছে। তিনি সমাজের প্রচলিত রীতির সংস্কার চাহেন, আমূল পরিবর্ত্তন চাহেন না। মিথ্যা ব্রহ্মণ্য ও কৌলিন্যকে কোন দিনই তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। তাঁহার লেখার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নিজেকে লেখার মধ্যে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছেন। যে স্থানে তিনি ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশে বিরত রহিয়াছেন সেখানে চরিত্র-সৃষ্টির বা গল্পের পরিণতির মধ্যে আমরা তাঁহার বক্তব্যকে ধরিয়া লইতে পারি।

সমাজ সংস্কারের জন্য লেখনি ধারণ করা ও জীবন্ত বিষধর সর্প লইয়া খেলা করা একই ব্যাপার। কারণ কখনও নিজের ক্ষণিক অসাবধানতার জন্য সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতে পারে। প্রথম যখন তাঁহার "চরিত্রহীন" এবং পরে "গৃহদাহ" প্রকাশিত হয়, তখন ঘরে বাহিরে শরৎচন্দ্রের সমালোচকের অভাব ছিল না। কিরণময়ী ও অচলার অতখানি অধঃপতনের পরও পুনরায় সমাজে তাহাদিগের তুলিয়া লওয়া ঐ সমস্ত সমালোচকের চক্ষে কত গর্হিত হইয়াছিল তাহা ঐ সময়ের দু-এক খানি সমালোচনা পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়। বিশেষ করিয়া ঐ দুইটি চরিত্র অঙ্কিত করিয়া তিনি নাকি সমাজের শান্ত সহজ আবহাওয়ার মধ্যে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি নাকি সমাজের দৃঢ় ভিত্তির মূলে তাঁহার এই রচনার দ্বারা কুঠার আঘাত করিয়াছেন। তাহার উপর যখন তাঁহার শেষ প্রশ্ন প্রকাশিত হইল তখন তাঁহাকে দেশ ছাড়া করিতে পারিলেই সমালোচকদল অধিক সুখী হইতেন। তিনি বরাবরই সমাজের মিথ্যা সংস্কার ও রক্ষণশীল প্রকৃতির বিরুদ্ধে। বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতির উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া তিনি "দেবদাস" রচনা করিয়াছিলেন। পার্ব্বতীর যে দেবদাসের সহিত বিবাহ হইল না তাহার মূলে রহিয়াছে সমাজের অন্যায় বিবাহ-বিধির সংস্কার এবং এই সংস্কারের ফলে মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হয়।

কমল চরিত্রের সমালোচনার ত আর আদি অন্ত নাই। সমালোচকদের বুঝিয়া লওয়া উচিত যে নিকট ভবিষ্যতে যে সমাজ-বিপ্লব আরম্ভ হইবে—যাহার বীজ বহু

পূর্ব্বে রোপিত ও অঙ্কুরিত হইয়াছে—যাহার সংঘাতে পুরাতন রক্ষণশীল ও কুসংস্কারপূর্ণ হিন্দুসমাজ হইয়া পড়িবে দিশাহারা, ব্যতিব্যস্ত ও পঙ্গু, তাহারই পুঞ্জীভূত শক্তি নিহিত আছে এই কমল-চরিত্রে। সমাজের শান্ত সহজ আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া সে সমস্ত ওলোট-পালট করিয়া দিবে। সে আসিবে প্রলয়ের ধ্বংসকারী শক্তি লইয়া। পুরাতনের প্রতি আমাদিগের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে সে নির্ম্মম ভাবে আঘাত করিয়া, যে ছন্নছাড়া ভাব নিত্য নূতনের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায় যে সমাজের নিষেধের গণ্ডী প্রতিক্ষণেই উল্লঙ্ঘন করিতে চায়, তাহাকে সে সসম্মানে পূজা করিয়া গৌরবের সুউচ্চ শিখরে স্থাপিত করিবে। কমল চিরদিনই যে প্রাচীন-পন্থীদিগের শত্রুতা উপেক্ষা করিয়া নিজের মতবাদ প্রচার করিয়াছে, তাহাতে শতযুগব্যাপী অন্ধ সংস্কার ভাঙ্গিয়াছে। লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত হইয়াছে। সমাজ বুঝিয়াছে নারীকে এতদিন যেভাবে দাবাইয়া রাখা হইয়াছে তাহার কোনই অর্থ নাই। তাহার জীবনেও সন্তান প্রসব করা অশিক্ষিতা মাতা হওয়া অপেক্ষা আরও মহত্তর ও বৃহত্তর কর্ম রহিয়াছে। সমাজ মানুষের সৃষ্টি। যুগে যুগে সমাজ-বিপ্লব আসিয়া তাহাতে সঞ্চিত কৃত্রিমতা ও কুসংস্কার বিনষ্ট করে তখন তাহার ঘটে বিধি-নিষেধের পরিবর্ত্তন। শরৎচন্দ্র সেই নবযুগের অগ্রদূত। তিনি ঐ সকল কৃত্রিমতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লোকের মনোভাব নূতন আলোকে গঠিত করিতে চান। সমাজে উপেক্ষিত নির্য্যাতীতা নারীর অন্তরের বিদ্রোহকে তিনি রূপায়িত করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিশেষ করিয়া তাহার স্ত্রীচরিত্র বিশ্লেষণ পটুতা ও নারী প্রীতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। শুধু বলিতে ইচ্ছা করে—

"সনাতন সমাজের যোগ্য কশাঘাতে মহামহিমাতে
গড়িয়াছ মূর্ত্তি নারীত্বের
তোমারে শুধু অন্তরের জানাই প্রণাম।"

শ্রীকনককান্তি ঘোষ

সনেট

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

সত্যই আসিয়াছিল ঘনাইয়া অন্ধকার রাশি,
সত্যই নিকটে যেন এসেছিল সর্ব্ব অবসান ;
কৃপা দানে অনুক্ষণ ব্যগ্র তার স্নেহময় প্রাণ,
পেয়েছিনু কৃপা তার,—তারাও যে পায় যারা দাসী।
নীরবে সে এসেছিল গোধূলিতে বাজাইয়া বাঁশী,—
পুষ্প সম শোভাময়, নিষ্কলঙ্ক সত্যের সমান ;
ছিন্ন ভগ্ন যৌবনের বক্ষে মোর নিয়েছিল স্থান।
দেখিনি তাহারে, শুধু বুঝেছিনু তার মৃদু হাসি।

কহিল সে, "ভগবান রক্ষিবে তোমারে বন্ধু মোর !"
তারপর চুমিল সে শুষ্ক, তপ্ত নয়ন, অধর।
শান্তিময়ি মৃত্যু, মোরে আরবার করগো চুম্বন,
এখন আসিয়া মোরে মুগ্ধ কর পরশে তোমার ;
যতক্ষণ প্রাণে মোর আছে এই মধুর স্বপন—
হৃদয়ের স্বর্গ সহ লহ তুমি হৃদয় আমার।

পি, বি, মার্স্টন

বে-চা-রা !

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

পতিতপাবন উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষার ওধারে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, তাই বলিয়া উচ্চ আশা যে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল একথা মনে করিলে বিশেষ ভুল করা হইবে। আজকালকার বাজারে তার দাম কি পরিমাণ হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে তার নিজের কোনো স্পষ্ট ধারণা না থাকায় অবলীলাক্রমে সে আপনাকে অত্যন্ত কাজের লোক মনে করিত। এমন কি আপনাকে অমূল্য ভাবিতেও তার বাধিত না।

তাই যখন পেস্কার বাবুর মেয়ে নীহারকণাকে সে ভালো বাসিয়া ফেলিল তখন বিবাহের ব্যাপারটাকেও অসম্ভব মনে করিতে পারিল না কিছুতেই। চুলগুলাকে ব্যাক্‌ব্রাশ্‌ করিয়া যখন-তখন নীহারদের বাড়ীতে গিয়া তার মাকে মাসীমা মাসীমা করিয়া আত্মীয়তা করিবার সময় সে কল্পনা করিয়া লইত যেন সে ও পরিবারের জামাই হইয়াই গেছে।

নীহারকে ভবিষ্যৎ সঙ্গিনীর উপযুক্ত করিয়া লইবার জন্য সে যখন-তখন শাসন করিত, শিশিবোতল বিক্রীর পয়সা হইতে খাতা কিনিয়া দিয়া তাহাতে আধুনিক গান লিখিয়া বলিত—গা!

ইতিপূর্ব্বে কোথা হইতে সঙ্গীতবিদ্যা কিঞ্চিৎ আয়ত্ত করিয়া পতিত হইয়া গিয়াছিল গানের মাষ্টার, এবং নীহার তার ছাত্রী।

কলিকাতার উপকণ্ঠে যে যায়গাটায় তাহাদের বাড়ী সেখানে সঙ্গীতশিক্ষকের বিশেষ অভাব ছিল, অথচ গান জানা না থাকিলে বিবাহ হওয়া দুরূহ মনে করিয়া অনেক কন্যার পিতারই টনক নড়িয়া উঠিয়াছিল, কাজেই পতিতপাবনের শিষ্যা সংখ্যা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল।

পল্লীর দশ এগারো বৎসরের মেয়ে-মহলে পতিতের খ্যাতি ও খাতির দেখিয়া তার সমবয়সী যুবকমহলে গাত্র-দাহ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কোমলকণ্ঠে 'পতিতদা' 'পতিতদা' ডাক শুনিয়া পতিতপাবনও মনে করিতে লাগিল সে Lady's man হইয়া গেছে।

অভিভাবকদের তরফ হইতে পতিতকে এতটা বিশ্বাস করিবার কারণ পতিতের রূপ ও শ্রী বলিয়া কিছু ছিলনা, বাঙালীর মধ্যে তাহাকে কাফ্রী বলিয়া ভুল করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং কোনো মেয়ে তাহাকে কখনো ভালো-বাসিতে পারিবেনা সকলেরই এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু পতিত সেইসব দুগ্ধপোষ্য বালিকাদের প্রেমে পড়িয়া গেল, বিশেষ করিয়া নীহারের, কারণ সে পনেরো পার হইয়া ষোলয় পা দিয়াছে, তার চেহারাও খুব খারাপ বলা যায়না।

পতিত নিজেই গড়িতেছে, নিজেই ভাঙিতেছে, নীহার-দের বাড়ীর কাহারও কথাটা জানিবার উপায় ছিলনা। প্রকাশ করিয়া দিল অজয়, ঈর্ষাবশতঃই বলিতে হইবে। অজয়ের মা সেলাইয়ের কাজ করিয়া যা উপায় করে তাহাতেই সংসার চলে, অজয়ের দিন যায় পাড়ার ক্লাবে মোড়লী করিয়া। পতিত নিজেকে অভিজাত সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া পরিচয় দেয়, বালিগঞ্জে ও টালিগঞ্জে তার ছাত্রী আছে বলে, অজয়ের সে সব অসহ্য ঠেকে। সে-ই একদিন নীহারের মাকে জানাইয়া দিল পতিতের ভয়ানক ইচ্ছা নীহারকে বিয়ে করার, এবং সে নাকি চতুর্দ্দিকে ঐ কথা রটাইতেছে।

নীহারের মা সুনীলা পতিতকে ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নীহারকে তুমি বিয়ে করতে চাও?

থতমত খাইয়া গেল পতিত; এ প্রস্তাব, না কৈফিয়ৎ তলব? অল্পবুদ্ধিতে মনে করিল প্রস্তাবই, শুধু তার সম্মতির অপেক্ষা।

তাই মাথা চুলকাইয়া বলিয়া উঠিল—নিজের হাতে ওকে গান শিখিয়ে মানুষ করেছি, নাচও শেখাচ্ছি আজকাল।

অর্থাৎ আমার মানসীকে আমি বিবাহ করিব এ আর বেশী কথা কি!

সুশীলা স্পষ্ট জবাব চায়। বলিল, বিয়ে করবার ইচ্ছে আছে?

পতিত ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

সুশীলা বলিল, নীহারকে বলেছ কোনদিন ও কথা?

ভয় পাইয়া পতিত বলিল—না।

সত্য কথা বলিতে কি, বলিয়াছে। নীহারও জবাব দিয়েছে, মাকে বলে দোব, কিন্তু বলিয়া দেয় নাই।

সুশীলা গম্ভীর হইয়া জানাইয়া দিল, আশা ছাড়ো পতিত। তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে কখনো হবে না। তুমি মুখ্যু, আমি বিদ্বান জামাই চাই। আমি চাই বি-এ পাশ, কলকাতায় বাড়ী আছে, বাপ বড় চাকরী করে, ছেলে রোজগার করে দেখতে শুনতে ভালো। তোমার সঙ্গে কিছুতেই হবে না। তোমার আর গান শিখিয়ে কাজ নেই। কখনো যদি শুনতে পাই তুমি ওকে বিয়ে করবার কথা কাউকে বলেছ, আর বাড়ীতেও আসতে দোব না; যাতে ওকে চোখের দেখাও না দেখতে পাও তার ব্যবস্থা করব। যাও।

পতিত নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

সুশীলাকে একদিন সে জানাইয়া দিয়া গেল, সে আবার পড়িতেছে, প্রাইভেট ম্যাট্রিক্ দিবে, তারপর আই-এ, তারপর বি-এ।

অর্থাৎ তুমি যেমন জামাই খুঁজিতেছ, আমি তেমনি হইব।

সুশীলা মনে মনে হাসিল, ততদিন অপেক্ষা করিতে গেলে, মেয়ের বয়স ছত্রিশ হইয়া যাইবে। তাছাড়া পতিতের মত জামাই, ছোঃ!

বয়স হইয়া গেলে কখনো পড়া হয়? পতিতের পড়া মোটেই অগ্রসর হয় না।

নীহার গোপনে পরামর্শ দিল, ভালো চাকরী যোগাড় কর, অনেক টাকা যদি মাইনে হয়, বাড়ী গাড়ী যদি করতে পারো, মুখ্যু হলেও মা হয়ত বিয়ে দেবে।

সুপরামর্শ সন্দেহ নাই। পাড়ার একটি লোককে ধরিয়া-করিয়া অনেক কষ্টে সে এক বাঙ্গালী-সাহেবের অফিসে কাজ যোগাড় করিল। সব দোয়াতে কালী ভরিতে হইবে, লাল ও কালো, মাহিনা সাত টাকা।

পতিত নীহারকে বলিল, আজ সাত টাকা, হঠাৎ সাহেবের নজরে পড়িয়া যাইতে পারিলে সাতশো টাকা হওয়াও বিচিত্র নয়। মার্চেন্ট অফিসের ঐ সুবিধা। সেখানে কাজের খাতির!

পতিত রোজ অপেক্ষা করে, সাহেব আজ বুঝি আসিয়া বলিবে, এত সুন্দর করে কালী ভরে কে? এই ছেলেটি? একে এত নীচু কাজে রেখেছ? ভালো কাজে দাও। মাইনে হোক দেড়শো।

কিন্তু তার পরিবর্তে সাহেব আসিয়া একদিন ধমক দিল, আমার দোয়াতে কালী রাখা হয় কেন? সাতশোবার বলেছি আমার ফাউন্টেন পেন আছে, কালীর দরকার নেই। সার্টের কফটা কালীতে নষ্ট হয়ে গেল। কে দেয় কালী? চাবধাবে ছড়িয়েছে?

যে দেয় সে কাঁপিতেছিল, সৌভাগ্যের বিষয় সাহেব তাকে দেখিবার জন্য জিদ করিলনা।

পাড়ার সেই লোকটির অফিসে কিছু খাতির ছিল, বড়বাবুকে বলিয়া সাহেবের জামাঝাড়ার কাজে লাগাইয়া দিল।

সাহেব আসিয়া কোট খুলিয়া রাখিলে সে গিয়া ঝাড়ে। আশা করে কোনদিন হয়ত সাহেব বলিবে, কে জামা ঝাড়ে হে? চমৎকার কাজ!

সাহেব বলে না। সাহেব খাসকামরা হইতে বাহির হইয়া এধার ওধার যাইবার সময় পতিত কাসে, হঠাৎ যদি নজর পড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করে, কে এ ছেলেটি? বেশ স্মার্ট, সুন্দর চেহারা। একে অ্যাসিষ্ট্যান্ট করে নিতে হবে।

উল্টা উৎপত্তি! একদিন সাহেব বড়বাবুকে ডাকিয়া ধমক দেয়, ও একটা লোক অনবরত কাসছে। ওকে ছুটি দাও, নয়ত ব্যর্গয়েনের পিল দাও একটা চুক্‌ক্। বড় কাজের ক্ষতি হচ্ছে।

অগত্যা পতিতকে কাশি থামাইতে হয়।

পতিত বলে, হে ভগবান্, সাহেবকে একবার বিপদে ফেল, আমি বাঁচাই। চিরজীবনের কৃতজ্ঞতার ঋণ মোটা চাকরী দিয়া শোধ করিবে।

ভগবান তার কথা শুনিলেন। একান্ত আকুলতায় সে ডাকিয়াছিল। অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ।

একদিন লেকের ধারে সে বেড়াইতে গিয়াছে, হঠাৎ দেখে দ্বীপের মত জায়গাটা হইতে পিছলাইয়া কে জলে পড়িয়া গেল। পতিত চকিতে দেখিয়া লইল—সাহেব!

চক্ষের নিমেষে পতিত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সাহেব সাঁতার জানেনা, হাবুডুবু খাইতেছে।

পতিত ডুব মারিয়া তার ঠ্যাংটা ধরিয়া টানিল, চুল ধরিয়া খানিকটা টানিয়া আনিল, গলাটাকে টিপিয়া ধরিয়া খানিকটা তুলিল। সাহেব তাহাকে জড়াইতে চায়।

লাথি ঠিক বলা যায় না একটু পা দিয়া ধাক্কা মারিতে হইল, তারপরেই কায়দা করিয়া হঠাৎ সে সাহেবের লম্বা কানটা ধরিয়া টানিয়া তীরের দিকে লইয়া আসিল। ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া অজস্র লোক চীৎকার করিতেছে, সাহেবের মেমসাহেব, মেয়েরা ও ছেলেরা হাঁকপাঁক করিতেছে।

এক পেট জল খাইয়া, হাঁপাইয়া, কাঁদিয়া, হাঁচিয়া সাহেব যখন উন্মাদপ্রায় অবস্থায় দাঁড়াইবার জায়গায় আসিয়াছে তখন নেকটাইশুদ্ধ কলারটা ধরিয়া পতিত তাহাকে টানিয়া তীরে তুলিল।

লাইফ্ সেভিংএ তারও বহুত পরিশ্রম হইয়াছে কিন্তু সাফল্যগৌরবে ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় সে সব-কিছু অগ্রাহ্য করিয়া সাহেবের সাম্নে আসিয়া দাঁত বাহির করিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া বলিল, নোন্ ফেস্। কোথায় দেখেছি যেন?

সেলাম করিয়া পতিত বলিল, আপনারি আপিসের এম্প্লয়ী।

সাহেব বলিল, তুমি যেতে পারো।

সমস্ত রাত্রি আনন্দের আতিশয্যে পতিতের ঘুম হইল না। স্থির করিল, পুরস্কার দিতে আসিলে সে লইবে না, গ্রহণ করিবে প্রমোশন, একেবারে পাঁচশো টাকার গ্রেড্। সুখবর লইয়া একেবারে নীহারের সঙ্গে দেখা করিবে এবং পরামর্শ করিবে শুভ পরিণয়টা কোন্ শুভ তারিখে।

পরদিন সাহেব তাহাকে সেলাম দিল।

পতিত গিয়া দাঁড়াইতেই বলিল, তুমি কাল আমায় বাঁচিয়েছ?

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া পতিত বলিল—দ্যাট্ ইস্ নাথিং স্যার। কর্ত্তব্য করেছি মাত্র।

মুখ খিঁচাইয়া সাহেব বলিল, কর্ত্তব্য করেছ? অত লোকের সাম্‌নে আমার ঠ্যাং টেনে লাথি মেরে চুল ধ'রে কাণ টেনে—ইউ ইডিয়াট, তোমাকে আমি পুলিশে দেব। আমার মানহানি করেছে—

সাহেব টেলিফোনের রিসীভার তুলিয়া লইয়া একটা নম্বর বলিল, তারপর যখন কহিল, বড়বাজার থানা?—তখন পতিত অদৃশ্য হইয়াছে।

বাড়ী আসিয়া শুনিল, সেই দিন নীহারের পাকা-দেখা হইয়া গেল; সম্বন্ধ—কামারপুরের ছ-আনী বাবুদের ছটা ছেলের কোন একটার সঙ্গে।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

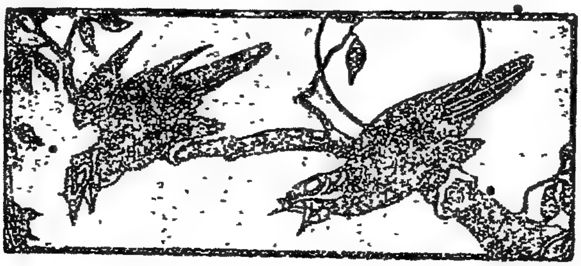

শান্তি-বীথি

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

বড় রাস্তার ওপর নিত্য কলগুঞ্জরণ মুখর একখানি চায়ের দোকান।

ক্ষণিকের আলাপ। পথ চল্‌তে চল্‌তে নামলো আষাঢ় আকাশে বর্ষণধারা—আশ্রয় লাভের আশায় ঢোকা গেল চায়ের দোকানটিতে। ছোট একখানি সাইনবোর্ড বাহিরে ঝোলানো আছে 'শান্তি-বীথি'। সাইনবোর্ডখানার ভেতরও নামের অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে—বাংলাদেশের সজল সরস কাব্য-আবহাওয়া থেকে চায়ের দোকানের সত্বাধিকারী নিজেকে বোধ হয় বঞ্চিত রাখেননি—তাই তাঁর চায়ের দোকানেরও অমনি একটা পোয়েটিক নামকরণ করেছেন।

সাইন্‌বোর্ডের ডিজাইন্‌ সহজেই চোখে পড়বার মতো। শ্যামল শ্রীযুক্ত একটি বৃক্ষ—ডাল-পাতার অন্তরালে বসে আছে সবুজ রংএর একটা পাখী—পাশ দিয়ে তার প্রবাহিত হয়ে গেছে ক্ষীণস্রোতা একটি নদী—তার ওপর ভাসমান একখানা নৌকা। শিল্পীর যে রসবোধ আছে তা প্রত্যেক কলা-রসিকই স্বীকার করতে বাধ্য।

ঘরে ঢুকতে সামনেই চোখে পড়ে, "আজ নগদ কাল ধার।" দেওয়ালের গায়ে সার দেওয়া যত রাজ্যের ছবি—উদ্ধৃত কবিতার লাইন। কালীঘাটের কালী, তারকেশ্বরের শিবমূর্ত্তি থেকে আরম্ভ করে পাল তোলা নৌকা, সন্ধ্যার ল্যাণ্ডস্কেপ, নোলক নাকে উর্ব্বশী, রাবণের সীতা অপহরণ, সিনেমার নট-নটী, স্যাণ্ডোর মাংশপেশী ইত্যাদি ইত্যাদি···

উদ্ধৃত কবিতার নীচে লাল সালুর 'পর সাদা বড় বড় অক্ষরে লেখা—কন্‌সেসন্‌। কন্‌সেসন্‌॥ বিরাট কন্‌সেসন্‌॥!

জোড়া মামলেট মাত্র তিন পয়সা—রুটি ব্যতীত সঙ্গে অপর কিছু লইতে হইবে।

একখানি ঘর—তাকে দুভাগে বিভক্ত করা। একদিকে হোটেল বিভাগ—দৈনিক ভাত খাবার ব্যবস্থা—দেওয়ালের গায়ে এক, দুই নম্বর দেওয়া, নীচে কয়েকখানি আসন পাতা। আর একদিকে রেষ্টুরেন্ট। মধ্যে দেওয়ালের গায়ে বিরাট একখানি বোর্ডের গায়ে বিবিধ প্রকারের ভোজ্যের লম্বা এক তালিকা:—

ভাত—	কালিয়া—	রোষ্ট	মামলেট—
ডাল—	মুড়িঘণ্ট—	ডেভিল—	পোচ—
চচ্চড়ি—	দৈ—	মোগলাই পরটা—	ডিমের কারি—
ভাজা—	চা—	মাংসের ষ্টু—	সরবৎ—
ঝোল—	চপ—	রুটি—	লস্যি—

ঝাল—কাট্‌লেট—পরটা—আমেরিকান কোল্ড-ড্রিঙ্ক

ডাল্‌না—মটন চপ্‌—পুডিং— ঘোলের সরবৎ—

ডাব এবং আর যা চান। ওপরে লেখা, ছপয়সার কম ভাত খাওয়া হয় না।

টিনের একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে শান্তি-বীথির শান্তিপূর্ণ স্নেহচ্ছায়ায় উপবেশন করা গেল।

এককাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে গম্ভীর ভাবে একটা সিগ্‌-রেট ধরালুম।

বাইরে চলেছে বৃষ্টির সমারোহ। বর্ষণধারা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। একে একে শান্তি-বীথির ডাল-পালা ভরে গেল খরিদ্দারের শুভাগমনে। সত্বাধিকারী নিজের চেয়ারটি পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

হাফ কাপ চায়ের সঙ্গে সঙ্গে গল্পের তুফান চলেছে।

ওদিক্‌কার এক কোন থেকে কে একজন প্রসঙ্গ তুললে—হ্যাঁ, গান যদি শুনতে হয় তো চলো গিয়ে লক্ষ্ণৌতে। আরে ছোঃ ছোঃ, বাংলা দেশের আবার গান তার আবার গাইয়ে!

পার্শ্ববর্ত্তী তারই একজন সহচর বললে সে কথা বলিস নি ভুতো, তুই ভুল করছিস, বাংলাদেশের ঢং যে অন্য। এই যে কাণা কেষ্ট, মাইরি কি গানে প্রাণ দেয় বলতো—পঙ্কোজ

মল্লিকের কি একখানা সুর—ওকি আর পশ্চিমের কাটখোট্টা তানটানের কথা ?

ভূতো রীতিমত উঠলো চটে—আরে যা যা—তুই কটা আসরে গেছিস—কটা গানই বা শুনেছিস্—গানের বুঝিস্‌ই বা কি ? তোদের ভালো লাগবে ওই—জীবন আমার বিফলে গেল—আরে ওর ভেতর সুরের কারসাজী—গলায় হিম্মৎ কোথায় ?

এদিকের একজন ভদ্রবেশী যুবক এবার এ আলোচনায় যোগদান করলেন—কলেজের গন্ধ যেন তাঁর গায়ে লেগে রয়েছে। বললেন, মশাই—'জীবন আমার বিফলে গেল—'বলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছেন কিন্তু এই কীর্ত্তন আর বাউল বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি। দীলিপ রায় বাংলা গানের জন্যে বিদেশে কি মর্য্যাদাই লাভ করেছেন।

ভূতো তীব্র প্রতিবাদ করে উঠ্‌লো—কিন্তু খেয়াল-ধ্রুপদ ? সে সব ওস্তাদি ব্যাপার—ক্লাসিক কাকে বলে। লক্ষ্ণৌতে ছিলাম—মন্নু খাঁ—অত বড় ওস্তাদ আর নেই—গাইলে একখানা খেয়াল—পায়েলিয়া ঝ্যারে—এই কটা কথাতেই মেরে দিলে পাক্কা তিন ঘণ্টা। কি গলার কাজ, কি গিটকিরি ! হুঁ হুঁ-হুঁ-উ করে ভূতো নিজেই খানিকটা টান এবং গিট-কিরির কসরৎ দেখিয়ে দিলে। প্রাণে যেন একেবারে ছুরি মেরে দিলে—

এদিকে তরুণ ভদ্রলোক বললেন—পশ্চিমে আপনি সুরই শুনেছেন, কিন্তু বাণী ? রবীন্দ্রনাথের আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন, অতুল প্রসাদের চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে—

ওদিক থেকে আর একজন বলে উঠলো—আরে রেখে দ্যান মশাই আপনার বাণী—গানের সুরই হচ্ছে প্রধান। ও ন্যাকা ন্যাকা কথা চোখের জল—বঁধু—চাঁদিনী রাত—ওরে আর গান কয় না, ওরে আপনি পদ্য কন্। কিন্তু গান কইলেই কইতে হয় সুরের কথা। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে শুনেছিলাম বটে এক যাত্রাওয়ালার মান-ভঞ্জন পালায়। কেষ্ট সাইজ্যা সখিরে ওরে আমার প্রাণ সখী—

থাক্ থাক্ মশাই, এখানে আমরা আপনার মানভঞ্জনের পালা শুন্‌তে আসিনি। আমাদের দেশেও বাংলা গানে রাধিকা গোঁসাই ক্লাসিক গেয়ে কম নামটা করে যান নি।

ভূতো তখন ভীষণ চটে উঠেছে, বলেন কি। কিসে আর কিসে। নিজ চোখে দেখা,—একটা বাড়ীতে লক্ষ্ণৌতে ইয়া-বড় এক সাপ, কেউ ভয়ে কাছে ঘেঁসতে পাবে না। মন্নু খাঁ গেল—ধরলো একখানা ভীমপলশ্রী। অমনি সাপ নেতিয়ে পড়লো, তারপর চললো বাড়ী ছেড়ে। স্বচক্ষে দেখা মশাই।

এ প্রসঙ্গ আর কতক্ষণ চলতো বলা যায় না, কিন্তু অকস্মাৎ মোড় ঘুরলো।

জলে ভিজতে ভিজতে কর্দ্দমাক্ত দেহে এক ভদ্রলোক এলেন—আর বলেন কেন। জচ্চুরি করে হারিয়ে দিলে। Semi final গেম মশাই, ক্লিন গোল, বললে অফ সাইড।

এ্যাঁ—হারিয়ে দিলে।

সমস্বরে চীৎকার—এ্যাঁ মোহনবাগান হেরে গেল। Hard lot ! আরে মশাই এতো জানা—it is a known fact ক্যালকাটা এবার sure I. F. A. Shield winner.

অত সোজা নয় মশাই—ওর নাম মহামেডান স্পোর্টিং—এ আর ছেলের হাতের মোওয়াটি নয়।

না মশাই, তা বলা যাচ্ছে না—রসিদ নেই এবার।

যান যান মশাই, রসিদ নেই রয়েছে নূরমোহম্মদ। কি aim। শট আর অব্যর্থ গোল—

ওদিক থেকে এক প্রৌঢ় বলে উঠলেন, খেলার আর এখন কি দেখছেন ? সে ষ্ট্যাণ্ডার্ডই নেই আর। সে দেখেছিলুম ১৯১১ সালে শিবে ভাদুড়ি আর বিজে ভাদুড়ি, কি combination একেবারে মাণিক জোড়।

সে সব ব্যাপারই আলাদা মশাই—এক দিকে গোষ্ট পাল বলাই চাটুজ্জে আর ও দিকে বেনেট্ নাইট্। গোষ্ট বলাইএর মাবের কায়দা কি—কারুর বাবার ক্ষমতা ছিল যে ফাউল ধরে, মারলে সট্, দিলে হেড, তিন দিকে তিন জন একেবারে ফ্ল্যাট্ !

ফুটবল গিয়ে এবার এলো সিনেমা।

গ্রেটা গার্ব্বো, মার্লিন ডিয়েট্রিচ্, কাননবালা, উমাশশী।

চণ্ডীঠাকুর এ কি সত্যি ! আরে ছোঃ কি ঢং ! কি এক্স্‌প্রেশন বল্‌তো গার্ব্বোর একখানা। এক চাউনিতেই মেরে দিলে। নাবদ আসছে বীণা বাজিয়ে মেঘের ভেতর দিয়ে, সে কি পশ্চার। রাম, রাম, হলিউড আর আমাদের দেশ।

বলিস্‌নে, যত রাবিশ্ এলিমেণ্টি! বেঁচে যদি থাকি তবে যাবো হলিউডে। সিনেমা-জগৎ গর্ব্বের সহিত দেখিস্ আমার নাম উচ্চারণ করবে।

তরুণদের দিক থেকে আলোচনা এবার ঘুরলো বৃদ্ধের দিকে। হ্যাঁ সাহেব ছিলেন জ্যেটি, একেবারে খাস ইংরেজ। নজর কি! ওকেই বলে বড় সাহেব!

সেবার বিলেত যাবার সময় আমাকে privately ডেকে বল্লেন, তোমাকে বড্ডই ভালোবাসতুম। তোমার মতন এমন কাজের লোক আমি নেটিভদের ভেতর অতি অল্পই দেখেছি। তা What can I do for you Bepin ?

আমি বললুম, কি আর চাইবো সাহেব, একমাত্র ছেলে আমার এইতো ম্যাট্রিক পড়ছে—

বল্লে, Very well, পাশ করবার পর তাকে বিলেত পাঠিয়ে দিও। এই নাও আমার ঠিকানা। I will bear all his expenses there.

হ্যাঁ? বল্লে? Very generous সাহেব তো—

বলবেনা আবার! সাহেব তো নয় যেন আমার গত জন্মের বাপ্। অনেক তপস্যা করে দাদা, অমন বড় সাহেব পেয়েছিলুম।

তা পাঠালেনা কেন ছেলেটাকে—মানুষ হয়ে আসতো।

বৃদ্ধ চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুকটা মেরে বললেন, আরে শালা-ছেলে যদি তাই হবে তবে আর আমার এ কষ্টটা কেন? তিন তিনবার পড়ালুম, ম্যাট্রিকটাই পাশ করতে পারলে না। হারাম-জাদার আবার কাব্যি লেখা হয় স্কুলের অঙ্কের খাতায়! সেখা হচ্ছে অনাগত প্রিয়া। আরে প্রিয়া, প্রেম এ সবের বুঝিস কি? প্রেম প্রেম করে দেশের ছেলেগুলো উচ্ছন্নে গেল—

আর বল কেন দাদা, কি দিনকালই হোল! খবরের কাগজ খোল আর দেখ লেকে ডুব! আর আজকালকার মেয়েগুলিরই বা কি আক্কেল? আরে ছিঃ ছিঃ—

তারপর এলো রাজনীতি। অটোয়াপ্যাক্ট, বাংলায় কংগ্রেসের দলাদলি, সমাজনীতি অর্থনীতি, সাহিত্য, অতি-আধুনিক সাহিত্য, sex, and what not!

আমার চায়ের পেয়ালা তখন নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বাইরে বৃষ্টিও ধরে এসেছে।

শান্তি-বীথির অপর পার্শ্বে আরম্ভ হয়েছে, ভাত দুপয়সার তিন নম্বরে—সাত নম্বরে মাছের কালিয়া—পাঁচ নম্বর ন'পয়সা —একি মশাই জোচ্চুরি—ডালে কেন মেশানো কেন? ডালের পয়সা আমি কিছুতেই দোবো না—

এদিকে হাফ কাপের সঙ্গে বিঁড়ি সিগারেটের ধোঁওয়ার মৌতাতে আসর পরিপূর্ণভাবে জমে উঠেছে।

অর্থ-সমস্যা থেকে আরম্ভ করে কোন কিছুই বাদ যাবার উপায় নেই।

নট-নটীর জীবন-চরিত, প্রেমনীতি আজকের সমাজের যাবতীয় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তর্কজাল ক্রমশই ঘনীভূত হয়ে উঠছে।

ধন্য মহানগরীর এই চায়ের দোকান। ছেলে ছোকরা, তরুণ যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ সর্ব্বশ্রেণী নির্ব্বিশেষে শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র!

শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, চাকরে, ব্যবসাদার, বেকার এমন অপূর্ব্ব মিলন-কেন্দ্র সমাজে কোন আন্দোলনই সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না।

মাত্র দুপয়সার বিনিময়ে যে বিপুল অভিজ্ঞতার যে বিপুল জাগরণ এবং আত্মচেতনার পরিচয় পেলুম তাকে সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা জানিয়ে নেমে পড়লুম সন্ধ্যার মহানগরীর রাজপথে।

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

অপরূপ বেশ

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

তুমি সাজিয়াছ অপরূপ বেশে প্রিয়া
অশোকগুচ্ছ কর্ণে দুলিছে তব,
পদ্মমৃণাল ভুজলতা বেষ্টিয়া—
কালো কেশপাশে সাজে কুরুবক নব।
মেখলা রচেছ মালতীর মালা দিয়া
পদনখে ফোটে শ্বেত মল্লিকারাশি,
অলক্তকের রক্তিমা নিঙাড়িয়া
পুরুষরক্তে মিশায়ে দিয়েছ আসি'।
ছন্দে ছন্দে বাজে মঞ্জীরধ্বনি
চটুল নয়নে ঘুমের আলস ঢুলে,
বক্ষপদ্মে লুকায় বক্ষমণি,
আষাঢ়ের মেঘ নামে তব কালো চুলে।

*　　*　　*

দূর অতীতের উজ্জয়িনীর পাশে
বেপথু শীপ্রা যে বিরহ বেদনায়,
সেথা হতে তব সঙ্গীত ভেসে আসে
অতীতের বাঁশী আজো সেথা বেজে' যায়।
তুমি সাজিয়াছ—তুমি আজো সেই নারী,
সেই অপরূপ আশা-নিরাশার আলো,
মানসী আমার—আমি শুধু পথচারী
জানিনে তোমায় বাসি কিনা বাসি ভালো।
হাজার হাজার বছর কাটিয়া যাবে
কুন্দ কেতকী কুরুবক তুমি নিও,
তোমার আঁখির আলো আরো জোর পাবে,—
আমার আঁখির আকাশে জ্বালিয়া দিও।
যুগ যুগ আগে এঁকে গেছে কত কবি
যুগান্ত পরে আমিও আবার আঁকি
হে নারী—তেমনি আছে তো তোমার ছবি,—
মোর দৃষ্টির ভঙ্গিমা পড়ে ফাঁকি।
তোমায় আঁকিনু দেখিনু যেমন রূপে
ভালবাসা দিনু যেমন দিয়েছে তারা
তুমি নমস্যা—মোর জীবনের ধূপে
আরতি করিনু।—আবার আসিবে যারা
তাহাদের তরে রাখিলাম মোর ছবি,
মোর শেষ ছবি—তবু সমাপ্ত নয়,
যুগযুগান্ত আসিছে, আসিবে কবি
তাহাদের তুমি রহিলে গো অক্ষয়।

মহাভারতী

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর নব-প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'মহাভারতী'। গ্রন্থের ২৩টি কবিতার মধ্যে প্রথম ৩টি ও শেষ কবিতাটি মহাভারতের চারটি চরিত্র নিয়ে রচনা। সুতরাং পুঁথিটিকে ঠিক অম্বর্থনামা বলা যায় না; অনেকটা প্রথম গল্পের নামে গল্পের বই-এর নামকরণের মত। বাকী কবিতাগুলি নানা বিষয়ের। তাঁদের বিষয়, ভঙ্গী ও ছন্দের বৈচিত্র্যে পাঠকের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।

প্রাচীন কাব্যের, বিশেষ যেগুলি আদি কাব্য তাদের ঘটনা ও চরিত্র নিয়ে পরবর্ত্তী যুগের কবিদের কাব্য-রচনা নানা পথে চলেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের কবিরা মহাভারত ও রামায়ণ অবলম্বনে যে সব কাব্য লিখেছেন তাতে তাঁরা ঐ দুই আদি কাব্যের কোনও ঘটনাকে নানা নূতন কল্পনা দিয়ে নূতন করে বিবৃত করেছেন, চরিত্রগুলির কাব্যগত রস ও ওজন মোটামুটি বহাল রেখে। এ গ্রন্থের প্রথম দুই কবিতা 'কর্ণ' ও 'দুর্য্যোধন' অনেকটা সেই শ্রেণীর। এই দুই বীরের জীবনের সব চেয়ে 'ক্রিটিকাল' সময়ের ঘটনা ও তাঁদের মনোভাব তাঁদের নিজের মুখের কথায় ব্যক্ত করে এই দুই কাব্য রচনা। কিন্তু সে কাব্য হ'য়েছে অতিরিক্ত রকম 'মেলো-ড্রামাটিক'। মনে হয় এ শ্রেণীর কবি-কর্ম্ম কবি যতীন্দ্রমোহনের পরধর্ম্ম। তাঁর কবিত্বের স্বধর্ম্ম কি তার প্রমাণ গ্রন্থের তৃতীয় কবিতা 'ভীম'।

> সুবিরাট বরদেহে বর্ণ তব কষিত কাঞ্চন;
> বিপুল বাহুর শক্তি প্রচ্ছন্ন প্রমত্ত প্রভঞ্জন,
> আনত আপন বীর্য্যে; সর্জ্জ-সম দৃপ্ত সরলতা
> জানায় নিখিল চক্ষে দূর হ'তে বলিষ্ঠ বারতা।
> একাধারে ভীমকান্ত—দেহমনে ভীষণ-সুন্দর—
> প্রণতি তোমার পদে, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বৃকোদর।

কোনও ঘটনার বর্ণনা নয়, চিত্রিত চরিত্রের উক্তি নয়, কবির নিজের মুখের স্তুতি, অর্থাৎ 'লিরিক'। কবি যতীন্দ্রমোহনের কাব্য এখানে সার্থক।

মহাভারত ও রামায়ণের ঘটনাকে কিছু পরিবর্ত্তন করে, বা নূতন ঘটনা জুড়ে দিয়ে কোনও চরিত্রকে উদ্দিষ্ট রসোজ্জ্বল করে তোলার অধিকার সকল কবির-ই আছে। কিন্তু এ কবি-প্রচেষ্টায় যতীন্দ্রমোহন সব সময় সফল হন নি। একটা উদাহরণ দেই। 'কর্ণ' কবিতায় কবি কর্ণের মুখে বসিয়েছেন,—

> —আজ মনে পড়ে—রাজ-সভাতলে কৃষ্ণা-স্বয়ম্বর!
> পার্থের সেই অপমানে আজও জর্জ্জর অন্তর!
> কৌশলে জিনি' মৎস্য-চক্র,
> মোর পানে চাহি' হাসিয়া বক্র,
> ভুবনধন্য পাঞ্চালীধনে বরিল সে বর্ব্বর,—
> আজ মনে পড়ে সেই বঞ্চনা—কৃষ্ণা-স্বয়ম্বর!

অর্জ্জুনের 'বক্রহাসি' বা 'বঞ্চনার কৌশলে' লক্ষ্যবেধের কথা কি বাস্তবে কি কর্ণের কল্পনায় কোথাও মহাভারতে নেই। এবং এতে কর্ণ কি অর্জ্জুন কারও চরিত্রের কোনও কিছু উজ্জ্বল হয়নি। এর সঙ্গে তুলনা করা যাক দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে কর্ণের লক্ষ্যচ্ছেদের চেষ্টা ও তার পরিণামের মূল উপাখ্যানটি। যখন বহু রাজা ও যোদ্ধা লক্ষ্যবিদ্ধ করা দূরে থাক তার জন্য তৈরী ধনুটিতে গুণ আরোপণের চেষ্টাতেই বিক্ষিপ্যমাণ হয়ে স্রস্তকিরীটহার ও ধরণীতলস্থ হলেন

> সর্বান্ নৃপাংস্তান্ প্রসমীক্ষ্য কর্ণো ধনুর্দ্ধরাণাং প্রবরো জগাম।
> উদ্ধৃত্য তূর্ণং-ধনুরুদ্যতং তৎ সজ্যঞ্চকারাশু যুযোজ বাণান্॥

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত। সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং; ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

'তখন ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ কর্ণ রাজাদের অবস্থা দেখে ধনুর নিকটে গেলেন, এবং ঝটিতি সেই ধনু উর্দ্ধে তুলে তাতে গুণারোপণ ও বাণযোজনা করলেন।' তাঁকে দেখে পাণ্ডুপুত্রেরা মনে করলেন যে পৃথিবীর মধ্যে কর্ণই লক্ষ্যভেদ করে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য দ্রৌপদীকে লাভ করলেন।

দৃষ্ট্বা সূতং মেনিরে পাণ্ডুপুত্রা ভিত্ত্বা নীতং
লক্ষ্যবরং ধরায়াম।

তখন
দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈর্জগাদ নাহং
বরয়ামি সূতম্।
সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্য্যং তত্যাজ কর্ণঃ
স্ফুরিতং ধনুস্তৎ॥

তাঁকে দেখে দ্রৌপদী উচ্চকণ্ঠে বল্লেন—আমি সূতকে বরণ করবো না। কর্ণ সক্রোধ হাস্যে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করে সেই স্ফুরিত ধনুক ত্যাগ করলেন।'

মহাভারতকার এক শ্লোককে একটি নাটক রচনা করেছেন। ঐ পরিসরের মধ্যেই কথা ও কাজের ঘাত প্রতিঘাতে দুটি চরিত্র রেখা ও রঙ্গে দীপ্তিমান হয়ে ফুটে উঠেছে। এবং সভাপর্ব্বের লাঞ্ছনা ও তার ফলে কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসলীলার সূচনা হয়েছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর উপলক্ষ করে পাণ্ডবদের উপর কর্ণের মনের বিরুদ্ধতা দেখাবার এর চেয়ে ভাল উপাদান কোন নবীন মহাকবি কল্পনা করতে পারেন।

মহাভারতীর কবিতার ও গ্রন্থের শেষ কবিতা "কৃষ্ণা' গ্রন্থকারের নিজের লেখা নয়। তিনি পাদটীকায় জানিয়েছেন যে 'তাঁরই অনুরোধক্রমে তাঁর কবি-বন্ধু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই কবিতাটি রচনা করেছেন; এবং এই কাব্যগ্রন্থে লিখিত ভারতকথার সুরের সহিত ইহার সুরও মিলিয়াছে। তাই, মহাভারতীয় 'কৃষ্ণা'-কথাতেই মহাভারতীর শেষ করা গেল।"

এ 'কৃষ্ণা'-কাব্যের সুর কবি যতীন্দ্রমোহনের মহাভারতীয় কবিতা তিনটির সুরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর। এ কবিতা হচ্ছে প্রাচীন কাব্যের আধুনিক 'ইণ্টারপ্রিটেশন্'। কাব্যের অনেক শ্রেষ্ঠ চরিত্র-সৃষ্টিকে, অনেক ঐতিহাসিক চরিত্রের মতই, যুগে যুগে নূতন দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব। মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রে এ সম্ভাবনা খুব বেশী। যদি বলি এ কাব্য প্রাচীন মহাভারত চরিত্রের আধুনিক 'ফেমিনিষ্ট ইণ্টারপ্রিটেশন্' তবে একটা লেবেল আঁটা হয় বটে, এবং হয়ত লেবেল হিসাবে খুব ভুল লেবেল নয়, কিন্তু তাতে এ কবিতার অভিনবত্ব ও দৃপ্ত ঔজ্জ্বল্যের কোনও পরিচয় হয় না। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর সঙ্গে বিবাহের হেতু আবিষ্কারের চেষ্টায় যে সব অদ্ভুত, অপ্রতীতিকর উপাখ্যান ও যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে সেটা মহাভারতের একটা অতি দুর্ব্বল অংশ আধুনিক কবি তাঁর স্বাভাবিক পরিহাসপটুতার সঙ্গে তাকে অগ্রাহ্য করে কবি-কল্পনায় অভিনব কাব্যের সৃষ্টি করেছেন।

পাঁজি পুঁথি লয়ে খুঁজে মুনিগণ
সতির পঞ্চপতির হেতু,
কল্পনা গাঁথি জন্ম হইতে
জন্মান্তরে বাঁধিল সেতু।

* * *

—সে সব কাহিনী জানি বা না জানি,
তেজস্বিনী গো, তোমারে চিনি,
আপন যোগ্য পুরুষ সৃজিতে
জন্ম জন্ম তপস্বিনী।
দেবতারা মিলে গড়িতে পারেনি
তোমার প্রাপ্য তপের নিধি
তাই গো সাধ্বি, পঞ্চ প্রদীপে
তোমারে আরতি করিল বিধি।
মাটির গর্ভে জন্মে যে সতী—
সে দিল পরশ অনলে পশি',
অনলকুণ্ডে জন্মিল যে বা
তার সতীত্ব কোথায় কবি?

পাঁচ বরের সঙ্গে এক কন্যার বিবাহের যে পদ্ধতি বেদব্যাস বাৎলে দিলেন তাতে পঞ্চ পাণ্ডবেরা পর পর পাঁচদিনে কৃষ্ণার পাণি গ্রহণ করলেন। এবং একটি ছেলেভুলান উপাখ্যান রচনা হলো যে বেদব্যাসের বাক্যবলে প্রতি বিবাহ দিবস গতে দ্রৌপদী পুনরায় কন্যাত্ব প্রাপ্ত হতেন। আধুনিক বাঙ্গালী কবি বেদব্যাসের বাক্য না মেনে যে নূতন বিবাহ-পদ্ধতির কল্পনা করেছেন শাস্ত্রকর্ত্তা বেদব্যাস তাতে রাজী না হলেও মহাকবি ব্যাস নিশ্চয়ই খুসি হতেন।

কে আছে পুরুষ
একা ধরে তব পূর্ণপাণি ?
উঠেছ অনলে নারীর গর্ব্বে
নারীর গর্ভ তুচ্ছ মানি'।
বিবাহ-আসনে বামাঙ্গুষ্ঠ
দিলে তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরে,
তর্জ্জনী তুলি' দিলে বৃকোদরে,
মধ্যমা হাসি' পার্থবীরে ;
ঈষৎ নামায়ে দিলে অনামিকা,
ধরিল নকুল হৃষ্টমনে,
কনিষ্ঠা তব পরশ করিয়া
সহদেব স্বীয় ভাগ্য গণে !

তারপর সভাপর্ব্বে দ্রৌপদীর যে চরম লাঞ্ছনা মহাভারতে সে একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য। কিন্তু নবীন কবির নূতন কল্পনা সেখানেও ব্যাহত হয়নি।

পুরুষের মাঝে বিবস্ত্রা তুমি,—
ধর্ম্ম-মেয়েরা শাস্ত্র ভাবে !
পুরুষ ছিল কি সেই সভাতলে
যারে দেখে তুমি লজ্জা পাবে ?
* * * *
সে দিন আকাশে লিখে' দিলে পণ
কণ্ঠ কটাক্ষে বজ্রভরা—
নরশূন্য না করিলে কখনো
নারীর যোগ্য হবে না ধরা।
এর পর অবশ্যম্ভাবী যে কুরুক্ষেত্র
সেই নরমেধে যজ্ঞ-অগ্নি
জ্বলিতেছ তুমি যাজ্ঞসেনী
উড়াইয়া শিরে শিখার শিখরে
পুঞ্জধূমের মুক্তবেণী !
যত নারী যেথা হ'ল লাঞ্ছিতা
প্রায়শ্চিত্ত করিল কুরু,
রক্ত-সন্ধ্যা গড়ায় আকাশে,—
কে লুটে ধরায় ভগ্ন-উরু।
—তবু কোথা শেষ ?—
* * *
ভাবতেন নব নিঃশেষ হবে
নারী-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিতে,
কে জানে সেদিন কোনও ব্যথা নারি,
জেগেছিল কিনা তোমার চিতে।
* * *
বাহিরিলে মহাপথে হে তাপসি
ললাটে লিখিয়া কিসের লিখা ?
বিশ্বনারীর লাঞ্ছনা, না ও
যজ্ঞশেষের ভস্মটীকা ?

সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে, বীর্য্য ও সাফল্যের মধ্যে যে মরীচিকা বাসা বেঁধে আছে তার মিষ্টি কবি পাঠকের চিত্তে ঘনিয়ে তুলেছেন।

বহু-যুগান্তে গগণপ্রান্তে
যুগের শঙ্খ বাজিছে ওকি ?
তোমারে জাগাতে কে জ্বালে অনল ?
হে কৃষ্ণা, অয়ি কৃষ্ণসখি !

এ কবিতার রসাস্বাদ না করলে বাঙ্গালার কাব্যামোদী পাঠক বঞ্চিত হবেন।

এ গ্রন্থের অ-মহাভারতীয় কবিতাগুলির মধ্যে যেগুলি গাথাশ্রেণীর, যেমন 'অশোক' কি 'জয়পরাজয়' কি 'প্রতিশোধ' কাব্যাংশে সে গুলি দুর্ব্বল। কবির 'কর্ণ' ও 'দুর্য্যোধনের' দোষ এ সব কবিতাকে গ্রস্ত করেছে। অর্থাৎ এ গুলি অতিরিক্ত 'সেনসেশনাল্'। সমস্ত রকম গতির মধ্যে যে শান্তরস শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রাণ এ গুলিতে তার অভাব ঘটেছে। যে কবিতাগুলি 'লিরিক,' সোজাসুজি কবির নিজের কথা নিজের মুখে প্রকাশ, রূপে ও রসে সে কবিতা-গুলিই কাব্য হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থে কবি যতীন্দ্রমোহনের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'আষাঢ়ে লেখা।'

তিনদিন ধরে মেঘ করে' আছে, রৌদ্রের নাই দেখা,
বন্ধ রয়েছে ধরা-পাঠশালে ধরাবাঁধা পাঠ শেখা।
* * * *
খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ যখন, উনোনে চড়ে না হাঁড়ী,
এদিকে ওদিকে প্যাচ্‌পেচে কাদা, ভিজে কাপড়ের কাঁড়ি।

এমন সময় ডাকে বন্ধুর জরুরী চিঠি এলো
—কাগজের লাগি' রচনা একটি চাই,
যেমন-তেমন চায় না আবার—ঝকৃঝকে হ'তে হবে,
রূপে আর রসে ফেটে পড়ে যেন নূতনের গৌরবে।
বিষম মুস্কিল, কোথায় পাওয়া যায় ঝকৃঝকে নতুন কল্পনা।
সহসা 'শেল্‌ফে' এ মেঘদূতের উপর চোখ পড়লো।
বলিহারি কবি—চারিধারে তার হেরিয়া হাজারো খুং—
আকাশ হইতে মেঘে টেনে এনে বানাইয়া দিল দূত।

* * * *

ধূমজ্যোতিসলিলমরুতে আস্মানি মনোহারী
প্রেমের পথের সুজে লইয়া হ'ল তাই পথচারী!
চিরবিরহীর মানস-মরাল সাথে সাথে উড়ে তা'র
পাখা ঝট্‌পটি প্রাণ ছট্‌ফটি উৎকট অভিসার।
কিন্তু কোথায় নূতনত্ব?
মাটির ধরণী বড়ই পুরাণো, পুরাণো মানবমন,
আরো পুরাণো যে চিরকেলে সেই প্রণয়ের ক্রন্দন।
তবু কালিদাস জেনে শুনে সেই পুরাণো কথাই ছন্দে গেথে
ফাঁকি দিয়ে অমর হয়ে গেছেন।
তা'রি সেই কথা, কাগজে তোমার চলিবে না, জেনে শুনে,
আষাঢ় মেঘের সেই ভিজে তুলো আবার তুলিবো ধুনে'।
ভাল না লাগে টেনে ফেলে দাও আর বিব্রত করো না।
ওদিকে আবার কাজ আছে ঢের দেখাশুনা, তোলা পাড়া;
জ্বরটুকু গেছে ঘুমটা ভেঙেছে, গৃহিনীরও পাই সাড়া
মেঘদূত—দেখি, নিষ্ফল নয়,—তাহারি রুগ্ন চোখে
পালটি' পড়িনু প্রেমের মন্ত্র স্তিমিত বর্ষালোকে।
বুকে রেখে যাইব মিলে না স্বস্তি, তাবেই বেখেছি দূবে—
সেই কথাটাই পালটি' শিখিনু পাগ্‌লা কবির সুরে।

,কবি মেঘদূতের মেঘকে যে অলকায় উত্তীর্ণ করেছেন তা ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের পথে কুবেরের অলকায় নয়, ফুটো চালের ভিতর দিয়ে মানুষের সামান্য কুটিরে। সেখানে বিরহ-শীর্ণা যক্ষপ্রিয়া নয়, আছেন জ্বরে রুগ্না ঘরের গৃহিণী। কিন্তু কালিদাস বেজার হবেন না।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

অন্তর ও বাহির

শ্রীউমাপদ চট্টোপাধ্যায়

আমার এ হিয়া-মাঝে ছন্দ আনে কোন্ সেই কবি,
মরম ঝঙ্কারে মোর কোন যন্ত্রী তুলে দেয় সুর,
মধুর পরশ কার এঁকে দেয় সুন্দরের ছবি,
কেগো আস তুমি, প্রিয়, নিয়ে যাও মোরে বহুদূর
কোন সে আনন্দলোকে! হাসি-অশ্রু যেথায় বিলীন
আছে শুধু স্বপ্ন-ছায়া আছে হর্ষ স্বচ্ছ অনাবিল
স্বর-সুর-রূপ-স্পর্শ যেথা সেই অদ্বিতীয়ে লীণ
তুমি আমি এক সেথা সেই তব স্বরূপ নিখিল।

এ বিশের কোলাহলে আছ মগ্ন তুমি শান্তধীর,
কোথায় অলক্ষ্যে থাকি তুলিতেছ তরঙ্গ তুফান
প্রশান্ত বারিধি বক্ষে; রাখি স্রোতে অতলগভীর,
সেই শান্ত থাক তুমি, অশান্তের মূর্ত্তিতে প্রধান।
নিগূঢ় অস্তিত্ব তব রাখিয়াছ অন্তরে ঢাকিয়া,
পরাণের তরে তাই খুঁজে ফিরি দেহ আবরিয়া।

রাজহংস

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

কিছুদিন থেকে কয়েকজন শক্তিমান কবি উঠে পড়ে লেগেছেন বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের সমাপ্তি করে নতুন যুগ সুরু করার উদ্দেশ্যে। এঁদের লেখার প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে নূতনত্বের যে একটা স্পষ্ট আভাস দেখা দিয়েছে, তার জন্যে প্রশংসা না করে থাকতে পারা যায় না। কিন্তু বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, এই কবিদের একটি দল একটা 'পোজ' নিয়ে সৃষ্টির সন্ধানে মেতেছেন। য়ুরোপীয় কবিদের অনুকরণ-মোহে তাঁরা অন্তরে যা নন, তা-ই তাঁদের লিরিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। যেমন, যিনি মোটেই সিনিক্ নন্ তিনি লিরিকে প্রকাশ করছেন দৃঢ় সিনিসিজিম্। জীবনে যাঁর শ্রমিকদের সঙ্গে কোন যোগ নেই, তাঁর কবিতার মূল সুর বেজে উঠেছে পরশ্রমজীবিদের বিরুদ্ধে। এই সব বিষয়-বস্তুর বিরুদ্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই। চলতিকালে যার সম্ভাবনা কেউ ভাবেনি, তারই আগমনী ধ্বনিত হয়ে ওঠে স্রষ্টা কবির বীণায়। কিন্তু কবির যা অন্তরের বস্তু নয়,—যা শুধু বিলাসের বস্তু কিংবা নিছক মস্তিষ্কের ক্ষণিক উত্তেজনা, তা নিয়ে কবিতা লিখে এ পর্য্যন্ত জগতে কোনো স্রষ্টা কবির আবির্ভাব ঘটেনি বলে মনে হয়। উগ্রপন্থী এঁদেরই কেউ কেউ য়ুরোপীয় সাহিত্য এবং পুরাণ থেকে উপমা, দৃষ্টান্ত, বিষয় বস্তু প্রভৃতি হুবহু আমদানী করতে দ্বিধা করেননি। বিদেশী শব্দ বা দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে আমার কোন আপত্তি নেই যদি তাকে উপভোগ করার মত পরিচয় মনের সঙ্গে আগে থেকে ঘটে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-অর্দ্ধাংশে যা হয়ত সম্ভব বলে মনে হত, আজ তা পুরোপুরিই অসম্ভব হয়ে গেছে। বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কোনদিনই য়ুরোপীয় পুরাণ অথবা সাহিত্যকে একান্ত নিজস্ব হিসাবে গ্রহণ করবে বলে আর আশা করা যায় না। বরং স্রোত উল্টোদিকেই বইছে। তাই মনে হয়, য়ুরোপীয় পুরাণ এবং সাহিত্যের এই সব সাগর-ছেঁচা মণির মর্য্যাদা কলিকাতা সমাজের য়ুরোপীয়ানার বাহিরে কোন দিন হবে না। অবশ্য অতি-আধুনিক কবিদের বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস আমার নেই। কারণ, সমসাময়িক সাহিত্যের বিচার করা যেমন দুরূহ তেমনি বিপজ্জনক। সমকালীন পরিস্থিতির সামীপ্যে পাঠকের মন এতই আচ্ছন্ন থাকে যে নবতম সৃষ্টির যথাযথ সন্ধান পাওয়া যায় না। মহাকালের কষ্টিপাথরে ত অনেক সমালোচকেরই সমকালীন সাহিত্যের সম্বন্ধে মতামত মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আমাদের অতি-আধুনিক কবিদের মধ্যে "বন্দীর বন্দনার" কবি শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু, "প্রথমা"র কবি শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া কারো কণ্ঠে বর্ত্তমানের সুর নেই,—যা আছে তা অনাগত ভবিষ্যের। তাঁরা কেউই চলতিকালের কবি নন,—আমাদের কবি নন। আমাদের আশা ও নিরাশা, দ্বন্দ্ব ও ক্ষোভ, উদ্যোগ ও অভিপ্সা তাঁদের কবিতার মধ্যে আশ্রয় পায়নি। তাঁরা তাদের কবি-যারা আজও আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছয়নি। তাঁদের কবি প্রকৃতি আমাদের সমাজের আধুনিক পরিস্থিতির মধ্যে গড়ে ওঠেনি। তাঁদের মনের সঙ্গে বর্ত্তমানের সংযোগ খুব নিবিড় নয়।

নতুন কোন কবিতার বই হাতে এলে কেবলই মনে প্রশ্ন ওঠে, চলতি যুগের কবি কই? যাঁর লেখা পড়তে পড়তে মনে হবে তিনি আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন আমাদের সুখদুঃখের অংশ নিয়ে। "রাজহংসের" মধ্যে পাওয়া যায় সেই কবির পরিচয়। আজ আমাদের জীবনের দিকে দিকে—রাজনৈতিক, সামাজিক, বা সাংস্কৃতিক—বড় বিচিত্র-

* রাজহংস: শ্রীসজনীকান্ত দাস-এর লেখা: রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস প্রকাশক: দাম দেড় টাকা।

ভাবে ভাঙাগড়া চলেছে। একদিকে সৃষ্টির উৎসাহ আর একদিকে গভীর অবসাদ। একদিক বিপুল বাধার সংঘাত আর একদিকে নিরুপায়ের চরম প্রচেষ্টা। একদিকে অফুরন্ত প্রাচুর্য্য আর একদিকে অসীম অনাটন। একদিকে নূতনের নিত্যলীলা আর একদিকে পুরাতনের প্রাচীন বিরোধিতা। এই যে পাশাপাশি দুই বিপরীত আবেষ্টনের সংযোগ এবং দ্বন্দ্ব—এই পরিস্থিতির মধ্যে যাঁর কবি-মন গড়ে উঠেছে, তিনি কি শুধু তথাকথিত কল্পলোকে বিহার করতে পারেন? তাঁর মন পরিপূর্ণ হয়ে থাকে অভাব, জরা, অবসাদ ও অসামঞ্জস্যের চিন্তায়। জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি হবে কবিদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটু বিভিন্ন। এখানে একটু টিকা দেওয়া দরকার। আমাদের ধারণা এই নয় যে পুরাকালে কবিরাজী শাস্ত্র যেমন লেখা হয়েছিল পদ্যে, আজকের আধুনিক কবি তেমনি বড় বড় রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাকে নিয়ে রচনা করবেন মহাভারত। কবি কি দৃষ্টিতে জীবনকে সমগ্রভাবে দেখেছেন এবং তাঁর দৃষ্টি জীবনের কি আবেষ্টনের মধ্যে গড়ে উঠেছে—এটাই আমাদের প্রধান বিচার্য্য। বাংলার আধুনিক আবেষ্টনের জলহাওয়ায় যাঁর কবি-প্রকৃতি পুষ্ট হয়ে উঠেছে—যাঁর প্রকৃতি গড়ে ওঠেনি শুধু ভবিষ্যতের কল্পলোকে—তাঁর দৃষ্টির মধ্যে আমরা পাব বাস্তব এবং আদর্শবাদিতার পাশাপাশি অবস্থান। আজকের দ্বন্দ্ব-প্রধান, অসমঞ্জস্য-ভরা পরিস্থিতির মধ্যে যাঁর পুষ্টি, তাঁর কাছে বাস্তব এতই প্রবল যে শুধু আশা এবং আকাঙ্ক্ষা—শুধু স্বপ্ন তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে না। কিন্তু একথাও স্বীকার করি, জাতি বা ব্যক্তিগত জীবনে যতই আঘাত আসুক তবু মানুষের কাছে শুধু বাস্তবই একমাত্র সত্য নয়। আমাদের চলতিকালের কবি যদি শুধু বাস্তব-সর্ব্বস্ব হন, তাহলে তাঁকে আমরা আধুনিক কবি বলতে পারব না। কারণ, আমরা যদি আজ পুরোপুরি বাস্তব-সর্ব্বস্ব হতুম, আমাদের মধ্যে কেবল দেখা যেত নৈরাশ্য,—অবসাদ-গ্রস্ত জীবনকে নিয়ে কেবল ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা। কিন্তু কে না অনুভব করেছে যে এই নৈরাশ্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকারেও বাঙালি জাতির বুক ভেদ করে একটা আকাঙ্ক্ষা কেবলই গর্জ্জে উঠছে, আমরা বাঁচব। এই দুর্জ্জয় বাঁচার আকাঙ্ক্ষা—এই সৃষ্টির মহাপ্রেরণা শুভমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় আমাদের জীবনের সকল দিক চঞ্চল করে তুলেছে। "রাজহংসের" অন্তর্নিহিত জীবনতত্ত্বে এই জটিল সুরটি বেজে উঠেছে। "রাজহংসের" মধ্যে পাওয়া যায় সত্যিকার আধুনিক বাংলার কবিকে। সজনীবাবু বাস্তবকে ভুলতে পারেননি। কিন্তু বাস্তবের লীলাস্রোতে নিমজ্জমান কবির চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বাস্তবাতীতের দ্যুতি। তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে দুর্জ্জয় মনুষ্যত্বের সঙ্গীত:

আমি শুধু পেয়েছি জানিতে,
দিবসের খর রৌদ্র অপরাহ্নে ম্লান হয়ে আসে;
সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে গুঁড়া গুঁড়া হয়ে উড়ে যায়,
দাবদগ্ধ দিবসের ভস্ম-অবশেষ!

* * *

কত যে নিবিয়া গেছে মহাকাল-বিপুল-প্রবাহে
কত মানুষের প্রাণ, মানবের সন্ধ্যাও দিবস,
কোটি কোটি হ'ল লয় বিন্দু বিন্দু ধূলিকণারূপে
কাল-কালিন্দীর নীরে।
হয়ত হতেছে সৃষ্টি মহাকাল-কালিন্দী সঙ্গমে
নবতর দ্বীপ কোনো; ধূলিকণা সেথা গিয়া লাগে,
এক দুই লক্ষ লক্ষ কোটি ও অর্ব্বুদ ধূলিকণা!
এর মাঝে হায় হায়, মোরা গণিতেছি গাঢ় স্নেহে
দিবসের খররৌদ্র অপরাহ্নে হয়ে আসে ম্লান,
কখন জেগেছে ঊষা তিমিরের কালো উপকূলে,
খররৌদ্র জাগিয়াছে মধ্যাহ্নের তপন প্রভায়—
আঁখিতে লেগেছে রঙ, দুই আঁখি ভরিয়াছে জলে,
ভালবাসিয়াছি, আর বুকে কারে লইয়াছি টানি।

অন্যত্র আছে,

ঢেউয়ের পশ্চাতে ঢেউ, এক যায়, পুনঃ আর আসে,
শ্মশানের শুষ্ক চরে পলি পড়ে, ফসল গজায়—
পাষাণে জলের লেখা—মানুষের এই ইতিহাস।

তবু এই জীবনকেই কবি গ্রহণ করেছেন:

তবু সে একান্ত সত্য, সত্য তার গতির প্রবাহে।

"কে জাগে" কবিতা সুরু হয়েছে যা নিয়ে তা' এর আগে বাংলা কবিতায় স্থান পাবে কেউ ভেবেছিল কি না সন্দেহ।

শহরে সবাই ঘুমে অচেতন, জেগে আছে পেট্রোল,
বি-ও-সি এবং মোকোনি এবং শেল—
কারো আঁখি লাল, কারো চোখ দুধ-সাদা।"

তারপর চলেছে বাস্তব জীবনের সুন্দর ও কুৎসিৎ ছবির পর ছবি।—বিড়ির দোকানে কোকেন এবং পানের দোকানে মদের বেসাতি যারা করে, 'আর জেগে আছে তারা এখনও যাদের জোটে নাই খদ্দের'। অবশ্য আরো জেগে আছেন:

তাহাদের বধূ যাহারা ফেরেনি ঘরে,
জাগে বধূ, তার জালাধরা চোখ জলে চল ছল করে,
বুকের জ্বালার প্রলেপ, পাশের ঘুমানো খোকার ঠোঁটে।

ছায়াচিত্রের মত অনর্গল এই সব ছবি পড়তে পড়তে সন্দেহ হয়, বুঝি বাস্তবপন্থী কবি জীবনের বাস্তব রূপ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাননি। কিন্তু কবিতাটির শেষের দিকে এসে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়। কবি 'কে জাগে' প্রশ্নের চরম উত্তর দিয়ে কবিতার ইতি করেছেন। সকলের চেয়ে নিত্য জেগে আছে মহাকালের সৃষ্টিলীলা,—ক্ষণিকের জন্যেও তার বিরাম নেই। একদিকে সদ্যমৃতের তিরোভাব আর একদিকে নবজাত শিশুর আবির্ভাব। এ লীলার আর শেষ নেই।

শুধু হাসে মহাকাল—
হাহা সেই হাসি শুনিলাম যেন রজনী দ্বিপ্রহরে,
শীতের রাত্রি, মরা জ্যোৎস্নায় কুয়াসা গলিয়া পড়ে—
জনহীন রসা রোড্—
চলে চারিজন ক্লান্ত চরণে, ক্ষণে বদলিয়া কাঁধ—
মুখে অতি ক্ষীণ—বল-হরি-হরিবোল।
মহাকাল যেন হাসিল অট্টহাসে।
সে ক্রুর হাসিরে উপহাস করি আলোকিত দোতলায়—
নবজাত শিশু ককিয়ে কাঁদিয়া উঠে—
সেই জাগে চিরকাল।

সজনীকান্তের কবিজীবনে কোন "ইজম্"—এর অপ-প্রেরণা নেই। তাই তাঁর কবিতার মধ্যে কোন কিছু প্রমাণ করার কৃত্রিম চেষ্টা নেই। কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি কবি ব্রাউনিং-এর কবিতার মত আপাতঃদৃষ্টিতে এমন এলোমেলো এবং এলোমেলো বলেই এত দৃঢ়-সংবদ্ধ যে কেবল অংশবিশেষ তুলে দিয়ে সমগ্র কবিতাটির সৌন্দর্য্যের আভাস দেওয়া দুরূহ।

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

জানিনে তবু রয়েছি পথ চেয়ে

শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায় এম-এ

শুধাই তারে "কহিবে মোরে বালা
কাহার লাগি প্রদীপ হল জ্বালা?
কহিবে তুমি কাহার তরে শেফালী ফুলে যতন ভরে
নীরব রাতে গাঁথিয়া চল মালা?"
সরমে মরি কহিল মোরে মেয়ে
"যাহার লাগি রয়েছি পথ চেয়ে।"
"কাহার লাগি?" শুধাই তবু ফিরে—
"জানিনে" কহি চলিয়া গেল ধীরে।

আজিকে ভাবি একেলা বাতায়নে
কাহারে বুঝি চেয়েছি মনে মনে
কাহার লাগি জাগিয়া রাতি আপন ঘরে জ্বেলেছি বাতি
প্রহর গুণি' উতলা ক্ষণে ক্ষণে!
শুধাও যদি আমারে কেহ আজি
"কাহার লাগি ফুলেতে ভরা সাজি?"
"জানিনে" কব সরমে আঁখি তুলি—
"কাহার লাগি দুয়ার রাখি খুলি"

পাপিয়া ও রক্তগোলাপ

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

ফুলবাগানে দাঁড়িয়ে যুবকটি করুণ সুরে বললে—"সে বলেছে, যদি একটি লাল গোলাপফুল তাকে দিতে পারি তাহ'লে কাল নাচের মজলিসে আমার হাত ধরে সে নাচবে। কিন্তু আমাদের বাগানে তো একটিও গোলাপ নেই!"

সেগুন গাছের ডালে ঝোপের মধ্যে বসে ছিল এক ছোট্টো পাপিয়া,—ঐ কথা শুনে পাতার আড়াল থেকে সে উঁকি মেরে চেয়ে দেখলে।

"এত বড় বাগানটার মধ্যে একটিও গোলাপ নেই!" বলতে বলতে যুবকের সুন্দর চোখদুটি জলে ভরে উঠলো। "হা'য়, কতটুকু সামান্য জিনিষের ওপর মানুষের সুখ নির্ভর করে! জ্ঞানী লোকদের লেখা কত জ্ঞানের কথা আমি পড়ে ফেলেছি, দর্শন শাস্ত্রের কত গূঢ় রহস্য আমি আয়ত্ত করেছি, কিন্তু তবু আজ একটি গোলাপ ফুলের জন্যে আমার জীবনটাই বুঝি ব্যর্থ হ'য়ে যায়!"

পাপিয়া ভাবলে..."এই তো একজন সত্যকার প্রেমিক! না জেনে শুনে আমি রাতের পর রাত এর কথাই তো গান করে এসেছি! আকাশভরা তারার কাছে রাতের পর রাত আমি এর কাহিনীই গেয়ে শুনিয়েছি! এত দিনে আমি ওকে দেখলাম। ওর চুলগুলি ভোমরার পাখার মত কুচ্‌-কুচে, আর যে গোলাপ ও খুঁজছে, ঠোঁট দুটি যেন তার মতই টুকটুকে। কিন্তু প্রণয়ের ব্যথায় ওর মুখখানা হ'য়ে গেছে ফ্যাকাশে, বিষাদের রেখা ফুটে উঠেছে ওর কপোলে।"

যুবকটি বলতে লাগলো..."কাল রাত্রে রাজবাড়ীতে নাচের উৎসব, সেখানে সে আসবে। একটি গোলাপ যদি তাকে দিতে পারি তা হ'লে সে আমার সঙ্গে সারাক্ষণ নাচবে। একটি গোলাপ যদি দিতে পারি তাহ'লে তার হাত দুখানি নিয়ে একবার আমার হাতের মধ্যে নিবিড় ভাবে চেপে ধরবো, তার মাথাটি আমার কাঁধের ওপর হেলে পড়বে। কিন্তু গোলাপ ফুল যে বাগানে একটিও নেই! তবে তো সেখানে গিয়ে আমাকে একলাই বসে থাকতে হবে, আর সে আমার সুমুক দিয়ে এমনই চলে যাবে। আমার দিকে একবার ফিরেও চাইবে না। আমার বুকটা তা হলে একেবারে ফেটে যাবে।"

পাপিয়া ভাবলে..."এ নিশ্চয়ই সত্যকার প্রেমিক। আমি যা নিয়ে কেবল গান গেয়ে বেড়াই, ও তাতে মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথা পায়; আমার কাছে যেটা আনন্দের, ওর কাছে সেটা পরম বেদনার বস্তু। আশ্চর্য্য সামগ্রী এই ভালোবাসা! এ হীরার চেয়েও দুর্লভ, মণি মুক্তার চেয়েও মহার্ঘ্য। জহরতের বিনিময়েও একে পাওয়া যায় না, ডালিম ফলের বিনিময়েও না, বাজারে এর কেনাবেচা হয় না। দোকানদারের ঘরে এ জিনিষ নেই, আর সোনার নিক্তি দিয়ে একে ওজন করবারও কোনো উপায় নেই।"

যুবক বলতে লাগলো..."বাদ্যকারেরা সেখানে সারি সারি বসে ঐক্যতান সঙ্গীত বাজাবে, তারের যন্ত্রগুলিতে ঝঙ্কার তুলে উন্মাদনার সৃষ্টি করবে, আর সে তখন নেচে উঠবে সেতারের তালে তালে, বেহালার সুরে সুরে। এত লঘু হবে তার জমকালো পদক্ষেপ যে মাটিতে একটু চরণ ছোঁয়াবে না। সেই নাচ দেখে পোষাকপরা রাজসভাসদেরা তার চারিদিকে এসে ঘিরে দাঁড়াবে। কিন্তু ঐ নাচ সে আমার সঙ্গে নাচবে না কেবল একটি গোলাপ ফুলের অভাবে।"—বলতে বলতে সে হতাশভাবে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো, হাত দুখানি দিয়ে মুখ ঢেকে করুণভাবে কাঁদতে লাগলো।

সবুজ গিরগিটি ল্যাজ উঁচু করে সেখান দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, সে বললে—"এ মানুষটি কাঁদে কেন?"

সূর্য্যমুখী ফুলের কাছে উড়ে বেড়াচ্ছিল প্রজাপতি, সেও বললে—"তাই তো ওর কি হয়েছে?"

ভীরু চন্দ্রমল্লিকাও তার প্রতিবেশীর দিকে হেলে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে—"তাইতো, ওর কি হয়েছে ?"

তখন পাপিয়া বল্লে—"ও কাঁদছে একটি গোলাপের জন্যে।"

সবাই বল্লে—'সামান্য একটা গোলাপ ? ছি ছি কি লজ্জা!" কাটখোট্টা সবুজ গিরগিটি তো একেবারে গলা ফুলিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো।

কিন্তু পাপিয়া বুঝেছিল যুবকের দুঃখ, সে চুপ করে সেগুন গাছের ডালে বসে ভাবতে লাগলো এই প্রেমরহস্যের কথা।

হঠাৎ সে ডানা ঝাড়া দিয়ে আকাশে উড়লো, কুঞ্জবন ছাড়িয়ে ঠিক যেন ছায়ার মত উড়তে উড়তে সে বাগানের একদিক থেকে অপর দিকে চলে গেল।

সেখানে সুন্দর ঘাসবিছানো জমির মাঝখানটিতে রয়েছে এক গোলাপ ফুলের গাছ, তাই দেখে পাখী ওর শাখার কাছে নেমে এলো। বল্লে—"আমায় একটি লাল রংএর গোলাপ দাও, আমি তোমাকে চমৎকার গান শোনাবো।"

গাছ মাথা নেড়ে জবাব দিলে—"আমার গোলাপ হচ্ছে সাদা পাহাড়ের চূড়ার হিমানীর চেয়েও যে সাদা, সে একেবারে সমুদ্রের ফেনার মত সাদা। তুমি যাও বরং আমার ভাইয়ের কাছে, ঐ পুরাণো বেদীটার পাশে তাকে দেখতে পাবে, তুমি যা চাও তা হয়তো ওর কাছে পেতে পারো।"

পুরাণো বেদীর কাছে যে গোলাপ গাছটি ছিল, পাপিয়া তখন উড়ে গেল তার কাছে।

বল্লে—"আমায় একটি লাল রংএর গোলাপ দাও, তা হ'লে আমি তোমাকে চমৎকার গান শোনাবো।"

গাছ মাথা নেড়ে জবাব দিলে—"আমার গোলাপ হচ্ছে হলদে, বাসন্তী দেবীর বাসন্তী রংএর আঁচলের চেয়েও সে হলদে, মাঠ আলো ক'রে যে সর্ষে ফুল ফুটে থাকে তার চেয়েও সে হলদে। তুমি যাও বরং আমার ভাইয়ের কাছে, ঐ যুবকের ঘরের জানলার নীচে তাকে দেখতে পাবে, তুমি যা চাও তা হয়তো ওর কাছে পেতে পাবো।"

পাপিয়া তখন আবার উড়ে গেল সেই জানলার নীচের গোলাপ গাছটির কাছে। বল্লে—"আমায় একটি লাল রংএর গোলাপ দাও, তা হ'লে আমি তোমাকে চমৎকার গান শোনাবো।"

গাছ মাথা নেড়ে জবাব দিলে—"আমার গোলাপ লাল বটে; পায়রার পায়ের গোড়ায় যে টুকটুকে লাল রং দেখা যায়, আমার গোলাপ তার চেয়েও লাল; মহাসমুদ্রের তলায় যে কোর‍্যালের পাহাড় আছে, তার ডালপালার মত পাথর-গুলো ক্রমাগত ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে যেমন লাল হ'য়ে ওঠে, আমার গোলাপ তার চেয়েও লাল। কিন্তু এই দারুণ শীতে আমার স্নায়ুতন্ত্রীগুলো শুকিয়ে গেছে, তুষার পড়ে আমার কুঁড়িরা সব মুষড়ে গেছে, ঝড়ে আমার ডালপালা ভেঙে গেছে, এ বছর আমার আর ফুল ফুটবে না।"

ব্যাকুল হ'য়ে পাপিয়া বল্লে—"একটিমাত্র লাল গোলাপ আমার চাই,—যেমন করে হোক চাইই চাই। এর কি কোনোরকম উপায় হতে পারে না ?"

গাছ বল্লে..."একটি মাত্র উপায় আছে। কিন্তু সে এমন ভয়ানক কথা যে আমি তোমায় বলতেই কুণ্ঠিত হচ্ছি।"

পাপিয়া জিদ্ ধরলে, "বলো, বলো, তা যতই ভয়ানক হোক।"

গাছ তখন বল্লে—"লাল গোলাপ যদি চাও, তবে চাঁদের আলোয় গান গেয়ে গেয়ে তা তোমাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, আর নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তাকে রাঙিয়ে দিতে হবে। আমার গায়ের কাঁটায় তোমার বুকটি বিদ্ধ করে রেখে কেবল গান করবে। সমস্ত রাত আমাকে গান শোনাবে, আর কাঁটার ঘায়ে বিদ্ধ হয়ে তোমার বুকের রক্ত গড়িয়ে এসে আমার মধ্যে আমার স্নায়ুতন্ত্রীতে গিয়ে তাকে সঞ্জীবিত করবে, তবেই ফুল ফুটবে।"

এই শুনে পাপিয়া বল্লে "জীবনের বিনিময়ে একটি গোলাপ, দামটা বড় বেশী। জীবন সকলের কাছেই প্রিয়। এই সবুজ বনানীর মধ্যে বসে জীবনযাপন, যেখানে সূর্য্য আসে তার সোনার রথে আর চন্দ্র আসে তার মুক্তার রথে,—এ বড়ই মধুর এখানে বাগানের বেড়ায় বেড়ায় সবুজ পাতার তাজা গন্ধ, উপত্যকার ধারে ধারে বনফুলের গোপন গন্ধ, পাহাড়ের গায়ে গায়ে লতাগুল্মের মিষ্ট গন্ধ। কিন্তু জীবনের চেয়েও মূল্যবান তার ভিতরকার প্রেম। আর একটা মানুষের হৃদয়ের তুলনায় একটা সামান্য পক্ষীর হৃদয়ের মূল্যই বা কতটুকু ?

আবার সে ডানা ঝাড়া দিয়ে আকাশে উড়লো, বাগান পার হ'য়ে ঠিক যেন ছায়ার মত উড়তে উড়তে আগেকার কুঞ্জবনে ফিরে গেল।

যুবক তখনো ঘাসের ওপর শুয়ে আছে, তার চোখের জল তখনো শুকোয় নি।

পাপিয়া চেঁচিয়ে বলে উঠলো, "শোনো, শোনো, তুমি নিশ্চিন্ত হও; তোমার লাল গোলাপ ফুল নিশ্চয় মিলবে। চাঁদের আলোয় গান গেয়ে আমি যে ফুল ফোটাবো, আমার নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তাকে রাঙিয়ে দেবো। তার বদলে কেবল আমি এইটুকু চাই যে তুমি যেন সত্যকার যথার্থ প্রেমিক হও। সত্যকার যে প্রেম, সে মহাজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানের চেয়েও তা গভীর। সত্যকার যে প্রেম, সে মহাশক্তি, পৃথিবীর সকল শক্তির চেয়েও সে শক্তিমান। এই প্রেমের সর্ব্ব অঙ্গে থাকে অগ্নিশিখার জ্যোতি: এর পাখায় পাখায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দীপ্তি। এর ওষ্ঠে থাকে পুষ্পমধুর আস্বাদ, এর নিশ্বাসবায়ুতে অগুরুধূপের সৌরভ।"

যুবক ঘাসের বন থেকে মুখ তুলে চাইলো, কান পেতে শুনলো, কিন্তু পাপিয়ার কথা কিছুই বুঝলো না। সে কেবল পুঁথির পড়াই জানে, পুঁথিতে যা লেখা থাকে তা ছাড়া অন্য কিছু সে বোঝে না।

কিন্তু সেগুন গাছ সে কথা বুঝলো, ভারী দুঃখিত হলো। তার ডালে পাপিয়া আপন বাসা বেঁধেছিল, এই ছোটো পাখীটাকে সে বড় ভালোবাসতো।

সে বললে, "পাখী, এই শেষবারের মত আমাকে একটা গান শুনিয়ে যাও। তুমি চলে যাবে, আমার বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগবে।"

তখন পাপিয়া গাছের ডালে বসে তাকে গান শোনালে, সে সুর যেন রৌপ্যভৃঙ্গারের ভিতর থেকে জলবুদ্বুদের তরল কলধ্বনির মত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো।

সে গান শুনে যুবক উঠে বসলো, পকেট থেকে তার খাতা পেন্সিল বের করলে।

গান শেষ হলে সে উঠে দাঁড়ালো, চলতে চলতে আপন মনে বললে, "ওর সুরের মধ্যে একটা রূপ আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু ওর নিজের কোনো চেতনা আছে কি? বোধ হয় না। অধিকাংশ শিল্পী যেমন হয়, এই পাখীটাও তাই; ওর সমস্তটাই কেবল শিল্পনৈপুণ্য, আন্তরিকতা একটুও নেই। পরের জন্য একটুও ত্যাগস্বীকার করতে পারে না। ও কেবল আপন সুরের কথাই ভাবে, আর কোনো কথাই না। সকলেই জানে, শিল্পবিদ্যা মাত্রই স্বার্থপর। যাই হোক, এ কথা স্বীকার করতেই হবে, ওর গলায় যে কতকগুলি সুর আছে তা একেবারে অপূর্ব্ব। তবে দুঃখের বিষয় যে ওর কোনো অর্থও হয় না, কোনো কাজেও লাগে না!"

সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো, বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলো আপন ভালোবাসার কথা। ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

এ দিকে আকাশে যখন চাঁদ উঠেচে, তখন পাপিয়া গেল সেই গোলাপ গাছের কাছে, তার কাঁটার ওপর নিজের বুক বিদ্ধ করে দিলে। কাঁটায় বুক বেধে সে সমস্ত রাত গান গাইলে, হিমরাত্রির স্বচ্ছ চাঁদ আকাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে সে গান শুনলো। সমস্ত রাত সে গান গাইলে, বুকের কাঁটা ক্রমশঃ গভীর ভাবে বিঁধলো, বুকের রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়লো।

গান সুরু হোলো প্রণয়ের জন্মকথা নিয়ে, যে প্রণয় প্রথম দেখা দেয় একটি বালকের মনে আর একটি বালিকার মনে। তখন গোলাপ গাছের সব চেয়ে উপরকার ডালটিতে ফুটে উঠলো এক অনুপম ফুল; গানের পরে গান হোতে থাকে, আর তার পাপড়ির পরে পাপড়ি স্তবকে স্তবকে ফুটতে থাকে। ফুলটি প্রথমে হোলো পাণ্ডুবর্ণ, নদীবক্ষের কুহেলির মত আবছা তার রূপ, প্রভাতের প্রথম পদরেখার মত অস্পষ্ট, ঊষার প্রথম ছায়াপাতের মত ফিকা। রৌপ্যমুকুরে গোলাপের যেমন প্রতিবিম্ব দেখায়, সরসীর বুকে গোলাপের যেমন জলচ্ছায়া দেখায়, গাছের উপকার ডালটিতে যে ফুল ফুটলো সে তখন ঠিক তেমনি দেখতে।

গাছ তখন পাপিয়াকে বললে, তাকে কাঁটার ওপর বুক এগিয়ে দিতে হবে। "কাঁটার ওপর বুকটা আরো চেপে ধরো পাখী, দেরী হ'য়ে গেলে দিনের আলো এসে পড়বে, ফলে তখন আর রং ধরবে না।"

পাপিয়া কাঁটার ওপর বুকটা আরো চেপে ধরলে, গানের সুর আরো চড়িয়ে দিলে; এখন সে গাইতে লাগলো সেই প্রণয়ের কথা যা প্রথম দেখা দেয় কেবল যুবকের মনে আর যুবতীর মনে।

তখন গোলাপের পাপড়িতে পাপড়িতে দেখা গেল ঈষৎ রক্তিমাভা,—নববধূর মুখে প্রথম চুম্বন দিতে গিয়ে বরের গালে যা ফুটে ওঠে কিন্তু কাঁটার আঘাত তখনো পাখীর বুকের কেন্দ্রে গিয়ে লাগেনি, তাই গোলাপের মাঝখানটা তখনো সাদা; পাপিয়ার বুকের ভিতরকার রক্ত না পেলে ওখানে লাল রং ধরবে না।

গাছ তখন পাপিয়াকে আবার বললে, তাকে কাঁটার ওপর আরো বুক এগিয়ে দিতে হবে। "কাঁটার ওপর বুকটা আরো চেপে ধরো পাখী, দেরী হ'য়ে গেলে দিনের আলো এসে পড়বে, ফুলে তখন আর রং ধরবে না।"

পাপিয়া কাঁটার ওপর বুকটা আরো চেপে ধরলে, কাঁটা একেবারে অন্তস্তলে প্রবেশ করলো, যন্ত্রণায় সে এক মর্ম্মস্পর্শী চীৎকার করে উঠলো। নিদারুণ, নিদারুণ সে যন্ত্রণা! তার গানের সুর তখন উদ্দাম হ'য়ে উঠলো, আকুল হ'য়ে উঠলো। সে গাইতে লাগলো সেই প্রেমের কথা, মৃত্যুতে যার পরিপূর্ণতা ঘটে, যে প্রেম সমাধির মধ্যে গিয়েও সমাপ্ত হয় না।

সেই অনুপম গোলাপ তখন প্রভাতের পূর্ব্বাকাশের মত লাল হ'য়ে উঠলো। পাপড়িগুলি হ'য়ে উঠলো রক্তের মত বাঙ্গা আর মাঝখানটা হোলো কবির মত টকটকে।

কিন্তু পাপিয়ার কণ্ঠস্বর তখন ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে, পাখা দুটি ঝটপট করছে, চোখের ওপর একটা পর্দ্দা পড়েছে। গানের সুর ক্রমশঃ মৃদু হ'য়ে এলো, গলা বন্ধ হ'য়ে এলো।

অন্তিম আবেগে সে একবার শেষবার গান গেয়ে উঠলো। পাণ্ডুর চাঁদ সে গান শুনে আকাশপথে থমকে দাঁড়ালো, প্রভাত যে হয়েছে সে কথা সে ভুলে গেল। নূতন গোলাপ সে গান শুনে আবেগে থর থর করে কেঁপে উঠলো, প্রভাত বায়ুর দিকে তার পাপড়গুলি মেলে ধরলো। প্রতিধ্বনি সে গান পাহাড়ের গুহায় গুহায় বহন করে নিয়ে গেল, তাই শুনে ঘুমন্ত রাখাল বালকদের স্বপ্ন ভেঙে গেল। সে গান নদীর বাঁশীতে বাঁশীতে উঠলো বেজে, ভাসতে ভাসতে তার বার্ত্তা সাগরে গিয়ে পৌছলো।

"দেখ, দেখ, চেয়ে দেখ, ফুলটি কেমন ফুটেছে!"—গাছ বললে। কিন্তু পাপিয়ার কোনো সাড়া নেই, ঘাসের মধ্যে সে নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে আছে, বুকে বিঁধে আছে কাঁটা

বেলা হ'লে যুবক জানলা খুলে বাগানের দিকে চাইলে।

"বাঃ, বাঃ, কি আমার কপাল! চমৎকার লাল গোলাপ ফুটে রয়েছে আমারি বাগানে! এমন সুন্দর গোলাপ তো জীবনে কখনো দেখিনি! নিশ্চয় এর একটা খুব অদ্ভুত রকমের লম্বা ল্যাটিন নাম আছে।"

জানলা থেকে হাত বাড়িয়ে সে ফুলটি ছিঁড়ে নিলে। তাড়াতাড়ি জামা গায় দিয়ে ফুলটি নিয়ে ছুটে চললো প্রফেসারের বাড়ী।

প্রফেসারের মেয়ে দরজার গোড়ায় বসে নীল পশমের সুতো জড়াচ্ছিলো, পায়ের কাছে শুয়ে ছিল তার কুকুরটা।

যুবক হেসে বললে—"তুমি বলেছিলে লাল গোলাপ দিতে পারলে তুমি আমার সঙ্গে নাচবে। এই দেখ কেমন গোলাপ, এর চেয়ে লাল রং কোনো গোলাপের হয় না। আজ রাত্রে তোমার বুকের কাছে একে গেঁথে রেখো, আমরা দুজনে যখন নাচবো তখন এটি থাকবে আমার ভালোবাসার নিদর্শন।"

মেয়েটি কিন্তু ভুরু কুঁচকে বললে—"আমার পোষাকের সঙ্গে এ ফুল তো মানাবে না। তা ছাড়া প্রধান রাজসদস্যের ভাগ্নে আমাকে পাঠিয়েছে কত জহরতের মালা! ফুলের চেয়ে তার দাম অনেক বেশী।"

যুবক রেগে উঠে বললে—"ছি ছি, তুমি তো বড় খামখেয়ালী!" গোলাপ ফুলটা সে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে, ধূলায় কাদায় সেটা মাখামাখি হ'য়ে গেল, একটা গাড়ীর চাকা তার ওপর দিয়ে চলে গেল।

মেয়েটিও রেগে উঠে বললে—"খামখেয়ালী? তুমি তো বড় অসভ্য দেখছি! একজন সামান্য ছাত্র, তার আবার এত তেজ? প্রধান রাজসদস্যের ভাগ্নের কত সম্পদ, তোমার তো তার কিছুই নেই!" এই বলে সে ঘরের ভিতর চলে গেল।

যুবক ফিরে যেতে যেতে ভাবলে—'ভালোবাসার মত বোকামি আর নেই। লজিক্ শাস্ত্রের দ্বারা এর কোনো প্রমাণ মেলে না,—যা কখনো ঘটতে পারে না সেই সব কথাই কেবল এতে শোনায়, যা সত্য নয় সেই কথাই বিশ্বাস করতে বলে। ভালোবাসার দ্বারা পৃথিবীর কোনো উপকার হয় না। আজকালকার দিনে ও সব কাল্পনিক জিনিষে মন না দিয়ে কাজের কথাই ভাবা উচিত, সুতরাং পড়াশুনায় মন দেওয়াই এখন সব চেয়ে ভালো।"

সে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে ধূলো ঝেড়ে নিয়ে দর্শনশাস্ত্রের পুঁথিখানা খুলে বসলো।

পশুপতি ভট্টাচার্য্য

(Oscar Wilder-এর একটি গল্প হইতে)

অচল প্রেম

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

৯

বাণীদেবী আজ বড়ই বিমর্ষ। কল্পনাদেবী ও মন্মথনাথ তাঁহাকে নানামতে হাস্য পরিহাসে হাসাইবার চেষ্টা করিয়াও হাসাইতে পারেন নাই, একটা বাগান পার্টিতেও লইয়া যাইতে সম্মত করিতে পারেন নাই। কত বুঝাইয়াছেন যে, বালিগঞ্জের 'অমৃতধামে' (দীপ্তির স্বর্গগতা জননী অমৃতময়ীর নামে) তাঁহার ডিউটিতে বাধা পড়িবে না, কেন না এটা পিক্নিক, সকাল হইতে সন্ধ্যা, কাজেই কেবল বিকালের দিকটা ছুটি লইয়া আসিলেই চলিবে—কিন্তু বাণীদেবী কিছুতেই সম্মত হন নাই। তাঁহার এক কথা, দীপ্তি অসন্তুষ্ট হইবে। বাণীদেবীর এই অসম্ভব সঙ্কোচ অথবা আশঙ্কার কারণ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া কল্পনাদেবী ও মন্মথনাথ চিন্তান্বিত।

বাণীদেবী শেষে হতাশভাবে বলিলেন, "না, না, তোমরা তাকে চেনো না, ঐ মেয়েটা ভয়ানক ধড়িবাজ—শেষটা সব হয়ত ফাঁসিয়ে দেবে।"

কল্পনা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "ফাঁসিয়ে দেবে? ইস্, একফোঁটা মেয়ে—"

মন্মথনাথ বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিলেন, "বলে,—সাত সমুদ্দুর পাড়ি মেরে গোষ্পদে জাহাজডুবি। তুমিত প্রতি ঝোপেই বাঘ দেখে থাকো। বলির পাঁঠা যদি ঠিক থাকে, আর তোমাদের দু'বোনের খাঁড়াখানা যদি শানানো থাকে—"

কল্পনাদেবী ধমক দিয়া বলিলেন, "দেখো, চুপ করে থাকো বলছি। তুমি বড় সাধু, না?"

বাণীদেবী আরও হতাশ স্বরে বলিলেন,—"বেশ, এখন কোথায় সবাই মিলে যুক্তি পরামর্শ আঁটবি, তা না ঘরেই ঝগড়া আরম্ভ করে দিলি? দেখ, যাতে করে ঐ ডাক্তারটার সঙ্গে দীপ্তির দেখাসাক্ষাৎ মেলামেশা না হয়, এখন তারই চেষ্টা হোক্ আমাদের ধ্যান জ্ঞান। মজদুর সভা নিয়ে একটা টোপ ফেলে এসছি, গিলতেও পারে বোধ হয়। তবে যে ধড়িবাজ! বলে কিনা আমায়, কল্পনাদেবীকে জানো? আ মর! সাত-গুষ্টীর খবর রেখেছে যেন ডিটেক্‌টিভগিরি করে!"

কল্পনা বলিলেন, "সত্যি, ও জানলে কি করে—"

মন্মথনাথ বলিলেন, "বাঃ মস্ত শক্ত কথা ত? ওর বাড়ী বালীগঞ্জে। হামেশা রাসবিহারী এভেনিউ দিয়ে যাওয়া আসা করছে—ও জানলে কি করে। তা ছাড়া তোমরা দু'বোনেই ত এ অঞ্চলে নামজাদা।"

কল্পনাদেবী বলিলেন, "তা বটে।"

বাণীদেবী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "উঁ হুঁ—যতটা সোজা মনে করছো ততটা সোজা নয়। এমনত সহরে এক ফ্ল্যাটে কত লোক কত সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ব্যবসা করছে, তা হঠাৎ আমার সঙ্গে যেন কল্পনার ব্যবসার যোগ আছে এইভাবে কথা কইলো কেন?"

মন্মথনাথ বলিলেন, "তা জেনেছে জেনেছে, তাতে ভয়টাই বা কি এত? তোমাদের দুজনের জানাশোনা আছে এইটে জানলেই যে সে অমনি চিলের মত ছোঁ মেরে তোমাদের মুখের শিকারটিকে ছিনিয়ে নেবে, এমনত কোন কথা নেই।"

কল্পনাদেবী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ কি জ্বালাতন কর! কাজের পরামর্শ একটা দিতে পারো না, কেবল জানো মস্করা করতে।"

বাণীদেবী বলিলেন, "না, মোনো ঠিক মস্করা করছে না। শিকার যে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই, একথা হয়ত ও বুঝতে পারছে না, কিন্তু ঐ মেয়েটার শিকার ছিনিয়ে নিয়ে যাবার কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। সত্যিই শিকার ফস্কে যাবার ভয় হচ্ছে আমার।"

কল্পনা বলিলেন, "হাঁ, তুমিও যেমন! সে রইলো কাশী, এ রইলো মক্কা, দুজনের দেখা সাক্ষাৎই নেই,..."

বাণীদেবী বাধা দিয়া বলিলেন, "নারে না...তোরা জানিসনে—ওদের নাকি বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, কেউ জানে না, আমি কোন রকমে মামা বুড়োর মুখে আড়াল থেকে ও কথা শুনেছি।"

কল্পনাদেবীর মুখ গম্ভীর হইল, বলিলেন, "তবেই ত!"

বাণীদেবী বলিলেন, "সাধে কি ভয় করছি? ওদের দুটো একজোট হলেই সব ফেঁসে যাবে। কত কষ্ট করে তবে না একটা সামান্য রকমের শিকার যোগাড় হোলো...তাও দেখছি টেঁকেনা। এক ভরসা এখনও তুমি।"

কল্পনাদেবী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি? তার মানে? আমায়ত আমলই দিলে না...একটা ছবির অর্ডারও দিলে না।"

মন্মথনাথ মুখখানা অন্ধকার করিয়া বলিলেন, 'ট্রাই এগেন! এদ্দিন যা করে আসছো...শিকারের টোপ হতে হবে আরও ভাল করে ..যাতে শিকার টোপ সমেত বঁড়শী গেলে!"

"কেল্লা মার দিয়া!" কথাটা দুই তিন বার আওড়াইতে আওড়াইতে হাতে বিষম শব্দে এক চপেটাঘাত করিয়া ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মিঃ এস্ সানিয়্যাল কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

বাণী দেবী সাগ্রহে বলিলেন, "কি, কিছু সুবিধে হোলো না কি? নতুন কিছু?"

শশাঙ্কমোহন আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আগে কিছু রিওয়ার্ড, তার পর এক্‌স্‌প্লানেশান।"

কল্পনা দেবী বলিলেন, "তা দেওয়া হচ্ছে এখনই। যাওনা দাদা একবার নিধেকে গেলাস বোতলগুলো আনতে বলে এসোনা। ব্যাপার কি শশাঙ্ক বাবু?"

শশাঙ্ক মোহন বলিলেন, "হচ্ছে, সবই হচ্ছে, আগে এক পেগ না চড়ালে মেজাজ সরিফ হচ্ছে না।"

পেগের পর পেগ চলিল, ঠুন ঠুন গেলাসের আওয়াজ বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজের সহিত মিশিয়া ঘর গুলজার করিয়া তুলিল।

শশাঙ্কমোহন পেগ চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "মিস গাঙ্গুলী খাসা মতলব দিয়েছিলেন—ঐ যে ডাক্তারটার জামিন হয়ে দাঁড়াতে—তার উপর কেস উঠলে ভাল ভাল উকীল লাগাতে...ওতেই কাজ হয়েছে, ওতেই মাছটাকে গাঁথা গেছে বঁড়শীতে, এখন খেলিয়ে ডাঙ্গায় তুলতে পারলে হয়। টু ইওর হেলথ মিস্ গাঙ্গুলী; এণ্ড মিস্ কল্পনা টু ইউ টু!"

মন্মথনাথ বলিলেন, "অধমই বা বাদ গেল কেন হে স্যানিয়্যাল সাহেব? না হয় আমিই তোমার হয়ে আমার স্বাস্থ্য পান করছি—"

শশাঙ্ক বলিলেন, "ও হো, অ-ফুলি সরি গাঙ্গুলী! টু ইওর—"

বাণী দেবী বলিলেন, "ঢের হয়েছে ওসব, এখন কি করে এলে বল।"

কল্পনা দেবীও তাহাতে সায় দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, হাতে হাতিয়ারে কিছু করেছেন, না, কেবল থিওরীই এখন চলছে।"

শশাঙ্কমোহন তখন একটু রঙ্গে চড়িয়াছেন, জড়িতস্বরে বলিলেন, "থিওরী, ড্যাম ইট! আমি মিঃ এস্ সানিয়্যাল, ক্যানভাসিং এজেন্ট, আমি কি ফেল হয়ে আসবো একটা ছেলেমানুষ ডাক্তারের কাছে? যেখানে আপনার মত সোসাইটি বিউটিরা ফেলিয়োর হলেন...কাছে ঘেঁষতেই পারলেন না...একখানা অয়েল পেন্টিং দূরে থাকুক ব্রোমাইড এন্‌লার্জমেন্টও আদায় করতে পারলেন না,...যেখানে এত বড় লেডী ডক্টর মিস গাঙ্গুলীও মাথা গলাতে পেলেন না, সেখানে এই আমি—মিঃ স্যানিয়্যাল কি করে এসেছি দেখুন—"

মিঃ সানিয়্যাল বুক চাপড়াইয়া পকেট হইতে একখানা ডেমি কাগজের মত পদার্থ বাহির করিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়খানা কাগজপত্র।

সকলে সাগ্রহে সৌৎসুক্যে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেখি, দেখি—"

মিঃ সানিয়্যাল তাড়াতাড়ি কাগজগুলি লুকাইয়া মধুর হাসি হাসিয়া আর এক পেগ চড়াইয়া বলিলেন, "হচ্ছে, হচ্ছে... লেডিস এণ্ড জেন্টলমেন! এত বড় সহর,...কেউ জানেই না গ্রেফতারের খবর...গৌয়ারগোবিন্দ নিজেও

জানায় নি ইচ্ছা করে কাকেও...কাজেই তার এডভার্টাইজিং এণ্ড ক্যানভ্যাসিং এজেণ্ট মিঃ সানিয়্যাল গিয়ে দাঁড়ালেন জামিন হয়ে···যত টাকা সিকিউরিটি চায় চাক, হোয়াট কেয়ারস হি ?"

বাণী দেবী অধীর হইয়া বলিলেন, "তাত বটেই। তারপর ?"

আত্মপ্রসাদসূচক অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী করিয়া মিঃ স্যানিয়্যাল বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "কোর্টের বাইরে এসেই একবারে আলাপ জমজমাট, বাড়ীতে ইনভিটেশান, ক্যানভাসিংয়ের আর এডভার্টাইজিংয়ের অর্ডার, টাকা এডভান্স,···"

সকলে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, এঁ্যা, সত্যি ?"

মিঃ সানিয়্যাল আবার পকেট হইতে কাগজের তাড়া বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "হিয়ার ইউ আর ! এসব কি মিথ্যে ? আমাদের এই ফার্মের নাম ঠিকানা দিয়ে নিগোসিয়েশানের কথা হয়ে গেলো। তারপর যেদিন কোর্টের মিটিং পর্য্যন্ত আটক রেখে খালাস দিলে, সেদিন আমার ও আমার উকীলদের আবার ঐ বাড়ীতে ইনভিটেশান হ'ল। খোলা প্রাণ, বললে, জেল যেতে কোন আপত্তি ছিল না, কেবল বাপের মনে কষ্ট হবে, এই দুঃখ···হাঃ হাঃ হাঃ একেবারে ইডিয়ট একটা।"

মন্মথনাথ বলিলেন, "বটেই ত। বাপের এমন কুপুত্তর ?"

কল্পনা দেবী বলিলেন, "দেখ দাদা, অত দরদ যদি, ত এতে নেমো না···বরাবরই দেখছি, তুমি ঐ ডাক্তারটার দিকে টেনে কথা কইছো। কেন, ও তোমার কে হয় ? এদ্দিন ত কারুর উপর দরদ দেখাও নি।"

মন্মথনাথ বলিলেন, "উঃ রাগটা বুঝি বড্ডো বেশী হয়েছে ওর উপর ? তোমাদের মোহিনী মায়ার চারে ঠোকর দেয়নি বলে, না ?"

বাণী দেবী ধমক দিয়া বলিলেন, "আঃ কি ছেলেমানুষী কর, ভাল লাগে না বলছি। তারপর, শশাঙ্কবাবু ?"

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, "রেস্পেক্টেবল ফার্মের নাম শুনে —আর আপনার এফিসিয়েন্সিও দেখেছে কিনা মিস গাঙ্গুলী। তাই একেবারে গলে গেছে। সহজ কথা ? যে ফার্মের এজেণ্ট ফস করে অজানা লোকের মোটা টাকার জামিন হয়ে দাঁড়ায়, মোটা টাকার উকীল দেয়, আবার যার পাটনায় একজন নামজাদা লেডী ডক্টর এণ্ড মিডওয়াইফ,—সে ফার্মের উপর নির্ভর করবে না ? এই মাসেই ডিসপেন্সারী খুলছে রসা রোড সাউথের উপর—এই কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্ট মেসার্স দত্ত ব্রাদার্সের উপর দুহাজার টাকার ওষুধের প্রথম দফায় অর্ডার, ক্রেডিটে এডভান্স করে দেবো আমরা—টাকাটা এই মাসেই দিয়ে দেবে মায় সুদ আর কমিশন—"

সকলে মহা উৎসাহে বলিলেন, "দেখি, দেখি, এগ্রিমেণ্ট-খানা"—

মিঃ স্যানিয়্যাল কাগজকয়খানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আর আপনি ওকে ব্যাক করবেন, মিস গাঙ্গুলী। তার জন্যেও কমিশনের বন্দোবস্ত, কেমন, অল-রাইট ? হুঁ হুঁ, এস স্যানিয়্যাল শুধু শুধু কালাপানি পার হয়নি হে মন্মথবাবু। হাঃ হাঃ হাঃ।"

কাগজ পড়িয়া কল্পনাদেবীর মুখখানি তেমন প্রফুল্ল হইল না। তিনি বলিলেন, "ওঃ মোটেত্ত দেখছি-হাজার চারেকেও দাঁড়ায় কিনা সন্দেহ। তবে যে দিদি লিখেছিল প্রথম মুখে দশ হাজার ?"

মিঃ সানিয়্যাল মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ সব হবে ডিয়ারি। একটু টাইম দাও—একটু খেলতে দাও—তোমরাও জয়েন করো, চার ফেলো।"

মন্মথনাথ একেবারে আগুন হইয়া বলিলেন, "সবাই মদ খেয়ে থাকে হে শশাঙ্ক, তা বলে কেউ মাত্রা ছাড়ায় না। পেঁচি মাতাল কিনা।"

মিঃ সানিয়্যাল বলিলেন, "বাই জোভ। হোয়াট ইজ অ্যামিস্ ? অপরাধটা কি করলুম ভাই ?"

কল্পনা দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া মন্মথনাথ মদের গেলাস তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "কিছু না, এস মদ খাই।"

ইহার পর বহুক্ষণ যাবৎ কনফারেন্স চলিল। গেলাসের পর গেলাসের সঙ্গে সদস্যদের মধ্যে ব্যবসা সম্পর্কে কল-কৌশলের অনেক পরামর্শ হইল। শেষে অবস্থা এমনই দাঁড়াইল যে, মিঃ স্যানিয়্যালকে ট্যাক্সিযোগে ঘরে পৌছাইয়া দিয়া আসিতে হইল। হাতে নগত করকরে টাকার কনট্রাক্ট —এমন সুযোগ ত রোজ ঘটে না।

১০

হিমাংশু আস্তাবলে মোটরগাড়ী ধুইয়া মুছিয়া সাফ করিতেছিল; পরিধানে তার লুঙ্গী ও গেঞ্জি, চন্দ্রমাধব বাবু সম্প্রতি একখানা মোটর কিনিয়া দিয়াছেন। তিনি যখন যে কাজটা করিতেন, তাহার অসম্পূর্ণতা রাখিতেন না। কাজে হাত দিলে তাহা সম্পূর্ণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করাই ছিল তাঁহার নীতি। এই হেতু বিচার বিবেচনা করিয়া ভাল করিয়া সব দিক না বুঝিয়া সুঝিয়া তিনি কোন কাজে হঠাৎ হস্তক্ষেপ করিতেন না। হিমাংশুর জন্য তিনি যখন ডিসপেন্সারী খুলিয়া দিবেন বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, তখন সে জন্য তিনি মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করিলেন না।

কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে বলরাম বসু ঘাট রোডে তিনি যখন বাড়ী করেন, তখন তাহার কোন অংশ অসম্পূর্ণ করিয়া রাখেন নাই। ভবিষ্যতে গাড়ী ঘোড়া রাখিবার প্রয়োজন হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া তিনি গাড়ীর আস্তাবলও তৈয়ার করাইয়াছিলেন। আজ যথার্থই সেই আস্তাবল কাজে লাগিয়া গেল

রসা রোডে হিমাংশুর ডাক্তারখানা খোলা হইয়াছে। হিমাংশু সেখানে সকালে বিকালে বসিতেছে। এজেন্ট সানিয়াল ও লেডী ডক্টর মিস বাণীদেবী খুব সাহায্য করিতেছেন। ক্রমে দুই চারটি রোগী ও খরিদ্দারও জুটিতেছে। তবে অবশ্য সেই খরিদ্দারগুলি এজেন্ট মহাশয় বা লেডীডক্টরের পয়সায় নিযুক্ত লোক কিনা, তাহা জানিবার কাহারও উপায় ছিল না। এমন গ্রন্থকার আছেন যিনি টাকা দিয়া নিজের লোককে প্রকাশকের কেতাবের দোকানে নিজের কেতাব কিনিতে পাঠাইয়া দেন, প্রকাশককে উৎফুল্ল রাখিবার উদ্দেশ্যে,—এও কতকটা সেই রকম। তা ছাড়া এজেন্টরা ট্রামে বাসে—সর্ব্বত্র কোন না কোন সূত্রে রসা রোডের নবীন ডাক্তার হিমাংশু মিত্রের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের বিস্ময়জনক পরিচয় প্রদান করিতে কখনও সুযোগ হারাইতেন না। লেডি ডক্টরও ডেলিভারি কেস পাইলেই ডাক্তার এইচ মিটারের অপূর্ব্ব ধাত্রীবিদ্যার পারদর্শিতার গল্পে গৃহস্বামীকে লুব্ধ করিবার সবিশেষ চেষ্টা করিতেন।

হিমাংশু এক মাসের মধ্যেই মোটর চালাইতে শিখিয়াছিল। এজন্য সে নিজেই গাড়ী চালাইত। তবে গাড়ী সাফ করিবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে মাঝে মাঝে স্বয়ং সখ করিয়া গাড়ী সাফ করিত; ইহাতে একদিকে সে যেমন আনন্দ পাইত, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে মোটরের নানা অংশের কলকব্জার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইত।

আজ সে একমনে মোটর-ধুইয়া সাফ করিতেছে, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে একটি ভদ্রমহিলা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

এমন সময়ে—তখন বেলা প্রায় বারোটা—ভদ্র মহিলা? 'কল' দিতে কখনই নয়; কারণ, খুব জরুরী হইলে ফোন করিতেন অথবা লোক পাঠাইয়া দিতেন। সে জানিতে চাহিল, মহিলা একাকিনী আসিয়াছেন, না তাঁহার সঙ্গে লোক আছে? ভৃত্য তাহার জবাবে সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনাইয়া দিল,—তিনি একাকী, খুব ছেলে মানুষ, মস্ত মোটর গাড়ীতে আসিয়াছেন, ইত্যাদি।

হিমাংশু একটু যে বিস্মিত হইল না তাহা নহে, কৌতূহলও জাগিল যথেষ্ট। অল্প বয়স্কা ভদ্রমহিলা—একাকিনী—কে ইনি? তাড়াতাড়ি সাবান জলে হাত মুখ ধুইয়া গলায় তোয়ালে খানা ঝুলাইয়া সে দ্বিতলের বসিবার ঘরের উদ্দেশ্যে একটু দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

বসিবার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় অনেকগুলি খাঁচায় অনেক রকমের পাখী ছিল, আর একটা ষ্ট্যাণ্ডের দাঁড়ের উপর পায়ে শিকল বাঁধা একটা কাকাতুয়া ছিল। হিমাংশুদের দেশের বাড়ীতে একটি ছোট খাটো চিড়িয়াখানা ছিল, পিতা-পুত্রের এই সখটি অতি মাত্রায় প্রবল ছিল, বেথারও তাহাতে বেশ একটু অংশ ছিল। কুকুর ও ঘোড়ার সখও হিমাংশুর ছিল বটে, কিন্তু বেশী নহে। কলিকাতার বাসার আস্তাবলে তাহার একটা ঘোড়া থাকিত, সেইটি আরোহণ করিয়া সে প্রত্যূষে প্রত্যহ একবার মাঠে ছুটাছুটি করিতে যাইত। কিন্তু পাখীর সখই ছিল তাহার অত্যন্ত বেশী।

সোপান অতীক্রম করিয়া বারান্দায় আসিতেই সে দেখিল, ভদ্র মহিলাটি তাহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া কাকাতুয়ার সহিত

গম্ভীর আলাপে ও হাস্য পরিহাসে নিমগ্না। মহিলাটি সুবেশা সুন্দরী তরুনী, অন্ততঃ তাঁহার যতটুকু দেখা যাইতেছিল, তাহাতে হিমাংশু এই ধারণা করিয়া লইয়াছিল। পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া তরুণী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। চারি চক্ষুর মিলন হইতেই হিমাংশুর মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছিল, তাহা তৎক্ষনাৎ দূর হইল। মহিলাটির পশ্চাদ্ভাগ দেখিয়াই সে তাঁহাকে দীপ্তিময়ী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল।

দীপ্তি একবার তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "নমস্কার। এবা যে বল্লে নীচে আস্তাবলে আছেন, তা আপনাকে দেখেই বুঝতে দেরী হয় না।"

হিমাংশু সেই সরস আলাপের কোন জবাব না দিয়া বিন্দু মাত্র না হাসিয়া সহজ সামাজিকতা রক্ষা করিয়া প্রতিনমস্কার করিল, বলিল, "আসুন, বসবেন আসুন। কিছু দরকার আছে কি?"

দীপ্তি যে সামান্য একটু ক্ষুন্ন হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু সে হাসিয়াই বলিল, "হাঁ, আছে; দরকার না থাকলে এতটা পথ বেয়ে আপনার দ্বারস্থ হতুম না। আপনার কাকাতুয়াটি ত বেশ সভ্যভব্য—কেমন আমার পা তুলে মাথায় ঠেকিয়ে নমস্কার করলে, জিজ্ঞাসা করলে, আমি কে, আমি কোথেকে আসছি, কি দরকার—"

হিমাংশুর অপ্রসন্ন মুখ প্রসন্নভাব ধারণ করিল, সে উৎসাহভরে বলিল, হাঁ, নন্দন অনেক কথা শিখেছে, আমায় খুব ভালবাসে, দেশে গেলে আমার সঙ্গে যায়। দেখবেন, ও কেমন খাবার খায়?" হিমাংশু কাকাতুয়ার বাটী হইতে খাবার তুলিয়া লইয়া নিজের জিহ্বাগ্রে রাখিয়া কাকাতুয়ার মুখের সম্মুখে ধরিল, সে ঠোঁট দিয়া তাহা উঠাইয়া লইয়া খাইতে লাগিল।

ঘরের ভিতর গিয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলে দীপ্তি বলিল, "আপনার পাখীর সখত খুব? এ সব দেখে কে? যেমন করে লুঙ্গি পরে আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ার সেবা করে এলেন, এ সব চিড়িয়ার সেবাও তেমনি করে করেন বুঝি?"

হিমাংশু গম্ভীর ভাবে বলিল, "তাই হয়ত করি। কিন্তু কি করতে হবে আমায় বল্লেন না ত?"

দীপ্তি বলিল, "দেখছি তাড়াতে পারলেই যেন বাঁচেন—কেন, এক দেশে বাড়ী, আলাপ পরিচয়ে দোষ আছে কি কিছু?"

হিমাংশু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "সে কি কথা—আপনার যতক্ষণ ইচ্ছা বসুন, কথাবার্ত্তা বলুন—"

দীপ্তি বলিল, "কাকাতুয়াটাকে বেশ পোষ মানিয়েছেন ত? সব পাখীরাই ঐ রকম নাকি? বাঃ খুব ক্ষমতা ত আপনার?"

হিমাংশু বলিল, "না, তা না, কাকাতুয়া মাত্রেই ঐ রকম, ওতে কিছু বাহাদুরী নেই। পশুপক্ষীদের স্বভাবই এই, ওদের যারা আদর করে, ওরাও তাদের পোষ মানে।"

দীপ্তি বলিল, "তারই মানে হচ্ছে যে, আপনি ওদের খুব আদর যত্ন করে থাকেন। এটাও কি আপনার ডাক্তারীর একটা অঙ্গ?"

হিমাংশু কেবল যে বিস্মিত হইল, তাহা নহে, সে ক্ষুব্ধও হইল, বলিল, "তার মানে?"

দীপ্তি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ-না হইয়া বলিল, "এই যেমন কোমরে চাদর জড়িয়ে কামার কুমোরদের সঙ্গে কেত্তোনে মেতে যাওয়া বা মজদুর সভাতে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া"—

এবার হিমাংশুর বিস্ময় ও ক্রোধের সীমা রহিল না। তাহার দৈনন্দিন কার্য্যের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত এই গর্ব্বিতা জমিদার কন্যার সম্পর্ক কি? সে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া একটু উষ্মার সহিত বলিল, "আমি কি করি না করি, তা নিয়ে আপনার ব্যস্ত হবার কোন দরকার দেখিনে ত। আপনার আর কিছু বলবার আছে?"

ইহা হইতে স্পষ্ট ভাষায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ার আর কি সহজ কথা থাকিতে পারে, তাহা দীপ্তি জানিত না। কিন্তু তথাপি সে ধীরভাবে বলিল, "প্রত্যেক মানুষেরই অন্য মানুষের ভুল দেখিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য—"

হিমাংশু তখনও ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, 'সে অধিকার থাকে তাদের যাদের অনেক দিনের পরিচয় বা সম্বন্ধের দাবী থাকে।" ক্ষণপরে শ্লেষের সুরে বলিল, "আপনি অনেক লেখাপড়া শিখেছেন শুনেছি। আর লেখাপড়া শিখলে মানুষের মনটা

খুব উদার হয়ে থাকে বলেও শুনে আসছি। আপনারা মানুষের ভিতরে ছোট বড় কিছু আছে বলে মানেন না। তবে কামার কুমোরদের কথায় বা মজদুরদের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন কেন?"

দীপ্তি বলিল, "আপনি কি ভাবেন, স্বদেশী সেজে বেড়ালেই, আর চাষাভূষোদের সঙ্গে নেচে গেয়ে বেড়ালেই মস্ত দেশভক্ত হওয়া যায়?"

হিমাংশু বলিল, "না, জমিদার যদি গরীব প্রজাদের কড়াক্রান্তি আদায়ে একটুও গাফিলতি না ক'রে, তাদেরই পয়সায় মোটর ল্যাণ্ডো চড়ে বেড়ায় আর তাদের সুখদুঃখের কোন খোঁজ খবর না রাখে, তবেই দেশভক্ত হয়।"

কথাটা বলিয়াই কথার ঝাঁঝের মাত্রা সীমা ছাড়িয়া গিয়াছে বুঝিয়া হিমাংশু লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইল। সে এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু তন্মুহূর্তেই দীপ্তির বিষাক্ত বাক্যবানে সে আর সেই অবসর প্রাপ্ত হইল না। দীপ্তি বলিল, "দেখুন, লোক দেখানো স্বদেশীতে আর ভণ্ডামীতে কোন তফাৎ আছে বলে আমি মনে করিনা। আমরাও কলেজে পড়বার সময় স্বদেশীতে মেতে পিকেটিং করেছি, সত্যাগ্রহ করেছি। কিন্তু তার পর যখন দেখেছি, স্বদেশী করে কারবারে লোকে কেবল স্বার্থ খুঁজছে,—কোন ওতে জোচ্চুরী আর ভণ্ডামী দলাদলি আর মোড়লীর লোভই প্রবল হচ্ছে, তখন থেকেই খদ্দর ছেড়েছি, ওদিক আর মাড়াই নি মোটে।"

হিমাংশু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "সব জোচ্চুরী? সব ভণ্ডামী?

দীপ্তি বলিল, "সব না হোক, প্রায় সব। আচ্ছা বলুন ত, স্বদেশী ব্যাঙ্কিং আর ইনসিওরেন্সে দেশের কত লোকের টাকা ডুবলো?"

ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া হিমাংশু বলিল, "দেশ ও জাতের সম্বন্ধে আপনার ধারণা এই রকমই না কি? যাক্, আপনি যে কষ্ট করে এতটা এসে আমায় আমার কর্ত্তব্য শেখাতে এসেছেন, এজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। বোধ হয় আপনার সে কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে?"

বার বার এরূপ স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের ইঙ্গিতেও যে দীপ্তি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই, তাহা তাহার ঈষৎ হাস্যোদীপ্ত বদন দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইতেছিল। সে হিমাংশুর ধৈর্য্যচ্যুতি ও ক্রোধ বিশেষরূপে উপভোগ করিতেছিল। সে তাহার এই স্পষ্ট বিদায়দানের উত্তরে বলিল, "না, কর্ত্তব্য আর একটু বাকি আছে। বলতে এসেছিলুম, কোর্টের অধিবেশন পর্য্যন্ত সামান্য কয় ঘণ্টা আটক থাকাও যা, আর দুমাস চারমাস জেল হওয়াও তাই নয় কি?— অপমান ত দুয়েই সমান? সরকারী খাতায় নাম উঠ্‌লো ত ওতে—ওটা কি আপনার ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই সুবিধের হোল?"

হিমাংশু ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। যাহা তাহার পিতাও তাহাকে বলিতে দ্বিধা বোধ করেন, সম্পূর্ণ পর এই অল্পবয়স্কা নারী কোন অধিকারে তাহাকে সে কথা বলিতে সাহস করিল? বিশেষত সে যখন পূর্ব্বে অহঙ্কারে তাহাকে ও তাহার পূজ্য পিতৃদেবকে অপমান করিয়াছে! এরূপ নির্লজ্জা মুখরা নারী সে জীবনে দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। অন্তরে রুদ্ধ ক্রোধ যথাসম্ভব দমন করিয়া সে শান্ত গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনি বড় লোক জমিদার, আপনার হয়ত যথেষ্ট সময় আছে অপব্যয় করবার। আমরা খেটে খেকো মানুষ, আমাদের অনেক কাজ। আমার বিবেচনায় এইখানেই আমাদের কথাবার্ত্তা শেষ করলেই ভাল হয়।" সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

দীপ্তি এবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে করিতে বলিল, "আমার কর্ত্তব্য আমি করে গেলুম। লোকের এমন এক একটা সময় আসে যখন তাকে তার মঙ্গল দেখিয়ে দিলেও সে দেখতে চায় না।"

হিমাংশু বলিল, "বলেইছিত, আপনার এই অযাচিত উপদেশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দুঃখের বিষয়, আপনার এই মহত্বটা মাঠে মারা যাচ্ছে—"

ফটকে এই সময়ে আর একখানা গাড়ী লাগিল এবং তাহা হইতে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা অবতরণ করিলেন। উপরের বারাণ্ডা হইতে তাঁহাদের বেশ দেখা যাইতেছিল, তাই তাঁহাদিগকে দেখিয়াই হিমাংশু কথা কহিতে কহিতেই থামিয়া গেল।

দীপ্তি সোপান অবতরণ করিবার পূর্ব্বে হিমাংশুকে বলিল, "দেখুন হিমাংশু বাবু, আপনি যাই মনে করুন, আমি সত্যিই আপনার ভালর জন্যে এ সব কথা বলতে এসেছিলুম। এ অধিকার যে আমার একেবারেই নেই তা বলতে পারেন না। আমার বাবা ছিলেন আপনার বাবার পরম বন্ধু, তার উপর আপনি আমার বন্ধু নীহারের দাদা—সে সুবাদেও আপনাকে এ সব কথা বলবার অধিকার আমার আছে। এখানে আপনার কেউ নেই—ধরুন যদি আজ আপনার মা থাকতেন—"

হিমাংশু বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল—এই অল্পবয়স্কা নারীর সবই অদ্ভুত। কথা কহিতেছে যেন কত বড় জ্ঞানবৃদ্ধ অভিভাবকের মত, অথচ তাহার সে অধিকার কিছুই নাই! সে অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বলিল, "আপনার সৎ উদ্দেশ্যে আমি সন্দেহ করছি না—"

বাধা দিয়া দীপ্তি বলিল, "আপনি সন্দেহ করুন বা না করুন, তাতে কিছু আসে যায় না। আমার বলার উদ্দেশ্য এইটুকু যে, আমি অনধিকার চর্চ্চা করি নি, কর্ত্তব্য পালনই করেছি। আর সেই জন্যই এই চিঠি দুখানা আপনাকে দিয়ে যেতে এসেছি, অবসর মত পড়ে দেখবেন। একখানা আমি আপনার বাবাকে লিখেছিলুম, আর একখানা তাঁর উত্তর। চিঠি দুখানা আপনার পড়ে রাখা দরকার, আমারও আপনাকে ঐ চিঠির কথা জানানো দরকার, তাই দিয়ে গেলুম। আমার ওতে আর দরকার নেই, ইচ্ছে করলে পড়া হলে রেখে দিতেও পারেন, ছিঁড়ে ফেলতেও পারেন। চল্লুম, নমস্কার।"

পত্র দুইখানি হিমাংশুর হস্তে দিয়া দীপ্তি আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে সোপান অবতরণ করিতে লাগিল।

হিমাংশু যন্ত্রচালিত পুত্তলের মত তাহার অনুসরণ করিতেছিল। সে তখন ভাবিতেছিল, এমন প্রগল্‌ভা নারী বাঙ্গালী ভদ্র গৃহস্থের ঘরে অভিনব বটে! কেবল মুখরা প্রগল্‌ভা নহে, দর্পদম্ভের অবতার! মাথার উপর শাসন করিবার কেহ নাই, কেবল স্বেচ্ছাচালিত হইয়াই আসিতেছে, কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, কাহারও মর্য্যাদা রাখিয়া কথা কহিতে অভ্যস্ত হয় নাই! কিন্তু একদিন এমন অবস্থায় পড়িবে, যখন তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, সে ছাড়া আর তাহার মতামত ছাড়া জগতে এমন অনেক কিছু আছে, যাহা তাহার চেয়ে এবং তাহার মতামতের চেয়ে অনেক প্রবলতর।

হঠাৎ আগন্তুকদের উপর দৃষ্টিপাত হইতে হিমাংশু দেখিল আগন্তুকা নারীটি করযোড়ে দীপ্তিকে নমস্কার করিয়া সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন—তিনি মিস বাণীদেবী, মিড্‌ওয়াইফ ও লেডি ডক্টর এবং তাঁহার সঙ্গীটি বাবু শশাঙ্কমোহন। দীপ্তি ও একটি ছোট প্রতিনমস্কার করিয়া সগর্ব্বে গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল।

হিমাংশু তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ভদ্রতার খাতিরে দাঁড়াইয়াছিল। সোফার গাড়ী ষ্টার্ট দিতেছে, এমন সময়ে দীপ্তি শ্লেষের ভঙ্গীতে আগন্তুকদের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া বলিল, "এই অদ্ভুত জীব দুটি এসে জুট্‌লেন কোথা হতে? দেখবেন, সাবধান।"

হিমাংশু কি জবাব দিল, গাড়ীর গতির শব্দে সে কথা শুনা গেল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

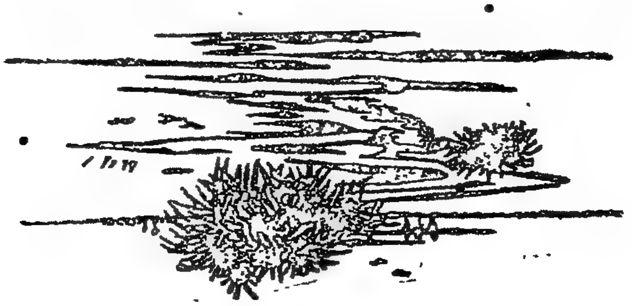

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে বাংলা কংগ্রেসের মতের দৃঢ়তা

বৈদেশিক শাসনতন্ত্রের অধীনে আমরা যে আশানুরূপ সুখ সুবিধা পাইব না এবং অনেক বিরুদ্ধভাব সহিত আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে সে কথা সুনিশ্চিত। বিগত অনেকগুলি শাসনতন্ত্রে এবং আগামী শাসনতন্ত্রে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু এই সব শাসনতন্ত্রের যে সকল অংশ আমাদের পরাধীনতার অবস্থাকে স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা আছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। আগামী শাসনতন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর অংশ হইতেছে, সেই জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। কারণ, ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরবিরোধী কৃত্রিম স্বার্থের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতিমধ্যেই দরকষাকষি ও মনোমালিন্য আরম্ভ হইয়াছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভবিষ্যতেও মিলনের পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় সৃষ্টি করিবে, অর্থনৈতিক ও জাতীয়তার ভিত্তিতে দলগঠনে বাধা দিবে এবং সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে কলহ জাগাইয়া রাখিয়া আমাদের পরাধীনতাকে স্থায়ী করিবে। এই বাঁটোয়ারার মধ্যে অবিচারমূলক যে সব ব্যবস্থা আছে তাহাও সুবিবেচিত ও সুপরিকল্পিত মনে না করিবার কারণ নাই। কারণ যাঁহারা বেশী সুবিধা পাইয়াছেন, তাঁহারা সেই সব বেশী সুবিধা রক্ষা করিবার জন্য সব সময় চেষ্টা করিবেন এবং যাঁহারা প্রাপ্য পান নাই বলিয়া মনে করিতেছেন তাঁহারাও প্রাপ্য পাইবার জন্য আন্দোলন চালাইতে থাকিবেন। এইরূপে সাম্প্রদায়িক কলহ বাঁচিয়া থাকিবে। বর্ত্তমানেই অনেকটা এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। পুরাতন শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে নূতন শাসনতন্ত্র আসিয়াছে, এ শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন শুধুমাত্র সময়সাপেক্ষ। কিন্তু, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দেশের মধ্যে যে কৃত্রিম স্বার্থ ও বিভাগের সৃষ্টি করিল, তাহার প্রভাব দূর করা সহজ হইবে না, এবং ভবিষ্যতে যে শাসনতন্ত্রই প্রবর্ত্তিত হউক এই বিভাগকে স্থায়ী করিবার জন্য সব সময়েই একদল লোক থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যে ঐক্যের প্রয়োজন এই বিভাগ সেই ঐক্যকেও ঠেকাইয়া রাখিবে। কাজেই, দেশের মঙ্গলকামী সকল ব্যক্তিরই একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করা। যদিও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় সম্প্রদায় বিশেষের লাভ লোকসান লইয়া কোন প্রকার উৎকণ্ঠা প্রদর্শনের আমরা পক্ষপাতী নহি।

এ সম্পর্কে কংগ্রেসের আচরণে পূর্ব্বে কোন দৃঢ়তা প্রকাশ পায় নাই। পরে কংগ্রেস বিশেষ কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তের দ্বারা ইহা বর্জ্জনের প্রস্তাব গ্রহণ না করিলেও কংগ্রেস-নির্ব্বাচন প্রচারপত্রে ইহা বর্জ্জনের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু, এ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসই যথোচিত দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া আইন সভার ভিতরে ও বাহিরে এই বাঁটোয়ারা রহিত করিবার আন্দোলন চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

কংগ্রেস হিন্দু বা মুসলমান কাহারও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে, অথবা ইহাদের বা অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানও নহে। কাজেই সম্প্রদায় বিশেষের বা সম্প্রদায় সমূহের মনোভাবের ও মতামতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিবার দায়িত্বও ইহার নাই। যে সাম্প্রদায়িকতা

বিরোধী জাতীয়তা ও স্বাধীনতা ইহার আদর্শ ও কাম্য, তাহার যাহাতে ক্ষতি না হয়, এবং তাহার প্রতি আক্রমণের প্রতিরোধ যাহাতে সাধ্যমত করা যায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করাই ইহার একমাত্র কর্ত্তব্য। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস এই সাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন। তাঁদের অবলম্বিত এই সুনির্দ্দিষ্ট পথ যদি অন্যান্য প্রদেশ কর্ত্তৃক এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুসৃত হয় তবেই বাংলা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা পূর্ণসাফল্য লাভ করিবে।

এখন অনেকের ভয় হইতেছে যে ইহার ফলে মুসলমানেরা সম্ভবতঃ কংগ্রেসের উপর রুষ্ট হইবেন। অনেকে যে হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অধিকাংশ লোক দেশের মঙ্গল সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের মাপকাঠিতে মাপিতেছেন। বাঁটোয়ারার ফলে সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত লাভবান হইয়াছেন। কাজেই এই আপাতপ্রতীয়মান লাভ সহসা যে অনেকে ত্যাগ করিতে চাহিবেন না, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে। হিন্দুদের ভিতর যাঁহারা বাঁটোয়ারার লাভ লোকসান লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন, এবং হিন্দুরা যাহাতে আরও কিছু বেশী আসন পান তাহার জন্য আন্দোলন করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা বাড়াইতেছেন, তাঁহারাও সমভাবেই সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হইতেছেন।

কিন্তু, তাহা হইলেও, যাঁহাদের দৃষ্টি সাম্প্রদায়িকভাবে ছাড়াইয়া আরও উর্দ্ধে উঠিতে পারে, এমন লোকের অভাব কোন সমাজেই হয়ত নাই। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির আলোচ্য প্রস্তাব কুমিল্লার মৌলবী আস্রাফউদ্দীন আমেদ চৌধুরী উৎসাহসহকারে সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ে বাংলার মুসলমান জনসাধারণের উপর তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর প্রভাব আর কাহারও নাই। বাংলার মুসলমান সমাজে তাঁহার মতাবলম্বী প্রভাবশালী আরও লোক আছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। শ্রীযুক্ত বসু পণ্ডিত জহরলালকে যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে ভারতবর্ষের মুসলমান নেতৃবর্গের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানেরা বাঁটোয়ারা রক্ষার পক্ষে নহেন, তাহারাও ইহাকে ভবিষ্যতের পক্ষে সমানই ক্ষতিকর মনে করিয়াছেন।

একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, বাংলা কংগ্রেস, নিখিল ভারত কংগ্রেসের অবলম্বিত নীতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা ভঙ্গ করিয়াছেন কিনা। পণ্ডিত নেহেরু বাংলা কংগ্রেসকে এই মর্ম্মে পত্র দিবার পর ইহার অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু পণ্ডিতজীকে যে দীর্ঘ উত্তর দিয়াছেন তাহাতে তিনি যোগ্যতার সহিতই দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদের অবলম্বিত পথ কংগ্রেস নীতির বিরোধী নহে, বরং তাহারই ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক পরিণতি। তিনি পণ্ডিতজীর নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই ওঁহাদের অবলম্বিত নীতির অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রবাসী ভারতবাসীদের দুর্দ্দশা

কংগ্রেসের বৈদেশিক বিভাগটি ইতিমধ্যেই তাঁহাদের উপযোগিতার প্রমাণ দিতেছেন। বিভাগটি আরও শক্তিশালী ও সুগঠিত হইলেই তবে, ইঁহারা প্রয়োজনানুরূপ কাজ দেখাইতে পারিবেন।

আইন পরিষদে শীঘ্রই প্রবাসী ভারতবাসীদের অবস্থার কথা বিবেচিত হইবে। ইঁহাদিগকে অন্যদের সহিত সমান মর্য্যাদাদানের জন্য ভারতসরকারের প্রতিহিংসামূলক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় কিনা, তাহাও এই সময়ে বিবেচিত হইবে। প্রবাসী ভারতীয়দের দুঃখ দুর্দ্দশা সম্বন্ধে কংগ্রেসের বৈদেশিক বিভাগ যে বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন এই আলোচনার সময় তাহার তথ্য সমূহ বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ ও উপনিবেশ সমূহে ভারতবাসীরা নিতান্ত অমর্য্যাদাসূচক ব্যবহার পাইয়া আসিতেছেন অথচ, এই সকল স্থানের লোকেরা ভারতবর্ষ হইতে নানাপ্রকার সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন এবং প্রভুজাতির সমান মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। মর্য্যাদা আদায় করিবার শক্তি না থাকিলে কেহ অপরের নিকট হইতে মর্য্যাদা পায় না, এসম্বন্ধে মানুষের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া সুফল পাইবার কোন দৃষ্টান্ত আধুনিক ইতিহাসে নাই। যাহারা আজ নিঃসঙ্কোচে ভারতবাসীর প্রতি অন্যায় আচরণ করিতেছে, তাহারা যদি জানে যে, ভারতবর্ষেরও প্রতিশোধ গ্রহণের

শক্তি আছে, ভারতবাসীদের সহিত খারাপ ব্যবহার করিলে তাহাদেরও স্বার্থহানি ঘটিতে পারে, তাহা হইলে ভারতবাসীর সহিত ব্যবহার সম্পর্কে তাঁহারা যে সাবধান হইবেন একথা নিশ্চিত।

ধর্ম্মঘটের নূতন পন্থা

নিজেদের দুঃখদুর্দ্দশার অভিযোগ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষকে অবহিত করিবার জন্য শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করিবার রীতি নূতন নহে। শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিলে, মালিকেরা তাহাদের স্থানে অন্য শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্মঘটীদের চেষ্টা নিষ্ফল ও তাহাদিগকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু, বর্ত্তমানে ধর্ম্মঘট করিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া এবং ফ্যাক্টরি পরিত্যাগ কিছুতে করিতে না চাহিয়া শ্রমিকেরা মালিকদের বিশেষ বিপদগ্রস্ত করিতেছেন। প্যারিসে আরম্ভ হইয়া ইহার ঢেউ ভারতবর্ষেও আসিয়া পৌছিয়াছে।

বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির একটি মন্তব্য

বম্বে আইন সভায় আলোচ্য কোন প্রস্তাবের সমর্থনকল্পে দুইটি কৃষক সভা আহ্বানের মুদ্রাযন্ত্র মুদ্রাকর বা প্রকাশকের নামহীন বিজ্ঞপ্তিপত্র (বগ্‌লান তালুক কংগ্রেস কমিটির) বিলি করার অপরাধে সাতারার প্রথম শ্রেণী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে দত্তত্রয় এম বিদকরের পাঁচ টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক সপ্তাহের জেল হয়। আসামী আপীল করেন। আইন অনুসারে দণ্ডদান অন্যায় হইয়াছে এবং আইনের একটি জটিল সমস্যা ইহার সহিত জড়িত আছে বলিয়া নাসিকের দায়রা জজ মামলাটি বম্বে হাইকোর্টে পাঠান। প্রধান বিচারপতি তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন :—

"সরকারের যুক্তি যদি গ্রহণ করিতে হয় তবে, নিমন্ত্রণপত্রে এবং ক্লাবের বিজ্ঞপ্তিপত্রে মুদ্রাকর, প্রকাশক এবং মুদ্রাযন্ত্রের নাম প্রকাশ না করিয়া ভাইসরয় ও গবর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের সকলেই প্রেস আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়া থাকেন বলা যাইতে পারে।"

আইনের চক্ষে সকলেই সমান এই নীতি এবং জবরদস্তির নীতির একত্র গমনের ফলে অনেক শোকাবহ কৌতুকের সৃষ্টি হইতে পারে।

বিলাতের লোকের ঐশ্বর্য্য ও ধন সঞ্চয়

সাধারণতঃ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকেরাই পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমাইয়া থাকেন,—তাহাও আবার প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলের লোকেরা। কাজেই, এখানকার জমা অর্থের পরিমাণ দেখিয়া দেশের মোট অর্থ সম্পদের কোন অন্দাজ পাওয়া যায় না। কিন্তু, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের অবস্থা ও সঞ্চয়শক্তির কতকটা আভাষ ইহা হইতে পাওয়া যাইতে পারে। বিলাতের সেভিংস্-ব্যাঙ্কের আমানতকারীর সংখ্যা এক কোটি। গ্রেট-ব্রিটেনের জনসংখ্যা সাড়ে চারি কোটির কাছাকাছি। এই সমগ্র জন সংখ্যার কথা ধরিলেও, বলিতে পারা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই সঞ্চিত অর্থ আছে। ইহাদের সঞ্চিত অর্থের মোট পরিমাণ ৪১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। অর্থাৎ প্রত্যেক আমানতকারীর ভাগে প্রায় ৪১ পাঃ এবং আমাদের টাকায় প্রায় সাড়ে পাঁচ শত করিয়া টাকা পড়ে। আমাদের সঞ্চয়ের না হউক ঋণের পরিমাণ ইহার কাছাকাছি হইবে।

খেলোয়াড়ী মনোভাবের অভাব

কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত পৌর অভিনন্দন, কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের একদলের বিরুদ্ধ মনোভাব থাকার অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করিয়া মহামেডান স্পোর্টিং খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দেন নাই। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের অধিকাংশ দলাদলি যে সাম্প্রদায়িক আকার গ্রহণ করে তাহা নিতান্তই শোচনীয় হইলেও, নানা কারণে তাহাকে সম্পূর্ণ পরিহার করা যাইতেছে না (যদিও, তাহা গেলেই ভাল হইত এবং যাহাতে তাহা যাইতে পারে তাহার জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য) কিন্তু গণজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহার জের টানিয়া আনা আরও অনেক বেশী দুর্গতির পরিচায়ক। মহামেডান স্পোর্টিং প্রস্তাবিত অভিনন্দন অস্বীকার করিয়া এই দোষের অংশভাগী হইয়াছেন। তাঁহারা

খেলোয়াড় বলিয়া দলাদলির মধ্যে আসিয়া পড়া তাঁহাদের পক্ষে আরও অন্যায় হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে টিমের গঠন যে আবাঞ্ছনীয় এবং ফলে উভয় টিমের সমর্থকদিগের ভাগ যে প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িক ভাগ অনুসারেই হওয়া স্বাভাবিক, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহা হইলেও, এরূপ যাহাতে না হয় তাহার জন্য সকলেরই সাধ্যগত চেষ্টা করা উচিত এবং মহামেডান স্পোর্টিংএর অসামান্য সাফল্যে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীই তাঁহাদিগকে নিজেদের লোক মনে করিয়া গৌরব বোধ করিয়াছেন। সকলে যদি এরূপ মনে নাও করিতেন তবুও, খেলোয়াড়দের নিজেদের এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া মনে করা কখনই সমর্থনযোগ্য হইত না। অপরে যখন তাঁহাদের সাফল্যে আনন্দিত হইয়াছে এবং এজন্য তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিতে চাহিতেছে তখন তাঁহারা যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এবং সেইটাই তাঁহাদের একমাত্র বা প্রধান পরিচয় একথাটা স্মরণ করিয়া দিবার মধ্যে যে রূঢ়তা আছে, তাহা খেলোয়াড়দের পক্ষে শোভনীয় নহে।

তদুপরি, কলিকাতা ভারতবর্ষের, অন্ততঃ বাঙলাদেশের সর্ব্বপ্রধান পৌর প্রতিষ্ঠান। ইহা কোন সম্প্রদায় বিশেষের জিনিস নহে, আবার কোন সম্প্রদায় বিশেষের অধিকার বহির্ভূত জিনিষও নহে। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বাঙ্গালী, 'অবাঙ্গালী' ইওরোপীয় সকলেরই অধিকার আছে। মুসলমানদের একদলের ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিলেও সকলে এই দলভুক্ত নহেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটি এখনও মুসলমান বর্জ্জিত হয় নাই। খেলোয়াড়েরা যদি নিজেদের শুধু মাত্র মুসলমান বলিয়াও মনে করিতেন তাহা হইলেও, তাঁহারা কর্পোরেশন সম্পর্কে এই প্রকার ব্যবহার করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহারা একটি বিশেষ রাজনীতিক দলের মুসলমান বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেন এবং তাহাও এই প্রকার অনুচিত ক্ষেত্রে।

সাম্প্রদায়িকতা যদি গৌরবের জিনিষ হইত তবে হয়ত, সাম্প্রদায়িক অভিমানের এইরূপ উগ্রপ্রকাশের মধ্যেও একটা প্রশংসার দিক থাকিত। কিন্তু, সাম্প্রদায়িকতা গৌরবের নহে, লাভেরও নহে, ইহার সত্য কোন ভিত্তিও নাই।

বাঙ্গালায় নূতন প্রতিষ্ঠান

দেশের সর্ব্বাঙ্গীন সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সার্ভেন্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির অনুসৃত নীতি অনুসারে কলিকাতা ৫নং ম্যাঙ্গো লেন, বেঙ্গল হাউসে "ইউনাইটেড বেঙ্গল এসোসিয়েশন" নামে একটা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার মহাশয় অনারারী জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে সমিতির কার্য্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

আইন পরিষদের সদস্যদের একটি অভাব

দুই একটি বিশেষ বিষয় এবং বিশেষ উপলক্ষ ব্যতীত আইন পরিষদের তর্ক বিতর্কে এবং বক্তৃতায় সরকারী সদস্যদের তুলনায় বেসরকারী সদস্যদের অপটুত্ব স্বতঃই চোখে পড়ে,—আলোচ্য বিষয়টি যখন সাধারণ না হইয়া কোন বিশেষ ব্যাপার সংক্রান্ত হয় তখনই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। আলোচ্য বিষয় সাধারণ রাজনীতি সংক্রান্ত হইলেই মাত্র বেসরকারী সদস্যেরা শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশের সুবিধা পান। এইরূপ হইবার কারণও জটিল নহে।

সাধারণ রাজনীতি ও আইন সম্পর্কিত ব্যাপার সমূহ বাদ দিয়াও আইন পরিষদকে, বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি এবং সৈন্য বেলওয়ে প্রভৃতি রাজ্য পরিচালনার আধুনিক সমস্ত দুরূহ বিষয় সমূহ আলোচনা করিতে হয়। এই সকল বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান এবং জানাশুনা না থাকিলে শুধুমাত্র সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা এই সকল বিষয়ের প্রতি যথাযথ সুবিচার করা যায় না। সরকার পক্ষে ইহার সকল বিভাগের জন্যই সুদক্ষ উপযুক্ত লোকেরা থাকেন, নিজনিজ বিষয় সম্বন্ধে ইঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে এবং প্রামাণ্য গ্রন্থাদি সরকারী খরচায় পাইবার সুবিধা আছে। সাধারণতঃ বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে রাজনীতিজ্ঞ ও শক্তিশালী আইন জীবিরা থাকেন বলিয়া রাজনীতি ও আইন ঘটিত বিষয়সমূহে ইঁহারা সরকার পক্ষের যোগ্য (বা যোগ্যের অপেক্ষা অধিক) প্রতিপক্ষ। অন্যান্য সকল ব্যাপারে সদস্যদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ হইবার সম্ভা-

বনাই অধিক। তবে, আলোচনার পূর্ব্বে যদি বিষয় বিশেষ উপযুক্ত সদস্তেরা আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ভালভাবে পড়াশুনা করিয়া, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া প্রস্তুত হইয়া যাইতে পারেন তবে, অবস্থার নিশ্চয়ই উন্নতি হয় এবং নির্ব্বাচক মণ্ডলীর প্রতি প্রতিনিধিদের এটি কর্ত্তব্যও বটে। কিন্তু, ইহার জন্য সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন হইতেছে, হাতের কাছে সকল বিষয়েরই প্রামাণ্য গ্রন্থের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকা। বেসরকারী সদস্যদের এ-বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া এইরূপ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে তাহার পরিচালনভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে সরকারী সাহায্য প্রত্যাশা করাও অনুচিত নহে।

আই-এম-এস-এ ইউরোপীয় নিয়োগ

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে ইউরোপীয় নিয়োগ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির প্রশ্নের উত্তরে, আর্ম্মি সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে, ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ ইচ্ছা করিলে যাহাতে স্বজাতীয় ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে পারেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই চাকরিতে ইউরোপীয়দের নিয়োগ করা হইয়া থাকে।

এদেশে সরকারি চাকরির বিভিন্ন বিভাগে প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় নিয়োগ হইয়া থাকে। এক, স্বজাতীয়দের প্রতিপালন এবং দ্বিতীয় হইতেছে দেশশাসনের কোন প্রয়োজনীয় বিভাগ যাহাতে ব্রিটিস প্রভাব এবং প্রত্যক্ষ ব্রিটিস পাহারার বাহিরে না যায় তাহার জন্য উদ্বেগ। ইহার কৈফিয়ৎ হিসাবে অবশ্য আমরা নিজেদের অযোগ্যতার কথা শুনিয়া থাকি, এবং ভারতীয়দের হাতে পড়িলে শাসন ব্যবস্থার বর্ত্তমান মানের উৎকর্ষ নামিয়া যাইতে পারে এমন কথাও শুনিয়া থাকি। কিন্তু ভারতবাসীদের প্রতি অসীম অনুকম্পাবশে যাঁহারা অত্যন্ত উচ্চবেতনে এদেশে চাকরি করিতে আসিবার কষ্ট স্বীকার করেন তাঁহাদের মর্য্যাদার প্রতি সম্মান দেখাইবার খরচা আমাদিগকে যোগাইতে হইবে, একথাটা, অনেক অসঙ্গত কথা শুনিতে অভ্যস্ত আমাদের কানেও তেমন ভাল শুনায় না। যাঁহারা উচ্চবেতন ভোগ ও ভারতীয়দের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য কষ্ট করিয়া এদেশে আসেন, তাঁহারা যে, বিলাতের জল, মাটী, বাতাস দাবী করেন না এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহা আমদানী করিবার জন্য যে আমাদিগকে অনেক ব্রিটিস বৈজ্ঞানিক, জাহাজ কোম্পানী, যন্ত্র নির্ম্মাতা এবং শ্রমিক প্রভৃতি শ্রেণীর লোককে প্রতিপালন করিতে হইতেছে না, সম্ভবতঃ তাহাকেই আমাদের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, একই চাকরির একই পদের বেতন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় এবং ভারতীয়ের এক নহে। উচ্চপদে নিযুক্ত ভারতীয়দেরও যে এদেশের দারিদ্র্যের তুলনায় অত্যধিক বেতন দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাও কেবল ইউরোপীয়দের উচ্চবেতন দিবার অন্যায় ও অযৌক্তিকতাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য।

কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের রাজনীতি-ভীতি

সিন্ধু প্রদেশের ডি-জি-এল কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ, অধ্যাপক ভাসওয়ানিকে, কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক থাকিবার অভিযোগে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। তাঁহাকে অবশ্য কর্ম্মে ইস্তফা দিতে বলিয়া কলের কর্ত্তৃপক্ষ অশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু, অধ্যাপক ভাসওয়ানি এই সৌজন্যের মর্য্যাদা উপলব্ধি না করিয়া কর্ম্মচ্যুত হওয়াই শ্রেয় মনে করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা, অধ্যাপকের কংগ্রেস-সংশ্রব কলেজের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিবে। অধ্যাপকের রাজনৈতিক মনোভাব ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া যাহাতে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের এবং তাঁহাদেরও কর্ত্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তার কারণ উপস্থিত না হয়, বোধ হয় তাহার জন্যই এই সতর্কতা। বেশী বাড়াবাড়িতে ফল আবার উল্টা না হইয়া যায়।

রাজনৈতিক আন্দোলনের দিক দিয়া কংগ্রেস বর্ত্তমানে বেশী কিছু করিতে পারিবেন, এমন বিশ্বাস অনেকেরই নাই। তবে, অন্যলোকের কংগ্রেসভীতি দেখিয়া কংগ্রেসের শক্তি সম্পর্কে সম্ভবতঃ ইহাদের মধ্যে মধ্যে আস্থা ফিরিয়া আসিবে।

কোন প্রকারের ভারতবাসী বার্ম্মায় যাইয়া থাকে

রেঙ্গুন হইতে শ্রীযুক্ত এম, ডি, দেশাই অমৃতবাজার পত্রিকার পত্র-বিভাগে লিখিতেছেন :—

Elsa C. Stamp কর্ত্তৃক লিখিত ও এই দেশের বিদ্যালয় সমূহে পঠিত A First Geograpy of Burma নামক পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের নবম পৃষ্ঠায়, 'কোন প্রকারের ভারতীয়েরা বার্ম্মায় বাস করিয়া থাকে' শীর্ষক নিবন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু দেখা যায় :—'স্বদেশে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজ বা খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া উহারা বার্ম্মায় আসিয়াছে। ঐ সকল লোকই ভারতবর্ষ হইতে (এখানে) আসিয়াছে। ভারতবর্ষে অনেক জাতি। আমরা অবশ্য উহাদের সকলকেই ভারতীয় বলিতে পারি,—যদিও উহারা বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে ও বিভিন্ন প্রকারের কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ তোমাদের ভারতীয় বন্ধু আছে। উহাদের সহিত যদি তোমরা বর্ম্মীদের তুলনা কর, তাহা হইলে তোমরা দেখিতে পাইবে বর্ম্মীরা ভারতবাসী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। উহাদের চামড়া খুব বেশী কালো—সাধারণতঃ উহাদের চামড়ার রঙ্ কালচে পীত। উহাদের চুল বর্ম্মীদের চুলের মত সোজা নয়, ঢেউ খেলানো।' চীনাদের সম্পর্কে পরের প্যারাগ্রাফে আছে—

'চীনারা অনেকটা বর্ম্মীদের মতই। তাহারা নিপুন শ্রমিকও বটে।' ভারতীয় বন্ধু থাকা সত্ত্বেও বর্ম্মী শিশুরা, তাহাদের ভারতীয় বন্ধুরা যে বিভিন্ন প্রকারের জীব; ভারতবর্ষের যে সকল দুর্ভাগারা পেটের জ্বালায় বার্ম্মায় আসিয়া উৎপাত সুরু করিয়া দিয়াছে, তাহাদের বন্ধুরা যে উহাদেরই পুত্র কন্যা, একথা যদি উপলব্ধি না করিয়া থাকে, তাহা হইলে শ্বেতকায় ভূগোল-লেখকের পার্থক্যটা বর্ম্মী শিশুদের বোধগম্য করাইয়া দিতেই হয়। শ্বেতকায় ব্রিটিশদের সম্বন্ধে ভূগোলখানিতে কিছু লেখা আছে কিনা শ্রীযুক্ত দেশাই লেখেন নাই। শিশুপাঠ্য ভূগোলখানির, বা ঐ লেখকেরই যে পুস্তকখানি উচ্চশ্রেণীতে পঠিত হয় তাহার পাতা উল্টাইলে সম্ভবতঃ অন্যত্র দেখা যাইবে,

ব্রিটিস জাতি বর্ম্মীদের উন্নত করিবার জন্য সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাহাদের গায়ের রঙ্ ভারতীয়দের মত কালোত নয়ই, বরং বর্ম্মীদের গায়ের রঙ্ অপেক্ষা উন্নত ধরণের। তবুও যে তাহারা বর্ম্মীদের সহিত মেলামেশা করে ও গায়ের রঙের আভিজাত্য ভুলিয়া বার্ম্মায় আসিয়াছে তাহা বর্ম্মীদের প্রতি তাহাদের স্নেহেরই পরিচায়ক।

স্বদেশে ভাল কাজ কর্ম্ম পাওয়া গেলেও এবং সর্ব্ববিধ সুখাদ্য ও সুখ-সাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা, যাহাতে দুষ্ট ভারতবাসীরা বর্ম্মীদের ফাঁকি দিয়া সমস্ত ধনরত্ন লুটিয়া না লয় তাহার তদারক করিবার ন্যায় সহজ কার্য্যে প্রণোদিত হইয়া বার্ম্মায় আসিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

বার্ম্মাকে ভারতবর্ষ হইতে কেন বিচ্ছিন্ন করা হইল, তাহা সরলমতি বর্ম্মীশিশুরা না জানিলেও ভারতবাসীরা জানে। আমরা ভাবিতেছি, ভারতবর্ষ হইতে বার্ম্মা এখন বিচ্ছিন্ন না হইলেও কিছুদিন পরে হইতই।

পূজায় আনন্দ ও কাজ

পূজা যদিও হিন্দুদেরই উৎসব, তবুও ইহার ব্যাপকতার ও এই সময়ে অফিস আদালত স্কুল কলেজ প্রভৃতি দীর্ঘ অবকাশের ফলে ইহা আমাদের জাতীয় জীবনে সার্ব্বজনীন উৎসবের স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবনে এই সময়টার একটা বিশেষ মূল্য আছে।

অন্নহীন, স্বাস্থ্যহীন, উদ্যমহীন, কর্ম্মহীন, রিক্ত, নিঃস্ব, নিরানন্দ, শতধাবিচ্ছিন্ন, নিশ্চল বাঙ্গালী সমাজে যেটুকু আনন্দের শক্তি, মিলনের শক্তি, উৎসবের প্রেরণা সঞ্চিত আছে, পূজার সময়টুকুকে আশ্রয় করিয়াই তাহা আত্মপ্রকাশ করে। এই উৎসবের আনন্দের মধ্যে দুঃখের কথা, নৈরাশ্যের কথা কাজের কথা, গুরুতর চিন্তার কথা, কঠিন সমস্যার কথা যদি আমাদের অবতারণা করিতে না হইত তবে, আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু, আমাদের জাতীয় জীবনে অবসরের সুযোগ, মিলনের সুযোগ, দুঃখকষ্টের নিষ্পেষণ বিস্মৃত হইবার সুযোগ এত কম যে, আনন্দের উচ্চ কোলাহলের মধ্যে নিমজ্জিত করুণ আর্ত্তনাদ, দৃশ্যমান সম্পদের আবরণের নীচের দুর্ভর দৈন্য, অতি সহজে প্রবাহিত জীবনস্রোতের পশ্চাতের মৃত্যু-গর্ত্ত সমস্ত আনন্দ উচ্ছলিত, কোলাহল মুখরিত বর্ত্তমানের মধ্যে

নিহিত সংশয়াচ্ছন্ন ভয়াকীর্ণ ভবিষ্যৎ এবং উৎসবের তারল্যের নীচের জমাট বাঁধা গুরুভার দায়িত্বের কথা স্মরণ না করিয়া আজ পারি না। আমরা যে সকল কর্ত্তব্য পালন করি নাই, যে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করি নাই, যে সকল সমস্যা পাশ কাটাইয়া এড়াইয়া গিয়াছি, বিশ্বজগতের যে সকল অনিবার্য্য দাবীকে অস্বীকার করিয়া বাঁচিয়া গেলাম ভাবিয়াছি অভ্রভেদী বিপুল দুঃখের মূর্ত্তিতে তাহারাই আজ আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে। দুঃখের সাগর বেষ্টিত উৎসবের এই ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর দাঁড়াইয়া যদি কূলহীন সীমাহীন দুস্তর সাগরের কথা ভুলিয়া যাই তবে, তাহার চেয়ে মূঢ়তা আর কি হইবে ?

এই সময়ে যাঁহারা পল্লীতে আসিবেন

এই সময় সহর হইতে যাঁহারা পল্লীতে আসিবেন তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকিবেন দেশকে যাঁহারা নূতন কল্পনা নূতন আদর্শ নূতন চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত করিতে চাহেন যাঁহাদের উদ্যম, সাহস ও কর্ম্মের উপর দেশের সমগ্র ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবে সেই ছাত্রদের, তরুণদের অনেকে আসিবেন নূতন চিন্তা ও ভাবের সংস্পর্শে আসিয়াছেন এমন বহুলোকও আসিবেন। প্রধানতঃ ইঁহাদের চেষ্টা, উৎসাহ ও নেতৃত্বে বাংলার বহু পল্লীতে থিয়েটার, গান ও অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠান হইবে। আমাদের একঘেয়ে নিরানন্দ জীবনে ইহার উপযোগিতা ও অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু ইঁহারা যদি সচেষ্ট হন, দেশের অনিবার্য্য প্রয়োজনের কথা স্মরণ করিয়া দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর হন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের বাহিরে যেমন সকলের আনন্দের মিলনক্ষেত্র আছে তেমনই যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার কর্ম্মক্ষেত্র আছে একথা যদি অনুচিত তারল্যে তাহারা অস্বীকার করিতে না চাহেন তবে, ইঁহাদের এই অল্পসময়ের চেষ্টায় পল্লীতে পল্লীতে একটা স্থায়ী কর্ম্ম প্রেরণার সৃষ্টি হইতে পারে। ইঁহারা যদি পল্লীজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিতে পারেন, তাহার জড়ত্ব ও স্থিতিশীলতাকে আঘাত দিতে পারেন, দেশের যে দরিদ্র, অজ্ঞ, মূক জনসাধারণ আজও নেপথ্যে রহিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত মিশিতে পারেন, দুঃখের প্রকৃত অবস্থা ও কারণ সম্বন্ধে তাহাদের সচেতন করিতে পারেন, তাহাদের সুখদুঃখ অভাব অভিযোগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন, সহানুভূতির সহিত সে সব দেখিতে পারেন, তাহার প্রকৃত প্রতিকারের উপায় ভাবিতে পারেন, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঐক্য আনিতে পারেন, আমাদের নিজেদের অবহেলা কর্ম্ম এবং মনোভাব ইহার জন্য কতটা দায়ী তাহা নির্ণয় করিতে ও তাহার প্রতিকারে উদ্যোগী হইতে পারেন তবেই, অবসরের প্রতি প্রকৃত সুবিচার করা হইবে।

সহর হইতে বহু মেয়েও এই সময় মফঃস্বলে আসিবেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকিবেন যাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতার, স্ত্রীশিক্ষার, পর্দা প্রথার উচ্ছেদের পক্ষপাতী। ইঁহারা যদি এই সময়ে পল্লীর ভগিনীদের দুঃখ দুর্দ্দশা সম্বন্ধে সচেতন হন, তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, শিক্ষায় উৎসাহ দান করেন, পর্দা ও অবরোধ যে মনুষ্যত্ব নাশকারী দাসত্বের পরিচায়ক একথা বুঝাইয়া দিতে পারেন, বহির্জ্জগতের উপর যে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের উপর যে বহির্জ্জগতের দাবী আছে, একথাটি দুই একজনকেও বলিয়া বুঝাইতে পারেন, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীরা বর্ত্তমানে যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহা যে নারী বা পুরুষ কাহারও পক্ষেই লাভের নহে, সে কথাটা সম্বন্ধে লোককে সচেতন করিতে পারেন, নারীরা স্বাধীনতা পাইলে, স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে যে, জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁহাদের সেবার দ্বারা অনেক লাভবান হইবেন, একথার প্রমাণ দিতে পারেন তবেই, এই সময়ের যথাযোগ্য ব্যবহার করা হইবে।

পুরুষদের কর্ম্মক্লান্ত জীবনে এই অবসরের সময়ে বিশ্রামের ইচ্ছা, লঘু আনন্দের ইচ্ছা, কাজ না করিবার ইচ্ছা হইতে পারে। কিন্তু, মেয়েরা অনেকেই বিশ্রামের মধ্যেই জীবনযাপন করেন, জীবিকোর্জ্জনের সংগ্রাম হইতেও দূরে থাকেন, কাজেই, এই সুযোগে তাঁহাদের পক্ষে উদ্দীপনা লইয়া, উদ্যম ও উৎসাহ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। আরও, পুরুষদের যেসকল দুঃখ আছে তাহার সমান ভাগ তাঁহাদেরও আছেই, তদতিরিক্তও তাঁহাদের বহু দুঃখ আছে। কাজেই, দায়িত্বও বেশী আছে।

পূজার সময়ে আরও কয়েকটি স্মরণযোগ্য কথা

পূজার সময় আমাদের আরও কয়েকটি বিষয় স্মরণ করিবার আছে। হিন্দুসমাজের দুর্ব্বলতার কারণের মধ্যে অস্পৃশ্যতাই বোধহয় সর্ব্বপ্রধান। এই সুযোগে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য হিন্দুসমাজের বিভিন্ন স্তরে ঐক্য আনিবার জন্য, প্রত্যেক হিন্দুরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য সার্ব্বজনীন পূজা প্রভৃতির দ্বারা যে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, একথাটা আমাদের জানিয়া রাখা দরকার। কারণ, সার্ব্বজনীন পূজা করিয়া এবিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইল বলিয়া আমরা মনে করিয়া থাকি। সর্ব্বত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া বৈষম্য রহিয়াছে বলিয়াই মিলনের জন্য যে পৃথক আয়োজন করিতে হইতেছে, একথা ভুলিলে চলিবে না। পূজা উপলক্ষে যে সকল আহারাদির ব্যবস্থা হইবে সেখানেও যদি বর্ণ বৈষম্য বর্জ্জন করিয়া সকলের একত্র আহারের ব্যবস্থা করা যায় তবে তাহাতেও অনেক উপকার হইবে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। পূজাকে উপলক্ষ করিয়া যাহাতে কোন সাম্প্রদায়িক কলহের সূত্রপাত না হয়, তাহার জন্য সকলকেই সাবধান হইতে হইবে। যাহাতে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও ঐক্য বর্দ্ধিত হয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূরীভূত হয়, তাহার জন্য এই সুযোগকে আমরা ব্যবহার করিতে পারি।

শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে সমাজের নিম্নস্তরে যে সর্ব্বব্যাপী দারিদ্র্য ও অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে, ইচ্ছা করিলে অনেকে এই সুযোগে তাহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিবেন এবং কি উপায়ে তাহার প্রতিকার হইতে পারে তাহা ভাবিতে পারিবেন। কোন প্রকার খুচরা ব্যবস্থার দ্বারা যে ইহার অবসান হইতে পারে না, জনসাধারণের শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি যে সকল কথা আমরা বলিয়া থাকি তাহা যে, ইঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় উপহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মিলে, সে কথা সকলের কাছেই স্পষ্ট হইবে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

—আনন্দময়ীর আগমন আসন্ন—

- এই সময় আপনার গৃহে,
- আনন্দ উপহারের ডালি সাজাইতে
- ল্যাড্‌কোর দেহ-মন-আনন্দ-বর্দ্ধক প্রকৃষ্ট
- প্রসাধন দ্রব্যাদিই শ্রেষ্ঠ সম্ভার। ল্যাড্‌কোর
- "সুগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল", "কুন্তলা", "রক্তকমল"
- ইত্যাদি গন্ধ-তৈল, "গ্লিসারিন সোপ", "লাইম-জুস-গ্লিসারিন",
- "ফেস্‌-ক্রিম", "স্নো" ইত্যাদি সকল প্রসাধন দ্রব্যই সর্ব্বজনের আদর লাভ
- করিয়াছে॥ ভাল দোকান মাত্রেই ল্যাড্‌কোর প্রসাধন দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়॥

"ল্যাড্‌কো"
কলিকাতা

ফরিদপুর মুসলিম ছাত্রসম্মিলনী

চৌধুরী মোয়াজ্জম হোসেন

(লাল মিয়া সাহেব)

সমবেত বন্ধুগণ!

বয়সের বিচার না ক'রে ছাত্রজীবনের অতীত বন্ধুকে আপনাদের মধ্যে নিজের মত প্রকাশের সুবিধা দিয়ে কৃতার্থ করেছেন বলে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ছাত্রের কর্তব্য :—

"ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ" কথার সাধারণ অর্থ লয়েই সন্তুষ্ট থাকতে ছেলেবেলা হতেই উপদিষ্ট হয়েছি। অর্থাৎ ছাত্র-জীবনে স্কুলপাঠ্য পড়া ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা করা অন্যায় ও অবৈধ। যদি জ্ঞান লাভের জন্যই অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়ে থাকে তবে সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞানের বিকাশের সহায়ক চিন্তাধারা ছাত্রজীবনের প্রাণের তরঙ্গে প্রবাহিত হবার সুযোগ অন্বেষণও ছাত্রদিগের অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান যুগে ভারতের ছাত্রদিগের পক্ষে বেঁচে থাকবার চিন্তা করা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি।

সমাজ সেবায় ছাত্র :

ভবিষ্যতের জাতির প্রতীক বর্ত্তমান ছাত্রদলের পক্ষে সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কার বিদূরণের অগ্রদূত রূপে অগ্রসর হ'তে হবে। দুর্নীতির দূষিত ক্ষতে গলিত সমাজদেহের সকল অস্থির আরোগ্য সম্পাদন ব্যতীত ভবিষ্যৎ জাতির পদমাত্র অগ্রসর হবার আর উপায় নেই প্রতি কার্য্যে শত বাধা সহস্র বাহু প্রসারণে অগ্রগমন পথে জাতিকে পশ্চাতে টানছে। কুসংস্কারের এই সমস্ত বাঁধনদড়ি দৃঢ়হস্তে ছিন্ন করবার শক্তি লয়ে ছাত্রদলকে বীরপদে সম্মুখের দিকে আগুয়ান হতে হবে! সংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ মনে স্বাধীন চিন্তা একেবারেই অসম্ভব। কুসংস্কারের গণ্ডীভাঙ্গা জাতি পৃথিবীর বুকে কতবড় অসাধ্য সাধনে সক্ষম, তুর্কির আতাতুর্ক কামাল তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইউরোপের নিপীড়িত জাতি তুর্কীর দল যেদিন কামালের বিজয় বৈজয়ন্তী পতাকা তলে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে তুর্কীস্থানের সমস্ত কুসংস্কারের সংস্কার সাধনে সমর্থ হয়েছিল সেই দিন সেই বিজয়ী তুর্কীর বিজয় হুঙ্কারে সমস্ত জগতের প্রাণের পরে যে উজান সুর বেজে উঠেছে তাদের প্রাধান্য স্বীকারে অবনমিত-শির ইউরোপ আজ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বন্ধুগণ! ভারতের বুকেও আজ বিংশ শতাব্দীর অগ্রগতির আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছেছে। কিন্তু সেখানে মুসলমান যৌবনশক্তি নিস্তব্ধ। অবিরল হিন্দু যুবদল পাড় কূল ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে, আর মুসলমান তরুণ দূরে দাঁড়িয়ে তাঁদের অগ্রগমন দেখছে ও বিস্মিত হচ্ছে। একই দেশের ফলে জলে পালিত, একই দেশের নীল আকাশের তলে বর্দ্ধিত—তবে কেন এ বৈষম্য?

জানি না কেমন করে মুসলমান যুবকদল তাদের গৌরবময় অতীতকে ভুলে যেতে পারে, অতীতের ইতিহাসের ছিন্ন পাতায় পাতায় মুসলমান শৌর্য্যের ত অভাব নেই। পরাধীনতার মসীময় রূপকে যে জাতি জীবনের প্রথম প্রভাত হতেই ঘৃণা করতে শিখেছিল, যাদের স্বাধীন সম্রাটদের উজ্জ্বল মুকুটমণি সেদিনও সৌরকরে অপূর্ব্ব দীপ্তি বিলাইতেছিল তাদের যৌবন আজ এত নির্ব্বীর্য্য হ'য়ে গেল কেন? একদিন যে মুসলমানের শৌর্য্য বীর্য্যের দিকে সমস্ত জগৎ বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে তাকিয়েছিল, একদিন যারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পতাকা হস্তে দীন্ দীন্ রবে সমস্ত ধরণী প্রকম্পিত করে তুলেছিল, একদিন যে মুসলমান বাদশাহকে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বলে ভূষিত করা হতো, আজ সেই মুসলমানের এ শোচনীয়

পরিণাম, পরাধীনতার কলঙ্ককালিমামণ্ডিত এ দীনবেশ সারা মন প্রাণকে যে ব্যথা বেদনায় ভরে তোলে!

বাংলার মুসলিম নারী

বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের নারী যে গৌরবময় ইতিহাসের রচনা করেছে তাহা বাস্তবিকই অভিনব! পুরুষ ও নারীর মিলিত শক্তি জাতিকে প্রত্যেক দেশে বিপদের ঝড় তুফানে রক্ষা করেছে। কিন্তু অন্যান্য দেশ ও সমাজের নারীদের সাথে নিজ সমাজের নারীদের অবস্থা ও স্থান মনোমাঝে উদিত হ'লে অন্তরে নিরাশার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। যে দেশের বুকে সুলতানা রিজিয়ার অভিনব শাসনকুশলতার চিহ্ন আজও বিরাজমান, যে সমাজে কৃপাণ হস্তে রণাঙ্গনে অবতীর্ণা চাঁদবিবির ইতিহাস আজিও উজ্জল ধ্রুব নক্ষত্রের মত প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে,—যে সমাজের নারী সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের অদ্ভুত রাজনৈতিক সুক্ষদর্শন বিশ্বের ইতিহাসে স্বপ্নবস্তু হয়ে রয়েছে, সে সমাজের নারী জাতির শোচনীয় অবস্থা দেখলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়!

হজরত রসুল করিমের সময় সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে আহতদের শুশ্রূষা করতেন। মুসলমান বীরদিগকে যুদ্ধে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতেন। ছাহাবাদের সময় খাওলা প্রমুখ মহিলাগণ রোমকগণের সঙ্গে প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ করে আত্মসম্মান রক্ষা ও যুদ্ধজয়ে সাহায্য করেছিলেন। জাগ্রত সিংহ আতাতুর্ক কামালের তরবারি আজ এঙ্গোরার মরুপ্রান্তে এক স্বপ্নভরা নূতন সাম্রাজ্য গড়ে তুলে সমগ্র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। এঙ্গোরার নারী প্রয়োজন হলে তুর্কীসাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। মিশরের মহিলাগণ আজ দলে দলে সভাসমিতির অনুষ্ঠান করে দেশের মুক্তিসাধনার বিপুল অংশ গ্রহণ করছে। এদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হলে চলবে কেন? বাংলার মুসলমান নারীদের ইতিহাসের এইসব গৌরবোজ্জল উদাহরণ হতে সাহস সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য সমগ্র মুসলমান বালিকাকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করা প্রয়োজন। আজ আমাদের নারীদের দুনিয়ার দরবারে তার সত্যিকার আসন পেতে দিতে দ্বিধা বোধ করলে জীবন সংগ্রামে মুসলিম সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য।

হিন্দু ও মুসলমান

অশিক্ষার কুসংস্কারের নাগপাশে আবদ্ধ সামাজিক জঘন্যতা দেখে অতীতের শৌর্য্য বীর্য্যের সুদিনের কল্পনাও বুঝি অসম্ভব। সমস্ত অভ্যুত্থানের মূলে সমাজের সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের সংস্কার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে উপলব্ধি হয়ে থাকে। ভারতের, তথা বাঙ্গালার ছাত্র বিশেষতঃ মুসলমান ছাত্রদিগের সম্মুখে এই গুরু দায়িত্ব বিদ্যমান।

এই প্রসঙ্গে আমার হিন্দু তরুণ ছাত্রবন্ধুদের একটী কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে বলি। যে হিন্দু অনলে অনীলে, চির নভোনীলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ভগবান্ বলে বিশ্বাস করেন—যে হিন্দু ক্ষুদ্র শিলা শালগ্রামখণ্ডকে নারায়ণ আখ্যা দিয়ে কৃপার আশায় ভূলুণ্ঠিত হয় সেই হিন্দু, মানুষ-মুসলমান বা নমঃশূদ্রের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত অথবা অস্বীকার করেন কি করে। কুকুর বিড়াল ঘরে গেলে গৃহদ্রব্য অপবিত্র হয় না, কিন্তু মানুষ-মুসলমান কিম্বা নমঃশূদ্রের পদার্পণ মাত্র বিংশতি হস্ত দূরস্থিত কলসীর জল অপবিত্র হয়ে যায় একথা বিগত শতাব্দীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন বৃদ্ধেরা বিশ্বাস করলেও বিংশ শতাব্দীর তরুণ মন এই অদ্ভুত বিশ্বাসের সারবত্তা কোথায় খুঁজে পান বুঝতে পারি না। পক্ষান্তরে মুসলমান তরুণদেরও স্মরণ রাখতে বলি যে জল, ওয়াটার, পানি প্রভৃতি ভিন্ন আখ্যা দিলেও জলের স্বাদ বা বর্ণের পরিবর্ত্তন হয় না, প্রভু, ভগবান্ বা খোদা বলে নিজ নিজ ধর্ম্মবিধান অনুযায়ী বিভিন্ন নামে কেউ যদি প্রার্থনা করে তবে তাকে বাধা দিবারও কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। একই সূর্য্য প্রতিদিন প্রভাতে সমভাবে হিন্দু ও মুসলমানের গৃহপ্রাঙ্গণে প্রতিভাত হয়, সম্প্রদায় বা জাতিভেদে তার বিভিন্ন প্রকাশ কখনও কল্পনাতেও কি সম্ভব! অপর দিকে প্রকৃতি দেবীর সংহারলীলাও যখন প্রচণ্ড বন্যার জলোচ্ছ্বাসে, ভূমিকম্পের নাচনে, কলেরা, বসন্ত, প্লেগরূপী মহামারীর ভিতর দিয়ে দেশের বুকে ধ্বংসের বিষাণ বাজিয়ে চলে যায় তখনও সে হিন্দু মুসলমানকে পৃথক দৃষ্টিতে দেখে না। এজন্য এদেশে বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য মুছে গিয়ে অদূরভবিষ্যতে এই উভয় জাতির মহামিলনে এক নবীন ভারতবর্ষের সৃষ্টি হবে সে-বিশ্বাস আমার আছে।

ছাত্রের রাজ নীতি

ছাত্রজীবনে রাজনীতির আলোচনা অন্যায় বলে মনীষী-বাক্য শুনে আমরা অভ্যস্ত। আহারে-বিহারে, আচারে-ব্যবহারে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে যেখানে রাজনৈতিক আইনের মধ্যে থেকে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে হয় সেখানে রাজনৈতিক চিন্তা হ'তে ছাত্রদিগকে দূরে রেখে অনাবশ্যক উপদেশ দিয়ে লাভ কি? জগতের প্রতি দেশে প্রত্যেক ছাত্র সমস্ত জগতের সংবাদের সাথে নিত্য পরিচয় রেখে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করবার সুযোগ পায় বলেই সেই সমস্ত দেশ জগতের মানচিত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করে রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করলেই দেখা যাবে যে দেশের প্রতিকার্য্যে প্রত্যেক রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সাথে ছাত্রদলের কতখানি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। যুদ্ধ-বিগ্রহ-শান্তি-সন্ধি সমস্ত সময় ছাত্রদলই জাতীয় জীবনের পতাকা স্কন্ধে অগ্রগমন করে এসেছে

জীবনযুদ্ধের ভবিষ্যৎ ক্ষেত্রে যাহাদিগকে প্রতিদিন প্রতি পদবিক্ষেপে বর্ত্তমানের ভীষণ ভ্রূভঙ্গির সম্মুখীন হতে হবে, শিক্ষার নামে তাহাদিগকে সে নগ্নতাকে চক্ষু বুজে অস্বীকার করে লাভ কি? খাওয়াপরা, হাঁটা-চলা, শিক্ষা-দীক্ষা রীতি-নীতি যেখানে প্রতি মুহূর্ত্তে ছাত্রদলের অগ্রগমনে প্রতিপদে বাধা উৎপাদন করছে সেখানে সে বাধার ব্যথাকে উপেক্ষা করে থাকা অসম্ভব। বিড়ম্বনাময় ছাত্রজীবনের ভিত্তির উপর যে ভবিষ্যৎ নাগরীক জীবন গড়ে উঠবে তাকে জীবনের প্রথম দিন হতেই তার দুর্ভাগ্যের সাথে পরিচিত হবার সুবিধা দেওয়া আমি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা বলে মনে করি। ভারতের বুকে বেঁচে থাকবার আশা লয়ে গঠনমূলক ছাত্রদলের পক্ষে রাজনীতি আলোচনা শিক্ষার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ সন্দেহ নাই। যাঁরা ছাত্রদিগকে রাজনীতি হতে দূরে রেখে ইউনিভারসিটির "ফিডিং বোতলে" শিক্ষা গলাধঃকরণ করিয়ে মানুষ করবার পক্ষপাতী, আমি তাঁদের সহিত ভিন্নমত।

ভবিষ্যৎ জাতি গঠনে ছাত্রদল

জাতীয়তাবাদী আত্মভোলা একটা বিরাট ভাবতন্ময় জাতি গড়ে তুলবার ভার ছাত্রগণের উপরেই বিশেষভাবে ন্যস্ত বলে আমি বিশ্বাস করি। ছাত্রজীবনের আত্মদানের উপর নির্ভর করেই পৃথিবীর বিশিষ্ট জাতিগুলি আজ জগতের বুকে ঈর্ষান্বিত স্পর্দ্ধায় দণ্ডায়মান। সৈন্যশ্রেণীর নিম্নতম বয়স ১৮ বৎসর নির্দ্ধারিত ক'রে পৃথিবীতে যে সমস্ত বিরাট বাহিনী সংগঠনের আয়োজন হচ্ছে, ছাত্রদিগের প্রাণঢালা জাতীয়তাবোধই তাহার একমাত্র উপাদান। জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে ছাত্রগণের বিরাট দান আজ আর কোন জাতিই অস্বীকার করতে পারে না। ভারতের এই ঘনায়িত দুর্দ্দিনে তাই ভারতের ছাত্রদলের আত্মত্যাগের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যে দেশের শতকরা ৯৯ জন নিরক্ষর কৃষক ব্যথার বেদনা অনুভবে অসমর্থ সে দেশের পক্ষে বাঁচবার দাবী নিয়ে অগ্রসরের আসা নিতান্তই দুরাশা। নিরক্ষর চাষার প্রাণে মুক্তির আনন্দের উদ্দাম স্রোত প্রবাহিত করতে হ'লে শিক্ষার আলোকে সে চির-অন্ধকার মনের জড়তা অপসারণ প্রথম কর্ত্তব্য। ছাত্র-ভাইদের পক্ষে এই নিরক্ষরের অক্ষর পরিচয় করাবার গুরুতর কর্ত্তব্য উপেক্ষার বিষয় নহে। অবসর বিনোদনে বিশ্রামের অবসর না দিয়ে ছুটির দিনে গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয়, লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দ্বারা কৃষকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ব্যতীত জাতির উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। আপনারা জাতীয়তা মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করে ভারতের মুক্তি-সাধনার সৈনিক হিসাবে অবসর সময়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে জাতির প্রাণধারার জীবন-উৎসের উৎপাদক কৃষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে নিরক্ষরকে শিক্ষাদান, দুর্ব্বলকে প্রবলের অত্যাচার হতে রক্ষা, বলহীনকে শক্তিশালী করে তোলা, সমাজ ও জাতীয় জীবন হ'তে অনাবশ্যক কুসংস্কারের সংস্কার সাধনায় আত্মনিয়োগ করতঃ জাতিকে ভবিষ্যৎ জীবনযুদ্ধের উপযোগী ক'রে গঠন করে তুলতে যত্নবান হউন। আপনাদের ঐকান্তিক সাধনায় মৃতপ্রায় জাতির প্রাণে জীবনের উদ্দাম স্রোত প্রবাহিত হউক, ভারতের হিন্দু-মুসলমান-পার্শি-শিখ-খ্রীষ্টানের মিলিত জাতি ভবিষ্যৎ ভারতে অজেয় জাতি হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার বিজয়গৌরবে স্পর্দ্ধিতশিরে দণ্ডায়মান হবার সুযোগ লাভ করুক।

উপসংহার

সভাপতি সাহেবান্ ও অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গ, যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অতীত ইতিহাসের লীলাভূমি বর্ত্তমান দুর্দ্দশা-নিকেতন আমাদের এই ক্ষুদ্র আবাসে পদার্পণ ক'রে আমাদিগকে কৃতার্থ করেছেন, অভ্যর্থনার সহস্র ত্রুটি লয়ে তাঁহাদিগকে আহ্বান করতে পেরে আমরা ধন্য হয়েছি। আপনাদের অনুগ্রহপ্রদত্ত সহযোগিতায় এই সম্মেলন সাফল্য-মণ্ডিত হউক, খোদাতায়ালার নিকট ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন

ইম্যুনিটী

ডাক্তার

জ্বর হ'ল, পিসীমা বল্লেন বেটের বাছার নজর লেগেছে, বাবা বল্লেন, হনুমানের মতন ঘুড়ী উড়িয়েছে তাই, আর ডাক্তার এসে বল্লেন পচা নর্দ্দমার জন্যে। বেটের বাছাকে নজরই বা দিল্ কে আর হনুমান কোন দেশে ঘুড়ী ওড়ায় তা জানা নেই বলেই বোধ হয় বাবা কিম্বা পিসীমা তাঁদের বক্তব্য প্রমাণ করতে পারলেন না, কাজেই ডাক্তারেরই জয় হ'ল। তা ভিন্ন, জ্বরের কারণ যা'ই হোক্ এখন জ্বর সারা যখন কতকটা ডাক্তারের হাতে তখন তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে মতান্তর হওয়াটা তাঁরা কেউ সমীচীন মনে করলেন না।

ব্যাধি যে একটা অনিবার্য্য দুর্ঘটনা এই কথাটা আমরা এখনও অনেকে মেনে নিই। কিন্তু তাই-ই কি? অসুখ হ'লে কেউ বলেন ভগবানের মার, আর কেউ বলেন পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল, আবার কেউ বলেন নজর লাগা—তবে ডাক্তারেরা বেশীর ভাগ রোগের কারণ দেখান ঐ পচা নর্দ্দমা। আজব সহর কোলকেতার কথা বাদ দিলে দেখা যায় বেশীর ভাগ সহরে নর্দ্দমা আর খাবার জল পরিষ্কার রাখা হয় বলে টাইফয়েড্, কলেরা প্রভৃতি রোগ অনেক কমে গেছে। কোলকেতার কথা আলাদা, কারণ এটা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর। এখানে ড্রেণের জল গিয়ে ঢোকে খাবার জলের পাইপে, খাবার জলের দীঘিতে গরুর মৃতদেহ পচিয়ে তারই নির্য্যাস খাওয়ান হয় সমস্ত সহরে, আর এখানে আধ ঘণ্টা বৃষ্টি হ'লে ৪।৫ ঘণ্টা বাস্ কিম্বা ট্রাম চলবার উপায় থাকে না। এখানে আরও একটা অদ্ভুত নিয়ম আছে। মিউনিসিপ্যালিটি অনেক পয়সা খরচ করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন—খবর্দ্দার কেউ যেন ময়লা-জলের কল থেকে জল নিয়ে সংসারের কোন কাজে ব্যবহার না করেন, কিন্তু তাঁরাই আবার সেই জল নিয়ে দুবেলা রাস্তায় এবং গৃহস্থের বাড়ীর দরজায় ছড়িয়ে দেন।

কিন্তু একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে, মরবার এত উপায় থাকতেও ত কই কোলকেতা সহর টাইফয়েড কিম্বা কলেরায় উজাড় হয়ে যায় নি! আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে—দেশে কোনও একটা নতুন রোগ এলে প্রথম প্রথম অনেকেই আক্রান্ত হয় এবং অনেকেই মারা যায় কিম্বা খুব বেশী ভোগে। কিছু দিন পরে দেখা যায় সেই রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কমে গেছে এবং লোকও আর অত মারা যাচ্ছে না। কেন? এর উত্তর হয় ত ভগবান ভিন্ন আর কেউ দিতে পারেন না—তবে মানুষেও কতকগুলো কারণ আন্দাজ করে নিয়েছে। মানুষে যা আন্দাজ করে তা হচ্ছে—রোগটা কেন হয় সেইটে কতকটা জানতে পেরে তার ব্যবস্থা, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা আর সব চেয়ে যেটা বড় কারণ বলে মনে হয় সেটা ভগবানের ব্যবস্থাই বলুন আর প্রকৃতির ব্যবস্থাই বলুন—সেটা হচ্ছে মানুষের রোগ প্রতিষেধ ক্ষমতার বৃদ্ধি, যেটাকে ইংরাজীতে ইম্যুনিটি (Immunity বলে)।

নভেলিষ্ট আর্নল্ড বেনেট্ গেলেন বেড়াতে দক্ষিণ ফ্রান্সে। সেখানে গিয়ে তাঁর হ'ল টাইফয়েড। তখন দেখা গেল সেখানকার জলে টাইফয়েড্ বীজাণু বর্ত্তমান অথচ সেখানকার বাসিন্দারা টাইফয়েডে বিশেষ ভোগে না। হয় ত অনেকেরই খুব ছোট বেলায় সামান্য একটু জ্বর হয়েছিল—তার পর থেকে তারা আর টাইফয়েডে ভোগে না। তারা খুব ছোট অবস্থা থেকেই এমন কি মায়ের দুধের সঙ্গে টাইফয়েড জীবাণু সামান্য পরিমাণে খেতে আরম্ভ করেছে যার জন্য তাদের এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আস্তে আস্তে বেড়ে উঠেছে। বেনেট্ও মারা যেতেন না যদি তিনি প্রথমেই অনেক বিষ এক সঙ্গে না খেতেন কিম্বা যদি তাঁর প্রথমেই সামান্য জ্বর হয়ে তাঁর ইম্যুনিটী বেড়ে যেত।

এই যে রোগ প্রতিবোধ করবার ক্ষমতা অর্থাৎ ইম্যুনিটি —এটা যে কেবল টাইফয়েডের বেলায় সত্য তা নয়, আর এর জন্য যে কেবল ঘটনাচক্রের ওপর নির্ভর করতে হয় তাও নয়। আমরা প্রতিদিনই নূতন নূতন রোগেব ইম্যুনিটী বাড়াবার উপায় পচ্ছি। মানুষেব শরীরে সাবধানে, স্বত্নে এবং অল্প মাত্রায় কোন রোগেব বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে অর্থাৎ টীকা দিয়ে সেই রোগ প্রতিরোধ করবার তার ক্ষমতা আমরা দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছি।

গয়লার মেয়ে যখন এড্‌ওয়ার্ড জেনারকে (Jenner) বলেছিল "আমার গোবসন্ত একবার হয়েছে সেই জন্য আসল বসন্ত আমার আর হবে না" তখন কি কেউ ভেবেছিল সে জগতের একটা কত বড উপকার করলে? গাছ থেকে ফল পড়তে সকলেই দেখেছে, কিন্তু নিউটন হয় ক জন? এর আগে আমাদের দেশেও টীকা দেবাব প্রথা ছিল। তখন নিয়ম ছিল একজনেব গুটী থেকে বিষ নিয়ে আর এক-জনেব শরীবে দিয়ে দেওয়া হ'ত। তার নাম ছিল বাংলা টীকা। তাতে একটা অসুবিধা ছিল এই যে অনেক সময়ে হিতে বিপরীত হ'ত। রোগ প্রতিকার না করে অনেক সময় রোগ বৃদ্ধি হ'ত। কারণ হচ্ছে একজনের পক্ষে যে বীষ সামান্য আর একজনের পক্ষে সেই বীষই হয় ত ভীষণ। গো বসন্ত হলে আসল বসন্ত হয় না একথাটা অনেকেই জানত এবং জানে, কিন্তু তার থেকে টীকা দেবার প্রথা বার করলেন জেনার। তিনি দেখলেন গোবসন্ত হ'বার জন্য দৈবের উপর নির্ভর না করে যদি আগে থেকেই সামান্য বিষ শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া যায় তা হলে ভয় অনেকটা কমে যায়। এখন যে টীকা দেয়া হয় সেটা আসল বসন্তও না গো বসন্তও নয়, সেটা যে কি তা বলা শক্ত। আসল বসন্তের বিষ নিয়ে গরুর শরীবে ঢুকিয়ে দিলে যে গুটী হয় সেই গুটী থেকে বিষ নিয়ে মানুষের শরীরে দেয়া হয়।

একদিন ছিল যখন ক্ষেপা কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ নিশ্চিত, আর জলাতঙ্ক হ'লে মৃত্যুও নিশ্চিত। এখন কিন্তু ব্যাপাবটা ঠিক তা নয়। দেখা গেছে কুকুর কিম্বা অন্য ক্ষেপা জন্তু (শৃগাল ইত্যাদি) কামড়াবার দেড় মাস থেকে দুই মাস পরে জলাতঙ্ক রোগ হয়। কদাচিৎ ১৫ দিন পরেও দেখা যায়। পাস্তুর (Louis Pasteur) আবিষ্কার করেন যে যদি এই সময়ের মধ্যে সাবধানে জলাতঙ্কের বিষ (virus) শরীরের মধ্যে দেওয়া যায় তাহলে এ রোগের সম্ভাবনা কমে যায়

রোগ সারাবার যে একমাত্র উপায় ওষুধ তা আজ কাল কোনও ডাক্তার বিশ্বাস করেন না। ওষুধ খেলেই রোগ সারবে এ কথাটা পাওয়া যায় এখন কেবল মাসিক পত্রের পেটেন্ট ওষুধের বিজ্ঞাপনের পাতায়। (আজকাল যে কেবল বিজ্ঞাপনের পাতায় পাওয়া যায় তা নয় প্রবন্ধের পাতায়ও পাওয়া যায়। শুধু যে ওষুধ খেলেই সর্ব্বরোগ সারে তাও নয়, চা'য়েও সব রোগ সারে। এর জন্য দায়ী যদিও আমাদের ডাক্তারবা যাঁরা এই সব প্রবন্ধ লেখেন।) আজকাল ডাক্তারবা বিশ্বাস করেন যে ঔষধ, পথ্য এবং শুশ্রূষার দ্বারা কেবল মাত্র রোগীর ইম্যুনিটী জাগিয়ে দেয়া যায়, যার জন্য কতকগুলি জীবাণু ঘটিত রোগ সারবার সম্ভাবনা বাড়ে।

দেখা যাচ্ছে জীবাণুঘটিত যে সব রোগ তাহা কেবল সারে এই ইম্যুনিটীর জন্য। যখনই শরীরে কোনও জীবাণুর আক্রমণ হ'ল—তখনই সেটাকে প্রতিরোধ করবার জন্য আয়োজন চলতে লাগল শরীরের ভিতর। যদি সে আক্রমন তেমন জোরের না হয় তা হলে রক্তের শ্বেতকণিকা তাদের হটিয়ে দেয়, আর আমরা সে বিষয়ে কিছুই জানতে পারি না। কিন্তু যদি আক্রমণ করে এক সঙ্গে অনেক জীবাণু কিম্বা যদি শরীর সেই সময় কোনও কারণে দুর্ব্বল থাকে তাহলেই শরীরে রোগের চিহ্ন দেখা যায়। ধরা যাক্ এক-জনের নিউমোনিয়া হ'ল—তখন দেখা গেল তার জ্বর, বুকে ব্যথা, কাশি, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস এই সব হয়েছে। এই রকমে আট দশ দিন যাবার পর, যদি কপাল ভাল হয়, হঠাৎ দেখা গেল মন্ত্রের মতন তার জ্বর ছেড়ে গেছে, বুকেও ব্যথা নেই নিঃশ্বাসও স্বাভাবিক আর ডাক্তার বাবুর মুখেও একটু গর্ব্ব মিশ্রিত সাফল্যের হাসি এসেছে।

এই যে একটা দৈবব্যাপারের মতন কাণ্ড হ'ল এটা কেন? বড় ডাক্তার এসে দেখেছিলেন? না। নতুন কোনও পেটেন্ট ঔষধ দেয়া হয়েছিল? তাও নয়। তবে? ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—ইম্যুনিটীর জয় হ'ল! শরীরে যখনই নিউমোনিয়ার জীবাণু ঢুকল তখনই তারা বিষ তৈরী করতে আরম্ভ করল আর সঙ্গে সঙ্গে শরীরও চেষ্টা করতে লাগল সেই বিষনাশক একটা জিনিষ তৈরী করতে যাকে ইংরাজীতে anti-body বলে। রোজই কিছু কিছু করে

এ্যাণ্টিবডি তৈরী হতে হতে এমন একদিন এল যখন নিউ-মোককসের বিষের চেয়ে এ্যাণ্টিবডি বেশী তৈরী হয়েছে—তখনই রোগের শান্তি হয়। তা যদি না হয় তাহলে রোগীর চিরশান্তি হয়।

দেখা যায় যারা সুস্থ এবং সবল তারাই এই এ্যাণ্টিবডি বেশী তৈরী করতে পারে, আর সেইটেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এই এ্যাণ্টিবডি সম্বন্ধে তিনটি জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে।

১। কোন অসুখ সেরে যাবার পর লোকের শরীরে সেই অসুখের এ্যাণ্টিবডি থাকে বহুকাল ধরে। সেইজন্য ভবিষ্যতে দ্বিতীয়বার সেই অসুখের আক্রমণ থেকে লোকে রক্ষা পায়।

২। সব অসুখের এ্যানটিবডি যে একই রকমের তা নয়। অর্থাৎ ডিপ্থিরিয়ার এ্যানটিবডি বসন্তে কোনও উপকারে লাগবে না।

৩। মানুষ ভিন্ন অন্য কতকগুলি জন্তুর (ঘোড়া ইত্যাদি) শরীরে যদি কোনও রোগের বিষ ঢুকিয়ে দেয়া হয় তাহ'লে তারাও এ্যানটিবডি তৈরী করে এবং তাদের রক্ত যদি মানুষের শরীরে দেয়া হয় তাহলে রোগ সারান যায়। ঘোড়ার শরীরে এই এ্যানটিবডি তৈরী করান হয়ত অনেকেই নৃশংস বলে ভাবতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। সবল সুস্থ ঘোড়া বাছাই করে নেয়া হয়। সব ঘোড়াতেই যে ভাল এ্যানটিবডি হবে তার কোনও মানে নেই। দেখতে সবল হলেও সব ঘোড়া থেকে ভাল এ্যানটিবডি পাওয়া যায় না। কারণ জানা নেই। মনে করুন ডিপথিরিয়ার এ্যানটিবডি তৈরী হবে। প্রথমে খুব কম পরিমাণে ঘোড়ার শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল। এত কম পরিমাণে দেয়া হয় যে তাতে ঘোড়ার কোনও অপকার হয় না। ২।৪ দিন পরে আবার একটু বেশী পরিমাণে দেয়া হয়। এই রকমে ক্রমে বিষের পরিমাণ বাড়িয়ে শেষকালে এত বেশী দেয়া হয় যে গোড়াতে সেই বিষ দিয়ে বহু সহস্র ঘোড়া মেরে ফেলা যেত। প্রথমেই যখন তার শরীরে বিষ দেয়া হ'ল তখনই তার এ্যানটিবডি তৈরী হতে আরম্ভ হ'ল তারপর বিষও যত বাড়ান হয় এ্যানটিবডিও ততই বাড়ে। তারপর তার রক্ত নেয়া হয়। সেই রক্ত থেকে লাল এবং সাদা কণিকা বাদ দিয়ে যে জলীয় ভাগ থাকে (সিরাম) তাহাই রোগীর শরীরে দেয়া হয়। একই ঘোড়া থেকে বহুদিন ধরে বহুবার রক্ত পাওয়া যায়। রক্ত নেবার সময় কিম্বা ইঞ্জেক্সন্ দেবার সময় ঘোড়াকে বেশ নির্ব্বিকারভাবে দানা খেতে দেখা যায়। মনে হয় না তার খুব বেশী কষ্ট হচ্ছে।

ছেলেদের শরীরে যেই ডিফথিরিয়ার বিষ ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে এ্যানটিবডি তৈরী হতে আরম্ভ হয়—কিন্তু রোগের গতি এতই দ্রুত যে এ্যানটিবডি তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে না আর সেই জন্যই দরকার হয় অন্যত্র তৈরী এ্যানটিবডির অর্থাৎ এ্যানটিটকসিন সিরামের (anti toxin serum)।

গুজব আছে চীনদেশে যত দিন লোকের শরীর সুস্থ থাকে ততদিন পারিবারিক চিকিৎসক কিছু কিছু পয়সা পান কিন্তু অসুখ করলে তাঁকে বিনা পারিশ্রমিকে দেখতে হয়। এটা নিছক গুজব, না এর মধ্যে সত্য কিছু আছে, তা আমার জানা নেই—তবে আমাদের দেশে ভাল থাকলে লোকে ডাক্তারকে পয়সা ত দেনই না—অসুখ করলেও পয়সা দিতে যথেষ্ট কুণ্ঠিত হ'ন, দারিদ্র্য এর একটা কারণ হতে পারে হয়ত, কিন্তু খুব বড় কারণ যে নয় তার প্রমাণ হচ্ছে এ বিষয়ে পয়সাওয়ালা লোকেরাই বেশী দোষী। দেখা যাচ্ছে সিরাম চিকিৎসার দরকার হওয়াটা চীনের ডাক্তাররা খুব বেশী পছন্দ করেন না। রোগ সারাটা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু রোগ না হওয়াটা তার চেয়েও কি চীনে কি বাংলায় সব দেশেই বাঞ্ছনীয়। সেই জন্যই আজকাল চিকিৎসার উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগ হবার আগে তার ব্যবস্থা করা—সেই উদ্দেশ্যেই টীকা দেবার নিয়ম হয়েছে। টীকা দেবার আরো একটা কারণ আছে। সব জীবাণুঘটিত রোগের সিরাম পাওয়া যায় না। যদিও জীবাণু শরীরে ঢুকলেই এ্যানটিবডি তৈরী হয়, কিন্তু সব জায়গায় সিরাম দিলে কাজ হয় না। সেক্ষেত্রে টীকা দেবার প্রয়োজন আরো বেশী। এই সব রোগের মধ্যে বিশেষ করে টাইফয়েড আর কলেরার নাম করা যেতে পারে। ডিফ্থিরিয়ার মতন অসুখেও টীকা দিলে কাজ পাওয়া যায়।

সাউথ্ এ্যাফ্রিকান ওয়ারে গোলাগুলিতে মারা গিয়েছিল ২০,০০০ লোক আর টাইফয়েডে মারা গিয়েছিল ৮০,০০০ লোক। জার্ম্মাণ যুদ্ধেও অবস্থাটা হয়ত সেই রকমই হ'ত যদি না স্যর এ, রাইট (Sir Almroth Wright) টাইফয়েড্ ভ্যাকসিন (T.A.B.) আবিষ্কার করতেন। তার জন্য তাঁকে লাটও করা হয়নি কিম্বা অর্দ্ধেক রাজত্বও দেওয়া হয় নি, আর সে কথা তিনি বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি, কারণ তিনি ত বড় জেনারেলের মতন মানুষ মারার উপায় বার করেননি, তিনি বার করেছিলেন মানুষ বাঁচাবার উপায়।

দিন দিন এত নতুন নতুন রোগের টীকা তৈরী হচ্ছে আর ছেলেদের দেয়া হচ্ছে যে ভবিষ্যতে ছেলেদের কথা মনে হলে বলতে ইচ্ছে করে রবিবাবুর মতন "পরজন্মের নিষ্ঠুরতায় এ জন্মে হয় অনুশোচন।"

"ডাক্তার"

শৈব্যা

শ্রীমতী বীণা দেবী

অস্তে চলিছে সান্ধ্য তপন পূণ্য কাশীর গঙ্গাতীরে,
দাসী চাই কার, দাসী লহ মোরে, কে ঐ ভাসিছে অশ্রুনীরে।
ওগো দিনমণি অস্তে যেও না, ধর্ম্মে পতিত হবেন স্বামী,
কে আছ দয়াল কিনে লহ মোরে হ'বে যে বংশ নিরয়গামী
এই কি শৈব্যা রাজার মহিষী ধরণীশ্বর দয়িতা হায়!
ইঙ্গিতে যাঁর আঁখির পলকে শত কিঙ্করী ছুটিয়া যায়।
প্রসন্ন যাঁর দৃষ্টির তলে অযুত নরের ভাগ্য গাঁথা,
সে আজি বিকায় দাসবিপণিতে, একি ভাগ্যের নির্ম্মমতা।
বৈতালিকের বন্দনাগীতে বিকাশে যাঁহার সুপ্ত আঁখি,
কুতূহলী শত জনতার মাঝে ধর্ম্ম তাঁহারে আনিল নাকি!
কে বোঝে মহিমা ধর্ম্ম তোমার, সতীরে ভাসাও অশ্রুজলে,
তোমার শরণ নিয়াছে যে জন তাহারে কাঁদাও কতই ছলে।
তবু তুমি শ্রেয়ঃ প্রিয় হ'তে প্রিয়, বক্ষের মণি বক্ষহার,
তব গৌরবে হয় মহীয়ান সকল দৈন্য দুঃখভার।
নহে সম্পদে রাজৈশ্বর্য্যে, বেদনার মাঝে প্রকাশ তব,
তুমি অমৃত, তুমি শাশ্বত, তুমি আনন্দ নিত্য নব।

বিশ্বামিত্রে হরিশ্চন্দ্র দানিলা আপন রাজ্যভার
চাই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিতে চরণে তাঁর।
ত্যজি রাজবেশ রত্নাভরণ পরিলেন রাজা দীনের সাজ,
মেঘ আবৃত দীপ্ত সূর্য্য, হেরি অপরূপ দৃশ্য আজ।
পত্নীপুত্র চলে পশ্চাতে, ছায়া চলে যেন কায়ার সাথে;
ব্যাকুল আবাল বৃদ্ধবনিতা, স্তব্ধ নগরী বজ্রাঘাতে।
দানে নহে শেষ, আছে দক্ষিণা, সপ্তাহ শুধু সময় তার;
কোথা সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, ঋণের এ জ্বালা সহেনা আর।
যায় সপ্তাহ, ডুবিছে সূর্য্য, দহে অন্তর তীব্র তাপে;
সূর্য্যবংশ গৌরব বুঝি হ'বে হতমান ব্রহ্মশাপে।

উন্মাদ সম ছুটে গেল রাজা কিসে উদ্ধার হবে না জানি,
রাণী মনে ভাবে পতির লাগিয়া করি বিক্রয় এ দেহখানি,
গৌরবে যাঁর ছিনু গরবিণী, অধিকারী যাঁর শ্রেষ্ঠভাগে,
অন্তর দাহ জুড়াতে তাঁহার মোর অধিকার সর্ব্বআগে।

মস্তকে তৃণ দাসীর চিহ্ন দাসবিপণিতে কে ঐ চলে,
দাসী চাই কার, দাসী লহ মোরে, কে ঐ ভাসিছে অশ্রুজলে
আসি মহাজন ধীর ব্রাহ্মণ কহে "দাসী মোর একটি চাই।
তুমি যে জননী লক্ষ্মীস্বরূপা এখানে তোমার নহে ত ঠাঁই।
কার অভিশাপে জানিনা লক্ষ্মী পথের ধূলায় হ'লে উদয়,
দাসী বলে বাগো ধরে নিতে তোরে দীন ব্রাহ্মণ সাহসী নয়।
অশ্রুসজল চক্ষে রমণী লুটে বিপ্রের চরণ পর,
দয়া ক'রে যদি আসিয়াছ পিতা, লহ কন্যায় আপন ঘর।
পঞ্চশতেক স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া বিশ্বামিত্র পায়
হরিশ্চন্দ্র মহিষী শৈব্যা দাসীর মূল্যে দেহ বিকায়।
হর্ষে বিষাদে দুলিয়া ফুলিয়া নাচিয়া চলিল গঙ্গাজল;
স্বর্গ হইতে ঝরিল পুষ্প, দেবতারা সব আঁখিসজল।
নাচে আনন্দে ভোলা ধূর্জ্জটী তুলিয়া ত্রিশূল ভাবে বিভোর।
কহে ধরিত্রী ধন্যা দুহিতা, ধন্য আজিকে বক্ষ মোর।
অপূর্ব্ব সেই দৃশ্য নেহারি থমকিল ভানু রক্তছবি,
কহিলা ঘোষিবে মহিমা তোমার যতকাল রবে চন্দ্ররবি।
দূরে দেবালয়ে বাজিল শঙ্খ, বিশ্বনাথের আরতি লাগি
অন্নপূর্ণা মন্দির দ্বারে হেমদীপাবলি উঠিল জাগি।
সতীশিরোমণি বক্ষে ধরিয়া ধন্য হইল তীর্থধাম
ভূলোক, দ্যুলোক, গোলক গাহিল সতীর মহিমা সতীর নাম।

সৌন্দর্য্য সাধনা

ডাঃ আর দাস এল-এম-এফ

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে যে প্রথম ও অদম্য স্পৃহা জাগিয়া উঠিল তাহা সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা। হৃদয়ের সমূহ বৃত্তিগুলিও এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। কি করিয়া সুন্দরকে দর্শন ও উপভোগ করিয়া সারা দেহ মন চরিতার্থ হইবে এই আকুলতা জীবনের প্রতি শিরায় শিরায় অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে। সৌন্দর্য্যকে পাইবার জন্য শুধু এই ব্যাকুলতাই সব নয়। ইহার সঙ্গে জাগিয়া উঠিয়াছে আর এক আকাঙ্ক্ষা, তাহা হইতেছে সৌন্দর্য্য-সাধনা, অর্থাৎ নিজেকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা, যাহাতে সে নিজেও বিশ্বের কাছে সৌন্দর্য্যের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

পৃথিবীর প্রকৃত সুখ কেবল ধনৈশ্বর্য্যের দ্বারা মেটেনা। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হয় দেহ ও মনের পরিপূর্ণতা, অর্থাৎ সকল মাধুরী উপভোগ করিবার মত হৃদয়ের বৃত্তি ও সুন্দর স্বাস্থ্য-সম্পন্ন দেহ। কিন্তু দেহের দাবী সর্ব্বাগ্রে। কারণ দেহ সুন্দর না হইলে মনও সুন্দর এবং পবিত্র হয় না। সুতরাং দেহ-সৌন্দর্য্যের বিকাশের জন্য একান্ত চেষ্টা করা উচিৎ। এই সৌন্দর্য্য-সাধনা অর্থে ইহা নহে যে দেহকে বেশভূষায় সজ্জিত করা, রুজ পাউডার, পমেটম, প্রভৃতিতে মুখশ্রীকে রঞ্জিত করা। এই গুলিতে শুধু দেহকে গন্ধহীন পুষ্পের মত ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল করে, চিরস্থায়ী শোভা তাহাতে ফুটিয়া উঠে না। প্রকৃত সৌন্দর্য্য সাধনা অর্থে স্বাস্থ্য গঠন করা। স্বাস্থ্যকে জয় করিতে হইলে দেহের প্রতি যন্ত্রটীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। জীবনের প্রতি খুঁটিনাটি, সামান্য গ্লানি বা মলিনতা যাহাতে দেহের মধ্যে অবিকলতার ছায়াও বিস্তার করিতে না পারে, তাহার জন্য একান্ত চেষ্টা করিতে হয়। দেহের যে কোন 'অর্গানের' সামান্য ক্ষয়ও সৌন্দর্য্য-বিকাশের প্রধান অন্তরায়। আর সেই ক্ষয়ের প্রথম সঙ্কেত সর্দ্দি ও কাশির আক্রমণ। উপযুক্ত রসের অভাব হইলে তরুণ পুষ্পকোরকের মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়া যেমন সকল দলগুলিকে তিলে তিলে নষ্ট করিয়া ফেলে, তেমন মানুষের জীবনেও সর্দ্দিকাশীরূপে কীট প্রবেশ করিয়া বিনা প্রতিকারে ও উপযুক্ত ঔষধের অভাবে ধীরে ধীরে বাড়িয়া, অলক্ষিতে ও অজ্ঞাতে দেহের সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট করে এবং ক্রমে শরীরের যন্ত্রপাতিগুলিকে আস্তে আস্তে ক্ষয় করিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। পরিশেষে একেবারে ধ্বংসের আবর্ত্তে ফেলিয়া জীবনের যবনিকা টানিয়া দেয়। সুতরাং এই রোগকে সামান্য বলিয়া প্রশ্রয় দেওয়া দারুণ নির্ব্বুদ্ধিতা। শৈশব হইতেই যাহাতে দেহকে নিখুঁতভাবে গড়িয়া তোলা যায়, সকল প্রকার ব্যাধির যে মূল, তাহাকে সূচনা মাত্রেই সমূলে বিনাশ করিয়া, যাহাতে সন্তানকে সদা প্রফুল্ল ও সুশ্রী করিয়া গড়িয়া তোলা যায়, তাহার জন্য প্রত্যেক সংসারের মাতাপিতার কঠোর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপে শৈশবে যদি শরীরকে ব্যাধিমুক্ত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে শিশুদিগের সর্ব্বাপেক্ষা যে মারাত্মক রোগ হুপিংকাফ্ ও ব্রনকাইটিশ ইত্যাদি, তাহারা আর আক্রমণ করিতে পারে না। ফলে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু কান্তিমান, সুশ্রী ও সবল হইয়া উঠে, এবং যত কঠিন রোগই ভবিষ্যতে আসুক না কেন মৃত্যু তাহাকে সহজে আলিঙ্গন করিতে পারে না।

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সৌখীন দেশগুলিতে, সেখানকার অধিবাসীগণ দেহ-মাধুর্য্যকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সারা-জীবন ধরিয়া সাধনা করিতেছেন। সেখানকার প্রত্যেকেই সৌন্দর্য্য সাধনার জন্য কেবল বিলাসিতার সামগ্রী ব্যবহার করেন না। সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা স্বাস্থ্যের সকল নিগূঢ় নিয়মগুলি মানিয়া চলেন, স্বাস্থ্যোপযোগী আহার বিহারের মধ্যে জীবন যাপন করেন এবং অতি সাধারণ সর্দ্দি কাশিকেও ক্ষয়ের অগ্রদূত বলিয়া অতিশয় ভয়ের চক্ষে দেখেন। ইহার সামান্য সূচনা মাত্রেই সুইজারল্যাণ্ডস্থিত "রচি কোম্পানীর" প্রস্তুত "সিরোলিন রচি" সেবন করিয়া দেহকে রোগ মুক্ত করিয়া তোলেন। শিশুদিগের প্রতিও তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান। দেহের ভিত্তিকে সুদৃঢ় ও সজীব করিবার উদ্দেশ্যে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই নিজেদের সন্তানদের "সিরোলিন-রচি" সেবন করান। সাধারণ ঔষধের মত ইহা তিক্ত নয় বরং অতিশয় সুস্বাদু বলিয়া শিশুদিগকে আহার করাইতে তাঁহাদের কোন কষ্টই পাইতে হয় না। এইরূপে স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন বলিয়াই যৌবনকে ও সৌন্দর্য্যকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হন। আমাদের দেশেও যাহাতে উঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেশবাসীগণ সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যকে জয় করিতে পারেন, তাহাই একান্তরূপে কামনা করি।

ইয়োরোপা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস আই-সি-এস

আলোক চিত্রশিল্পী—লেখক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ছবিতেও যে এত কবিতা ছিল তা কে জানত?

শুধু একটি প্রাণচঞ্চল কিশোরী একটী পা বরফে রেখে অন্য পাটী বঙ্কিম ভঙ্গীতে তুলে তুষার সমুদ্রের মধ্য দিয়ে স্কেটিং করে চলে যাচ্ছে—পিছনে তার চাঁদ উঠেছে, আননে মোহন হাসি, চরণে গতির লীলা, হাতছানিতে সুদূরের আহ্বান। আর

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।"

সময় নিরূপণও হয় সূর্য্যের মুখের দিকে তাকিয়ে হিসাব করে। ভাগ্যে সূর্য্যমামা আছেন, না হলে গ্রামের লোকটী কেমন করে আকাশের দিকে আঙুল তুলে সময় বুঝাবে সূর্য্য কোন্‌খানটায় ছিল তা দেখিয়ে দিয়ে? কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে এসে প্রভাতের মাধুরী ভিন্নভাবে প্রকাশিত দেখলাম। আর সূর্য্য দেখে সময় ঠিক করে চলার উপায়ও যে নেই তা বুঝলাম। পরম প্রত্যুষ থেকে একেবারে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বরফে আলোর যে ঝকমকানি তাতে দিন যে কত হল তা বোঝে

রুসোর দ্বীপ

নীচে লেখা আছে,—আমার সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে এস।

সেই আহ্বান আমার স্বপ্নের সঙ্গে মিশে গেল।

গরমের দেশের লোক আমরা সূর্য্যের মুখ চেয়ে দিন কাটাই। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত থেকে ঘরে আলোর আগমন বার্ত্তা পাই, আর অন্ধকার এমনভাবে অতর্কিতে বিদায় নেয় যেন অনেক বেলায় দেরী করে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গেছিল। ক্রমবিলীয়মান উষা বা সন্ধ্যা আমাদের নেই। সূর্য্য যে কখন রঙীন থেকে হলুদ পরিণত হয় তা টেরই পাওয়া যায় না। আবার আমাদের

কার সাধ্য?

এদেশের আকাশে নীলিমা ম্লানিমার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। এতটুকু ধূলার আভাস নেই, ধূয়া নেই; অন্তরীক্ষের কোনো অলক্ষ্য ব্যবধান আকাশের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যকে এতটুকুও অন্তরাল করে না। মনের মধ্যেও এমনি মুক্তির আস্বাদ অনুভব করতে লাগলাম। উষার আহ্বানে সেই উজ্জ্বল নীল আকাশের এক কোণায় একটা পাহাড়ের পিছনে সূর্য্য যখন উঠি উঠি করে তার অরুণ-রথের আভা অন্যান্য

কত পাহাড়ে পরশ লাগায়, আর চূড়ায় চূড়ায় বরফের সাদা লাল আবীর গোলা হয়ে যায়। রং সুরের ঝঙ্কারের মত, তরঙ্গ ভঙ্গের মত, সৌরভ বিস্তারের মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়; মনের উপর পড়ে তাকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। সেই সময়টুকুর মধ্যে যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন আনন্দ ছড়িয়ে দেবার মত প্রশস্ত জায়গা সুইজারল্যাণ্ডের আকাশ ছাড়া আর কোথাও মেলে না। অসহ আনন্দ বেদনা হয়ে দেখা দেয়।

সেই মুক্ত আকাশে আমার আত্মা মুক্তি পেয়ে বাঁচল। লঘুপক্ষ পক্ষীর মত যেন তা স্বেচ্ছা বিচরণ করে বেড়াতে পারবে; শৈলশৃঙ্গের সঙ্গীতের স্রোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারবে।

"অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড় পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কী বাণীর সন্ধানে।"

সে বাণীর অনাহত ধ্বনি মনে এখনি যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে, আর সহ্য না করতে পেরে যেন শতধা হয়ে যাবে আমার মন।

শুধু আমার কেন, মানবাত্মার মুক্তি হবে এই আকাশের তলায়। ইতিহাসের পাতায়ও তার প্রমাণ পাই শিল্পী, বাগ্মী, সংস্কারক, দেশপ্রেমিক পালিয়ে এসে এদেশের বুকে আশ্রয় পেয়েছেন আবহমান কাল থেকে। সুইজারল্যাণ্ড না থাকলে ক্যালভিনের সমরপরায়ণ প্রটেষ্টান্টিজমের সৃষ্টি সহজ হত না, গ্রোটিয়াসের আন্তর্জাতিক আইনের মূল সূত্রটীর প্রেরণা আসত না; রুশোর সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী যেন এখানেই আদর্শ রূপে জেগে উঠেছিল; ম্যাৎসিনির নব্য ইটালীর পরিকল্পনা এখানেই রূপ ধারণ করল। এমন কি সেদিনকার রুশ বিপ্লবের বীজও সুইজারল্যাণ্ডের ভূমিতেই প্রথমে রোপণ করে রক্ষা করতে হয়েছিল। রুশের বিপুল শক্তি ও রাজতন্ত্রকে ব্যর্থ করে লেনিনকে জগতে নূতন মতবাদ ও রাজপাট প্রতিষ্ঠা করতে হত না পর্ব্বত অরণ্যানীময় স্বাধীনতার লীলাভূমি এদেশ না থাকলে। এ দেশ হচ্ছে অত্যাচারীর চক্ষুশূল ও

জেনিভা

অত্যাচারিতের আশ্রয়। চারদিকে চারটী প্রবল বিবদমান রাষ্ট্রকে সংস্পর্শ দিয়েও সংঘর্ষ থেকে অনেকখানি বাঁচিয়ে রেখেছে এই দেশ। এ না থাকলে পৃথিবীর ইতিহাসের অনেক অধ্যায় রাজনীতির অনেক বিবর্ত্তন বাদ থেকে যেত। অথচ এর নিজের শক্তিই বা কতটুকু? তিনটী ভাষা ও তেরটী প্রদেশ (ক্যান্টন) একে খণ্ড খণ্ড করে রেখেছে, তবু কত শতাব্দী ধরে এখানে গৃহবিবাদ বা আভ্যন্তরিক যুদ্ধ হলই না।

ইউরোপে লিগ অব্ নেশন্স আর একটি হতে পারে, কিন্তু জেনিভা আর একটা হবে না। সব দেশের সব রাজধানীর উপর জেনিভাকে স্থান দিই। এমন বড় কিছু সহর নয়, এমন কিছু সম্পদশালী নয়; কিন্তু কত বিপ্লবী ও চিন্তাশীলকে বরাভয় দিয়ে পৃথিবীকে বঞ্চিত হওয়া থেকে রক্ষা

করেছে। এ সহর হচ্ছে 'নন্ কনফমিষ্ট'; এখানে আশ্রয় নিতে হলে কোন দল বা রাজনীতির শরণাপন্ন হতে হয়নি কাউকে। রাজরোষ থেকে মাথা বাঁচাতে হলে ছুটি সহরের কথা তাদের মনে এসেছে প্যারিস ও জেনিভা। প্যারিস বিরাট, স্বরূপ ও আহ্বানময়; জেনিভা সীমাবদ্ধ, সুন্দর ও আত্মসমাহিত। প্যারিস বলতে স্বাধীনতার আশ্রয় তত বুঝাবে না, যত বুঝাবে সুকুমার কলা ও বিলাসলীলা। কিন্তু জেনিভা বলতে প্রধানত বুঝাবে গিরিবেষ্টিত তুষারশোভিত স্বাধীনতার প্রকাশ। প্যারিসের পিছনে কত ভাবের বিকাশ, কত ঐতিহাসিক 'ট্রাডিশন' যা পৃথিবীকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে; কিন্তু জেনিভার পিছনে লেক 'লেমানের' (জেনিভা হ্রদের) ওপারে তুষারশৃঙ্গ মঁ ব্লাঁ, যা সব সংস্কার ও ইতিহাসের উর্দ্ধে মাথা তুলে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে। প্যারিসের দান মানবের হাতে তৈরী; জেনিভার দান প্রকৃতির।

এই স্বাধীনতার দেশটিতে কিন্তু একটী বন্দীর কাহিনী উজ্জ্বল হয়ে আছে। এখানে এসে বায়রণের 'শিলঁর বন্দীর দুর্গটী না দেখে কোন লোক চলে যায় না। আর বায়রণের মত বীর কবির উপযুক্ত বর্ণনার বিষয়ই হচ্ছে এদেশ। তিনি ছিলেন বীর, তাই মুক্তিকামী বন্দীর অন্তর যে প্রহরীকে এড়িয়ে মুক্ত আকাশে বিচরণ করত তা সহানুভূতি দিয়ে অনুভব করেছিলেন; আর তিনি যে ছিলেন কবি তা জেনিভা হ্রদে ষ্টীমারে বিহার করে সেই দুর্গে গেলেই বুঝা যাবে। এপাশের নিকটের তীর তীরবেগে যেন ছুটে চলে যায়, আর ও পাশের সুদূরের তীর পর্ব্বত-বেষ্টিত হয়ে স্থাণু হয়ে থাকে। ও পারে বরফের চিত্রপট, আর এপারে দ্রাক্ষাকুঞ্জের জন্য সাজান সানুদেশে কখনো কখনো শিল্পী ড্যুরেরের চিত্রের মধ্য থেকে একটী একটী প্রাচীন গ্রামের সহসা দৃষ্টিপথে উদয়।

এদেশ যেমন সান্ত্বনা দিয়েছে তেমনি দিয়েছে প্রেরণা। য়্যামিয়েলের 'জারন্যালের' পাতায় পাতায় পাই এদেশের প্রভাব, তীব্র শীতের মনকে জাগিয়ে তোলার কথা; প্রকৃতি যখন নিরাভরণ তখনো তার মধ্যে মনের কত সম্পদ্ আহরণ। কত মনীষীকে অন্নের চেয়ে অধিক ধন, প্রাণের চেয়ে বড় প্রেরণা দিয়েছে এদেশের সৌন্দর্য্য। হলবীনের চিত্রগুলিতে যে গভীর অনুভব ও জীবনের মুখোমুখী হবার ভাব পাই তাতে মনে হয় যে 'জুরা' পর্ব্বতমালার রং তার সব চিত্র জুড়ে বর্ত্তমান আছে; শিল্পীর মনকে অভিভূত ও সৃজনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জুরা ভিন্ন কত শিল্পীকে বল্লনাই করা যায় না।

একটি গিরিদুর্গ

সৌন্দর্য্য কখনো শ্রান্তি আনে না যদি প্রকৃতি নিজে থাকে প্রাণময়ী আর সে কান্তির মধ্যে থাকে কল্পনা। সুইজার-ল্যাণ্ডের সৌন্দর্য্য কখনো মানুষের কাছে পুরাতন হয়ে যাবে না। নিবিড় হরিৎ গোচারণ-ভূমির রঙের বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না; শুধু একটা ইংরেজী কবিতার পংক্তি বলা চলে।

The emerald green of leaf-enchanted beams

তার উপর বরফে বরফে যখন যুঁই ফুলের বৃষ্টি হয়ে যাবে তখন সে তুষারকণাগুলি লোভী বালকের মত মুখে পুরব, না পাতায় পাতায় হীরা মুক্তার গুঁড়া ছড়ান দেখে দেখে চোখ জুড়াব ভেবে পাই না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় মন মূক থাকে না, মুখর ও উত্তরের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে; এবং রংএর মায়াকাঠির স্পর্শে সবটা দেশ ভাষার আভাসে ভরে যায়।

অগণিত হ্রদে ভরা এই দেশ। প্রত্যেকটীই আবার বর্ণ-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। সূর্য্যের কিরণে চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় প্রত্যেকটীতে আবার স্বতন্ত্র রূপ খোলে। সবচেয়ে সুন্দর দেখায় যখন রাত্রির ঐশ্বর্য্য জলের বুকে প্রতিফলিত হয়। বিশাল পর্ব্বতের ছায়া ও ভাসমান মেঘের মায়া পারের চঞ্চল গাছগুলির পাশাপাশি এমন একটা কম্পমান মাধুরী সৃষ্টি করে যে দিনের বেলাকার বেড়ানর ষ্টীমার যে এর উপর কোন বিক্ষোভ এনেছিল সে কথা মনেই হবে না। আর পারের নিস্তব্ধ 'শালে'গুলিকে ঘুমন্ত মায়াপুরী বলে মনে হবে। কিন্তু আমার কাছে ছোট ছোট হ্রদগুলিই বেশী ভাল লাগে। সেগুলি দেখা দেয় অনেক উচুঁতে দুর্গম স্থানে হঠাৎ দেখার বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে; মানুষের রূঢ় চরণক্ষেপ তাদের ধ্যানভঙ্গ করে না; তাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়, আয়ত্ত করা যায় না।

Icicles

সুইজারল্যাণ্ডকে এত বেশী ভাল লাগছে পার্ব্বত্যদেশ বলে। এক একটা শৃঙ্গ যেন মানবাত্মার বাণীর প্রকাশ। সমতলের মাটীর মোহ স্বচ্ছ লঘু ও অগভীর; তার উপর দিয়ে আকর্ষণ ছড়িয়ে যায়, কোথাও এসে ঠেকে না, জমাট বাঁধে না, কিন্তু অসমতলের প্রস্তরের প্রেম চূড়ায় চূড়ায় আকর্ষণের কিরীট পরে; তরঙ্গ ভঙ্গের লীলার মত স্বরগ্রামের খেলার মত ঢেউ খেলে যায়। আর সমতল থেকে উচ্চতা মনকে উপরের দিকে টানতে থাকে অবিরাম, রাত্রিদিন। ওই বরফের শৃঙ্গ জেগে আছে চিরকাল, অতন্দ্র, নিদ্রার দ্বারা অনাহত হয়ে, পথিকের জন্য, আমার জন্য।

আজ প্রকৃতির তুষারস্বপ্ন। এদেশের প্রকৃতিকে বলেছি প্রাণময়ী; এ কথাকে শুধু কথার অর্থ দিয়ে বিচার করলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মানুষ নিজের হাতে ভৈরবীর মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে, করে নিজে মন্ত্রসিদ্ধ হয়েছে। এই দুরন্ত শীতে গাছপালা সব বরফে ঢাকা, পথ লুপ্ত হয়ে গেছে, বৃষ্টির ধারার মত বরফ ঝরছে, আর সেই দেবতার দান তুষার-বিন্দুরূপে সব জায়গায় শোভা পাচ্ছে। সারা বছরে মাত্র কয়েকটি মাস মানুষ প্রকৃতির এই নির্ম্মম দান আশা মিটিয়ে পাবে; কিন্তু যেটুকু পাবে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করবে। নিজের প্রাণের রসে রসিয়ে নিয়ে।

ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্তে একটা উচু পাহাড়ে

ওঠা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এরা সেজন্য ক্ষান্ত হয়নি। সেখানে উঠছে বিদ্যুতের তারের সাহায্যে 'টেলিফেরিকে'; এই যাদুঘর যখন নীচের পৃথিবী ছেড়ে ৩০০০ ফিট উপরে উঠতে থাকে তখন জীবনটা একটামাত্র তারের উপর ঝুলে। কিন্তু তা বলে ভয় ত কেহ পায় না। সেই চূড়ায় উঠে এই চিরযৌবন সম্পন্নদের দল নাচবে, গাইবে, আবার খাবে। এরা যদি আমাদের দেশের লোক হত তাহলে হিমাচলের গোপন সাধকদের চঞ্চল হয়ে পর্ব্বত ছেড়ে অরণ্যবাস করতে হত আর কয়েক বছরের মধ্যে এভারেষ্টে না হোক, অনেক চূড়াতেই পূজার ছুটীটা কাটানর বন্দোবস্ত হয়ে যেত। উপর থেকে নীচে তাকিয়ে দেখলাম যে বরফ সমুদ্রের তরঙ্গগুলি অপরূপ দেখাচ্ছে

তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত করি অবনত।"

এখানে ইউরোপীয় সঙ্গীতের মর্ম্ম রহস্য যেন উদ্‌ঘাটিত হয়ে আছে মনে হল; যেন সে সঙ্গীতের ঝঙ্কার সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে চূড়ায় চূড়ায় তরঙ্গিত হয়ে পড়েছে বিরাট্ বৈচিত্র্য ও অসীম অনুভব নিয়ে। তার মূল সুরটুকু প্রকাশ পাবে ভারতীয় সঙ্গীতের মত বিজনতার বীণায় নয়, নিখিল বিশ্বব্যাপী অর্কেষ্ট্রার ঝঙ্কারে।

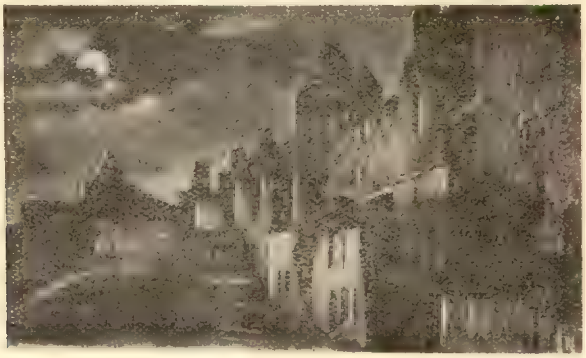

'শালে'—চাঁদিনী রাতে

প্রকৃতি এদেশে নিষ্ঠুরা; এখানে 'কেমন মলয় সমীরে' অঙ্গ ঢেলে কাব্য চর্চ্চা করা যাবে না, তাই মানুষকে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনের আনন্দ আহরণ করে নিতে হচ্ছে। শীতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য শীতকেই এরা আক্রমণ করেছে স্কেটিং করে, শী-ইং করে, বরফের উপর দৌড়ঝাপ নাচ করে। শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কোন পাহাড়ের চূড়ায় কত বরফ পড়ল, কোন হ্রদটা জমে গেল তাই হবে প্রত্যহ প্রভাতের প্রথম খবর। একদিন এমনই একটা সুসংবাদ শুনে লুজান থেকে ছুটে এলাম সাঁ শার্গে বরফের খেলার জন্য। আর সে কি খেলা? সে হচ্ছে জীবনের উপাসনা। তার মধ্যে কিন্তু মিনতি নেই, আছে পরাক্রম। বন্ধুর স্বতঃপ্রবৃত্ত যে দান তাতে মাধুর্য্য আছে; কিন্তু শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যে ধন তার সার্থকতার সঙ্গে প্রথমটার তুলনাই হয় না।

কিন্তু এত উল্লাস ও প্রাণের বিকাশের মধ্যেও একটা জিনিষের অভাব চোখে বাজে। এ উদ্দামতার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি নেই। যে আনন্দ এদের শীতের ভিতর দিয়ে বরফের উপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে ভূমার অসীমতা নেই। বসন্তকালকে এরা আহ্বান করল সাগরস্নান দিয়ে দেশ ভ্রমণ দিয়ে, শীতকালকে আমন্ত্রণ করল শীতের খেলা

দিয়ে। শুধু আনন্দের অন্বেষণই ত এদের মুখে ছাপ রাখছে; তার বেশী ত কিছু নজরে পড়ছে না। আসল কথা হচ্ছে এই যে অবিরাম আনন্দ লিপ্সা সাধারণ লোকের জীবনে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন এনে দিচ্ছে। এখানে একটী বন্ধুর সঙ্গে কথায় কথায় বুঝলাম যে সে কোন দিন চিন্তাশীল বলে খ্যাতিলাভ করতে পারত, কিন্তু লঘু আনন্দের দাবী তার জীবনকে অন্য দিকে গতি দিচ্ছে। সে একটী নবীন লেখক।

প্রকৃতির তুষার-স্বপ্ন

কিন্তু জীবিকা অর্জ্জনের পর বিশ্রামটুকু সে রাশি রাশি বইয়ের মধ্যে মগ্ন থেকে কটানর চেয়ে সাগর তরঙ্গে মগ্ন হয়ে কাটান বেশী আকর্ষণীয় মনে করে। সে বলে যে গভীর রাত্রে সে দিনের বেলায় বিক্ষিপ্ত চিন্তাসূত্রকে গ্রথিত করে আনতে পারে বটে; কিন্তু যৌবনের আহ্বান তার কাছে প্রবল হয়ে উঠে সব কিছুকে মূল্যহীন করে দিচ্ছে। একটি প্রাচীন ইংরেজ গ্রাম্য কবির কবিতা উদ্ধৃত করে হেসে বলল "What had my youth with ambition to do?" অস্বীকার করতে পারি না যে তার কথাও

কম সত্য নয়। আজ সে নেশা চোখে রঙীন হ
উঠেছে, মাত্র কয় বছর পরে তা ধূসর হয়ে যাবে
কেহ আজকের মুহূর্ত্তটীকে নিঃশেষে উপভোগ কর
তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। আজকের দিনে
কি কালকের অনাগত সাফল্যের চেয়ে কম মূল্যবান?

কিন্তু নীরব খ্যাতিহীন মিল্টন—যে ফুটিলেও
পারিত—তার জন্য দুঃখ করে লাভ কি? চি

সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হতে পারে না—সাম্যবাদী এমন কি সমাজবাদী রুষিয়াতেও নয়।

অবশ্য ইউরোপে এমন লোক যথেষ্ট আছেন যাঁ
কের বিরামের জন্য তাঁদের চিন্তার আশ্রম থেকে
প্রান্তরে বা নৃত্যশালায় চলে আসেন এবং তারপর
এই জগৎকে পিছনে ফেলে রেখে যান। ঠিক এ
সামঞ্জস্য আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে পাই
ইউরোপীয়ের চোখের সামনে typical অর্থাৎ f
মূলক ভারতীয় বলতে ফকির বা মহারাজার চিত্র ফু

ভারতবর্ষের কৌপিন ও মুকুট সম্বন্ধেই তাদের যা কিছু ধারণার যখন তখন পরিচয় পাওয়া যায়। সে কথা অস্বীকারই বা করা যায় কি করে? ছেলেবেলায় গল্প শুনলাম বিলাসী জমিদার লালাবাবু উদাস করা সন্ধ্যায় একটী বালিকার অনির্দ্দিষ্ট আহ্বানে উদ্ভ্রান্ত হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন; অপরিণত মনের মধ্যে বিশেষরূপে বিভিন্ন ও সম্পূর্ণ স্বদূর দুটী চরিত্রের

'টেলিফেরিক'

ছাপ পড়ে গেল। ইতিহাসেও রাজা ও রাজ্যের উত্থান পতন এবং বৈরাগ্যময় ধর্ম্মগুলির অভ্যুদয় ও বিলয়ের কথাই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে পড়লাম। জাহাজের পানশালার কাণ্ড দেখে দেশের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে আমরা মদ খাই না, কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা খায় তারা সাধারণতঃ তাল সামলাতে পারে না। আমরা প্রাণের প্রাচুর্য্যে স্বচ্ছন্দ আনন্দ করতে অভ্যস্ত হই না, সে জন্য ভেসে যাওয়ার ভয় বেশী। জাহাজে বারবার মনে হয়েছিল যে আমরা ভোগ ও ত্যাগ এদুটীর মধ্যে কোন অবিরোধী অবস্থা সহজে কল্পনা করতে চাই না। নিজের কথাও ভাবতে হয়েছিল—ভারতবর্ষের ইউরোপের জীবনে অনভ্যস্ত ছাত্র ঐশ্বর্য্যময় ইউরোপের স্বাধীনতার কোন্ পথে চলে যাবে? সমুদ্রযাত্রায় তরঙ্গের তাণ্ডবলীলা দেখবার জন্যই যে ঘোরাপথে বিস্কে উপসাগর দিয়ে ইংলণ্ডে যাবার সংকল্প করল তার খেয়ালী দুঃসাহসী মন কতখানি সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারবে?

ইয়োরোপের সামঞ্জস্যময় জীবনের একটী উদাহরণ এই শীতের খেলার মধ্যে পেলাম। আমার পরিচিত এক প্রবীন মনীষী এখানে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে এই তুষার

বরফে খেলা

সমুদ্রে কোন যুবকেরই প্রভেদ নেই। তিনি কখনো আমাদের দেশের সর্ব্বদা গাম্ভীর্য্যে লুপ্ত প্রায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অনেক অধ্যাপকের মত থাকেন না কিন্তু তাঁর জ্ঞানের দীপ্তি তাঁকে সর্ব্বদাই আমাদের কাছ থেকে পৃথক করে রাখত। আমরা বেশ জানতাম এবং সসম্মানে স্বীকার করতাম যে তিনি আমাদের বয়স্য নন, বন্ধু। এইখানে তাঁর উল্লাস দেখে কিন্তু কোন্ ভারতীয়ের মনে হবে যে তিনি একজন প্রবীন জ্ঞানের সাধক? ইউরোপের আলোকে আমাদের ধাতকে চূড়ান্তবাদী অর্থাৎ extremist বলে প্রকাশিত হতে দেখলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

সিকিম ও তিব্বতে বারো দিন

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এল

প্রথম কল্প—আয়োজন

বন্ধুবর সুধীরকুমার মণ্ডল ১৯৩৪ সনে পূজার ছুটির পর কালিমপং থেকে ফিরে এসে যেদিন প্রথম বললেন, চল হে, আসছে বছর পূজার ছুটিতে হিমালয় ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যাক্, তখন আমরা তাঁর প্রস্তাবটি নিরর্থক আলাপ বলেই নিয়েছিলাম। তখন ভাবিনি, যে সত্য সত্যই আগামী পূজার ছুটিতে সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হবে। সুধীরবাবু কিন্তু আগের বছর কালিমপংএ তাঁর বন্ধু রাজা সনাম টোপগে দরজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা করে এবিষয়ে মনস্থির করে এসেছিলেন। সঙ্কল্প পাকা হোল দুমাস পরে, যখন ১৯৩৪ সনের ডিসেম্বর মাসে ভুটানের মহারাজা কলকাতায় বেড়াতে আসেন। আমাদের এই ভ্রমণের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে যদি এই রাজা দরজীর পরিচয় পাঠকবর্গকে না দিই। রাজা দরজী কালিমপংএর একজন প্রভূত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং সিকিম ভুটান ও তিব্বতের কতক অংশে তাঁর বিস্তর প্রতিপত্তি। এইসব প্রদেশের পাহাড়ী-জাতের ওপরেও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব। তিনি উচ্চশিক্ষিত, মিষ্টভাষী ও লোকপ্রিয়। আমাদের সাহেব-সুবোদের মহলে তাঁর প্রভূত সম্মান ও খাতির। আবার ভুটান রাজ্যে হা নামক এক প্রদেশের ভূস্বামী বলে ভুটান দরবারেও তিনি সম্মানিত 'দেব-জিম্পন' (Chief Adviser)। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও তাঁকে Assistant Political Officer of Bhutan এই পদ দিয়েছেন। বিবাহসূত্রে তিনি সিকিম মহারাজের শ্যালক। তাঁর পত্নী শ্রীমতী রাণী চুণী দরজী একজন উচ্চশিক্ষিতা পার্ব্বত্য-মহিলা। কর্ম্মসূত্রে স্বামী অনুপস্থিত থাকলে রাণীসাহেবাই তাঁর কালিমপংএর শৈলাবাস হতে বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করেন। শোনা যায়, লাট কর্জ্জনের তিব্বত-অভিযানের সময়ে নেপাল ও ভুটানের অধিপতিদের মত, রাজা দরজীও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেছিলেন। সেই জন্যে কৃতজ্ঞ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দরজী বংশের প্রতিষ্ঠা যশ ও প্রভাব যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে বিষয়ে সদাই যত্নবান্। এই রাজ-দম্পতির সহায়তা ও উৎসাহ না পেলে, আমরা ছয়টি বাঙালী, যার মধ্যে আবার চারজন অল্পবয়স্ক যুবক, হিমালয় প্রদেশের দুর্গম পথ ভ্রমণের ও রুদ্ধদ্বার তিব্বত দেশে প্রবেশের কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারতাম না।

গত ডিসেম্বরে যখন ভুটানের মহারাজা ও মহারাণী কলকাতায় আসেন, তখন তাঁদের এখানে বাসের জন্য উপযুক্ত বাড়ীর বন্দোবস্ত করার ভার রাজা দরজী সুধীর বাবুর ওপরেই দেন। মহারাজা মহারাণী কলকাতায় যে কদিন ছিলেন সিকিম ভুটান ও তিব্বতের political officer, তাঁদের সঙ্গে এক বাড়ীতেই থাকতেন, এঁদের সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে সুধীর বাবু আমাদের তিব্বত যাত্রার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, এবং এঁদের কাছে উৎসাহ পাওয়াতেই, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হোল।

সঙ্কল্প করা তো সহজ, কিন্তু সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা অন্য কথা। পথঘাট কি রকম ও কোনদিকে, পথের সম্বল কি নিতে হবে, যান বাহনেরই বা কি ব্যবস্থা করতে হবে, এসব আমাদের কিছুই জানা ছিল না। এ সমস্ত কথা বলে দিতে পারেন, এ রকম লোক আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও কেউ ছিল না। পরিচিত লোক কেউ বা তিব্বত অভিযানের কথা শুনে নাসিকা কুঞ্চিত করলেন, কেউ বা অজস্র বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করলেন, কেউ বা সদুপদেশ দিলেন,—পাগল হয়েছ নাকি, পূজোর ছুটিটা এই রকম করে নষ্ট করতে হয়। এই রকমভাবে জল্পনা কল্পনা করতে করতে ইষ্টারের ছুটি এসে পড়ল। তখন সকলে মিলে স্থির করা গেল যে এই ছুটিতেই সুধীর বাবু কালিমপংএ যান, গিয়ে রাজা দরজীর সঙ্গে পরামর্শ করে, বিস্তারিত ভ্রমণ সূচী স্থির করে আসুন।

এত আগের থেকে ভ্রমণ সূচী স্থির করার অনেক কারণ ছিল। প্রথমত সিকিম রাজ্যের সীমানা ছেড়ে তিব্বতে পদার্পণ করতে হলে Political Officerএর পাশ বা প্রবেশপত্র নইলে চলবে না। এই প্রবেশপত্রের দরখাস্তের সঙ্গে ভ্রমণ-সূচী জুড়ে দিতে হয়, এই নিয়ম। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষ থেকে তিব্বত প্রবেশের ভিন্ন ভিন্ন যত পথ আছে, তার মধ্যে কোনটি নেওয়া আমাদের পক্ষে সহজ, কোনটি নিলে অল্পদিনের মধ্যে ভ্রমণ শেষ করে আসা যাবে, তা আমাদের আগে হতে জানা দরকার। তৃতীয়ত যানবাহন, খাদ্যসামগ্রী, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যবস্থা সবই নির্ভর করছিল পথ নির্দ্ধারণের উপর। তাই তাড়াতাড়ি ইষ্টারের ছুটিতে সুধীরবাবু গিয়ে রাজা দরজীর সঙ্গে পরামর্শ করে এই ভ্রমণ সূচী স্থির করে এলেন।

১০ই অক্টোবর—কালিমপং থেকে গ্যাংটক্
১১ই " ... গ্যাংটক " কার্পোনাং
১২ই " ... কার্পোনাং " চঙ্গু
১৩ই " ... চঙ্গু থেকে নাথুলার ওপর দিয়ে চম্পিটাং
১৪ই " ... চম্পিটাং " ইয়াটুং।
১৪—১৭ " ... ইয়াটুং
১৭ই " ... ইয়াটুং থেকে জেলাপ-লা ওপর দিয়ে কুপুপ
১৮ই " ... কুপুপ " চঙ্গু
১৯শে " ... চঙ্গু " কার্পোনাং
২০শে " ... কার্পোনাং " গ্যাংটক।
২১শে " ... গ্যাংটক " কালিমপং।

কালিমপং অথবা বাঙ্গলাদেশ থেকে তিব্বতে যাবার দুটি পথ আছে। একটি কালিমপং থেকে সোজা তিব্বতের রাজধানী Lhasa পর্য্যন্ত চলে গেছে। ঐ পথটিকে সাধারণত Kalimpong Lhasa Trade Route বলা হয়। আর একটি পথ সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক হতে তিব্বতের অন্তর্গত চুম্বী উপত্যকায় আমো-চু নদীর তীরে ইয়াটুং সহরের কাছাকাছি ঐ আগের রাস্তার সঙ্গে মিলেছে। Trade Route টি হিমালয়ের যে গিরিসঙ্কটের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করেছে সেই গিরিসঙ্কটের নাম Jelah La. La শব্দের ইংরাজী অর্থ Pass. আমাদের সঙ্গে যে উচ্চতা-মান যন্ত্র (altimeter) ছিল, তাতে দেখা গিয়েছিল, Jelah La ১৫১০০ ফিট উঁচু। গ্যাংটক হতে যে পথ তিব্বতে প্রবেশ করেছে, সেটা গেছে Nathu La গিরিপথের ভেতর দিয়ে। তার উচ্চতা দেখেছিলাম ১৪৭০০ ফিট। আমাদের যে ভ্রমণপঞ্জী স্থির হয়েছিল, তা ওই দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করে। কারণ এই যে, কালিমপং হতে গ্যাংটক অবধি যে ৫২ মাইল পার্ব্বত্য পথ গেছে, সেটা বেশ প্রশস্ত, আর মোটরগাড়ী চলাচলের উপযোগী। গ্যাংটক হ'তে যাত্রা করলে আমরা দুদিনের পথ, প্রায় ২৭ মাইল বাঁচাতে পারব। এই সব ভেবে আমরা Kalimpong Lhasa Trade Route দিয়ে যাওয়ার কল্পনা ছেড়ে, গ্যাংটক হয়ে Nathu Laর পথে তিব্বত প্রবেশ করাই প্রশস্ত মনে করলাম। ফেরবার পথে Jelap La দেখব বলে, আমরা ১৭ মাইল Trade Route ধরে এসেছিলাম। এই ভ্রমণসূচী স্থির করবার সময় আমাদের আরেকটি ভাববার বিষয় ছিল, তিব্বতের ভেতরে কতদূর পর্য্যন্ত যেতে পারব।

তিব্বতীয়েরা সাধারণত তাঁদের দেশে বিদেশীর প্রবেশ পছন্দ করেন না। বিনা অনুমতিতে বিজাতীয়ের তিব্বত-প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু ১৯০৪ সনের তিব্বত-অভিযানের পরে ভারত সরকারের যে সন্ধি হয়, তার সর্ত্ত অনুসারে

তিব্বত-যাত্রীগণ কালিম্পং 'স্নো ভিউ' সম্মুখে

নূতন সীমান্ত হ'তে তিব্বতের দুটি সহর পর্য্যন্ত ব্যবসাসূত্রে যাতায়াতের অধিকার বৃটিশ প্রজাবর্গ পেয়েছে। এই অধিকার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাই দেখবার জন্য একজন British Trade Agent এর আপিসও বসানও হয়েছে। এই দুটি সহরের নাম ইয়াটুং এবং গিয়ান-ৎসি। ইয়াটুং, Nathula ও Jelap La, উভয় স্থান হতেই প্রায় ১৫ মাইল। গিয়ান-ৎসি সেখান থেকে আরও ১৪ দিনের পথ। প্রায়

১৫০ মাইলের ব্যবধান। Gantok এ তিব্বত, সিকিম ও ভুটানের যে political officer থাকেন, এখন তাঁর কাছ থেকেই ভারতীয় বাণিজ্যকারীদের ওই দুই সহর পর্য্যন্ত যাবার অনুমতিপত্র নিতে হয়। হিমালয় লঙ্ঘন করে ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়ান্-ৎসি পর্য্যন্ত যাওয়া একমাস ছুটির মধ্যে সম্ভব নয়। নিতান্ত বাধ্য হয়ে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হোল। ইয়াটুং পর্য্যন্ত গিয়েই আমাদের তিব্বত ভ্রমণের, গৌরব বলুন, আকাঙ্ক্ষা বলুন, মেটাতে হবে, এই স্থির হোল।

কালিম্পং খেলাভূমি ও বাজার

ভ্রমণসূচী নির্দ্ধারণ করে যথারীতি political officerএর হুজুরে পাসের জন্য দরখাস্ত গেল। যদিও October মাসে আমাদের যাত্রার কাল, তবু যথেষ্ট সময় থাকতে, অর্থাৎ জুন মাসের প্রথমেই দশজনের জন্য প্রবেশপত্রের প্রার্থনা করলাম। এই দুর্গম পথে আমাদের কতকটা দলে ভারী হয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল, political officer এর সঙ্গে এ বিষয়ে আগে হ'তেই কথাবার্ত্তা কয়ে নেওয়াতে অনেকটা সুবিধা হয়ে গেল। তিনি আমাদের দলের সংখ্যা চাকরবাকর বাদে ছয়জন নির্দ্ধারিত করে দিলেন। আমরা এই ছয়জনের নাম, ধাম, পেশা, ইত্যাদি লিখিয়ে দিয়ে প্রবেশপত্র বের করে নিলাম। আমাদের এতোদিন আগে হতে অনুমতিপত্র নেওয়ার কারণ এই যে শরৎকালে সাহেবসুবো অনেকে পাসের জন্য দরখাস্ত করেন। মাঝে পড়ে আমাদের দরখাস্তটা গোলমাল হয়ে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা ছিল। হিমাচলের চিরতুষারধবলিত গিরিশৃঙ্গগুলির দর্শনমানসে যে সব বিদেশী যাত্রী আসেন, তাঁরা এই পথই অবলম্বন করেন। Mount Everest Expeditionও এই পথ অবলম্বন করেই চুম্বী উপত্যকার ভিতর দিয়ে ইয়াটুং সহরের কয়েক মাইল আগে Kampa Dyougএ তাঁদের base camp স্থাপিত করেছিলেন। ঐ সব পথে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বা তিব্বত গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ যে সব ডাকবাংলো আছে সেগুলো আপন আপন ভ্রমণসূচী অনুসারে আগে হতে কর্ত্তব্য না করলে, সেখানে স্থান পাওয়া দুরূহ। আর ডাকবাংলোতে স্থান না পেলেই সর্ব্বনাশ। এসব পথে না আছে গ্রাম, না আছে অন্য কোনও আশ্রয়স্থল, যেখানে আগে ব্যবস্থা না করে রাত কাটাতে পাওয়া যায়।

Frontier Pass বা তিব্বত দেশে প্রবেশের অনুমতি-পত্রে এই এই সর্ত্তগুলি লেখা থাকে। প্রত্যেক পথিককে এই সব সর্ত্ত পালন করতেই হবে।

(১) তিব্বতে দুই সপ্তাহের অধিক বাস করিতে পারিবে না।

(২) ইয়াটুং এবং গিয়ান-ৎসিতে ব্যবসাকেন্দ্রের বাইরে যাইবে না বা বাণিজ্যপথ হইতে বিচ্যুত হইবে না।

(৩) মৎস্য বা অন্যান্য পশুপক্ষী শিকার করিবে না।

(৪) কোনও মঠ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করিবে না।

(৫) তিব্বতীয়গণের সহিত ব্যবহার বিষয়ে ইয়াটুং বা গিয়ান-ৎসিতে British Trade Agent এর পরামর্শ ব্যতীত চলিবে না।

(৬) ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কোনও সংবাদপত্রে বা অন্যত্র তিব্বত-ভ্রমণ সম্বন্ধে এমন কিছু প্রকাশ করিবে না, যাহা তিব্বতীয়গণের মনোবেদনার কারণ হইতে পারে।

যদিও অনুমতিপত্রে তিব্বতে বন্দুক পিস্তল নিয়ে যাবার

নিষেধ নেই, তবু রওয়ানা হবার আগে আমরা যখন Political officer এর কাছে আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক নিয়ে যাবার প্রার্থনা করি, তখন Lhasa হতে তারযোগে তিনি তিব্বতে fire arms নিয়ে যেতে নিষেধ করে দিলেন।

ছাড়পত্র পাওয়ার পর ডাকবাংলোর ব্যবস্থা করবার জন্য আমাদের Deputy Commissioner, Darjeeling ও British Trade Agent, Yatung কে চিঠি লেখা হ'ল। Sikkim রাজ্যের ডাকবাংলোগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার সিকিম সরকারের হাতে থাকলেও সেখানে বাস করার অনুমতি নিতে হয়, Darjeeling এর Deputy Commissioner সাহেবের কাছ হতে। সেই রকম, তিব্বতের অন্তর্গত কোনও ডাকবাংলোতে থাকতে হলে, আবেদনপত্র পেশ করতে হয়, British Trade Agent, Yatung এর হুজুরে। তিব্বতের অন্তর্গত ডাকবাংলোগুলির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার কার ওপর তা জানি না, তবে প্রত্যেক ডাকবাংলোতে টাঙানো যে নিয়মাবলী আছে, তার নীচে তিব্বতী কর্ম্মচারী ও British Trade Agent, দুজনের জোড়া সহি রয়েছে। Sikkim রাজ্যের ডাকবাংলোর reservation মূল্যের হার লোকপ্রতি দৈনিক ২৲ টাকা, এবং সমস্ত ডাকবাংলোর জন্য দৈনিক ৬৲ টাকার বেশী নয়। আমরা সারা ডাকবাংলো দখল করব বলে, আমাদের ৬৲ টাকা হারে অগ্রিম, অর্থাৎ প্রায় দুমাস আগেই টাকা পাঠিয়ে নিজেদের জন্য reserve করতে হয়েছিল। কেবল Gantox এর ডাকবাংলোর দরুণ লেগেছিল, দৈনিক ১২৲ টাকা। আর তিব্বতের বাংলোগুলির দৈনিক আট টাকা। তবে তিব্বতের ডাকবাংলোর জন্যে অগ্রিম টাকা পাঠাতে হয়নি। ইয়াটুং পৌঁছিবামাত্রই British Trade Agent আপিসের head clerk উপস্থিত হয়ে তাঁদের দৈনিক আট টাকা হারে ভাড়া আদায় করলেন।

হাইকোর্টের দীর্ঘাবকাশ আরম্ভ হোল ২৮শে আগষ্ট। আমরাও যাত্রার আয়োজন করতে পুরোদমে লেগে গেলাম। প্রথম চিন্তনীয় বিষয় হোল যানবাহন। পদব্রজে যাওয়া অসম্ভব না হলেও নানা কারণে আমাদের সাধ্যাতীত ছিল। খানিকটা উঁচুতে চড়ার পর হাওয়াতে অক্সিজেনের ভাগ কমে যায় বলে সমতলবাসী পথিকের অতি সহজেই দম চড়ে যায়। তখন জোর করে হাঁটাহাঁটি করতে গেলে ভারী গোলযোগ হয়। এমন গা ঘোরে, মাথা ঘোরে, বুক ধড়ফড় করে যে অল্প কালের মধ্যেই শয্যা নিতে হয়। এরই নাম mountain sickness বা পর্ব্বতের ব্যাধি। এই সব বুঝে সুঝে নিজের দেহটাকে বাঁচানোর জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হয়। ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশের বন্ধুর পথে চলাফেরা করতে পথিকের প্রধান সুহৃদ mule বা খচ্চর। আমাদের দুজনের জন্যে ও চাকরবাকরদের

কালিম্পং রোড হ'তে তিস্তা নদী

জন্যে সওয়ারী অশ্বতরী আটটি এবং মালপত্র বহনের জন্য লাদানী অশ্বতরী নটি মোট সতেরোটি জানোয়ারের বন্দোবস্ত, রাণী চুণী দরজী করে দিলেন। সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত পিডং সহরের অশ্বতরীর খুব নামডাক। তাই তিনি সেখানের এক মিউল সর্দ্দারের মারফতে প্রত্যেক সওয়ারী মিউলটি পরীক্ষা করিয়ে তবে আমাদের জন্য ভাড়া করেন। মানুষ চড়বার অশ্বতরী প্রত্যেকটি দৈনিক ৩৲ হারে ভাড়া করা হয়েছিল। রাজা দরজী সে সময়ে কালিমপংএ ছিলেন না। লাটসাহেবের

ভুটান ভ্রমণের সমস্ত আয়োজনের ভার তাঁর ওপর ছিল। তিনি সেই কাজে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হওয়াতে আমাদের সফরের ব্যবস্থার ভার রাণীজীর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। গভর্ণর বাহাদুরের ভুটান যাত্রা আমাদের কয়েকদিন পূর্ব্বে স্থির হওয়াতে আমরা একদিকে যেমন ভাল রাস্তা ও পরিষ্ক'র পরিচ্ছন্ন ডাকবাংলোর সুবিধা পূর্ণমাত্রায় পেয়েছিলাম, তেমনি অন্যদিকে এই সতেরোটি অশ্বতরীর ভাড়া বাঁচাবার সৌভাগ্য

তিস্তা-সেতু

হতে বঞ্চিত হয়েছিলাম। তার কারণ গভর্ণর বাহাদুরের ভুটানে শুভাগমন উপলক্ষ্যে রাজা দরজী তাঁর নিজের সমস্ত অশ্ব ও অশ্বতরী সেখানে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তা নইলে আমাদের এই ভ্রমণে তাঁদের নিজেদের পশু দিয়ে সাহায্য করতে সহজেই পারতেন। টোপগে দম্পতি সুধীর বাবুকে এজন্য ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বহুবার পত্র দিয়েছেন। কিন্তু একথা নিয়ে দুঃখ না করাই ভাল। কোথায় মহামহিম লাটবাহাদুর, আর কোথায় সামান্য উকিল-এটর্ণী বন্ধুমণ্ডলী!

যানবাহনের ব্যবস্থার পর বাকী রইল পোষাক পরিচ্ছদ, বিছানা কম্বল ও খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধপত্র। পরিচ্ছদ নির্ব্বাচনে প্রধানত দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল এই দিকে যে অনাবশ্যক জিনিষে আমাদের বোঝা না বাড়ে, অথচ উপর পাহাড়ের ভীষণ শীতে নিজেদের বাঁচাতে পারি। ভ্রমণকালে প্রত্যেকের অঙ্গে উঠেছিল, একত্রে এই সব কাপড় :—সাদা গেঞ্জি ও উলের দুটি গেঞ্জী, ফ্লানেলের সার্ট, পশমের সোয়েটার, গরম কোট, পায়ে ডবল মোজা ও পট্টি, ভেতরে উলের পায়জামা, তদুপরি গরম প্যাণ্ট, হাতে দস্তানা, গলায় পশমের গলাবন্ধ, মাথায় Balaclava cap বা বাঁদুরে টুপী। ওভারকোট মাত্র দুজনের সঙ্গে ছিল, তাও পথে ব্যবহার হয় নাই। কোনও কোনও স্থানে ডাকবাংলাতে সকাল সন্ধ্যায় ব্যবহার হয়েছিল মাত্র। এই পোষাক পরে পথে শরীরের কষ্ট কারও বড় একটা হয় নাই। শয্যাদ্রব্যের মধ্যে বিছানা ছিল, প্রত্যেকের একটা বালিশ, ও চারখানি করে কম্বল, দুটি পাতবার জন্য ও দুটি ঢাকবার জন্য। বোঝা বেশী হবে বলে আমরা কেউ লেপ তোষক সঙ্গে নিইনি। কিন্তু কালিমপংএ রাণীজী এসংবাদ শুনে প্রত্যেকের জন্য একটি করে নূতন পাতবার তোষক পাঠিয়ে দিলেন। পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে, তোষক না থাকলে, আমাদের সেই নিদারুণ শীতে কি কষ্টই হোত!

রসদ সংগ্রহ, কতক কলকাতা হতে, কতক কালিমপং হতে করা হয়েছিল। পার্ব্বত্য পথে তো আহার্য্য পাবার কোনও সম্ভাবনা নাই। সেখানে না আছে লোকের বাস, না আছে দোকান পসার। সুতরাং ছয়টি জীবের জন্য বারো দিনের খাদ্য সংগ্রহের সম্ভাবনা কলকাতা হতেই আমাদের করতে হয়েছিল। কলকাতা হতে নিয়ে যাওয়া গেল :— ৬ টিন এক পাউণ্ড মাখন, ৬ টিন জ্যাম, ৬ টিন Condensed milk, চা ২ পাউণ্ড, কোকো ২ টিন, Ovaltine এক টিন, বিস্কুট চার বাক্স, preserved fruits ৬ টিন, ৪ টিন মৎস্য, ২ টিন mutton। কিন্তু শেষোক্ত ছটি টিনের সদ্ব্যবহার আমাদের করতে হয়নি। কারণ প্রথম টিন খোলার সঙ্গে সঙ্গে তার সৌরভে আমরা এমন আকুল হয়ে উঠলাম যে সেদিন আর সান্ধ্য আহার করতে হোল না। বিধাতা যার অদৃষ্টে যা লেখেননি, তার আর ভোগ কোথা থেকে হবে? নচেৎ এই

সুস্বাদু ও সুসজ্জ খাদ্যের সরবরাহ করে লোকে লক্ষপতি হয়ে যাচ্ছে !

খাদ্যের ব্যবস্থার পর আমাদের সংগ্রহ করতে হোল ঔষধ-পত্র। সাবধানের মার নেই। অজানা অচেনা দেশে জনমানব-হীন বিপদসঙ্কুল পথে অত্যুচ্চ পর্ব্বতের আবহাওয়ায় অনভ্যস্ত যানবাহনে যাতায়াতে শারীরিক অসুস্থতার আশঙ্কা তো আছেই। তাই সঙ্গে নেওয়া গেল প্রায় একটি ছোটখাটো ডাক্তারখানা বিশেষ! এ বিষয়ে আমাদের দলনায়ক সুধীরবাবুর দৃষ্টি কোনও দিন শিথিল হয়নি। Bengal Chemical এর একটি Emergency Set, তা ছাড়া টিংচার আয়োডিন, কুইনাইন, ব্যাণ্ডেজ, first aid এর দ্রব্যাদি, সর্দ্দি কাশির ঔষধ, মাথা ধরার ঔষধ, mountain sickness এর জন্য aspirin ও veramon, মুখ ফাটার জন্য Glycerine, Catine cold cream, পেটের অসুখের জন্য Ptycho soda tablet, Bi-carbobate of soda, Oxo-pharmakon; উপরন্তু চোখের ঔষধ; গলার ঔষধ, বেদনার মালিস ইত্যাদির কিছুরই অভাব ছিলনা।

আজকালকার দিনে দেশ-ভ্রমণের পূর্ণ আনন্দ কখনও পাওয়া যায় না, যদিনা সেই ভ্রমণের কাহিনী চিত্রে চিরজাগরূক রাখা যায়। তাই আমাদের সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একটা Rolleiflex যন্ত্র, এবং চলচ্চিত্র তোলবার জন্য একটি movex camera। মনোমুগ্ধকর দৃশ্য এবং স্মরণীয় ঘটনার চিত্র যত-দূর সম্ভব এঁকে রাখবার চেষ্টা করা গেছে। সে সব চিত্র যদি পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন করতে পারে, তবেই আমাদের চেষ্টা সার্থক।

এছাড়া Raincoats, Hill stick, hot bag, glare-glass, Thermoflask, binocular, stove ইত্যাদি খুচরো সরঞ্জাম সবই সঙ্গে ছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

যুগান্তকারী উপন্যাস
সুলেখক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বি-এল'র
সদ্য প্রকাশিত অপূর্ব্ব সৃষ্টি
খেয়ালী তরুণী ১৷৷০
যাহার প্রকাশে সমগ্র বঙ্গ চঞ্চল। যাহাতে আছে এক আধুনিক নারী, যে আকাশে উড়ে, সাগরে ঢেউ খেলে…
অগ্নিলেখা ১৷৷০ আলোড়ন ১৷৷০
আনন্দবাজার, দৈনিক বসুমতী, ডাক্তার নরেশ প্রভৃতি কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত।
শ্রীগুরুলাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

সন্তরণ প্রতিযোগিতায় একাদশ বর্ষীয়া বালিকা শ্রীমতী লীলা চট্টোপাধ্যায়ের অসামান্য কৃতিত্ব

কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায় ২৪ পরগণার বারুইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ও সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সদস্যা। কুমারী লীলা গতবৎসর ছোট মেয়েদের সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সর্ব্বত্রই জয়ী হয়েছিলেন। গত বৎসর হুগলীতে গঙ্গা বক্ষে ১ মাইল সন্তরণে বয়স্কা মহিলা সাঁতারু বাণী ঘোষকেও পরাজিত করেন। এঁর সাতার কাটিবার প্রণালী অত্যন্ত উন্নত ধরণের ও উচ্চাঙ্গের যা সচরাচর পুরুষদিগের মধ্যে দেখা যায় না।

সাঁতারু বালিকা কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায়

কুমারী লীলা এবৎসর সাধারণের যে সকল প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন সে সকল প্রতিযোগিতায় সকল বিষয়ে

পূর্ব্বেকার সময়-সীমা ভেঙেছেন। কুমারীর সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই যে এ বৎসর ১০০ মিটার সন্তরণে বাণী ঘোষের ন্যায় একজন বয়স্থা বালিকা সাঁতারুকেও পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন। কুমারী লীলা প্রথম হ'তে বিখ্যাত কবি সাঁতারু শ্রীযুক্ত শান্তি পালের শিক্ষাধীনে ও তত্ত্বাবধানে থেকে অসামান্য উন্নতি লাভ করেছেন। আমরা কুমারী লীলার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

কুমারী দীপিকা দে

গত ১১ই আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ণে দমদম গৌরীপুরে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুরম্য বাসভবন 'অলকা'র উদ্যানে বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আহ্বানে রবিবাসরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ৬১তম জন্ম দিনোৎসবে এই অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা কুমারী দীপিকা দে'র অপূর্ব্ব 'ভীলবালা', 'সাপুড়িয়া' ও 'পূজারিণী' নৃত্য দর্শনে সকলেই বিমোহিত হ'য়েছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দে মহাশয় প্রদত্ত দুইটী রৌপ্য পদক ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র স্বহস্তে দীপিকাকে পরিয়ে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন, "দীপিকার নাচ যা দেখলাম, তা সত্যই চমৎকার। এরূপ নাচ পদক লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।" দীপিকার 'ভীলবালা' নাচ সত্যই অপূর্ব্ব। আমরা তাঁর উন্নতি ও মঙ্গল প্রার্থনা করি।

কুমারী দীপিকা দে
(সুবিখ্যাত ডিটেক্টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের পৌত্রী)

'অলকা'—গৌরীপুর-দমদম
বিচিত্রার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাস-ভবন

তিনঠাঙ্গা স্কুল

বিহারীরা শুধু বাঙালি-বিদ্বেষ নিয়েই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই, তাঁরা গ্রাম সংগঠনে উঠে পড়ে লেগেছেন, নীচের ছবিখানিতে সেই পরিচয় পাওয়া যায়। ভাগলপুর জিলার তিনঠাঙ্গা গ্রামখানি খুব বড় নয়। গ্রামের লোকের বেশীর পড়ে। কমিশনর জে, আর, ডেন, সি, আই, ই মহোদয়ের পরিদর্শন উপলক্ষে ছবিটি তোলা হয়েছিল। ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব বি, কে, সেন মহাশয়ের সৌজন্যে ছবিখানি আমাদের হস্তগত হয়েছে। আমাদের বাঙলায় হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া বরিশাল প্রভৃতি জেলায়

তিনঠাঙ্গা স্কুল পরিদর্শন

ভাগ জাতিতে গোয়ালা। তাঁরা নিজেদের চেষ্টায় এই এম, ই স্কুলটি গড়ে তুলেছেন। এর বৈশিষ্ট্য এই যে বিবাহিত অথবা বয়স্ক মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একই সময়ে হরিজন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শিক্ষাবিস্তারের প্রশংসনীয় কাজ চলেছে। সেই সব কর্ম্মিদের কাছে আশা করি ছবিখানির আদর হবে।

ক্ষণিকের অতিথি—শ্রীসীতা দেবী। কলিকাতা, ২৮৩ দরগা রোড, পার্ক সার্কাস, শ্রীমতী শান্তা দেবীর নিকট এবং কলিকাতার সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য দুই টাকা।

লেখিকা কথা সাহিত্যে সুপরিচিতা। তাঁহার এই উপন্যাস খানির ঘটনাবিন্যাস অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। পড়িতে বসিলে কিছুতেই শেষ না করিয়া উঠা যায় না। গল্পের গতি বেগবান অথচ সহজ। চরিত্রগুলি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে, প্রধান চরিত্রগুলির কথা বাদ দিই, খুব ছোট চরিত্রও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে লেখার গুণে, যেমন বলা যাইতে পারে লালমোহন কিংবা কনকাম্পার মেসো ও মাসীর চিত্র। কনকাম্পাকেও আমরা কয়েকবার মাত্র দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাতেই এই দুর্ভাগিনী নারীর কথা আমাদের মনে গভীর দাগ দিয়া যায়, তপতীকে ভুলিলেও কনকাম্পাকে ভোলা যায় না। তপতী যে ধরণের চরিত্র, তাহাকে ফুটিবার আরও অবকাশ দেওয়া উচিত ছিল মনে হয়। তপতীকে অতটুকু পাইয়া আমাদের আশা মিটে না। বইয়ের গোড়া হইতে সত্যশরণকে দেখি, কিন্তু সত্যশরণ সম্বন্ধে আমাদের মনে খুব কিছু কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় না। তপতীকে যতবার দেখি, ততবারই নতুন কিছু দেখিতেছি মনে হয়। তপতীর সম্বন্ধে পাঠকের মনে কৌতূহলের অন্ত নাই।

পুস্তকের মলাটের উপরকার চিত্রটী সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু মনে হয় গল্পের সহিত এই ছবিটীর মিল নাই। পতঙ্গ ও দীপশিখার চিত্রে প্রেমের যে অন্ধ, দুর্ব্বার আকর্ষণের ইঙ্গিত আছে, সত্যশরণ ও তপতীর প্রেম সে জাতীয় নহে। ইহার গতি সব দিক হইতেই বড় ধরা বাঁধা ও সহজ। সত্যশরণের প্রতি কনকাম্পার মনোভাবও অত্যন্ত চাপা, প্রেম কি না বোঝা যায় না অন্ততঃ মোহের তীব্রতা সেখানে যে নাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এখানেই বইয়ের একটা ত্রুটী। ইহাতে প্রেম বড় মন্দগতিতে চলিয়াছে। কৌতূহলের অবকাশ নাই বলিলেও চলে। দুয়ে দুয়ে চার যেমন সত্যি, সত্যশরণ ও তপতীর মধ্যে যে প্রেম হইবে ইহাও তেমনি সত্যি। সে প্রেম মধুর বটে, কিন্তু মার্ব্বেল পাথরে বাঁধানো চৌবাচ্চার জল, বেগবতী নদী নয়।

এ গেল শুধু প্রেমের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে। পুস্তকের গল্পের সম্বন্ধে এ উক্তির সম্পর্ক নেই, তাহা যেমন কৌতূহলজনক, তেমনি বেগবান।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপালের পথে—শ্রীসুধীরকুমার আচার্য্য ও শ্রীরমেশচন্দ্র সাহা: বরেন্দ্র লাইব্রেরি—মূল্য বারো আনা।

ভ্রমণকাহিনী হইলেও সাধারণতঃ এই রকমের বই যেমন নীরস হয় তেমন নয়। লেখকদের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য, পথ ও বর্ণিত স্থানগুলির পরিচয় তাঁরা সূক্ষ্ম দৃষ্টি, অনুসন্ধিৎসা ও ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন। বইটি খুবই সুখপাঠ্য।

ব্রিজসঙ্কেত—হরতনের টেক্কা কথিত: রামশঙ্কর মৈত্রেয়, ৬১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পাঁচ আনা।

বাংলা ভাষায় ব্রিজ-খেলা সম্বন্ধে এমন বই চোখে পড়ে নাই। ডাক খেলা, ব্রিজ-খেলার আধুনিকতম নিয়মকানুন ইত্যাদি ব্রিজ-খেলার সকল বিভাগ সম্বন্ধে বইটি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। গ্রন্থকারের বলিবার ভঙ্গী ও ভাষা প্রশংসনীয়। গুণের তুলনায় বইটির দাম খুবই কম।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

আফিমের ফুল—অনিরুদ্ধ রায়। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২২৮। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানির শ্রেণী নির্দ্ধারণ করিতে প্রথমটা একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু গল্প অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় এখানি উপন্যাস। অবৈধ মাদক ব্যবসায়ের গুপ্তরহস্যের সহিত বাংলার রাজনীতিক ইতিহাসের এক অধ্যায় জড়াইয়া এই কৌতূহলপ্রদ উপন্যাসখানি লিখিত। দুঃসাহসিক ঘটনাবলীতে ইহার প্রত্যেক অধ্যায় পরিপূর্ণ হইলেও ইহা সাধারণ শ্রেণীর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস নয়। চরিত্র অঙ্কনে যে লেখকের কৃতিত্ব আছে, নলিনী, আসিয়া বিবি ও সুকুমার বাবুর চরিত্রে লেখক তাহা সপ্রমাণ করে গেছেন। বইখানিতে অনেকগুলি ছবি আছে, কিন্তু বোধহয় সেগুলি না দিলেই ভাল হইত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভালো।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন কবিতা:—হরপ্রসাদ মিত্র, বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ২৪ পৃষ্ঠা—১৪টি কবিতার সমষ্টি—মূল্য ছয় আনা।

প্রথম লেখকের ৪টি এবং পরবর্ত্তী দুইজন লেখকেরই ৫টি করিয়া কবিতা বক্ষ্যমাণ পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সব কবিতাগুলিই রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত গদ্য ছন্দে লেখা।

গদ্য ছন্দে কবিতা আমাদের দেশে এখনো বেশী চলিত হয় নাই। সুতরাং এই ধরণের কবিতা পড়িতে আমাদের দেশের পাঠকবর্গের কান এখনো অভ্যস্ত নহে। অতএব কবিত্রয়ের সাহিত্যক্ষেত্রে এই যাত্রাপথকে অভিনন্দিত করিবার হেতু আছে কিনা এ বিষয়ে কোন নির্দ্দেশ দেওয়া এখনো সুকঠিন। রবীন্দ্রনাথ গদ্য ছন্দে কবিতা লিখিয়াই গিয়াছেন কিন্তু লিখিবার রীতি সম্বন্ধে কোন আইন কানুন বলিয়া দিয়াছেন কি না আমার জানা নাই। বোধ হয় তিনি বলিয়াছেন যে ছন্দে কবিতা লেখার চেয়ে গদ্য ছন্দে কবিতা লেখা দুরূহ। কিন্তু গদ্য এবং গদ্যছন্দে কবিতা এ দুইয়ের সীমারেখা যে কোথায় এ বিষয়ে এক কান ব্যতীত যাচাই করার অপর কোন প্রণালী আছে কিনা আমি জানি না।

একটা মোটা কথা এই মনে হয় যে রসসৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। অতএব যদি গদ্য কবিতার দ্বারা রসের সৃ থাকে এবং যদি তাহাতে এমন ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থা গদ্য হইতে স্বতন্ত্র তবে গদ্য ছন্দে কবিতা লেখার সাধিত হইয়াছে বলিতে হইবে। সেইভাবে বিচার নবীন কবিত্রয়ের নবীনতর প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ করিতেই হয়।

বইখানির প্রচ্ছদপট এবং get up সুরুচির পরি গদ্য ছন্দে কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে কবিত্রয়কে ছন্দে লিখিতেও অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীঅবনীনাথ

গীতা—শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম-এ, ‍ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় কাব্যাকারে গ্রথিত।

প্রকাশক রায়বাহাদুর শ্রীমুরলীধর রায়চৌধুরী বসিরহাটে গ্রন্থকারের নিকট এবং কলিকাতার পি রাসবিহারী এভিনিউতে প্রকাশকের নিকট ও পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

সুকবি ভুজঙ্গধর সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। "মঞ্জরী" "গোধূলি" "ছায়াপথ" প্রভৃতি কাব্য সুধী সমাদৃত হইয়াছে।

গীতা ধর্ম্মশাস্ত্র এবং হিন্দুর নিত্যপাঠ্য। নানাভ বিভিন্নভাবে ইহার অসংখ্য অনুবাদ প্রচলিত আছে। ভুজঙ্গধরের এই অনুবাদ বৈশিষ্ট্যে অভিনব এ কথা অ বলা যায়। তিনি কাব্যের মাধুর্য্যে ইহাকে অপূর্ব্ব শ্র করিয়াছেন; কিন্তু, ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন, এ মূলের সৌন্দর্য্য কোথাও ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। সর্ব্বত্র এক রচিত হইলে রুচিকর হয় না, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজনানুরূপ নানাবিধ ছন্দের আশ্রয় লইয়াছেন। স্বচ্ছন্দগতি এবং সুমধুর লালিত্য সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। এ আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া ভাবানুগত অনুবাদ করিয় মনস্বী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভূমিকায় এই পুস্তকের ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক বাহুল্যমাত্র। এই গ্রন্থের পরিশেষে মূলও সন্নিবিষ্ট হই

গীতারসপিপাসু সকলেই এই অনুবাদ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

মরাল—মৌলভী কাজী কাদের নওয়াজ প্রণীত। প্রকাশক মৌলভী কাজী মৌলা নওয়াজ বি, এ, সাহিত্যকুঞ্জ, মঙ্গল-কোট। মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা।

এখানি কবিতার গ্রন্থ। কবি কাদের নওয়াজ বিচিত্রার পাঠক-সমাজের কাছে অপরিচিত নন,—তাঁর অনেক কবিতা পূর্ব্বে বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। এ বইখানি পাঠ করে আমরা অতিশয় সুখী হয়েছি। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য—সেগুলির গতি মরালেরই মতো লীলায়িত এবং সেগুলির রূপ মরালেরই মতো শুভ্র সুন্দর। সুতরাং 'মরাল' নাম সর্ব্বতো-ভাবে সার্থক হয়েছে।

বইখানির ভূমিকায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "এই বইখানিতে কবির বাহিরে বাহিরে যে পরিচয় তার চেয়ে অনেক মূল্যবান অন্তরের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ তিনি পাঠকদের দিয়েছেন। এই উভয়দিকে পরি-চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুদূর আরব্য-পারস্য দেশের জনকয়েক মহা-কবির লেখার ও ভাবের সঙ্গে পরিচয় ক'রে নেবার সুযোগ এই বইখানিতে পাওয়া যাবে।" . . .

বইখানির ছাপা কাগজ ও বাঁধাই সৌষ্ঠব এবং সুরুচির পরিচায়ক। আমরা এই পুস্তকটির বহুল প্রচার এবং পাঠ কামনা করি।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গল্প সঞ্চয়—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত। সিটি বুক সোসাইটি, ৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হ'তে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৶০ টাকা।

চিত্রে চিত্রে শোভিত এই সুবৃহৎ পুস্তকটি ছেলেদের গল্প সঞ্চয়ন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র হ'তে আরম্ভ ক'রে বাঙ্গলা দেশের অপরাপর সুপ্রসিদ্ধ লেখকদের মোট ২৮টি গল্প এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। চিত্র আছে ৪৭টি।

গল্প এবং চিত্রের এই মনোরম সংযোগ পূজার অবকাশে ছেলেদের প্রচুর আনন্দের উপকরণ হবে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নাথ সরকার মহাশয় বহুকাল হ'তে ছেলেদের চিত্তের রসদ জুগিয়ে আসছেন। এবারকার পূজার সময়ের এই রসদটির জন্যও বাঙলা দেশের কিশোর-সমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হবে। . . .

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

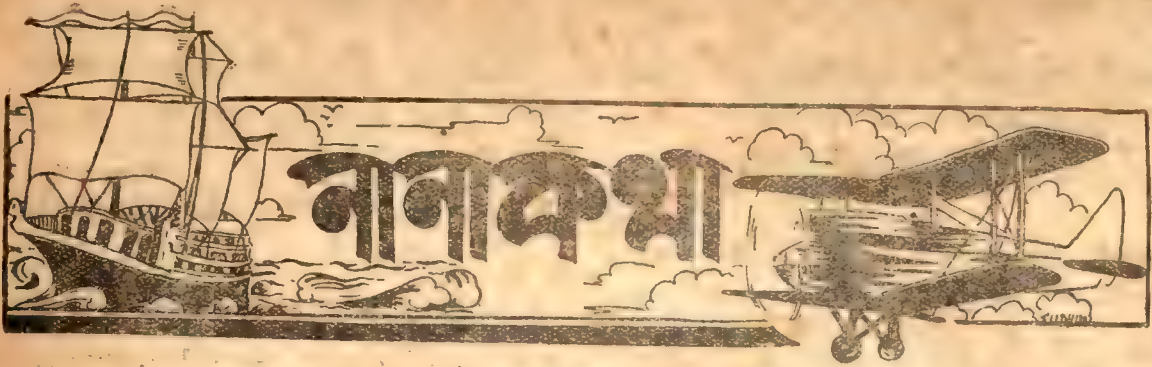

রবিবাসর ও শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব

গত ১১ই আশ্বিন রবিবার বিচিত্রা-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আহ্বানে দমদম গৌরীপুরে বিচিত্রা মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুরম্য বাসভবন "অলকায়" রবিবাসরের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত অধিবেশনে রবিবাসরের পক্ষ হতে বাসরের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর একষষ্টিতম জন্ম দিনোৎসব উপলক্ষ্যে অভিনন্দন প্রদান করা হয়।

সভারম্ভে কুমারী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এতদুপলক্ষে রচিত উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। তৎপরে রবিবাসরের সর্ব্বাধ্যক্ষ রায় জলধর সেন বাহাদুর সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে অভ্যর্থিত করেন এবং শরৎচন্দ্রকে মাল্য ও চন্দন দান ক'রে তাঁর শুভ কামনা করেন। কথা ছিল রবিবাসরের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভায় উপস্থিত হয়ে শরৎচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করবেন, কিন্তু গুরুতর কারণবশতঃ শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করতে না পারায় তিনি বিচিত্রা সম্পাদককে যে পত্র লিখেছিলেন সেটি (এই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) সভায় পঠিত হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের মাতুলদ্বয়, শরৎচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করেন। অতঃপর রবিবাসরের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক অভিনন্দন পত্র পাঠের পর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় উহা শরৎচন্দ্রকে প্রদান করেন। রবিবাসরের অন্যতম সদস্য সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অতিশয় সুরুচির সহিত ষাটটি অঙ্কিত পুষ্পের দ্বারা অভিনন্দন পত্রটিকে চিত্রিত করেন। বলা বাহুল্য ষাটটি পুষ্প শরৎচন্দ্রের ষাট বৎসর বয়ঃক্রমের পুষ্পিত স্বরূপ। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রতিভাষণ প্রদান করেন।

অভিনন্দনের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আমোদ প্রমোদের পর্ব্ব আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কৌতুকাভিনয়, কুমারী রমা গঙ্গোপাধ্যায়ের এসরাজ বাদন, কুমারী দীপিকাদের সাঁওতাল সাপুড়িয়া ও আরতি নৃত্য, কুমারী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দি খেয়াল গান, কুমারী রেখা ও কুমারী লেখা ভগ্নীদ্বয়ের সঙ্গীত নৃত্য, কুমারী অসীমা শেঠের বাঙলা গান এবং কুমারী আভাময়ী বসুর কীর্ত্তন গান সভাস্থলে একটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-হিল্লোলের সৃষ্টি করেছিল। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কৌতুকাভিনয়, সুগায়িকা কুমারী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান এবং কুমারী দীপিকা দের নৃত্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতের তালে তালে অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা দীপিকার লীলায়িত পদন্যাস এবং অঙ্গ-ভঙ্গী সকলকে বিমুগ্ধ করেছিল। এত অল্প বয়সে সমস্ত দেহ ও মনের যুক্ত সঙ্গতির দ্বারা নৃত্য-ছন্দের মধ্যে এমন নিগূঢ় এবং কমনীয় ভাব-সংস্থাপন কদাচিৎ দেখা যায়। আমরা আশীর্ব্বাদ করি কুমারী দীপিকার নৃত্য-কলা সাধনা যেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাফল্যের দ্বারা পুরস্কৃত হয়। কুমারী দীপিকা প্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ-ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের পৌত্রী। রবিবাসরের সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র কর্তৃক প্রদত্ত রৌপ্য পদক শরৎচন্দ্র নিজ হস্তে দীপিকার কণ্ঠে পরিয়ে দেন। কুমারী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎকৃষ্ট সঙ্গীতে প্রসন্ন হয়ে শ্রীযুক্ত কর্ম্মযোগী রায় তাঁকে একটি পদক দিতে প্রতিশ্রুত হন।

সুরম্য উদ্যানভূমিতে মুক্ত আকাশতলে গীতনৃত্যানন্দিত

পুষ্পমাল্যখচিত সুবিন্যস্ত উৎসব-সভার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পার্শ্ববর্ত্তী এরোড্রোম থেকে সহসা একখানি এরোপ্লেন সভার ঠিক উপরে উড়ে এসে নানাবিধ কৌশল কসরৎ দেখাতে আরম্ভ করে। ভূমিতলের উৎসব আনন্দের সহিত নভঃস্থলের এই অযাচিত সহৃদয় যোগদান সকলেরই পক্ষে বিশেষরূপে উপভোগ্য হয়েছিল।

রবিবাসরের পঞ্চাশ জন সদস্যের মধ্যে চল্লিশ জন সদস্য সেদিন উপস্থিত ছিলেন, তদ্ভিন্ন আহ্বানকারী কর্ত্তৃক বিশেষ-ভাবে নিমন্ত্রিত রায় বাহাদুর প্রমথনাথ মল্লিক, স্বামী সন্তোষানন্দ মহারাজ, শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত, ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য, ডাঃ প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অভিরাম মল্লিক, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন রায় প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক এবং মান্যগণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব্বশেষে নৈশভোজান্তে সেদিনকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় গৃহস্বামী শ্রীমান সুশীলকুমারের আন্তরিক আদর-আপ্যায়নে সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

ভারত ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

আমাদের দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য পুরাতন ও বৃহৎ জীবন বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে ভারত ইনসিওরেন্স অন্যতম। এই কোম্পানীটি পরিকল্পিত এবং গঠিত হয়েছে শ্রীযুক্ত হরেকিষণলালের দ্বারা। তিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ভারতবর্ষে আধুনিক উন্নতি পদ্ধতিতে বীমা ব্যবসায় যাতে পরিচালিত করা যায় তৎসংক্রান্ত প্রচার ও প্রসার বিষয়ে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন।

'ভারত ইনসিওরেন্সে'র জীবন বীমা তহবিলের মোট পরিমাণ এই কোম্পানীর সমস্ত বীমাপত্রের মোট দায় মেটাবার পক্ষেও যথেষ্ট অধিক। তদ্ভিন্ন বিগত চল্লিশ বৎসর ধরে যে রক্ষিত তহবিল (Reserve Fund) গড়ে উঠেছে তার পরিমাণও বিপুল।

যে সকল ব্যবসায়ীর উপর এই কোম্পানী পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছে তাঁরা সকলেই ধনী এবং প্রখর ব্যবসাবুদ্ধি সম্পন্ন। কোম্পানীর নূতন চেয়ারম্যান শেঠ রামকিষণ দাস ডালমিয়া বিহারের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী। শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ খৈতান এম্-এ, বি-এল্ কোম্পানীর ভাইস-চেয়ারম্যান। পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ বীমাকর্ম্মী মিঃ পি, ডি, খোসলা কোম্পানীর জেনেরাল ম্যানেজার এবং ডাঃ এস, সি, রায় বঙ্গদেশের ডিরেক্টর ইন্-চার্জ নিযুক্ত হয়েছেন।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে দন্তচিকিৎসা বিভাগ

আমরা অবগত হয়ে সুখী হলাম যে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে পূর্ব্বে দন্তচিকিৎসার যে ব্যবস্থা ছিল তার উন্নতি ও প্রসারের জন্য এক নূতন পরিকল্পনা করা হয়েছে। তদনুসারে দন্তচিকিৎসা বিভাগের জন্য এই হাসপাতালে এক স্বতন্ত্র দালান নির্ম্মাণ করা হচ্ছে। ইদানীং দন্তরোগের যেমন প্রাদুর্ভাব তাতে এই নূতন ব্যবস্থায় কলিকাতা ভবানীপুর অঞ্চলের বিশেষ সুবিধা হবে। সুপরিচিত ও সুযোগ্য দন্তচিকিৎসক ডাঃ ডি, এস, দাশগুপ্ত ডি ই ডি এফ (প্যারী) বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ও হাসপাতালের পরিচালকমণ্ডলী কর্ত্তৃক উক্ত বিভাগের কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হয়েছেন। আমরা আশা করি তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় উক্ত বিভাগের উত্তরোত্তর উন্নতি হবে।

জাতীয় কল্যাণ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

উক্ত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩৬ সালের অর্থাৎ প্রথম বর্ষের ডিরেক্টরগণের রিপোর্ট পাঠ করে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। ১৯৩১ সালে বোলপুরে একটি প্রভিডেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি স্থাপিত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই উক্ত সোসাইটিকে উন্নত ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটিকে পরিবর্ত্তিত করবার পরামর্শ হয় এবং তদনুযায়ী ১৯৩৫ সালের মে মাসে বর্ত্তমান সোসাইটি গঠিত হয়। রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে আলোচ্য বর্ষের আয় এবং ব্যয়ের রেশিও ৫১.৫৪%। আয়-ব্যয়ের এই হার অতিশয় সন্তোষজনক বলতে হবে। আমরা এই বীমা কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউট

গত ৪ঠা অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যাকালে বিচিত্রা সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ইন্‌ষ্টিটিউট হলে শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউটের একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভায় পদব্রজে এবং সাইকেলযোগে পৃথিবী-ভ্রমণকারী My travels in the East নামক পুস্তকের লেখক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতার দ্বারা তাঁর দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন। ভয়-বিস্ময় কৌতূহল এবং শিক্ষাপ্রদ সরস ভ্রমণকাহিনী শুনে শ্রোতৃবর্গ সকলেই বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। এই সকল বক্তৃতাদিতে ম্যাণ্টার্ণ শ্লাইডের ব্যবস্থা থাকলে কাহিনী সুসম্পূর্ণ হয়।

বরানগর অঞ্চলে শশিপদ ইনষ্টিটিউট একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা এবং সাহিত্য প্রচারকল্পে এই সমিতির উদ্যম এবং ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

"কার্মিনিয়া তৈল" এবং "সুগন্ধি মহা-ভৃঙ্গরাজ তৈল"

"কার্মিনিয়া তৈলে"র প্রস্তুতকারক বম্বের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল কোং এবং "সুগন্ধি মহা-ভৃঙ্গরাজ তৈলে"র প্রস্তুতকারক কলিকাতার শ্রীকেমিক্যাল ওয়ার্কস্ তাঁদের তৈলের নমুনা আমাদের প্রেরণ করেছেন। এজন্য আমরা তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। উভয় তৈলই ব্যবহার ক'রে আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করেছি। দুটি তৈলেরই গন্ধ সুমিষ্ট এবং চিত্তপ্রফুল্লকর। শারদীয় পূজার আনন্দের ব্যবস্থায় এই দুটি তৈলই যে মূল্যবান উপাদান ব'লে পরিগণিত হ'তে পারবে তদ্বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়।

ভ্রম সংশোধন

গত আশ্বিন মাসে প্রকাশিত "অন্তরাল" নামক গল্পটির লেখকের নাম ভুলক্রমে "আলোক রায়" মুদ্রিত হয়েছে। তৎপরিবর্ত্তে "অলোক রায়" হবে। এই ভ্রম-প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

ইণ্ডিয়ান টি সেস কমিটি

চা ভারতবর্ষের একটি মূল্যবান পণ্য বস্তু এবং পানীয় হিসাবে নির্দ্দোষ সুলভ এবং তৃপ্তিপ্রদ—নানাবিধ প্রচার পদ্ধতির দ্বারা ইণ্ডিয়ান টি সেস কমিটি জনসাধারণের মনে এই কথাটি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতবর্ষের চা সর্ব্বোত্তম এবং প্রচুরভাবে উৎপন্নও হয় ভারতবর্ষে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এমন ব্যাপকভাবে চা ব্যবহৃত হয় যে, চা-এর দ্বারা রপ্তানির ব্যবসা করে দরিদ্র ভারতবর্ষের আংশিক দারিদ্র্য মোচনের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। সুতরাং এই প্রচার কার্য্যের দ্বারা টি সেস কমিটি যে দেশের মঙ্গল বিধান করছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইণ্ডিয়ান টি সেস্ কমিটির প্রচার কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হয়েছেন কলিকাতার সুবিখ্যাত বিজ্ঞাপন-পরিচালক মেসার্স ডি জে কীমার এণ্ড কোং লিঃ। আমরা সর্ব্বদাই তাঁদের নিকট হ'তে চা সংক্রান্ত অত্যন্ত কৌতূহল এবং শিক্ষাপ্রদ মুদ্রিত লিপি এবং পুস্তিকা লাভ করছি। সাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে ট্যানিক অ্যাসিডের বর্ত্তমানতা হেতু চা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তু। কিন্তু এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তা তাঁদের মুদ্রিত লিপি হ'তে সঙ্কলিত নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হতে সপ্রমাণ হবে।

'Chemically, tea tannin is very different from *acidum tannicum.* The popular idea of the stomach lining being tanned by tea is one to be dismissed as foolish. (The Chemistry and Pharmacology of a Cup of Tea by Carpenter and Harler.)

'The pleasant astringency of a good apple depends on the tannin it contains . . . . Most green vegetables also contain tannin, hence they turn brown in crushing, just as tea leaves do . . . . There is no trace of tannic acid in tea. Tea tannin is not an acid at all. (M. H. R. Cooper, Chief Scientific Officer, Tocklai Experimental Station.)

No doctor has ever suggested that apples or green vegetables are harmful to health, and yet diatribes against tea on the ground of its tannin-content are so ridiculously cammon.

বিশেষজ্ঞের উল্লিখিত মন্তব্যটী সাধরণের পক্ষে বিশেষ ভাবে জ্ঞাতব্য ব'লে আমরা মনে করি।

শারদীয় পূজা উপলক্ষে বন্ধ

শারদীয় পূজা উপলক্ষে বিচিত্রা কার্য্যালয় আগামী ১লা কার্ত্তিক হইতে ১৫ই কার্ত্তিক বন্ধ থাকবে। এই পনের দিনের মধ্যে পত্র-ব্যবহারাদি অফিসের সাধারণ কার্য্য সম্পন্ন হবে না।

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Bishnupada Chakravarti at the Sahitya-Bhaban Press, 21, Holwel Lane, Calcutta and Published by Saratchandra Mukherjee from 27-1 Fariapooker St. Calcutta.

বিচিত্রা
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

পল্লীশ্রী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সাহা

বিচিত্রা

দশম বর্ষ, ১ম খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ | ৫ম সংখ্যা

শরৎচন্দ্রের প্রতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র

তুমি জীবরে নির্দ্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছ। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্য তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণসভা।

বয়স বাড়েআয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতি সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয়নি। তোমার সাহিত্যরসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, কৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশনপাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

সাহিত্যের দাযারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্ম্মম। তারা কাল যা পেয়েছে তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের ঠায় কিছু কম পড়লেই ভ্রকুটি করতে কুন্ঠিত হয় না। পূর্ব্বে যা ভোগ করেছে তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেদোম কেটে নেয় আজ যেটুকু কম পড়েছে তার হিসেব করে। তারা লোভী, তাই ভুলে যায় রসতৃপ্তির মাণ-ভরা পেট দিয়ে নয় আনন্দিত রসনা দিয়ে, নতুন মাল বোঝাই দিয়ে নয়, সুখস্বাদের চিরন্তনত্ব দিয়ে তারা মানতে চায় না রসের ভোজে স্বল্প যা তাও বেশী, এক যা তাও অনেক।

এটা জানা কথা,, পাঠকদের চোখের সামনে সর্ব্বদা নিজেকে জানান্ না দিলে পুরোনো ফোটো-গ্রাফের মত জানার রেখা হদ হয়ে মিলিয়ে আসে। অবকাশের ছেদটা একটু লম্বা হলেই লোকে সন্দেহ করে যেটা পেয়েছিল টাই ফাঁকি, যেটা পায়নি সেটাই খাঁটি সত্য। একবার আলো জ্বলেছিল তার পরে তেল ফুরিয়েছে অত লেখকের পক্ষে এইটেই সব চেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি। কেননা আলো জ্বলাটাকে মানুষ অশ্রদ্ধা করথাকে তেল ফুরোনোর নালিশ নিয়ে।

তাই বলি, মানুষের বয়স যখন পেরিয়ে গেছে তখনো যারা তার অভিনন্দন করে তারা কেবল অতীতের প্রাপ্তিস্বীকার না, তারা অনাগতের পরেও প্রত্যাশা জানায়। তারা শরতের আউষ ধান ঘরে বোঝাই করেও সেই সহেমন্তের আমনধানের পরেও আগাম দাবী রাখে। খুসি হয়ে বলে, মানুষটা এক-ফস্‌লা নয়।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালোই, না থাকলেই ভাবনার কারণ, এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভুলে যায়। ভালো লাগতে স্বভাবতই ভালো লাগেনা এমন লোককে সৃষ্টিকর্ত্তা যে সৃজন করেছেন। সেলাম করে তাদেরও তো মেনে নিতে হবে—তাদের সংখ্যাও তো কম নয়। তাদের কাজও আছে নিশ্চয়ই। কোনো রচনার উপরে তাদের খর কটাক্ষ যদি না পড়ে তবে সেটাকে ভাগ্যের অনাদর বলেই ধরে নিতে হবে। নিন্দার কুগ্রহ যাকে পাশ কাটিয়ে যায়, জানব তার প্রশংসার দাম বেশি নয়। আমাদের দেশে যমের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বাপ মা ছেলের নাম রাখে এককড়ি দুকড়ি। সাহিত্যেও এককড়ি দুকড়ি যারা তারা নিরাপদ। যে লেখায় প্রাণ আছে প্রতিপক্ষ তার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে, তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীতপন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্ত্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরাণ আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুসি হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্য অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বত-উচ্ছ্বসিত। শুধু কথাসাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে, চিন্তাশক্তির তর্ক নয় কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্য্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করুন,—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে গুণে ভালোয় মন্দয়,—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।

২৫ আশ্বিন
১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

ভাবি, কি অশুভক্ষণেই না এবার বাড়ী থেকে রওনা হয়েছিলাম। প্রথমবার যখন আসি, মা পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকিয়ে দিন ক্ষণ দেখিয়ে, আমাকে যাত্রা করিয়েছিলেন। তারপর মাঝে যেবার গেলাম, দুদিন ছিলাম মাত্র। রওনা হবার সময়, দিন ক্ষণ কিছুই ত দেখা হয়নি, শুধু সবাইকে প্রণাম করে যাত্রা করেছিলাম। তবুও ত শুনেছিলাম দিন ভাল, যাত্রায় বাধা নাই। তবে সব এমন হ'ল কেন?

বোঠানের চিঠি পাওয়ার পর দু এক দিন প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠেছিলাম। নেহাত কলেজ যাই আর আসি এবং বাকী সময়টা বেশীর ভাগ চুপ করে নিজের ঘরে শুয়ে থাকি। একথা ওকথা সেকথায় সাবিত্রীর সঙ্গে আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি একটা একটা করে প্রাণের মধ্যে আলোচনা করে দেখি, আর বুকের মধ্যে অস্থিরতায় আকুল হয়ে উঠি। সেই সাবিত্রী—সেই অভিমানিনী, গরবিণী, নিঃসহায়া সাবিত্রী, সে তার জীবনের এতবড় দুর্ঘটনা সইবে কেমন করে? বুকখানা যে তার ভেঙ্গে যাবে—ঐ ত অতটুকু তার বুকখানা—চিরদিনের জন্য চিরকালের জন্য।

মনকে বোঝাই, তা আমি কি করব! আমি ত বিবাহে অমত করিনি। সবই অদৃষ্টের পরিহাস; নইলে সাবিত্রী-মারইবা অমন ভীষণ অসুখ করবে কেন? মন হয়ত ব একটু শান্তও হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় সাবিত্রী অপরের অঙ্কশায়িনী, অমনি বুকের মধ্যে যেন শত বৃশ্চিকের দংশনে জ্বলে ওঠে। সেই মধুর ডাক—"শান্তদা"। আর কখনও তেমন করে কি ডাকবে? ও ডাক হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য আমার জীবনে।

একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিন গেল। মাঝে মাঝে ভাবি ললিতকে সব বলি। কাহুকে সব খুলে বলতে পারলে যেন প্রাণে একটু শান্তি পেতাম। কিন্তু ললিতের কেমনই একটা ধরণ, এ সব কথা বলে তার কাছ থেকে কোনও সহানুভূতি পাওয়া ত দূরের কথা, কোনও সাড়া পর্য্যন্ত পাওয়া যায়না তার কাছ থেকে। মেয়েদের কথা, প্রেমের কথা তার কাছে বললে সে কেমন যেন হাঃ হাঃ করে একটা ফাঁকা হাসি হাসে—সবই কেমন যেন হাল্কা করে উড়িয়ে দেয়।

যাই হোক, সুখের বিষয় কি দুঃখের বিষয় জানিনা মণি-বোঠানের চিঠি পাওয়ার পরে প্রথমটা যেমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, তেমনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই মন আবার স্বাভাবিক হয়ে সবল হয়ে উঠল। এবং বেশ মনে আছে, ৫।৭ দিন পরেই কলকাতার দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে আনন্দ কুড়িয়ে নেওয়ার শক্তি প্রায় ষোল আনাই ফিরিয়ে পেলাম। এবং সাবিত্রী সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্নের মত প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে বিশেষ কিছুই কষ্ট করতে হল না। মনে মনে ভেবেছিলাম—এটা কলকাতার গুণ, দেশে থাকলে এ ধাক্কা সামলাতেই পারতাম না বোধ হয়।

কলকাতার যে গুণ সে বিষয় সন্দেহ মাত্র নাই। সাত রংয়ের খেলা কলকাতার উপরে চোখ চাইলেই দেখা যায়। কখন যে চোখ কোন রংয়ে ধরা দেয়, সে ত মুহূর্ত্ত আগেও বলা যায়না। মন কি কোথাও দাঁড়ায় স্থির হয়ে এক দণ্ডের তরে!

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল। এবং কিছুদিন পরে মন যেন অতিরিক্ত হাল্‌কা হয়ে উঠ্‌ল। কোনও বোঝা নেই কোনও ভার নেই। পিছনে যেন আমার কিছুই নেই সবই সামনে, সবই ভবিষ্যতে। ভবিষ্যতের যবনিকা কেউ যদি তোলে, অন্ততঃ একমুহূর্ত্তের জন্য—না জানি কি না অপরূপ ছবি সব দেখ্‌তে পাব। চলেছি সোজা, সোজা পথে, ডাইনে ফিরি বা বাঁয়ে ফিরি মোড় ফিরলেই নতুন পথ। নতুন পথের নতুন মায়া। সেত আমারই সামনে। আমিত চলেছি সমুখ পানেই।

মণ্টি বোঠানের ২য় চিঠি পাওয়ার ১৪।১৫ দিন পরেই সুলোচনা দিদি এলাহাবাদ রওণা হয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় আমাকে বিশেষ করে বলে গেলেন পূজোর ছুটীতে আমি যেন অবশ্য অবশ্য এলাহাবাদ একবার বেড়াতে যাই। কথা দিলাম "যাবো"। মনে মনে ঠিক করেছিলাম যাবো,—নিশ্চয়ই যাবো। যেমন করে হোক বাবার মত করাতেই হবে। সমস্ত ছুটীটা গ্রামে আমি বসে থাকৃতে পারব না। সেই এক ঘেয়ে পুরোণো আর ভাল লাগেনা ভাবতে। হাওড়া ষ্টেশন থেকে টিকিট করে, ৫০০ মাইল দূরে এলাহাবাদ। নতুন দেশ, নতুন আবহাওয়া। এ সুযোগ আমি কখনও ছাড়ব না।—

* * * *

প্রায় মাস খানেক কেটে গেছে। পূজোর ছুটী হতে আর মাত্র ১০।১৫ দিন বাকী। দিন ৩৪ হল বাবার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। বাবা লিখেছেন "গত পরশ্ব শেষরাত্রে শ্রীমতী সাবিত্রীর মাতা ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।" চিঠিখানা পেয়ে প্রাণের মধ্যে কেমন যেন একটা বেদনা টনটনিয়ে উঠ্‌ল; এবং সমস্ত দিনটাই বিশেষ অবসন্ন কাতর হয়ে রইল প্রাণখানা—একটু নড়লে চড়লেই যেন ব্যথা পায়।

৩।৪ দিন কেটে গেল। বাবার চিঠির উত্তর এখনও দেওয়া হয়নি। রোজই ভাবি লিখ্‌ব—কিন্তু হয়ে ওঠেনা। এমন সময় একদিন কলেজ থেকে মেসে ফিরে একখানা টেলিগ্রাফ্‌ পেলাম। বাবা পাঠিয়েছেন। লিখেছেন "Come home immediately" অর্থাৎ এখুনই বাড়ী চলে এস। টেলিগ্রাফ্‌খানা পেয়ে বুকটা কেমন যেন কেঁপে উঠ্‌ল। হঠাৎ এরকম টেলিগ্রাফ্‌ এল কেন? বাড়ীতে কারো কি বিশেষ অসুখ বিসুখ করল? কিন্তু এই ৪ দিন আগেও ত বাবার চিঠি পেয়েছি। তিনি ত লিখেছেন—সকলে বেশ ভাল আছে। তবে!—কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। ছুটীর আর মাত্র ৮।১০ দিন বাকী ৮।১০ দিন পরেই ত বাড়ী রওণা হতাম। এ কদিন আগে আমাকে এরকম ভাবে হঠাৎ ডেকে পাঠানর মানে কি। কি হতে পারে, নানান দিক দিয়ে আকাশ পাতাল মনের মধ্যে আলোচনা করতে করতে কেমন যেন মনে হল তবে কি সাবিত্রীর বিয়ে শেষ পর্য্যন্ত হয়নি। বিয়ে ঠিক হয়ে শেষ পর্য্যন্ত কি ভেঙ্গে গিয়েছিল। "বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হল"—এ খবরটা ত বাবার চিঠিতে ঠিক পাইনি বোধহয়। কিন্তু তা যদি হত, মণ্টীবোঠান কি সে খবরটা আমাকে দিতেন না। মণ্টীবোঠানের শেষ চিঠির উত্তর অবশ্য আমি আর দি নাই। উত্তর দেওয়ার ছিলও ত না কিছু। তবুও, সে রকম একটা কিছু হলে—বোঠান নিশ্চয়ই জানাতেন। আর যদি তা হয়েও থাকে, তা হলেইবা কি। তা হলেই বা বাবা আমাকে ডেকে পাঠাবেন কেন? বিশেষতঃ ছুটীর আর যখন ৮।১০ দিন মাত্র বাকী।

ভেবে কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনে মনে কতকটা ঠিক করে নিলাম—বোধহয় মার কোনও একটা ব্রত উপলক্ষ্যে একটা কিছু খাওয়ান দাওয়ানর শুভদিন হঠাৎ এসে গেছে; বাবা ত জানেন আমার ছুটির আর মাত্র ৮।১০ দিন বাকী, তাই আমাকে কিছু আগে যেতেই তার করেছেন।

এইরকম একটা ঠিক করে নেওয়াতে মনটা অনেকটা শান্ত হল। সেই দিনই রাত্রের ট্রেনে রওনা হওয়ার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম। এবং রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শিয়ালদহ ষ্টেশনে এসে যখন ট্রেনে উঠে বসলাম তখন মনের উদ্বেগ

ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে। বেশ হালকা হয়ে উঠ্‌ল প্রাণখানা।

গাড়ী ছাড়ল। মাঠ ঘাট বন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হু হু করে ছুটে চল্‌ল আমার বাড়ীর দিকে।

ট্রেনে অত্যন্ত ভীড় ছিল। ঘুমুবার জায়গা পেলাম না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। সাবিত্রী আর নাই বোধহয় গ্রামে, তার সঙ্গে আর দেখা হবেনা—এই কথাটাই বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে বড় করে প্রাণে বাজতে লাগ্‌ল, এবং একটা উদাস ভাবে প্রাণখানা ভরে গেল। তবুও বাড়ী যাচ্ছি—সেই মাধবপুর, সেই আমাদের বাড়ী, সেই মা, সেই মণ্টীবোঠান—প্রাণখানা যেন ট্রেনের আগে ছুটে যেতে চায়,—এত তার আবেগ।

সত্যি করে প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা পেলাম, যখন আমার গরুর গাড়ীখানা জেলা বোর্ডের রাস্তার উপর দিয়ে শরৎকালের উজ্জ্বল সকাল বেলায় মাধবপুর গ্রামের মধ্যে ঢুকল, যখন দেখতে পেলাম সেই জঙ্গলের মধ্যে সেই কাঁটাল গাছ তলা, সেই বেতবন,—যেখানে সাবিত্রীকে শেষ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখেছিলাম। সেই দিকে চেয়ে মনে হল সেখানটার জঙ্গল যেন আরও বেশী হয়েছে—আজ সাবিত্রী দাঁড়িয়ে থাকলেও যেন তাকে দেখা যেতনা।

ক্রমে গাড়ী ঘুরে এসে নদীর পার দিয়ে আমাদের বাড়ীর রাস্তায় মোড় নিল। সামনেই আমাদের বাড়ীর সদর দেখা যাচ্ছে—সেই জামগাছ তলা যেখানে মা, মণ্টীবোঠান দাঁড়িয়েছিলেন আমার প্রথম যাত্রার দিন। আকুল আগ্রহে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখলাম—বাড়ীর বাইরে কোনও লোকজন দেখতে পেলাম না।

বাড়ীর পুকুরঘাটের পার দিয়ে গাড়ী যখন প্রায় সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, দেখ্‌তে পেলাম আলীমিঞা বার বাড়ীর ভেতর থেকে বাইরের উঠানে এসে দাঁড়ালেন। গাড়ী যখন একেবারে দাঁড়িয়ে গেল আমি একলাফে গাড়ী থেকে নেমে আলীমিঞার কাছে এগিয়ে গেলাম।

বুকের মধ্যে তখন যেন আমার কেমন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। সবই কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হ'তে লাগ্‌ল।—আমি এলাম, অনেক দূর থেকে বাড়ীর সবাই নিশ্চয়ই আমার গাড়ী দেখ্‌তে পেয়েছে কিন্তু একটা লোক কেউই এগিয়ে আস্‌ছে না বাইরের উঠানের দিকে। দাদাবই বা হ'ল কি? তিনি ত সকলের আগে গিয়ে এগিয়ে নদীর ধারে দাঁড়াতেন। মেয়েরাও ত খিড়কী দিয়ে খানিক এগিয়ে আস্‌তে পারত—পুকুর পারের দিকে। আলীমিঞা'কে জিজ্ঞাসা করলাম, "আলীমিঞা! বাড়ীর খবর ভাল ত? সবাই কোথায়?"

আলীমিঞা একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটু উত্তেজিত স্বরেই বোধহয় জিজ্ঞাসা করলাম "চুপ করে আছেন কেন? কি হয়েছে শীঘ্র বলুন। সবাই ভাল আছেন ত?"

আলীমিঞা কোনও কথা না বলে আমার হাত ধরে নিয়ে বার বাড়ীর বারান্দায় উঠ্‌লেন। একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লেন "বসুন দাদাবাবু।"

আমি বল্‌লাম "আমি বস্‌ব না। বাড়ীর ভেতর যাই। বলুন না সবাই ভাল আছেন ত?"

শান্তস্বরে আলীমিঞা বললেন "না"।

কিছু যে একটা নিদারুণ অশুভ ঘটেছে আমার বুঝতে বাকী ছিল না। চোখে অন্ধকার দেখলাম। চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম "কি হয়েছে বলুন, বলুন। বাবা কোথায়?" আলীমিঞা ঠিক সেই রকম শান্ত স্বরেই বললেন "শ্মশানে। আমাকে বসিয়ে রেখে গেছেন। আপনি এলেই আপনাকে শ্মশানে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন।"

শুধু একবার স্তম্ভিতের মত জিজ্ঞাসা করলাম "কে? —কে?—"

আলীমিঞা আস্তে বললেন, "বৌমা! আজ ভোরবেলায় মারা গেছেন।"

মণ্টী বোঠান! আমার চোখের সাম্‌নে পৃথিবী ঘুরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে মার চীৎকার কান্না শোনা গেল।

* * * *

আমাদের গ্রামের শ্মশানটী ছিল মুকুন্দদের বাড়ী ছাড়িয়ে নদীর ধার দিয়ে আরও খানিকটা পশ্চিমে গিয়ে। যখন শ্মশানে গিয়ে হাজির হলাম—চিতা সাজান হয়েছে। সমস্ত গা ঢেকে দিয়েছে কাঠে, কেবল মুখখানি দেখা যাচ্ছে।

কপাল ভরে মাখিয়ে দিয়েছে সিঁদুর, তার উপর শরৎকালের সকাল বেলার সোণার রোদটুকু এসে পড়েছে—চক্ চক্ করছে। অর্দ্ধ নিমীলিত আঁখি—আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম,—মনে হল যেন ঠোঁটে চাপা রয়েছে সেই দুষ্টু হাসি, যা মণ্টী বোঠানেরই নিজস্ব।

দাদা কিছু দূরে মাটীতে বসে আছেন হাঁটু ভেঙ্গে। হাঁটুর উপর হাত দুটী রেখে তার উপর উপুড় হয়ে এলিয়ে দিয়েছেন মাথা।

আমায় দেখে আর কেউ কোনও কথা কইলেন না, কেবল মুকুন্দর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন "এই যে সুশান্ত! নেবেই সোজা আস্‌ছ বুঝি?"

কিছু জবাব দিয়েছিলাম কি না মনে নাই কিন্তু দাদার দিকে চেয়ে দেখলাম সেই অবস্থাতেই তাঁর পিঠটা হঠাৎ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল একটা চাপা কান্নায়—বোধহয় আমার নাম শুনে।

মুকুন্দ উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। বল্‌লে "একটা দিন আগে যদি আস্‌তে শান্তদা!"

কোনও রকমে ঢোক গিলে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম "কি হয়েছিল?"

মুকুন্দ বল্‌লে "হঠাৎ। তিনদিনের জ্বরে মাথায় রক্ত উঠে গেল। কি নাকি ভয়ানক খারাপ জাতীয় ম্যালেরিয়া!"

চোখ ফিরিয়ে দূরের দিকে চাইলাম। চোখে পড়ল মুকুন্দদের বাড়ীর বাঁধা ঘাট—যেখানে একদিন এমনি সকাল বেলায় বজরা বাঁধা ছিল

* * * *

শ্মশান থেকে ফিরে আসতে আসতে প্রায় বেলা দুটো বাজল। এসে বাড়ীর ভেতরে না গিয়ে বাইরের কর্ম্মচারীদের সেরেস্তার একপাশে শুয়ে পড়লাম। এবং শুতে শুতেই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য্যদেব প্রায় পশ্চিম গগনে অস্ত গিয়েছেন। অপরাহ্নের একটা বিষাদ মাখা ছায়া আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গনে, পুকুর ঘাটে, বাগানে, চারিদিকেই লুটিয়ে পড়েছে। ঘুম ভাঙ্গার পর ঘরের ভেতর থেকে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম—বাইরের পানে, অপরাহ্নের সেই ছায়াটীর প্রতি। চারিদিক চুপচাপ নিস্তব্ধ। চেয়ে রইলাম—কিন্তু মন যেন তখনও ছিল ঘুমন্ত। যেন স্বপ্নেই অনুভব করলাম—

সাবিত্রী এল, চলে গেল! মণ্টীবোঠান এল, জন্মের মত ছেড়ে গেল! জীবন আবার নতুন করে হবে সুরু—তাই এখন আমার চারিদিকে সবই চুপচাপ নিস্তব্ধ...!

(প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

CENTRAL LIBRARY

মাইকেল ফ্যারাডে

শ্রীনীলরতন কর

বিশ্রুতনামা ফ্যারাডের কীর্ত্তির হেতু

উত্তুঙ্গ পর্বতের শিখরদেশ হ'তে তার চতুঃপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতর গিরিশৃঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষীভূত হয় যে তারা পৃথক পৃথক সমষ্টিতে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রত্যেক সংহতি এক একটি প্রধান সমুন্নত পার্বত্যভূমি আশ্রয় ক'রে বিরাজিত। ফ্যারাডের জীবন ও গবেষণাকার্যের সহিত তাঁর অনুবর্ত্তীগণের তুলনায় এই উপমা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গতানুগতিক জীবনের অপেক্ষা মহত্তর প্রয়াস যে ক্ষমতা দ্বারা ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হয়, অনেক সময়ে সেটি অপরগুলিকেও তারই সন্নিকটবর্ত্তী পর্য্যায়ে উত্তোলিত করে। ফ্যারাডের জীবনকে কেন্দ্র ক'রে বহু বৈজ্ঞানিক-মহামণ্ডল গ'ড়ে উঠেছে, তাঁর গবেষণাকার্য আশ্রয় ক'রে বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানে নব নব শাখা উদ্ভূত হয়েছে। এখনও তাঁর আবিষ্কারের ফলপ্রসূ ঐশ্বর্যের মধ্যে নূতনতর কোরক মঞ্জরিত হচ্ছে। তাই বৈজ্ঞানিক চূড়ামণিরূপে তাঁর নাম পৃথিবীর সর্বদেশে সুবিদিত।

বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার মহনীয় প্রাসাদ যে প্রধান বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তি ক'রে রচিত, সেটি তাঁরই মানসগোচর হয়েছিল আজি হ'তে শতাধিক বৎসর পূর্বে। সেই আবিষ্কার দিবসের স্মৃতি উপলক্ষ্য ক'রে পৃথিবীর প্রায় প্রতি দেশের বৈজ্ঞানিক সমিতি সমূহে সেদিন (খৃঃ১৯৩১) ফ্যারাডে শতবার্ষিকী মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয়েছে। এই বিজ্ঞানদ্রষ্টাপুরুষ, আদর্শমানুষের উদ্দেশে বিশ্ববাসী চিরকাল অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবে।

প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু এবং আবিষ্কারকের জীবন কোন না কোন কারণে মহৎ, কারণ তাঁর দান জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে। কিন্তু যাঁরা পূর্বকার প্রতিষ্ঠিত মূলসূত্রকে ভিত্তি ক'রে অগ্রসর হন তাঁদের অপেক্ষা নূতনপন্থা বা মূলসূত্রের প্রবর্ত্তক যাঁরা, তাঁদেরকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়। দীর্ঘকাল সত্য ব'লে অনুমিত কোন থিওরী বা সিদ্ধান্তকে যে ব্যক্তি বহুবর্ষব্যাপী অধ্যবসায় সহকারে অনুসন্ধান কার্য ফলে প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যাঁর সিদ্ধান্ত পরিণামে জগতের সমগ্র শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বংশপরম্পরাকালব্যাপী পরিবর্ত্তন সংঘটনে সমর্থ হয় তিনি বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠ ও অগ্রনায়ক নামে অভিহিত হবার যোগ্য। মাইকেল্ ফ্যারাডেকে এই পর্য্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তিনি ছিলেন নূতন পন্থা প্রদর্শনের অগ্রদূত, নূতন পথের নির্মাতা ও স্রষ্টা।

তিনি যদি না থাকতেন অথবা তিনি যদি অকৃতকার্য হতেন তা' হলে হয়ত অপর কেউ যথাসময়ে তাঁরই মত' চিন্তাপারম্পর্য অনুসরণে একই প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটাতে সমর্থ হতেন। আবিষ্কার বিষয়ে অনুরূপ সাক্ষ্য যে দুর্লভ তা' নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নেপ্‌চুন্ গ্রহ আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নেপ্‌চুন্ আবিষ্কৃত হবার পূর্বে ১৮৪৬ অব্দে কেম্ব্রিজের আডাম্ এবং প্যারীর ল ভেরিয়ে উভয়েই নিরপেক্ষভাবে গণনা ক'রে গ্রহটীর অস্তিত্ব ও স্থান নিরূপণে সমর্থ হন। তাঁরা না থাকলেও হয়ত নেপ্‌চুনের আবিষ্কার হত। কিন্তু এ ব'লে তাঁদের প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করা যায় না। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে এটি তাঁরাই আবিষ্কার করেছিলেন। ফ্যারাডেও তেমনি বৈদ্যুৎচুম্বকতত্ত্ব বিষয়ে পরীক্ষাকালে দেখেছিলেন যে কোন তারকে চুম্বক ক্ষেত্রের নিকটে নিয়ে গেলে বা তা' হতে দূরবর্ত্তী করলে

সেই তারে ক্ষণকাল যাবৎ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এ আবিষ্কার তাঁর আকস্মিক নহে। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েই এই ফল তিনি পেয়েছিলেন। সে পরীক্ষা এক্ষণে আমরাও করতে পারি সামান্যমাত্র কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে। কিন্তু দ্রষ্টব্যের বিষয় এই যে বৈদ্যুৎ চুম্বকতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণারত আঁপেয়ার প্রমুখ বহু মনীষি এই আবিষ্কারের প্রান্তসীমায় পৌঁছেও থেমে ছিলেন। তাঁরা জানতেন যে বিদ্যুৎ চুম্বকক্ষেত্র উৎপন্ন করে। কিন্তু—বিদ্যুৎ চুম্বকক্ষেত্র উৎপন্ন করলে, চুম্বকও বিদ্যুৎক্ষেত্র উৎপন্ন করতে পারে কিনা?—এই প্রশ্ন ফ্যারাডের তীক্ষ্ণ, অচঞ্চল বিচার বুদ্ধির নিকট সমাধান প্রাপ্তির আশায় অপেক্ষা ক'রে ছিল।

যে কোন সমস্যাকে সকলদিক হ'তে পরীক্ষা ক'রে দেখার অভ্যাস তাঁর জীবনের শৈশবাবস্থা হতেই গঠিত হয়েছিল; কেবল গঠিত হয়েছিল বললেও যেন সম্পূর্ণ বলা হয় না, এটি তাঁর মধ্য হতে স্বতঃই উৎসারিত হয়ে সমগ্র জীবন ব্যাপী বিদ্যমান ছিল। তাঁর বন্ধু A de la Rive রয়াল ইনষ্টিটিউশনে ফ্যারাডের কর্মজীবন সম্পর্কে বলেছেন—"ব্যবসায়ী ব্যক্তি তার কর্মস্থলে যেরূপ নিয়মিত-ভাবে গমন করে ফ্যারাডেও তেমনিভাবে তাঁর বীক্ষণাগারে গিয়ে পূর্বরাত্রের চিন্তিত বিষয়গুলি পরীক্ষা ক'রে তার সত্যতা নিরূপন করতেন।" বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তা অথবা কার্যে অবিরত নিযুক্ত থাকা তাঁর স্বভাবগত ছিল। কোন সিদ্ধান্তকে স্থির নির্দিষ্ট ও পরিণত না করা পর্যন্ত তিনি নিরস্ত হতেন না।

লর্ড কেল্‌ভিন্ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "তাঁকে শেষ-বার রয়াল ইনষ্টিটিউশনে কাজ করতে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। বাহিরের কোলাহল হতে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য তিনি ভূতলস্থ এক ক্ষুদ্র গৃহ নির্ব্বাচন করেছিলেন। তারই ভিতর থেকে তিনি বৈদ্যুৎচুম্বক বলের গতিহার পরিমাপের চেষ্টা করেন। তাঁর সেই পরীক্ষা অবশ্য সফল হয় নাই। তার অনতিকাল পরে তিনি মাধ্যাকর্ষণের সহিত চুম্বকের সম্বন্ধ নিরূপণের চেষ্টা করেন কিন্তু তাতেও অকৃত-কার্য্য হন।"

বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি তাঁর মনে প্রতিফলিত হ'ত অন্তর্-বোধ দ্বারা; সেগুলি যেন ঠিক বিচার বুদ্ধি নিসৃত নয়। তিনি বৈদিক ঋষিদের মত সত্যদ্রষ্টা ছিলেন কিন্তু তিনি যখন সেই সত্যের সত্যতা পরীক্ষার পথে অগ্রসর হতেন তখন তার পশ্চাতে থাকত তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি। তিনি পরি-কল্পনা সমূহকে একটির পর একটি পরীক্ষা ক'রে অবান্তর ও পরীক্ষা দ্বারা অসিদ্ধ ধারণাগুলি অপসারিত করতেন।

কোন কোন চিন্তাকে এরূপভাবে ক্রিয়া করতে দেখা যায় যে তাকে কেন্দ্র ক'রে তথ্য সমূহ যেন স্বতঃই দানা বেঁধে ওঠে। ফ্যারাডের চিন্তাধারাও ঠিক সেইরূপ ছিল। ১৮৮১ অব্দের ফ্যারাডে লেক্‌চারে হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ্ বলেছিলেন যে তিনি গণিত সূত্রের কিছুমাত্র সাহায্য গ্রহণ না ক'রে সহজভাবে এরূপ সিদ্ধান্ত সমূহে উপনীত হতেন যার জন্য বহু জটিল গণিতের প্রক্রিয়া আবশ্যক হয়। কিন্তু তিনি অদ্ভুত প্রখরবুদ্ধি ও ধারণাবশে (inspiration and intuition) একটি মাত্রও গণিত সূত্রের সাহায্য না নিয়ে উচ্চ গণিতের সমস্যা সমূহ এরূপ চমৎকারভাবে মনে মনে সমাধান করতেন যে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। পূর্ব প্রচলিত বৈজ্ঞানিক রীতি হতে তাঁর পদ্ধতি ও চিন্তাধারা এরূপ ভিন্ন ছিল যে তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের নিকট সেগুলি অতিশয় অদ্ভুত প্রতীয়মান হ'ত। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল যথাসম্ভব পূর্ব-পরিকল্পনাগত ধারণাকে ব্যক্ত না ক'রে নূতন ধারণা সমূহ কেবল তথ্য দ্বারা প্রকাশ করা। সাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পথে এই উন্নতসোপান যুক্তি-তর্কমূলক দর্শনশাস্ত্রের রাজ্য হতে বিজ্ঞানকে মুক্ত করেছে। অবশ্য কেবল ফ্যারাডেই যে এইভাবে কার্য্য করেছিলেন এমন নয়, কিন্তু তাঁর সময়ে বোধ হয় আর কেউ এটি এত পরিপূর্ণ ভাবে করেন নাই। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হ'য়েছিল যে lines of farce এর অস্তিত্বে এত দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর কি ক'রে হ'ল, তাতে তিনি বলেছিলেন, "I can see the lines with my eyes shut." এতে তাঁকে সত্য দ্রষ্টা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

একস্থানে ফ্যারাডে স্পষ্টই বলেছেন যে গণিতশাস্ত্র তাঁর খুব প্রিয় ছিল না। বৈজ্ঞানিক ধারণার সহজতর প্রকাশরীতি

সম্বন্ধে ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েল্‌কে তিনি ১৮৫৭ অব্দে লিখেছিলেন—"কোনও গণিতবিদ্‌ জড়জগতের ক্রিয়াবলী ও তার ফল বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত থেকে যে সকল মন্তব্যে উপনীত হন তাকে কি গণিতসূত্র ব্যতিরেকে তদনুরূপ সম্যক স্পষ্ট ও সম্পূর্ণরূপে সাধারণভাবে প্রকাশ করা যায় না? যদি তা' সম্ভব হয় তবে তাদের সাঙ্কেতিকরূপ পরিবর্তিত ক'রে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ পূর্বক পরীক্ষাযোগ্য ক'রে তোলা যুক্তিযুক্ত নয় কি?"

পরীক্ষাময় কার্যের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরক্তি ছিল। গণিতবিদ্‌ কাগজের উপর নানারূপ প্রতীক ও সঙ্কেতচিহ্ন দিয়ে থিওরী ব্যাখ্যার প্রয়াসে যে আনন্দ উপভোগ করেন, বিদ্যুৎ ও চুম্বক বিজ্ঞানে অজ্ঞাতপূর্ব তত্ত্ব পরীক্ষায় চুম্বক কাঁটার স্পন্দন ও বিদ্যুতের আচরণ লক্ষ্য ক'রে ফ্যারাডের চিত্ত সেই আনন্দরসে নিমগ্ন হত।

চুম্বক ও বিদ্যুতের মধ্যে সম্বন্ধ দেখিয়ে এবং চুম্বক হতে বিদ্যুৎ পাবার উপায় উদ্ভাবন ক'রে আধুনিক জগতকে তিনি সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও প্রভাবান্বিত করেছেন সন্দেহ নেই কিন্তু রসায়ন বিজ্ঞানেও তাঁর প্রবর্তিত চিন্তাধারা কম প্রণিধানযোগ্য নয়।

তিনি ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ক্লোরাইড অফ্‌ কার্বন আবিষ্কার ক'রে এইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যে বৎসর তাঁর প্রথম গবেষণাপূর্ণ নিবন্ধ Chemical Manipulation প্রকাশিত হয় সেই বৎসরে তিনি রয়্যাল ইনষ্টিটিউসনে পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর প্রথম বার্ষিক বক্তৃতা দেন। বীক্ষণ যন্ত্রের কাচ অনবদ্য করবার উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ বহুসংখ্যক পরীক্ষা ক'রেছিলেন। রয়্যাল ইনষ্টিটিউসনে 'বাকেরিয়ান্‌ লেক্‌চার' প্রদান কালে ১৮২৯ অব্দে তিনি "The manufacture of glass for Optical purposes" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অক্সিজেনের উপর চুম্বকের প্রভাব এবং গ্যাস ও অগ্নিশিখার সহিত সম্বন্ধ আবিষ্কার ক'রে তিনি পরবর্তীকালে রসায়ন শাস্ত্র ও চুম্বকতত্ত্বের মধ্যে সংযোগসূত্র স্থাপন করেছেন। তিনি বহু প্রকার গ্যাসকে তরলীভূত করতে সমর্থ হন; বহুপ্রকার ধাতুর মিশ্রণ দ্বারা ইস্পাত প্রস্তুত বিষয়ে পরীক্ষামূলক কার্য করেন। এতদ্ব্যতীত অবিরত পরীক্ষা ও চিন্তার ফলে বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের ধর্ম বিষয়ে যে চরম সিদ্ধান্ত সমূহে তিনি উপনীত হয়েছিলেন প্রধানত সেই জন্যই তাঁর নাম সুপরিচিত। জনৈক জীবনী লেখক কোন স্থানে বলেছেন যে "যখন উপযুক্ত খেলোয়াড় আসেন এবং ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত তাসগুলি যথাযথ ভাবে ফেলা হয় তখনই মহৎ কৃতকার্যতা লাভ করা যায়।" মাইকেল ফ্যারাডের জীবনে এই নিয়মের সুপ্রকট ব্যতিক্রম ঘটেছিল। ভাগ্যকে তিনি নিজের কাছে যেতে বাধ্য করিয়েছিলেন।

সে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য ফ্যারাডের নাম জনসাধারণে সুপরিজ্ঞাত সেটি তাঁর জীবনের একটি বিশেষ দিক বা অংশ মাত্র। তাঁর বিষয়ে জানতে আগ্রহবান প্রত্যেকেই একথা সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে তিনি যা করেছিলেন সে জন্য তাঁকে যতটা মর্যাদা দেওয়া হয় তদপেক্ষা তিনি যা ছিলেন সেই জন্য অনেক বেশী শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। ফ্যারাডের এক সহকর্মী লিখেছেন যে "তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে তাঁর মহত্ত্বের অর্ধেকও সন্নিবিষ্ট নেই কারণ বিজ্ঞান তাঁর হৃদয়ের মাধুর্য ও সাহসিকতা প্রকাশ করতে পারেনা।" তিনি কেবল বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, দ্রষ্টা, ঋষি ও আদর্শ মানুষ।

শ্রীনীলরতন কর

সুতপা

শ্রীঅবনীনাথ রায়

সুতপার সঙ্গে যখন ললিতের বিয়ে হয় তখন কোর্টশিপ ক'রে হয় নি। সুতপার বাবা এবং ললিতের বাবা দু'জনেই পুরাতনপন্থী—বিয়েব আগে ভাবী বর ক'নের দেখা সাক্ষাৎ হয় এ কথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারতেন না। তাঁদের কালে বিয়ে থা'র সময় নিজেরা কোন দিন ক'নে দেখেন নি। অতএব এ কালে যদি কোন ছেলের মনে সে রকম ইচ্ছা হয় তবে সেটাকে তাঁরা বেহায়াপনা বলে গণ্য করতেন। সুতরাং এই সব ক্ষেত্রে যেমন করে বিয়ে হয় ললিত সুতপার বিয়েও তেমনি ক'রে হ'ল অর্থাৎ এমন একজন মধ্যস্থ হ'য়ে কথাটা তুললেন যিনি ললিতের পিসে মশায় এবং সুতপার ছোট মামা। আত্মীয়ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব থাকবার কথা নয়। সুরনাথ ললিতের বাবার কাছে গিয়ে বললেন, মুখুজ্যে মশায়, আপনার বড় ছেলের বিয়ে যদি দেন ত এই সুসময়। আমার একটি ভাগ্নি আছে, তার সঙ্গে দিন, সুশ্রী মেয়ে, এই ন বছরে পা দিয়েছে, জানা শোনা ঘর—আত্মীয় স্বজনের মধ্যে একটি প্রীতির বন্ধন গ'ড়ে উঠবে।

কথাটা তুলে সুরনাথ চুপ করে থাকবার লোক নয়। অপর পক্ষে ললিতের বাবা ছিলেন কুঁড়ে প্রকৃতির—মেয়ে দেখতে যাওয়ার ঝঞ্ঝাট তিনি পোয়াতে রাজী ছিলেন না। সুতরাং সাধারণত যা হয়ে থাকে তাই হ'ল অর্থাৎ ললিতের বাবা সুরনাথের কথার উপর নির্ভর ক'রে নিজের ছেলের বিয়ে সুরনাথের ভাগ্নির সঙ্গে দিতে রাজী হলেন।

ললিত সাধারণ থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছেলে। পুরাতন এবং নতুনের সন্ধিস্থলে তার জন্ম। সে সবে তখন ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। বিয়ে করবার তার আদৌ ইচ্ছে নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ পড়ে তার মন কখনো গভীর অরণ্যানীর মধ্যে পর্য্যটনরত সন্তানদের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্চে, কখনো স্বামী বিবেকানন্দের 'হে ভারত, ভুলিও না তোমার উপাস্য সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর' প্রভৃতি বাণী আকাশে বাতাসে শুনতে পাচ্চে, কখনো রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র অপূর্ব্ব কাব্যগুঞ্জনে তার মন মুগ্ধ, আবার Cowper এর The boy stood on the burning deck ও সে পড়েছে। ইতিমধ্যে কখন কোন আর্ট স্কুলে গিয়ে সে ওরিয়েণ্টাল রীতিতে ছবি আঁকাও শিখে এসেচে। মোট কথা তার মনের উপর ললিত কলার এবং আদর্শবাদের ছাপ সুস্পষ্ট।

তাই বাবা যখন ললিতকে ডেকে বল্লেন যে সামনের অঘ্রাণ মাসেই তার বিয়ে সুতপার সঙ্গে ঠিক করেচেন তখন প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিবাদ করার ভাষা তার মুখ দিয়ে বেরুলো না। বাল্যকালে যাত্রা দেখেছিল পরশুরাম বাপের কথায় মাতৃহত্যা করেছিলেন—সেই থেকে পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, পিতা হি পরমন্তপঃ মন্ত্রটি তার মনে শিকড় গেড়ে বসেছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে ললিতের মা ছিল না।

বাপের কথায় অসম্মতি প্রকাশ না করলেও মন কিন্তু তার বিগড়ে গেল। তার মনের অনেক উচ্চাশা এই অনাকাঙ্খিত বিয়ের জন্যে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। তার তখন যে বয়স তাতে কোন আদর্শই মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠবার কথা নয়। কখনো ভেবেছিল আনন্দ মঠের সন্তানদের মত কৌমার্য্য গ্রহণ করে দেশের কাজে আত্মসমর্পণ করবে, কখনো ভেবেছিল স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত রামকৃষ্ণ মিশনে ঢুকে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে, কখনো ভেবেছিল এমন কোন ধনীর মেয়ে বিয়ে করবে যিনি তাকে বিলাত পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাবেন এবং সে মেয়ে সর্ব্বপ্রকারে তার উপযুক্ত সঙ্গিনী হবে।

কিন্তু বাবার একটি কথায় সব জল্পনা কল্পনা কর্পূরের মত উবে গেল। যা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হ'ল সেটুকু হচ্চে

এই যে সুতপা নামক একটি মেয়েকে তার বিয়ে করতে হবে। কে সুতপা? তাকে ত কোনদিন চোখে দেখেনি। সে দেখতে কেমন, সে কি ভাবে, সে কি পড়ে? তার কিছুই জানা নেই কিন্তু বাবা বলেচেন তার সঙ্গে ললিতের বিয়ে দেবেন।

অতএব অঘ্রাণ মাসে চিরাচরিত নিয়ম মত সুতপার সঙ্গে ললিতের বিয়ে হ'য়ে গেল। শুভদৃষ্টির সময় আত্মীয় স্বজন বর এবং কনের উপর যখন একটা চাদর ঢাকা দিয়ে দিলে তখন ললিত জোর ক'রে চোখ দুটোকে মাটির দিকে নিবদ্ধ ক'রে রাখলে। একটা শুভমুহূর্ত্তে চোখাচোখি হওয়ার সুযোগ এইভাবে ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

বিয়ের পর ললিত ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করলে এবং কলেজে পড়তে কলকাতা চলে এল। সুতপার বাবাও মেয়ের বয়স কম ব'লে তাকে আপাতত শ্বশুরবাড়ী পাঠালেন না।

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল তখন তাদের বিয়ের পর ছয় সাত বছর পেরিয়ে গেছে। ললিত তখন ছাত্রজীবন থেকে ছুটি পেয়ে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেছে। সুতপাও তখন পনেরো ষোল বছরের যুবতী—সুতরাং তার বাবা তাকে ললিতের কর্ম্মস্থলে পাঠিয়ে দিলেন।

ললিত প্রথমে তাকে বেশ প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করলে। বললে, সু, আজ বিকেলে আমার বন্ধুরা চা খেতে আসবে তাদের নেমন্তন্ন ক'রে এসেছি—তুমি তাদের সামনে বেরিয়ে চা দিও।

সুতপা যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে সেকি গো? ও-সব খৃষ্টানিপনা বাপু আমার অভ্যেস নেই। আমি কারো র সামনে বেরুতে পারবো না।

ললিত হেসে বললে, এর নাম খৃষ্টানিপনা নয়, সু। লোক বেশী নয়—দু'তিন জন মাত্র। এরা আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তুমি এসেচ শুনে তারা তোমাকে দেখতে চেয়েছে। তাদের এ ইচ্ছা স্বাভাবিক। আমাকে যারা ভালবাসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে তারা আলাপ করতে চাইবেই। আমিও আলাপ করিয়ে দেব বলেছি।

সুতপার মনের খুঁতখুঁতুনি তবু ঘুচলো না। বললে, আমাকে নিয়ে এসব কেন বাপু? তোমরা ত বেশ নিজেরা গল্প করো—আমরা আমাদের কাজকর্ম্ম নিয়ে থাকি। তোমাদের মধ্যে আমাকে টেনে আনা কেন। আমি কি তোমাদের মত বড় বড় কথা বলতে পারবো, না তোমাদের সব কথা বুঝতে পারবো?

ললিত সুতপাকে কোলের দিকে টেনে নিয়ে বললে, তোমার কাজকর্ম্ম আর আমার কাজকর্ম্ম এখন আর পৃথক নেই, সু। এখন আমরা যে দু'জনেই এক। তোমার রান্না, বাড়ার কাজের মধ্যেও আমি আছি, আমার পড়াশুনার কাজের মধ্যেও তুমি আছ। সুতরাং আমাদের কথা-বার্ত্তার মধ্যেও তোমার ডাক পড়বে, আর তোমার হেঁসেল-খানায়ও বাক্যচর্চ্চার প্রয়োজন হ'লে আমাকে ডাক দিয়ো। বড় বড় কথা তোমাকে বলতে হবে না, আমরাও সব সময় বড় বড় কথা বলিনে। যাঁরা আসবেন তাঁরা তোমাকেই দেখতে আসবেন, তোমার ছোট কথাই শুনতে আসবেন—তাঁরা এনি বেশান্ত কিম্বা সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে দেখা করতে আসচেন না তা তাঁরা জানেন।

বিকেলে ললিতের বাসায় চায়ের মজলিস বসলো। সুতপা নিজের হাতে অনেক রকম সুখাদ্য প্রস্তুত করে রেখেছিল। সকল বন্ধুকে পরিতৃপ্ত ক'রে খাওয়ালে। জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে সব বন্ধুর চায়ের কাপে দু'বার তিনবার ক'রে চাও ঢেলে দিলে বন্ধুরা খুব খুসী হ'য়ে সুতপার প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠলেন।

জ্ঞান বললে, বৌদি, একেই বলে বাংলাদেশের লক্ষ্মীশ্রী। দেখুন ত আমরা রেস্তরাঁয় গিয়ে কত চপ, ডেভিল আর কাটলেট যে খাই তার আর সংখ্যা নেই কিন্তু এই যে চন্দ্রপুলি আর ক্ষীরের ছাঁচ আপনি বানিয়েচেন এর সঙ্গে কি তার তুলনা হয়? পেটের জ্বালায় কেবল পয়সা খরচ করেই মরি কিন্তু খেয়ে যে একটা তৃপ্তি আছে তা আগে এমন ক'রে বুঝিনি আজ যেমন বুঝলুম।

সুতপা হেসে বললে, আপনি খুসী হয়েচেন এতেই আমার সব পরিশ্রম সার্থক হয়েচে, ঠাকুরপো। আমরা বাংলাদেশের মেয়ে—লেখাপড়া বিশেষ শিখিনি। তবে একটা জিনিষ শিখেছি—সকলকে পরিচর্য্যা করা, সকলের সেবা করা।

ললিত ঈষৎ কটাক্ষ ক'রে বললে, বাংলাদেশের এখনো

লক্ষ্মীশ্রীর দুর্ভিক্ষ হয়নি জ্ঞানবাবু। একটু ফরমায়েস করলেই আমরা সে সাগরছেঁচা মাণিক সংগ্রহ করে আনতে পারি। চাই কি তোমার বৌদিও এই মহৎ কাজে সাহায্য করতে রাজী হ'তে পারেন।

জ্ঞান লজ্জা পেয়ে বললে, তোমার ঐ দোষ, ললিতদা। সবতাতেই ঠাট্টা। আমি কি নিজের কথা কিছু বলেছি?

ললিত বললে, আহা—হা, লজ্জা কি ভাই? আমি কি বল্‌ছি যে তুমি বলেছ? আমি তোমার মনের ইচ্ছেটা আঁচ করেছি মাত্র।

মজলিশ ভাঙলে ললিত স্তুতপার হাত দু'টি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, এই ত সুন্দরভাবে তুমি সমস্ত ম্যানেজ করলে, সু। কে বল্‌বে তুমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কিছু জানো না। তবে আগে থাক্‌তে ভয় পাচ্ছিলে কেন?

* * * *

কয়েক দিন পরের কথা। ললিত বস্‌বার ঘরে ব'সে খবরের কাগজ পড়ছিলো এমন সময় রাঁধুনী বামুন এসে ঘরে ঢুকলো। কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বললে, বাবুজি, আমি আর আপনার বাসায় চাকরি করতে পারবো না।

ললিত আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে, কেন, ব্যাপার কি? কি হ'ল তোমার?

চোর বদনাম নিয়ে আমি চাকরি করতে চাইনে, বাবুজি। মাইজি বলেচেন আমি নাকি চুরি ক'রে মাছ খাই।

স্তুতপা এইবার ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুক্‌লো। রাগে তার চোক দুটো কপালে উঠেচে। হাত পা নেড়ে বললে, খাস-ই ত, নেমকহারাম। আবার বাবুজির কাছে নালিশ করতে আসা হয়েচে। আমি গুণে গুণে মাছ রাখি, আর মাছ আমার উড়ে যায়? নচ্ছার বেটা, পেটে পেটে সয়তানি!

ললিত এই কথা কাটাকাটির ফলে একেবারে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলো। হঠাৎ সজাগ হ'য়ে বললে, আঃ সু, একটু চুপ করো। শুধু শুধু মানুষকে গালাগালি করচো কেন? ও মাছ খেয়েচে তুমি দেখেচ?

তীব্র স্বরে স্তুতপা বললে, খাওয়ার সময় কেউ আবার দেখিয়ে খায় নাকি? ঘরের মধ্যে তুমি আর আমি মানুষ—মাছ তবে খায় কে? গাল দেব না ত চাকরকে কি পুজো করবো? কুকুরকে মুগুরের বাড়ি না দিলে ঠিক থাকে না। তুমি এ সব বিষয়ে কথা বল্‌তে এস না ব'লে দিচ্চি।

ললিতেরও হঠাৎ যেন জেদ চ'ড়ে গেল। বললে, দেখ, সংসারের কর্ত্তা আমি—আমার সংসারে কাউকে শুধু শুধু গাল দেওয়া হয় এ আমি পছন্দ করি নে। বেরালেও মাছ খেতে পারে। কোন কারণে কাউকে রাখার অসুবিধে হয় তাতে স্পষ্ট ব'লে দিয়ো, তোমাকে রাখবো না, তুমি অন্য চাকরি খুঁজে নাও গে,—কিন্তু তাই নিয়ে চেঁচামেচি গালাগালি এ আমার ভাল লাগে না।

স্তুতপা গুম হ'য়ে বসে রইলো। রাঁধুনী বামুন ইতিপূর্ব্বেই অদৃশ্য হয়েছিল। ঠিক এমনি সময় গলার সাড়া দিয়ে জ্ঞান বাবু ঘরে ঢুক্‌লো। দু'জনকে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, কি ললিত দা, বিরস মুখে ব'সে আছেন যে? অজাযুদ্ধ নাকি?

স্তুতপা কথার উত্তর দিলে। বললে, ঠাকুরপো, আপনার দাদা আমাকে চাকরের সামনে অপমান করলেন।

ভীত হ'য়ে জ্ঞান বাবু বললে, কি হয়েছে, বৌদি, একটু খুলে বলুন।

ললিত বললে, বিশেষ কিছু নয়, জ্ঞান বাবু। তোমার বৌদি বল্‌ছিলেন আমাদের ঠাকুরটির নাকি চুরি ক'রে মাছ খাওয়ার বদ অভ্যাস আছে। তাই আমি বললুম, খেতে যখন আমরা দেখি নি তখন দোষ দিই কি ক'রে? তবে তাড়িয়ে দিতে চাও এমনি দিতে পার কিন্তু বদনাম দিয়ে নয়।

স্তুতপা বললে, অর্থাৎ কি না আমি যা বল্লুম তা' ওঁর বিশ্বাস হ'ল না। উনি চাকরের দিকে হ'লেন।

ললিত বললে, তুমি বুঝতে পারছো না, সু। এ কারোর দিকে হওয়ার কথা নয়, এ উচিত অনুচিতের কথা। ও বেচারা আমার বাড়ি চাকরি করতে এসেচে ব'লে আমি ওর উপর যা' তা' ব্যবহার করবো এমন শিক্ষা আমার নয়। চাকর হ'লে-ও মানুষকে আমি মানুষ ব'লেই গণ্য করতে চাই।

সে দিন ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হ'ল বটে কিন্তু তার রেশ ছ'জনের মনের মধ্যেই ধোঁয়াতে লাগলো এবং নতুন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলনের যে সেতুটি গ'ড়ে উঠছিলো তাতে একটা প্রকাণ্ড ফাটল ধরলো।

*   *   *

এর পর আরো পাঁচ ছয় বছর কেটে গেল। এখন ললিতের ছু'টি ছেলে হয়েচে। ললিত তার কর্ম্মস্থল থেকে একটি নতুন জায়গায় বদ্‌লি হ'য়ে এল। এ জায়গায় তেমন বাঙালী নেই—চারিদিকে কেবল বিস্তীর্ণ প্রান্তর তার মধ্যে সৈন্যদের ছাউনি। সৈন্যদের জন্তই একটি ছোট বাজার আছে—সেখানে কেবল মাংস আর পেঁয়াজ পাওয়া যায়। দিন রাত সৈন্তদের বিউগ্ল এবং কুচকাওয়াজের শব্দ কানে আসে।

শরতের প্রভাত। দুর্গাপূজার আর দেরি নেই। চারি পাশের মাঠ সোনার রৌদ্র কিরণে ঝলমল করছে। ছোট ছোট বাব্‌লা গাছের মধ্যে যে মন্থর আবেশ ঝিমিয়ে ছিল সেটি যেন হঠাৎ কার হস্তস্পর্শে সচকিত হ'য়ে উঠল। তারাও যেন অনুভব করলে মা আনন্দময়ী এক বছর পরে পিতৃগৃহে ফিরে আস্‌চেন।

পূজার ছুটিতে ললিতের ছোট ভাই ধীরেশ দাদার কর্ম্ম-স্থলে বেড়াতে এল। অনেক দিন পরে ছুই ভাইয়ে সাক্ষাৎ

সেদিন পাশ দিয়ে ললিতের বড় ছেলেটি ছুটে পালাচ্ছিল, তাকে ধ'রে ললিত বল্‌লে, খোকা, দেখি তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে কি?

প্রথমে সে ত কিছুতেই হাত খুল্‌বে না, শেষে জোর ক'রে হাতের মুঠো খুলে দেখা গেল তার হাতে একটা পয়সা।

ললিত জিজ্ঞাসা করলে, খোকা, তুমি পয়সা পেলে কোথায়?

খোকা একেবারে চুপ।

ললিত সাহস দিয়ে বল্‌লে, বল তুমি কোথায় পেলে, আমি কিছু বল্‌বো না।

খোকা তবু চুপ করে রইল।

ললিত বল্‌লে, আমার বালিশের নীচে যে পয়সা ছিল তার থেকে নিয়েছ, না?

খোকা এইবার বল্‌লে, না।

ললিত রেগে উঠলো—ঠাস্ ক'রে খোকার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলে। খোকা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো।

রান্নাঘর থেকে সুতপা কাজ ফেলে ছুটে বেরিয়ে এল। রোরুদ্যমান বালকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বল্‌লে, ওকে তুমি মারলে কেন?

ললিত বল্‌লে, মারবো না কেন? সত্যি ওর স্বভাব বড় খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে, সু। এক ত পয়সা নিয়েছে চুরি ক'রে আমার বালিশের নীচে থেকে, তার পর যখন জিজ্ঞাসা করলুম, তখন আবার মিথ্যে কথা বল্‌লে।

সুতপা বাধা দিয়ে বল্‌লে, তোমাকে আগেও বলেছি এখনো বল্‌ছি, তুমি আমার ছেলেপুলের গায়ে হাত তুল্‌বে না। ও কি এর মধ্যেই চুরি কাকে বলে বোঝে নাকি যে তুমি চোরের মা'র ওকে মারছ?

ললিত এই ধরণের কথা সুতপার মুখে আগেও শুনেছে, কাজেই বেশি আশ্চর্য্য হ'ল না। কিন্তু আশ্চর্য্য হ'ল ধীরেশ। সে এইবার বল্‌লে, এ তোমার অন্যায় বৌদি। খোকা ছেলে মানুষ তাকে ভাল মন্দ বুঝিয়ে দেওয়ার এই ত সময়। ছোট বেলায় শাসন না করলে তার ঐ সব বদ্ অভ্যাসগুলি স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাবে—তখন আর শোধ্‌রানো যাবে না।

সুতপা ঝাঁঝিয়ে উঠে বল্‌লে, তুমি এর কোন্ কথাটা জানো ঠাকুরপো যে সালিশি করতে এসেছ? খোকাকে উনি দেখতে পারেন না, এই শোন খাঁটি কথা, তাই ঐ রকম ছুতো ধ'রে শাসন করেন।

ধীরেশ বল্‌লে, তুমি এক অদ্ভুত কথা শোনালে বৌদি। বাপ ছেলেকে দেখতে পারে না, শুধু শুধু মারে। কিন্তু তোমারও মনে রাখা উচিত যে ছেলে কেবল মাত্র মায়ের নয়, ছেলে বাপ মা ছু'জনেরই।

ক্রমাগত বাধা পেয়ে সুতপা এইবার ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো, এবং রাগের মুখে কথার সূত্র হারিয়ে যেমন আবোল তাবোল মুখ দিয়ে বেরোয়, সে-ও সেই রকম বল্‌লে, তোমাদের বাড়ীর ন্যায় অন্যায়ের বিচার আর শুনিয়ো না, ঠাকুরপো, সে সব আমি জানি। তোমাদের বংশের ধারাই এই রকম—ব'লে ঝড়ের বেগে ছেলে কোলে ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ধীরেশ নিজেকে বড্ড অপমানিত বোধ করলে এবং একটুখানি চুপ ক'রে বসে থেকে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। খানিক পরে যখন তার খোঁজ হ'ল তখন দেখা গেল ধীরেশ বাসায় নেই। সেদিন সপ্তমীর প্রভাত—কটু ঝগড়ার ক্লেদাক্ত আবহাওয়ায় প্রাতঃকালের আনন্দ একেবারে মাটি হ'য়ে গেছে—বচ্ছরকারের দিন দুই ভাই এক সঙ্গে ব'সে খাবে হঠাৎ ধীরেশের তিরোধানে সে সম্ভবনাও লুপ্ত হ'য়ে গেল।

ললিত একেবারে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগলো। তার এই ছোট ভাইটি বড় আদরের—এক বছর বয়সের সময় সে মাতৃহারা হয়—তার পর কেবলমাত্র ভাই এবং বোনের অনুকূলতায় সে এত বড় হয়েছে এবং এখন কলেজে পড়ছে।

ললিত ব'লে গেল, ধীরেশকে খুঁজে আনিগে, যদি তাকে পাই তবে এক সঙ্গে খাব, নয় ত আজ আর আমি কিছুই খাব না।

কিন্তু খুঁজে দেখবে কোথায়? ধীরেশ নতুন এসেচে, সেখানে কাউকে চেনে না. সুতরাং কারোর বাড়ী যাওয়ার কথা নয়। তা' ছাড়া চারিদিকে কেবল মাঠ, ছোট ছোট বাব্‌লা গাছ এবং ছোট ছোট বেনা বনের ঝোপ—তার মধ্যে লুকিয়ে থাকারও স্থান নেই। সৈন্যদের ব্যারাক্ বা হাসপাতালেও তার যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বাসা থেকে বেরিয়েই যে কথাটা ললিতের প্রথম মনে হ'ল সেটা হচ্ছে এই যে ধীরেশ হয়ত বাড়ী ফিরে গেছে—মনে হওয়া মাত্র সে ছুটে ষ্টেশনের পথ ধরলে। খানিক দূর যেতেই দেখলে পথের পাশে ঘাসের উপর একটা গেঞ্জি পড়ে আছে—হাতে তুলে দেখলে সেটি ধীরেশেরই গেঞ্জি কয়েক দিন আগে সেই কিনে দিয়েছিল। ভাইয়ের উপর ভাইয়ের অভিমান দেখে তার আর একবার নতুন ক'রে চোখে জল এল। সন্তর্পণে গেঞ্জিটি তুলে নিয়ে সে নিজের কাছে রাখলো।

ষ্টেশনে গিয়ে বুকিং ক্লার্কের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল কেউ বাংলা দেশের কোন টিকিট সেদিন কেনে নি।

তখন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হ'য়ে ললিত মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে লাগলো—সমস্ত দিন অনাহারে দুশ্চিন্তায় শরৎকালের কড়া রৌদ্রে তার মুখ চোখ লাল হ'য়ে গেল। বেলা যখন অপরাহ্ন তখন দূর থেকে দেখলে তার দিকে পিছন ফিরে রাস্তার কাল্‌ভার্টের (Culvert) উপর ধীরেশ ব'সে আছে।

কাছে গিয়ে ললিত ধীরেশের হাত দু'টো চেপে ধরলে, অবরুদ্ধ স্বরে বল্‌লে, ছোট্‌কা, খাবি চল্।

ধীরেশ মন্ত্রমুগ্ধের মত ললিতের সঙ্গে চল্‌লো। খানিক পরে যেতে যেতে বল্‌লে, তুমি কি রকম ক'রে ঘরকন্না কর দাদা, আমি বুঝতে পারিনে। এই কদিনেই আমি ত অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেচি।

ললিত বললে, সে তুই বুঝবিনে ছোটকা যে মানুষকে কত সহ্য করতে হয়! কিন্তু এর নামই জীবন। জীবন উপন্যাসে-পড়া ছবির মত রোমাঞ্চকর নয়। আমার জীবনের কত কল্পনা, কত আদর্শবাদ যে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে প'ড়ে ব্যর্থ হ'য়ে গেছে তা' তুই ছোট ভাই, তোকে আর কত বলবো বল।

দুই ভাইয়ে যখন পাশাপাশি খেতে বসেচে তখন সন্ধ্যা আসন্ন। পূজার প্রথম দিনটি প্রবাসে দুই ভাইয়ের কাটলো ভাল। সুতপা যখন দুই ভাইয়ের সামনে ভাতের থালা ধ'রে দিলে তখন দেখা গেল ক্ষুন্নিবৃত্তির পরিতৃপ্তিতে এবং পানের রসে তার মুখখানি টলটল করচে।

* * *

এর কয়েকদিন পরে ললিতের মেজ ছেলেটি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়লো। জ্বর এবং অবিশ্রান্ত ভেদ। ষ্টেশনে আর কোন ডাক্তার নেই—এক আছেন হাঁসপাতালের আই, এম, এস অফিসারেরা—তাঁরা প্রাকটিস্ করেন না—আর আছে হাঁসপাতালের এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ফিরিঙ্গি ডাক্তার এবং সাব-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন দেশী ডাক্তার। ললিত এক ফিরিঙ্গি ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ এনে ছেলেকে খাইয়ে দিলে। দু'তিন পুরিয়া ওষুধ খাওয়ানোর পর ভেদ বন্ধ হ'য়ে গেল বটে কিন্তু বিকালের দিকে হঠাৎ ছেলেটি চোখ উল্টে নির্জ্জীবের মত পড়ে রইলো। ধীরেশ ছেলেটির শিয়রে সেই যে আসন নিলে আর কিছুতে উঠলো না। ললিত ছেলের অবস্থা

দেখে বারো মাইল দূরবর্ত্তী সহরে এক ডাক্তার বন্ধুকে টেলিফোঁ করলে আসার জন্তে।

সুতপা বলতে লাগলো, তোমার জন্যেই এই অসুখটা বাড়লো। রোগের প্রথম অবস্থায় তুমি আদৌ গা করোনা—গোড়া থেকে ওষুধ পড়লে অসুখটা বাড়তে পারতো না।

ললিত মর্ম্মাহত হ'য়ে বললে, ওষুধ ত সময় মতই এনে দিয়েছি, সু। প্রথম এক আধ দিন ভেবেছিলুম যে হয়ত খাওয়া দাওয়ার ধরাকাটা করলেই সেরে যাবে। তা' যখন গেল না তখন ওষুধ এনে দিতেই হ'ল।

সুতপা বললে, ভারি ত ডাক্তার, গোবদ্যি। ও ফিরিঙ্গি ডাক্তার কি আমাদের ছেলেমেয়ের ধাত বোঝে? এমন একটা জায়গায় তোমার চাকরী যেখানে ভাল ডাক্তার পর্য্যন্ত নেই।

সন্ধ্যার একটু পরেই সহরের ডাক্তারবাবু মোটরযোগে এসে পৌছুলেন। রোগীকে পরীক্ষা ক'রে ললিতকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, কেস্ খারাপ হ'য়ে গেছে, বিশেষ আশা কিছু দিতে পাচ্ছি না, বন্ধু। তবে চেষ্টা ক'রে দেখা যাক, যদি কিছু হয়।

তারপর সমস্ত রাত ধ'রে ইঞ্জেকসান চলতে লাগলো। কিন্তু রোগীর কোন উন্নতিই দেখা গেল না, বরং ক্রমশঃ নিস্তেজ হ'য়ে আসতে লাগলো। আর সে মর্ম্মভেদ তৃষ্ণার বিরাম নেই—প্রতি সেকেণ্ডে জল খাওয়ার জন্তে হাঁ করছে ধীরেশ রোগীর শিয়রে ব'সে একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে এবং চামচে ক'রে জল দিচ্ছে। ললিত কেবল ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগলো—এক সময় ডাক্তারের হাতদুটো চেপে ধ'রে বললে, দুদু, ও এত জল খেতে চাইচে কেন রে, এ তৃষ্ণার কি আর নিবৃত্তি নেই? ডাক্তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, তোমার ফিরিঙ্গি ডাক্তার পায়খানা বন্ধ করার জন্যে যে ওপিয়ম দিয়েছিল, ভাই।

ভোরের দিকে ডাক্তার চলে গেলেন। যাওয়ার সময় ব'লে গেলেন যে কেমন থাকে খবর পেলে কাল আবার তিনি আসবেন।

সকালে ছেলেটি মারা গেল। সুতপা আছাড়ি বিছাড়ি করে কাঁদতে লাগলো। জীবনে এই তার প্রথম শোক। ললিত তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, কেঁদো না সু। এই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমরা এক হব—আমি তোমাকে আরো বেশি ক'রে ভালবাসবো—আমাদের দু'জনের শোক সমানভাবে আমাদের দগ্ধ ক'রে পরস্পরকে পরস্পরের কাছে টেনে আনবে।

* * *

পাঁচ ছ' বছর আবো কেটে গেল। ললিতের এক বন্ধু বিলেতে গিয়েছিলেন—তিনি বিলাত থেকে ফিরে যাওয়ার পথে ললিতের বাসায় কয়েকদিনের জন্য নামলেন। বাল্য-বন্ধুকে পেয়ে ললিতের মন খুসীতে ভ'রে উঠলো।

প্রদোষের আলো-আবছায়ার মধ্যে দিগন্তবিসারি প্রান্তরে ব'সে দুই বন্ধুতে অনেক সুখ দুঃখের কথা হ'ল। এক সময়ে ইংলণ্ড প্রত্যাগত বন্ধু বললেন, আমাকে সত্যি ক'রে বল, নলু, তুই দাম্পত্য-জীবনে সুখী হয়েচিস কি না। তোর এই ক'দিনের জীবনযাত্রা দেখে আমি ত খুব ভরসা পাচ্ছি না।

ললিত একটা সান্ধ্য তারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। সে দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বন্ধুর মুখে নিবদ্ধ ক'রে বললে, তুমি যা' বুঝেচ তা' সত্যি ভাই। আমার আদর্শবাদী স্বভাবের সঙ্গে কারোর খাপ খায় না। আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি বুঝেচি যে আমি সব জিনিষকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি সকলে সে দিক থেকে দেখেনা। সু-র কোন দোষ নেই—সে প্রাণপণে আমার সঙ্গে মিলতে চেষ্টা করে—আমিও চেষ্টা করি কিন্তু মাঝখান থেকে এমন একটা ঘটনা এসে পড়ে যার ফলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যায়। কোন ঘটনাকেই আমরা দু'জনে এক দৃষ্টিকোণ থেকে ইণ্টারপ্রেট করতে পারিনে। এই নিয়েই আমাদের দ্বন্দ্ব।

বন্ধু খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন—তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আমার একটা কথা রাখবি, নলু। তোর স্বাতন্ত্র্যকে খানিকটা বিসর্জ্জন দিতে হবে—অর্থাৎ সু-র স্বভাবের স্বাতন্ত্র্য তোকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। অবশ্য আমাদের দেশে এমন মেয়েই বেশি জন্মায় যারা স্বতন্ত্রপ্রধান নয়—স্বামীর ইচ্ছা এবং আদেশের ভিতরেই যারা নিজেদের ইচ্ছাকে ডুবিয়ে দিয়ে শান্তি খোঁজে। কিন্তু দৈবাৎ যদি এমন কোন মেয়ের সাক্ষাৎ মেলে যার অভিরুচি এবং ঝোঁক স্বামীর চিত্তবৃত্তির

বিপরীত, তবে তাকেও ত ছেঁটে ফেলে দেওয়া চলে না, ভাই। য়ুরোপ থেকে এইটি আমি শিখেচি। সে দেশে গৃহস্থালীর মধ্যে গৃহস্বামিনীর একটি বিশিষ্ট স্থান এবং অধিকার আছে। আমাদের দেশে আমরা মুখে যতই স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলিনে কেন, কার্য্যত তার কিছুই করিনে। এখনো আমাদের সংসারে স্বামীর মতামতই মুখ্য। এটা ভাল কি মন্দ সে কথা বলচিনে, কিন্তু যেখানে স্ত্রীর মতামতের সঙ্গে স্বামীর মতামতের বিরোধ, সেখানে স্ত্রীর মতকেও অনেক সময় শিরোধার্য্য করতে হয়, কেননা তবেই সে মতের মূল্য দেওয়া হয়।

ললিত অনেকক্ষণ স্থির হ'য়ে রইল—তারপর বললে, তোমার মূল কথাটা বোধহয় আমি বুঝেচি। হয়ত তুমি ঠিকই ধরেচ—আমার স্বাতন্ত্র্যই আমার মিলনের পথে প্রধান অন্তরায়। তাকে উৎসাদিত করলে মিল হওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু তা'হলে কি কম্প্রোমাইজকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না?

বন্ধু বললেন, কম্প্রোমাইজের নামই ত ব্যবহারিক জীবন। সামাজিক জীবনে তুমি মৌল আদর্শ কোথায় পাবে ভাই? জীবন মানেই আদর্শের সঙ্গে খাদ মিশিয়ে সুসহ ক'রে নেওয়া।

সে দিন দু'বন্ধুতে মিলে যখন বাসায় ফিরলে তখন বেশ রাত হয়েচে। সুতপা অপেক্ষা ক'রে ছিল, বললে, বাবাঃ তোমাদের দু'বন্ধুতে কি আর কথা ফুরোয়না গো? কি এমন গল্প গুজবে মত্ত ছিলে শুনি?

ললিত হেসে বললে, তোমাদের মেয়েদের পুকুরঘাটের গল্পই কি সহজে শেষ হ'তে চায় নাকি? তোমরা সমালোচনা কর পুরুষদের, আমরা সমালোচনা করি মেয়েদের।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

পরম মুহূর্ত্ত

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস, আই-সি-এস

এ মুহূর্ত্তটীরে
আসা যাওয়া সময়ের তীরে
হারায়ো না বহুদূর বিস্মৃতির দেশে।
কাল কত ভেসে
কোথা যায় কে জানে ঠিকানা;
স্বর্গ হ'তে আনা
এ মুহূর্ত্তটীরে
তিলোত্তম সাধখানি ঘিরে
রচেছিনু মনে
তোমার স্মরণে।

বিশ্ব জুড়ে কত যাওয়া আসা,
নিত্য কাঁদা হাসা,
নিরাশার দুঃখ ক্ষতি মরণের ভারে,—
চুপি চুপি এড়াইতে তারে
পারিনা যে; মহাকাল-মুখরিত রথচক্রতলে
নিষ্পেষিয়া ফেলি' দেয় কোথায় সবলে,
মুছে যায় সময়ের নাম,
তুচ্ছ পরিণাম!

তবু তুমি ভুলিয়ো না তারে
কতবার তব কণ্ঠহারে
যোগায়েছি ফুল; তা' সবার সেরা
প্রিয় নামে ঘেরা
এ মুহূর্ত্ত কোথা' ফেলিয়ো না,
এরে ভুলিয়ো না।

———

হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন

স্বামী আত্মানন্দ

হিন্দু-সমাজ আজ সমস্যার ঘনঘোর কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। পারিবারিক কি সামাজিক, ধার্ম্মিক কি রাষ্ট্রীয়, নৈতিক কি আধ্যাত্মিক সর্ব্বক্ষেত্রেই হিন্দুর জীবন আজ বিশেষভাবে বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত। ভেদ-বৈষম্য, অনৈক্য-পার্থক্য ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ-পরশ্রীকাতরতা যেমন একদিকে দুষ্ট রাহুর মত লোলরসনা বিস্তার করিয়া হিন্দু-সমাজকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি হিন্দু আজ আচরণের অভাবে তার শিক্ষা-সভ্যতা, সাধনা-সংস্কৃতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত সংযোগসূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। যে নির্ম্মল ধর্ম্ম, যে মহান আদর্শ, যে মহিমময় শিক্ষা, সভ্যতা ও সাধনার অমিয় নির্ঝর হইতে সে একদিন অফুরন্ত জীবনী-শক্তি লাভ করিয়া সহস্র বিপদাপদ ঘাতসংঘাতকে সবলে প্রতিহত করিয়াও উদ্দামবেগে জীবনের পথে ছুটিয়াছিল আজ সেই শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত তার কোন সম্বন্ধ, ঘনিষ্ঠ নাড়ীর টান—সেই সাধনা ও সংস্কৃতির উপর তার আন্তরিক কোন শ্রদ্ধা দরদ বা মমত্ববোধ নাই। বিরাট বিশাল হিন্দু-সমাজ তাই প্রাণহীন, নির্জ্জীব, জীবন শূন্য মমির মত নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ফলে আপনার বাস্তুভিটায় দাঁড়াইয়াও হিন্দু আজ নিরুপায়, নিরাশ্রয়—দিবা দ্বিপ্রহরে প্রকাশ্য রাজপথেও তার বুকের উপর দিয়া অন্যায় অত্যাচারের প্রলয়-ঝঞ্ঝা নির্ব্বিবাদে বহিয়া যায়!

হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন প্রবর্ত্তক—আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান আফগানিস্থান শুধু হিন্দু-রাজ্য নয়, হিন্দু সভ্যতার একটা মস্ত বড় কেন্দ্র ছিল। ইহাই মহাভারত-বর্ণিত গান্ধারীর পিতৃভূমি গান্ধার দেশ। কাবুল, কান্দাহার, গজনী প্রভৃতি স্থানে খোঁজ করিলে এখনও হিন্দু সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। আজিও মুসলমান অধ্যুসিত বেলুচিস্থানে হিঙ্গলাজ দেবীর মন্দির হিন্দুর অতীত চিহ্নরূপে দণ্ডায়মান। সুদূর বলী, চম্পা, কাম্বোজিয়া, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি

নীলাম্বুরাশি-পরিবেষ্টিত সাগরাভ্যন্তরাস্থিত দ্বীপপুঞ্জ একদিন হিন্দুরই দেশ ছিল। যবদ্বীপ, ইন্দোচীন প্রভৃতি স্থানে হিন্দুর সুবিশাল নভশ্চুম্বী মন্দির, সুন্দর সুঠাম দেববিগ্রহ, সুচারু শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্য এখনও উন্নত শিরে হিন্দুর অতীত কীর্ত্তি গৌরবের জয় ঘোষণা করিতেছে। শুধু তাই নয়, বোর্ণিওর রাজপরিবার এবং অন্যান্য স্থানের বহু বিশিষ্ট আভিজাত্য বংশে এখনও পূর্ব্বাপর রীতিক্রমে অনেক হিন্দু আচার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আর তারা হিন্দু নাই—হিন্দুত্ব সেখানে অতীতের স্বপ্ন!

দিয়াছিল, আজ সেই হিন্দুর সমাজাঙ্গন সাম্প্রদায়িক ভেদ বিরোধের কেন্দ্রভূমি। অন্যপরে কা কথা, পিতা-পুত্রে ঐক্য নাই, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—স্বীয় ধর্ম্ম, সমাজ, মন্দির, বিগ্রহ, এমন কি জায়া জননী, দুহিতা ভগিনীর উপর নির্ম্মম অত্যাচারে তার নির্জ্জীব দেহে চেতনার সঞ্চার হয় না।

হিন্দুর গৃহে আজ সত্যই ভাঙ্গন ধরিয়াছে। একদিকে উন্নত সমাজ শ্রদ্ধা, শিক্ষা ও আচরণানুষ্ঠানের অভাবে নির্ব্বিষ বিষধরের মত হিন্দুত্বহীন হিন্দুতে পরিণত, অন্যদিকে দলে দলে অনুন্নত সমাজ প্রীতি সহানুভূতি ও শিক্ষার অভাবে

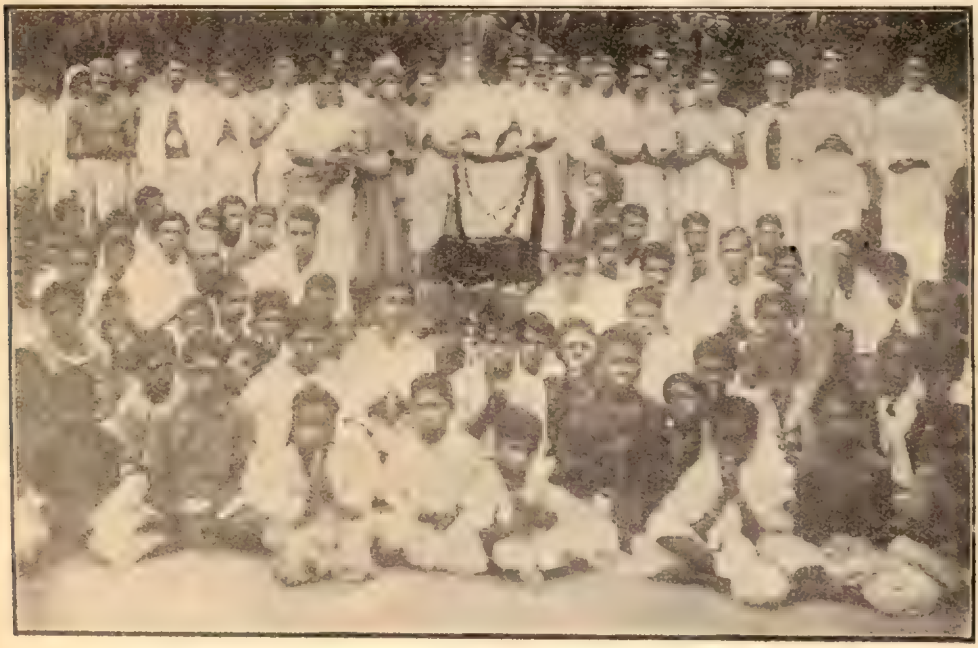

হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন—মিলনমন্দিরে প্রার্থনারত হিন্দু জনসাধারণ

বহির্ভারতের আধিপত্য হারাইয়া হিন্দু ক্রমে ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু সে ভারতেও তার অবস্থা আজ নিতান্ত শোচনীয়ভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আত্মঘাতী ভেদ বিরোধ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ শ্মশান-প্রেতের মত বীভৎস মূর্ত্তিতে মৃত সমাজের বুকে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে। যে হিন্দু বিশ্বসৃষ্টির আদিমতম উষায় মহামিলনের মহাঋক উচ্চারণ করিয়া আচণ্ডালে কোল

হিন্দুত্বের কোল পরিত্যাগ করিতে সমুদ্যত, ফলে হিন্দুর ঘরে ঘরে ধ্বংসের কালানল, অশান্তির তীব্র দাবদাহ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে দুঃখ দৈন্য দুর্ব্বিপত্তি আসিয়া হিন্দু সমাজকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। ২৬ কোটি হিন্দুসন্তান বুকে ধরিয়াও হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিভূমি আজ ধ্বসিয়া পড়ার উপক্রম!

আজ এই ধ্বংসের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইতে হইলে আসন্ন মৃত্যুর ভীতিময় কবল হইতে হিন্দুজাতিকে রক্ষা

করিতে হইলে চাই এমনিতর এক বিরাট ব্যাপক শক্তিশালী প্রবল ধর্ম্মান্দোলন যা মৃতকল্প হিন্দুসমাজকে নূতন শক্তির বৈদ্যুতিক স্পর্শে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে, আজ চাই এমনিতর এক কর্ম্মপন্থা যাহা খণ্ডিত বিখণ্ডিত হিন্দুসমাজকে ভেদের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া এক অখণ্ড মহা হিন্দুজাতিতে পরিণত করিবে, আজ চাই এমনিতর শিক্ষা দীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন যা হিন্দুত্বের পুনরুদ্বোধন করতঃ গোটা জাতিকে নূতন জীবনের প্রাচুর্য্য ও মাধুর্য্যে মাতাইয়া

হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন—অনুন্নত-সমাজ শিক্ষামন্দির

তুলিয়া উদ্দাম গতিতে স্বীয় লক্ষ্যপানে ছুটাইয়া লইয়া যাইবে।

এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ভারত সেবাশ্রম-সঙ্ঘ হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সঙ্ঘ প্রচারক ও কর্ম্মীগণের প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে সর্ব্বত্র আশাতীত ফল লাভ হইতেছে। চারিদিকে যে উৎসাহ, উন্মাদনা ও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি তাহাতে যেন হিন্দুর পুনরুত্থানের শুভ সূচনাই দেখা যাইতেছে। আমরা জনসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে "সমন্বয় আন্দোলন" সম্পর্কিত গত বৎসরের কার্য্য বিবরণী উপস্থিত করিতেছি।

মিলন-মন্দির সংস্থাপন

শ্রেণীগত ভেদ-বিবাদে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজে আজ মিলনের প্রশ্নই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। পরস্পর প্রেম-প্রীতি, ঐক্য, মিলন ও সহানুভূতির অভাবে হিন্দু ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িতেছে। সমষ্টিগত চিন্তা, ভাবনা, দায়িত্ব ও মমত্ববোধ না থাকায় হিন্দু সমাজ যেন কিছুতেই একত্র দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে পরিতেছে না; আর তারই ফলে তার জীবনপ্রবাহ ধীরে ধীরে নিশ্চল হইয়া আসিতেছে।

আজ এই খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হিন্দু-সমাজকে পরস্পর সম্মিলিত ও সঙ্ঘ-বদ্ধ করিতে হইলে চাই সমাজের বুকে এমন এক মিলনক্ষেত্র রচনা, যেখানে উন্নত-অনুন্নত, শিক্ষিত অশিক্ষিত সনাতনী সংস্কারক, বালক বৃদ্ধ প্রৌঢ় সকলেই প্রেমপ্রীতি-ভরে উপস্থিত হইতে পারিবে, যেখানে ভেদের ছিদ্রপথ বন্ধ করিয়া বিরোধের সূত্র বিস্মৃত হইয়া কেবল মিলনেরই জয়গান

হইবে। আজ চাই এমন এক মিলনভূমি, যেখানে একদিকে সমবেত ভজন, প্রার্থনা, উপাসনা ও ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানাদির দ্বারা ধর্ম্মভাবকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করার চেষ্টা হইবে, অন্য দিকে হিন্দুধর্ম্মের জীবন্ত তত্ত্ব, হিন্দুর শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, হিন্দু ভারতের গৌরবময় ইতিহাস ও অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-কাহিনী সম্বন্ধে নিয়মিত পঠন পাঠন ও আলোচনাদি হইবে। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জীবনের বৈশিষ্ট্য দৈনন্দিন জীবনে প্রতিপাল্য রীতি নীতি আচার অনুষ্ঠানাদি শিক্ষা, শিশুদের হিন্দু ধারায়

এমনিভাবে সকলে মনে প্রাণে হিন্দুত্বের শিক্ষা ও সাধনায় ব্রতী হইল ধীরে ধীরে আভ্যন্তরিক ভেদ বিরোধ ব্যবধান দূর হইয়া সকলের ভিতর এক বিশ্বোদার ভাব, প্রেম, মৈত্রী ও মিলন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভারতবর্ষের বুকে আবার এক অখণ্ড বিরাট সবল শক্তিশালী হিন্দুজাতি দানা বাঁধিয়া গড়িয়া উঠিবে। ধর্ম্মানুভূতির উর্দ্ধভূমিতে দাঁড়াইয়া তখন সকলে দেখিবে ও বুঝিবে—এক পিতার বিভিন্ন সন্তানের মত আমরা বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেও মূলে

হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন—প্রচারক বাহিনী

প্রাথমিক শিক্ষা, বালক ও যুবকগণের নৈতিক শিক্ষা, শরীর চর্চ্চাদির ব্যবস্থা, লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সর্ব্ব প্রকার আয়োজন থাকিবে। এক কথায় ইহাই হইবে হিন্দুর জাতীয়-জীবন গঠনের মূল কেন্দ্র—সার্ব্বজনীন মিলনতীর্থ, যেখানে বর্ণ ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে শিশু, বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ তাদের ধার্ম্মিক ও নৈতিক, শারীরিক ও ব্যবহারিক জীবন গঠনের প্রেরণা ও শিক্ষালাভ করিয়া খাঁটি হিন্দু হইয়া দাঁড়াইবে।

সকলেই এক—আমাদের শিক্ষা সভ্যতা কৃষ্টি ও সাধনা অভিন্ন—আমাদের জীবন মরণ, সুখ দুঃখ, মান মর্য্যাদা, উন্নতি অবনতি সমসূত্রে গাঁথা। একের বিপদে সকলের বিপদ, একের অপমানে সকলের অপমান, একের ব্যথায় সকলের ব্যথা।

হিন্দুর প্রাণে এই অখণ্ড ঐক্যতানুভূতি, ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি এমনিতর দরদ ও মমত্ববোধ, শিক্ষা ও সাধনার প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠানুরাগ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর গভীর শ্রদ্ধা-

বোধ জাগ্রত করিয়া এক মহা অভ্যুত্থান সাধনের শুভ সঙ্কল্প লইয়াই সঙ্ঘের "মিলন-মন্দির" স্থাপনের এই প্রচেষ্টা। ইহাই উদীয়মান হিন্দু জাতির ধর্ম্মক্ষেত্র, ইহাই কর্ম্মক্ষেত্র ইহাই হইবে তাহার মহাতীর্থ। এখান হইতেই হিন্দু তার মহান অভ্যুদয়ের মহামন্ত্র ও প্রেরণা লাভ করিয়া নূতন বিক্রমে নূতন তেজে আবার জাগ্রত হইয়া উঠিবে। এখান হইতেই সে তার অফুরন্ত জীবনীশক্তি লাভ করিয়া মহাকালের বুকে চির অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে। তাই এই "মিলন

অনুন্নত সমাজে শিক্ষা প্রচার

অনুন্নত সমাজকে যথোচিত শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য "হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলনের" শিক্ষাপ্রচার বিভাগ হইতে বিভিন্ন "মিলন মন্দিরে" বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরে ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে, ইহাতে ছাত্রসংখ্যা ৩৫০।

এতদ্ব্যতীত মাদারিপুর ও খুলনা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় এবং কলিকাতা ফ্রী ষ্টুডেণ্টস্ হোমে রাখিয়া অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্র-

হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন—ক্ষত্রিয় সংগঠন

মন্দিরই" হইবে ভবিষ্যৎ হিন্দু-ভারতের মহান্ আশ্রয় ও অবলম্বন, শক্তি ও সান্ত্বনার এক মাত্র উৎস।

সঙ্ঘ "হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন" প্রবর্ত্তনাবধি এই অল্প পরিসর সময়ের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ২৫টী "মিলন মন্দির" গঠন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অভিযান সুরু করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামকাঠি (বরিশাল), মাণিকদহর (ফরিদপুর), সাহাপাড়া (খুলনা), দেবহাটা (খুলনা), বণ্ডীর (বর্দ্ধমান) প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী নূতন "মিলন মন্দির" সংস্থাপিত হইয়াছে।

দিগকে উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

হিন্দু-সম্মেলন

"সমাজ সমন্বয় আন্দোলনের" কার্য্যধারা ও হিন্দু-সমাজের সময়োপযোগী জটিল সমস্যাসমূহের আলোচনা এবং হিন্দু জনসাধারণের ভিতর নূতনতর উৎসাহ উন্মাদনা আনয়নের জন্য আলোচ্যবর্ষে উন্নত অনুন্নত সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুদিগকে লইয়া বাজিতপুর ও আশাশুনিতে দুইটী হিন্দু-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙলার বিভিন্ন জেলা হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু নেতা, প্রতিনিধি ও দর্শক উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। রায়-বাহাদুর শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট্ ও ডাঃ প্রতাপ-চন্দ্র গুহরায় মহাশয় যথাক্রমে বাজিতপুর ও আশাশুনিতে সভাপতির আসন গ্রহন করিয়াছিলেন। উভয়স্থানে ৪ দিনে মোট ৬ টি সভার অধিবেশন হয় এবং বহু বক্তা বক্তৃতা ও আলোচনা করেন এবং কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যকরী প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সর্ব্বত্র বিপুল আয়োজন হয় এবং সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী তাঁহার দর্শন ও উপদেশ লাভের জন্য ছুটিয়া আসে। তিনি সকলকে নৈতিক চরিত্র গঠন ও ধর্ম্ম-জীবন যাপন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার উপস্থিতিতে জনসাধারণের ভিতর বিপুল উৎসাহ উন্মাদনার সৃষ্টি হয় এবং সকলে এক নূতন ভাবে মাতিয়া উঠে।

বিভিন্নস্থানে প্রচার

"সমাজ-সমন্বয় আন্দোলনের" আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্ম্মপদ্ধতির

হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলন—সার্ব্বজনীন মিলন মহোৎসব

প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা হিন্দু-সমাজকে পুনরুদ্বোধিত করিবার জন্য উপযুক্ত সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে আলোচ্যবর্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও ব্রহ্মদেশে ৮টী প্রচারবাহিনী প্রেরিত হইয়াছে। তাহারা নিয়মিতভাবে সর্ব্বত্র জনসভায় ও পারিবারিক সম্মেলনে বক্তৃতা, আলোচনা, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, পূজারতি, উৎসব, শাস্ত্র ও সদ্গ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি সার্ব্বজনীন ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং গৃহে গৃহে আহূত হইয়া ভজনকীর্ত্তন ও নগর সংকীর্ত্তন, শোভাযাত্রাদি করেন।

বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘনেতা শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্যদেবের শুভ পদার্পণ

বিভিন্ন স্থানের নেতৃবৃন্দের সাগ্রহ অনুরোধে সঙ্ঘনেতা শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্যদেব আলোচ্যবর্ষে এলাহাবাদ, পাটনা, ভাগলপুর, কাশী, গাজিপুর, গয়া, দেওঘর, যশিডি, দুমকা, মধুপুর, ছাপরা, খুলনা, বাজিতপুর, পূর্ণিয়া, ডে'র-অন-শোন, পুরী, ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশাল জেলায় সুদূর পল্লী-অঞ্চলে শুভ পদার্পণ করেন।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতা প্রধান কার্য্যালয় হইতে অন্যান্য প্রচারকগণও সাময়িকভাবে বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে হিন্দু জনসাধারণের ভিতর একটা নূতন চেতনার সঞ্চার হইয়াছে।

ভারত ও বহির্ভারতে সমন্বয় বক্তাগণ

হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলনের পক্ষ হইতে স্বামী অদ্বৈতানন্দজী, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী, স্বামী বেদানন্দজী, স্বামী বিকাশানন্দজী, স্বামী আত্মানন্দজী, স্বামী পূর্ণানন্দজী স্বামী কুমারানন্দজী প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রচারক ও বক্তাগণ গুজরাট, কাথিয়াবার, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ শানরাজ্য মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, সংযুক্ত প্রদেশ, বাংলা বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারত ও বহির্ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় হিন্দু-সমাজের জটিলতম সমস্যাসমূহের সমাধান করতঃ হিন্দুর জাগরণোপায় সম্বন্ধে কার্য্যকরী পন্থা প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়াছেন। বক্তৃতাবসানে ছায়াচিত্রযোগে সমাজ-সমন্বয় আন্দোলনের নব-প্রবর্ত্তিত কর্য্যাবলী এবং হিন্দুর অতীত কীর্ত্তি গৌরব শিক্ষা সভ্যতা প্রভৃতি দেখান হইয়াছে।

অনুন্নত সমাজে ক্ষত্রিয় বীর সংগঠন

শারীরিক শক্তিতে শক্তিমান অনুন্নত সমাজই হিন্দুর প্রকৃত ক্ষত্রশক্তি। পূর্ব্ববঙ্গের নমঃশূদ্র এবং দক্ষিণবঙ্গের পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণ অদূর অতীতে যে বীর্য্যবত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল তাহা এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী যে কোন জাতির পক্ষেও শ্লাঘার বিষয়। তাই সঙ্ঘ হইতে অনুন্নত সমাজকে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করতঃ তাদের সেই অপূর্ব্ব ক্ষাত্রবীর্য্যের পুনরুদ্বোধন করিয়া হিন্দুসমাজকে অনাচার অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার এবং হিন্দু নারী রক্ষা সাধনের প্রচেষ্টা হইতেছে। এতদুদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে ব্যায়ামাগার প্রভৃতি স্থাপন করা হইতেছে।

সার্ব্বজনীন মিলন মহোৎসব

উৎসবই জাতির জীবন, অনুষ্ঠানই প্রাণ। নিয়মিত আচরিত দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানগুলি যেমন মানুষকে জীবন্ত রাখে, তেমনি সাময়িকভাবে অনুষ্ঠিত বিরাট সার্ব্বজনীন উৎসব মহোৎসবগুলিও গোটা জাতিকে নূতন ভাব প্রেরণা ও জীবনের প্রাচুর্য্যে মাতাইয়া তোলে। সার্ব্বজনীন মিলনোৎসবই জাতিকে তার সমষ্টি শক্তি, তার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেয়। মহামহোৎসবের মহা-মিলনক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতি স্বীয় শক্তি ও স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যে সাহস ও আত্মবিশ্বাস লাভ করে তাহাই তাহাকে সহস্র ঘাত সংঘাত হইতে বাঁচাইয়া রাখে। পরন্তু এই উৎসবের ফলেই জাতি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া গড়িয়া উঠে, ব্যষ্টি-জীবনের সঙ্কীর্ণতা স্বার্থপরতা বিস্মৃত হইয়া সমষ্টি-জীবনের বিরাট উদারভাবে অনুপ্রাণিত হয়। তাই সঙ্ঘ আজ স্থানে স্থানে সার্ব্বজনীন মিলনোৎসব অনুষ্ঠান করিয়া জাতি গঠনের সূত্রপাত করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে "সমন্বয় আন্দোলনের" পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত মিলনোৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উন্নত অনুন্নত শিক্ষিত অশিক্ষিত বালবৃদ্ধ যুবা সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুই ইহাতে যোগদান করিয়াছেন।

১। শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমার উৎসব—খুলনা ২৩শে ও ২৪শে কার্ত্তিক, লোকসংখ্যা ১০,০০০।

২। ত্রিশূল উৎসব—বাজিতপুর (ফরিদপুর) পৌষ-পূর্ণিমা লোকসংখ্যা ১০০০।

৩। কুম্ভমেলা ক্ষেত্রে—প্রয়াগধাম পৌষসংক্রান্তি মাঘী পূর্ণিমা।

৪। মাঘীপূর্ণিমা উৎসব—বাজিতপুর ২২, ২৩, ২৪শে মাঘ, উপস্থিত লোকসংখ্যা ৩৫,০০০।

৫। শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমা উৎসব—আশাশুনি (সুন্দরবন) ২৩, ২৪শে ফাল্গুন উপস্থিত লোকসংখ্যা ১০,০০০।

৬। শ্রীশ্রীশিবরাত্রি উৎসব—কলিকাতা (বালিগঞ্জ) ৮ই ফাল্গুন লোকসংখ্যা ১৫০০।

৭। শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা উৎসব—বাজিতপুর, লোকসংখ্যা ২০০০।

৮। সুফলকাঠী মিলন মন্দিরের বার্ষিক উৎসব—সুফল-কাঠী (যশোর) ২রা ফাল্গুন লোকসংখ্যা ৬০০০।

৯। গাজনোৎসব—বাজিতপুর ২৯শে চৈত্র, লোকসংখ্যা ১২০০।

১০। বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসব—মাদারীপুর (ফরিদপুর) ২২, ২৩শে বৈশাখ, লোকসংখ্যা ৩০০০।

১১। হিন্দু উৎসব—মাণিকহার (ফরিদপুর) জ্যৈষ্ঠ, লোকসংখ্যা ৫০০০।

১২। হিন্দু উৎসব—কোলা (যশোহর) জ্যৈষ্ঠ, লোকসংখ্যা ২০০০।

১৩। শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসব—পুরী ৫, ৬ই আষাঢ়।

১৪। শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব—কলিকাতা (বালিগঞ্জ) ২৩ শ্রাবণ, লোকসংখ্যা ১০০০।

১৫। মিলনমন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব—শ্রীরামকাঠী (বরিশাল) ২১শে আষাঢ় লোকসংখ্যা ৮০০০।

১৬। মহালয়া উৎসব—গয়া, ২৮—৩০শে আশ্বিন।

১৭। শ্রীশ্রীসারস্বত উৎসব—রাজসাহী শ্রীপঞ্চমী।

১৮। যজ্ঞোৎসব—আকিয়াব, চৈত্র লোকসংখ্যা ৭০০।

এতদ্ব্যতীত পেগু, ময়লেম, ইনানজান, টঙ্গী, মেমিও, শিবপুর, স্বরাট, সাহাপাড়া, টাকী, প্রভৃতি বহুস্থানে ছোট ছোট উৎসবাদিও অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, উপসংহারে আবার বলি, হিন্দু ভারতের পুনরভ্যুদয়ের শুভ মহাসঙ্কল্প লইয়াই হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় আন্দোলনের সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট অভিযান। সঙ্ঘ আজ চাহে, মৃতকল্প হিন্দুর শুষ্ক শিথিল অবশচিত্তে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করিতে, খাঁটি হিন্দুত্বের সাধনায় দীক্ষাদান করিয়া এক মহান্ বিরাট শক্তিশালী হিন্দুজাতি গড়িয়া তুলিতে। এ যুগ মহাজাগরণের যুগ, এ যুগ মহাসমন্বয়, মহামিলনের যুগ, এ যুগ মহামুক্তির যুগ। ফিরিয়া দাঁড়াও হিন্দু, ফিরিয়া দাঁড়াও, হিন্দুত্বের সাধনায় দীক্ষাগ্রহণ করিয়া মরণ-পথ রোধ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে সকলে সমস্বরে উদাত্ত কণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া গাও, জয় হিন্দুর জয়, জয় হিন্দুত্বের জয়! শ্রীভগবান জাতির ব্যাকুল প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

ওঁতৎসৎ

স্বামী আত্মানন্দ

শীতের বাঁশী

শ্রীতরলিকা দেবী

ঐ এলো শীত, ঐ এলো শীত,
শিশির ঝরা অন্তরে,
ফুটলো গোলাপ মন্তরে।
উত্তরে বায় পাতা ঝরায়
শীর্ণ প্রাণের কন্দরে,
বসন্তের ঐ আভাস খানি সন্তরে!
হাস্‌চে গাঁদা মল্লিকা ফুল
হাস্‌নাহানার গন্ধ,
রাত্রিবেলায় শিউরে ওঠায়
কার সে গোপন ছন্দ!
অনাগত কার সে বাণী
মেঠোপথে সুর ধরে,
হলদে ফুলের শাড়ীর মাঝে
মৌমাছিরা গান করে!
শীত এলে রে, শীত এলোরে,
মন ক'রে দেয় আন্‌মনা,
ঝরা পাতার তালে তালে
গান জানি কার যায় শোনা!

———

ফুল-তোলা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

খোঁপা যে এলায় !
অমনি কি খ'সে খ'সে পড়িবে হেলায় ?
পথপাশে বেলা শেষ
যেমন-তেমন বেশ ;—
এ কোন্ খেয়াল্ তব আলাভোলা মনেরে খেলায় ?
কখন এসেছ আর কখন বা যাবে ?
এত যে তুলিছ ফুল কী তুমি সাজাবে ?
কার এ মালঞ্চখানি
আগে কি নিয়েছ জানি' ?
—তবে যে নিমগ্ন মন এমন আশঙ্কাহীন ভাবে !
সবারই তোমায় দেখে লাগিবে কি ভালো ;
দেহে সাঁঝ-আবছায়া ছড়াবে কি আলো ?
মুখে যে কথাটি নাই !
করো কি সে-প্রতীক্ষাই,—
দেখিবে সন্ধ্যার পাখী মৌন তব কী সুরে ভরালো ?

দেখো তুমি চেয়ে—
এবারে আঁচোর তব ফুলে গেছে ছেয়ে।
শাখে বাহু-বল্লরী
অমনি কি রবে পড়ি' ?
নবনীকোমল ও যে, নিজ ভারে কাঁপে ব্যথা পেয়ে !
কী বা তুমি দেখো, আর কী যে তুমি করো !
আঁচর যে একদিকে ভুঁয়ে ঝরোঝরো !
চরণের কাছে কাছে
কত ফুল প'ড়ে আছে,
চেয়েও চাহ না ফিরে,' দ'লে ফিরো, এ কেমনতরো ?
তুলিতে ও-ফুল যদি এত মন লাগে,
পরে তুলো' ;—খোঁপা তুমি বেঁধে লও আগে !
প্রসাধনে এত রুচি,
সে সবই কি গেল ঘুচি' ?—
ও-দিকে সখীরা বুঝি দ্বার হতে ফিরিল বিরাগে !

———

ইউগাণ্ডা

বর্ত্তমান সভ্যতার আলোকে দুর্গম আফ্রিকার বহু রহস্যই আজ উদ্ঘাটিত। একদিন যে অনাবিষ্কৃত দুস্তর ভূখণ্ডগুলি আবিষ্কার করিতে যাইয়া বড় বড় মহারথীগণ প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, আজ একজন সাধারণ পর্য্যটকের কাছেও সেই স্থানগুলি অনায়াসলভ্য ও অত্যন্ত সুগম হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন ভূ-পর্য্যটকগণ দুর্লঙ্ঘ্য গিরিবন ও দুর্গম মরুকান্তার ভেদ করিয়া আফ্রিকার যে সব অংশের পরিচয়পত্র দিয়া গিয়াছেন আজ সেখানে নব নব রেলপথ নির্ম্মিত হইয়া নূতন নূতন নামকরণ হইতেছে। ভ্রমণবিলাসী পর্য্যটকগণ এখন হামেসা সেইসব স্থানে যাতায়াত করিয়া অবাধে মনের আনন্দ মিটাইতে পারিতেছেন।

তাঙ্গানিকা ইউগাণ্ডা ও কেনিয়া এই তিনটী প্রদেশ লইয়া বৃটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকা গঠিত। তন্মধ্যে ইউগাণ্ডার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও ও অনন্ত বৈচিত্র্য সত্যই মনোমুগ্ধকর। বহুদেশ ঘুরিয়া একই জিনিষ বহুবার দেখিতে দেখিতে ভ্রমণকারীর মনে স্বতঃই কেমন এক একঘেঁয়ে অরুচির ভাব জন্মে। কিন্তু ইউগাণ্ডায় প্রবেশ করা মাত্র সে অবসন্নভাব আপনি কাটিয়া যায়। প্রকৃতির অফুরন্ত বৈচিত্র্য সেখানে শতধারায় পরিপূর্ণ। কিবা উদ্ভিদ্‌জগৎ কিবা জীবজগৎ সকল ক্ষেত্রেই সেখানকার নিত্যনূতন আবিষ্কার আজিও সভ্যদেশবাসীর চক্ষে পরম বিস্ময় উদ্রেক করিতেছে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শ্যামল তৃণশোভা নানাজাতীয় উদ্ভিজ্জ নানাবর্ণের সুদৃশ্য পুষ্প-শোভা, এখানকার পাহাড় পর্ব্বত, নদনদী, পাখীর গান, সবই চমৎকার এবং অনন্ত বৈচিত্র্যময়। ইউগাণ্ডায় প্রকৃতির নানা

মাসাকার নিকট নাবুগাবো হ্রদ

দিকদেশ ও বহুমুখী বিকাশের একত্র সমাবেশ দেখিয়া বিখ্যাত পর্য্যটক ষ্টেন্‌লী মুগ্ধ হইয়া ইহাকে "আফ্রিকার মণি" এই নামে ভূষিত করিয়াছেন।

সেজিবঙয়া প্রপাত—ইউগাণ্ডা

ইউগাণ্ডায় হ্রদের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। এখানে জলপ্রপাতগুলির অবিরাম বর্ষণ-শব্দ শ্রবণে হৃদয়ে এক গভীর ভাবের সঞ্চার করে। পৃথিবীর প্রাচীনতম নীলনদীর উৎসমুখ ইউগাণ্ডার পাদদেশ বাহিয়া স্ফীত ধারায় ছুটিয়া চলিয়াছে। সে দৃশ্যের সম্মুখীন হওয়া মাত্র অপার্থিব অনুভূতিতে মনোপ্রাণ আচ্ছন্ন করে।

ইউগাণ্ডার দেশীয় লোকদের সহজ সরল জীবনযাত্রা বড়ই অদ্ভুত। ইংরাজ অধিকার করার পর জাতিবিশেষের মতি-গতি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ লোকেরাই সেই আদিম অসভ্যযুগের রীতিনীতি এখনও পালন করিতেছে। বহু প্রাচীনকালের অসভ্য রাজাদের শাসনপদ্ধতি এখনও এখানকার আদিম অধিবাসীদের ভিতর প্রচলিত। অপেক্ষাকৃত সুসভ্য বাগাণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়া যত প্রকারের বর্ব্বর ও অসভ্য জাতি আছে সকলেই এখানে বাস করে। যাহাদের পরিধানে বৃক্ষাদির বল্কল তাহারা সভ্যপর্য্যায়ভুক্ত; আর যাহারা অর্দ্ধ-উলঙ্গাকৃতি বা একেবারেই উলঙ্গ তাহাদের হাবভাব ও ব্যবহার হীনতম অসভ্যতার পরিচায়ক। নীলনদীর পার দিয়া উহাদের বসবাস। রাওএনজোরিতে আবার একদল আদিম অধিবাসী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বামনের বংশবিশেষ; দেখিতে অতিশয় খর্ব্বাকৃতি—ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইউগাণ্ডার প্রাকৃতিক সংস্থানের পরিচয় যতই পাইতেছেন ততই তাহার অজ্ঞাত রহস্যের নব নব সন্ধান করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন। বহুস্থানের অজ্ঞাত সন্ধান বাহির করিয়া অনেক

কাম্পেলায় একটি রাজপথ

নূতন তথ্য তাঁহারা দিয়াছেন ও এখনও দিতেছেন। আবার অনেক জায়গায় এখনও তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে নাই; সেখানকার গাঢ় যবনিকা আজিও অপসারিত হয় নাই।

ইউগাণ্ডায় প্রকৃতি-বৈচিত্র্য কিবা মধুর, কিবা বিরাট,

কোথাও বিস্ময়বিহ্বল ভয়াবহ মূর্ত্তি নানাভাবেই তাহার দৃশ্যপট লইয়া ধরা দেয়। কোথাও দেখিবে বহুদূরবিস্তৃত শ্যামল উন্মুক্ত ভূখণ্ড প্রখর সূর্য্যকিরণে দিক্‌বলয়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; কোথাও অসূর্য্যম্পশ্য নিবিড় জঙ্গল, শ্বাপদসঙ্কুল, দিনের বেলাতেও সেখানে আজ পর্য্যন্ত আলো প্রবেশ করে নাই। আবার এখানকার সুবিপুল পর্ব্বতগাত্র, পাহাড়ের চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া আকাশে উঠিয়াছে; কোন শিখরদেশ বিরাট মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে; সেখান হইতে গৈরিক ধাতু, তপ্ত লাভার উষ্ণস্রাব গলিয়া পড়িতেছে। আবার চতুর্দ্দিকের গভীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কোনও পর্ব্বতগাত্র হইতে জলপ্রপাতের অবিরাম গর্জ্জনধ্বনি শোনা যাইতেছে। সমুচ্চ শিখরদেশ হইতে নিম্ন অধিত্যকায় জলপ্রপাতের এই মধুর দৃশ্য কি মহিমময়!

রিপণ ফল্‌স্—জিঞ্জা

ইউগাণ্ডার উৎপন্ন দ্রব্যাদির ভিতর প্রধান সম্পদ তুলা। ইহা ছাড়া, চিনি, তামাক, লঙ্কা, চীনাবাদাম, কোকো, কফি প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষই এখানে প্রভূত পরিমাণে জন্মে।

বিষুব রেখার ভিতর ইউগণ্ডার অবস্থিতি। সেজন্য এস্থানে সর্ব্বদাই গ্রীষ্মের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। তবে আফ্রিকার অন্যান্য অংশের অপেক্ষা এখানকার গ্রীষ্ম একেবারে অসহ্য নয়; তাপ অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় বিদেশী পর্য্যটকগণ এখানে অনেকটা সুখেস্বচ্ছন্দেই বাস করিতে পারেন। তবে মাথায় রৌদ্র নিবারণের জন্য সর্ব্বদা টুপি কি ছাতা অবশ্য-ব্যবহার্য্য। ম্যালেরিয়ার আশঙ্কাই এখানে খুব বেশী। তাহারও প্রতীকার আছে। রাত্রিতে মশারী খাটাইয়া ঠিক ভাবে শুইতে পারিলে ম্যালেরিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা কম।

পশুপক্ষী শীকারের পক্ষে এস্থানটী খুবই উপযুক্ত। মৎস্য শীকারীরা প্রত্যহ এখানে মাছ ধরিতে আসেন। এখানকার

ইউগাণ্ডার কুম্ভকার

বিখ্যাত এলবার্ট হ্রদের জলে এবং রিপণ জলপ্রপাতের তলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

ইউগাণ্ডার ব্রিটিশগভর্ণমেণ্টের রাজধানীর নাম এণ্টেবী। ভিক্টোরিয়া হ্রদের তীরে অবস্থিত এণ্টেবীর চতুষ্পার্শ্বস্থ

দৃশ্য বড়ই মনোরম। চারিদিকে সবুজ তৃণঘাস। মাঝে মাঝে লাল সুরকীর রাস্তা আঁকা বাঁকা চলিয়া গিয়াছে। সুদৃশ্য পুষ্পোদ্যান ; নানা বর্ণের কত রকমের ফুল। তারি

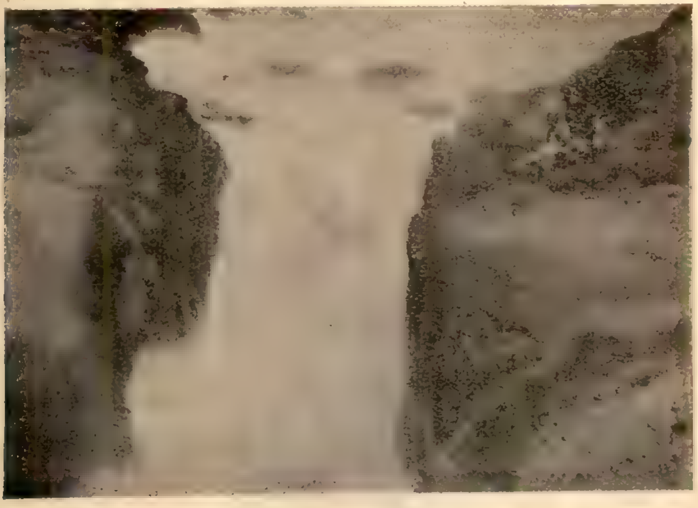

ম্যাচিসান ফল্‌স্—নীল নদী

মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাংলো। বাংলো হইতে সুদূর পাহাড়ের শ্রেণীবদ্ধ চূড়াগুলির দৃশ্য অতীব সুন্দর! সে সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইতে হয়। আবার এখানকার কত রকম যে পাখী তাহার ইয়ত্তা নাই। কলকণ্ঠ পাখীগুলির সুমিষ্ট স্বর শোনামাত্র প্রাণ জুড়ায়।

এন্টেবী ছাড়াইয়া পঁচিশ মাইল পথ মটরে অতিক্রম করিলে কম্পালায় পৌছান যায়। কম্পালা, ম্যাঙ্গো ইউগাণ্ডার দেশীয় রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। এন্টেবীর তুলনায় এই স্থানগুলির লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কারণ সহরের বাজার, বাণিজ্য ব্যবসায় সমস্তই কাম্পালায় কেন্দ্রীভূত।

কাম্পালার অনতিদূরে নেমিরেম্বি পাহাড় দেখা যায়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই রবিবার সেখানে সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টান মিশনারীরা ধর্ম্ম প্রচার করেন। বহুকষ্টে ও বহু অর্থব্যয় করিয়া নেমিরেম্বি পাহাড়ের চূড়ায় প্রথম গীর্জ্জাটী নির্ম্মাণ করা হয়। কিন্তু গীর্জাটি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রবল বাত্যায় গীর্জাটী ভাঙ্গিয়া যায়। পর পর আরও দুটী গীর্জা নির্ম্মাণ করা হয় কিন্তু বজ্রপাত হওয়ার ফলে তাহাও নষ্ট হয়। ১৯১৯ সনে যে গীর্জাটী পুনরায় স্থাপিত হয় উহাই সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। এই নব-নির্ম্মিত গীর্জার পাশে মুটেসার বিখ্যাত সমাধিস্তম্ভ প্রোথিত। মুটেসা ইউগাণ্ডার সমৃদ্ধ রাজবংশীয়ের বহু প্রাচীন আদি রাজা ছিলেন। দেশীয় রাজাকে ইউগাণ্ডার অধিবাসীরা

ম্যাচিসান ফল্‌সের নিকট হস্তিযূথ

"কাবাকা" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কাবাকার রাজভবন ও রাজ্যশাসন সংক্রান্ত প্রধান অফিসগুলি মেঙ্গো পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। নলবনের মত এক জাতীয়

উদ্ভিজ্জ দ্বারা এই বাড়ীগুলির চতুর্দ্দিকে বেড়া দিয়া রাখা হইয়াছে। মেঙ্গো পাহাড়ের নিকটে 'মেকারের' নামে যে পাহাড়টী দেখা যায় সেখানে এখানকার জাতীয় শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। পূর্ব্ব আফ্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় এইস্থানটীতেই এখন পরিবর্ত্তন করিয়া আনা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মুলাগো পাহাড়ে ইউগাণ্ডার চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

বিখ্যাত বিদ্যামন্দিরটী ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ছাড়া কিসুবিতে রোমান্ ক্যাথলিকদের প্রতিষ্ঠিত এক মস্ত কলেজ আছে। পর্য্যটকগণ অতি অল্প সময়ের ভিতরেই অল্প ভাড়ায় মোটরে করিয়া ঐ স্থানগুলি ঘুরিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন।

"রিপন্ ফলস্" নামক সুদৃশ্য জলপ্রপাতটী ইউগাণ্ডার প্রধান সৌন্দর্য্য। এটী স্বচক্ষে না দেখিলে পর্য্যটকের কাছে ইউগাণ্ডা

ম্যাচিসান ফলস্—আবর্ত্তের পরে জলাশয়

ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। জলপ্রপাতের নিম্নে পর্ব্বতগাত্রে অসমসাহসিক প্রখ্যাত ভূপর্য্যটক স্পিকের স্মৃতিতর্পণস্বরূপ এক প্রস্তরফলক খোদিত আছে। ভৌগোলিকের কাছে স্পিকের নাম সত্যই চিরস্মরণীয়। যে সমস্ত ভূপর্য্যটকগণ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া জাঞ্জিবারের ভিতর দিয়া নীলনদীর উৎপত্তিস্থলের সন্ধানে বাহির হইয়া অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন স্পিক্ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাপার ঘটে।

ইউগাণ্ডার প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশ ও সহরগুলির দৃশ্য বাদ দিয়া তাহার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল ছাড়াইয়া একটু দূরে পল্লীর ভিতর প্রবেশ করিলে আরও অনেক ছবি চোখে পড়ে। তন্মধ্যে "রাজার হ্রদ" নামে এক বহুদূর বিস্তৃত জলাশয় আছে। কেম্পেলা-এণ্টবী রাস্তার প্রায় তের মাইল দূরত্ব হইতে "ভিক্টোরিয়া নায়ান্জার" অপূর্ব্ব দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম দেখায়। বম্বো আরও ২৪ মাইল দূরে। এখানে তুলার চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। "কিংস কলেজ" নামক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাটীর মায়া

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার

ধরণীতে এলো আহ্বান,
আকাশ পাঠালো বাণী ;
মৃৎপাত্রে জমা হোলো সুধা ;
মাটীর মানুষ সজীব হলো।

হিমানীসিক্ত শীতের হাওয়ায় চোখ মেলে দেখলো—
এক রূপময় জগৎ—অনির্ব্বচনীয় সুন্দর !
প্রাণে পেলো সাড়া,
অনুভূতি তাকে পরশ দিলো অমৃতের ছন্দের গন্ধের ;
সে চাইলো মাটীতে মিশে থেকে মাটির ধরার-
রূপ রস ছন্দ ও আলো,
প্রভাতের প্রথম অরুণোদয় তাকে দিলো হাতছানি ;
দিকে দিকে সে বেরুলো অভিসারে,
খুলে দিলো মনের দ্বার রঙীন কল্পনার মহলে।
আকাঙ্ক্ষা বাড়ালো ক্ষুধ,
ক্ষুধায় সুধায় মিলে সে হল জড়, স্বভাবের দাস
খেয়ালী মনের খোরাক-জোগানদার।

রথ ছুটালো ধূলা উড়ালো,
গগনে গগনে পবনে পবনে পাঠালো প্রাণের দূত।
এলো বিপর্য্যয়—
এলো ভাঙন ; সন্ধ্যার নিকষ-কালো আঁধার
দুর্জ্জেয় রজনীর বিভীষিকা !
পথ হারালো, দিক গেল ভুলে
চীৎকার করে উঠলো, সাথী ! সাথী !! সাথী !!!
নিস্তব্ধ গভীর আঁধারের ঘনজালে রুদ্ধ পথ ;
ছুটে চলে সে দুর্ব্বার,
জড়িয়ে যায় জালের শিকল চপল চরণে।
বলে, 'আমি বাধাবন্ধনহারা,—
ধরণী, আলোয় আলোকময় কর
আকাশ, তুমি কোটী তারার প্রদীপ জ্বালো,
বাতাস, তুমি গোলাপশাখার বুলবুলির সুর-[illegible]
ব[illegible] আনো,
জাগাও, ঘুমন্ত ধরিত্রীকে জাগাও,
দূর করো এই মৃত্যুর বিভীষিকা,
ভেঙে ফেল ব্যবধানের লৌহকবাট।

পথে যেতে বন্দী,
শোনে তার পথ-চাবাধারে নিঝুম রজনীর
বিরহী শান্ত্রীর পায়চারীর খট খট শব্দ ;
ঝড় বহে,
মেঘের ভেলা ভাসে আকাশে,
বিদ্যুৎ চমকে ;
ভেসে আসে পথ পাশের হেনার ঝাড় হতে
মন মাতানো সৌরভ—দিক ভুলানো,
দেখে, লতার বুকে হেসে উঠেছে হাজার ফুল ;
বলে, নিশীথিনী, থামিয়ে দাও তোমার প্রহরীকে,
চির আকাঙ্ক্ষার সমাধি-সৌধ গড়ে
তুমি কেন মনের দেশে ব্যথার পরাগ ছড়াও,
চোখে লাগাও ধাঁ ধাঁ।
করে—যুদ্ধ মুক্তির নিষ্ফল প্রয়াস,
অবশ হয়ে আসে দেহ;
থেমে যায় হৃদয়ের স্পন্দন,
ঝিমিয়ে আসে উদ্বেলিত মনের আকুতি কাকুতি।

দেখে রজনীর শিথিল কবরী এলিয়ে পড়েছে,
খোঁপায় গোঁজা কুসুম দল পল্লব
ঝ'রে প'ড়ে লুটিয়ে আছে পথের ধুলায়।
তার এক-পিঠ আঁধার কালো কেশের ফাঁকে
সে দেখে পূবের তোরণদ্বারে আলোকের উৎসব!
খুলে যায় পায়ের বাঁধন,
আশে পাশে দেখে অযত্নের ঝরা শেফালীর মেলা ;
শোনে কেয়ার ঝোপে কোকিলের কলগান
সৃষ্টির জয়গান গেয়ে চলে আপন মনে,
ভাবে, আলোর ভুবনখানি বুঝি
চেয়ে আছে মাটীর মানুষের দিকে!
ফুল চয়ন করে মালা গেঁথে,
প্রাণের অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজা দেয় সৌন্দর্য্যের বিপনীতে।
বেদনা-হলুদ কামনার সারা অঙ্গ ভূষিত করে
নিবৃত্তির জড়োয়া অলঙ্কারে।
ভাবে অহঙ্কারকে দিবসের চেতনাকে
অপমান করুক নিশীথের নিভৃতের স্বপ্নমায়া জাল।
আলো ছায়ার বেড়া-ঘেরা কেতকী কুঞ্জে
সে দেয় দোলা
বলে, লতা তুমি ঘিরে থাকো এই
কাঁটা কামনার শ্বেত শতদলকে,
ফুল বলে, ওগো সন্ধানী, মাটীর মমতারসে
তুমি সিক্ত কর সাহারা-পিপাসাকে।

ঘনায় সন্ধ্যা,—
ভাবে বিরহ ব্যাকুল বেদন জাগানিয়া রহস্যদুলালী সন্ধ্যা—
তারপর—
আঁধার শীতল নিস্পন্দ নিশীথিনীর বুকে তার অভিযান,
চেতনার কূলে কূলে ব্যথাহত্যা
মনের চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্ব।
বলে, মন, শেষ কর এই নদী কিনারার
খেয়াঘাটে আনাগোনা—
সাগরের কূলে মাণিক্যের সন্ধান।

দূরে কি যেন এক শব্দ শোনে—!
অশ্রুশিশিরের ক্রন্দন,—
না
মরু-বালুতটে উতলাহাওয়ার আকুতি!
দেখে, আলো হাতে কে যেন
আসে তার দিকে—
দিক্‌ভোলা পথিক ? না! আলেয়া-??
কাছে,—আরো কাছে—
দেখে মাটীর মানুষ আলোকের দেবতা
সৃষ্টির দূত,
বলে, "সাথী, সাথী,
ওগো সাথী মোর!"
ছুটে গিয়ে হাত ধরে,
চমকে উঠে দেখে, তারা-ঘেরা-গগনসম ললাটে
জ্বলে উঠেছে চন্দনটিপ্।
বলে—চীৎকার করে বলে,
"পেয়েছি পূর্ণতা পেয়েছি,—"

কী সুন্দর মৃৎ-পাত্রসম এই মাটীর ধরণী!—
একই মোহনায় সন্ধ্যা সকাল চাওয়া পাওয়া
কান্না হাসি মিলেচে।
আঁধারের মরুভূমিতে আলোকের ঝর্ণাধারা মিশেচে
একই মিলন মোহনায়।
মাটীতে মাটী মিশে হয়েছে সোনা,
দিবস ও রজনীতে মিলে হয়েছে কাল।

ওগো সাথী, আমরা কালের যাত্রী,
দিবসে আমাদের সংগ্রাম,
রজনীতে আমাদের মিলন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মীরাট শাখার মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সিগারেট

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার এম্‌-এ

না, বিলিতি ক্রীম্ নয়, স্নো নয়, হেজ্‌লীন ভেজ্‌লীন ওসব কিছুই নয়। দুধের সর। সারাদিনের পরিশ্রমে আর তাতে মুখ শুকিয়ে গেছে, মুখের ওপরকার ত্বক্ যেন তৃষিত হয়ে উঠেছে স্নিগ্ধ কিছুর জন্যে। বিভূতি মুখে সর মেখে খানিকক্ষণ ব'সে রইল চুপ্‌চাপ্ চোখ বুজিয়ে। তারপর স্নানঘরে গিয়ে সাবান মেখে বেশ ক'রে নেয়ে ফেল্‌লে। মাথায় গাম্‌ছা ঘস্‌তে ঘসতে নিজেকে লক্ষ্য ক'রে আরামে বল্‌লে—আঃ! অর্থাৎ সরের উপকারিতা সম্বন্ধে ঈষৎ সন্দিগ্ধ তার মনকে সশব্দে জানিয়ে দেওয়া হল যে সে একটুও ঠকেনি।

তারপর খাবার। বিভূতি সাগ্রহে খেতে খেতে—আচ্ছা, বাঙালীর সকাল বিকালের জলখাবারের কোনো একটি পদ্ধতি আছে কি? কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি? কিংবা কিছুমাত্র রুচির পরিচয়? নেই। কিন্তু মাকে বল্‌তে গেলেই তিনি বল্‌বেন, 'কত লোক দুবেলা দুটি খেতেই পায় না। তোদের সংসারে সকাল বিকেল খাবারের পাট আছে এইটেই ভাগ্যি ব'লে মানিস্।' মার ঐ রকম। সবেতেই তিনি ঐ ধরণের 'না-খাওয়া' 'মরা' প্রভৃতি এমন কথা টেনে নিয়ে আসবেন যে আর কথা কওয়া চল্‌বে না। মেয়েদের হাতে-তৈরী এই জাতি-গোত্র-কুল-শীলহীন খাবার—এই পরোটার সঙ্গে শাক-ছেঁচ্‌কি আর মুড়ির সঙ্গে ডিমের অদ্ভুত সমন্বয়—আর কখনোই খাওয়া...যাক্, এবারে প্লেটটা নিঃশেষ হয়ে গেছে। কাল সকালে এবিষয়ে বিভূতি তার স্ত্রী বুল্‌বুল্‌কে কড়া রকমের কিছু বল্‌বে। এখন দেখা যাচ্ছে, বৈকালিক প্রসাধন সেরে চওড়া পাড়ের একখানা সাড়ী প'রে বারান্দার হাওয়াকে একটু সুরভিত একটু উৎসুক ক'রে সে এসে দাঁড়িয়েছে—হাতে তার চায়ের পেয়ালা।

চা এনেছ বুল্‌বুল্? ঐ, আবার বুল্‌বুল্ ব'লে ফেল্‌লুম। তুমি কি এখনো বিয়ের আগের সেই খুকিটি আছ যে বুল্‌বুল্ ব'লে ডাক্‌তে যাবো। আর কিসব নাম রাখার ধরণ! একজন মেয়ে বড় হবে, কারুর বউ হবে নিশ্চয়, মাও হবে এক সময়—তাকে নাম দেওয়া হল বুল্‌বুল্! মানায় কখনো? ও হল দশশালা বন্দোবস্তের নাম, দশবছর বয়স্ পর্য্যন্ত চলে। একটা নতুন নাম ভেবে......একি! আমার সিগারেটের কৌটো? এইতো টেবিলে রেখে নীচে গেলুম?

ও, তাহলে—

'ও তাহলে' কি বুল্‌বুল্? খুঁজে দেখ। কি মুস্কিল, কে যে সব তছ্‌নছ্ করে। সারাদিনের পর চা খেয়ে একটা সিগারেট ধরাবো তারো উপায় নেই। কি, পেলে না? উড়ে গেল নাকি ঘর থেকে? ভালো জ্বালাতনে পড়েছি দেখতে পাই। এখন সেই রাস্তার মোড় অবধি দৌড়োই সিগারেট কিন্‌তে।

এখন আর নাই বা খেলে সিগারেট। সারাদিনই তো খাচ্ছ। শুন্‌ছো, এখন আর বেরিয়ো না।

বিভূতি কথাটা কানেই তুল্‌লে না, গম্ভীরভাবে বল্‌লে, ব্যাগ্‌টা দাও।

না, এখন আমি ব্যাগ্ দোবো না। এই না আজ সকালে বল্‌লে সিগারেট ছেড়ে দেবে?

দেরী হয়ে যাচ্ছে বুল্‌বুল্—

মেয়েদের একটা সদ্‌গুণ হচ্ছে এই যে বরাবর কাদার মত নির্ভরশীল থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ একদিন ভুল জায়গায় ও ভুল উপায়ে অসম্ভব দৃঢ়তা নৈতিক সাহস দেখিয়ে ফেলে! যে বুল্‌বুল্ সাধারণত বিভূতি একবার চোখের বৃত্তটা বড় ক'রে চাইলেই, 'বল-না-কি-করতে-হবে?'-গোছের ভঙ্গি করে, সে আজ হঠাৎ অবিশ্বাস্য রকম একগুঁয়ে হয়ে উঠ্‌লো। সজোরে মাথা দুলিয়ে বল্‌লে—না, সত্যি বল্‌ছি, এখন আমি তোমাকে সিগারেট খেতে কিছুতেই দোবো না।

আঃ—সজোরে আওয়াজটা বেরিয়ে এল বিভূতির মুখ থেকে। স্নানঘরেরর 'আঃ' টার চেয়ে এই 'আঃ' টা পুরো এক অক্টেভ উঁচু। তারপর দেয়ালে যেমন ছেলেরা কাগজের ঠোঙা ফাটায়, তেমনি বুল্‌বুলের ওপর একটা কথা ফাটালে, সে কথাটা হচ্ছে—দাও। এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে প্রস্থানোদ্যম। যারা ষ্টেজে ও পর্দায় 'যোগেশ' সাজে, তারাও বিভূতির ভাবভঙ্গি দেখ্‌লে গয়না-কাড়ায় ওস্তাদ হয়ে উঠ্‌তো।

বিভূতির এখন বুল্‌বুলের দিকে লক্ষ্য কর্‌বার সময় ছিল না, কিন্তু আমরা তো তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখ্‌ছি। দেখি, তার চোখদুটো উঠ্‌লো জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্ব'লে, সাধারণত আল্‌গা ঠোঁট দুটো দৃঢ়বদ্ধ হলো, কঠিন অথচ শান্তগলায় বল্‌লে—দাঁড়াও।

একটু বিস্মিত হয়ে বিভূতি দোরটার কাছে দাঁড়ালে। বুলবুল ক্ষিপ্রহাতে বিছানার চাদর তোষক প্রভৃতি উল্‌টে ফেল্‌তে লাগ্‌লো। বিভূতি ভাবলে—ক্ষেপ্‌ল নাকি? কিন্তু হঠাৎ চিক্‌মিক্ ক'রে উঠ্‌লো সেই হল্‌দে রং। আরে এ যে বিভূতিরই গোল্ড ফ্লেকের কৌটোটা!

ঘাট হয়েছে আমার, আমিই মরতে লুকিয়ে রাখতে গিয়েছিলুম। এই নাও।

টেবিলের ওপর কৌটো বসাবার আওয়াজ, দ্রুতগামী বুল্‌বুলের কনুই-দরজা-সংঘর্ষের শব্দ ও দেশলাইএর 'ফ্‌চ্‌স্' যেন একসঙ্গেই শোনা গেল। কুণ্ডলী-পাকানো খানিকটা নীল ধোঁয়া বিভূতি তার রক্তের মধ্যে বন্দী ক'রে ফেলতে লাগ্‌লো—খানিকটা সিগারেটের ডগা থেকে আর বিভূতির নাকমুখ থেকে পালিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছাদের দিকে রওনা হলো।

সিগারেটের প্রথম টানের পর বিভূতি মনে মনে বল্‌লে, বুল্‌বুল্ যেন কি! ছেলেমানুষি করে—একটা সময় অসময় জ্ঞান নেই!

অ'র দুটান্ পরে। আহা, মনে কষ্ট পেয়েছে! কিন্তু আমার দোষ কি?

সিগারেট যখন মাঝামাঝি—নাঃ, একটু আদর ক'রে ওকে প্রফুল্ল ক'রে দেওয়া উচিত। ও তো আমার ভালর জন্যেই…

কিন্তু আর এক মুহূর্ত্ত পরেই বুল্‌বুলের কথা আর মনে এল না।

সিগারেট বেশ জিনিষ!—হাস্‌তে হাস্‌তে—এ আমি ছাড়তে গেলুম কেন, তেমন বোকা নই। সারাদিনের খাটুনির পর কিংবা সংসারের এই সব যত বাজে ভাবনা চিন্তার মধ্যে লোকে যদি এম্‌নি একটা………একি! এর মধ্যে শেষ হয়ে এল যে! এই তো সবে ধরালুম, এর মধ্যে দেড়টা পয়সা—যাক্ গে, আর একটা ধরাই—

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিভূতি সাগ্রহে টান্‌তে লাগ্‌ল। মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লো—গেলই বা দুচার পয়সা। কি এসে যায়! যেমন খরচ করি তেম্‌নি রোজগার ও তো করতে হয়। এম্‌নি একটা কোনো……আরে, কি হল আজ! ব্যাটারা দিন দিন quality খারাপ করছে দেখছি। গলার জ্বলুনি ছাড়া আর তো কোনো লাভ দেখি না। ধ্যেৎ—

সিগারেটের টুক্‌রোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।… দূর হোক্ গে, আর খাব না? যত সব বাজে জিনিষ, না আছে শরীরের কোনো উপকার, না আছে কোনো সুখ—শুধু মিছি-মিছি পয়সা নষ্ট। এর চেয়ে পয়সাগুলো গরীব দুঃখীদের দিলে তারা খেয়ে বাঁচে। আমি খাচ্ছি সিগারেট দিনে পাঁচছ' আনার, আর এমন অনেক লোক আছে যে হয়তো সারাদিনে দুটি খাবার জন্যে একটা পয়সাও পায় না।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শুক্লপক্ষের উৎসাহী চাঁদ পুরোপুরি রাত হবার আগেই এসে হাজিরা দিয়েছে। বারান্দার যে যে জায়গায় বিভূতি বসেছে, সেটা সংসারের এজ্‌মালি থেকে একটু পৃথক, একটু স্বতন্ত্র। একা ব'সে ব'সে বিভূতির মনটা একটু ভাবপ্রবণ হয়ে উঠ্‌লো। এমন সব ভাবনা মনে হুড়মুড় ক'রে এসে ঢুকতে লাগ্‌লো, যা অপ্রীতিকর, অস্বস্তি-জনক! এমন তো কখনো হয় না! বিভূতি ঠিক করলে, আর কিছু নয়, ঐ যে বুল্‌বুল্ হঠাৎ অস্বাভাবিক ধরণের তেজ দেখিয়ে গেল, সেই হল এই চিত্তবিকারের কারণ। কিন্তু এইসব সেন্টিমেন্টালিটিকে তো আর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। ঠিক হয়েছে—এ সমস্যার মীমাংসা—ওয়েল্‌স্ ওয়েল্‌সের একখানা উপন্যাস খুলে বস্‌লেই সব গণ্ডগোল থাম্‌বে।

When the sleeper wakes! এইজন্যেই ওয়েলস্ পড়বার এত ইচ্ছে হয়। বইয়ের নাম শুনলেই নেশা লেগে যায়। বাঃ, বইয়ের নাম হল কি, না, 'যখন ভাঙবে ঘুমন্ত লোকের ঘুম!' বইটা পড়লে তারও হয়তো ঘুম ভাঙবে। সে এখন ঘুমে আচ্ছন্ন নয় একথা কে বল্‌তে পাবে! এই যে সে দিনের পর দিন সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে···

আঃ, আবার! ভালো জ্বালাতনে পড়া গেল। এই ক'রে শেষ অবধি মাথাটি ধ'রে না উঠ্‌লে আর নিষ্কৃতি নেই!

বিভূতি আপনমনে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগলো। শেষে বল্‌লে—কাকে বল্‌লে তা বোঝা গেল না—কিন্তু বেশ শাসিয়ে বল্‌লে—আচ্ছা, দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি—

ব'লে ব্রাউনিংখানা টেনে নিয়ে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বস্‌লে। স্বগত নয়, প্রকাশ্যেই কাকে যেন শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—কেন যে আমরা কবিতা না প'ড়ে উপন্যাস নিয়ে মশ্‌গুল্‌ থাকি, তা বুঝি না। উপন্যাস হল হাঁটুজল, নৌকো ভাসবারও উপায় নেই, ডুব দেবারও নয়। কবিতাই হল গভীর সমুদ্র। এই যে কবিতাটা পড়তে আরম্ভ করলুম, প্রথম লাইনটা পড়তেই মনে সুর লেগে গেল, বাঃ! এখন আর কেউ কিংবা কিছুই আমাকে এটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ওঠাতে পারছে না।......

এই পর্য্যন্ত প'ড়ে বিভূতি হঠাৎ থাম্‌লে। বই থেকে প্রফুল্লভাবে মুখটা তুলে আকাশের দিকে চাইলে। বেড়ে যাক্‌,···এই যেটুকু পড়েছে, সেইটুকুই আবার ঝিম্‌ঝিম্‌ ছন্দে মনকে ব্রুত ক'রে দিক্‌। কই, সেইসব বাজে কথা আর মনে পড়ছে কিছু? কিছুমাত্র না! কারুবে বিদ্রূপ এবং অপমান করতে হলে যেমন হাসি দরকার, নেই ধরণের একটা বাঁকা হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠ্‌লো।

বলো ব্রাউনিং তোমার বাণী। একটি প্রস্তুত সুসংযত মন তোমার সাম্‌নে।······

'খেতে পায় না।'

বিভূতি চম্‌কে উঠ্‌লো। কি, কি হয়েছে? ভ্রূকুটি ক'রে খানিকক্ষণ কি যেন শোন্‌বার চেষ্টা ক'বে আবার বইটা তুলে নিলে।···এই মেয়েটার মত আমার যদি একটা—

'খেতে পায় না!'

এবার বিভূতি স্পষ্ট শুন্‌তে পেলে। এমন অদ্ভুত ব্যাপার বিভূতি কখনো দেখেনি। এই কথাগুলো তার নিজের মাথার মধ্যেই ঝল্‌সে উঠ্‌ছে। অথচ কেমন করে যেন মাথা থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে অপর কারুর কথার মত তারি কানে এসে ঢুকছে! অসুখ, এ একটা সাংঘাতিক অসুখ ছাড়া আর কি হতে পারে! তার মুখ কঠিন হয়ে উঠ্‌লো। বইটা সযত্নে বন্ধ ক'রে টেবিলের ওপর রেখে স্থির প্রতিজ্ঞার ভঙ্গিতে কিসের যেন অপেক্ষায় রইল। তারপর জেরা করবার সুরে বল্‌লে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু কে খেতে পায় না শুনি?

এবারেও সেই এক উত্তর—খেতে পায় না। হাসিও পায়, রাগও ধরে। এ যেন সেই হ্যাম্‌লেটের বাপের ভূতের মত একগুঁয়ে ধরণের কথাবার্ত্তা।

কিন্তু থাম্‌বার উপায় নেই। বিভূতির মনে হল এ আলোচনা শেষ করতে সে বাধ্য। বল্‌লে—বেশ, বুঝলুম, পাগ্‌লা সুরেনদার সেই ছেলেটার কথা বলছ। সেই যে আমাব এক জ্ঞাতি—দেশে থাকে, পরিবার ছেলেকে দুটো খেতে দিতেও পাবে না। তার স্ত্রীকে বলে এসেছিলুম মাসে মাসে দুএক টাকা পাঠাবো।···শুধু সেই বা কেন? আরও অনেকে একবেলা ভাতও খেতে পাচ্ছে না। কিন্তু আমি কি করবো শুনি? পৃথিবীর সব পেট চালাবার ভার একলা আমার ওপরেই নাকি?

সেই সমান একগুঁয়ে উত্তর। বিভূতি রাগে অস্থির হয়ে বারান্দার এদিক্‌ থেকে ওদিক্‌ দৌড়ে বেড়াতে লাগ্‌লো।

ব'য়ে গেছে আমার। যার হরাতে দুঃখ আছে, কেউ সে দুঃখ দূর বরতে পারবে? কেউ খেতে পাচ্ছে না ব'লে যদি আমায় সিগারেট ছাড়তে হয়, তাহলে বুলবুল্‌ দামী সাড়ী আর গয়না পরা ছাড়ুক, মা ব্রত করা আর বামুন খাওয়ানো ছাড়ুক, ঘরের বামুনটাকে ছাড়িয়ে দিই,—এই দোতালা পাকা বাড়ীতেই বা থাকি কি ক'রে? খোলার বাড়ী গিয়ে উঠে বক্রী টাকায় সেই ছেলেটির পড়ার খরচ জোগাই।···কল্‌কাতার সব প্রাসাদ ভেঙে ফেলে তাহলে বস্তিগুলো আগে থাকবার মত ক'রে দাও।

দায় শুধু আমারই, না? কেন, মুখ্যু ছেলেরা বিলেত ঘুরে আস্‌ছে কি ন্যায্য দাবীতে? আমি বিলেত যাবার খরচ পাই না কেন? যে যুক্তিতে আমাকে আমার আত্মীয়পুত্রের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে, ঠিক সেই যুক্তিতে আমার ধনী জ্যাঠামশায়ের কি উচিত নয় আমার পড়ার জন্যে সামান্য সাত আট হাজার টাকা এখুনি আমায় দিয়ে দেওয়া?…হুঁঃ, যা বোঝ না, তাই নিয়ে তর্ক কর বই তো নয়। টাকার বাঁটোয়ারা কি অত সোজা জিনিষ যে আমি সিগারেটের খরচটা কমালেই একটা মীমাংসা হয়ে যাবে? পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই মজায় থাকুক, আর আমি একলা একে ওকে দেখতে গিয়ে নিজের সামান্য একটু সাধ আহ্লাদ সমস্ত নষ্ট ক'রে শেষকালে ম্লান ম্রিয়মাণ একটা কিম্ভুত কিমাকার হয়ে দাঁড়াই! এখনি আমার যদি একটা অসুখ, কি একটা বিপদ ঘটে, আমাকে কে সাহায্য করতে আস্‌বে শুনি?

বিভূতি খুব জাঁকের সঙ্গে আর একটা সিগারেট ধরালে। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে বোধ হল। বাঁচা গেল বাবা, এ এক আচ্ছা বিপদ। বেশ খানিকক্ষণ চুপ্‌চাপ্ ব'সে থেকে অপর পক্ষের আর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। মানে, এতো হতে বাধ্য। ঐসব সেন্টিমেন্টালিটি মায়েদের মুখেই মানায়, তীক্ষ্ণ যুক্তির সামনে ও জিনিস কতক্ষণ দাঁড়াতে পাবে?

কিন্তু না। আবার সুরু হল। এবারে আর সেরকম ভৌতিক হাস্যকর আওয়াজ নয়; এবারে একেবারে বিভূতির চোখের সামনে অদ্ভুতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো সেই জ্ঞাতির ছেলেটার ম্লান মুখ! কানে হেড্‌ফোন্ লাগিয়ে রেডিওর আওয়াজ যেমন শোনায়, মনে হল যেন সেইরকম একটা শব্দের ভূত তার কানে ভেসে আস্‌ছে।

'মা, দুটি মুড়ি দাও না, সেই কখন ইস্কুল থেকে এসেছি, বড্ড খিদে পেয়েছে।'

'মুড়ি তো আজ নেই বাবা। যা, ঐ গাছে উঠে পেয়ারা পেড়ে খেগে যা।'

বিভূতি যেন ক্ষ্যাপালোকের মত রুখে উঠে দাঁড়ালে। বিকৃতকণ্ঠে বল্‌লে—বাঃ, বেশ নকল করা হয়েছে তো? বুজ্‌রুক কোথাকার। থাম্‌লে কেন, এবার মড়াকান্না শোনাও। সেটা আর বাকি থাকে কেন?

খোকা, এই নে, এই চারপয়সায় কিছু কিনে খেগে যা। বৌদি, আমি ওর জন্যে মাসে মাসে কিছু দোব অখন, না খাইয়ে ছেলেটাকে রাখো কি করে?

বিভূতি মুঠো পাকিয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—জানি, জানি, সয়তান। আমার মনে আছে। বুল্‌বুল্, বুল্‌বুল্—

বুল্‌বুল্ মুখ ভার ক'রে এসে দাঁড়াল।

এই দেখ, এই ছুঁড়লুম সিগারেটের কৌটো নর্দ্দমায়। কেমন, হলো তো? হ্যাঁ, এবার এদিকে এসো। এই নাও টাকা, নিয়ে রাখো, বুঝলে? কালই সীতেশকে দিয়ে সুরেনদাকে মণি-অর্ডার করবে।

এইখানেই থাকতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সত্য গোপন করা উচিত ব'লে মনে করি না।…সেই রাত্রেই ঘণ্টা দুয়েক বাদে গোল্ডফ্লেকের কৌটোটা পুনর্ব্বার বিভূতির টেবিলে স্থানলাভ করেছিল।

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

উন্মেষ

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

কিশোরী তুমি লহরী তুলি ফোটোনি দেহ ভরি,
কাঁপোনি থরথরি
অজানা সুখ-বেপথু-বেদনাতে,
তরল দুটি সুনীল আঁখিপাতে
রঙিন মধু রাগের লিখা লেখেনি নব-ভানু,
ব্যথার ভরে হওনি নতজানু।

আমার কাছে আসিলে তুমি সহজ নিজ টানে,
সরম নাহি জানে
তরুণ হিয়া, লুকাতে কিছু নাই,
আগল-হারা ঝরণা ধারা তাই
মানে-না-জানা কথার নুড়ি ভাসায়ে যেন ছোটে,
এমনি করে মরম বাণী ফোটে।

শিথিল-পাতা পুরাণো পুঁথি উলটি কর খেলা,
আলসে কাটে বেলা;
বুঝ না বুঝ পুঁথিটি রাখ কাছে,
কত না কথা তারে যে ভরিয়াছে,
কি যেন নব রাগের তানে করে সে কি আকুতি,
—উতলা করা মধুর অনুভূতি!

প্রাচীন-পুরী আঙিনাগরে গোপনে এস শুধু,
চাতাল করে ধূ ধূ,
আঁধার ঘরে বাদুড় চামচিকে,
প্রাচীর ভেঙে পড়েছে দিকে দিকে,
ফাটল ফাঁকে অশথ শাখে নবীন কিশলয়
নয়নে তব স্বপন বিরচয়।

দেউল ঘেরা শালের বনে একেলা বসি শাখে
দুপুরে ঘুঘু ডাকে,
অধর কোণে রাখিয়া হাতখানি,
কপোত মুখে বনের মনোবাণী
দাঁড়ায়ে শোন, অচল আঁখি, অধর আধো-খোলা,
আঁচোলে চুলে বায়ুর মৃদু দোলা।

সে বীথিপথ বিথার ভরি বিতত ঝরা পাতা
ধূলিতে গুঁজি মাথা
মরণাহত পড়িয়া ছিল যারা
হারানো বাণী ফিরিয়া পেল তারা,
শতধা ভাঙা দলিত বুকে ললিত মরমর
জাগায়ে তুলি চল যে পথপর।

বনের ফাঁকে গগন পারে ভূধর মেঘমালা
নভের নীলে ঢালা,
বনের বুকে কাজল দীঘিটিরে
তমাল-তরু-বলয়ে আছে ঘিরে।
গভীর হ্রদ কিনারে আসি দাঁড়ায়ে এলোচুলে
সহসা যেন নিজেরে যাও ভুলে।

বসনখানি সে ভাঙা ঘাটে ফেলিয়া অনায়াসে
গাহন সুখ আশে
দীঘির জলে সাঁতার নাহি জানি
ঝাঁপায়ে পড়, নহত সাবধানী।
রাণার নীচে নিকষ-কালো অচল জলরাশি
তোমারে লয় গ্রাসি'।

দীঘির কূলে বেতস লতা ঝুঁকিয়া পড়ে জলে,
কঠিন করতলে
আঁকড়ি তারে ধরিয়া বাহু তার
তটের পরে উঠাও দেহ ভার।
তরাসে তব সারাটি দেহে উথলে বিভীষিকা,
পবনে যেন শিহরে দীপশিখা।

অচিরে যবে ভাঙিল ভয় কঠিন মাটি পরে,
হেব সে সরোবরে
কমল-দল মেলিল শত আঁখি,
তমাল শাখে গাহিল শত পাখী,
আপন দেহ-তটের পরে লহরী-মালা জাগে,
ফুটিলে বালা নবীন অনুরাগে।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীদের আর্থিক অবস্থা

শ্রীপঞ্চানন ভৌমিক

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীদের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা অসম্ভব না হইলেও দুঃসাধ্য। সরকারী বা বেসরকারী এমন কোনো পুঁথিপত্র বা প্রতিষ্ঠান নাই যার মারফতে ইহার তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মের আদমসুমারীর বিবরণে বাঙ্গালীদের কথা বিশেষ করিয়া কিছু পাওয়া যায় না। ভারতীয়দের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে বাঙ্গালীদের সংখ্যা ব্যতীত আর কিছু উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

কিন্তু বাঙ্গালীদের আর্থিক জীবনের অঙ্কপাত করা দুঃসাধ্য হইলেও ভারতীয়দের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে তাহার আভাস কিছু কিছু পাওয়া যায়। যেহেতু ব্রহ্মদেশের বৈষয়িক জীবনে ভারতীয়দের স্থান মোটামুটি নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। তাহাতে বাঙ্গালীর স্থান কোথায় কতটুকু আছে জানা কঠিন হইলেও, কোথায় কতটুকু নাই তাহা জানা অপেক্ষাকৃত সহজ। সুতরাং নিতি নিতি করিয়া বাঙ্গালীর স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে।

১৯৩১ সনের আদমসুমারী অনুসারে ব্রহ্মদেশের লোক সংখ্যা হইতেছে ১,৪৬,৬৭,১৪৬। তন্মধ্যে ভারতীয় জাতি সমুচ্চয়ের জনসংখ্যা ১০,১৭,৮২৫। অর্থাৎ শতকরা ৭ ভাগের কিছু কম। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী জাতির লোক সংখ্যা ৩,১৭,৩৬৩ অর্থাৎ একতৃতীয়াংশের কিছু বেশী। ভাষা হিসাবে গণনায় বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা পাওয়া যায় ৩,৭৬,৯৯৪। অর্থাৎ যাহাদের বাঙ্গালী বলিয়া ধরা হইয়াছে তাহারা ছাড়া আরও ৫৯,৬৩১ জন লোক বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই বঙ্গভাষাভাষী অবাঙ্গালীরা যে প্রধানতঃ তথাকথিত "জেরবাদী" সম্প্রদায়ের লোক এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। "জেরবাদী" নামের বুৎপত্তিগত অর্থ জানা নাই। তবে ইহারা ভারতীয় মুসলমান পিতা ও ব্রহ্মদেশীয়া মাতার সন্ততি বলিয়া প্রসিদ্ধ। আরাকানের জেরবাদীগণ বাঙ্গালী মুসলমানের সন্তান। তাহা ছাড়া "আরাকানী মুসলমান" ও "আরাকানী কামান" নামক আরও দুইটী উপজাতি আছে, যাহাদের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ বাংলাভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। আরাকানী মুসলমানেরা জেরবাদীরই সমশ্রেণীর। সেন্সস-রিপোর্ট অনুসারে, আরাকানী কামান-এরা "are the cescendents of the followers of Shah Shuja, son (!) of Aurangzebe, who fled to Arakan in 1660 A. D."

এখানে বলা আবশ্যক যে ব্রহ্মের সেন্সাস রিপোর্টে বাঙ্গালী জাতিকে "বাঙ্গালী" ও "চট্টলবাসী" এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ইহার কোনো কারণ নাই, তবে কর্ত্তারা বলেন, এতে কোনো ক্ষতিও নেই, (no harm done)। উপরের গণনায় বাঙ্গালীর যে সংখ্যা লওয়া হইয়াছে, তাহা এই দুই বিভাগের সংখ্যার সমষ্টি।

বাঙ্গালীদের মোট সংখ্যা ৩,১৭,৩৬৩।

ইহার মধ্যে ২,১২,৫৯৪ জন পুরুষ. মুসলমান ১,৮৫,৯৩৬; হিন্দু ২৩,০৫১; বৌদ্ধ ৩,৩১৭; খৃষ্টান ২২৮ এবং অন্যান্য ৬২।

বাঙ্গালী নারী চতুর্ব্বর্গের মধ্যে অপর ত্রিবর্গলাভের সহায় হইলেও সাধারণতঃ অর্থলাভের সহায় হন না। সুতরাং বর্ত্তমান আলোচনায় তাঁহাদের বাদ দেওয়াই সঙ্গত।

উপরোক্ত দুইলক্ষাধিক বাঙ্গালী পুরুষের মধ্যে ১ লক্ষ ৪০ হাজার প্রকৃত প্রস্তাবে "প্রবাসী"। বাকী ৭০।৭৫ হাজারের এই দেশেই জন্ম। ব্রহ্মদেশের আর্থিক জীবনে এই দুই লক্ষাধিক বাঙ্গালীর স্থান কোথায়? ভূমি, মূলধন ও শ্রম এই তিনটী আর্থিক জীবনের ভিত্তিস্থানীয়। এই তিনের

মালিক যাঁহারা তাঁহারাই জাতীয় জীবনের নিয়ন্তা। কিন্তু এই তিনের সমন্বয়ে জাতির আর্থিক জীবন গঠিত হইলেও সর্ব্বত্র সকল সময়ে ইহাদের সমান প্রাধান্য হয় না। মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথমে ভূম্যধিকারীর, পরে ধনিকের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। আবার আধুনিক যুগে দেশে দেশে শ্রমিকের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে ও হইতেছে। ব্রহ্মদেশে বাংলার মতো জমিদারী প্রথা নাই। এখানে সরকারই হচ্ছেন ভূস্বামী। এদেশ বিশেষভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক সত্বাধিকারীর (Peasant proprietors) দেশ হইবার উপযুক্ত বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন। কিন্তু এই আদর্শ ঠাহর করিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধের পর (ইং ১৮৫২) ভারত সরকার একদা ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে চাষীদের আমদানী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য "relieving specially congested tracts in India by transferring the indigent population of those parts of (to ?) Burma and promoting the wealth of Burma by developing the cultivation of tracts lying waste and unproductive..." তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ইং ১৮৮৯ সালে পুনরায় বেসরকারী ধনিকদের উক্ত কার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য নিয়ম কানুন প্রনয়ণ করা হয়। ফলে দুইটী জমিদারীর সৃষ্টি হয়। একটী পেগুজেলায় ও অপরটী টাংউ জেলায়। প্রথমটীর মালিক একজন শ্বেতাঙ্গ; দ্বিতীয়টীর মালিক বিহার প্রদেশের রায় জয়প্রকাশ লাল বাহাদুর C.I.E.। ইহার জমিদারী Zeyawaddy (জয়াবতী ?) grant নামে খ্যাত; জমিদারীর পরিমাণ ১৫,০০০ একর; প্রজার সংখ্যা ৫০০০, অধিকাংশই বিহারের সাহাবাদ জেলার লোক। ইহারা "live in selfcontained Hindu villages, influencing but little, and influenced but little by, the Burmese life surrounding them."

যে নীতির ফলে উক্ত জমিদারীর সৃষ্টি হয়, সে নীতি বহুপূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং ঐ শ্রেণীর জমিদারীর আর উদ্ভব হয় নাই। কিন্তু ইদানীং আর এক কারণে অন্য এক শ্রেণীর ভূস্বামীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা প্রায় সকলেই মান্দ্রাজের চেট্টিয়ার বা চেট্টি সম্প্রদায়ের লোক। ইহাদের প্রধান ব্যবসা ব্যাঙ্কিং। ব্রহ্মদেশে ইহাদের যে টাকা খাটিতেছে তাহার পরিমাণ প্রায় ৭৫ কোটি। জমি বন্ধক রাখিয়া ইঁহারা টাকা ঋণ দিয়া থাকেন। এই সূত্রে কোনো কোনো স্থলে দেনাদারের অক্ষমতার ফলে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভূম্যধিকারী হইয়া পড়িয়াছেন। এবং জমিতে প্রজাপত্তন করিয়া চাষ-আবাদ করিতেছেন। ব্রহ্মদেশের মোট জমির তুলনায় ইঁহাদের অধিকৃত জমির পরিমাণ সামান্য হইলেও, এইরূপে জমি স্বদেশী কৃষকের হাত হইতে বিদেশী অকৃষক শ্রেণীর হস্তগত হওয়াতে সরকার ও ব্রহ্মদেশীয় নেতৃগণ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। সম্প্রতি Joint Select Committee এই সকল "money lender" দের ভবিষ্যতে (অর্থাৎ separation এর পর) ব্রহ্মদেশে অবাধে আসিতে দেওয়া সঙ্গত নয় বলিয়া রায় দিয়াছেন।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্মদেশে ভূম্যাধিকারীর কোঠায় বাঙ্গালীর স্থান নেই বলিলেও চলে।

অবশ্য কোনো কোনো জেলায় দুই একজন বাঙ্গালী উকীল লগ্নি কারবার করিয়া অথবা ক্রয় করিয়া কিছু খানি জমির মালিক হইয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। তবে সমগ্রের তুলনায় তাঁহাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ যে তুচ্ছ এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

যে সকল যৌথ কোম্পানীর প্রধান কর্মক্ষেত্র ব্রহ্মদেশ তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৩০০। উহাদের মোট আদায়ী মূলধন (Paid up capital) সাড়ে পঁচিশ কোটি টাকার উপর। এই মূলধনে বাঙ্গালীর অংশ ৩০।৩৫ লক্ষের অধিক নহে। তার মধ্যে ২৫ লক্ষই এক Bengal Burma Steam Navigation কোম্পানীর। এই কোম্পানী চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত আব্দুল বারী চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় স্থাপিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা Scindia Steam Navigation Co'র তত্ত্বাবধানে (Managing Agency) চলিয়া গিয়াছে। ত ছাড়া আর একটী মাত্র বাঙ্গালী কোম্পানীর নাম উল্লেখযোগ্য।* ইহারা Mergui এর 'পাল ব্রাদার্স'। ১৯১৪ সালে ১ খানা লঞ্চ ও ২০,০০০ টাকা মূলধন লইয়া ইঁহারা লঞ্চ-চালনা আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে ইঁহাদের

মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ৫ খানি steam launch ও ১ খানি motor launch আছে। তা ছাড়া নিজস্ব ডক্, ওয়ার্কস‍্প, জেটি, পন্টুন প্রভৃতি আছে। ইঁহাদের কারবারে ৮৮ জন লোক খাটে—তার মধ্যে ৫৮ জন বাঙ্গালী, অধিকাংশ মুসলমান। সত্বাদিকারীগণের আদি নিবাস চট্টগ্রাম। (১) শ্রীযুক্ত পালব্রাদার্স সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদের জন্য আমি Mergui এর উকীল শ্রীযুক্ত জে, এল, দাস মহাশয়ের নিকট ঋণী।

সমগ্র ব্রহ্মদেশে ২০ জনের অন্যূন লোক খাটে এরূপ কারখানার সংখ্যা ৮০০এর উপর। এই সকল কারখানায় দৈনিক মোট প্রায় ১ লক্ষ লোক খাটে। বাঙ্গালীরা এর মধ্যে মাত্র ১০।১২টী কারখানার মালিক। তাহাতে দৈনিক মোট ৪৫০।৫০০ লোক খাটে। ইহা হইতে তাহাদের আয়তন ও গুরুত্ব অনুমান করা যাইতে পারে।

ব্যাঙ্কিং ও মাহাজনি ব্যবসায়েও বাঙ্গালীর অবস্থা অস্তিহীন। যদিচ এদেশের স্বদেশী (indigenous) ব্যাঙ্ক সবই ভারতীয়দের হাতে। দেশী ব্যাঙ্কার্সদের মধ্যে চেট্টিয়ার সম্প্রদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তার পর মাড়োয়ারী, মুলতানী, গুজরাটী। চেট্টিয়ারদের ৭৫ কোটি টাকা এদেশে খাটিতেছে। ইঁহারাই এদেশের কৃষকগণের প্রধান সম্বল। ইঁহারা সাক্ষাৎভাবে প্রতিবৎসর কৃষকদের যে অল্প-মেয়াদী ঋণ দেন তাহার পরিমাণ প্রায় ১২ কোটি টাকা। সরকার মাত্র লাখ দুই টাকা দিয়া থাকেন। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদাতৃগণের মধ্যেও নিঃসন্দেহ চেট্টিয়ারগণ প্রধান। ব্রহ্মদেশের আমদানি রপ্তানির কারবার বড় বড় বিদেশী কোম্পানীর হাতে। তাহাদের নিজেদের যথেষ্ট মূলধন আছে। তবে প্রয়োজন হইলে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চেট্টিয়ারদের নিকট ঋণ গ্রহণ করেন।

এই সকল ব্যাপারে বাঙ্গালীর নামগন্ধ নেই। কেবল মাত্র ছোট ছোট দোকানদারদের যাঁহারা টাকা যোগান তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই নিম্নস্তরের মহাজনদের মধ্যেও বাঙ্গালীর স্থান কোথায় দেখুন। যথা, পেগু জেলায়, শতকরা—

চীনা	৩০ জন
ব্রহ্মদেশীয়	২০ জন
চেট্টিয়ার	৪০ জন
অন্যান্য ভারতীয়	১০ জন
	১০০

বাঙ্গালীরা দশজনের একজন!

ভূম্যধিকারী গেল, কারখানার মালিক গেল, ব্যাঙ্কার ও মহাজন গেল, বাকী রহিল উকিল, ডাক্তার মাষ্টার আর মুদী, চাষী, মজুর, খালাসী, কেরানী। উকীল ব্যারিষ্টারের মধ্যে দু'চার জন প্রতিষ্ঠাবান বাঙ্গালী আছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মজীবনের উপান্তে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহাদের স্থান পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা হয় না। ডাক্তার ও মাষ্টারের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। ৩।৪ জন বাঙ্গালী Civil Surgeon ছিলেন ও আছেন। ২ জন বাঙ্গালী সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ৪।৫ জন কলেজের অধ্যাপক আছেন। মোটের উপর এই সকল পর্য্যায়ের বাঙ্গালীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সংবাদপত্রসেবীর মধ্যে মাত্র একজন বাঙ্গালী আছেন। তিনিও আসামী।

মুদীর মধ্যে অধিকাংশই চুলিয়া মুসলমান, মাদ্রাজ প্রদেশের লোক। রেঙ্গুণ সহরে দু'চার জন বাঙ্গালী আছেন। কাপড়, জুতা ও ষ্টেশনারীর দোকানও বাঙ্গালীদের কয়েকটী হইয়াছে। সম্প্রতি দুইটী বাঙ্গালী মিষ্টান্নের দোকান হইয়াছে।

চাষীর মধ্যে বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৭০।৭৫ হাজার হইবে। ইঁহারা অধিকাংশই চট্টগ্রামের লোক। এবং প্রধানতঃ Akyab জেলায় ইঁহাদের বসতি। আমহার্ষ্ট, তাঠোন প্রভৃতি জেলায়ও কতক কতক আছে।

সমগ্র ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী মজুরের সংখ্যা পাওয়া কঠিন। তবে রেঙ্গুণের চাউলের কলসমূহে ২০০০ এবং করাতকলে ৮৫০ জন বাঙ্গালী মজুর কাজ করে। ইহারা সবই চট্টগ্রাম বাসী। রেঙ্গুণের অনুপাতে হিসাব করিলে সমগ্র ব্রহ্মদেশে চাউলের কলে ৭০০০ এবং করাত কলে ১৭০০ বাঙ্গালী মজুর ধরা যায়। যে হেতু রেঙ্গুণের চাউলের কলে যত মজুর কাজ করে, সমগ্র দেশের চাউলের কলে তার ৩॥ গুণ সংখ্যক

মজুর কাজ করে। আর রেঙ্গুণের করাত কলে যত মজুর কাজ করে, সারা দেশের করাতকলে কাজ করে তার দ্বিগুণ সংখ্যক মজুর।

চালানি নৌকার মাঝিদের অধিকাংশ তেলেগু, তবে চট্টগ্রামের মুসলমান দু'চার জন আছে।

জাহাজঘাটের কুলীরা প্রায়ই গোদাবরী ও কৃষ্ণা জেলার লোক।

রিক্স-চালক সবই তেলেগু।

ডক ইয়ার্ড ওয়ার্কসপ প্রভৃতি কারখানায় প্রায় ৬০০ চট্টগ্রামী কাজ করে। Irawaddy Flotilla Co'র জাহাজের মাঝিরা অধিকাংশই চট্টগ্রামী। Rangoon Post Commissionersদের জাহাজেও প্রায় ৬০০ শত চট্টগ্রামী কাজ করে। Rangoon Electric Tramways Co তে ২৫০ চট্টগ্রামী কাজ করে। এ ছাড়া রেঙ্গুনেই প্রায় ৫০০০ চট্টগ্রামী সামপান-ওয়ালা আছে। রেঙ্গুণের বাহিরে অন্যান্য বন্দরেও মোট হাজার খানেক আছে। ইহারা প্রায় সকলেই মুসলমান।

ধাঙ্গড়েরা শতকরা প্রায় ১০০ জনই মান্দ্রাজী ও পাঞ্জাবী।

নাপিত, ধোপা ও দুধওয়ালার মধ্যে অনেক বাঙ্গালী আছেন। তবে তাঁহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। ইহারা সবই হিন্দু।

রাঁধুনীর মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির লোকেই আছে।

পাউরুটী বিস্কুট প্রভৃতি যাঁহারা প্রস্তুত করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেক বাঙ্গালী মুসলমান আছেন।

দরজীর মধ্যেও অনেক বাঙ্গালী মুসলমান আছেন। দু'চার জন হিন্দুও আছেন। এ সকল ছাড়া Insurance Agent ও canvasser দের মধ্যে অনেক বাঙ্গালী দেখতে পাওয়া যায়। ঠিকাদারী কাজেও অনেক বাঙ্গালী দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই শেষোক্তদের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে।

বাকী সবই কেরাণী। দুই চার জন উচ্চ সরকারীপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন এইমাত্র।

শ্রীপঞ্চানন ভৌমিক

পূর্ণিমা-রাতে

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

তোমায় আমায় দেখা হ'ল যবে মধু-পূর্ণিমা রাতে,
পরম-লগ্নে পৃথিবীর বুকে সবুজের প্রাঙ্গণে;
দু'জনার লীলা পড়েছিল ধরা আকাশের আঁখি পাতে—
দেখেছিল চাঁদ মালা-বিনিময় ঈর্ষা উতলা মনে।

চাঁদের আবার ঈর্ষা বেদন? মনে মনে ভাবো বুঝি
জ্যোৎস্না যে তা'র দীর্ঘ নিশাস একথা কি তুমি মানো?
বুকের কালিমা অপবাদ তা'র নিঃস্ব জীবনে পুঁজি
বঞ্চিত তা'র নিঃসীম আশা তুমি কিবা তার জানো;

তোমার আমার এ মিলন রাতে তাই দূরাকাশে বসি'—
তারা-পরীদের ছলনায় কাঁদে ছল ছল চোখে শশী,
ঝরা-কুসুমের রেণু উড়ে যায় দূর বিরহের বনে—;
ওগো ভীরু মেয়ে, ভয়ে ভয়ে আমি তোমারে জড়ায়ে ধরি
আঁখি দিয়ে আঁখি ঢেকে রাখি তব সেই সে পরম ক্ষণে;—
পাছে গো হারাই তাই মনে হয় দু'জনাতে যেন মরি।

———

দেশাধিপের মৃত্যু

ডাঃ সোমনাথ সাহা এম্‌-বি

দেশাধিপের মৃত্যুশয্যা।

কিন্তু ঘর নীরব নয়। বহু লোক ধীরে ধীরে সংযত পদক্ষেপে সেই ঘরে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা মরণোন্মুখ রাজার নিস্পন্দ দেহের দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে পরস্পরের নিকট পরস্পরের শোকের প্রাচুর্য্যের প্রমাণ দিতেছে এবং অতি ধীরে বাহির হইয়া যাইতেছে। এতলোকের একত্র সমাবেশে অতি সাবধানতা সত্ত্বেও বেশ একটু চাপা কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন যে রাজার আর কিছু শুনিবার ক্ষমতা নাই। রাজার নিস্পন্দ দেহ দেখিয়াও সেই কথাই মনে হইতেছে। তাঁহারই সুন্দরী স্ত্রী তাঁহার পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িয়া যে মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, তাহা আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না।

দিনের পর দিন সেই ঘরের আলো ম্লান করিয়া রাখা হইত। এখন এই শোকের আতিশয্যে আলো কম করিয়া রাখার কথা সবাই ভুলিয়া গিয়াছে। উজ্জ্বল আলোকে মরণোন্মুখ রাজার অসুবিধা হইবার কথা কাহারও মনে পড়িতেছে না।

কিন্তু তাহাতেও কিছু আসে যায় না। চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন যে রাজার চোখে আর আলো দেখিবার শক্তি নাই। মৃত্যুর কালো ছায়ায় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ঢাকিয়া আসিতেছে

কতদিন হইতে শুশ্রূষাকারী ছাড়া আর কেহ রাজার ঘরে আসিতে পারিত না। কিন্তু আজ রাজার মৃত্যুকক্ষের দ্বার সাধারণের কাছে উন্মুক্ত। কিন্তু তাহাতে কোন অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন রাজার বোধশক্তি আর নাই।

ধীরে ধীরে রাজার আয়ত চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গেল। ধীরে ধীরে রাজার বক্ষের স্পন্দন মৃদু হইতে মৃদু হইয়া আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

দর্শকেরা তাঁহার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে নম্রস্বরে বলিতে লাগিল তাঁহাকে কি সুন্দর দেখাইতেছে।

ধীরে ধীরে আলো নিভিয়া গেল।

রাজা যখন অনুভব করিতে পারিলেন, তখন চারিধারে মূক নীরবতা বিরাজ করিতেছে। কি অপরূপ মধুর নিস্তব্ধতা, কি সুন্দর নিঝুম অন্ধকার। তিনি যেন অমরাপুরীতে শুইয়া আছেন। চারিদিকে স্নিগ্ধ পুষ্পসৌরভ। দূরের একটি মুক্ত বাতায়নপথে শীতল নৈশ সমীর শান্তি বহন করিয়া আনিতেছে। অতিদূরে একটি ম্লান দীপশিখা। তাঁহার মুখ খোলা। যে কয়েকজন প্রহরী তাঁহার দেহরক্ষা করিতেছিল, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

দূরে ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে পড়িল, যখন মৃত্যুর শিথিল স্পর্শ তাঁহার চেতনায় সুপ্তি-প্রলেপ মাখাইয়া দিতেছিল এবং তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া এই অসময়ে জীবনের হিসাব-নিকাশ মিটাইবার তাগিদকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন,—তখন যেন তিনি শুনিতে পাইলেন কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে—"তুমি তোমার মৃত্যুকে তোমার নিজের প্রতি ও তোমার প্রজাদের প্রতি ঘোর অবিচার বলিয়া মনে করিতেছ। আমি তোমাকে আরও একঘণ্টা বাঁচিবার সময় দিলাম। ইহার মধ্যে যদি তুমি এমন তিনটি লোক খুঁজিয়া বাহির করিতে পার যাহারা তোমার বাঁচিয়া থাকা চায়, তাহা হইলে তুমি মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইবে।"

মৃত্যুর গ্রাস হইতে তিনি এই একটি ঘণ্টা ফিরিয়া পাইয়াছেন। তাঁহাকে আর মরিতে হইবেনা। কারণ

তাঁহাকে জীবিত চায় এমন তিনটি লোক কেন তিন লক্ষ লোক তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে খুঁজিয়া পাইবেন। তিনি অতি সৎভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছেন। দিবারাত্র প্রজাদের সুখের জন্য তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন। নিজের স্বার্থের দিকে তিনি ফিরিয়া চান নাই। তিনি দেশকে ভালবাসিতেন প্রজাকে ভালবাসিতেন। ধনী দরিদ্রে তিনি পার্থক্য করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুশঙ্কায় দেশবাসী সবাই শোকে মগ্ন।

ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনি ভাবিলেন—প্রথমে কোথায় যাই? রাণীর কাছে? না! রাণীর শোকের প্রাচুর্য্যের সম্ভাবনাতেই রাজার বুকে যেন শেল বিঁধিতে লাগিল। না—এখন না! তিনি মৃত্যুজয় করিয়া রাণীর নিকট যাইয়া তাঁহার শোকাশ্রু মুছাইয়া দিবেন। তখন তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া মৃত্যুজয়ের কাহিনী শুনাইয়া তাঁহার মুখের হাসির অরুণোদয় দেখিবেন। এখন না। একঘণ্টা মাত্র ত? বারটা বাজিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যুর পরোয়ানা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যাইবে। সেই সম্ভাবনায় তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তিনি সহরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আদরের রাজধানী শুভ্রজ্যোৎস্নার রজতধারায় স্নান করিতেছে।

রাজপ্রাসাদের তোরণের অনতিদূরে একটি ছোট শিশু কাঁদিতেছিল। দ্বাররক্ষী প্রহরী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল সে কাঁদিতেছে কেন?

সে কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর দিল রাজার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাহার পিতামাতা তাহাকে ফেলিয়া রাজপ্রাসাদে চলিয়া গিয়াছে। তাহার খাওয়া হয় নাই। তাহার খেলার পুতুল ভাঙিয়া গিয়াছে। যদি রাজা না মরিতেন, ত বেশ হইত। সে আবার কাঁদিতে লাগিল।

রাজায় হাসি পাইল! এই তাঁহার প্রথম শিশু প্রজার সাক্ষাৎ পাইলেন যে তাঁহার জীবন কামনা করিতেছে। সময় থাকিলে তিনি তাহাকে একটু আদর করিতেন। তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ বন্ধুর গৃহের দিকে চলিলেন। বন্ধু বেচারীর বৃথা শোকের সম্ভাবনায় তাঁহার বেশ আমোদ বোধ হইতে লাগিল। বেচারী নিশ্চয় শোকে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আর কিছুক্ষণ বাদেই সে বুঝিতে পারিবে যে রাজা আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। সে নিশ্চয় খুব খুসী হইবে। তাহার যে কি গভীর কষ্ট হইতেছে, রাজা তাহা অনুভব করিতে পারিতেছিলেন। কারণ তাঁহার মৃত্যুর বদলে যদি এই বন্ধুর মৃত্যু হইত তাহা হইলে তিনি শোকে যে পাগল হইয়া যাইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বন্ধুর গৃহদ্বারে কিন্তু শোকের চিহ্ন বড় দেখা গেল না। বরং কিসের জন্য যেন সবাই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, এঘর সেঘর ঘুরিলেন। কিন্তু বন্ধুর দেখা পাইলেন না। তাঁহার ভয় হইল। তাঁহার শোকে বন্ধু আত্মহত্যা করে নাই ত? ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে এক বন্ধ্বাব গুপ্তগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন এক যোদ্ধৃবেশী পুরুষ ও একটি মহিলা কথা বলিতেছেন। তাহার নিজের ছবি ছিন্ন অবস্থায় ধুলায় লুটাইতেছে।

পুরুষটী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা?"

মহিলাটি উত্তর দিলেন "তিনি এইমাত্র নূতন রাজাকে সম্মান দেখাইতে গিয়াছেন। মৃত রাজার সহিত তাঁহার মৌখিক সৌহার্দ্দ্য ছিল বলিয়া বর্ত্তমান রাজা তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে পারে। তাই সবার আগে সে নূতন রাজার নিকট মৃতরাজার মৃত্যুতে তাঁহার আন্তরিক আনন্দের খবর জানাইতে গিয়াছেন।

আর অধিক শুনিবার প্রয়োজন হইল না। রাজা দ্রুতপদে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন দূর হোক, এই সব রাজনৈতিক খেলোয়াড়কে ছাড়িয়া দিয়া আমি আমার প্রজাসাধারণের কাছে যাই। তাহাদের জন্য আমি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছি। তাহারা আমাকে নিশ্চয়ই ফিরিয়া চায়।

তিনি যেখানে পূর্ব্বে গোপনে যাইয়া যে রোগ তাঁহার মৃত্যুর কারণ সেই সংক্রামক ব্যাধি লইয়া আসেন, সেইখানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা ত তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয় জানে।

পাঁচছয় জন লোক সেখানে জটলা করিয়া মদ খাইয়া হল্লা করিতেছিল।

একজন বলিতেছিল—বাঁচা গেছে ভাই, বাঁচা গেছে। রাজাব্যাটা মরেছে না, আমরা বেঁচেছি। বেটা বলত মদ

খেওনা। আরে, আমরা খেটে খাই, মদ না খেলে খাটব কেমন করে?

আর একজন বলিল—আরে ছোঃ! ছেড়ে দাও বেটা আহাম্মুকের কথা! রাজা হয়ে যদি রাজার মতন না হবি, তাহলে আর রাজা হয়ে ফলটা কি?

আর একজন বলিতেছিল—মরুকগে ব্যাটা। আমাদের কারখানায় ত ছুটি হ'ল। নতুন রাজার অভিষেকের দিন একটা দস্তর মতন খ্যাটও জুট্‌বে!

রাজা সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। হায়রে ইহাদের ভালর জন্য তিনি কি না করিয়াছেন!

তাঁহার মনে হইল তিনি যাহাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়াছেন তাহাদের গালাগালি শুনিলেও এই অকৃতজ্ঞদের বাক্যজ্বালা হইতে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিবেন।

তিনি কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত এক কয়েদীর ঘরে গিয়া দেখিলেন সে কি যেন লিখিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে কারাধ্যক্ষ আসিয়া কারাকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রবেশ করিলেন। কয়েদী তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল—আজই? কাল সকালে আমার ফাঁসী হওয়ার কথা ছিল না? তা হোক আপনি এই চিঠিখানা আমার স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

কারাধ্যক্ষ বলিলেন—রাজার মৃত্যু হইয়াছে। নূতন রাজা তোমার ফাঁসীর হুকুম রদ করিয়া দিয়াছেন। কাল সকালে বোধ হয় তুমি মুক্তি পাইবে।

কয়েদী যেন অভিভূত হইয়া পড়িল। "রাজার মৃত্যু হইয়াছে?" তাহার দুইগণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সরল শোকের অশ্রু! "মহাশয়, আমি তাঁহাকে যথার্থ রাজা বলিয়া ভক্তি করিতাম। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আমার মত পাপীর মৃত্যুতে আমার দুঃখ ছিল না। হায়! তিনি যদি আবার বাঁচিয়া উঠেন।"

রাজার বুকে অশ্রুর চাপ জমিয়া উঠিল। কে যে তাঁহাকে ভালবাসে, তাহা তিনি কিছুই জানেন না!

তাঁহার মনে হইল এই প্রচ্ছন্ন শত্রুময় দেশে রাজা হইয়া বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা কি? তাঁহাকে সত্য সত্যই শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, এমন লোক কই? এ রাজত্বে ও এ জীবনে তাহা হইলে কেন এত আকাঙ্ক্ষা?

ধীরে ধীরে তিনি তাঁহার স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রাণী বিছানার একপার্শ্বে চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতেছেন। রাজার আদর করিয়া দেওয়া সকল অলঙ্কার তাঁহার বর-অঙ্গে ঝলমল করিতেছে। তাঁহার আঙুলে রাজার শেষ দান বহুমূল্য মণি-খচিত অঙ্গুরীয়ক। তিনি অন্যমনস্কভাবে সেইটি নাড়িতেছেন। রাজার বুক বিরহ ব্যথার ভারি হইয়া উঠিল। হায় রে! তাঁহারই দেওয়া উপহারের স্পর্শে রাণী তাঁহারই ধ্যানময়! যেন মূর্ত্তিমতী বিষাদ! মনে হইল একবার ডাকিয়া বলেন—রাণি, আর কারও জন্য নয়, শুধু তোমার বুকের শূন্যতা পূর্ণ করিতেই আমি মৃত্যুর আহ্বান ফিরাইয়া দিই।

কিন্তু ও কি?

পার্শ্বের গুপ্তদ্বার খুলিয়া গেল! রাজা অবাক হইয়া গেলেন। এ দ্বারের অস্তিত্বও একমাত্র তিনি ও রাণী ছাড়া আর কাহারও জানা ছিলনা!

দেখিলেন সেই দ্বারপথে দেশের নূতন রাজার মূর্ত্তি! রাণী সহাস্য মুখে উঠিয়া দুইহাত বাড়াইয়া দাঁড়াইলেন। নূতন রাজা ঘরে প্রবেশ করিয়া মণি-মুক্তা-অলঙ্কার শোভিত রাণীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখে অসংখ্য চুম্বন আঁকিয়া দিয়া বলিলেন—এতদিনে আমাদের কাঁটা দূর হ'ল সখি!

রাণী হাস্যমুখে মৃতরাজার শেষদান আংটিটি নূতন রাজার আঙুলে পরাইয়া দিয়া তাঁহার অধরে দীর্ঘচুম্বন দান করিয়া বলিলেন—এতদিনে আমাদের সুখের উষার অরুণোদয় হ'ল, সখা!

যখন রাজপ্রাসাদের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারোটার ঘণ্টা বাজিয়া নিশীথ রাত্রি ঘোষণা করিল, প্রহরীরা ধড়মড় করিয়া ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিল রাজা তেমনি ভাবেই শুইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার মুখে এক কঠিন ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল রাজার মুখ তাঁহার সাধ্বী রাণীকে দেখিতে দেওয়া হইবেনা। তাহারা বহুমূল্য আবরণ দিয়া রাজার মুখ আচ্ছাদন করিয়া দিল।

দেশাধিপের মৃত্যু হইয়াছে।

শ্রীসোমনাথ সাহা

Mary Coleridge-এর গল্প থেকে নেওয়া।

পল্লী ও নগর

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

হোথায় নগরে মহা উদ্দাম
        নৃত্য-চপল প্রাণ ;
হেথায় নিথর তরুর তলায়
        ধীরে প্রাণ বহমান।

হেথায় ফেনিল ঘোর ঘর্ঘর
        উত্তাল কোলাহল ;
হেথায় কোকিল, পাপিয়া, শালিক
        করিতেছে কলকল ।

হোথায় সূর্য্য সৌধ পিছনে
        কোন্ পথে কোথা যায় ;
হেথায় তপন তপ্ত কিরণে
        অবারিত স্নেহ ছায়।

হোথায় চন্দ্র সভয়ে গোপনে
        শুধু দেয় উঁকি ঝুঁকি ;
হেথা সে চন্দ্র স্নিগ্ধ ধারায়
        ধরায় করিছে সুখী।

হোথায় লোভে ও স্বার্থের সাথে
        উঠে নিতি হলাহল,
হেথায় আপন ক্ষুদ্র সীমায়
        সবে রহে অচপল।

হোথায় লক্ষ মানুষে সতত
        গায়ে গায়ে লাগালাগি,
মনে মনে তবু সবে দূরে দূরে
        সেথা সদা ভাগাভাগি ;

হেথায় বিরল-বসতি ভূমিতে
        দূরে দূরে সবে রহে ;
দূরে দূরে আছে, মনে মনে কাছে—
        মনে মনে প্রীতি বহে।

দূরে দূরে নর করে হেথা বাস,—
        দুই কুটীরের মাঝে
শত তরুলতা করি' জড়াজড়ি
        দোঁহায় বাঁধিয়া রাজে।

লতায় তরুতে বাঁধাবাঁধি হেথা,
        বাঁধাবাঁধি নরে নরে ;
চাঁদে ও তপনে ধরণীর সাথে
        সুখে জড়াজড়ি করে।

* * *

হে নগর, তোমা' দূর হ'তে আমি
        জানাই নমস্কার ;
তুমি থাক দূরে লয়ে আপনার
        দাপাদাপি চীৎকার।

তুমি সে বিরাট দৈত্যের মত
        পিঠে লয়ে গিরিভার
দীর্ঘশ্বাসেতে হাঁপায়ে দাপায়ে
        ছাড় নিতি হুঙ্কার।
ফেনাময় তব বদনে ভীষণ
        দশন লাগায় ভয় ;
দূরে এসে তাই বেঁধেছি আবাস
        তরুতলে ছায়াময়।

হেথায় লতায় তরুতে ঘাসেতে
পুকুরে মিতালি কত।
তাহাদের সাথে আমিও মিতালি
করিতেছি অবিরত।

ধরা মা হেথায় যেমন তৃণেরে
আঁকড়ি' বাঁচায় স্নেহে,
তেমনি সে মাতা অপার আদরে
পোষিছে আমার দেহে।

সুখে আছি হেথা, আছি আনন্দে,
প্রাণমন গেছে খুলি';
জ্যোৎস্না-মাখানো নারিকেল-পাতা
সাথে প্রাণ উঠে দুলি'।

পুকুরের নীল নিথর বারিতে
এ প্রাণ ছড়ায়ে দিয়া
শীতল নিথর হরষে নিয়ত
জুড়াইয়া লই হিয়া।

কলার পাতার উপরে গড়ায়ে
ঝরে যে চাঁদের সুধা
দুই আঁখি আর মুখ দিয়া সদা
পিয়া তা' মিটাই ক্ষুধা।

সতেজ নবীন তরুর চারায়
আঁকড়িয়া ধরি' বুকে
করি অনুভব ধরণী মাতার
প্রাণের আবেগ সুখে।

ফুলসাথে প্রাণ ফুটিবার তরে
ব্যাকুলিয়া ওঠে যেন;
ঝিঁঝির বিরামবিহীন ধ্বনিতে
বাজে প্রাণ বীণা হেন।

পাখীর ডাকেতে নীরব বনের
মুখে যেন কথা ফুটে;
সে কথা বুঝিনা, তবু তারি সাথে
প্রাণ যেন ডেকে উঠে!

* *

এই পল্লীর কোমল শ্যামল
বুকেতে বাঁধিয়া ঘর,
কাটুক আমার নীরব জীবন
অচটুল মন্থর।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

মা

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

শ্রীচরণেষু,

মা, বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল তবু আমি বেঁচে আছি। বেঁচে আছি বটে, কিন্তু সে বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না। মৃত্যুর বিরাট মুঠোর ভেতর থেকেও তার সম্মুখীন হইনি আজও, এই যা। এ জীবন আর ভাল লাগে না। আর বেশী দিন বাঁচব না জানি কিন্তু তবু স্বস্তি কই? মনকে বাঁধ মা এখন থেকেই। আমি বাঁচব না বাঁচতে পারি না এ ধ'রে রাখ। মরণের মুঠোর ভেতর দাঁড়িয়ে এখন অনেক কথাই মনে হয়, মনে হয় তোমার কথা, মনে হয় আরও অনেক মায়ের কথা। ক'লকাতার রাস্তায় অনেককে দেখেছি ছেলে কোলে ক'রে বসে থাকতে ভিক্ষার আশায়। তারাও মা, কিন্তু কি তারা ক'রতে পেরেছে তাদের সন্তানদের জন্যে? অভুক্ত ছেলেকে সামনে রেখে ভিক্ষা করার চেয়ে বড় অভিশাপ মায়ের ওপর আর কি হ'তে পারে আমি তা ভেবেই পাইনে। সেই মা-ই তুমি, তাদের কথা মনে ক'রে নিজেকে শক্ত ক'রে তোল। বোনটির কথা মনে হয়, কিন্তু তাকে মনে না আনাই উচিত। এসেছিল সে শুধু ব্যথা বাড়িয়ে দেবার জন্যই। আমিও চলেছি সেই পথে—চলেছি মনকে প্রস্তুত করেই, সে দেশের অধিকারি যে তার সাথে দেখা ক'রে শুধু বলতে চাই তোমার নিষ্ঠুর তূণে আর ত কিছুই নেই, যা ছিল তাই ত' ছোঁড়া হয়ে গেছে কিন্তু নিষ্ঠুর-রাজ যা কিছু নিক্ষেপ করতে হয় কি সেই একজনকে লক্ষ্য ক'রেই—আমার মা সে—তাই তোমার সাথে একটা বোঝাপড়া ক'রতে চাই আমি। কি উত্তর দেবে সে? সে উত্তর আমি জানিয়ে দিতে চাই সবাইকে, কিন্তু লজ্জা যার নেই সে কি দেবে সেই সুবিধেটুকু? হতভাগ্য সন্তান আমি, কিছুই ক'রতে পারিনি ক'রেছি কেবল শোষণ, কেবল ভারি করে তুলেছি তোমার বুক। ক্ষমা ক'র মা, বুককে শক্ত করে তোল—কোন ব্যথাই যাতে আঘাত ক'রতে না পারে। তোমাদের বিশ্ববিখ্যাত দেবতার মত নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠ মা। ভুলে যাও এ ছেলেকে।

প্রথমে মনে হ'ত হয়ত' বেঁচে যাব, মরতে পারব না আমি। অসুখ ধরা প'ড়েছে প্রথম অবস্থায়েই, তবে কেন বাঁচব না আমি? এত সুন্দর জগতটাকে ছেড়ে যেতে পারব না কিছুতেই। এ বয়সে ওকে ছেড়ে যাওয়া চলে না, কিছুই যে উপভোগ করিনি আমি। যদি যাবই এত তাড়াতাড়ি, তবে এসেছিলুম কেন? আজ কি মনে হয় জান মা? মনে হয় কেন আমি বেঁচে আছি, বেঁচে থাকতে চাই না আমি। কেন স্বাস্থ্য আমার ভাল ছিল? যদি আমি হতুম খুব দুর্ব্বল তবে ত' আমায় বেঁচে থাকতে হত' না বেশীদিন। জীবন আর মরণের মাঝে এখন এতটুকু পার্থক্য বুঝিনে আমি। একটি সাদা আর একটি কালো হ'লেও ওদুটি দাগকে পৃথক করে নেই কিছু। কোন পর্দা নেই ওদের মাঝে, থাকে না ঠেলে এগিয়ে যাবার উপায় নেই। সোজা পথ—জীবন আর মরণের মাঝে বিস্তৃত। দূর পাহাড়ের গায়ে গাছগুলোকে দেখতে ইচ্ছে হয় না, দেখতে ইচ্ছে হয় না মানুষের আনাগোনা কিন্তু তবু চোখ তাকিয়ে থাকে ওদের পানে। কি দেখে? কিছুই দেখে না হয়ত', হয়ত' ওটা একটা খেয়াল, কিন্তু তবু মনে হয় হয়ত' থাকতে পারতুম ওদেরই মত একজন হয়ে, ওদেরই মত আনন্দে চঞ্চল—ওই সবুজ গাছগুলোর মতই সজীব হ'য়ে। কিন্তু পৃথিবী এতটু ছোট তা' জানতুম না, জানতুম না আমায় স্থান দিতে গিয়ে পৃথিবী হাঁফিয়ে উঠেছে,—আমি এত' ভারী সে জ্ঞান ত' ছিল না আমার এর আগে। পৃথিবী যার ভারে টলে ওঠে তাকে সরে যেতেই হবে,—সরে যেতেও চাই আমি কিন্তু, তবু যেতে পারিনে যে। মা, অনেক সয়েছ তুমি, অনেক করেছ, আর একটু, আর একটা কাজ করতেই হবে তোমায়—আশীর্ব্বাদ কর যেন যেতে পারি শিগ্‌গীরই।

কিসের আকর্ষণে আজও আমি বেঁচে আছি? আকর্ষণীয় কিছুই ত' নেই আর, শুধু তুমি মা ছেড়ে দাও আমায়, যেতে দাও।—

কাশির সঙ্গে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল। কিন্তু সেটা এমন বিশেষ কিছুই নয়। এ রক্ত দেখে সজীব মানুষ হয়ত ভয় পেয়ে যাবে, কিন্তু যে সজীব নয় তার ওতে কি আসে যায়। এ ত' তার কাছে সাধারণ জল বাতাসের মতই, অতি সাধারণ সহজ নিশ্বাস। এখানে আমার আশেপাশে আরও অনেকে আছে। প্রায় প্রত্যেকেই ভাবে বুঝি তারা বেঁচে যাবে—প্রত্যেকেই ভাবে, যে একজন বাঁচে বহুর মধ্যে সেই একজন সে নিজেই। মনে মনে হাসি আসে—কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারিনে। অনেকে বলে তাদের বাড়ীর কথা আরও কত' সুখের কথা; কিন্তু বোঝেনা ওরা যে সে সবই যাবে—মিথ্যে হ'য়ে যাবে সব। যদি বাঁচাই থাকত' তাদের কপালে লেখা তবে এ রোগের হাতে পড়ত' না তারা কিছুতেই। ওদের অনেকেই আর আসে না আমার কাছে—আমার অবস্থা নাকি ভাল নয়, আমি মরবই সে কথা ওরা বুঝতে পেরেছে বুঝে আমার দুঃখ হয়নি এতটুকু, আনন্দই হয়েছে—মৃত্যুর মুখোমুখি এসে প'ড়তে পেরেছি তাহ'লে। দুঃখ হয় শুধু ওদের জন্যে, বাঁচতে ওরা চায় কিন্তু বাঁচতে ওরা পারবে না, বাঁচা ওদের হ'তে পারে না কিছুতেই।

পঁচিশ বছর বয়সে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি, অথচ কিছুই নেই, ভাববার যা তা হয়ত' ফুরিয়ে গিয়েছে। অন্যেরা হয়ত' কত কি ভাবে। কিন্তু আমি? মৃত্যুর কোন মানেই যে নেই আমার কাছে।

বেশীদিন বাঁচব না আর তাই এখানে থাকতে ভাল লাগছে না মোটেই। তোমার কাছে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব। মরবার সময় তোমার কাছে থাকতে চাই। পৃথিবীর কোথাও কিছু ভাল খুঁজে পাইনি শুধু তোমাকে ছাড়া। তাই যাবার সময় সেই ভাল জায়গা থেকেই যাবার ইচ্ছে হ'চ্ছে আজ।

আশা করি তুমি ভালই আছ। আমিও ভাল। ভাল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তিল তিল ক'রে যারা মৃত্যুর দিকে চলে তাদের যখন ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসে তখন তারা ভাল ছাড়া আর কি থাকতে পারে। আমার প্রণাম জেন। ইতি

সেবক
মনোজ

চিঠিটা শেষ ক'রে ও ভাবতে থাকে। যে বয়সে মানুষ ছুটে ছুটে বেড়ায়, যে বয়সে জগতটাকে শুনে নেবার আগ্রহে মানুষ হয়ে ওঠে মাতোয়ারা সেই বয়সে ডাক্তারেরা ওর বুকের ভেতর আবিষ্কার করেন এই বিশ্রী রোগের বীজাণু। সে কথা শুনে ওর মুখ শুকিয়ে যায়, ওর বাবা ব'সে পড়ে হতাশ হ'য়ে, মা ওর ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। একমাত্র ওরই ওপর যে সব আশা, কিন্তু কি নিষ্ঠুর ওই দেবতা। ওর বিয়ে দিয়ে মেয়ের অভাব পূরণ করবার ইচ্ছে ছিল মায়ের। মেয়ে পছন্দ করতেও বাকী ছিলনা তার কিন্তু সব ইচ্ছাই ভেঙ্গে গড়িয়ে পড়ে ধূলায়, একটা শক্তিশালী হাত যেন সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দেয় দূরে। মানুষ ক'রতে পারে কি? শুধু চেয়ে থাকা, তার বেশী কিছু সম্ভব হয় না যে। তারপর কেটে যায় মাসের পর মাস, আর কত দিন কতদূরই বা। এর যেন শেষ নেই অথচ শেষ যে চাই-ই—সহ্যের সীমা যে শেষ হ'য়ে আসে। ও চলে আসে এই দেশে। ভাল হবে এই আশায়ই হয়ত' ওর মা বাপ ওকে পাঠিয়ে দেয় এদেশে।—কিন্তু কি ভুলই না করে মানুষ। ভুল বুঝেও তা সংশোধন করার হাত তার নয় যে। ওই দূরের পাহাড়, দূরের সমস্ত সজীবতা, ডাক্তারদের চঞ্চল-ভাবে চ'লে বেড়ানো সব কিছুই তাকে আঘাত করে। এ সব ত' ওর জন্যে ওর—তবে কেন ওকে ঘিরে থাকবে তারা অনুক্ষণ? সন্ধ্যার তারাগুলো যেন এক একটা সঙ্কেত, যেন ওরা বলে বেঁচে থাকতে, চেয়ে থাকতে ওদের দিকে অনিমেষে—কিন্তু কেন, কেন ওরা ওর মাথার ওপরও ওঠে? এখানে ওসব কেন? মৃত্যুপথ যাত্রীকে কেন লোভ দেখানো? জীবনের শত সহস্র আনন্দ, সৌন্দর্য্য সামনে রেখে কেন তবে হত্যা করা? এখানে চাই অন্ধকার, মৃত্যুর মত কালো, চাই ঝড়, উদ্দাম বায়ু, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ খসে পড়া। ওদের সাথে তাল রেখে চলা যে সহজ। সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঘিরে রাখা যেন সহজ স্বভাব, তাই তীব্র উলঙ্গ মৃত্যুকে ঢেকে রাখবার কি ব্যস্ততাই না চারিদিকে। দীর্ঘ নিশ্বাস ওর বেরোয়

না, ঠোঁটের কোণে বেরিয়ে আসে অদ্ভুত রকমের একটা হাসি।

ডাক্তার এসে বলেন, আছেন কেমন, রক্ত কি খুব বেশী পড়েছে আজ?

ও হাসে, বলে, না বিশেষ কই আর, এখনও শরীরে রক্ত আছে অনেক। মিছেই রক্ত বাড়াবার চেষ্টা, কি হবে তাতে। জীবনটাকে ছোট করে ফেলবার চেষ্টা ক'রলে বেঁচে যেতুম এতদিন। আর কিছুতেই কোন প্রয়োজন নেই আমার। ওই আশে পাশের ঘরে অনেকে এখনও বাঁচতে চায় ডাক্তার বাবু। ও আবার হাসে, এর চেয়ে হাসির জিনিষ যেন ওর কাছে আর কিছুই নেই।

ডাক্তার ওর মুখের দিকে চায়। কি ব'লবে ওকে, সান্ত্বনা দেবার ওকে আর কিই বা আছে—সহজভাবে এগিয়ে যাওয়াই এখন ওর পক্ষে মঙ্গল।

ও ব'লে চলে, ডাক্তারবাবু, একটা ছোট মেয়েকে দেখেছি তার মায়ের কোলে শুয়ে দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে থাকতে। ফুট্ ফুটে সুন্দর মেয়েটি আর তার ঘুমটিও বড় সুন্দর, জাগবে না সে কোন দিন, উঠবেও না কারও ডাকে—মায়ের কোল এমনি আরামের। সেই মায়েরই একটি ছেলে মরতে বসেছে আজ পাঁচ বছর থেকে—ও রোগে কেউ বাঁচে না, অথচ মরতেও পারছেনা যেন। যেন দুলছে সে বড় আরামে, মৃত্যুর মুখে গিয়ে প'ড়তে পারলেই যেন সে হয় সার্থক। আর যাই হ'ক ওরকম মা কটা দেখেছেন বলুন ত? সন্তান পালন ক'রেই তার কর্ত্তব্য ফুরিয়ে যায়নি তাদের পৌছে দেওয়াও কর্ত্তব্যের অংশ যে। বেশ সুন্দর না? ও দূরের পানে চেয়ে থাকে যেখানে পাহাড়ের কোলে ঢলে প'ড়ছে তপনদেব।

ফুর ফুর ক'রে হাওয়া ব'য়ে যায়। ও হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, বন্ধ ক'রে দিন সব জানলা দরজাগুলো, কি হবে ওই হাওয়া—জীবনটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে যেন। উপহাস, উপহাস করে লাভ কি আর? যার শেষ হ'য়ে এসেছে তাকে ওইটুকু দিয়ে আর হবে কি? ওর নিষ্ঠুরতার মাপকাঠি নেই, না মাপা যায় না তা কোন কিছু দিয়েই। চুলগুলোকে হাতের মুঠোর ভেতর ধরে ও হতাশ হ'য়ে শুয়ে পড়ে ইজি-চেয়ারটায়।

ডাক্তার ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

পাশের ঘর থেকে ওরই মত একজন ওপারের যাত্রী এসে বসে। বলে, হাতটায় কেমন যেন একটা ব্যথা লাগছে অথচ চিঠি একটা লিখতে হবে বাড়ীতে, দেবেন একটা লিখে? ছোট ভাইয়ের নামেই লিখতে হবে, অপরকে দিয়ে ত' আর বৌকে চিঠি লেখা যায় না। ও হাসে অন্ধকারের মতই ম্লান হ'য়ে।

মনোজ যেন জ্ব'লে উঠে, বলে, ভাল লাগে না ওসব। মরতে বসে ওসব ছেলেমানুষি সহ্য ক'রতে পারিনে আমি। কি হবে কতকগুলি বাজে কথা ব'লে, যা সত্যি সহজভাবে তাকে চোখের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়াই কি ভাল নয়?

ওর চোখে জল আসে, বলে, জানি মৃত্যু পথযাত্রী আমি কিন্তু কি ক'রে সে কথা জানাই ওদের, বিশেষ ক'রে ওই নির্দ্দোষ মেয়েটিকে। ওযে কিছুতেই বিশ্বাস করে না আমার রোগের কথা, তবে কি ক'রে সে বিশ্বাস ক'রবে যে সময় আমার ফুরিয়ে এসেছে। জানেন না আপনি ওর চোখে ফুটে ওঠে কি কথা, কি বেদনার ছাপ। মানুষের সব কিছুই ভুলিয়ে দিতে পারে হয়ত' সে চোখ দুটো। মাঝে মাঝে মনে হ'ত বুঝিবা আমারই ভুল, বুঝিবা কোন রোগই নেই আমার—ওকে কাছে পাবার জন্যে হাত দুটো বাড়িয়ে দিতুম, কিন্তু কে যেন আঘাত করত নিষ্ঠুর ভাবে, হাত দুটো ভেঙ্গে প'ড়ত—ওর ঠোঁট উঠত' কেঁপে, চোখ যেত জলে ভ'রে। সে সব মনে না ক'রে করি কি মনোজ বাবু, প্রতিটি জিনিষই যে মনে একেবারে গেঁথে গিয়েছে।

ও উঠে পড়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, মরতে হবে জানি কিন্তু দুঃখ তাতে কমে কই? বুকটা হাহা ক'রে ওঠে, মনের মধ্যে এতটুকু শান্তিও নেই।

মনোজ চুপ ক'রে চেয়ে থাকে সামনের দিকে। একের সাথে শুধু একেরই শেষ হয় না। নিজের সাথে সাথে কেউ বা শেষ করে যাকে কেউ বা অন্য কাউকে—সঙ্গী একজন থাকা চাই-ই যেন।

* * *

কদিন হয় ও ফিরে এসেছে ওর মায়ের কাছে।

মা ওকে আশীর্বাদ ক'রে বলে, অমন বিশ্রী বাজে চিঠি লিখতে কেন বলত? ভগবান আমাদের আছেন, যাকে তিনিই সৃষ্টি ক'রেছেন—মায়ের কথা বুঝতেও তাই তাঁর বাকী নেই। দীর্ঘনিশ্বাস ঠেলে বেরিয়ে আসে মায়ের বুক চিরে, অত্যাচারের প্রতিটি রেখা তার মুখে চোখে স্পষ্ট দেখা যায়। অত্যাচারিত হয়েও এতখানি বিশ্বাস তারা পায় কোথা থেকে?

মনোজ চেয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে। ছেলে আর মা। পরস্পরের কোন কিছুই গোপন থাকে না পরস্পরের কাছে। মনোজের চোখ ভারী হ'য়ে ওঠে, ও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ওর মা আস্তে আস্তে উঠে যায়, যার সব শেষ হ'য়ে বসেছে সে যেমন ভাবে চায় সবার দিকে ঠিক তেমনি ভাবে মাও চায় ওই দূর আকাশের পানে—যেন দেবতা তার বসে আছে ওখানেই—তার মনকে শান্ত করতে। পা যেন চ'লতে চায় না কিন্তু তাই ব'লে ব'সে থাকাও ত চলে না।

মনোজ ফিরে তাকায় ওর মায়ের পথের দিকে। ও জানে কোথায় চলেছে ওই নারী। কিন্তু কি হবে ওখানে গিয়ে ওই মাটীর দেবতা যে মাটীরই। ওর এতটুকু শক্তি নেই কিছু করবার। জড় পদার্থের মত শুধু চেয়ে থাকা ছাড়া আর কোন কিছুই করবার নেই ওর। ওকে ওর সিংহাসন থেকে তুলে সাজিয়ে রাখলেও চলে যেন। এত বড় জীবন পৃথিবীর কি ওই অতটুকু জড় দেবতা? কিন্তু তবু বুঝবে কে বোঝাবে কে তাদের? যে সুখ দেয়নি এতদিন, সুখী করবার জন্যে মাথা ব্যথা তার হয়নি আজও। সব ভূয়ো, সব মিথ্যে। মিথ্যেকে সত্যের রূপ পরিয়ে দাঁড়করান ছাড়া এ আর কিছুই নয়।

ও চেয়ে থাকে জান্‌লা দিয়ে রাস্তার পানে। মানুষের যাতায়াতের বিরাম নেই—অনন্ত স্রোত যেন ব'য়ে চলেছে। ওদেরই আশপাশ দিয়ে জোরে চ'লে যাচ্ছে কত গাড়ী, কত উত্তেজনাময় না জানি মানুষ।—সেও ঠিক অমনি মানুষ অথচ চুপ ক'রে প'ড়ে থাকা ছাড়া তার কোন উপায়ই নেই। এত বড় পার্থক্যের কারণ কি? ও উৎসুক হ'য়ে চেয়ে থাকে, নিজেকে কল্পনা করে ওদের মাঝে—কি সুন্দর এই পৃথিবী, ওযে সুন্দর তা ও জানত' না এর আগে। ওরই পুরণো দিনের সহপাঠী অরুণকে হঠাৎ ও দেখতে পায়, অরুণ আর তার পাশে একটি তরুণী। তরুণী যে কে তা সে অনুমানে বুঝে নেয়। এই সেই অরুণ যে একদিন তার দীর্ঘ উন্নত দেহকে শ্রদ্ধা করত', মনে মনে হিংসেও করত হয়ত'। কিন্তু আজ? মানুষের শক্তির চরম দর্পকে সঙ্গে নিয়ে সে আনন্দে চ'লেছে পথ বেয়ে। আর সে নিজে? প'ড়ে আছে অন্ধকারে, এতটুকু আলোও নেই। ওর মনে প'ড়ে যায় সেই লোকটিকে যে তার স্ত্রীর কথা ব'লে ওর কাছে পেয়েছিল শুধু উপহাস। মনের মধ্যে ওর ঘায়ের পর ঘা পড়ে, কে যেন হাতুড়ী ঠুকে যায় অনবরত। না, না জান্‌লা খুলে রাখা হবে না, বাইরের জগতকে প্রবেশ ক'রতে দেওয়া হবে না মুমূর্ষুর ঘরে। জান্‌লা বন্ধ করবার জন্যে ও উঠে পড়ে। ওর মাথা ঘুরে ওঠে, আছাড় খেয়ে ও প'ড়ে যায় মেঝের ও'পর।

* * *

দিনের আলো নিবে যায়।

চুপে চুপে মনোজের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় ওর মা। সাদা ধব্‌ধবে বিছানার ওপর শুয়ে ও।—হয়ত' এই ওর শেষ, হয়ত' আর একটি দিনের জন্যেও উঠে ব'সতে হবে না ওকে দিনের আলো, রাতের আঁধার কেমন তা আর দেখবে না ও। জীবনের মাঝে মৃত্যুর দুঃখ অনুভব ক'রতে হবে না ওকে। ওর মা ঘরের মধ্যে এসে ওর মাথার কাছে দাঁড়ায়। ছোট্ট টেবিলটা ওর পাশে এনে রাখে, তার ওপর রাখে কাঁচের গ্লাসে ক'রে জল আর সেই বইটা যেটা মনোজ প'ড়ত সব সময়। একবার ছেলের মুখের দিকে চায় তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।—

পা টিপে টিপে নিজের ঘরে এসে প্রবেশ করে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে ভাল ক'রে। সব চুপ, কোথাও কেউ জেগে নেই হয়ত'। নিস্তব্ধতা যেন তাকে চেপে ধরে। একটা জোরাল হাত যেন তাকে কাজ করিয়ে নেয় নিজের খুসীমত। আলমারী খুলে সে বার করে একটা ছোট

কৌটো, তারপর ধীরে ধীরে খুলে ফেলে সেটাকে। কালো একটা গোলাকার পদার্থ বেরিয়ে পড়ে তার বিশ্রী চেহারা নিয়ে। মায়ের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। ওই বিশ্রী জিনিষই আজ তাকে দেবে সান্ত্বনা। সুন্দর ভগবান যখন করে অত্যাচার তখন ওই বিশ্রী জিনিষই হয়ত' বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে। মা মনে মনে হেসে ওঠে। কি হবে তার বেঁচে থেকে? অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতেই হবে। ঈশ্বর ভেবেছে বুঝি অত্যাচারের পর অত্যাচার ক'রে ভেঙে দেবে মায়ের বুক, কিন্তু সেকি জানেনা ওই মা তার চেয়েও সুন্দর তার চেয়েও কঠিন? সৃষ্টি ক'রেও তার অন্তরের কথা জানেনা অন্তর্যামী—সেই ত' মা। প্রতিশোধ নিতে হবে সৃষ্টির ক্ষতি ক'রে তারই দেওয়া প্রাণ নষ্ট ক'রে তার অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়াই ত' চাই। তার মেয়ে গেছে কিন্তু আছে তার ছেলে। ওই ছেলেও যেতে ব'সেছে তার মাকে ফেলে, কিন্তু হবে না তা'। মাকে ফেলে যাবার আগেই মা যাবে চলে ওই দূরের দেশে—যেখানে আছে তার মেয়ে, যেখানে যাবে তার ছেলে, তাদের দেখবে কে? অত্যাচার থেকে রক্ষা ক'রবার জন্যে চেয়ে থাকবে কার চোখ, কে টেনে নেবে দু'হাত বাড়িয়ে? সে ত' এই মা-ই।—ঈশ্বরের বিরুদ্ধে টিকে থাকবার শক্তি মা ছাড়া আছে কার?

কালো জিনিষটা মুখের কাছে এনে আবার সেটা সরিয়ে নেয় সে। যদি ও এখন জেগে ওঠে, যদি খুঁজতে থাকে ওর মাকে? হয়ত' ও যাবে না চ'লে, হয়ত' এখনও ফিরে আসতে পারে ও মায়ের কাছে। তবে দেখবে কে ওকে? মায়ের মন দুলে ওঠে। হয়ত' এখন ও জেগে উঠেছে, চোখ মেলে চেয়ে আছে, ডাকছে তাকে।

কৌটোটা হাতের মধ্যে নিয়ে মা আবার আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ায় ছেলের ঘরে। না, কোন সাড়া নেই ওর; নিঝুম, নিস্তব্ধ। ঘরের এক কোণে ছোট্ট একটা চৌকিতে শুয়ে আছে ওর বাবা। তারও কোন সাড়া নেই। ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা—একটা বিরাট দৈত্যের চেয়েও শক্তিশালী। আবার সে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। রেলিঙে ভর দিয়ে চেয়ে থাকে বিরাট অনন্তের পানে। কালো রাত্রির কালো চোখ দুটো যেন চুপ ক'রে চেয়ে আছে তার দিকে। তারাগুলো পিট্ পিট্ ক'রে জ্বলে—ওরা সবাই মিলে যেন কিসের সঙ্কেত করে। ওরই একটা হয়ত' তার সেই মেয়ে। হয়ত' মাকে না দেখে হয়ে আছে আকুল, হয়ত' এখন দেখতে পেয়ে ডাকছে তাকে। আকাশের কোথায়ও একটু ফাঁক নেই যেখান দিয়ে বেরিয়ে তার মেয়ে এসে প'ড়তে পারে তার কোলে—একেবারে একটানা দিগন্ত বিস্তৃত ওই আকাশ। হঠাৎ তার মনে হয় যেন কেউ কোথাও নেই, নেই তার মেয়ে, নেই তার ছেলে, সবই যেন মিলিয়ে গেছে ওই শূন্যে, ওই দিগন্ত রেখার আড়ালে হয়ত' তারা ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। শুধু চোখের জল, মা-হারাদের চোখে জল যে গড়িয়ে পড়ে সব সময়েই। চারিদিকের শূন্যতা মাকে ঘিরে ধরে, ধীরে ধীরে সেই কালো জিনিষটা সে হাতে তুলে নেয়। ওপরের দিকে হাত বাড়িয়ে চুপে চুপে বলে যাচ্ছি, আমি, থাকতে কি পারি সব কিছু ছেড়ে। ডাকতে হয় না মাকে, মা বুঝতে পারে, আপনিই সাড়া দেয়।

কালো জিনিষটাকে একবার সে বুকের কাছে নিয়ে যায়, যেন জড়িয়ে ধরতে চায় ওকে, ওই যে মিলিয়ে দেবে তাকে তার ছেলে মেয়ের সাথে,—সুন্দর ঈশ্বরের চেয়েও ভাল ওর কালো রূপ।

ঘরে এসে মা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ছেলের মুখের দিকে। ওর নিমীলিত চোখে কিছুই দেখা যায় না। কিসের একটা ছায়া ওর মুখের ওপর দেখা যায়। তারপর স্বামীর মুখের দিকে একবার চায় মা, এক ঝলক তীব্র হাসি ফুটে ওঠে মুখের ওপর। কিন্তু আর দেরী নয়, দেরী করা চলে না যে। ধীরে ধীরে গ্লাসটা তুলে নিয়ে জলের সাথে সেই কালো জিনিষটাকে ঢেলে দেয় মুখের ভেতর।

মাথাটা কেমন করে ওঠে। বিশ্রী জিনিষ বিশ্রীই হয় চিরকাল। বেরিয়ে যায় সে ঘর থেকে। বাইরের জগত তার চোখের সামনে থেকে সরে যায় যেন। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, চোখ মেলে আর চেয়ে থাকা যায় না। নিশ্বাস হ'য়ে ওঠে ঘন। চারিদিক কালো, বিশ্বজোড়া কালো রং ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

মা আর চুপ করে থাকতে পারে না। ছেলের ঘরের সামনে এসে আছাড় খেয়ে প'ড়ে যায়, চেঁচিয়ে ডাকতে চায় ছেলেকে, কিন্তু গলার স্বর যেন কে দিয়েছে বন্ধ করে। শুধু একটা শব্দ হয় মুখ দিয়ে।

* * * *

ডাক্তার মুখ গম্ভীর করে বলে, না কিছুই বলা যায় না, কিন্তু আশাও দিতে পারা যায় না এতটুকু।

মনোজের বাবা স্থির হয়ে চেয়ে থাকে স্ত্রীর মুখের দিকে। মুখের কোথাও এতটুকু কুঞ্চন দেখা যায় না। এ জগতের মানুষ হয়েও সে যেন কোন জগতেরই নয়। উদাসীনতা তার চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ওপর বিশ্বের কোন দাগ নেই। কিছুই হয়নি, হবেই বা কি, কিই বা হ'তে পারে? শুধু খেয়ে যাওয়া, কবে যাওয়া—প্রাণ নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই।

ডাক্তার বলে, কিন্তু যদিই উনি ভাল হয়ে ওঠেন, ছেলের কথা তাকে ব'লবেন না কিছু, একথা মনে থাকে যেন। যে গেছে তাকে সামনে এনে আর একজনের পথ প্রশস্ত ক'রে লাভ কি? আগে পরে যেতে ত' হবেই সবাইকে কিন্তু সেই পরকে আগিয়ে আনা উচিত নয় কোন মতেই। ডাক্তারের কথাটা মনে রাখবেন।

মনোজের বাবার মুখের ওপর হাসির রেখা খেলে যায়। ঠোঁট দুটো তার নড়ে উঠে। মাথা নেড়ে ডাক্তারের কথায় সায় দেয়। বলবার যেন কিছু নেই তার। শুধু চেয়ে থাকা—প্রয়োজন মতে যার যা' ইচ্ছে করে যাক্ কিন্তু সে যেন শুধু চেয়েই থাকবে।

ডাক্তারেরও ওপরে যে আছে তার খেয়াল মতই সংসার চলে। মায়ের ইচ্ছে তার ইচ্ছের কাছে তুচ্ছ হ'য়ে যায় আর তাই সমস্ত শাস্তি মাথায় পেতে নিতে তাকে ফিরে আসতে হয় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। ওপর-ওয়ালা যখন শাস্তি দেবেই তখন কি আর করা যেতে পারে? তীব্রতা মনের মধ্যে রেখে হতাশ হ'য়ে থাকতেই হবে যে।—

মা ভাল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু ভাল হওয়া বলা চলে না ওকে। চোখে একটা কিসের দৃষ্টি নিয়ে যেন সে ওঠে ঘুম থেকে। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন দেখতে চা'য়—কি যেন স্মরণ ক'রতে চায় চারিদিকে চেয়ে। ধীরে ধীরে মনোজের ঘরে এসে চেঁচিয়ে ডাকে,—'খোকা, খোকা, কোথায় গেলি।'—কোন সাড়া না পেয়ে সে যেন রেগে ওঠে, স্বামীর কাছে গিয়ে বলে, সারাদিন চেয়েই র'য়েছ কিন্তু দেখ কি? খোকা গিয়েছে কোথায়, ডেকে আনতে পার না তাকে?

একটু চুপ ক'রে থেকে চোখের দৃষ্টিতে আগুন ছড়িয়ে দিয়ে বলে, মা, পারিনে আর। খুকীটা চেঁচিয়ে সারা হ'চ্ছে ওদিকে—সবাই মিলে যেন পাগল ক'রে দেবে আমায়। মরলেই যেন আপদ চুকে যায় সব। ছুটে সে উঠে যায় ও'পরে।

খাটের ও'পর শোয়ান ছোট বালিশটাকে বুকে চেপে ধরে, কোলে ব'সিয়ে দোল দেয়—ঘুম পাড়াবার জন্যেই হয়ত'।—

মনোজের বাবা ওপরে উঠে আসে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে সে স্ত্রীর দিকে। অত্যাচারের শেষ অবস্থা এ মনোজের বাবা শুধু চেয়ে থাকে অপলক চোখে। এই মা—আজ সামান্য একটা বালিশ সন্তান হ'য়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে। কিন্তু যদি ওর খেয়াল হয়, যদি ওর পাগলামী মুহূর্তের জন্যেও যায় থেমে, তবে? ছেলেকে ধ'রে রাখতে ও পারবে না, পারবে না নিজের মৃত্যুকেও ডেকে আনতে সামনে—কেন, এত অত্যাচার কিসের জন্যে? আর যদি হ'তে হয় তাই, তবে, স্নেহ, মমতা কেন থাকে মানুষের মনে বেঁধে, কেন ঘিরে রাখে তারা মাকে? প্রশ্ন আছে বহু, ছেয়ে ফেলা যায় প্রশ্নে, কিন্তু উত্তর নেই একটারও, দিতেও পারে না কেউ।—

মায়ের হঠাৎ নজর পড়ে এদিকে, লজ্জায় মাথাটা একটু নীচু ক'রে সে বলে, লজ্জা করে না তোমার অমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে, যাও, নিয়ে এস খোকাকে ডেকে। বাড়ী যেন ওরে ভাল লাগে না কিছুতেই। মা ত' আর কেউ নয়, যা কিছু ওই বন্ধুরা।

মনোজের বাবা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। সান্ত্বনা যদি মেলে তবে মিলুক তা অমনি ক'রেই। কি হবে

জাগিয়ে দিয়ে? নিষ্ঠুর বিধাতার দেশে সুখ পাওয়ার আশা কেন?

হঠাৎ সারা বাড়ী কাঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মা।—মনোজ, খোকা আমার।—

মানোজের বাবা ফিরে আসে।—

বালিশটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মা তখন প'ড়ে আছে মেঝের ও'পর—চুল গুলো দুই মুঠোর মধ্যে সজোরে চেপে। সারা দেহ তার কেঁপে কেঁপে উঠে স্থির হ'য়ে যায়। চোখের জল ধ'রে রাখা যায় না সে দৃশ্য দেখে, কিন্তু যার চোখ নেই? পাষাণ পাষাণই চিরকাল। হয়ত'-ও পাষাণও নয়, একটা ভুয়ো কল্পনা। মানুষের কল্পনা শক্তির একটা উদাহরণ মাত্র।

মনোজের বাবার উদাস চোখ দুটোতেও জল দেখা যায়। মনে মনে সে বলে, যথেষ্ট ক'রেছ দেবতা, আর বাড়িয়ে তুলোনা অত্যাচার। পাগল ক'রেছ তাতে দুঃখ নেই কিন্তু সেই পাগলামী নিয়েই থাকতে দাও ওকে—তা ভেঙে দিয়ে সহজ মানুষ ক'রে দিওনা ক্ষণিকের তরেও। তোমার অযশ গাইবে না কেউ। সবাই স্বীকার ক'রে নেবে—অত্যাচার ক'রতে তোমার মত আর কেউ নেই। তবে আর কেন?

এ সেই মা—যে মাকে চেনে না কেউ।

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

বায়ু চুম্বিত গিরি প্রান্তরে

শ্রীমৃগাঙ্কমৌলি বসু আই-সি-এস্

বায়ু-চুম্বিত গিরি প্রান্তরে
দেখেছি উষায় অস্তরাগে
স্তব্ধকরুণ স্থির মায়া, যেন
পুরাণো গ্রাম্য মৃদু স্বর্।
দেখেছি কেতকী নবতৃণদল
বরষা নারীর পুরোভালে,
স্নিগ্ধ শ্রাবণ ধারা বরষণ
সুকোমল লঘু ঝুরুঝুর্॥

২

শুনেছি না ফোটা কোরকের গান,
সাগরের চির-নিঃস্বন্,
শ্বেত বঙ্কিম পালের তলাতে
হেরিয়াছি দেশ তরীতে—
সবার অধিক সুন্দরতম
দেখায়েছে মোরে ভগবান্
যে মায়া প্রিয়ার স্বরে, কুন্তলে
রক্ত অধরে, আঁখিতে॥

'Masefield' অবলম্বনে

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীনিরুপমা দেবী

সংসার দাবানল লীঢ় লোক প্রাণায় কারুণ্য ঘনাঘনত্ব প্রাপ্তস্য কল্যাণ গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্। ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলম্ জ্ঞানমূর্ত্তিম্, দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্, একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদাসাক্ষীভূতং, ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরোস্তম্ নমামি।

সেই সদ্গুরুরূপী পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে প্রণাম করি। আসমুদ্র হিমাচল একদিন যাঁহার নামে ধ্বনিত হইয়াছিল, ভারতের সেই বিবেকানন্দ, বাংলার সেই বিবেকানন্দ যে গুরুর আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। শিষ্যের দ্বারাই গুরুর প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই প্রচলিত বাণীটিকে শ্রীবিবেকানন্দ যুগোচিত কার্য্যের দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "যদি আমার কায়মনোবাক্য দ্বারা আমি কোন সৎকার্য্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বহির্গত হইয়া থাকে, যাহাতে জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই। তাহা আমার জীবনের আদর্শ আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের।" যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই তাঁহার শক্তির খেলা, তাঁহারই বাণী এবং তিনিই স্বয়ং।" *

তাই আজ হিমাচলশিরে মায়াবতী হইতে সমস্ত ভারতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বিস্তৃত—বিখ্যাত। বহুযুগ পূর্ব্বে ভারতে যে বৌদ্ধ সংঘাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবিষয়ে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া আজ সমুদ্রপারে সুদূর আমেরিকা এবং য়ুরোপ পর্য্যন্ত এই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বেদান্তসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সময় এই মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সে এক যুগ বিপ্লবের সময়। দেশ তখন বৈদেশিক ধর্ম্ম কৃষ্টিশিক্ষা ও সমাজের নূতন মোহে বিভ্রান্ত। হিন্দু ধর্ম্মের গ্লানি তখন আকাশ বাতাসে ছড়াইতেছিল। রাজা রামমোহন রায় দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি বেদান্ত ধর্ম্মের দিকে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর উপনিষদুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে ফিরাইয়া সেই বন্যার মুখে কথঞ্চিৎ বাঁধ দিয়াছিলেন এবং দিতেছিলেন।

ভগবান বলিয়াছেন "যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইবে তখনি তিনি সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইবেন। এই কথা সত্য করিতেই চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ দলবল, যাহার স্রোত শতবৎসরব্যাপী চলিয়াছিল। মহাপুরুষের পর মহাপুরুষ, গোস্বামীগণ, আচার্য্যবর্গ, কবিরাজগণ, মহান্তের দল, ঠাকুরগণ, সেই সঙ্গে সিদ্ধান্তকারী ও টীকাভাষ্যকারী পণ্ডিতের বর্গ, কত কত পদকর্ত্তা, কবি, বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত প্রচারের ও আচারের সে যেন এক বন্যা। তিনি যখন আসেন তখন তাঁহার অগ্রে পশ্চাতে এমনি করিয়াই তাঁর দলবল তাঁর 'বরযাত্র' আসে।

কিন্তু শতাব্দীর মধ্যেই আমরা আবার সকলি ভুলিলাম। বেদবেদান্ত উপনিষদ পুরাণে শ্রীগীতার চরম প্রতিপাদ্য যে সাধ্যবস্তু এবং তাহার যে সাধনা মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দেশের আপামর সাধারণকে দান করিয়াছিলেন সে বস্তু আবার কালের করাল কুক্ষিগত হইল, রহিল কেবল তাহার বিকৃত আকার যাহা আমাদের দেশের ভাগ্যে প্রত্যেক যুগধর্ম্মের পরেই দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনের সঙ্গে তাঁহার নিজ জনগণও আসিয়াছিলেন। আসিয়াছিলেন বিবেকানন্দ, জ্ঞানানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি, আসিয়াছিলেন বিজয়কৃষ্ণ,

* 'ভারতে বিবেকানন্দ' কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তরে।

কেশব সেন ইত্যাদি। কিন্তু সেই গ্রাম্যযুবক গদাধর নিজে প্রথমে কি লইয়া সেই যুগান্তরকারী প্লাবনের মুখে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? পরে তিনি বহুমুখী সাধনা ও বহুশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার প্রথম সাধক-জীবনে কি মহাসম্বল ছিল যাহার কথা তিনি শেষ পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন? সে কোন বস্তু যাহা সাধনকালে এবং সিদ্ধিকালে উভয়কালেই সমান প্রয়োজনীয়?

এইখানে একটু অবান্তর অথচ অত্যন্ত দরকারী কথা বলিবার প্রয়োজন। আমার ন্যায় অনধিকারী ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে প্রভু রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আদেশ দিয়া গৌরীপুরী-মাতা বামনকে চন্দ্র ধরিতেই উদ্বাহু করিয়াছেন মাত্র। যখন তাঁহাদের ইচ্ছায় সমুদ্রে ভেলা ভাসাইবার স্পর্দ্ধা করিতেই হইয়াছে তখন একটি কথা পূর্ব্বেই নিবেদন করিতে চাই। এই যোগ জ্ঞান ভক্তি ধ্যান কর্ম্ম প্রভৃতির সমন্বয়ে লোকোত্তর সমুদ্রতুল্য চরিত্র হইতে আমরা আমাদের শক্তির অনুরূপ একটী বস্তুরই আলোচনা করিব। এ বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, "আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ, যার যত শক্তি তত করে আরোহণ। যাবৎ বুদ্ধির গতি ততেক বর্ণিল, সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল।" মহতের চরিত্র ও লীলা ইহা"—দুগ্ধবিধ সমান, তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি সবে করে পান।" নিজ ক্ষমতার অনুরূপ আলোচনার ত্রুটি আশা করি মার্জ্জনীয় হইবে।

এই মহাপুরুষের জীবন এক পরম বিস্ময়ের এক পরম চমৎকৃতির বিষয়, যাহাতে সর্ব্বধর্ম্ম এবং সর্ব্বসাধারণার একত্র সমন্বয় হইয়াছিল। তাঁহার সাধক জীবনের কথা অত্যদ্ভুত। আমাদের হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বরানুভবের যতগুলি পন্থা আছে সমস্ত সাধনাতেই তিনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা, জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্যের তত্ত্বজ্ঞান, বেদান্তের বিচার, সমস্ত পুরাণতন্ত্রোক্ত সাধনা কিছুই তাঁহার অনধিগম্য ছিলনা। যাহা কেহ চিরজীবনের সাধনায় সারিতে পারে নাই তিনি তাহা কোনটি একদিনে কোনটি তিনদিনেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন এমন কি খৃষ্ট ও ইস্‌লাম ধর্ম্ম পর্য্যন্ত তাঁহার সাধনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তাই তাঁহার নিকটে যে কোন ধর্ম্মের ব্যক্তি আসিলেও আনন্দ পাইত।

মানুষ আনন্দকে চায়! শ্রুতি বলিতেছেন আনন্দেই এ জগতের উৎপত্তি আনন্দেই ইহার স্থিতি! মানুষ রসলোভী। এক আনন্দস্বরূপ রস স্বরূপ বস্তুর কথা শুনিয়া মানুষ তাহাকে পাইতে চাহিল। অনুভব করিতে ইচ্ছা করিল অথচ সে বস্তু "অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ" তাহাকে সূর্য্য চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ অগ্নি কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। চক্ষু তাহাকে দেখেনা বাক্ সেখানে পৌছেনা! তাঁহাকে কোন জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবার উপায় নাই; অথচ সে বস্তু নিকটেই রহিয়াছে। তাহাকে আমরা পাইতে চাই, কিন্তু কি উপায়ে পাইব? শ্রুতি বলিতেছেন—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী।"

ভক্তিই তাঁহাকে প্রাপ্ত করান ভক্তিই তাঁহাকে দর্শন করান। সেই পুরুষ ভক্তির বশ অতএব ভক্তিই শ্রেষ্ঠা। জগতের প্রার্থনীয়া এই ভক্তি কি? শাণ্ডিল্যসূত্র বলিতেছেন "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" নারদ ভক্তিসূত্র আরও একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছেন "ওঁ সা কস্মৈ পরম্ প্রেমরূপা।" সেই ভক্তি ঈশ্বরে পরম প্রেমস্বরূপা। "অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপং।"

মূকাস্বাদনবৎ। প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে (৫১।৫২।৫৩) ইনি অনির্ব্বচনীয় প্রেম স্বরূপ, বাক্যে প্রকাশের বিষয় নহেন। মূকের কোন বস্তু আস্বাদনের ন্যায়! কোন পাত্রে ইহার কখনো প্রকাশ পায়। অর্থাৎ মুখে বলিয়া ইহাকে বুঝানো যায় না। কোন পাত্রে যখন ইহার প্রকাশ হয় তখনই এই বস্তু সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আমাদের অনুভবে আইসে। তাই মহাপ্রভুর অবতারে জগৎ এই ভক্তিদেবীকে প্রত্যক্ষানুভব করিয়াছিল। আজ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবে শুনিতেছি যাহারা তাঁহাকে দেখিবার ও বুঝিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল তাহারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও করিয়াছিল।

রসের—আনন্দস্বরূপের আস্বাদন করিতে হইলে আনন্দময়ী বৃত্তিরই প্রয়োজন। এই বৃত্তির নাম ভক্তি এবং তাহার ঘনীভূত স্বরূপের নাম প্রীতি। এই আনন্দময়ী বৃত্তি জীবে স্বভাবতঃই আছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দানুভবে নিজেকে প্রয়োগ করাই এ বৃত্তির সার্থকতা। ভক্তি সূত্রকার এই ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপাদন করিয়াছেন। "ওঁ সাতু কর্ম্মজ্ঞান

যোগেভ্যঽপ্যধিকতরা।" সেই ভক্তি কর্ম্মজ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠ। "ভক্তা ঐকান্তিকো মুখ্যাঃ" ঐকান্তিক ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবদ্ বলিতেছেন "শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে, তেষমসৌ ক্লেশ এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থুলতুষাব ঘাতিনাম্।" হে বিভো, যে সকল সাধক সর্ব্বকল্যাণকর ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করে তুষে আঘাতকারীর ন্যায় তাঁহাদের শ্রম মাত্রই সার হয়। তাহাদের নিজেদের স্বাভাবিক সত্তাজ্ঞান মাত্রই অবশিষ্ট থাকে। আর কিছুই লাভ হয় না। অন্যত্র বলিতেছেন "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্র-মীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্মযদপ্যকারণং স্ব" নিরুপাধিক ব্রহ্মজ্ঞানও ভক্তি রহিত হইলে তাহার শোভা হয় না।" সুতরাং কি অশম কর্ম্ম কি দুঃখদকর্ম্ম ভগবানে সমর্পিত না হইলে বৃথাই হয়। শ্রীভগবান বলিতেছেন—ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ। এক ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রহণীয়। ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উর্দ্ধব ন স্বধ্যায়ো স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তি মমোর্জ্জিতা। নিত্য প্রবৃদ্ধা অপ্রতিহতবেগে ভক্তি যেমন আমাকে বশ করে তেমন যোগ তপাদিতেও পারেনা। শ্রীগীতাতে ও ভক্তি যোগাধ্যায়ে এবং মোক্ষাধ্যায়ে এ বিষয়ের বিস্তর প্রমাণ দর্শিত হইয়াছে (যাহা এখন বোধহয় সকল শিক্ষিতা মহিলারই জানা আছে) শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তি বিষয়ক শ্লোকের কথা তো এক বন্যার স্রোতের সহিতই তুলনীয়। 'যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈ রথো বহুগুণাশ্রয়ঃ।'

একো না নেয়তে তদ্বদ্ ভগবান শাস্ত্র বর্ত্মভিঃ। বহু গুণাশ্রয় একদ্রব্য যেমন চক্ষু ইত্যাদি পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় দ্বারা বিভিন্নরূপে পরিগণিত হয় তেমনি একই ভগবান উপাসনা ভেদে নানারূপে প্রতিভাত হ'ন।

শ্রীমৎ রূপগোস্বামীকৃত 'কারিকায়' এ বিষয়ে অনেকখানি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আমরা তাহার সারার্থটুকুই আলোচনা করিব। ক্ষীর এই বস্তুটিকে অনেক ইন্দ্রিয় দিয়াই জানা যায়। চক্ষু ইহার শুক্লবর্ণকে জানিতে পারে, ত্বক ইহার কোমলতা, নাসিকা ইহার সুগন্ধ এবং কর্ণ ইহার ক্ষীর এই শব্দটিকে জানিয়া থাকে কিন্তু ইহার মধুর রসের কথা জানে মাত্র রসনা।

"তথাস্তা বাহ্য করণ স্থানিয়োপাসনা খিলা ভক্তিস্তুতেঃ স্থানিয়া তত্তৎ সর্ব্বার্থ লাভতঃ। বাহ্যকরণ ইন্দ্রিয়েরা নিজ নিজ বিষয় যেমন গ্রহণ করে তেমনি অন্যান্য উপাসনাবর্গ কেবল স্বস্বোপযোগী সেই সেই স্বরূপই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। চিত্তস্থানিয়া ভক্তি কিন্তু তাহার উপাসনার সমস্ত স্বরূপই গ্রহণ করিয়া থাকে। (অর্থাৎ চিত্তে ক্ষীরের শুভ্রবর্ণ কোমলত্ব সৌগন্ধ এবং মাধুর্য্য এক সঙ্গেই প্রকাশিত হয়, অন্য ইন্দ্রিয়ে তাহা হয় না। তেমনি এক ভক্তিতেই ভগবানের সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র মাধুর্য্য সমস্ত সত্বার সহিত অনুভব হইয়া থাকে)।

ভক্তির আলোচনায় শ্রীমৎভাগবতের প্রভাব এড়ানো কঠিন, কেননা জগতের মঙ্গলের জন্য পুরাণ ইতিহাসের পৃষ্ঠে ভগবান বেদব্যাস বেদান্তের প্রতিপাদ্য বস্তুকে বিবৃত করিয়াও যাহা বিশেষভাবে বর্ণন না করার জন্য শান্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না; পরে শ্রীনারদের প্রেরণায় যে ভাগবত-ভক্তি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বৈষ্ণবদিগের বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ যাহা পরিগণিত হ'ন ভক্তির আলোচনা করিতে হইলে তাঁহাকে বাদ্ দিবার উপায় নাই। সুতোক্তিতে ভাগবত বলিতেছেন 'স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ যতোভক্তিরধোক্ষজে।'

অহৈতুক্য প্রতিহত যয়াত্মাসুপ্রসীদতি। (১।২।৬) মন ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত ভগবানে অহৈতুক্য অপ্রতিহতা ও আত্মপ্রসাদকারী ভক্তি যাহা হইতে জন্মে তাহাই মানবের পরম ধর্ম্ম। যোগীশ্রেষ্ঠ ভগবান কপিলদেব (সাংখ্যকার) মাতা দেবহুতিকে বলিতেছেন, "অনিমিত্তা ভগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণ মনসো যথা। ৩।২৫।৩০। জঠরানল যেমন স্বল্পক্ষণে (মানুষের অজ্ঞাতে অপ্রযত্নে) ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করিয়া ফেলে এই স্বাভাবিকী ভক্তি-বৃত্তিও সেইরূপ মানবের বহুজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ও বাসনাজনিত সংসার প্রবর্ত্তক সূক্ষ্ম শরীরকে শীঘ্র ক্ষয় করিয়া ফেলে।" পরে যাহা বলিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এই, "হে জননী! এই ভক্তি-যোগ পথভেদে (উপায় বিশেষে) বিভিন্ন ভাবের মানবে বিবিধ প্রকারে পরিকল্পিত হয়। ভাবের সেই বিভিন্নতা মানবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারেই হইয়া থাকে। আমার গুণ শ্রবণ মাত্রেই সর্ব্ব গুহাশয় সর্ব্বান্তর্যামী

পুরুষোত্তম আমাতে সমুদ্রাভিমুখী গঙ্গাধারার ন্যায় মনের অবিচ্ছিন্না গতিরূপা অহৈতুকী ভক্তির উদয়ই নির্গুণ ভক্তি-যোগের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া নির্নীত হয়। এই ভক্তিযোগই ভক্তিসাধনের চরমসিদ্ধি যাহা দ্বারা মানব ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া আমাতে আত্মহারা ভাবে আমার স্বরূপ লাভে সমর্থ হয়।" তাই সেই ভাবসমাধিগত আত্মারাম মহাপুরুষ যিনি সর্ব্বজীবের পরমাত্মাস্বরূপ ব্রহ্মস্বরূপ হরিকে মাতৃভাবে দেখিয়া-ছিলেন সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "মা আমাকে বলিলেন, 'তুই আমি ভিন্ন নই কিন্তু তুই ভক্তি নিয়ে থাক্ জগতের মঙ্গলের জন্য।" (সুতও মুনিগণকে বলিতেছেন "তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলা। ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পনং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ।" অষ্টাঙ্গ যোগীতপস্বীগণ ধ্যানধর্ম্ম নিষ্ঠাবান কর্ম্মযোগীগণ যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মশীল যশস্বীগণ। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন নিষ্ঠ জ্ঞানযোগী মনস্বীগণ মন্ত্রতন্ত্রবিদ্ আগম নিগমজ্ঞগণ এবং ভুবন মঙ্গলকামী সদাচার সাধকগণ স্বকৃত সমস্ত কর্ম্ম ভক্তিপূর্ণ প্রাণে আত্মনিবেদনের সঙ্গে যাঁহাকে সমর্পণ করিতে না পারিলে শান্তি লাভ করিতে পারেন না সেই মধুর মঙ্গল পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি)। আত্মা-রামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে, কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ। অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।

তীব্রেন ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্। ভাগবতের এই শ্লোক স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবে প্রমাণিত হইয়াছিল। আত-তত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ। শ্রীধরস্বামীকৃত ভাবার্থ দীপিকায়াম্ আততত্বাচ্চ—স্বরূপ বিস্তরত্বাৎ মাতৃত্বাৎ জগদ্-যোনি রূপত্বাৎ চক্রবর্ত্তী। ঋষিরাও যাঁহাকে ঈশ্বরের পরানু-রক্তি স্বরূপা এবং পরম প্রেমরূপা বলিতেছেন সেই প্রেমের কথা পরমহংসদেব কি সহজ কথায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা এই "ভগবানকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয়কে ভালবাসে। এই তিন জনার ভালবাসা একত্র করিলে যতখানি হয়, ঈশ্বরকে ততখানি ভালবাসলে তবে তাঁর দর্শন লাভ হয়।" ভক্তরাজ প্রহ্লাদও এই কথাই বলিয়াছেন, "যা প্রীতি রবিবেকীনাং বিষয়েষনপায়িনী ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু।" অবিবেকীর বিষয় যেমন অনন্যমমতা তোমার প্রতি তেমনি প্রীতি যেন আমার হৃদয় হইতে অপ-হরণ না করে। এই ভাবের ও উপরের ব্যাকুলতার কথা ভক্তগণকে অনুভব করাইতেই পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন "জলে চুবিয়ে ধরলে দেহেন্দ্রিয় প্রাণের যেমন অবস্থা হয়, মাছকে ডাঙ্গায় তুললে সে ধড়ফড় করে ভগবানের জন্য যখন প্রাণের তেমনি ধড়্ফড় করা ভাব আসবে তখন বুঝবে যে ভগবানে ভালবাসা এসেছে।" ব্যাকুলতার এমন জীবন্ত তুলনা আর কেহ আর কোথাও এমন সহজ কথায় দিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। শাণ্ডিল্য সূত্রের ভক্তির ব্যাখ্যায় একজন বৈদেশিক পণ্ডিত ডাক্তার গ্রিয়ারসন্ যাহা বলিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ এইরূপ "ভক্তি ঔপাধিক জ্ঞান নহে, ভক্তি উপাসনাও নহে, ভক্তি কোন ধর্ম্মমতও নহে। ভক্তির অর্থ ভালবাসা। ইহার কোন অভিসন্ধি বা কামনা নাই। ভক্তি কর্ম্ম নহে। কেননা কর্ম্মের ফল নশ্বর কিন্তু ভক্তির ফল অবিনশ্বর।

> ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল (বল)
> সর্ব্বফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল।

আমরা সাধারণ কথায় যাদের ভক্তি বলি তাহা ভক্তির আভাস মাত্র। ভক্তিস্বরূপ শক্তির বৃত্তি, ভক্তি জ্ঞানানন্দ-স্বরূপিনী, ভক্তি ভগবানকে বশ করে এবং প্রেমরাজ্যে পৌঁছা-ইয়া দেয়। চরিতামৃতকার বলিতেছেন 'ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগস্বরূপ লক্ষণ, ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন, রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম, তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্য-বান।' এই লোলুপতার কথায় এখানে একটি শ্লোক চরণ করিয়া দিয়াছেন,

"কৃষ্ণভক্তি রস ভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোহপিলভ্যতে তত্রলৌল্যমপিমূল্যমেকনং জন্মকোটী সুকৃতৈ র্ন লভ্যতে"

জন্মকোটী সুকৃতির দ্বারাও যাহা লভ্য হয়না আবার লোভ রূপ সামান্য বস্তুই যার মূল্য, সেই কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতি যদি কোথাও (বা যাহা হইতে) লাভ করিতে পার তাহা ক্রয় কর।

এই লৌল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই সাধকগণ "শ্রবণ

কীর্ত্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চ্চন বন্দন দাস্য এবং আত্মনিবেদন এই নববিধপথে ভক্তির যাজন করেন, কারণ যদিও মহাজনগণ বলিয়াছেন 'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়,' কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার আশ্বাসও দিতেছেন 'শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্ত করয়ে উদয়,' এই ভক্তি এই প্রেমসাধনের দ্বারাই যে পাওয়া যাইবে এমন কেহ বলিতে পারেননা। ইহা নিত্যসিদ্ধ বস্তু, আপনা হইতেই ইহাই আবির্ভাব। যেমন ভগবান নিত্য-সিদ্ধ বস্তু তাঁহাকে অনুভব করিবার জ্ঞানরূপা এই ভক্তি এই বৃত্তিও তেমনি নিত্যসিদ্ধা, আজীবন সাধনা করিয়াও হরষচিত্তে ইহার উদয় হইল না। আবার হয়ত কেহ জন্মের সঙ্গেই এই ধনে ধনী হইয়া আছেন, ইহাকে জন্মান্তরীন সাধনা বা সংস্কারের ফল বলিয়াও মনে করা যায়, তাই ভক্তরা শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে আশাপাশে বদ্ধ হইয়া এই পথে অগ্রসর হয়।

প্রেমভক্তির এই নিত্যসিদ্ধত্ব শ্রীরামকৃষ্ণদেবে জাজ্জ্বল্য-মান। তাঁহাকে এই ভক্তির জন্য কখনও সাধনা করিতে হয় নাই। এই নিত্যসিদ্ধা প্রেম তাঁহার দেহ ধারণের সঙ্গেই যেন আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। শিশুকালে কেবল কিছু সাধু সঙ্গ, তাঁহাদের সেবা এবং পুরাণ ভাগবতাদি শ্রবণের কথা জানিতে পারা যায়। যার ফলে এগারো বৎসর কালে মাঠের মধ্যে অদ্ভুত জ্যোতি দর্শন করিয়া ভাবসমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের' উপক্রমনিকায় এ ঘটনাগুলি শ্রীনারদজীর প্রথম জীবনের ঘটনার সহিত অনেকটা মেলে। এই মূর্চ্ছাটি পর্য্যন্ত। যাঁহারা শ্রীগীতায় শ্রীনারদের আত্মকাহিনীর কথা জানেন তাঁহারা মিলাইয়া দেখিতে পারিবেন।

এই নিত্যসিদ্ধা ভক্তি বা রাগাত্মিকা প্রেমের কথা পরম-হংসদেব বহুস্থানেই বলিয়াছেন। যে প্রেমের কথা ভগবান একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবকে জ্ঞানের যোগের কর্ম্মের সাধনার সমস্ত উপদেশ শেষ করিয়া বলিতেছেন "বাধ ক্ষুদ্র ব্রজে গোপ্যযজ্ঞ-পত্ন্যস্তথাধ্বরে তেনাধীত শ্রুতিগণা নোপাসীত মহত্তমা। অব্রতা তপ্ততপসো মৎসবাম্মামুপাগতাঃ॥ ইত্যাদি

(কেবলেন হি ভাবেন গোপ্য গাবো নগাপগা
যেহন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা,)

(যন্ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রত তপোধ্বরৈঃ
ব্যাখ্যা স্বাধ্যায় সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি)

যোগ, তত্ত্ববিচার, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, বেদপাঠ, সন্ন্যাস এই সমস্ত যত্নের সহিত সাধন করিয়াও যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়না ইহারা কেবল তাহাদের ভাবের দ্বারাই তাহা লাভ করিয়া-ছিল। সেই লাভটি কি? তানাবিদন্ময্যনুষঙ্গ বদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্মান-মদস্ত-য়েদং, যথা সমাধৌ মুনয়োব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে।' গোপিকা আমাতে এমনভাবে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিল যে নিজদেহগৃহ ইহলোক পরলোক কিছুরই প্রতি তাহাদের দৃষ্টি ছিল না। মুনিগণ সমাধিযোগে যেমন আত্ম-লোপ করেন, নদী যেমন সমুদ্রসঙ্গত হইয়া তাহার স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাম ও রূপকে পরিত্যাগ করে গোপিকারাও তেমনিভাবে আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া আমাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

প্রভু তাঁর সমস্ত কাজ শেষ ক'রে, সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্কৃত-কারীদের বিনাশ ধর্মসংস্থাপন অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ সব কাজ সেরে লীলা সম্বরণের সময় তাঁর সর্ব্বাধিক প্রিয়তম উদ্ধব যাকে তিনি আদর করে বলেছেন

ত তথা মে প্রিয়তম আত্মযোর্গীর্ন শঙ্কর
ন চ সঙ্কর্ষনো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্

(তুমি আমার যেমন প্রিয় ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মী এমন কি নিজেকেও আমি তেমন প্রিয় বোধ করিনা।)

সেই উদ্ধবকে উদ্ধব গীতার দ্বারা জ্ঞানের চরম সীমায় নিয়ে গিয়ে শেষে কিনা মূঢ়বুদ্ধি গোপিকার কথা বলে শেষ করিলেন। যাদের পরিচয়ে বলিয়াছেন "মৎকামা রমণং জার মস্বরূপ বিদোহবলা"আমার স্বরূপ অবগত নহে বুদ্ধিহীনা নারী কেবল আমাকেই প্রিয় বলে মাত্র জানে—আমাকেই মাত্র চায়। এই সামান্যা বুদ্ধিহীনা নারী জাতির মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাগানুগা প্রেমভক্তির যে চরমোৎকর্ষত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এমন বস্তু আর কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ, তাই সেই স্থানের কিছু আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করি।

কুরুক্ষেত্রে বহুদিনের পর গোপীদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের জ্ঞানযোগের উপদেশ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তোমাদের সঙ্গে বা জগতের সঙ্গে কখনও আমার

বিচ্ছেদ নাই। আমিই সব", ইত্যাদি তখন গোপীরা "আহুশ্চ তে নলিনাভ" শ্লোকে যে উত্তর দিয়াছিলেন কবিরাজ গোস্বামী তাহার ভাবার্থ কহিতেছেন

পূর্ব্বে উদ্ধব দ্বারে এবে সাক্ষাৎ আমারে
যোগজ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময় জান আমার হৃদয়
মোর ঐ হে কহিতে না যায়।
চিত্ত কাড়ি তোমা হইতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে
যত্ন করি নারি কাড়িবারে
তারে ধ্যান শিক্ষা কর লোক হাসাইয়া মার
স্থানাস্থান না কর বিচারে ?
নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদ কমল
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটি তার মধ্যে কুটি নাটি
শুনি গোপীর বাড়ে আর রোষ।
দেহ স্মৃতি নাহি যার, সংসার কূপ কাঁহা তার
তাহা হইতে না চাহে উদ্ধার
বিরহ সমুদ্র জলে কাম তিমি-মিশে গিলে
গোপীগণে লহ তার পার।

যাঁহাতে চিত্ত লাগাইবার জন্যই যত কিছু যোগ, জপ, জ্ঞান, ধ্যান ধারণার অনুশীলন সেই বস্তুতে তাঁহাদের চিত্ত এমনি স্বাভাবিক অনুরাগে বদ্ধ যে (বিরহের যাতনায়) বলিতে হইতেছে—

চিত্ত কাড়ি নারি কাড়িবারে বিচারে। তাহাদের নিকট নূতন করিয়া আবার যোগধ্যানের কথা বলিলে ভগবানকেও এইরূপ উপহাস পাইতে হইবে বৈকি! গোপীরা আরও বলিতেছেন, "তোমার পাদপদ্ম চিন্তা সংসারকূপে দেহস্মৃতি নাহি যার পতিতদের তরণের অবলম্বন বটে, কিন্তু যাহারা সমুদ্রে পড়িয়াছে তাহারা কূপ হইতে উদ্ধারের উপযুক্ত রজ্জু গাছটি লইয়া কি করিবে ? (নহে গোপী যোগেশ্বর লহ তার ধ্যানের কথা কিম্বা যোগের কথা হে যোগেশ্বর আমাদের বলে আর রাগ বাড়িও না)। আমরা তোমার সংসারকূপের ধারই ধারিনা তো তার থেকে উদ্ধার হতে কি চাইব ? (এখন তোমার এই বিরহসমুদ্র জলে বাসনা তিমি যে আমাদের গিলছে-তার থেকে উদ্ধার কর।) সে কাম সে বাসনা কি ? না আবার এই ব্রজভূমিই তোমায় তোমার সেই রাখালবেশে আমাদের সঙ্গে মিলিত হ'তে হ'বে।

তোমার যে অন্য বেশ অন্য সঙ্গ অন্য দেশ
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে তোমা না দেখিলে মরে
ব্রজজনের কি হবে উপায় ?

যাহাদের প্রেমের উৎকর্ষে প্রভুকে বলিতে হইয়াছে—

ন পারয়েহহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ
যা মা-ভজন্ দুর্জ্জয় গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।

তাঁহাদের এই প্রেমের প্রতিদান তিনি কোন কালেই দিতে পারিবেন না। তাঁরা নিজেরাই তাঁদের অন্তরের এই প্রেমবৃত্তির উৎকর্ষত্বে নিজেদের পুরস্কৃত মনে করুন, ভগবানেরও এ ঋণ শোধের ক্ষমতা নাই।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
(যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্)
এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥

অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে ভক্তাবতার বলিয়া থাকেন। তাঁহাকে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিতে আমাদের মনে কিছুমাত্র বাধা আসে না, কিন্তু কেহ যদি ব্যথা বোধ করেন তাহা হইলে মনে করা প্রয়োজন যে শ্রীমান্ মহাপ্রভুকেও এই প্রেমাবতার ভক্তাবতার আখ্যা বহু স্থানে দেওয়া হইয়াছে। তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর নাম বহু এক"

ভক্ত ভগবান হইতে ভিন্ন নন্, শ্রীগুরুদেবও নন্। সদ্গুরুরূপে ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে ভগবানই অবতীর্ণ হন। উদ্ধবকে তিনি বলিয়াছেন "বন্ধুগুরুরহংসখে" হে সখে আমিই গুরুরূপী বন্ধু। অন্যত্র "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিও। "যোহন্তর্ব হিস্তনু-ভৃতামশুভং বিধুন্বনাচার্য্যচৈত্ত বপুষ স্বগতিং ব্যনক্তি" ঈশ, তুমি বাহিরে আচার্য্যরূপে এবং

অন্তরে অন্তর্যামীরূপে দেহিগণের অশুভ বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে আপনার গতি প্রদান কর। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারও বলিতেছেন,

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং
ভক্তাবতার ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তি শক্তিকং
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরুচৈত্যরূপে
শিক্ষাদাতা হন্ কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে"

জীব চর্ম্মচক্ষে তাঁর দর্শন পায় না, তিনি অন্তরে অন্তর্যামীরূপে প্রেরণা দেন এবং বাহিরে ভক্তশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে প্রকাশ পান। শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণস্বরূপ অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুইরূপ। পরমহংসদেব এই ভক্তশ্রেষ্ঠ গুরুরূপেই সাধারণের নিকটে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক অবতারই যেমন অনেকগুলি কার্য্যের জন্যই আসেন তেমনি প্রভু রামকৃষ্ণদেবও অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার শক্তিকে নানাদিকেই বিকশিত করিয়াছিলেন। যে শক্তির প্রভাব আজ পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ক্রমে ভারতে বিশিষ্ট বস্তু হইয়া উঠিতেছে, কর্ম্মের এই প্রেরণা তাঁহাদের যাহার নিকট শিক্ষা সেই শ্রীবিবেকানন্দই বলিয়া গিয়াছেন "আমার যা কিছু সব তাঁর।" হিন্দুধর্ম্মের নূতন করিয়া অভ্যুদয়, নিষ্কাম কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা এবং তাঁহার আরও একটি কার্য্যকে আমাদের মুখ্য বলিয়া মনে হয়। এই নিত্যসিদ্ধা প্রেমাত্মিকা সরল ভক্তির প্রাধান্য দেখানও যেন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। নহিলে সেই প্রায় অক্ষরজ্ঞানহীন, শুনিয়াছি তিনি স্বাক্ষর পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না, (জানিনা ইহা কতটা সত্য), নহিলে সেই সাধারণতঃ জাগতিক উচ্চশিক্ষাহীন ব্যক্তির চরণে সেই যুগের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা কেন মস্তক লুটাইয়া দিতেন, বাণী শুনিয়া স্তব্ধ হইতেন? বেদান্তের বিচার উপনিষদের ব্রহ্ম তত্ত্ববাদীদিগেরও অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনের জ্ঞান ও ভক্তির তত্ত্ব, এক কথায় ঈশ্বরানুভবের যত কিছু প্রমাণ, আগম নিগমের যত কিছু সরলার্থ কি করিয়া এই প্রায়-অশিক্ষিত ব্যক্তির নখদর্পণের মধ্যে আসিল। তোতাপুরী বা সাধিকা ব্রাহ্মণী আদির কথা তাঁহার জীবনে উপলক্ষ্য মাত্র বলিয়া মনে হয়। নিজেই যেন এক স্বতঃসিদ্ধ বস্তু কিন্তু তথাপি তিনি যে পদার্থই হোন্ তাঁহার ভিতরে যে শক্তিই থাকুক সাধারণতঃ তিনি ইহারই প্রমাণ দেখাইয়াছেন, একটি পথ আছে যে পথ দিয়া যাইলে অতি সহজেই এমন স্থানে পৌঁছানো যায় যেখানে পৌঁছিলে জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না। শ্রীরূপ গোস্বামী সেই ক্ষীর ও ইন্দ্রিয়াদির উপমায় এই কথাই বলিয়াছেন। কর্ম্মযোগ প্রভৃতি অন্যান্য করণের দ্বারা ভগবানকে আংশিক জানা যায়। চিত্তস্থানীয়া ভক্তির মাঝেই তাঁহার পূর্ণ বিকাশ। শ্রীতুলসীদাস বলিয়াছেন—

চৌদ্দ চার আধার পড়ে শুনে ক্যা হোই
প্রেমকে এক অচ্ছর পড়ে বড়ে পণ্ডিত হো গোই

কর্ম্ম ইত্যাদি যেন দেহীর শারীরিক উৎকর্ষ প্রয়োজনীয় নহিলে দেহের সার্থকতা ঘটে না, কিন্তু ঈশ্বরে জ্ঞানময়ী ভক্তি আত্মার উৎকর্ষ। তাই ভক্তি সাধনাকে তিনি গরীয়সী বলিয়াছেন। তাঁহার কথামৃতের অমৃতস্রোতে অবগাহন করিলে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় কিছুদিন হইতে বসুমতী মাসিক পত্রিকায় পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জীবন কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার কর্ম্মসম্বন্ধে ইহাতে অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। এখনও ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। শ্রীম কথিত কথামৃত "তবকথামৃতং তপ্তজীবনং" স্বরূপই বটে। ইহা দেশকে দান করিয়া লেখক বা সংগ্রাহক 'ভূরিদা' পর্য্যায় ভুক্তই হইয়াছেন। আমাদের লোকমাতা জানকী সীতাদেবী যাঁহাকে পরমহংসদেব শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী বলিয়াছেন, আমাদের চিরবিরহসাধনাময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া যাঁহার কথা বলিতে রসনা মূক হইয়া যায় তাঁহাদের সাধনার সঙ্গে যাঁহার নাম মনে আসিতেছে তাঁহার নামে এই সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধন্য হইয়াছে। মাসিক বসুমতী হইতে আমরা ইহার সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাঁহাকে দর্শনের সৌভাগ্যও একবার লাভ করিয়াছিলাম। যাহাতে এই শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী ভাব প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন সেই ঈশ্বরী সারদামণি, যিনি অতি শৈশবে তাঁর চিরকালের প্রভুকে দর্শন করিয়া ও মুখের সঙ্গীত শুনিয়া বলিয়াছিলেন "ওকেই বিবাহ করিব।" এবং সেই বিবাহের ফলে যিনি আজীবন সাধ্বী সীতা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আদর্শে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন এই আশ্রম তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। প্রার্থনা করি যেন সে

নামের সম্মান এ আশ্রম রক্ষা করিতে পারে। এই আশ্রমের সহিত কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমাদের পরিচয় হইয়াছিল তাহাতে ইহার বিষয় যেটুকু জানিতে পারা গিয়াছে সেই কথার কিছু আলোচনা করিতে চাই। মেয়েদের শিক্ষায়তন এখন আমাদের দেশে অনেক হইয়াছে কিন্তু দেশের নাড়ীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া এমন নারী শিক্ষালয় দেশে আর আছে বলিয়া আমরা জানিনা। যে শিক্ষা যে কৃষ্টি আমাদের নিজস্ব বস্তু ছিল সেই শিক্ষাকে আদর্শ করিয়া এই আশ্রম অগ্রসর হইতেছে অথচ কালোপযোগী শিক্ষার সহিতও বিরোধ নাই সেজন্য রীতিমত বালিকা বিদ্যালয় আছে, কিন্তু তাহা অবৈতনিক। আমাদের গরীবের ঘরের মেয়েরাও যাহাতে পিতামাতার সঙ্গতির অভাবে শিক্ষায় বঞ্চিতা না হয় সেজন্য কতখানি প্রাণের দরদ দিয়া যে তাঁহারা এ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এ ব্যবস্থার জন্য কতখানি চেষ্টা কতদিকের কত অভাবের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ করিতে হয় তাহা অবর্ণনীয়। তারপর এই শিক্ষায়তনটির নাম 'ব্রহ্মচর্য্য বালিকা বিদ্যালয়' ইহার মূল উদ্দেশ্যর কথা এই নাম হইতেও অনেকটা প্রকাশ পায় বটে কিন্তু নামমাত্রই বস্তুর সব নয়। অনেকগুলি বালিকার সমস্ত ভারই এই শিক্ষায়তনটি বহন করিয়া এবং তাহাদের একেবারে নিজবক্ষের মধ্যে লইয়া আশ্রমটির নামোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতেছেন। কালোচিত শিক্ষার জন্য তাহারা স্কুলে পড়ে এবং স্কুলের শিক্ষা শেষ হইলে উচ্চশিক্ষায়ও যে তাহারা সুবিধা পায় তাহা এই আশ্রমের কন্যাকয়েকজনের উপাধি দেখিলেই বুঝা যায়। এই উচ্চ শিক্ষার আবার অন্যস্তরও আছে যাহাতে কন্যারা একদিন কাব্যতীর্থা ব্যাকরণতীর্থা উপাধি লইয়া সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতিও আয়ত্ত করিতে পারেন।

নারীজাতির উন্নয়ন আজ সমস্ত সভ্য দেশের বিশিষ্টতারূপে পরিগণিত। ভারত বা তথাকথিত বাংলাদেশও যে এবিষয়ে নিতান্ত পশ্চাতে পড়িয়া নাই তাঁহা এই যুগের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা কন্যাদিগের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রমাণিত হয়। এই দরিদ্র দেশেও মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ক্রমশঃই বাড়িতেছে, আরও বৃদ্ধি পাইত যদি সারদেশ্বরী আশ্রমের মত এইরূপ আদর্শের এবং অবৈতনিক বিদ্যা ও শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বেশী সংখ্যায় থাকিত। মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার বনিয়াদও যদি এই আদর্শে গাঁথা হইতে পাইত (দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে) তাহা হইলে অশোভন বিলাসিতা এবং অবস্থার অতিরিক্ত চালচলন যাহা আমাদের মধ্যে অলক্ষ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহা হয়ত এতটা প্রবেশ করিতে পাইত না। একদিন এই ভারতের লোকসমাজে ব্রহ্মচারিণী কুমারীগণের এমন স্থান ছিল যাঁহারা পরে যে আশ্রমে প্রবেশ করিতেন তাহাই উন্নত হইয়া উঠিত। ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিশ্ববারা, প্রভৃতি মনস্বিনীগণ অনসূয়া, অরুন্ধতী, লোপমুদ্রার শতরূপার ন্যায় জননীগণ যাঁহারা কপিলমাতা দেবহুতি আকুতি প্রসূতির মত কন্যা অত্রির মত ঋষি এবং প্রিয়ব্রতাদির মত রাজর্ষি সন্তান গর্ভে ধারণ করিতেন, তাঁহারা এই ভারতেরই কন্যা। আশা করি যে বৃহৎ আদর্শ লইয়া এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত কন্যাগণ যেদিন দেশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইহার পরিচয় দিতে পারিবে সেইদিনই এই আশ্রমের অভিভাবিকা এবং পরিচালিকাগণের এই অসামান্য চেষ্টার সফলতা লাভ হইবে। প্রার্থনা করি সেই দিন আসুক।

যিনি শত বৎসর পূর্ব্বে লোকশিক্ষার জন্য আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন যাঁহার নাম লইয়া জনহিতকর কর্ম্ম সেবা ও ধর্ম্মের দেশে পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল, তাঁহার শতবার্ষিকী উৎসবে আমরা একত্র হইয়া প্রার্থনা করি যে এই সারদেশ্বরী আশ্রম শিক্ষায় সেবায় কর্ম্মে জ্ঞানে যেন প্রভু রামকৃষ্ণদেবের ও দেবী সারদামণির নামের সম্মান রাখিতে পারে।

শ্রীনিরুপমা দেবী

(শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের সভায় পঠিত)

মাতন

শ্রীশক্তি পাল

(বোধন)

দুষ্টু ছেলে
দস্যি ছেলে
দেখ্‌না চেয়ে
চক্ষু মেলে
মা জননী দাঁড়িয়ে দোরে—
ডাক্‌ছে তোরে ;
আয়রে আয়রে আয় সবাই।
তাকি তাকি ঘিনি তা।
ঢাক ঢোল বাজে ঝাঁ।
বাজ বাজনা
সাজ সাজ্‌ না,
চণ্ডীতলায় ঢাক বাজে !—
ভূত-প্রেত-তাল ওই সাজে !—
গর্ত্ত ফুঁড়ে
মর্‌ছে ঢুড়ে
সোলুই ফোঁসে
রুদ্র রোষে
ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ ফোঁস
পাল্‌টা ঘুরে ;
দেখরে দেখরে দেখ ও ভাই।
তাকি তাকি ঘিন তা।
ঢাক ঢোল বাজে ঝাঁ।
বাজ বাজ না,
সাজ সাজ্‌ না,
চণ্ডীতলায় ঢোল বাজে !—
দৈত্য দানব ওই সাজে !—

(আরতি)

শম্ভু শম্ভু—
শিব শিব শম্ভু
বাজাও ঝাঁঝর
কণ্ঠেতে কম্বু।
শম্ভু শম্ভু
শিব শিব শম্ভু !
বাজাও ঝাঁঝর
কণ্ঠেতে কম্বু।
হরষ হর হা।
তাকিতা তা তা তা।

বাজ বাজ না,
সাজ সাজ না,
চণ্ডীতলায় ঢাক বাজে !—
ভূত-প্রেত-তাল ওই সাজে !—

দশটি হাতে
বর্ষা মাতে,
খড়্গ কাতি
উঠ্‌ছে ভাতি !
চক্‌ চকা চক্‌
সে সজ্জাতে
লটর পটর-লুট্‌ লুটায়।
ঘিনি তাক্‌ তাক্‌ ঝাঁ।
হা হা হা হি হি হি হা

তাক্ ঝাঁ ঝাঁ
উয়র গিজা,
ঘিনি তাক্ তাক্
নাগ্‌লী গিজা।
চণ্ডীতলায় ঢোল বাজে!—
দৈত্য দানব ওই সাজে!—
(বলি)
সুপ্তি নিতে
মুক্তি দিতে
মুণ্ড কাটা
বুকের পাটা!
ছর্ ছর্ ছর্
রক্ত পিতে'
অৰ্দ্ধ চন্দ্ৰ ধূম-আকাশ!
খিটি তাক্ তাক্ তা।
ঢাক ঢোল বাজে ঝাঁ
নিকি তাক্ তাক্
খিটি তাক্ তাক্
নাগ্‌লা গিজা
গি ঝান্তা—
চণ্ডীতলায় ঢাক বাজে!—
রুদ্র শুভ্র ওই সাজে।—
(ধ্যান)
হর হর সুন্দর
ভোলা দিগম্বর
ভূতনাথ মহেশ্বর;
বেদ আগম, পুরাণ সংহিতা
ত্রিবিধ স্বর গ্রাম
সৰ্ব্বহন্তা হা।
খিটি তাক তাক তা!

বাজ বাজ না
সাজ সাজ না
চণ্ডীতলায় ঢোল বাজে!—
ভূত-প্রেত-তাল ওই সাজে!—
অবতরি সুন্দরী
কালী দিগম্বরী
ভীমা-বেশী, মহেশ্বরী;
জায়া-শিবম্, ত্রিলোক-সংস্থিতা,
দাত্রী পরিত্রাণ
মুণ্ডমালিনী মা।
তাকি তাকি ঘিনি তা!

বাজ বাজ না
সাজ সাজ না
চণ্ডীতলায় ঢাক বাজে!—
আয়রে সবাই মার কাজে!—
(বুক্তি)
জগৎ মাঝে
মায়ের কাজে
পড়ল সাড়া
জয় মা তারা
জয় মা তারা—
নিকি তাক তাক
খিটি তাক্ তাক
উয়র গিজা
গি ঝান্তা!
চণ্ডীতলায় ঢোল বাজে!—
আর কি তোদের ঘুম সাজে!—

শান্তি পাল

অসামঞ্জস্য

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

উখরা গ্রামে বিরাট রথের মেলায় পাঁচ সাত খানা গ্রাম থেকে বহু নরনারীর সমাগম হয়। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে প্রতি বছরে মেলা বসে আসছে। দুর্গম গড় জঙ্গলের পাশে খানিকটা স্থান পরিষ্কার করা আছে, মেলা বসে সেখানে।

মেলা যেখানে শেষ হয়েছে তার পাশে অনেকগুলি তাঁবু পড়েছে। গ্রামের যারা বিশিষ্ট ব্যক্তি, এক মাসের খাদ্য ও ব্যবহার উপযোগী জিনিষ সঙ্গে করে নিয়ে এসে সেখানে বসবাস সুরু করে।

দিনের সুরু থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্থানটা সমারোহ ও কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকে। সন্ধ্যা সমাগম হলে ভীড় অনেক কমে আসে, কারণ জঙ্গলের এত কাছে রাত্রে থাকাটা বিশেষ নিরাপদ নয়।

মেলার ইতিহাসে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের ভেতরে রাত্রিকালে এমন কি ঘন দিবালোকেও অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে গেছে। মনে আতঙ্ক থাকলেও লোক সমাগম ঠিকই হয়।

জঙ্গলের ফাঁক থেকে অজয় নদীর রক্তাভ বালুরাশি দেখা যায়। নদীতে জল নেই। মাঝে মাঝে ক্ষীণ জলস্রোত। নদীর একটা দিক ঘন বনে সমাচ্ছন্ন, অপর পারে অন্য গ্রাম।

নদীর উত্তপ্ত বালুরাশির উপর দিয়ে অজস্র ভিন্ গ্রামের লোক পায়ে হেঁটে এপারে মেলায় আসে। প্রশস্ত নদী পার হয়ে এদিকে আসতে তাদের যে অবসাদ ও ক্লান্তি আসে মেলা দর্শনে ও আমোদ প্রমোদে সবটুকু সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়।

ম্যাজিক্, যাত্রা, সঙ্গীত প্রভৃতি আমোদের ব্যবস্থাও প্রচুর পরিমাণে থাকে।

মেলা বেশ জমে উঠেছে। সব শেষের তাঁবুর পরদা সরিয়ে তের বছরের একটা মেয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

সূর্য্য তখনও অস্ত যায়নি। বনানীর উপর রক্তাভ বর্ণ-রেখা। মুখর গ্রামের বুকে মনোরম সান্ধ্যশ্রী!

তাঁবুর ভেতর থেকে ধমকের সুরে বলতে শোনা গেল, সন্ধ্যা, যাস্‌নে বলছি। মেরে পা ভেঙ্গে দোব। ভেতরে আয়।

সন্ধ্যা তার সুন্দর মুখখানা ফিরিয়ে বলল, নিশ্চয় যা'ব। আমি দৌড়ব। ধর দেখি আমায়।

পর্দ্দা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল এক প্রৌঢ়া। তারপর ঈষৎ ক্রোধের সঙ্গে বলল, লক্ষ্মী মা আমার, একলা যাসনে, কাল সকালে আমি তোকে নিয়ে যাব।

সন্ধ্যার আয়ত দুটী চোখ ছল ছল করে উঠল, অভিমানের সুরে বলল, আচ্ছা গো আচ্ছা, আমি যাব না। এ রকম জানলে কে তোমার সঙ্গে আসত।

হেসে প্রৌঢ়া বলল, তাই নাকি রে, তোর মাকে বুঝিয়ে নিয়ে এলুম কিনা। তখন'ত মেয়ে কেঁদে লুটোপুটি, পিসিমা তুমি আমায় নিয়ে চল। দাঁড়া কালই তোকে নিয়ে যাচ্ছি।

সন্ধ্যা ব্যথিত দৃষ্টিতে দূরে মেলার জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করল। আসন্ন সন্ধ্যার রক্তিম বর্ণচ্ছটা সন্ধ্যার সারা দেহে পড়েছে। কিশোরী সন্ধ্যার অপরূপ রূপরাশিতে স্থানটি আলোকিত হ'য়ে উঠেছে।

দুর্গামণি স্নেহের দৃষ্টিতে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে রইল। মনে মনে ভাবল, এ রূপ নিয়ে সন্ধ্যার রাজার ঘরে জন্মান উচিত ছিল।

খুব স্নেহার্দ্র কণ্ঠে দুর্গামণি বলল, আয় মা ভেতরে আয়, আমি আর কিছু বলব না।

সন্ধ্যা কাঁদ কাঁদ সুরে বলল, খুব হয়েছে, বকুনি দিয়ে এখন আবার সোহাগ হ'চ্ছে। আমি যেতে চাই না, কালই আমি বাড়ী যাব।

দুর্গামণি হেসে তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেল।

সন্ধ্যা একটা অর্জ্জুন গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। তার

মনে হ'ল পিসিমা'ত ভেতরে চলে গেছে, এই বেলা সেত ছুটে মেলা দেখে আসতে পারে। কত ভাল ভাল খেলনার দোকান, খাবারের দোকান। সব চেয়ে ভাল লেগেছে তার ম্যাজিক। কাঁচ খাওয়া, তাসের খেলা দেখান, লাঠিতে ভর দিয়ে শূন্যে শুয়ে থাকা। লাঠিতে ভর দিয়ে যে লোকটা নানা রকম কৌশল দেখাচ্ছিল, কি বিকট তার চেহারাটা। গোল গোল ছোট চোখ, দৃঢ় সবল মাংসপেশী। খেলা হয়ে যাবার পর লোকটা তার দিকে পিট পিট করে চেয়ে হাসছিল। সে চোখের কি দীপ্তি! সন্ধ্যার কিন্তু ভয়ে বুকের ভেতর দুর দুর করছিল। এত লোক থাকতে লোকটা তার দিকে চাইছিল কেন।

সন্ধ্যা এখুনি ছুটে যেতে পারত, কিন্তু ঐ লোকটাকে আবার যদি দেখতে পায়। অন্যমনস্কভাবে সন্ধ্যা অপর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

দূরে ঘন বোয়ান ঝোপ। ঝোপের মাঝে একটা উঁচু পাথর, অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। পাথরের ও পাশ থেকে কয়েকটা দীর্ঘদেহ লোক লাঠি হাতে বের হয়ে তার দিকে আসতে লাগল।

সন্ধ্যা কিছুক্ষণ সে দিকে চেয়ে থেকে তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভেতর ঢুকতে গেল, এমন সময় দেখল তার পাশেতে নিঃসাড়ে দীর্ঘাকৃতি একটী লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় রুমাল বাঁধা, হাতে লম্বা লাঠি।

সন্ধ্যা শিউরে চেঁচিয়ে উঠল। লোকটা খুব সোহাগের সুরে বলল, কাঁদছ কেন খুকি? আমি কি বাঘ! আরো একটু নিকটে এগিয়ে এসে বলল, কোন তাঁবুতে থাক?

সন্ধ্যা তার শুভ্র কোমল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে তাদের তাঁবুটা দেখিয়ে দিল।

লোকটা বলল, মেলা দেখতে যাবে খুকি?

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বলল, না। তারপর কেঁদে বলল, পথ ছাড় আমি ভেতরে যাব।

লোকটা হাসল। তারপর বলল, কাল মেলায় গেলে আমার ওখানে যেও। ভাল খেলা, ম্যাজিক দেখাব। যাও, তুমি ভেতরে যাও।

সন্ধ্যা সত্বর তাঁবুর ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর ঈষৎ পর্দ্দা সরিয়ে দেখতে গেল, লোকটা সোজা গিয়ে সেই দীর্ঘদেহ লাঠি হাতে লোকগুলোর সামনে দাঁড়াল। ওকে দেখে সকলে মাথা নীচু করল। তারপর পুনরায় তারা বিপরীত দিকে জঙ্গল অভিমুখে চলতে সুরু করল।

সন্ধ্যা তখন গভীর হ'য়ে এসেছে। ধীরে ধীরে মূর্ত্তিগুলো অদৃশ্য হ'য়ে গেল। শুকনো পাতার উপর তাদের পায়ে চলার অস্পষ্ট খস খস আওয়াজ কিছুক্ষণ শোনা যাচ্ছিল।

* * *

রৌদ্র তখনও প্রখর ভাব ধারণ করেনি। প্রকৃতি তখন নিঃশেষিত প্রভাতের সীমায়। বন্যকুক্কুট ও আর আর পাখীর কলরবে চারিদিক মুখরিত। মেলাতেও মানুষের কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে কোলাহলে পরিণত হ'তে সুরু হয়েছে।

দুর্গামণি স্নান আহ্নিক সেরে উঠে ডাকল, সন্ধ্যা, ডুরে শাড়ীটা পর, ছাওয়া থাকতে মেলা থেকে কিছু হাট করে নিয়ে আসি।

বলবার আগেই সন্ধ্যা ডুরে কাপড়টা পরে প্রস্তুত ছিল। দুর্গামণির ডাকে রাগের ভাণ করে সে বলল,—বাড়ী চল পিসিমা, মেলা দেখে কি হ'বে। আমি যাব না।

দুর্গামণি মুচকে হাসল। মনে মনে বুঝল, সন্ধ্যার অভিমান হয়েছে। সন্ধ্যার খুব নিকটে এসে, মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল,—রাগ করিসনে মা, আর তোকে কিছু বলব না। তোর যতক্ষণ ইচ্ছে তুই ওখানে ঘুরে বেড়াস। চল আর দেরী করিসনে।

মুখখানা ঈষৎ ঘুরিয়ে দুষ্টামির হাসি হেসে সন্ধ্যা বলল, বা, রে মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে গিয়ে আমার বল খোঁপা যে খারাপ করে ফেললে, আর বাবু তোমায় আদর করতে হবেনা। চল।

তাঁবুর সামনে সরু অসমতল পথ মেলা পর্য্যন্ত চলে গেছে। পথের মাঝে সন্ধ্যা ও দুর্গামণির সঙ্গী জুটে গেল। সন্ধ্যার গাঁয়ের লোক তারা।

গীতা সন্ধ্যার বয়েসি। গীতার মাকে পেয়ে দুর্গামণি গল্পে খুব মেতে গেল। সন্ধ্যা ও গীতা হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হ'তে লাগল।

সন্ধ্যা বলল, তোরা কোথা যাচ্ছিস ভাই?

গীতা বলল, আমার এক কাকা থাকেন ঐ ওখানে।

সন্ধ্যা গীতার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ মত সে দিকে চেয়ে দেখল তাঁবুর সামনা সামনি একটা দূর প্রসারিত রুক্ষ প্রান্তর, তার ওধারে সারি সারি কয়েকখানা ঘর। ওর মধ্যে একখানা গীতার কাকার বাড়ী।

সন্ধ্যা বলল, একলা ভাই হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। তুই রোজ আসবি, একসঙ্গে ঘুরব। তার মুখ খুসিতে ভরে উঠল।

গীতা বলল তুইও আমার বাড়ীতে যাবিত ভাই?

সন্ধ্যা হেসে বলল, নিশ্চয়।

গল্প করতে করতে তারা মেলায় এসে পড়ল।

সূর্য্য তখন মাথার উপর খরতর হয়ে উঠেছে। বিচিত্র জিনিষ দেখতে দেখতে তারা যেখানে ম্যাজিক দেখান হচ্ছিল সেখানে এসে পড়ল।

বাঁশের মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে একটা লোক নানা ভঙ্গীতে কথা বলছে, আর কয়েকটা বল নিয়ে নিপুণতার সঙ্গে লোফ-লুফি করছে।

সকলে সেখানে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যা দেখল কালকের সেই দীর্ঘকায় লোকটা।

সন্ধ্যাকে দেখে সে হাসল। বিস্ময়ে গীতা বলল, তোকে দেখে হাসছে কেন রে?

মুখ অন্তদিকে ঘুরিয়ে সন্ধ্যা বলল, যা।

মঞ্চের সামনে ছেঁড়া চট ও সতরঞ্চি পাতা, দর্শকদেরে বসে খেলা দেখবার জন্তে।

দুর্গামণি তাদের নিয়ে সামনে বসল। সন্ধ্যার ইচ্ছা ছিল না সামনে গিয়ে বসা। দুর্গামণি ও গীতার জেদে তাকে বাধ্য হয়ে বসতে হ'ল।

খানিক পরে ঘণ্টা পড়ল। প্রথমে অন্য লোকেরা এসে নানা বিস্ময়কর ম্যাজিক দেখাতে লাগল। তারপর বেরিয়ে এল সেই দীর্ঘ লোকটা।

লোকটা খেলবার আগে তার পরিচয় দিল। সে বলল, আমার নাম রতন সর্দ্দার, এ অঞ্চলের সকলেই নিশ্চয় আমার নাম শুনেছেন। লাঠির বিভিন্ন কৌশল দেখাবার জন্যে অনেকে আমাকে অনুরোধ করেছেন। অতএব লাঠিখেলা আমি প্রথমে দেখাব।

রতন সর্দ্দারের নাম শুনে অধিকাংশ দর্শকের মুখ ঘোলাটে হ'য়ে গেল। তার মত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও সাহসী ডাকাত এ-অঞ্চল কেন সারা জেলার মধ্যে দু'টো নেই। দারোগা বাবুরা পর্য্যন্ত তার সঙ্গে প্রাণের ভয়ে পাল্লা দিতে চায় না।

সন্ধ্যা বড়দের মুখে রতন সর্দ্দারের বিষয় বহু ভয়াবহ ঘটনা শুনেছে। ছোট বেলায় সন্ধ্যা না ঘুমোতে চাইলে, তার মা তাকে ভয় দেখাবার জন্য বলত, ঘুমো, না হ'লে রতন সর্দ্দারকে ডেকে দোব। তার নামেই মনে তার আতঙ্ক সৃষ্টি করত।

একবার রতন তাদের গ্রামে গেছল। তিন দিন সেখানে সে ছিল। সারা গ্রামের লোক আতঙ্কে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ঐ কয়দিন কাটিয়েছে। রাত্রে কেউ বাড়ীর বাইরে এক পা দিত না। সন্ধ্যা সে কয়দিন কথার মোটে অবাধ্য হয়নি। শেষদিনে যে দিন রতন গ্রাম ছেড়ে যায়, সেদিন নিশুতি রাতে গ্রামে ভীষণ কান্না ও কোলাহল শোনা গেছল। পরদিন জানা গেল, মুখার্জ্জিদের বাড়ী ভীষণ ডাকাতি হ'য়ে গেছে,—অমানুষিক প্রহার পর্য্যন্ত। সকলে অনুমান করল রতন সর্দ্দারের কাজ।

সেই রতন সর্দ্দারের এত সন্নিকটে সে। গীতা ও দুর্গামণির মুখের দিকে চেয়ে দেখল, তাদের মুখও ভয়ে বিবর্ণ। লাঠির উপর ভর দিয়ে রতন অলৌকিক ক্রীড়া দেখাতে লাগল। সকলে তারিফ করতে লাগল। সন্ধ্যার দিকে চোখ পড়তে রতন হেসে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ এ খেলা এবার শেষ হয়েছে।

সন্ধ্যাও মাথা নেড়ে জবাব দিল।

দুর্গামণি ও গীতা আতঙ্কে ও বিস্ময়ে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করল, ডাকাতটা তোকে দেখে হাসে কেন রে? চাপা ক্রন্দনের সুরে দুর্গামণি বলল, ও বাবা গো, কি হ'বে আমার।

সন্ধ্যা সাহস সঞ্চয় করে বলল, ওর সঙ্গে কাল আমার আলাপ হ'য়েছে, আমায় কত আদর করেছে।

দুর্গামণি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, বলল, কাল সাপ, ওদের আবার আদর। ধমক দিয়ে সন্ধ্যা বলল, তুমি যদি পিসিমা অমন করে চিৎকার কর আমি ওকে বলে দোব।

চোখ কপালে তুলে দুর্গামণি বলল, মেয়ে বলে কি।

মড়ার মাথা হাতে নিয়ে রতন আবার খেলা দেখাতে এল। গলা চড়িয়ে বলল, এবার যাদু খেলা দেখাব। মড়ার মাথা আমার কথার জবাব দেবে।

সকলের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। ফিস ফিস করে কেউ বলল, স্বহস্তে হত্যা করা এ রকম মড়ার খুলি ওর অনেক আছে।

গীতা ও সন্ধ্যা দুর্গামণির গলা জড়িয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। দুর্গামণি মনে মনে রাম নাম জপ করতে লাগল।

সন্ধ্যা দু'হস্তে মুখ ঢাকা দিয়ে একটা চোখ আড়ভাবে রতনের দিকে নিবদ্ধ করে রইল।

মড়ার মাথাটা নামিয়ে রেখে, রতন লাল সিঁদুর খানিকটা মাখিয়ে দিল, তারপর বিড় বিড় করে অনেকক্ষণ কি বলল।

দর্শকদের দিকে চেয়ে রতন বলল, আমি ওর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলুম। আপনাদের মধ্যে যদি কেউ ইচ্ছা করেন, ওকে প্রশ্ন করতে পারেন।

দর্শকদের মধ্যে কথার উত্তর কেউ দিল না।

সন্ধ্যাকে রতন বলল, তুমি কিছু বলবে খুকি? সন্ধ্যার কথা বলবার আগেই দুর্গামণি যোড়হাতে মিনতি করে বলল, না বাবা। ও কিছু বলবে না, আমরা বড় গরীব। দোহাই বাবা।

রতন হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মড়ার মাথাকে রতন নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সকলে দেখল, মাথাটা নড়ছে, উপরে উঠছে নীচে নামছে। নাকিস্বরে মড়ার মাথা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

উজ্জ্বল দিনের আলোতেও সব ভয়ার্ত্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। সন্ধ্যার স্খলিত তনু প্রদীপের শিখার মত কাঁপতে লাগল। দুর্গামণি আরো নিবিড় করে সন্ধ্যাকে বুকে চেপে ধরে ঘন ঘন রাম নাম করতে লাগল।

রতন সন্ধ্যাকে জিজ্ঞেস করল, খুকি ভয় করছে?

দুর্গামণি অসহায় দৃষ্টিতে রতনকে বলল, থাক বাবা।

* * *

গভীর রাত্রি। পৃথিবীর বুকে পরিপূর্ণ স্তব্ধতা। মাঝে মাঝে বাতাসের শন শন আওয়াজ, বনানীর পত্র-মর্ম্মর, দু'একটা ভুতুম পেঁচার বিকট ডাক সৌম্য নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করবার চেষ্টা করে।

নিদ্রিত দুর্গামণির বুকের কাছে সন্ধ্যা শুয়ে আছে। অদূরে প্রদীপের ক্ষীণ শিখা বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সন্ধ্যার চোখে ঘুম নেই। ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে ক্ষীণ আলোকে সে একবার এদিক ওদিক চেয়ে দেখছে আবার মুখটা দুর্গামণির বুকের ভেতর লুকিয়ে ফেলছে। তার মনে হচ্ছে টক্ টকে সিঁদুর মাখান মড়ার মাথাটা ঘরের চারিপাশে ছোটাছুটি করছে, আর তার দিকে চেয়ে খিল খিল করে হাসছে।

সহসা সন্ধ্যা তাঁবুর পাশে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ শুনতে পেল। মিনতির সুরে যেন কে বলল, বাবা। প্রাণে মেরো না আমাদের, যা আছে সব নিয়ে যাও।

ভারি গলায় ধমকের সুরে অপর একজন উত্তর দিল, চুপ। আবার অস্ফুট গোঁ-গোঁ আওয়াজ।

সারা দেহ সন্ধ্যার হিম হয়ে আসতে লাগল। দ্বিতীয় আওয়াজটা তার মনে হ'ল রতনের গলার। বুকে ভর দিয়ে সে একটু এগিয়ে এসে তাঁবু ঈষৎ সরিয়ে দেখতে পেল,—অর্জ্জুন গাছের পাশে হাতে মস্ত লাঠি নিয়ে রতন দাঁড়িয়ে আছে। গাছের পাতার ফাঁক থেকে রূপালি চাঁদের এক টুকরা আলো রতনের মুখে পড়েছে, তার সামনে একটা লোক উপুড় হ'য়ে পড়ে আছে,—আর মাঝে মাঝে গোঁ-গোঁ শব্দ করছে।

অদূরে তাঁবুর ভেতর থেকে এক নারী মূর্ত্তি বেরিয়ে এল। হাতে একটা পুঁটলি। রতনের সামনে যোড় হাত করে বসে কেঁদে সে বলল, আমার স্বামীকে প্রাণে মেরো না, আমার যথা সর্ব্বস্ব পুঁটলিতে আছে। রতন পুঁটলিটা তুলে নিল। নারী মূর্ত্তি স্থাণুর মত সেখানে বসে রইল।

সন্ধ্যার মনে হ'ল রতন অপলক নেত্রে তাদের তাঁবুর দিকে চেয়ে রয়েছে, তারপর যেন সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সন্ধ্যার সমস্ত দেহটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। পরে কি হ'ল আর সে জানে না।

* * *

ভোরে দুর্গামণির ডাকে সন্ধ্যার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ

রগড়ে সে উঠে বসল। তার তখনও মনে হ'চ্ছে লাল টক্ টকে সিঁদুর মাখান মাথাটা, অন্ধকারে লাঠি হাতে রত্নের মূর্ত্তি,—চাপা গোঁ-গোঁ আওয়াজ। সন্ধ্যা চমকে উঠল। এক রাত্রে তার মুখ হ'য়ে গেছে শীর্ণ, রক্তশূন্য।

দুর্গামণি সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোর অসুখ করেছে নাকি রে?

অন্যমনস্ক ভাবে সন্ধ্যা বলল, না পিসিমা।

দুর্গামণি উর্দ্ধে চেয়ে যোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে মনে মনে বলল, মা তারা। আমাদের বাঁচা। ডাকাতটার দৃষ্টি থেকে বাঁচা, তোকে সন্তুষ্টি করে পূজো দোব। তারপর সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বলল, বাইরে জল আছে মুখ হাত ধুয়ে আয়। আর কোথাও যেন যাসনে।

সন্ধ্যা বাইরে এসে অর্জ্জুন গাছের তলায় দাঁড়াল। যেখানে লোকটা কাল রাত্রে পড়ে গোঁ-গোঁ করছিল সেই স্থানে সন্ধ্যার চোখ পড়ল। ঘাসের ওপর চাপড়া রক্তের দাগ। সন্ধ্যার মনে হ'ল নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে। সামনের তাঁবু শূন্য, জনমানব সেখানে নেই।

পিছনে খস্ খস্ পায়ের আওয়াজ পেয়ে চমকে সে ফিরে চাইল। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে রতন। কাল রাত্রের মত রতনের চোখে মুখে সে রূঢ় নৃশংসতার ভাব নেই। অত্যন্ত সহজ সরল সে অবয়ব। সন্ধ্যা চোখ তুলে চেয়ে থাকতে পারল না।

রতন বলল, কেমন আছ খুকি!

সে ডাকের ভেতর ফুটে উঠল নিবিড় আন্তরিকতা ও স্নেহের ধারা। প্রথমটা সন্ধ্যার মুখ থেকে কোন কথা বের হ'ল না, তার গলাটা যেন কে টিপে ধরে আছে।

রতন আবার জিজ্ঞেস করল।

সন্ধ্যা বলল, ভাল আছি।

রতন বলল, তোমার নাম কি খুকি?

সন্ধ্যা বলল, আমার নাম সন্ধ্যা।

রতন জিজ্ঞেস করল, তোমার কে কে আছে?

সন্ধ্যা বলল, মা, বাবা, পিসিমা! তার স্বর কেঁপে উঠল।

রতন বলল, তোমার ভাই নেই।

সন্ধ্যা বলল, না।

রতন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। সাহস করে সন্ধ্যা রতনের মুখের দিকে চাইল।

প্রভাতের স্বচ্ছতা সে মুখে।

রতন সন্ধ্যার আরো নিকটে সরে এল। সন্ধ্যার মোটেই ভয় করল না, সমস্ত ভয় তার মন থেকে হঠাৎ চলে গেছে।

রতন বলিল, আমায় তোমার ভাই করবে সন্ধ্যা?

নিতান্ত পরিচিতের মত সন্ধ্যা বলল, তুমি ডাকাত, মানুষ খুন কর! আমায় যদি মেরে ফেল।

রতন বলল, আমায় যদি তুমি ভাই বল সন্ধ্যা, আমি সব ছেড়ে দোব।

সন্ধ্যা নির্ভীকভাবে বলল, তুমি কাল রাত্রে কি করেছ, আমি দেখেছি। তোমার মানুষ মারতে মায়া করে না রতন দা।

ছল ছল চোখে রতন বলল, সন্ধ্যা আমায় ক্ষমা কর। আমি আর করব না, তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি। কিছুক্ষণ থেমে আবার বলল, আমায় দাদা বলে আবার ডাক সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার কোমল হাত রতন তার সবল দুটো হাতের ভেতরে ধরে রইল। সারা মুখে তার অনুশোচনার তীব্র ছাপ। মুগ্ধ হ'য়ে সন্ধ্যা দেখল এখনকার রতনের সঙ্গে সে রতনের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

সন্ধ্যা বলল, ভেতরে চল রতন দা। পিসিমার সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দিই।

দুর্গামণি ডালে সবে মাত্র কাঠি দিতে সুরু করেছে এমন সময় রতনের হাত ধরে সন্ধ্যা ভেতরে ঢুকল।

দুর্গামণি নিজের চোখকে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না, বাঁ হাত দিয়ে দুবার চোখ রগড়ে যখন সে সত্যই দেখল, রতন ছাড়া আর কেউ নয় তখন সে রীতিমত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল, মুখ থেকে কথা নিঃসৃত হ'ল না। শক্তিহীন দৃষ্টিতে সে একবার রতন ও সন্ধ্যার মুখের দিকে চাইল। প্রথম রতন কথা কইল,—আমি যে সন্ধ্যার ভাই পিসিমা।

দুর্গামণির মনে বেশ স্পষ্ট ধারণা হ'ল, এত আত্মীয়তা, নিশ্চয় ওর মনে কু-মতলব আছে।

তার মুখ আরো ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠল। করুণ মিনতির সঙ্গে সে বলল, রক্ষা কর বাবা!

রতন বলবার আগে সন্ধ্যা বলল, পিসিমা, রতন আমার দাদা হ'য়েছে, ও খুব ভাল লোক, আমায় ভালবাসে।

রতন এগিয়ে এসে দুর্গামণিকে প্রণাম করল,—নিশ্চল স্থাণুর মত দুর্গামনি স্থির।

সন্ধ্যা রতনের হাত ধরে বাইরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, পিসিমা, আমি রতনদার সঙ্গে মেলা দেখে আসি।

দুর্গামণি হাত তুলল, মুখ ফুটে বারণ করতে গিয়ে দেখল, গলা দিয়ে তার স্বর বের হ'চ্ছে না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। প্রকৃতির বুক হ'তে তপ্ত দ্বিপ্রহর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হ'য়ে গেল। পশ্চিমে ঘন শালবনের মাথায় সূর্য্য অস্তমিত প্রায়।

অনাহার ও চিন্তায় পরিশ্রান্ত হ'য়ে দুর্গামনি তাঁবুর বাইরে বসে রইল। কত লোক ফিরে গেল, রতন বা সন্ধ্যার কোন সন্ধান নেই। মনে তার নানারূপ অমঙ্গল ও ভয়াবহ চিন্তার উদয় হ'তে লাগল।

কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে জানে না, একটি কোমল হাতের স্পর্শে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার মুখ তৃপ্তি ও আনন্দে ভরে উঠেছে। হাতে একটা বড় পুঁটলি।

দুর্গামণির গলা জড়িয়ে সন্ধ্যা খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, ওমা তুমি কাঁদছ? রতনদা গাড়ী চাপিয়েছে মেলা দেখিয়েছে, কত ভাল কাপড় খেলনা কিনে দিয়েছে। আমি ওকে দিব্যি করিয়ে নিয়েছি ও আমাদের কেন্দুগ্রামের বাড়ীতে যাবে।

দুর্গামণি সন্ধ্যার কথা শুনে খুসি হ'ল না। মনে ভাবল মেয়েটাকে রতন যাদু করেছে। সন্ধ্যার মন রাখবার জন্যে দুর্গামণি আনন্দের ভাব দেখিয়ে বলল, রতন আবার কবে আসবে? পুঁটলি খুলে বিভিন্ন কাপড়ের রং মিলিয়ে দেখতে দেখতে সহাস্য মুখে সন্ধ্যা বলল, কাল সন্ধ্যের সময় আসবে। ক্ষনকাল থেমে সন্ধ্যা আবার বলল, রতনদার এক বোন ছিল পিসিমা, তাকে দেখতে ঠিক আমার মত, দু'বছর হ'ল সে মারা গেছে, আমাকে দেখলে রতনদার মনে হয় আমি তার সেই বোন।

দুর্গামণির মনে সন্দেহের কালো মেঘ ক্রমেই ঘনিয়ে উঠতে লাগল।

* * * *

ক্রমে সন্ধ্যার সাথে রতনের ঘনিষ্টতা এত নিবিড় হ'তে লাগল, যা দেখে দুর্গামণি ভাবল, সন্ধ্যাকে এখান থেকে সত্বর নিয়ে যেতে পারলে রতনটার হাত থেকে আপাততঃ পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

দুর্গামণি সন্ধ্যাকে ডাকল। অর্জ্জুন গাছের তলায় সন্ধ্যা উদ্‌গ্রীব নেত্রে রতনের আশার পথে চেয়ে রয়েছে।

দুর্গামণির ডাকে সাড়া দিয়ে সে ভেতরে গেল।

দুর্গামণি জিজ্ঞেস করল, বাইরে কি করছিলি সন্ধ্যা?

বিমর্ষভাবে সন্ধ্যা বলল, কাল থেকে রতনদা কেন আসেনি পিসিমা?

দুর্গামণি কথাটা যেন শুনতে পায়নি এমন ভাণ করে বলল, মুখুর্জ্জের কাছে শুনলুম, তোর মার খুব অসুখ। কালই আমরা যাব, কি বলিস?

সন্ধ্যা চুপ করে রইল।

পরের দিনও দুপুর পর্য্যন্ত রতন এল না। সন্ধ্যা কোন খাদ্য স্পর্শ করেনি, সমস্তক্ষণ কেঁদে কাটিয়েছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুর্গামণি গরুর গাড়ীর উপর সমস্ত জিনিষ চাপিয়ে সন্ধ্যাকে নিয়ে উঠে বসল।

সন্ধ্যার মুখে সে প্রফুল্লতা নেই। রতনের দেওয়া কাপড়, খেলনা সে নিজের কোলের কাছে রাখল।

গাড়ী চলতে সুরু করল। সন্ধ্যা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল, চোখ তার জলে ভরে উঠল।

আমলকি গাছের পাশ দিয়ে, মাঠ পেরিয়ে যখন তারা চাটুর্জ্জেদের পুকুর পাড়ে এসে পড়ল, এমন সময় কোলাহলের শব্দ শুনে সন্ধ্যা ফিরে চাইল।

শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রতন দাঁড়িয়ে, চারিপাশে তার পুলিশ ও বহু লোক।

সন্ধ্যা গাড়ীর উপর দাঁড়িয়ে উঠে ডাকল, রতনদা,—রতনদা,—আমি যাচ্ছি।

রতনের সবল দেহটা আন্দোলিত হ'ল—হাতে শৃঙ্খল ঝন্-ঝন্ করে বেজে উঠল। তারপর অসহায় শিশুর মত কেঁদে সে বলল, আমায় ভুলিসনি সন্ধ্যা,...আমি তোর কাছে যাব।

চলন্ত গাড়ী থেকে সন্ধ্যা লাফিয়ে পড়তে গেল। দুর্গামণি প্রাণপন শক্তিতে সন্ধ্যাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

* * * *

মাঠ বন পার হ'য়ে তারা অজয় নদীর বুকের উপর এসে পড়ল। মাথার উপর নিষ্প্রভ রক্তাভ চক্রবাল, দুপাশে অনন্ত রক্তাভ বালুরাশি।

সন্ধ্যার অপলক নেত্র মেলার দিকে নিবদ্ধ। কাণে তার তখনও বাজছে, আমায় ভুলিসনি সন্ধ্যা।

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

ভুলে যাই পৃথিবীরে

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তোমারে দেখিলে সব ভুলে যাই,—ভুলে যাই পৃথিবীরে
পৃথিবীর নদ নদী প্রান্তর সাগর ভূধর বন,
ফুলসম্ভারে অবনত বন চন্দ্র সূর্য্য তারা,
আকাশেরে ভুলি, ভুলি জোৎস্নায়,—দিবালোকে ভুলে যাই।

শুধু মনে পড়ে তুমি এসেছিলে সুন্দর সন্ধ্যায়,
ধারা বর্ষণ মুখর সন্ধ্যা,—রাত্রি আসিছে নেমে ;
কেয়ার গন্ধ ভাসিয়া আসিছে সজল বাতাস বেয়ে
অঞ্চলে তব ঢাকিয়া আনিলে স্নিগ্ধ প্রদীপটিরে,
সে বুঝি তোমার সান্ধ্যপ্রদীপ আপনার হাতে জ্বালা,
অভিসার করে ফিরিবে যখন দিশারী আঁধার পথে ?
সুন্দর তব মুখখানি আজ ভেসে ওঠে বারেবারে
নিশুতি রাতের মেঘ-বাতায়নে শতকোটি তারকায়।
দূরে দূরে তব কণ্ঠের সুর জলতরঙ্গে বাজে
গন্ধমদির কুঞ্জবনের ফুলদল পড়ে ঝরে'।
ফুলে ফুলে আর লতায় পাতায় নব কিশলয় বেয়ে
তব তনুদেহ-পেলবতা বুঝি এখনও গড়ায়ে পড়ে।
শুধু মনে পড়ে সুন্দর রূপ, সেই অপরূপ রূপ—
যা' দেখি ধরার রহিবাঙ্গনে বেধেছি মর্ম্মপুটে।
আমারে ভুলায় সেই তব রূপ—আর সব ভুলে যাই,
নিকটের সব মিলাইয়া যায় নিমেষে দূরান্তরে।

সঙ্গবিহীন অবসরে মোর নিরজন সন্ধ্যায়
কার সন্ধানে এসেছিলে জানি অভিসারিকার বেশে,
সে-কথা ত আমি ভুলি নাই প্রিয়া, ভুলিতে পারিনা আমি
আমারি সকাশে গতি-চঞ্চল আকুল অন্বেষণ
ভুলিব কেমনে অনুরাগ-রাগে সে তব আকিঞ্চন—
ভুলিতে পারিনা নয়ন-লোভন জ্যোতি-সুশোভন দেহ—
—দীপাধারে তব সন্ধ্যা-আরতি, লীলায়িত ভঙ্গিমা
নিঃসঙ্কোচ নিবেদন তবে নিবিড় নির্ভরতা
স্মৃতি-নভোতলে একলা জাগিয়া রহিয়াছে শুকতারা।
আর তারা নাই অসীম আকাশে তুমি শুধু উজ্জ্বল।

চোখে চোখে হ'ল মিলন মোদের শুভদৃষ্টির পথে,
বন-হরিনীর সে মন-হারিণী গভীর দৃষ্টিতলে
অতল সিন্ধু রহস্য ছিল স্মিত সহাস্যে ঢাকা,
কত কিছু পাই, কত যে হারাই সে-কথা থাকে না মনে।
কত না যুগের রহস্য যেন গোপন তোমার চোখে
মুগ্ধ নয়ন বিমুগ্ধ মন অনিমেষ চেয়ে থাকি।
সেই সে আমার পরমক্ষণের কামনা সফল করি
আমার সকল ভুবন ঘেরিয়া দাঁড়াইলে মনোরমা।
তাই ভুলে যাই এই পৃথিবীরে, শুধু করি অনুভব
মম আত্মার পরমাত্মীয়া—লীলা সঙ্গিনীটিরে।

দাক্ষিণ্যের পান্থশালায়—দীর্ঘ পথের শেষে
তোমারে পেলাম হে পথচারিণী—উদাসিনী মোর তরে,
শ্রান্তির পরে নামিল শান্তি নিবিড় তৃপ্তি-সুধা
শত জীবনের তৃষ্ণা মিটাল জ্যোৎস্না-বিভল রাতে।
তব নয়নের প্রসাদে পেলাম স্নিগ্ধ অমর জ্যোতি,
আমার কণ্ঠে পরালে যতনে কনক চাঁপার মালা
তব যৌবন নিকুঞ্জবন-ভবন উজল-করা
ভুবনমোহিনী মূরতি তোমার নয়নে আনিল মোহ।
অমৃতবল্লী প্রেম-রসায়ন আকণ্ঠ করি পান
পরিতৃপ্তির আবেশে তাইত ভুলে যাই পৃথিবীরে
ভুলে যাই মোর ইহ পরকাল, মর্ম্মের বেদীতলে
জ্বলে আনন্দে তব আরতির স্নিগ্ধ প্রদীপখানি।

পালাগানে মানুষ ও প্রকৃতি

শ্রীকামিনীকুমার রায় এম-এ

গত ১২।১৩ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন-এর সম্পাদনায় 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা' কয়েক খণ্ড প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গীতিকা দুইটি পূর্ব্ববঙ্গের সুদূর পল্লী অঞ্চলের বহু জ্ঞাত-অজ্ঞাত কবির রচিত এবং ৩।৪ শত বৎসর ধরিয়া নিরক্ষর কৃষক ও সাধারণ গৃহস্থশ্রেণীর লোকদের অনেকের মুখে মুখে সংরক্ষিত কতকগুলি পালাগানের সংগ্রহ। এই গুলির মধ্যে যেমন আছে ইতিহাস, তেমনি আছে কাব্য ও কাহিনী, বাংলার জন-মনের খাঁটি পরিচয়, গ্রাম্যদৃশ্য ও গৃহচিত্র। এ পর্য্যন্ত সাহিত্যামোদী অনেকেই ইহাদের নানাদিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহাদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাও পোষণ করেন। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত গ্রাম্যভাষায় রচিত হইলেও মূলপাঠে ও সম্পাদকের টীকাটিপ্পনীতে অনেক ভুলপ্রমাদ থাকা সত্ত্বেও এই গাথাগুলির অন্তর্নিহিত সরল সৌন্দর্য্যে অতি সাধারণ পাঠকও মুগ্ধ হন। প্রাণের কথা প্রাণের ভাষায় এমন ভাবে, এমন আন্তরিকতার সহিত উচ্চারিত হইয়াছে যে, তাহা শ্রেষ্ঠ কাব্যশিল্পের দাবী করে এবং অপরের হৃদয় স্পর্শ না করিয়া যায় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি এই সকল গাথাকাব্যে মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক এবং একের উপর অন্যের নিগূঢ় প্রভাব বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অনন্ত বৈচিত্র্যময় বিশ্বপ্রকৃতির সংস্পর্শে মানুষের চিত্তে প্রতি মুহূর্ত্তে নানা ভাবের উদয় বিলয় হইতেছে। যিনি কবি, যিনি শিল্পী, তিনি ভাষায় রেখায় সেই ভাবকে রূপায়িত করিয়া তোলেন; যাহা থাকে ব্যক্তিগত তাহা সার্ব্বজনীন হইয়া দেখা দেয়।

অনেকে বলিয়া থাকেন, বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতির 'স্বানুভাবাত্মক বা Subjective বর্ণনা' অতি আধুনিককালে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আরম্ভ হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে কবিরা প্রকৃতিকে প্রাণবান মনে করিয়া তাহার সহিত নিজেদের আনন্দ বেদনার ঘনিষ্ঠসংযোগ অনুভব করিতে পারিতেন না; অন্ততঃ সে-অনুভূতি তাঁহাদিগকে কাব্য-প্রেরণা দিত না; প্রসঙ্গতঃ প্রকৃতির শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়াই তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিতেন। কিন্তু আলোচ্য পালাগানগুলির রচয়িতাদের পক্ষে এই উক্তি সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, যদিও ইঁহারা স্বতন্ত্রভাবে প্রকৃতির বর্ণনা করেন নাই এবং যদিও ইঁহাদের কাব্যের মূল উৎস নর-নারীঘটিত প্রেম—তাহাদের শাশ্বত মিলনপিপাসা; পূর্ব্বরাগ, মিলন, বিরহ এবং যদিও মুখ্যতঃ এই প্রেম-সূত্রেই ইঁহারা প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি ইঁহাদের সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ ও আন্তরিক দৃষ্টির কাছে প্রকৃতির ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন পদার্থই জড় বা নিরর্থক ঠেকে নাই; সকলই গভীর অর্থপূর্ণ হইয়া মানুষের চিন্তা চেষ্টা ও আনন্দবেদনার মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। প্রকৃতিতে ও মানুষে যে যথার্থ জাতিভেদ নাই, উভয়ের মধ্যে যে নাড়ী চলাচলের যোগ আছে, একে যে অন্যের উপর নিগূঢ় প্রভাব বিস্তার করে, তাহা এই পল্লীকবিদের কাব্যের একটি বিশিষ্ট ও সুস্পষ্ট সুর। অথচ ইংরেজী সাহিত্যের বা ইংরেজী ভাবধারার সংস্রবে আসিবার সুযোগ ইঁহাদের জীবনে কখনো উপস্থিত হয় নাই। সুসভ্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতি হইতে বহুদূরে পল্লীর নিভৃত অঞ্চলে ইঁহারা জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বাহিরের কোনও শিক্ষালব্ধ সংস্কার বা ধারণা ইঁহাদের দৃষ্টি ও দ্রষ্টব্যের মধ্যে বাধা হইয়া দাঁড়ায় নাই। প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার এবং প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিবার ইঁহাদের সুযোগ ছিল।

বঙ্গ-পল্লী

শ্রীপূর্ণেন্দু দে ঘটক

বিচিত্রা
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

পালাগানগুলিতে মানব চিত্তের উপর প্রকৃতির নিগূঢ় প্রভাব অনেকস্থলেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বনে উপবনে ফুল ফুটিয়া থাকে; ভ্রমর স্বচ্ছন্দ গতিতে উড়িয়া বেড়ায়; আকাশে চাঁদ হাসে, সুধায় পৃথিবী ভরিয়া যায়; নদীর জলে ঢেউ খেলায়,—ছল্ ছল্ কল্ কল। প্রকৃতির এই স্বচ্ছন্দ গতি ও সহজ বিকাশের মধ্যে মানুষ আপনাকে সর্ব্বাংশে মিশাইয়া দিতে চায়। কিন্তু পাবে কই? তাহার চারিদিকে অনেক বাধা! সে-বাধা অতিক্রম করিয়া ফুলের মত ফুটিয়া ওঠা, চাঁদের মত হাসিতে পারা সহজ নয়। এই না-পারার বেদনা মানুষকে পীড়া দেয়; তাহার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া একটা করুণ সুর উত্থিত হয়। বাঞ্ছিতকে লাভ করিবার পথে,—নিজেকে সার্থক করিয়া তুলিবার পথে পদে পদে ব্যাহত হইয়া, আর প্রকৃতির স্বাধীন স্বচ্ছন্দবিহারী বিচিত্ররূপের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এখানে একজন নায়িকা কি করুণভাবেই না তাহার বেদনা ব্যক্ত করিতেছে:—

"ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধুরে যদি কেওয়াবনে।
নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার সনে।
তুমি যদি হইতেরে বন্ধু অসমানের চান।
রাত্র নিশা চাইয়া থাকতাম খুলিয়া নয়ান॥
তুমি যদি হইতেরে বন্ধু ঐ যে নদীর পানি
তোমারে চাহিয়া দিতাম তাপিত পরাণি॥"

বাদলধারা বিরহীদের মনে একটা তীব্র বিরহবেদনা জাগাইয়া তোলে। বাহিরে অবিশ্রান্ত জল ঝরিতেছে; মেঘ গুরু গুরু ডাকিতেছে; ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে; কদম্বের ডালে, লতায় পাতায় কত রংএর ফুল ফুটিয়া আছে; মানুষ ইহাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না; তাহার মন এই আবেষ্টনীর মধ্যে প্রিয়তমের সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। পল্লীকবির নায়িকাকেও তেমনি ব্যাকুল দেখিতেছি।

"কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়া গগনি।
ময়ূর ময়ূরী নাচে ধরিয়া পেখম॥
কদম্বের ফুল ফুটে বর্ষার বাহার।
লতায় পাতায় শোভে হীরামন হার।
মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা।
ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা॥"

প্রকৃতির রাজ্যে একটা আনন্দলীলা চলিয়াছে। চৈত্রমাস, গাছে গাছে নূতন পাতা, নূতন ফুল; কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর ভ্রমরী গুন্ গুন করিতেছে; মধ্যে মধ্যে কোকিল পঞ্চমস্বরে গাহিতেছে; থাকিয়া থাকিয়া দখিন হাওয়া বহিতেছে। প্রকৃতির এই বিপুল সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য মানুষ একাকী ভোগ করিয়া শান্তি পায় না; তাহার মন স্বভাবতঃই বাঞ্ছিতকে খুঁজিয়া ফিরে।

"দারুণ চৈত্রের হাওয়া দূর হইতে আসে।
আমার বঁধু এমন কালে রৈয়াছে বিদেশে॥
গাছে গাছে সোনার পাতা ফুটে সোনার ফুল।
কুঞ্জেতে গুঞ্জরী উঠে ভ্রমরার রোল।
ডালে বসে কোকিল ডাকে পুষ্পেতে ভ্রমর
এমন না কালে বঁধু গেল দেশান্তর॥"

কত দুঃখ কত নির্য্যাতন ভোগ করিবার পর মহুয়া ও নদের চাঁদের মিলন, তাহাদের ঘর সংসারের পত্তন। কোথায় তাহারা ঘর বাঁধিল? সামনে পাহাড়িয়া নদী, উপলখণ্ডে আঘাতের পর আঘাত করিয়া জল ছুটিয়াছে কল কল; চারিদিকে নানা রংএর ফুল, গাছে পাকা ফল; মধ্যে মধ্যে কোকিলের স্বর; প্রকৃতির এই আনন্দ-লীলার সঙ্গে প্রেমিক-যুগলের হৃদয়-ছন্দ নাচিয়া উঠিল:—

"এইখানে বাঁধ কন্যা নিজের বাসা ঘর।
এইখানে থাকিয়া মোরা কাটাইব দিন॥
সামনে সুন্দর নদী ঢেউয়ে খেলায় পানি।
এইখানে বঞ্চিব মোরা দিবস রজনী॥
চৌদিকেতে রাঙ্গা ফুল ডালে পাকা ফল।
এইখানে আছয়ে কন্যা মিঠা ঝরণীর জল॥"

অগ্রহায়ণ মাসে সোনার বর্ণ রাঙ্গা ধান মাঠে মাঠে পাকিয়া আছে; কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ভাবিতেছেন তাঁহার কন্যাটির যদি ঐরূপ একটি রাঙ্গা বর আনিয়া দিতে পারিতেন:—

"আগন মাসে রাঙ্গা ধান জমিনে ফলে সোনা।
রাঙ্গা জামাই ঘরে আনতে বাপের হইল মনে॥"

লোকালয় হইতে দূরে নদীর তীরে হিজল গাছ; কেওয়া ফুলের বন; তাহাতে ভ্রমরকুল অবিরাম গুঞ্জন করিতেছে। নায়কের ইচ্ছা হইল, প্রাণপ্রিয়াকে যদি প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে পাওয়া যাইত। সে বলিতেছে:—

"গাঙের পারে হিজল গাছ লো চিড়ল চিড়ল পাতা।
জলের ঘাটে যাইত কন্যাগো কইতাম মনের কথা॥
গাঙের পারে আছে কন্যা কেওয়া পুষ্পের বন।
নিরালা বসিয়া করতাম গো প্রেম আলাপন॥"

শুধু আনন্দের লীলাই নয়, প্রকৃতির ভিতর যে একটা বেদনার ধারাও বহিয়া চলিয়াছে, তাহা এই পল্লীকবিদের অন্তর্দৃষ্টির কাছে অনেকস্থলেই ধরা পড়িয়াছে।

শ্রাবণের জল অবিশ্রান্ত ঝরিতেছে; মাঠ ঘাট, নদী-নালা, কানায় কানায় ভরা। কিন্তু চাতকের পিপাসা মিটে কই? আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া তাহার জল পান হয় কই? তাই সে চারিদিকের পূর্ণতার মধ্যে চিত্তের অপূর্ণতা লইয়া থাকিয়া থাকিয়া গাহিয়া উঠে:—

"বৈরা বৈরা চাতক ডাকে বর্ষে জলধর।
না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর॥"

এই ভরা বাদলের দিনেই আর একটা পাখী বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর হইয়া 'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও' বলিয়া পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। মাথায় মুহুর্মুহু বাজ পড়িতেছে, জল-ধারার বিরাম নাই। কিন্তু পাখীটার সেদিকে লক্ষ্য নাই, দিন রাত্রি একইভাবে সে হৃদয়-বাঞ্ছিতকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া চলিয়াছে; তবু ত বাঞ্ছিতের মান ভাঙে না, আপনার বিরহ-বেদনার তবুত শেষ হয় না। পাখীর এই বিচ্ছেদ-যাতনা লীলা নিজের অন্তর্বেদনা দিয়া একান্তভাবে অনুভব করিতেছে,—নিজের দুঃখ দিয়া পাখীর দুঃখের রূপটি দেখিতেছে; সে বলিতেছে:—

"কোন বা বিরহী নারী হায় অভাগিনী।
অভেদ নাহিক জানে দিবস রজনী॥
শাওনিয়া ধারা শিরে বজ্রধরি মাথে।
বউ কথা কও বলি কান্দি ফিরে পথে॥
কাহারে সুধাওরে পাখী আমি নাহি জানি।
আমিও তোমার মত চির বিরহিনী॥"

যে বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া লতা বাড়িয়া উঠিয়াছে সেই বৃক্ষ যদি মরিয়া যায় তাহা হইলে লতার দুর্গতির সীমা থাকে না, সে দিন-দিন শুকাইয়া উঠে, তাহার পুষ্প পাতা ঝরিয়া পড়ে। পল্লীকবিরা সহকার ও স্বর্ণলতিকার মিলন-মাধুর্য্যই দেখেন নাই, আশ্রয়ের অভাবে আশ্রিতের যে কি দুর্দ্দশা হয়, তাহাও দেখিয়াছেন; গোলাপের শুধু সৌন্দর্য্যেই ভুলেন নাই, তাহার ভূলুণ্ঠিত ছিন্নদলগুলিও দেখিয়াছেন। তাই তাহারা ব্যথার সুরে বলিয়াছেন:—

'বিরক্ষ মইরা গেলে যেমুন গো ঝুইরা পড়ে লতা।
লতা যদি শুক্যা গেলগো ঝরে পুষ্প পাতা॥"

আবার প্রকৃতির আনন্দ বেদনা যেমন মানুষের চিত্তে দোলা দেয়, মানুষের সুখদুঃখও প্রকৃতিকে তেমনি অভিভূত করে। প্রকৃতিও মানুষের আনন্দ-বিষাদের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল। পালা-গানগুলির বহুস্থানে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

মহুয়ার হৃদয়-সর্ব্বস্ব নদেরচাঁদ। সেই নদেরচাঁদের সঙ্গে কতদিন পরে দেখা! কিন্তু বজ্র-কঠোর পিতা তাহাদের মিলনের অন্তরায়; শুধু তাহাই নহে, তিনি ঘুমন্ত নদেরচাঁদকে হত্যা করিবার জন্য কন্যা মহুয়ার হস্তে বিষাক্ত ছুরি তুলিয়া দিয়া পিতৃস্নেহের দাবীতে তাহাকে কর্ত্তব্য-পালনে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। নিজ হস্তে প্রাণ-প্রিয়তমকে হত্যা করিতে হইবে! মহুয়ার সেই মনের অবস্থায়, পিতার সেই নিষ্ঠুর আচরণে বিশ্বচরাচর যেন শিহরিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরের চন্দ্রতারা মুখ ঢাকিয়া ফেলিল, সোনালী জ্যোৎস্না রাত্রি অন্ধকারে বিবর্ণ হইয়া গেল:—

"ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সোনালী চান্নীর (চাঁদিনী) রাইত আঁধারে পড়ল ঢাকা॥"

দেওয়ান ভাবনার ঘরে সোনাই বন্দী। নিজে বন্দী হইয়া প্রাণপ্রিয়তমকে উদ্ধার করিয়াছে, জীবনে আর তাহার মুখ দেখিবারও আশা নাই। মুহূর্ত্ত পরেই কামোন্মত্ত দেওয়ান ছুটিয়া আসিবে, এক্ষণে দুই পথ তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত,—আত্মহত্যা, না হয় সতীত্ববিসর্জ্জন। সোনাইর মনের সেই অবস্থায় প্রকৃতি বিষাদময়, মৌন।—

"নিশি রাইত মেঘে আন্ধা আসমানে নাই তারা।
বারবাংলার ঘরে সুনাই চৌদিকে পাহারা॥"

সোনাই বিষের কৌটা খুলিতেছে, সে দৃশ্য দেখিয়া কেহই প্রফুল্ল থাকিতে পারে না:—

আসমান কালা জমীনরে কালা কাল নিশা যামিনী।
বিষের কটরা খুলে কন্যা জনম দুঃখিনী॥"

গর্গের অবিমৃষ্যকারিতায় 'সুরভি' গাভী নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে বিষ মাখানো ভাত খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কঙ্ক নিরুদ্দিষ্ট; আশ্রমে লীলা মুহ্যমানা। এই দৃশ্য যেমন করুণ, তেমনি মর্ম্মান্তিক। আশ্রমের মল্লিকা, মালতী, পশু, পাখী কাহারো প্রাণে এতটুকু আনন্দ নাই, সকলেই এলো থেলো, গভীর শোকাভিভূত :—

"মালতী মল্লিকা পড়ে ঝরিয়া ভূতলে।
ভ্রমর উড়িয়া যায় নাহি বসে ফুলে॥
নাহি খায় পুষ্প মধু না দেয় ঝঙ্কার।
বিপদ ভাবিয়া মুনি দেখে অন্ধকার॥
পুষিয়া পাখী যত নীরব খাঁচায়।
নাহি ডাকে কঙ্কে তারা না ডাকে লীলায়॥"

ধনীর দুলালী কমলাকে জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই দুঃখকষ্ট যে ভোগ করিতে হইবে তাহা যেন প্রকৃতি তাহার জন্মকালেই জানিতে পারিয়াছিল; তাই আত্মীয় বন্ধু সকলে যখন কমলার জন্মে আনন্দ-উৎসবে ব্যাপৃত, তখন প্রকৃতির মনে আনন্দ ছিল না;—আকাশ বাতাস বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল :—

"জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীদিন শুক্রবার যায়।
কালা মেঘে করে সাজ আসমানের গায়॥
রাত্রিশেষে জন্ম লয় এই অভাগিনী।
কমলা রাখিল নাম আদরে জননী॥"

প্রকৃতির আনন্দ-বেদনার সহিত মানবের আনন্দ-বেদনার এই নিবিড় সংযোগ এবং একের উপর অন্যের নিগূঢ় প্রভাব চিরন্তন। কিন্তু পালাগানগুলিতে যে জিনিষটি আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট করে তাহা হইতেছে,—প্রকৃতির সহিত মানুষের সামাজিকতা ও আত্মীয়তাবোধ। আমরা এখানে এক বৃহত্তর পল্লীসমাজের সম্মুখীন হই। এই সমাজ শুধু স্বজাতি বা বিভিন্নশ্রেণীর মানুষকে লইয়া নয়, মানুষের চতুঃপার্শ্বস্থ বিশাল বস্তু-জগৎ ও প্রাণীজগৎ—সমস্ত জলস্থল, আকাশ, গ্রহতারা, ফলফুল, পশুপাখীও এই সমাজের অন্তর্ভূত। এখানে মানুষের ন্যায় প্রকৃতির এক একটি রূপও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং গ্রামের উৎসবে ব্যসনে, সামাজিক আচার-বিচারে তাহাদের স্থান বা মূল্য কম নহে। মানুষে মানুষে যে সমাজ সে সমাজে অনেক সঙ্কীর্ণতা, অনেক ভেদ-ব্যবস্থা; কিন্তু প্রকৃতিতে ও মানুষে যে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে জাতিভেদ নাই, কুলীন অকুলীনের পার্থক্য নাই, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের বিচার নাই। এখানে একজন মানুষ আপনার পদমর্য্যাদাকে ঘরের একটা পোষা পাখীর বা বাগানের একটা ফুলের পদ-মর্য্যাদার চেয়ে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করে না, বা তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিতে, বিপদে আপদে তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে সঙ্কুচিত হয় না। ইহার মূলে রহিয়াছে প্রেম। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে পালাগানগুলির মূল উৎস নরনারীঘটিত প্রেম। এই প্রেমের দৃষ্টিতে পল্লীকবিরা, তাহাদের নায়ক নায়িকারা বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে এবং বিভিন্ন পদার্থের ভেদ-রেখা অস্বীকার করিয়া জড়ে অজড়ে, ক্ষুদ্রে বৃহতে, নিকটে দূরে, মানুষে, পাখীতে, ফুলে, চাঁদে,—এক কথায় মানবে ও মানবেতর জগতে একাকার করিয়া দেখিয়াছে। সামাজিক বা একদেশ-বাসের সংযোগ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখানে মানুষ প্রকৃতিকে যেমন দেখিয়াছে স্বজাতি, স্বশ্রেণী,—তেমনি দেখিয়াছে আত্মীয়, অন্তরঙ্গ। নিজেদের কথাবার্ত্তা হইতে পালা করিয়া প্রকৃতিকে কখনো বাদ দিতে পারে নাই।

উৎসবের বাড়ীতে দেখি, গানের আসরে গায়েন দাঁড়াইয়া সকলের শুভেচ্ছা প্রার্থনা করিয়া, সকলকে প্রণতি জানাইয়া গান আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার এই 'সকল' কাহারা? তাঁহার সর্ব্বানুভূতি শুধু মানুষের মধ্যে আবদ্ধ নয়; চারিদিকের জলস্থল, চন্দ্রসূর্য্য, তরুলতা, পশুপাখী সকলকেই তিনি আপনার চৈতন্যে পরিপূর্ণ করিয়া অনুভব করিতেছেন; তিনি দেখিতেছেন, তাঁহার গান শুনিতে কেবল মানুষই বসে নাই, চারিদিকে তরুলতা, পশুপাখীও উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে;—"উড়িয়া যায় পাখী আসি বসিল ডালেতে।" দূরস্থিত জলাশয়ের মীনটি পর্য্যন্ত তাঁহার চৈতন্য হইতে বাদ পড়িতেছে না। তাই গায়েন যেমন সভাস্থ লোকজনকে, তেমনি 'তরুলতা', 'বসুমাতা', 'মীন' প্রভৃতিকেও বন্দনা করিতেছেন :—

"চারকোনা পৃথিবী বন্দুম বন্দুম তরুলতা।
উপরে আকাশ বন্দুম নীচে বসুমাতা॥

পিতা বন্দুম মাতা বন্দুম বন্দুম জ্যেষ্ঠ ভাই।
যা হৈতে সুহৃদ এই ত্রিভুবনে নাই।
চন্দ্র সূর্য্য বন্দি গাই জগতের আঁখি।
যাহার প্রসাদে আমি রাত্র দিবা দেখি।
সাগর পর্ব্বত বন্দুম জলে বন্দুম মীন।
সভার চরণ বন্দি গাই আমি দীন হীন।"

মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করে—কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে। যে অত্যাচার প্রকাশ্যে হয়, সে অত্যাচারের সাক্ষ্য অনেকেই দিতে পারে এবং সুবিচারেরও আশা করা যায়; কিন্তু যে অত্যাচার লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি কৌশলে সংসাধিত হয়, তাহার কি বিচার নাই? তাহারও বিচার আছে। মানুষ সাক্ষী দুর্লভ হইলেও সর্ব্বব্যাপী প্রকৃতি সাক্ষীর অভাব হয় না। এই পালাগানগুলিতে দেখিতে পাই, অত্যাচারিতের পক্ষে বৃক্ষলতা, কোটি কোটি মাইল দূরের চন্দ্রসূর্য্য, এমন কি অত্যাচারের দিনের 'আঁখির পানি' টুকুও সাক্ষ্য দেয়। এখানে একজন অত্যাচারিতা অপরাধীর অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষী মানিতেছে:—

"সাক্ষী আমার চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী দেবগণ।
সাক্ষী আমার তরু লতা সাক্ষী পশুগণ॥
মায়ের মন্দিরে আমি সাক্ষী করি তারে।
আগুন পানি সাক্ষী আমার ডাকি সর্ব্ব দেবতারে॥
* * * *
সন্ধ্যাকালের তারা সাক্ষী সাক্ষী আঁখির পানি।
আর সাক্ষী হাতে আমার মামার পত্রখানি।

নারীর সবচেয়ে অপমান তাহার সতীত্বের উপর কলঙ্ক রটনা। এই অপমান আরও তীব্রতর হয় যখন তাহা প্রাণের প্রিয়তম হইতেই আসে। সপত্নীর চক্রান্তে কাজলরেখার উপর তাহার হৃদয়বাঞ্ছিতই সেই দারুণ অপবাদ দিলেন এবং উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়া তাহা খণ্ডন করিতে বলিলেন। সেই সঙ্কট-অবস্থায়ও কাজল ভীত হইলনা, সে 'দেব-ধর্ম্ম', 'চন্দ্রতারা', 'শুকপক্ষী', 'ঘরের বাতি' এবং 'কাইলের রাতি'—ঘটনার রাত্রিকে সাক্ষী মান্য করিয়া ধর্ম্ম-সভায় বিচারার্থী হইল:—

"সাক্ষী হইয়ো দেবধরম তোমরা সকলে।
সাক্ষী হইয়ো চন্দ্রতারা দেখছ নিশাকালে॥
শুকপক্ষী সাক্ষী মোর আর ঘরের বাতি।
আর কারে মানিব সাক্ষী সাক্ষী কাইলের রাতি॥"

বিচার হইয়া গেল; শুকপক্ষীর কথায় রাজা কাজলকে দ্বীপচরে নির্ব্বাসন দিলেন। বর্ত্তমান যুগে প্রকৃতির প্রাণস্পন্দন যাঁহারা অহরহ শুনিতে পান, এবং প্রকৃতিকে নিজেদের সগোত্র মনে করেন, তাঁহারাও এমন সঙ্কট-কালে প্রকৃতির উপর এতখানি নির্ভর করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

মা মরিয়া যাইতেছেন; দুই শিশুপুত্রকে স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয় যাইতে তাঁহার ভরসা হইতেছেনা, পাছে স্বামী আবার বিবাহ করিয়া পুত্রদের দুঃখকষ্টের কারণ হন। কিন্তু উপায় নাই; তাই অগত্যা তাহার এই দান-পত্রের এবং স্বামীর আর বিবাহ না করার প্রতিশ্রুতির সাক্ষীরূপে চন্দ্রসূর্য্য, কিতাব কোরাণ, নদীনালা, পাহাড় জঙ্গল, ও পশু পাখীকে রাখিয়া যাইতেছেন; স্নেহের দৃষ্টিতে কিতাব কোরাণ পর্য্যন্ত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পাখী পুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে:—

সাক্ষী থাক্য (থাকিও) চান্দ সুরুজ আরে দুই নয়নের আঁখি।
তার হাতে সপ্যা গেলাম আরে আমার পোষা পাখী॥
সাক্ষী থাক্য কিতাব কোরাণ আরে সাক্ষী যে তোমরা।
আলাল দুলালের (দুইশিশু পুত্রের) লক্ষ্য নাই সে তুমি ছাড়া॥
সাক্ষী অইয়ো নদী নালা জঙ্গলা পাহাড়ী (পাহাড়)।
বলের না পইখ পাখালী আমি তারে সাক্ষী করি॥
আশিত ভক্তাগী যাও আরে যাইবে ছাড়িয়া।
কোলের ছাওয়াল শিশুরে নেও কোলেতে তুলিয়া॥"

অভাবে পড়িয়া মানুষ যেমন তাহার আত্মীয় বান্ধবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাহাদের শৈথিল্যের জন্য আত্মীয়তার দাবীতে অনুযোগ করিতেও ছাড়ে না, তেমনি মেঘের কাছেও মানুষ এখানে হাত পাতিতেছে, তাহার অবিবেচনার জন্য তাহাকে মিঠাকড়া শুনাইতেছে। বৃষ্টির অভাবে সাইল ধান নষ্ট হইতে বসিয়াছে, কিন্তু মেঘের ত কোনই সাড়া পাওয়া যাইতেছে না! তাই কবি বলিয়া উঠিলেন:—

"কানা মেঘারে তুইন (তুই না) আমার ভাই।
এক ফোটা পানি দে সাইলের ভাত খাই॥"

কোথাও বা নায়ক তাহার প্রাণ প্রিয়তমাকে হারাইয়া পালিত কোড়া পাখীকে বলিতেছে :—

"বনের কোড়া মনের কোড়া জন্ম কালের ভাই।
তোমার জন্ত যদি আমি মনুর উদ্দিশ পাই॥"

প্রকৃতিকে কোথাও মানুষ এক-পরিবারভুক্ত করিয়া লইয়াছে। যেমন সে শ্রদ্ধা করিতেছে পিতাকে, ভক্তি করিতেছে গৃহের দেবতা শালগ্রাম-শিলাকে, তেমনি স্নেহ করিতেছে সুরভি গাভীকে, পাটলী বৎসকে, পালিত তোতা শারীকে, উদ্যানস্থিত তরুলতাকে। সুরভি ও পাটলী শুধু স্নেহাস্পদই নয়, তাহারা প্রাণের দোসর। বিদেশ গমনোদ্যত কঙ্ক যখন লীলাকে সংসারের ভার বুঝাইয়া দিয়া যাইতেছে, তখন প্রকৃতির প্রতি তাহার গভীর আত্মীয়বাৎসল্য উছলিয়া পড়িতেছে ; সে বলিতেছে :—

"রৈল রৈল লীলা তোমার তোতা শারী।
ক্ষীর সর দিয়া তারে পালিও যত্ন করি॥
রইল রইল রে লীলা পুষ্প তরু যত।
জল সেচন দিয়া পালিও অবিরত॥
রইল রইল রে লীলা মালতীর লতা।
আজি হৈতে রইল পইরা তোমার মালা গাঁথা॥
সুরভি পাটলী রইল রে লীলা প্রাণের দোসর।
তৃণজল দিয়া সবে করিও আদর॥
আমার লাগিয়া যদি তারা হয়রে দুঃখমনা।
গায়ে হাত বুলাইয়া করিও সান্ত্বনা॥
গৃহের দেবতা রইল রে লীলা শালগ্রাম শিলা।
শুদ্ধমনে পূজা তারে করিও তিন বেলা॥
তোমার আমার গুরুরে লীলা রইলেন পিতা।
জীবনে মরণে যিনি সাক্ষাৎ দেবতা॥"

লীলার আশৈশব সুখদুঃখের সাথী—একাধারে ভ্রাতা, বন্ধু, প্রাণ-প্রিয়তম কঙ্ক একদিন মধ্যরাত্রিতে নিরুদ্দেশ হইল, সে চারিদিকের ফুলে, পাখীতে, ভ্রমরে, চন্দ্রে তারায় কঙ্কের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এই জিজ্ঞাসার মধ্যে কৃত্রিমতা নাই, সম্পর্কের দূরত্ব নাই ; আছে গভীর আন্তরিকতা, প্রকৃতিকে মানবীয় অনুভূতিতে রঞ্জিত করিয়া দেখা, প্রকৃতির সহিত মানবচিত্তের বিনিময়। লীলা জিজ্ঞাসা করিতেছে :—

"মালতী বকুলে লীলা জিজ্ঞাসে বারতা।
তোমরা নি দেইখাছ আমার কঙ্ক গেল কোথা॥
পোষমানা পাখীগণে লীলা কান্দিয়া সুধায়।
তোমরা নি দেইখাছ কঙ্ক গিয়াছে কোথায়॥
উড়িয়া ভ্রমর বইসে মালতী বকুলে।
তাহারে জিজ্ঞাসে কন্যা ভাসি আঁখিজলে॥"

গর্গ কঙ্কের অনুসন্ধানে দেশ বিদেশে তাঁহার শিষ্যগণকে পাঠাইয়াছেন। লীলার আশঙ্কা হইতেছে, যদি তাহারা কঙ্ককে খুঁজিয়া না পায়, লীলা বাঁচিবে না, জীবনে আর কঙ্কের সহিত দেখা হইবে না তাই সেও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল না ; সূর্য্যকে, তারাকে, নদীকে নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করিল, কঙ্কের অনুসন্ধানে তাহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিল। সে সূর্য্যকে বলিতেছে :—

"পূবেতে উদয় রে ভানু পশ্চিমে অস্ত যাও।
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া কঙ্কের দেখা নি গো পাও॥
এমন আন্ধাইর নাইরে তোমার আলো নাহি পশে।
যাওয়া আসা ঠাকুর তোমার আছে সর্ব্ব দেশে॥
কহিও কহিও ঠাকুর আরে তুমি দিনমণি।
যাহার লাগিয়া আমি হইনু পাগলিনী॥
লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও।
আলোকে চিনাইয়া পথ দেশেতে আনিও॥"

কখনো বা ছুটিয়া নদীতীরে যাইতেছে, নদীকে বলিতেছে ;—

* * * *

"কত দেশে যাওরে নদী বহিয়া উজান।
কোথাও নি শুনিতে পাও নদী সেই বাঁশীর গান॥
পাহাড়ে পর্ব্বতেরে নদী তোমার যাওয়া আসা।
অভাগীরে ছাইড়া বন্ধে (বন্ধু) কোথায় লইল বাসা॥
লাগাল পাইলে রে তারে কইও লীলার কথা।
মিনতি জানাইয়া কইও দুঃখের বারতা॥"

কখনো বা আকাশের চন্দ্রতারাকে মিনতি জানাইতেছে :—

"রজনী কালের সাক্ষী শুন চন্দ্র তারা।
কোথায় হারাইল আমার নয়নের তারা॥
জাগিয়া পোহাইছি নিশি তোমরা ত জান।
কোন্ দেশে গেল বন্ধু বলহ সন্ধান॥
সপ্তসাগর তীরে পর্ব্বত জঙ্গলে।
যথা তথা যাও তোমরা এই নিশাকালে॥
অতি উচ্চে কর বাসা পাওত দেখিতে।
বল শুনি বন্ধু মোর গেল কোন পথে॥
শুন শুন শুনরে কথা যত তারাগণ।
তিলেকে বেড়াইতে পার এ তিন ভুবন॥
খুঁজিয়া দেখিও গিয়া আছে কোন স্থানে।
মরিবে অভাগী লীলা বলো তার কানে॥"

লীলা বাহিরের সকলকে নিজের দুঃখের কথা বলিয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ঘরের দিকে ফিরিয়া গেল।

গিয়া দেখে পালিত শুক ও শারী নিশ্চিন্ত মনে গান করিতেছে, তাহাদের প্রতি লীলার স্নেহের ভর্ৎসনার অবধি রহিল না। বনের পাখীর পক্ষে কষ্টের কথা বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু কষ্ট যাহাদিগকে ক্ষীর সর দিয়া লালনপালন করিয়াছে, কষ্ট যাহাদিগকে ভালবাসিয়াছে, তাহারা যদি প্রেমাস্পদের প্রতি এইরূপ শৈথিল্য দেখায়, প্রাণে বড় বাজে। তাই—

"পিঞ্জিরাতে শারী শুক গান করে বৈসে।
নিকটেতে গিয়া লীলা কান্দিয়া জিজ্ঞাসে॥
তোমরাত পিঞ্জরার পাখী নাহি থাক বনে।
তোমরা তাহার কথা ভুলিলে কেমনে॥
ক্ষীর সর দিয়া পাখী পালিল যেজন।
কেমনে তাহার কথা হইলে বিস্মরণ॥
এত যে বাঁসিয়া ভাল পালিল সকলে।
কি বলিয়া গেল বঁধু যাইবার কালে॥
কোন দেশে যাবেরে বলি কহিল ঠিকানা।
অবশ্য তোমাদের পাখী কিছু আছে জানা॥
ধরিয়া শারীর গলা লীলা কহিছে কান্দিয়া।
আগে আগে চল আমার পথ দেখাইয়া॥
উড়িয়া যাইতে রে পাখী আছে তোমার পাখা।
একদিন অবশ্য পথে হবে তার দেখা॥"

লীলা এইখানেই শান্ত হইল না, সে সত্য সত্যই খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল—

"উড়ায়ে খাঁচার পাখী বলে লীলাবতী।
ফিরায়ে কঙ্কেরে মোর আনহ ঝটিতি॥
উড়িয়া যাও হীরামণ তোতা উঠরে আকাশে।
শীঘ্রগতি চল মোর বন্ধু সেই দেশে॥
দেখিলে শুনাইও আমার দুঃখের গান।
বলিয়া কহিয়া আনিয়া তারে বাঁচাও লীলার প্রাণ॥"

মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সামাজিক সংযোগ এবং বিবিধ আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; সে প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গেরও উপরে স্থান দিয়াছে। মনের যে কথাটি অতি অন্তরঙ্গও জানিতে পারে না বা তাহাকে বলিতে নাই, প্রকৃতি তাহা অনায়াসে জানিয়া লয় এবং মানুষও নিঃসঙ্কোচে তাহা তাহার নিকট প্রকাশ করে। চন্দ্রাবতী নিজের মনো-রাজ্যের দিকে চাহিয়া দেখে কোন্ অজানা মুহূর্ত্তে জয়ানন্দ সেরাজ্যের একচ্ছত্র রাজা হইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু এই খবর ত' চন্দ্রা পিতাকে দিতে পারে না। সে মনের দ্বার চন্দ্রসূর্য্যকে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইল :—

"চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করি মনের দিকে চাইয়া।
জয়ানন্দ (কে) মাগে বর ধর্ম্ম সাক্ষী দিয়া॥"

প্রকৃতি অন্তর্য্যামী। বিচ্ছেদ-কাতরা লীলা নদীকে বলিতেছে,—তুমিত' আমার প্রাণের ব্যথা, আমার মনের যত আশা আকাঙ্ক্ষা সকলই জান :—

"শুন শুন নদী আরে শুন আমার কথা।
তুমিত অভাগী লীলার জান মনের ব্যথা॥
তুমিত দরিয়ারে নদী আরে নদী কূলে তোমার বাসা।
তুমি জান কঙ্ক লীলার মনের কত আশা॥"

প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্পর্ক শুধু বর্ত্তমান যুগেরই নয়; সে চারিযুগের সাক্ষী; মানুষের কত জন্মের, কত সুখদুঃখের, কত হাসিকান্নার সে সাক্ষী হইয়া আছে :—

"পাহাড় থাইক্যা (হইতে) ভাইট্যাল নদী সাগর বইয়া যায়।
চাইর যুগের যত কথা জিজ্ঞাস তাহায়॥"

প্রেমের দৃষ্টি এমনি দৃষ্টি যে উহা কিঞ্চিন্মাত্র পার্থক্যও মানিয়া লইতে চায় না, মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা বা অন্তরঙ্গতা স্থাপন করিয়া এবং তাহার সহিত অহর্নিশ চিত্তের ভাব-বিনিময় করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই; সে আপনাকে তাহার প্রেমাস্পদকে প্রকৃতির বিচিত্র-রূপে রূপায়িত দেখিয়াছে। মানুষ প্রাণ-প্রিয়তমকে কখনো দেখিয়াছে 'পর্ব্বতের চূড়া', কখনো দেখিয়াছে 'রণ-দৌড়ের ঘোড়া', কখনো দেখিয়াছে 'হীরামণ তোতা', কখনো 'মণিমুক্তা', কখনো 'গলার হার'। প্রেমের কাছে তাহার আভিজাত্যের গর্ব্ব লোপ পাইয়াছে। একজন নায়িকা পরম গর্ব্বভরে বলিতেছে :—

"আমার সোয়ামী সে যে পর্ব্বতের চূড়া।
আমার সোয়ামী যেমন রণ-দৌড়ের ঘোড়া॥"

আর একজন বিরহ-কাতরা নায়িকা পাখিগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছে :—

"কত দেশে যাওরে তোমরা পাখী আরে উড়িয়া বেড়াও।
"পূর্ণিমার চান্দে আবার দেখিতে নি পাও॥
দেখিতে নি পাওরে আমার হীরামণ তোতা॥"

একজন নায়ক তাহার প্রাণ-প্রিয়াকে বলিতেছে :—

"তুমি আমার চন্দ্রসূর্য্য তুমি নয়নতারা।
তুমি আমার মণিমুক্তা তুমি গলার হার॥"

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিব না। পাঠক পালাগান শুনিতে দেখিয়া লইবেন মানবীয় অনুভূতিতে রঞ্জিত হইয়া বিশ্বপ্রকৃতি কি অপূর্ব্ব হইয়াই না উঠিয়াছে।

শ্রীকামিনীকুমার রায়

অচল প্রেম

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

৯৯

পল্লীগ্রামের হুজুগের আগুন নিভিয়াও নিভে না। সহরের এক অঞ্চলে—এমন কি এক পাড়ার পাশাপাশি লোকে পরস্পরের খোঁজ খবর রাখে না। সহরের কোথাও একটা দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে অথবা কোনরূপ হুজুগ উঠিলে সেই সময়টার জন্য তথায় রথদোলের ভীড় লাগিয়া যায়, একথা সত্য; কিন্তু পাঁচ মিনিটে সে হুজুগ চুকিয়া গেলে কেহ তাহা মনে রাখে না বা তাহা লইয়া আলোচনা করিতে বসে না, যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যায় অথবা নিজের কাজে লিপ্ত হয়। পল্লীগ্রামে কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। হুজুগ ত তথায় নাই বলিলেই চলে। যদিও বা কালেভদ্রে কোন দৈবদুর্ঘটনা অথবা বিস্ময়কর ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মাসের পর মাস ধরিয়া গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে বাঁধাবটতলায়, বাজারগঞ্জে অথবা স্নানের ঘাটে তাহা লইয়া রীতিমত আলোচনা চলে। কল্যাণপুর অথবা প্রসাদপুরে যে তাহার ব্যতিক্রম হইবে এমন কোন কথা নাই।

প্রসাদপুরের কীর্ত্তনের দলের সহিত পাথরঘাটার কীর্ত্তনের দলের নিশান-কাড়াকাড়ি ও মারামারি হইয়া যাইবার পরই কলিকাতা হইতে ডাক্তার হিমাংশুর গ্রেফতার ও দণ্ডের খবর আসিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদপুর ও আশপাশের কয়খানা গ্রাম একেবারে তোলপাড় হইয়া উঠিল। এবং সেই তোলপাড়ের ও ঘোঁটের অবস্থা দিনের পর দিন অতীত হইলেও নিবৃত্ত হইবার কোন লক্ষণ দেখা দিল না। বিশেষতঃ অন্যত্র থামিয়া গেলেও চণ্ডীমণ্ডপের তাসপাশার আড্ডায়, বাঁধাবটতলার গুড়ুকের মজলিসে অথবা স্নানের ঘাটে পল্লীনারীদের কনফারেন্সে উহা সমান তেজেই চলিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, বেচারী নীহারকেও তাহার হিমুদার জন্য কম বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। হিমাংশুর পিতা রাসভারী লোক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সম্মুখে হিমাংশুর বিরুদ্ধে যৎসামান্য আলোচনা কচিৎ কখনও হইলেও কেহ সাহস করিয়া তাঁহার মুখের উপর কড়া কথা শুনাইত না। সনৎকুমার উইক-এণ্ডে দেশে আসিত, কখনও কখনও আফিসে কার্য্যের চাপ পড়িলে দুই একটা সপ্তাহ পরে পরে আসিত। পূজার দীর্ঘ অবকাশে সে অবকাশ কালটা দেশেই কাটাইয়া যাইত। কাজ করিত সে হাইকোর্টে। কাজেই চন্দ্রমাধব বাবুকে বা সনৎকুমারকে হিমাংশুর জন্য বেশী কথা শুনিতে হইত না। বিশেষতঃ তাঁহারা ছিলেন পুরুষমানুষ, বাহিরে নানা কাজে ডুবিয়া থাকিবার তাঁহাদের সুযোগ ছিল। কিন্তু নীহারের এসব সুযোগ মোটেই ছিলনা। বাঙ্গালী ভদ্র পরিবারের কন্যা বধূদের নীরবে মুখ বুজিয়া অনেক কিছু সহিতে হয়, নীহারকেও সহিতে হইত। পাড়ার বর্ষীয়সীরা তাহাকে ঠেস দিয়া অনেক কথা বলিয়া যাইতেন, যেন হিমাংশু তাহার পিতৃস্বসা পুত্র বলিয়া তাহারই যত অপরাধ! বাড়ীর মেয়ে হইলেও তবু কথা ছিল, কিন্তু সে কুলবধূ, পাল্টা জবাব দিবার তাহার অধিকার নাই।

এজন্য রুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত সে অন্তরে গর্জ্জন করিত, তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িত হিমুদার উপর। আর সে মাঝে মাঝে মনের কপাট খুলিত তাহার বন্ধু দীপ্তির কাছে। দীপ্তি বন্ধুর নিকট হইতে এমনই একখানা ঝাঁঝের চিঠি পাইয়াই যাচিয়া হিমাংশুকে দু'কথা শুনাইতে গিয়াছিল। তাহার মন যখন যাহার উপর বিরূপ হইত, তখন সে পরিচিত কি অপরিচিত শত্রু কি মিত্র, জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, পুরুষ কি নারী,—কিছুই ভাবিয়া দেখিত না, ভাবের উদ্দামে তাহাকে মনের সমস্ত রাগ বা ঘৃণার কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ফেলিত,—কখনও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেখিত না, তাহার কঠোর কথার কি পরিণাম হইতে পারে।

একদিন উইকএণ্ডে সনৎকুমার বাড়ী আসিল। সেবার তাহার মুখ অসম্ভব গম্ভীর, সে কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না। আড্ডায় তাস পিটিয়া রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে সে যখন শয়ন করিতে আসিল, তখনও নীহার ঘুমাইয়া পড়ে নাই। কারণ, সে সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্বামীর মুখ বিষণ্ণ ও চিন্তারেখাঙ্কিত দেখিয়াছিল। এমন অনেক দিন গিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া স্বামীর সোহাগ পাইবার লোভে সে কপট নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া থাকিত। সে সময়ে সনৎকুমার নিদ্রিতা পত্নীকে নানা প্রিয় সম্ভাষণে জাগাইয়া দিত। আজ কিন্তু সে কপট নিদ্রার ভাণ করিলেও সনৎকুমার তাহাকে আদর করিবার অথবা জাগরিত করিবার কোন চেষ্টা করিল না। নিঃশব্দে আসিয়া শয্যার একপার্শ্বে শুইয়া পড়িল।

নীহারের প্রাণ উড়িয়া গেল। সত্যই সে ছিল পতিগতপ্রাণা। স্বামীর সোহাগ আদরে বিন্দুমাত্র ভাব বৈলক্ষণ্য ঘটিলে সে দশদিক অন্ধকার দেখিত, তাহার মনে হইত, সমস্ত পৃথিবীটাই যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। ভয়ব্যাকুলকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, কি হয়েছে? তুমি অমন করে র'য়েছো কেন? আমার যে বড্ডো ভয় করছে!"

অন্য সময় হইলে সনৎকুমার প্রাণসমা পত্নীর এই কাতর আবেদনে বিচলিত হইত, কিন্তু আজ তাহার ভাবান্তর বস্তুতঃই অভিনব। সে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "কি আবার হবে? তুমি ঘুমোও নি?"

নীহার কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "না। বল না, কি হয়েছে? আমার যে কান্না পাচ্ছে। তুমি এমনি নিষ্ঠুর? বল না,— এই তোমার পায়ে মাথা কুটছি, বল।" সত্যসত্যই নীহার স্বামীর পদযুগলের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া ফেলিল, সনৎকুমারের পায়ে তাহার অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল।

সনৎকুমারের সমস্ত গাম্ভীর্য্য ভাসিয়া গেল, সত্যই সে হাসিয়া ফেলিল। পুলকিত প্রেমভরে পত্নীকে বুকে তুলিয়া লইয়া অশ্রু মুছাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আস্ত পাগল! সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললে? তুমি এমন, তবে তোমার বন্ধুটি অমন বেয়াড়া কেন। সেই ত আমায় ভাবিয়ে তুলেছে!"

স্বামীর আদরে নীহার গলিয়া গেল, স্বামীর কণ্ঠলগ্না হইয়া বলিল, "তাই বল, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম— না জানি কি অপরাধই করেছিলুম।"

সনৎকুমার বলিল, "যাক্, এইবার নিশ্চিন্ত হলে ত? কাল সকালে উঠেই বোধ হয় হরিলুঠ দিচ্ছ? আমরা তারক ময়রার ফুটো মোণ্ডা সন্দেশের আশা করতে পারি কি?"

নীহার অভিমানের সুরে বলিল, "যাও, তুমি ভারী দুষ্টু! আমার বন্ধুটি আবার কি করলে? আমার বন্ধু—তোমার কেউ নয় বুঝি?"

সনৎকুমার গম্ভীর হইয়া বলিল, "সেই জন্যেই ত ভাবনা— নইলে কোথাকার কে হলে আমার কি বয়ে যাচ্ছে ওর জন্যে মাথা ঘামাবার? আমার বোন, তোমার বন্ধু—তাই ত তাকে বকতে গেছলুম—তা যা শোনান শুনিয়ে দিয়েছে—উঃ! ওর জীবে যেন ক্ষুরের ধার!"

নীহার বলিল, "পোড়ারমুখীর ঐ ত রোগ! তোমায় কথা শুনিয়ে দিয়েছে? কেন, তুমি কি বলতে গিয়েছিলে ওকে? তুমি ত ওদিকের ধার দিয়েও যাও না।"

সনৎ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "গেরো! নইলে দেখেছো ত, আমি তোমাদের কলেজে পড়া মেয়েদের কি রকম ভয় করি?—তাদের কাছ থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।"

নীহার কৃত্রিম কোপে বলিল, "ইস্, তাই নাকি? তবে মশাই আমার কাছে তর্জ্জন গর্জ্জন করেন কেন? উহুহু—না, না, আর বোলবো না, দুটি পায় পড়ছি—আচ্ছা বাঁদরী কি করেছিল যে, তুমি তার বাড়ী বয়ে কথা শোনাতে গিয়েছিলে?"

সনৎ হাই তুলিয়া বলিল, "সে ঢের কথা, কাল তখন বোলবো, এখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, সারা বিকেলটা গাড়ীর ঝাঁকুনি—একটু শুই—"

নীহার বলিল, "বটে! আর আড্ডায় গিয়ে রাত বারোটা অবধি তাস পিট্‌লে বুঝি চোখ ঢুলে আসে না?"

সনৎ বলিল, "দোহাই তোমার—আর যদি কখনো তাস পিটি আড্ডায়। বসেছিলুম বটে খানিকক্ষণ, কিন্তু তাস ছুঁইনি, মনটাই ভাল ছিল না।"

নীহার বলিল, "তবে এত রাত হোলো কেন? ওঃ বুঝেছি!" নীহার মুখ টিপিয়া হাসিল।

সনৎকুমার বলিল, "বুঝেছো ত? তবে এখন শোওয়া যাক্ এসো।"

আড্ডা দিয়া না আসিলে গ্রামের বন্ধুরা তাহাকে স্ত্রৈণ আখ্যা দিবে, সনৎকুমারের ভয় ছিল, তাই বুঝিয়াই নীহার হাসিয়াছিল। কিন্তু সে জন্য সে স্বামীকে রেহাই দিল না, বলিল, "ঘুমোও তুমি প্রাণভরে আপত্তি নেই, কিন্তু যতক্ষণ না বলছো, পোড়ারমুখী দীপ্তি কি করেছে, ততক্ষণ চোখ বুজতে দোবো না তোমায়। বলো। বল না!"

সনৎকুমার কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল, "আঃ তুমি দেখচি ছিনে জোঁক। কাল দোবো'খন চিঠি দুখানা—কেবল আমায় পড়তে দিয়েছিলো লুকিয়ে—তা ত ছাড়লে না। তুমি পড়ে দেখো এর পরে। এর একখানা দীপ্তি লিখেছিলো তোমার পিসেমশাইকে আর একখানা তার জবাব। ভাবি, ওর এত স্পর্দ্ধা হ'ল কেন—ও পরের কথায় অনধিকার চর্চ্চা করতে যায় কেন? জানই ত, তোমার হিমুদা কেমন মানুষ—কারুর কথার ধার ধারে না, কারুর কথা সহ্য করে না,—তাকে গেছে লেকচার ঝাড়তে। বাপ!"

নীহার বন্ধুর পক্ষ লইয়া (বন্ধু উপস্থিত নাই তাই) বলিল, "তা মন্দ কি করেছে? হিমুদা কি বাড়াবাড়ি করছে না? আমি ওকে হিমুদার কীর্ত্তি জানিয়েছিলুম বলেই ত ও বলতে গিয়েছিলো, নইলে ওর কি দায় পড়ে গেছে!"

সনৎ বলিল, "বারে! তুমি পাঁচ শো বার হিমাংশুকে বুঝিয়ে বলতে পারো, আমিও পারি, কিন্তু তা বলে তোমার বন্ধু? দীপ্তি? হাঃ হাঃ! ওর সঙ্গে হিমুদের কি সম্পর্ক? ও আগসর্দ্দার হয়ে যায় হিমুর বাড়ী বয়ে ঝগড়া করতে? পিস মশাইকেই বা চিঠি লিখে হিমুকে শাসন করতে উপদেশ দেয় কেন? বাপ! মেয়ে বটে! কি বোলবো তোমার বন্ধু, নইলে—"

নীহার বলিল, "নইলে কি করতে? ফাঁসী দিতে, না দ্বীপান্তর পাঠাতে? দেখি চিঠি দুখানা, কি লিখেছিল বাঁদরী—ওর ঐ রকম, যা মনে আসে, তার ভাল মন্দ না দেখেই কায করে বসে—দেখি"

সনৎ বলিল, 'পারি নি বাপু, এই রাত দুপুরে উঠে চিঠি খুঁজতে, কাল তখন পোড়ো।"

কথাটা বলিয়াই সনৎকুমার পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল, এবং মিনিট দুই পরেই দুই একটা হাই তুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল অথবা ঘুমাইবার ভাণ করিল। নীহার উঠিয়া কিছুক্ষণ টেবিল ও ডেস্কের টানা হাতড়াইল, কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হইয়া অগত্যা স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া শুইয়া পড়িল। মনটা কিন্তু তাহার নিতান্ত খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল।

পরদিন নীহার যত শীঘ্র সম্ভব অবসর করিয়া লইয়া যখন পত্র পাঠ করিতে লাগিল, তখন দীপ্তির প্রতি ক্রোধে ও বিরক্তিতে তাহার সমস্ত অন্তরটা ভরিয়া উঠিল। দীপ্তির পত্রখানি এইরূপ—দীপ্তি শুনিয়াছে যে চন্দ্রমাধব বাবু তাহার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহার পুত্রের সহিত তাঁহার এই বিষয়ে মতান্তর ঘটিয়াছে। এরূপ হইবার সে কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না। সে নিজে এরূপ বিবাহের পক্ষপাতিনী নহে, তাই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এজন্য যদি কেহ অপরাধী হয়, তবে সে নিজেই অপরাধিনী, তাঁহার পুত্রের সহিত তাঁহার মতান্তর হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। এখনকার কালে যাহারা স্বামী স্ত্রী রূপে সুদীর্ঘ জীবন একত্র অতিবাহিত করিবে, দেখিয়া শুনিয়া রীতিমত পরিচিত হইয়া তাহাদের পরস্পরকে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত, ঘটিবাটি না গরুবাছুরের মত তাহাদের বিলাইয়া দিবার অধিকার অন্য কাহারও নাই। ইত্যাদি।

ইহার জবাবে চন্দ্রমাধব বাবু লিখিয়াছেন, বিবাহের প্রস্তাব করা হয়ত তাঁহার ভুল হইয়াছে। কিন্তু ভুল হইলেও উহা তাঁহার পক্ষে অপরাধ নহে। কারণ এই বিবাহের সম্বন্ধ তাহার স্বর্গগত পিতার জীবিতকালেই স্থির হইয়াছিল। যাহা হউক, সে চুক্তির সাক্ষী এখন কেহ নাই, তাঁহার কথা বেদবাক্য বলিয়া ধরিয়া লওয়ারও কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। অতএব এই বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইল। তবে পাত্র ও পাত্রীর আপনি দেখিয়া শুনিয়া পরস্পর পরিচিত হইয়া বিবাহিত হওয়ার যুক্তি সম্বন্ধে তাহার সহিত তাঁহার মতভেদ আছে। সে যখন কথা পাড়িয়াছে, তখন তাহাকে তাঁহার পক্ষের কথাটাও শুনিতে হইবে। যাহাদের সমাজে এরূপ বিবাহের ব্যবস্থা আছে, তাহাদের পাত্র পাত্রীর মধ্যে সকল বিবাহই যে সুখের হয়, তাহাও ত দেখা যায় না; হইলে

সে সব দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইত না এবং সে জন্য সমাজে নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইত না। ইত্যাদি।

পত্র দুইখানা পাঠ করিয়া নীহারবালা দুর্জ্জয় ক্রোধে আপন মনে বলিল, উঃ এত অহঙ্কার! বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে বাপের সমান গুরুজনকে এমন নির্লজ্জ বেহায়ার মত পত্র লেখে? আশ্চর্য্য! আবার এই চিঠি ও চিঠির জবাব দিয়া আসে গিয়া পাত্রের হাতে? তাহাকে গুরুমহাশয়ের মত লেকচার দেয়? আসুক এবার পোড়ারমুখী—তাহাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। মাথার উপর কেউ নাই বলিয়া আর তার পয়সার ভয়ে মুখের উপর কেহ কিছু শোনাইয়া দেয় না বলিয়া তার বড় বাড় বাড়িয়াছে!

সেদিন নির্জ্জনে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইতেই নীহার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি হিমুদার ওখানে হঠাৎ গিয়েছিলে কেন? হিমুদাই বা চিঠি দুখানা তোমায় দিলে কেন?"

সনৎকুমার উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "গিয়েছিলুম কি সাধে ওর ওখানে? কি বাঁদরামী করে বেড়াচ্ছে বল দিকি? কাজ-কর্ম্ম যেন আর কিছু নেই, উনি হবেন মজদুর সভার সেক্রেটারী—নাবিক সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট! কেন, তোর ওসব কেন, তুই করবি ডাক্তারী! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! বাপ একটা মান্যি গন্যি লোক, দেশের একটা দিকপাল, তার মুখ পোড়াচ্ছিসনে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে?"

নীহার সায় দিয়া বলিল, "তা বটে—হিমুদার আর সব ভাল, কিন্তু ঐ এক কি মাথায় পোকা—হাঁ, তোমার কথা শুনে কি বল্লে?"

সনৎ বলিল, "বল্লে যা, তাতে আরও রাগ হয়। কথার পাল্টা জবাবে যদি রেগে গিয়ে দুকথা শোনাতো তাহলে বরং কথা ছিল; কিন্তু তাত নয়। মিষ্টি হেসে ঠেস্ দিয়ে বল্লে, "তার যে এতগুলি গুরুমশাই রয়েছেন বেত নিয়ে শাসন করবার জন্তে, তা সে জানতো না; এখন জেনে খুশী হোলো, তাঁদের সে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। তবে তার দুঃখ এই যে, এমন সুন্দর লেকচারগুলো মাঠে মারা যাচ্ছে। একজন এসে শুধু লেকচার দিয়ে যাননি, তার সঙ্গে দু'খানা চিঠির পাঠ মুখস্থ করতে দিয়ে গেছেন, না মুখস্থ হলে বোধ হয় ফিরে এসে বেত দিয়ে যাবেন।"

নীহারের সমস্ত গাম্ভীর্য্য, সমস্ত রাগ এই কথার স্রোতে ভাসিয়া গেল, সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। সনৎকুমার ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "বাঃ হেসে কুটিপাটি! এতে হাসবার কি পেলে।"

নীহার চোখ মুছিয়া বলিল, "হিমুদার কথা শুনলেই হাসি পায় না? বাবা, বাবা,—ওর পেটে পেটে বুদ্ধি, এদিকে যেন ভিজে বেরালটি! তা যাই হোক, ও পোড়ারমুখী কি বলে নিমুদাকে চিঠি দিয়ে গেলো,—ওমা বুকের পাটা দেখো একবার!"

সনৎকুমার বলিল, "তা, এ তোমার অন্যায়। কলেজের পাশকরা মেয়ে, পাড়াগেঁয়ে ডাক্তারে মন উঠবে কেন?"

নীহার বলিল, "ঘেন্নার কথা বোলোনা বলছি!—হিমুদার মত ছেলে—ওর পা ধোওয়া জল খেলে বর্ত্তে যায়—"

সনৎ মুচকিয়া হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "ছেলে বলে ছেলে! কত লোকের লোভ হয়—এই ধর না কেন, আমাদের মত কেরাণী বর না হয়ে যদি হিমুদার মত—"

নীহার বিষম ধমক দিয়া বলিল, "দেখো, চুপ কর বলছি, কথার ছিরি দেখো! ফের যদি ওরকম সব বিশ্রী কথা বল্‌বে—"

সনৎকুমার দুই বাহু প্রসারণ করিয়া পত্নীকে দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া হাসিয়া বলিল, "বাদবে! মুখে যাই বলি, আমার এ জিনিষ বুঝি আর কাউকে দেবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি?"

স্বামীর আদরে নীহার গলিয়া গেল, আসল কথা বলিবার যাহা ছিল, তখনকার মত তাহা তাহার মনেই রহিয়া গেল, বলা আর হইল না।

১২

হাকিম কড়া হইলে প্রায়ই জনপ্রিয় হইতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার বিচার নিরপেক্ষ ওজনেই হইয়া থাকে, তাহাতে একচুল পক্ষপাতিতা বা একদেশদর্শিতা থাকে না। জমিদার কড়া হইলেও প্রায় এমনই হইয়া থাকেন, প্রজারঞ্জক বলিয়া তাঁহার নাম তত হয়ই না, অধিকন্তু অন্তরালে প্রজারা তাঁহার উচ্ছেদ কামনাই করিয়া থাকে। তবে আদায় পত্রে কোনও রূপ অনাচার অত্যাচার অথবা ন্যায্যপ্রাপ্যের কাণা কড়িও

অধিক আদায়ের সম্ভাবনা থাকে না, যদি কচিৎ কোন কর্ম্মচারী সেই অপরাধে অপরাধী হইয়া ধরা পড়েন, তবে তিনি জমিদারের যতই প্রিয় হউন বা যতই বিশ্বস্ত পুরাতন কর্ম্মচারী হউন একদণ্ডেই তাঁহার চাকুরী খসিয়া যায়।

কড়া জমিদার বলিয়া দীপ্তিময়ীর নাম রটিয়াছিল, উহা খ্যাতিরও বটে, অখ্যাতিরও বটে। সে মোটেই জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। যদুগোপাল বাবুর প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার শাসন-নীতির একেবারেই পরিবর্ত্তন হয় নাই, আর সেই হেতু প্রজারা তাহার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিল। তাহার পূর্ব্বতন জমিদারেরা সকল কাজে প্রজাদের আহ্বান করিতেন, তাহাদের আপদে বিপদে দাঁড়াইতেন, জমিদার বাড়ীতে প্রয়োজন হইলেই তাহাদের পাত পড়িত। দীপ্তি এ সম্বন্ধ স্বীকার করিত না। খাজনা আদায় করা আর জমিদারীর পথঘাট জলসেচ জলনিকাশ ইত্যাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করা সে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে মনে করিত, জমিদার প্রজার যে তদতিরিক্ত একটা মধুর প্রীতির নিকট সম্বন্ধ থাকিতে পারে, ইহা কখনও তাহার মনে উদয় হইত না। এই হেতু তাহার পূর্ব্বতন জমিদারদের আমলে জমিদারই যে প্রজাদের জজ ব্যারিষ্টার পিতা মাতা ছিলেন এবং তাঁহাদের ডাকিলেই পাইতেন, সেই দাবীটুকু দীপ্তি হারাইয়াছিল। একদিন সে তাহার অতিরিক্ত দর্প ও অহঙ্কারের জন্য প্রজাদের নিকট অপমানিতও হইয়াছিল। সেদিন জমিদার বাড়ীতে কি একটা ছোটখাটো পর্ব্ব উপলক্ষে বাঁশের ভারা বাঁধিয়া সামিয়ানা টানাইবার প্রয়োজন ছিল। এ কাজ সাধারণতঃ গ্রামের দুলে বাগদী ঘরামী প্রজারাই করিত। সেদিন তাহাদের দুইতিন বার ডাকিয়া পাঠাইলেও তাহারা কাজ করিতে আসে নাই। শেষে পাইক বেলদার পাঠাইয়া তাহাদের ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলে তাহারা জবাব দিয়াছিল যে, তাহারা কাহারও বেতনভুক্ত ভৃত্য নহে যে তু বলিয়া ডাক দিলেই দৌড়াইয়া যাইবে। ইহার পর কাজ আদায় করিতে হইলে দাঙ্গাফ্যাসাদ ছাড়া উপায় নাই; কাজেই সদর নায়েব মহাশয়ের জমিদারের হুকুম লইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। দীপ্তি প্রথমটা কিছুই শুনে নাই। যখন সব শুনিল, তখন বিস্মিত হইয়া মামাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রজাদের এরূপ জবাব দিবার কারণ কি—তাহারা ত কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাইবে। যদুগোপালবাবু প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ পীড়াপীড়িতে শেষে বলিলেন যে, পূর্ব্বতন কর্ত্তাদের আমলে ঘরামী প্রজারা বিনা পারিশ্রমিকে সানন্দে জমিদার বাড়ীর কাজ করিয়া দিত। তাহার কারণ এই যে, তখনকার কালে জমিদার বাবুরা প্রত্যেক কাজে তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষরূপে ভোজন করাইতেন, তাহাদের মনসার ভাসানে ও বাউলের দলে উৎসাহ দিতেন, উদ্যোগী হইয়া কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতেন, মড়কমহামারীর সময় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া তাহাদের সংবাদ লইতেন। এখনকার আমলে ওসব উঠিয়া গিয়াছে। এবার মুচিপাড়ায় বিসূচিকা দেখা দিলে এবং কয়েকজন মারা গেলে জমিদার বাড়ীর কেহ কোন তত্ত্ব লয় নাই। এখন জমিদার প্রজায় সম্বন্ধ হইয়াছে লেন-দেনের, ব্যবসাদারীর; হৃদ্যতার বা আত্মীয়তার নহে। কাজেই তাহাদের উপর জোর চলে না, চালাইলে আজকালের আইন আদালতও বড় কড়া। দীপ্তি শুনিয়া খুব গম্ভীর হইয়া হুকুম দিয়াছিল, ভিন্নগ্রাম হইতে ভাড়াটিয়া ঘরামী আনিতে। আর ভবিষ্যতে গ্রামের এসব ছোটলোক প্রজাদের সহিত যেন কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা রাখা না হয়, দীপ্তি এ হুকুমও দিয়া রাখিয়াছিল।

নিজের জমিদারীর প্রজার সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ এইরূপ, সে সহরের সম্পূর্ণ অজানা অচেনা মজুর শ্রমিক নাবিক প্রভৃতি কর্ম্মীদের আন্দোলন ও সভাসমিতি শোভাযাত্রার প্রতি কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই জন্যই সে মজুর সমিতির শোভাযাত্রা সম্পর্কে ডাক্তার হিমাংশুর গ্রেফতার ও দণ্ডের কথা শুনিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিল, মনে মনে বলিয়াছিল, যাহার সঙ্গ এত নীচ, সেও নিশ্চিতই নীচ ও সঙ্কীর্ণমনা। হিমাংশুকে অজ্ঞাতসারে অপমানিত করিতে যাওয়ার মূলেও ছিল তাহার এই মনোবৃত্তি।

মেটিয়াবুরুজে তাহার কতকটা জমিতে বস্তি ও প্রজার বসতি ছিল। উহার সংসর্গে পার্শ্ববর্ত্তী ভূস্বামীর সহিত তাহার আমলাদের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। একদিন যদুগোপাল বাবুকে সঙ্গে লইয়া সে স্বয়ং ঐ জমি দেখিতে গেল।

দেখাশুনার পর সে ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় দেখিল, অনেক লোক নিশান লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া খিদিরপুরের দিকে আসিতেছে। সেই শোভাযাত্রার জন্য তাহাদের মোটরকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। বিলম্ব দেখিয়া সে পথের পুলিস প্রহরীকে তাহার জন্য পথ করিয়া দিতে বলিলে প্রহরী বলিল, শোভাযাত্রা কাছেই এক পার্কের মধ্যে যাইতেছে মিটিং করিতে, যতক্ষণ না যায়, অপেক্ষা করিতে হইবে। দীপ্তি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া মোটর ফিরাইয়া মেটিয়া বুরুজ পুলিসথানায় গেল এবং ইনস্পেক্টরের সকাশে পথিকদের এসব অসুবিধার জন্য অনুযোগ করিল। ইনস্পেক্টর বুঝাইলেন যে, ঐটি মজদুরদের শোভাযাত্রা, উহার জন্য তাহারা সরকারী পাশ লইয়াছে এবং পুলিস হইতে তাহাদের পার্কে যাইবার পথও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এ বিষয়ে কিছু করা যায় না; হয়ত এতক্ষণ গিয়া তিনি দেখিবেন যে, পথ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

দীপ্তি জিদ ধরিয়া বলিল, তাহার যাওয়া না যাওয়ার কথা হইতেছে না, কথা হইতেছে পথিকের পথ চলাচলের অধিকারের,—এ অধিকারে বাধা দিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। ইনস্পেক্টর বুঝাইলেন, বিশেষ বিশেষ ঘটনায় সাধারণের অধিকার সঙ্কুচিত করিবার আইন আছে, যেমন মহরম, রথ, দুর্গোৎসব ইত্যাদি। দীপ্তি তথাপি জিদ ছাড়িল না। শেষে ইনস্পেক্টরেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। ভদ্র সম্ভ্রান্ত মহিলা—বিশেষতঃ সুন্দরী তরুণী বলিয়া তিনি এতক্ষণ সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কথা কহিতেছিলেন। এখন বলিলেন, তিনি কিছুই করিতে পারেন না, করিবেনও না; তাঁহার ইচ্ছা হইলে আদালতে নালিশ করিতে পারেন।

অন্যায় জিদ ও মুখের দোষের জন্য দীপ্তিকে এরূপ অপমান প্রায়ই সহ্য করিতে হইত। কিন্তু আশ্চর্য্য এইটুকু যে, সে এগুলিকে অপমান বলিয়া ধরিতে পারিত না! সেদিন এই ভাবের ব্যবহার পাইয়া সে অপমানিত বোধ না করিলেও মনে মনে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইল এবং এরূপ অবস্থার প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই বেশ পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে ষ্টেটের উকীল বাবুকে তদ্দণ্ডেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ফোন করিয়া দিল। কিন্তু উত্তর আসিল, রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে উকীল বাবুর গৃহে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই, তিনি তাঁহার এক মাড়োয়ারী মোয়াক্কেলের সহিত তাঁহার লিলুয়ার বাগান বাড়ীতে গিয়াছেন; সুতরাং তৎপরদিন তাঁহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা, তৎপূর্ব্বে নহে।

উত্তর পাইয়া দীপ্তি গুম হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার ক্রোধের মাত্রা সপ্তমে গিয়া পৌছিল। আরও অধিক ক্রোধের কারণ হইয়াছিল এই যে, সে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পার্কের মধ্যে মজদুর সভার বিশিষ্ট দলপতিগণের ভিতরে হিমাংশু ডাক্তারকে উচ্চমঞ্চে সমাসীন দেখিয়াছিল। এই লোকটার একি অদ্ভুত স্বভাব? ভদ্র শিক্ষিত বংশের সন্তান,—ইহার প্রবৃত্তি এমন নিম্নগামী কেন? দূর হউক, হিমাংশু ডাক্তার যাহাই হউক না কেন, তাহার তাহাতে কি? হিমাংশু ত শিশু নহে, আগুন খাইলে আংরা বমন করিতে হয়, সে কি তাহা জানে না?

কিন্তু হিমাংশু ডাক্তারের চিন্তা মন হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করা যত সহজ, তত সহজে ত সে চিন্তা দূর হইয়া যায় না, বরং ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই চিন্তাই দেখা দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে হিমাংশু ডাক্তারের প্রতি দুর্জ্জয় ক্রোধে অন্তরটা ভরিয়া উঠে। এ লোকটার রীতিমত শিক্ষা হওয়া উচিত। এমন একটা গুরুদণ্ড তাহার হওয়া উচিত, যাহাতে সে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভদ্র সন্তানের মত সমাজে চলাফিরা করিতে পারে।

তাহার মনের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময়ে খানসামা আসিয়া খবর দিল, একজন সাহেব দেখা করিতে চাহেন। সাহেব? তাহার সহিত সাহেবের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? ঈষৎ রুষ্ট স্বরে সে বলিল, তাহার যাহা দরকার থাকে তাহা সে সদর নায়েব মহাশয়কে জানাইতে পারে। খানসামা বিনীত কণ্ঠে বলিল, সে তাঁহারই সহিত দেখা করিতে চাহে সে বাঙ্গালী সাহেব। দীপ্তি বিস্মিত হইল। তাহার সাহেব পল্লীতে দুই চারিখানা বাড়ী ছিল, সেই সূত্রে কখনও কখনও সাহেব মেমরা ভাড়ার জন্য সদর নায়েবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিত, তাহার সহিত তাহাদের সাক্ষাতের প্রয়োজন হইত না। এই বাঙ্গালী সাহেব কি চাহে, কে সে? কৌতূহল তৃপ্তির

নিমিত্ত সে সাহেবকে তাহার বসিবার ঘরে লইয়া আসিতে বলিল এবং নিজেও তৎপূর্ব্বে তথায় গিয়া উপস্থিত হইল।

সাহেব কক্ষে উপস্থিত হইয়া টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিতেই দীপ্তি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিতেই ভুলিয়া গেল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া আগন্তুককে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দরকার আপনার? কি চান আপনি? আপনাকে আর একদিন দেখেছি না?"

"মিঃ সানিয়াল,—মিস দত্ত। ইফ ইউ প্লিজ, এট ইওর সার্ভিস।" বাঙ্গালী সাহেব যে মিঃ শশাঙ্ক মোহন সান্যাল, তাহা বোধহয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

দীপ্তির ক্রোধ ও অসন্তোষের ভাব মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল, সাহেবের অপরূপ বেশভূষা ও কথাবার্ত্তায় তাহার একটা দুর্দ্দমনীয় হাসির বেগ দেখা দিল। অতি কষ্টে উহা দমন করিয়া দীপ্তি বলিল, 'হাঁ, হাঁ, মিঃ সানিয়ালই বটে। আপনাকেই না লেডি ডক্টর মিস বাণী দেবীর সঙ্গে একদিন দেখেছিলুম ডাক্তার হিমাংশু মিত্রের বাড়ী? তা ছাড়া—"

মিঃ সানিয়াল বাধা দিয়া বলিলেন, "কোয়াইট সো মিস দত্ত। দি থিং ইজ—"

দীপ্তি বাধা দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "দেখুন মিঃ সানিয়াল, আপনি দেখছি বাঙ্গালী। তা আমাদের কথাবার্ত্তা বাঙ্গালা হলেই ভাল হয় না?"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "একজ্যাক্‌টলি সো। দেখুন মিস দত্ত, একটা মস্ত ডিফিকালটিতে পড়ে আপনার হেল্‌প্‌ নিতে এসেছি।"

দীপ্তি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমার সাহায্য? কোন সম্পর্কে তা ত বুঝলুম না—মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় আছে বলে আমার ত মনে হচ্ছে না।"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "সবই বলছি মিস দত্ত। একটু পেসান্স—"

দীপ্তি বাধা দিয়া বলিল, "কি বলবার আছে বলুন—একটু সংক্ষেপে হলে বাধিত হবো"

মিঃ সানিয়াল বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া বলিলেন, "না বেশী না, আপনার ভ্যালুয়েবল টাইমের ক্ষতি কোরবো না কথাটা কি হচ্ছে জানেন, যে ডক্টর মিটারের ওখানে আমাদের দেখেছিলেন, তাঁকে আমরা একটা স্টার্ট দিচ্ছি তাঁর বিজনেস প্রোফেসানে"

দীপ্তি বলিল, "আমরা? কে আপনি আর মিস বাণী দেবী ত?"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "হাঁ আর ঐ সঙ্গে তাঁর সিষ্টার আছেন—লেডি আর্টিষ্ট ও পামিষ্ট—"

দীপ্তি বলিল, "মিস কল্পনা দেবী?"

মিঃ সানিয়াল মহা খুসী হইয়া বলিলেন, "হাঁ, আপনি জানেন না কি তাঁকে? ওঃ ফাইন লেডি—এ জিনিয়াস—ওয়ান ইন্ এ থাউজ্যাণ্ড—"

দীপ্তি বলিল, "ওঃ নিশ্চয়ই! উনিই না 'প্রতিশোধ' প্রবন্ধ লিখেছেন 'বঙ্গ তরুণী' কাগজে?"

মিঃ সান্যিয়াল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "প্রবন্ধ? সেটা কি পদার্থ?"

দীপ্তি হাসিয়া বলিল, "এই যাকে আপনারা কাগজের আর্টিক্‌ল্ বলেন।"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "বাই জোভ' তা মিস কল্পনা-দেবী আর্টিকল লিখে থাকেন বটে কাগজে, শুনেছি।"

দীপ্তি বলিল, "হুঁ, তারপর?

মিঃ সানিয়াল সাগ্রহে বলিলেন, "তা কি জানেন, বিজনেস ইজ বিজনেস—কিন্তু ডক্টর মিটার ওটা বোঝেন না, তিনি এর ভিতরে পলিটিক্‌স্ এনে সমস্তটা গুলিয়ে ফেলছেন।"

দীপ্তির শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য কেমন একটা কৌতূহল হইয়াছিল, তাই ধৈর্য্যধারণ করিয়া বলিল, "কি রকম?"

মিঃ সানিয়াল বলিলেন, "মনে রাখুন, তিনি হন ডক্টর, তাঁর কি মজদুর এজিটেটারদের সঙ্গে মেলামেশা—তাদের এজিটেশানে লিড নেওয়া লিড দেওয়া, তাঁর পক্ষে সেফ, না তাঁর প্রোফেসনের পক্ষে সেফ? এ হ্যাবিট না ছাড়লে আমরা কি করে তাঁকে ব্যাক করতে পারি?"

দীপ্তি মৃদু হাসিয়া বলিল, 'হুঁ'। তা, এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমি আপনাদের এতে কি হেল্‌প্‌ করতে পারি?"

মিঃ সানিয়্যাল এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "ও: আপনি? ইউ ক্যান ডু আস এ লট অফ গুড—"

দীপ্তি বলিল, "কি রকম?"

মিঃ সানিয়্যাল বলিলেন, "আপনার এক কাজিন ব্রাদার ডক্টর মিটারের ক্লোজ ফ্রেণ্ড আর তাঁর ওয়াইফ হচ্ছেন আপনার প্যাল—আপনি একটু ইনফ্লুয়েন্স করলে—"

দীপ্তি দাঁড়াইয়া উঠিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দেখুন সোজা কথা বলছি, আমার দ্বারা এসব কিছু হবে না—আপনি যেতে পারেন।" দীপ্তি কক্ষ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল।

মিঃ সানিয়্যাল বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না দেখিয়া পকেট হইতে তাড়াতাড়ি কয়খানি পুস্তিকা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "গুড বাই, মিস দত্ত! এই প্যামফ্লেট্ খানা লিজার মত পড়ে দেখবেন, ডক্টর মিটার লিখেছেন—দেখবেন কি ডেনজারাস্!" মিঃ সানিয়্যাল হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন। দীপ্তি পুস্তিকাগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

দীপ্তি অন্যমনস্কভাবে পুস্তিকাগুলি নাড়াচাড়া করিতেছে, এমন সময়ে মিঃ সানিয়্যাল আবার ফিরিয়া আসিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "এক্সকিউজ্ মি, মিস দত্ত! একটা কথা আপনাকে রিমাইণ্ড করতে ভুলে গিয়েছিলুম, ডক্টর মিটার এর আগে এসব এজিটেশানে লিড্ করতে গিয়ে কোর্টে কন্‌ভিক্‌টেড্ হয়েছিলেন, শুনেছেন বোধ হয়—আমিই সিকিউরিটি দিয়েছিলুম সেই কেসে—তাতে করে গভর্ণমেণ্টের ব্ল্যাক লিষ্টে তাঁর নাম টোকা হয়ে গেছে—"

দীপ্তি দাঁড়াইয়া উঠিয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "বলেছি ত আমি, এসকল বিষয়ের সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই। আপনি অনর্থক এসব কথা বলে আমার সময় নষ্ট করছেন কেন? ডক্টর মিটার তাঁর নিজের কেয়ার নিতে সম্পূর্ণ সমর্থ, আমাদের তাতে মাথা ঘামাবার দরকার দেখছিনে।"

কথাটা বলিয়া দীপ্তি আর দাঁড়াইল না, কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

মিঃ স্যানিয়্যাল তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে মুহূর্ত্তকাল নিবদ্ধদৃষ্টি থাকিয়া মৃদুহাসিয়া চক্ষুর সঙ্কেত করিয়া আপন মনে বলিলেন, "হোঃ হোঃ মাই লাভ্‌লি বিউটি! যে বিষের বীজ বপন করে গেলাম, এর ফল ফলতেই হবে, নইলে মিঃ স্যানিয়্যালের নামই মিথ্যে!"

৯৩

চন্দ্রমাধব বাবু পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য অর্থব্যয়ে কার্পণ্য প্রদর্শন করিতেন না বটে, তবে তাঁহার অর্থের সদ্ব্যবহার হইতেছে কি না সে বিষয়েও উদাসীন ছিলেন না। পুত্রকে এই হেতু তিনি ডাক্তারখানার আয়ব্যয়ের একটা পরিষ্কার হিসাব রাখিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ছয় মাস গত হইলেও হিমাংশু হিসাব দিবার জন্য আরও কিছুকাল সময় প্রার্থনা করিল, তখন তিনি একটু চঞ্চল হইলেন। পুত্রের এরূপ কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য শৈথিল্যের কারণ কি? ব্যবসায়ে প্রথমে টাকা ফেলিয়াই হাতে হাতে লাভ হয় না, একথা সকলেই জানে, চন্দ্রমাধব বাবুর মত বিজ্ঞ লোকেরও যে উহা জানাই সম্ভব ছিল, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহা হইলেও হিমাংশু কেন লিখিল যে, প্রথম মুখে বিজ্ঞাপনে ও প্রচারকার্য্যে এবং মূল্যবান ঔষধ ও সরঞ্জাম ইত্যাদি ক্রয়ে, যে সকল খরচ হয়, গোড়া হইতে কড়ায় ক্রান্তিতে তাহার হিসাব রাখা অসম্ভব? যে কখনও সংসারের ধার ধারে নাই, হুকুম মাত্রেই যাহার সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে সে যে টাকাকড়ির ব্যাপারে খুবই হুসিয়ার হইবে, ইহা আশা করাই অন্যায় এবং একথা চন্দ্রমাধব বাবুও বিলক্ষণ বুঝিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও সে আর এখন বালক নহে, সংসার সংগ্রামে তাহাকে আগুয়ান হইতে হইতেছে,—এ সময়ে তাহাকে বিশেষ হুঁসিয়ার হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে, নতুবা তাহাকে পদে পদে বঞ্চিত ও প্রতারিত হইতে হইবে। বিশেষতঃ যখন তাহাকে বিরাট রাজধানী কলিকাতা সহরের নানা শ্রেণীর নানা জাতির নানা ফিকির ফন্দীবাজ মানুষের সংস্রবে আসিতে হইতেছে, তখন ত কথাই নাই। কলিকাতার মত মহাসাগরে শিয়ালা পানিফল ও মকর কুম্ভীর প্রভৃতি অসংখ্য হিংস্র প্রাণহানিকর প্রাণী মানুষের রক্তমোক্ষণের জন্য মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, হিমাংশুর মত সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ আনকোরা পাশকরা ডাক্তারের তন্মধ্যে মাথা গলাইয়া দেওয়ায় কোন বৈচিত্র্য নাই।

যতই মনের মধ্যে এই সকল কথা তোলাপাড়া করিতে

লাগিলেন, ততই চন্দ্রমাধব বাবু অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশ্য স্বভাবতই তিনি ধীর গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। মনের মধ্যে গুমরিয়া মরিবেন, তথাপি প্রাণের কথা কাহাকেও জানিতে দিবেন না। বিপত্নীক মানুষদের স্বভাব প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে সকল বিষয়ে কাহারও কাছে মনের কপাট খুলিতে না পারায় প্রায়ই তাঁহারা কূর্ম্মের মত সকল চিন্তাই আপনার মধ্যে গুটাইয়া লইয়া থাকেন। তাহার উপর চন্দ্রমাধব বাবু ছিলেন রাশভারী লোক,—বাহিরের লোকের কাছে উপদেশ বা পরামর্শ গ্রহণ করিতে তিনি অতিমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন। তাই এবিষয়ে তিনি মনের মধ্যেই গুমরিতে থাকিলেন। একবার এমন কথাও মনে হইল যে, সনৎকুমারের মারফতে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জাও সঙ্কোচ আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিল,—সনৎকুমার পুত্রস্থানীয়, তাহার সহিত এরূপ ব্যাপারে কোন আলোচনা করা বিধেয় নহে।

মনের যখন এইরূপ অবস্থা তখন চন্দ্রমাধব বাবু কলিকাতা হইতে একখানি পত্র পাইলেন। কলিকাতা যাত্রার্থ তিনি একরূপ প্রস্তুতই হইতেছিলেন, এমনই সময়ে এই পত্র, আশ্চর্য্য বটে ? আরও আশ্চর্য্য এই যে, পত্রখানি আসিতেছে তাঁহার বাল্যবন্ধুর কন্যা দীপ্তিময়ীর নিকট হইতে। অবশ্য এই পত্রই তাহার প্রথম নহে, ইতিপূর্ব্বে সে আর একবার তাঁহাকে একপত্র দিয়া অতিমাত্র চকিত, বিস্মিত ও বিচলিতও করিয়াছিল। এবারও তাই। তাঁহার কন্যাস্থানীয়া কোন তরুণী তাঁহাকে এমন পত্র লিখিতে ভরসা করে এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। পত্রখানি দুইতিন বার পাঠ করিয়াও তাঁহার বিস্ময় অপনোদিত হইল না। কি অদ্ভুত পত্র। পত্রখানি এইরূপ :—

আমার নাম দেখেই বোধ হয় বুঝতে পারছেন এর আগেও একবার আপনাকে পত্র লিখে বিরক্ত করেছিলুম। সে পত্রের জবাব যা পেয়েছিলুম তাতে বুঝেছিলুম আপনি আমার পত্রে সন্তুষ্ট হন নি বরং বিরক্ত ও ক্রুদ্ধই হয়েছিলেন। হয় ত আমার লেখার ভঙ্গীর ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমি অনেক ভেবে দেখেছি যা লিখেছিলুম তাতে সহজ সত্য কথাই লিখেছিলুম। তাতে যদি আমি অপ্রিয় হয়ে থাকি তাহলে সেটা আমার অদৃষ্টের দোষ।

এবারও দুই চারটি সহজ সত্য কথা বল্‌বো। যদি বলেন, কোন অধিকারে, তা হলে বোলবো আপনার বাল্যবন্ধুর কন্যার অধিকারে। আরও একটা অধিকারের কথা বলতে পারি। মানুষের জীবনে যেটা সব চেয়ে বড় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধে আপনি একদিন আমায় আপনার সংসারের সঙ্গে বাঁধতে চেয়েছিলেন। যদিও সেই অধিকার থেকে আমি আমাকে বঞ্চিত করেছি, তা হলেও আপনিও আমায় নিজে সেই অধিকার দিতে চেয়েছিলেন।

কথা এই, সেই অধিকারে আমি আপনার ইষ্টঅনিষ্ট দেখে থাকি। এটা মোটেই আমার অনধিকার চর্চ্চা নয় বলে আমি মনে করি। ডাক্তার হিমাংশু বাবু আপনার পুত্র। তাঁর ডাক্তারীর জন্য আপনি যে টাকাটা খাটাতে দিয়েছেন, সেটার যাতে সদ্ব্যবহার হয়, তা দেখা আমার অধিকারের ভিতরে বলে আমি মনে করি। এখানে তা দেখবার কেউ নেই। তাঁর কারবারে যাঁরা সঙ্গী হয়েছেন, তাঁরা ভাল কি মন্দ তা আমি বলতে চাইনি। কেন না তাঁদের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত কোন মন্দ খবর পাইনি। তবে তাঁদের মধ্যে কারও কারও চালচলন দেখলে মনে কেমন একটা সন্দেহ হয়। হতে পারে আমি ভ্রান্ত। কিন্তু তা হলেও আপনার নিজে এসে সব অবস্থা একবার দেখে যাওয়া উচিত বলে মনে করি।

বিশেষ, হিমাংশু বাবু যে ভাবে চলাফেরা করছেন, তাতেও মনে হচ্ছে, ডাক্তারীর চেয়ে তাঁর শ্রমিক আন্দোলনের দিকে বেশী ঝোঁক। আজ তিন চার দিন হ'ল তিনি পাটনায় একটা কম্যুনিষ্ট কনফারেন্সে নেতৃত্ব করতে গিয়েছেন। এদিকেও আপনার নজর থাকা দরকার মনে করি। তাঁর অনুপস্থিতিতে কারবার যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁদের উপরেও একবারে পূর্ণ নির্ভর করাও আমি উচিত বলে মনে করিনে।

আমরা একই অঞ্চলের বাসিন্দা, তার উপর আমার আপনার উপর পিতার সুবাদে একটা আদর অভিমানের দাবী আছে। তারই জন্যে এই পত্র লিখ্‌লাম, ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন। ইতি

আশীর্ব্বাদপ্রার্থিণী—
দীপ্তি

পত্রখানি পাঠান্তে চন্দ্রমাধব বাবু যে বিস্মিত হইলেন তাহা বলাই বাহুল্য, পরন্তু তিনি মনে মনে কি জানি কেন একটা স্বস্তি অনুভব করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ষাট বৎসর। অথচ এই সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া তিনি কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না যে, ঠিক এই প্রকৃতির বাঙ্গালী গৃহস্থের অনূঢ়া শিক্ষিতা তরুণীর সংস্পর্শে কখনও আসিয়াছেন কি না। একটা কথা তাঁহার মনে পড়িল। যৌবনে কলেজে বিদ্যাধ্যয়নকালে তিনি সংস্কৃত পাঠ্যে প্রগল্‌ভা নারীর বিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন। আজ বহুদিন পরে সেই ব্যাখ্যা মনে পড়িলে তাঁহার ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্য রেখা প্রস্ফুট হইল। তাঁহার আরও মনে হইল, এই অশিষ্টা গর্ব্বিতা তরুণী তাঁহার সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। সেই সঙ্গে তাঁহার সহিত তাহার সমস্ত সম্বন্ধেরও অবসান হইয়াছিল। অথচ সে কেমন স্বচ্ছন্দে তাঁহার সহিত অতি নিকট আত্মীয়ার মত ব্যবহার করিয়া তাঁহার ন্যায় বর্ষীয়ান অভিজ্ঞ পুরুষকে তাঁহার কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দিতেছে! এই ব্যবহারের মনস্তত্ত্ব কি? তাহাই স্মরণ করিয়া বৃদ্ধের বদনে হাস্য রেখা খেলিয়া গেল।

যাহাই হউক, পত্রখানি তাঁহাকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। সত্যই কি তাঁহার কর্ত্তব্যপালনে শৈথিল্য দেখা দিতেছে? পুত্র কৃতবিদ্য, বয়ঃপ্রাপ্ত, সংসারে প্রবেশ করিতেছে, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি চিন্তাশক্তি ও বিচার-বিবেচনার উপর এখন হইতে নির্ভর করাই ত সঙ্গত—জগতে সমস্ত পিতাই ত তাহা করিয়া থাকে। তবে? শিশুর মত এখনও তাহাকে পক্ষপুটের আশ্রয়ে রাখিবার চেষ্টা করিলে তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনা থাকিবে কি? কিন্তু—

কিন্তু সেই পুত্রই ত এযাবৎ আত্মনির্ভরশীল হইতে অভ্যস্ত হয় নাই—সে সুযোগ ত তাহাকে দেওয়া হয় নাই। এজন্য দোষী কে? দায়ী কে?

চন্দ্রমাধব বাবু অতিমাত্র অস্থির হইয়া কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমন সমস্যায় ত তিনি কখনও পড়েন নাই! কি করি কোন পথে যাই? কে এ অন্ধকারে জ্ঞানের বর্ত্তিকালোক ধরিয়া পথ দেখাইয়া দিবে?

চন্দ্রমাধব বাবু সেদিন বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতরাশ সমাপনের পর হঠাৎ গত দিবসের পত্রের একটি ছত্রের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। ছত্রটি তিনি বহুবার পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বে তাহার বৈশিষ্ট্য তিনি উপলব্ধি করেন নাই। ছত্রটি এই:—

"কিন্তু তা হলেও আপনার নিজে এসে সব অবস্থা দেখে যাওয়া উচিত বলে মনে করি।"

সত্যই ত! একবার কলিকাতায় গিয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিলে ক্ষতি কি? এমন ত তিনি প্রায়ই গিয়া থাকেন। পুত্রের গতিবিধি বা কার্য্যকলাপের প্রতি তিনি দৃষ্টি রাখিতেছেন, একথা ত পুত্র একদিনও মনে করে নাই। তবে এখনই বা করিবে কেন? কিন্তু তাঁহার মন বলিয়া দিল, পূর্ব্বের যাতায়াত আর বর্ত্তমানের যাতায়াতে প্রভেদ রহিয়াছে; তাই মন সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান হইয়াছিল। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে একদিনও বিলম্ব হইল না।

ভবানীপুরের বাসায় ভৃত্যপরিজন ব্যতীত কেহ নাই। কর্ত্তার অতর্কিত ও অসম্ভাবিত আগমনে তাহারা তটস্থ হইল। কিন্তু তিনি কাহাকেও ব্যস্ত না করিয়া কেবলমাত্র মোটর প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। পল্লী হইতে ট্যাক্সী ও ট্রেণযোগে কলিকাতায় পৌছিতে মাত্র তিন ঘণ্টা লাগে, কর্ত্তা অপরাহ্ণে যাত্রা করিয়া রাত্রি ৮ টার সময় কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। কাজেই কাহাকেও ব্যতিব্যস্ত করিবার ইহাতে কিছুই ছিল না।

দীপ্তিময়ীর বাটীতে খানসামা গৃহকর্ত্রীরই আদেশক্রমে চন্দ্রমাধব বাবুকে তাহার লাইব্রেরীর পাঠের কক্ষে পৌছাইয়া দিল। চন্দ্রমাধব বাবু বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, দীপ্তি অভিনিবেশ সহকারে একখানা নোট বুকে কি টুকিয়া লইতেছে, আর তাহার সম্মুখস্থ আসনে চসমাধারী একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি একখানা কেতাব খুলিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দীপ্তি দাঁড়াইয়া উঠিয়া ললাটে দুই কর স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিল, বলিল, "আসুন, বসুন। আর দুচার লাইন বাকী আছে লিখে নিতে, এখনই হয়ে যাবে।"

কথাটা বলিয়া সে আবার নোটবুকে মনোনিবেশ করিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি আসন ত্যাগ করিয়া চন্দ্রমাধব বাবুকে অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহার দিকে একখানি আসন ঠেলিয়া দিলেন।

মুহূর্ত্ত পরেই দীপ্তি খাতাপত্র বন্ধ করিয়া ভদ্রলোকটিকে বলিল, "আপনি আজ যেতে পারেন, এটা ভাল করে বুঝতে দুদিন সময় লাগতে পারে—এ দুদিন আপনার আসবার দরকার নেই।"

ভদ্রলোকটি যে আজ্ঞা বলিয়া অভিবাদনান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চন্দ্রমাধব বাবু কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কি তোমার প্রাইভেট টিউটর, মা? আমি এসে এসময়ে পড়াশুনার ক্ষতি করলুম বোধ হয়?"

দীপ্তি বলিল, "না, কিছুই না। এ বছর বি, এ, দোবো; ইকনমিক্স আছে কিনা, তাই ঐ সাবজেক্টটার জন্যে টিউটর রাখতে হয়েছে। তবে এখন আমায় যা পড়তে দেখছিলেন, ওটা মোটেই আমার কোর্স নয়, ওটা কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে একখানা বই। মাষ্টারমশাই ওটাও ভাল জানেন।"

চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন, "বটে! তা একজামিনের জন্যে তৈরী হচ্ছো, এ সময়ে ওটার কি দরকার হোলো? কিছু মনে কোরো না, মা। আমরা বুড়ো হুড়ো মানুষ, আমাদের স্বভাবই হোচ্ছে ঐ রকম প্রশ্ন করে বিরক্ত করা, যাতে অধিকার নেই, তাতে মাথা গলাতে যাওয়া—"

দীপ্তি বাধা দিয়া বলিল, "তাতে কি হয়েছে? আপনি আমার বাবার বন্ধু, বাপের সমান, আপনি যদি আমায় ও রকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেন, তাহলে বুঝবো আপনি আমায় পর মনে করেন।"

চন্দ্রমাধব বাবু পরম প্রীতি অনুভব করিয়া বলিলেন "ঠিক বলেছ মা। তবে কি জান, ভয় করে আজকাল তোমাদের মত কলেজে পড়া মেয়েদের কাছে মুরুব্বিয়ানা ফলাতে যাওয়ায়—"

দীপ্তি মৃদু হাসিয়া বলিল, "কেন? আমরা কি বাঘ? হাঁ, ভাল কথা, আপনার খাওয়া দাওয়ার দেরী হয়ে গিয়েছে বোধ হয়। নিতাইচরণ?"

চন্দ্রমাধব বাবু শশব্যস্তে বাধা দিয়া বলিলেন, "আরে না না, কি করছ মা—রাত্তিরে বুড়োমানুষ সামান্য কিছু খাই, কোন দিন বা খাই-ই না—ও সব হাঙ্গামা—"

দীপ্তি অভিমান ও আবদারের সুরে বলিল, "তাহলে বুঝবো আপনি সত্যিই আমায় মেয়ের মতন দেখেন না।"

দীপ্তি উঠিয়া আসিয়া তাঁহার আসনের পার্শ্বে দাঁড়াইল—তাহার মুখে চোখে মিনতি ও আবদারের ভাব ফুটিয়া উঠিল। চন্দ্রমাধব বাবু অবাক। যে গর্ব্বিতা নারী তাঁহাকে কঠোর পত্রাঘাতে ক্ষুণ্ণ ও আহত করিয়াছিল, এ কি সেই জমিদার কন্যা দীপ্তিময়ী? এ যেন কুসুম অপেক্ষাও কোমলা স্নেহময়ী বালিকা। অপূর্ব্ব কুহেলিকাময়ী নারীর চরিত্র সত্যই কি দুর্জ্ঞেয়? চন্দ্রমাধব বাবু আদালতে বিচারে বসিয়া হৃদয় কত কঠোর করিয়া রায় দিয়াছেন,—সে সময়ে দয়া মায়া স্নেহ মমতা তাঁহাকে বিচলিত করিলেও কখনও কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারে নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে কোথায় ভাসিয়া গেল তাঁহার কঠোরতা, দৃঢ়তা? অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াও তিনি দীপ্তির অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, কিছু জলযোগ করিতে সম্মত হইলেন। দীপ্তি হৃষ্টান্তঃকরণে তখনই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। ঘরের গরুর দুধ ঘন ক্ষীরের মত করিয়া জাল দেওয়া, চন্দ্রমাধব বাবু সেই দুধ ও সামান্য দুই একটি সন্দেশ খাইয়া পার পাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দীপ্তি তাঁহাকে খান দুই গরম লুচি ও আনুষঙ্গিক মাছ তরকারি না খাওয়াইয়া ছাড়িল না। সত্যই বালিকার মত আবদার করিয়া বলিল, "এটা যদি না খান জ্যেঠা মশাই, তাহলে সত্যিই আমি জলস্পর্শ কোরবোনা—হাঁ, জানেন ত আমি কেমন একগুঁয়ে মেয়ে!" এমন আদর করিয়া কাছে বসিয়া অনেক দিন কেহ তাঁহাকে খাওয়ায় নাই

চন্দ্রমাধব বাবু তাহার আদরের জেঠামশাই সম্বোধনে একবারে গলিয়া গেলেন, তাহার মত ধনমদগর্ব্বিতা কলেজে পড়া মেয়ের উপর পূর্ব্বের পত্রের জন্য যাহা কিছু ক্রোধ বা অভিমান ছিল, তাহা তখন অন্তর্হিত হইল। বরং তৎপরিবর্ত্তে তাহার উপর একটা অহেতুকী স্নেহপ্রীতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। খাইতে খাইতে চন্দ্রমাধব বাবু হাসিয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মী তাহলে আমাদের বাঙ্গালীর

ঘরের মেয়ের মত পাঁচজনকে খাওয়াতে দাওয়াতে ভাল বাসেন দেখছি। তা, মালক্ষ্মীর এ সব রান্নাবান্না আসে?"

দীপ্তিও হাসিয়া বলিল, "কেন, মা লক্ষ্মীরা কলেজে পড়লে কি কেবল মেম সাহেব সেজে বসে থাকে—"

চন্দ্রমাধব বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "অমন কথা বোলো না মা, ওদের দেশে গেরোস্তদের ঘরে মেমসাহেবরা যা সংসারের জন্যে খাটে, তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়—এখানে ওরা বাবুয়ানা করুক—"

দীপ্তি বলিল, হাঁ, তা শুনেছি বটে—সেলাই করা কাপড়-কাচা থেকে আরম্ভ করে রান্না বাড়া সব—"

চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন, "তাহলে মা তুমি ত সব জান দেখছি, তবে—"

দীপ্তি তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ও তাহাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া বলিল, "তবে—তবে কি। আমার অহঙ্কার দেমাক দেখে 'তবে' বলছেন ত? সবাই ঐ কথা বলে।"

চন্দ্রমাধব বাবু মহা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না, না, সে কি কথা মা—তোমরা শিক্ষিত মেয়ে, তোমাদের যদি বিনয় সৌজন্য না থাকবে তবে কার থাকবে? এই দেখ না কেন—"

দীপ্তি হাসিয়া গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বলিল, "শুধু ঐ কমপ্লিমেন্ট দিলেন জেঠামশাই? কেন, আমরা কি রাঁধতে বাড়তে জানিনে—"

নিতাই খানসামা হাজির ছিল,—সে হঠাৎ কথার পিঠে কথা কহিয়া বলিল, "কে, দিদিমণি? ওঃ কত রসুই জানে।—জানেন কত্তাবাবু। এ সব কচুরি সিঙ্গাড়া পোলাও কালিয়ে নয় শুধু, সুক্ত ঘন্টো"—

দীপ্তির মুখ চক্ষু লাল হইয়া উঠিল, হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "বামুন ঠাকুরকে আর দুখানা লুচি আনতে বলে এসো নিতাই—"

চন্দ্রমাধব বাবু "উঁহু, না, না," বলিয়া পাতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু নিতাই চরণ দিদিমণির মুখচক্ষুর ভাব দেখিয়া ত্বরিত পদে স্পন্দিত হৃদয়ে আদেশপালনে গমন করিল। প্রভুভৃত্যের মধ্যে এই ভাববিনিময় বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া চন্দ্রমাধব বাবু আচমনান্তে একটি সিগার ধরাইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে বলিলেন, "তা মা, এইবার কাজের কথা পাড়তে পারি কি?"

দীপ্তি বলিল, 'হুঁ', জানি। কিন্তু আমার যা জানাবার তা ত চিঠিতেই জানিয়েছি, তার বেশী আর ত কিছু বলতে পারবো না।"

চন্দ্রমাধব বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি মা, চিঠিতে ত কেবল একটু আভাস দিয়েছ মাত্র, আসলে কতদূর কি হয়েছে তা ত জানাও নি।"

দীপ্তি গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "বলছি ত, এর বেশী আমার আর কিছু জানাবার নেই আপনাকে—আমার কর্ত্তব্য ঐ খেনেই শেষ হয়েছে।"

চন্দ্রমাধব বাবু একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন; অনুযোগের সুরে বলিলেন, "তা বটে। এর বেশী খোঁজ নেবার অধিকারও আমার নেই। তবে বলছিলুম কি, যারা হিমাংশুকে এই কারবারে নামিয়েছে, তাদের সম্বন্ধে তুমি কিছু সন্ধান পেয়েছ কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম।"

দীপ্তি এবার একটু কঠোর স্বরেই বলিল, "তারা হিমাংশু বাবুকে কারবারে নামিয়েছে কি হিমাংশু বাবু তাদের কারবারে নামিয়েছেন, সে সব খবর আমি কিছুই জানি না,—এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত কথা—আপনি না নিলেও পারেন—তাই আপনাকে লিখেছিলুম।"

চন্দ্রমাধব বাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর ও নীরব হইয়া রহিলেন। পরে শুধু বলিলেন, "হুঁ।"

দীপ্তি এবার অপেক্ষাকৃত সহজ ও কোমলকণ্ঠেই বলিল, "আপনি আমার উপর রাগ করলেন বোধ হয়। কিন্তু দেখুন, আমি ত ইনফর্মারের মত ওদের খবরাখবর রাখিনি—তবে এইটুকু আপনাকে বলতে পারি যে ওদের একজনের একটা আর্টিকল্ প'ড়ে মনে বড় রাগ হয়েছিলো, আর একজনের কথাবার্ত্তা চালচলন দেখেও কেমন একটা অবিশ্বাস আর সন্দেহ দেখা দিয়েছিলো—হয়ত এই জন্যেই ওদের উপর আমার তেমন আস্থা নেই, এও হতে পারে—"

চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন, "তার মানে তুমি আমায় এখন থেকে ওদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখতে বলছো কেমন, না?"

দীপ্তি বলিল, "সে আপনার ইচ্ছা। তবে আমার মনে হয় আপনার যখন টাকা, তখন সন্দেহের কারণ না থাকলেও আপনার আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল।"

চন্দ্রমাধব বাবু আবার কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে বলিলেন, "হুঁ। আচ্ছা আর একটা কথা। তুমি যে হিমাংশুর ডাক্তারী প্রোফেসান ছেড়ে লেবার মুভমেন্টে যোগ দেওয়ার কথা বলছিলে—ওহো হো—ঐ যে তুমি কম্যুনিজমের কেতাব পড়ছিলে ওটা কি—ওটা কি ওরই সম্পর্কে ?"

দীপ্তি যেন কিছু অপ্রতিভ হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, 'হাঁ, খানিকটা বটে। কম্যুনিজম্ জিনিষটে আমার মোটেই জানা ছিল না, অথচ ও সম্বন্ধে হিমাংশু বাবুর লেখা কখানা প্যামফ্লেট আমায় পড়তে দেওয়া হয়েছিল—তাই জিনিষটে আগে বোঝবার চেষ্টা করছিলুম।'

চন্দ্রমাধব বাবু এবারও একটি ছোটখাটো 'হুঁ' দিয়া জবাব পর্ব্ব সমাধা করিলেন। কিন্তু এবার তাঁহার অধরকোণে একটু যেন মৃদু হাস্যরেখা খেলিয়া গেল।

তাহার পর তিনি সহাস্যে বলিলেন, "তাহলে আজ উঠি। এরপর দরকার হলে যদি বুড়ো জেঠামশাই দুচারদিন এসে বিরক্ত করে যায় তা হলে তার অপরাধ নিওনা, কারণ তুমিই ত আমায় এ সংবাদ দিয়েছ মা।"

দীপ্তিও হাসিয়া বলিল, "অপরাধ নোবোনা, খুব নোবো। কেন বললেন আপনি, মাঝে মাঝে দুচারদিন আসবেন ? যদ্দিন কলকাতায় থাকবেন, রোজ আসবেন না কেন ? আপনার ঐ ভবানীপুরের বাসায় কেবল চাকর বামুনের কাছে কি আদর যত্ন পাবেন ? সত্যি জেঠামশাই, এইখানেই এবারটি থাকুন না কেন—মেয়ের কাছে থাকতে আপত্তি কি ?"

চন্দ্রমাধব বাবুর বিস্ময়ের সীমা নাই। সত্যই ত নারীচরিত্র দুর্জ্জেয়! তাঁহার নয়নে অজ্ঞাতসারে একবিন্দু অশ্রু সঞ্চিত হইল, মন পুলকিত হইল। এই সংসার-মরুর মধ্যে নারীর স্নেহস্পর্শ যেন সাহারার মধ্যে ওয়েসিস। তাঁহাকে অতি আপনার করিয়া নিবিড়ভাবে এমনভাবে কেহ বহুদিন আকর্ষণ করে নাই। হর্ষ-পুলককম্পিত স্বরে তিনি বলিলেন, "আসবো বৈকি মা, নিশ্চয়ই আসবো। আগে ত জানতে পারিনি তুমি আমার কত আপনার—এখন থেকে আসা-যাওয়ার সম্পর্ক হোলো। তুমি কি আমার ভবানীপুরের বাসায় কখনও গিয়েছিলে মা ?"

দীপ্তির মুখখানি ঈষৎ লোহিতাভ হইল, সে বলিল, "হাঁ, গিয়েছিলুম একদিন—তা বেশীক্ষণ ছিলুম না. হিমাংশু বাবুকে দু-একটা কথা বলবার দরকার ছিল। মাগো, ঘর দুয়ারের যে ছিরি!"

চন্দ্রমাধব বাবু যাত্রার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দীপ্তি তাঁহার অনুগমন করিল। কক্ষের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন, "তুমি যাও মা, আর আসবার দরকার নেই। আমার ঘর দুয়োরের ছিরির কথা আর বোলো না মা—লক্ষ্মীছাড়াদের আর ওর বেশী কি হতে পারে ? আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যার ঘরের লক্ষ্মী হবে, তার শ্রীসম্পদ যেন পূর্ণ অঙ্গ হয়ে উথলে ওঠে।"

দীপ্তির মুখমণ্ডলে অকস্মাৎ অত্যধিক রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। আরক্তমুখে ঈষৎ রূঢ়স্বরে সে বলিল, "আপনাদের বুঝি ঐটি ছাড়া মেয়েছেলেদের আর কিছু মঙ্গল ইচ্ছা জানাবার নেই ? এ দেশের মেয়ে পুরুষ সবাই কি সমান ? কেবল ঐ ভাবনা ?"

চন্দ্রমাধব বাবুর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া দীপ্তি ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। চন্দ্রমাধব বাবু হাসিবেন কি দুঃখ করিবেন. কিছু স্থির করিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৎপরে কি ভাবিয়া সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। যাত্রাকালে ভাবিতে লাগিলেন, এই অভিমানদর্পিতা ক্ষুদ্রা ব্যাঘ্রীকে ক্রুদ্ধ করিয়া ভাল হইল কি ? সমস্তক্ষণ তাহার সহিত মধুর আলাপের সুযোগ পাইয়া শেষ-মুখে অকারণ এই ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ ঘটাইয়া কি লাভ হইল ? এ যেন দুস্তর সাগর পার হইয়া আসিয়া কূলের কাছে ভরাডুবি!

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

যেতে হ'বে চলে

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তরঙ্গ-বন্ধনে বাঁধা হে পৃথ্বী আমার,
সময় হয়েছে যাবার।
ওগো নীলাকাশ, ওগো পুঞ্জ নক্ষত্রমণ্ডলী,
ওগো কুন্দকলি,
চলে' যাবো আজ।
পৃথিবীর বেচা-কেনা, ধরণীর সব কাজ
মোর কাছে শেষ হয়ে গেছে।
নিবেছে প্রদীপ—ফুরায়েছে
তৈল তার।
চারিধারে মোর, ঘন কালো তমসার
চঞ্চল অঞ্চল ধরে মোরে বাহু প্রসারিয়া
অদৃশ্য সে হাত দিয়া
ধীরে ধীরে আমারে জড়ায়।
চায়
মোরে তার কাছে—
আলোহীন, সূর্য্যহীন, অন্ধকার মাঝে!

ওগো মা বসুধা!
কত ভালোবাসি তোমা! মোর ব্যথা
বার বার মর্ম্মরিয়া ওঠে
চৈতালির বায়ু সম অন্তঃহীন মাঠে!
কত ভালোবাসি
শিশিরের অশ্রুজল, প্রভাতের হাসি,
বনানীর ঘনছায়া, পাখীর কাকলি,
গুঞ্জরিত অলি,
এই নীলাকাশ,
এই আলো, এই মেঘ, এই যে বাতাস!

মোর ছোট গৃহখানি
মৃত্তিকায় ঘেরা। পত্র আনি, পুষ্প আনি,
আনি ফল-মূল—দিন মোর কাটে।

রক্তাভ উষায়, মাঠে
যাই। কত করি কাজ...
সব কথা ধীরে ধীরে মনে পড়ে আজ!

মধ্যাহ্নের দীপ্ত শিখা মাঝে,
বস্ত্রাঞ্চলে খাদ্য ঢাকি আনে মোর কাছে
নির্ম্মল বালিকা এক।—মোর বঁধু, মোর সাথী!
...সরম-জড়িত পদে আসে যেন রাতি।

প্রতি সন্ধ্যায়,
অন্ধকারে তুলসীর মূলে, মোর আঙিনায়
জ্বালে সে প্রদীপ। শঙ্খধ্বনি করি, করি লয়
সন্ধ্যারে বরণ! কঙ্কন বলয়
রিণিঝিণি করি উঠে
নিস্তব্ধতা টুটে।

আজি এই সব;
এই উষা, এই রাত্রি, এই ঝিঁঝিঁ রব
সবই ছেড়ে যেতে হবে!
যেতে হবে চলে' কার আবাহনে, কার মৌনরবে
কোন এক অনির্দ্দিষ্ট দেশে!...ফোটে কি কুসুম সেথায়?
ঝঙ্কারে কি পাখীর কাকলী? তথায়
ঝরে কি আলো? আসে কি প্রভাত?
তথায় আছে কি দিবা-রাত?

...নাহি জানি কিছু!
সর্ব্ব অঙ্গ মোর রিম্‌ঝিম্ করে। পিছু পিছু
আসে গো আঁধার।
সে আঁধারে শুনি যেন পদ-ধ্বনি কার!

অভিজ্ঞান

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

অভিজ্ঞান—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, প্রকাশক আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৪৬৭ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

প্রভাতকুমারের গল্পে এক রায়বাহাদুরের সাক্ষাৎ পাই, যিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'তোমার উপন্যাসে কেবল লভ্ আর লড়াই; তার চেয়ে এমন একটা উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস লেখ যা প'ড়ে বাঙালী ছেলে ব্যবসা বাণিজ্য শেখে।' বঙ্কিমবাবু নাকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ তাই করব, আর বইয়ের পরিশিষ্টে কাঁচামাল ও পাকামাল, আমদানী ও রপ্তানীর একটা statistics এঁটে দেব।'

উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের প্রতি সাধারণ পাঠকের কারণ-সঙ্গত একটা বিতৃষ্ণা আছে। উদ্দেশ্য যার মূল, তার শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্পের বাইরে যদিচ আর্টের সুগারকোটিং, ভিতরে তার উদ্দেশ্যের সুতিক্ত পাঁচন আছেই আছে। উদ্দেশ্য থাকলেই উপদেশ থাকবে, এবং উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে। পাঠকদের মধ্যে যারা মূর্খ তাদের প্রকোপের কারণ ঘটবে, এবং যারা মূর্খ নয় তাদের ঘটবে সময়ের অপব্যয়। দুয়ের কোনটিই গ্রন্থকারের সুনামের অনুকূল নয়।

উদ্দেশ্যমূলকের একটা বাঁধাবাঁধি রাস্তা আছে, তার একটা কাটা একটা ছাঁচ, একটা ফর্মুলা, যথা ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়। গল্প সে যেমনই হোক না,—প্রেমের অথবা ডিটেকটিভের কিম্বা এতদুভয়ের—পাঠক একেবারে সুনিশ্চিত যে শেষের অঙ্কে বা পরিচ্ছেদে নায়ক নায়িকার মিলন হবেই হবে, অথবা ডিটেকটিভ্ কর্তৃক চোর গ্রেফ্তার, থাকুক্না কেন প্রথম ও শেষ পরিচ্ছেদের মাঝে চমকপ্রদ নানা ঘটনা-বলী যাতে করে ক্ষণিকের জন্য মনে দুরাশা জাগতেও পারে চিরাচরিতের হন্ত বুঝি নির্ব্বাসন। কিন্তু হায়, সে দুরাশা সফল হবার নয়।

"অভিজ্ঞান" যদিও অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা, কিন্তু তা বলে এটা উদ্দেশ্যমূলক মোটেই নয়। অভিজ্ঞান দস্যু-নিপীড়িতা সন্ধ্যার গভীর লাঞ্ছনার মর্মন্তুদ কাহিনী হৃদয়ের সমস্ত দরদ দিয়ে গ্রন্থকার নির্যাতিতার আত্মনিবেদন রচনা করেছেন। অপরিসীম সংযমের সঙ্গে তিনি উৎপীড়িতার কাহিনী অশ্রুর আখরে লিখে গেছেন,—কারো দোষ দেননি, কারো প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেননি। শাণিত বাক্যবাণে সমাজকে জর্জরিত করবার এতবড় একটা প্রলোভন তিনি অনায়াসে এড়িয়ে গেছেন; সন্ধ্যার অস্বাভাবিক পিতা, নিষ্ঠুর শ্বশুর, দুর্বলচিত্ত স্বামী—এদেরও এঁকেছেন করুণ সহানুভূতি দিয়ে, কারণ তিনি জানেন সমাজের মতি যদিও বদলেছে গতি বদলায়নি, এবং এসব লোকের নিজস্ব কোন গতি নেই; সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত গতিই এদের গতি, এরা নিতান্তই পঙ্গু দুর্বল অসহায়। তিনি ভীমের মতো অসহায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেননি, তাদের বলবীর্যহীনতায় গ্লানি অনুভব করেছেন কিন্তু সহানুভূতি দেখাতে কার্পণ্য করেননি। এইখানেই তাঁর বলিষ্ঠ উদার মনের বিশেষত্ব।

তিনি আমাদের আমন্ত্রণ করেছেন ঝাড়গ্রামের জমিদারের অট্টালিকায় অভাগিনী সন্ধ্যার জীবনকাহিনীর যেখানে সুরু। আমরা গিয়েছি তাঁর পিছু পিছু শাল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেখানে পালকী চড়ে চলেছে সন্ধ্যা রেলষ্টেশনের দিকে। আমরা শুনেছি সেই ঘন গহন অন্ধকারে ডাকাতের লাঠির আওয়াজ, সন্ধ্যার গভীর আশার স্বপ্নকে যা চুরমার করে ভেঙে দিলে। দুর্বৃত্ত ডাকাতের ঘরে দেখলাম সন্ধ্যার নির্যাতন, কিন্তু কোথায় লাগে সে নির্যাতন তার শ্বশুর ও পিতৃগৃহের কাছে। সন্ধ্যার মৃত্যু-ভীতিহীন তেজ গুণ্ডার পশুপ্রবৃত্তিকে পরাজিত করতে পারল, কিন্তু বিধিনিষেধ শাসিত হিন্দুগৃহের গোড়ামিকে পারল

না। শুধু সে নিজের ইচ্ছায় চলে, সম্মানার্হার সম্মানের প্রতি যখন সে সচেতন হয় তখন তাকে সম্মান দেখাতে তার বাধে না। হিন্দুগৃহের নিজের কোন ইচ্ছাই নাই, সে যন্ত্র। সমাজ তাকে যে পথে দম দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে সে-পথ ছাড়া তার গতি নেই। যেখানে সন্ধ্যার কোন দাবীই ছিল না সেই ভিন্ন-ধর্মী পরগৃহে সে পেলে পরমাত্মীয়ার মর্য্যাদা, অতিথির সম্মান; আর যেখানে ছিল তার দাবী, সেখানে সামান্য দাসীর মতন স্থানও তার জুট্‌ল না। প্রচণ্ড দুঃখের দাহনে জলতে জলতে চলেছে এই হতভাগিনী মেয়ে, উল্কার মতো কক্ষবিচ্যুত পথে, সজ্ঘর্ষে অগ্নিময় হয়ে; কখনো তার চোখে উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা, কখনো ঠিকরে পড়ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

সে পেলে প্রমথর দেখা। বাঙালীঘরের শুড্‌বয় সে নয়, বাপমায়ের সুপুত্র হয়ে বংশ আলো সে কোনোদিন করেনি, বিধি-নিষেধকে না মানাই তার বিধি। জীবন তার নিঃসঙ্গ উদ্দেশ্যবিহীন, অর্থের প্রাচুর্য্য তার সমস্ত শিষ্ট এবং অশিষ্ট খেয়াল মেটায়। মদটি তার নিত্য পেয়। বিনোদিনী-কামিনী-মানদার দল তাকে কেন্দ্র করে অর্থের আকর্ষণে তার চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়ায়। এ হেন পাষণ্ড ব্যক্তির কাছে সন্ধ্যা কি ক'রে আত্মরক্ষা করল, কি করে তার উপযুক্ত সম্মান মর্য্যাদা আদায় করল সে একটা পরমাশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু সন্ধ্যার মতো মেয়েকে যে জানে সেই জানে সন্ধ্যার দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব। প্রমথ নিজেই তার পরিবর্ত্তনে আশ্চর্য্য হয়ে বলছে, "সাবাস প্রমথ"। সে নিজেকে তুলনা করেছে এক মাংসলোলুপ ব্যাধের সঙ্গে যে একদিন হঠাৎ একটা স্বচ্ছ শ্বেতকান্তি স্ফটিক্ কুড়িয়ে পেয়ে সেটার দিকে মুগ্ধনেত্রে রইল চেয়ে। তার হাত থেকে খসে গেল ধনুকবাণ, তার মন থেকে হিংসা। বনফুল তুলে এনে সে সুরু করল পূজা। আমরা ত সবাই এমনি আর এক ঘটনার কথা জানি, এক ডাকাতের এমনি ধারা পরিবর্ত্তন হয়েছিল এক মহীয়সী নারীর সংস্পর্শে এসে। তিনিও বাংলা দেশের নারী। প্রমথর পরিবর্ত্তন সে হল প্রধানতঃ বিজয়িনী সন্ধ্যার গৌরবের জয়টীকা, তবু তাতে প্রমথরও গৌরব কম নয়, কেন না তার মধ্যেও এমন কিছু ছিল যা অনির্বচনীয়, যা সমস্ত মলিনতার মধ্যেও আপনাকে রক্ষা করে এসেছে, একদিন আত্মপ্রকাশ করল।

অবশেষে সন্ধ্যার স্বামী প্রিয়লালের সঙ্গে সন্ধ্যার হল দেখা। এইখানেই সমস্ত রচনার কৃতিত্ব অপরূপ রঙে রসে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে দেখা দিয়েছে। রচয়িতার অপরিসীম শক্তির প্রতি যে সুগভীর বিস্ময় সমস্ত বইখানির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় উদ্ভূত, শেষের দিকে সে বিস্ময় পুঞ্জীভূত হয়ে মনকে চমক লাগিয়ে দেয়। চিরাচরিতের অর্থহীন অন্ধ আবেগ অতিক্রম করে সন্ধ্যার অন্তরশায়ী দেবতা সহসা জাগ্রত হলেন, অকস্মাৎ তিমিরাবরণ ভেদ করে সহজ সত্য বিদ্যুদ্দীপ্ত মরকত মণির মতো জলে উঠল। সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই,—অভিজ্ঞান সেই মানুষের জয় গান।

প্রিয়লালের একাগ্র প্রার্থনা উপেক্ষা ক'রে চিরাচরিতের এই অবমাননা, সনাতন পন্থার এই অতিক্রম স্থিতিশীল মনে প্রচণ্ড ঝটিকা তুলবে। কিন্তু পৃথিবীর চির-চলিত পথ সন্ধ্যার মতো মেয়েদের জন্যে নয়, তারা আসে নতুন পথের প্রবর্ত্তন করতে। সন্ধ্যার সমজাতীয়া আর এক মেয়ের কাহিনীতে যে পূর্ব্বাভাষ দিয়েছিলাম সন্ধ্যার সম্বন্ধেও তা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। এখানে সেটুকু উদ্ধৃত করলে বোধ হয় অন্যায় হবে না—

একা বাজিল বুকে তীব্র জ্বালা রূঢ় আঘাতের
বাহিরিল খুঁজে নিতে সুবিপুল এই জগতের
বিচিত্র সম্ভারভরা সমারোহ মাঝে
পন্থা তার কোথায় বিরাজে।

সনাতন রাস্তা দিল ছেড়ে।
তোমরা বলিবে মাথা নেড়ে
চিরদিন এইপথে আর সব নারী
চলিয়াছে, মনঃপূত হল নাকো তারি।

মনে রেখো; একদা এ ধরণীতে নাহি ছিল পথ
সনাতন কোনো মতামত।
দূর অতীতের যুগে অজানা কে, এ গাথার বধূটির মতো—
রচেছিল পন্থা নব নাহি মানি নিন্দা শত শত—
আজ তারা হল সনাতন।

গলিবেনা তোমাদের মন ?
চলে যাবে তোমাদের পানে চেয়ে চেয়ে
বাক্যহারা অভিমানী মেয়ে ?

দেবী নাই, আসিবে সে ফিরে
পন্থাহীন প্রান্তরেতে পন্থা চিরে চিরে—
সেই পথে রমণীর প্রাণ
দাসত্বশৃঙ্খল ভাঙি স্ব-বলে লভিবে পরিত্রাণ,
আপন গৌরবপথে রচিবে আপন প্রতিষ্ঠান।

কবি রহে জাগি—
অনাগত সুদিনের লাগি।

দস্যুর হস্তে নিগৃহীতা সন্ধ্যার শ্বশুরগৃহে ও পিতৃগৃহে নির্য্যাতনের কাহিনী সমস্ত বাঙালী হিন্দুর লজ্জার ও কলঙ্কের কাহিনী। অপমানিতা নারীর প্রাণে তার নিকটতম আত্মীয়দের এই বর্বরোচিত ব্যবহার কি মর্মান্তিক হয়ে বাজে, সুনিপুণ কথা-শিল্পী সন্ধ্যার চরিত্রে তা অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। সন্ধ্যা বার বার আপনাকে প্রশ্ন করেছে ভদ্রগৃহস্থের মেয়ে সে, ধনী ও বনেদি বংশের বধূ, সহসা কোন মহাপাপে হল সে বন্দিনী ডাকাতের ঘরে ? সেখানে তার সদ্যোবিকশিত নারীত্ব কি ঘৃণিতভাবে অপমানিত হল, বিমর্দ্দিত হল। তার নিকটতম আত্মীয়রা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল, পথের পঙ্কে নির্দ্দিষ্ট হল তার স্থান।— কিন্তু কেন, কোন অপরাধে ? যে প্রায়শ্চিত্ত এত ভীষণভাবে প্রকট হয়ে উঠল, চোখে তার পাপ দেখা যায়না কেন ? সন্ধ্যা নিরন্তর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাই ভাবে। কখনো কখনো যেন তার বিশ্বাসই হয় না, তার অদৃষ্টেও এ ঘটল! তার অন্তরের সমস্ত দুঃখ বেদনাকে অতিক্রম করে একটা তীব্র ক্রোধ জাগে, অভিমানে সমস্ত শরীরটা যেন বিষিয়ে ওঠে। হতভাগিনী সন্ধ্যা,—যারা তার বিপদের সময় তাকে রক্ষা করতে পারল না, দস্যুর কবল থেকে উদ্ধার করবার মুরদ যাদের নেই, সেই নিকট আত্মীয়ের দল কোন অধিকারে তাকে ত্যাগ করল। তারা ভয় দেখাল সমাজের। সন্ধ্যাকে যদি তারা ঘরে স্থান দেয় তাহলে তাদের বংশে কলঙ্ক লাগবে,—আর নিরপরাধা নির্য্যাতিতাকে কুকুর শেয়ালের মধ্যে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের বংশ গৌরবে সমুজ্জল হয়ে উঠল! সন্ধ্যার পিতার ভয় তাকে গৃহে স্থান দিলে তাঁর অপর কন্যাদের বিবাহ হবে না। হতভাগ্য মেয়ের বাপের প্রায়শ্চিত্ত এখানেই শেষ নয়। তাঁর গ্লানির চরম হল যখন তিনি করযোড়ে তাঁর দ্বিতীয় কন্যা সম্প্রদানের উমেদারী করলেন প্রিয়লালের কাছে, যে তাঁর প্রথমা কন্যাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে নি, অসহায় জেনেও তাড়িয়ে দিয়েছে সেই প্রিয়লালের কাছে। কিন্তু এমনি ধারা ঘটনা বাংলা দেশে ত সচরাচরই ঘটছে। পত্নীঘাতী পুরুষদের পাত্রীর অভাব হয়েছে বাংলাদেশে এমন কখনো শুনিনি।

রামচন্দ্র পত্নী ত্যাগ করেছিলেন প্রজারঞ্জনের জন্যে। স্বামীর কর্ত্তব্য ও রাজার কর্ত্তব্য এ দুয়ের সামঞ্জস্য হয়েছিল কিনা, এবং সীতাদেবীকে বিনা দোষে নির্ব্বাসিত করবার অধিকার তাঁর ছিল কিনা এ সম্বন্ধে চিরদিন মতদ্বৈধ থাকবে। কিন্তু রামায়ণের দোহাই এ কালের প্রিয়লালদের বেলা খাটবে না, কারণ সে যুগের পৌরুষ নারীলুণ্ঠনকারী দস্যুকে সবংশে সংহার করে সসম্মানে গৃহের লক্ষ্মীকে গৃহে ফিরিয়ে আনত, আর এ যুগের প্রিয়লালরা দস্যুর এক ঘা লাঠির আঘাতেই পা ভেঙে ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদ করে, পুলিশে খবর দিয়েই কর্ত্তব্য শেষ হয় এবং গৃহলক্ষ্মীকে উদ্ধারের জন্যে লড়াই ত দূরের কথা তিনি যদি স্বয়ং গৃহে ফিরে আসেন ত তাকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দেওয়াই বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের বিধি। বাঙালী স্বামীর ও তার আত্মীয় স্বজনের এই ইতর ব্যবহার আমাদের মনে কি কোনো লজ্জারই উদ্রেক করবে না কোনোদিন ? যাকে রক্ষা করবার কোনো সামর্থ্য রাখি না, তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেবার কোনো অধিকার আমাদের আছে কি ? সমাজের দোহাই দিলে কি হবে, সমাজ ত আমাদেরই সৃষ্টি। শাস্ত্রের দোহাই দিলেই বা কি হবে, শাস্ত্রের সব বিধান কি আমরা মানি ? আমরা যদি মানুষ হতাম, আমাদের সমাজ এবং আমাদের তথাকথিত শাস্ত্রও অন্য রকম হত।

বাংলাদেশে সাধারণতঃ নারীরা অসহায়, পুরুষরা বলবীর্য্য-হীন। তাই দস্যুকর্ত্তৃক নারীহরণ এখানে প্রায় প্রতিনিয়তই

ঘটছে। দস্যুরা যাতে শাস্তি পায় তার জন্যে আজকাল সভাসমিতি হয়েছে, মামলা লড়বার জন্যে অর্থসাহায্যও হয়। কিন্তু অত্যাচার ত দস্যুরা তত বেশী করেনা যত করে অপহৃতা নারীর আত্মীয় স্বজন। সন্ধ্যা নিজেই বলছে, "খবরের কাগজে আমার মতো হতভাগিনীদের কাহিনী পড়তে পড়তে যখন দেখতাম যে বিনা অপরাধে তাদের বাপ মা শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী তাদের অনায়াসে ত্যাগ করলে তখন কি ঘৃণা যে তাদের ওপর হতো তা তোমাকে কি বলব। গুণ্ডাদের চেয়েও তাদের ওপর আমার বেশী ঘৃণা হোত।" লাঞ্ছিতা হতভাগিনীর স্থান হয় কোনো অবলা আশ্রমে, অভিজ্ঞানের আমিনা যাকে বলেছেন 'পিঁজরাপোল'। পিঁজরাপোল, কারণ, গরু মোষ ঘোড়া এইসব গৃহপালিত প্রাণীরা বুড়ো হয়ে অচল হয়ে গেলে তাদের পিঁজরাপোলে দেওয়া হয় তা ত জান? সেখানে তারা যতদিন বেঁচে থাকে, জীবন ধারণের মতো দানাপানি পায়। আমার শ্বশুর বলেন, তোমাদের হিঁদুদের মাতৃমন্দির অবলা-আশ্রম নামে সে সব ব্যাপার আছে সবই ঐ হিন্দুমেয়েদের পক্ষে পিঁজরাপোলের মতন।" কোনো দোষে যারা দোষী নয়, যাদের একমাত্র দুর্ভাগ্য বাঙালী হিন্দুর ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মানো, জোর করে তাদের এই বানপ্রস্থ অবলম্বন করান যে সমাজের বিধি সে সমাজ কি সভ্য সমাজ? কথার উচ্ছ্বাসে আমরা বলি আমরা নারীকে মস্ত সম্মান দিয়েছি তাঁকে শক্তিরূপে পূজা করে, কিন্তু কাজের বেলা এই বাক্যবাগীশের দল তাঁর প্রতি যে ব্যবহার করে থাকি তার হিসেব নিকেশ কখনো করেছি কি? মুসলমান সমাজ এ বিষয়ে হিন্দুর চেয়ে উন্নত, হিন্দুর চেয়ে উদার। গ্রন্থকার একটি মাত্র বাক্যে উভয় সমাজের পার্থক্য সুন্দররূপে অভিব্যক্ত করেছেন,—হিন্দু কেবল জাত নিতে পারে, জাত দিতে পারে না। মুসলমান যেমন জাত নিতে পারে তেমনি সে জাত দিতেও জানে। সহস্র সাধনাতেও প্রিয়লাল যে মর্য্যাদা সন্ধ্যাকে দেয়নি, অযাচিত ভাবে নাসির সন্ধ্যাকে সেই মর্য্যাদা দিতে চেয়েছিল। যদি বলি নারীর প্রতি দুর্ব্যবহারে বাঙলাদেশের জহরলাল প্রিয়লালের দল বিগত রাশিয়ার জারের চেয়েও অত্যাচারী, তা হলে কি অতিরঞ্জন হয়? যদি বলি আমাদের সমাজ নারীনিগ্রহের পাপে আজ পৃথিবীর কাছে নিগৃহীত, অপমানিত তা হলে কি মিথ্যা বলা হবে • • •

অভিজ্ঞান বইখানি বাঙালী হিন্দুসমাজের কাছে মস্ত বড় একটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছে, সন্ধ্যার মতো মেয়েদের জন্যে তোমরা কি ব্যবস্থা করচ? সমাজবৃদ্ধের ওপর কোনো ভরসাই রাখা যায় না। এই অত্যাচারের কাহিনী তাঁদের যে বিচলিত করবে এতবড় দুরাশা নেই। তাঁরা এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেবেন জহরলালের মতো, "অদৃষ্ট তার মন্দ এই তার অপরাধ। দুরদৃষ্টের মতো দ্বিতীয় অপরাধ আর নেই। তা না হলে এত সাধু লোক যে এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করে তার কোনো অর্থই হয় না।" অথবা দোহাই দেবেন পূর্ব-জন্মার্জিত কর্মফলের। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় নির্য্যাতিতা নারীর অপরিসীম দুঃখের কোন লাঘবই হবে কি?

সমাজবৃদ্ধদের ওপর ভরসা নেই, সমাজের তরুণদের ওপর কি ভরসা আছে? তরুণ প্রিয়লালের দল এ ক্ষেত্রে কি রকম ব্যবহার করবে তার নমুনা ত গ্রন্থকারই দিয়েছেন। আশ্রয়-প্রার্থিনী সন্ধ্যাকে প্রিয়লাল আশ্রয় দিল না। সন্ধ্যা যখন বলল, "তুমি ত ধর্মসাক্ষী করে আমাকে গ্রহণ করেছ, এখন তুমি আমাকে একটা অনিশ্চিত সময়ের জন্যে বাপের বাড়ীতে অপেক্ষা করতে বলছ। দৈবক্রমে তুমি পুরুষ হয়ে জন্মেছ আর আমি জন্মেছি মেয়েমানুষ হয়ে, এরই বলে তুমি আমার ওপর এত বড় অত্যাচার করতে পারছ। এই কি তোমার ধর্ম? এই তোমার কর্ত্তব্য?"

তখন প্রিয়লাল বলল, "আমার কর্ত্তব্য তা হলে কি বল তুমি?" সন্ধ্যা স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল প্রিয়লালের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বলল, "আমি যা বলি তা পারবে তুমি করতে? আমি বলি তোমার কর্ত্তব্য তোমার বাপ মা আমাকে নিতে রাজী না হলে আজই তোমার আমার সঙ্গে এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসা। তারপর কোনোদিন যদি তাঁদের মত আমাদের স্বপক্ষে বদলায় সেদিন আমরা দুজনে আবার এ বাড়ীতে ফিরে আসব। এ তুমি পারবে করতে? আমি হলে কিন্তু নিশ্চয় পারতুম।"

আর্ত্তস্বরে প্রিয়লাল বললে, "আমি দুর্বল। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো সন্ধ্যা।" সজোরে মাথা নেড়ে প্রবলভাবে

সন্ধ্যা বললে, "না না, দুর্বলকে আমি ক্ষমা করিনে, দুর্বলকে আমি ঘৃণা করি।"

প্রিয়লাল শিক্ষিত, প্রিয়লাল চরিত্রবান, প্রিয়লাল সভ্যতা-অভিমানী এবং আভিজাত্য-গর্বিত। শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু-সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা প্রিয়লাল। এ হেন প্রিয়লালের মনে এতটুকু জোর নেই যে সে সন্ধ্যার প্রতি এই নির্মম ব্যবহারে সামান্য একটু প্রতিবাদও করে। সন্ধ্যার কি অপরাধ? সে নিজেই প্রিয়লালকে বলেছে, "এ তোমাকে আমি স্পষ্ট করে বলে রাখলাম, একমাত্র বাংলাদেশের হিন্দু-ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মান ছাড়া আর আমি কোন অপরাধ করি নি, পালকী থেকে নেমে পড়ে ডাকাতদের সঙ্গে পালিয়ে যায় নি, আমি তাদের লুঠ করতে আসবার জন্যে বলে পাঠাইনি। তাদের হাতে পড়ে আমার যে নিগ্রহ হয়েছে তার জন্যে একমাত্র তোমরা দায়ী। কেন তোমরা আমাকে অমন বিপদভরা পথ দিয়ে রাত্রে নিয়ে এসেছিলে? কেন তোমরা আমার রক্ষার জন্যে যথেষ্ট লোকজন সঙ্গে আনোনি? কেন তোমরা ডাকাতদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় সেখানে প্রাণ দিলে না? অপরাধ করবে তোমরা আর শাস্তি ভোগ করব আমি?—" এর উত্তরে তথাকথিত শিক্ষিত সচ্চরিত্র সুসভ্য বাঙালী তরুণ স্বামী যদি "আমি দুর্বল আমাকে ক্ষমা কোরো" বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, তা হলে এই ঘৃণিত পুরুষত্ববিহীন জাতির ভবিষ্যৎ যে ভয়াবহ তাতে সন্দেহ নেই।

এই বইখানি সভ্যতা-অভিমানী শিক্ষিত তরুণ মনে বারম্বার আঘাত করছে, বারম্বার বলছে—তোমরা মানুষ হও, এই নিবীর্য কাপুরুষতার জড়ত্বকে বীরের মতো খণ্ড খণ্ড করে উড়িয়ে দাও। তোমরা যে যথার্থ বীর, তোমরা যে যথার্থ পুরুষ, তোমরা যে যথার্থ প্রেমিক তা প্রমাণ করো। অভিজ্ঞানের এই মর্মভেদী প্রেরণা বাংলাদেশে কি ব্যর্থ হবে?

প্রিয়লালের চরিত্র শেষের দিকে অতি সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। তার মনের মধ্যে দুটো বিরুদ্ধগামী ধারা ক্রমাগত লড়াই করছে,—একটা হচ্ছে সন্ধ্যার প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ, আর একটা হচ্ছে প্রচলিত সমাজ বিধি এবং পিতার ইচ্ছার প্রতিবাদ করবার মতো মানসিক বলের অভাব। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তার মন সংস্কারের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে উঠছে, তার পৌরুষ তার দুর্বলতাকে জয় করে অবশেষে একদিন স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করল, কিন্তু হায়, তখন হয়ে গেছে অনেক দেরী। সন্ধ্যার প্রচণ্ড প্রয়োজনের সময় তার দাবীকে প্রিয়লাল স্থগিত করেছিল, 'দরকারের সময় স্থগিত করা মানেই অগ্রাহ্য করা।' সন্ধ্যার তুলনায় দুঃখ প্রিয়লালও কম পায়নি, তার জীবনের ট্র্যাজেডিও অপরিসীম। জীবন সংগ্রামে যা নিয়ম, সাধারণ সংগ্রামেও তাই নিয়ম। যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধা যদি তার মনের জোর হারিয়ে ফেলে, পরাজয় তার অনিবার্য, কেউ তাকে মার্জনা করে না। পরে সে যতবড় মনস্তাপেই জ্বলুক না কেন, তার দুর্বলতায় যে বিজয়লক্ষ্মী অপসৃতা, সে আর ফিরে আসে না। তবু তার ট্র্যাজেডিতে অভিভূত হয় না এমন মানুষ নেই, কারণ তার দুঃখের সান্ত্বনা নেই, জীবন তার ব্যর্থ, রিক্ত সঙ্গীবিহীন একাকী। যে প্রিয়লালের দুর্বলচিত্ততার জন্যে সে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত, সেই প্রিয়লাল যখন লক্ষ্ণৌ ছেড়ে চলে গেল তখন তার দুঃখে অশ্রুসিক্ত হবেনা এমন চক্ষু নেই।

সন্ধ্যা কথাশিল্পী উপেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সূর্য্য রশ্মিতে হীরকখণ্ডকে নানাদিকে ঘুরিয়ে ধরলে যেমন তা হতে শতসহস্র জ্যোতির ধারা বিচ্ছুরিত হয়, নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে সন্ধ্যার চরিত্র হতে তেমনি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ও তেজের রশ্মি বিকীর্ণ হয়েছে। সন্ধ্যা কখনো নববধূর বাসর-সজ্জায় ব্রীড়ারক্তিম্; দস্যুর অকথ্য অত্যাচারে কখনো সে পিঞ্জরাবদ্ধা সিংহীর মতো ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে অসংবৃতা আত্মহারা; আত্মীয় স্বজন স্বামীর নির্মম দুর্ব্যবহারে এই স্বভাবতঃ মৃদুভাষিণী কখনো মুখরা, উত্তেজিতা, ক্ষিপ্তপ্রায়। সমস্ত বাঁধন যখন ছিন্ন, তখনো আজন্মের সংস্কার এসে তাকে ব্যথিত করছে, প্রেমের দেবতা ধীরে ধীরে জাগছেন তার মনে,—এ যেন এক ঝটিকাবিক্ষুব্ধ কমলকলিকার আত্ম-সম্বরণের তপস্যা, আত্মোপলব্ধির কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মবিকাশের গৌরবময় জাগরণ। সকলের ওপর চোখে পড়ে তার চরিত্রের দৃঢ়তা, তার অপরিসীম তেজ, তার অবিচলিত আত্মসম্ভ্রম। সাধারণতঃ একথা বোধ হয় খুবই

সত্য যে বাঙালী নারীর আত্মসম্মান জ্ঞান বাঙালী পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী। সন্ধ্যা বাঙালী নারীর আত্মসম্ভ্রম জ্ঞানের প্রতীক। কারো অনুগ্রহের ভিক্ষার্থিনী সে নয়, পৃথিবীতে, সমাজে তার যা দাবী, তার যা ন্যায়সঙ্গত অধিকার তা সে যদি না পায়, রিক্ত হস্তে চলে যাবে, অনাহারে মরবে, তবু কারো কৃপাকণার প্রার্থিনী সে নয়। কি আছে এই মেয়েটীর চরিত্রে জানি না, কিন্তু আমাদের মন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিরন্তর তাকে নমস্কার জানায়, তাকে সম্ভ্রমজ্ঞাপন করতে হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে সন্ধ্যা নির্য্যাতিতা। নির্য্যাতনের ফলে মানুষের আত্মসম্মান গভীর ঘা খায়, বিলুপ্ত হয়েও যেতে পারে। সন্ধ্যার কিন্তু তা হয়নি। বারম্বার যতই ঘা সে খেয়েছে ততই দৃঢ় হয়ে উঠেছে তার আত্মসম্ভ্রম। এই জন্যে সন্ধ্যার চরিত্র আদর্শ চরিত্র।

আঘাত পেলে আত্মসম্ভ্রম কেমন করে লোপ পেয়ে যায় তার তুএকটা উদাহরণ দেব। ছোটনাগপুর অঞ্চলে অনেক কুষ্ঠরোগী পথে ঘাটে ভিক্ষা করে বেড়ায়। তাদের সঙ্গে কথা কইলে জানতে পারবেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ এককালে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ছিলেন। অবাক হয়ে যাবেন তাদের অধঃপতনের ইতিহাস শুনলে। তুরন্ত ব্যাধি এসে যখন আক্রমণ করল, সমাজ ও আত্মীয় স্বজন হতে হল তাদের নির্বাসন। তাদের যা কিছু পুঁজি ছিল তাই নিয়ে তারা বাইরে চলে এল, কুষ্ঠাশ্রমে চিকিৎসা করে নীরোগ হবার তুরাশায়। কুষ্ঠাশ্রমে স্থান সংকুলান হল না, পুঁজিও ফুরিয়ে গেল। তখন তারা ভিক্ষা করতে সুরু করল। গভীর ঘা খেয়ে এদের আত্মসম্ভ্রম কোথায় যে উধাও হয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই। একটী মেয়ের কথা আমি জানি, তার স্বামী ও শাশুড়ী তাকে বিনাদোষে সুদীর্ঘ তিন বছর একটা অন্ধকার ঘরে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। দৈবাৎ সেই ঘরের চাল ছাইবার সময় ঘরামীরা তাকে দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দিল। মেয়েটীকে উদ্ধার করে আনা হল। সে যখন সেই ঘর থেকে বেরিয়ে কোর্টে আসে, তখন তাকে দেখেছিলাম, তার সর্ব্বাঙ্গে মারের দাগ, পরণে ছিন্ন চট; মাথায় চুল নেই, অস্থিচর্ম সার, যেন শ্মশান থেকে মড়া উঠে এসেছে। বিচারে তার স্বামী ও শাশুড়ীর সুদীর্ঘ কারাদণ্ডের আদেশ হল, মেয়েটী তার বাপের কাছে ফিরে গেল। স্বামীর কারামুক্তি হবার পর একদিন দেখি বুড়ো বাপকে সঙ্গে করে মেয়েটী এসে হাজির, আমাকে বললে, "বাবা, আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।" হিন্দু ছাড়া অন্য কোনো জাতি হলে মেয়েটী বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে পুনরায় বিবাহ করতে পারত। তার বুড়ো বাপকে পরামর্শ দিলাম তোমার মেয়েকে নার্স কিংবা শিক্ষয়িত্রী এমনি একটা কাজে লাগিয়ে দাও যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে। এ পরামর্শ তাদের মনঃপূত হল না। স্বামীর কাছে ফিরে যেতেও মেয়েটী নারাজ, কারণ সে জানে তাকে আয়ত্তের মধ্যে পেলে তার স্বামী হয়ত তাকে প্রাণেই মেরে ফেলবে, কেন না মেয়েটীর জন্যে সে গুষ্ঠীশুদ্ধ জেল খেটেছে। মেয়েটী বললে, 'আপনি আমার স্বামীর কাছ থেকে কিছু মাসহারার ব্যবস্থা করে দিন, আমি বাপের বাড়ীতেই থাকব।' যে স্বামীর হাতে তার এমন অমানুষিক অত্যাচার ঘটেছে, যে তার জীবনকে, তার নারীত্বকে এমন নির্দয়ভাবে বিমর্দ্দিত করেছে, যে এখনো সুবিধা পেলে হয়ত তাকে মেরেই ফেলবে, সেই স্বামীর টাকার প্রতি এই ব্রাহ্মণকন্যার কিছুমাত্র ঘৃণা নেই, সেই টাকায় খরিদকরা অন্নজল স্বচ্ছন্দে তার গলা দিয়ে গলবে, জহরলালের মত কিছুতেই তার বমি হবে না, হজম করবে। এই মেয়েটীকে দেখলে বোঝা যায় নির্য্যাতিতা বাঙালীর মেয়ের আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান কত নীচু কোঠায় নেমে দাঁড়িয়েছে। এমনিধারা হাজার হাজার মেয়ে বাংলা দেশে আছে। সন্ধ্যার জ্বলন্ত তেজ, তার কঠোর আত্মসম্ভ্রম এদের উদ্বুদ্ধ করে তুলুক, আত্মবিস্মৃত নারীদের আত্মোপলব্ধি ঘটাক।

সব দিক দিয়ে অভিজ্ঞান একটা পড়বার মতো বই। গভীর শ্রদ্ধাভরে এ বই পড়তে হবে, গ্রন্থকার যা বলতে চেয়েছেন, যা বোঝাতে চেয়েছেন অভিনিবেশ সহকারে তা বুঝতে হবে। উৎপীড়িতার জন্য যে দরদ তিনি দেখিয়েছেন তা বাংলা দেশের জনে জনে উপলব্ধি করুন, এই অত্যাচরিতা নারীর কাহিনী সকলের প্রাণে গভীর সমবেদনা জাগাক, শুধু সমাজের মতি নয়, গতিও বদলে দিক। ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতির চিন্তার দৈন্য কোনোদিন ঘটেনি। সমস্ত সমস্যার সে চিরদিন সামঞ্জস্য বিধান করে এসেছে,—ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের অধঃপতনের দিনে বুদ্ধের বাণীকে সে পরম আগ্রহভরে গ্রহণ করেছিল, বৌদ্ধের অনাচার-স্রোত সে রুদ্ধ করে আবার ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান ঘটিয়েছে, মুসলমান বিজেতাকে সে অনুরাগে বশীভূত করে কায়মনোবাক্যে বাঙালী করেছে, ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য ভাবধারা সেই প্রথম গ্রহণ করেছে সতীদাহ সেই বন্ধ করেছে, বিধবা-বিবাহ সেই চালিয়েছে, আদর্শের জন্য সেই প্রাণ দিয়েছে। আজ যে জড়িমা তার পায়ের বেড়ি হয়ে আছে তা ঘুচিয়ে দিতে তার দেরী হবে না। অভিজ্ঞান সেই নবযুগের সূচনা করেছে, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতি উপেন্দ্রনাথের কাছে চিরদিনের মতো কৃতজ্ঞ রইল।

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

নলিনীদলগত

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম্‌-এ, বি-এল

অম্বুজনাথ ওরফে অম্বু চাটার্য্যি বি-এস্‌সি (ক্যাল্‌ ও বার্ম্ম্‌) প্রায় চার বৎসরকাল ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ায় থাকিয়া কাচের কারখানার কাজ শিখিয়া আসিয়াছে এবং তিন বৎসর হইল সাহাবাণপুরের নিকটে রাজপুর গ্লাস ফ্যাক্টরির সহকারী ম্যানেজারের কাজ করিতেছে। সম্প্রতি সে ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে।

ছুটি লইয়া আসিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না; ভাই-বোন, বাপ-মাকে অনেক দিন দেখে নাই, একবার দেখিয়া যাইবে। আর একটা উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের নূতন বাড়ীখানি দেখিয়া যাওয়া। অম্বুর বাবা সরকারি চাকরী হইতে অবসর লইয়া আসিয়া বালীগঞ্জে বাড়ী করিয়াছেন এক বৎসর হইল। তিনি নিজে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, সুতরাং স্বীয় তত্ত্বাবধানে বেশ মনের মতন করিয়া বাড়ীটি করিয়াছেন।

অম্বু আসিয়াছে ঠিক পূজার মাথায়,—চতুর্থীর দিন। প্রথম কয়দিন সে পূজার উৎসবে মাতিয়া রহিল। ছোট ভাই পঙ্কজকে (ডাক নাম পানু) লইয়া সারা কলিকাতা সহর চষিয়া বেড়াইল। এখন দুপুর বেলা একাই বাহির হয়; এখানে-ওখানে ঘুরিয়া, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে বই পড়িয়া সময় কাটায়। বৈকালে বাড়ী ফিরিয়া পানুকে লইয়া সে একটু বেড়াইতে যায়। বেশী দূর তাহাদের যাওয়া হয় না,—বাড়ীর কাছে বালীগঞ্জ পার্ক।

হ্যাট-কোট এবং বো আঁটিয়া বেতের ছড়ি হাতে লইয়া অম্বু বেড়াইতে বাহির হয়, পানু হাফ্‌-সার্ট ও হাফ্‌-প্যাণ্ট পরিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়। পানু বয়সে অনেক ছোট। যে বৎসর অম্বু ম্যাট্রিক পাস করে, সেই বৎসর তাহার জন্ম; এখন সে মোটে এগারোয় পড়িয়াছে। কলিকাতায়, বিশেষতঃ বালীগঞ্জে, অম্বুর কোন বন্ধু-বান্ধব নাই, তাই ছোট ভাইটিকে সঙ্গী করিয়াই সে বেড়ায়।

২

সেদিন পার্কের ভিতর দুই ভাইয়ে গল্প করিতে করিতে বেড়াইতেছিল, হঠাৎ অম্বুর লক্ষ্য হইল পানু তাহার পাশে নাই। সে পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল, পানু মাঝখানে একস্থানে দাঁড়াইয়া গিয়া কি একটা কৌতুক দেখিতেছে। পায়ে পায়ে ফিরিয়া গিয়া অম্বু দেখিল পানুর সমবয়সী একটি ছেলে ছোট্ট একটা কুকুর লইয়া খেলা করিতেছে। কখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া একটু দৌড়াইতেছে, কখন নাচাইতেছে, কখন একটা রবারের ছোট লাল বল গড়াইয়া দিতেছে আর কুকুরটি ছুটিয়া গিয়া মুখে করিয়া তাহা আনিয়া দিতেছে।

দাদাকে নিকটে দেখিয়া পানু বলিল—"এটা কি কুকুর দাদা? কেমন সুন্দর!"

অম্বু বলিল—"বোধ হয় জাপানী স্প্যানিয়ল; নয় খোকা?"

ছেলেটি তখন কুকুরটিকে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—"হ্যাঁ এর মোটে এই দেড় বৎসর বয়স,—ছেলেমানুষ।"

পানু কুকুরের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। অম্বু বলিল—"এ আর বেশী বাড়বে না,—এ জাতের কুকুর ছোটই হয়। একে খুব যত্ন করে রেখো,—বড় সুখী জীব এরা।"

"এর নাম কি ভাই?"—পানু বলিল।

"এর নাম জেম।"

"জেমকে একটু নামিয়ে দেবে ভাই? ডাক্‌লে আমার কাছে আসে কি না দেখি।"

পানু একটু দূরে সরিয়া গিয়া, অনেকখানি হেঁট হইয়া হাত বাড়াইয়া ডাকিল—"জেম জেম, আয় আয় তু-তু।"

অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ক্রমে ক্রমে একটু একটু অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু পানু তাহাকে ধরিতে যাইবামাত্র সে ছুটিয়া পলাইল। ছেলেটি তাহাকে আবার

কোলে তুলিয়া লইল। হাসিয়া বলিল "ভয় পায়,—বড় ছেলেমানুষ কি না।"

পান্নু বলিল—"আমাদেরও একটা কুকুর আছে। আচ্ছা দাদা, জ্যাক্‌কে বেড়াতে আন্‌লে হয় না?"

"খুব হয়। তা হলে ত সে বাঁচে। সেখানে খুব বেড়াত।" তারপর ছেলেটির দিকে চাহিয়া বলিল—"খোকা, কুকুরের নাম বললে, নিজের নামটি ত বল্‌লে না।"

"আমার নাম অপু—অপরূপ রায়।"

পান্নু বলিল—"কাল তাহলে আমাদের কুকুর নিয়ে আস্‌ব।"

অপরূপ ঘাড় হেলাইয়া বলিল—"এনো।"

৩

পরদিন অপু ও পান্নুর সঙ্গে জ্যাকও পার্কে বেড়াইতে আসিল। সে জাতিতে স্কচ্ টেরিয়ার; খুব বড় না হইলেও জেমের চাইতে অনেক বড় বটে। তাহাকে দেখিয়া জেম প্রথমটা খুবই ভয় পাইল; পরে যেন একটু একটু করিয়া ভয় ভাঙিতে লাগিল। জ্যাকের সহিত খেলা করিবার মত সাহস না হইলেও তাহার সম্মুখ হইতে বল কুড়াইয়া আনিবার মত সাহস হইল। বোধ হয় জেম ছেলেমানুষ বলিয়া জ্যাক তাহাকে কিছু বলে না, মুরুব্বির মত চুপ করিয়া বসিয়া তাহার খেলা দেখে।

একবার, কি জন্য জানি না, বলটা যখন জ্যাকের সম্মুখ দিয়া গড়াইয়া গেল, সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। জেম বলের পশ্চাতে ছুটিতেছিল, জ্যাককে উঠিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর ফিরিয়া ছুট দিল ঊর্দ্ধশ্বাসে। কিছুদূরে একখানা বেঞ্চের উপর একটি তরুণী বসিয়াছিল, জেম ছুটিয়া গিয়া একেবারে তাহার কোলের উপর উঠিয়া বসিল। অপু তাহাকে ধরিয়া আনিতে গেল; বলিল—"জেমটা কি ভীতু দেখেছ দিদি!"

তারপর জেম আবার খেলা আরম্ভ করে।

তিন দিনের মধ্যে দুই কুকুরের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়া গেল। তারপর দুজনে মিলিয়া খুব ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে।

কুকুরদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অপু ও পান্নুর মধ্যেও বেশ ভাব জমিয়া উঠিল।

অপুর দিদি নলিনী বলে—"ও ছেলেটি কে রে?"

অপু বলে—"ও আমাদের স্কুলেই পড়ে—এক ক্লাস ওপরে। ওকে স্কুলে দেখেছি অনেকবার, কিন্তু আগে চিন্‌তুম না। এখন খুব ভাব হয়েছে।...জানো দিদি, ওর ঐ যে দাদা,—উনি বিলাত-ফেরত।"

নলিনী বলে—"সাহেবী পোষাক পরে সেইটেই বুঝি জাহির করা হয়! বিলাত গিয়ে কোন্ ছুটো হাত বেরিয়েছে তার ঠিক নেই, সাহেবিয়ানাটা ষোল আনা শেখা হয়েছে।"

বড় বড় চোখ বাহির করিয়া অপু বলে—"না গো, তুমি কি জানো? উনি বিলাত থেকে অনেক পাশ করে এসেছেন। এখান থেকে খুব দূরে কোথায় এক জায়গায় একটা কারখানার ম্যানেজার উনি, তিন শ' টাকা মাইনে!"

"ওঃ, ভারি ত!"

দিদির এই তাচ্ছিল্যের ভাবটা অপুর কিন্তু মোটেই ভাল লাগে না।

৪

পান্নু দাদার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হয় বটে, কিন্তু পার্কের ভিতর তাহার সহিত প্রায় কোন সম্বন্ধই থাকে না। পার্কে পৌঁছিয়া জ্যাক ও জেম অবিলম্বে পরস্পরকে খুঁজিয়া বাহির করে। অপু ও নলিনী হয় ত বেড়াইয়া বেড়াইতেছে, জ্যাক ছুটিয়া গিয়া সেখানে পৌঁছায়,—তাহার পেছু পেছু পান্নু। অপু জেমকে কোল হইতে নামাইয়া দেয়, দিয়া পান্নুর হাত ধরিয়া বেড়াইতে থাকে। প্রত্যহ নলিনীর দলটি বেশ ভারি হয়; তিনজনে পরমানন্দে হাসি-গল্প করিতে করিতে বেড়ায়। অমু একা পড়িয়া যায়,—তাহাকে একাকি এদিক-ওদিক ভাসিয়া বেড়াইতে হয়।

যেদিন হয় ত একটু বেড়াইয়া অপু ও নলিনী বেঞ্চে গিয়া বসিয়া আছে,—জ্যাক ঠিক গিয়া জোটে। পান্নুও গিয়া অপুর পাশে বসিয়া পড়ে। অমু বেচারী লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সময় কাটায়,—যতক্ষণ না পান্নুবাবুর বাড়ী ফিরিবার সময় হয়।

এমনই একদিন দুই ভাই-বোনে বসিয়া আছে, পান্নু ও জ্যাক আসিয়া জুটিল। অমু দূর হইতেই পাশ কাটাইতেছিল, হঠাৎ নলিনী বলিল—"পঙ্কজ, তোমার দাদাকেও ডেকে এনে বসাও না। অপু তুই-ই যা।"

অপু ছুটিয়া গিয়া অম্বুকে ধরিল। সে খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া অপুর সঙ্গে গিয়া নলিনীকে নমস্কার করিয়া বেঞ্চের এক প্রান্তে একটু জায়গা করিয়া লইয়া বসিল। বেঞ্চের অপর প্রান্তে নলিনী, মাঝখানে অপু ও পানু।

আজ অম্বু নলিনীর সাক্ষাৎ পরিচয় পাইল, পূর্ব্বে যদিও পানুর নিকট সে অনেক কথা শুনিয়াছিল। নলিনী ব্যারিষ্টার মিঃ তড়িৎ রায়ের কন্যা। এ বৎসর সে আই-এ পাস করিয়াছে। বি-এ পড়িবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু তাহার পিতা আর পড়িতে দিলেন না।

বেশী কথা আর তাহাদের যোগাইল না। ছেলেদের কথা কিন্তু আর ফুরায় না,—পরম উৎসাহের সহিত তাহাদের নানা আলোচনা হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে ছেলেদের ডিঙ্গাইয়া দুই তরুণ-তরুণীর মধ্যে দু একটা বাক্য-বিনিময় হইল মাত্র।

গল্প করিতে করিতে দুই বালক-বন্ধুতে আপন আপন কুকুর লইয়া উঠিয়া গেল। অম্বুও উঠিল। নলিনী বলিল—"আপনিও যাচ্ছেন না কি? কোন কাজ আছে?"

অপ্রস্তুতের নিষ্প্রভ হাস্যের সহিত অম্বু বলিল—"না, কাজ আর কি?"

"তবে বসুন না, একটু গল্প-সল্প করা যাক।"

অম্বু আবার তাহার নিজস্ব জায়গাটিতে বসিল। কিন্তু দুজনে যে কথাবার্ত্তা হইল তাহাকে গল্প করা বলা যায় না,—টেলিগ্রাফী ভাষায় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর মাত্র।

অল্পক্ষণ পরে বন্ধু-যুগল ফিরিয়া আসিলে অম্বুর যেন ঘাম দিয়া জর ছাড়িল।

৫

তিন-চার দিনের মধ্যে অম্বুর সঙ্কোচ ভাবটা অনেকখানি কমিয়া গেল। এখন সে কতকটা সহজ ভাবেই নলিনীর সঙ্গে কথা কহিতে পারে। মধ্যে মধ্যে একটু-আধটু হাস্য-পরিহাসও হয়। অম্বু তাহার বিলাত প্রবাসের অনেক কথা শুনাইয়াছে, সে যে কাজ করে তাহারও কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছে, আর কয়েকদিন পরে তাহার ছুটি ফুরাইলে কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে তাহাও বলিয়াছে।

ছেলেরা কুকুর লইয়া মহা আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে নলিনীর মুখের উপরে যেন একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। সে বলিল—"আপনি যাবার সময় জ্যাককেও নিয়ে যাবেন ত?"

"হ্যাঁ,—কেন?"

"না, বলছিলুম জ্যাক চলে গেলে জেমটার বড় কষ্ট হবে,—দুটোতে খুব ভাব হয়েছে কি না। রোজ বিকালে বেড়াতে আসবার জন্যে কি রকম যে ছটফট করে বেড়ায়! আমাদের পায়ের কাছে ঘুরঘুর করে কেবলই তাগাদা দেয়।"

একটু সহানুভূতির সুরে অম্বু বলিল—"হ্যাঁ, তা ত দেখছি। কিন্তু জ্যাক কি আমাকে ছেড়েই থাকতে পারবে? জানি না ত।"

নলিনী বলিল—"সে যাই হোক, অন্ততঃ যে ক'দিন আছেন, ওকে নিয়ে একবার করে বেড়াতে আসবেন ত?"

তাহার বিষণ্ণতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে অম্বু একটু রসিকতার চেষ্টা করিয়া বলিল—"তা ত আসতেই হবে। এখন যে আমিও আপনার দলের সামিল হয়ে গেছি কি না,—একেবারে নলিনীদলগত!"

নলিনী হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"কিন্তু ও সম্বন্ধে একজন মস্ত বড় জ্ঞানী পুরুষ কি বলে গেছেন জানেন?"

"কি?"

"তিনি বলেছেন যে নলিনীদলগত জলং—অর্থাৎ কিনা অম্বু—অতিশয় তরলং তথা চপলং।"

"না, সে কথা আমার বেলায় খাটে না। দেখতেই পাচ্ছেন, আমি তরলং মোটেই নই,—ঘোরতর নিরেটং। আর যদি বলেন চপলং, ত দেখুন আমি কতদূর ধীরং স্থিরং চ গম্ভীরং!"

বদনমণ্ডলে ভ্রূকুটিজাল বিস্তার করিয়া অম্বু প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্তব্ধ, নিস্পন্দ, নিশ্চল হইয়া বসিল।

তাহার এই আকস্মিক রূপান্তর দেখিয়া নলিনী খিল-খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে অম্বুর গাম্ভীর্য্যচ্যুতি ঘটিল না।

অবশেষে নলিনী হাত যোড় করিয়া কহিল—"আচ্ছা ঢের হয়েছে মশায়, আর নয়। প্রমাণ হয়ে গেল যে মহাজন-বাক্যও ভুল হয়। এখন রক্ষে করুন; আপনার এই বিরাট

গম্ভীর মূর্ত্তি সম্বরণ করুণ। একটু মুখ-চোখ নাড়ুন।"

"নেড়ে—?"

"এই গল্পসল্প করুন একটু।"

"কি গল্প, বলুন।"

"এই আপনাদের বিলেতের গল্প।"

'বিলেত দেশটা কি আমাদের ?"

"আপনাদেরই ত। আপনি কি রকম খাঁটি সাহেব! বিদেশ থেকে বাড়ী এসেছেন, এখানে কোনও কাজ কর্ম্ম নেই, তবুও সাহেবী পোষাক আঁটা। বেবিয়েছেন বেড়াতে, তাও বিলিতি পোষাকে প্যাক হয়ে। বিলেত দেশটা আপনাদেব নয় ত আবাব কাদের?...আচ্ছা, আপনার মা-বাবা কিছু বলেন না?'

"তাঁরা আর কি বলবেন,—বাড়ীতে ত আমি আট-পৌবে ধুতি জামাই পরি। আপনি কি মনে করেন পায়-জামা আব ড্রেসিং-গ্রাউন পরে থাকি?...আসল কথা কি জানেন,—বাইরে বেরুবাব মতন ভাল জামা-কাপড আমার বিশেষ নেই; সেখানে ত ও-সব চলে না কি না। যা আছে তাও পুবণো, আর ক'দিন প'বে ময়লা হয়ে পড়ে রয়েছে। তাই এতেই চালিয়ে দিচ্ছি,—এই কটা দিনের জন্যে আবার নতুন কাপড়-চোপড কিনবো?"

"তা বটেই ত! সেই টাকাতে অন্ততঃ একটা ভাল ফেল্ট-হ্যাট আর একজোড়া বুট কিনলে বরং—"

কথাটা আর শেষ হইল না,—অপু ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"চল দিদি, এইবার বাড়ী যাবে?"

৬

রোজ প্রায় নলিনীরাই আগে পার্কে আসে। সেদিন কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল। এ রকম এক একদিন হয়। অম্বু ও পান্নু আসিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল, জ্যাক তাহার বন্ধুর সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একটু পবে দেখা গেল অপু ছুটিয়া আসিতেছে। আজ তাহার সঙ্গে নলিনীও নাই জেমও নাই। সে আসিয়াই বুক-পকেট হইতে একখানা চার ভাঁজ করা নীল রঙের কাগজ বাহির করিয়া পান্নুর হাতে দিল এবং কোনও কথাটি না কহিয়া যেমন আসিয়া-ছিল তেমনই ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল। রাস্তায় তাহাদের মোটর দাঁড়াইয়াছিল, অপু গিয়া উঠিতেই ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল।

ব্যাপাব কি কিছু অনুমান করিতে না পারিয়া অম্বু পান্নুর মুখের পানে চাহিল। দেখিল সেখানে আসন্ন বর্ষণের পূর্ব্ব-লক্ষণ।

"কি হয়েছে রে? জেমের অসুখ করেছে, না কি হয়েছে?"

উষ্মা-মিশ্রিত অভিমানের সুরে পান্নু বলিল—"দেখ না, কি হয়েছে!"

অম্বু কাগজখানা হাতে লইয়া দেখিল, অপু পান্নুকে চিঠি লিখিয়াছে:—

মঙ্গলবার

ভাই পঙ্কজ,

তোমার সঙ্গে ভাই আড়ি।

তোমাদেব জ্যাককে আমার মোটেই ভাল লাগে না। ওটা কি কুকুব না রাক্কোস? সেদিন জেমের বলটা আব একটু হলে ত গিলেই ফেলেছিল। জেম ওকে দেখলে ভয়ে মরে। সে আজকাল ভাল করে খায় না, সারাক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করে, দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। তাই আর জ্যাকের সঙ্গে ওকে মিশতে দেবো না।

তোমার ওপরেও ভাই আমার বড় রাগ। তুমি এক ক্লাস ওপরে পড কেন? আমার বুঝি লজ্জা করে না? তুমিও হয়ত আমাকে ঘৃণা কর,—নীচের ক্লাসে পড়ি বলে। তাই তোমার সঙ্গে আর মিশবো না ভাই।

তারপর তোমার দাদা। তিনি ত যেন একটা সঙ্‌! অম্বুজ বাবু না গম্বুজ বাবু। কাটখোট্টা পোষাক পরে ওঁকে কি রকম যে দেখায় হয়ত উনি জানেন না, কিন্তু আমাদের বড় বিচ্ছিরি লাগে। ঠিক যেন ষ্টীম রোলারের ড্রাইভার।

তাই ভাই আড়ি দিলুম। আমরা আর পার্কে বেড়াতে যাব না। ওখানে বড় ভীড়। আজ থেকে লেকে যাব। লেকেব পূব ধারে একটা জায়গা আছে, বেশ ফাঁকা, নিরিবিলি। ইতি

তোমার বন্ধু
শ্রীঅপরূপ রায়

চিঠি পড়িয়া অমু হাসিতে লাগিল। বলিল—"আরে! তুই এর জন্যেই কেঁদে ফেলছিস! আমাকে ত সবচেয়ে বেশী গালাগাল দিয়েছে, কিন্তু আমি দেখ হাসছি।...এর জন্যে ভাবিসনে, এটা অপুর নেহাৎ ছেলেমানুষী। দেখ না, দু'দিন না যেতে ও-ই নিজে এসে আবার ভাব করবে'খন। এখন চল আমরাও আর কোথাও বেড়িয়ে আসি। এখানে আর ভাল লাগছে না।"

পান্নুকে লইয়া অমু চলিয়া গেল ভবানীপুর। সেখানে দু-জনের জন্য মট্‌কার পাঞ্জাবীর অর্ডার দিল। সেলাই ও ধোলাই করিয়া তিন দিনের মধ্যে দিতে হইবে।

সেখান হইতে গিয়া সিনেমা দেখিয়া তাহারা বাড়ী ফিরিল রাত্রি নয়টার পর। ফিল্মে রবিন হুড্ ও তাহার দলের কার্য্যকলাপ দেখিয়া পান্নু তাহার আকস্মিক বন্ধু-বিচ্ছেদের শোক প্রায় ভুলিয়া গেল।

৭

ইহার পরের তিনদিন অমুরাও আর পার্কে গেল না— সারাদিন ধ'রিয়া চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইল।

তারপর যথাসময়ে মট্‌কার পাঞ্জাবী আসিল। সেই সঙ্গে আসিল অমুর নিজের জন্য একজোড়া দেশী ধুতি, উড়নী, নিউ-কাট্ সেলিম ইত্যাদি।

ধুতি উড়ানী জয়হরিকে কুঁচাইতে দিয়া অমু চলিয়া গেল সেলুনে। সেখান হইতে আর একটু ছোট করিয়া চুল ছাঁটাইয়া, বাটারফ্লাই গোঁফজোড়াকে উড়াইয়া দিয়া সে ফিরাইয়া আসিল।

তারপর বৈকালে অভিনব পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া অমু পান্নুকে লইয়া অভিযানে বাহির হইয়া পড়িল। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া তাহারা সোজা চলিয়া গেল—লেক, লেকের পুব ধার।

সেখানে গিয়া এদিক-ওদিক একটু ঘুরিতেই জ্যাক কিছু-দূরে তাহার প্রিয় বন্ধু জেমকে দেখিয়া মহা লাফালাফি আরম্ভ করিয়া দিল। চেনে বাঁধা না থাকিলে হয়ত মান-অপমান ভুলিয়া ছুট দিত।

পান্নু একটু মিষ্টস্বরে দাদাকে বলিল—"ওঁরা ঐ ওখানে বসে রয়েছে দাদা, দেখতে পেয়েছ?

অমু বলিল—"তা দেখেছি। কিন্তু জ্যাককে ছাড়িসনে, ধরে রাখিস।...আয় আমরা এইখানে এক জায়গায় বসি,—যেন ওদের দেখতেই পাইনি।"

মিনিট কয়েক পরে দেখা গেল জেম ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে,—মুখে একখানা লাল কাগজ।

কাগজখানা লইয়া অমু দেখিল, সেটা কোন জুতার দোকানের পূজা-কন্‌সেশনের বিজ্ঞাপন। অমু বলিল,—"পূজো ত কোন কালে চুকে গেছে, তবু কন্‌সেশন দিতে ছাড়েনা। দোকানদারেরা আজকাল কি রকম নিস্বার্থ ব্যবসাই আরম্ভ করেছে—বছর ভোরই কন্‌সেশন দিচ্ছে, লাভ করবার কোন চেষ্টাই নেই।"

পান্নু বলিল—"এর ওপিঠে কি সব লেখা রয়েছে দাদা।"

সত্যই ত! পেন্সিল দিয়া কয়েক ছত্র লেখা অক্ষরগুলা অস্পষ্ট, বাঁকাচোরা। মনে হয় হাতের চেটোর উপর কাগজ রাখিয়া তাড়াতাড়ি লেখা হইয়াছে।

এটাও পান্নুকে লেখা অপুর চিঠি:—

প্রাণের বন্ধু পান্নু,

ভাব, ভাব, ভাব। তোমার সঙ্গে ভাই ভাব॥

তোমাদের ওপর সত্যি সত্যি ত আর রাগ করিনি।

তোমাদের জ্যাকটি ভাই বেশ। জেম ওকে বড্ড ভালবাসে। না দেখতে পেলে বড় কষ্ট পায়।

আর তুমি যে এক ক্লাস ওপরে পড়, ঠিকই কর। দিদি হিসেব করে দেখেছে তুমি আমার চেয়ে ন মাসের বড়।

তারপর তোমার দাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরে আজ তাঁকে কি সুন্দরই মানিয়েছে ভাই।

রাগ করিসনে ভাই। আমার আড়ি ফিরিয়ে নিলুম।

জ্যাককে নিয়ে এখানে একবারটি আয় না ভাই। দিদিও আছে।

স্নেহের বন্ধু অপু

চিঠি পড়িয়া পান্নুর চোখে মুখে একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। অমু বলিল—"দেখলিত? ঠিক যা বলেছিলুম; এখন যা—ভাব করেছে যখন, ডাকছে।...আমি এইখানেই আছি।..."

অমু একাকি বসিয়া লেকের জলে দুখানা নৌকার প্রতিযোগীতা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার বিলাতের ছাত্রজীবনের কত কথা মনে পড়িতে লাগিল।

তাহার মন কিন্তু তাহাতে তন্ময় হইয়া গেল না। মাঝে মাঝে আড়চোখে একটি দিকে কেবলই চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল নলিনীর দল তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে আর সেদিকে চাহিল না, একাগ্রদৃষ্টিতে বাচখেলা দেখিতে লাগিল।

"নমস্কার মহাশয়। মহাশয়ের নামটি কি মিষ্টার অমু চ্যাটার্জ্জি না শ্রীমান অমুজনাথ চট্টোপাধ্যায়?"

অমু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নলিনীকে প্রতিনমস্কার করিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া পাতিয়া দিয়া বলিল—"বসুন।"

নলিনী বসিল। ছেলেরা পরস্পরের গলা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অমু বলিল—"নাম আপনাদের যা পছন্দ হয় বলতে পারেন। গম্বুজ বাবু নামও মন্দ নয়,—বেশ গম্ভীর, ভারিক্কী নাম।" তারপর ছোট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অমু আবার বলিল—"আর এই কটাদিন পরেই ত চলে যাচ্ছি। আবার কতদিনে আসা হবে, আবার দেখা হবে কি-না তার ঠিক নেই। কিন্তু অপু আমাকে যে নামটি দিয়েছে গম্বুজ বাবু, তা চিরকাল মনে থাকবে।" অপুর মুখের পানে চাহিয়া সে একটু হাসিল।

অপুর বড় লজ্জা বোধ করিতেছিল। এ অপবাদ তাহার আর সহ্য হইল না। সে অভিমানের সুরে বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ, ও নাম বুঝি আমি দিয়েছি! দিদিই ত। ওই ত আমাকে বলে বলে চিঠি লিখিয়েছিল।"

"তবে রে ইষ্টুপিড্ ছেলে!" বলিয়া নলিনী অপুকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। সে দুপা পিছাইয়া গেল, তারপর "কেমন বলে দিয়েছি!" বলিয়া ছুট দিল। তাহার খেলার সাথীরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

অমু নলিনীর ঈষদানত বদনের পানে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল সেই শারদ-সন্ধ্যার অস্তাচলবর্ত্তী সুবর্ণমণ্ডিত মেঘরাশি তাহার সমস্ত লালিমা যেন এই একটি তরুণীর মুখের উপরেই উজাড় করিয়া দিয়াছে।

৮

অপু ও পানুর আবার পূর্ব্বের মতই ভাব হইয়াছে। তাহারা লেকে না গিয়া আবার পার্কেই বেড়াইতে আসে। যেমন ছিল সব তেমনই হইয়াছে। কেবল নলিনী আর সে নলিনী নাই। সে আজকাল বড় কম কথা কয়, সর্ব্বদাই বিমর্ষ, অন্যমনস্ক, চিন্তাভারগ্রস্ত।

কয়দিন হইতে নলিনীর মনে একটা কৌতূহল জাগিয়াছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হয় না। শেষে আর থাকিতে পারিল না।

বেঞ্চের দুই প্রান্তে দুইজন বসিয়া আছে, মাঝখানে অপু ও পানুর রিজার্ভ করা বসিবার জায়গা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। নলিনী বলিল—"আপনার ত বোধ হয় ছুটি ফুরিয়ে এসেছে,—কবে যেতে হবে?"

অমু বলিল—"ছুটি ফুরিয়ে এসেছে বললে ঠিক হয় না, ফুরিয়ে গেছে,—তবু যাই নি। আর এখন যাবও না। আর একমাসের ছুটি নিয়েছি। ম্যানেজার মিঃ মুর—আইরিশম্যান খুব ভাল লোক, আমাকে ছোট ভাইয়ের মতন ভালবাসেন। সেই ভরসায় শুধু একখানা দরখাস্ত পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলুম। ম্যানেজার সাহেবের চিঠি আজই পেয়েছি, বোধ হয় পকেটেই আছে,—হ্যাঁ, এই যে।"

চিঠিখানা বাহির করিয়া সে নলিনীর হাতে দিল। অন্যান্য কথার মধ্যে ম্যানেজার লিখিয়াছেন—"শীঘ্রই তোমার বিবাহের সম্ভাবনা আছে শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। প্রার্থনা করি তোমার জীবন সুখময় হউক। এক মাসের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে, সে সম্বন্ধে পৃথক পত্র অফিস হইতে পাইবে; বিবাহ যদি এখন হয়, হানিমুনের জন্য আবশ্যক হইলে আরও এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া দিতে পারিব বলিয়া আশা করি।"

নলিনী উল্লাসভরে বলিয়া উঠিল—"ওঃ! তবে ত আরও একমাসের ছুটি পেতে পারবেন।"

"সে ত যদি বিয়ে হয় তবে। নইলে ত নয়।"

"কেন, বিয়ের কি এখনও কিছু ঠিক হয় নি?"

"বই আর হয়েছে? আসল যা দরকার তাই হয়নি। এখনও অনুমতিই পাইনি।"

"কার অনুমতি ?"

"এই আপনার !"

"আমার ! বিয়ে করবেন আপনি, তাতে আমার অনুমতির দরকার ?"

"দেখুন, বিয়ে জিনিসটা এমন যে, একা একা হবার যো-টি নেই। একজন বিয়ে করতে গেলেই আর-এক জন এসে জুট্‌বে। সেই আর-এক জনের অনুমতি না পেলে কি করে হয় বলুন।"

নলিনী বড় বিপন্ন বোধ করিতে লাগিল। অম্বু যে আজ অকস্মাৎ এমন ভাবে এ কথাটা তুলিবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

তাহাকে নীরব দেখিয়া অম্বু বলিল—"কি, বলুন।"

নলিনী বিষম ঘামিয়া উঠিয়াছিল; রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"আমি আর কি বলবো। বাবা-মা যা করবেন তাই হবে।"

"তা ত নিশ্চয়ই। আর সেদিকে অনেকটা সুরাহা হয়েছে বলেও ভরসা হয়। আজ সকালে আপনার বাবা আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। আমি তখন বাড়ী ছিলুম না, এসে পানুর কাছে শুনলুম।...যাক, সে সব পরে যা হবার হবে, তাতে ত আমাদের কোনও হাত নেই। এখন তুমি কি বলছ, বল।"

নলিনী ততক্ষণে একটু সামলাইয়া উঠিয়াছিল। হাসিয়া উত্তর করিল—"আমি কিছু বলবার আগেই ত আপনি দখল করে নিয়েছেন, আর বলবার আবশ্যক কি ?"

"দখল আর কি করেছি ?"

"ঐ যে—'আপনি'টা হয়ে গেছে 'তুমি'।"

অম্বু হাসিয়া উঠিল; বলিল—"ওঃ তা যদি বিনা অনুমতিতে দখল করেই থাকি, তুমি এখন সে দখল কায়েম করে দাও।...বল নলিনী—হাঁ কি না ? ঐ দেখ ওরা এসে পড়ল বলে,—শীগগির বল নলিনী।"

সরম-জড়িত অস্ফুট স্বরে নলিনী শুধু বলিল—"হুঁ।"

অপুরা সত্যসত্যই আসিয়া পড়িল।

নলিনী তাহার রুমালে বাঁধা একটা আধুলি বাহির করিয়া অপুর হাতে দিয়া বলিল—"ঐযে সাইকেল চড়ে আইসক্রীম বিক্রি করে, তাই দুজনে দুটো নিয়ে খাওগে।...আর দেখ, গেটের পাশে বোধ হয় পাঁঠার ঘুগনি বেচতে বসেছে, কুকুর দুটোকে তাই কিনে দিও,—জেমকে এক পয়সার জ্যাককে দুপয়সার। কিন্তু খবরদার, তোমরা যেন ও সব খেতে যেও না।"

নাচিতে নাচিতে দুই জোড়া বন্ধু চলিয়া গেল।

অম্বু বলিল—"সবাইকারই মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা হল, কেবল আমি বেচারীই বাদ পড়লুম ?"

নলিনী ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল—"আপনিও খাবেন আইস্‌-ক্রীম ? আনতে বলব ?"

"আমাকেও কি ঐ আইস্‌-ক্রীম খেয়েই মুখ মিষ্টি করতে হবে ?"

অম্বুর মুখের হাসিতে চোখের চাহনিতে বোধ হয় কোন প্রচ্ছন্ন অর্থের ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাই নলিনীর মুখখানা হঠাৎ অসম্ভব রকম লাল হইয়া উঠিল। সে কিছু বলিল না, কেবল ছোট্ট একটি কিল তুলিয়া দেখাইল।

অম্বু নলিনীর দিকে পিঠ ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "বেশ ত, দাও না। ওতে শুধু মুখ কেন, সমস্ত দেহ প্রাণ মিষ্টি হয়ে যাবে।"

নলিনী একবার চোরের মত এদিক ওদিক চাহিয়া লইয়া সেই ক্ষুদ্র মুষ্টির মৃদু আঘাতে অম্বুর সারা অঙ্গে পুলকের স্রোত বহাইয়া দিল।

৯

সে দিন অপু আসিয়াই মুখখানা একটু বিষণ্ণ করিয়া বলিল—"অম্বুজ দা, দিদি কাল থেকে আর বেড়াতে আসবে না।"

"কেন ? কি হয়েছে ?"

"দিদির শীগ্‌গিরই বিয়ে হবে কিনা। মা বললেন, ও রকম করে বেড়াতে যাওয়া আর ভাল দেখায় না,—তাই।"

"ও! তোমার দিদির বিয়ে ? কবে ? কোথায় ?"

"তা জানি না। একটা ভাল বর পেলেই হবে।"

অম্বু হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"বাঃ! এ ব্যবস্থা তোমার ত মন্দ নয়। বরের সঙ্গে খোঁজ নেই, ঠিক হয়ে গেল—

শীগ্‌গিরই বিয়ে হবে। তারপর বিয়ের দিন স্থির হবে। বর একটা বিয়ের আগে যা হোক দেখেশুনে নিলেই চলবে, নয়?—বেশ আছ যা হোক!"

অপুর আর কথা কহিবার সময় ছিল না, জ্যাক ও জেম খেলিবার জন্য মহা তাগাদা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অপু দলবল লইয়া চলিয়া গেল।

বিবাহের পূর্ব্বে এই তাহাদের শেষ দেখা। আজ অনেক কথা বলিবার ছিল; কিন্তু কে কোন কথাটা যে আগে বলিবে খুঁজিয়া পাইল না।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর নলিনী বলিল—"আরও এক মাস ছুটি নেবেত?"

"নিশ্চয়ই! সাহেব যখন নিজে থেকে বলেছে, তখন ছাড়তে আছে!...চল, মাসখানেক কোথাও হানিমুন করে আসা যাক। তবে এরকম সাহেবিয়ানাতে তোমার কোন আপত্তি নেই ত?"

"আপত্তি আর কি?... কোথায় যাবে তা হলে?"

"এই পুরী, শিলং,—যেখানে হোক। এখন ত সবই সমান।"

"আচ্ছা, পানু-অপু আর কুকুর দুটাকে সঙ্গে নিলে হয় না?"

"না। ..অবশ্য এ বিয়ের গোড়াই হল জ্যাক আর জেম। তা হলেও, ওদের কারুকেই নিয়ে যাওয়া হবে না। ওরা সবাই এখন কাব্যের উপেক্ষিত। কাব্যের পরিণতির জন্যে ওদের যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ ছিল। এখন আর ওদের স্থান নেই। কাব্যের এই শেষ সর্গে—সপ্তম সর্গে—থাকবে, কেবল তুমি,—আর তোমাতে মিশে থাকব আমি।"

কৌতুকপূর্ণ হাসির সহিত নলিনী বলিল- 'নলিনীদলগত হয়ে?'

"নলিনীদল---'গত' বললে ঠিক হয় না,---নলিনীদলে বিলীন, বিলুপ্ত, সমাহিত!"

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

বাজারে
"ম্যালেরিয়ার মহৌষধ"
নানা প্রকার পাইবেন—কিন্তু
সাবধান!
যা' তা বাজে ঔষধ সেবনে
দেহের অধিকতর অপকার করিবেন না॥
এপাইরিন
ম্যালেরিয়া আদি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের
সুপরীক্ষিত অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ॥
এপাইরিন
—ব্যবহারে কোন কুফল নাই—
ভাল ডাক্তারখানায় পাইবেন
ল্যাড কো
কলিকাতা

তৈল

শ্রীরাইমোহন সামন্ত এম্‌-এ

কলিকাতা হইতে ফিরিতেছিলাম, বিকালের একটা গাড়ীতে। মনটা একটু অতিমাত্রায় ভালই ছিল; বাঙ্গালী জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ অবস্থা আমার তাহাই লাভ হইয়াছিল, গত বৃহস্পতিবার গেজেটে আমার চাকুরি লাভের খবর বাহির হইয়াছিল। রাস্তায়, দোকানে সওদা করিতে করিতে একটু দেরীই হইয়া গিয়াছিল, গার্ড সাহেব প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া হুইস্‌ল্ ফুঁকিতেছিল, আর নীল ফ্ল্যাগ নাড়িতেছিল। আমি একটু ছুটিয়া গিয়াই একটা ইণ্টার ক্লাসে আশ্রয় লইলাম আর তখনই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ীতে ভীড় ছিল, জানালার ধারে লম্বা বেঞ্চে চার পাঁচ জন আরাম করিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা লইয়াই বসিয়াছিল। মালপত্র নামাইয়া কুলি বিদায় করিলাম। তারপর মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বেঞ্চের কাছে গিয়া সভয় সঙ্কোচে বলিলাম, "মশাই একটু বসতে দেবেন ?" তাঁরা দেখিলেন কলেজি ছোকরা, হাতে ইংরেজি বই, বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে সামান্য একটু জায়গা ছাড়িয়া দিলেন, তবে বিশেষ খুসির সঙ্গে নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হইবার ইচ্ছা না থাকিলেও একটু চাড়া দিয়া আরামের সহিত বসিবার মত জায়গা করিয়া লইতে আমার বিলম্ব হইল না। তারপর সামান্য একটু জিরাইয়া লইয়া হাতের Upton Sinclair লিখিত Oil পুস্তকখানি পড়িতে লাগিলাম। পাশের ভদ্রলোকগুলি আলাপে মত্ত হইলেন। নানা রকমের কথা, আফিসের বড় বাবুর কথা, ফুটবল শীল্ডের কথা, ভারতীয় ক্রিকেটের কথা, পাটের দামের কথা, গিন্নীর অসুখের কথা, সুভাষ বসুর স্বাস্থ্যের কথা, চাকরি-বাকরির কথা। বুঝিলাম উঁহারা অধিকাংশই মার্চেণ্ট আফিসের কেরাণী। আমার বাঁদিকে একজন অদ্ভুত এক ব্যক্তি দলের মধ্যে পড়িয়াও বেশ নির্ব্বিকার হইয়া বসিয়া আছেন দেখিলাম। একটু বয়স্ক, চুল প্রায় সব পাকিয়া গিয়াছে, মাথা দিয়া তেল কাণের পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে; গন্ধে বুঝিলাম ভদ্রলোক মধ্যম নারায়ণ মাখিয়াছেন। মুখচোখের রেখাগুলি মুখটিতে একটা যেন ক্রুর বিষণ্ণ বিদ্রূপের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সংসারের হালচাল সব যেন তিনি দেখিয়া লইয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টির সামনে লুকান কিছু আর নাই, এই রকম ভাবটা। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হইল লোকটি পাকা Cynic। কেরাণী বৃন্দের আলাপ ঘুরিয়া ফিরিয়া চাকুরিতে উন্নতি কি করিয়া হয় এই প্রতিপাদ্যে আসিয়া পৌঁছিল। কেহ বলিল, "কাজের পুরস্কার আছেই মশাই, ফাঁকি দিয়ে কখনও বড় হওয়া যায় না।" অপর একজন মেকেনন মেকেঞ্জির কোন এক অখ্যাতনামা মধু বোসের কার্য্যদক্ষতা ও ভাগ্যহীনতার উদাহরণ দেখাইয়া পূর্ব্বোক্ত মতের ঘোরতর প্রতিবাদ করিল। এইরূপে উঁহারা যখন মতামতের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়া মরিতেছিল, এমন সময় Cynic মহাশয় একেবারে অযাচিত অনাহূত ভাবেই তর্কে যোগ দিয়া আরম্ভ করিলেন, "দেখুন, হঠাৎ কেহ আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে জীবনে সিদ্ধির উপায় কি, আমি বলবো তৈল।"

তাঁহার কথায় সকলেই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল, আমিও Upton Sinclair রাখিয়া তাঁহার দিকেই কাণ খাড়া করিলাম। তিনি বলিয়া চলিলেন।

"তৈল বলতে আমি কি বুঝি, তা অবশ্য আপনারা বুঝেছেন। ইহা কোন বস্তু নয়, বস্তুর গুণ মাত্র, একেবারেই রূপক। "পায়ে তেল দেওয়া" আমাদের ভাষায় প্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, জয়দেবের দেহি পদ পল্লব মুদারম্-এর বাংলা তর্জ্জমা হচ্ছে ঐ পায়ে তেল দেওয়া। প্রগতির পথে বাধা হচ্ছে ফ্রিকসন্, সেই বাধা কমাতে হ'লে প্রয়োজন তৈল। ইহা যেমন বস্তুজগতে সত্য, রূপজগতেও তেমনি সত্য।

আমাদের প্রেমজীবনে খোসামুদি করতে হবেই; খোসামুদি না হ'লে কোন নারীই সন্তুষ্ট হবেন না। চীনা সুন্দরীকেও খগজিনি নাক, পটল চেরা ভাসা ভাসা চোখ ইত্যাদি বলে সুখ্যাতি করতে হবে। অতিশয়োক্তি কেবলমাত্র কবিদিগের Licence নয়, আমাদের ব্যবহারিক জীবনের passport। যান্ত্রজগতেও এই তৈল প্রদানকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন; জড়পিণ্ডের কাছ হতে নির্বিবাদে কাজ আদায় করতে হলে, efficiency bar টপকাতে হ'লে দেন একটু তেল, করুন একটু খোসামুদি। তেল দেওয়া বন্ধ করুন, খোসামুদি স্থগিত রাখুন যন্ত্রপাতি বেঁকে দাঁড়াবে, efficiency bar দুর্লঙ্ঘ্য barrier হয়ে দাঁড়াবে, নানা রকম গরজ দেখিয়ে সকলেই কাজ পণ্ড করবে। তাই বলছিলাম যত কিছু প্রগতির মূলে তৈল। আমাদের কথায় বলে নাকে তেল দিয়ে ঘুমান' অর্থাৎ কি না নিদ্রাদেবীর রথের ঘর্ঘরধ্বনি ঐ তৈল প্রদানে মুখর হয়, ঘুমের চাকা যেন নাকের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে চলে। মানুষের মধ্যে যদি কোন একটা Common element থাকে তবে তা হচ্ছে ঐ তৈল প্রদানে প্রবৃত্তি এবং তৈল গ্রহণে ইচ্ছা। এইখানেই আমরা এক, এই আমাদের Common platform, 'এক সূত্রে গাঁথা মোরা মানব সন্তান'।

আমাদের ভিতরের 'আমি' বস্তুটার খোরাকই হচ্ছে তৈল, আমার চারপাশের নিম্নস্থ লোকগুলার কাছ থেকে তৈল না পেলে ওটা বাঁচতেই পারে না। শঙ্করাচার্য্যের শত মোহমুদ্গরেও ঐ আমিকে একটুও ভাঙতে পাবে না; ধনজন যৌবনের গর্ব্ব আমরা করবই, নলিনীদলগত জলের ন্যায় জীবন চপল বলেই বেশি করব এবং সেই গর্ব্বকে যে তৈলসিক্ত না করে আঘাত করবে তাকে কোন ক্রমেই ক্ষমা করব না। জগতে সত্য বথার চল নাই, কারণ তার পুরস্কার নাই। চাণক্য পণ্ডিতের 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ' এর কোন মানেই হয় না, কারণ সত্য মাত্রেই অপ্রিয়, সুতরাং পরিত্যজ্য।

তৈল সর্ব্বদাই উর্দ্ধগামী, আগুনের শিখার মতই উহা নীচে নামে না। জগৎ ব্যবস্থায় ক্রমে ক্রমে যে উচ্চ হতে উচ্চতর অবস্থার ধাপ রয়েছে, ঐ ধাপ বেয়ে তৈল চলেছে সোজা ঐ ভগবানের আসন পর্য্যন্ত। অতিমানব তার অতি উচ্চশিখর থেকে নিম্নবর্ত্তীদের কাছ হ'তে যে সম্ভ্রম শ্রদ্ধা আদায় করে নেয় তাকে আমরা hero worship বলি বটে, কিন্তু এই hero worship তৈল দানেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত। আমাদের গড়া ভগবানও ঐ কলুপ্রবৃত্তি এড়াতে পারে নাই, অর্জ্জুনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গীতার একাদশ অধ্যায় মুখস্ত বল, পড়

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।

তুমি হইবে শ্রেষ্ঠ ভক্ত, আর কৃষ্ণের দেবত্ব তুমি অস্বীকার কর তুমি হইবে নিকৃষ্ট পাপী। আমাদের ব্যোম ভোলা মহাদেব এমনই খোসামোদপ্রিয় যে মাথায় সামান্য একটু বেলপাতা দাও, শত্রুকেও পথ ছাড়িয়া দিবেন তিনি। চাঁদ সদাগরের মত একজনকে বাধিয়া আর একজনকে তৈল দিতে যাওয়ায় যে কি দোষ তাহা যাহারা ভুক্তভোগী তাহারাই জানে। ইহাকেই বলে difficult of serving two masters। ধর্ম্মজগতে ও কর্ম্মজগতে বাঙ্গালী হিন্দুর এ মুস্কিল লেগেই আছে। লক্ষ্মী সরস্বতী অনেক সময়েই জোড়া এসে প্রশ্ন করেন, 'কে বেশী সুন্দর', এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের ভাগ্য নলদময়ন্তীর অপেক্ষা বিশেষ ভাল হয় না।

Napoleonএর সময় ফরাসীতে নাকি এমন একটা সময় এসেছিল, যখন Career open to talent ছিল। জগতে এমন অবস্থা কোথাও কখনও এসেছিল শুনলেও সুখ হয়, কিন্তু কে জানে তখন talent এর সংজ্ঞা কি ছিল, তবে talent-এ তেলের গন্ধ সুস্পষ্ট। কার্লাইকে Genius এর সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, Capacity of taking infinite pains। এই ভুল সূত্র ধরে সংসার পথে চলেছিলেন বলেই হয়ত সংসার তাঁর কাছে বড় বন্ধুর ঠেকেছিল, তাঁর Sartor Resartus বহু বৎসর ধরে প্রকাশক পায় নাই। যথাস্থানে একটু তেল প্রদান করতে শিখলে তাঁকে অত কষ্ট করতে হ'ত না।

উন্নতির পথে চলতে চাও ত যথাস্থানে তেল দাও। এখন এই যথাস্থান নিয়েও যত গোলমাল। আমার এক চাকরকে একবার বলেছিলাম সাইকেলে তেল দিলে গাড়ী ভাল চলে। পর দিন দেখি দুইটা টায়ারকে সে আচ্ছা করে তৈলসিক্ত

করেছে। সে জাতিতে ছিল গোয়ালা, কিন্তু আমাদের অনেকেরই সন্ধিক্ষণে এই গোপবুদ্ধি এসে পড়ে, অন্যায় জায়গায় তেল দিয়ে ভবিষ্যৎ নষ্ট করি। কোথায় তেল দিলে যন্ত্রের গতি সচ্ছল হবে তা জানতে হ'লে যেমন যন্ত্রটাকে বিশেষ করে জানতে হয় সেই রকম কোন ব্যক্তির উপর তৈল প্রয়োগ করবার প্রয়োজন হ'লে ভাল করে লোকটাকে জানতে হয়। অনেকে এমন আছেন যেখানে কথাতেই চিঁড়ে ভিজে, সেখানে ছাড়ুন কথার স্রোত, অবশ্য humour বুঝে। আবার কোথাও মন্ত্র কথায় চিঁড়ে ভিজে না, তখন ছুটতে হবে হগমার্কেটে, সেরা কমলা, সেরা কপি, কড়াইশুঁটি হুজুরে হাজির করে বলতে হবে আপনার বাগানের ফসল ওগুলি, ভীম নাগের সন্দেশ আপনার গৃহিনীর স্বহস্তপ্রস্তুত বলে চালাতে হবে। কেউ কেউ দেখবেন সামনাসামনি প্রশংসা ভালবাসেন না। তখন তৃতীয় পক্ষের কাছে তাঁর প্রশংসা করে বলে দিতে হবে যে কথাগুলা যেন তাঁর কানে না যায়। তৃতীয় ব্যক্তি বিশ্বাসী হলে আপনার প্রশংসা ঠিক স্থানে যেয়ে হাজির হতে দেরী হবে না। কোথাও কোথাও দেখবেন তেল দেওয়ার আদর নাই, মহাশয় নিজমুখেই বলবেন খোসামোদি আমি পছন্দ করি না। সেখানে তেল দেওয়ার নিন্দা করুন, নিরভিমানের প্রশংসা করুন, কার্য্য উদ্ধার হইবে। কাহারও কাহারও কাছে একটু বাঁকাপথে চলতে হয়; সাহেবের বাংলায় গিয়ে ছোট ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকা কি পড়,' পেরাম্বুলেটরের কাছে গিয়ে সাহেবের মূক শিশুটিকে একটু নাড়াচাড়া করলেন, জানালা থেকে সাহেব গৃহিণী দেখলেন আর ভিতরে ভিতরে আপনার ভাগ্যাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র একটু নড়চড় হয়ে বসল, আপনার সুরাহা হয়ে গেল। এত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ইংরেজরা তো সোজাসুজি বলে, love me, love my dog also। বাংলায় বলে কাণ টানলে মাথা আসে, এ ত সেই আর কি!

আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। Man is weakest in his hobbies. কাজেই তৈল প্রয়োগের পূর্ব্বে লোকটার hobbyর সন্ধান নিতে হবে। এই hobby যে কত রকমের হতে পারে তা ভাবলেও আশ্চর্য্য হতে হয়। কারও দেখবেন শিকারে সখ, কারও বাগানে বাতিক, কারও বা সাহিত্যে, কারও জ্যোতিষে, আবার কারও প্রত্নতত্ত্বে। এদের মন পেতে হলে আপনাকেও সেই পথে অগ্রসর হতে হবে, খবরের কাগজের Garden notes থেকে নানারকম ফুলের নাম মুখস্থ করতে হবে ফিজিওলজির ছাত্র হলেও হিস্টলজি পড়তে হবে, সাহেবের হাতের রেখা দেখে সাহেবের ছেলে বিলাতে কেমন লেখা-পড়া করছে বলে দিতে হবে, 'রাজা হর্ষের কটা ছিল নাতি' সে সব করিয়া জাহির বিদ্যার জাহির কর্ত্তে হবে। এসব ছাড়া আরও নিম্নস্তরের কত শত hobby ই যে আছে, সে সব আর নাই বললাম। কাজ দেখিয়ে উন্নতি করবেন মাথা হেঁট করবেন না, এ মনোবৃত্তি নিয়ে বললে Sidetracked হতেই হবে। William Tell রাজাকে শির নোয়াননি বলে কি রকম বিপর্য্যস্ত হতে হয়েছিল তা ত জানেন। আরে বাপু, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করলে চলে। শুনা যায় না কি ছিমস্থিনিস জিবের আড় ভাঙবার জন্যে জিবের নীচে কাঁকর রেখে চীৎকার করতেন; মহাশয়, জগতে যদি উন্নতি চান তবে উপরয়ালা মনিবের কাছে গিয়ে, যাতে Sir, Your honour, হুজুরে তুফান ছুটাতে পারেন তার জন্য জিহ্বাকে শিক্ষিত করুন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখে-ছিলেন, 'জগৎ জুড়িয়া একজাতি শুধু সে জাতির নাম মানব জাতি।' আমার মনে হয় জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু সে জাতির নাম বলুন জাতি লিখলেই তিনি সত্য কথা লিখতেন। জগতের অধিকাংশ লোকই তৈলব্যবসায়ী। কাহাকেও দেখছেন মর্য্যাদার উচ্চতম শিখরে আরামে বসে আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁর পথের ইতিহাস। তৈল প্রদানের অনেক কথাই তিনি বলবেন, বলবার সৎসাহস যদি তাঁর থাকে। আমাদের দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানীরা এই সংসার-টাকে কলুর ঘানির সঙ্গে উপমা দিয়াছেন। যে সংসারে তৈলের এত মর্য্যাদা সেটা ঘানি না ত কি?

এক কালে বাংলা দেশে ইংরাজি শিক্ষার এতই উৎকট ইচ্ছা হয়েছিল যে, শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই ইচ্ছাকে স্বপ্নেও লালন করতেন। মাইকেল নাকি বলেছিলেন, ইংরেজি শিখতে চাও ত ইরাজি পড়, ইংরাজি কথা বল, ইংরাজিতে চিন্তা কর, ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখ। একেই বলে প্রকৃত

বাসনা, চাকরিতে উন্নতি করবার জন্যে ঠিক এইরূপ সত্যকার বাসনা চাই, শয়নে স্বপনে জাগরনে হুজুর Sir, Your honour বলে সেলাম বাজাবার মকস দিতে হবে। কিছু দিন পূর্ব্বে এক ছবি দেখেছিলাম, টেলিফোনে প্রভুর ডাক শুনে প্রভুভক্তভৃত্য অভ্যাস বসে সেলাম দিচ্ছে। এই হচ্ছে your most obedient servant এর ideal type."

এমন সময় গাড়ী শ্রীরামপুরে আসিয়া পৌছাইল। ভদ্রলোকটী শশব্যস্তে উঠিয়া বাক্স হইতে আপনার কাগজে জড়ান একটি ছোট বাণ্ডিল ও পুরাণ একটি ছাতা লইয়া আমাদের সকলকে নমস্কার করিয়া ত্বরিতপদে গাড়ী হইতে নামিয়া গেলেন। আমাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গেলেন, ভায়া, এখনও বাপদাদার খেয়ে মানুষ হচ্ছ, সংসারে ঢোক নাই, সংসার কি চিজ তা জান না। ভগবান না করুন, যদি চাকরি করতে হয় তখন বুঝবে বুড়া নেহাৎ মিথ্যা বলে নাই। এই বলিয়া প্লাটফর্মে টিকিট খানি দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আমার Oil মাথায় রহিল, বৃদ্ধ যে তৈল মাথায় ঢুকাইয়া দিয়া গেলেন তাহাই নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম। পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভদ্রলোকটি কে জানেন'? তিনি বলিলেন, 'ভদ্রলোক বেশ পণ্ডিত লোক, M.A.B.L; চাকরিও ভালই পেয়েছিলেন, কিন্তু উপরিয়ালাদের সঙ্গে কখনই বনিবনাও করতে পারেন নি। সকলের সঙ্গে সমান পাল্লায় কথা বলতে চাইতেন, অপমান হজম করতে পারতেন না। তাই ভদ্রলোক কিছুতেই চাকরিতে উঠতে পারলেন না। কত Junior তাঁকে টপকে গেল। শেষে রেগে মেগে একদিন চাকরীটাই ছেড়ে দিলেন। একটু বায়ুপ্রধান ধাত, না হলে এমনটাও করে। আজ তাই মধ্যমনারায়ন মাখতে হচ্ছে।'

হতাশ প্রেমিক অনেক চোখে-পড়ে, কিন্তু চাকরি হতাশায় মানুষ পাগল হয় তা জানিতাম না। নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একটু শঙ্কিতই হইয়া উঠিলাম। জগৎ যদি সত্যই এমন হয় তবে ত...

শ্রীরাইমোহন সামন্ত

জীবিত অবস্থায় অর্দ্ধমৃত

ডাঃ এস্ সি সেন

সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতেই মানুষ যখন প্রকৃতির ক্রোড়ে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন রোগ বলিয়া কোন শত্রু এ জগতে আছে তাহা তাহাদের জানা ছিলনা। প্রকৃতিমাতা সকলের লালন-পালনের ভার লইয়াছিলেন, তাহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের প্রাকৃতিক আবেষ্টন হইতে পুরাতনকে বহু দূরে রাখিয়া বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম আবর্ত্তনের মধ্যে আসিয়া পড়িল। অস্বাভাবিক জীবন ধারণের ফলে নানাপ্রকার রোগ বীজাণু শরীরে প্রবেশের সুযোগ পাইল। মানুষ বহু পূর্ব্বাবস্থা ভুলিয়া গিয়া বিভিন্ন সঙ্কটাকীর্ণ পথে চলিতে চলিতে অধুনা শীর্ণ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এখন দেখা যায় তাহাদের দেহে শক্তি নাই, শরীরে বল নাই, চক্ষুতে সে দীপ্তি নাই, প্রাণে সে অদম্য স্ফূর্ত্তি নাই, কাজ কর্ম্মে তেমন স্পৃহা নাই,—মাংসপেশী শিথিল, স্নায়ু দুর্ব্বল, রক্ত দূষিত। প্রত্যেক বেদনাযুক্ত পদক্ষেপে সে প্রাণভরা জীবনীশক্তির অভাব অনুভূত হয়। বাতে পঙ্গু, নাহয় কটিবেদনায় সঙ্কুচিত, আর না হয় মাথা বা দন্তের অসহ্য বেদনায় আড়ষ্ট। এভাবে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বহু নর নারী, বৎসরের পর বৎসর, দিনের পর দিন, কষ্ট ভোগ করিতেছেন; ইহাতে দেহের অপরিসীম কষ্ট তো আছেই তদ্ব্যতীত মানসিক ও আর্থিক ক্ষতিও ঘটে। আধুনিক যুগে এ সমস্ত কষ্টকর অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য "রচি" কোম্পানী বহু বৎসর গবেষণার পর নিরাপদ অথচ কার্য্যকরী বেদনা নাশক 'সারিডন" আবিষ্কার করিয়া মানবের বহু উপকার সাধন করিয়াছেন। "সারিডন" হৃদপিণ্ডের কোন অনিষ্ট করেনা, এজন্য সকলেই ইহা নিরাপদে সেবন করিতে পারেন। আমাদের দেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ প্রত্যহ ইহার ব্যবস্থা দিতেছেন। আমিও বহু রোগীর বেদনার জন্য ব্যবস্থা দিয়া উপকার পাইয়াছি।

নবদ্বীপে মাধুকরী

শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

বিচিত্রা পত্রিকায় বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় 'নবদ্বীপে মাধুকবী নামে' যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই—

উক্ত প্রবন্ধ 'নবদ্বীপে মাধুকরী' নামে অভিহিত হইলেও উহার আলোচ্য ক্রম যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াব সাধনা লইয়াই লিখিত হইয়াছে, ইহা বলা সম্ভবতঃ অসঙ্গত হইবে না। মাধুকবী যেন না বলিলেই নয়—এমনিতর যুক্তিতে, উপসংহারে স্থান পাইয়াছে মাত্র।

যাহা হউক, উক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—"নবদ্বীপে মাধুকরী প্রথা উদ্ভবের বিবরণ আমরা পাইয়াছি"—ইহা যেন দৃঢ়তার উক্তি। তাবপব ঐ মাধুকরী বিরূপে নবদ্বীপে প্রচারিত হইল, তাহা প্রদর্শন করিতে বলা হইয়াছে— "ভোগ শেষে কেবল এক মুষ্টি প্রসাদ ভক্তগণকে বিতবণ করা হইত। নবদ্বীপে যে সকল গৌরভক্ত বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারা সকলেই কণিকা প্রসাদের জন্য সেই তৃতীয় প্রহব অন্তে গৌরগৃহেব বহির্দ্দেশে সমবেত হইতেন।……সর্ব্বশেষে তাঁহাবা প্রসাদ কণিকা গ্রহণ করিয়া প্রেম টলমল দেহে গৌর নামের গর্জ্জন হুঙ্কার করিতে করিতে বাহিব হইতেন। এই রূপে নবদ্বীপে তথা বঙ্গদেশে "মাধুকবী" বিতরণ প্রথা আরম্ভ হয়।"—ইহাই যদি উক্ত মাধুকরী প্রথা উদ্ভবের কারণ হয়, তবে সহজেই উপলব্ধি হইতেছে যে, বিষ্ণুপ্রিয়া হইতেই নবদ্বীপে মাধুকরী প্রথার প্রচার।—কিন্তু ইহা যুক্তি-সঙ্গত নহে। বৈষ্ণবগণ এ সিদ্ধান্ত মানিতে রাজি নহেন

মাধুকবী কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার্য্য ; কিন্তু তাহাব অবশ্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন অর্থাৎ—"সংসার ত্যাগী ভজনশীল বৈষ্ণব জীবনধারণের জন্য অবশ্যই কিঞ্চিৎ আহাব করিবেন"—ইহা স্বীকাব কবিতে বাধ্য নহি।—ইহা অধিকোক্তি। কেননা, জীবন ধাবণেব যাহার আবশ্যকতা তাহাকে নিত্য কিছু আহাব কবিতেই হইবে,—তাহা ভজনার্থেই হউক আব অ-ভজনার্থেই হউক। উপবাসে ক'দিন জীবিত থাকা যায় ?

মাধুকরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য চবিতামৃত হইতে যে বাক্য উদ্ধৃত কবা হইয়াছে—

"এক এক বৃক্ষতলে এক একদিন বাস।
পরিধানে বহির্ব্বাস মাধুকবী গ্রাস।
সাড়ে সপ্ত প্রহব যায় শ্রবন কীর্ত্তনে।
অর্দ্ধ প্রহব নিদ্রা নহে কোন দিনে॥"

—ইহা শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত বাঙ্গালী ভক্তগণের মুখেই প্রকাশ করিতে দেখান হইয়াছে,—আচাবে দেখান হয় নাই।—কাজেই নবদ্বীপে মাধুকরী প্রথার সূচনাবম্ভ হইল কবে ?—কাহা হইতে ?—এ সকলেব সঠিক উত্তব উহাই, স্বীকার করা যায় কি করিয়া ?

যেহেতু এ সকলেব যথার্থ উত্তব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন, কেননা, এই ঘটনার অনুকূলে বৈষ্ণব মহাজনগনেব কোন ইতিহাস গ্রন্থ পাওয়া যায় না, কাজেই, কোন একটী ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া অনুমানেব সাহায্যে সম্পূর্ণ প্রমানবিহিন ভাবে—একটা সিদ্ধান্ত স্থাপন করাও ন্যায়-নীতি-সম্মত নহে।

বাস্তবিক, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া হইতে নবদ্বীপে বৈষ্ণব-মাধুকবী প্রচারিত হইয়াছিল—এই মত পোষণ করা ও প্রকাশ কবা দুই-ই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। ইহা ভ্রমাত্মক পবিকল্পনা। এ বিষয়ে উক্ত প্রবন্ধোদ্ধৃত শ্লোকাদিই স্বমতের বিবোধ-সাধন করে। যেমন—শ্রীমদ্ভাগবতোদ্ধৃত শ্লোক—

"স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং দেহো বর্ত্তেত যাবৎ।
গৃহান্ হিংসায়াতিষ্ঠেদ বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ॥"

অর্থাৎ—ঈশ্বর মননশীল সাধকগণ যাবৎ দেহ বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎ দেহরক্ষার্থে যতটুকু প্রয়োজন মাত্র ততটুকু ভোজন করিবেন। তাঁহারা হিংসাদি বৃত্তি পরিত্যক্ত হইয়া 'গৃহস্থগণের' নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত আহার সংগ্রহের জন্য মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিবেন।

এখানে গৃহস্থগণের কথা আছে—এক গৃহ হইতে নহে; এতদ্ব্যতীত উক্ত প্রবন্ধের মাধুকরী কাহাকে বলে তাহা উল্লেখ করিতে যে সকল কথা বলা হইয়াছে—সেস্থলেও গৃহস্থগণের ভাবই প্রকাশ আছে। কাজেই, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিতরিত প্রসাদান্নগ্রাহী ভক্তগণ যে আরও একটি গৃহদ্বারে, ঠিক ঐরূপই আশায় উপস্থিতি দিত তাহা দেখান আবশ্যক; নতুবা প্রসাদান্নগ্রহণকে মাধুকরী বলা যায় না। এতদ্ব্যতীত আরও একটি প্রমান আবশ্যক যে উক্ত ভক্তগণের—

"এক এক বৃক্ষতলে এক একদিন বাস।
পরিধানে বহির্ব্বাস মাধুকরী গ্রাস॥"

—এসকল প্রমান ব্যতিরেকে গৃহস্থভক্তগণের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার দ্বারে উপস্থিতি দেওয়াকে প্রসাদার্থেই বলা যায়—ফস্ করিয়া মাধুকরী বলা যায় না।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, নবদ্বীপে মাধুকরী সম্বন্ধে আপেক্ষিক দৃঢ় যুক্তি দিতে—এবং মাধুকরী প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে "বৈষ্ণব মাধুকরী" প্রবন্ধের অবতারনা করিতেছি।—

বৈষ্ণব মাধুকরী

মাধুকরীবাগী ভক্তের ভিক্ষাচার পদ্ধতি। শুধুমাত্র রাগীভক্তগণ যে তনুরক্ষার্থে এই ভিক্ষাচার গ্রহণ করিবেন তাহা নহে, ইহাতে তাঁহাদের রাগের রস-সাধন বর্ত্তমান। এই মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ প্রসাদান্নকে তাঁহারা শ্রীভগবদ্ যুগলমূর্ত্তির অধরামৃত মনে করিয়া আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। এই রাগী ভক্তগণকে একভক্ত বলে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় এই একভক্তের প্রশংসাবাক্য আছে। শ্রীহরিভক্ত বিলাস এই এক ভক্তের এইরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন।

"দিনার্দ্ধ সময়েঽতীতে ভুজ্যতে নিয়মেন যৎ।
এক ভক্তমিতি প্রোক্তং কর্ত্তব্যং তৎ প্রযত্নত ইতি॥
ততো রাত্রিং নাবত্তাঞ্চ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভগবন্তং স্মরণ্ ভক্ত্যা ভূমিশায়ী সুখং স্বপন্॥"

অর্থাৎ :—দিনার্দ্ধ সময় অতীত হইলে নিয়মপূর্ব্বক যাহা ভোজন করা যায়, তাহাকে একভক্ত বলে। যত্নপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে সকলের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। একভক্তসাধকগণ ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও ভূমিশায়ী হইয়া সুখে শয়নপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে ইষ্টরূপ শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিবেন।

বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত—

"এক এক বৃক্ষতলে এক একদিন বাস।
পরিধানে বহির্ব্বাস মধুকরী গ্রাস॥
সাড়ে সপ্ত প্রহর যায় শ্রবণ কীর্ত্তনে।
অর্দ্ধ প্রহর নিদ্রা নহে কোন দিনে॥"

—এই বাক্যের কোন বিরোধ নাই, বরং সম্পূর্ণতঃ ঐক্যই রহিয়াছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বৈষ্ণবগণের ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন কোন স্থান হইতে কি কি ভিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তৎসম্বন্ধে একটি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন।

'শাকং মূলং ফলং বাপি গব্যং ক্ষীরঞ্চ বা দধি।
সাধুভ্যো ভৈক্ষ্যমন্নথা শক্তবঃ পায়সং হি বা॥
বৈদিকাচার যুক্তানাং শুচীনাং শ্রীমতাং সতাং।
সংকুলস্থানজাতানাং ভিক্ষাশীলোঽগ্রজন্মনাং॥
ভুঞ্জানো বা হবিষ্যান্নং শাকং যাবকমেব বা।
পয়োমূলং ফলং বাপি যদ্যদত্রোপপদ্যতে॥
মৃদুকোষ্ণং সুপক্কং কুর্য্যাদ্বৈ লঘুভোজনং।
নেন্দ্রিয়াণাং যথা বৃদ্ধিস্তথা ভুঞ্জীত সাধকঃ॥"

অর্থাৎ :—শাক, মূল, ফল, গব্যক্ষীর, গব্যদধি, অন্ন, যবচূর্ণ ও পায়স—এই সকল দ্রব্য খাদ্য। ইহা সাধুদিগের নিকট হইতে ভিক্ষাদ্বারা সংগ্রহ করিবে।—এই সাধু কাহারা? তদুত্তরে বলিতেছেন—বৈদিকাচারযুক্ত, শৌচসম্পন্ন, শ্রীমন্ত, সংস্থানাবস্থিত, সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ ইহাদের মধ্যে যে যে স্থানে, অর্থাৎ—যাহার যাহার নিকট হবিষ্যান্ন, শাক, যাবক (অর্দ্ধপক্ক যব), ইত্যাদি যে যে বস্তু ভিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন সেই সকল বস্তু মাত্র ভক্ষণ করিবেন। সাধক ব্যক্তি মাত্রেই মৃদু, ঈষদুষ্ণ, সুপক্ক এমত বস্তুর লঘু ভোজন করিবেন—যাহাতে ইন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি না হয়।

পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষাচার আবার অপারগের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে; পারগের কেবল মাত্র অগ্নিভিক্ষারই নিয়ম আছে।

"বিহায় বহ্নিং নহি বস্তু কিঞ্চিদগ্রাহ্যং পরেভ্যঃ সাতি সম্ভবে চ।
অসম্ভবে তীর্থ বহির্বিশুদ্ধাৎ পর্ব্বাতিরিক্তে প্রতিগৃহ্য অপ্যাৎ॥
তত্রাসমর্থোঽহ্নদিনং বিশুদ্ধাৎ যাচেত্ত যাবাদ্দিন মাত্র ভক্ষ্যং।
গৃহ্নাতি রাগাদধিকং ন সিদ্ধিঃ প্রজায়তে কল্পশতৈরমুষ্য॥"

—"শ্রীহরিভক্তিবিলাস"

অর্থাৎ:—সম্ভবপর হইলে সাধক ব্যক্তি, অগ্নি ভিন্ন কোন বস্তু পরের নিকট গ্রহণ করিবেন না। অসম্ভবে তীর্থের বহিঃ প্রদেশে, পর্ব্ব ভিন্ন দিনে বিশুদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে তদ্দিন মাত্রের ভোজন যোগ্য বস্তু ভিক্ষা করিয়া লইবেন। কিন্তু অভিলাষ বশতঃ যদি অধিক বস্তু গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই সাধকের শত কল্পেও মন্ত্র-সিদ্ধি হইবে না।

এখানে এই প্রতিগ্রহ ভিক্ষার যদিও বিশেষ কিছু নিয়ম কথিত নাই, তথাপি বৈষ্ণবগণের মতে দুই হইতে আট বাড়ি পর্য্যন্ত ভিক্ষা বা মাধুকরী করিবার নিয়ম আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে মাধুকরীরই এইরূপ নিয়ম বলিয়া কোন উক্তি নাই যদিও, তথাপি এ সম্বন্ধে একটি বচন আছে।

"ভিক্ষামাহুর্গ্রাসমাত্রমগ্র্যং তস্মাচ্চতুর্গুণং।
পুষ্কলং হন্তকারঞ্চ তচ্চতুর্গুণ মিষ্যতে॥
ভোজনং হন্তকারং বা অগ্র্যং ভিক্ষামথাপিবা।
অদত্বা তু ন ভোক্তব্যং যথা বিভবমাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ:—পণ্ডিতগণ গ্রাস মাত্রকে ভিক্ষা এবং ভিক্ষার চতুর্গুণকে অগ্র্য, তথা অগ্র্যের চতুর্গুণকে পবিত্র হন্তকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হন্তকার ভোজন বা অগ্র্য ভোজন কিম্বা ভিক্ষা ভোজন আপনার বিভবানুসারে সাধ্যমত অতিথিকে অর্পণ না করিয়া ভোজন করিবেন না।

অতএব এতদ্বারা ইহা জানা যাইতেছে যে, মাধুকরী প্রকৃত ভিক্ষা নহে। ইহা অগ্র্য বা হন্তকার ভিক্ষার অন্তর্ভূক্ত। কারণ বৈষ্ণব উক্তিতে মাধুকরী দুই হইতে আট বাড়ি পর্য্যন্ত গ্রাহ্য এবং উক্ত প্রাসাদান্ন বিতরণ পূর্ব্বক আনন্দ সহকারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।—বৈষ্ণবের সহিত সাধ্যমত এইমত সামঞ্জস্য রাখিয়াছে।

মাধুকরী বৈষ্ণবের ভজনাঙ্গ। বৈষ্ণবগণ প্রায়শই ভক্তযোগীন্। ইহার আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বৈধী ও রাগী।

"বৈধী ভক্তির্ভবেৎ শাস্ত্রং ভক্তৌ চেৎস্যাৎ প্রবর্ত্তকম্।
রাগানুগা স্যাচ্চেদ্ভক্তৌ লোভ এব প্রবর্ত্তকঃ॥

—রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা

শাস্ত্র যে ভক্তিতে প্রবর্ত্তিত করে তাহা বৈধী ভক্তি। লোভ যে ভক্তিতে প্রবর্ত্তিত করে তাহা রাগানুগা ভক্তি। লোভ অর্থে শ্রীভগবানকে প্রাপ্তির প্রবল পিপাসা।—এখানে রাগানুগা শব্দের উল্লেখ থাকিলেও বস্তুতঃ উহা রাগভক্তিই; কেননা, রাগভক্তি রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভেদে দ্বিবিধ।—রাগী ভক্ত ও বৈধী ভক্ত প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন—এবং নিগূঢ় কোন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে ইঁহারা সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। নিগূঢ় তত্ত্ব বা সাধনের কথা ইঁহারা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মৌখিক ভাবেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। নিকট শিষ্য না হইলে ইঁহারা ইহা প্রচার করিতেও চাহেন না। এ বিষয়ে ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আদর্শ মানিয়া লইয়াছেন—

"বহিরঙ্গ লয়ে করেন নাম সংকীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ লয়ে করেন রস আস্বাদন॥"—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অতি গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ উচিত নহে,—এ মত শুধু বৈষ্ণবগণেরই নিজস্ব নহে—ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মেরই আদেশ। অন্ততঃ উপনিষদে আমরা ইহার অনেক নিষেধাজ্ঞা পাই।

যাহা হউক, বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ ভ্রমর জাতির ধর্ম্মানুসারী।—তাঁহারা যে ফুলে মধু পান, তথায় গমন করেন,—মধুহীন পুষ্পে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন না। এখানে ফুল অর্থাৎ শ্রীভগবানের শ্রীচরণানুরাগী,—ইহাতে জ্ঞানযোগী ভক্তিযোগী কর্ম্মযোগী প্রভৃতি ভেদ নাই,—তত্ত্ব-রস পাইলেই হইল; তত্ত্বার্থেই তাঁহাদের সম্বন্ধ।—এহেন স্বভাব বিশিষ্ট ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের মাধুকরী আচরণকেও স্থান বিশেষেই ব্যবহার করেন, সর্ব্বত্র নহে। যে গৃহে বিষ্ণু ভক্তি ও বিষ্ণু বিগ্রহ নাই, সেখানে বৈষ্ণবগণ মাধুকরী প্রসাদ ভিক্ষার্থে গমন করেন না। এ বিষয়ে বিষ্ণু-স্মৃতিই তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দেয়—

"অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈবচ।
অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্বমাংস সদৃশং ভবেৎ॥"

অর্থাৎঃ—অবৈষ্ণবের অন্ন পতিতের অন্ন, এবং বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন কুক্কুর মাংসতুল্য। অতএব মধুকরের ন্যায় বৃত্তি বিশিষ্ট এই যে বৈষ্ণবগণের মাধুকরী ভিক্ষাচার প্রথা তাহা মধুকরবৃত্তির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণার্থক না হইলেও, শুধু-মাত্র লক্ষণাত্মক হইলেও ইহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। মধুকর যেমন প্রতিপুষ্প হইতে বিন্দু বিন্দু মধু সংগ্রহ করিয়া দৈনন্দিন অস্থূটী রক্ষাপূর্ব্বক সঞ্চয়কার্য্যে ব্রতী হয়—বৈষ্ণব-গণের মাধুকরী এই অংশে সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁহারা সঞ্চয়তো করিবেনই না পরন্তু পরিমিতাহারেও সংযম করিতে যত্নবান থাকিবেন।

—যদিও সত্য, রাগমার্গের সাধকগণের নিকট কোন বিধির দাবী-দাওয়া নাই কেবলমাত্র স্ব স্ব প্রাণের আকুলতাই বিধি; তথাপি, মাধুকরী, আনসঙ্গ, আনবার্ত্তালাপ প্রভৃতি বহিরাঙ্গিন কয়েকটি সাধন-ব্যাপারে তাঁহাদের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতেই হইবে, নতুবা, নিজনিজ ভক্তি প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখাই সাধ্যাতীত হইয়া যাইবে।

এই তো গেল মাধুকরীর কথা। এক্ষণে নবদ্বীপে এই মাধুকরী কিভাবে প্রচারিত হইল দেখা যাউক।—ভক্তি-রত্নাকরে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীনিবাস প্রভু শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীপাদ রঘুনাথের মুখে নবদ্বীপের তত্ত্বমাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া তদ্দর্শনে আগমন করেন। তখন নবদ্বীপে শ্রীগৌর গৃহে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সাধনাবস্থায় দিনপাত করিতেছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য ঈশান নাগর প্রিয়াজীর সেবায় রত ছিলেন। শ্রীনিবাস প্রভু এই ঈশান নাগরকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপের তদানীন্তন নয়টি দ্বীপে পরিক্রমায় বাহির হয়েন।—এই পরিক্রমা কালে তাঁহাদের একাধিক দিন লাগিয়াছিল সত্ত্বেও তাঁহাদের অন্নাদি বহন করিয়া লইয়া যাইতে দেখান হয় নাই। কাজেই অনুমান করা যায়, সেই সময় দৈনন্দিন দিনপাতের জন্যও তাঁহাদের ভিক্ষা বা মাধুকরী করিতে হইয়াছিল। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার পূর্ব্বে বৃন্দাবনে গমন করিয়া এইরূপই বৃত্ত্যাশ্রিত হইয়াই স্থান নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ রঘুনাথ গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব-চূড়ামণিগণও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশে ক্ষেত্র তীর্থে এই বৃত্ত্যাশ্রিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, নবদ্বীপ পরিক্রমা কালে আমরা শ্রীনিবাস প্রভুকে স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিতে দেখিতে পাই এবং সেই সেই বিশ্রাম স্থলে কোন না কোন ভক্তের আশ্রম ও শ্রীবিগ্রহ দেখিতে পাই। বর্ত্তমান বৈষ্ণবগণের মত—সম্ভবতঃ ইঁহাদের নিকট হইতেই মাধুকরী নবদ্বীপে প্রথম প্রচার হয়। যেহেতু মাধুকরী যে সকল গোস্বামীগণের ভিক্ষাচার এবং যাঁহারা মাধুকরীর সুখ সুবিধা আনন্দ বিশেষ ভাবেই পরিজ্ঞাত ও অভ্যস্ত ছিলেন—তাঁহরাও সময় সময় এখানে আগমন করিয়াছিলেন—তাঁহাদের নিকট হইতেই ইহার প্রচার অধিকতর যুক্তি সঙ্গত।

মহাপ্রভুর একটী বাক্য আছে 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখাই।'—কাজেই, বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা এইখানেই যে, যাঁহারা নিজে মাধুকরী ভিক্ষা আচরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা প্রচার করিতে পারেন—অন্যের পক্ষে ইহা যুক্তি যুক্ত নহে। গোস্বামীগণ এই আচারে অভ্যস্ত, কাজেই তাঁহাদের দ্বারা ইহার প্রচারই অধিকতর যুক্তি-যুক্ত।

শ্রীকালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রাম একই পর্য্যায়ের কিনা

আমাদের দেশের (এবং পৃথিবীরও) সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী রাজনীতিক মতানুবর্ত্তীরা বিশ্বাস করেন যে, আর্থিক স্তর-ভেদই সমাজের প্রকৃত ভেদের এক মাত্র ভিত্তি ও আশ্রয়; আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী-স্বার্থই প্রকৃত স্বার্থ এবং অন্য সকল প্রকার বিভাগ ও স্বার্থের বোধ কৃত্রিম ও ভিত্তিহীন। শ্রেণীগত আর্থিক স্বার্থ সম্বন্ধে চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আছে বলিয়াই নানা প্রকার ভুয়া জিনিসকে প্রকৃত স্বার্থ ও সমস্যা মনে করিয়া লোকে মারামারি করিতেছে। অবিচারমূলক আর্থিক ব্যবস্থার নগ্নতাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য নানাবিধ কাল্পত সমস্যার সহিত জড়াইয়া তাহাকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিবার দীর্ঘ-দিন-ব্যাপী চেষ্টার ফলে লোকে এই প্রকার ভ্রান্ত পথে চালিত হইতেছে। সামাজিক ও রাজনীতিক নানা অবস্থার বিপর্য্যয় এবং ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরাও ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। অবশ্য, বর্ণিত সকল অবস্থারই গতি ও পরিণতি সমাজের আর্থিক গঠনের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

এই মতাবলম্বী লোকেরা আরও বিশ্বাস করেন যে, সমাজের আর্থিক ভেদকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিলে এবং শ্রেণীগত আর্থিক স্বার্থ সম্বন্ধে লোককে সচেতন করিয়া তুলিতে পারিলে, অন্য সর্ব্ব প্রকার ভেদবুদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধি আপনা হইতেই তিরোহিত হইবে এবং প্রকৃত ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইবে। যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমানে বিশেষ জটিল সমস্যার আকারে দেখা দিয়া আমাদের রাষ্ট্রীক প্রগতি এবং দেশের শান্তির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সমাধানও এই পথেই হইবে বলিয়া ইঁহারা বলিতেছেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যখন এ কথা বুঝিতে পারিবে যে তাহাদের একজন মুসলমান ও অপর জন হিন্দু বলিয়া তাহাদের মধ্যে প্রকৃত কোন স্বার্থের বিরোধ নাই এবং একজন জমিদার অন্যজন প্রজা, একজন মহাজন অন্যজন খাতক, একজন মালিক ও অন্যজন বেতনভুক হইলে এক ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেও স্বার্থের মিল হইতে পারে না, তখন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হইবে এবং আর্থিক স্বার্থকে ভিত্তি করিয়া লোকে দল বাঁধিবার চেষ্টা করিবে। কাজেই, সত্য সত্য যাঁহারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এই পথেই চেষ্টা করিতে হইবে। চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া সন্ধি করিয়া ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে সকলকে শান্তিতে বাস করিবার উপদেশ দিয়া এবং এই প্রকারের আরও জোড়াতালি দিয়া হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য যে সকল চেষ্টা হইতেছে তাহার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু, ইহাও বিনা বিরোধে শান্তিতে হইবার নহে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে আর্থিক স্বার্থের যে বিরোধ রহিয়াছে সে সম্বন্ধে লোকে সচেতন হইয়া উঠিলে দেশে আরও গভীরতর অশান্তি এবং প্রবলতর অন্তর্বিরোধ দেখা দিবে। দেশে যেমন জমিদার, গাঁতিদার, মহাজন আছেন তেমনই প্রজা ও রাজা খাতক আছেন; যেমন বিপুল ধনের মালিকেরা আছেন তেমনই অগণিত নিঃস্ব আছেন; অসংখ্য লোক যেমন কঠোর পরিশ্রম করিয়াও উদারান্ন ও পরিধেয় জুটাইতে পারিতেছে না তেমনই বহু লোকে বিন্দুমাত্র

পরিশ্রম না করিয়াও প্রাচুর্য্য, বিলাসিতা ও অপব্যয়ের মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছে। এই ব্যবস্থার ফলে যাহারা শোষিত ও নির্য্যাতিত হইতেছে তাহারা নিজেদের দুরবস্থার মূল কারণটি জানে না বলিয়াই, ভাগ্যকে দোষী করিয়া এবং এই অবস্থাই স্বাভাবিক মনে করিয়া, বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে মানিয়া লইতেছে। যে মুহূর্ত্তে তাহারা এই ব্যবস্থার অন্যায় ও অসঙ্গতির কথা বুঝিতে পারিবে, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার অবসান সম্ভব এই আশা পাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সচেষ্ট হইবে। ইঁহাদের অধিকার আদায়ের অর্থই হইবে, যাঁহারা সুবিধা-সমূহ ভোগ করিতেছেন তাঁহাদের সুবিধাসমূহের লোপ। তাঁহারা কখনও ইহা স্বচ্ছন্দ চিত্তে ছাড়িয়া দিতে চাহিবেন না। ফলে বিরোধ অনিবার্য্য হইবে।

এই সম্ভাবিত বিরোধের কথা উল্লেখ করিয়া একদল লোক বলিতেছেন, "সমস্যার সমাধান আর হইল কই? বিরোধ ত জাগিয়াই থাকিল; শুধু রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিল মাত্র। আমরা দেশের মধ্যে অব্যাহত শান্তি চাই; আর্থিক শ্রেণী চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই কাজেই অন্য পথ দেখিতে হইবে।" শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যাহাতে দেশের লোকের মনে পরস্পরের প্রতি মৈত্রী ও প্রীতি জাগ্রত হয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূরীভূত হয় প্রতিকারের পন্থা হিসাবে সেই প্রকারের চেষ্টার কথাই ইঁহারা নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই তুলনাটা আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলিয়া মনে হইলেও, ইহা যুক্তি ও বিশ্লেষণের দ্বারা সমর্থিত হইবার মত নহে। যাঁহারা সাম্প্রদায়িক ও আর্থিক বিরোধটাকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন তাঁহারা সমগ্র সমস্যাটিকে জড়াইয়া ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

দেশের অসংখ্য অগণিত লোক যে বর্ণনাতীত দুঃসহ ক্লেশে দিনাতিপাত করিতেছে, সম্ভবতঃ সে বিষয়ে কাহার অণুমাত্র সন্দেহও নাই। কিন্তু, এই দুঃখের সীমা যে কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে, সমাজের নিম্নস্তরে যে কি নিদারুণ দারিদ্র্য ও অনাহার সর্ব্বব্যাপীভাবে দেখা দিয়াছে, দারিদ্র্যের নিত্য অনুচর অস্বাস্থ্য ও ব্যাধি যে মানুষকে কি পরিমাণে অকর্ম্মণ্য ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে তাহা আমরা যাহারা কতকটা সুখ স্বচ্ছন্দে আছি তাহাদের পক্ষে সত্যই কল্পনাতীত। অথচ আমাদের অনেক লোকে যে খাইয়া পরিয়া মোটামুটি ভাল-ভাবেই দিনাতিপাত করিতেছে, তাহাও সত্য। আবার একথাও সত্য যে অপেক্ষাকৃত সংখ্যাল্প হইলেও, যাহারা আলস্য, অপব্যয় ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া আছে এমন লোকেরও আমাদের দেশে অভাব হয় নাই। আরও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে যাঁহারা দুস্থ এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র তাঁহারাই ধন উৎপাদন করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা সম্পন্ন ও ধনী তাঁহারা প্রধানতঃ পরশ্রমোপজীবি। যে ব্যবস্থার ফলে ইহা হইতেছে তাহা কখনও সঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না; অথচ, অভ্যাস বসে ইহাকেই আমরা সত্য ও মূলত অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। যদি কেহ গায়ের জোরে অপরের ধন সম্পত্তি কাড়িয়া লয় তবে তাহাকে আমরা কখনই প্রশংসা করি না এবং তাহার কার্য্যে বাধা দিতে যাইয়া যদি বিরোধের সৃষ্টি হয় তবে তাহাকেও বরণীয় মনে করি। যদি সমাজে এমন ব্যবস্থা থাকে যাহাতে একজনের ধন সম্পত্তি আর এক-জনের অন্যায় ভাবে হস্তগত করিবার সুযোগ থাকে তবে সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে আমরা খুব উচ্চস্তরের বলিয়া মনে করি না এবং এই প্রকার ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার চেষ্টা হইতে বিরোধ সৃষ্টির ভয়ে পশ্চাৎপদ হই না। এই সকল ক্ষেত্রে যে আমরা বিরোধে প্রবৃত্ত হই তাহা কলহ প্রীতি বশত নহে, বা বিরোধকে আমরা ভাল মনে করি বলিয়া নহে; কিন্তু বিরোধ অপরিহার্য্য বলিয়া, বিরোধের মধ্য দিয়া অকল্যাণকর ও অশান্তির অবস্থা দূর হইতে পারে বলিয়া, একদিন দুর্ব্বল ও সবল সকলেরই শান্তিতে বাস করিবার অধিকার প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়া।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজে গায়ের জোরে অপরের ধনসম্পত্তি অধিকার করিবার সুযোগ নাই বা এইরূপ কার্য্য সমাজে প্রশংসিত হয় না, একথা সত্য। তবু আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, নানাবিধ জটিল ব্যবস্থার ফলে, একজনের শ্রমে উৎপাদিত অর্থ অবাধগতিতে অপরের হস্তে চলিয়া যাইতেছে, ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতার নামে বহুলোককে ঠেলিয়া ফেলিয়া একজনে বড় হইতে পারিতেছে। ফলে, দেশের যাহা কিছু ধনসম্পদ সব অল্প

লোকের হাতে সঞ্চিত হইয়া আছে এবং জনসাধারণ দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, এবং হীনতায় মগ্ন হইয়া আছে। অভ্যাসবশে আমরা এই অবস্থাকে শান্তির অবস্থা মনে করিতেছি, কিন্তু বঞ্চনা ও শোষণের উপর যে ইহার ভিত্তি, কোটি কোটি মানুষের হৃদয়রক্তের সিঞ্চনে যে ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইতেছে একথা যতই নির্ম্মম কঠোর ও অবাঞ্ছনীয় হউক, ইহার সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা এই অবস্থাকে শান্তির অবস্থা মনে করিতেছি, কিন্তু যে হতভাগ্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও দিনান্তে স্ত্রীপুত্রের মুখে একমুষ্টি অন্ন দিতে পারে না, পরিধেয় সংগ্রহ করিতে পারে না, রোগের সময় ঔষধ দিতে পারে না সে কি এই অবস্থাকে শান্তির অবস্থা, বাঞ্ছিত অবস্থা মনে করিবে। ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদের আস্তাকুড় হইতে ভাত খুঁটিয়া খাইতে হয়, গৃহের অভাবে বৃক্ষতল বা পথিপার্শ্ব আশ্রয় করিতে হয়, এই অবস্থাকে তাহারা কখনই শান্তির অবস্থা মনে করিবে না। অথচ, ইহাই দেশের জনসাধারণের অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ। আমরা কেহ মনে করিতেছি শিক্ষার বিস্তার ঘটিলে দুরবস্থার অবসান অথবা বিশেষ কোন কোন পন্থা অবলম্বন করিলে বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে। অবশ্য ইহার দ্বারা আংশিক ফললাভ যে হইবে না তাহা নহে, এবং হয়ত বা সম্পূর্ণ ফললাভের পথও পরোক্ষে প্রশস্ত হইবে। কিন্তু একথা আমরা বেশী লোকে ভাবিয়া দেখিতেছি না যে, উদরান্নের জন্য যাহাদের অষ্টমবর্ষীয় বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলকেই সূর্য্যোদয় হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত কর্ম্মে অথবা কর্ম্মের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহাদের জীবনে লেখাপড়ার সুযোগ কোথায়। একথা আমরা ভাবিয়া দেখিতেছি না যে, যাহাদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য আছে, দুর্ব্বল জাতিদের শোষণ করিবার অবাধ সুযোগ আছে, যাহাদের রাষ্ট্রের সমগ্র শক্তি দেশের লোকের সমৃদ্ধি সাধনে নিযুক্ত হইয়া থাকে, ধনতান্ত্রিক এমন কোন দেশই আজও নিজ নিজ দেশের লোকদের কাজ দিবার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই।

কিন্তু যে শান্তির অবস্থার কথা হইতেছিল। অগণিত লোকের নিরতিশয় দুঃখের পরিবর্ত্তেও যদি অল্পসংখ্যক লোক সুখ সমৃদ্ধিতে থাকিতে পারে তবে যাহারা সুখে থাকে তাহারা সেই অবস্থাকে শান্তির অবস্থা মনে করিয়া থাকে এবং অন্যদের অধিকারলাভের চেষ্টাকে অশান্তি আখ্যা দিয়া থাকে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হউক, জানিয়া হউক বা না জানিয়া হউক, আমরাও সেই অবস্থার দাস হইয়া সেই অংশই অভিনয় করিতেছি। আমাদের কিছু সংখ্যক লোকের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থাটাই শান্তির অবস্থা বটে এবং সেইজন্য এই অবস্থার পরিবর্ত্তন চেষ্টাকে আমরা অকারণ অশান্তি মনে করি। অন্য সকল প্রকার হাঙ্গামার সহিত তাহাকে সমস্থানীয় মনে করিতে পারি। কিন্তু, যাহারা নীচে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতেছে তাহারা (ইহারাই দেশের অধিকাংশ লোক) এই বাণীহীন ভাষাহীন প্রকাশহীন মৃত্যুগর্ভ অশান্তির অপেক্ষা যাহার মধ্যে তাহাদের ব্যথা ভাষা পাইবে, নিঃসহায় অবস্থা শক্তির মধ্যে রূপ পাইবে, দুঃখের অবসানের আশা থাকিবে সেই অবস্থাকে অধিকতর বরণীয় মনে করিবে। প্রথম দলের লোকেরা বলিবেন, ইহা নূতন কোন অশান্তি নহে, আমাদের অনেকের দৃষ্টির অন্তরালে যে অশান্তির অগ্নি কোটি কোটি লোককে দগ্ধ করিতেছে, ইহা তাহারই একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ইহার ফলে বর্ত্তমান অশান্তির অবসান ঘটিয়া সকলের পক্ষেই সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তির অবস্থা আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে। সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি প্রগতিবিরোধী অনুচিত মনোভাবও ইহাতে দূর হইবে।

অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে আমাদের কোন দিক দিয়া কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহা বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের, বিশেষ করিয়া হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা কৃত্রিম ভেদ রেখা টানিয়া প্রকৃত ভেদ রেখাটিকে অস্পষ্ট করিয়া দিতেছে এবং অর্থনৈতিক বা অন্য কোন রাজনৈতিক ভিত্তিতে দলগঠনের পক্ষে এই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ধারণাই একটা বিশেষ বড় বাধা জন্মাইতেছে। দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবল আছে বলিয়াই, হিন্দু ও মুসলমান কৃষক পরস্পরকে আত্মীয় না ভাবিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অর্থশালী স্বার্থ বিশিষ্ট লোকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সকল লোকের স্বার্থ যে তাহাদের স্বার্থের বিরোধী, ইহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই যে তাহাদের ব্যবহার

করেন, তাহাদের প্রকৃত স্বার্থের কথা যে ইঁহারা কখনই বলিতে পারেন না, একথা হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ বুঝিতে পারিতেছে না। এই দিক দিয়া হিন্দু মুসলমানের বিরোধ শুধু যে বর্ত্তমানেই শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতেছে তাহা নহে ইহা আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথও রোধ করিয়া আছে।

আমাদের রাষ্ট্রিক চিন্তার নবীনতম শাখার এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা সম্পর্কে এই সকল কথা সকলেরই ভাবিয়া দেখা দরকার।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মিলনী

ছাত্রেরা নূতন ভাব, চিন্তা ও কর্ম্মধারার বাহক ও প্রবর্ত্তক। যে বর্ত্তমান কালের দ্বারা মানব সমাজ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাঁহারা সেকালের মানুষ নহেন। যে কাল আজও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই, তাঁহারা সেইকালের অগ্রদূত। নিজেদের চিন্তা ও কর্ম্মের দ্বারা সেই কালকে প্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হইবে। অন্য সকল দেশের ছাত্রদের মধ্যে এই প্রকারের কর্ম্মোদ্যম ও প্রচেষ্টা রহিয়াছে। আমাদের প্রতিবেশী চীনের অবস্থা অনেকাংশে আমাদের ন্যায় অথবা আমাদের অপেক্ষাও শোচনীয়। কিন্তু, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সেখানকার ছাত্রদল দেশের জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য যে ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য নূতন চিন্তা-ধারার বিস্তার সাধনের জন্য, জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করিবার জন্য, দেশকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য যে উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিতেছেন তাহা আমাদের ছাত্রদের অনুকরণীয়।

আমাদের ছাত্রেরাও দেশের রাষ্ট্রিক আন্দোলন সমূহের প্রধান সহায়ক হইয়াছেন, কিন্তু, ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার একটা বিষয় হইতেছে এই যে, এই আন্দোলনে ছাত্রেরা প্রধান অংশ যদিও গ্রহণ করিয়াছেন তবুও ইহার মধ্যে তাঁহাদের কোন নিজস্ব বিশিষ্ট চেষ্টা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নাই। জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের যে প্রবল ঢেউ, সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিয়াছে, অন্যান্য লোকের ন্যায় তাঁহারাও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন মাত্র। যদি তাঁহাদের নিজেদের সংঘবদ্ধতা থাকিত, সম্মুখে আদর্শ থাকিত তবে তাহা হইতে প্রেরণা ও চেষ্টাও দেখা দিত। রাষ্ট্রিক আন্দোলন মন্দীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া না পড়িয়া নূতন আন্দোলন ও প্রচেষ্টার নেতৃত্ব করিতে পারিতেন। কিন্তু সংঘবদ্ধতার অভাবে, নিজেদের শক্তি ও কর্ত্তব্য সম্পর্কে সচেতন মনোভাবের অভাবে এপর্য্যন্ত তাঁহারা ধারাবাহিক ভাবে এরূপ কার্য্য করিতে পারেন নাই।

আমাদের দেশেও নূতন ভাবধারার বিস্তার সাধনে ছাত্র-সমাজের মধ্যবর্ত্তিতা প্রধান সহায় হইয়াছে বটে। কিন্তু, তাঁহাদের মধ্যে সচেতন কোন চেষ্টার অভাবে ইহা অনেকটা তাঁহাদের মধ্যে এবং তাঁহারা যে শ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন সেই শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে। দেশের বিপুল জনসাধারণের উপর তাহার বিশেষ কোন প্রভাব দেখা যায় নাই।

কিছুদিন হইতে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ছাত্রদের মধ্যে একটা নূতন জাগরণ এবং সংঘবদ্ধতার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। নিখিলভারত ছাত্র সম্মিলনীর লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে একটা নিখিল ভারত ছাত্রসংঘ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সংঘের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রদেশে ছাত্রদের প্রাদেশিক সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বে কলিকাতায় বাংলার ছাত্রদের প্রাদেশিক সম্মিলনী হইয়া গেল। এই সম্মিলনীতে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে যদি আমাদের ছাত্রদের মনের গতির দিক নির্ণয় করিতে হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা শুধু ভাব ও আদর্শবাদের মধ্যেই ডুবিয়া থাকিতে চাহিতেছেন না, তাঁহারা দেশের সমস্যাসমূহকে নূতন চিন্তা ও তাঁহাদের তরুণ মনের আলোকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। চিত্তউদ্‌ভ্রান্তকারী নানা জটিল সমস্যার মধ্যেও দৌলৎপুর হিন্দু একাডেমীর অনুন্নত ছাত্রদের দুঃখের কথা যে তাঁহারা স্মরণ করিয়াছেন তাহা বাস্তবসমস্যা-সমূহ সম্পর্কে তাঁহাদের সতর্ক সচেতনতার পরিচয়।

তবে, এ সম্পর্কে আমাদের একটা কথা মনে হইয়াছে। অন্যান্য সকল প্রাদেশিক কার্য্যাবলীর ন্যায় বাংলার প্রাদেশিক ছাত্রসংঘের কার্য্যাবলীও বাংলায় পরিচালিত হওয়া ভাল।

ইংরাজীতে ভালভাবে জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারেন নাই, এমন ছাত্রদের মধ্যেও প্রচারের ও তাঁহাদের সংঘবদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

শিক্ষা ও বেকার সমস্যা

শিক্ষার সহিত আমাদের বেকার সমস্যা বাড়িয়া যাইতেছে এই প্রকারের একটা ধারণা আমাদের অনেক লোকের আছে। যত লোকে শিক্ষিত হইতেছেন তত লোকে কাজ পাইতেছেন না, এ কথাটা অবশ্য সত্য, এবং তাহা হইতে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে, শিক্ষার সহিত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। শিক্ষার সহিত দেশের মোট বেকারসংখ্যা বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক নাই। কারণ শিক্ষার সহিত মোট বেকার সমস্যা বাড়িতেছে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে শিক্ষা-সাপেক্ষ নহে এমন কাজের অভাব দেশে নাই, এবং শিক্ষিত হইলে লোকের পক্ষে সে সকল কাজ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। অর্থাৎ যাঁহারা শিক্ষা পান নাই এমন লোকদের কাজের অভাব নাই, এবং যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারা যদি শিক্ষার দিকে না ঝুঁকিতেন তবে তাঁহারাও কাজ পাইয়া যাইতেন, কেবল শিক্ষা পাইবার ফলে ইঁহারা যে সকল কাজের অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন, এবং শিক্ষাসাপেক্ষ কাজের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়ায় ইঁহাদের অনেকে বেকার হইয়া পড়িয়াছেন এবং ফলে দেশে শিক্ষার বিস্তার না ঘটিলে যে সমস্যার আদৌ উদ্ভব হইত না শিক্ষার জন্য সেই সমস্যা দেখা দিয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক এরূপ নহে।

বেকার সমস্যা সমাজের সর্ব্বস্তরেই সমান প্রবল হইয়াছে। কৃষি হউক ছোটখাট ব্যবসা হউক শিল্প হউক (বৈদেশিক প্রতিযোগিতার জন্য) সর্ব্বত্রই কাজের চেয়ে লোক বেশী বলিয়া সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা তীব্র হইয়াছে, যাঁহারা কাজ পাইতেছেন তাঁহাদের উপার্জ্জন কমিয়া গিয়াছে, উপার্জ্জনশীল প্রত্যেক লোকেরই বেকার প্রতিপাল্যের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে এবং ফলে জীবনযাত্রার সাধারণ মান কমিয়া গিয়াছে এবং দারিদ্র্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমাদের দেশে চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প বাড়িলেও জনসংখ্যার বৃদ্ধি তাহার তুলনায় অনেক বেশী হইয়াছে। চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ যেটুকু বাড়িয়া গিয়াছে, বহুস্থানের বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের পশ্চিম ও মধ্যভাগের জমির উৎপাদিকা শক্তি অসম্ভবরূপে কমিয়া যাওয়ায় ভূমিবৃদ্ধি-জনিত লাভ সম্ভবতঃ মরিয়া গিয়াছে। কাজেই সমাজের বৃত্তিমূলক শুরভাগ যদি সমানও থাকিত তবুও কৃষকদের মধ্যে বেকার সমস্যা দেখা দিত।

কিন্তু কৃষকেরা ব্যতীতও পূর্ব্বে বহুলোক নানাবিধ কুটীর-শিল্পের সাহায্যে জীবিকার্জ্জন করিত। বৈদেশিক প্রতিযোগি-তার ফলে এই সকল কুটীর-শিল্পের সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে। দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা যদিও আরম্ভ হইয়াছে, তবুও যন্ত্রশিল্পের প্রবর্ত্তন হওয়ায় উৎপাদিত জিনিষের তুলনায় উৎপাদনে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যবসা হইতে বিচ্যুত লোকেরা পূর্ব্বেই বর্দ্ধিত কৃষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু পর্য্যাপ্ত ভূমি না থাকায় সকল কৃষকের ভাগের জমি কমিয়া গিয়াছে, এবং কৃষকশ্রেণীর মধ্যে বহু ভূমিহীন শ্রমিকের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার ফলে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে বেকার সমস্যা এবং অন্নকষ্ট নিতান্ত নিষ্করুণ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পর্য্যাপ্ত কাজ খুব কম লোকেই পায় এবং অনেক লোককেই বৎসরের অধিকাংশ সময় বসিয়া থাকিতে হয়। শুধু যে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় কৃষকদের দুরবস্থা হইয়াছে তাহা নহে। শ্রমের ক্ষমতা অনুযায়ী প্রায় কোন লোকই কাজ না পাওয়ায়, এবং অনেক লোক বৎসরের অধিকাংশ সময় কাজ না পাওয়ায় বহু লোকের নিদারুণ দুর্দ্দশা হইয়াছে। সকলের দুরবস্থাই অল্পবিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে। বৈদেশিক প্রতি-যোগিতার জন্য এবং দেশের সাধারণ লোকের ক্রয়শক্তি অসম্ভবরূপে কমিয়া যাওয়ায় শ্রমশিল্পীরাও কাজ পাইতেছে না। কাজেই যাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়া বেকার হইয়া বসিয়া আছেন তাঁহারা যদি বিদ্যাশিক্ষা না করিতেন তাহা হইলেও কাজ পাইতেন না।

কথা হইতে পারে, যাঁহারা শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদের মনে একটা মিথ্যা মর্য্যাদাবোধের সৃষ্টি হয় বলিয়া তাঁহারা ছোট-খাট কাজ করিতে পারেন না এবং সে জন্য অশিক্ষিত লোকদের ন্যায় যখন তখন সামান্য কাজ করিয়া দরকারের

সময় যৎসামান্য উপার্জ্জন করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের আংশিক ব্যবস্থা করিতে পারেন না। কিন্তু অত্যন্ত যৎসামান্য বেতনে শিক্ষিত লোকেরা যে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন তাহার প্রমাণ দুর্লভ নহে এবং দৈহিক শ্রমসাপেক্ষ বহুকাজ যে তাঁহারা করিতেছেন, এবং শিক্ষিত লোকের পক্ষে সে সব কাজ করা যে অসাধারণ কিছু বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না, তাহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। অবশ্য শিক্ষিত লোকেরা করিতে চাহেন না বা করিলে সাধারণের চক্ষে একটু হেয় বলিয়া (যদিও অন্যায় ভাবে) বিবেচিত হন, এরূপ কাজও অনেক আছে। কিন্তু, এ সব কাজ করিলেও যে, এমন বেশী কিছু সুবিধা হইত, এমন নহে। কারণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এ সব কাজ করিতে না পারার জন্য অবস্থার প্রকৃতপক্ষে কোন তারতম্য হয় না। তবুও, শিক্ষা কাহাকেও কোন কাজ করিতে নিষেধ করে না, বা কোন কাজের পক্ষে অযোগ্য করিয়া দেয় না। শিক্ষিত লোকেরা দৈহিক শ্রম সাপেক্ষ অনেক কাজ করিতে যে অপমান বোধ করেন, সে অন্যায় মনোভাবের দায়িত্ব শিক্ষার নহে, সমাজের। কারণ বিশেষ বিশেষ সমাজের লোকেরা বিশেষ বিশেষ কাজকে অপমানজনক মনে করিয়া থাকেন এবং এই কথা সেই বিশেষ বিশেষ সমাজের অশিক্ষিত লোকদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

এ সম্পর্কে আরও একটা কথা সম্ভবতঃ বলা হইবে। অনেকে হয়ত বলিবেন এবং কথাটা সত্যও বটে যে, শিক্ষার সহিত জীবনের আদর্শ ও মান পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং অশিক্ষিত লোকেরা যেপ্রকার দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করিতে পারেন, শিক্ষিত লোকেরা তাহা পারেন না। ফলে, এক প্রকার আর্থিক অবস্থার মধ্যেও তাঁহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা বাড়িয়া যায়। কিন্তু, ইহার সহিত বেকার সমস্যার সম্পর্ক নাই; ইহা একটা মানসিক অভ্যাসের কথা মাত্র। প্রয়োজন হইয়া পড়িলে লোকের অভ্যাসের পরিবর্ত্তন হইবে। পূর্ব্বে শিক্ষাকে আমরা সার্ব্বজনীন প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতাম না। যাঁহারা শিক্ষা পাইতেন তাঁহারা হয় সমাজের অর্থশালী ছিলেন, না হয় কোন না কোন প্রকারে অর্থশালী লোকের দলভুক্ত হইবার সুযোগ তাঁহাদের ছিল। কাজেই, অর্থের সহিত শিক্ষার সম্মিলনে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ জীবনাদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শিক্ষিত হইলে সেই মান অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে হইবে, এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষার বিস্তৃতির সহিত এই ধারণা এবং আদর্শ চলিয়া যাইতেছে, আরও যাইবে। কাজেই, শিক্ষার সহিত বেকার সমস্যার কোন সম্পর্ক আছে, একথা বলা ঠিক নহে।

তাহা হইলেও, আমাদের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিবার কারণ আছে। দেশের জনসাধারণের সহিত আমাদের সংযোগ বিশেষ কিছু নাই বলিয়া, তাঁহাদের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে আমরা সজাগ নহি। অন্যদিকে শিক্ষিত লোকের সুখ দুঃখ আমাদের নিজেদের অর্থাৎ যাহারা কথা বলিবে তাহাদেরই সুখ দুঃখ। যাঁহারা শিক্ষিত হইতেছেন তাঁহারা আমাদের দলভুক্ত হইতেছেন। আমাদের দলভুক্ত লোকেরা দুঃখ পাইবেন, ইহা আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক, আমাদের দলভুক্ত না হইয়া যদি তাহারাই সেই প্রকার বা তদপেক্ষা অধিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে থাকেন তবে তাহাতে আমাদের বিচলিত হইবার কারণ ঘটিবে না। কথাটা অনেকটা এই প্রকারই দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের এইরূপ ধারণা জন্মিবার দ্বিতীয় কারণ হইতেছে এই যে পূর্ব্বে শিক্ষাকে লোকে অর্থার্জ্জনের উপায় বলিয়া মনে করিত এবং শিক্ষিত লোকদের কখনও বসিয়া থাকিতে হইত না। শিক্ষাকে অর্থার্জ্জনের উপায়-স্বরূপ লোকে এখনও সমানই মনে করিতেছে, অথচ, কার্য্যক্ষেত্রে এই আশা আর পূর্ণ হইতেছে না। কাজেই আশাভঙ্গের ক্ষোভ লোককে শিক্ষিত লোকদের এই অপ্রত্যাশিত অবস্থা সম্বন্ধে একটু বেশী সচেতন করিয়া তুলিয়াছে।

তৃতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ হইতেছে যে শিক্ষিত লোকেরা সহজে সংঘবদ্ধ হইতে পারেন, নিজেদের কথা জানাইবার উপায় জানেন ও জানাইতে পারেন এবং চেঁচা-মেচি ও আন্দোলন করিতে পারেন। যাঁহারা তাহা পারেন না, তাঁহাদের অবস্থা ভাল আছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

বেকার সমস্যা দেশে সর্ব্বব্যাপী হইয়াছে। শিক্ষার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা দূর করিবার উপায় উদ্ভাবনের সময় সকলের দারিদ্র্য ও কর্ম্মহীন অবস্থার

কথা হিসাব করিতে হইবে। দেশের কর্ম্মক্ষেত্রের যাহাতে প্রসার ঘটে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বৈদেশিক শোষণের পথ যাহাতে রুদ্ধ হইতে পারে, ভিন্ন দেশীয় লোকেরা এখানে চাকরি ও ব্যবসা প্রভৃতির যে সকল ক্ষেত্র অধিকার করিয়া আছেন, সে সকল ক্ষেত্র যাহাতে দেশের লোকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, দেশে যে সকল যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতেছে তাহা যাহাতে জনসাধারণের শোষণের ফল না হইয়া উঠে তাহার ব্যবস্থার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালীদের মনে রাখিতে হইবে যে, অর্থার্জ্জনের প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে ভিন্ন প্রদেশবাসীরাই বাংলায় প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বিদ্যাসাপেক্ষ কর্ম্ম সমূহে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলেও, ব্যবসা, দৈহিক শ্রম ও দক্ষতা সাপেক্ষ কাজগুলি প্রায় সবই ভিন্ন প্রদেশবাসীর হাতে গিয়াছে। পুলিশবাহিনী প্রভৃতি সরকারী চাকরিগুলিও সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন প্রদেশবাসীর হাতে। শুধু মাত্র অন্যদের দোষ দিলে চলিবে না, আমাদের চরিত্রের কোন কোন দোষের জন্য এরূপ ঘটিতেছে, তাহাও আমাদের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা দরকার।

শিক্ষার যে অর্থমূল্য আমাদের মন অধিকার করিয়া আছে এবং যাহার ফলে শিক্ষার সহিত আর্থিক সর্ব্বপ্রকার সমস্যাকে আমরা সব সময় যুক্ত করিয়া থাকি, তাহা পরোক্ষভাবে শিক্ষালাভে লোকের উৎসাহ কমাইয়া দিতেছে। ইহাতে আর্থিক সমস্যা সমূহের সমাধান কিছু হইবে না বরং শিক্ষা বিস্তারে বিঘ্ন ঘটিয়া ক্ষতি হইবে। অর্থমূল্য ব্যতীত যে শিক্ষার নিজস্ব একটা বড় মূল্য আছে, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে শিক্ষার বিস্তার অপরিহার্য্য একথাটা আমাদের কোন সময় ভুলিলে চলিবে না।

সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের স্থান

আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের স্থান সম্বন্ধে নিখিলবঙ্গমহিলাকর্ম্মী সম্মিলনের সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "যে অর্থহীন বিধি নিষেধ অস্পৃশ্যতার আধিপত্যকে আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে, সেই বিধি নিষেধের জন্যই অবরোধ প্রথা আজও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। পর্দ্দার অন্তরালে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যাদের যাপন করিতে হয়, বৈচিত্র্যহীন কাজের মধ্যে—খাওয়ার পর রাঁধা, আর রাঁধার পরে খাওয়া ছাড়া যাদের অন্য কোন কর্ম্ম নেই, বৃহত্তর জগতের বিশাল জীবন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যারা অন্তঃপুরের অবরোধের মধ্যে যাপন করে বন্দিনীর অভিশপ্ত জীবন—তাদের দুর্ভাগ্য সত্যই অপরিসীম।"

নূতন মহিমার আলোকে উদ্ভাসিত নারীর নূতন মূর্ত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ঘরের দাবীকে সে ভুলেও অস্বীকার করে না, গৃহের কেন্দ্রেই তার মাতৃত্বের সিংহাসন; কিন্তু, একান্তভাবে ঘরের মধ্যে তার কর্ম্মক্ষেত্র আর সীমাবদ্ধ নয়। যে স্বাতন্ত্র্য বোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে মানুষ বন্ধের দাবীকে অস্বীকার করে, তার ঔদ্ধত্য থেকে মুক্ত সে; কিন্তু, পারিবারিক কর্ত্তব্যের নামে যে পরাধীনতা তার দশের ইচ্ছা বোঝাই করা' জীবনটাকে পঙ্গু করে রেখেছে, সেই পরাধীনতাকে মেনে নিতে সে কিছুতেই রাজী নয়।"

কর্ম্মধারায় ইঙ্গিত দিয়া সভানেত্রী বলিয়াছেন :—"কর্ম্মের দিকটা ভাবতে গিয়ে আমার কাছে সংঘবদ্ধ হওয়াই সকলের আগে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। আমরা একাএকা কোন কাজ করতে পারবো না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্রিত করতে না পারলে, আমাদের সাধনা সফল হবে না। সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং সেখানে গড়ে তুলতে হবে মেয়েদের শক্তিশালী সংঘ। সংঘই শক্তি।"

বর্ত্তমান সভ্যতার গঠনে নারীর হাত নাই

সভ্যতার বর্ত্তমান সঙ্কটের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া সভানেত্রী বলিয়াছেন যে সভ্যতার গঠনে নারীর হাত না থাকার ফলেই এরূপ হইয়াছে। তাঁহার কথায়, "মানুষের সভ্যতা এমন নিষ্ঠুর কদর্য্যরূপ কখনই নিতে পারতো না যদি এর গঠন কার্য্যে মেয়েদের হাতের ছাপ থাকতো। মানুষের জীবন যে কত মূল্যবান—তা বুঝতে হ'লে দরদী প্রাণ চাই, সে দরদ যদি পুরুষের মধ্যে থাকতো যন্ত্রবেদীর উপরে তৃষ্ণা রাক্ষসীকে বসিয়ে তার চরণে নরবলি দিতো না, অর্থের জন্য মানুষকে বস্তুর পর্য্যায়ভুক্ত করতো না। কিন্তু, প্রেমের আদর্শে সমাজকে গড়ে তুলবার কোন সুযোগ পায়নি নারী, তাদের

ইচ্ছাকে দাবিয়ে রেখে পুরুষের ইচ্ছাই জয়ী হয়েছে সর্ব্বত্র, আর সেইজন্যই মানব-সভ্যতার আজ এই অপরিসীম দুর্গতি।"

তিনি আশা করেন, নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রকে গড়বার জন্য নারীর সাহায্য অপরিহার্য্য। পুরুষের হৃদয়হীনতাই বর্ত্তমান সভ্যতাকে এমন কদর্য্য করেছে, নারীর হৃদয়ের স্পর্শে এর রূপান্তর ঘটবে।

কলিকাতায় পণ্ডিত জওহরলাল

পণ্ডিত জওহরলালের কলিকাতা আগমনে কলিকাতার সর্ব্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যে যে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল, সকল দলের সকল শ্রেণীর লোক তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবার, তাঁহার কথা শুনিবার, তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার জন্য যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা জওহরলালকেও বিস্মিত ও অভিভূত করিয়াছে। বাংলার জনসাধারণের মধ্যে একটা নবীন রাজনৈতিক চেতনার পূর্ব্বাভাষ বলিয়া ইহাকে মনে করা যাইতে পারে। জওহরলালকে লোকে শুধু কংগ্রেস সভাপতি বলিয়াই জানে না, নিপীড়িত শোষিত জনসাধারণের বন্ধু, নূতন রাষ্ট্রিক আদর্শ প্রচারে ব্রতী বলিয়া জানে। তাঁহার বিপুল সম্বর্দ্ধনা পাইবার ইহাও একটা পরোক্ষ কারণ। বাংলার জনসাধারণের সর্ব্বস্তরেই যে রাজনৈতিক চেতনা বিস্তার লাভ করিতেছে ইহা তাহারও লক্ষণ। জওহরলালের ক্লান্তিহীন উদ্যম, অনন্যসাধারণ কর্ম্মক্ষমতা, নির্ভীক সরল স্পষ্ট উক্তি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে।

সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে জওহরলাল

র‍্যাডিক্যাল পার্টির উদ্যোগে আহূত সভায় জওহরলাল ভারতে নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"সীতা সাবিত্রী সম্বন্ধে যদিও সুন্দর সুন্দর কথা বলা হইয়া থাকে তবুও, ভারতে নারীদের অবস্থা বিশেষ শোচনীয়। তাঁহারা উৎপীড়িত ও নিষ্পেষিত। তাঁহাদিগকে আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া হয় না। কোন দেশই তাহার নারীদের চাপিয়া রাখিয়া বা তাঁহাদের উপর উৎপীড়ন চালাইয়া, উন্নত হইতে পারে না। নারীরা কৃষ্টি ও প্রগতি সম্পন্না হইলেই তবে আপনারা উন্নত ও কৃষ্টির অধিকারী হইবেন। যদি আপনারা মনে করিয়া থাকেন যে, আপনারা সাহসিক কার্য্যসমূহ করিবেন আর মেয়েরা পিছনে বসিয়া থাকিয়া তাহার জন্য মাঝে মাঝে আপনাদিগকে উৎসাহ দিবেন ও পিঠ চাপড়াইবেন তবে তাহা খুব সুবিধার হইবে না। আপনারা তাঁহাদিগকে সমাজ ও ও জাতির বোঝা করিয়া রাখিতে পারেন না। এই বোঝা লইয়া কোন জাতিই অগ্রসর হইতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত যাহার উপর সমস্যাটি নির্ভর করিবে তাহা হইতেছে মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা। আর্থিক দিক দিয়া যখন অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয় না তখনই অবশেষে মেয়েরা উন্নত হইতে পারেন; এবং ইহাই সমস্যাটির সম্পূর্ণ সমাধান করিতে পারে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা বলিবার সময়, যে সকল লোক আপনাদের চারিপাশে রহিয়াছেন আপনাদের সেই মাতা, ভগিনী ও কন্যাদের স্বাধীনতার কথা যদি না ভাবেন তবে তাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীনতা সম্বন্ধে আপনাদের সুসংহত ধারণা পর্য্যন্ত নাই। তাহা প্রকৃত স্বাধীনতার কথা নহে, ব্রিটিশ বিরোধী, বিদেশ বিরোধী মনোভাব মাত্র—ইহা ভাল নহে। স্বাধীনতার ধারণা ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। ইহা সামাজিক দাসত্ব হইতে মুক্তি, ইহা জনসাধারণের আর্থিক মুক্তি। যদি আপনারা স্বাধীনতার এই সকল ধারণাকে, জাতীয় স্বাধীনতার এই সকল ধারণাকে, জাতীয় স্বাধীনতার ধারণার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন তবেই, স্বাধীনতা সম্বন্ধে আপনাদের সঠিক ধারণা হইবে।"

সভায় মহিলাদের সম্বোধন করিতে যাইয়া জওহরলাল লক্ষ্য করিলেন যে সভায় কোন মহিলা উপস্থিত নাই। পণ্ডিতজী কোন ফরাসী গ্রন্থকারের উল্লেখ করেন। ইনি বলিয়াছিলেন, "কলিকাতায় স্ত্রীলোকের দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।" পণ্ডিতজী দুঃখ করিয়া বলিলেন, "এটি একটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে কলিকাতার রাস্তায় মেয়েদের দেখা যায় না। তাঁহারা কেন এই প্রকারের সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ জীবন যাপন করেন, তাহা আমার জানা নাই।

জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জওহরলাল

"প্রত্যেক জাতিরই একটা সংস্কৃতি আছে বটে। কিন্তু, এই জাতীয় সংস্কৃতিও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর দ্বারা বিপুল ভাবে প্রভাবিত হইতেছে। পুস্তকাদি, চিন্তাধারা, জীবনযাত্রার অবস্থা প্রভৃতি সকলেই অল্পাধিক একপ্রকার হইয়া যাইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্য ইওরোপ ভয়ানকভাবে আন্তর্জাতিক কিন্তু তথাপি ইওরোপ ও আমেরিকায় তীব্র, আক্রমণমূলক জাতীয়তা দেখা দিয়াছে। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে, বিরোধ আসিতেছে, যুদ্ধ অনিবার্য্য হইতেছে। অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক যে সকল শক্তি প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমানকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই দৃষ্টি দিয়া দেখিলেই, ভারতবর্ষের সমস্যা সমূহকে যথাযথ ভাবে দেখা যাইবে।"

শ্রীসুশীলকুমার বসু

শরৎচন্দ্র কি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অবিচার করিয়াছেন

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম এ

"দত্তা" পড়িয়া বন্ধু মন্তব্য করিলেন, শরচ্চন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ওপর বিশেষ সদয় ন'ন। কথাটা অসঙ্গত বলিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। কোন'ও একটা সমাজকে শরচ্চন্দ্র সম্পূর্ণ বিদ্বেষ করিতে পারেন, এ কথা শরৎ-সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইয়া ধারণা করা কঠিন। বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে অবশ্য জাতিগত পক্ষপাতের একটা কথা অধুনা উঠিয়াছে। তর্ক করিতে গেলে, সে সম্বন্ধে সত্যই সতর্ক হইয়া কথা বলিতে হয়। কিন্তু ধর্ম্ম সমাজ নির্বিশেষে শরচ্চন্দ্রের উদার সমদৃষ্টির কথা বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করা যায়।

বিশেষ করিয়া "দত্তা"র ব্রাহ্ম-বিদ্বেষের কথা উঠিতেই পারে না। সত্য বটে রাসবিহারীকে লইয়া তিনি অতিরিক্ত রকমের কৌতুক করিয়াছেন, এবং এই বৃদ্ধ কপট ব্রাহ্মের বার বার 'নিরাকার পরব্রহ্মের যুগ্মপাদপদ্মে নমস্কার' লইয়া তিনি প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু ইহা হইতে কোন'ও কিছুই প্রমাণ হইল না। যেহেতু অনুরূপ উপহাস, বিদ্রূপ তিনি একাধিক কপট হিন্দুভক্ত ও পুরোহিতদের লইয়া'ও বহুত্র করিয়াছেন। বস্তুতঃ লোক দেখানো অনাবশ্যক ভক্তির বাহুল্য ও আন্তরিক কপটতা যেখানে, সেখানেই শরচ্চন্দ্র তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন,—হিন্দুসমাজ বলিয়া নিষ্কৃতি দেন নাই, ব্রাহ্ম সমাজ বলিয়া বাড়াবাড়ি করেন নাই। কোন'ও না কোন'ও বিশেষ হিন্দুর কাপট্যের প্রতি তিনি তাঁহার বহু পুস্তকেই তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। "মহেশ" গল্পের তর্করত্নকে লইয়া তিনি তীব্র Satire'র সৃষ্টি করিয়াছেন; "বামুনের মেয়ে"তে হিন্দু সমাজের শিরোমণিদের ভণ্ডামীকে তিনি অসহ বিদ্রূপে দগ্ধ করিয়াছেন; এবং "শ্রীকান্তে" তথাকথিত সন্ন্যাসীদের লইয়া তিনি কী কৌতুকই না করিয়াছেন! ইহা ছাড়া তাঁহার প্রায় প্রত্যেক পুস্তকেই শঠতা ও ভণ্ডামি'র প্রতি অল্পবিস্তর আক্রমণ আছেই। কিন্তু ইহা হইতে তাঁহাকে হিন্দুবিদ্বেষী বলিবার মত বাতুলতা কাহার'ও হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না, যেহেতু অকপট হিন্দু মহাত্মার চরিত্র'ও তিনি একাধিক সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর লালসা-কলুষিত চিত্র তাঁহার সাহিত্যে আমরা দেখিয়াছি। আবার "শ্রীকান্তে"র চতুর্থ পর্ব্বে যখন বৈষ্ণব আখড়ার গুরুদেবের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে তখন'ও বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না; মনে হয় স্বর্গের দেবতা মর্ত্ত্যে নামিয়াছেন। কিরণময়ীকে দিয়া সংস্কারবহুল ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে আঘাত দিয়াছেন, আবার সুরবালাকে দিয়া উহাকেই অতি উচ্চে স্থাপিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, কোন'ও বিশেষ সমাজ বলিয়া নয়, ক্ষুদ্র বা দুর্ব্বল চরিত্রের অন্তঃশূন্যতা ও অন্যায়, ও মহৎ চরিত্রের আন্তরিকতা তিনি অতি নিরপেক্ষভাবেই দেখাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র'ও "দুর্গেশনন্দিনীতে" বিদ্যাদিগ্‌গজের কপটতা ও মূর্খতা লইয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সাহিত্যে আর যাহাই থাক্ আদর্শ ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু'র চরিত্রের অভাব নাই।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, "দত্তায়" রাসবিহারীকে লইয়া শরচ্চন্দ্র নাকি ব্রাহ্ম বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ "দত্তা"র আখ্যানভাগ সুরু হইবার অনতিকাল পরেই, রাসবিহারীর অন্তঃশূন্যতা লইয়া উপহাস করিবার বহু পূর্ব্বেই, আর একজন দীক্ষিত মস্ত ব্রাহ্ম এবং রাসবিহারীর বন্ধু, বনমালীকে তিনি কী শান্ত, কী সৌম্য মূর্ত্তিতেই না আমাদের সম্মুখে আনিয়াছেন! বনমালীর ভগবৎ প্রেম লইয়া ত শরচ্চন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্যও পরিহাস করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্ম

* বর্দ্ধমান সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

বনমালীর ভক্তিকে তিনি কী শ্রদ্ধার চোখেই না দেখিয়াছেন, কত শ্রদ্ধাভরেই না দেখাইয়াছেন! গল্পের মধ্যে এই প্রবীণ ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের কথা খুব বেশী নাই। তথাপি কী গভীর তাঁহার প্রভাব! বিজয়া সম্বন্ধে কথা বলিতে বলিতে শরচ্চন্দ্র সময়ে সময়ে শুধু হয়ত বলিয়াছেন, "কিন্তু পিতার কাছে বিজয়া নিষ্ফল শিক্ষা পায় নাই" কিন্তু কত গভীর এই ইঙ্গিত। এই যে সুশিক্ষার কথা, এই যে মহান্ আদর্শের উল্লেখ ইহা ঐ ব্রাহ্ম মহাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হইয়াছে। কিন্তু বনমালীর কথা ছাড়িয়া দিলেও দয়াল আমাদের চক্ষু এড়ায় না। সুমহান আদর্শে চিত্রিত এই উদারচরিত্র প্রাচীন ব্রাহ্ম—শুধু ব্রাহ্ম নহেন, ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য—আসিয়া যখন গল্পের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন হইতেই একটা পুণ্যময় স্নিগ্ধতা সমগ্র নাটকখানাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যে ঋষির মূর্ত্তিতে এই ব্রাহ্ম পুরোহিতকে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা বোধ করি কোনও ব্রাহ্মলেখনীতেও কল্পিত হইত কি না সন্দেহ; এবং সত্য সত্য, ব্রাহ্মসমাজে—শুধু ব্রাহ্ম সমাজে কেন, বিরাট্ হিন্দুসমাজেও—যে অনুরূপ মাহাত্মার সংখ্যা অধিক নাই এ'কথা জোর করিয়া বলা যায়। দয়াল, বনমালী প্রভৃতির পার্শ্বে রাসবিহারীকে দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় কেবল কৌতুক করিবার জন্যই উঁহাকে ঐ ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে—বিশেষ করিয়া ব্রাহ্ম বলিয়া উঁহাকে হাস্যাস্পদ করা শরচ্চন্দ্রের উদ্দেশ্য নহে।

"পরিণীতা" পুস্তকে শরচ্চন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে যথেষ্ট উচ্চ করিয়া দেখাইয়াছেন। এমন কি কন্যাদের বিবাহ লইয়া বিব্রত গুরুচরণ যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন তখন হিন্দু সমাজের এক দিকের দারুণ ক্ষুদ্রতা প্রত্যেকের চোখে পড়ে। ব্রাহ্মযুবক গিরীন্দ্রকে তিনি দেবোপম চরিত্র করিয়া গড়িয়াছেন। এবং একদিন হিন্দু সমাজের শেখর, গিরীন্দ্র চলিয়া যাইবার পর তাহার সমস্ত বিদ্বেষ ভুলিয়া অকস্মাৎ "এই অপরিচিত ব্রাহ্মযুবকের উদ্দেশে বার বার ভূমিতে মাথা স্পর্শ করিল; মানুষ নিঃশব্দে যে কত বড় স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে ইহাই কল্পনা করিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।" ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিদ্বেষ লইয়া কেহ কখনও এত বড় ব্রাহ্মচরিত্র আঁকেন না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ "গৃহদাহে"র অচলা ব্রাহ্মসমাজের। নিষ্ঠুর জগৎ, ততোধিক নিষ্ঠুর "গৃহদাহে"র ঘটনাবৈচিত্র্য—সে নির্ম্মম তরঙ্গাঘাত অভাগিনী অচলা সহ্য করিতে পারিল না। তাহার সমগ্র জীবন অত্যন্ত অকালে চিরদিনের জন্য ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহা না হয় গেল। কিন্তু এই অচলাকে কেন্দ্র করিয়া নাস্তিক সুরেশের মুখ দিয়া শরচ্চন্দ্র ব্রাহ্ম-মেয়েদের তথা আলোকপ্রাপ্তা আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতি তীব্র বাক্য প্রয়োগ করাইয়াছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সর্ব্ব প্রথম মনে রাখিতে হইবে যে, সুরেশের কথার বিশেষ কোনও মূল্য নাই, যেহেতু সুরেশ 'গৃহদাহে'র আদর্শ, চরিত্রবান নায়ক নহে, এবং তাহার মতবাদ তাহারই, লেখকের নহে। দ্বিতীয়তঃ সুরেশ নাস্তিক, প্রবৃত্তিবশগামী, অসাবধানী, pessimist—কতকটা টলষ্টয়ের ব্রন্স্কির মত। তথাপি, সুরেশের ব্রাহ্মবিদ্বেষের মধ্যে যদিই বা কিছু অন্যায় প্রকাশ হইয়া থাকে, নির্ম্মলচরিত্র দেবোপম মহাপ্রাণ মহিমকে দিয়া শরচ্চন্দ্র তাহা সংশোধন করাইলেন। আদর্শ-চরিত উদারমনা মহিম সেই ব্রাহ্মসমাজেই বিবাহ করিল, এবং সেই অচলাকেই। কিন্তু এ'সমস্ত বিশেষ কিছুই নহে। অচলা-মহিমের বিবাহের পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে গৃহ-দাহের প্রকৃত নাট্যাংশ শুরু হইয়াছে; এবং হতভাগিনী ব্রাহ্মনারী অচলা আখ্যায়িকা (romance) জটিল করিয়াছে ও আপন সমাজে কলঙ্ক ঢালিয়াছে। কারণ, যদিচ দৃঢ়মনা মহিম সুরেশের কথা অগ্রাহ্য করিয়া অচলাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল, তথাপি একদিন অতি নির্ম্মম-ভাবেই ঐ মন্দ-ভাগিনী ব্রাহ্ম মহিলার সম্বন্ধে পাষণ্ড সুরেশের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়া গেল, অথবা, বিশ্বাসঘাতক সুরেশ আপনই উহা সার্থক করিয়া তুলিল, প্রবঞ্চনা ও কৌশলের সাহায্যে। যাহাই হউক্ না কেন, সুরেশের কথা ফলিয়া গেল,—এবং অসীম নিদারুণ ভাবে। মহিমের মর্ম্মে মর্ম্মে উহারই বিষাক্ত প্রলেপ দিনরাত ক্রিয়া বিস্তার করিয়া তাহার দিনের কাজ ও রাতের নিদ্রা নষ্ট করিয়া দিল। আর দুর্ভাগিনী শিক্ষিতা ব্রাহ্ম তরুণীর জীবন চরম বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হইল। কিন্তু এ সকল 'সত্ত্বে'ও বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের নারী বলিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র করা হইল বা

তাহাকে অধিক মাত্রায় বিপথগামিনী দেখান হইল তখনও পর্য্যন্ত তাহা চোখে পড়ে না। কিন্তু যখন পূত-চরিত্রা, শরচ্চন্দ্রের অসামান্য আদর্শ-সৃষ্টি ভক্তিপরায়ণা, স্বামি-স্মৃতিমাত্রসম্বলা, একনিষ্ঠা হিন্দু বিধবা যুবতী মৃণাল আসিয়া নাটকের আখ্যান ভাগে দেখা দিল, তাহার গরদের কাপড়টি পরিধান করিয়া পবিত্র পূজারিণী মূর্ত্তিতে তখন ভাগ্যবিড়ম্বিতা অচলার মলিনতা এমনি বাড়িয়া গেল যে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ যেন মৃণালের পার্শ্বে একেবারে কালি হইয়া দেখা দিল। বিশেষ করিয়া ঠিক এই সময়টিতেই অচলার পিতা ব্রাহ্ম কেদারবাবু মৃণালকে দেখিয়া একদিন বলিয়া বসিলেন, "মা, তোকে যখন ঐ গরদের কাপড়ে পূজোয় ব'সতে দেখি, তখন ইচ্ছে করে, আমিও আবার পৈতে নিয়ে, কোষাকুষি নিয়ে আহ্নিকে বসে যাই।" এই একটিমাত্র স্থল যেখানে শরৎ-সাহিত্যে অবসাদ-খিন্ন ব্রাহ্মকণ্ঠে এক অতি সকরুণ আক্ষেপ প্রকাশ পায়।—যেন ব্রাহ্মসমাজে আর শান্তি মিলিতেছে না। মৃণাল অবশ্য উত্তর করিয়াছিল যে প্রত্যেকেই আপন আপন ধর্ম্মমতে শান্তি পাইবে, পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু বোধ করি কলঙ্কিনী কন্যার কথা স্মরণ করিয়া প্রবীন ব্রাহ্ম পিতা সে কথায় সান্ত্বনা পান নাই।

এই যে অচলাকে গ্রন্থকার গাঢ় মসীবর্ণে লিপ্ত করিয়াছেন যাহার ছায়াপাতে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ কৃষ্ণাভ হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উপর অবিচার মনে করিবার কোনও হেতুই নাই। যেহেতু তাহা হইলে তিনি যে হিন্দু সমাজের উপরে'ও অবিচার করিয়াছেন এ'কথাও বহুস্থানে উঠিতে পারে। হিন্দুকুলবধূ কিরণময়ীকে কি তিনি অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে কলুষের পঙ্কে নিক্ষেপ করেন নাই? তবে, এ'কথাও সত্য যে, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া যদিই বা কোথা'ও শরচ্চন্দ্র কটাক্ষ করিয়া থাকেন তাহাতে কিছুমাত্র অন্যায় প্রকাশ পায় নাই। কারণ, বিচার করিয়া দুর্ব্বলতা দেখানর নাম অবিচার নহে। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক হইয়া গেল একটা মহত্তর উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ আর'ও কিছু ভাল ও আর'ও কিছু মহৎ করিবে বলিয়া, অথচ, পরিবর্ত্তে যদি দুর্নীতি কোথা'ও ঠিক একই প্রকার বাহির হয় তাহার প্রতি কটাক্ষ করিবার অধিকার অন্ততঃ প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের আছেই। বিশেষ, সমাজকে উন্নত করিতে হইলে তাহার দুর্ব্বলতাগুলিকে দেখাইয়া দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। বার্ণার্ড শ' তাঁহার "কুইন্টেসেন্স্ অভ্ ইব্‌সেনিজ্‌ম্" পুস্তকে একস্থানে বলিয়াছেন,—"...it is on the weaknesses of the higher types of character that idealism seizes." অত্যন্ত খাঁটি কথা।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, অচলা চরিত্রে যাহাই প্রকাশ পা'ক না কেন বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া শরচ্চন্দ্র বিন্দুমাত্র বাড়াবাড়ি করেন নাই। যে বিশিষ্ট ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ও সামাজিক সংস্থান সমাবেশে ঠিক যেরূপটি হওয়া স্বাভাবিক শরচ্চন্দ্র তাহাই করিয়াছেন, বেশী কিছু করেন নাই। মুষ্টিমেয় নরনারী লইয়া ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াই ব্যাপারটা একটু চোখে পড়ে। অন্যথা হিন্দু নরনারীর কত চরিত্র লইয়া শরচ্চন্দ্র কত অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কোন'ওটা কি তখন'ও বিশেষ করিয়া হিন্দুসমাজ বলিয়া আমাদের চোখে পড়িয়াছে।

যাহা হউক, অচলার তথা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি "গৃহদাহে" শরচ্চন্দ্র যদিই বা সত্যই কিছু অবিচার করিয়া থাকেন, তাঁহার "সতী, অনুরাধা, ও পরেশ" পুস্তকের সতী গল্পে তিনি ইহার ক্ষতি পূরণ করিয়া দিয়াছেন। গৃহদাহের হিন্দু বিধবা যুবতী মৃণালের পার্শ্বে ব্রাহ্মমহিলা অচলাকে যেরূপ কুৎসিত দেখাইয়াছে, "সতী"-গল্পের ব্রাহ্মবিধবা যুবতী লাবণ্যের পার্শ্বে হিন্দুমহিলা নির্ম্মলাকে ঠিক সেইরূপ ম্লান দেখায়। "দত্তা"র রাসবিহারিকে ক্ষুদ্র দেখাইয়াছে প্রায় ঐ ব্রাহ্মসমাজেরই অনন্য মহৎ চরিত্রের পার্শ্বে; "সতী"-গল্পের দার্শনিক পণ্ডিত ব্রাহ্ম হরকুমারের পার্শ্বেই কিন্তু সমস্ত হিন্দু-সমাজ শিরোমণিদের নিতান্ত কুৎসিত রকমের ক্ষুদ্র করিয়া দেখান হইয়াছে। বস্তুতঃ সতীগল্পে হিন্দুসমাজ লইয়া শরচ্চন্দ্র যে তীব্র বিদ্রূপ করিয়াছেন তাহাতে হিন্দু পাঠকের মনে আঘাত লাগা পর্য্যন্ত নিতান্ত অসম্ভব নহে। প্রবীন ব্রাহ্ম হরকুমারের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটিল কতকগুলি উচ্চশিক্ষিত হিন্দুকুলচূড়ামণির এক আধ্যাত্মিক তর্কের অর্থাৎ যুদ্ধের ক্ষেত্রে। পরিচয়টা এইরূপ—"...সেদিন এমনি একটা লড়ায়ের মাঝখানে হরকুমার তাঁহার বাঁশের ছড়িটি হাতে করিয়া আস্তে আস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সকল যুদ্ধবিগ্রহ ব্যাপারে কোন'ও দিন তিনি অংশ গ্রহণ করিতেন না। নিজে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়াই হৌক, অথবা শান্ত মৌন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়াই হৌক, চুপ করিয়া শোনা ছাড়া গায়ে পড়িয়া অভিমত প্রকাশ করিবার চঞ্চলতা তাঁহার একটি দিনও প্রকাশ পায় নাই। আজ কিন্তু অন্যরূপ ঘটিল। তিনি ঘরে ঢুকিতেই টাকওয়ালা মুন্সেফবাবু তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া বসিলেন। এইবার ছুটিতে কলিকাতায় গিয়া তিনি কোথায় যেন এই লোকটির ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের একটা জনরব শুনিয়া আসিয়া-ছিলেন। হরকুমার স্মিতহাস্যে সম্মত হইলেন। অল্পক্ষণেই বুঝা গেল, শাস্ত্রের অনুবাদ মাত্র সম্বল করিয়া ইঁহার সহিত তর্ক চলেনা।" শাস্ত্রের বাংলা অনুবাদ পড়িয়া পাণ্ডিত্য ফলাইবার প্রবৃত্তি যেহ হিন্দুকুলচূড়ামণির আছে বলিয়া উদ্ধৃত অংশের

শেষ ছত্রে শেষোক্তি মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। যাহাই হোক, ব্যঙ্গোক্তি এইখানেই শেষ হয় নাই। মানুষের স্বভাব হইতেছে যে, তাহার সত্যকার সঙ্কীর্ণতা, জ্ঞানের দৈন্য ও গোপন প্রবঞ্চনা অকস্মাৎ প্রকাশ হইয়া গেলে সে ব্যক্তি লজ্জিত না হইয়া ক্রুদ্ধ হয়। ব্রাহ্ম হরকুমারের অনন্যসাধারণ সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ক্ষুব্ধ হিন্দুশিরোমণি আমাদের সবজজ বাহাদুর তাঁহার শিখার গুচ্ছ গীতার বঙ্গানুবাদ ও ৺কাশীবাসের উপকারিতা সমেত খাপ্পা হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন, "যে ব্যক্তি জাতি দিয়াছে তাহার আবার শাস্ত্রজ্ঞান!" এই স্থলে শরৎচন্দ্র কঠিন বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন, "...সবজজ বাহাদুর বলিলেনও ঠিক তাই। সকলে উঠিয়া গেলে তাঁহার পরমপ্রিয় সরকারী উকিলবাবুকে চোখের ইঙ্গিতে হাসিয়া কহিলেন, 'শুনলেন'ত, ভাদুড়ীমশায়, ভূতের মুখে রাম নাম আর কি!' ভাদুড়ী ঠিক সায় দিতে পারিলেন না, কহিলেন, 'কিন্তু জানে খুব। সমস্ত যেন মুখস্থ।" ব্যাপারটা এইখানে শেষ করিলেও হইত, কিন্তু সবজজের মুখ দিয়া আরও একটা জবাব বাহির করিয়া দিয়া শরৎচন্দ্র যেন, 'গৃহদাহে'র ব্রাহ্মসমাজের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ তুলাইয়াছেন। ভাদুড়ীর বাক্যে "...হাকিম প্রসন্ন হইলেন না। কহিলেন, 'ও জানার মুখে আগুন। এ'রাই হ'ল জ্ঞানপাপী। এ'দের আর মুক্তি নাই।"—"জ্ঞানপাপী" ও "এদের আর মুক্তি নাই"—দুইটি কথার দ্বারা যে অতি-নির্ম্মম তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে সংস্কারবদ্ধ হিন্দুসমাজ অত্যন্ত ম্লান হইয়া উঠিয়াছে, এবং সত্যকে অস্বীকার করিবার এই নিষ্ঠুর নীচতা প্রকাশের দ্বারা একজন হিন্দুশিরোমণির উপর দিয়া শরৎচন্দ্র পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজকে ছোট করিবার ও কেদার বাবুর আক্ষেপোক্তির দ্বিগুণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ হিন্দুসমাজের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হয় নাই, একজন বিশেষ ধর্ম্মাভিমানী সত্যঘাতক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইহার অভিযান। যেমন এখানে'ও বিশেষ করিয়া হিন্দুসমাজকে আঘাত করা শরৎচন্দ্রের অভিপ্রায় নহে, অন্যত্র'ও তেমনি ব্রাহ্মসমাজকে হাস্যাস্পদ করা তাঁহার মত সংযতলেখনী গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যের মধ্যে কখনও ছিল না। কেবল অসত্য ও হৃদয়ের দৈন্যের প্রতিই তাঁহার অবজ্ঞা। বস্তুতঃ, "সতী" গল্পের ব্রাহ্মমহিলা লাবণ্যকে (উক্ত হরকুমারের কন্যা) তিনি কী অপরিসীম উদার আদর্শেই না গড়িয়াছেন! উচ্চশিক্ষিতা স্কুল-ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্, ব্রাহ্মমহিলা লাবণ্যের সত্যপ্রিয়তা, একটি সহজ সরলতা, ও সর্ব্বোপরি তাহার মহান চরিত্রের একটা সুদৃঢ় প্রভাব আমাদের মনের উপর একটা সুস্পষ্ট গভীর ছাপ রাখিয়া যায়। এবং উহারই পার্শ্বে হিন্দু আদর্শে গঠিতা স্ত্রী নির্ম্মলাকে যে কী বীভৎসই দেখায় তাহা লিখিয়া বুঝানো অসম্ভব। "গৃহদাহে" মৃণালের পার্শ্বে অচলাকে দেখিয়া যেমন সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ লজ্জায় মাথা নত করিয়াছিল, লাবণ্যের পার্শ্বে নির্ম্মলাকে দেখিয়া তেমনই হিন্দুসমাজের'ও মাথা তুলিবার অণুমাত্র শক্তি থাকে না। বস্তুতঃ, নির্ম্মলার পাশে উমাকে না দেখিলে আমরা হয়ত বলিতাম শরৎচন্দ্র হিন্দুসমাজের প্রতি অবিচারই করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে যদি কোনও সমাজ শরৎচন্দ্রের লেখনীস্পর্শে অতিঘৃণ্য হইয়া দেখা দিয়া থাকে'ত সে বিলাতফেরৎ ইঙ্গবঙ্গ সমাজ। এই হতভাগ্য সমাজ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র কোথাও করুণা প্রকাশের লেশমাত্র প্রয়াস করেন নাই। "শ্রীকান্তে" বলিতেছেন, "ইঁহাদের (বিলাতফেরত ইঙ্গবঙ্গদের) মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলেন তাঁহারা হিন্দুসমাজকে উত্ত্যক্ত করিতেছেন; এবং যাঁহারা নিজদিগকে ব্রাহ্ম বলেন তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে নষ্ট করিতেছেন।" "নববিধান" উপন্যাসে এই ইঙ্গবঙ্গসমাজকে তিনি নিষ্ঠুর বিদ্রূপে দগ্ধ করিয়া মারিয়াছেন। অথচ "নববিধানের" ইঙ্গবঙ্গেরা সকলেই হিন্দুসমাজের। "বিপ্রদাসে"ও শরৎচন্দ্র ইঁহাদের সমাজকে নিষ্ঠুর কশাঘাত করিয়াছেন। বাস্তবিক যে সমস্ত বাঙ্গালী সমগ্র জীবন বাংলাদেশে কাটাইয়া জীবনের দুই চারিটা বৎসরমাত্র একবার সাগর পারে যাপন করিয়া আসিয়া আগাগোড়া বিলাতী চালে চলিতে থাকেন, বিলাতী রীতি-নীতি মানিয়া চলেন, ও বিলাতী অনুকরণে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন, সেই হতভাগ্য মূঢ় সম্প্রদায়কে শরৎচন্দ্র কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন নাই। ইঁহাদিগকে হাস্যাস্পদ করিয়া শরৎচন্দ্র স্থানে স্থানে বড় নির্ম্মম আমোদ করিয়াছেন। "চরিত্রহীনের" বেচারা শশাঙ্কর প্রতি কোন'ও ক্রমেই যাহাতে এতটুকু করুণার ভাব কোন'ও পাঠকেরই মনে না আসে শরৎচন্দ্র সে বিষয়ে ভারী একটা হৃদয়হীন সতর্কতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই পথভ্রান্ত ইঙ্গবঙ্গসমাজকে নির্দ্দয় উপহাসে দগ্ধ করিবার সময় শরৎচন্দ্র হিন্দুসমাজ-ব্রাহ্মসমাজ লইয়া কোথাও পক্ষপাতদোষ দেখান নাই।

এক কথায় শরৎ-সাহিত্যের সহিত নিবিড়ভাবে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা একথা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, শরৎচন্দ্র মহত্ত্ব দেখাইবার সময় হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম বলিয়া কোথাও তিলমাত্র তারতম্য ঘটিতে দেন নাই, এবং অন্যায় দমন করিবার কালেও কোথাও সমাজ স্বাতন্ত্র্যের কোনও সুবিধাই গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার ঘোষাল

এমনি অজস্র নমুনা দেওয়া যায়, কিন্তু তাহা বাহুল্য। কাব্যামোদী পাঠকমাত্রই তাঁহার কবিতা উপভোগ করিয়া থাকেন।

বইখানির মূল্য আট আনা হওয়ায় সাধারণের সহজলভ্য হইয়াছে। গ্রন্থকার এই জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীমনোজ বসু

যৌন-বিজ্ঞান [সচিত্র]—আবুল হাসানাৎ আই-পি প্রণীত। প্রকাশক—আবুল হাসানাৎ আই-পি ময়মনসিংহ। ৪৩২ পৃষ্ঠা। মূল্য সাড়ে চারি টাকা।

যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই সুবৃহৎ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। যথোচিত ভাবে স্ত্রী-পুরুষের দেহ পরিচালনা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তদনুমোদিত নিয়মাদি পালন যে অপরিহার্য্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় এ বিষয়ে বেশী পুস্তকাদি নাই; যে দুই-চারিখানি আছে তাহার অধিকাংশই অশ্লীলতা দোষে দূষিত, এবং এরূপ বদর্য্যভাবে লিখিত যে সেগুলি অসঙ্কোচে আত্মীয়স্বজনের হস্তে দেওয়া যায় না। আলোচ্য পুস্তকখানি এই দোষ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। সুমার্জ্জিত এবং সুস্পষ্ট ভাষায় যৌন ব্যাপারসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে লেখক যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা শুধু মলিনতাবর্জ্জিতই নয়, পরন্তু অতিশয় কৌতূহলজনক এবং উপকারপ্রদ। যুক্তি এবং বিচারের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা বইখানিকে প্রসাদগুণসম্পন্ন করিয়াছে। এই বইখানি যে বাঙলা সাহিত্যের একটা বিশেষ দিকের অভাব মোচন করিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দুর্গাপূজা-চিত্রাবলী—শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৭৩ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ নেই।

বইখানির নাম দুর্গাপূজা-চিত্রাবলী হ'লেও বইখানি শুধু চিত্রই নয়, এবং শুধু দুর্গাপূজারই চিত্র নয়। দক্ষিণদিকের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রের পূর্ব্বে বাম দিকের পৃষ্ঠায় তার কাহিনী ভাষায় মুদ্রিত আছে; এবং কাহিনী প্রধানতঃ সতী এবং উমা সংক্রান্ত হলেও, ছায়াচিত্রে প্রধান চিত্রের পূর্ব্বে ছোট ছোট অবান্তর চিত্রের ন্যায়, বইখানির অগ্রভাগে চিংড়িরাণীর কাহিনী সমুদ্রমন্থনের কাহিনী প্রভৃতি ছোট ছোট কাহিনী বিবৃত এবং চিত্রিত হয়েছে।

বইখানির চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী উভয়েই সুদক্ষ শিল্পী,—সুতরাং কথা ও চিত্রের পাশাপাশির এই বইখানি তরুণ পাঠকদের চিত্ত এবং চক্ষু পরিতৃপ্ত করবার সম্পূর্ণ উপযোগী হয়েছে—এ কথা বলাই বাহুল্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ পুস্তকটি প্রকাশিত ক'রে শুধু গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন নাই, সম্পূর্ণ নূতন একটি ক্রিয়াশীলতারও পরিচয় দিয়েছেন। আমরা আশা করছি দুর্গাপূজা-চিত্রাবলীর দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি নূতন সিরিজের প্রবর্ত্তন করলেন।

পুস্তকের প্রথমে সন্নিবিষ্ট শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ছবিখানি শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত। এই চিত্রে অবনীন্দ্রনাথের আকৃতির বিশেষত্ব সুপরিস্ফুট।

বইখানি আগাগোড়া আর্ট পেপারে মুদ্রিত। ছাপাও প্রথম শ্রেণীর, কিন্তু বাঁধাই পুস্তকের তুলনায় নিকৃষ্ট হয়েছে।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গীত-সরণি, প্রথম ভাগ, ভূপালী—শ্রীপ্রসাদ বসু প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপ্রসাদ বসু ৪৩, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড শ্রীরামপুর। ১৬ পেজি ডঃ ক্রাঃ ১২ পৃষ্ঠা। মূল্য দশ পয়সা মাত্র।

শ্রীযুক্ত প্রসাদ বসু একজন কবি এবং সঙ্গীতবিদ্। গীত রচনায় সুর এবং কথার উপর মাধুর্য্য স্থাপন করবার শক্তি তাঁর আছে। প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য এই স্বরলিপির পুস্তকখানি তিনি নূতন পদ্ধতিতে রচিত করেছেন। এ বইখানি

আমি আদ্যোপান্ত পরীক্ষা ক'রে দেখেছি এবং নব প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি সম্পর্কে রচয়িতার সহিত আমার মৌখিক বিস্তারিত আলোচনাও হয়েছে। আমার মনে হয়, সঙ্গীত-সরণির পদ্ধতি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সত্যই উপকারী হবে।

এই পুস্তিকায় যে স্বব-সাধনা এবং কণ্ঠ-সাধনা আছে তা ভূপালী ঠাটে, সুতরাং তার মধ্যে মধ্যম এবং নিখাদ এই দুইটি সুরের স্থান নেই,—সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে প্রচলিত সাধারণ সার্গমেব সাধনা এব দ্বাবা হচ্ছে না। তেতালা, একতালা এবং ঝাঁপতাল ছন্দেব যে চারখানি গানের স্বরলিপি এ পুস্তকে দেওয়া হয়েছে সেগুলিও ভূপালী সুবের, সুতরাং তার মধ্যেও মধ্যম এবং নিখাদ সুরের পরিচয় নেই। অত-এব এ কথা বলাই বাহুল্য যে, যে-শিক্ষার্থীকে এ পুস্তিকাখানি আদ্যোপান্ত শেখানো হ'ল স্বর-সপ্তকব মা এবং নি দুটি স্বরের কোন পরিচয়ই সে পেলে না। প্রসাদ বাবুব যুক্তি হচ্ছে, নাই বা পেলে, কেদারা ঠাট শেখবার সময়ে, (অথবা কোনো সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী শেখবার সময়ে ত নিশ্চয়ই,) মা এবং নি-র পরিচয় সে ভাল কবেই পাবে। শিশু যখন কথা কইতে শেখে তখন তাকে ভাল করে কথা বলতে শেখাবার জন্য স্বর এবং ব্যঞ্জন বর্ণগুলির শিক্ষা দিতে হয় না। নিজের উৎসাহে এবং উদ্যমে সে 'বাবা' 'খাবা' [খাবাব], 'গায়ি' [গাড়ি] প্রভৃতি কথাগুলি বলতে বলতে ক্রমশঃ বর্ণমালার সব অক্ষরগুলিই উত্তমরূপে আয়ত্ত ক'রে নেয়। তেমনি সর্ব্বপ্রথমে সার্গম সাধনার তাড়নার দ্বারা সঙ্গীত শিক্ষার্থীর মনে সঙ্গীতের প্রতি বৈরূপ্য সঞ্চার না ক'রে বিভিন্ন রাগ রাগিণীর মাধুর্য্যেব মধ্য দিয়ে সুরগুলির পবিচয় সাধন হ'লেই স্বাভাবিক ভাবে সার্গম পরিচয় ঘটে। সুর-সপ্তকের মধ্যে প্রথম শিক্ষার্থী মধ্যমের যে পরিচয় লাভ করে, তাব চেয়ে অনেক মধুব ভাবে এবং যথার্থভাবে লাভ করে, কেদারা ঠাটের মধ্যে ।

প্রসাদ বাবুব পদ্ধতির মধ্যে যুক্তির এমন প্রবলতা আছে যে, এ পদ্ধতিটি নিয়ে অন্ততঃ বিস্তৃত আলোচনা এবং পরীক্ষা হওয়া উচিত।

পুস্তকটির শেষ গান ভূপালী রাগিণীর লক্ষণ গীতি। মনে হয় প্রত্যেক ভাগেই সেই ভাগে আলোচিত রাগিণীর একটি ক'রে লক্ষণ-গীতি স্থান পাবে। স্বরলিপি পুস্তকখানি শিক্ষার্থীদের পক্ষে যে মূল্যবান হয়েছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আগামী মাঘ মাস হইতে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাস
"সোনালী রঙ"

সিকিম ও তিব্বতে বারো দিন

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় কল্প—যাত্রা

৩০শে সেপ্টেম্বর দারজিলিং মেলে সুধীরবাবু সপরিবারে কালিম্পং যাত্রা করলেন ; সঙ্গে গেলেন আমাদের দলের চারটি যুবক, তাঁরই ভাগিনেয়চতুষ্টয়। বাকী রইলাম শুধু আমি। বাড়ীতে শারদীয়া পূজার উৎসব শেষ হওয়ার আগে আমার বাড়ী ছেড়ে যাওয়া ভাল দেখাবেনা বলেই, এই ভ্রমণপঞ্জীর তারিখ স্থির হয়েছিল পূজার অব্যবহিত পরেই—১০ই অক্টোবর। এবার আমার পূজার আনন্দ বাদ দিয়ে কয়েক-দিন আগে পর্ব্বতভ্রমণ আরম্ভ করার আলোচনা অনেকবারই হয়েছিল। কিন্তু বৎসরান্তে একটিবার বাঙ্গালীর এই জাতীয় উৎসব স্বগৃহে দুর্গাপূজার সাধ-আহ্লাদ হ'তে নিজেকে বঞ্চিত করে, পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের প্রাণে ব্যথা দিয়ে দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে আমার মন কিছুতেই চাইলেনা। তবু বিজয়া পর্য্যন্ত থাকতে পারলাম না। মানুষ অবস্থার দাস। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে আমাকে মহাষ্টমীর সন্ধ্যাতেই গৃহত্যাগ করতে হোল। একাদশী তিথিতে অর্থাৎ ৮ই অক্টোবর প্রাতঃকালে আমাদের মালপত্র কালিম্পং হ'তে অশ্বতরপৃষ্ঠে গ্যাণ্টক রওয়ানা হবার কথা। কালিম্পং হ'তে আমাদের দুদিন আগে রওয়ানা না হলে, গ্যাণ্টকে আমাদের আগে পৌছতে পারবেনা। এই কারণে আমারও ৬ই তারিখে কালিমপং পৌছানর দরকার ছিল। উচ্চ পর্ব্বতারোহণের এক নিয়ম আছে। কিছুদিন অপেক্ষাকৃত কম উঁচু জায়গায় থেকে, হাঁটাহাঁটি করে পাহাড়ী আবহাওয়া সইয়ে না নিয়ে সমতলবাসীর বড় পর্ব্বত চড়া উচিত নয়, এই বিজ্ঞ চিকিৎসক-গণের মত।

৫ই অক্টোবর মহাষ্টমীর সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টার ও মঙ্গল-বাদ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমি এই দুর্গম পর্ব্বতারোহণের ও হিমালয়-লঙ্ঘনের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে, গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ও মহামায়ার চরণে সদ্যনিবেদিত পুষ্পবিল্বপত্র মাথায় নিয়ে সজলনয়ন আত্মীয়স্বজনের নিকট হতে বিদায় নিলাম। সেদিন বোধ হয় দেবীর এই প্রণাম মন্ত্র—

"পথি দেবালয়ে দুর্গে অরণ্যে প্রান্তরে জলে।
সর্ব্বত্র রক্ষ মাং দুর্গে, দুর্গে রক্ষ নমস্তুতে ॥"

যতটা সার্থক হয়েছিল ততটা পূর্ব্বে আর কখনও

ভারবাহী মিউলের যাত্রা—কালিম্পং হইতে

হয়নি। পর্ব্বতারোহণ কি সত্যই বিপদসঙ্কুল? তাই কি দেবীপুরাণে, "ধনং দেহি সদা গৃহে," "সংগ্রামে বিজয়ং দেহি"— প্রভৃতি বহু প্রার্থনার মধ্যে এটাও দেখতে পাই—

"পর্ব্বতারোহণে দুর্গে, দুর্গে রক্ষ নমস্তুতে ॥"

দার্জ্জীলিং মেলে রওয়ানা হ'লাম। গন্তব্যস্থান হিমালয়ের পরপারে নিগূঢ় রহস্যময় তিব্বতদেশ। পথ, জনমানবহীন ও ভয়াবহ। চারিদিকে অরণ্যানী-সমাচ্ছন্ন বন্ধুর পর্ব্বতশ্রেণী।

কিন্তু হৃদয় আনন্দ-উৎসাহে ভরা। হিমালয় লঙ্ঘন করতে যাচ্ছি! হিমালয়! ভারতমাতার "শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট" হিমালয়! "বঙ্গমাতার শিরোভূষণ চিরতুষারধবলিত" হিমালয়! যুগযুগান্তের কত শত কবির বীণার ঝঙ্কারে মুখরিত হিমালয়! সৌন্দর্য্যময়, রহস্যময়, মহিমাময়, জগজ্জন-মোহন হিমালয়! গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্রের জনক হিমালয়! হিন্দুর পরমারাধ্য দেবদেবীর লীলা-নিকেতন হিমালয়! সেই হিমালয়ের উচ্চশিখরে আরোহণ করব, তাকে লঙ্ঘন করে দুর্গম তিব্বত-রাজ্যে প্রবেশ করব, এই সব

তিস্তা নদীর পথ হইতে দৃশ্য

চিন্তা, এই সব স্বপ্ন, সারা-রেলপথ হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছিল। ট্রেণ জলপাইগুড়ি ছাড়লে পর ক্ষিপ্রগতিতে প্রসাধন সমাধা করে জানালার বাহিরে মুখ ফেরাতেই উষার অরুণ-আলোতে ভেসে উঠল চোখের সামনে, দূর নীলাকাশের গায়ে কালবৈশাখীর ঘনকৃষ্ণ মেঘরাজির মতো বিশাল পর্ব্বত-শ্রেণী, বহুবার শিলিগুড়ির পথে এদৃশ্য দেখেছি। কিন্তু আজ যেন হিমালয় নূতনরূপ ধরে এসে দাঁড়াল, প্রকৃতি ও মানবের দ্বন্দ্ব তো চিরদিন চলে আসছে, চিরদিন চলবে। পাহাড় সগর্ব্বে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে বলছে, 'হে পথিক, দাঁড়াও, রুদ্ধ তোমার পথ।' পথিকও সগর্ব্বে বুক ফুলিয়ে উত্তর দিচ্ছে—'বটে! চূর্ণ করব তোমার অহঙ্কার। বুক চিরে উঠবো তোমার মাথার ওপর, যাবো চলে অপর পারে।' কালিদাসের অমর শ্লোক মনে পড়ল:

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধিবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যামিব মানদণ্ডঃ।"

তখনও জানিনা, যে পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ সেই নগাধিরাজের উচ্চ চূড়ায় চড়তে পারবো কিনা। তবু সেদিন আমার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে যেন হিমালয় কী অপরূপ, কী মোহন সাজে এসে দাঁড়ালো।

৬ই অক্টোবর প্রাতে যথাসময় শিলিগুড়িতে এসে পৌছলাম। রেলের টিকিটের সঙ্গে সঙ্গে দার্জ্জিলিং জেলাতে প্রবেশের অনুমতি পত্র বা Exemption certificateও ষ্টেশনের ফটকে স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মচারীকে দেখাতে হোল। সুধীরবাবু কালিমপং হতে মটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই মালপত্র তাইতে তুলে দিয়ে কালিমপং অভিমুখে যাত্রা করলাম। শিলিগুড়ি হ'তে দার্জ্জিলিং অবধি যে রকম পাহাড়ী রেলপথ আছে, কালিমপংএর ৯ মাইল পূর্ব্বে 'গিলিখোলা' পর্য্যন্তও সেইরকম রেলপথ আছে। তা ছাড়া গড়ী যাবার পুরোণো রাস্তা তো আছেই। মোটরে শিলিগুড়ি হ'তে কালিমপং ৪২ মাইল পথ, তিন ঘণ্টার মধ্যেই পৌছে গেলাম। প্রথম বারো মাইল সমতল ভূমির উপর দিয়ে গিয়ে পর্ব্বতের পাদমূলে শেভক নদীর নূতন পুলে এসে পৌছলাম। পুল পার হওয়ার পর চড়াই আরম্ভ। পথের দুধারে ঘন বনানী। নীচে দুই পাহাড়ের মাঝে এক অপ্রশস্ত উপত্যকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিতা খরস্রোতা তিস্তা। রাস্তা নদীর পাশ দিয়ে বরাবর গেছে তিস্তা ব্রীজ পর্য্যন্ত। তিস্তা ও শেভকের ওপর এই দুই পুল বহু অর্থব্যয়ে প্রায় বছর দুই হোল বাঁধা হয়েছে। এতে কালিমপং যাত্রীদের অনেক সুবিধা হয়েছে। শোনা যায়, এত খরচ করে এই দুই পুল, শুধু জনকয়েক কালিমপং যাত্রীর সুবিধার জন্য সহসা বাঁধা হয়নি। ভারতের পূর্ব্বসীমান্ত রক্ষানীতির অঙ্গস্বরূপ এই দুই পুল এত সত্বর নির্ম্মিত হয়েছে, সামরিক বিভাগের সুবিধার জন্যই। যাক্ আমাদেরও সুবিধা হয়ে গেল! তিস্তা-ব্রীজ পার হয়ে, নয় মাইল লম্বা এক চড়াই ভেঙ্গে তবে রাস্তা কালিমপং সহরে প্রবেশ করেছে।

কালিমপং বৃটিশ ভারতের একদিকের সীমান্ত। এই সীমান্তের পরপারে সিকিম-রাজ্য। কালিমপং সহর একটি ব্যবসা-কেন্দ্র। একে তিব্বত দেশের বন্দর বলা যেতে পারে। ইউরোপীয় বা ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ীরা রুদ্ধদ্বার তিব্বতের ভেতরে প্রবেশ করতে পান না বটে কিন্তু, তিব্বতীয় ব্যবসায়ীরা অবাধে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে এসে তাঁদের পণ্যদ্রব্য, বিশেষ করে পশম, কালিমপংএ বিক্রয় করে যান। এবং তার বিনিময়ে কালিমপংএর বাজার হ'তে নানাবিধ অল্প-মূল্যের প্রয়োজনীয় জিনিষ আপন দেশে নিয়ে যান। অতএব এই কালিমপংকে ভারতীয় ও তিব্বতীয় ব্যবসায়ীদের প্রধান মিলনক্ষেত্র বলা যেতে পারে। কালিমপং প্রায় ৪৫০০ ফুট উঁচু। অর্থাৎ দারজিলিংএর চেয়ে প্রায় দু'হাজারে ফিট নীচু। এখানে সারা বছরে দারাজিলিংএর চেয়ে অনেক কম বৃষ্টি পড়ে। সেইজন্যে এখানকার আদ্রতাও অনেক কম। কালিমপং দারজিলিংএর মত বাংলা সরকারের রাজধানী নয় বলে এখানে জনতার কোলাহল নেই, লালপাগড়ীর হুড়োহুড়ি নেই, রাস্তায় সেলামের বাড়াবাড়িও নেই, শান্ত বিশ্রামের পক্ষে দার্জ্জিলিং অপেক্ষা কালিমপং অনেক বেশী উপযোগী। তা ছাড়া এখানের রাস্তা খুব উঁচু নীচু নয়, তাই সমতলবাসী পথিক এখানে এসে মনের আনন্দে হেঁটে বেড়াতে পারেন। ক্রোশখানেক চললেই দেহ অবসন্ন হ'য়ে যায় না। চারিদিকে ঘোড়ায় চড়বার নির্জ্জন সুন্দর পথ অনেক পাওয়া যায়।

কালিমপংএ চারদিন বন্ধুবরের ও তাঁর স্নেহময়ী জননীর আদর যত্নে যে আনন্দে কাটিয়েছিলাম, তা অবর্ণনীয়। তাছাড়া এই চারদিন হয়েছিল, আমাদের সকলের পাহাড়ে চড়বার শিক্ষানবিশী। নিয়মিত দুবেলা উঁচুনীচু রাস্তায় আমরা ছয়জন দলবেঁধে সবেগে পাদচারণা করতাম। দুই পায়ের পেশীগুলোকে আমাদের কল্পিত পর্ব্বত অভিযানের উপযোগী দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করবার চেষ্টায় প্রত্যহ অন্তত আট দশ মাইল করে হাঁটছিলাম। আমি কালিমপংএ পৌঁছবার পূর্ব্বেই দলস্থ সকলে রাণাজীর পাঠান সওয়ারীর মিউলগুলিকে পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছিলেন যে, সেগুলি শান্ত শিষ্ট, না, দুর্দ্দান্ত, বজ্জাত। দলের মধ্যে আমারই বপু সমধিক গুরুভার, তাই আমার জন্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ পশুটিই রাখা হয়েছিল।

৮ই অক্টোবর প্রাতে ভারবাহী অশ্বতরীর দল মালের বোঝা নিয়ে রওয়ানা হবার কথা। তাই ৭ই সন্ধ্যে বেলায় আমাদের সমস্ত জিনিষপত্র গোছগাছ করে রাখতে হয়েছিল। তবে আমাদের স্বহস্তে কিছু করতে হয়নি। সবই করে দিলেন কালিমপংএর বাটীর গৃহিণীরা। কল্যাণ হস্তের স্পর্শ ব্যতিরেকে বাঙ্গালীর সংসারে না আসে শৃঙ্খলা, না আসে মাধুর্য্য! আমাদের রসদের সমস্ত গোছগাছ করবার ভার নিয়েছিলেন সুধীরবাবুর জননী ও গৃহিণী। কলিকাতা হ'তে

পেশক রোডস্থ মেষপাল

আনা রসদের সামগ্রী ছাড়া অন্য যাবতীয় আহার্য্য দ্রব্য এবং তৈজসপাত্র তাঁরা দুটি বাক্সে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। চাল, ডাল, আটা ঘি, ময়দা, তৈল, লবণ, রন্ধনের মশলা, পানের মশলা, তরী-তরকারী, মায় চাকী-বেলুন, সাঁড়াশী প্রভৃতি, সমস্ত খুঁটিনাটি এমন নিখুঁতভাবে গুছিয়ে দিয়েছিলেন যে কি হিমালয়ের উচ্চচূড়ায়, কি সেই সুদূর তিব্বতে, কোথাও আমাদের গরম লুচি, গরম পোলাও, সুস্বাদু চপ কাটলেটের অভাব হয়নি। সর্ব্বত্রই পরম পরিতোষের সহিত উদর পূরণ করেছিলাম। অশ্বতর পৃষ্ঠে অধিরূঢ় হয়েও চালকড়াইভাজা চিঁড়েভাজা, পেস্তা-বাদাম ও আখরোট চর্ব্বণ করতে করতে চলেছি। পথের ক্লান্তি একটুও বুঝতে পারিনি।

৮ই অক্টোবর প্রত্যুষেই মিউলসর্দ্দার ভারবাহী অশ্বতরী-গুলিকে নিয়ে আমাদের কালিমপংএর আবাসে উপস্থিত হোল। সঙ্গে এসেছিলেন রাজা দরজীর দুজন পাহাড়ী কর্ম্মচারী। তারমধ্যে একজনই নিযুক্ত হয়েছিলেন আমাদের পথপ্রদর্শক ও দোভাষী-রূপে, নাম—শটী পিঞ্জু। এঁর ওপর রাজা দরজীর হুকুম ছিল যে ভারবাহী অশ্বতরদলের সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গ্যাণ্টকে আমাদের সঙ্গে জুট্‌বেন। সেদিন এই পথপ্রদর্শকের সঙ্গে বিশেষ আলাপের সুযোগ হয়নি। অন্য কর্ম্মচারীটির নাম গম্ফু দরজী। রাজা দরজীর Conservator of Forest, বা অরণ্য-রক্ষক এঁরা দুজনে মালপত্র

ঝুলান সেতু—মেল্লি

যথারীতি দেখেশুনে বেঁধে নিয়ে প্রত্যেক পশুর পিঠে দুইমণ বোঝা চাপাবার ব্যবস্থা করলেন। প্রত্যেক গাঁটরীর ওপর "G. B." বা ভুটান গভর্ণমেণ্টের মোহর অঙ্কিত করলেন। পশুর দল মাল নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল ন'টার সময়। সঙ্গে অশ্বতর পৃষ্ঠে চললেন, পথপ্রদর্শক শটী পিঞ্জু।

১০ই অক্টোবর প্রাতে আমাদের কালিমপং হ'তে তিব্বতের পথে বেরিয়ে পড়ার নির্দ্দিষ্ট সময়। অধিকাংশ মালপত্র আগে চলে যাওয়াতে ব্যস্ত হবার কোনও কারণ ছিলনা। আগেই বলেছি কালিমপং হ'তে গ্যাণ্টক অবধি আমাদের মোটরে যাবার কথা। ৫২ মাইল পার্ব্বত্য পথ। ভৃত্য, পাচক, ছয়জন বাবু, এক গাড়ীতে কি করে যাবে! আগের দিনই প্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী ব্যবসাদার বংশীবাবুকে গাড়ীর বন্দোবস্তের ভার দেওয়া হয়েছিল। প্রাতে যথাসময়ে দুখানি গাড়ী এসে পৌছল। একখানি রাজা দরজীর গাড়ী, নিয়ে এলেন গমফু দরজী, অন্যখানি নিয়ে এলেন বংশীবাবু নিজে। তিনি আমাদের গ্যাণ্টক অবধি এগিয়ে দিয়ে আসবেন। এই বংশীবাবু কালিমপং-এর একজন খ্যাতনামা মাড়ওয়ারী ব্যাপারী। তিরিশ বছর আগে সামান্য সম্বল নিয়ে, সুদূর মাড়ওয়ার হ'তে এসে এখানে কারবার প্রতিষ্ঠা করে আজ তিনি একজন মস্ত বড় ব্যবসায়ী। সর্ব্বপ্রকার পণ্য দ্রব্যের কেনাবেচা তো করেনই উপরন্তু তিনি তথাকার ব্যাঙ্কার ও জমীজমার মালিক। বাংলা দেশের সকল সহরেই ব্যবসাক্ষেত্রে এই মাড়ওয়ারীর প্রভাব ও বাঙ্গালীর অভাব দেখতে পাই।

যাক, বাঙ্গলার এই চিরন্তন অন্নসমস্যার সমালোচনা করে আর এই ভ্রমণকাহিনীর কলেবর বাড়িয়ে কি হবে! রোজকার চেয়ে অনেক ভোরেই আজ শয্যাত্যাগ করা গেল। সকলেরই মনে মহা উৎসাহ ও আনন্দ, কিন্তু সংশয়ও যথেষ্ট। সফলতা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারবো কি না, সে বিষয়ে নানা হিতৈষী ব্যক্তি নানা মত প্রকাশ করছেন; কেউ বলছেন, মশায়, আপনারা সুখী লোক, আপনাদের আবার এতো কষ্টস্বীকার কেন? কেউ উপদেশ দিলেন, যতটা পারবেন, ততটা যাবেন, শরীরের ওপর অযথা অত্যাচার করবেন না। কেউ পথে অনিবার্য্য বরফের ঝড়ের (blizzard) ভয় দেখালেন। কেউ বললেন, শীত বরদাস্ত হবেনা, নাথুলা পর্য্যন্ত যদি যেতে পারেন তো ফিরে আসবেন, আর এগোবেন না। এই রকম নানা জনের নানা মতের মাঝে মনে একটু সংশয় না এসেই পারেনা। তবু সাহসে বুক বেঁধে, প্রাণে উৎসাহ, মনে আশা নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল কালিমপং-এর বাড়ী হ'তে। আমাদের দলে যে চারটি তরুণ ছিল, তাদের আনন্দ দেখে কে! তাদের মনে তো আর বৃদ্ধজনোচিত শঙ্কা ছিলনা। কেবল আনন্দ, কেবল উৎসাহ! বিদায়ের পালা সেই কলকাতার মতই মর্ম্মস্পর্শী! জননী সন্তানকে ও গৃহিণী স্বামীকে ছলছলনেত্রে

বিদায় দিলেন। হে বঙ্গসন্তানের জননী! তুমি কি যথার্থই অবলা? স্নেহ-মন্দাকিনীর পীযূষধারায় ধৌত তোমার মন-প্রাণ! কিন্তু তাই বলে কি মা তুমি দুর্ব্বল সন্তানে ভালবাস? দুর্ব্বল, নিস্তেজ, প্রাণহীন সন্তান কি করে জগতে আজ তোমার মুখোজ্জ্বল করবে?

তৃতীয় কল্প—পথ

১০ই অক্টোবর গ্যাণ্টক। কালিমপং-থেকে মোটর-পথে ৫২ মাইল। শিলিগুড়ির রাস্তা দিয়ে প্রায় ৯ মাইল পথ নেবে গিয়ে, তিস্তা-ব্রীজের আধ মাইল আগে হতে গ্যাণ্টকের রাস্তা বরাবর নদীর বাঁ-কিনারা ধরে চলে গেছে। তিস্তার পুল পার হলে, দুটো রাস্তা পাওয়া যায়। বাঁদিকের রাস্তাটা গেছে শিলিগুড়ির অভিমুখে, আর অন্য-দিকের রাস্তা তিস্তা-গ্রামের ভেতর দিয়ে গেছে দার্জ্জিলিং-এ। ঐ রাস্তাকে পেশক রোড বলে। ঐটি দার্জ্জিলিং হতে কালিমপং বা সিকিম রাজ্যে প্রবেশের shortcut। দার্জ্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি ঘুরে কালিমপং যেতে প্রায় ৭৫ মাইল। কিন্তু পেশক রোড দিয়ে সবে ৩৫ মাইল। ঐ রাস্তায় নিয়মিত একটা বাচ্চা অষ্টিন্ গাড়ী আরোহী নিয়ে যাতায়াত করে। পথ সঙ্কীর্ণ, তাই বড় মোটর চলে না। কালিমপং থেকে গ্যাণ্টক যেতে হ'লে পুল পার হতে হয়না। তিস্তার পূর্ব্বপার দিয়েই যেতে হয়। কালিমপং থেকে পুলের মুখ পর্য্যন্ত ৯ মাইল রাস্তা একেবারে ৪৫০০ ফুট হতে ১০০০ ফুট অবধি নেমে এসেছে। সেখান থেকে রাস্তা উত্তরপূর্ব্ব-মুখো হয়ে তিস্তা উপত্যকার মধ্যস্থ ঘনবনের ভেতর দিয়ে পর্ব্বতের গা বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেছে। পুলের মুখ হ'তে মাত্র দেড় মাইল দূরে তিস্তা ও রঙ্গীট নদীর সঙ্গমস্থল। এই সঙ্গমের অপর পারেই সিকিমরাজ্য। দুই নদীর মিলনস্থলে রাস্তা দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে ফিরেছে। ঐ স্থান হ'তে প্রায় পনেরো মাইল নদী ও পাহাড়ের মাঝে প্রায়-সমতল, সর্পিল পথের ওপর দিয়ে আমাদের মোটর দুখানি ছুটে চলল, গ্যাণ্টকের উদ্দেশ্যে। এ রাস্তার নাম টিষ্টা ভ্যালি রোড। দূরে বহু নিম্নে উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে দুপাশের উন্নতশির ঘন বনাচ্ছাদিত পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে বেগে খরস্রোতা তিস্তা আপনার পথ আপনি খুঁজে, এঁকে বেঁকে, কোনও বাধা না মেনে, ছুটে নেমে যাচ্ছে সমতল ভূমির পানে। বহু উর্দ্ধ হ'তে তিস্তার জলস্রোত কী সুন্দরই দেখাচ্ছিল! কোথাও কাঁচের মত স্বচ্ছ, স্থির, ধীর, কোথাও বা সম্মুখস্থ শিলারাশির সঙ্গে ভীষণ-গর্জ্জনে যুদ্ধে রত। যেন পথিককে বলছে:

"ক্ষণেকের তরে দাঁড়াও পথিকবর!
হের মোর রূপ!.................."

এই রকম পনেরো মাইল টিষ্টা ভ্যালি রোড ধরে আমরা বরাবর ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত কালিম্পং মহকুমার ভেতর দিয়েই চলেছি। আর সম্মুখে দেখছি, তিস্তার অপরপারে সিকিম-রাজ্য। মাঝে মাঝে দু'একটি Suspension bridge বা ঝোলাপুল, দুই রাজ্যের মধ্যে যাতায়াতের সোজা-পথরূপে নির্ম্মিত হয়েছে। তার একটি আমরা পেলাম টিষ্টা ব্রিজ হ'তে প্রায় ৪ মাইল পথ গিয়ে, মেল্লি-গ্রামে। মেল্লি ছেড়ে আরও এগারো মাইল যাবার পর আমরা একটি ছোট পার্ব্বত্যনদী দেখতে পেলাম নাম রংপু-চু। চু শব্দের অর্থ তিব্বতীয় ভাষায় নদী। তার ওপরেও একটি ঝোলান সেতু আছে। সেতুর ওপর যে গ্রাম তার নাম রংপু এই রংপু সেতু

গ্যাণ্টক ডাকবাংলো

পার হয়ে আমরা সিকিম রাজ্যে প্রথম প্রবেশ করলাম। পুলের মুখে গাড়ী এসে দাঁড়াতেই একটি পুলিশকর্ম্মচারী, এগিয়ে দেখে নিলেন যে, যাত্রীরা ভারতবাসী কি না। কারণ বৃটিশ-ভারত হ'তে সিকিমে প্রবেশ করতে হলেই ভারতবাসী ব্যতীত সকল জাতিকেই দার্জ্জিলিঙ্গের ডেপুটি কমিশনারের নিকট হতে প্রবেশ-পত্র নিতে হয়, আর ওই পত্র ওই স্থানে দেখাতে হয়। পুল পার হয়ে সিকিমরাজ্যে প্রবেশ করবা-মাত্রই সিকিম গভর্ণমেণ্টের এক পুলিশ-কর্ম্মচারী এসে তাঁর খাতা খুলে বললেন, নাম সই করতে হবে। আমাদের দলনায়ক সুধীরবাবু নেমে নামধাম, গন্তব্যস্থান ইত্যাদি পূরণ করে দিলেন। রংপু-তে প্রবেশ করে উচ্চতার মাপ দেখলাম

মাত্র ১২০০ ফুট। ১৫ মাইল যে রাস্তা সবে দু'শো ফুট উঠেছে, তাকে সমতল বললে অত্যুক্তি হয়না। এখানে এই তিস্তা উপত্যকার গরমও বেশ, তাপমান যন্ত্রে তাপ দেখা গেল ৯২°। কালিম্পং হতে প্রায় ২৫ মাইল, রংপু একটি ছোট-খাটো পার্ব্বত্য গ্রাম। এখানে হাটবাজার আছে, মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীর গদীও আছে। রংপু ছেড়ে প্রায় ৭ মাইল গিয়ে আর একটি পার্ব্বত্য গ্রাম মিললো। তার নাম সিংটাম। এখানেও দোকান-পশার আছে। এই সিংটামে রংনি-চু বলে একটি ছোট নদী এসে মিশেছে তিস্তার সঙ্গে। রংনি-চু'র ওপর দিয়ে যে ঝোলা পুল আছে তাও পার হ'লাম। এইখান হ'তে রাস্তা তিস্তার কূল ত্যাগ করে শাখা-নদী রংনি-চু'র তীর ধরে ঋজু গতিতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠতে আরম্ভ করেছে।

গ্যাণ্টক ডাকবাংলো

রংপু ও সিংটামের মধ্যপথে একস্থানে তিস্তার কূলে গাড়ী থামিয়ে বংশীবাবু পাহাড়ের গায়ে একটি গহ্বর দেখালেন। সেটি একটি তাম্রখনির মুখ। এখনও সেই গহ্বর থেকে যে জলধারা বইচে, তার রং তাম্রবর্ণ। এই পাহাড়ে বরাবর তিস্তার গর্ভ পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ কেটে সিকিম দরবারের নিকট হ'তে পরওয়ানা নিয়ে কোনও ইংরাজ কোম্পানী খনির কাজ আরম্ভ করেন। তামা নাকি এখানে এখনো যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে বিগত মহাযুদ্ধের আরম্ভে জিনিষপত্র মহার্ঘ হওয়াতে এবং খনিজদ্রব্য সমতলে নামিয়ে নিয়ে যাবার খরচা অত্যধিক হওয়াতে, তাঁরা আর লাভ করতে পারছিলেন না। ফলে খনির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে সিকিম রাজ্যের চীফ্ এঞ্জিনীয়ার রায়সাহেব ফকীরচাঁদ জালির সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় জানতে পেরেছি, ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের পরীক্ষার ফলে সিকিম রাজ্যের বহুস্থানে তাম্রের ও অভ্রের খনির সন্ধান নাকি পাওয়া গেছে। কিন্তু সমতলে বহন করবার সুবিধামতো ব্যবস্থা না হওয়াতে আজও খনির কাজ আরম্ভ করতে কেউ সাহস করেননি। তবে সিকিম দরবারের সহিত অনেক বিজাতীয় কোম্পানীর এ বিষয়ে মধ্যে মধ্যে এখনও পত্র ব্যবহার হয়। সিকিম দরবার এখনো তাঁদের এই ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থ হ'তে প্রভূত আয়ের আশা পোষণ করেন।

সিংটাম ছাড়িয়ে কয়েকমাইল পথ যেতে না যেতে পেলাম একটি সুড়ঙ্গ। একটি পাহাড়ের গায়ে প্রায় ৪০০ ফুট সুড়ঙ্গ কেটে রাস্তা বা'র করা হয়েছে। আমাদের মোটর সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়েই চল্‌ল। মোটরের সুড়ঙ্গের প্রবেশ ও নির্গমের চলচ্চিত্র নেবার জন্য আমাদের দু'একজন গাড়ী হতে সেইখানে নামলেন। এইবার রাস্তা যে আগের চেয়ে গা' খাড়া উঠছে, তা বেশ বুঝতে পারা গেল। এইরকম ভাবে যেতে যেতে গ্যাণ্টকের প্রায় ছ'মাইল পূর্ব্ব হ'তে পথ সোজা একটি পাহাড়ের গা অবলম্বন ক'রে এঁকেবেঁকে সাপের মত উঠতে সুরু করল। বংশীবাবু বলে দিলেন, যে আমরা এইবার গ্যাণ্টকের পাহাড় চড়তে আরম্ভ করেছি। এই ছয় মাইলের মধ্যেই আমরা প্রায় ২৮০০ ফুট চড়লাম। অথচ রংপু হ'তে ২২ মাইলে আমরা মোট উঠেছিলাম ১৮০০ ফুট। বংশীবাবু সারা পথ সঙ্গে থাকাতে আমাদের বড় সুবিধা হয়েছিল। তিনি সব দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখাতে দেখাতে চলেছিলেন। যদিও মাড়ওয়ারীসুলভ ব্যবসায় বুদ্ধিতে তিনি ওই চার ঘণ্টাকাল বৃথা নষ্ট না করে সুধীরবাবুর সঙ্গে তাঁর বৈষয়িক ও মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত নানা পরামর্শ করছিলেন,—কোন্ ডোবা টাকার কিরূপে উদ্ধার হয়, কোন্ হ্যাণ্ডনোট কিরূপে তামাদি বাঁচান যায়, কোন্ মোকদ্দমা কোন্ আদালতে নালিশ যুক্তিসঙ্গত ইত্যাদি। এই ভাবে চলতে চলতে বেলা ঠিক একটার সময় আমরা পৌঁছলাম গ্যাণ্টকে। গাড়ি একেবারে ডাকবাংলোর ফটকে লাগল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

শরৎ

মনসুর-উর-রহমান

সোনার বরণী রাণী,
বন-পথে পথে উড়িছে তোমার শ্যাম অঞ্চল খানি।

অধরে ক্ষরিছে পুলক মাধুরী মূর্ত্ত হাসির ধারা,
জীবনে তোমার, শুভ্র-স্বপনে ভাব তন্ময়-হারা।

ঝাউ-শাখে শাখে চরণ ছোঁয়ায় বাজে মধু-কিঙ্কিনি,
ওগো সুষমার চির মনোরমা চিনি গো তোমায় চিনি।

নীহারের জলে সিনান করিয়া, মাখিয়া কুসুম-রেণু,
আসিয়াছো রাণী নন্দন হতে, হাতে লয়ে বীণা বেণু।

হিজলের-রঙে রাঙায়ে চরণ শ্রান্ত-মেঘের-রথে,
কুহেলির শেষে আসিয়া দাঁড়ালে রিক্ত ধরণী-পথে।

তোমার পরশে পুলকে পূরিল অন্তর-যৌবন
বনে বনে আজ পাখীদের খেলা কলগীতি গুঞ্জন।

স্বপ্ন-হরিণী কোন মায়া দেশে রূপের কাজল পরি'
কণ্ঠে দোলায়ে সোনার কমল ছিলে বল অপ্সরী?

আজি এলে তুমি বন-বাতায়নে, হাসির মাধুরী ঝরে
সমীর দোলানো ধানের গন্ধে হৃদয় আকুল করে।

নীল জলে ফোটে সাঁপলার ফুল ও তনু সুষমা মাখি
শিউলি বকুল ফুলে মালা গাঁথি মুগ্ধ হয়েছে আঁখি।

এখানে দাঁড়াও আঁখির দুলালী মালতীর স্নেহ-ছায়,
মনের হরষে বুনো-ফুলদল ঝরে তব রাঙা পায়।

দিবা বয়ে যায় কুসুম কুড়ায়ে, নেহারি ও রূপরাশি,
সন্ধ্যায় তুমি সকল ভুলায়ে বাজালে মোহন-বাঁশী।

আজিকে আবার মধু-পূর্ণিমা হাসিছে আকাশে চাঁদ,
পুলক দোলায় ভাঙিলে আমার ভরা-সাগরের বাঁধ।

যে মালা একাকী গাঁথিয়াছি রাণী, মৃদু মধু সমীরণে,
তোমার কণ্ঠে পরাইয়া দিনু চির স্নেহ বন্ধনে!

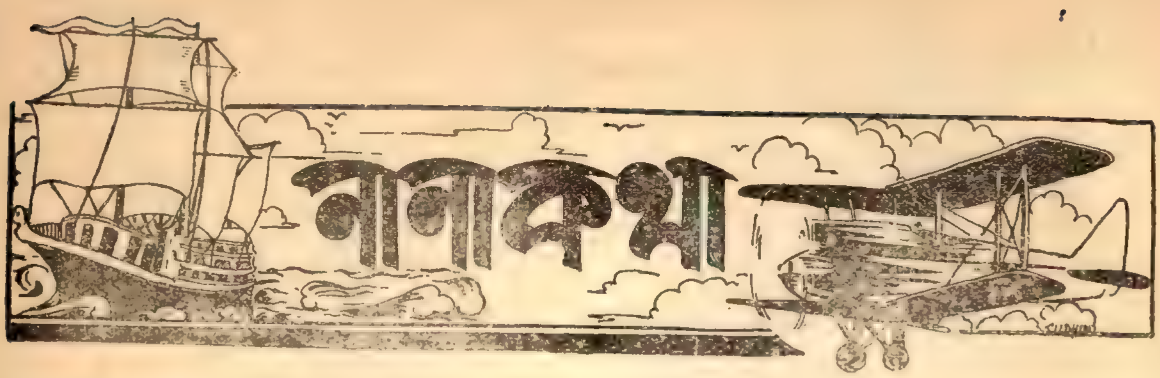

ভারতমাতা মন্দির

গত বিজয়া দশমীর দিন কাশীধামে মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক ভারতমাতা মন্দিরের দ্বার উদঘাটিত হয়; সে সময়ে সভায় শ্রীযুক্ত জবাহরলাল নেহেরু, মৌলবী আবদুল গফুর খাঁ প্রমুখ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, পার্শি, জৈন, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, এবং সকলে নিজ নিজ ধর্ম্মানুযায়ী স্বস্তিবাচন করেন।

ভারতমাতা মন্দির

এই মন্দিরে সকল ধর্ম্মের ব্যক্তি প্রবেশ ক'রে স্বীয় পদ্ধতি অনুযায়ী উপাসনাদি করতে পারবেন। মন্দিরে কোনো মূর্ত্তি স্থাপিত হয়নি, স্থাপিত হয়েছে ভারতবর্ষের একটি মর্ম্মর নির্ম্মিত বৃহৎ মানচিত্র। একটি প্রশস্ত চতুষ্কোণ হলের মধ্যস্থলে ভূমির উপর প্রায় তিন ফুট নিম্নে একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে এই রিলিফ মানচিত্রটি স্থাপিত হয়েছে। মানচিত্রের আয়তন ৩১ ফুট ২ ইঞ্চি × ৩০ ফুট ২ ইঞ্চি। স্কেল্—১ ইঞ্চি =৬-৪ মাইল; অর্থাৎ, মানচিত্রের ১ ইঞ্চি ভারতের ৬ মাইল ৭০৪ গজের সমান। ১১" × ১১" মাপের ৭৬২ খণ্ড পাথর দিয়ে মানচিত্রটি প্রস্তুত। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদজী বি-এর তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কারিকর দ্বারা এই মানচিত্র নির্ম্মিত হয়েছে। মন্দিরের ব্যয়ভার (মানচিত্র পঁচিশ হাজার টাকা এবং সৌধ পঁচাত্তর হাজার টাকা) বহন করেছেন স্থানীয় বিখ্যাত ধনী এবং কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্ত।

মন্দিরের দেওয়ালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক মানচিত্র আঁকা হচ্ছে।

বিশাল মর্ম্মর মানচিত্রের এই মন্দির যুগে যুগে দর্শকের নিকট ভারত-কাহিনীর মূক অভিব্যক্তি হ'য়ে রইল।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

আগামী ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই পৌষ রাঁচিতে উক্ত সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন হবে। বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিত্বের নিম্নলিখিত ভাবে ব্যবস্থা হয়েছে। মূল ও সাহিত্য—রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন; শিক্ষা-পাঠাগার ও সাংবাদিকী—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; ইতিহাস—শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়; অর্থনীতি—শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়; বিজ্ঞান—ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র; মহিলা বিভাগ—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী; দর্শন—ডাঃ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত; সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বসু।

সম্মেলন সংক্রান্ত সংবাদাদির জন্য অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত কালীশরণ মুখোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদকের নামে চিঠি লিখতে হবে।

সত্যেন্দ্রকুমার বসু

গত ৩রা কার্ত্তিক নূতন মাসিক পত্র "তপোবনে"র সম্পাদক সত্যেন্দ্রকুমার বসু বৃন্দাবনের পথে গাড়ি গয়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করবার কিছুপরে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬১ বৎসর হয়েছিল। সাংবাদিক-জীবনের প্রাক্‌কালে সত্যেন্দ্রকুমার "বঙ্গবাসী"র সম্পাদকীয় বিভাগে কিছুদিন কার্য্য করেন, পরে ইংরাজি সাপ্তাহিক "টেলিগ্রাফে'র সম্পাদক হন। তৎপরে "বসুমতী" পত্রিকায় যোগদান ক'রে "দৈনিক বসুমতী" এবং "মাসিক বসুমতীর" সম্পাদনা করেন। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি "মাসিক বসুমতীর" সম্পাদক ছিলেন। "বসুমতী" হ'তে অবসর গ্রহণ ক'রে তিনি বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্যমের সহিত নূতন মাসিক পত্র "তপোবন" প্রকাশিত করেন, কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় মাত্র একটি সংখ্যা "তপোবন" প্রকাশিত ক'রেই অকস্মাৎ তিনি মারা গেলেন!

সত্যেন্দ্রকুমার একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক এবং সুদক্ষ সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। সরল অমায়িক আচরণের জন্য সত্যেন্দ্রকুমার অতিশয় জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।

প্রতিবাদ

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় যে পত্রখানি আমাদের লিখেছেন সাধারণের অবগতির জন্য আমরা তা প্রকাশ করলাম। "আপনার পত্রিকার গত কার্ত্তিক সংখ্যায় যামিনী-কান্ত সেনের যে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে উহার বস্ত্রহরণ ও কালীঘাটের মাতৃমূর্ত্তি চিত্র দুইখানি আমার প্রকাশিত চিত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে। লেখকও উহার কোনো উল্লেখ আবশ্যক বোধ করেন নাই। কিন্তু আমি সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে 'বস্ত্রহরণ' চিত্রখানি—যাহা আমি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম—উহা মূল চিত্র ছিলনা। পরে আমি ইহা সংশোধিত করিয়া উক্ত পত্রিকায় লিখি যে আমার প্রকাশিত বস্ত্রহরণ চিত্রখানি মূল চিত্র নয়, উহা শ্রীগুরুসদয় দত্ত

সুতরাং বর্ত্তমানে ঐ চিত্রখানি পুনরায় কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করা একেবারে নিষিদ্ধ।"

কবি শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ

প্রায় দেড়বৎসরব্যাপী ইয়োরোপ প্রবাসের পর কবি কান্তি-চন্দ্র সম্প্রতি দেশে প্রত্যাগমন ক'রে লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের

কবি কান্তিচন্দ্র

এসিষ্টাণ্ট্ সেক্রেটারীর কার্য্যে যোগদান করেছেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি পার্লামেণ্টারী অফিসের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। সেখানকার সাহিত্যিক মহলে অলডাস হাক্সলী প্রভৃতি অনেকের সহিত তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। P. E. N. ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষও তাঁকে বিশেষ-ভাবে সম্মানিত করেন। কন্টিনেণ্টে, বিশেষতঃ ভিয়েনায়, অনেক সাহিত্যিকের সহিত তাঁর পরিচয় ঘটে। এবার তিনি ইতালীতে কয়েক মাস অতিবাহিত করেন, ইতালীয় ভাষায় বর্ত্তমান গীতিসাহিত্য হ'তে কিছু অনুবাদ করবার অভিলাষ তাঁর আছে। আশা করি বিচিত্রার পাঠকবর্গ তার

P. E. N. ক্লাবের টেবিলে কবি কান্তিচন্দ্র (ফেজ মস্তকে)

আজমীর নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনী

এবার রাজপুতানার আজমীর শহরে ৩রা অক্টোবর হতে ৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত উক্ত সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল। রাজপুতনায় এই ধরণের অনুষ্ঠান এই প্রথম। ভারতের নানা প্রদেশের খ্যাতনামা সুরশিল্পী যন্ত্রশিল্পী ও নৃত্যশিল্পীগণ এখানে সমবেত হয়েছিলেন। সমাগত গুণীবৃন্দের মধ্যে ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, নারায়ণ রাও ব্যাস, শ্রীকৃষ্ণরতনজিন্‌কর, মাষ্টার বসন্ত, মাষ্টার বাল-গন্ধর্ব্ব, প্রফেসার নাটু, নাম্নে খাঁ, ওঙ্কারনাথ, বুন্দু খাঁ, কুমারী ইভা গুহ, প্রসিদ্ধ নর্ত্তক শম্ভুপ্রসাদ, কুমারী অমলা নন্দী, মিস্ শান্তা প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

কলকাতা সঙ্গীত সম্মিলনীর সুযোগ্যা সম্পাদিকা শ্রীযুক্ত প্রমদা চৌধুরাণী উক্ত প্রতিষ্ঠানের তিরিশ জন ছাত্র ছাত্রীর সহিত বাংলাদেশের পক্ষ হ'তে আজমীরের এই সম্মিলনীতে যোগদান করেছিলেন। বাংলাদেশের পক্ষে যথার্থই আনন্দ ও গৌরবের কথা যে সম্মিলনীর প্রদত্ত অধিকাংশ স্বর্ণপদক ও রৌপ্য পাত্র (cups) বাংলার প্রতিনিধিরাই জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রত্যেক বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রতিযোগিদের পৃথক পৃথক পুরস্কারের ব্যবস্থা ক'রে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন। ধ্রুপদ গানে সঙ্গীত ভূষণ রিয়াজুদ্দিন খাঁ, খেয়াল গানে ওস্তাদ ফৈয়াজখাঁ ও রজব্ আলি খাঁ, ঠুংরী গানে গীতশ্রী কুমারী ইভা গুহ সম্মিলনীর প্রদত্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জ্জন করেছেন। যন্ত্র-সঙ্গীতে সারঙ্গী ওস্তাদ বুন্দুখাঁ ও সেতারী ওস্তাদ কিদা হোসেন খাঁ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন। নৃত্যকলায় অতুলনীয়া কুমারী অমলা নন্দী ও কাশীর নৃত্যবিশারদ নন্দলাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জ্জন করেছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশ হ'তে সমাগত গায়কবৃন্দের মধ্যে কুমারী ইভা গুহ ঠুংরী গানে কন্‌ফারেন্সের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়ায় বাঙলা দেশের মুখোজ্জ্বল হয়েছে।

ইহা ভিন্ন বাংলা দেশের প্রতিনিধিগণের মধ্যে কলকাতা সঙ্গীত সম্মিলনীর ছাত্রী গীতশ্রী গীতা দাস, আরতি দাস, ও মালা দাস কণ্ঠসঙ্গীতে কৃতিত্বের জন্য অতিরিক্ত পুরস্কার লাভে

অসাধারণ বিবেচিত হওয়ায় সম্মিলনী তাঁকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দানে সম্মানিত করেছেন। কুমারী রেণুকা মোদকের নৃত্যও চমৎকার বিবেচিত হাওয়ায় সম্মিলনী কর্ত্তৃক তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা যশ কীর্ত্তি সম্মান ও সমাদর লাভে সমর্থ হয়েছে সুরতন্ত্রের যাদুকর যন্ত্রী শ্রীযুক্ত মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সঙ্গীত সম্মিলনীর অর্কেষ্ট্রা বা ঐক্যতান বাদন। আজমীরের সঙ্গীত সম্মিলনীতে সমবেত ভারতের বহু গুণীগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মিহিরবাবুকে প্রতিদিন সম্মিলনীর অধিবেশনে এই অর্কেষ্ট্রার অনুষ্ঠান করতে হ'ত এবং তাঁহারই দল এবার সম্মিলনীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কাপটি এবং আরও ১২টি ছোট কাপ জয় করে এনেছেন।

পশ্চাতের সারি—বি, এস্ গর্গ। মিহির কিরণ ভট্টাচার্য্য। রাখাল মজুমদার। ২য় সারি—অসীমা দাস। অরুণা সেন। অনিমা বোস। বুল্‌বুল্ রায়। ৩য় সারি—অন্নপূর্ণা সেন। মন্দিরা গুপ্ত। বেল দাস। ৪র্থ সারি—গীতশ্রী গীতা দাস। গীতশ্রী ইভা গুহ। ৫ম সারি—আরতি দাস। রেণুকা মোদক। ৬ষ্ঠ সারি—কণিকা মিত্র। মাধবি দাস। অরুন্ধতী সেন। সম্মুখ সারি—অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য্য। সুধীর চক্রবর্ত্তী। ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্ত্তী।

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবেত্তা ও সঙ্গীত রচয়িতা পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। সঙ্গীত জগতের যাঁরা সংবাদাদি রাখেন তাঁরা বুঝবেন ভাতখণ্ডেজীর মৃত্যুতে কত বড় ক্ষতি হ'ল। ভাতখণ্ডেজী রচিত স্বরলিপির পুস্তক ও তন্মধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর লক্ষণগীত ও তাহার স্বরলিপি সঙ্গীত বিষয়ে অমূল্য রত্ন।

শুভ পরিণয়

সম্প্রতি (গত আশ্বিন মাসের শেষভাগে) আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাশ মহাশয়ের পুত্র বিচিত্রার খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি এস ও শ্রীমতী কমলা নাগ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি এই মিলন সর্ব্বতোভাবে শুভ ও আনন্দপ্রদ হোক।

শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস্

শ্রীমতী কমলা দাশ

Edited by Upendranath Gangali, Printed by Bishnupada Chakravarti at the Sahitya-Bhaban Press, 21, Holwel Lane, Calcutta and Published by Saratchandra Mukherjee from 27-1, Fariapooker Street, Calcutta.

বিচিত্রা

পৌষ, ১৩৪৩

বনফুল

শ্রীধীরেনকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ

CENTRAL LIBRARY
UNIVERSITY

বিচিত্রা

দশম বর্ষ, ১ম খণ্ড | পৌষ, ১৩৪৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

হৃদয়ের রাজা

শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী

বিস্ময়ে চাহিয়া আছি—হে বিরাট্ হে মহামানব।
বহিছ ব্যথার বোঝা নিজ শিরে সেই ত গৌরব।
হ কবে নিন্দা গ্লানি—
কেহ হাসে বিদ্রূপের হাসি,—
তোমারে স্পর্শেনা সে ত,
যায় নিজ দীনতা প্রকাশি'।
য ধনে হইয়া ধনী তুচ্ছ কর রাজ-সিংহাসন,
ানবের প্রাণে তাহা দিবে পাতি'
প্রেমের আসন!
গমব তোমার নাম: তুমি আজ মানবের রাজা
াত্মলোপী প্রেমে তব। ধর্ম্ম তব—সত্য তব তাজা
অন্ধানুগতিক পথে চলে নাই, তাই বুঝিল না
াষ্ট্রনীতিবিশারদ—তোমার এ অন্তর বেদনা।

কহে মোহ! ওরে মূঢ়,—বাধিলনা বলিতে এ কথা?
হেরিল না অন্ধ আঁখি দরাজ হিয়ার উদারতা?
প্রজাতুষ্টি তরে রাম আপনারে দিল বনবাস
ত্যজিল না প্রেয়সীরে—নিয়তির এই পরিহাস।
এই যদি মোহ হয—কাজ নাই মৃত জাগরণ—
এই মোহ আনে যেন জীবনের বিদ্যুৎ স্পন্দন।
তুচ্ছ মানবের মানে রাখিয়াছ উচ্চ তব শির,—
গভীর সিন্ধুর মত অটল শিখর হিমাদ্রির,—
মাথা নত হ'য়ে আসে হেরিয়া বিশাল তব হিয়া!
ত্যাগে মহীয়ান্ প্রেম চিরদিন রহিবে জাগিয়া।
আজি মহাশুভদিন,—ওরে তোরা জয়ধ্বনি বাজা
সিংহাসন ত্যজি' আসে আজ কবি-হৃদয়ের রাজা!

সুশান্ত সা'

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
ব্যারিষ্টার-এ্যাট্-ল

১

প্রায় বছর বারো পরে, একদিন শীতকালের মধ্যাহ্নে স্নান করবার জন্য আমাদের বাড়ীর পুকুরে পূবের পারের বাঁধা ঘাটের উপরের ধাপে এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় দেখ্‌তে পেলাম আমার দক্ষিণে, কিছুদূরে জলের ঠিক কিনারায় একটা ঢোঁড়া সাপ একটা ব্যাঙ ধরেছে। ব্যাঙটা থেকে থেকে একটা চাপা আর্ত্তনাদ করছে আর সাপটা ব্যাঙটাকে ধরে জলের কিনারায় ঘাসের উপর চুপ করে শুয়ে, আস্তে আস্তে ল্যাজ নাড়াচ্ছে—যেন তার জীবনের পরিতৃপ্তির চরম বিকাশ, ব্যাঙটাকে গরার মধ্যেই এই সীতের মধ্যাহ্নে রৌদ্রটুকুর নীচে পূর্ণতা লাভ করল আজ।

পৌষ মাস, দারুণ শীত। আমি ঘাটের একটা ধাপের উপর বসে পড়লাম। একটা চাকর আমার সর্ব্বাঙ্গে তেল মালিস করে দিতে লাগ্‌ল। আর আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম সাপটার পানে। একবার ইচ্ছে হ'ল সাপটাকে মেরে ব্যাঙটাকে উদ্ধার করি। কিন্তু কেমন যেন ব্যাঙটার প্রতি করুণার চাইতেও সাপটীর এই নিশ্চিন্ত উপভোগটুকুর মূল্যই বিশেষ করে বড় হয়ে উঠ্‌ল আমার প্রাণে।

তার বোধ হয় একটু কারণও ছিল। সেদিন আমার মনটা ছিল বিশেষ অশান্ত। দয়া দাক্ষিণ্যের কোনও স্থানই ছিল না সেখানে। সাপটীর দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল—জীবনটাকে ঠিক চেনা গেলনা বলেই অহিংসা হ'ল পরমঃ ধর্ম্ম। একটু চাইলেই দেখতে পাওয়া যায় চারদিকে পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাতের মধ্য দিয়েই জীবনের গতি পূর্ণভাবে চলেছে। জয় পরাজয়ই যেন জীবনের নিত্য ধর্ম্ম। আদিকাল থেকে জয়ী বেঁচেছে, পরাজিত মরেছে। প্রাণের ধ্বংসের মধ্য দিয়েই প্রাণের পরিপুষ্টি বেড়ে চলে। রোগের বীজাণু ধ্বংস হলেই রোগী বাঁচে, আবার একটী প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে গেলে আর একটীকে বলি দিতে হয় এবং সেখানে ছোট বড়র প্রভেদ করা চলে না। এই যেন মহাসৃষ্টির চিরন্তন লীলা, আদি-যুগ থেকে চলে এসেছে—চিরকালই চল্‌বে।

তবে নিজের জীবনের দিকে চেয়ে মনে হ'ল জীবন-যুদ্ধে আমি যেন ক্রমেই পরাজিত হচ্ছি। জয়ের কোন লক্ষণই যেন কোন দিকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছিল আমার জীবনের যবনিকা আমারই চোখের সামনে উঠে গেছে—শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাচ্ছি। সোজা পথ, ডাইনে বাঁয়ে মোড় ফিরবার যেন কোন প্রয়োজনই নেই। সোজা পথে মাধবপুর শ্মশানেই আমার জীবনের পরিসমাপ্তি। এখন কথা এই, সে পথটুকুও বা সরল হবে না কেন? কেনই বা পদে পদে পায় ফুটবে কাঁটা, আচ্ছন্ন করে দেবে দেহ মন? নিজের ঘরটাকে মনের মত করে সাজিয়ে তোলবার শক্তিও যেন আমার নাই, অথচ সামান্য পশুপক্ষীর মধ্যেও সে শক্তির প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। ঘরে সহধর্ম্মিণী আছেন অথচ তাঁর সঙ্গে আমার জীবনের গতি আজ পর্য্যন্ত সহজসুরে মিলিয়ে নিতে পারলাম না।

সহধর্ম্মিণী। হ্যাঁ—আমার বিবাহ হয়েছে। প্রায় এই বছর ৭।৮ হ'ল একদিন শুভলগ্নে তিনি এলেন আমার ঘরে। মনে পড়ে সেই দিন কত আকাঙ্ক্ষা কত অনিশ্চয়তার উত্তেজনায় দুরু দুরু করে কেঁপে উঠেছিল হিয়া। কত রঙেই

না রঙিন করে তুলেছিলাম জীবনের ভবিষ্যত ছবি। কয়েকটা দিন চলেছিলাম যেন এক স্বপ্নালোকে—তার চারদিকেই কেবল রূপ কেবল রস কেবল গন্ধ। কত কথাই না মনে পড়তে লাগ্‌ল। বিবাহের পর প্রথম কয়েক মাস কেটেছিলও বেশ। নিত্যই যেন নব নব রূপে জীবনটাকে সুন্দর করে তোলবার অনুপ্রেরণা ও শক্তি আমার মধ্যে অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছিল।

আমার স্ত্রীর নাম তুষারবালা। পরমা সুন্দরী সে। সুলোচনা দিদি বলেছিলেন—'পরমা সুন্দরী'। সেই কথাটী আমারই বিবাহের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়েছিল আমার জীবনে। উজ্জল গৌরবর্ণ তনুখানি, একহারা দীর্ঘ লীলায়িত ভঙ্গীর মধ্যে চারিদিকে যেন নিত্য নতুন রূপের সৃষ্টি করে। সমুন্নত নাসিকা, একটু ছোট হলেও টানা টানা দুটী চোখে ঈষৎ নীলাভ দুটী আঁখিতারা, ছোট কপালটী, একপিঠ তরঙ্গায়িত কালো চুলে ঈষৎ স্বর্ণাভা—এই সমস্ত মিলিয়ে এমন একটা প্রখর জ্যোতির সৃষ্টি হ'ত তার চারিদিকে, যেন তার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। দূর থেকে চেয়ে চেয়ে চোখ ঝলসে যায়, অবাক করে দেয় মন। মনে হয়, এত রূপও মানুষের সম্ভব!

কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই বোঝা গেল যে মনুষ্য জীবনের শান্তি কেবল চোখের পরিতৃপ্তির মধ্যেই নয়। প্রাণ মন যাতে বিশ্রাম পায় এমন একটী আশ্রয়ের দরকার; কিন্তু কই তুষারবালার রূপে সে আশ্রয়ের ত ঠাঁই ছিল না। সে রূপ চোখে দেখ্‌তেই ভাল কিন্তু তার মধ্যে বিশ্রাম নাই। তার মধ্যে নিজের প্রাণের ঠাঁই খুঁজে নিতে গেলে যেন, সমস্ত দেহমন জ্বলে ওঠে—এত প্রখর তার জ্যোতি। সাবিত্রীও ত সুন্দরী ছিল,—তার রূপে ছিল—শান্তি, আশ্রয়, বিশ্রাম। কিন্তু তুষারবালার রূপে যেন বিশ্রাম করা গেল না!

আমাদের গ্রামের বেগবতী নদীর ওপারের পথটী ধরে সোজা দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে ৫।৬ ক্রোশ গেলেই আর একটী নদীর তীরে একখানি গ্রাম পাওয়া যায়—নাম "পলতা"। এই গ্রামেরই মেয়ে তুষারবালা। তবে সে ঠিক গ্রাম্য মেয়ে নয়, বহুদূর পশ্চিমে অমৃতসর সহরে তার বাপের কি যেন বড় ব্যবসা ছিল। আমার বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে তার বাপ দূর বিদেশেই হঠাৎ মারা যান। তখন তুষারবালার দুস্থা মাতা স্বামীর সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য—অমৃতসর সহরে যা কিছু ছিল—সবই বিক্রয় করে কিছু টাকাকড়ি হাতে নিয়ে তাঁর এই একটী মাত্র কন্যাকে সঙ্গে করে নিজের গ্রামে এসে গ্রাম্য বাড়ীতে বসবাস করতে সুরু করেন। তুষারবালার বয়স তখন ১৩। অতবড় মেয়েকে গ্রাম্য নিয়ম অনুসারে ঘরে রাখা চলে না তাই তিনি চারিদিকে লোকজন লাগিয়ে তুষারবালার বিবাহের সম্বন্ধের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এবং তুষারবালার রূপের খ্যাতি মাধবপুর গ্রামে আমাদের ঘরে এসেও যে পৌঁছয় নি এমন নয়।

এমন সময় একদিন বজরা নৌকায় মফঃস্বলের মহল পর্য্যবেক্ষন করবার জন্য পলতা গ্রামের পাশের নদী দিয়ে যেতে যেতে নদীর তীরে বাবা তুষারবালাকে দেখ্‌তে পান। তুষারবালাকে দেখেই তার রূপে তিনি এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে তৎক্ষণাৎ তিনি পলতা গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগিয়ে তুষারবালার বিষয় সন্ধান করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। তিন দিন পলতা গ্রামে থেকে তুষারবালার বিষয় সমস্ত খবরা-খবর নিয়ে সেই খানেই তার মাতাকে পাকা কথা দিয়ে আসেন। এবং সেখান থেকে তিনি বাড়ী ফিরে এসে সকলকে সব কথা বলেন। তারপর দু-তিন মাস পরে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এলে, একদিন শুভলগ্নে তুষারবালার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়।

আগে আমি কিছুই জানতাম না তাই হঠাৎ বিবাহের সময় আমি যেন কেমন একরকম হয়ে গিয়েছিলাম। পরে, বিবাহের পরে স্ত্রীর অসামান্য রূপের দিকে চেয়ে চেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিলাম—আজও মনে পড়ে। আগেই বলেছি বিবাহের পরে কয়েক মাস যেন কেটেছিল স্বপ্নালোকে। জীবনের নূতন আনন্দের স্পর্শে আমি যেন রোজই নব নব পুলকে শিউরে শিউরে উঠ্‌তাম। প্রত্যেক দিন দিনের বেলায় রাত্রের শয়নটি কেমন করে নতুন রূপে সুন্দর করে তোলা যায় এই ছিল আমার একমাত্র সাধনা। মনে পড়ে কতদিন রাত্রে তুষার-

বালার শুতে আস্‌বার পূর্ব্বে তার মিষ্টি অভিমানটুকু উপভোগ করবার জন্য কপট নিদ্রার অঘোরে ঘুমিয়ে পড়তাম। তারপর তুষারবালার শয়ন কক্ষে আসার মৃদু রিন্ ঝিন শব্দে পুলকে সেই ঘুমের মধ্যেই শরীরে মনে যে কি রকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ত—আমার কপট নিদ্রাকে সংযত রাখা কঠিন হয়ে উঠ্‌ত! তারপর তুষারবালার বিছানায় নিঃশব্দে শয়ন এবং আমাকে কোনরূপ ডাকাডাকি বা ঠেলাঠেলি না করার দরুণ কতদিন প্রাণে প্রাণে যে বেদনা পেয়েছি—আজও স্পষ্ট মনে আছে।

যাই হোক এতই অভিভূত ছিল আমার প্রাণ, যে বি-এ পাশ করবার পর বাবা যখন আমাকে আরও পড়াবেন কিনা এই নিয়ে একটু ইতঃস্তত করতে লাগ্‌লেন তখন আমি—কলকাতায় পড়তে গেলে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়—এই অজুহাতে বাড়ীতে বসেই পড়ে এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মাকে দিয়ে বাবাকে অনুরোধ করিয়েছিলাম।

হ্যাঁ—একটা কথা বলা হয় নি। বিবাহের দিন রাত্রে তুষারবালার ব্যবহারে আমি যেন একটু অবাক হয়েছিলাম। ঠিক সাধারণ চল্‌তি গ্রাম্য জীবনের সদ্য বিবাহিত কন্যার ব্যবহারের সম্বন্ধে আমার যা ধারণা ছিল তুষারবালার ব্যবহারের সঙ্গে ঠিক যেন তার খাপ খায় না। তুষারবালার ব্যবহারে ছিল একটু যেন লজ্জাহীনতার পরিচয়, একটু যেন বেশী রকম অগ্রসর হয়ে যায় তার মন সাধারণের চেয়ে।

উদাহরণটা দি।

আমি ঠিক করেছিলাম বিবাহের বাসরেই স্বামী স্ত্রীর নূতন পরিচয় সুরু করব না। তার দুটী কারণ ছিল। প্রথমতঃ বাসরে নূতন পরিচয়ের চেয়ে ফুলশয্যায় নূতন পরিচয় হওয়াটাই সুন্দর—এই ছিল আমার ধারণা। দ্বিতীয়তঃ ভেবেছিলাম, নূতন পরিচয়ের নব আনন্দের প্রথম শিহরণ সংযমের মধ্য দিয়ে যতটা পেছিয়ে নেওয়া যায় ততই তার মাধুর্য্য আরও গভীর হয়ে মনকে অভিভূত করে। তারও একটু কারণ ছিল বোধ হয়। ভেবেছিলাম বিনা পরিচয়ে কেবলমাত্র সান্নিধ্যের আনন্দটুকুই, যতক্ষণ উপভোগ করা যায় ততক্ষণইবা ছাড়ি কেন। জানা নাই শোনা নাই অথচ একটা সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে সমস্ত জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক শয্যার পাশাপাশি শয়ন করে ছোট ছোট হঠাৎ লাগা স্পর্শের শিহরণে সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠার মূল্য টুকুই কি কম?

যাই হোক সে উপভোগটুকু আমার হল না। বাসরের উৎসব শেষ করে যখন আমাদের দুজনকে নিয়ে সমস্ত পৃথিবী আড়াল হ'ল, তখন কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পরই তুষারবালা যেন বড্ড বেশী আমার কাছে এগিয়ে এল! হঠাৎ ঘুমে এলিয়ে পড়ে এগিয়ে আসা নয়—বেশ সহজ সজাগ ভাবে স্পষ্ট এগিয়ে আসা। প্রথমটা আমার মনে হ'ল একটু সরে যাই। কিন্তু স্পর্শের পুলকে বোধ হয় এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে আমার নড়া চড়ার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ হ'ল। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ, পরে হঠাৎ তুষারবালাই প্রথম কথা কইলে। একটু মৃদু অথচ স্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করলে "তুমি কখন অমৃতসরে গিয়েছিলে?" আমি বললাম "না"।

বললে "বেশ জায়গা। একবার আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে?"

আমি বললাম "হুঁ"।

আমার বাকশক্তি কি লোপ পেয়েছিল? তারপর দুজনেই আবার চুপচাপ। ভাব্‌লাম আমার একটা কথা বলা দরকার। অনেক ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম "মাধবপুর গ্রামে তুমি আগে কখন এসেছ?" সে বল্‌লে "না। পলতাতেই মাত্র নৌকাকরে দুতিনবার এসেছি জীবনে।"

খুলনা থেকে নদী দিয়ে পলতাগ্রামে বরাবর সোজা যাওয়া যায়। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর আলিঙ্গনের নিবিড় স্পর্শে দুজন দুজনকে যেন হারিয়ে ফেল্‌লাম।

সেই তু প্রথম পরিচয়। তারপর মনের পরিচয় ক্র[illegible] যতই নিবিড় হতে লাগ্‌ল, ততই মাঝে মাঝে প্রাণে চ[illegible] ভাঙান এক একটা ধাক্কা যে পাইনি এমন নয় কিন্তু [illegible] কয়একমাস মোটের উপর উপভোগের আনন্দটুকুর মা[illegible] এতই বেশী ছিল যে তার মধ্যে একটু আধটু তিক্ততা যেন বুঝেও বুঝিনি। তুষারের সুন্দর তনুখানি নানান রূপে নানান রঙে সাজাবার নেশা আমাকে যেন পেয়ে বসেছিল।

ললিতকে কলকাতায় চিঠি লিখে মুখের ক্রীম, মাথার খোঁপার নানান রকম রঙিন জাল, পাউডার, এসেন্স ইত্যাদি কত জিনিষই যে মাঝে মাঝে আনাতাম তার ইয়ত্তা নাই।

ক্রমে নেশা কাট্‌ল। বিশেষতঃ একদিনের একটা ব্যবহারে বিশেষ করে প্রাণে ব্যথা পেয়েছিলাম। কি একটা উপলক্ষ্যে মনে নাই তুষারবালার মাতা তাকে বাপেরবাড়ী পাঠাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে পত্র লেখেন। তুষারবালা অবশ্য ইতিমধ্যে মাসখানেক বাপেরবাড়ী কাটিয়ে এসেছে। আমি পত্রখানি পাঠ করে বাবাকে দেখাবার জন্য মার হাতে পত্রখানি দিলাম। মা বাবাকে পত্রখানি দিয়েছিলেন। বাবা অবশ্য চিঠি পড়ে, তাঁদের কাছে না লেখার দরুণই হোক্ বা নিজের ব্যক্তিগত আপত্তির কারণেই হোক, উচ্চবাচ্য কিছুই করেন নি। ফলে বাপেরবাড়ী যাওয়া হলনা। কিন্তু বাড়ীশুদ্ধ সবাই বোধ হয় স্তম্ভিত হয়েছিল, যখন তুষারবালা কারুকে কিছু না বলে সকালবেলা স্নান করে এসেই নিজের ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল। এমন কি বেলা ৩টার সময়ও অনেক রকম ধাক্কাধাক্কির ফলে বাবা নিজে এসে নাম ধরে বারে বারে ডাকা সত্ত্বেও কিছুতেই যখন দরজা খুলল না, তখন রাগে দুঃখে লজ্জায় আমার যেন মাটীর মধ্যে মিশে যেতে ইচ্ছে হ'ল। মনে হ'ল আমার প্রচণ্ড গর্ব্বে ভীষণ ঘা লাগ্‌ল। আমার স্ত্রী—সে আমারই প্রাণের সচল গতির সঙ্গে প্রাণ মন ভাসিয়ে নিয়ে আমারই অনুভূতিগুলি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে জীবনের পথে চলবে,—এই যেন দাম্পত্য জীবনের চরম সার্থকতা। জীবন ভোর বাবাকে শুধু আমি ভয় করিনি শ্রদ্ধাও করেছি। গভীর শ্রদ্ধায় বাবার চরণে আমার প্রাণ সব সময় নুয়ে থাকৃত এবং বাবার কোনও কথা বা আদেশ অবহেলা করবার শক্তি যে কারো থাকতে পারে এমন ধারণাই আমার ছিল না। তাই বোধ হয় তুষারবালার বাবার প্রতি এই অবহেলায় প্রাণে একটা ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল সেদিন। তারপর রাত্রে শুতে গিয়ে, তুষারবালার কোন যেন একটা উত্তেজিত কথাবার্ত্তার মধ্যে আমাদের বাড়ীর প্রত্যেক লোকের প্রতি অসংযত অশ্রদ্ধায়, তার প্রতি ঘৃণায় ভরে গেল আমার প্রাণ। এবং স্পষ্ট মনে আছে সেই রাত্রের আমাদের পরস্পর সংঘাতের মধ্যে এমন একটা বিকারের সৃষ্টি হয়েছিল আমার প্রাণে, যে মনে হয়েছিল জীবনে কোন দিনই ওরকম তিক্ত হয়ে ওঠেনি প্রাণ।

যাই হোক এই সুরু হ'ল। তারপর মাঝে মাঝে প্রায়ই এটা ওটা সেটা নিয়ে পরস্পরের কুৎসিত সংঘাতের মধ্যে আমার প্রাণ একটা বিকৃত অনুভূতিতে অস্থির হয়ে উঠ্‌ত। বিবাহের ৬।৭ বৎসর পরেও সেইদিন মধ্যাহ্নে এই রকমই একটা তিক্ত মন নিয়ে স্নানের ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তাই বলছিলাম দয়া দাক্ষিণ্যের কোন স্থানই ছিল না সেদিন আমার প্রাণে।

কিন্তু মোটের উপর তখনও তুষারবালার প্রতি প্রাণের আনন্দটুকু একেবারে হারিয়ে ফেলিনি। এই সব কলহ দ্বন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে বড়ই মধুর লাগ্‌ত তাকে। এবং সত্যকথা বল্‌তে গেলে শান্তরূপে মাঝে মাঝে কমনীয়তার মাধুর্য্য চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার শক্তি তুষারবালার মধ্যে যথেষ্ট ছিল। মনে পড়ে জীবনে ২।৪ বার আমার অসুখের মধ্যে অক্লান্ত সেবায় আমার রুগ্ন শয্যার চারিদিকে এমন একটা শান্ত আনন্দের সৃষ্টি করত সে যে তখন আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে মনে আমার সৌভাগ্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তাম। এবং তুষারবালার মনের উত্তেজিত রূপের অস্বাভাবিক বিকৃতি যেন নেহাত তুচ্ছ কিছুই নয়,—এই রকম একটা ধারণায় গভীর শান্তি অনুভব করতাম প্রাণে প্রাণে।

আজ জীবনের শেষ সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে ভাবি বিবাহের ৬।৭ বৎসর পরেও যদিও প্রাণ মাঝে মাঝে মর্ম্মন্তুদ উত্তেজনায় অশান্ত হয়ে উঠ্‌ত তবুও তার গতিতে ছন্দ তখনও হারায় নি। জীবনের সুর যদিও মাঝে মাঝে প্রখর ঝঙ্কারে বিকৃত হয়ে জ্বলে উঠ্‌ত তবুও বেতালা ছিল না। তাই বোধ হয় সেদিন মধ্যাহ্নে স্নানের ঘাটে বসে বসে শীতের রৌদ্রটুকুর মধুর স্পর্শে অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে ভাব্‌তে ভাবতে প্রাণ আবার শান্ত হল। স্নান করে ঘরে গেলাম, প্রাণখানা ভরিয়ে নিলাম একটা পরিপূর্ণ দাক্ষিণ্যে।

* * * *

এই বছর বারোর মধ্যে আমাদের সংসারের উপর দিয়ে

অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। মন্টীবোঠানের মৃত্যুর পরে বছর খানেক যেতে না যেতে বাড়ীশুদ্ধ আমরা সবাই উঠে পড়ে লাগ্‌লাম দাদার আবার বিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু দাদা কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হলেন না। মা অনেক কান্নাকাটী করলেন—অনেক অনুরোধ উপরোধ—এতবড় সংসারের ভার তাঁর ভাঙাস্বাস্থ্যে তাঁর পক্ষে একলা বওয়া যে কতখানি কষ্টকর নানান কথায় নানানভাবে দাদাকে অনেক করে বোঝালেন, কিন্তু কিছুই ফল হল না। দাদার ঐ এক কথা—যে চলে গেছে তার জায়গায় আমি আর একজনকে বসাতে পারব না; না, না, কখনই না। মার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্যের কথাও দাদাকে স্মরণ করিয়ে দিতে মা একেবারেই ভোলেন নি। তার উত্তরে দাদা সহজ স্বরে বলতেন "বেশ ত সুশনের বিয়ে দাও না—তাহলেই ত আবার বৌ ঘরে আসবে, আমাকে আর জড়িও না।"

আমিও অনেকদিন দাদার সঙ্গে এ বিষয় কথাবার্ত্তা বলেছি কিন্তু কিছুই ফল হয়নি। অত ভাল মানুষ সহজ লোক দাদা তবুও তাঁর মধ্যে কেমন একটা একগুঁয়েমী ছিল যে একবার না বললে তাকে হ্যাঁ করান একরকম অসম্ভব। আমাকে বলতেন—

"দেখ সুশন তোর সেই মন্টী বোঠানের জায়গায় আর একজনকে বোঠান বানাতে তোর কষ্ট হয় না? আহা! কি ভালই না বাসত তোকে।"

এই বলে একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করে যেতেন। আমিও চুপ করে থাকতাম, দাদার ওরকম কথার উপর আর কোন কথা কইতে পারতাম না। কেবল বাবাই বিবাহের বিষয় দাদাকে কোন দিন কোন কথা বলেন নি। আমি অনেকবার মাকে বলেছি বাবাকে দিয়ে দাদাকে বলাবার জন্য কিন্তু মা বলতেন "সে উনি বল্‌বেন না। আমি অনেক বার বলে দেখেছি। বল্লে আরও ফল খারাপ হয়। সেদিন খেতে বসেছিলেন, আমি কথাটা তুলেছিলাম, কিন্তু উনি কোনও কথাই কইলেন না, আমি লক্ষ্য করে দেখ্‌লাম ওঁর যেন ভাল করে খাওয়াই হল না।"

বোধ হয় বাবা মনে ভাবতেন পুত্রের বিবাহ দেওয়া পিতার একবারই কর্ত্তব্য, দ্বিতীয়বার বিবাহ করা না করা পুত্রের ইচ্ছা; তাতে পিতার হস্তক্ষেপ করা উচিৎ নয়। কিম্বা, তিনি মন্টী বোঠানকে অত্যন্ত ভালবাস্‌তেন—গভীর ছিল সে ভালবাসা এবং বোধ হয় অত্যন্ত নিবিড় ছিল তাঁর অনুভূতি, দুএকবার জটিল জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারেও বাবার মত লোক মন্টী বোঠানকে ডেকে তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছেন বাড়ীর আর কারোর সঙ্গে নয়। এতখানি আস্থা ছিল তাঁর সেই ১৪।১৫ বছরের মেয়েটীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রতি। তাই বোধ হয় তিনি দাদার আবার একটা বিয়ের কথা ভাব্‌তে নিজের প্রাণেই কষ্ট অনুভব করতেন। যাই হোক্ তিনি দাদাকে কখনও কিছু বলেন নি। বল্লে হয়ত দাদার পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই সহজ হ'ত না।

দাদা আর বিবাহ করলেন না। এবং দাদার মধ্যে আবার এক পরিবর্ত্তনের সুরু হ'ল। যদিও এখন মাছ খান তবুও মন্টী-বোঠানের মৃত্যুর ঠিক পর হতেই একেবারে নিরামিষাশী হয়েছিলেন। এবং যতদূর মনে পড়ে বছর দুই পর্য্যন্ত মাছ মাংস একেবারে স্পর্শ করেন নি। বাহারী চুলগুলো আবার ছোট ছোট করে ছেঁটে ফেল্‌লেন এবং মন্টী বোঠানের একখানি বড় ফটোগ্রাফ নিজের শোবার ঘরে টাঙ্গিয়ে প্রত্যহ খানিকক্ষণ দরজা বন্ধ করে কি যে করতেন তা তিনিই জানেন। পূজো আচ্ছার প্রতি ঝোঁক যা ছিল তার চাইতে শতগুণ গেল বেড়ে। এবং সব চেয়ে যেটা বড় করে সবার চোখে পড়ল, সেটা হচ্ছে তিনি বাবার সঙ্গে জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখা একেবারে ছেড়ে দিলেন। স্পষ্টই বোধ হয় বাবাকে বলেছিলেন—তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে না। তাই ছুটীতে ছুটীতে যখনই বাড়ী আস্‌তাম আমাকেই বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখ্‌তে হ'ত এবং তাই বোধ হয় আমার বি-এ পাশ করবার পরে বাবা এম-এ পড়বার জন্য আমাকে কলকাতায় পাঠান নি।

ফলে দাদার ত বিবাহ হলই না, আমার বিয়ের কথাটা একেবারেই কেহ মনে আনে নি। সকলেরই আসা ছিল দাদা কালে হয়ত বা রাজী হবেন, কিন্তু আমার বিবাহ হয়ে গেলে দাদাকে আর বিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না, একথা বাড়ীর সবাই জান্‌তেন। তাই যদিও আমাদের সমাজে অল্প বয়সে

বিবাহ দওয়া বিধি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমার বিবাহ হ'ল বি-এ পরীক্ষা দেওয়ারও পরে। আর একটা মস্ত পরিবর্ত্তন ঘটেছে। প্রায় বছর দশেক জমিদারীর কাজকর্ম্ম শিখে আমি এখন জমিদারীর কাজে একরকম দক্ষতা লাভ করেছি। বাবার মত বিচক্ষণ দক্ষতা অবশ্য আমার হয়নি, এবং কোন কালেই হবে না। তবুও যেটুকু যা শিখেছি আলী মিঞাকে দক্ষিণ হস্ত করে আমিই এখন জমিদারীর কাজকর্ম্ম চালিয়ে যাচ্ছি।

কারণ, বাবা এখন আর ইহজগতে নাই। আমার বিবাহের বছর দুয়ের মধ্যেই তিনি মারা যান হঠাৎ একদিন দুপুর বেলায় খেতে বসে। উঃ! সেদিনটা কী ভীষণ দিন ছিল আমাদের অদৃষ্টে। কোন অসুখ ছিল না, দিব্যি সুস্থ মানুষ স্নান করে মধ্যাহ্নে ভিতরে এসে খেতে বসেছেন এমন সময় হঠাৎ দু এক গরাস মুখে দিতে না দিতে কেমন যেন এলিয়ে ঢলে পড়লেন। কি হল! কি হল—বলে মা চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌লেন। আমরা যে যেখানে ছিলাম সবাই ছুটে গেলাম দেখ্‌তে কিন্তু জ্ঞান আর ফিরে এল না। আলী মিঞা সদরে ছুটলেন ডাক্তার আন্‌তে। গ্রামের যে যেখানে ছিল ছুটে এল আমাদের বাড়ীতে। বত রকম টোট্‌কা ঔষধ এটা ওটা সেটা খাওয়াবার চেষ্টা করা গেল, কপালে কি একটা পাতার রস মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া হ'ল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। সদর থেকে ডাক্তার সাহেব যখন এলেন, তখন প্রায় শেষ অবস্থা। রাত্র ৯ টার সময় আমার পিতা মাধবপুরের স্বনামধন্য 'রতন সা' দেহত্যাগ করলেন। শেষ মুহূর্ত্তে একটু জ্ঞান বোধ হয় ফিরে এসেছিল। বোঁ—বোঁ—বোঁ—এইরকম একটা শব্দ মুখ দিয়ে ২।৪ বার বেরুল। মনে হল যেন কিছু বল্‌তে চান। মুখের কাছে কাণ দিয়ে কথাটা শোনবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিছুই বোঝা গেল না।

শুনেছি মৃত আত্মীয় স্বজন মৃত্যুর সময় পাশে আসে, দেখা দেয়। আমার কেমন বিশ্বাস, মন্টী বোঠান বাবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শেষ সময়। তাই বোধ হয় বাবা "বৌমা" বলে কিছু একটা বল্‌তে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা কোনদিনই স্পষ্ট হল না ইহজগতে।

মাধবপুরে একটা উল্কাপাত হ'ল। যেন প্রকাণ্ড একটা পাহাড়ের তলায় ছিল আমাদের মাধবপুর গ্রামখানি, এমন সময় হঠাৎ পাহাড়টা খসে এসে পড়ে গেল—চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রচণ্ড ফাঁকা, হু হু করছে—এইরকম একটা মনভাবে বোধ হয় সমস্ত গ্রামখানা অভিভূত হয়ে প'ড়েছিল। কিন্তু আমাকে যে কিরকম ব্যথা দিয়েছিল তার তীব্রতা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। জীবনে এতবড় আঘাত কখনও পাইনি। মন্টী বোঠানের মৃত্যুর পরে বুক ভেঙে কান্না আস্‌ত, কিছুদিন মনটা হু হু করত দিনরাত—এইমাত্র। এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু এবার! এবার যেন আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, যেন সইতে পারব না, এ সওয়া যেন অসম্ভব—একটা দিশেহারা আকুল মনোভাব। কেবল মনে হত কি করি!—এখন কি করি। জীবন সমুদ্রে যেন অথোরে তলিয়ে যাচ্ছি কোনও উপায় নাই। চারিদিকে সবই যেন বিরাট ফাঁকা, এত ফাঁকা সওয়া যায় না, দমবন্ধ হয়ে আসে।

মা যে সেই শয্যা নিলেন বোধ হয় একমাস বিছানা ছেড়ে উঠেন নি। যখন উঠ্‌লেন তখন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁকে আর চেনা যায় না। দাদার মুখের দিকে চাইলে মনে হ'ত তিনি কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছেন, যেন অসম্ভব আজ সম্ভব হল। এমন অবস্থায় যেন এ জগতে আর থাকাই চলে না।

লোকে কথায় বলে "সময় সবই সয়"। আমাদেরও সইল। এবং দাদার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করে বাবার এমন শ্রাদ্ধের আয়োজন করলাম, যে মাধবপুর অঞ্চলে কেউ কখন কোনও দিন শ্রাদ্ধে এত ঘটা দেখেনি। শ্রাদ্ধের দিনটা ব্রাহ্মণ ভোজন দান মন্ত্রপাঠ কীর্ত্তন ইত্যাদিতে যে কোন্ দিক দিয়ে কেটে গেল যেন টেরই পেলাম না। বাবার—মাধবপুরের রতনসার শ্রাদ্ধ ও অঞ্চলের লোক কেউ কখন ভোলেনি বোধ হয়। এবং আমার মনে চিরকাল সজাগ হয়ে ছিল আজও আছে। তার আবার একটু বিশেষ কারণও ছিল। ঐ দিনটাকে নিয়ে আমার প্রাণের সশ্রদ্ধ অনুভূতির সঙ্গে একটা বেদনা জড়ান আছে। যেন বাবার কাছে চিরকালের মত আমিই অপরাধী হয়ে রইলাম।

। ব্যাপারটা বলি। শ্রাদ্ধের আগের দিন সকাল বেলায়

তুষারবালা আমাকে বল্লে, "বাড়ীতে সাবান ফুরিয়ে গেছে, আজকের মধ্যেই সাবান না আনিয়ে দিলে কালকে আমার স্নানই হবে না।"

কথাটা শুনে যুগপৎ স্তম্ভিত ও দুঃখিত হলাম।

বল্লাম, "তুমি এ সময় গায় সাবান মাখ্‌ছ ?"

বল্লে, "কেন ? তাতে কি হয়েছে ?"

বল্লাম, "মাখতে নেই এইটেই বিধি ; এবং বাবার ব্যাপারে প্রত্যেক বিধিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানা হয়—এইটেই আমার ইচ্ছে।"

আমার কথার স্বরে বোধ হয় একটু ঝাঁজ ছিল। তুষারবালাও একটু উত্তেজিত স্বরে বললে,

"আমি ওসব মানিনা—যত কুসংস্কার। বাইরে ঐ সব ভড়ং দেখালেই বুঝি যত শ্রদ্ধা দেখান হয়! লোকের শ্রদ্ধা লোকের মনে, বাইরে নয়। আমার মনের খোঁজ তুমি কি রাখ ?"

আমি একটু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বল্লাম,

"তোমার মনের খবরের আমার কোনও দরকার নেই। কুসংস্কার কিনা বিচার করতেও তোমাকে কেউ বলে নি, আর সে বিচার করবার বিদ্যেও তোমার নেই।"

তুষারবালা বল্লে,

"বিদ্যে থাকুক বা না থাকুক আমি মানব না—ব্যাস।"

আমি একটু জোরের সঙ্গে বল্লাম,

"তুমি আমার স্ত্রী—মান্‌তেই হবে তোমাকে।"

তুষারবালার চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌ল, বল্লে,

"কেন ? জোর নাকি ? কিসের জোর এত শুনি—পুরুষ মানুষ বলে ?"

আমি গম্ভীরভাবে শুধু বল্লাম, "হ্যাঁ"।

উত্তেজিত স্বরে বল্লে "জোরটা বুঝি পুরুষদেরই একচেটিয়া ? যাও, তোমার সঙ্গে কথা কইতেও আমার ঘেন্না বোধ হচ্ছে।"

আমি বল্লাম, "তোমার মত মেয়ের মুখ দেখ্‌তেও আমার ঘেন্না বোধ হয়।"

কোন কথা না বলে তুষারবালা হন্‌ হন্‌ করে সেখান থেকে চলে গিয়ে সশব্দে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করলে।

অন্য সময় হলে আমি হয়ত পিছন পিছন যেতাম, জোরে ধাক্কা দিতাম দরজা, এবং কলহ যতই কুৎসিৎ হয়ে উঠুক না কেন ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু সেই দিনকার আমার মনের অবস্থার দিক দিয়ে রাগটার চাইতেও গ্লানিটা হয়ে উঠ্‌ল বড়। আমি কিছু না বলে সেখান থেকে চলে গেলাম। তুষারবালার আর কোন খবরই নিইনি সেদিন। তাঁরই ঝি সরলা ২।৩ বার দিনের মধ্যে আমার কাছে এসেছিল, যেন কিছু বল্‌তে চায়, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বিরক্তিপূর্ণ চাহনির সম্মুখে কিছুই বল্‌তে সাহস করেনি।

রাত্রে আমার মন অনেকটা শান্ত হয়েছে। একসঙ্গে শোবার বিধি নাই। তাই শুতে যাবার আগে ভাব্‌লাম, তুষারের ঘরে গিয়ে অত্যন্ত কোমল ব্যবহারে তাকে গলিয়ে একটা মিটমাট করে নেব। রাত পোহালেই যে কালকে মহাদিন।

তুষারবালার ঘরের সামনে গিয়ে দেখ্‌লাম ঘরের দরজা ভিতর হতে বন্ধ। আদর মাখান স্বরে দুএকবার ডাক্‌লাম, কোন সাড়া এলনা। তারপর ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে দরজায় একটু জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলাম, ভিতর হতে উত্তেজিত কর্কশ কণ্ঠস্বর কাণে এল—

"লজ্জা করে না ? যার মুখ দেখ্‌তে ঘেন্না হয় তার কাছে আবার কুকুরের মত এগিয়ে এসেছ ?"

শুনে শরীর মন দুই এক সঙ্গে জ্বলে গেল। দ্বিতীয় কথা না বলে সেখান থেকে চলে গিয়ে বারান্দার একপাশে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত একটুও ঘুম আসেনি। ক্রমে মন শান্ত হয়ে এল হঠাৎ ভাব্‌লাম, রাগের মাথায় রাত্রে কিছু করে বস্‌বে না ত ? কালকের মহাদিন যে সামনে। কিন্তু উঠে গিয়ে আবার খোসামোদ করবার প্রবৃত্তিও কিছুতেই হ'ল না।

পরের দিন শ্রাদ্ধের কাজকর্ম্ম সুসম্পন্ন হ'ল। তুষারবালা কাজে যে যোগ দেয় নি এমন নয়, কিন্তু সমস্ত কাজকর্ম্মের মধ্যেই এমন একটা উদাসীন তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ হতে লাগল—বিশেষতঃ আমার সামনে, যে সকলের সম্মুখে লজ্জায় দুঃখে আমার মাথা হেঁট হয়ে আস্‌ছিল। কেবল মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লাম—বাবা ত বুদ্ধিমান ছিলেন, সবই দেখে গেছেন—তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

হসন্ত-অশান্ত-সংবাদ

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অশান্ত

এস তর্ক করি।

হসন্ত

আপত্তি কি? চ'লে এস।

অশান্ত

কিন্তু কি বিষয় নিয়ে তর্ক করা যায় একটু আভাস দাও।

হসন্ত

যে কোন বিষয় নিয়ে—কেবল "পাত্রাধার তৈল" কি "তৈলাধার পাত্র" না হ'লেই হ'ল। আজকার এই সমস্যা কণ্টকাকীর্ণ পৃথিবীতে তর্কের বিষয়-বস্তুর অভাব কি! রাজনীতি সমাজনীতি কিম্বা কেবল নীতি—অর্থাৎ সুনীতি বা দুর্নীতি—তারি পাছে পাছে যৌন সমস্যা ও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, মেয়েরা কতটা স্বাধীন হ'লে পুরুষের পুরুষত্ব বজায় থাকে কিম্বা পুরুষের কত ভোল্‌ট্ প্রেম থাক্‌লে মেয়েদের নারীত্বের স্ফুরণ কেউ ঠেকাতে পারে না—তা সে সাফ্রেজিস্ট্ সোসাইটির সেক্রেটারিই হোক্ বা স্যাল্‌ভেশান আর্মির অ্যাড্‌জুট্যান্ট্‌ই হোক্—যখন তারা ভোটের চাইতে কাঁথা সেলাই বা দুনিয়ার লোকের নৈতিক খবরদারীর চাইতে শয়ন মন্দিরে মশারি খাটান greater fun অর্থাৎ বেশী মজাদার মনে করবে, আবার অন্যদিকে আর্ট সাহিত্য কাব্য নাটক নভেল ঔপন্যাসিক প্রবন্ধ বা প্রাবন্ধিক উপন্যাস ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি আজকার এই সমস্যা-সমাকীর্ণ মানব-সমাজে তর্ক করবার বিষয়ের জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছ? দুর্বার আবেগে বলতে ইচ্ছা হয়—হায় অশান্ত! যেমন আবেগ কতলু-কন্যা আয়যাও অনুভব ক'রেন নি যখন তিনি হতভাগ্য ওস্‌মানের জলজ্যান্ত হৃদ্‌পিণ্ডটা একেবারে বিধ্বস্ত ক'রে বলেছিলেন—"এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!"

অশান্ত

আচ্ছা, আধুনিক সাহিত্য তোমার কেমন লাগে?

হসন্ত

আধুনিক সাহিত্য! বস্তুটা কি?

অশান্ত

আধুনিক সাহিত্য কি জান না! তোমার এই বার্ণার্ড-শ-ঠাট্ দেখলে শৈত্যে আমার সর্দি লেগে আসে।

হসন্ত

বার্ণার্ড-শ-ঠাট্ কি দেখলে এর মধ্যে?

অশান্ত

বার্ণার্ড-শ ঠাট্ ছাড়া কি? বার্ণার্ড-শ-র যেমন সব বিষয়েই একটা নতুন ধরণের কথা কিছু বলাই চাই তোমারও প্রায় সেই রকমের ঠ্যাকার। সবাই যা জানে, যা নিয়ে চারিদিকে হৈ হৈ চৈ চৈ রৈ রৈ সেই আধুনিক সাহিত্যের কথা যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তুমি করি-বিনিন্দিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ব'লে বসলে কি না—"বস্তুটা কি?" Poseur!

হসন্ত

দ্বিতীয় রিপুটি তুমি আজও বশ আন্‌তে পারলে না দেখছি। এবং ও-রিপুটির তোমার মধ্যে এমনি ক্রিয়া যে বাংলা হিন্দি ইংরেজিতেও কুলোয় না, অবশেষে ফ্রেঞ্চ। আধুনিক সাহিত্য বস্তুটা কি আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম এই জন্যে যে "আধুনিক" কথাটা কোন সাহিত্যের বিশেষণ হতে পাবে ব'লে আমি মনে করতে পারি নে।

অশান্ত

মানে?

হসন্ত

মানে—সাহিত্যের একমাত্র বিশেষণ হচ্ছে শাশ্বত—অর্থাৎ যতটা শাশ্বত আমাদের মনের ধারণায় আসে। নইলে আসল শাশ্বত তো ব্রহ্মের মতই অনির্বচনীয় ও অমননীয়। সে যা হোক্—যা বলছিলাম—যে-লেখা শুধু আধুনিক তা

সাহিত্য নয় এবং যা খাঁটি সাহিত্য তা আধুনিক নয়। কিন্তু তোমরা যে ইতিমধ্যে সোনার পাথর-বাটি তৈরি ক'রে ব'সে আছ—চৌকো গোঁজ গোল গর্তে ঢুকিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সবাই ব'সে ব'সে তারিফ করছ "বাহারে" "বাহারে" তা কেমন ক'রে বুঝব।

অশান্ত

তবে "আধুনিক সাহিত্য" ব'লে কোন ব্যাপার নেই ?

হসন্ত

না, নেই। যেমন পুরণো প্রেম ব'লে কোন বস্তু নেই, প্রবীণা কিশোরী ব'লে কোন মেয়ে নেই, কুৎসিতা প্রেয়সী ব'লে কারো কোন দয়িতা নেই।

অশান্ত

তবে "আধুনিক সাহিত্য" কথাটার সৃষ্টি হ'ল কি ক'রে ?

হসন্ত

ও-রকম অনেক অনেক অর্থহীন কথার আমদানি হয়।

অশান্ত

যথা ?

হসন্ত

যথা—ধর এই বাংলা দেশের ফ্রি লাভ্ ম্যারেজ—অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ-বিবাহ…যাকে বলে প্রেমে-প'ড়ে বিয়ে।

অশান্ত

ওটা বাংলাদেশে অর্থহীন কেন ?

হসন্ত

কারণ ও-সব ম্যারেজের, হাত-ফস্কান দু' একটা ছাড়া, আর সবই ফ্রি ম্যারেজও নয় আর লাভ্ ম্যারেজও নয়।

অশান্ত

কি থেকে তুমি এমন কথা বলছ ?

হসন্ত

বলছি এই থেকে যে এই সব তথাকথিত ফ্রি লাভ্ ম্যারেজে মেয়ের বাপ মা আগে থেকে ছেলে পছন্দ করে আর ছেলের বাপ মা মেয়ে পছন্দ করে। তারপর ছেলে মেয়ে দুটি সুবোধ বালক বালিকার মত পরস্পরের প্রেমে পড়ে—হা হুতাশ করে—"প্রাণান্ত"র সঙ্গে "বসন্ত" কি "প্রেয়সী"র সঙ্গে "সুহাসি" মিল লাগিয়ে কবিতা লেখবার চেষ্টা করে। তারপর মেয়ের বাপের টাকা থাকলে ছেলে হ্যাট কোট প্যাণ্ট্ পরে সাহেবি কায়দা-দুরস্ত হবার চেষ্টা করে, আর ছেলের বাপের টাকা থাকলে মেয়ে নাচ গান শিখে কলাবিদ্ হবার সাধনা সুরু করে দেয়। তারপর হয় তো বিবাহ। একে আর যা-ই বল ফ্রি লাভ্ ম্যারেজ বলে না। আসলে এটা পূর্ব্বেকার বিবাহ ব্যাপারেরই একটু রঙ্-লাগান একটা রকম-ফের। পূর্ব্বরাগ বস্তুটা টবের চারা নয় যে শয়নকক্ষের বাতায়নের আলসেতে বসিয়ে বাপ মায়েরা তাতে রোজ একটু একটু জল দিলেই সেটায় কুঁড়ি ধরবে।

অশান্ত

তোমার দিব্য দৃষ্টির জ্ঞান অনুসারে কি রকম হ'লে ফ্রি লাভ্ ম্যারেজ হবার সম্ভাবনা দাঁড়ায় ?

হসন্ত

সর্ব্ব প্রথম হচ্ছে ছেলে মেয়েদের পরস্পরের সঙ্গে অবাধে মেলা মেশা করতে দেওয়া যা অবশ্য বাংলা দেশের সশংকিত পিতামাতারা কিছুতেই দিতে পারেন না। আমি বাংলা দেশের পিতামাতা নই—কিন্তু সম্ভবত সেই পিতামাতারা সাবধানের মার নেই এই কথা মনে ক'রে ধ'রে রাখেন যে প্রতি বিবাহ-যোগ্য তরুণ হচ্ছে আসলে এক একটি ডন্ জুয়ানের অবতার আর প্রতি বিবাহ-যোগ্যা তরুণী হচ্ছে এক একজন কুমারী কুন্তী দেবী। আর বিশেষ করে বয়স্থা মেয়েদের পিতামাতারা তো এটা স্বতঃসিদ্ধ বলেই মনে ক'রে রাখেন যে ষোল থেকে ছাব্বিশ বছরের মধ্যেকার পুরুষ জাতীয় মনুষ্যগণের প্রত্যেকটি হচ্ছে এক একজন potential scoundrel। হাঃ—হাঃ—হাঃ……

অশান্ত

এর মধ্যে হাসির কথা কি আছে ?

হসন্ত

এর মধ্যে হাসির কথা কিছু নেই। কিন্তু হঠাৎ অন্য একটা কথা মনে প'ড়ে গেল।

অশান্ত

কি কথা ?

হসন্ত

বার্ণার্ড শ'র "ম্যান এণ্ড্ সুপর ম্যান্"-এর একটি ব্যাপার। বইখানা পড়েছ তো? মনে আছে?

অশান্ত

পড়েছিলাম সেই সপ্তম্ এডোয়ার্ডের আমলে। সব ঠিক ঠিক মনে আছে তা হলফ করে বলতে পারি নে।

হসন্ত

ভায়োলেট ব'লে একটি মেয়ে হঠাৎ একদিন অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় এসে হাজির। কিন্তু তার বিয়ে কবে যে হোল তা কেউ জানে না।

অশান্ত

My God!

হসন্ত

কেবল My Godই নয়, great great great grand-father of my God বললেও ইমোশানের আরও অনেকখানি বাকি থেকে যায়। অন্তত সেই মেয়ের ভাইটির তখন ঠিক সেই রকমই অবস্থা। রিকি টিকি ট্যাভি অর্থাৎ অক্‌টেভিয়াস্ মেয়েটির ভাইয়ের নাম। তার তো তখন লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে মাথা একেবারে ঝুলে পড়েছে। তাদের আধা-বন্ধু আধা-মুরুব্বি র‍্যাম্‌স্‌ডেন্ ক্রোধে হিংস্রতায় উচ্চ-শির হ'য়ে উঠেছে। ভদ্র ইংরেজ পরিবারে এ কী কাণ্ড! শেষের সে দিন ভয়ংকর অর্থাৎ Last day of Judgment এসে গেল নাকি? সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা হটেনটট্‌রা দখল ক'রে নিল নাকি? কিম্বা সমগ্র ব্রিটিশ জাতিটা অষ্ট্রেলিয়ার বুশ্‌ম্যান ব'নে গেল নাকি? কে সে রাস্কেল? কে সে স্কাউন্‌ড্রেল? অবশেষে অক্‌টেভিয়াস্ বললে যে, সেই স্কাউন্‌ড্রেলকে বাধ্য করাতে হবে তার বোনকে বিয়ে করতে ক্ষতি-পূরণ স্বরূপে। সেইখানে ছিল ট্যানার অর্থাৎ বার্নার্ডশ—অন্তত বার্নার্ডশ'র একটি বিশেষ "মুড্"। ট্যানার অক্‌টেভিয়াসের প্রস্তাব শুনে তাকে বললে—তাহলে তুমি মনে কর যে সেই লোকটা সত্যি সত্যি স্কাউন্‌ড্রেল নয়। র‍্যাম্‌স্‌ডেন্ আর অক্‌টেভিয়াস্ প্রায় এক সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল—স্কাউন্‌ড্রেল নয়! একশবার হাজারবার লক্ষবার স্কাউন্‌ড্রেল—সে, তার পিতা, তাঁর পিতামহ, তার সাত পুরুষ, তার চোদ্দ পুরুষ স্কাইন্‌ড্রেল! ট্যানার তখন অক্‌টেভিয়াস্‌কে বললে—কি আশ্চর্য, তাকে এত বড় স্কাউন্‌ড্রেল জেনেও তার সঙ্গে তোমার বোনের বিয়ে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা হবে না তোমার? এই-ই হচ্ছে আমার হাসির কারণটা।

অশান্ত

হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক—মনে পড়ছে। তারপর ক্রমে প্রকাশ হ'য়ে পড়ল যে মেয়েটির সত্যি সত্যি বিয়ে হয়েছে আর সেটা তার ভাবী সন্তানের জন্মদাতার সঙ্গেই। তারপর সে মেয়েটির সবার উপর কি রাগ। তাকে সবাই দুশ্চরিত্র ব'লে ধ'রে নিয়েছিল ব'লে। কিন্তু সবার চাইতে বেশি রাগ ট্যানারের, কারণ অন্য সবাই তো তাকে দুশ্চরিত্র বলেই কেবল ধ'রে নিয়েছিল। কিন্তু ট্যানার আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল যে সে—ভায়োলেট—কোনই দোষের কাজ করে নি—সে বিশ্ব-প্রকৃতির অমোঘ আদেশই পালন করেছে সুস্থ মনে নির্ভিক চিত্তে বীরাঙ্গনার মত—তা তাতে নাই বা হ'ল গির্জায় গিয়ে দুটো মন্ত্র পাঠ বা রেজেষ্ট্রি অফিসে গিয়ে দুটো নাম সই।

হসন্ত

ঘটনাটা ঐ রকমই বটে। যাক্ সে কথা—যা বলছিলাম তাই শোন। কিন্তু আজ বাংলা দেশের সব পিতামাতারা যদি বেপরোয়া হ'য়ে তাঁদের ছেলে মেয়েদের পরস্পরের সঙ্গে অবাধে মিশ্‌তে দেনও তবুও বর্ত্তমানে কোন ফ্রি লাভ ম্যারেজ হবার সম্ভাবনা দাঁড়াবে না।

অশান্ত

ছেলে মেয়েদের অবাধে মেলা মেশা করতে দিলেও ফ্রি লভ্ ম্যারেজ হবার সম্ভাবনা দাঁড়াবে না? তুমি আবার হেঁয়ালি সুরু করলে দেখছি।

হসন্ত

না, তার কোন সম্ভাবনা দাঁড়াবে না। কারণ ফ্রি লাভ ম্যারেজ হবার প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত হচ্ছে বিবাহ সম্বন্ধে অন্যমনস্ক হওয়া। ছেলে মেয়েরা বিবাহ সম্বন্ধে অন্যমনস্ক না হ'লে ফ্রি লভ্ ম্যারেজ হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

অশান্ত

মানে? তোমার হেঁয়ালি একেবারে সাপের ওঝার মন্ত্রে এসে দাঁড়াল দেখছি। তাক্-লাগান প্যারাডক্স ছ'একটা ঝাড়তে পারলেই, তোমার ধারণা, সব কিছুই পরিষ্কার হ'য়ে গেল—উপরন্তু গ্যালারি থেকে হাততালি তো আছেই।

হসন্ত

বিশদ ক'রে বল্‌ছি তবে শোন। বাংলাদেশের মেয়েদের বার তের বছর বয়েস হ'লেই তারা—এবং ততোধিক তাদের পিতামাতারা—বিয়ের কথা ভাবতে সুরু ক'রে দেয়। তাদের পক্ষে অর্থাৎ ঐ মেয়েদের পক্ষে—ঐ একমাত্র পন্থা যাতে তারা বাঙালি-সমাজে সহজ ভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে থাকতে পারে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। তাই এমন অবস্থায় অধিকাংশ তরুণ যুবকই মেয়েদের কাছে গোড়া থেকেই "হ'লেও হ'তে পারে" স্বামী-রূপে দেখা দেবে—অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে তোমরা বলবে potential husband। এমন পরিস্থিতিতে মেয়েরা রামের সঙ্গে প্রেমে পড়বার জন্যেও যেমন প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বে, লক্ষ্মণ ভরত কি শত্রুঘ্নর সঙ্গে প্রেমে পড়বার জন্যেও ঠিক তেমনি প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বে। কিন্তু প্রেম জিনিসটা আসলে হচ্ছে একটা অতর্কিত ব্যাপার—একটা আবির্ভাব—একটা revelation—ঋষিদের চিদাকাশে বৈদিক মন্ত্রের আবির্ভাবের চাইতে একটা কম কিছু নয়। যে-আবির্ভাবে মুহূর্ত্তে জীবন হ'য়ে ওঠে অমৃত, পৃথিবী হয়ে ওঠে স্বর্গ, দিন-রাত্রি হ'য়ে ওঠে কবিতা। কিন্তু এমন আবির্ভাব কিছুতেই ঘটতে পারে না যদি মেয়েদের ও ছেলেদের মন প্রাণ বিবাহের আইডিয়া এবং স্বামী অথবা স্ত্রীর মূর্ত্তি দিয়ে আবৃত থাকে—যদি মেয়েদের মন স্বামী সংগ্রহে ও ছেলেদের মন গৃহিণীর তল্লাসে ব্যাপৃত থাকে। তাই বলছিলাম যে বিবাহ সম্বন্ধে অন্যমনস্ক অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী অর্জ্জন সম্বন্ধে নির্লিপ্ত না হ'তে পারলে ঐ প্রেমের আবির্ভাবের সম্ভাবনা জাগতেই পারে না। সুতরাং লাভ-ম্যারেজও হ'তে পারে না। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেম-সাধনায় পরকীয়া তত্ত্বের ভিতরের কথাটাও তাই। যেখানে ঘর গৃহস্থালী পাতবার কোন প্রশ্ন নেই "পুত্রার্থে ক্রীয়তে"র জন্যে কোন রকম আধ্যাত্মিক উদগ্রীবতা বা পুণ্যময় ব্যাকুলতা নেই সেইখানেই আপন ছন্দে আপনার আনন্দে সংসার ও সমাজের সকল প্রয়োজনীয়তার হিসেবকে ফল বিশেষ প্রদর্শন ক'রে প্রেমের আপনার গৌরবময় চেতনা নিয়ে আবির্ভাবের সম্ভাবনা। তবে অবশ্য এ-কথাটাও এখানে ব'লে রাখা ভাল যে ঋষির চিদাকাশে মন্ত্রের আবির্ভাব হ'তে হ'লে তাঁর অন্তরের যেমন শুদ্ধতা শক্তি ও ধারণ-সামর্থ্যের প্রয়োজন অ-ঋষির চিদাকাশে প্রেমের ঐ রকম আবির্ভাব হ'তে হলেও তার অন্তরেরও তেমনি শুদ্ধতা শক্তি ও ধারণ সামর্থ্যের প্রয়োজন।

অশান্ত

তোমার ঐ বক্তৃতা অনুসারে কারো পক্ষেই প্রেমিক হওয়া সম্ভব নয়।

হসন্ত

তোমার কথা কতকটা সত্য। প্রেমের ঐ রাজ সংস্করণ এই পৃথিবীর লোকের ভাগ্যে ঘটে না—ঘটলেও কচিৎ কদাচিৎ—"কোটীকে গোটিক"। তাই ও-প্রেমকে আমরা কেবল তর্কের বেলায় দার্শনিক আলোচনার বেলায় আদর্শের অনুসন্ধানের বেলায়, উপস্থিত করতে পারি। কিন্তু অন্যত্র সাধারণ জীবনে সর্ব্বসাধারণের বেলায় ঐ প্রেমের একটা সাধারণ সংস্করণ পেলেই আমরা খুশী—তাই নিয়েই আমরা মেতে উঠি—সনেট লিখি, নাটক লিখি, সঙ্গীত রচনা করি। ওতেই আমাদের দৈনন্দিন জীবন চলে যায়, এবং ওর আসল আদর্শটা যে কি রকমের তারও একটা আমেজ পাই।

অশান্ত

সে যা হোক, মেয়েদের মধ্যে না হোক্ ছেলেদের মধ্যে কিন্তু খুঁজলে বিবাহ সম্বন্ধে গভীর অন্যমনস্ক কিন্তু ওর পরিণতির দিক সম্বন্ধে প্রচণ্ড স-মনস্ক দু'একজন বর্ত্তমানেই পাওয়া যেতে পারে। ফ্রয়েড্ যাদের গীতা এবং হ্যাভ্‌লক্ এলিস্ ভাগবত।

হসন্ত

আমি বাঙালি সমাজের ভদ্র ছেলেদের কথাই বলেছি, ক্রিমিন্যালদের কথা নয়। ক্রিমিন্যালদের জন্যে ফ্রি লাভও

নয়, লাভ্ ম্যারেজও নয়—তাহাদের জন্যে আছে পেনাল কোড। ইন্দ্রনীলদের সাক্ষাৎ মিলবে হয় উপন্যাসে নয় জেলে নয় বলশেভিক রাশিয়ায়। তাদের স্থান বাঙালি ভদ্র সমাজে নেই—তা সে সমাজ বঙ্গ-বঙ্গই হোক্ বা ইঙ্গ-বঙ্গই হোক্ অর্থাৎ পুরোপুরি বাঙালিই হোক্ বা আধা বিলেতি আধা বাঙালিই হোক্।

অশান্ত

যারা প্রেমে বিশ্বাস করে বিবাহে বিশ্বাস করে না তাদের ক্রিমিন্যাল বলছ কেন?

হসন্ত

যতক্ষণ পর্য্যন্ত "প্রেমে বিশ্বাস করি, বিবাহে বিশ্বাস করি না" এই রকমের একটা কবিতাই কেবল থাকে ততক্ষণ ক্রিমিন্যাল বলি না। কিন্তু ঐ কবিতা যখন শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে শনৈঃ শনৈঃ গদ্যে নেমে এসে এই রকমের রূপ নেয়—"শৃঙ্গার রসে বিশ্বাস করি কিন্তু সংসার ধর্ম্মে বিশ্বাস করি না"—অর্থাৎ দৈহিক সম্ভোগ বিশ্বাস করি কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণে বিশ্বাস করি না তখন তাকে ক্রিমিন্যাল না বলে না তো কি বলবে কীর্ত্তিমান!

অশান্ত

ওঃ!

হসন্ত

মনে করো না যে দৈহিক ক্ষুধা এবং তার তৃপ্তিকে নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে আমি ভীষণ অ-নৈতিক একটা কিছু বলছি। আসলে যে একমাত্র পদ্ধতিকে আশ্রয় ক'রে মনুষ্য-সমাজ বিস্তৃত হ'য়ে উঠেছে বিরাট হ'য়ে উঠেছে, তার প্রাণের প্রদীপ যুগ যুগ ধ'রে প্রজ্জলিত রয়েছে সেটা শুকদেব বা পরম-হংসদেব এসে বললেও অ-নৈতিক হ'য়ে উঠবে না। যতদিন পর্য্যন্ত মানসপুত্রের জন্ম না হ'তে পারছে বা ল্যাবরটরিতে Synthetic বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিশু তৈরি হ'য়ে না উঠছে ততদিন পর্য্যন্ত ঐ দেহের ক্ষুধাকে নৈতিক বলেই মানতে হবে। আজ যদি পৃথিবীব্যাপী সকল পুরুষ নারীর ঐ ক্ষুধায় পেনসন্-প্রাপ্ত মুনসফের পেটের ক্ষুধার মত অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয় তবে কাল বিশ্ব-মানব মেগাথিরিয়ম ম্যাস্টডনের মতই ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যাবে আর সেখানে পরমোল্লাসে নৃত্য করতে থাকবে চড়ুই গিরগিটি কাঠ-বিড়ালাদি কিন্তু যাক্ সে সব অবান্তর কথা। সবার চাইতে বড় ক্রাইম কি জান? অসহায়ের প্রতি অত্যাচার যার পাল্টে প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা নেই! আজ যদি সমাজে পুরুষদের মত নারীদের সমান দাবী সমান অধিকার থাকত, মেয়েরা দৈহিক মানসিক বলে পুরুষদের সমকক্ষ হ'ত, পুরুষদের মতই নারীদের সর্ববিষয়ে সকল সুখ সুবিধা থাকত তবে হয় তো ঐ "ক্রিমিন্যাল, কি ক্রিমিন্যাল নয়?" এ-প্রশ্ন এমন স্পষ্ট হ'য়ে উঠত না। এবং ইন্দ্রনীলদের জীবন-কবিতা যত বড়ই অসম এবং অসহ ছন্দে হোক্ না কেন তাতে তত বড় কিছু আসত যেত না। কিন্তু আজ সমাজে মেয়েদের যে-স্থান যে-অধিকার তাতে ইন্দ্রনীলদের ও-কবিতা কবিতা নয়—স্রেফ্ গুণ্ডামি। এটা অসম্ভব নয় যে লেনিন্ ও তাঁর দল যেমন প্রলেটেরিয়েট্‌দের জন্যে পৃথিবীতে স্বর্গ-রচনা-রূপ কর্ত্তব্য নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তেমনি এমন অন্য কেউ আসতে পারেন যিনি তাঁর দলবল নিয়ে মেয়েদের জন্যে স্বর্গ-রচনাকে কর্ত্তব্য ব'লে নিজের কাঁধে তুলে নেবেন। সেদিন নিশ্চয়ই দেখা যাবে যে ইন্দ্রনীলদের কবিতার চমৎকার ছন্দ ও সুষ্ঠু মিল এসে গেছে। কেননা তখন তারা জানবে যে প্রেমের কবিতায় ও-রকম বে-পরোয়া অসম ছন্দ আর চলবে না। সেদিন নিশ্চয়ই মেয়েরা "কামিনী-কাঞ্চন"-এর পাল্টা জবাবে "পুরুষ-পামর" শব্দের সৃষ্টি করবে। এবং সেদিন যদি পুরুষরা বলে যে নারী হচ্ছে নরকের দ্বার তবে নারীরা তার পাল্টা জবাব হিসেবে নিশ্চয়ই বলবে যে পুরুষরাই বা কি এমন স্বর্গের একেবারে গবাক্ষবিহীন বাতায়ন।

অশান্ত

থাক্ থাক্ তোমার গ্যালান্‌ট্রি—ও গ্যালান্‌ট্রি আমার কাছে দেখিয়ে আর লাভ কি, যেখানে দেখালে মেহনতটা একে-বারে নিতান্ত খালি খালি মাঠে মারা যাবে না সেইখানে দেখা-বার জন্যে মজুত করে রাখ। এখন আসল কথা যা আমরা বলছিলাম সেইটে বল। আচ্ছা না হয় মানলাম যে, ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দু' জোড়া বৈবাহিক যখন পিছন ফিরে মুখ টিপে টিপে হাসছেন তখন তাঁদের ছেলে মেয়েরা আত্ম-

প্রসাদ লাভের জন্যে ফ্রি লাভ্ ম্যারেজ বাক্যটি তৈরি করেছে। কিন্তু "আধুনিক সাহিত্য" কথাটা বাংলাদেশে কে তৈরি করুল?

হসন্ত

সম্ভবত রবীন্দ্রোত্তর লেখকদের কোন মহাভক্ত।

অশান্ত

কেন?

হসন্ত

নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি নে। তবে একটা আন্দাজ করতে পারি।

অশান্ত

সেই আন্দাজটাই বল। তোমার নিশ্চয়-কথায় সত্য না থাক্, তোমার আন্দাজ-কথায় কাব্য থাকেই। তুমি যে কেন কবিতা লেখ না তাই ভেবে মাঝে মাঝে আমার আশ্চর্য লাগে

হসন্ত

তবে শোন। দোষ যত ঐ রবিঠাকুরের।

অশান্ত

দোষ রবিঠাকুরের!!

হসন্ত

ঠিক তাই। রবিঠাকুর ত অবসর গ্রহণের কোনো লক্ষণই প্রকাশ করছেন না, উপরন্তু সমানে কলম চালিয়ে চলেছেন। আর এমন কলম চালিয়ে চলেছেন যে আধুনিকদের কারও সাধ্য হ'ল না তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিতে। কিন্তু আধুনিকদের ভক্ত যারা তাদের সেই আধুনিক হিরোরা যায় কোথায়? সেই হিরোদের মান প্রতিভা মাহাত্ম্য থাকে কোথায়? তখন দিব্যি একটা কালের যবনিকা ফেলে দেওয়া হ'ল। সৃষ্ট হ'ল "আধুনিক সাহিত্য"। ভক্ত তখন সোয়াস্তির নিশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বললে—রবিঠাকুর বড় হ'তে পারে কিন্তু সে সেকেলে পুরণো প্রায়-বাতিল। আমার হিরোরা আজ আধুনিকতার আলোকে সগৌরবে দেদীপ্যমান। যবনিকার ও-ধারে কি আছে তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই। কিন্তু যবনিকার এ-ধারে আমার হিরোরা স্বরাট।

অশান্ত

তুমি কি বলতে চাও স্বরাট নয়?

হসন্ত

নিশ্চয় স্বরাট। আমাদের দেশের দেশী রাজারা যেমন স্বরাট। কিন্তু আসল কথাটা, অশান্ত, হচ্ছে এই যে, "আধুনিক সাহিত্য" "অতি আধুনিক সাহিত্য" "অতি অতি আধুনিক সাহিত্য" যে-সব নামই তোমরা তৈরী কর না কেন সাহিত্যের—অন্তত সুকুমার সাহিত্যের—অর্থাৎ কাব্য নাটক গল্প উপন্যাস—ভিতরের আসল কথাটা চিরকালই সেই "খোড় বড়ি খাড়া" আর "খাড়া বড়ি খোড়" —অর্থাৎ সেই নয়টি রস—তা সে সাহিত্য চতুর্দ্দশ লুইয়ের ফ্রান্সে ব'সেই রচনা কর বা লেনিনের রাশিয়াতে ব'সেই রচনা কর। স্বর্গের ইন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর প্রেমের বর্ণনাই কর কিম্বা বস্তির রামখেলনের সঙ্গে শ্যামপিয়ারীর পিরিতের কেচ্ছাই লেখ ভিতরের কথাটা হচ্ছে সেই এক শৃঙ্গাররস। অন্ধ মুনি তার পুত্রের জন্যেই শোক করুক কিম্বা কয়লাখাদের জমাদার তার ছেলের জন্যেই অশ্রুবিসর্জন করুক ভিতরের আসল কথাটা হচ্ছে করুণ রস। এই নয় রসের বাহিরে কোন কালেই কোন দেশেই কোন সাহিত্যিকেরই যাবার উপায় নেই—এমন কি মুসোলিনি আদেশ দিলেও নয়, হিটলার আইন করলেও নয়। সাহিত্যের আসল বিচার হচ্ছে এই রসের বিচার—সন তারিখের বিচার নয়, বা বিশেষ কোন রাজনৈতিক প্রবণতার বিচার নয়। সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে প্রেয়সীকে "অয়ি প্রাণেশ্বরি!" ব'লে ডাকলেই যেমন তা সাহিত্যে বিশেষ-কিছু হ'য়ে উঠতে বাধ্য নয়, ছেঁড়া তেনা কোমরে জড়িয়ে প্রেয়সীকে "মেরী পিয়ারী" ব'লে ডাক্‌লেও তেম্‌নি তা সাহিত্যে বিশেষ-কিছু হ'য়ে উঠতে বাধ্য নয়। আসলে স্বর্গলোক বা বস্তির লোক রূপদক্ষের বা আর্টিস্টের প্রতিভাকে প্রকাশ করবার একএকটা আধার মাত্র উপকরণ মাত্র। সাহিত্যে যে রসের প্রকাশ হয় তা ঐ সোনার মুকুট থেকেও আসে না বা ঐ ছেঁড়া তেনা থেকেও আসে না, আসে তা রূপদক্ষের অন্তরাত্মা থেকে। আমরা রূপদক্ষের অন্তরাত্মারই এক একটা বিশেষ বিশেষ রসোচ্ছল আবেগানুভূতির সংস্পর্শে আসি—ইন্দ্রেরও

নয় বা রামখেলনেরও নয়। রূপদক্ষের অন্তরাত্মার এই যে রস-আবেগ তার—ঐ অন্তরাত্মারই মত—যেমন কোন জাত নেই তেম্‌নি কোন বয়েসও নেই। সুতরাং "আধুনিক সাহিত্য" "অতি আধুনিক সাহিত্য" ইত্যাদি বচনগুলির দিক থেকে কোনই সার্থকতা নেই। আমরা যে কিং লিয়ারের পাশে জিন্ ভাল্‌জিন্‌কে তুলে ধরতে লজ্জা পাই সে তার কারণ এ নয় যে কিং লিয়ারের তুলনায় জিন্ ভাল্‌জিন্ আধুনিক কিম্বা জিন্ ভাল্‌জিনের জন্ম প্রলেটেরিয়েট্ বংশে। তার কারণ হচ্ছে এই যে রূপদক্ষের চেতনার রস-কুণ্ডে অবগাহন ক'রে ও দুই-ই শিল্পের জগতে এক গোত্র পেয়েছে সুতরাং এক পংক্তিতে ওদের বসবার কোনই বাধা নেই।

অশান্ত

বাপ্ রে বাপ্! বেচারা আধুনিক সাহিত্যকে নিয়ে তুমি যে একেবারে ক্ষেপে যাবার জোগাড় হ'লে দেখছি। ঐ যে তোমার হাতের কাছে গোলাপ জলের বোতলটা আছে, না হয় একটু মাথায় দিয়ে নাও। কিন্তু তুমি যে এতক্ষণ রস রস ক'রে একেবারে দশা-প্রাপ্ত হবার মত হ'লে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে আধুনিক একটা চিন্তা-ধারা তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত এসে পৌছয় নি।

হসন্ত

কোন্ চিন্তা-ধারা? তোমাদের মুখে "আধুনিক" শব্দটা শুনলেই আমার মুখমণ্ডলের মাংসপেশীগুলো হাসবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। মনে হয় না জানি তোমরা আবার কোন্ ষষ্টির উল্‌টো দিক্ কসে ধ'রে ব'সে আছ।

অশান্ত

কথাটা হচ্ছে এই যে গল্পে উপন্যাসে কেবল সেই রস এ-কালে আর চলবে না। আমাদের মন আর এখন সেই সেকালের লোকদের মত তেমন শিশু-মন নেই। এখন আমরা রীতিমত সাবালক। এখন আমাদের কত কাজ কত তর্ক কত সমস্যা কত গবেষণা। এখন আমাদের আনতে হবে গল্পে উপন্যাসে তাই নানা তর্ক নানা গবেষণা নানা সমস্যার সমাধান নানা প্রশ্নের মীমাংসা। গল্পে বা রসের চবিকাঠি মুখে দিয়ে দিন কাটালে আর চলবে না।

হসন্ত

অর্থাৎ এক কথায় আর্ট আর রসিকজনের কারবার থাকবে না, তা হ'য়ে উঠবে পণ্ডিত লোকের চরবার ক্ষেত্র। ও-সব মায়া অশান্ত, সব মায়া।

অশান্ত

মায়া?

হসন্ত

যেমন মায়া আজকালকার বাঙালি মেয়েদের চিন্তা যে তাদের পক্ষে আঠার কুড়ি বছর বয়েসে পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়সের একটি টুক্‌টুকে বরের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে ঘর সংসার করার চাইতে জীবন ভ'রে কোন শুল্ক-আদায় আফিসে কেরানিগিরি বা কোন ব্যাংকে টাইপরাইটারে কাজ করা বেশি সুখের বেশি সত্যের ও বেশি স্বাধীনতার।

অশান্ত

তুমি—তুমি হসন্ত, এই রকমের কথা বলছ?

হসন্ত

হ্যাঁ—আমি—আমি হসন্ত ধীর চিত্তে স্থির মনে শীতল মস্তিষ্কে দেহে ফারেন্‌হিটের অষ্টানব্বই দশমিক চার ডিগ্রি উত্তাপ নিয়ে এই কথা বলছি। পুরুষ নারীর অন্তরের স্নেহ প্রেম ভালবাসা কবিতা রোমান্স্ ইত্যাদি অতি প্রাচীন ব্যাপারগুলি এই প্রগতির যুগে না হয় একেবারে বাদই দিলাম—ও-সবের হিসেব গণনার মধ্যে না এনেও তুমি কি মনে কর অশান্ত যে if worst come to the worst কোন কিশোরী মেয়ের পক্ষে ত্রিশ পঁচিশ বছরের যুবক বলিষ্ঠ স্বামীর জন্যে দু'তিন-ঘণ্টা মাথার চইতে খুখুড়ে আশী বছরের বুড়ো কোন ব্যাংকের ডিরেক্টারের জবানি চিঠি দৈনিক পাঁচ সাত ঘণ্টা ক'রে টাইপরাইটারে কপি করা বেশি প্রাণ-জুড়ান ও মন প্রাণ আত্মার বেশি উন্নতি-বিধায়ক? তোমাদের বায়লজি ও সাইকলজি কি বলে? বেশ করে ভেবে উত্তর দিও অশান্ত।

অশান্ত

তোমার প্রশ্নটা একটু জটিল—চট্ ক'রে উত্তর দেওয়া যায় না।

হসন্ত

অর্থাৎ আসল কথাটা বলতে ভয় পাও পাছে তোমাদের প্রিয় থিওরিগুলোর গায়ে আঁচড় লাগে। আর একটা মুস্কিল বা মজা—যা মনে কর—কি হয়েছে জান? বাংলাদেশের স্কুল কলেজের প্রতি ছাত্রীর মানস-চোখের সাম্‌নে এই দুটি ছবি ভেসে বেড়ায়—প্রথমটি হচ্ছে ঘর সংসার করা মানে একটি ঘোমটা-ঢাকা কনে বউ চার দেয়ালের মাঝে সারা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে রাঁধা বাড়া শোয়া আর শোয়া রাঁধা বাড়া নিয়ে—আর দ্বিতীয় হচ্ছে স্বাধীনতা মানে ডেম্‌লার বা মিনার্ভা কারে চ'ড়ে সারা জীবন গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়ান। বলা বাহুল্য ওর প্রথমটি যেমন ঘর সংসারের শাশ্বত চিত্র নয় দ্বিতীয়টিও তেমনি স্বাধীনতার সুলভ-লভ্য অবস্থা নয়। ঘর সংসার করেও গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়া যায় মিনার্ভা বা ডেম্‌লার কার নাও থাকে যদি। আবার ডেম্‌লার বা মিনার্ভা যদি সুলভ-লভ্যই হ'য়ে পড়ে তবে তাতে ক'রে সারা জীবন গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়ানই যে পরিপূর্ণ সার্থকতা বহন ক'রে আনবে তাও নয়। রবীন্দ্রনাথের "গুপ্তধন" গল্পটা মনে আছে তো?

অশান্ত

আছে।

হসন্ত

খালি সোনার যেমন কোন মূল্য নেই, সমস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে সোনা যেমন মাটির ঢেলারই সামিল—তেমনি কেবল স্বাধীনতা কেবল নিজ পায়ে দাঁড়ানর কোন সার্থকতা নেই। স্বাধীনতা যখন আর সব কিছুই থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন যে তা কেবল অর্থহীন তাই-ই নয়, তা আত্মার পক্ষে মারাত্মক। কেননা আমরা বেঁচে থাকি বস্তু ঐশ্বর্য্যের শক্তিতে নয়—আত্মার রসের ঐশ্বর্য্যে। আর এই যে আত্মার রস, তা আমরা পাই সোনা থেকে নয় রূপা থেকে নয়, ট্রাম রেলওয়ে বা মিনার্ভা কার থেকে নয়, শুল্ক-আদায় আফিসের চাকুরি থেকে নয়, ব্যাংকের টাইপ-রাইটার থেকে নয় এমন কি রেস্তোরাঁর চপ্ কাট্‌লেট বা সিনেমা-গৃহের চার্লি-চ্যাপ্‌লিন্ কিম্বা—সেই যে ম'রে গেছে, কি নামটা তার? যার জন্যে আমেরিকান্ মেয়েরা বৃন্দাবনের গোপিনীদের মতই উন্মাদ হ'ত, রুডল্‌ফ্ ভ্যালন্‌টিনো বুঝি নামটা—চার্লি-চ্যাপলিন বা সেই রুডল্‌ফ্ ভ্যালেনটিনো থেকেও নয়, তা পাই আমরা রক্তমাংসে গড়া আর দশ জনেরই অন্তরাত্মা থেকে। অশান্ত, মানুষের সবার চাইতে আনন্দের সামগ্রী উপভোগের উপাদান হচ্ছে মানুষ—মানুষের আত্মার স্পর্শ। আত্মার এই স্পর্শ যেখানে যত গভীর আমাদের পুলকও সেখানে তত বেশি, সার্থকতাও সেইখানে তত পূর্ণ। তাই প্রেমে এমন আনন্দ সখ্যে এমন সরসতা বাৎসল্যে এমন আকর্ষণ। আর এদের ক্ষতিপূরণ কোন সিনেমার চার্লি চ্যাপলিন বা কারখানার মোটরগাড়ী করতে পারে না। বাঙালি মেয়েরা যতদূর প্রগতিশীল হওয়া সম্ভব হোক্ লিপ্‌স্টিক্ ঠোঁটে ঘষুক, পিঠ-খোলা স্নান-সজ্জায় সজ্জিত হোক্ এমন কি নিউডিস্ট্ সোসাইটিতে ভর্তি হয় হোক্ কিন্তু স্বামী ও সন্তান ছাড়্‌লে তারা ঠকবে। আর এ-ঠকা হবে বিশ্ব-বিধাতার হাতে ঠকা। সুতরাং এর ক্ষতিপূরণ আর কোন খানেই মিলবার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য যদি না মেয়েরা সবাই এক এক জন ত্রৈলঙ্গস্বামী হ'য়ে উঠে—ব্যাকরণ ঠিক রেখে স্বামিনী বলাই অবশ্য উচিত।

অশান্ত

তুমি আবার মেয়েদের নিয়ে লম্বা বক্তৃতা সুরু ক'রে দিলে দেখছি। বাঙালি মেয়েদের স্বামী-বিমুখ হ'তে—যদি কোন দিন হয়—এখনও পাঁচ সাত শ' বছর দেরি আছে। আর বাঙালি মেয়েদের কথাই বা শুধু কেন! সেদিন কাগজে দেখলাম যে ইংল্যাণ্ডে এ-বছর গেল বছরের চাইতে বেশি সংখ্যার বিয়ে হয়েছে। আর সে-বিয়ে ইংরেজ পুরুষ আর ইংরেজ মেয়ের মধ্যেই হয়েছে—আবিসিনিয়া থেকে মেয়ে আমদানি ক'রে হয় নি। কেবল তাই নয় সেই বিবাহিতাদের মধ্যে ষোল বছুরে কয়েকটি বালিকাও (বিলেতি মতে) ছিল। সম্ভবত ইয়োরোপে ইটালিই আজকাল 'a la mode—অর্থাৎ ফ্যাশান। তাই ওদের বিয়েটাও বোধ হয় রোমিও জুলিয়েতের বয়েসের দিকে এগিয়ে চলেছে। জুলিয়েতের বিয়ের ঘটকালি, জান, আরম্ভ হয় যখন তার বয়েস চোদ্দ। একেবারে প্রায় সনাতন হিন্দু ব্যাপার। সুতরাং ও নিয়ে তোমার মাথা গরম করবার এখন কোনই

দরকার নেই। কথাটা হচ্ছিল উপন্যাসে কথা-বস্তুর আধিপত্য নিয়ে, রসের দিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়ার কথা নিয়ে।

হসন্ত

জান বোধ হয় সেকস্‌পীয়াব সম্বন্ধে এই একটা বাদানুবাদ আছে যে সেকস্‌পীয়াবের নাটকগুলি সেকস্‌পীয়াবের লেখা নয়, অন্য কোন মহাপণ্ডিত ব্যক্তির রচনা।

অশান্ত

জানি।

হসন্ত

আমাদের দেশেও হয় তো কোনকালে কেউ এমন প্রমাণ করতে পারেন যে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়, তা ব্রজেনশীল বা বিনয় সরকারের রচনা।

অশান্ত

হাঃ—হাঃ—হাঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ—তোমার মাথায় যত সব আজগুবি কল্পনা আর উদ্ভট ফক্কুড়ি এসে জোটে!

হসন্ত

সে যা হোক্—সেকস্‌পীয়াব নিয়ে ঐ বাদানুবাদ সম্বন্ধে কোন রসিক পুরুষ রসিকতা ক'রে বলেছেন এই কথা যে—

The dramas of Shakespeare were not written by Shakespeare but by somebody else whose name was Shakespeare। উপন্যাস সম্বন্ধেও দেখ্‌ছি ওর চাইতেও ভাল রসিকতা করা যায়।

অশান্ত

কি রকম?

হসন্ত

কোন রসিক পুরুষ বলতে পারেন এই রকমের কথা যে, আমরা এতদিন যে-সব গ্রন্থকে উপন্যাস ব'লে জেনে এসেছি সে-সব গ্রন্থ উপন্যাস নয়—উপন্যাস হচ্ছে সেই সব গ্রন্থের নাম যে-সব গ্রন্থ উপন্যাস নয়।

অশান্ত

তোমার রসিকতা যুক্তি নয়—তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।

হসন্ত

তা হয় না বটে। কিন্তু যদি কেউ গুরু গম্ভীর ভাবে বলেন যে যেখানে নানা প্রশ্ন নানা সমস্যা নানা গবেষণা নানা সমাধান ইত্যাদির আমদানি করা হয় নি সেখানে চল্‌ছে নিতান্তই একটি শিশু-মনের ব্যাপার তাহলে এ-কথা বল্‌তে হয় যে চিত্র-বিদ্যা ও সঙ্গীত-শিল্প একটা চিরকেলে শিশু-মনের ব্যাপার। কেননা ঐ দুই ব্যাপারে কোনকালে কেউ উক্ত সামাজিক প্রশ্ন অর্থনৈতিক সমস্যা বা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ইত্যাদি রূপ মহান্ মহান্ বিষয়গুলি প্রবেশ করাবার কথাই ভাব্‌তে পারবে না—অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ কেউ। তাহলে মোনালিসার ছবির সামনে বা বুদ্ধের মর্ম্মরমুর্ত্তির সাক্ষাতে যখন আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত হ'য়ে যাই তখন আমরা নিশ্চয়ই শিশু বনে যাই। কেবল তাই-ই নয়, তাহলে বল্‌তে হয় যে মানুষের জীবনে যা কিছু গভীর তা সবই শিশু-মনের ব্যাপার। মাতৃ-হৃদয়ের সন্তানের জন্য আকুলতা বা রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা ও দুই-ই শিশু-মনের ব্যাপার। কেননা ও-দুয়ে না আছে কোন তর্ক না আছে গবেষণা বা না আছে কোন বাগ-বিতণ্ডা। তাহলে বল্‌তে হয় যে জীবনের সাবালকী পরম সার্থকতা হচ্ছে গোলদীঘিতে গলা-ফাটান ধর্ম্মঘটের বক্তৃতায়, আর চরম গভীরতা হচ্ছে ভাটপাড়ার "পাত্রাধার তৈল" না "তৈলাধার পাত্র" এর তুমুল তর্কবিতর্কে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে—উপন্যাস রচনাকে আর্টের অন্তর্গত ব'লে স্বীকার কর তো?

অশান্ত

ত করি।

হসন্ত

তবে উপন্যাসে তর্ক গবেষণা প্রশ্ন সমস্যা ইত্যাদি যত খুশি আমদানি কর কিন্তু সেটাকে ঔপন্যাসিক প্রগতি নাম দিও না।

অশান্ত

কিন্তু কেন?

হসন্ত

কারণ প্রশ্ন সমস্যা ইত্যাদি ব্যাপার গুলো আমাদের মন ও বুদ্ধির কারবার, আর এই মন ও বুদ্ধি আমাদের চেতনার একটা অত্যন্ত বাইরের অংশ—অগভীর স্তরের একটা মজা। তর্কে বা গবেষণায় বা ইউক্লিডের একস্ট্রা কষায় যে কোন ভোগ নেই তা নয়। কিন্তু আমরা আর্টে চাই গভীর চেতনার একটা কিছু সত্তা-যার অস্তিত্ব মাত্রেই

আনন্দের—তর্ক না ক'রে প্রমাণ না দিয়ে। এইখানেই আমাদের গভীর সত্তার সঙ্গে আর্টিষ্টের গভীর সত্তার তথা সৃষ্টির নিগূঢ় সত্যের পরিচয়। বলা বাহুল্য তর্ক বা গবেষণা বা পরের ভাল করবার ইচ্ছা অথবা উপকার করবার বাসনা ইত্যাদি অদৃশ্য না হ'লে অর্থাৎ বাক্যের বহির্মুখীনতা ও কর্মের বহির্মুখীনতা থেমে না গেলে এই গভীর চেতনার প্রকাশ হবার কোন সম্ভাবনা জেগে ওঠে না। তাই এই তর্ক গবেষণা কিম্বা বিশ্ব-মানবের একটা মহা উপকার করবার উদ্‌ভ্রান্ত বাসনা ইত্যাদিরূপ পরোপকার ব্রত অবসর গ্রহণ না করলে ভগবানেও যেমন সিদ্ধি নেই আর্টেও তেমনি সিদ্ধি নেই। এই মন বুদ্ধি যেখানে সক্রিয় সেখানে উইলিয়াম ক্লিসোল্ডের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়—আর ঐ গভীর অন্তরের রস-চেতনা যেখানে প্রবুদ্ধ সেখানে সৃষ্ট হয় ফর্‌সাইথ্ সাগার। আর আমরা ভাগবৎ-জ্ঞান লাভ করতে হ'লে যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংসেরই কাছে যাই শশধর তর্কচূড়ামণির কাছে নয়, তেমনি ঔপন্যাসিক-রস উপভোগ করতে হ'লে ফর্‌সাইথ্ সাগাই টেনে নেই উইলিয়াম ক্লিসোল্ড নয়। এখন উপন্যাসকে যদি আর্টের ব্যাপার বলে মানো তবে সেই আর্টের বিচারে ফর্‌সাইথ্ সাগার চাইতে উইলিয়াম ক্লিসোল্ডের উঁচু আসন হবার কোন সম্ভাবনা নেই। আসলে আর্টকে তুমি নীচুস্তরে অর্থাৎ তর্কাতর্কি বাকবিতণ্ডার জগতে টেনে এনে তাকে উঁচু ব'লে চালাতে পার না কিম্বা অগভীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে তাকে গভীর ক'রে দেখাতে পার না। "শেষ প্রশ্ন" যত পাণ্ডিত্যপূর্ণই হোক্ না কেন "শ্রীকান্ত" তার চাইতে চিরকাল বেশি কান্তিমান হ'য়েই থাক্‌বে। রোঁম্যা রোলা নোবেল প্রাইজই পান আর যাই করুন তাঁর বহু ঊর্দ্ধে চিরকাল জল্ জল্ করতে থাকবে বাল্‌জাক্ বা মোঁপাসাঁ। "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় দেশের দুঃখে কবির আত্ম-নিবেদন যতই আমাদের প্রাণ স্পর্শ করুক না কেন—তার বহু ঊর্দ্ধে চিরকাল এক খণ্ড হীরকের মত জ্বলতে থাকবে তাঁর "সাজাহান" যেন একটা আবির্ভাব—একটা revelation। আমরা "সাজাহান" ও রবীন্দ্রনাথের আরও বহু বহু কবিতা পড়ি আর রঙ্গময়ী কল্পনাকে ধন্যবাদ দি যে সেই সুবোধ ও রসজ্ঞ মহিলাটি সত্যি সত্যি রবীন্দ্রনাথকে চির-কালের জন্যে তাঁর প্রার্থনা মত ফেরান নি—হাতের বাঁশিটি কেড়ে নিয়ে তাঁর হাতে মাটি কোপাবার কোদাল তুলে দেন নি—ভগবানকে ধন্যবাদ যে শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতনকে গ্রাস করে নি। এই হচ্ছে আর্টের ভিতরের কথাটা তা তাকে শিশু-মনের ব্যাপারই বল বা উন্মাদের প্রলাপই বল। বিশ্ববাসী একেবারে বাউরা না হ'য়ে গেলে এ-কথা কোন দিনই বল্‌বে না যে নয়া দিল্লীর নব ব্যবস্থাপক সভার নবীন সৌধ আগ্রার তাজের চাইতে বেশি স্বর্গীয় যেহেতু ঐ ব্যবস্থাপক-সৌধে সমাজের বহু কাজের কথা ধ্বনিত হচ্ছে।

অশান্ত

কিন্তু তুমিই বা রস রস ক'রে আনন্দ আনন্দ ক'রে এমন বাউরা হও কেন?

হসন্ত

কারণ, অশান্ত, রসো বৈ সঃ অর্থাৎ এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পুরুষ যিনি তিনি হচ্ছেন রসস্বরূপ—কারণ, অশান্ত, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, অর্থাৎ এই বিশ্বে যা কিছু সবই আনন্দেই জন্মাচ্ছে আনন্দেই বর্তমান আছে এবং আনন্দেই প্রত্যাবর্তন করছে। কারণ, অশান্ত, রস ও আনন্দ যে কেবল আর্টেরই প্রাণ-স্বরূপ তাই নয়, রস ও আনন্দ হচ্ছে আমাদের জীবনেরও স্থিতি শক্তি ও বৃদ্ধির একমাত্র মূলীভূত কারণ, অর্থাৎ তোমরা ইংরেজিতে যাকে বল first cause—কোন তর্ক বা গবেষণা বা বাকবিতণ্ডা নয় তা সে তর্ক যত পাণ্ডিত্যপূর্ণই হ'ক না কেন বা সে গবেষণায় যত নির্ভুল হিসাব নিকাশের অঙ্কই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকুক না কেন।

অশান্ত

তোমার ঐ নাটুকে বক্তৃতা শুনে সহর্ষে আমার করতালি সুরু ক'রে দেবার ইচ্ছা হচ্ছে।

হসন্ত

তার চাইতে বরং ঐ ক্র্যাভেন "এ"র টিনটা এদিকে এগিয়ে দাও, কাজ দেবে—এবং তোমার ঐ ঘৃত-পুষ্ট নধর করকমল-যুগলেও কালশিটে পড়বার সম্ভাবনা দাঁড়াবে না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রাইডার হ্যাগার্ডের দেশে

রাইডার হ্যাগার্ডের রোমান্স্‌গুলির ঘটনাস্থল ছিল প্রধানতঃ উত্তর ট্রান্সভাল। উত্তর ট্রান্সভাল দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ স্থান, যেখানে এই বিংশ শতাব্দীতেও অসম্ভব ঘটনা ঘটতে পারে। এই দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন মনোরম, ইহার অতীত ইতিহাস তেমনই কৌতূহলপ্রদ।

উত্তর ট্রান্সভালের জল হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। আফ্রিকার নানা অঞ্চল থেকে লোকে আসে এখানে হাওয়া

পিটার্স্‌বুর্গের পথে

বদলাতে। খুব বড় বড় প্রান্তর, মাঝে মাঝে কমলালেবুর বাগান ও কফিক্ষেত, বনজঙ্গল এদেশে তেমন নেই, কেবল আছে ছোট বড় শৈলমালা ও পাহাড়ী নদী।

অনেক রক্তপাত হয়ে গিয়েছে উত্তর ট্রান্সভালের অধিকার নিয়ে। পূর্ব্বে এ দেশ ছিল জেনারেল পাইট্‌ জুবার্টের প্রতিষ্ঠিত সাধারণ তান্ত্রিক ট্রান্সভাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। জেনারেল জুবার্ট ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নেটালের শাসনকর্ত্তা সার জর্জ্জ কলিকে মাজুবার যুদ্ধে হারিয়ে দেন। প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ এতেই শেষ হয় এবং চার বছর পরে বিজয়ী সেনাপতি পাইট জুবার্টের নামে পিটার্স্‌বুর্গ সহরের প্রতিষ্ঠা হয়।

এই সহর যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এখানে অনেক আগে আদিম অধিবাসীদের একটা বড় গ্রাম ছিল, গ্রামের চারিপাশে বড় বড় বাওবার গাছের তলায় ওদের উৎসবের দিনে নাচ হোত—ওরা নাম দিয়েছিল জায়গাটার 'লালো-কোয়ান্' অর্থাৎ বিশ্রামের স্থান। এই বাওবার গাছগুলি এখনও পাইটার্স্‌বুর্গ সহরের একটা বড় পার্কের মধ্যে দেখা যায়।

আদিম অধিবাসীদের দেওয়া এই নামেরও একটা ইতিহাস আছে।

তখন উত্তরপশ্চিম জুলুল্যাণ্ডের রাজা ছিল চাকা। যদি কখন জুলুল্যাণ্ডের বর্ব্বর রাজাদের কোনো ইতিহাস লেখা হয় তবে এই নৃশংস রক্তপিপাসু দুর্ব্বৃত্তের নাম তাতে কৃষ্ণতম কালির অক্ষরে লিখিত হবে। সুটো জাতি আবার এই রাজার হাতে সকলের চেয়ে বেশী উৎপীড়িত হয়েছিল—শেষ পর্য্যন্ত আর অত্যাচার সহ্য করতে

না পেরে ড্রাকেন্‌স্‌বার্গ পর্ব্বতের বিরাট প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে তারা পালিয়ে এল এখানকার উর্ব্বর সমতলভূমিতে।

বেশ নিরিবিলি জায়গা, ছোট্ট পাহাড়ী নদী অদূরে বয়ে যাচ্চে, বেশী বনজঙ্গলও নেই, ভাল চাষবাস হবে, পশুচারণ ভূমিও যথেষ্ট—এই সব দেখে ওরা জায়গাটার নাম দিলে 'পালাকোয়ান্'—এতদিন পরে এখানে এসে ওরা বিশ্রামের অবকাশ পেলে।

কিন্তু হায়! বেশীদিন নিরুপদ্রবে বিশ্রাম ভোগ করা স্থটো জাতির অদৃষ্টে বিধাতা লেখেন নি।

১৮৩৫ সালের দিকে এল 'ভুর ট্রেকারস্' এর দল। এদের গায়ের চামড়া শাদা, চোখ নীল, হাতে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র, বুদ্ধিশুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। নতুনতর যুদ্ধের কৌশল তারা জানে—স্থটো-জাতির এত সাধের বিশ্রামের স্থানে ওরা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো।

অবিশ্যি স্থটোরা অত নিরীহ নয় যে ভালমানুষের মত শ্বেতকায় 'ভুর ট্রেকারস্'দের জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল। যথেষ্ট যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত হয়েছিল এ নিয়ে।

ম্যাগোবার অধিত্যকায়

কিন্তু এই 'ভুর ট্রেকারস্'রা অদ্ভুত লোক ছিল সব দিক দিয়ে। দেশের যে সব ছেলে দূরসমুদ্রে পাড়ি দিয়ে বিদেশে গিয়ে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করে, উপনিবেশ স্থাপন করে, তাদের কাঠামো থাকে বড় শক্ত ধাতুতে গড়া।

তারা দেশে অন্ন পায় নি বলে বিদেশে এসেছিল কৃষি-ক্ষেত্রের সন্ধানে। এসে তারা করলে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। লরেন্স হাউস্‌মানের কথায় "out of the lives you cast away settlements were born"—স্থটোজাতি ক্রমশঃ হঠে যেতে লাগলো। ১৮৩৫ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে দলে দলে ডাচ্ কৃষকেরা এসে একটা বড় জনপদের প্রতিষ্ঠা করলে। এরা যেমন সাহসী ছিল, তেমনি পরিশ্রমী ছিল। এদিকে আবার সবাই ছিল গোঁড়া খৃষ্টান। কোনো বিপদকে তারা বিপদ বলে গ্রাহ্য করতো না, অসীম ছিল এদের ধৈর্য্য, তেমনি অসাধারণ ছিল এদের কর্ম্মশক্তি।

অরেঞ্জ নদীর তীরবর্ত্তী সমস্ত অনাবিষ্কৃত ও জনহীন ভূমি দেখতে দেখতে জনপদে পরিণত হোল—এর নাম হোল অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট্।

কিন্তু এই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে 'ভুরু ট্রেকাস্'দের মূল্য দিতে হয়েছিল বড় বেশী। যত লোক প্রথমে অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটে ও উত্তর ট্রান্সভালে বসতিস্থান করে, তার সিকি মারা পড়ে ম্যালেরিয়া ও 'স্লিপিং সিক্‌নেস'এ—আর সিকি প্রাণ দেয় হিংস্র বন্যজন্তু ও হিংস্রতর জুলুদের আক্রমণে। কিন্তু তারা ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে যেতে অরেঞ্জ নদীর তীরে গিয়ে পৌছলো। তখন সমস্ত অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটে মাত্র পঞ্চাশটা কৃষিক্ষেত্র ছিল কিনা সন্দেহ। ক্রমে জমির দাম চড়তে লাগলো—গ্রাম হয়ে পড়লো সহর।

এই সময়ে আর এক উৎপাত আরম্ভ হোল।

যে সব ছোটখাটো ফার্ম্ম কিংবা গ্রাম উত্তর ট্রান্সভালের সীমান্তদেশে অবস্থিত, সেখানে অসভ্য বাভাণ্ডা জাতি মরুভূমির দিক থেকে এসে মহা অত্যাচার স্রুরু করলে। খুন-জখম, গৃহদাহ, নারীহরণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল।

অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট্ তখন সবে গড়ে উঠচে, সেখানকার গবর্মেণ্ট এমন শক্তিশালী নয় যে এই সব দূরবর্ত্তী জনপদকে উপযুক্ত সাহায্য করতে পারে। কিছুদিন একা একা যুদ্ধ

করবার পরে তারা ঘরবাড়ী ক্ষেতখামার ছেড়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলে পাইটার্সবুর্গ সহরের আশপাশে। কারণ সমস্ত অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের মধ্যে এখানেই লোকের বসতি বেশ ঘন, পুলিশ আছে, মিলিশিয়া সৈন্যদল আছে, বান্টুজাতির সাধ্য নেই যে এদিকে ঘেঁসে।

এইভাবে পাইটার্সবুর্গ সহরের পত্তন সুরু হোল। আগে যা ছিল ডাচ্ কৃষকদের একটা ক্ষুদ্র গ্রাম—তা ক্রমে আকারে ও আয়তনে বিরাট হয়ে উঠতে লাগলো। ১৮৬৩ সালে আবার গ্রামও ছিল না, একটী মাত্র ফার্ম্ম ছিল 'ষ্টার্কলুপ্' ব'লে—ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্ট এই ফার্ম্ম কিনে নিয়ে এখানে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম স্থাপন করেন। গ্রামটীর নামও ছিল 'ষ্টার্কলুপ্'।

এখন সেই 'ষ্টার্কলুপ্ 'গ্রাম হয়েছে বিশাল পাইটারস্বুর্গ সহর।

কত দেশ থেকে কত লোক এসে সহরের হোটেল পরিপূর্ণ রাখে।বেশীর ভাগ দর্শক বিখ্যাত ক্রুগার ন্যাশানাল পার্ক দেখতে যাবার পথে এই সহরে দু একদিন থেকে বিশ্রাম করে যায়। পাইটার্সবুর্গ থেকে ক্রুগার ন্যাশানাল পার্ক সহজে পৌছানো যায় এবং সে পর্য্যন্ত ভাল মোটারের রাস্তা আছে।

পিটার্সবুর্গ সহরে রাস্তাগুলির দৈর্ঘ্য মোট ৪০ মাইল। এখানে খুব বড় একটী এরোড্রোম সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে কেপ্-কায়রো বিমান পথের সুবিধার জন্যে। সহরের বাইরে প্রান্তর ও বনে বিভিন্ন ঋতুতে নানারকম রঙীন বন্য পুষ্প ফোটে, মরুভূমি সহর থেকে বিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যে, সেখানে সিংহ বিচরণ করে।

ম্যাগোবার অধিত্যকা

চুণীস্‌পুর্ট অঞ্চলে

পিটার্সবুর্গ থেকে ট্রান্সভালের মনোরম অঞ্চলগুলিতে

যাওয়া অত্যন্ত সহজ। এখানকার রাস্তাগুলি দ্রুতগামী মোটরগাড়ীর চলাচলের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী করা হয়েচে। সর্ব্বত্র পেট্রল কিনতে পাওয়া যায় পথের ধারে, গাড়ী সারাই করবার কারখানা যন্ত্রপাতির দোকানও মাঝে মাঝে আছে। এমন সুন্দর মোটরের রাস্তা ইউরোপ ছাড়া অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ—আমেরিকাতেও বেশী নেই, এমন কি মার্কিণ যুক্তরাজ্যেও সর্ব্বত্র নেই।

হার্টেন্‌স্‌বুর্গের চারিধারের পাহাড়ে অনেক ছোট বড় ঝরণা থাকায় কতকগুলি পার্ব্বত্য নদীস্রোতের সৃষ্টি করেচে। বনচ্ছায়ায় তীরস্থ শিলাখণ্ডে বসে এই সব নদীতে ট্রাউট্‌ মাছ ধরা জীবনের একটা অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। এই সব পাহাড় ও উপত্যকা, এই বনভূমি অমর হয়ে থাকবে রাইডার হ্যাগার্ড ও জন বুকানের লেখার মধ্যে দিয়ে।

কি অপরূপ শোভা বনবাসীর এই ক্ষুদ্র উপত্যকায় ও তার আশে পাশে। জনপদ থেকে দূরে এখানে সত্যিকার

ডুইভেলসক্রুফের অরণ্যপ্রদেশ

এখান থেকে হার্টেন্‌স্‌বুর্গ আটত্রিশ মাইল। হার্টেন্‌স্‌বুর্গ পর্ব্বতবেষ্টিত একটী অতি মনোরম উপত্যকায় অবস্থিত। এটীকে গ্রাম ছাড়া আর কিছু বলা যায় না—কিন্তু এর প্রাকৃতিক দৃশ্য এত সুন্দর যে ভ্রমণকারীর দল এখানে একবার না এসে থাকতে পারে না। ক্রুগার ন্যাশানাল পার্ক থেকে ফিরবার পথে সকলেই হার্টেন্‌স্‌বুর্গ হয়ে যায়।

ট্রপিক্যাল অরণ্য বর্দ্ধিত হয়েচে। অল্প খরচে ও পরিশ্রমে ট্রপিক্যাল অরণ্য দেখতে হোলে হার্টেন্‌বুস্‌র্গ উপত্যকায় আস্‌তে হয়। আগাথা আর একটী মনোরম স্থান—হার্টেন্‌স্‌বুর্গ থেকে ২৮ মাইল দূরে

এই পথে বনের মধ্যে যথেষ্ট শিকার মেলে—প্রধানতঃ হরিণ ও চিতাবাঘ। কচিৎ সিংহ দেখতে পাওয়া যায়।

তবে পরিশ্রমের সঙ্গে সন্ধান করলে অজগর সাপও মেলে।

দুমাইল গিয়েই পথ দু'হাজার ফুট নেমে গেল। এখানে পাহাড় কেটে বিখ্যাত গিরিবর্ত্ম মাদুবা ক্লুফ তৈরী করা হয়েচে। পথে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম পড়ে, প্রাচীনকাল ধরে ইন্দ্রজাল বিদ্যার জন্যে এই গ্রামের অধিবাসীরা প্রসিদ্ধ। আগে এরা বৃক্ষদেবতার সামনে নরবলি দিত—এখন অবশ্য অনেক সভ্য হয়েছে, অনেকে পাইটার্স্‌বুর্গে থেকে স্কুল কলেজে পড়ে। কিন্তু ইন্দ্রজালবিদ্যার চর্চ্চা এখনও এদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অন্যান্য গ্রামের জুলু ও কাফির অধিবাসীরা এদের ভয় করে চলে।

উত্তর ট্রান্সভালের অধিকাংশ অঞ্চলে বন ছিল না, আজকাল গবর্ণমেন্টের বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে সেখানে সযত্নে বৃক্ষরোপণ করা হচ্চে। একজাতীয় বাবলাগাছ বেশীর ভাগ রোপণ করা হয়েচে তার মূল্যবান আঠার জন্যে। এর আঠা উৎকৃষ্ট আরবী গঁদের সমান দামে বাজারে বিক্রী হয়। নিকটেই জগদ্বিখ্যাত র‍্যাণ্ড্ স্বর্ণখনি—খনিতে ভূগর্ভে খুঁটী বসাবার জন্যেও প্রচুর পরিমাণে বাবলাগাছের গুঁড়ি চালান যায়।

ডাচ্ কৃষিক্ষেত্রগুলিতে উন্নত প্রণালীতে পিচ্, পিয়ার, কলা, আম, পেঁপে ও আনারসের চাষ করা হয় ও জাহাজের ঠাণ্ডা কেবিনে পুরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র চালান দেওয়া হয়। ফলের ব্যবসা উত্তর ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের একটী অতি লাভজনক ব্যবসা।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সার রাইডার হ্যাগার্ড তাঁর যৌবনে ট্রান্সভালের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন—এই অঞ্চলের পর্ব্বত ও অরণ্য তাঁর কয়েকখানি রোমান্সের আবেষ্টনী রচনার সাহায্য করেচে। ডুইভেল্‌স্ ক্লুফের অনতিদূরে দুটী শৈল-শৃঙ্গের তিনি নাম দিয়েছিলেন 'রাণী শেবার যুগল স্তন'—বহুদূর থেকে টুরিষ্ট্‌দের দল এই শৈলশৃঙ্গ দুটী দেখতে এসে ঘন বনের ছায়ায় তাঁবু পেতে ক্লান্তদেহে বিশ্রাম করতে করতে শক্তিশালী লেখকের সৃষ্ট 'রাজা সলোমানের রত্নাগার'এর স্বপ্ন দেখে।

পেঁপে গাছ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাল্যবতী

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

রসাল-বনে মুকুল সনে করছে খেলা কে ?
চিন্‌তে আমি পেরেছি ওই স্বপন-মালাকে।
মুখ চিনেছি, চিন্‌তে নারি কৌতুকী তার মন,
চোখের কোণে চেয়ে-চেয়ে হাস্‌ছে কি কারণ ?
বুঝ্‌তে নারি তার সে ছলা কী-জানি-কেমন,
মায়াছবির কুহক-টানে বন্দী হ'ল মন।
দখল করে' আছে সে মোর সকল কামনা,
ফাগের থালি খালি করে' কর্‌লে আন্‌মনা।
বাঁশীর মত ঝঙ্কারিয়া ডাকতো হাসির সুর,
ফাগুন-রসে ভরা কলস কর্‌লে সে ভরপুর।
তালে তালে বাজিয়ে কাঁকণ দেয় সে করতালি,
কখন্ গড়ে সোহাগ-বেড়ী, কখন্ চতুরালি।
জরা যেদিন তরুণ বুকে দেয়নি এসে হানা,
দখিন হাওয়া উড়িয়ে দিত সরম-রাঙা-মানা,
নিঙড়ে দিত এই তৃষিতে কামিনী-ফুল-ঝুরা,
ফেনিয়ে দিত পেয়ালাতে বিষামৃত সুরা।—

সে যে আমার রাত-প্রভাতের চিত্ত-চমৎকার,
চুমা দিয়ে ক'র্‌তো মধুর সমস্ত সংসার।
মোতির ঝালর ঝুলিয়েছে সে গরীব-খানায় মোর,
কে জানিত তার বিহনে গল্‌বে আঁখির লোর!
কে ভুলিবে মধুভরা আদর-পরিহাস,
সেই দিয়েছে অপূর্ব্ব মুখ, অপূর্ব্ব নৈরাশ।
ভাণ্ডার মোর উজাড় করে' পেয়েছিলাম মন,
কোন্ সকালে পালিয়ে গেল প্রেমের হীরামন্।
ওজন করে যত রতি কর্‌লে হাসিদান,
পরখ্ করো, অশ্রুকণাও ঠিক তারি সমান।
বীণার কাজে সেতার বাজে, মল্লার দেয় সাড়া,
কে বুঝিবে স্মৃতির গীতি মরমী মন ছাড়া ?
কখন্ স্ফটিকপাত্র টুটে' কর্‌লে অধর-ক্ষত,
কি তীক্ষ্ণ ধার ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরির মত!
হায় রে চপল মন-মনুয়া বন্দী তারই ফাঁদে,
চুপিসাড়ে কোথেকে সে সব সুখে বাদ সাধে।

সমাজ, রাষ্ট্র ও বিজ্ঞান

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র ডি-এস্ সি

গত দুই শতাব্দীতে জড়বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রয়োগ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে অভাবনীয় পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে। পরিবর্তন চিরকালই হইত। কিন্তু সম্প্রতি পরিবর্তনের হার অতি দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। এই ক্রমবিবর্দ্ধমান পরিবর্তন মানুষের উন্নতির পথে সহায়তা করিতেছে, না মানুষকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে তাহা প্রত্যেক মনস্বী ব্যক্তিই চিন্তা করিতেছেন। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাকালে, যে যুগে আধুনিক যুগের মত মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল না, সে যুগেও পরিবর্তন হইত। কিন্তু পরিবর্তন হইত ধীরে ধীরে। একজন মানুষের জীবদ্দশায় এই পরিবর্তনের পরিমাণ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাইত না। কিন্তু এখন কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে পরিবর্তন হয় তাহা আগে কয়েক শত বৎসরেও হইত কিনা সন্দেহ। এই পরিবর্তন যদি সৌষ্ঠব ও সুসামঞ্জস্যের সহিত মানুষের সংসারে সমাজে ও রাষ্ট্রে হয় তাহা হইলে মোটের উপর সমষ্টিগত ভাবে মনুষ্য জাতির উন্নতিই হইল বলিতে হয়। কিন্তু তাহা যদি না হয়, মানুষের জটিল জীবনের এক অংশে যদি পরিবর্তন হয়, শুধু এক অংশের যদি উন্নতি হয় তাহা হইলে এই পরিবর্তন অগ্রগতির পথে সহায়ক না হইয়া নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে। ছোট শিশু যখন বড় হয় তখন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও সমানভাবে উন্নত হয়; কিন্তু যদি শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গই বড় হয়, হাত পায়ের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিরও যদি বিকাশ না হয় তাহা হইলে শিশু বড় হইয়া মানুষের পরিবর্তে বন্য জন্তুর মত ব্যবহার করিতে শিখে। শিশুর শরীর ও মনের পরিবর্তন ও উন্নতির বিষয়ে যে কথা প্রযোজ্য মনুষ্য জাতির সমগ্রভাগে উন্নতির বিষয়েও সেই একই কথা প্রযোজ্য। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সুষ্ঠুভাবে হইতেছে কিনা, ও না হইয়া থাকিলে কি ভাবে অগ্রসর হইলে ইহা হওয়া সম্ভব তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি সে সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা ভুল ও অস্পষ্ট। বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা গোড়াতেই বুঝিয়া লইলে ভাল হয়। ইংরাজিতে একটা কথা আছে —"Science is systematised knowledge"—বিজ্ঞান শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান। বিজ্ঞানের ইহার চাইতে ভাল সংজ্ঞা হইতে পারে না। মানুষ তাহার চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরিদৃশ্যমান জড় জগৎ হইতে অনবরত নানারূপ জ্ঞান আহরণ করিতেছে। এই সব জ্ঞান সংখ্যায় অগণনীয়, বৈচিত্র্যে অবর্ণনীয়। বৈজ্ঞানিক এই সব জ্ঞানকে সুনিয়ন্ত্রিত, সুসম্বদ্ধভাবে সাজাইয়া তাহাদের মধ্য হইতে নিয়মের শৃঙ্খলা আবিষ্কার করেন। যে নিয়ম যত বেশী জ্ঞানকে এক সঙ্গে শৃঙ্খলায় আনিতে পারে, সেই নিয়মের মূল্য বৈজ্ঞানিকের কাছে তত বেশী। নিউটনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম এইরূপ একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম। পৃথিবীপৃষ্ঠেই হউক বা গ্রহ উপগ্রহ সমন্বিত সৌরজগতেই হউক বা কোটি কোটি যোজন দূরে অবস্থিত তারকামণ্ডলেই হউক সর্ব্বত্রই পর্য্যবেক্ষণের ফলে জড়পিণ্ডের গতি সম্বন্ধে মানুষ যে জ্ঞান আহরণ করে তাহা এই মহানিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক সর্ব্বদাই এইরূপ নূতন নিয়ম ও সূত্রের সন্ধানে ব্যস্ত। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা সেই এক মূল নিয়মের আবিষ্কার যাহা মানুষের সমস্ত জ্ঞানকে

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে (রাঁচি) বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

একসূত্রে গ্রথিত করিতে পারে। প্রশ্ন ওঠে কিসের অনুপ্রেরণায়, কিসের আশায় বৈজ্ঞানিক এই নিয়মের সন্ধানে প্রাণান্তে চেষ্টা করেন? অনুপ্রেরণা শুধু বৈজ্ঞানিকের মনের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা। প্রকৃতির ঘটনাবলী যে গূঢ় রহস্যের আবরণে আবৃত রহিয়াছে, সেই আবরণের অন্তরালে কি আছে তাহা জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকের মন সদাই অশান্ত। রহস্য কিছু ভেদ করিতে পারিলে, নিয়ম কিছু আবিষ্কার করিতে পারিলে তাঁহার অশান্ত মনে কিছু শান্তি আসে, কৌতূহল কিছু পরিতৃপ্ত হয়। এই পরিতৃপ্তিতেই তাঁহার সুখ। তিনি অর্থের বা বিত্তের প্রত্যাশী নন। তাঁহার আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য মানুষের কোনও কাজে লাগিবে কিনা তাহাও তিনি জানেন না, ও জানার জন্য ব্যস্তও নহেন।

বৈজ্ঞানিক ও উদ্ভাবক

কিন্তু নিয়মের আবিষ্কার কাজে লাগা না লাগা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নিজে যতটা উদাসীন সাধারণ মানুষ ততটা উদাসীন নয়। সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের চাইতে বিজ্ঞানের প্রয়োগটাকেই বড় করিয়া দেখে। এই জন্য বৈজ্ঞানিকের পিছে পিছে উদ্ভাবক ও যান্ত্রিক (technician) ঘুরিয়া বেড়ান। ইঁহাদের উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কাজে লাগান। নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য কি পরিমাণে কাজে লাগাইতে পারা যায় তাহা বিবেচনা করিয়া উদ্ভাবক ও যান্ত্রিক সেই তথ্যের গুরুত্ব নির্ণয় করেন। কাজে না লাগিলে সে তথ্যের মূল্য তাঁহাদের কাছে বিশেষ কিছু নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আইনষ্টাইনের বিখ্যাত "আপেক্ষিক তত্ত্ব" (Theory of Relativity) বিজ্ঞান রাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় প্রত্যক্ষভাবে ইহাকে কোনও কাজে লাগাইতে পারা যায় না বলিয়া উদ্ভাবক ও যান্ত্রিকের কাছে ইহার কোনও মূল্য নাই।

এমন এক সময় ছিল যখন সাধারণ লোক ও, বিশেষ করিয়া, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্তারা নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। পুরাতন মতে তাঁহাদের যে কলকারখানা চলিতেছে তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিতেন। উদ্ভাবক তাঁহার নবাবিষ্কৃত উদ্ভাবনা লইয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এখন কিন্তু সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এখন বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ধনিক মালিকেরা নিজেরাই বৃহৎ সুসজ্জিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপিত করেন। সেখানে বৈজ্ঞানিক, উদ্ভাবক ও যান্ত্রিক পরস্পরের সাহায্যে কাজ করেন। ইহার ফলে এখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কাজে প্রয়োগ করা আগের চাইতে অনেক সহজে ও শীঘ্র হয়। উদ্ভাবক, যান্ত্রিক ও ধনিকের সমবায়ে সভ্যজগতে যে সব মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে সে সবের তুল্য শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান জগতে আর আছে কি না সন্দেহ।

বিজ্ঞানের যুগ

আগেই বলিয়াছি মানুষের, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক মানুষের মন সর্ব্বদাই কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু। এই কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসাই মানুষকে জ্ঞানার্জ্জনে নিয়োগ করে। কিন্তু পূর্ব্বকালে যে শ্রেণীর মানুষ জ্ঞানার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহাদের অর্জ্জিত জ্ঞান পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। সাধারণ মানুষ তাহার নাগাল পাইত না। তাহা ছাড়া জ্ঞানার্জ্জনের পন্থার মধ্যেও একটা বড় রকমের ত্রুটি ছিল ও তাহার ফলে জ্ঞান একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট হইত। শুধু বিচার, বিতর্ক ও সহজাত জ্ঞানের সাহায্যে জড়জগতের উৎপত্তি ও পরিণতি, জড়, জীব ও চেতনার রহস্য ইত্যাদি জানিবার চেষ্টা করা হইত। এইরূপ প্রচেষ্টার ফলে সকল দেশেই দর্শনশাস্ত্র অনেক অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু জ্ঞান লাভের আর একটি যে প্রকৃষ্ট পন্থা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ তাহা বহুদিন ধরিয়া প্রায় একরকম অজানিত ছিল। শুধু অজানিত নয় যাহারা দ্রব্যগুণ লইয়া পরীক্ষা করিত লোকে তাহাদের সন্দেহের চক্ষে দেখিত। উদাহরণ স্বরূপ মধ্যযুগের তথাকথিত রাসায়নিক ও কিমিয়বিদ্যা (Alchemist ও Alchemistry) কথা বলা যাইতে পারে। দার্শনিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, ধর্ম্মযাজক ইত্যাদি যাঁহারা আগের কালে কৃষ্টির আভিজাত্য বহন করিতেন তাঁহাদের কাছে এই শ্রেণীর লোক অবজ্ঞাত, অখ্যাত ও কৃপার পাত্র ছিল।

এখানে বলা আবশ্যক যে মধ্যযুগে ইউরোপের যখন এই অবস্থা তাহার বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষের মনীষিরা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ এবং চার্ব্বাকদের গবেষণা ও বিচারপদ্ধতি এই সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য।

পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণের প্রতি এই উদাসীনতা ও অবজ্ঞার ভাব দূর করিবার প্রথম চেষ্টা করেন যোড়শ শতাব্দীতে রজার বেকন। তাহার পর হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গবেষণা ও অনুসন্ধানের আবশ্যকতা মানুষ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও বিদ্যা শ্রেণীবিশেষের বা ধর্ম্মযাজকদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে যাত্রা সুরু হইয়াছিল অস্পষ্টভাবে মন্থর গতিতে তাহার বেগ উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে। যতদিন বিজ্ঞানের অগ্রগতি বজায় থাকিবে ততদিন মনুষ্যসমাজে তাহার প্রভাব নূতন নূতন বিপ্লব আনয়ন করিবে।

বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও সেই সঙ্গে যন্ত্রের উন্নতি কিভাবে দুই শতাব্দীর মধ্যেই মানব সভ্যতার ও মানবের ব্যবহারিক জীবনে এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা আলোচনা করা যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে লোহার কারখানাতে কাঠের পরিবর্ত্তে কয়লার ব্যবহার সুরু হয়। কয়লার খনির ভিতর জমা জল উপরে তুলিবার জন্য হস্তচালিত পাম্পের পরিবর্ত্তে বাষ্পচালিত পাম্পের আবিষ্কার হইল। প্রাকৃতিক শক্তিকে রূপান্তরিত করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের কাজে লাগানর উদাহরণ এই প্রথম। বাষ্প যদি পাম্প চালাইতে পারে তা' হইলে গাড়ীও চালাইতে পারিবেনা কেন? উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রেলওয়ে ও ষ্টীম এঞ্জিনের আবির্ভাব হইল। ষ্টীম চালিত রেলগাড়ীর প্রবর্ত্তন সে সময়ে যে কত বড় যুগান্তকারী ঘটনা তাহা আজকাল ধারণা করা শক্ত। শুনা যায় যে খৃঃ পূঃ ৩২৫ শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডার যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হন তখন তিনি গড়ে রোজ ২০ মাইল পরিক্রমণ করিতেন। ১৮১২সালে নেপোলিয়ন যখন রুশিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন ১৩০০ মাইল আসিতে তাঁহার ৩১২ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। দেশবিদেশে গমনাগমনের জন্য মানুষকে যে সময় ক্ষেপণ করিতে হইত দুই সহস্রাধিক বৎসরেও সে সময়ের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু সহসা সেই সময়ের পরিমাণ কমিয়া একদশমাংশে দাঁড়াইল। নেপোলিয়নের যেখানে ৩১২ ঘণ্টা লাগিত সাধারণ মানুষের সেখানে ৩০ ঘণ্টায় যাওয়া সম্ভবপর হইল। স্থলে রেলওয়ে এঞ্জিনের সঙ্গে সঙ্গে জলেও বাষ্পচালিত জলযানের প্রবর্ত্তন হইল। সাগর মহাসাগর উত্তীর্ণ হইতে যেখানে ছয় মাস লাগিত সেখানে মানুষ ছয় সপ্তাহে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। জাতির সঙ্গে জাতির, দেশের সঙ্গে দেশের মধ্যে নূতন সম্বন্ধ ও সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া বাণিজ্য, ব্যবসায় ও সংবাদ আদানপ্রদানের এক নূতন যুগ সহসা দেখা দিল। মানুষের সভ্যতার উন্মেষের সুরু হইতে পাঁচ ছয় হাজার বৎসরেও যে পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় নাই সেই পরিবর্ত্তন সহসা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সাধিত হইল। ইহা ছাড়া যেখানেই মানুষ সুবিধা পাইল সেইখানেই শারীরিক শক্তির পরিবর্ত্তে ষ্টীম এঞ্জিন বসাইয়া শ্রম লাঘব করিয়া দশজনের কাজ একজনে করিতে শিখিল।

বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের আর এক অধ্যায় সুরু হইল যখন গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরীক্ষাগারে বিদ্যুৎ ও চুম্বক শক্তির পরস্পরের অভিনব সম্বন্ধ আবিষ্কার করিলেন। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন আবিষ্কৃত হইল; দূরে সংবাদ আদান প্রদান যে কত দ্রুত হইতে পারে তাহা মানুষের কল্পনাকেও ছাড়াইয়া গেল। দূর আর দূর রহিলনা। বৈজ্ঞানিকের যাদুমন্ত্রে পৃথিবীর কলেবর যেন ছোট হইয়া গেল; বৈদ্যুতিক আলো, বৈদ্যুতিক যান ইত্যাদি বিদ্যুতের নব নব প্রয়োগ মানুষের চোখে ও মনে ধাঁধা লাগাইয়া দিল। বৈদ্যুতিক শক্তি শুধু দুইটা তারের সাহায্যে এক জায়গা হইতে অপর একজায়গাতে পাঠাইবার উপায় হওয়াতে বিদ্যুতের ব্যবহার অচিরে দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল।

এই সবের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের চক্ষুর অন্তরালে আর একদিকে ব্যাপক ভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছিল। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারে নানারূপ কাচ পাথর ধাতু ইত্যাদির গুণ সম্বন্ধে পরীক্ষণ ও গবেষণা খুব ব্যাপক ভাবে হইতেছিল। ধাতুর মধ্যে, বিশেষ করিয়া লোহার দৃঢ়তা, নমনীয়তা ইত্যাদি, নিজের ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করার উপায়

আবিষ্কৃত হওয়াতে ইহার ব্যবহার শত দিকে শতগুণে বাড়িয়া গেল। এই সব গবেষণার ফলে ও সেই সঙ্গে খনিজ তৈলের আবিষ্কার হওয়াতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মোটর এঞ্জিন বা তথাকথিত Internal Combustion Engine-এর উদ্ভব হইল। ষ্টীম এঞ্জিনের শক্তির মূল কয়লা। কিন্তু কয়লা জ্বালান হয় এঞ্জিনের সিলিণ্ডারের বাহিরে বয়লারে। মোটর এঞ্জিনের শক্তির মূল পেট্রোল, পেট্রোল পোড়ে সিলিণ্ডারের মধ্যে। এই কারণে মোটর এঞ্জিন সমান শক্তি সম্পন্ন ষ্টীম এঞ্জিনের চাইতে অনেক হাল্কা। মোটর এঞ্জিনের ক্রত উন্নতি এখন জলে স্থলে ষ্টীম এঞ্জিনকে হঠাইতে সুরু করিয়াছে। ভারী বলিয়া অন্তরীক্ষে ষ্টীম এঞ্জিনের ব্যবহার সম্ভবপর হয় নাই। বায়ুস্তরে চলিবার জন্য এরোপ্লেন ও হাওয়া-জাহাজের উদ্ভাবনা মোটর এঞ্জিনের দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছে। রেলওয়ে প্রবর্ত্তনের সময় যে গতির বেগ মানুষ অবাক হইয়া দেখিত এরোপ্লেনের কাছে তাহা এখন অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যান্ত্রিক যুগের পত্তনকারী ষ্টীম এঞ্জিনের পরমায়ু একশত বৎসরের মধ্যে ফুরাইবার উপক্রম করিয়াছে।

এই সব বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবসর কাটাইবার ও চিত্তবিনোদনের জন্য বিজ্ঞান যাহা করিয়াছে ও করিতেছে তাহা ত্রিশবৎসর পূর্ব্বেও লোকে ধারণা করিতে পারিত না। চলচ্চিত্র, রেডিও, টকি, গ্রামোফোন, ফোটোগ্রাফি এ সমস্তের উদ্ভাবনা ও অগ্রগতি আমাদের জীবদ্দশায় দেখিতেছি। দূরদর্শন বা Television ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞানের এই সব চমকপ্রদ প্রয়োগের কথা বলিয়া ক্ষান্ত থাকিলে অনেক কথা বলা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মানুষের আহার্য্য যোগাইবার জন্য কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে দুই দিক হইতে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। প্রথমতঃ বীজের উৎকর্ষ ও জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সার দেওয়ার ফলে আগে যেখানে একগুণ ফসল হইত এখন সেখানে দশগুণ হয়। দ্বিতীয়তঃ ভূমিকর্ষণ ইত্যাদি কাজ আগে শুধু গবাদি পশুর সাহায্যে হইত। এখন তাহার জায়গায় যন্ত্রচালিত হল ইত্যাদির সাহায্যে একজন মানুষ যে বিস্তৃত ক্ষেত্র আবাদ করিতে পারে আগে তাহা দশটি মানুষ ও পশুর সাহায্যে হইত কিনা সন্দেহ। চিকিৎসা শাস্ত্রেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিপ্লব আনিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গত শতাব্দীতে বীজাণু তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে রোগের নিদান ও রোগের প্রতিরোধ উভয় বিষয়েই মানুষের জ্ঞান প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়াছে। ফলে সকল সভ্যদেশেই মৃত্যু-হার, বিশেষতঃ শিশু মৃত্যুহার, অনেক কমিয়াছে।

রাষ্ট্র ও সমাজ

বিজ্ঞানের এই সব অভিনব প্রয়োগ রাষ্ট্র ও সমাজকে নানা দিক দিয়া নানা ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথমে রাষ্ট্রের কথা ধরা যাক্। দ্রুত গমনাগমন ও নিমেষের মধ্যে এক জায়গা হইতে অপর জায়গায় সংবাদাদি প্রেরণের নূতন ব্যবস্থা হওয়ার জন্য কোনও দেশ, রাষ্ট্র বা জাতি আগের মত নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেনা। আগের কালে সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের অসুবিধার জন্য কোনও দেশের শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি সেই দেশের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। সাগর ও পর্ব্বত-মালা, নদী ও মরুভূমি দেশের সীমানা নির্দ্ধারণ করিত। প্রাচ্য মহাদেশে ইয়োরোপে ও এশিয়াতে এই কারণে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। আমেরিকাতে যুক্তরাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার কিছু পরেই রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি প্রবর্ত্তনের জন্য আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি এইরূপে স্বতন্ত্র ভাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। সে সময়ে যদি বিজ্ঞানের এই সব প্রয়োগ আবিষ্কৃত না হইত তাহা হইলে আজ আমরা যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্ত্তে একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র দেখিতে পাইতাম।

এক সময়ে অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞান এই যে-সব যুগান্তরকারী বিপ্লব আনয়ন করিয়া দেশ দেশান্তরে নানা জাতির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ও সম্বন্ধ স্থাপন করার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের, এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের বিরোধ ঘুচিয়া যাইবে। সমস্ত মানব মিলিয়া এক মহামানব জাতিতে পরিণত হইবে, সমস্ত রাষ্ট্র মিলিয়া এক মহা-রাষ্ট্র গঠিত হইবে। পৃথিবীর

ধনদৌলৎ ও খাদ্য কেহ কম কেহ বেশী পাইবেনা। সমস্ত সমভাবে বণ্টন করা হইবে। বিজ্ঞানের যুগের প্রারম্ভে এই স্বপ্ন অনেকেই দেখিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ এই স্বপ্ন সফল হইবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছেনা। পরন্তু উল্টা ফল হইতেছে বলিয়াই মনে হয়।

স্বপ্ন সফল না হওয়ার অনেক কারণ আছে। একটা প্রধান কারণ এই যে, সম্পর্ক ও সম্বন্ধ স্থাপন করা ব্যবস্থা হইলে যেমন বন্ধুত্ব ও সখ্য হইতে পারে, তেমনি বিবাদ ও কলহও বাধিতে পারে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে এই কারণে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যুদ্ধবিগ্রহাদি সাধারণতঃ প্রতিবেশী বা নিকটবর্ত্তী রাষ্ট্রের সঙ্গে বাধিত। কাছাকাছি যে সব রাষ্ট্র আছে তাহাদের সঙ্গে আবশ্যক মত সন্ধি করিলে, চিরকালের জন্য না হউক অন্ততঃ কিছুকালের জন্য শান্তিতে ও নিরুদ্বেগে বাস করা সম্ভবপর হইত। সেই কারণে এক দেশের অধিবাসীরা দূরদেশে কি ঘটিতেছে তাহার সংবাদ রাখার আবশ্যকতা অনুভব করিত না। এখন সেরূপ করিলে চলেনা। একদেশে কি ঘটিতেছে সে সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার প্রভাব বিস্তার করে। এক দেশের এরোপ্লেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বহুদূরদেশে তাহার সৈন্যাদি লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। কোনও রাষ্ট্র যদি শান্তিতে থাকিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের সহিত সদ্ভাব, সখ্য ও সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু সদ্ভাব ও সখ্য সমানে সমানে হয়। দুর্ব্বল ও সবলের মধ্যে সখ্য মৃৎপাত্র ও কাংস্যপাত্রের মধ্যে বন্ধুত্বের ন্যায় দুর্ব্বলের পক্ষে বিপজ্জনক। বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রয়োগ গত দুই শতাব্দীতে এত দ্রুত হইয়াছে, পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব এত বিভিন্ন দিক হইতে এত বিচিত্রভাবে সহসা আসিয়া পড়িয়াছে যে পৃথিবীর সকল জাতি, সকল রাষ্ট্র তাহার সঙ্গে নিজেদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিজেদের অগ্রগতি বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই। যে জাতি পারিয়াছে সে জাতি শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত হইয়াছে, যে জাতি পারে নাই সে জাতি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ব্বল জাতি টিকিয়া আছে তাহার একমাত্র কারণ এই যে কে তাহাকে গ্রাস করিবে তাহা লইয়া সবলদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছে।

কিন্তু সবল যাহারা হইয়াছে তাহারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে ধ্বংসের বীজ রোপণ করিতেছে। সবলেরা সবল ও পরাক্রান্ত হইয়াছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কাজে লাগাইয়া। একদিকে গঠনমূলক কাজে লাগাইয়া ধনদৌলৎ আহরণ ও নিজেদের আহারে বিহারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করিয়াছে, ও অপরদিকে শত্রুদমন বা শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার অছিলায় বিজ্ঞানকে ধ্বংসমূলক কাজে লাগাইয়া নূতন নূতন মারণ অস্ত্র, বিষাক্ত বাষ্প, মেসিনগান, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি উদ্ভাবন করিয়াছে। ফলে সমস্ত সভ্য সবল জাতি তাহাদের যুদ্ধোপকরণ এত বাড়াইয়াছে যে সেগুলি একবার যদি কোনও ছুতায় কাজে লাগাইতে পারে তা' হইলে কে যে কোথায় ধ্বংস হইয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই। বিজ্ঞানের সাহায্যে এই যে জগদ্ব্যাপী ধ্বংস ও প্রলয়ের আয়োজন হইতেছে তাহা দেখিয়া সাধারণ মানুষ বিস্মিত ও ভীত হয়। তাহারা বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিককে ইহার জন্য দায়ী করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিককে এই পরিস্থিতির জন্য দোষী করা সঙ্গত নয়। কারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন সত্য-আবিষ্কারের জন্য। তাঁহার আবিষ্কৃত সত্য সমস্ত সভ্য জগতের সম্পত্তি। রাষ্ট্রনায়কেরা ও অস্ত্রব্যবসায়ীরা উদ্ভাবক ও যান্ত্রিকের সাহায্যে সেগুলিকে বিষাক্ত বাষ্প বা বিস্ফোরক দ্রব্য বা মেসিনগানের উন্নতির জন্য ব্যবহার করেন। বৈজ্ঞানিক আজ যদি তাঁহার গবেষণাগার রুদ্ধ করিয়া দেন তবুও এতদ্দিনে যে সব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহৃত হইয়াছে তাহারই সাহায্যে বহুদিন পর্য্যন্ত মারণযন্ত্র তৈয়ার করা চলিবে। এই জগদ্ব্যাপী সমর-সজ্জার মূলে আছে মানুষের প্রতি মানুষের সহজ বিশ্বাসের অভাব, এক জাতির সহিত অন্য জাতির স্বার্থের সংঘাত ও উগ্র জাতীয়তাবাদ। যতদিন এগুলি থাকিবে ততদিন এই পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন হইবে না ও অস্ত্রব্যবসায়ী এই সবের সুযোগ লইয়া নূতন নূতন সহস্রমারী বা লক্ষমারী যন্ত্র উদ্ভাবন করিবে। এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে দুইটি জাতি যখন নির্ব্বোধের মত পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ রত সেই সময়ে তৃতীয় জাতির অস্ত্রব্যবসায়ীরা দুইপক্ষকেই অস্ত্র যোগাইতেছে!

রাষ্ট্র ছাড়িয়া সমাজের কথা ধরা যাক। বিগত দুই শতাব্দীতে মানুষের সামাজিক জীবনে দুই দিক হইতে দুইটা

বিপ্লব আসিয়াছে। একটার বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রয়োগ, যন্ত্রের উদ্ভাবন ও তাহার ব্যবহার। ইহাকে "যান্ত্রিক বিপ্লব" বলা যাইতে পারে। আর একটা হইতেছে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সমবেত-শ্রমের প্রবর্ত্তন। পূর্ব্বকালে শিল্পী তাহার শিল্পশালাতে একলা অথবা নিজের পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের সাহায্যে কাজ করিত। এখন তাহার পরিবর্ত্তে বহুশিল্পীর এক সঙ্গে একই রূপ কাজ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। শিল্পশালার মালিক এখন আর শিল্পী নিজে নন। ধনিক এখন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা। শিল্পী এখন দক্ষ শ্রমিক। ইহা হইল "সমবেত-শ্রমের" বিপ্লব। অনেকে মনে করিতে পারেন যে যন্ত্রের বিপ্লবই ও সমবেত শ্রমের বিপ্লব দুইই বুঝি একই জিনিষ। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে দুইটি একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। একটু উদাহরণ দিলে বোধহয় কথাটা পরিষ্কার হইবে। আমি যখন শেলাইয়ের কল চালাই তখন যন্ত্রের ব্যবহার করি। এই কল চালানোর সঙ্গে সমবেত শ্রমের কোনও সম্পর্ক নাই। বাড়ীর উপর তালায় জল তোলার জন্য যখন ইলেকট্রিক পাম্প ব্যবহার করি তখন বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবিত বিদ্যুত ও চুম্বক শক্তিকে কাজে লাগাই। এখানেও সমবেত-শ্রমের কোনও প্রশ্ন উঠে না। বস্তুতঃ সমবেত-শ্রমের প্রচলন যান্ত্রিক বিপ্লব আসিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বকালে যখন মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবন হয় নাই তখন পুঁথি প্রকাশকদের "কারখানায়" এক সঙ্গে কয়েকসারি কেরাণী বসিয়া যাইত। একজন উচ্চৈঃস্বরে লেখা-পাঠ করিত ও একসঙ্গে বহু পুঁথি লেখা হইত। সমবেত শ্রমের ব্যবস্থার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গত দুই শতাব্দীতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও কলকারখানার উন্নতি সমবেত-শ্রমশিল্পের উপর নানা দিক দিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, সমবেত শ্রম প্রথাও নানারূপে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। একে অপরকে গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু মূলে উভয়ে ভিন্ন প্রকৃতির জিনিষ। বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে যান্ত্রিক বিপ্লব যদি না আসিত তা হইলেও সমবেত শ্রমশিল্পের বিস্তার যে হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক যন্ত্রচালিত শিল্পে সমবেত শ্রম প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে সমাজে অনেক নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। একটা প্রধান সমস্যা এই যে যন্ত্রচালিত শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা কম লাগে। যে সব শ্রমিক যন্ত্রপ্রবর্ত্তনের জন্য বেকার হইল তাহারা কি করিবে? আদিম অবস্থায় কৃষিই ছিল মানুষের প্রধান পেশা। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের জন্য নূতন দ্রব্য ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে ও নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষ কারিগর পুরুষানুক্রমে এই সব শিল্পদ্রব্য নিজ হাতে গড়িয়া তাহাদের চাহিদা মিটাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু যে কাজে আগে দশজনের অন্নসংস্থান হইত এখন সেই কাজ একজন লোকেই যন্ত্রের সাহায্যে করিতে সক্ষম হয়। বাকি নয়জনে কি করে? কৃষিক্ষেত্রে ফিরিয়া যাও একথা মুখে বলা সহজ, কিন্তু কাজে তত সহজ নয়। প্রথম, সেখানে যে কৃষক পুরুষানুক্রমে ভূমির স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছে সে আজ নগর হইতে বিতাড়িত বেকার শ্রমিককে ভূমির অংশ কেন দিবে? দ্বিতীয়তঃ কৃষিক্ষেত্রেও যন্ত্রের আমদানী হইয়াছে; সেখানেও আবশ্যকীয় শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। তৃতীয়তঃ যে লোক চিরকাল কারুশিল্প করিয়া আসিতেছে সে আজ সহসা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিতে সক্ষম হইবে কি? তাঁতিকে তাঁত ছাড়িয়া হল চালনা করিতে বলিলে তাঁত ও কৃষি দুইএর প্রতিই অবিচার করা হয়।

কিন্তু কয়েকটা কারণে যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে বেকার সমস্যা যত প্রবলভাবে দেখা দিতে পারিত ঠিক তত প্রবলভাবে দেখা দেয় নাই। প্রথমতঃ যে সব যন্ত্র শিল্পের কারখানা হইতে শ্রমিককে সরাইয়াছে সেই সব যন্ত্র তৈয়ার করিতে নূতন কারখানা স্থাপন করিতে হইয়াছে ও বহু শ্রমিক সেইখানে কাজ পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নূতন আবশ্যকের সৃষ্টি হইয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যথা, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, মোটরকার ইত্যাদি। তাহা ছাড়া মানুষের বিলাসিতা ও প্রসাধনের জন্যও নূতন উপকরণের সৃষ্টি ও সেই সঙ্গে সেই সব প্রস্তুত করার জন্যও নূতন কারখানা পত্তন হইয়াছে ও সেখানে নূতন শ্রমিক নিয়োজিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমশঃ

বর্দ্ধিত হওয়ার দরুণ উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িতেছে, সেই কারণেও কলকারখানা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। অর্থাৎ, বিজ্ঞান ও যন্ত্র শ্রমিককে ঠিক তাড়াইয়া দেয় নাই, শুধু একজায়গা হইতে আর একজায়গায়তে স্থানান্তরিত করিয়াছে। এই ব্যাপার, এক শিল্পে শ্রমিক বিতাড়ণ ও নূতন শিল্পে শ্রমিক গ্রহণ ইহা যদি পরস্পরের সহিত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া ধীরে ধীরে হয় তা' হইলে মোটের উপর সমাজে কোনও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইনা বলিতে হয়।

কিন্তু সবক্ষেত্রে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বজায় থাকিতেছেনা। প্রথমতঃ বিজ্ঞানের অগ্রগতি এত দ্রুত হইতেছে যে নূতন যন্ত্র কাজে লাগিয়া তাহার জন্য শ্রমিক একস্থান হইতে অপর স্থানে গুছাইয়া বসিবার পূর্ব্বেই সে যন্ত্র বাতিল হইয়া যাইতেছে। যে তালে বিজ্ঞানের প্রয়োগ অগ্রসর হইতেছে সেই তালে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ হইতেছেনা। শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ দ্রুত করা সম্ভব নয়। নূতন কারখানায় আসিয়া তাহার নূতন কাজ শিখিতে ও নিজের সন্তান সন্ততিকে সেই কাজে দক্ষ করিতে এক পুরুষ নয়, কয়েক পুরুষ কাটিয়া যায়। তাহা ছাড়া শ্রমিক যেখানে গৃহ বাঁধিল, সেইখানে আত্মীয় স্বজনের ও বন্ধু বান্ধবের মধ্যে তাহার সখ্যের বন্ধন গড়িয়া উঠে। এই গৃহ, সখ্য ও আত্মীয়তা দৃঢ় হইতে কিছু সময় লাগে, এবং এইগুলিই হইল শ্রমিকের জীবনের সুখ ও শ্রী। সেই গৃহ, সেই আত্মীয়তা ও সখ্যের বন্ধন যদি অনবরত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে তা' হইলে শ্রমিকের জীবনে সুখ শান্তি কোথায়? এই সব কষ্টের মধ্যে পড়িয়া শ্রমিক যদি প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহী হইয়া ওঠে তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

আর একটা সমস্যা আছে। পাশ্চাত্য অনেক দেশের জনসংখ্যা স্বাভাবিক কারণেই হউক বা কৃত্রিম কারণেই হউক উপযুক্ত রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেনা। জনবৃদ্ধির জন্য শিল্পদ্রব্যের যে চাহিদা স্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত হওয়া উচিৎ ছিল তাহা হইতেছেনা। সুতরাং হয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি ও তাহার উৎপাদন জোর করিয়া কমাইয়া রাখিতে হয়, নয় উৎপন্ন পণ্যকে বিদেশে, যে দেশ শিল্পপ্রধান নয়— সে দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানীর ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রথমোক্ত ব্যবস্থাতে বেকার সমস্যা অমীমাংসিত থাকিয়া যায় ও দ্বিতীয় ব্যবস্থাতে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে আর এক রাষ্ট্রের বিরোধের নূতন পথ খুলিয়া যায়। কোনও কোনও রাষ্ট্র অবশ্য জনসংখ্যা বাড়াইবার জন্য নানারূপ আইন প্রণয়ন করিয়াছে। অবিবাহিতের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স, বিবাহ করিলে রাষ্ট্রের তহবিল হইতে অর্থের দাদন ও সন্তান জন্মিলে সেই অর্থের আধানা হইতে পরিশোধ ইত্যাদি নানা উপায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য সাধারণকে উৎসাহিত করিতেছে। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টা কতদূর সফল হইবে তাহা এখনও বলা যায় না।

উপায় কি?

বিজ্ঞানের অগ্রগতি, প্রয়োগ ও প্রতিক্রিয়ার ফলে রাষ্ট্রে ও সমাজে এই যে সব নূতন সমস্যার উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের সমাধান কি উপায়ে হইবে? সমাধান করিতে না পারিয়া একপক্ষ বলেন যে বিজ্ঞানই যখন এই সব কুঘটনের জন্য দায়ী তখন বিজ্ঞানকে নির্ব্বাসিত করা হউক। বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের বিদ্যার অপব্যবহার করিতেছেন, অতএব তাঁহাদের পরীক্ষাগার বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার সব জটিল উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া নূতন করিয়া আবার সমাজ গড়িয়া তোলা হোক। আদিম যুগে মানুষ যে সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিত সেই জীবনযাত্রা প্রণালী আবার ফিরাইয়া আনা হোক। অপর পক্ষ বলেন যে ইহা অসম্ভব। বিজ্ঞান জীবনযাত্রাকে জটিল করিয়াছে সত্য, নূতন সমস্যা আনয়ন করিয়াছে সত্য, নূতন ও পুরাতনের মধ্যে বিরোধ জাগাইয়াছে তাহাও সত্য। কিন্তু তা হইলেও সমস্যার নিরাকরণ করিতে গেলে বিজ্ঞানকে এড়াইলে চলিবেনা। বরং বিজ্ঞান ও বিশেষ করিয়া বৈজ্ঞানিক বিচার-পদ্ধতি আরও বেশী করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক বিচার পদ্ধতি এতদিন ধরিয়া শুধু জড় জগতের নিয়মাবলী আবিষ্কারের জন্য ও জড় প্রকৃতির রহস্য বুঝিবার জন্য এক সংকীর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইত। এই প্রয়োগের ক্ষেত্র এখন বিস্তৃত করিতে হইবে। মানুষের সমাজে, জীবনে রাষ্ট্রে ও অন্যান্য যে সব কর্ম্মক্ষেত্রে এখনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংস্কার সাধিত হয় নাই, যে যে বিভাগের অগ্রগতি মানুষের দূরদর্শিতার অভাবেই হউক বা যে কারণেই হউক বন্ধ হইয়া আছে সেই সব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পাওয়া সহজসাধ্য

নয়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক যিনি তাঁহার মন যুক্তিবাদী সংস্কার লেশহীন। তিনি গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফল যাহা পান তাহা যদি তাঁহার কোনও দৃঢ়পোষিত মতবাদের বিরুদ্ধে যায় তাহা হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। জড় প্রকৃতির সম্বন্ধে এইরূপ মনোভাব লইয়া গবেষণা করা খুব আয়াসসাধ্য নয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি আলোচনা করার সময় গবেষক কি ঠিক বৈজ্ঞানিকের মনোভাব লইয়া সমস্ত প্রশ্ন সব দিক দিয়া নির্লিপ্তভাবে বিচার করিতে পারেন? তাঁহার জন্মগত সংস্কার, ধর্ম্মবিশ্বাস, স্বজাতিপ্রীতি, সমাজ শাসন—এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শাসন—তাঁহার বৈজ্ঞানিক বিচার পদ্ধতির পথে অসংখ্য বাধা সৃষ্টি করে। তাহা ছাড়া গবেষক যদিও বা ব্যাপক ও গভীর আলোচনার ফলে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহা সমাজে কি রাষ্ট্রে প্রয়োগ ও প্রচলিত করা সহজসাধ্য নয়। মানুষের মন সদাই রক্ষণশীল। মধ্যযুগে গ্যালিলিও সৌর জগতের গঠন সম্বন্ধে নূতন কথা শুনাইতে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে আজকাল অবশ্য মানুষের মন এতটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ইত্যাদির বেলা মানুষের মন আগের মতই সঙ্কীর্ণ অবস্থায় আছে। পুরাতন প্রথা, পুরাতন মতবাদ, শাস্ত্রের বচন বা আপ্তবাক্যের দোহাই দিয়া মানুষ নূতনকে ঠেকাইয়া রাখিতে চায়। মানুষের সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রের শুধু এক অংশে বিজ্ঞানের আলোক সম্পাত হইয়াছে; সেখানে মানুষের চোখ ফুটিয়াছে। নূতন গ্রহণ ও পুরাতন বর্জ্জন সম্বন্ধে মানুষ সু-বিচার করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু বাকি বৃহত্তর অংশ এখনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই অন্ধকারে মানুষ কোন্ দিকে যাইবে বা কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই বুঝিতে পারেনা। কিন্তু তবুও এখানে কেহ আলোক বর্ত্তিকা লইয়া অগ্রসর হইতে অক্ষম। অন্ধকারে বাস করিতে করিতে মানুষ এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহার চক্ষু জ্ঞানের ক্ষীণ আলোকও সহ্য করিতে পারেনা। যিনি আলোকে বর্ত্তিকা লইয়া অগ্রসর হইতে চান, চতুর্দ্দিক হইতে ফুৎকার আসিয়া তাঁহার বর্ত্তিকার দীপশিখা নিভাইয়া দেয়।

কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থা আর কতদিন চলিবে? মানুষের মনের ও চরিত্রের পরিবর্ত্তন কিরূপে করা যাইবে? জড় বিজ্ঞান মানুষকে কৃষ্টি দিয়াছে, বিত্ত দিয়াছে, পৃথিবী ধন দৌলৎ হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান ও সদ্‌বুদ্ধি দিতে পারে নাই। নীতি বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান যাহাতে তাহা দিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা আন্তর্জ্জাতিক ভাবে, মানুষের আধুনিক অবস্থা ও আধুনিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হইবে। দুই সহস্র বৎসর আগে, যখন জড় বিজ্ঞানের এই সব যুগান্তরকারী প্রয়োগ হয় নাই, যখন বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাষাভাষী সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের লোক প্রত্যেকে অচলায়তনের মধ্যে বাস করিত, তখনকার সময়ের রীতি, নীতি, আইনকানুন আশ্রয় করিয়া থাকিলে চলিবে না। পুরাতন জীর্ণ বসন ত্যাগ না করিয়া জোর করিয়া পরিধান করিতে চেষ্টা করিলে তাহা আরও ছিঁড়িয়া যায়। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। মানুষ আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তি যাহা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা, ভবিষ্যতে যাহা করিবে তাহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। এখন মানুষের যান্ত্রিক শক্তির প্রধান উৎস অনুপরমাণুর মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া। কিন্তু এ শক্তি অনুপরমাণুর উপরকার আবরণের শক্তি মাত্র। পরমাণুর অভ্যন্তরে যে প্রচণ্ড শক্তি নিহিত আছে তাহার সন্ধান মানুষ সবে মাত্র পাইয়াছে। এই শক্তি আয়ত্ত করিতে পারিলে মানুষ ধরাকে সরা জ্ঞান করিবে। কিন্তু তখনও যদি মানুষের চরিত্রের ও মনের উন্নতি না হয় তাহা হইলে মানুষ এ শক্তি লইয়া কি করিবে? অবোধ শিশুর হাতে আগুনের মত সে এই শক্তি লইয়া পৃথিবীতে ধ্বংসের লীলা সুরু করিয়া দিবে। সুতরাং উপসংহারে আবার বলি, জড়বিজ্ঞানের যে দ্রুত অগ্রগতি হইয়াছে তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিবার জন্য এখন চর্চ্চা করিতে হইবে মানুষের নীতিবিজ্ঞান, চরিত্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান—এক কথায় মানব-বিজ্ঞান। নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম হইলে চলিবে না। সকলকে অভয়ের বাণী শুনাইতে হইবে। মানুষ অতীতে যেমন বর্ব্বরতার অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া সভ্যতার আলোক দেখিতে সক্ষম হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতেও তেমনি যন্ত্রের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত সভ্যতার যা ফল—শুধু শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়—মানসিক উৎকর্ষ, শিক্ষা ও কৃষ্টি তাহাও সকলে সমানে, অবাধে ভোগ করিতে সক্ষম হইবে।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

পদের জন্য একখানা আবেদন করিয়াছিল; তাহারই-ইন্টার-ভিউ পত্র পাইয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছে। কিন্তু তাহার ন্যায় হতভাগ্যের যে কোন প্রকার আশা রাখাই মূর্খতা আজ সেখান হইতে সে তাহা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়া আসিয়াছে। একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাসে ঘরটা ভরিয়া এবং নিজের নিবুর্দ্ধিতাব প্রতি একটা বক্রোক্তি করিয়া প্রদোষ তাহার শয্যার উপব লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। মেসের উপর তলায় কে যেন গান ধরিয়াছে,—

"তুই বারে বারে জ্বালবি বাতী
হয়তো বাতী জ্বলবে না,
তা বলে ভাবনা করা চলবেনা—"

তাহার ক্লান্ত চক্ষু ধীরে ধীরে বুঁজিয়া আসিল—সঙ্গীতের শেষ চরণ তাহার তিয়াষা-কাতর শুষ্ক কণ্ঠে এক ফোঁটা 'স্ফটিক জল' যেন ঢালিয়া দেয়...।

* * * *

...ঘুম জমিয়া আসিল...কাহার যেন একটা মৃদু করস্পর্শ ...সম্মুখে 'প্রভাতী ক্লাবের' পবিত্র। ছাত্রাবস্থায় প্রদোষও এই বিনা চাঁদার ক্লাবটির সদস্য ছিল; এখন সে আর উপস্থিত হইতে না পারিলেও তাহার নামটি এই ক্লাবের মোটা খাতা হইতে লুপ্ত হয় নাই। তাই আজ সকালে প্রেসিডেণ্ট পঙ্কজ রায়ের বাড়ী সে ধাওয়া করিয়াছিল। তাহারই বসিবার ঘরে এই ক্লাবের অফিস। কথায় কথায় একখানি মাসিক পত্র চালানোর কথা উঠিয়া পড়িয়াছিল। আগে হাতের লেখা 'প্রভাতী' বাহির হইত মাসে মাসে; কিছুদিন পুর্ব্বে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই নূতন করিয়া আবার ইহা বাহির করিলে মন্দ হয় না ইত্যাদি।

...আজ এই সম্বন্ধেই কী একটা বলিবার জন্য পবিত্র আসিয়াছিল পঙ্কজ রায়ের তরফ হইতে। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরই সে তাহার কথা পাড়িল, তাহার শেষের দিকটা এইরূপ সম্পাদনা করতে হবে তোমাকেই, আপাতত মাসে মাসে পাবে এক শ'; কিন্তু সম্পাদকের নাম থাকবে 'পঙ্কজ রায়'। বড় লোকের খেয়াল—সব খরচ সে-ই চালাবে।

...প্রদোষের মনে হইল যেন একখানা নৌকা তাহার 'পচা জলের ডোবার' নামাইয়া দিয়া বহুদিনের অযত্ন-বর্দ্ধিত কচুরি পানার দুর্ভেদ্য জঙ্গল পবিত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে, কিছুদিনেই স্বচ্ছ জল টলটল্ করিয়া উঠিবে, তারপরেই ফুটীবে শ্বেত-রক্ত-বিচিত্র শতদল।

...আসন্তুকের পক্ষ হইতে প্রশ্ন আসিল,—কেমন রাজী ত?—প্রদোষ আর বলিবে কি? পরম স্বস্তির একটা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "হাঁ"—ইহার বেশী কথা তাহার মুখে আজ যোগাইল না।

* * *

"কই প্রদোষ বাবু, 'হাঁ' বলেই যে চুপ করলেন, উঠুন!"—রুম্‌মেট নরেশচন্দ্রের কথাটা কানে যাইতেই প্রদোষ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। চাহিয়া দেখিল ঘরে আর কেহ নাই। তবে কি এ সবই স্বপ্ন? সকাল বেলাকার সামান্য একটু ঘটনা লইয়া এতখানি জাল সে এবই মধ্যে বুনিয়া ফেলিয়াছে?

নরেশ বলিয়া চলিল, "সন্ধ্যে বেলায় ফিরে এসে দেখি পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছেন। একটা ঠেলা মারলুম, কিন্তু তাতে কি কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙে? যাক্, এবার নাকে মুখে যা হোক কিছু গুঁজে নিয়ে যতো ইচ্ছে ঘুমোন।"

প্রদোষ তাহার উত্তর দিলনা; শুধু কম্বলটা ভাল করিয়া টানিয়া লইয়া আবার শুইয়া পড়িল; মুখ দিয়া অস্ফুট স্বরে হয়তো বাহির হইয়া আসিল, "পচা জলের ডোবা।"

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী

অব্যক্তি

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ

তোমায় শুধু দেখি।
কতদিন ধরে' নীরব ব্রতপালনের পালা
চলেইছে—তবু ফুরোয় না।
কেবলই উপকরণের হিসেব করে মরি,
উদ্‌যাপনের ভরসা নেই।
শুধু শুনে' যাই—কণ্ঠ ঢেউ এসে লাগে
তোমার গতিভঙ্গীতে ;
ভাবি—কী মোহ জাগায় তোমার চাপা-হাসির স্ফুরণ।
তোমার টুক্‌রো কথার জড়ানো কোমল মীড়ে
রেশ থেকে যায়—
আমি বসে' শুনি কুণ্ঠিতমনে
তোমার চেতনার আড়ালে—
একান্ত দেশে।

আমার মুগ্ধ অপলক চোখ
দেখছে খালি তোমাকেই
তোমার অজানিতে।

এ কল্পনাবিলাসের বন্ধন টুটবে একদিন।
জানি, তবু মানি না।
ভয় হয়, মন বলে—যাক্ সে কথা।
তুমি ত কিছুই জান্‌বেনা—চলে যাবে উদাসভাবে
আপন জীবনপথে।
বুঝবে না—এত সান্নিধ্যেও র'য়ে গেলো
কী নিবিড় অপরিচয়।

সংসারের নিত্যকালের গুরুপ্রয়োজন
বাঁধবে তোমায় শৃঙ্খলায়।
নিগড়বদ্ধ হবে তোমার মিষ্ট লঘু চিত্তটি
আমার জন্যে ফেলবেনা ভুলেও
একটি গভীর শ্বাস।
তুমিত ধরতে পারো নি, হয়ত প্রয়াস করোনি—
কী অক্ষম অশান্তির বহ্নিজ্বালা
জ্বলছে হৃদয়ে অনির্বাণ।

মানুষ যখন বসে সর্ব্বনাশের পথে,
ঋণপঙ্কে হয় আকণ্ঠ-মগ্ন,
করে দ্বিগুণ ধার মরীয়া সাহসে।

প্রাণের কারবারে ফেল্-করা মানুষ আমি—
মন আমার দেউলে।
আঁক্‌ড়ে থাকবো তবু পরম-আপন বেদনাকে।
সেইখানেই মিল্‌বে চরম
শান্তি এবং সান্ত্বনা।

তোমার ওই আপনমনে অবলীলায় চলে-যাওয়ার পথে
জাগবে জানি ব্যথার জোয়ার।
তবু তোমার সহজ ও নিঃসংশয় বিদায়পালার পরে
আমার অব্যক্তির অর্থহীন দুঃখকে
বিষম্বী স্মৃতির বিফল তলে
পারবোনা—পারবোনা দিতে
নিরঞ্জন।

নন্দিনী

শ্রীইন্দ্রানী রায়

শ্বশুর শীতলেশ বসু, দিদিশাশুড়ী পদ্মাবতী ও গুটিকয়েক দাসদাসী লইয়া নন্দিনীর সংসার। সহরের নির্জ্জনপ্রান্তে ত্রিতল প্রাসাদখানি এই ক'টি প্রাণীকে লইয়া শূন্যতার ভারে সদাই যেন খাঁ খাঁ করিতে থাকে। শীতলেশবাবু অধিকাংশ সময়ই ত্রিতলের উত্তর দিকে ঠাকুর ঘরে সময় কাটান। পদ্মাবতীকে রাঁধুনীর কাছে থাকিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও রান্নার তদ্বির করিতে হয়; কারণ নন্দিনীকে এখন আর এসব ব্যাপারে আদৌ দেখা যায়না। অথচ সংসার নন্দিনীরই। এ বয়সে পদ্মাবতীর তীর্থবাস করিবার কথা, কিন্তু নন্দিনী তার সে পথেরও প্রতিবন্ধক।

কয়েক মাস পূর্ব্বেও নন্দিনীকে দেখা গিয়াছে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত, দুই একখানা গল্প উপন্যাস পড়িবার সময়ও তাহার মিলিত না। পদ্মাবতীকে তখন দেখা গিয়াছে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া পূজা আহ্নিক মালাজপ করিতে। ঠাকুর ঘরের পূজার আয়োজন রান্নার ব্যবস্থা, ঝি চাকরদের কাজের তদারক, শ্বশুর ও দিদিশাশুড়ীর খাওয়ার যত্ন,—এগুলো সারিয়া নন্দিনী যখন তেতলায় গিয়া পৌছিত, তখন তাকে দেখা যাইত অপরাহ্ণের স্থল পদ্মের মতই শ্রান্ত মনোরম। রাত্রিতে চারিদিকের ঝক্কি একেবারেই থাকে না, তখন দেখা যাইত শ্রান্তদেহে নন্দিনী গিয়া প্রবেশ করিয়াছে স্নানের ঘরে। স্নান শেষে হাল্কা ঋজুদেহলতাকে বিচিত্র শাড়ীতে শোভিত করিয়া তড়িতালোকিত পূবের সুদীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করিয়া শয়ন কক্ষের দিকে চলিয়াছে। আর নিখিলেশ সেই চলার পানে চাহিয়া মুগ্ধের মত কহিত—তোমার চলবার পথ যেন শেষ হয় না নন্দিনী। আমি কেবলি ভাবি, তোমার ঐ চলার পানে চেয়ে জগতের সব দুঃখই বুঝি ভুলে যাওয়া যায়। তাই, এ সময়টুকুতে আমার সব কাজ ফেলে এ বারান্দার পানে চোখ তুলে ধরি।

মধুর হাসিয়া নন্দিনী তার স্বামীকে কহিত—তোমার ঐ চেয়ে থাকার জন্যই যে আমার চলার সার্থকতা। তুমি চেয়ে না দেখলে হয়ত অন্যপথে ঘুরে যেতুম। নিখিলেশ উচ্চ হাসি হাসিয়া জবাব দিয়াছে—তুমি ভারি দুষ্ট নন্দিনী! আমার সবই তোমার একেবারে জানা। তাই নিঃশব্দে আমায় যেমন খুসী করতে পার, শাস্তিও দাও নিঃশব্দ থেকেই। অথচ আমি যখন রাগ করি কড়া কড়া কথা গুছিয়ে তোমার প্রতীক্ষা করতে থাক,—পরে…

নিখিলেশের ভোর রাতটায় রওনা হইতে হয় তার অফিসে। সহরে তার অফিস, এবং সে-ই অফিসের বড়বাবু। বাড়ী ফিরিতে নিখিলেশের প্রতিদিনই সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসে। পিতার সঞ্চিত অর্থ বহুপরিমাণে না থাকিলেও বাড়ীখানা এবং পুঁজি যা আছে নিখিলেশের চাকরী না করিলেও একপ্রকার চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তিন শত টাকার চাকরী সে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই।

এই নিখিলেশ যেদিন রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় অতর্কিতে নিতান্তই অসহায় ভাবে চিরকালের মত দুটি চোখ বন্ধ করিল—সেইদিন হইতে নন্দিনীর হাসি গান, চলাফেরা, কর্ম্মব্যস্ততা সব কিছু মৃত্যুর মতই হিম হইয়া গিয়াছে। নন্দিনী মরে নাই সত্য কিন্তু মৃত্যু যেন সর্ব্বদাই তাকে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে বাঁধিয়া বাঁধিয়া ছাড়িয়া যায়, আর অসহ্য যাতনায় আপেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরে—অনুভব করিতে চেষ্টা করে নিশ্বাস প্রশ্বাসের আয়ু শেষ হইয়া গেল কিনা।

—নন্দিনী বাঁচিয়া আছে এবং তারই তো সংসার। কিন্তু কয়েক মাস ধরিয়া নন্দিনীকে নীচের তলায় একদিনের জন্যও নামিতে দেখা যায় না। আঘাতের বেদনা কাহারও তো কম নয়। তবে নন্দিনীর জীবনে শোক এই প্রথম এবং এতই গভীর যে আজও সে প্রকৃতস্থ হইতে পারে নাই।

* * * একদিন শরৎকালের প্রভাতে স্নিগ্ধ হাসিমুখে নন্দিনী নীচে নামিয়া আসিল। গভীর বিস্ময়ে সকলেই দেখিল দুটি চোখ তার সজল—কিন্তু হাসি মুখে সকল কক্ষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অগোছাল জিনিষ গুছাইয়া রাখিতেছে। শ্বশুরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল নন্দিনী। মৃদুস্বরে তাঁকে কহিল—এত বড় বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে, ভাড়াটে বসালে মন্দ হয়না।—

নন্দিনীর উদাসকরা আনত মুখখানার পানে চাহিয়া শ্বশুর কহিলেন—তুমি কি ওসব ঝক্কি সইতে পারবে মা! কত রকমের লোক আসতে পারে, হয়ত ছেলেপেলে থাকবে বহু। তোমার অনভ্যস্ত মন তিতো হয়ে যাবে দুদিনেই—। আর নীচের তলায় থাকলেই বা কি, ছেলেপিলেরা দৌরাত্ম্য করে বেড়াবে উপরে নীচে সারাক্ষণ। তার চেয়ে বরং চলো, চলে যাই সব বাড়ী ভাড়া দিয়ে কোন তীর্থস্থানে।

আপন মনের মধ্যে চমকাইয়া উঠিল নন্দিনী। তীর্থের জন্য মন তো তার একদিনও কাঁদে না! নিখিলেশের স্মৃতি-বিজড়িত গৃহ,—এই তো তার পরম তীর্থস্থান! নিঃসঙ্গ জীবন তার মাঝে মাঝে দুঃসহ হইয়া উঠিতে চায়, তাই সে চায় মানুষ,—মানুষের মুখ দেখিয়া এ তীর্থ-মন্দিরে জীবন তার কাটিয়া যাইবে স্বচ্ছন্দে।

আর্দ্রকণ্ঠে নন্দিনী কহিল—এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও আমার যেতে ইচ্ছে করছেনা। দিদিমাকে না হয় পাঠিয়ে দিন কাশী। এত বড় বাড়ীটায় মানুষ এলে আমাদের আর খারাপ লাগবে না। শীতলেশ বুঝিলেন নন্দিনীর বেদনা কোথায়। সান্ত্বনার স্বরে তিনি কহিলেন, তুমি কিছু ভেবনা মা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

একদিন ক্ষেমী ঝির কাছে নন্দিনী শুনিল ভাড়াটে আসিয়াছে। শুনিবামাত্র কী এক অদম্য কৌতুহলে নন্দিনী স্থির থাকিতে পারিলনা। দোতলার বারান্দার রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অনেকগুলো কিশোর কচিমুখ, দু একটি তরুণীবধূ আবিষ্কারের চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রতিদিনের মত নিঃশব্দতা দেখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া আপন ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

শীতলেশ বাবুর কাছে নন্দিনী শুনিল একটি বধূ নাকি আসিয়াছে তার রুগ্ন স্বামীকে লইয়া। সহর হইতে এক দেবর আসিয়া দেখা শুনা করিতেছে। সংসারে নিকট আত্মীয় বলিতে আর কেহ নাই। কবিরাজী মতে চিকিৎসা চলিতেছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে এস্থান অনুকূল, কোথাও চেঞ্জে যাওয়ার মত অবস্থাও নয়; কাজেই কিছু দিন এখানেই থাকিবে। ছেলেটি নিখিলেশেরই বয়সী, অত্যন্ত বিনয়ী—কোন্ স্কুলের নাকি হেড্‌মাষ্টার। অসুখে একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়ায় ছুটী লইয়া আসিয়াছে।

একদিন স্তব্ধ মধ্যাহ্নে নন্দিনী সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। অতি সন্তর্পণে রোগীর কক্ষের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত নীচতলাটাই ভাড়া দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আসিয়াছে মাত্র দুইটি প্রাণী। দুইটি ঘরই ওদের পক্ষে যথেষ্ট।—অনেক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও নন্দিনী কাহারও সাড়া পাইল না, নীরবে ফিরিবার উপক্রম করিতেই দেখিল নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটি কিশোরী বধূ—পেছনে ক্ষেমী।

গভীর বিস্ময়ে ক্ষেমী কহিয়া উঠিল—ওমা, তুমি এখানে বৌদিমণি? বিস্মিত দুটি চোখ নন্দিনীর মুখের উপর মেলিয়া ধরিয়া অপরিচিতা বধূটি কহিল—ওঃ আপনাদেরই এ বাড়ী? দেখতে এলেন বুঝি আমাদের।

স্নিগ্ধস্বরে নন্দিনী কহিল—হ্যাঁ ভাই, দেখতেই এলাম,—তুমি আর তোমার বরই বুঝি এসেছো? রোগী মানুষ নিয়ে একেবারে একা,—আর কেউ নেইও শুনছি—

এইবার বউটির দুই চোখ ছলছল করিয়া ওঠে, মুখখানি নত করিয়া কহিল ওঁর এক মামাতো ভাই ছাড়া শ্বশুর ঘরের আর কেউ বড় নেই। মা আর দাদা আছেন আমার, তাঁরা দেশেই থাকেন। অনুকম্পায় নন্দিনীর মন ভরিয়া উঠে,—সান্ত্বনার স্বরে কহিল—চিন্তা করোনা, নিয়মমত ওষুধ পথ্য করো, তোমার বর ভাল হয়ে উঠবেন নিশ্চয়ই।

মাসছয়েক পর—। রুগ্ন অশোক, স্ত্রী নিরুপমা দুজনেই শীতলেশবাবু ও নন্দিনীর সহিত ঘনিষ্টতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। অশোকের পক্ষাঘাত,—ধীরে ধীরে তার উন্নতি—। খামখেয়ালী লোক,—নিজের দোষে কোন কোন সময় রোগের মাত্রা বাড়াইয়া তুলে। ছেলেমানুষ স্ত্রী বিব্রত হইয়া নন্দিনীর কাছে ছুটিয়া যায়।

একদিন অপরাহ্ণ বেলা—। নন্দিনী ফল কাটিয়া শ্বেত-পাথরের রেকাবী ভরিয়া সাজাইতেছে—নিরুপমা আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। মুখ না তুলিয়াই নন্দিনী জিজ্ঞাসা করিল—কি ভাই ঘরের কাজ সব হয়ে গেল? অশোকবাবু আজ কেমন? ছদিন ধরে যেতেও পারছিনে।

বধূটী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে—নন্দিনী মুখ তুলিয়া চায়। প্রসাধনের পারিপাট্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া নন্দিনী জিজ্ঞাসা করিল—ওকি, কোথায় যাচ্ছো? অশোকবাবু বুঝি আজ একটু ভালো।

অপ্রস্তুত হইয়া নিরু কহিল—না—না,—তিনি তো রোজের মতই আছেন। আজ ক'দিন জ্বরটা আসছেনা এই যা। কাল রাতে নিশীথ ঠাকুরপো এসেছেন, আজ এখানেই আছেন। তা—তিনি একটু বায়স্কোপে নিয়ে যেতে চান—অথচ ঘরে অসুখ। তিনিও বলছেন অসুখ তো রোজই আছে, নিশীথ যখন এত করে বলছে, না গেলে অসন্তুষ্ট হবে।

এতকথা শুনিবার আগ্রহ ওর ছিলনা—নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল। নিশীথকে আজ পর্য্যন্ত নন্দিনী একদিনও দেখে নাই—কিন্তু তার প্রসঙ্গ কেন জানি ওর অপ্রীতিকর মনে হয়। দ্বিধাজড়িত স্বরে বউটি কহিল—দিদি, একটা কথা।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নন্দিনী তার মুখের পানে চাহিতেই নতমুখে নিরুপমা কহিল—ওকে একা ফেলে যাচ্ছি আপনি যদি গিয়ে একটু বসেন—আর সন্ধ্যা সাতটায় ক্ষেমী যদি একবার ওষুধটা দেয়।—তিক্ততায় নন্দিনীর মন ভরিয়া উঠিল—কিন্তু বধূটির মুখের পানে চাহিয়া ওর কেমন মায়া হইল। সকল সমস্যা হইতে নিরুপমাকে মুক্তি দিয়া নন্দিনী কহিল—যাবে যাও,—অশোকবাবুর যেটুকু দরকার তা চলবেই। নিরু হয়ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল. মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে নন্দিনী কক্ষান্তরে চলিয়া গেছে।

অশোকের মাথার ধারে বসিয়া নন্দিনী হাওয়া করিতেছে। ক্ষেমী ষ্টোভ জ্বালিয়া পথ্য প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত। নিরুপমা তখনও বায়স্কোপ হইতে ফিরে নাই। ক্লান্তস্বরে অশোক কথা কহিতেছিল—সত্যি, আপনাকে আমার এত ভালো লাগে। আপনি এলে আমার খালি কথা বলতে ইচ্ছে করে। ঘুম থেকে জাগতেই মনে হয়, সারাদিনে দিদিকে কখন একবার দেখবো!

শাসনের সুরে নন্দিনী কহিল—চুপ করুন এখন একটু। এতবাজে বকলে আমি আর আসবোনা বলছি। আকুল হইয়া অশোক কহিল—আপনি বুঝতে পারছেননা দিদি, আমার মনে হয় আর বেশী দিন আমি বাঁচবোনা। তাই আপনার দেখা পেলেই আমি এত কথা বলি। আমার দিদি আজ বেঁচে নেই, কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁর সাথে আপনার চেহারার এত মিল!

নন্দিনী কথা বলেনা, নিঃশব্দে হাওয়া করিতে থাকে। এই নীরবতা অশোক সহিতে পারেনা—নন্দিনীর কথা শুনিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠে। হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া অশোক কহিল—না, না,—আপনি চলে যান দিদি, আপনার কতকাজ—আমার আর হাওয়ার প্রয়োজন নেই। কথার শেষে অশোকের নিঃশ্বাস দ্রুত হইয়া উঠে। মুহূর্ত্তে নন্দিনী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অশোকের দিকে পাখাটা ফেলিয়া দিয়া কঠিন কণ্ঠে কহিল—যত রাগ বুঝি আমার উপর! আমি আপনাদের কে, বলুন তো? নিজের স্ত্রী রয়েছে—তাকে পাঠান হাওয়া খেতে,—সে সময় রাগ অভিমান থাকে কোথায়!

দ্রুতপদে নন্দিনী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সিঁড়ির ধাপে ধাপে তার পদধ্বনির প্রতিটি বিক্ষেপ আসিয়া অশোকের বুকখানা যেন ভাঙিয়া দিতে চাহিল।

—রাশি রাশি বই কিনিয়া শীতলেশবাবু ছোট্ট একটা লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিয়াছেন। দিনের অধিকাংশ সময় তাঁর ঠাকুর ঘর ও পড়ার ঘরেই কাটিয়া যায়। তীর্থের জন্য শূন্য মন অধীর হইয়া উঠে—কিন্তু নন্দিনী যে তীর্থের নামে সাড়া দেয়না। সকল তীর্থের পরমধন যেন এ গৃহেই খুঁজিলে মিলিবে। এ গৃহের রেণু-পরমাণুর সঙ্গে বর্ত্তমানে ওর কী সুগভীর নিবিড়তা। নিখিলেশের টেবিল, জামাকাপড়, বই, আলমারী পূর্ব্বের মত সাজাইয়া গুছাইয়া তার দিন কাটে! ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই যে ও বাঁচিয়া আছে। কতদিন নন্দিনী নীচে যায়না—অশোককে সেই যে আঘাত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, আর তাকে দেখিতে যায় নাই। ও যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে! অশোকের সান্নিধ্য ওর মনকে অপ্রকৃতস্থ করিয়া তুলে।

শীতলেশবাবু, একদিন উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন—মা, তোমার শরীরটা কি ভালো যাচ্ছেনা?

চমকিয়া নন্দিনী শ্বশুরের মুখেরপানে চাহিয়া কহিল—কৈ, না—আমি তো বেশ আছি। অনেকদিন বুঝি অশোককে দেখতে যাওনা! বছর ঘুরে এল—রোগের তো বিশেষ উন্নতি দেখছিনে। আজ দেখতে গেছি, বারবার জিজ্ঞেস করলে দিদির অসুখ নাকি, তাঁকে আজ কাল দেখিনে কেন। বলে এলাম শরীরটা হয়ত ভালো নেই তাঁর। স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল নন্দিনী। ক্ষেমী আসিয়া কহিল—বৌদিমণি, তোমার অসুখ সেরে থাকলে অশোকবাবু একবার ডাকছেন—আজ আবার জ্বর এলো অনেক দিন পর। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া শীতলেশ গিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। শয়নকক্ষের দ্বারবন্ধ করিয়া শূন্য বিছানার উপর পড়িয়া অধীর আবেগে নন্দিনী কাঁদিতে লাগিল। অশোক—অশোক—তাহাকে এত কথা বলিবার কে। এত আবদার অভিমানের দাবী সে কোথা হইতে পাইল। নিজের স্ত্রী থাকিতে অভিমান, অভিযোগ নন্দিনীর উপর কেন? অশোকের ছেলেমানুষী আবদার অভিমানের অন্তরালে—নিখিলেশের কথার সুর যে সুস্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসে। সেই সুর বাস্তব সংসার হইতে নন্দিনীকে যেন অনেক—অনেক দূরে টানিয়া নেয়—। সেখানে নিখিলেশ যেন গভীর অভিমান ব্যথায় মৌন হইয়া আছে। তাঁর অভিমান ভাঙিতে গিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদে নন্দিনী,—তবু নিখিলেশের সাড়া পাওয়া যায়না। অশোকের আবির্ভাবে নিখিলেশের অভিমান যেন তীব্রভাবে বাড়িয়া উঠিতেছে। কেমন করিয়া আজ নিখিলেশকে শান্ত করিবে, নন্দিনী তার সীমা করিয়া উঠিতে পারেনা।

গভীর বেদনার মধ্য দিয়া নন্দিনীর কেবলই মনে পড়িতে লাগিল—নিখিলেশের এতটুকু সেবার প্রয়োজন পড়ে নাই কোন দিন। নীরোগ দেহ নিয়া অকস্মাৎ সে চলিয়া গেল। বিনিদ্র রজনী বসিয়া থাকিয়া মাথায় হাওয়া করা, শীর্ণমুখখানি দেখিতে দেখিতে অশ্রু গোপন করিবার সময় নিখিলেশের কাছে ধরা পড়িয়া যাওয়া—নন্দিনীর জীবনে যে একদিনের জন্যও আসিলনা। অথচ নিঃসম্পর্কীয় অশোকের আবদার তাকে পালিতে হয়। দুঃখে কতদিন দুই চোখে ওর অশ্রু জমিয়া উঠিয়াছে—আত্মগোপন করিবার জন্য কতদিন মিথ্যা কাজের অজুহাত দেখাইয়া চলিয়া আসিতে হয়।

একদিন সন্ধ্যার পরক্ষণ—। নিরুপমা নন্দিনীর ঘরে প্রবেশ করিয়া সঙ্কোচের হাসি হাসিয়া কহিল—চার মাসের বাড়ীভাড়া বাকী পড়েছিল,—দু'মাসের তুলে রেখে দিন—হয়ত আবার আমরাই চেয়ে নেবো। ডাক্তার কবিরাজে ওষুধ পথ্যে—

দয়ার্দ্র কণ্ঠে নন্দিনী কহিল—ও টাকা এখন তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও ভাই। অশোকবাবু সেরে উঠলে তখন দিও। নম্রকণ্ঠে নিরু কহিল—এবাড়ীতে এসে পড়েছিলেম,—তাই রক্ষা—। আমার সুদিন হয়ত আর নাও আসতে পারে—কথার শেষে নিরুপমার দুইচোখ অশ্রুভার হইয়া উঠে। নিজকে সামলাইয়া কহিল—নিশীথ ঠাকুরপো এসেছে, ও-ই তো আজকাল সাহায্য করছে। সংসার বলে ওর কিছু নেই বলেইনা এতটা করতে পারছে। নন্দিনী চুপ করিয়া থাকে—নিরুপমা চলিয়া যায়—।

সমস্ত দিনের মধ্যে আজ একবারও অশোককে দেখিতে যাওয়া হইয়া উঠে নাই। শীতলেশবাবু উপরে নাই, নিশ্চয়ই অশোকের ঘরে গিয়াছেন। নন্দিনী নীচে নামিয়া গেল।—অপরিচিত কণ্ঠস্বর—নন্দিনীরই সম্বন্ধে। আড়ষ্ট হইয়া ও বারান্দার কোণে দাঁড়াইল। ঘরে নিশ্চয়ই নিশীথ। নিশীথ যায় নাই,—শীতলেশও নীচে আসেন নাই। নন্দিনী ফিরিতে উদ্যত হইতেই শুনিল নিশীথ কহিতেছে—তোমরা বলেছিলে বিধবা। শাড়ী গয়না দেখে আজ আমি চমকে গেছি। ভারি মিষ্টি চেহারা,—আবার বিয়ে দেওয়া উচিত, কি বলো অশোক দা?

অশোকের দুর্ব্বল কণ্ঠ শোনা গেল—শাদা থান, খালি হাত শীতলেশবাবু সইতে পারেন না, তাই ওগুলো দিদির পরতে হয়। ও ছাড়া দিদিকে আর কিছু মানায়ও না। বিয়ের কথা বোলচ? ছিঃ— তাঁকে তোমরা জাননা, ভেতরের রূপ তাঁর বাইরের চেয়েও সুন্দর। অশোক নন্দিনীর প্রসঙ্গে চঞ্চল মুখর হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে নিরুপমা কহিল—থামো, তোমার বাড়াবাড়ি বড্ড

বেড়ে গেছে। লজ্জা বলে তোমার সব খুইয়ে বসেছো। আশ্চর্য্য! ভুলে যেওনা তাঁর সাথে আমাদের সত্যিকার কোন সম্বন্ধ নেই। নিশীথের কণ্ঠস্বরে আবার নন্দিনীর নাম শুনা গেল। ঘৃণায় ক্রোধে নন্দিনীর সমস্ত দেহ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। উত্তেজনার মুখেই ও ওপরে উঠিয়া গিয়া শ্বশুরের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। আজ স্পষ্ট করিয়া শ্বশুরকে ও কহিবে—এ ভাড়াটে এই মুহূর্ত্তে উঠাইয়া দেওয়া হউক। নন্দিনীকে তারা আলোচ্য বিষয় করিয়া তুলিল কোন সাহসে!

ঘরে প্রবেশ করিয়া নন্দিনী দেখিল দুটি চোখ মুদিয়া তাহার শ্বশুর জপে বসিয়াছেন। বাহিরের স্বল্প জ্যোৎস্নালোক আসিয়া ধ্যানস্থ মুখের উপর পড়িয়াছে, মুহূর্ত্তে কী এক অপার্থিব শান্তিতে নন্দিনীর মন পূর্ণ হইয়া উঠিল।—মান অপমান ক্রোধ সব একাকার হইয়া গেল। নন্দিনীর মনে হইল এ দুনিয়ায় সবই তুচ্ছ,—মিথ্যা—। যাকে ভাবিতে গেলে দেহমন অসাড় হইয়া দুটী চোক মুদিয়া আসে তিনিই সত্য। তুচ্ছ, তুচ্ছ—নীচরে ভাড়াটে তার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ! তাদের মুখের কথার মূল্য কতটুকু!

রোগযন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে বেপরোয়া ছেলেমানুষ হইয়া উঠে অশোক। নন্দিনীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা সে অনেক-দিন হইতেই ভুলিয়া বসিয়া আছে। শ্বশুরের আহ্বানে নন্দিনীর সেদিন অশোকের কাছে গিয়া বসিতে হইল। নিরুপমা গিয়াছে নিশীথের সাথে পূজার বাজার করিতে। নিশীথ ও শীতলেশ বাবুর অনুরোধে তাকে যাইতে হইয়াছে। কে জানে, আগামী পূজায় এ দিন তার নাও থাকিতে পারে। অনেক্ষণ বসিয়া শীতলেশবাবু উপরে উঠিয়া গেলেন—তাঁর সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হইয়াছে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া নন্দিনী কহিল—নিশীথবাবু বুঝি আপনাদের চেঞ্জের বন্দোবস্ত করছেন? অশোক কাতরস্বরে কহিল—ওদের জন্যেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়, অসুখও যায় বেড়ে। দুজনে খালি পরামর্শই করে,—করুক ওদের যা খুশী। দেহটা এখন মাটির ডেলা ছাড়া আর কি। ওরা বুঝলেনা দিদি, আপনার এখান থেকে গেলে আমার রোগ হয়ত বেড়েই যাবে।

নিজের মনের মধ্যে চমকাইয়া উঠিল নন্দিনী। অশোক তাহার মধ্যে এমন কী পাইয়াছে—যেখানে জীবন মৃত্যু লইয়া প্রশ্ন জাগে। আপনার অজ্ঞাতে—

নন্দিনীর দুইচোখ অশ্রুভারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আত্মগোপন করিবার জন্য অশোকের বিছানা সংলগ্ন চেয়ার ছাড়িয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল—শ্বশুরঠাকুরের খাবার সময় হয়েছে,—আমি আজ যাই।

অশোক হঠাৎ চঞ্চল হইয়া হাত বাড়াইয়া নন্দিনীর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—না,—না—আপনি এখন কিছুতেই যেতে পারবেন না। আমার আবার হয়ত জ্বর আসছে—আপনি বুঝতে পারেন না বুঝি!

সন্ত্রস্ত হইয়া হাত ছাড়াইয়া নিতেই সদ্যাগত নিরুপমার সঙ্গে নন্দিনীর দৃষ্টি মিলিয়া গেল। নন্দিনী দেখিল অনুগ্রহ-প্রার্থিণী স্বল্পভাষিণী বধূটির দুইচোখে যেন হঠাৎ অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নন্দিনীর হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলো হঠাৎ যেন পাথরের মত কঠিন হইয়া উঠিল। নিরুপমার পানে চাহিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল, তোমাদের বাড়াবাড়ি বড্ড বেড়ে গেছে। সকলেরই রোগে মাথা খারাপ হয়ে যায়নি। স্বামী সেবার ভার অন্যের হাতে দিয়ে নিজে যাও স্ফূর্ত্তি করতে—ছিঃ! আর নয়, এবাড়ী তোমাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত। বিদ্যুৎবেগে নন্দিনী কক্ষ ছাড়িয়া গেল। গভীর বেদনা-বিস্ময়ে অশোক আচ্ছন্ন হইয়া চোখ মুদিল।

কয়েক মাস পর। নিশীথ এখন নিরুপমাদের সঙ্গেই থাকে। অশোকের অনেকটা উন্নতি দেখা যায়, লাঠির সাহায্যে ঘরের মধ্যে হাঁটিয়া বেড়ায়। সে যেন রোগে পড়িয়া সংসারের বাইরে চলিয়া গেছে। তার বিদ্যাবুদ্ধির আজ যেন কোন দাম নাই। নিশীথ ও নিরুপমার পরামর্শে ওকে চলিতে হয়। পশ্চিমে যাওয়া ওদের ঠিক হইয়া গেছে। নিশীথের অর্থ আছে, সকলকিছুর উদ্যোক্তা সে-ই। অশোক আর একটু সুস্থ হইলেই তারা রওনা হইয়া পড়িবে।

নন্দিনী সেই যে চলিয়া গেল আর নীচে নামে নাই। নিশীথ থাকায় নন্দিনীর কাছে নিরুপমার এখন আর সাহায্যের জন্য মাথা নত করিয়া দাঁড়াইতে হয় না। শীতলেশবাবু পূর্ব্বের মতই আসিয়া অশোককে দেখিয়া যান। অশোক মরিয়া হইয়া

একদিন নন্দিনীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, নন্দিনী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, আজকাল পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থবোধ করিলেও নিজের ঘর ছাড়িয়া কোথাও বড় সে যায়না।

ঘরের মধ্যে শান্ত-স্নিগ্ধ সবুজ আলোর মায়া। বড় আর্শীটার সম্মুখে সুচিত্রিত কেদারায় বসিয়া নন্দিনী তার রুক্ষ কেশ দুইভাগ করিয়া চিরুণী চালাইতেছে। চোখে মুখে একটা গভীর ক্লান্তি। নিজের অসুস্থতায় ঘরের শ্রীও যেন একেবারে বদলাইয়া গেছে। আজ অসুস্থ মনের মধ্যে নিখিলেশের অস্তিত্ব বড় বেশী অনুভূত হইতেছে। হাতের চিরুণী থামিয়া যায়,—দুটি চোখ মুদিয়া ও মনের দুয়ারে নিখিলেশকে খুঁজিয়া মরে। সব শূন্য —মুহূর্ত্তে সব মিলাইয়া যায়—।

ক্ষেমীর আহ্বানে চমকিয়া নন্দিনী চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে তার ঘরের দুয়ারে শ্রান্ত দুটি চোখ মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে অশোক। এ যেন স্বপ্ন! মুহূর্ত্তে নন্দিনী কেশ-বাস ঠিক করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। ক্ষেমীর পানে চাহিয়া কহিল—উ.ক কেন এখানে নিয়ে এলি? রোগীমানুষ কি করে এলেন এখানে। শীঘ্‌গির কর্ত্তাবাবুকে ডেকে আন—;

আহতস্বরে অশোক কহিল—আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন দিদি! শেষ দেখা করতে এলাম। হয়ত জীবনে আর দেখা হবে না,—অশোকের কণ্ঠ বেদনায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া আবার কহিল—আমার জন্যে আপনার যে দুঃখ পেতে হলো, তাই বলে তা ভুলে যাবেন, আজই চলে যাচ্ছি।

—আজই? কখন? চমকিয়া নন্দিনী প্রশ্ন করিল। অশোক কহিল—রাত চারটায় মোটর আসবে,—আজ দুপুরের দিকে কথা ঠিক হলো—।

ধীরে অশোক চৌকাঠ পার হইয়া ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। নন্দিনী বসিবার আসন দিতেই কহিল, এখন যাই—অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি অসুখের সময়। এত কষ্ট পাই, যখনই ভাবি আপনাকে কেউ বুঝলেনা—নিরু পর্য্যন্ত! অশোক নীচু হইয়া নন্দিনীর চরণ স্পর্শ করিতেই বিদ্যুৎস্পর্শের মত সরিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত স্বরে নন্দিনী কহিতে লাগিল, এ কী কল্লেন আপনি! ব্রাহ্মণ হয়ে—না'—না আমার পাপ হবে যে। অশোক কথা কহিতে গেল, পারিলনা, চোখের দৃষ্টি অর্থহীন—। ভয় পাইয়া নন্দিনী হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল, মেঝের উপর অশোক টলিয়া পড়িল,—কান্নায় নন্দিনীর কণ্ঠ বুজিয়া আসিল। দ্বারের সম্মুখে উদ্বিগ্ন হইয়া শীতলেশ বাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যস্ত-ব্যাকুল হইয়া নিরুপমা ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। সকলকে অভয় দিয়া নিশীথ কহিল—ভয় নেই—মূর্চ্ছা—।

শ্রীইন্দ্রাণী রায়

'ভাব্‌তে লাগে ভাল'

শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায় এম-এ

মনে মনে শুধুই আমি ভাবি কেবল ভাবি
বাস্‌বে কিনা আমায় তুমি ভাল!
কল্পলোকের স্বপ্ন-ছোঁয়া প্রাসাদপুরীর চাবি
তাই দিয়ে কি আন্‌বে চাঁদের আলো?
রঙীন আকাশ রাতের ডানায় পড়ল বুঝি ঢাকা;
অন্ধ পাখী আঁধার মাঝে ঝাপ্‌টে মরে পাখা,
জীবন শুধু মরণ হতে আগ্‌লে দেহ রাখা
ক্ষীণ জোনাকির আলো!
হলই বা তাই, ভাবছি তবু একলা ঘরে বসি
বাসবে কিনা আমায় তুমি ভাল!

অকারণে সেই কথাটাই জাগে কেবল জাগে
আমায় তোমার ধরবে কিনা মনে!
তোমার সজল আঁখি-পাতায় শ্যামল আভা লাগে
উতল সাঁঝের নিভৃত যৌবনে?
করুণ বিলাপ আছড়ে মরে এই ধরণীর মাঝে,
ফুটি ফুটি বন্দনকলি ফুটলোনা আর লাজে,
ভাঙা আশার করুণ ভাষা শ্রাবণ মেঘে বাজে
বোড়ো হাওয়ার সনে,
হলই বা তাই, ভাবছি তবু একলা ঘরে বসি,
ধরবে কিনা আমায় তোমার মনে!

এই কথাটা ভাবতে লাগে ভাল কতই ভাল
আমার লাগি আঁখি তোমার জাগে,
আমায় স্মরি বক্ষে তোমার প্রেমের প্রদীপ জ্বাল
স্তব্ধ রাতের অন্ধ অনুরাগে!
হাজার লোকের হাজার কথার দুর্ব্বিষহ ভিড়ে
হারওনিত ক্ষণেক তরে আমার স্মৃতিটিরে!
গুপ্ত ব্যথায় গুমরে হৃদি উঠছে ধীরে ধীরে
আমায় বুঝি মাগে!
ভাবছি বসে একলা ঘরে, ভাবতে লাগে ভাল,
আমার লাগি আঁখি তোমার জাগে।

সুধী-র বন্ধু

শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী

দুই বন্ধু—সুধী আর অনাদি। কিন্তু কেন এত বন্ধুত্ব কে জানে। দুজনে এমন অসাদৃশ্য, যেন আসমান আর জমিন। সুধীর রঙ কালো, স্বভাব ডানপিটে, রুচি বেপরোয়া, অর্থাৎ যখন যেদিকে ঝোঁকে মন। আর অনাদি? অনাদি গৌরবর্ণ, শান্ত, সংযত। এত অমিল, তবু বন্ধুত্ব, সেই পাঠশালায় পড়বার সময় থেকে সুরু, আর আজ পরিপূর্ণ যৌবনেও তেমনই অটুট।

কলেজে সুধী গেল আর্টস কোর্সে, অনাদি বেছে নিল সায়েন্স। সুধী খেলে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস; অনাদি থাকে দাঁড়িয়ে—দর্শকদের একজন। নিজের ডিপার্টমেণ্টে ক্লাসের পড়ায় সুধী দেয় ফাঁকি; ফেলের নম্বরও তাই নিত্য পাওনা। এদিকে অনাদি ফার্স্ট বয়, প্রফেসরের প্রিয়, স্কলারশিপটি হাত-ধরা। তবু পরম বন্ধুত্ব—সুধীতে আর অনাদিতে।

হঠাৎ কিন্তু এক জায়গায় এসে দুইটি বিভিন্ন ধারা একমুখী হয়ে বইতে লাগল, অন্তরের বন্ধন হ'ল দৃঢ়তর। আই-এ পাশ করতে না করতে সুধীর খেয়াল চাপল বিলেত যাবে। অভিভাবক চোখ রাঙালেন, "বিলেতটা কি রসগোল্লা যে বায়না ধরলেই অমনি কিনে এনে দেব?"

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু তা-ই দিতে হ'ল। গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগ—চলল সুধী বিলেতে। অনাদি রইল পড়ে পিছনে, বাপ বড় কড়া। মন কিন্তু কালাপাণি পার হয়ে ছুটল সুধীর সঙ্গে। নিত্য পত্রালাপ, নিত্য নানারকম মতলব আঁটা। সুধীর এক ভাবনা, কি করে অনাদিকেও টেনে আনা যায়। অনাদি না এলে ওর নিজের আসাটা সার্থক হয় না, সম্পূর্ণও না। কিন্তু অভিভাবকদের যৌবন যে গত হয়ে গেছে অনেক দিন! স্বপ্নের পাখা মেলে কল্পনার নীল নভে সঞ্চরণ করা—সে কি জরাগ্রস্ত মনের কাজ?

তবু একদিন হয়ে গেল। এক-এক সময় সংসারে অসম্ভবও সম্ভব হয়। বছর দুই পরে অনাদি পাশ করে পেল গবর্ণমেণ্টের এক মোটা রকম বৃত্তি—ভালো ছাত্রদের জন্যে ধার্য্য। চলল সায়েন্সের কী একটা পড়তে। আনন্দে সুধী আত্মহারা। অতদূর থেকে আর কিছুই করতে না পেরে শেষকালে অনেক টাকা খরচ করে বেতারে পাঠাল এক বার্ত্তা। ভূমধ্যসাগরে ষ্টীমারে বসে অনাদি শুনল 'লরা'কে নিয়ে সুধী আসবে ভিক্টোরিয়ায়। একটা পরীক্ষা নাকি ভূতের মতো চেপেছে ঘাড়ে, নইলে আসত ডোভার, ক্যালে, এমন কি মার্সেলসে। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, তাই শুধু ষ্টেশনে এসেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

বন্ধুর আনন্দবার্ত্তা অনাদিকে কিন্তু চমকে দিলে। বসে বসে ভাবতে লাগল—লরা কে? ইংরেজ মেয়ে নিশ্চয়ই। সুধী তাহ'লে এরই মধ্যে—? বছর দুই না যেতেই—?

নির্দ্দিষ্ট দিনে ভিক্টোরিয়ায় ডোভার থেকে কত ট্রেণ এলো আর গেল, প্লাটফরমে পায়চারি করতে করতে সুধী ক্লান্ত হয়ে পড়ল, অনাদির দেখা নেই। ষ্টীমার ঠিকমতো পৌঁছেছে, খবর পাওয়া গেছে। কী হ'ল তবে, কোথায় গেল অনাদি?

বন্ধুর ভাবনায় রাত্রে সুধীর ঘুম হয় না, পরীক্ষা সেবার গেল ভেসে। এমনি যখন উতলা অবস্থা, খবর এলো এডিনবরা থেকে। অনাদি ক্ষমা চেয়ে লিখেছে সুধীকে লণ্ডনে দেখা করতে পারল না বলে।

সুধী অবাক। মানে কী এর? লণ্ডনে নেমে লণ্ডন থেকেই গেল এডিনবরায়—সুধীর সঙ্গে দেখা করতেই হ'ল যত বাধা? ক্ষোভে দুঃখে সুধী উত্তরও দিল না।

কিন্তু খবর আছে শুনে ফুল্লরা ওরফে লরা যখন দেখা

করতে এলো, অভিমানে তেইশ বছরের ছেলের চোখ ছলছল করে উঠল।

ফুল্লরা একটুখানি হেসে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। বলবে কী? বোঝা মুস্কিল অনাদি এমন করল কেন হঠাৎ।

দুজনে অনেকক্ষণ চুপচাপ। সুধীর দুঃখের পরিমাণ দেখে ফুল্লরার হাসিও পায়, মায়াও হয়। ভাবে, এ কী ছেলেমানুষ! মাকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল যে!

ঘড়িতে দেখে খানিক পরে বললে, "আমি যাই।"

সুধী ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে।

মুখ নিচু করে ফুল্লরা বললে, "খাওয়া হয়নি এখনো।"

সুধী মুহূর্ত্তে শোক ভুলে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল, "সে কি! বলতে হয় এতক্ষণ। বেশ মেয়ে! চলো চলো, বাইরে কোথাও খেয়ে আসি।"

হাসিমুখে ফুল্লরা উঠে দাঁড়াল।

সুধী জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাবে?"

"যেখানে ইচ্ছা।"

"কাছেই 'ইটালিয়ান'এ?"

"বেশ তো।"

দু'টুকরো ভাগু উটচ, এক পেয়ালা কফি; খাওয়া শেষ করে ফুল্লরা হাত গুটিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল।

আশ্চর্য্য হয়ে সুধী বললে, "খাও!"

"খাওয়া হয়ে গেছে।"

"এই তোমার খিধে? রইল সব পড়ে।"

"রাক্ষস নই তো!"

স্থির দৃষ্টিতে সুধী চেয়ে দেখলে।

স্মিত মুখে ফুল্লরা সুধোলে; "কি দেখছেন অমন করে?"

সুধীর চোখ দুটি তিরস্কারমাখা। ধীরে ধীরে বললে, "এই চালাকিটা না করলেও হ'ত। কচি খোকা নাকি আমি।"

"কচি কেন? মস্ত খোকা। এ্যানাকে বলেছেন রাত্রে ডিনার চাইনে, চা-ও দিয়েছেন ফিরিয়ে। বেচারি ভয় পেয়ে আমায় এসে বললে, দেশ থেকেই এসেছে বুঝি কোনো খারাপ খবর।"

"এ্যানা মেয়েটা বড় ভীতু।"

"দোষ ওর নয়।"

খানিক চুপ ক'রে থেকে সুধী বললে, "লরা!"

"কেন?"

সুধী মুখ নিচু করে টেবিলের চাদরের একপ্রান্ত টেনে জড়ো করতে লাগল।

ফুল্লরা হেসে বললে, "সুধীদা, মন খারাপ হলে মুখখানা কেমন দেখায়, আয়নায় কখনো দেখেছেন চেয়ে? এ্যানা তো ছেলেমানুষ, আমি যে আমি—"

"তুমি তো হাসবেই।...লরা, আজ আমি এডিনবরা যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"ঐ তো বললাম।"

অনেকক্ষণ পরে ফুল্লরা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

সুধী চুপ করে রইল।

সন্ধ্যার আগে বোর্ডিংএর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ফুল্লরা একটুখানি ইতস্তত করে বললে, "সত্যি যাবেন?"

সুধী এবারও উত্তর দিল না।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ফুল্লরা বললে, "ফিরবেন কবে?"

"দেখি।"

রাস্তার মোড়ে সুধীর দীর্ঘ দেহ ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে দুঃখে অভিমানে এবার ফুল্লরার চোখে প্রায় জল এলো। বন্ধু বলতে অজ্ঞান! আর কেউ হলে অমন বন্ধুর নামও নিত না। কে জানে এখন কবে আসে ফিরে। হয়ত লণ্ডনে আর আসবেই না। অনাদি এডিনবরাতেই থাকা স্থির করলে হয়ত, সেও লণ্ডনের বাস উঠিয়ে দিয়ে—কিন্তু সত্যিই কি করবে তা?

গেট বন্ধ করে দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ফুল্লরা পিছনের বাগানে যায়। মনে পড়ে সুধীর সঙ্গে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ।

এইতো সেদিনের কথা। দু'ভাইবোন—অমর আর ফুল্লরা একসঙ্গে এসেছিল বিলেতে। প্রথম থেকেই অমরের সহ্য হ'ল না এদেশের জলহাওয়া। ডাক্তার বললেন, "গরম

দেশের ছেলে, গরমে যাও ফিরে! মিছে কেন ভুগতে চাও? পড়াশুনো কি ওদেশে হয় না?"

খবর শুনে অমরের মা ছেলেকে ফিরে পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন।

যাবার আগে অমর একদিন বললে, "ফুল, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, কেমন? সে আমার চেয়েও যত্ন করবে তোকে।"

"যত্ন থাক্। কিন্তু কে এই বন্ধুটি?"

"এলে দেখিস।"

নিয়ে এলো চা-এ। লম্বা চওড়ায় একটা পালোয়ান। অথচ লাজুকের একশেষ।

দিন দুই না যেতে মনে হ'ল যেন কতকালের চেনা। ফুল্লরা ভাবে, ওই প্রকাণ্ড দেহের আড়ালে অমন একটা ছেলেমানুষের মতো মন লুকিয়ে ছিল কি ক'রে? ভাইকে বলতে হল না কিছুই। অমরের বুঝতে বাকি রইল না ফুল্লরার সুধীকে ভালো লেগেছে। দেশে ফিরল সে নিশ্চিন্ত হয়ে।

ফুল্লরা জানে সুধী ওকে ভালোবাসে। কিন্তু সেটা সহজ বুদ্ধির জানা। কারণ সুধীর চোখ দু'টি যা-ই বলুক না কেন, মুখে ভালোবাসার কথা উচ্চারণ করা ওর ধাতে নেই। তবু ফুল্লরা জানে তার 'সহজ বুদ্ধি' ভুল করেনি। সুধী নিশ্চয় ফিরে আসবে।

ফিরে সত্যিই এলো।

প্রথম দিন দেখা করতে গিয়ে ফুল্লরা বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইল। সুধীর সঙ্গে এ কে? পুরুষমানুষ এত সুন্দর হয়?

…চালাকিটা সুধীর। অনাদি আসবে সঙ্গে, একথা একবারও জানায়নি কাউকে। বুড়ী ল্যাণ্ডলেডিকেও না। কারণ বোঝা শক্ত নয়। সুধী চিরকালই রহস্যপ্রিয়, আমুদে। আরো এক কারণ, আগে বললে ফুল্লরা এত সহজে আসত না এবাড়ি। অনাদির ওরকম অন্তর্ধানে নানান খটকা লেগেছিল ওর মনে। একটা। এই যে হয়ত সে-ই দায়ী তার জন্যে। কথাটা অবশ্য সুধী হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ফুল্লরার মনে সন্দেহ ছিলই।…

নিঃশব্দে খানিকক্ষণ ওর বিস্ময়াতিশয্যটা উপভোগ ক'রে কষ্টে হাসি চেপে সুধী বন্ধুর দিকে ফিরে বললে, "অনাদি, এদিকে এসো। লরা—"

সচকিত দৃষ্টি তুলে অনাদি চেয়ে দেখলে।

সুধী যেন দেখতে পায়নি, গম্ভীরভাবে নাটুকে-ভঙ্গিতে বললে, "শ্রীমতী ফুল্লরা দেবী ওরফে বন্ধুমহলে মিস—ও কি? কী হল অনাদি?"

চোখে তিরস্কার ভরে অনাদি মুখে বললে, "হবে আবার কী?"

এ্যানা এলো চা নিয়ে।

অলক্ষ্যে দ্রুত চাপাকণ্ঠে অনাদি বললে, "মানুষকে এতই অপ্রস্তুত করতে পারো তুমি! কেন এভিনবরায় ঐ মিথ্যে কথাগুলো বললে?"

"মিথ্যে কথা কখন্ বললাম?" গলা উঁচু করে বললে, "উনি ঐ যা দেখতেই বাঙালী, আসলে মেমসাহেবেরও—"

"দোহাই দোহাই সুধী, আবার যদি তাড়াতে না চাও—"

দূরে দাঁড়িয়ে ফুল্লরা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। এই তবে অনাদি! কিন্তু সব তাতেই সুধীর এ কী রকম ছেলেমানুষি! এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সামনে না ব'লে না ক'য়ে ওকে টেনে নিয়ে আসা, আবার তাই নিয়ে এত হাসি। ছেলেটিই বা কী মনে করছে?

নিজের সম্বন্ধে ফুল্লরার মন বড় সচেতন। বেশ বুঝতে পারলে অনাদিকে সে সহজভাবে নিতে পারছে না।

সুধী কখনো ওকে এত চুপচাপ দেখেনি। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মনে মনে। এদের দুজনের বনবে না নাকি? ওর নিজের সঙ্গে প্রথম দেখার দিনেও সেই সহজ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার মনে পড়ল। কিন্তু অনাদিকে দেখেই হঠাৎ এমন বিমনা হয়ে গেল কেন?

দুজনের অজ্ঞাতে দুজনকে সে বারবার লক্ষ্য করে দেখতে লাগল। কী সুন্দর চেহারা অনাদির! কেমন শান্ত লাবণ্য ফুল্লরার মুখে! বন্ধুভাগ্য সুধীর সত্যিই অসীম। এমন দুটি বন্ধু!…যেমন করে হোক অনাদিকে ধরে রাখতে হবে লণ্ডনে। কিছুতেই ছাড়া হবে না।

দু'চারবারে আমতা আমতা করে অনাদিও রাজি হয়ে গেল।

সুধীর অশ্রান্ত চেষ্টা কী ক'রে ফুল্লরার চোখে অনাদিকে বড় ক'রে ধরবে। বাল্য আর কৈশোরের নানা কীর্ত্তিকলাপ, নানান দুঃসাহসের বর্ণনায় ফুল্লরা হাসে, ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে তোলে বিদ্রূপের আভাস। ক্ষোভে অভিমানে সুধী ভাবে ফুল্লরা মানুষের সামান্য ত্রুটিও বড় বেশিদিন মনে গেঁথে রাখে। না বুঝে পালিয়ে গিয়েছিল সেটা এতই কি বড় অপরাধ! আজও তাই অনাদিকে দেখলেই গম্ভীর অভুষ্ট হয়ে যায়, কী অদ্ভুত মেয়ে এই ফুল্লরা! সুধীর প্রাণটা ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করলে ওদের যতটা সম্ভব একলা ছেড়ে দিতে হবে। তৃতীয় ব্যক্তি মাঝখানে না থাকলে ফুল্লরা এমন পাশ কাটাতে পারবে না।

সুধী ব্যস্তবাগীশ। ধৈর্য্য ওর কোষ্ঠিতে লেখা নেই। যেই সংকল্প অমনি কাজ।

সেদিন থেকে "ত্রয়ী মিটিং" থেকে সুধী প্রায়ই অদৃশ্য হয়—অপ্রত্যাশিতভাবে নানা অবোধ্য দুর্ব্বোধ্য ওজর আপত্তি দেখিয়ে। একলা ফেলে যায়, কাজেই ফুল্লরাকে বোর্ডিংএ পৌঁছিয়ে দিতে হয় অনাদিকেই। আরো ছোট-খাট কত কী। রৌদ্রোজ্জ্বল ছুটির দিন, তিনজনে হয়ত বাসের মাথায় চড়ে ক্রিষ্ট্যাল প্যালেসে যাচ্ছে। হঠাৎ সুধী "আরে, এ যে Mr.—er—excuse me, লরী"—নেমে পড়বে বাস্ থেকে। ফুল্লরা অনাদি ঝুঁকে প'ড়ে দেখে এক অজানা ইংরেজ ভদ্রলোক ভিড় ঠেলে দ্রুত ছুটেছেন, সুধী তাঁরই পিছন পিছন উধাও। এদিকে বাস্ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে?

পথে অনাদি দুতিনবার জিজ্ঞাসা করে নেমে যাবে কিনা। ফুল্লরা রুষ্ট মুখে বলে, "না।"

সুধীর এরকম ব্যবহারের কোনো অর্থই খুঁজে পায় না সে।

ক্রমে অভ্যাস হয়ে যায়।

* * *

একদিন নির্জ্জনতার সুযোগে অনাদি সাহস করে বলে ফেলল, "এখনো ক্ষমা করেননি আমায়! হয়ত কখনোই করবেন না।" এই মেয়েটির গাম্ভীর্য্যকে সে মনে মনে ভয় করে।

ফুল্লরা জিজ্ঞাসুভাবে ফিরে তাকায়।

অনাদি মাথা নিচু করে বলে, "আমি তখন জানতাম না।"

কিছু বুঝতে পারে না, বিস্মিতের মতো ফুল্লরা শুধু চেয়ে থাকে।

তখন অনাদি ধীরে ধীরে সব বলে। সুধী যে রকম বে-পরোয়া—

পলায়নের কারণ শুনে চাপাহাসিতে ফুল্লরার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, জিজ্ঞাসা করে, "তারপর?"

ভয়ানক লজ্জিত হয়ে অনাদি বলে, "তারপর আবার কী! আপনি যে আপনি, তা জানলে—"

"পলায়নই পন্থা' বলে মেনে নিতেন না, না?"

তরল রহস্যের সুরে অনাদির বুকের ভার নেমে যায়। ফুল্লরা অবুঝ নয়। এমন সরল ক্ষমা প্রার্থনা ও স্পষ্ট স্বীকারোক্তির পরে অনাদির ব্যবহার সম্বন্ধে আর মনে কোনো ক্ষোভ পুষে রাখে না।

সুধী দেখে নিশ্চিন্ত হ'ল।

* * *

এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে দুই বন্ধুর জীবন বিচিত্রভাবে গড়ে ওঠে।

সংসারে ওর প্রিয়তম দুজন একান্ত নিকটে আছে, এটুকুতেই সুধী নিশ্চিন্ত। সারাদিন খেলাধূলা, ক্লাবে কলেজে হৈ চৈ নিয়ে থাকতে ভালোবাসে। তার বেশি কিছু ভাবেও না, চায়ও না।

অনাদী স্বপ্নবাদী। তাছাড়া ছেলেবেলায় ছিল রুগ্ন। তখন থেকেই বই অবলম্বন। সে অভ্যাস এখন হয়ে দাঁড়ালো চিরকালের প্রয়োজন। বই না হলে অনাদি যেন বাঁচে না। ফুল্লরার মন সেখানে মস্ত আশ্রয় পেল। আগে কোন্ শূন্যে ঘুরে বেড়াত মনটা। সুধী বুঝত না।...ফুল্লরার সঙ্গে অনাদির মনের যোগ বইয়ের স্বপ্ন-রাজ্যের ভিতর দিয়ে দৃঢ়তর হয় দেখে সে আরো নিশ্চিন্ত।

অনাদি মাঝে মাঝে ভাবে, এ হ'ল যেন ঠিক সেই ছেলে-

বেলার মতো। একটা জিনিষ দুজনে সমান ভাগাভাগি করে নিতাম, যার যেদিকটা পছন্দ। সুধী কখনো ঝগড়া করেনি, আমার ভাগটায় অযথা দখল বসাবার চেষ্টাও না। মস্ত ওর হৃদয়। স্বীকার করি বাড়াবাড়ি আছে, কিন্তু হীনতা নেই। ফুল্লরা যতখানি ওর, ততখানি আমারও।

শীতের সন্ধ্যা। বাইরে বরফ পড়ে সাদা হয়ে আছে। সুধী সারাদিন ঘরে বন্দী। মেজাজ ভালো থাকবার কথা নয়। বসবার ঘরে এসে খুব জোরে জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে একরাশ কয়লা আর গরম গরম কফির হুকুম করে সটান সোফায় গা এলিয়ে দিলে, হাতে ছ'পেনি নভেল; সময় কাটানো চাই।

ওধারে ছাত্র-ছাত্রী দুটি গভীর অভিনিবেশে অধ্যয়নরত। সুধীর সেসব বই ভালো লাগে না—সায়ান্স, ইকনমিক্‌স্—রাজ্যের নীরস আবর্জ্জনা!

ফুল্লরা মাঝে মাঝে এবাড়িতেই থাকে, আজও থাকবে। বিরক্ত সুধী ভাবে, "ওদের আর কী। বই পেলেই হ'ল। সৃষ্টি তোলপাড় হলেও চেয়ে দেখবে না।"

নভেলে মন বসে না। হঠাৎ মনে হল ওদের ডেকে একটু গল্প করা যাক, একটা দিন বই তো নয়। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে অনাদি একমনে কী লিখে যাচ্ছে, জ্বলন্ত আগুনের রাঙা আভা মুখে, সুন্দর গৌর রঙে। আর—একপাশে বসে ফুল্লরা তন্ময় হয়ে তা-ই দেখছে। কী যে ছিল সেই দৃষ্টিতে—সুধী চোখ ফেরাতে পারল না।

অনাদির লেখা বুঝি শেষ হ'ল। মুখ তুলতেই ফুল্লরা অমনি চোখ নামিয়ে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে—আগুনের জন্যে কিনা কে জানে—মুখখানা লাল হয়ে উঠল।

সেই থেকে সুধীর কী যে হ'ল, যখন-তখন ওর চোখ দু'টি এদের অনুসরণ করে বেড়ায়। সন্ধ্যায় ক্লাবে যাওয়া, ছুটির দিনে সারাটা দিন বাইরে বাইরে কাটানো ছেড়েই দিলে একরকম। জিজ্ঞাসা করলে বলে শরীর ভালো নেই। মন ভালো নেই বললেই সত্যি বলা হ'ত।

একদিন কী এক প্রবল ভাবের বশ হয়ে বললে, "লরা, আমার সঙ্গে এসো একটু।"

ফুল্লরা জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায়?"

"এসোই না কেন আগে। কোথায় দেখবে তখন।"

অনাদি ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে, "আজ যে আমাদের সে বইটা শেষ করাই চাই। ফুল, তুমি কথা দিয়েছিলে কিন্তু।"

ফুল্লরা বললে, "কোথায় যাবে সুধীদা? আজ না গেলেই নয়?"

সুধী চোখ নামিয়ে বললে, "বেশ তো, থাক্।" কণ্ঠস্বর ভারি, গভীর।

ফুল্লরা এক নতুন জিনিষ দেখলে। মনটা পীড়িত হয়ে উঠল এই ভেবে যে হয়ত বিশেষ কোনো দরকার ছিল। কখনো তো এমন করে না।

অনাদির অভিমান তাই অগ্রাহ্য করেই বই রেখে উঠে গেল।

রাস্তায় এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কী? কিছু কিনতে হবে?"

ওদের টাই-কলার, ছোট বড় অনেক সৌখীন জিনিষ ফুল্লরাই পছন্দ করে কিনে দেয়। ভাবলে আজও বুঝি সেরকম কিছু চাই।

সুধী বললে, "অনেকদিন একলা পাইনি তোমায়। চলো সিনেমায় যাই।"

"এই? তাহলে অনাদিকেও আনলে না কেন?"

সুধীর মুখ কালো হয়ে গেল। বললে, "ভুল হয়ে গেছে। চলো ফিরে যাওয়া যাক।"

ফুল্লরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। হঠাৎ এ কী?

সেদিন সিনেমা দেখা হ'ল দুঃসহ নীরব মনঃপীড়ার মধ্যে।

ফিরবার মুখে ফুল্লরা হঠাৎ বললে, "আমি এখনই বোর্ডিংএ যাবো।"

"কেন? আরো দু'চারদিন তো ওবাড়িতেই থাকবার কথা।"

"কাজ আছে।"

"আচ্ছা যাও। আমি কাল সকালেই আসব। চলো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

ফুল্লরার বিস্ময়ের সীমা রইল না। 'যাবো' বলতেই সুধী আজ ওকে এত সহজেই যেতে দিল? মিসেস মার্টিন, এ্যানা জানে ফুল্লরা ফিরবে; ওর জন্যেও খাবার তৈরি। সুধী কি সব ভুলে গেছে?

ফুল্লরা আসেনি, কিছুদিন আর আসবে না শুনে অনাদি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খাবার সময় এ্যানাকে দিয়ে বলে পাঠাল মাথা ধরেছে।

সুধীর বিস্ময় আর বিরক্তির সীমা নেই। অনাদির এ কী ছেলেমানুষী!

সমস্ত বাড়ি সচকিত করে জোরে জোরে পা ফেলে উপরে উঠে গেল। অনাদি দোর খুলল না।

সুধীর মনের ভিতরটা রাগে জ্বলে উঠল। এ অন্যায়—ভয়ানক অন্যায়! কতদিন পরে ওরা দুজনে একলা বেরিয়েছে অনাদির সেটা একটু বোঝা উচিত।

তবু মন মানে কই? বিনা দোষেও নিজেকে এমন দোষী মনে হয়। অস্বস্তি বেড়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে অনাদির উপর রাগটাও যায় বেড়ে। কী আশ্চর্য্য, ফুল্লরা কি চিরকাল এ বাড়ীতে থাকবে বলে লিখে দিয়েছিল? অনাদির সঙ্গে রোজ একরাশ বই পড়া ছাড়া ওর কি আর কোনো কাজ নেই?...

পরদিনও অনাদির সেই একই ভাব। নিচে এলোই না।

সুধী আর থাকতে পারল না। ভাবলে, "না, বসে বসে এরকম দুশ্চিন্তায় গা-ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে ফুল্লরাকে নিয়ে আসাই ভালো।"

হঠাৎ মনে পড়ল সেও তো রাগ করেই গেছে। বেদনায় সমস্ত মন অন্ধকার হয়ে ওঠে। এই বন্ধু, এ-ই ভালোবাসা—সংসারটা এমন!

কিন্তু এত ভাব-সংঘাত সুধীর সয় না বেশিক্ষণ। সে কাজের লোক। ঠিক করল ফুল্লরাকে ডেকে এনে আজই একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলা চাই। সে স্বাধীন, যা করবার স্বাধীনভাবেই করুক।

তখনই উঠে পড়ল।

বাইরে আসতেই বসবার ঘরের ঠিক দোরগোড়ায় অনাদির সঙ্গে মুখোমুখি। সুধীকে দেখে থতমত হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে সুধী বললে, "কোথায় যাচ্ছ?"

"ফুল বইটা পড়তে চেয়েছিল বিশেষ করে। তাই ভাবলাম—"

"ওঃ বটেই তো। আচ্ছা যাও।" ফিরে ঢুকে পড়ল ঘরে।

অনাদি লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল। দোরটা ঈষৎ খুলে বললে, "তুমি যাচ্ছিলে? তাহলে তো ভালোই হয়। নিয়ে যাও বইটা, ওকে দিও, বলো—"

"না, না। আমার—যাকে বলে মরবার ফুরসৎ নেই। তুমিই যাও।"

একটুখানি ইতস্তত করে অনাদি চলে গেল। মনকে বোঝালে, কেনই বা এত সংকোচ? বইটা দিতে যাবে, কেমন আছে দেখবে, তাতে মহাভারত এমন কি অশুদ্ধ হয়ে গেল? সুধীর কেন এত রাগ।

এমন করে দুই বন্ধুর মাঝখানে আগের সেই শুভ্র শান্ত মেঘের পরিমণ্ডল লজ্জা, ঈর্ষা, বেদনাবিক্ষুব্ধ এক অদৃশ্য বিশ্রী মেঘের ধারা যেন তারাক্রান্ত বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠল। অথচ দুজনেই মনে মনেও একথা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করে।

* * *

ফুল্লরা নির্ব্বোধ নয়। ব্যাপার বুঝতে ওর একটুও দেরি হয়নি। অপমান-বোধের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পরে নিজের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল। সুধীর এই অকস্মাৎ অদ্ভুত ব্যবহারের কোনো কারণই কি নেই? কিন্তু তবু, এমন কী করেছে সে যার জন্যে সুধীর এত সন্দেহ ঈর্ষা? সুধীকে ভালোবাসায় যদি কোনো দোষ না থাকে, বড় দোষ কি কেবল অনাদির বেলায়। মানুষ নিজের সম্বন্ধে এত অন্ধ কেন।

কিন্তু বৃথা এত চিন্তা। আত্মবিশ্লেষণ তো বাসনামুক্তের ধর্ম্ম নয়। ফুল্লরার তা জানা উচিত।

সুধী যেরকম আবেগপ্রবণ! এর পর থেকে বন্ধ হ'ল ওবাড়ির পথ। দুঃখ পাবে, কিন্তু উপায় কী? অনাদি তো কোনো অপরাধ করেনি, বন্ধুবিচ্ছেদ থেকে বাঁচাতেই হবে তাকে।

ফুল্লরা জানে অনাদির মধ্যে কী এত সম্বল ওকে এমন আকর্ষণ করেছে। সে বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, রসগ্রাহী। পক্ষান্তরে সুধী যাকে বলে এক কথায় ভালোমানুষ। ফুল্লরার মতো মনস্বিনী শুধু ওটুকুতে তৃপ্ত হতে পারে না। সত্যি বটে, অনাদি রূপবানও। কিন্তু রূপ? শৌর্যহীন গুণহীন পুরুষের রূপ কি আবার একটা জিনিষ? ফুল্লরা অনাদিতে এমন কিছু দেখেছে যার কাছে রূপ তুচ্ছ।

সারাদিন সুধীর উপর মনটা বিরূপ হয়ে রইল। ঈর্ষা! ছি ছি। এই অত্যন্ত হীনতার প্রশ্রয় দেওয়া অন্তত সুধীর উচিত হয়নি। সে নিজেই অনাদির সঙ্গে ফুল্লরার ঘনিষ্ঠতা কামনা করেছে, এখন কেন হঠাৎ এই পঙ্কিল—না, ফুল্লরা জীবনে আর ওবাড়ি যাবে না।

মনটা খারাপ হয়েই ছিল। অসময়ে হঠাৎ অনাদি এলো।

ফুল্লরা অবাক হয়ে দেখল এই অপ্রত্যাশিত আগমনকে সে মোটেই খুশী হয়ে গ্রহণ করতে পারছে না। এই ক'দিনে অনাদির চেহারা একী হয়ে গেছে! ললাটে বুদ্ধির সে উজ্জ্বল আভা মলিন, চোখ দু'টি নিষ্প্রভ চঞ্চল, সমস্ত দেহে একটা ক্লান্ত শুষ্ক ভাব, অথচ—

ফুল্লরার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে অনাদির চোখ দুটি আপনি নত হয়ে গেল। আগের মতো সহজ সংযতভাবে কথা বলতে পারে না, অকারণে মুখ হয়ে ওঠে লাল, গলা কাঁপে, প্রসাদপ্রার্থী ভিক্ষুকের মতো চোখের দৃষ্টি।

ফুল্লরা বলবে কী, সংকোচে অপমানে চোখ ফেটে জল এলো। অবসন্ন মাথাটি টেবিলের উপর ঈষৎ নুয়ে-পড়া, ক্ষীণ কম্পিত রক্তাভ শিথিল হাতখানি স্বেদসিক্ত। নারীর এই মাধুর্য্যভরা দুঃখের রূপ অনাদি একে ভুল বুঝলে। একান্ত আবেগে মুখের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলে, "ফুল!"

ফুল্লরা ছিটকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ঘন ঘন নিশ্বাসে বুক বুঝি ফেটে যাবে, রোষস্ফীত চোখের দৃষ্টি তীব্র। সঙ্কোচে, ভয়ে, নিরাশায় অনাদির পা দুটো ভেঙে পড়ল।

ফুল্লরা চলে যেতে উদ্যত, কষ্টে আত্মসংবরণ করে অনাদি উঠে দাঁড়ালো। কাছে এসে বললে, "আমায়—আমায় মাপ কোরো।"

ফুল্লরা নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল।

ভগ্নকণ্ঠে অনাদি বললে, "আমি জানতাম না। ভেবেছিলাম, তুমি আমায় ভালোবাসো।"

তবু ফুল্লরা উত্তর দিল না।

একটুখানি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অনাদি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফুল্লরা আর সহ্য করতে পারলে না। সেখানেই মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

* * *

এই ক্ষুদ্র জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত এখানেই হতে পারত; কিন্তু হ'ল না।

যে ক্ষুধাটা এতদিন যৌবনসুলভ খেলাধুলা ও হুজুগ-প্রিয়তার আড়ালে ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মতো সুপ্ত ছিল, সেটা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সুধীর বুদ্ধিতে তুমুল বিপর্য্যয় ঘটিয়ে দিলে। আজকাল যখন-তখন ওর মনে হয় ফুল্লরাকে না হলে আর একটা দিনও চলবে না। অনাদির কথা ভেবে যেটুকু বা সংকোচ ছিল, সেদিন তা-ও গেল। ফুল্লরা যে ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তা বুঝতে সুধীর দেরি হয়নি। একদিকে বন্ধুর জন্যে ঈষৎ মমতামিশ্রিত দুঃখবোধ, আর একদিকে বিজেতার গর্ব্ব দুইয়ের সংঘর্ষে সুধীর উদার স্নেহশীল প্রাণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তবু অস্বীকার করতে পারে না যে ফুল্লরাকে চাইই।

দিনকতক পরে কি জানি কেন সুধীর মনে হ'ল এভাবে থাকার চেয়ে যত শীগ্‌গীর ওদের বিয়ে হয়ে যায়, ততই ভালো। তাতে অনাদিরও উপকার হবে। পরকীয়া-প্রীতি! সে তার স্বভাব সহ্য করবে না।

যে-ই মনে হওয়া অমনি সঙ্কল্প স্থির। বিলেতে যাবার রোখ যখন চেপেছিল তখন যেমন স্থির সয়নি, এখনও তেমনি।

প্রস্তাব শুনে ফুল্লরা অবাক। জিজ্ঞাসা করলে, 'এর মানে কী?"

ক্ষুব্ধভাবে সুধী বললে, "মানে আবার কী? বিয়ে কি কারো হয় না?"

"পাগলামি কোরো না, সুধীদা।"

ফুল্লরা উঠে গেল সেখান থেকে।

তবু সুধীর হুঁস হ'ল না। সময় পেলেই আসে, সুযোগ পেলেই অনুনয় বিনয়।

শেষে একদিন ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললে, বললে, "নর, তোমার মনের আসল কথাটা কী, খুলে বলো দেখি। আমাকে এমন ভাবে খেলিয়ে তোমার লাভ ?"

"কী ?" ফুল্লরার চোখ দিয়ে আগুন ছোটে।

দেখে সুধীর মাথায় খুন চেপে গেল, রাগে অধর দংশন করে বললে, "আমি অনাদি নই, জানো ? সব সইতে পারি, ফ্লার্ট—"

"সাবধান, সুধী !"

"ধমক দেবার কে তুমি ? ফ্লার্ট নও ? একবার এবে, আবার তাকে—"

ফুল্লরা পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল, "চুপ করবে কিনা তুমি ?"

"না, করব না। আগে জবাব দাও কেন আমাকে নিয়ে এমন মজাটা করলে ! ভদ্রলোকের মতো বিয়ে করতে চাই, এখন তাতে আপত্তি ? বলো, কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ—"

ফুল্লরা অটল পদে দু'পা কাছে সরে এলো। বিবর্ণ মুখখানি জোর ক'রে তুলে ধরে বললে, "কেন, শুনবে ?"

সুধী তেমনিভাবে উত্তর করলে, "শুনব বলেই এসেছি, শুনব বলেই এখনো দাঁড়িয়ে আছি। নইলে তোমার ছায়াও মাড়ানো পাপ।"

"শোনো তবে।" প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় ফুল্লরা কঠোর কণ্ঠে বললে, "ভালোবাসি অনাদিকে, তোমায় না। তাই—শুধু তাই—কেমন, এবার হ'ল ? আগে বুঝিনি। নইলে তুমি ? তোমায় ? হাঁ, এবার যাও।" কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল সেখানে।

উত্তেজিত সুধী তখন ঘরের বাইরে।

* * *

দু'তিন মাস পরের কথা।

লণ্ডনপ্রবাসী ভারতীয় ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, সুধী গুপ্ত হঠাৎ জাহান্নমে যেতে বসেছে। কেন বা কি কারণ, কেউ জানে না। তবে একবিষয়ে সকলেই একমত যে বেশিদিন এদেশে থাকলে এমনই হয়। সুধীকে সবাই ভালোবাসত ওর পতনে তাই সুখী হল না কেউই। কিন্তু ফুল্লরা যে ওর সংসর্গ ত্যাগ করেছে, তাতে গোপনে গোপনে অনেকেই খুসী কেন—তা বলা বাহুল্য। সে যাই হোক, অনেকেই দয়া করে খবরটা যথাসম্ভব শীঘ্রই ফুল্লরার কানে তুলে দিল।

সেদিন সকালে বসে সে এই সবই ভাবছিল। মেড এসে বললে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান, বিশেষ দরকার।

কে ভদ্রলোক ভাবতে ভাবতে ফুল্লরা নিচে নেমে এলো। বসবার ঘরের দরজা খোলা, অনাদির চোখে চোখ পড়ে গেল।

একেবারেই কাজের কথা পাড়লে অনাদি। বললে, "ফুল, ক্ষমা কোরো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেই আসা। সুধীর খবর জানো ?"

"শুনেছি।"

"তারপর ?"

"তারপর তুমিই বলে দাও।"

"তবে এসো আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যেতে হবে ?"

"বাড়ি।"

দুজনে চুপ চুপে উপরে উঠে এলো। মিসেস মার্টিন বাড়ি নেই, এ্যানারও ছুটি।

সুধীর ঘরে বাইরে থেকে তালা লাগানো। অনাদি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কান পেতে কী শুনলে। পরে ইঙ্গিতে ফুল্লরাকে ডেকে তেমনি করে শুনতে বললে। ভিতর থেকে অস্পষ্ট জড়িতস্বরে গালাগালি, হুঙ্কার, দ্রুত পায়চারির আওয়াজ—ফুল্লরার চোখ জলে ভরে এলো।

অনাদি ওকে নিজের ঘরে এনে বসালে। বললে, "এরকম প্রায়ই। ক্রমেই বাড়ছে। আজ একেবারে দিনের বেলা—এতটুকু লজ্জা নেই, ভয় নেই। দরজা তালা দিয়ে রেখেছি, নইলে বেরিয়ে চলে যায়।"

ফুল্লরা স্তব্ধ হয়ে থাকে।

হঠাৎ অনাদি ওর হাত দুখানি চেপে ধরে বললে, "ফুল, এর প্রতিকার তোমার হাতে তুমি ছাড়া কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না কেউ না।"

ফুল্লরা চমকে হাত ছাড়িয়ে নিলে।

অনাদি বললে, "ক্ষমা কোরো, আমার মাথার ঠিক নেই। কিন্তু মনে ক'রে দেখ এর জন্যে দায়ী কে? আমি এদেশে না এলে কি এমন হতে পারত? তোমাদের মাঝখানে এই অশান্তির সৃষ্টি করলাম আমিই। এ দুঃখ যাবার নয়।"

"কী যে বলো তুমি।"

"তুমি বুঝি তাহলে সব জানো না?"

"কী শুনি।"

"সুধী মনে করে যে—সুধীর ধারণা—"

"লজ্জা কিসের?"

"সে ধারণা কত মিথ্যে তা কি আমি জানিনে। তুমি ওর ভুল ভেঙে দাও, ওকে বাঁচাও। আমিও বুকের থেকে এ বোঝা নামিয়ে বাঁচি।"

ফুল্লরা নিরুত্তরে বসে রইল।

অনাদি বললে, "আমার লোভের সীমা নেই। সত্যি কথাই বলব আজ, তোমার কাছে লুকোব না। আশা করে ছিলাম দুজনের একজনকে তুমি স্বেচ্ছায়, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই বরণ করে নেবে। বিশ্বাস ছিল সুধীও তা সহ্য করতে পারবে। কিন্তু ঘটল সবই উল্টো। সুধী যখন ভালোবাসে—আমার বেলায় দেখেছ তো? তুমি আমি দুজনকেই ওর চাই। কারো জন্যে কাউকে পারবে না ছাড়তে।"

"আর তুমি?"

"আমি? সামান্য মানুষ, সামান্যই আমার আশা আকাঙ্ক্ষা। জীবনটা কাটিয়ে দেব তোমাদের স্নেহের ছায়ায়। তুমি জানো না সুধী কী করেছে আমার জন্যে, তার কাছে কত ঋণী আমি। সব ভোলা যায়, কৃতজ্ঞতার দাবী ভুলি কি করে!"

একটু পরে আবার বললে, "স্বার্থপর নয় সুধী। আমার চেয়ে তা কম জানো না তুমি। তুমি রাজি হলেও শুধু আমার জন্যেই সে শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করত কিনা তোমায়, সন্দেহ। কিন্তু ওই যে বললাম—ও পারত না তোমায় ছেড়ে থাকতে। ভোলবার জন্যে এমনি করেই—"

"যেত অধঃপাতে?"

"তা কি তুমি নিজেই জানো না?"

"কিন্তু অনাদি, তুমিও বা কি ক'রে মনে করো এমন-ঝোঁকালো লোকের সঙ্গে বিয়েতে কোনো মেয়েই সুখী হয়?"

"হয় ফুল, হয়। অন্তত তুমি হবে, এ আমি জোর করে বলতে পারি।"

"তাহলে কী করতে বলো আমায়?"

"ও যা বলেছিল।"

"তাতে সুখী হবে তুমি?"

"সুখ অসুখ নিজের মনে। মানুষ কি এতই অসহায়! তাছাড়া সুধী তো সুখী হবে।"

ফুল্লরা রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলে, "অনাদি!"

অনাদি মুখ তুলল না।

ফুল্লরা বললে, "মুখ তোলো, শোনো। যদি বলি, বিয়ে আমি করতে পারিনে কাউকেই তাহলে কি তুমি খুব আশ্চর্য্য হবে?"

একটুখানি চুপ করে থেকে অনাদি বললে, "না।"

"কেন?"

"কেন? বোধ হয় এজন্যে যে তোমায় আমি চিনি—বুঝতে পারি।"

"তাহলে সুধীকেও তুমি বোঝাতে পারবে। পারবে না?"

অনাদি উত্তর দিল না।

ফুল্লরা বললে, "একদিন তোমার প্রতি বিদ্বেষের সীমা ছিল না আমার। ভুল বুঝতাম তোমায়, মনে করতাম সুধীর থেকে কেবল নিতেই জানো, দিতে নয়। কতদিন এজন্যে মনে মনে অবজ্ঞা করেছি। এক একসময় সুধীর প্রতি এত ঈর্ষা দেখেছি তোমার, কখনো ভাবিনি শেষ মুহূর্তে তুমি নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করবে।"

অনাদি ক্ষীণভাবে শুধু একটু হাসলে।

ফুল্লরা বললে, "সংসার-বুদ্ধিহীন সন্তানের জন্যে মার যে দরদ যে শঙ্কা, সুধীর জন্যে আমার স্নেহে তারই ছিল খানিকটা মেশানো। আজ আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। এখন তোমার হাতে ওকে সঁপে দিয়ে শান্তমনেই যেতে পারব।"

"সে কি? কোথায় যাবে?"

"যদি বলি অনেক দূরে?"

"ঐ বলা পর্য্যন্ত। যেতে পারবে কেন? তুমি চলে গেলে সুধী বাঁচবে না।"

"আমি চলে গেলেই বাঁচবে। তুমি জানো না অনাদি, মেয়ে হওয়ার দুঃখ কত।"

"বলো, থামলে কেন। বুঝিয়ে দাও আমায় তোমার কী এত দুঃখ।"

"দুঃখ নয়? ছিলাম আমরা তিনটি বন্ধু। এমনি করেই দিন কাটতে পারত, কিন্তু কাটল না। কেন জানো?"

অনাদি রুদ্ধশ্বাসে বললে, "কেন?"

"সেই চিরকেলে ব্যাপার। আরো বুঝিয়ে বলতে হবে?"

"না।"

"এই যে এত জটিলতা, এর মূলেই তো ওই। তোমার ঈর্ষা, সুধীর রাগ—"

অনাদি মাথা নিচু করলে।

"এসব আসে কোথা থেকে? এত হা-হুতাশ, বাড়াবাড়ি, সর্ব্বনাশা অভিমান, এ সমস্ত কেন? একটি মাত্র কারণ।"

অনেকক্ষণ পরে অনাদি বললে, "স্বীকার করি তোমার কথায় সত্য আছে। কিন্তু ভালোবাসলে ওরকমই হয়। প্রতিপক্ষ, এমন কি প্রিয়তম বন্ধু হলেও।"

"ভালোবাসলে হয় না।"

"ভুল বুঝেছ।"

"না। অত্যন্ত ঠিক বুঝেছি।"

আহতস্বরে অনাদি বললে, "তার মানে, আমরা যে তোমায় ভালোবাসি সেকথা মিথ্যে?"

কুলরা হাসলে, বললে, "তার মধ্যে আনা দু'য়েক হয়ত সত্যি।"

"তবু ভালো যে ষোলো আনাই মিথ্যে বলোনি। কিন্তু চৌদ্দ আনাই বা মিথ্যে কেন?"

"কেন? সে কি কথায় বোঝানো যায়? না তর্কে কোনো লাভ আছে? কিন্তু বলো দেখি, জীবনে এর আগে সব শুদ্ধ আর কয়টি মেয়েকে ভালোবেসেছ?"

অনাদির মুখে সহসা এক ঝলক রক্ত ছুটে আসে। রাগ করে বলল, "এ তোমার অন্যায়।"

"চিন্তাশীল তুমি—সত্য স্বীকার করতে এত লজ্জা?"

"সব রকম আকর্ষণই কি ভালোবাসা?"

"নিশ্চয়ই না। কিন্তু ভালোবাসারও সবটাই ভালোবাসা নয়।"

"অপরাধটাও ভালোবাসার নয়। মানুষের প্রকৃতির।"

"সে কথা সাহসের সঙ্গে স্বীকার করাই তো ভালো।"

অনাদি হেসে ফেললে, "বড় ভয়ানক তুমি।"

—"ভয়ানক আমি, না তুমি?"

—"সাধারণত মানুষের প্রকৃতি সর্ব্বত্র এক রকম। কোথায় পাবে তুমি নির্ভেজাল ভালোবাসা—নিস্তার কোথায়?"

"কোথাও না। তাই বলে ভেজাল চাইনে। দুধের সাধ ঘোলে মেটানো বোলে?"

—"মানুষ যা পারে দিতে, তার বেশি প্রত্যাশাই বা করা কেন তার কাছে? তুমিও তো মানুষ। সকলের দোষ ত্রুটি সকলে মেনে নিলেই হয়।"

"না। অন্তত তোমার মুখে ওকথা শোভা পায় না। আদর্শ বা লক্ষ্য কোনোটাই তোমার অত নিচু নয়।"

অনেকক্ষণ নীরবতার পরে বললে অনাদি, "সারা জীবনটা তাহলে করবে কী তুমি? সব পুরুষই তো মিথ্যেবাদী।"

"শুধু পুরুষ কেন? মেয়েরা কম কী?"

হঠাৎ কানে এলো ওধার থেকে ভীষণ দাপাদাপির শব্দ। কুলরার মুখ লাল হয়ে উঠল।

অনাদি বললে, "প্রকৃতিস্থ থাকলে আজ এজন্যে সুধী নিজকে খুন করে ফেলত। তুমি একটু বোস, আমি আসছি।"

সে যেতেই কুলরা দুহাতে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল। খানিকক্ষণ কেঁদে শান্ত হয়ে টেবিলের উপর এক টুকরো কাগজে কি লিখে রেখে পিছনের দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল।......

দিন দুই পরে অনাদি কুলরাকে লিখলে, "সেদিন তুমি চলে গেলে। লিখে রেখে গিয়েছিলে এখন কোনো খোঁজ না নিতে, খবর না দিতে। তাই নিইনি, দিইনি। কিন্তু সুধীর অসুখ। এ সময়েও যে মানুষ এমন অবুঝ, এতই বেপরোয়া

হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আমায় কী করতে বলো।"

ফুল্লরার উত্তর এলো। প্রথমেই খবর, অনাদি এ চিঠি পাবার আগেই সে লণ্ডন ছেড়ে চলে যাবে। কোথায়, তা লেখেনি। অনাদি বুঝতে পারলে না কী ব্যাপার; শেষবারের মতো একটিবার দেখাও না করে ফুল্লরা চলে গেল। প্রবল চেষ্টায় অভিমানী উদ্বেল হৃদয়কে সংযত করে পড়লে:

"তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই অনাদি, এমন একদিন ছিল যখন সুধীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার বড় আর কিছু ভাবতেও পারতাম না। সেদিন তুমি দেখনি। সুধীর জন্যে আমার সমস্ত দেহ মন আকুল উদগ্রীব হয়ে থাকত। কিন্তু সে ছিল তখন ঘুমন্তপুরীর রাজপুত্র। ওকে জাগাবার সোনার কাঠি আমি তো পাইনি। দেশবিদেশে মুসাফেরগিরি খেলাধূলা আর বন্ধু অর্থাৎ তোমার গল্প ও চিন্তা ছাড়া অন্য কাজ বা কথা কি ছিল না সংসারে? আমি মেয়েমানুষ—কী করতে পারি? তাছাড়া স্বভাবতই আমি অভিসারিকা নই।

যাক, কী বলছিলাম।

সেদিন সুধীর সব ছিল, ছিল না কেবল 'মন'। যাকে বলে—বুড়ো খোকা। চাকা যখন উল্টে গেল তখনই কি সময় হ'ল হুঁস হবার? বলো দেখি, পুরুষ মেয়েকে বা মেয়ে পুরুষকে অতি বিশদ, অতি স্পষ্ট করে জানলে—যেমন আমি জেনেছি সুধীকে—বিয়ে করবার মতো সাহস বা মনের জোর কোনোটিই থাকে কি? আত্মদান ব্যাপারটা তো সোজা নয় অনাদি। তার জন্যে চাই অনেকখানি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর দু'তরফেই তার যোগ্যতা।

সত্যি কথাই বলব। দেহের দিকে আজও আমি সুধীর প্রতি উদাসীন নই। দেহেরও একটা স্বধর্ম আছে, কী চায় কাকে চায়, জানে। কারো ডাকে সে সাড়া দেয়, কেউ বা তাকে দূরে ঠেলে। দোষ দাও সেজন্যে প্রকৃতিকে, আমিও দিই।

এজন্যেই আমি পালাব। আমার রক্তের মাংসের দুর্ব্বলতা থেকে নিজেকে আমায় বাঁচাতেই হবে। যদি দেহের মতো মনও আমার একান্তভাবে সুধীকেই কামনা করত, জীবন এমন দুঃসহ দ্বন্দ্বময় হ'ত না।

তুমি হয়ত বলবে, দেহ আর মন কি একই সঙ্গে দু'টো আলাদা জিনিষ চাইতে পারে?

আমার উত্তর— পারে।

সুধীর ভিতর এক প্রবল আকর্ষণী শক্তি রয়েছে। ওর এই পাগলামিও প্রচণ্ড। কত নারী শুধু এটুকুর জন্যেই প্রবল পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আমিও হেসে যেতাম একই স্রোতে, যদি না তোমার সঙ্গে দেখা হ'ত। আজও সুধীকে ভালোবাসি আমি, কিন্তু ভালোবাসারও বড় যা, তোমার বন্ধুত্বে ও সাহচর্য্যে পেয়েছি তা-ই।

রাত্রিদিন কত বড়, কত ভয়ানক আত্মদ্বন্দ্বে শিখেছি—জীবনটা আগাগোড়া রোমান্স নয়, ভালোবাসা sex নয়, নারী শুধুই নারী নয়। তারও আছে মন, আছে মনের 'বালাই'। সেই মন ভয় পায়, সঙ্কুচিত হয় পুরুষের উদ্দাম বাসনার শিখায় মুহূর্ত্তের, এমন কি চিরকালের হলেও, পতঙ্গের মতো নিজেকে বলি দিতে।

শুনেছি নারীর প্রেমে পুরুষ বড় হয়েছে, বড় বড় সৃষ্টির মূলে রয়েছে তার ভালোবাসা। কিন্তু পুরুষের ভালোবাসা কী দিয়েছে তাকে? গৃহ, সন্তান—আর কী?

রাগ কোরো না, পুরুষের প্রতি বিদ্বেষ নেই আমার। তোমাকে, এমন কি সুধীকেও ভুলতে কখনো পারব না। যদিও পারলেই হ'ত ভালো। স্বপ্নভঙ্গ সুখের নয়। কিন্তু মিথ্যা স্বপ্ন ভাঙাই উচিত। কাছে থাকলে শ্রদ্ধা করবার গর্ব্ব করবার যেটুকু বাকি আছে, তাও যাবে। সে সর্ব্বনাশা ভাঙন সহ্য করব কিসের জোরে?

সুধীর জন্যে আমার ভাবনা নেই। কারণ তুমি আছ। আমি জানি, তুমিও বিশ্বাস কোরো—ওর প্রয়োজন প্রিয়ার নয়, বন্ধুর। পুরুষ নারীকে যতদিন প্রেয়সীর পদ থেকে স্বেচ্ছায় সম্মানে 'বন্ধু'র পদে প্রতিষ্ঠিত না করবে, ততদিন তাকে দিয়ে পুরুষের মঙ্গল নেই। এই আমার শেষ কথা। বুঝে—পার তো আমায় ক্ষমা কোরো।"

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্মালা দেবী

বঙ্গসাহিত্যে হুগলী কলেজের দান *

শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার

Ars longa, vita brevis—কলা কালসম অনন্ত, জীবন স্বল্পপ্রাণ। এই জীবন অর্থে মানব-জীবন। কিন্তু এই অধিবেশনের জীবন স্বল্পতম, আর এই প্রবন্ধ-পাঠকের জীবন আরও স্বল্প, আরও আরও অল্প—বুদ্বুদ-প্রাণ-প্রায়,—সুযোগ্য অধ্যক্ষ জ্যাকারিয়া মহাশয় এবং তস্য মন্ত্রী বাঙ্গালার অধ্যাপক কালীপদ সেনের কল্যাণে ১০ মিনিট-কাল-স্থায়ী অথচ আলোচ্য বিষয় কলার ন্যায় অনন্ত, অসীম, অপরিমেয়। যদিও আমি শুধু আমার পিতামহ ও পিতৃদেবের সাহিত্য-জীবনী-মাত্র আলোচনা করিতে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছি, তথাপি লোভ সামলাইতে না পারিয়া আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি এক মহাবিড়ম্বনাজনক বাতুলতায়।—ইংরাজি ১৮৩৬ হইতে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত ৫০ বৎসরের মধ্যে হুগলী কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে নিজেদের কৃতিত্ব ও গুণগরিমা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া, বঙ্গমাতার সেবা করিয়া নিজেরা ধন্য হইয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভারতীর মুখোজ্জ্বল করিয়া স্বদেশ, সমাজ ও সাহিত্যকে অলঙ্কৃত, পুষ্টীকৃত এবং গৌরবান্বিত করিয়াছেন,—আপনাদের সম্মুখে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে। লিখিতে গিয়া হাত কাঁপিতেছে—না জানি কি মহাপাপ করিয়া বসিব; যদি শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া ফেলি, তাহা হইলে সে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই! হুগলী কলেজ বাঙ্গালা সাহিত্যে যে অসীম, অমূল্য, অফুরন্ত দান মুক্তহস্তে করিয়াছে, আজ পর্যন্ত অন্য কোন বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান যে তাহার একচতুর্থাংশও করিতে পারে নাই, এ কথা এই প্রকাণ্ড সভায় বিদ্বজ্জনগণ মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বিঘোষিত করিলে সত্যের অপলাপ ত হইবেই না—অতিরঞ্জনও হইবে না। হুগলী কলেজের যে সকল কৃতী ছাত্র সাহিত্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনও একজনের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিতে যাওয়া আমার পক্ষে শুধু ধৃষ্টতা নহে—ঘোরতর বাতুলতা, বাচালতা ও প্রগল্‌ভতা। তাই ভয়ে সারা দেহে কাঁটা দিয়া উঠিতেছে যে, যদি এই সাহিত্যরথগণের স্মৃতিতর্পণ করিতে গিয়া তাঁহাদের পিণ্ডান্ত পিণ্ডশেষ করিয়া ফেলি! তাহার উপর দ্বিতীয় বিড়ম্বনা—মাননীয়া সভানেত্রী মহোদয়ার শ্রীকরকমল-চালিত সুমধুর অথচ আমার বুদ্বুদপ্রাণঘাতী ঘণ্টাধ্বনি কখন কোন্ শুভ বা অশুভ মুহূর্তে বাজিয়া উঠিবে, আর আমার ছোট প্রাণ-টুনটুনিটি ফুস করিয়া উড়িয়া যাইবে! হে বঙ্গ-জননি! আমাকে এই মহাবিপদ্ হইতে উদ্ধার কর, এই অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্তি দাও, মা!

হুগলী কলেজের প্রতিষ্ঠা-বর্ষ ১৮৩৬ হইতে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত ৫০ বৎসরের মধ্যে এই শিক্ষায়তনের ছাত্র হিসাবে আমি মাত্র ষোল জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবকের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। অনুরোধরক্ষা-কল্পে পিতামহ ও পিতৃদেবের পরিচয় একটু বেশি করিয়া দিব এবং বাকি ১৪ জনের পরিচয় অতি সংক্ষেপে দুইচার ছত্রে সারিব।

'চন্দ্রে সবে ষোলকলা হ্রাস-বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥'

কৃষ্ণচন্দ্রের সভার ন্যায় হুগলী কলেজ চৌষট্টি কলায় পরিপূর্ণ থাকিলেও আমাকে বাধ্য হইয়া ষোলকলার উল্লেখেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে হয়ত দুইচার জনের নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে এবং মরণকাঠী বা ঘণ্টার ভয়ে এক-আধজনের নাম ইচ্ছা করিয়াও উল্লেখ করি নাই। আপনারা আমার এই ত্রুটি মার্জনা করুন। এই অনুল্লেখ

* হুগলী কলেজের শতবার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে ৩০এ নভেম্বর তারিখে পূজনীয়া শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর নেতৃত্বে যে বিশেষ সাহিত্য-সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার জন্য লিখিত এবং সেই সভায় লেখক-কর্তৃক আংশিকভাবে পঠিত।

বা বাদ-দেওয়ার অন্য কোন বিশেষ কারণ আরোপ করিয়া আপনারা আমাকে আর প্রত্যবায়গ্রস্ত করিবেন না।

প্রথমেই এই ষোল জন প্রাতঃস্মরণীয় সাহিত্যসেবীর নাম তাঁহাদের হুগলী কলেজে পঠদ্দশার পর্যক্রমানুসারে উল্লেখ করিতেছি। ইহা হইতে তাঁহাদের বয়সের তারতম্যও মোটা-মুটি বুঝিতে পারা যাইবে।

১	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৯	শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু
২	হরচন্দ্র ঘোষ	১০	মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়
৩	গঙ্গাচরণ সরকার	১১	যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু
৪	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১২	শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
৫	দয়ালচাঁদ সোম	১৩	বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়
৬	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৪	রসময় মিত্র
৭	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	১৫	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়
৮	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কাল্‌নার নিকটে বাকুলিয়া গ্রামে ইঁনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ইঁহার রচনার আদর্শ ছিল, পরে বাঙ্গালা কাব্যের গতি পরিবর্তিত করিয়া রঙ্গলালই হেমমধু-কাব্যযুগের প্রথম পথপ্রদর্শক। বহুদিন এডুকেশন গেজেটের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 'রসসাগর' নামে একখানি পত্রিকাও কিছুদিন সম্পাদন করিয়াছিলেন। স্মরণ করাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছি ইঁনিই 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' প্রণেতা রঙ্গলাল। সেই—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?'

ইঁহার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ কর্মদেবী, শূরসুন্দরী ও কাঞ্চীকাবেরী। বাঙ্গালা ছন্দের উপর ইঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল, তাই ইনি বাঙ্গালা কাব্যের নূতন যুগ-প্রবর্তক। ১৮৮৭ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

হরচন্দ্র ঘোষ

হুগলীর অধিবাসী। ইঁহার সম্বন্ধে পিতৃদেব অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'পিতাপুত্র'-এর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—'হুগলী কলেজে মাতৃভাষা শিক্ষা ভালরূপই হইত। পিতৃদেবের সময়েও হইত আমাদের সময়েও হইয়াছিল। আমাদের সময়ে যে ভালরূপ হইত, তাহার সাক্ষী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। মধ্য সময়ে যে হইত, তাহার সাক্ষী বঙ্কিমবাবু ছিলেন। প্রথম সময়ে যে হইত, তাহার সাক্ষী হুগলীর হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন।......ইতিপূর্বে ইংরাজি অভিজ্ঞের বাঙ্গলা ভাষার অনভিজ্ঞতার একটা বিদ্রুপাত্মক গল্প ছিল। লোকে বলে কোকিলের স্ত্রীলিঙ্গ লিখিতে হইলে, তাঁহারা নাকি লিখিতেন "মেদী কোকিল"। এ দুর্নামপ্রধানত এ কলেজে হরচন্দ্র ঘোষ ও পিতৃদেব কর্তৃক দূরীকৃত হয়।

ইঁনি বাঙ্গালা অনুবাদের জন্য 'লর্ড অকল্যাণ্ড' পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন।

গঙ্গাচরণ সরকার

আমার পিতামহ। পিতৃদেব 'পিতাপুত্র'-এর একস্থলে লিখিয়াছেন,—'(উঁহার) সন্ধ্যার পর পিতৃদেবের বাসায় মহা মজলিস হইত। মন্ত্রণাগৃহ নহে, দুঃখ-দারিদ্র্য জ্ঞাপনের স্থান নহে, পরনিন্দা-পরকুৎসা প্রসার করিবার কেন্দ্র নহে, দুর্বিসহ রাজনীতি চর্চা করিবার ক্ষেত্র নহে, রাস্তির শ্রান্তির প্রমোদভবন নহে, কিন্তু মজলিস, ভরপূর মজলিস—গমগমে মজলিস।...

এই শান্ত মজলিসে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের চর্চা বিশেষরূপ হইত। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল-পঁচিশ, জীবনচরিত প্রকাশিত হইল। তিনি "কৃষ্ণ-নগরের মূল পুস্তক দৃষ্টে" ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ প্রকাশিত করিলেন। তারাশঙ্করের কাদম্বরী প্রকাশিত হইল। এই সকল পুস্তক এবং সেই সময়ের অন্যান্য পুস্তক—ভাল অক্ষরে ছাপায়, ভাল সংস্করণে—যেমন প্রকাশিত হইত, পিতা এক খণ্ড ক্রয় করিতেন, আর সান্ধ্য সম্মিলনে পঠিত, আলোচিত, আন্দোলিত হইত। সেই সাহিত্যের আন্দোলনে আনন্দের ফুয়ারা উঠিত।'

অন্যত্র লিখিত আছে,—'পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে আদালতে বাঙ্গালা এক বিকুৎসিত ব্যাপার ছিল। একপৃষ্ঠা

দরখাস্তে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকিত। "এতদ্বত্যা" "বিধায়" ইত্যাদি শব্দ দিয়া প্যাঁচের উপর প্যাঁচ লাগাইয়া বাঙ্গালা ভাষার এবারৎ বা ষ্টাইল একটি বিষম গোলক ধাঁধাঁ করিয়া তোলা হইত। বাঙ্গালা লেখার জন্য যত্ব-ণত্ব-জ্ঞান থাকা আবশ্যক ছিল না। এও আকার দিয়া (া) হএ্যা (হইয়া), ওয়ে আকার দিয়া, হওা (হওয়া) সর্বদাই থাকিত। লেখকেরা কেহ বিশুদ্ধ বানানের ধার ধারিত না। ব্যাকরণ কাহাকে বলে জানিত না। গেরর উপর গের দিয়া, প্যাচের উপর প্যাচ দিয়া, জটিল-কুটিল দুর্বোধ একটা কারখানা করিতে পারিলেই লেখক বড় মুন্সি হইতেন। লেখকদিগের বুদ্ধি ছিল না এমন নহে—কিন্তু ঘোর ফের করিয়া যে যত ভাষা অস্পষ্ট করিতে পারিত, তাহার মুন্সিয়ানা বুদ্ধির তত প্রশংসা হইত। তাহার পর নির্বুদ্ধিতাও যথেষ্ট ছিল। একজন উচ্চ কর্মচারী তাঁহার উপরিস্থ আর একজন উচ্চতর কর্মচারীকে লিখিলেন,—"পুলিশ সাহেবের আশায় দস্যুরা পলায়ন করিল।" বড়সাহেব বাহাদুর অভিধান দেখিয়া জানিলেন যে "আশা" অর্থে ইচ্ছা; অতএব বুঝিলেন, পুলিশ-সাহেবের ইচ্ছাক্রমে ডাকাতরা পলাইয়াছে। সুতরাং পুলিশসাহেব সস্পেণ্ড হইলেন, মহাতুমুল হইয়া উঠিল।...

এরূপ সর্বদাই হইত। এই সকল বিড়ম্বনা দূরীকরণার্থ পিতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। আহেলে মামলা, কাছারি আমলা, উকীল মোক্তার সকলের কার্যেই তাঁহাদের ত্রুটি দেখাইয়া দিয়া, তাঁহাদের ভাষা সংশোধন করিয়া দিতেন, আর ভবিষ্যতে সেরূপ না হয়, তাহার জন্য সৎ উপদেশ প্রদান করিতেন।...যখন যে জেলায় গিয়াছেন, সেইখানেই যাহাতে ভাষার সংস্কার হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। যে ভাষায় তিনি সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা অবিকল সাক্ষীর কথা হইলেও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইত।...তাঁহার সাক্ষীর জবানবন্দি অতি পরিষ্কার বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালা। সমস্ত হুকুম নিজে লিখিয়া দিতেন; সাধারণত মোকদ্দমার রায় বাঙ্গালাতেই লিখিতেন, তাহা অতি প্রাঞ্জল বাঙ্গালা হইলেও বিশেষ প্রগাঢ় হইত। তাঁহার সেই আদর্শ বাঙ্গালা লেখার সংক্রামকতা ছিল; বঙ্গেই উকীল মোক্তার সকলেই ভাল বাঙ্গালা লিখিতে চেষ্টা করিতেন।'....

আর এক স্থলে লিখিত আছে,—'পিতার সাহিত্য-সেবার আর একটি অঙ্গ বলি। যে সময়ের কথা বলিতেছি...তখন জাঁক পসার পাঁচালীর...কথার ছটায় শব্দের ঘটায় দাশরথি তখন বাঙ্গালা আচ্ছন্ন করিয়াছেন; আর আমাদের নিকটে চুঁচুড়ায় গাওনার জোরে, সুরতালের বলে সন্ন্যাসী তখন দাশরথির সমকক্ষতা করিতেছেন। এই সন্ন্যাসীর দলে একজন তবলা বাদ্যকার ছিলেন ঠাকুরদাস সরকার, আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী।...এই ঠাকুরদাসের অনুরোধে পিতা তিন চার পালা পাঁচালীর গান তাঁহাকে রচনা করিয়া দেন। ঠাকুরদাস সন্ন্যাসীর দল হইতে ভাঙ্গিয়া আসিয়া সেই রচনার বলে পৃথক্ দল করিয়াছিলেন। একপালা শিবের বিবাহ, দ্বিতীয় পালা শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ, তৃতীয় পালা বিরহ, চতুর্থ পালা আগমনী।'

পিতামহ নানাবিধ বিষয়ে বহুতর সুন্দর সুন্দর গান রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'কে রে কাল কমিনী। বাস-পরিহারিণী॥' গীতিটি রামপ্রসাদের গানের মধ্যে রাম-প্রসাদেরই নামে ছাপা হইয়াছে। কৃষ্ণবিষয়ক গান, ব্রহ্মসঙ্গীত—এমন কি মধুর টপ্পা পর্যন্ত তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ঢাকায় অবস্থানকালে পিতামহ দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন,—একটি হিন্দুধর্ম-বিষয়ক, অন্যটি বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা-বিষয়ক। উভয় প্রবন্ধই পরে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত অধিকাংশ লেখকের লেখার ভঙ্গির সমালোচনা বিশদ ভাবে করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ইহাই স্মৃতিকাগার।

পিতৃদেব-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সাধারণী' পত্রিকায় তাঁহার বহুতর কবিতা ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গসাহিত্যে পিতামহের শ্রেষ্ঠ দান 'ঋতুবর্ণন'। ইহার দ্বিতীয় মুদ্রণের 'নিবেদন'-এ পিতৃদেব লিখিয়াছিলেন,

'কাব্য হিসাবে ব্যতীত ইতিহাস হিসাবে ইহার একটা মূল্য আছে। পিতৃদেব সেকালের এবং একালের মধ্যবর্তী পুরুষ। তাঁহার কাব্যের রীতি বা ভঙ্গি দুইকালের মধ্যবর্তী।'

আর ইহার দীর্ঘ সমালোচনা-প্রসঙ্গে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন,—'কাব্যের দুইটী উদ্দেশ্য বর্ণন ও শোধন।…এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণন নহে, অপ্রাকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে।… তাঁহারা সৌন্দর্যের, অতিপ্রাকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতিপ্রাকৃত কিন্তু অপ্রাকৃত নহে।…ইহাকেই আমরা প্রবন্ধারম্ভে শোধন বলিয়াছি। যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, যাহার উদ্দেশ্য কেবল "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" তাহাকেই আমরা বর্ণন বলিয়াছি।

আমরা দুইজন আধুনিক বাঙ্গালী কবির কাব্যকে উদাহরণ-স্বরূপ প্রয়োগ করিয়া এই কথাটী সুস্পষ্ট করিতে চাহি। যে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধন, হেমবাবু প্রণীত "বৃত্রসংহার" তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।… দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত "ঋতুবর্ণন।"…ইহাও বক্তব্য যে, গঙ্গাচরণবাবু স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন যে, তিনি শোধন কাব্যেও অপটু নহেন। উদাহরণস্বরূপ প্রভাত-বর্ণনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

মরি কি তরল অনল কিরণে
চল চল আভা ঢালিয়া ভুবনে,
পুলক-জনক আলোক-ভূষণে
প্রাচী নভোদ্বারে উষা উপনীত ;
আরক্ত অধরে কিবা হাসি হাসে,
সে হাসিহিল্লোলে চরাচর ভাসে,
নিশার তামস নিশার আকাশে,
হেরিয়া হইল অখিল মোহিত।…'

পিতৃদেব লিখিয়াছেন, '১৮৩৬ খৃষ্ট অব্দে ১৬ই শ্রাবণ (১লা আগষ্ট) চুঁচুড়াতে College of Mahammad Mashin খুলিল। ইহাকেই এখন হুগলী কলেজ বলে। যে দিন খুলিল, সেই দিনই পিতা স্কুলে ভর্তি হইলেন। শুনিয়াছি, সে দিন কলেজ খুলিয়াছে, ছেলেরা পড়িতে যাইতেছে, দেখিবার নিমিত্ত লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। তখন ভর্তি হওয়ার কোনরূপ সেলামি ত লাগিতই না, স্কুলের মাহিনাও ছিল না, কাগজ, কলম, কালি, খাতা, পড়িবার সমস্ত পুস্তক অধ্যক্ষেরা ছাত্রগণকে বিনা মূল্যে দিতেন।'

পিতামহ হুগলী কলেজে অধ্যয়ন-কালে বাঙ্গালা প্রবন্ধ-রচনার জন্য যে রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন, সেই-খানিকে আপনাদের দর্শনার্থ এই সভামধ্যে টেবিলের উপর রাখা হইয়াছে। তাহার এক পৃষ্ঠায় হুগলী কলেজের প্রতিচ্ছবি, অন্য পৃষ্ঠায় 'Bengalee Essay. Ganga Churn Sircar 1845 এবং কিনারার (rim) ধারে ধারে Presented by D. J. Money, Esq., C. S.' ক্ষোদিত আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-সম্রাট্ বন্দেমাতরমের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধে কোন কথার অবতারণা করিতে গিয়া আমার পাপের ভার আর বাড়াইব না। আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ভার লইয়াছেন। আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, যে হুগলী কলেজের দৌলতে আমরা ঋষি বঙ্কিমের বাণী কর্ণগোচর করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছি, যিনি জন্ম গ্রহণ না করিলে আমরা আজ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতাম, সেই হুগলী কলেজ ঋষি বঙ্কিমের অধ্যয়নাগার বলিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই পবিত্র দেবালয় —এ যে ঋষির সাধন-নিকেতন।

দয়ালচাঁদ সোম

আমাদের চুঁচুড়াবাসী দয়ালচাঁদ সোম মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন; কুমারতন্ত্র তথা ধাত্রীবিদ্যায় তাঁহার যশ, তাঁহার গৌরব ভারতের বাহিরেও ঘোষিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় ধাত্রীবিদ্যার গ্রন্থ তিনিই প্রথম প্রণয়ন করেন।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের সহোদর। দীর্ঘকাল বঙ্গদর্শনের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধসম্ভারে বঙ্গদর্শনের বক্ষ অলঙ্কৃত হইয়াছিল। শৈশব-সহচরী, মধুমতী প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার সাহিত্য-সেবার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

পিতৃদেবের সম্বন্ধে বিশ্বকোষের নূতন সংস্করণে যাহা লিখিয়াছি, তাহারই সংক্ষিপ্ত সারাংশ, অর্থাৎ সাহিত্য-জীবনীটুকু আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি। তবে আলোচনা পাঠ করিবার পূর্বে সভয়ে একটি বিষয় আপনাদের সমীপে নিবেদন করিতেছি। 'রূপক ও রহস্য'-এর 'গ্রন্থ পরিচয়'-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম,—'কিন্তু পিতার লিখিত প্রবন্ধ-

নিচয়ের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা পুত্রের পক্ষে মহা বিড়ম্বনা—এ কথা আগে বুঝিতে পারি নাই। লেখার গুণ-বর্ণনা করিবার, সুখ্যাতি করিবার উপায় নাই—লোকে বলিবে, "বেটা সার্টিফিকেট দিচ্ছে বাবাকে,—স্পর্দ্ধা দেখ!" আবার কোন দোষের কথা উল্লেখ করিলেই পাঁচজনে বলিবে,—"বেটা সমালোচনা করছে বাপের লেখার,—ঘোর কলি!" সুতরাং আমার উভয় সঙ্কট!' আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার এই ঘোরতর বিপদের কথা মনে রাখিয়া আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। তবে ভরসার মধ্যে পিতৃতর্পণের অধিকাংশ স্থল গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় করিব, আর বাকি অংশে ভক্তনিবেদিত নির্ম্মাল্য কুড়াইয়া লইয়া পিতৃচরণোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব।

পিতামহের ন্যায় পিতৃদেবও এক স্মরণীয় দিনে হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলেন। যে দিন দমদমায় সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া চাকরীতে ইস্তফা দিয়া অন্যান্য বিদ্রোহিগণের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, ১৮৫৭ সালের সেই ২রা জুন তারিখে পিতৃদেব ষষ্ঠ শ্রেণীতে সেকেণ্ড নম্বর রীডারের ক্লাসে ভর্তি হন। তাহার পর দ্বিতীয় শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই দুইমাস পরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি ১৮৬৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই হুগলী কলিজিয়েটের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র সুপ্রসিদ্ধ আমীর আলি তাঁহার সহিত পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৬৭ সালে হুগলী কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে এম. এ. ও আইন পড়িতে যান। সুতরাং দীর্ঘ এগার বৎসর তিনি এই শিক্ষা-মন্দিরে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

পিতৃদেব যে সময়ে কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন, তখন স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে কলেজের অধ্যক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন শ্রেণীর শিক্ষক পর্যন্ত সকলের দোষ ও গুণাবলি-সম্বন্ধে একটি বিচিত্র রহস্যাত্মক ছড়া প্রচলিত ছিল। পিতৃদেবের মুখে ছড়াটি আগাগোড়া শুনিয়াছিলাম; এখন যে কয় পঙ্‌ক্তি স্মরণ আছে, উদ্ধার করিতেছি।

মিষ্টার Kerr বড় post,
তাঁর নীচে মিষ্টার Thwaytes;
মিষ্টার থোয়েট্‌সের গাড়া বিবি
তাঁর নীচে Graves রাগী;
গ্রেভস্ রাগী চলে নিত্যি গড়ের পথটা,
তাঁর নীচে ঘোষাবী চক্রবর্ত্তী;
ঘোষারী চক্রবর্ত্তী খান আণ্ডা,
তার নীচে বিন্‌ল্যাণ্ডা;
বিন্‌ল্যাণ্ডা পড়াতে প্রিয়,
তাঁর নীচে মিষ্টার ইয়োর;
* * *
... বড় ল্যাক, ...
তাঁর নীচে ক্লাশ ফাঁক।

হুগলী কলেজের সহিত পিতৃদেবের সম্বন্ধ বিষয়ে আর একটি মাত্র কথার উল্লেখ করিতেছি। শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে General Education Commitee স্থির করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক স্কুল এবং কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে "who has made the greatest progress during the year in the knowledge attained from the study of the books in the Library" তাহাকে একটি মেডেল পুরস্কার দেওয়া হইবে। পরে এই পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হয় এবং শেষে উঠিয়াও যায়। হুগলী কলেজ হইতে মাত্র দুইটি ছাত্র এই লাইব্রেরী-পরীক্ষা-পুরস্কার পাইয়াছিলেন, একজন দ্বারকানাথ মিত্র (পরে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ বিচারপতি) এবং অন্য জন আমার পিতৃদেব।

পিতৃদেবের সাহিত্য-জীবনীর কথা বলিতে গেলে তিনি সাহিত্য-মন্দিরে কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন, সর্বাগ্রে সেই বিষয়েরই অবতারণা করা উচিত। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

'দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী, তৎপার্শ্বে উপবীতবক্ষে গণেশমূর্ত্তি বিদ্যাসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরস্বতীস্বরূপ ভারতচন্দ্র, তৎপার্শ্বে ময়ূর-চূড়া, টেরি-কাটা কার্ত্তিক স্বরূপ ঈশ্বরগুপ্ত, মধ্যে সাক্ষাৎ মহাদেবতা পিতৃদেব, চালচিত্রে শিবরূপী মদন-মোহন,—সাহিত্যে আমি এই মহাপ্রতিমার উপাসক। অনর্থক পিতৃগৌরব-বৃদ্ধির জন্য পিতৃদেবকে মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত করিতেছি, এমন কেহ মনে করিবেন না। বাঙ্গালা

লেখা-পড়ায় আমার প্রবৃত্তি, পন্থানুসরণ, শিক্ষায় সাহায্য, ভ্রমে সংশোধন—প্রধানত তাঁহা হইতেই। তবে অন্য পঞ্চদেবতার উপাসনা অতিশৈশবেও যেমন করিয়াছি, এখনও তেমনি করিতেছি।'

ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃদেব যখন বহরমপুরে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন, তখন বহরমপুর বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীদ্বারা পূর্ণ ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার রামদাস সেনের বাটী বহরমপুরে, তিনি তৎকালে তাঁহার প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীর মধ্যে অধ্যয়ননিরত। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক-প্রস্তাব-প্রণেতা পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বহরমপুর কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক। বাঙ্গালার ইতিহাস লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন তথাকার উকীল। বিখ্যাত ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোমণি মহাশয় বহরমপুর নর্ম্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ। তখন গঙ্গাচরণ সরকার মুন্সেফ, দীনবন্ধু মিত্র পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। এই সাহিত্যিক জ্যোতিষ্কের একত্র সমাবেশের অপূর্ব পরিণতি বঙ্গে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব।

১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইল, প্রথম সংখ্যায় পিতৃদেবের 'উদ্দীপনা' নামক প্রবন্ধ বাহির হইল। এই বহরমপুরেই অক্ষয়চন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পরিচয়, সে পরিচয় ক্রমে বয়ঃপার্থক্য অতিক্রম করিয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল।

১২৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিক চুঁচুড়া হইতে পিতৃদেব সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাধারণী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। বঙ্গদর্শনের সহিত সাধারণীও কাঁটালপাড়ার বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইত। পিতৃদেব সাধারণী সম্পাদন করিতেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একযোগে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন। তিনি প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে বঙ্গদর্শনে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' করিতেন। এই বঙ্গদর্শনেই তাঁহার 'গ্রাবু', 'দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—'বঙ্গদর্শনের অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তাঁহারই প্রণীত। * * * তাঁহার প্রণীত সেই সকল প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, অক্ষয়বাবুর ন্যায় প্রতিভা-শালী গদ্যলেখক অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।' এতদ্ভিন্ন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কমলাকান্তের দপ্তরের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় পিতৃদেব লিখিত 'চন্দ্রালোকে' এবং ১৪শ সংখ্যায় 'মশক' প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে 'চন্দ্রালোকে' প্রবন্ধটিকে কমলাকান্তের দপ্তরভুক্ত করিয়াছেন। ১২৮১ সালের শ্রাবণ মাসে পিতৃদেব চুঁচুড়ার কদমতলায় নিজের বসত বাড়ীর সংলগ্ন স্বতন্ত্র বাটীতে 'সাধারণী-যন্ত্রালয়' স্থাপন করিয়া সাধারণী প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সরল ভাষায় রাজনীতি আলোচনা করিবার জন্য এবং জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিবার জন্য সাধারণী পরিচালিত হইত। ইহাতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের আলোচনাও থাকিত প্রচুর, আর ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল নির্ভীক, নিরপেক্ষ অথচ সরল সমালোচনা। পিতৃদেব বঙ্গের অদ্বিতীয় সমালোচক ছিলেন। ১৩ বৎসর যোগ্যতার সহিত সাধারণী প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালীকে রাজনীতির অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছিল। সাধারণীর মতামত রাজসকাশে আদৃত হইত। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের হাতেখড়ি এই সাধারণীতে। ১২৯৩ সালে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভবানীপুরের এল. এম. এস. কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. মহাশয় সম্পাদিত 'নববিভাকর' পত্রিকা সাধারণীর সহিত মিলিত হয়। পিতৃদেব এই 'নব-বিভাকর-সাধারণী' সম্পাদন ও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত হইয়া পিতৃদেব সাধারণী-যন্ত্রালয় কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। এই সালের শ্রাবণ মাস হইতে তিনি 'নবজীবন' মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। নির্জীব হিন্দু সমাজে সঞ্জীবতা আনয়ন করিবার জন্য, বাঙ্গালীর প্রাণে ধর্ম্মের সত্য জ্যোতি বিকিরণ করিবার জন্য, বাঙ্গালীকে নবজীবন দান করিবার জন্য তিনি নবজীবন প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নবজীবন পাঁচ বৎসর ধরিয়া যোগ্যতার সহিত চলিয়াছিল। সাধারণী ও নবজীবন পিতৃদেবের কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই নবজীবন ও সাধারণীতে বাঙ্গালার অনেক সাহিত্যিকের

হাতেখড়ি হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রসিদ্ধ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং প্রসিদ্ধ সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, অক্ষয়চন্দ্র তাঁহাদের সাহিত্যগুরু —সাহিত্যিক জীবনের সূচনায় তাঁহার সময়োচিত অমূল্য উপদেশ, পরামর্শ, উৎসাহ এবং সর্বোপরি রচনার যথোপযুক্ত সংশোধন ও পরিবর্ত্তনই তাঁহাদের ভবিষ্য সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। চট্টগ্রামের ষষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পিতৃদেবকে সভাপতিরূপে বরণ করিতে গিয়া কূটরাজনীতিজ্ঞ প্রবীণ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তারস্বরে ওজস্বিনী ভাষায় বিঘোষিত করিয়াছিলেন, 'আচার্য অক্ষয়চন্দ্র শুধু আমার সাহিত্যগুরু নহেন,—তাঁহার সাধারণী পড়িয়াই রাজনীতির ক-খ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ-পড়া পর্যন্ত শিখিয়াছি।' আর বঙ্গবাসীর যোগেন্দ্রচন্দ্র যে পিতৃদেবের হাতেগড়া পুরামাত্রায় সাহিত্যশিষ্য তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

১৩২৪ সালের (১৯১৭ খৃঃ) ১৬ই আশ্বিন, ৭১ বৎসর বয়সে কদমতলা, চুঁচুড়ার বাড়ীতেই পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার সমগ্র জীবন মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম বাইশ বৎসর পঠদ্দশা, দ্বিতীয় একুশ বৎসর (১২৭৫ হইতে ১২৯৬) সাহিত্যিক জীবন এবং তৃতীয় আটাশ বৎসর সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,—'যমে মানুষে টানাটানির পালা,—কখন যম জিতিতেছে, কখন আমি জিতিতেছি।' ১২৯৫ সালে পিতামহ গঙ্গাচরণ যোগ্যধামে গমন করিলেন, বিসূচিকা রোগে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল, পিতৃদেবের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি গঙ্গাচরণের একমাত্র সন্তান। পিতৃবিয়োগেই তাঁহার প্রথম ও প্রধান শোক। তাঁহার একটানা খরস্রোত সাহিত্য-সেবায় বাধা পড়িল, একনিষ্ঠ সাধকের সাধনায় বিঘ্ন ঘটিল। অতঃপর ক্রমাগত উপর্যুপরি মৃত্যুশোকে অতবড় তেজস্বী, মনস্বী, দৃঢ়চেতা পুরুষকে একটু যেন বিচলিত করিয়া তুলিল। ১২৯৭ সালে সাতটি ছোট ছোট সন্তানকে রাখিয়া আমাদের-মা পরলোক গমন করিলেন। ১২৯৯ সালে পিতৃদেবের জননী, ১৩০৭ সালে তাঁহার ২৭ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরচন্দ্র এবং পর পর কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জামাতার মৃত্যু হয়। এমনি করিয়া বর্ষের পর বর্ষ গিয়াছে, আর পিতৃদেবের বুকের এক একখানি পাঁজর খসিয়া গিয়াছে। তাই এই আটাশ বৎসরের মধ্যে পূর্বের ন্যায় অনন্যকর্মা হইয়া একমনে একধ্যানে বাণীর সেবা করিবার সুযোগ ও সুবিধা তাঁহার হয় নাই, তখন যে যমে-মানুষে টানাটানির পালা; কিন্তু তবুও তিনি সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যসেবা করিতে বিরত হন নাই। এই সময়ের মধ্যেই তাঁহার 'পিতাপুত্র', 'সনাতনী' ও 'কবি হেমচন্দ্র' প্রকাশিত হইয়াছিল; এই সময়েই তিনি 'বঙ্গবাসী' ও 'পূর্ণিমা'র নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং অন্যান্য মাসিক পত্রিকা মধ্যে মধ্যে তাঁহার, সরস, সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইত; এই সময়েই তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন-উপলক্ষে তিনটি উপাদেয় ও জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহার বাটীতে স্থাপিত 'হিন্দুসমিতি' নামক সাহিত্য-সমিতির তরুণ সভ্যগণকে লইয়া সর্বদা সাহিত্যালোচনা করিয়া তিনি প্রচুর নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতেন। তাঁহার শেষ রচনা মৃত্যুর ১৫।২০ দিন পূর্বে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি যে ছিলেন আজীবন একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবী।

এইবার পিতৃদেব কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রণীত পত্রিকা ও পুস্তকাবলির একটি তালিকা এবং উহাদের প্রথম প্রকাশ-তারিখ উল্লেখ করিব।

'সাধারণী'—সাপ্তাহিক পত্র (১১ই কার্তিক, ১২৮০)। 'নবজীবন'—মাসিক পত্র (শ্রাবণ, ১২৯১)। 'নববিভাকর-সাধারণী'—সাপ্তাহিক পত্র (বৈশাখ, ১২৯৩)। 'শিক্ষানবিশের—পদ্য'—অধিকাংশই বায়রনের রসানুবাদ (১২৮১)। 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ'—(১) বিদ্যাপতি, (২) চণ্ডীদাস, (৩) গোবিন্দদাস, (৪) রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ, (৫) মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল; সারদাচরণ মিত্র ও শোভাবাজারের বরদাকান্ত মিত্রের সহযোগিতায় প্রথমে খণ্ডশঃ এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১২৮১)। 'সমাজ-সমালোচন'—বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'উদ্দীপনা' ও 'গ্রাবু' প্রবন্ধদ্বয়ের সঙ্কলন

(১২৮১)। 'গোচারণের মাঠ' যুক্তাক্ষরবর্জিত পয়ার ছন্দে রচিত পল্লীচিত্র; বঙ্কিমচন্দ্রপ্রমুখ সমালোচকগণ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত; বহুবৎসর যাবৎ পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট ছিল; ১২৮৫ সালে সমগ্র গ্রন্থ প্রথমে খণ্ডশঃ সাধারণীতে প্রকাশিত হয় (১২৮৭)। 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ'—দেবর্ষি নারদ বাল্মীকিকে সংক্ষেপে যে রামায়ণ বিবৃত করিয়াছিলেন তাহারই মূল এবং গদ্যানুবাদ (১২৮৯)। 'আলোচনা'—বিদ্যালয়পাঠ্য প্রবন্ধাবলি; কয়েক বৎসর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট ছিল (১২৮৯)। 'হাতে হাতে ফল' (হসন-হাসন)—প্রহসন; গ্রন্থে পিতৃদেবের নাম মুদ্রিত নাই,—'শ্রীবঙ্গবিলাস সমজদার-প্রণীত' লিখিত আছে; এই ছদ্ম নামে তিনি বহুতর রসরচনা 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত করেন। হসন-হাসন অর্থে, যাহাতে হাসি পায় ও যদ্দ্বারা হাসানো যায় (১২৮৯)। 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড (চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণের কথা, বিদ্যাপতি), দ্বিতীয় সংস্করণ (১২৯১)। 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)', দ্বিতীয় সংস্করণ (১২৯১)। 'পিতাপুত্র'—গঙ্গাচরণ ও অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনী; 'বঙ্গবাসী কার্য্যালয়, হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত (১৩১১)। 'সনাতনী'—সনাতন ধর্ম, দর্শন ও সমাজ-সম্বন্ধীয় নিবন্ধমালা (১৩১৭)। 'কবি হেমচন্দ্র'—কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং বিশদ কাব্য-সমালোচনা; বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩১৮)। 'মোতিকুমারী'—Haggardএর 'Pearl Maiden' নামক উপন্যাসের ভাবানুবাদ এবং কয়েকটি ছোট গল্প ও সমাজ-চিত্রের রস-সমষ্টি (১৩২৪)। 'মহাপূজা'—সাধারণী ও নবজীবন হইতে সঙ্কলিত দুর্গাপূজা-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী (১৩২৮)। 'রূপক ও রহস্য'—রূপক ও রহস্য-শ্রেণীর যাবতীয় রচনার সঙ্কলন; হৃষীকেশ সিরিজ-এর অন্তর্ভুক্ত (১৩৩০)। 'সাহিত্য-সাধনা'—কিশোরগণের উপযোগী সাহিত্যবিষয়ক রচনারাশি; পিতৃদেবের সমগ্র জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় (১৩৩০)। 'সাহিত্যপাঠ', দ্বিতীয় সংস্করণ; ছোট ছোট বালকবালিকাদের পাঠ্যপুস্তক (১৩৩১)।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পিতৃদেবের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালাকে তিনি যেমন ভাল করিয়া জানিতেন, তেমন ভাল করিয়া জানা অনেক বাঙ্গালী সাহিত্যিকের ক্ষমতার অতীত। যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা বলে, সেই প্রাণ দিয়া ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায় অক্ষয়চন্দ্রের বাঙ্গালার প্রতি ও বাঙ্গালীর প্রতি ভালবাসায়। আর কোন কারণে না হইলেও কেবল সেই কারণেই অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালীর শ্রদ্ধাভাজন। তিনি যে ভাবে দেশকে ভাল বাসিতেন, তাহারই কথায় কবি ঈশ্বরগুপ্ত বলিয়াছেন, 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।' কিসে বাঙ্গালী ভাল থাকিবে, কিসে বাঙ্গালী বড় হইবে,—কিসে বাঙ্গালী তাহার নষ্ট স্বাস্থ্য ও সম্পদ্ ফিরিয়া পাইবে—তাহাই ছিল অক্ষয়চন্দ্রের চিন্তার বিষয়। বাঙ্গালী তাঁহার চিন্তার কেন্দ্র ছিল। অক্ষয়চন্দ্রের দেশপ্রেমের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে ভালবাসা তাঁহার ধাতুতে ছিল—তাঁহার হৃদয়ের উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া রচনার মধ্য দিয়া অবাধে প্রবাহিত হইত। তাহা গঙ্গার প্রবাহের মত পবিত্র, তাহার পাবনী শক্তিও অসাধারণ।

চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'পৃথিবীর সুখদুঃখ' পুস্তকে লিখিয়াছেন, 'এক অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরের কথা ও মনের কথা ভক্তের ন্যায় ভালবাসেন এবং পাঁতি পাঁতি করিয়া দেখেনও বটে।...অক্ষয়চন্দ্রের হৃদয় যে অতলস্পর্শ।'

শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ আরও লিখিয়াছেন যে, আজকাল আমরা সাহিত্যে রচনায় যে প্রকৃত শিল্পীর নৈপুণ্যের অভাব অনুভব করি, অক্ষয়চন্দ্রের রচনায় সে অভাব নাই। তিনি অতি ক্ষুদ্র রচনাও সরস ও সুন্দর করিতেন। তাই তাঁহার রচনা চিরসুন্দর এবং তাহা বাঙ্গালা রচনার অন্যতম আদর্শ হইয়া থাকিবে।

অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমমণ্ডলে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি। তিনি যখন দেশাত্মবোধের প্রচারক হইয়াছিলেন, তখন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ে অনেক ভাবুকের মনে সেই ভাবের উদ্ভব হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ প্রকাশিত হইবার অনেকদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্র 'দশমহাবিদ্যা' লিখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন।

"আমার বোধ হয় যে, এই ভারতবর্ষের দশ দশাই দশমহাবিদ্যা। এক্ষণে সপ্তমী দশা চলিতেছে, সেই দশার প্রতিমূর্তিই ধূমাবতীমূর্তি।" কিন্তু তাহার পর "মাতা আবার বগলামূর্তিতে দেখা দিবেন। ভারতমাতা আবার রত্ন-সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন, ভারতমাতা আবার স্বভূষণে ভূষিতা হইবেন। এমন দিন হইবে। * * * ইহার পরেই ভারতের মাতঙ্গীমূর্তি। ভারতমাতা আপনার চির-পরিচিত দয়ার বশবর্তিনী হইয়া সেই কবকবলিত শত্রুকে বিমুক্ত করিয়াছেন; আত্মরক্ষার্থ খড়্গ-চর্ম ধারণ করিয়াছেন; শাসনার্থ পাশাঙ্কুশ পুনর্বার গ্রহণ করিয়াছেন; রত্ন-পদ্মাসনে রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া বিরাজ করিতেছেন।" ইহাই কিন্তু শেষ নহে। "ইহার পর মা 'মহালক্ষ্মী'রূপে ভবে দেখা দিবেন,

'সুবর্ণ সুবর্ণ-বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥
চতুর্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে।
রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥'

ভারতমাতার যুগযুগান্তরের মলরাশি শ্বেত হস্তিগণ অমৃতবারি সেচনে বিধৌত করিয়া দিতেছে। ভারত-মাতা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; পদ্মাসনে পদ্মাসনা পদ্মহস্তে জগতে অভয় দান করিতেছেন। তাহা কি শুভ দিন! শরীরে রোমাঞ্চ হয়। সকলে একবার আনন্দধ্বনি কর। ভারতমাতার অভিষেক হইতেছে। মাতা যোগিনী-মূর্তি, রাজ্ঞীমূর্তি, এমন যে ভুবনে অতুলা ভুবনেশ্বরীমূর্তি,—মাতা তাহা গ্রহণ করেন নাই; মা এখন মহালক্ষ্মীভাবে শোভা পাইতেছেন; সকলে জয়ধ্বনি কর।" এই জয়ধ্বনিই 'বন্দে মাতরম্'। এই মহালক্ষ্মীমূর্তির সহিত আনন্দমঠের মাতৃমূর্তি তুলনীয়।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সরস হাস্য-পরিহাস ও ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনায় ইন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গদ্যে ও পদ্যে ইনি ছিলেন সব্যসাচী। 'পঞ্চানন্দ' পত্রিকা 'সাধারণী-যন্ত্রে' মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হইত। পরে বঙ্গবাসী-সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর অনুরোধে ও আগ্রহাতিশয্যে ইহা বঙ্গবাসীর ক্রোড়ে স্থান লাভ করে। ইঁহার 'ভারত-উদ্ধার' নামক ব্যঙ্গকাব্যের সমগ্র একদিন যুবাবৃদ্ধ সকলেরই কণ্ঠস্থ ছিল। 'একান্তই যাবে যদি নাথ, আলুভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া।'—প্রভৃতি অমর পঙ্‌ক্তি লোকের মুখে মুখে ফিরিত। ভারত-সভার মন্ত্রণা-সভাগৃহের টানাপাখাখান: কেন ছিঁড়িয়া পড়িয়া যাইতেছে না—না, 'কড়ি আগে পড়ে কিংবা দড়ি আগে ছেঁড়ে'—এই তর্কের মীমাংসা হইয়া উঠিতেছে না বলিয়া, এই সরস মুখরোচক যুক্তি এককালে আবালবৃদ্ধ-বণিতা আনন্দের সহিত উপভোগ করিত। তাঁহার 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরাম' উপন্যাস পাঠ করিলে তাঁহার চিন্তাশীলতা, সূক্ষ্মবিচার-বুদ্ধি এবং সমাজ তত্ত্বে নৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি আজীবন সাধারণী ও বঙ্গবাসীর নিয়মিত লেখক ছিলেন। সমাজ সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে এবং বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে ইঁহার লিখিত প্রবন্ধাবলি পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইনি শুধু রসরচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন না, যুক্তিগর্ভ সুচিন্তাবহুল বহুতর প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রণয়নেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অতি জটিল ও দুরূহ বিষয়ও অতি সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ইনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গবাসী কার্যালয়ের কর্মকর্তারা ইঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বসু

স্বনামধন্য গিরিশচন্দ্র আকুমার মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিতেছেন। বিলাত ফেরৎদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় লেখনী চালনা করিয়া বিলাতের পত্র প্রকাশ করেন। ইংরাজি শিক্ষিত মাত্রেই—বিলাত কোন্ দিকে যিনি জানিতেন না—তখনকার দিনে তিনিও পিতাকে বাঙ্গালায় চিঠি লিখিতে লজ্জা পাইতেন, ঘৃণা বোধ করিতেন। গিরিশচন্দ্রের স্বাদেশিকতায় বাহ্য আড়ম্বর নাই, নিজের ঢাক নিজে পেটা নাই, তাহা অন্তর্মুখী, আত্মগত—বুঝি বা মজ্জাগত—স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম আর মাতৃভাষা যে তাঁহার প্রাণের প্রাণ। বিলাত ফেরৎদের মধ্যে সকল বিষয়ে এমন নীরেট, অচ্ছিদ্র, আপাদমস্তক সনাতনপন্থী মহাপুরুষ আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই, পড়ি নাই বা শুনি নাই। ২০।২৫ খানি

বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালায় লিখিয়াছেন। সহজ, সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক লিখিতে ইনি অদ্বিতীয়। 'একে একে নিভেছে দেউটি'—ইঁনিই এখন আমাদের শিবরাত্রের শলতে। ভগবান্ ইঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র এবং প্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িত্রী আমাদের সভানেত্রী শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর জনক। যোগ্যতর ব্যক্তি ইঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ভার লইয়াছেন, সুতরাং আমি আর আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। ইঁহার প্রণীত 'সদালাপ' বাঙ্গালার অমূল্য সম্পদ; গ্রন্থখানি হীরার টুকরা, অথচ আমাদের গ্রহবৈগুণ্যে উহার আদর করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

'বঙ্গবাসী'র সর্ব্বস্ব যোগেন্দ্রচন্দ্রের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া নিজের ধৃষ্টতার মাত্রা বর্দ্ধিত করিব না। বঙ্গসাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রধান দান বৃহদায়তন সুলভ সংবাদপত্র প্রকাশ। দ্বিতীয় দান—মডেল ভগিনী, শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী, বাঙ্গালী চরিত, নেড়া হরিদাস প্রভৃতি সমাজ-সংক্রান্ত অমর ও অপূর্ব্ব গ্রন্থরাজি-প্রণয়ন। এই নারী-প্রগতির যুগে আমি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে অবহিত হইয়া মনোযোগ সহকারে আর একবার মডেল ভগিনী আগাগোড়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আর সর্ব্বোপরি বঙ্গভাষায় সুলভ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার যোগেন্দ্রচন্দ্রের অক্ষয় কীর্ত্তি! যোগেন্দ্রচন্দ্র বিহীনে বাঙ্গালীর ছেলেমেয়ে আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সংহিতার নাম পর্য্যন্তও জানিতে পারিত না,—এই সব দুষ্প্রাপ্য বহুমূল্য গ্রন্থাদির সম্যক্ পরিচয় লাভ করা ত দূরের কথা। বঙ্গভাষায় এই বহুল শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রকাশ যতদিন সনাতন ধর্ম থাকিবে, তত দিন যোগেন্দ্রচন্দ্রকে অমর করিয়া রাখিবে। 'সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে—মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।'

শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

আমাদের চুঁচুড়া কদমতলা নিবাসী শিবাপ্রসন্ন কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ছিলেন। বিপুল অর্থাগম ও একমাত্র পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী হইয়া সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হন। নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া শেষে ৺কাশীধামে বাস করেন এবং প্রায় তিন বৎসর হইল, তাঁহার ৺কাশীপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সন্ন্যাসজীবনে তাঁহার নাম ছিল শ্রীমন্ মহারাজ পরমানন্দ তীর্থস্বামী। পুরীর গোবর্দ্ধনমঠের (শঙ্করাচার্য্যের মঠ) গদীতে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য তিনি মনোনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা শ্রদ্ধাভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া কাশীবাস করেন।

তিনি সাধারণীতে নিয়মিতভাবে লিখিতেন। তাঁহার প্রণীত 'প্রকৃতি' অপূর্ব্ব প্রবন্ধ-সম্ভার। তিনি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সেখানির নাম 'পুত্রের প্রতি উপদেশ।' এমন উপাদেয় নীতিগর্ভ অথচ যুক্তিপূর্ণ পুস্তক আমি আর একখানিও পড়ি নাই। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যেক ছাত্র যেন এইখানি পাঠ করেন।

বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়

এখানকার অন্যতম প্রসিদ্ধ উকীল। কিশোর বয়স হইতে সাধারণীতে লিখিতে আরম্ভ করেন। আকুমার সাহিত্যসেবী। পরিণত বয়সে বাঁশবেড়িয়ার মহাশয়গণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'পূর্ণিমা' মাসিক পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ ও সমালোচন-গৌরবে পূর্ণিমা বহুকাল হাস্যস্ফুরিতাধরা ছিল। 'মৃত্যুর পর' শীর্ষক ধারাবাহিক ভাবে ক্রমশঃ প্রকাশিত বহুগবেষণা ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রায় ১০ বৎসর ধরিয়া পূর্ণিমার অঙ্গশোভা করিয়াছিল। এই প্রবন্ধ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু এই অসমাপ্ত প্রবন্ধই বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অপূর্ব্ব দান।

রসময় মিত্র

পরম বৈষ্ণব ও প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ইংরাজি সাহিত্যের অর্থপুস্তক-মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা মানের প্রবর্ত্তন করেন। চিরদিন বাঙ্গালা সাহিত্যের, বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যের, চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইলেও অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালা লিখিতেন। প্রৌঢ় বয়সে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় নিজের যে জীবন-স্মৃতি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাব, ভাষা ও বর্ণনামাধুর্য্যে অনুপম।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়

প্রসিদ্ধ অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্ ও ভাষাতত্ত্ববিদ্। এই বৃদ্ধ বয়সে সমানে একটানে মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিতেছেন। আজ বিশ বৎসর হইতে বাঙ্গালা বানান সংস্কারে ইনি অক্লান্তকর্মী, বদ্ধপরিকর। যোগেশচন্দ্র প্রণীত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ এবং বাঙ্গালা শব্দকোষে তাঁহাকে বঙ্গ সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। দুইখানি গ্রন্থেই তাঁহার বিপুল গবেষণা, বহু বিষয়ে জ্ঞান এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিরূপ অধ্যবসায়-সহকারে অক্লান্ত পরিশ্রম করিলে তবে এমন বইয়ের মত দুইখানি বই যোগ্য হস্তে লিখিতে পারা যায়, তাহা আমরা ভাবিয়া উঠিতেই পারি না। ভগবান্ আরও দীর্ঘকাল ইহার কর্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আমরা গভীর ও গম্ভীর চিন্তা করিতে ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছি, তাই হাসির গানেই দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বজন পরিচিত। কিন্তু বিরহের দ্বিজেন্দ্রলালকে, সীতার দ্বিজেন্দ্রলালকে, কালিদাসের সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলালকে, আর সর্বোপরি সাজাহানের দ্বিজেন্দ্রলালকে ইতিমধ্যে ভুলিলে চলিবে না,—ভুলিলে যে পাপ স্পর্শিবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত তুষানলেও পর্যাপ্ত নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল আধুনিক বাঙ্গালার অনন্যসাধারণ মনীষা। দ্বিজেন্দ্রলালের মর্মস্পর্শী উপদেশ উদ্ধার করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

কিসের শোক করিস ভাই—
আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই,
আবার তোরা মানুষ হ।
ঘুচাতে চাস যদি রে এই—
হতাশাময় বর্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল
ভায়ের প্রতি ভায়ের টান।
ধর্ম যথা সে দিকে থাক,
ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ;
স্বজলে দেশ ডুবিয়া থাক;
আবার তোরা মানুষ হ।

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার

জাগো পুরুরবা জাগো

শ্রীমাধুরী ভট্টাচার্য্য

এসো আজ এ নিশীথে মোরা শুধু দুইজন থাকি,
মোরা শুধু দুইজন পূর্ণিমায় বেঁচে থাকি আজ,
মিথ্যা হোক্ এ মিলনে অক্টোপাশ মনুর সমাজ,
দুর্লভ পূর্ণিমা রাতে আপনারে আর নয় ঢাকি।

হের ওই জ্যোৎস্না নামে আকাশেরে করিয়া মধুর
জ্যোৎস্না সেতো উর্ব্বশীর সর্ব্বপ্লাবী প্রেমের সুষমা,
জাগো পুরুরবা জাগো, বিরহিণী কাঁদে প্রিয়তমা;
অভিশপ্ত অপ্সরার অভিশাপ কর আজ দূর।

এ নিশি পোহালে আর মিলিবেনা প্রাণের পিয়ারে,
বেঁচে থাক্ এ পূর্ণিমা আমাদের মিলিত জীবনে;—
অলব্ধ যা চিরদিন কি ফল সে স্বপনে সীবনে?
স্বপ্ন সেতো মরীচিকা যদি ধরা যায়না তাহারে।

জাগো পুরুরবা জাগো, চলে যায় উর্ব্বশী তোমার,
এ রাত্তি পোহালে তারে এ জীবনে মিলিবেনা আর।

———

কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে

শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায়

আট বছর একাদিক্রমে কলিকাতায় কাটাবার পর আজ ভোরে বিকাশ দেশে ফিরেছে। ষোল বছর যখন তার বয়স তখন বিকাশ গ্রাম ছেড়ে গিয়েছিল কলকাতায়। এখন তার বয়স প্রায় পঁচিশ; এই আট বৎসরে সে এম এ পাশ করেছে, কাষ্টম হাউসে মাসিক দুশো টাকার চাকরীও যোগাড় করেছে। বলে রাখা ভাল, বিকাশ এখনও বিয়ে করেনি। তবে পাত্রী ঠিক করে রেখেছে, সে বিবাহে মার সম্মতি নিতে আসাও দেশে ফেরার একটা কারণ। দীর্ঘ আট বৎসর পরে বিকাশ মার কোলে ফিরে এল, মার চোখের জল আজ আর বারণ মানলে না। ছেলেকে বুকে ধরে চোখের জলের ভেতর দিয়ে অন্তরের সবটুকু শুভাশীষ তার মাথায় ঢেলে দিলেন। ষোল বছরের ছেলে বিকাশ ম্যাট্রিক পাশ করে বৃত্তি পেয়েছে এ খবরটা যেদিন স্কুলের বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় দিয়ে গেলেন, তার দু মাস আগে বিকাশকে নিয়ে তিনি বিধবা হন। গ্রামের সকলেই বিকাশকে চাকুরীর চেষ্টা দেখতে বলে, শুধু বিকাশের জ্ঞাতি খুড়া বিলাসবাবু আর পিতৃবন্ধু হরিশ বাবু উদ্যোগ করে বিকাশকে কলকাতায় পড়তে পাঠান। গ্রামের বিজ্ঞেরা একবাক্যে বলেছিলেন—কুঁড়লের ঘোড়া রোগ। মায়ের শেষ সম্বল দুগাছি বালা বিক্রী করে পাওয়া পঞ্চাশটা টাকা আর আশীর্ব্বাদ সম্বল করে বিকাশ কলকাতায় এসে কলেজে ভর্ত্তি হল। তার মনে একটি ভাবনাই ছিল, লেখা পড়া শিখে তাকে মানুষ হতে হবে, তার মার কষ্ট দূর করতে হবে। সেই কথা ভেবেই সে এতগুলি পরীক্ষা পাশ করেছে বৃত্তি নিয়ে, তারপর এই দুশো টাকা মাইনের চাকরী যোগাড় করেছে! সেই বিকাশ আজ সাফল্যের জয়মুকুট পরে মার কোলে ফিরে এসেছে, আজ মার আনন্দ দেখে কে?

"কিছু খাবি চল বাবা।"

"পরে খাব মা! সেই ছেলেবেলাকার মত তোমার কোলে মাথা রেখে একটু শুই।" বলে বিকাশ মার কোলে মাথা রেখে সটান শুয়ে পড়ল। মা তার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, তাঁর বিকাশ এখনও যেন সেই ছেলেমানুষই আছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়টীকা তার ললাটে, গবর্ণমেণ্টের পদস্থ কর্ম্মচারী সে। স্বামীকে মনে করে আর একবার তিনি আঁচলে চোখ মুছলেন।

"এবারে উঠে কিছু খা বাবা।"

বিকাশ উঠল, উঠে জলযোগ করল। তারপর বেড়াতে গেল। দীর্ঘ আটবৎসর না দেখা সঙ্গী সাথীর দল, কে কেমন আছে কি করছে বিকাশের আগ্রহ আর শান্ত থাকছিল না। সারা সকাল গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিকাশ সকলের খবর নিলে, এমনভাবে সকলের সঙ্গে মিশলে যেন সে একটি দিনের জন্যেও গ্রাম ছেড়ে বাইরে যায়নি। গ্রামের বিজ্ঞেরা মাথা নেড়ে রায় দিলেন, "হ্যাঁ, বিকাশ বাহাদুর ছেলে বটে।" প্রবীণারা বললেন, "বিকাশের মা রত্নগর্ভা, সার্থক ছেলে ধরেছিল পেটে!" গোটা গ্রামখানা ঘুরে, বিকাশ পদ্মদীঘির পাড় দিয়ে বাড়ী ফিরছিল। কয়েৎবেল, বকুল ও শিরীষগাছ জায়গাটাকে ছায়াশীতল করে রেখেছিল, তলাতে অজস্র টবচির ঝোপ। ছেলেবেলায় সেখানে কত খেলাই না তারা খেলেছে! দীঘির এঁটেল মাটিতে ঠাকুর ক'রে তার পূজা করেছে, কাঁচা আম নূন লঙ্কা দিয়ে মাকে লুকিয়ে এইখানে বসে খেয়েছে, সরস্বতী পূজার সময় কুমোর বাড়ি থেকে ছোট ঠাকুর কিনে এনে এইখানে সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে তার পূজো করেছে, পাল্তির রঙীন পাতা ছিঁড়ে শিকলি তৈয়ার করে কি সুন্দর করেই এ জায়গাটা তারা সাজিয়ে তুলত!

বিকাশের ইচ্ছা করতে লাগল আবার সেই আগেকার দিনের মত ওই বুড়ো বকুল গাছের তলায় শুয়ে পড়ে, মাথার ওপর টুপ টুপ করে এক-একটা ফুল ঝরে পড়ে, মেঠো হাওয়া

ঝির ঝির করে বয়ে যায়, তার সারা দেহে একটা শিহরণ নিয়ে আসে। কিন্তু বেলা হয়েছে অনেক, মা বসে আছেন তার জন্য। বিকাশ পা চালালো বাড়ীর দিকে।

"বিকাশদা!"

বিকাশ চমকে চাইল। একটি কিশোরী তাকে ডাকছে। মুখখানা যেন বড় চেনা, অথচ যেন তাকে চিনতে পারছে না! কে এ মেয়ে? মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল, বিকাশের কানে সে হাসি বড় মিষ্টি লাগল।

"আমায় চিনতে পারলে না বিকাশদা। আমি যে মুক্ত— মনে পড়ে? বিকাশের মনে পড়ল;—আগাগোড়া সব কথাই তার মনে পড়ে গেল। মুক্তর ভাই মাণিকের সঙ্গেই তার ছিল সব চেয়ে বেশী ভাব, আর সেই মুক্তকেই সে চিনতে পারলে না! কিন্তু তার দোষই বা কি! সে যখন গ্রাম ছেড়ে যায় মুক্ত তখন বড় জোর সাত বছরের। কিন্তু মুক্তই বা তাকে চিনলে কি করে।

"তুই এত বড় হয়েছিস্ তোকে কি চট করে চেনা যায়। কিন্তু তুই ত আমায় ঠিক চিনেছিস্!"

"বা রে কেন চিনতে পারব না? সই-মা রোজ তোমার কথা বলেন, তারপর তুমি আজ সকালে এসেছ, তাও জানি। তুমি কেমন আছ বিকাশদা!"

"আমি ভাল আছি মুক্ত। তুই কেমন আছিস্, মাণিক কেমন আছে? সে কবে বাড়ী আসবে?"

"দাদা ভাল আছে। এখন বাড়ি আসতে পারবে না লিখেছে।"

"তুই বাড়ি যা মুক্ত। আমি বিকালে সইমার সঙ্গে দেখা করতে যাব।" মুক্তও বাড়ির পথে পা বাড়াল, বিকাশও ঘরে ফিরল।

খাবার সময় একথা সেকথার পর বিকাশ মাকে বললে, "পথে মুক্তর সঙ্গে দেখা হল মা। আমি ত প্রথমে ওকে চিনতেই পারিনি। ও বেশ বড় হয়েছে দেখলুম।"

"তা হয়েছে বই কি বাবা! পনেরো পার হয়ে ষোল বছরে পড়ল।"

"ওর বে'র চেষ্টা হচ্ছে না?"

"শুধু হাতে ত বে' হয় না বাবা, টাকা চাইত।"

"কেন মাণিক ত চাকরী করছে।"

"সেত আজ কমাস হল। তাও মাইনে মাত্র পঞ্চাশটি টাকা।"

বিকাশ চুপ করে খেতে লাগল। খাণিক পরে মা আবার বললেন "আমার বড় ইচ্ছে মুক্তকে আমার বউ করি। আর মেয়েটোও বড় লক্ষ্মী। রাতদিন আমার কাছেই আছে। আহা বাছা আমার বড় শান্ত মেয়ে।"

বিকাশ চমকে উঠল। মুক্তর সঙ্গে বে! সে কি কথা? মনে পড়ল তার মীরাকে, তার মনের কোণে যার মুখখানি কাজে অকাজে জেগে ওঠে সেই মীরা—যার কল্পনা করে সে রাত জেগে কবিতা লিখেছে, স্বপ্নে যার কথা শুনে সে জেগে ওঠে! বরষার রাতে একক শয্যা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন পাশে তাকে কল্পনা ক'রে সে শান্তি পায়, তার চুলের মৃদু সৌরভের এখনও সে আঘ্রাণ পা'চ্ছে! ড্রয়িংরুমে মীরা যখন অতি আধুনিক কবির আধুনিকতম গান অর্গানের সাথে গলা মিলিয়ে গায়, বিকাশের সর্ব্বশরীর যেন কেমন ঝিমিয়ে আসে, যেমন উগ্র মদ পান করার পর হয়! সেই মীরার পাশে এই গ্রাম্যবালিকা মুক্ত!

বিকাশ মার কথার কোন উত্তর দিল না। মা ভাবলেন ছেলে তাঁর একালের ছেলেদের মত বেহায়া নয় যে, বিয়ের ব্যাপারে মা-বাপের কথার উপর কথা কইবে। "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" কথাটা তাঁর জানা ছিল।

সন্ধ্যার একটু আগে বিকাশ মুক্তদের বাড়ি গেল। মুক্তর মা চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে বিকাশের অভ্যর্থনা করলেন। উঠানের একটি কোণে মুক্তর ফুলের বাগান। ছোট বাগানটি বাঁখারি দিয়ে সুন্দরভাবে ঘেরা, বেড়ার গায়ে তরুলতার ফুলে বেড়ার সারাটি গা লাল হয়ে আছে। বাগানটি ভরে ফুল ফুটেছে অজস্র। বেলা, মল্লিকা, গন্ধরাজ, যুঁই, রজনীগন্ধার সৌরভে বাড়িখানি যেন ভরপুর! বিকাশের মনে হল, যেন নন্দনকাননের খানিকটা অংশ মুক্তদের উঠানে খসে পড়েছে! কাঠের একটা ছোট টুল নিয়ে বিকাশ ফুলবাগানের বেড়ার ধারে বসল।

মুক্তর মা এসে বসলেন কাছে। তারপর কত কথা;— বিকাশের চাকরীর কথা, কলিকাতার কথা, মাণিকের কথা,

কথা আর ফুরায় না। বিকাশ যখন বাড়ি যাবার জন্য উঠল, তখন অনেকটা রাত হয়ে গেছে। গ্রামখানি নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে, শুধু পূবপাড়ার হরিসভা থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে কীর্ত্তনের সঙ্গে খোলের আওয়াজ ভেসে আসছিল। ফিরে আসবার সময় মুক্ত একটি কলার পাতে মুড়ে তাকে একরাশ ফুল দিলে।

পথে আসতে আসতে বিকাশের মনে কেবলই মুক্তর মুখখানা উঁকি মারতে লাগল। সে ভাবতে লাগল মুক্তকে তার জীবনপথের সঙ্গিনী করলে কেমন হয়! দেখতে তাকে বেশ সুশ্রী, মীরার চেয়ে খারাপ নয়, কিন্তু এই অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা মেয়েকে নিয়ে সে কি করবে? তাকে নিয়ে কলকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে কি করে সে মিশবে? কিন্তু মুক্তকেই যে সে বিয়ে করবে তারই বা স্থিরতা কৈ! না, না, মীরা যে বিকাশের জন্তই বসে আছে, বিকাশের জন্তই সে যে নিজেকে সকল রকমে প্রস্তুত করছে। সাত পাঁচ ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে বাড়ী ফিরল।

খাওয়ার সময় মা জিজ্ঞাসা করলেন, "মুক্তদের বাড়ি গিয়েছিলি?"

"গিয়েছিলুম মা।"

"তা'হলে বাবা আর দেরী করে কাজ নেই। আমি কাল সইয়ের সঙ্গে পাকাপাকি কথা কই?"

"এত তাড়াতাড়ির কি দরকার-মা, তোমার কোলে দুদিন জিরোতে দাও তারপর যা হয় করো।"

"না বাবা, তুই আর অমত করিসনে, তোর বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে ঘর করার সাধ আমার কতদিনের। নারায়ণ যখন এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন, তখন আমি আর দেরী করতে পারব না, বাবা।"

তাই হোক! মা যখন মুক্তকে নিয়ে সুখী হতে পারবেন তাই হোক! কিন্তু মীরা? সে যে বিকাশের জন্তই তার সমস্ত মনখানি নিয়ে বসে আছে। প্রতি কথায়, প্রতি ভঙ্গীতে তাগর দুটি চোখের প্রতি চাহনিতে বিকাশকে বুঝিয়ে দেয় সে তাহার—সেই মীরার সঙ্গে প্রতারণা! না, তা অসম্ভব!

"কি চুপ করে রইলি যে, বল তা'হলে।"

বিকাশ একটু ইতস্তত করে বললে, "বৌ তোমার আসবে মা, তবে মুক্তকেই আনতে চাও কেন? আমার এক বন্ধুর বোন আছে কলকাতায়। তাদেরই সাহায্যে আমার উন্নতি, আমি যে তাদের কথা দিয়ে রেখেছি মা, তোমার মত নিয়ে তাকেই আমাদের ঘরে নিয়ে আসব।" মা একটু চুপ করে রইলেন। বিকাশ বুঝল আশাভঙ্গের মনস্তাপ মার বুকে বেশ তীব্র হয়েই বাজল। একটু চুপ করে থেকে মা বললেন, "বেশ, তাই কর বাবা, তবে আর দেরী করিসনে! একলা ঘরে প্রাণটা যেন আমার হাঁপিয়ে ওঠে।"

"তাই হবে মা।" বলিয়া বিকাশ ঘরে ঢুকল।

ঘরের আলো নিভিয়ে বিকাশ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের তরল অন্ধকার দেখতে লাগল। গ্রামখানি অনেকক্ষণ হল ঘুমিয়ে পড়েছে, পূবপাড়ার হরিসভা থেকে সঙ্কীর্ত্তনের শব্দ আর শোনা যাচ্ছেনা, শুধু দূর থেকে একটা কুকুরের ডাক মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। মুক্তর উপহার সেই ফুলগুলার সুবাসে সারা ঘরখানি যেন গন্ধমাতাল হয়ে রয়েছে। তরল অন্ধকারে সাদা ফুলগুলিকে দেখাচ্ছিল অমাবস্যার কাল আকাশে রুপালী তারার মত। বাঁশঝাড়ে জোনাকীর আলো ঝিকমিক করে জলছিল! বিকাশ জানালা থেকে ফিরে এল। সব ফুলগুলোকে বিছানায় ছড়িয়ে দিলে। তরল অন্ধকারে সাদা ধপধপে বিছানায় ফুলগুলো যেন কি এক স্বপ্ন রচনা করেছিল! বিকাশ অপলক চোখে সেই দিকে চেয়ে রইল। তার মনে হল ফুলের হাসিতে যেন মুক্তর হাসির ছায়া, তাদের গন্ধের সাথে জড়িয়ে রয়েছে যেন মুক্তর চুলের গন্ধ। "যাকগে মার যখন এতই সাধ, তখন মুক্তকেই" আত্মগতভাবে এই কথা বলে বিছানায় শোবার উদ্যোগ করতেই বিকাশের মনে পড়ল মীরার মুখ। মীরার সঙ্গে এর পর যখন দেখা হবে তখন কি মীরার চোখের দিকে সে চাইতে পারবে। মীরার সেই আশ্চর্য্য সুন্দর দুটি চোখ, যে দুটি চোখের দৃষ্টি বিকাশকে সারাক্ষণ ঘিরে আছে, সেই দুটি চোখ, যার নীরব মুখরতা বিকাশকে কত গোপন আশার কথা শুনিয়েছে! না, মীরার সঙ্গে প্রতারণা অসম্ভব! বিকাশ মন স্থির করে শোবার উদ্যোগ করতেই তার মনে হল সমস্ত ফুলগুলো যেন একসঙ্গে মুখর হয়ে তাকে প্রশ্ন করছে...যদি মুক্তকে তুমি না নেবে, তবে তার দেওয়া এ উপহার নেবার তোমার কি অধিকার।..

আমাদের মধ্য দিয়ে সে যে তার নীরব পূজা তোমায় পাঠিয়েছে। পূজারিণীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলে কিন্তু পূজার অর্ঘ্য নিতে কুণ্ঠিত হলেনাত ?

বিকাশ ফুলগুলি আস্তে আস্তে কুড়িয়ে কলাপাতায় বেঁধে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

অনেক বেলায় বিকাশের ঘুম ভাঙল। চোখ চেয়েই দেখলে তার দিকে পেছন করে জানালায় দাঁড়িয়ে অতি মৃদু অতি মিষ্ট স্বরে কে গাইছে,

"যে পথে কাননে আসে ফুলদল,
যে পথে কমলে পশে পরিমল,
সে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির স্নিগ্ধ প্রাত"

মুক্তর গলা এত মিষ্টি! এত সুন্দর গান সে গায়! বিকাশের মনে হল এ যেন বসন্তের প্রথম পিকের ঝঙ্কার যেন জোছনা রাতে পাপিয়ার গান।

"মুক্ত!"

চমকে মুক্ত মুখ ফিরাল, "একি তুমি জেগে আছ? আমি ভেবেছিলাম যে তুমি ঘুমিয়ে।"

"জেগেছিলাম, তাই তোমার ওই মিষ্টি গলার গান শুনলুম।"

"জেগেছিলে যদি, তাহলে আমায় ডা'কনি কেন।"

"আমি জেগে আছি জানলে নিশ্চয় তুমি গান গাইতে না।"

বাহির হতে মা ডাকলেন, "মুক্ত, চায়ের জল গরম হয়েছে মা।"

"যাই সই-মা। বিকাশদা তুমি উঠে মুখ ধোও, আমি চা তৈরি করে আনছি"

বিকাশ উঠে মুখ ধুতে না ধুতেই মুক্ত চা এনে হাজির করল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বিকাশ মুক্তর মুখের দিকে চাইল। কি সরল সুন্দর মুখখানি মুক্তর, কি লাবণ্য। বিকাশের মনে হল এ রূপ যেন শরতের শুক্লা চতুর্দ্দশী, তাতে দাহ নেই, আছে শুধু অপরূপ স্নিগ্ধতা। বিকাশের মনে হল মীরার রূপ যেন বড় তীব্র, বড় চোখঝলসানো। আর মুক্তর রূপ যেন প্রাণ ভরে, শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়ে অনুভব করার জিনিষ।

"মুক্ত!"

"কি বলছ?" মুক্ত পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে বিকাশের দিকে চাইল। আয়ত দুটি চোখের তারায় যেন কিসের ছবি, যেন কি আগ্রহ।

"মুক্ত, এদিকে আয় মা একবার।"

মুক্ত চলিয়া গেল। বিকাশ অনেকক্ষণ তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইল।

* * * * * *

"এই যে বিকাশ এসো এসো, বাড়ির সব খবর ভালো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার শরীর ভালো আছে?"

"আর বাবা আমাদের শরীরের কথা আর বলো না। যাবার সময় ত হয়ে এলো। এক ভাবনা ছিল মীরার জন্যে, তা সে দিকেও নিশ্চিন্ত; আশীর্বাদ করি তোমরা সব বেঁচে থাক, সুখী হও।" বিকাশের মনের মধ্যে হঠাৎ একটা শিহরণ বয়ে গেল? মীরার সম্বন্ধে তার বাবা যে ইঙ্গিত করলেন, বিকাশের কাছে তার অর্থ খুব স্পষ্ট। সে এই কথাটি পাকাপাকি করতেই বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে। তার ভাবনা হল যে বৃদ্ধের কথার এখন কি উত্তর দেবে! পায়ের ধূলা নিয়ে ভাবী শ্বশুরকে খুসী করবে না—আঃ কি বিপদেই বিকাশ পড়েছে। "জানোই ত বিকাশ, আজকাল আমাদের বাঙালীর ঘরে কন্যাদায়ের মত মহাদায় আর নেই। আজ সেই দায় আমার উদ্ধার হতে চলেছে।" বিকাশের মনে হল, লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে বলে ফেলে, "মীরাকে পেলে জীবন আমার ধন্য হয়ে যাবে" কিন্তু একটা কথাও বিকাশের মুখ দিয়ে বার হলো না? সে যে কি করবে, কেমন করে তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে কিছুই বুঝতে পারলে না। মাথার উপরে আল্লারের পাখা পূর্ণবেগে ঘুরছে, বিকাশত বু'ও ঘেমে যেন নেয়ে উঠল। "ব্যারিষ্টার চাটুজ্যে সাহেবের নাম শুনেছ বোধ হয়? তাঁরই ছোট ছেলে আজ দুদিন হল ব্যারিষ্টার হয়ে কলকাতায় ফিরেছে। মীরার সঙ্গে আগে থেকেই তার বন্ধুত্ব ছিল, বিয়ের কথাও বিলেত যাবার আগে ঠিক হয়েছিল। পরশুদিন কথা বার্ত্তা সব স্থির হয়ে গেছে। আসছে রবিবার

বিয়ে, এই সন্ধ্যাবেলা বাড়ির মেয়েরা তাঁদের বাড়িতে একটা পার্টিতে গেছেন।"

আচমকা বুকের উপর হাতুড়ির ঘা মারলে মুখের যেমন চেহারা হয়, বিকাশের মুখের অবস্থা ঠিক সেই রকম হয়ে গেল।

সে দিকে লক্ষ্য না করেই মীরার বাবা বলে চল্লেন, "তুমি বাবা ঘরের ছেলের মত, তোমায় আর কি বলব, আমার বল ভরসা সবই তোমরা।"

বিকাশের মুখখানায় যেন কে হঠাৎ কালী মাখিয়ে দিয়েছে। কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আচ্ছা আজ আমি আসি।"

মীরার বাবা কি বলতে গেলেন কিন্তু বিকাশ টলতে টলতে নিজের বাসায় ফিরল।

* * * * *

সন্ধ্যার ধূসর পক্ষে আশ্রয় করে রাতের আঁধার গ্রামের পথে পথে নেমে আসছে, শ্যামসুন্দরের মন্দিরে আরতির শঙ্খ ঘণ্টার শব্দ গ্রামখানি মুখর করে তুলেছে, এমন সময় বিকাশ বাড়ি ঢুকল। তুলসীতলায় প্রণতা ও কে! প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় মুখের একটী পাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, চোখের কোণে এক ফোঁটা জল চিক চিক করছে, যেন স্থল-কমলের বুকে রাতের একফোঁটা অশ্রু! সেদিন সকালবেলায় বিকাশ মুক্তর এক রূপ দেখেছিল, আর এই ধূসর গোধূলিতে প্রদীপের ম্লান আলোয় তার আর এক রূপ দেখলে। মুক্ত উঠে দাঁড়াল।

বিকাশ একটু অগ্রসর হয়ে ডাকল, "মুক্ত!"

"বিকাশদা এখুনি ফিরে এলে?" নত হয়ে মুক্ত তাকে প্রণাম করতে গেল।

"এখন থাক মুক্ত। চল আগে দুজনে একসঙ্গে মার পায়ের ধুলা নিইগে!"

পাশের বাড়ি থেকে কে ঠিক এই সময়েই শাঁক বাজালে।"

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

কল্পনা ও বাস্তব

শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তফী এম-এ

হে মানসী, জীবনের যত কিছু আশা
তোমারে আশ্রয় করি লভিছে আকার,
তোমার বিরহ স্মরি বেদনা আমার
ছন্দে গানে কতভাবে পায় তার ভাষা,
সঞ্চিত যতেক স্বপ্ন, যত ভালবাসা,
আকুল কামনা যত তরুণ হিয়ার,
গড়িয়া তুলিছে তারা কল্পনা তোমার,
তাই নিয়ে দিবানিশি কাঁদা আর হাসা।

হে মানসী, যবে তুমি শুভক্ষণ জানি,
দেখা দিবে আজিকার রহস্য ভাঙিয়া,
কল্পনার বস্ত্রখানি বস্তুলাজ মানি,
প'ড়ে রবে পদতলে মরমে মরিয়া—

সনেট রচনে নাহি রবে প্রয়োজন,
তখন ভুঞ্জন শুধু, না রবে গুঞ্জন।

বিচিত্রা
পৌষ, ১৩৪০

স্নানের ঘাট (উদয়পুর)

শ্রীঅনন্তকুমার বসু

অচল প্রেম

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

১৪

"ফাই অন ইউ দিদি! ফাই অন ইউ। এই সিম্‌প্‌ল্‌ ব্যাপারটা বুঝলে না—ওঃ ঙ্ক্যাজ ক্লিয়ার অ্যাজ ওয়াটার।" মিঃ এম্‌, সানিয়্যাল ভাবে গদগদ হইয়া লেডী পামিষ্ট ও এষ্ট্রলজার মিস কল্পনাদেবীর কথায় বাধা দিয়া লেডী ডক্টর মিস বাণী দেবীকে উদ্দেশ করিয়া কথা কয়টি বলিবার সময়ে টেবলের উপর এরূপ প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, চায়ের সাজ সরঞ্জাম সমেত প্রকাণ্ড টেবিলটা যেন ভীষণ ভূমিকম্পে কাঁপিয়া উঠিল।

কয়মাসে মিঃ সানিয়্যাল কল্পনা ও বাণী দেবীর জয়েণ্ট কারবারে আসর জমাইয়া ফেলিয়াছেন ভাল। এখন 'আপনি' 'তুমিতে' নামিয়াছে, 'মিস্‌' কথাটি 'দিদি' সম্বোধনে পরিণত হইয়াছে, অবশ্য বাণীদেবীর সম্পর্কে, নতুবা কল্পনাদেবী এখনও 'মিস' আছেন, তবে আড়ালে আবডালে 'কল্পনা' ও 'ডিয়ারী' সম্বোধনও যে চলে না, এমন কথা হলপ করিয়া বলা যায় না। জয়েণ্ট কারবারে এখন শুধু দুই ভগিনীই পার্টনার নহেন, মিঃ সানিয়্যালের নামও সে খাতায় উঠিয়াছে কারবার চলিতেছেও ভাল, তন্মধ্যে হিমাংশু ডাক্তারেরটাই প্রথম ও প্রধানের পর্য্যায় উন্নীত হইয়াছে। আর বেচারী মন্মথনাথের যে থোড়বড়িখাড়া তাহাই আছে—সেই বাজার হাট ঘরকন্না, রাঁধাবাড়ার তদারক, ইভনিং মর্নিং পার্টিতে চা যোগান দেওয়া। তবে কল্পনাদেবীর কাছে মাঝে মাঝে মিষ্ট মধুর আপ্যায়নের সঙ্গে একটা আয়ের পথ খুলিয়াছে, সেটা হইতেছে ডাক্তারখানার বিল সরকারীটা। সে পরিচয় পরে দিতেছি।

বাণীদেবী উক্তরূপে সম্ভাষিত হইয়া বলিলেন, "দেখ শশাঙ্ক, তোমার দেড়গজি ভনিতা রেখে সোজা বাংলা কথায় বল দেখি নতুন মতলবটা তোমার কি।"

কল্পনাদেবীও এই কথায় সায় দিলেন। শশাঙ্কমোহন বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন, "বাংলা? ওঃ বাংলা ত আমি কয়েই থাকি—তবে কি জান, সকল সময়ে ওতে মনের ভাবটা ঠিক এক্‌স্‌প্রেস করা যায় না। থাক[illegible] কথা হচ্ছে এই যে, এ সব ডিপ্লোমাটিক মুভ করতে হলে একটু সিক্রেসির দরকার। তা মাষ্টার মন্মথটা যে রকম ইডিয়ট—"

কল্পনাদেবী বিরক্তিভরে বাধা দিয়া বলিলেন, "আবার ওকে নিয়ে পড়লে কেন—ওকে ত একরকম নাইজিংএ ফেলাই হয়েছে, ওর হাতে মোওয়া দিয়ে ভুলিয়েই রাখা হয়েছে।"

শশাঙ্কমোহন উৎসাহ ভরে হাততালি দিয়া বলিলেন, "ওঃ কি আইডিয়াটাই না দিয়েছি। এর জন্যে আমি পেতে পারি এ থাউজ্যাণ্ড থ্যাঙ্কস তোমাদের তরফ থেকে।—নয় কি? হাঁ, হাঁ কেমন মাষ্টার মন্মথর বিল-সরকারীর সঙ্গে নাইটের শিপিং বিজনেস? কি বলবো, এদেশে মেরিটের কদর নেই, নইলে মিঃ এস সানিয়াল আজ ডিপ্লোমেসিতে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট এর গোল মেডালিষ্ট হোতো! মন্মথটাও ইডিয়ট। ডাক্তারটা ওকে ভালবাসে, প্রায়ই প্রেজেণ্টটা আসটা দেয়, তাতেই ও গলে যায়। এক এক সময়ে জেটির বিজনেস করতে ওর স্কুপলস হয়! হোঃ হোঃ!"

কল্পনা দেবী কিঞ্চিৎ রুষ্টস্বরে বলিলেন, "তোমার ঐ চালটা এখনও বুঝতে পারলুমনা শশাঙ্কবাবু। কি যে জেটিতে নাইট ডিউটি জুটিয়ে দিয়েছ ওকে। আজকাল ত প্রায়ই রাত বারোটা একটার আগে সে ঘরে ফেরে না। যখন ফেরে প্রায়ই বেসামাল হয়ে, মুখে মদের গন্ধ—এরকম ত আগে ছিল না।"

মিঃ সানিয়্যাল বলিলেন, "না, তা ছিল না। কিন্তু পয়সা রোজগার করতে হলে কেবল ডোমেষ্টিক ডাভ হয়ে ঘরে বসে মুখোমুখী হয়ে থাকলেই ত চলে না। ওর ব্রেণ ক্রমে ক্লিয়ার

হয়ে আসছে, এর পর ক্রিলি আমাদেব ব্রাদারহুডে জয়েন করতে পারবে ও।”

বাণী দেবী অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “তোমার ওসব বাগাড়ম্বর এখন রাখ। আগে তোমার নতুন মতলবটার পরিচয় দাও, তারপর ওসব কথা হবে'খন।”

শশাঙ্কমোহন আড়ামোড়া ভাঙিয়া হাই তুলিয়া বলিলেন, “আঃ শরীরটা যেন ভেঙে পড়ছে, শীতে ত কালিয়ে গেলুম একবারে! এখন একটা ইনসাইড ব্র্যাকেট না পেলে তাজা হতে পারছিনা. —কথা বোলাবার কোথা থেকে? নিধিরাম—এই নিধিরাম!’

খানসামা ডিক্যান্টার গেলাস সোডা সমস্ত যোগাইয়া দিয়া গেল। বোধ হয় অপর পার্টনারদেরও ব্র্যাকেটে বিশেষ আপত্তি ছিল না।

মিঃ সানিয়্যাল কিছু তাজা হইয়া স্ফূর্ত্তিভরে বলিতে লাগিলেন, “দেখ, এক ঢিলে দুই পাখী মারবার মতলব করেছি, দিদি। কারবারের ছয় মাসের ক্লিয়ারিং আর ষ্টক-টেকিংএর সময় এগিয়ে আসছে বোধ হয় জান। জমিদারের মেয়ে—সেই প্যারাগন অফ বিউটি এণ্ড প্রাইড এ ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়িয়েছে সত্যি, কিন্তু খবর পেয়েছি, বুড়ো বাপ বেটা এসেছে কলকাতায় কারবারের খোঁজ খবর নিতে। এ একটা মস্ত ক্রিটিক্যাল টাইম আমাদের বলতে হবে না?”

বাণীদেবী শুষ্কমুখে বলিলেন, “সত্যি নাকি? বুড়ো সরকারী হাকিম ছিল না? উপায়?”

মিঃ সানিয়্যাল একরাশ সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করিয়া বলিলেন, “ক্রমে, ক্রমে সবই বলছি। মিঃ স্যানিয়্যালের এই বিরাট ব্রেণ থাকতে চিন্তার কোন কারণ নেই।”

কল্পনাদেবী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “দেখ, ভাল লাগেনা বলছি এসব ভনিতে। আগেই ত বলেছি, সোজা কথায় বুঝিয়ে দাও তোমার মতলবটা।”

মিঃ সানিয়্যাল বলিলেন, “এসব ব্যাপারে হারি করাটা কিছুই নয়—কিছু ভাবতে হবেনা, ডিয়ারি! আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি দেখনা। আসল কথা এই যে, ব্যাপার যখন সঙ্গীন হয়ে ওঠে, তখন অপোজিট পার্টির মুভগুলোকে সাইডিং এ সাণ্ট করে দিতে হয়”—

কল্পনাদেবী এবার সত্যই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিলেন, “আঃ আবার ঐ সব হেঁয়ালী! তুমি সোজা কথা বলবে কিনা বল—রাত হয়ে যাচ্ছে।”

মিঃ স্যানিয়্যাল দুই হস্ত বাটীর আকারে পরিণত করিয়া বলিলেন, “আহাহা, চটো কেন, ডিয়ারী! বলছি, ক্রমে ক্রমে সবই হচ্ছে। এই, কথাটা হচ্ছে কি জান, বুড়োকে এমন একটা ডিফিকাল্ট পজিসানে ফেলতে হবে, যাতে ওর মনটা আপাততঃ ডাক্তারখানার খাতা-পত্তোরের দিকে না যেতে পারে—এতে আমাদের তরফ থেকে একটা নতুন ধরণের ডিপ্লোম্যাটিক চাল দিতে হবে, বুঝলে?”

বাণীদেবী বলিলেন, “অর্থাৎ?”

কল্পনাদেবীও সায় দিয়া বলিলেন, “হাঁ, সেটা কি রকম হবে?” উভয় ‘ভগিনী’ উদগ্রীব হইয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলেন। মিঃ সানিয়্যাল এই অবস্থাটুকু বিশেষ উপভোগ করিয়া আত্মপ্রসাদের তৃপ্তিপূর্ণভাষে বলিতে লাগিলেন, “অর্থাৎ কিনা,—বুড়োর বাঁচনকাঠি মরণকাঠি ধরে এমন নাড়া দিতে হবে যে, সে আর কোনদিকে নজর দেবার বা নিঃশ্বেস ফেলবার অবকাশ পাবে না।’

বাণী দেবী আর এক পেগ চড়াইয়া বলিলেন, “সেই মরণকাঠিটি কি?”

মিঃ সানিয়্যালও তাঁহার অনুসরণ করিয়া এবং টেবিলে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিলেন, “ভাইট্যাল পয়েণ্ট দিদি, ভাইট্যাল পয়েণ্ট—অর্থাৎ ওর ছেলে, ওর ছেলে ডাক্তার মিত্তির—যার জন্যে ও দু দশ হাজার ছেড়েছে, আরও দু দশ হাজার ছাড়তে পেছপা নয়, বুঝলে?”

কল্পনা দেবীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি সোৎসাহে বলিলেন, “ক্যাপিট্যাল! কিন্তু ছেলেকে দিয়ে ওর মনটাকে মেন লাইন থেকে সাইডিংএ ঠেলে দেবে কেমন করে?”

মিঃ সানিয়্যাল এবার দ্বিগুণ উৎসাহে বলিতে লাগিলেন, “ওঃ সে সব দাবার ছকের মত ঠিক করে সাজিয়ে ফেলেছি, ডিয়ারি! ইডিয়ট ডাক্তারটা গেছে পাটনায় কম্যুনিষ্টদের হুজুগে ধড়ফড়ি করতে। এ দিকে যে ওদের মধ্যে মস্ত পার্টি ফিলিং বেঁধে গেছে, তা ত বাছাধন জানেন না এবং তার মূলে কে রয়েছেন তাও ত ইডিয়টটার বোঝবার ক্ষমতা নেই—হাঃ হাঃ হাঃ।”

বাণী দেবী হাসিতে যোগদান করিয়া বলিলেন, "তোমার তা হ'লে এতে পোয়াবারো দেখছি—আসতে যেতে লাভ।"

মিঃ সানিয়্যাল উল্লাসভরে টেবিল বাজাইয়া বলিলেন, "একজ্যাক্টলি সো। এই জন্মেই দিদি আমি তোমার এত বড় ভক্ত—সত্যি আপ-অন গড দিদি—এই, কোই হ্যায়,—পেগ লেয়াও। ঢালো খাও—যাবৎজীবেৎ সুখংজীবেৎ ঋণং কৃত্বা হুইস্কি পিবেৎ," মিঃ সানিয়্যাল ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে গান জুড়িয়া দিলেন—

—"ঢালো—আরো ঢালো

রূপের সঙ্গে তীব্র মদিরা লাগে ভালো

ভারি লাগে ভালো।"

এইখানে নিজেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"কেয়াবাৎ! তোফা! চমৎকার! লেয়াও গেলাস লেয়াও মদ!" সঙ্গে সঙ্গে আবার গান,—

—"স্বর্ণ পাত্রে যার তুমি সুরা

সরস রক্ত অধর মধুরা

চুম্বন দাও শিরায় শিরায় লালসা বহ্নি জ্বালো জ্বালো।"

এই পর্য্যন্ত কষ্টে সৃষ্টে সুর করিয়া গাহিয়া মিঃ সানিয়াল কতকটা বেসামাল অবস্থায় মিহি সুরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই ক্রন্দনের সুর কতকটা কুকুর বিড়ালের আওয়াজের মত। কল্পনা দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "দেখো, ভাল লাগে না বলছি। অমন করে ও ছাই খাও কেন?"

মিঃ সানিয়্যাল মিস্ কল্পনা দেবীর সম্মুখে নতজানু হইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"এঁ্যা—আ—মি—খে—ই—ছি? তুমি বললে আ—আ—মি খেয়েচি?"

হঠাৎ নিধিরাম দ্বার প্রান্তে ব্যস্তসমস্তভাবে হাজির হইয়া বলিল, "হুজুর দোবে এক বিবি এসে মহা গোল বাঁধিয়েছে, বলে এখনই হুজুরদের সঙ্গে—এই যে মানা না শুনে নিজেই এসে হাজির হয়েছে—যাও নিচে—যাও বলছি—"

কল্পনা দেবী বাধা দিয়া বলিলেন, "আঃ গাধার মত চেঁচিয়ো না—যাও চলে যাও। আপনি কি চান? কাকে চান এখানে?"

ততক্ষণ মিঃ সানিয়্যাল প্রকৃতিস্থ হইয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আগন্তুকা দ্বারপ্রান্ত হইতেই বলিল, "ওগো, বড় বিপদে পড়েই তোমাদের দোরে এসেছি—এইখেনেই সে থাকে না?—ঠিকানা ত বলতে না, অনেক কষ্টে জানতে পেরেছি। উঃ!"

আগন্তুকা যে অতিমাত্র দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিল, তাহা তাহার মুখচন্দ্রই বলিয়া দিতেছিল। বসিয়া সে ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল তাহাকে দেখিয়া মনে হয়, সে তখনও যৌবনের সীমারেখা অতিক্রম করে নাই, দেহে রূপলাবণ্যও যে তাহার ছিলনা তাহা নহে। তবে রূপজীবিনীদের ঘৃণিত শোচনী জীবনযাত্রা তাহার নয়ন ও অধরকোণে কলঙ্করেখা সুস্পষ্ট টানিয়া দিয়াছিল।

মিঃ সানিয়্যাল রসভঙ্গ করিয়া আগন্তুকার মুখের কাছে হাত মুখ নাড়িয়া বলিলেন, "কে বাবা তুমি রাত দুপুরে?—শ্যাওড়া গাছ থেকে নেমে আসনি ত?"

বাণীদেবী ধমক দিয়া বলিলেন, "কি হচ্ছে ও সব শপাক—"

কল্পনাদেবী বাধা দিয়া আরক্তলোচনে হুকুম দিলেন, "যাও, চলে যাও এখান থেকে।—এই নিধি—নিধি—"

নিধিরাম ও পাচকঠাকুর আসিয়া এরূপ জোর জবরদস্তি করিয়া মিঃ সানিয়্যালকে কক্ষান্তরে অপসারিত করিল। বাণীদেবী তখন কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "কে তুমি—কি দরকার এই রাত্তিরে? কে থাকে এখানে—কার কথা বলছো তুমি?"

আগন্তুকা বলিল, "বলছি সব একে একে। এই যে গো তোমাদেরই ভাই না কে হ, ঐ যে গো ডাক্তারখানার ম্যানেজার নাকি গো, আমার কাছে নাম ভাঁড়িয়ে নগেন বাবু বলে যেতো আসতো—ঐ যে গো তোমাদের ভাই মন্মথ না কি—"

বাণীদেবী উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "হাঁ, তা কি? মন্মথর কি হয়েছে?"

আগন্তুকা হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, —"হবে আর কি গো—তাকে যে পুলিসে ধরে নিয়ে গেলো গো বাপু—উ! উঁ।"

দুই ভগিনী সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "পুলিসে? কেন? কি করেছে সে?" তাহার পর বাণীদেবী তাহাকে শান্ত হইতে বলিয়া নানা মিনতিপূর্ণ প্রবোধ বাক্য বলিলেন এবং শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি জানলে কি করে বাপু? তোমার নাম কি—কোথায় থাকো?"

আগন্তুকা ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে ভাঙা ভাঙা স্বরে আপনার পরিচয় দিল। তাহার নাম কুসুম, সে থাকে কালীঘাটে, আজ প্রায় বৎসরাবধি নগেনবাবু তাহার ওখানে যাতায়াত করে, তবে সে এক মাড়োয়ারী বাবুর রক্ষিতা। ইদানী কয় মাস হইতে মন্মথ অত্যন্ত মত্তপ হইয়াছে এবং দুই হাতে পয়সা উড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে মন্মথর নিকটে সে পয়সা লইত না, সে তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু মত্তপ হইবার পর হইতে সে অতিমাত্র দুর্দ্দান্ত হইয়াছে এবং প্রায়ই মত্তাবস্থায় কক্ষের আসবাবপত্র ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়। তাহার বাবু এইহেতু তাহাকে বিস্তর অনুযোগ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে মন্মথকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। কোথায় সে এত পয়সা পাইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, জেটিতে নাইট ডিউটি করিয়া সে দিনে দুই টাকা আড়াই টাকা উপায় করে। সাবধান হইতে বলিলে যখন ভাল অবস্থায় থাকে তখন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদে, মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে আবার যে কে সেই। কয়দিন পূর্ব্বে সে মত্তাবস্থায় একখানা বড় আয়না ভাঙিয়া চুরমার করিয়াছিল। তাহাতে মাড়োয়ারী বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারবান দিয়া তাহাকে প্রহার করাইয়া তাড়াইয়া দেয়—বাবু তাহার জন্য গোয়েন্দা লাগাইয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। ইহার পরদিন রাত্রিকালে মন্মথ তাহাকে তাহার গাড়ী দরজায় দাঁড়াইতেই ছোরা লইয়া আক্রমণ করে। বাবু তাহাকে পুলিসে ধরাইয়া দিয়াছে এবং তাহার নামে চুরির ও মারপিটের চার্জ্জ দিয়াছে,—সে তাহার চাবিশত টাকা দামের ঘড়ি ও চেইন ছিনাইয়া লইয়াছে এবং মূল্যবান জামিয়ারখানা ছিঁড়িয়া দিয়াছে, ইত্যাদি। সে বড় লোক, পুলিস তাহার ডায়েরী লিখিয়া লইয়া মন্মথকে আটক করিয়া রাখিয়াছে। সে বহুকষ্টে তাহার ডাক্তারখানা হইতে বাড়ীর সন্ধান পাইয়া তাহাদের কাছে আসিয়াছে। সে স্ত্রীলোক, মূর্খ এবং রূপের ব্যবসা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি নাই, কোন উকীল মোক্তারের সঙ্গেও তাহার জানাশুনা নাই। তাঁহারা তাহার ভগিনী, এখন তাঁহারা দয়া করিয়া উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে তাহার আর উদ্ধারের কোন আশা নাই,—নিশ্চয়ই জেল হইবে।

এই বলিয়া কুসুম মুখে অঞ্চল দিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্পনাদেবী বিষম চটিয়াছিলেন, অন্তরে গুমরাইতেছিলেন, কিন্তু তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বাণীদেবী আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নেই কুসুম—আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি তাকে ছাড়িয়ে আনতে—"

কল্পনাদেবী গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হাঁ, ছাড়িয়ে আনবে, না মুড়ো খেংরা দেবে—থাক না জেলে পচে মরুক না—দেখুক না কত ধানে কত চাল—"

বাণীদেবী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "আহা, কি করিস বল দিকি, চুপ কর বলছি। দেখ দেখি, বেচারী ওকে কত ভালবাসে—নইলে ওর কি দায় পড়ে গিয়েছে ছুটে এই রাতে আসতে—"

কুসুম আদরে যেন আরও গলিয়া গিয়া স্খলিত কণ্ঠে বলিল, "ও দিদিমণি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—চলনা পুলিসে এখনি—যা হয় একটা কর গিয়ে—"

বাণীদেবী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "নিশ্চয় করবো, ও কি আর তোমায় বলতে হয়?—হাজার হোক, আমাদের ভাই ত! কল্পনা রাগের মাথায় যাই বলুক, ফেলতে ত আর পারবে না ওকে—তবে কি জান বাছা, আমরা খেটে-খেগো লোক, এই বাজারে সংসারই চলে না, তার উপর এসব হাঙ্গামা—চার চারশো টাকার দাবী—তার উপর পুলিসে ডায়েরী,—উকীল আদালতের খরচা—"

কুসুম উচ্ছ্বাসভরে বলিল, "টাকার জন্যে কিছু ভেবো না দিদি—ওসব আমি দেবো। কিসের জন্যে টাকা? হীরে জহরতের গয়না? দরকার হলে সব দোবো—তুমি নগেনকে বাঁচাও দিদি, এযাত্রা। এই নাও চারশো টাকা—ওটা সঙ্গে করেই এনেছিলুম—আরও দরকার হলে দোবো পরে—এখন এই দিয়ে পুলিসের হাত থেকে ছাড়িয়ে আন তাকে।"

বাণীদেবী পরম উৎসাহ ও আগ্রহভরে নোটের তাড়াটি

হস্তগত করিলেন।' বাণীদেবীর সহিত কল্পনাদেবীর চোখে চোখেই সঙ্কেত হইয়া গেল। কল্পনাদেবীর আয়ত নয়ন দুটি ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রজত খণ্ডের কি অপার মহিমা।

বাণীদেবী গাত্রোত্থান করিয়া কুসুমকে ধরাসন হইতে উঠাইয়া একবার কল্পনাদেবীর দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিলেন—আবার চোখে চোখে অদ্ভুত বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের আদান প্রদান হইয়া গেল। তাহার পর বাণীদেবী অতি মিষ্ট কোমল স্বরে বলিলেন, "তাই ত ভাই কুসুম, কাজটি ত বড় সোজা নয়—বাঘে ছুঁলে আঠারো" ঘা। আচ্ছা তোমার বাবুকে বুঝিয়ে কেস উঠিয়ে নেওয়াতে পারবে? বাবু ত তোমায় খুব ভালবাসে।"

কুসুম বলিল, "তা খুব পারবো। বাবুও এর মধ্যেই অনেকটা নরম হয়েছে পুলিস হাঙ্গামা করতেই চাইছে না। তবে ডায়েরি লিখিয়েছে—পুলিস ত সহজে ছাড়বে না।"

বাণীদেবী যাইতে যাইতে বলিলেন, "হ্যাঁ চল, দেখি কি করতে পারি। তুমি এখন বাসায় যাও—ঠিকানা এই ত? পুলিসে হয়ে আসি একবার—খাতির করে একটু আমায়—লেডি ডক্টর কিনা!"

১৫

ডাক্তার হিমাংশু মিত্রের সত্যই স্নানাহারের অবকাশ হইতেছেনা—সে যে সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই—নতুবা সে পাটনায় গেলে রোগীর দল তাহার কম্পাউণ্ডারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত না। তাহার অভিজ্ঞতা ছিল না একথা সত্য, কিন্তু তাহার ভিতরে ছিল একটা আশ্চর্য্য ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা, বড় বড় নামজাদা অভিজ্ঞ প্রবীণ ডাক্তারেরা অসমর্থ হইলেও সে অনেক ক্ষেত্রে যত্ন পূর্ব্বক পরীক্ষা দ্বারা রোগ নির্ণয় করিতে পারিত এবং একটা কেস হাতে লইলে তাহার জন্য সে অনেক পুস্তক পাঠ করিত, অনেক ভাবিত এবং রোগীর কাছে বহুবার, বহুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা ও প্রশ্নাদি করিয়া প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে চেষ্টা করিত। এই সকল কারণে অল্পদিনেই তাহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, নিরন্তর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিলনা। যে কয়েক মাস সে ডিসপেনসারি খুলিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করিয়াছিল সেই আট নয় মাসের মধ্যেই তাহার ডাক হইয়াছিল আশাতীত। কিন্তু এই আট নয় মাসের মধ্যেই সে দুই তিন বার অতি কঠিন রোগের দায়িত্ব হাতে থাকিতেও কলিকাতা ত্যাগ করিয়া শ্রমিক সঙ্ঘের কার্য্যে বাহিরে যাইতে বিরত হয় নাই। এজন্য রোগীদের বিরক্তির কারণ হইয়াছিল যথেষ্ট। বিশেষতঃ এবার পাটনায় অতিরিক্ত বিলম্বের কারণে রোগী মহলের অসন্তোষ চড়িয়াছিল চরমে। তাহাদের কঠোর শ্লেষপূর্ণ প্রশ্নের জ্বালায় বেচারী কম্পাউণ্ডার ও বেহারার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সত্য বটে, হিমাংশু পাটনা যাত্রার পূর্ব্বে তাহার সতীর্থ আর একজন ডাক্তারকে ডিসপেনসারীতে সকালে বিকালে বসাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রোগীরা তাহাতে আদৌ সন্তুষ্ট ছিল না, বা ভরসা পাইত না।

এইভাবেই দিন চলিতেছিল। কোন কোন রোগী ডাক্তারখানা ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র নূতন ডাক্তারের শরণাপন্ন হইল, ডাক্তারখানার বিক্রয় পত্রও কমিয়া গেল। কম্পাউণ্ডার প্রমাদ গণিয়া বিল সরকার মন্মথনাথের মারফৎ লেডি ডক্টর বাণীদেবী ও তাঁহার এজেন্ট মিঃ সানিয়্যালকে খবর দিলেন, নিজেও তাঁহাদের দ্বারস্থ হইলেন। কিন্তু ঘোড়া না থাকিলে যেমন গাড়ীচড়ার অভাব দূর হয় না, তেমনি ডাক্তারের অভাবে ডাক্তারখানা চালানর অভাব নিবারণ করা সম্ভব হইল না। অবশ্য মিঃ সানিয়্যালের 'ওভারকের' কামাই গেল না, অথবা বিল সরকারের 'বিল সাধাও' সমান তেজে চলিবার পথে কোন বাধা দেখা দিল না।

অবস্থা যখন এইরূপ, ঠিক এমনই সময়ে ডাক্তার হিমাংশু পাটনা জয় করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আশ্চর্য্য এই যে সে প্রত্যাবর্ত্তন করিবা মাত্র আবার ডাক্তারখানায় রোগীর ভিড় বাড়িতে লাগিল এবং সত্যসত্যই সে স্নানাহারের সময় করিয়া উঠিতে প্রায়ই অসমর্থ হইতে লাগিল। উপরোক্ত, ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাহার পিতা কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তারখানার হিসাব পত্র লইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথম দুই চারিদিন পিতাপুত্রে সে বিষয়ে কোন আলোচনা হইল না। হিমাংশু বাসায় পৌছিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হয় নাই, কেন না সে কম্পাউণ্ডারের পত্রে তাঁহার কলিকাতা আগমনের ও ডিসপেনসারীতে শুভ পদার্পণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু প্রথম মুখে অতিরিক্ত ডাকের চোটে সে কোনদিকে লক্ষ্য রাখিবার অবকাশ না পাইলেও পরে যখন দেখিল, তাহার পিতা ডাক্তারখানার খাতাপত্র ও বিলের তাড়ায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন, তখন সে পূর্ব্বে তাঁহাকে ডাক্তারখানা সম্পর্কে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে দেখে নাই বলিয়া যে বিস্মিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

একদিন সন্ধ্যার পর হিমাংশুর একটু অবসর হইলে সে বাসায় বসিবার ঘরে আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একটু বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছে এমন সময় চন্দ্রমাধব বাবু হঠাৎ অতর্কিত ভাবে তথায় প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। হিমাংশু তাড়াতাড়ি সিগারেটটা এ্যাশট্রেতে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

চন্দ্রমাধববাবু কোনরূপ ভনিতা না করিয়া সরাসরি বলিলেন, "বড্ডো ব্যস্তছিলে এতদিন, এখন দুটো কথা কবার অবসর হবে বোধ হয়। বলছিলুম কি, বছর প্রায় ঘুরে এল, ডাক্তারখানার ষ্টক্ টেকিং হয়েছে কি ? দেখলুম না ত তার খাতা পত্র কিছু।"

হিমাংশু বলিল, "হাঁ, ওসব কম্পাউণ্ডার বাবু ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে মাসে মাসে দেখে আসছেন—"

বাধা দিয়া চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন, "তা দেখে আসতে পারেন, কিন্তু তুমি তাঁদের একাউণ্টের খাতাপত্র চেক্ করেছো কি ? প্রতি ছয় মাস অন্তর ষ্টক টেকিং করা হয়—এটা এসব বিজনেসের নিয়ম বলেই শুনেছি।"

হিমাংশু একটু অস্বস্তি অনুভব করিয়া বলিল, "না আমি চেক্ করিনি বটে, করবার দরকারও হয়নি—ডাক্তারখানা চলছে খুব জোর যখন—"

"তখন পরের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত বসে থাকবে ? দেখ, বড় লোকদের পক্ষে যাই হোক, দশ দশ হাজার টাকা আমাদের পক্ষে অল্প নয়,—তার উপর আবার তুমি নতুন মাল গস্ত করবার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছ।"

"ব্যবসা করতে গেলে তা যে ব্যবসাই হোক না—প্রথম মুখে অমন দুচারবার—"

"টাকা ঢালতে হয় কেমন না ? তা আমিও জানি। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে টাকাটা ঠিক মত কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা নিজে হতে দেখাও চাই তেমনি। আমি বলছি না যে, তোমার ডাক্তারখানা চলছে না, কেননা তোমার রোগী আর প্রেসক্রিপশানের সংখ্যা যত বেশী, এত এ অঞ্চলে আর কোন ডাক্তারখানায় দেখতে পাই নি—"

"তবে ? তবে আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন কেন ?"

"মিথ্যে ভয় নয় হিমাংশু, মিথ্যে ভয়ের কথা এতে কিছু নেই। কথা হচ্ছে, তুমি নিজে সমস্ত এক্যাউণ্ট ঠিকমত দেখে যাচ্ছ কিনা। এ সব কারবারে পরের উপর ভার দেওয়া কিছু নয়। ধর না তোমার ম্যানেজারকে—ঐ যে তোমার এডভারটাইজিংএর এজেণ্ট না ? ও কি করে ? ও ত কেবল ক্যানভ্যাস করে, তার দরুন কমিশনও পায়, তবে আবার ও ম্যানেজার কিসের ? দেখছি অথচ, ও চেক কাটে, অর্ডার দেয়, বড় বড় ব্যাপারীদের ওরই সঙ্গে বিজনেসের চুক্তি হয়—"

"তাত হবেই। ওঁর উপর পাওয়ার অফ এটর্ণি দেওয়া রয়েছে যে। ডাক্তারকে চব্বিশ ঘণ্টা ওসব করতে গেলে ডাক্তারী চলবে কেমন করে ?"

"হুঁ, শুধু তাই ? ডাক্তারকে ওসব করতে হলে যখন তখন পাটনা গয়া যাওয়া হয় কেমন করে ? আবার শুনতে পাই, যে লোকটা বিল সরকারী করে, সেও নাকি বাজারে নিজেকে ম্যানেজার বলে পরিচয় দেয়। আরও মজা, রোজকার রোজ বিল সাধবে সে, তা না মাস মাসের বিল আদায় না হয়ে তারই কাছে জমা হয়ে রয়েছে। ক্রেডিটে কারবার করতে হলে সে সব বিল আদায় হ'ল কিনা হ'ল, তা মাঝে মাঝে চেক করতে হয় না কি ? তাও কি বিল সরকারের বাড়ীতে জমা হয়ে পড়ে থাকে ?"

হিমাংশু বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি ? আহা এই মন্মথ ছেলেটি বড় ভাল—ও আমার বড় অনুগত—ও কোন রকম মন্দ কাজ করেছে—"

চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন, "আশ্চর্য্য হচ্ছ ? হবারই কথা বটে। শুনেছি, তুমি ওকে বড় স্নেহ কর, বিশ্বাস কর, সর্ব্বদাই কিছু না কিছু দাও। কিন্তু তোমার কম্পাউণ্ডারের কাছে এ বিষয়ে খোঁজ করতে গেলে সেও মাথা চুলকোয়, বলে

ম্যানেজার বাবু হুকুম দিয়েছেন মন্মথকে সমস্ত বিল দিয়ে দিতে। এর মানে কি ?"

হিমাংশু অতিমাত্র অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, বলিল, "কৈ, তা ত শুনি নি।"

চন্দ্রমাধব বাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "না, তা শুনবেনা। কিন্তু শোনা উচিত ত ? এই রকম করে তোমার ষ্টকে কত মাল আছে আর কত মালইবা খরচ হয়েছে এবং তার কি লাভালাভই বা তোমার ডিসপেনসারি পেয়েছে, তাও ত তোমার জানা বা শোনা দরকার। নইলে ষ্টক ফুরিয়েছে বা কতক খালি হয়েছে বলে আবার নতুন মাল কেনবার জন্যে টাকা এডভান্স করার দরকার হলেই অমনি টাকা দিতে হবে, এ ত বড় মজার কথা। এটাত মোটেই ব্যবসাদারের মত কাজ নয় বলেই মনে হচ্ছে আমার।"

হিমাংশু কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "কি করতে বলেন আমায় ?"

চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন, "বলি অনেক কথা। কিন্তু সে সব বলতে হলে সময়ও লাগবে অনেক, খাতাপত্র নিয়ে দুজনে বসতেও হবে কিছুকাল। আর তা ছাড়া সবচেয়ে যেটা দরকার, অন্ততঃ এখন দিন কতক তোমায় যেখানে সেখানে টহল দিয়ে বেড়ান ছাড়তে হবে।"

হিমাংশু যে বিলক্ষণ ক্ষুণ্ণ হইয়া গম্ভীর ও নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহা বুঝিতে তাহার পিতার বিলম্ব হইল না। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কি, মনে মনে খুব রাগ অভিমান হচ্ছে বোধ হয় ? মানুষ মাত্রেরই আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে তা হয়ে থাকে বটে, আমাদেরও খুব হয়— বিশেষ তোমার মত বয়সে ত হয়েই থাকে। কিন্তু তুমি আমার অবাধ্য ছেলে নও বলেই এতকথা বলছি। কথা কই না বটে, কিন্তু কই যখন তখন তোমায় আমি ছেলের মত দেখি না, বন্ধু হিসেবে সুপরামর্শ দিই, নেওয়া না নেওয়া তোমার ইচ্ছা। তুমি এখন বড় হয়েছ, সংসারে ঢুকছো, বাজারে তোমার মান যশ হয়েছে। যা করবে, ভাল করে ভেবে চিন্তেই কোরো মাত্র এইটুকু বলতে পারি। আর এটুকুও ঐ সঙ্গে বলতে চাই যে, আমি যা তোমায় করতে পরামর্শ দেবো, সেটা তোমায় ভাল ভেবেই দেবো।"

হিমাংশু বলিল, "আপনার এত কথা বলবার কোন দরকার ছিল না, আপনার কোন্ কথাটি শুনিনি আমি—"

বাধা দিয়া চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন, "বলেইছি ত তুমি আমার অবাধ্য ছেলে নও। তবে সব কথাই যে বরাবর শুনে এসেছ তাও বলতে পার না।"

হিমাংশু মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিল তাহার পর অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে বলিল, "কি ভেবে এ কথা বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না। যদি প্রফিক আন্দোলনে যোগ দেবার—"

চন্দ্রমাধববাবু বাধা দিয়া বলিলেন "না, সেটাও একটা বলবার কথা বটে, তবে এক্ষেত্রে আমি অন্য একটা ব্যাপার সম্পর্কে কথাটা বলেছিলুম।"

হিমাংশু বলিল, "কি ? বিবাহের কথা ? ওঃ! তা, আমি ত আপনার কথায় আপত্তি করিনি, কেবল বলেছিলুম, একটু স্থিতস্থিত না হলে—"

"অর্থাৎ ?" ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন, 'রোজগার করে স্বাধীন হলে ?"

হিমাংশু ক্ষুণ্ণ ব্যথিত স্বরে বলিল, "এমন কথা আমি কখনও বলিনি—আপনি অন্যভাবে কথাটা নিচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না।"

চন্দ্রমাধববাবু বলিলেন, 'আমি উল্টো বুঝছি ? তা বটে। তোমরা ভাবো, দুপাতা ইবিজি পড়ে মস্ত বোঝদার পণ্ডিত হয়েছ, না ? তোমার কখন বিয়ে করা উচিত অনুচিত, তা আমি বুঝিনি, তুমি বোঝো ?"

হিমাংশু বলিল, "থাক, আপনি যে সম্বন্ধ ঠিক করে ওকথা পেড়েছিলেন, ও পক্ষ থেকে যখন তা অগ্রাহ্যই হয়েছে তখন আর ও কথা তুলে দরকার কি ?"

চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন, "খুব দরকার আছে। দীপ্তির বাপ ছিল আমার বন্ধু, ভাই পরম সুহৃদ, হিতৈষী। তাতে আমাতে যা ঠিক হয়েছিল, তাই করতে চেয়েছিলুম। দীপ্তিকে যা দেখলুম, খুব ভালমেয়ে, তবে নিজের একটা জিদ তার আছে। কারও কর্ত্তৃত্ব সে মানতে চায় না, এই যা দোষ। তাই রাগের মাথায় আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল।"

হিমাংশু দাঁড়াইয়া উঠিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "শুধু অগ্রাহ্য করেছিলেন তা নয়, বড়মানুষিই বলুন আর জমিদারী

চালই বলুন, যাই বলুন, সেই চাল দেখিয়ে আমার সামনে আপনাকে অপমান করেছিলেন।”

চন্দ্রমাধব বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, “ভুল বুঝেছো হিমাংশু। সে আমাদের খুবই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—খুবই আত্মীয়ের মত ব্যবহার করেছে আমার সঙ্গে, বুঝলে? নইলে সে এই কারবারের সম্বন্ধে আমায় সতর্ক করে দেবে কেন?”

হিমাংশুর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। যে পিতার সমক্ষে সে কখনও মাথা তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে কথা কহে নাই, সেই পিতার পদমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “ওঃ সেই জন্যেই বুঝি তিনি আমার বিপক্ষে সনৎদাদের কাছে নানা কথা বলেন, আমার বাড়ী বয়ে আমায় বেত নিয়ে শাসন করতে আসেন।”

রুদ্ধ ক্রোধে সে আর অধিক কথা বলিতে পারিল না। চন্দ্রমাধব বাবু হাসিয়া বলিলেন, “অন্ধ, তুমি একবারে অন্ধ। যদি তার উদ্দেশ্য ভাল না হবে, তা হলে উপযাচক হয়ে আমাদের ভালমন্দ দেখবার তার কি দরকার ছিল? আর—”

হিমাংশু বাধা দিয়া বলিল, “ওঃ! আমাদের ভালমন্দ দেখবার জন্যে ঘুম নেই বলেই বুঝি তিনি আমার মুখের উপর বলতে সাহস করেছিলেন যে, আমার বা আমার বাবার কালচারের অভাব আছে? তা হলে বোধ হয় আমাদের ভালমন্দ দেখবার জন্যে তিনি আমার ডাক্তারখানার উদ্ধারকের জন্যে আর আমার গতিবিধি দেখবার জন্যে আপনাকে খবর দিয়ে আনিয়েছেন দেশ থেকে? এ রকম যারা পরের কাজে মাথা দেয় সেসব লোককে তার অধিকারের সীমানা দেখিয়ে দেওয়ার বিশেষ দরকার আছে দেখছি তা হলে।”

চন্দ্রমাধব বাবুর উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়াই সে ক্রোধে প্রায় জ্ঞানহারা হইয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। চন্দ্রমাধব বাবু পুত্রের নিকট এরূপ ব্যবহারের কখনই প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, এ সকল ব্যবহার আধুনিক প্রগতি ও শিক্ষার ফল ভিন্ন আর কিছু নহে। ক্ষুণ্ণ মনে তিনি আপনার ঘরে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

বাজারে
“ম্যালেরিয়ার মহৌষধ”
নানা প্রকার পাইবেন—কিন্তু
সাবধান!
যা' তা বাজে ঔষধ সেবনে
দেহের অধিকতর অপকার করিবেন না॥
এপাইরিন
ম্যালেরিয়া আদি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের
সুপরীক্ষিত অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ॥
এপাইরিন
—ব্যবহারে কোন কুফল নাই—
ভাল ডাক্তারখানায় পাইবেন ঃ
ল্যাড কো
কলিকাতা

বাণী

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

হে আমার বাণী,
এ পাথর চাপা বুকে তুমি কি গো হয়েছ পাষাণী ?
সে পাষাণ মূক,
তবু যে প্রাণের স্পন্দে রাত্রিদিন করে ধুক্ ধুক ।
কী বলিতে চায়,
স্ফুরিত অধর প্রান্তে ধ্বনি আসি যেন মুরছায় ।
এ মাটির তলে
বীজের কণিকা যেন গুমরিছে পাষাণ কবলে ।
অঙ্কুরিতে নারে
সে কঠিন মুঠিতলে । ঘেরিয়া রয়েছে চারিধারে
প্রাণরসধারা,
অমৃতের খনি মাঝে কবরিত মরণের কারা
বেঁধেছে যে তারে,
দুর্ব্বার জীবনস্পন্দ নিত্য শির হানিছে দুয়ারে
বিমুক্তির আশে,
ধরিত্রীর স্তন্যরস উথলয় তারি আশে পাশে ।
একটি শিকড়
দীর্ণ করিবারে যদি পারে এই পাষাণ নিগড়,
নবোদ্ভিন্ন প্রাণে
উঠিবে অকুতোভয়ে আলোকের তরে ঊর্দ্ধপানে ।
পাবে সে বাতাসে
মৃত্যুহীন পরমায়ু নবোন্মেষ প্রতি মধুমাসে ।
কুসুমমঞ্জরী
পল্লবে পল্লবে তার মহানন্দে উঠিবে শিহরি,
পুষ্পিত সে ভাষা
চন্দ্রসূর্য্য তারকারে জানাবে প্রাণের ভালবাসা ।
আলোকে বাতাসে
হবে সে যে মুখরিত বরণে ও মদির সুবাসে ।
পৃথ্বী হতে টানি
লবে সঞ্জীবনী ধারা, তপনের কিরণতূনানি
জ্যোতির্বাস পরি'
দিবে দেখা হাসিমুখে আপনারে প্রসারিত করি
উদার আকাশে,
নিত্যনব সৃজনের মহোৎসবে পুলকে উল্লাসে
হবে আত্মহারা,
লভিবে নিকুঞ্জ-শোভা শূন্যময় ঊষর সাহারা ।

'চতুরঙ্গে'র কলাকৌশল

শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

জীবনের সঙ্গে মনের একটা চিরন্তন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব আছে। জীবনের সামান্য যে স্নেহ, ভালবাসা, সুখ দুঃখ, তা মনের কাছে অতি তুচ্ছ, অতি উপেক্ষণীয়, অতি সাধারণ; তার মধ্যে মন স্মরণীয় কিছু খুঁজে পায় না। জীবনের দ্বন্দ্ব যেখানে একান্ত একঘেয়ে মন সেখানে কোন্‌ বৈচিত্র্যের, রসের সন্ধান পায় না; আবার জীবন যেখানে তার 'Savage greatness' বা 'ruthless beauty' নিয়ে দাঁড়ায় মন সেখানেও স্বচ্ছন্দতার তৃপ্তি পায় না; আড়ষ্ট সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ ভেবে দেখলে জীবনটা একান্তই formless (নিরাকার), তা সাগরের মতই একটা বিরাট অনন্তের গতি ও বিস্তার নিয়ে আমাদের আচ্ছন্ন করে, যার সঙ্গে মন নিজের থেকে পরিচয় করবার জন্য ব্যগ্র নয়। সে প্রয়োজনের মধ্যে জীবনের যেটুকু পায় তাতেই সন্তুষ্ট।

সাহিত্য হল জীবনের এই নিরাকারতার মধ্যে আকারের সন্ধান, যে সন্ধানের বৈচিত্র্যের বিরাম নেই। মন যেখানে প্রতিদিনের জীবনকে উপেক্ষা করে, যেখানে জীবনের নিষ্ঠুর সৌন্দর্যে সঙ্কুচিত হয়, সাহিত্য সেখানে মনের অতীত কল্পনার দৃষ্টি নিয়ে সেই প্রতিদিনের জীবনের ব্যর্থতাকে, তুচ্ছতাকে এমন রূপ দেয় যে তা আমাদের উদ্বুদ্ধ ও চকিত না করে' পারেনা; তেমনি আবার অনুভূতির নগ্নতাকে এমন সুকুমার ভাবান্তরে আবরিত করে যে তখন আমরা যেন নিজেদের মধ্যে তার স্বরূপ উপলব্ধি করে' বিস্মিত, আনন্দিত হই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা সাহিত্যের এই দু'ধারার সঙ্গেই পরিচিত হই। তাঁর কাব্যের, তাঁর ছোট গল্পের সাধারণ যে সুর তা সামান্য দৈনন্দিন অনুভূতিগুলিকে রসে ছন্দে অসাধারণ করবার সুর। তাঁর 'নষ্টনীড়' জাতীয় গল্পে, তাঁর উপন্যাসের মধ্যে 'ঘরে বাইরে' এবং 'চতুরঙ্গে'র মধ্যে তেমনি প্রণয় বা অনুরাগের নির্মম ও নগ্ন পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করি অপূর্ব কলাকৌশল ও কল্পনার মধ্য দিয়ে, যে কল্পনা অসুন্দর বাস্তবের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে সৃষ্টি করে' সাহিত্যের মর্য্যাদা দান করে, যার মৌন নির্দ্দেশ ভাব ও কলারীতিকে আপন স্বতন্ত্র পথে নিয়ন্ত্রিত করে' নিত্যনূতন আকারে রূপায়িত করে।

জীবনের এই অধৃষ্য বিরাট, হয়ত বিকৃত, সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে নিরাকারতার ইঙ্গিত আছে তার সঙ্গে সাহিত্যে বাস্তবতা-রীতির আত্মপ্রকাশের বেশ ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলে' মনে হয়। যে কোন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তার আদর্শ যখন classicism এর রীতিতে (যাকে Arthur Symons এর ভাষায় বিশেষিত করতে পারি—'perfect simplicity, perfect sanity, perfect proportion') সংহত হ'ল তখন ক্রমশঃ একটা প্রতিক্রিয়ার ফলে জীবনের যা কিছু আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর ও মধুর তাই উপলক্ষ্য করে' গড়ে' উঠল কতকগুলো convention বা প্রথাপদ্ধতি। এই রকম সূত্রেই সংস্কৃতসাহিত্যে 'কবিপ্রসিদ্ধি'গুলির বা গ্রীক্‌ নাট্য-সাহিত্যে দেশকালের ঐক্য (unities of time and place) প্রভৃতির জন্ম। ক্রমশঃ উঁচুদরের শিল্পীর অভাবে এই প্রসিদ্ধি বা প্রথাগুলিই আত্মসর্ব্বস্বভাবে সাহিত্যের স্থান অধিকার করল—জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ, রসসৃষ্টির বা রসপরিণতির (transformation) সূক্ষ্মসূত্র তা হ'য়ে রইল গৌণ। জীবনের এই যে সুন্দর, সুস্থ (sane) বা মনোজ্ঞ দিকটার প্রতি পক্ষপাতিত্ব—যা ক্রমশঃ একটা ধোঁয়াটে কল্পনাবিলাসিতায় পর্য্যবসিত হয়—বাস্তবতা হ'ল যেন এই দৃষ্টির প্রতিবাদ। বাস্তবপন্থীর মতে জীবনের মধ্যে সুস্থতাকে, সঙ্গতিকে বড় করে' দেখায় জীবনের মায়িকতা (elusive-ness) যেন বিশেষ করে'ই নষ্ট হয়ে যায়। জীবনের যে পথ তার গতি একেবারে সরল বা ঋজু নয়, তা চলে' গেছে অনেক

এঁকে বেঁকে, অনেক অলিগলি, অনেক বিশৃঙ্খল প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। তাই জীবনের যে খোঁচ, যে বাঁক। যে insanity বা perversity, যে passionateness, যার মধ্যে আছে হয়ত কেবল উত্তেজনা, অসঙ্গতি বা বিক্ষোভ সেই খোঁচ বা অসঙ্গতিকে, বিরোধ বা বিক্ষোভকে কতকগুলো জীর্ণ প্রথাপদ্ধতির মাপকাঠির খাতিরে মসৃণ, ভদ্র বা ভেতো-দুরস্ত হতে হবে, এবং তা না হ'তে পারলে তার সাহিত্যে স্থান হবে না—এর কি অর্থ আছে। বরং সেই বিরোধকে, বিক্ষোভকে, অসঙ্গতিকে ফুটিয়ে তোলা, জীবনের সেই অসুন্দর অথচ মায়াময় বিশালতা ও বৈচিত্র্যকে সার্থক করে' তোলাই হবে আর্টের আদর্শ। তাই বাস্তবপন্থীদের কাছে শব্দগুলি শুধু বর্ণ ও ধ্বনির বিলাসমাত্র নয়, শব্দগুলি জীবনের গতি-ভঙ্গীতে প্রাণময়, চঞ্চল; ভাষারীতির সৌষ্ঠব বাক্যের ধ্বনিসঙ্গতির অন্বেষণমাত্র (search for hramony of of phrase) নয়—মনোবিশ্লেষণকে অন্বেষণ করে' জীবনের উত্তেজনা ও গতিকে (the very heat and motion of life) অক্ষুণ্ণ রাখবার একান্ত প্রয়াসের ফল। এইভাবে বাস্তবতার ফলে সাহিত্যরীতিতে একটা নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয়।

একথা অবশ্য সত্য যে, জীবনের বাস্তবতা এই অসুন্দরকে, উত্তেজনা ও বিক্ষোভকে আশ্রয় করলেও অসুন্দরের অন্তরালে যে গভীরতর সৌন্দর্য্য বা একান্তই কল্পনাগ্রাহ্য, উত্তেজনা ও বিক্ষোভের অন্তরালে যে গভীরতর শান্তি ও স্মৃতি তা আভাসিত হয় সাহিত্যের রূপে সেই বাস্তবতা যখন কল্পনার সৌষ্ঠব ও শ্রী মণ্ডিত হ'য়ে পরিতৃপ্তি লাভ করে। এ হ'ল সৃষ্টির ধর্ম। তাই বাস্তবপন্থীদের সাহিত্যরীতি বিশ্লেষণকে অবলম্বন করলেও, তা বিশ্লেষণ-সর্ব্বস্বই নয়। বরং বাস্তবপন্থীরা বলবেন যে এই বিশ্লেষণ পদ্ধতির নির্দ্দেশ প্রত্যেক প্রকৃত স্রষ্টার মধ্যেই পাওয়া যাবে। কারণ প্রকৃত স্রষ্টা যিনি তাঁর মানসনেত্রে চরিত্রগুলির পরিকল্পনা একটা সমগ্রতা, অখণ্ডতা নিয়ে আগেই উদিত হয়; কিন্তু তাঁকে এই অখণ্ডতাকে ভাষায় প্রকাশের সময়, অন্যকে তা দেখাবার সময়, একটার পর একটা ঘটনা এনে, কোথাও আবহাওয়ার (atmosphere) সঙ্কেতে, কোথাও আলাপের ভঙ্গীতে ইত্যাদি কতশত রকমে তিল তিল করে' গড়ে' তুলতে হয়, আর একেই নাম বলা যায় বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অনুসরণ সকল রূপদক্ষের সাধারণ হ'লেও, বাস্তবপন্থা এই বিশ্লেষণকে সাহিত্যরীতির বিষয়ীভূত করে' চরিত্রটীর মনের সমস্ত ওতপ্রোত তন্তুগুলির সন্ধান দেয়, চরিত্রটীর সজীবতা, তার চিন্তা, তার কর্ম্ম এই বিশ্লেষণ-রীতিকে আশ্রয় করে' আমাদের অভিভূত করে। উদাহরণ-রূপে আমরা Flaubert-এর অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি Emmar চরিত্রের এবং Madame Bovary'র রীতিভঙ্গীর এখানে উল্লেখ করতে পারি। এই উপন্যাসখানি একটা সমগ্র নারীচরিত্রের অপরূপ ইতিহাস—যেন স্রষ্টা নিজেকে সর্ব্বদা দূরে রেখে 'objectively' সেই চরিত্রটীকে একটা সমগ্র জীবনের পরিণতির মধ্যে রূপ দিতে চেয়েছেন। তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন এমাকে যেন তার বিকৃত (morbid) মনের প্রণয় নিষ্ঠুরতা তাঁর পক্ষে ও পাঠকের পক্ষে একটা চিরন্তন বিস্ময়—Bandelaire এর ভাষায় বলতে গেলে—তিনি এমার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন বিকৃতকল্পনাপ্রবণ এক ব্যভিচারিণী নারী (he creates in her the adulterous woman with a depraved imagiration)। এই চরিত্র সৃষ্টিতে সংযম (reticence) যথেষ্ট আছে—যা যে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আর্টে থাকবে; কিন্তু জীবন যে পথে এমাকে টেনেছে এবং তার ফলে তার দেহের বা মনের যে সব বৃত্তি ও অভিলাষ উদ্দাম ও দুর্ব্বার হয়ে উঠেছে তাদের—তা তারা যত কুৎসিত বা উত্তেজনাময় হোক না—অনাবৃতভাবে বিশ্লেষণ করে' দেখাতে ফ্লবেয়ার পশ্চাৎপদ হননি; তাছাড়া তাঁর উপন্যাসখানিতে জীবনের অতলস্পর্শীতা ও অনন্তবিস্তার, এক কথায় অবশ্যম্ভাবিতা (ineritableness) ভাষার সঙ্গতি ও সৌন্দর্য্যে এমন একটা লোকোত্তর পরিণতি লাভ করেছে যা বাস্তবতার চরম আদর্শ। এইরকম Dosteovoskyতে জীবনের abnormality বা বিকৃত নির্বিকার দিকটার অনুরাগ তাঁর সাহিত্যরীতিকে একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য ও ব্যঞ্জনা দিয়েছে। সাধারণ ভাবে বলতে পারা যায় যে, Flaubert, Dosteovosky, Balzac প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর বাস্তবপন্থীদের রীতি শুধু বিশ্লেষণ-সর্ব্বস্বই নয়; জীবনের এই বিকৃত

নিরাকারতার প্রেরণাই বিশ্লেষণকে বাহন করে' সৃষ্টির অপূর্ব্বতার সার্থক করেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' 'চোখের বালি' 'ঘরে বাহিরে' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাসই যে আমাদের সাহিত্যে বাস্তবতার গোড়াপত্তন করেছে তা বোধ হয় সকলেই মেনে নেবেন। 'নষ্টনীড়' 'চোখের বালি'তে যে বাস্তবতা আরম্ভ হ'য়ে 'ঘরে বাইরে'তে চরম ও সুন্দর রূপ পেয়েছে তা হচ্ছে বিশ্লেষণমূলক বাস্তবতা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ বাস্তবতা অভিনব নয়; অবৈধপ্রণয়ের বাস্তবতা এর আগেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়েছিল। কিন্তু অনুভূতির এত সূক্ষ্ম, লীলায়িত ভঙ্গী বিশ্লেষণের কৌশল এত সুন্দর করে', এত সহানুভূতি নিয়ে এর আগে কেউ দেখান নি। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসখানির আকারই এই বিশ্লেষণকে আশ্রয় করে'; আত্মকথার সাহায্যে এই বিশ্লেষণকে সুন্দর অথচ অনাবৃতভাবে যাতে সহজেই প্রকাশ করা যেতে পারে।

কিন্তু 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসখানির বাস্তবতারীতি এতটা স্পষ্ট করে' বিশ্লেষণপ্রধান নয়। এখানে তাই artistic formটাও 'ঘরে বাইরে' থেকে ভিন্ন। এই উপন্যাসের মুখ্য পাত্র যে দুটি—শচীশ ও দামিনী—তাদের অভিনয়ের আগা গোড়াই আত্মগত। তারা দুজনেই যেন জীবনের অবাধ স্বাধীনতা ও অনন্ত ভাববিস্তারের মধ্যে ভেসে চলেছে; তারা জীবনকে অনুভব করতেই চায়, মনের চিন্তার দিক থেকে জীবনকে বিশ্লেষণ করে' দেখবার মত আকাঙ্ক্ষা বা অবসর তাদের নেই। তাই শ্রীবিলাসকেই পাই আমরা প্রকাশ্যে—সেই যেন দ্রষ্টারূপে তাদের জীবনসূত্রটীর যেখানে যেখানে গোল পাকান'র অবস্থা হয়েছে, সেখানেই আমাদের খেই ধরিয়ে দিয়ে চলেছে। শচীশ ও দামিনীর মাঝখানে যে ব্যবধানের স্রোত বয়ে চলেছে শ্রীবিলাসই যেন তার যোগাযোগের সেতু। তাই artistic form থেকেই বেশ বুঝা যায় চতুরঙ্গের বাস্তবতা ঠিক বিশ্লেষণমূলক নয়; জীবনের বাধাহীন প্রেরণাই তার মূল।

'চতুরঙ্গ'-উপন্যাসখানির আর একটী বৈশিষ্ট্য জীবনের অনুভূতির বাস্তব নগ্নতাকে সাহিত্যরসের পর্য্যায়ে আনবার কলাকৌশল। যেখানে অন্য শিল্পী হ'লে অনুভূতির নগ্নতাকে তীব্রতায় পরিস্ফুট করবার জন্য পাঁকের সৃষ্টি করতেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় করেছেন রূপক বা symbolism. রবীন্দ্রনাথ এই রূপককে তাঁর নাটকে খুব পরিচিত করে' তুললেও রূপকের, উপন্যাসের সঙ্গে, বিশেষতঃ বাস্তবতার সঙ্গে এই যে যোগাযোগ এটা তিনি আর কোথাও এত সুন্দর ভাবে, with so much artistic effect, ব্যবহার করেছেন কি না জানি না। তিনি স্রষ্টা, সৃষ্টি করেই মুক্ত; তাঁর সৃষ্টির বাস্তবতার দিক্‌টাই শরৎচন্দ্রের প্রভাবে এবং আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমাদের অধুনাতন সাহিত্যিকদের চোখে পড়ল, রূপকের কোন শিল্পমর্য্যাদা স্বীকৃত হ'ল না। কিন্তু বাস্তবতার নগ্নতাকে রূপকের সাহায্যে কত তীব্র, ব্যাপক করা যায় তা গিরিগুহার নিভৃত অন্ধকারের মতই অন্ধকারমূর্ত্তি (দামিনীর) প্রণয়ের একান্ত আত্মসমর্পণের বর্ণনায় পাওয়া যায়। কলাকৌশলের দিক দিয়া এই প্রতীক দৃশ্যটীর তুলনা আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে আছে বলে' স্মরণ হয় না। এমনি একটী প্রতীক দৃশ্য—সমুদ্রের অন্তরে অন্তরীপের নির্জ্জন, নিস্তব্ধ শান্তি। এই শান্তিও শচীশ প্রভৃতি অন্তরের নিভৃতে যে শান্তিকে পেতে চায়, তারই প্রতীক্। প্রতীক বর্ণনার পরম সুবিধা এই যে, জীবনের মধ্যে যে অনির্দ্দেশের আহ্বান বা নিরুদ্দেশের বিস্তৃতি ও মোহ আছে তাকে প্রতীকের মধ্যে দিয়ে এত সুন্দর, তীব্র করে ধরা যায় যা সাধারণ ভাবে হাজার কলাও বর্ণনা করলেও ধরা যায় না। তাই এই প্রতীকের সঙ্গে নিরাকার, এলোমেলো, অনুভূতির আতিশয্যে ঘোলাটে, বা অনুরাগের আবেগে দুর্ব্বার জীবনের স্পর্শ খুবই নিবিড় ও সুসমঞ্জস, এবং এই পন্থার আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথের কলারীতি রসবোধের এমন একটী সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য্য পেয়েছে যাতে artistic form এর দিক্ থেকে এই উপানাসখানি একরকম অনন্যসাধারণ হয়ে গেছে। বেশ বুঝা যায়, এর সঙ্গে 'ঘরে বাইরে'র আত্মকথার রূপটী মোটেই সঙ্গত ও শোভন হ'ত না।

কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য, এই উপন্যাসখানিতে বাস্তবতার একটা সম্পূর্ণ অভিনব দিক্ রবীন্দ্রনাথ ধরতে চেয়েছেন। তিনি দেখাতে চান,—জীবনের যে দ্বন্দ্বের,

মাহের বা নিরুদ্দেশের গতি তাও যেমন জীবনের সত্য, জীবনের মধ্যেই আবার শান্তির, সৌন্দর্য্যের যে রূপ তাও তেমনি সত্য। জীবন রূপকে সৌন্দর্য্যকে আকারের সামঞ্জস্যকে ভেঙেই চলে তা নয়; তা একটা সুন্দরতর পূর্ণতার সঙ্গতিকেও সেই সঙ্গে গড়ে' তোলে। এই সুন্দরতর, পূর্ণতর সঙ্গতি জীবনের উপর আর্টের ছাপ দেওয়া থেকে লব্ধ নয়; তা সাহিত্যিকের সৌন্দর্য্য বোধের, কল্পনার বস্তু মাত্র নয় তা জীবনের মধ্যেই সত্য ও বাস্তব; এবং জীবনের উদ্দাম নিরাকারতা হ'তেও এই সামঞ্জস্য, সঙ্গতি গভীরতরভাবে সত্য। শিল্পী এই সামঞ্জস্যকে শুধু ধরতে চায়। এই সামঞ্জস্যের মূল নিছক কল্পনা নয়, তা জীবনেরই গভীরতর অনুভূতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিখ্যাত আইরিশ কবি ইয়েট্স তাঁর—Plays and Controversies'এর এক জায়গায় চমৎকার বলেছেন—"The subject of all art is passion, and a passion can only be contemplated when separated by itself, purified of all but itself and aroused into a perfect intensity by opposition with some other passion." কামনার অনুরাগ ও প্রেমের অনুরাগের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে, কামনার অনুরাগের আবিলতা, উদ্দামতার মধ্যে প্রেমের অনুরাগের যে শান্তি ও তৃপ্তির বীজ লুকান আছে, যে পরিণতির ইঙ্গিত আছে,—আর্টের এবং সাহিত্যের এই যে চরম আদর্শ এবং তার অন্তর্নিহিত যে বাস্তবতা তাকে সুন্দর ও সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথ রূপ দিতে চেয়েছেন। তাই এই উপন্যাসখানিতে বাস্তবতার যে গভীরতর রূপটা পাওয়া যায়, তা ইউরোপীয় সাহিত্য ধর্ম থেকে এতটা পৃথক এবং অভিনব যে তাকে ধরতে গেলে এর আখ্যান-অংশের সামান্যভাবে উল্লেখ করা দরকার

ননীবালার জীবনের যবনিকাপাতের কিছু আগে থেকে শচীশের জেঠামশাইয়ের মনে যে স্নেহের আবেগ ও তৃপ্তি উঁকি দিয়ে গেল, তার সম্পূর্ণতার অনুসরণেই শচীশের জীবন নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্ক সুরু হ'ল। যে হৃদয় এতদিন বুদ্ধির পর্ব্বতগুহায় আত্মগোপন করেছিল তা নারীর কল্যাণস্পর্শে নির্ঝরধারায়, বন্যার বেগে আত্মবিস্মৃতির জন্য ছুটে চলল। কিন্তু নারীর সঙ্গে তার যে পরিচয় তা ভাবের ঘোরের আচ্ছন্ন পরিচয়; সেখানে নারী ও বন্ধু সবই একটা idea মাত্র; নারীর মধ্যে সে নারীত্বকে পায় না, পায় এক বিশ্বরূপকে। তাই ননীবালার মধ্যে নারীর এক বিশ্বরূপ সে দেখল, অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করেছে। আর দামিনীর মধ্যে নারীর আর এক বিশ্বরূপ সে দেখল, যে আকর্ষণে দুর্ব্বার, কামনায় চঞ্চল, প্রাণরসে উজ্জ্বল। কিন্তু শচীশ দামিনীর এই মাধুর্য্যকেই দেখল, মহত্ত্বকে, নারীত্বকে দেখল না।

দামিনী এই উপেক্ষাকে কোনমতেই মেনে নিতে পারল না। শচীশের মনের তার প্রতি এই উদাসীন ভাব মোটেই সে সহ্য করতে পারল না। তাই যখন সমুদ্রের অন্তরে অন্তরীপে শান্তির কোলে শচীশ ও শ্রীবিলাস গুরুদেবের সঙ্গে এসে পড়ল, তখন দামিনী সঙ্গে থেকে সেই নির্জ্জনতার সুর ভেঙে দিতে বসল—এ সুরের সঙ্গে তার মনে ক্ষুব্ধ বাসনার যে চাপা কান্না গুমরে উঠছে তার কোন সঙ্গতি সে খুঁজে পায় না, পেতে ইচ্ছাও করে না। গিরিগুহার নিভৃত অন্ধকারে সে যেচে আপনাকে শচীশের চরণতলে সমর্পণ করতে চেয়েছিল, তখন শচীশ যে বুনো জন্তুর স্পর্শ ভেবে শিউরে পদাঘাত করেছিল, সেই বুনো জন্তুর মতই অন্ধকারমূর্ত্তি প্রণয়ের উত্তেজনা একান্ত নগ্নতায় বিভীষিকাময়। সে প্রণয় সংযমের কোন বাঁধ বা বাধা মানে না, মানতে চায় না। অসংযত দুর্ব্বার কামনা তার মনে পাথরের মত চেপে বসে' আছে। রসের ঢেউ তুলে সে পাথরগলানর চেষ্টা গুরুজির ও শিষ্যবর্গের তাই ব্যর্থ হ'ল। নারীকে বিঘ্ন ভেবে রসের স্বর্গলোক বাঁধবার এই যে সাধনা এ যে তার নারীত্বের অপমান। নিজে থেকে সেধে যে সে এই সাধনায় যোগ দেবে এমন প্রকৃতি তার নয়। আর যে সাধনা জীবন থেকে দূরে থাকতে চায়, সে সাধনার সঙ্গেও তার মনের কোন সহানুভূতি নেই। তাই সে এই অতি ঠুনকো শান্তির নীড়টাকে রূপের নির্ম্মম আকর্ষণে ভেঙে ফেলতে দ্বিধা করলে না।

'রূপকের সঙ্গে রূপের' এই বিরোধের ফলে যখন শচীশের ভাবের ঘোর অনেকটা কেটে গেল, তখন সে সাধনার গলদ বুঝে দামিনীকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে

আহবান করল। দামিনী এই আহবানের জন্যে যেন কান পেতে ছিল; কিন্তু এখন দামিনীর নারীত্বের দিকটা শচীশের কাছে এত স্পষ্ট করে' দেখা দেয় যে, গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ সমস্তই তার গোল হ'য়ে যায়। এখন দামিনীর কল্যাণবুদ্ধিই তাকে এই আত্মহত্যা থেকে মুক্তি দিল। সে জোড় হাত করে' শচীশকে বলল—প্রভু, আমাকে ঐ (রসের) রাক্ষসীর হাতে বলি দিও না; আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাতে পারেত সে তুমি। শচীশ বলল—বল আমি তোমার কি করতে পারি। দামিনী বলল—"তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও, যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিষ—যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইও না।" শচীশ দামিনীর কাছ থেকে নারীত্বের আহবানের বদলে সুন্দরের আহ্বান শুনে প্রকৃতিস্থ হ'ল। তার অন্তদৃষ্টি খুলে গেল; সে আপনারি মধ্যে সত্য, সুন্দর, কল্যাণের প্রকাশের জন্যে সহজের পথ ধরল। দামিনী নিজের প্রাণে প্রেমের, সুন্দরের অভিষেক লাভ করে' গৃহিণীর ধর্ম্মকে বরণ করলেও অর্দ্ধপথে অন্তর্হিত হ'য়ে সে "গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল শেষ পর্য্যন্ত দামিনী।"

এই পর্য্যন্ত হ'ল দুটী জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বন্দ্বের পরিণতির ইতিহাস। শচীশ প্রকৃতই জীবনের সত্যের সন্ধানী; বুদ্ধির মোহে পড়েও হৃদয়ের সাড়া তার নিস্তব্ধ হয়নি; আবার ভাবের ঘোরে 'বুঁদ' হ'য়েও বুদ্ধিবৃত্তি তার একেবারে পঙ্গু হয়নি; কারণ যতই হোক ভাবের মধ্যে এই মুক্তি যে অন্ধকারের মুক্তি, আলোকের নয়, তা সে অন্তরের সঙ্গেই জানে। তবে সে যা স্বীকার করে, তা একান্ত বিশ্বাসের সঙ্গেই স্বীকার করে। যে জীবন সে ছেড়ে যায়, তার সঙ্গে তার নূতন জীবনের কোন মিটমাট; রফা চলে না, কারণ এ জীবনের সঙ্গে সে জীবনের কোনখানেই মিল নেই। সেই সত্যের সন্ধান লাভ করে' সে বলল—"আমি বেশ করিয়া বুঝিয়াছি। তিনি রূপ ভালবাসেন তাই কেবলি রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচিনা, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাঁর লীলাবন্ধনে; আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝিনা বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।" এইভাবে হৃদয়ের ও বুদ্ধির, কামনার ও সাধনার যে চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্বে, আত্মবিস্মৃতিতে তার হৃদয় মন নিপীড়িত হচ্ছিল, একটা গভীরতর চেতনার স্পর্শে তার অবসান হ'ল, সে চেতনায় আত্মস্থতার বন্ধন নেই, আছে অসীম আনন্দের মুক্তি ও তৃপ্তি।

আর দামিনী—যখন প্রথম সে দেখা দিল তখন কিসের যেন অপূর্ণতার চাঞ্চল্যে বিহ্বল—সে অপূর্ণতা কি কামনার ধূলিতে অবলিপ্ত; না জীবনের ভালোমন্দের সংঘর্ষণে তিক্ত; না নিজের জীবনের বিস্তৃতির চিন্তায় উৎপীড়িত, তা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। তা Mona Lissa'র স্মিতহাস্যের মতই বিচিত্র ও রহস্যময়। তবুও দামিনীর চরিত্রের এমন একটা সবল নির্ভীকতা আছে, এমন একটা কামনার নিষ্ঠুরতা, আত্মহারা ভাব আছে; রূপের দিক দিয়ে, প্রাণোচ্ছ্বাসের দিক দিয়ে এমন একটা আত্মজাগ্রতের চমক আছে যে মনে হয়, সে যেন, আগুনের ফুলকী; জ্বলে ওঠে বুঝি, সবই জ্বালিয়ে দেয় বুঝি। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তার চোখে আগুন যত সহজে জ্বলে, জল তত সহজে পড়ে না, তাকে পদ্মপাতার উপরকার শিশির বিন্দুর সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

তার একান্ত বাসনা—সে শচীশকে, পৌরুষের মহিমায় পণ্ডিত শচীশকে আপনার করে' নেবে। কিন্তু সে দেখে, শচীশ সে পৌরুষের অবমাননা করে' আর একজনের দাস হ'য়ে বিচ্ছিন্ন ভাবের ঘোরে এতদূর তন্ময় যে তার নারীত্বের কোন মূল্যই তার কাছে আদায় করা যায় না। তার কামনা ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গের মত নিষ্ফল ক্রন্দনে আকুলিয়া ওঠে। সে নিজের অসুন্দরকে, কামনার নগ্নতাকে যতই চাপতে চেষ্টা করে; ততই বারে বারে প্রতিহত হ'য়ে ব্যর্থ হ'য়ে আপনার অক্ষমতাস্বীকারের দীনতায় কঠিন নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠে। তাই সে প্রিয়কে আপনার করবার জন্য আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চলল, কথায়, বাক্যে কার্য্যে যতদূর স্পষ্টভাবে পারল সে আঘাত দিতে পেছাল না। সে যেন রসের সঙ্গতির মাঝখানে মূর্ত্তিমান রসভঙ্গ। এরূপ করল, কারণ সে জানত, তার এ অসুন্দরকে সুন্দরে রূপান্তরিত করবার শক্তি তার

নেই, কিন্তু আর একজনের আছে, যার সরল, সুন্দর মুখশ্রীর একটু অনুগ্রহের চাহনি তার সমস্ত প্রেমের স্বপ্নকে সার্থক করে, বাঁচিয়ে তোলে—কামনার কলুষ সেখানকার বাতাসকে মলিন করতে পারে না। কিন্তু সে দেখে শচীশ তার প্রতি একান্তই উদাসীন; সুতরাং আঘাত করা ছাড়া তার আর উপায় ছিল না। আর এ আঘাত এ নিষ্ঠুরতাই হল তার তপস্যা। এই আঘাত করার তলে তলে যে গোপন অশ্রু সঞ্চিত হ'ল, যে ব্যথার ভারে হৃদয় কাতর, নিপীড়িত হ'ল তাহাই তার 'কামনার পাথরকে গলিয়ে প্রেমের সুধা-ধারায় তার মনকে পূত, নির্মল করে' তুলল। তাই সে কামনার স্তরে যতদিন ছিল, ততদিন যেন দ্বন্দ্বের শেষ নেই বিরাম নেই, যেন দুটী হৃদয়ের মিলনের কোন সন্ধানযোগ নেই। শেষে দু'জনেরই মিলন হ'ল প্রেমের নিবিড়, নিগূঢ় তৃপ্তিতে, যেখানে জীবনের সমগ্রতা প্রাণসম্পদে আপনাতে আপনি পূর্ণ। দামিনী আপনার শূন্য মন্দিরের দেবতাকে আপনার ক'রে পেল কামনাকে নিঃশেষে বলিদান দিয়ে; আর নিজে তার পূজারিণী হ'য়ে রইল প্রেমের, সৌন্দর্য্যের অনন্ত উপলব্ধিতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে।

একটা ঝড় ওঠবার সমস্ত পূর্ব্বসূচনা জানিয়ে উপন্যাস খানির আরম্ভ; ঝড়ের একটা উন্মত্ত আবেগ থেকে থেকে ঝাপটা দিয়ে এসে পড়ে'; কিন্তু উপন্যাসখানি শেষ হল এক সুবিমল আনন্দের প্রভাতের সঙ্গে যেখানে দামিনীর জীবনের অকস্মাৎ প্রয়াণও বিদায়ের অপূর্ণতায় কাঁদায় না; একটা উদার, শান্ত সুরের মাঝখানে সুন্দর হ'য়ে সমগ্র হ'য়ে সে ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটার মতই আমাদের অন্তরাকাশে মিলিয়ে যায়।

শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়

আগামী সংখ্যার বিচিত্রায়
সুপ্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজ বসু প্রণীত
নূতন ধরণের কৌতুক-নাট্য
বিবাহ এবং অতঃপর
অনাবিল হাস্যরসের অবিশ্রান্ত ধারা।

আলো

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

হতাশার অন্ধকারে নামিয়া গিয়াছি বহুদূর—
কোথা আর জীবনের আলো ?
পূতিগন্ধে ভরি' উঠে যৌবনের রচা মধুপুর—
সেথা নাই এতটুকু ভালো।
আঁখির তারকা আছে শুধু নাহি আলোকের শিখা—
কুঁড়ির কামনা কাঁদি' পায় নাই বুকে প্রাণলিখা,
প্রেমের পাপড়ি হ'তে মুছিয়াছে প্রণয়ের সুর—
শোণিত জমিয়া হয় কালো।

আমারে দিয়ো না উষা এতটুকু আলোকের ছোঁয়া—
শুধু মোরে দাও অভিশাপ,
রত্নাকর যোগ্য নহে লভিবারে নদী-করতোয়া—
তটিনী সহিবে কেন তাপ ?
ঘৃণায় ঘৃণায় মোর বুকে দেখ পড়িয়াছে চর—
বালুচরে তুমি আসি' বাঁধিয়োনা বেসাতির ঘর,
যাচিয়া কেন গো হেথা বৃথা দাও আপনারে খোয়া—
অন্ধকূপে আসিয়া কি লাভ ?

পাষাণ

স্বর্গীয় সুকুমার সান্যাল

যে আমার কাছে এসে স্পর্শ করে যায়,
কর্কশ কঙ্করকীর্ণ কঠিন এ কায়,
ভাবে বুঝি নিতান্ত পাষাণ করিয়া,
গড়িয়াছে বিধি মোরে,—নিরস এ হিয়া।
কখন বা দূরে থাকি দেখে যদি কেহ,
বন্ধুর পরুষ ধূম্র ধূসর এ দেহ।
তৃণতরুপুষ্পহীন,—ভাবে মনে মনে,
এরে সৃজিয়াছে বিধি কোন প্রয়োজনে ?
আমার হৃদয় হতে কত নির্ঝরিণী,
বহিতেছে নিরন্তন স্নেহ প্রবাহিণী।
আমাতে জনম লভি কত নদনদী
ধরণীর তপ্ত অঙ্গ করে নিরবধি।
শীতল সুফলপ্রসূ। তটনিবাসিরা
জানে তাকি ? —কভু মোরে দেখে নাই যারা।

পরিচয়

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া বৌদি' অমলকে প্রায় চমকাইয়া দিলেন। অজ্ঞাত অশুভ আশঙ্কায় মুখখানি তাঁহার মৃতের মত বিবর্ণ, পূজা করিতে করিতে উঠিয়া আসিয়াছেন,—গরদের শাড়ীখানা ভালো করিয়া সামলাইয়া লইবারও অপেক্ষা সহে নাই।

তাঁহার পদশব্দে চিঠি লেখা থামাইয়া অমল মুখ তুলিয়া চাহিতেই বৌদি' ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে এক নিশ্বাসে বলিয়া গেলেন,—ঠাকুরপো, দু'বন্ধুতে তোমরা একবারটি দেখে এস ত' ভাই, বেবিটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না;—কোথায় যে গেল মেয়েটা;—লিলি বলছে সে তাকে নদীর ধারে খেলা করতে দেখে পাশে ওই ডক্টর ঘোষেদের বাড়ী গিয়েছিল ফিরে এসে আর দেখতে পাচ্চে না;—লিলিও খুঁজতে গেছে চাকরটাকেও পাঠিয়েছি; তোমরা ছুটিতে এক্ষুণি একবার—

অমল পাঁচ ছয়দিন হইল বৌদি'র কাছে আসিয়াছে তাঁহাকে কখনও এরূপ উত্তেজিত, উদ্বেগে এরূপ ব্যাকুল হইতে দেখে নাই। উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রাচুর্য্যে চপল ফেনোচ্ছল ঝরণার মতই চিরচঞ্চল তিনি। তাঁহার বাক্য-স্রোতে বাধা দিয়াই সে উঠিয়া পড়িল। আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গীতে বলিল,—আচ্ছা, আমি এক্ষুণি সুপ্রকাশকে নিয়ে তোমার বেবিকে খুঁজে বা'র করছি দেখ না; কোথায় আর যাবে সে, এইখানেই কাছাকাছি কোথাও আছে বোধ হয়।

—তাই হোক্ ভাই, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক;—ভাবনায় হাত পা যেন আর আমার আসছে না।...সেদিন বাগ্দীদের মেয়েটা যা করে' জলে ডুবে—

—যত সব অলক্ষুণে কথা তোমার; বলিয়া অমল সুপ্রকাশকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

ব্যাপারটা প্রথমে খুব সহজ বলিয়াই মনে হইয়াছিল বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সে ধারণা আর রহিল না। তাহারা দুই জনে নদীর ধারে ধারে বহুক্ষণ ঘুরিল, পথে যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই বেবির নির্দ্দেশ দিতে পারিল না। বাজারের দিকে গিয়াও খোঁজ করা হইয়াছে, কালীবাড়ীতে গিয়া দেখিতেও বাকী নাই, কিন্তু সমস্তই পণ্ডশ্রম।

বেবির হদিস্ মিলিল না।

বৌদি' হয়ত' এতক্ষণ অধৈর্য্য হইয়া ঘর বাহির করিতেছেন, কিম্বা হয় ত' পা ছড়াইয়া বসিয়া কাঁদিতেই সুরু করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব জানিতে অমলের আর বাকী নাই। এম্নি তিনি খুব আমুদে লোক, কিন্তু সংসারে অতি সামান্য বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখ কিছু একটা হইলে হয়, তখন বৌদিকে সান্ত্বনা দেওয়া সহজ নহে।

এমন অবস্থায় বাসায় ফিরিয়া বৌদিকে কি বলিয়া বুঝাইবে ভাবিয়া সে চিন্তিত হইয়া পড়িল।

কিন্তু উপায়ান্তর নাই। ঘণ্টাখানিক ঘোরাঘুরি করিয়া ম্লানমুখে ঘর্ম্মাক্তদেহে বাসায় শেষে ফিরিতেই হইল। দেখিয়া বিস্মিত ও নিশ্চিন্ত হইল সদর দরজার সম্মুখে সিঁড়ির উপর বসিয়া বেবি একখানা পুরা এগার ইঞ্চি ইট বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া অপরূপ ভঙ্গীতে দুলিয়া দুলিয়া সুর করিয়া ছড়া কাটিতেছে,—খোকন সোনা চাঁদের কোণা একরত্তি ছেলে,...

মাঝে মাঝে তাহার সেই কল্পিত "খোকন"কে চুম্বন করিয়া মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেও ভুলিতেছে না। তাহাকে কিছু আর না বলিয়া তাহারা ভিতরে চলিয়া গেল।

বৌদি তখন গ্রামোফোনে রেকর্ড চড়াইয়াছেন। ক্ষণ পূর্ব্বের তাঁহার সেই শঙ্কাপাণ্ডুর মুখে নিশ্চিন্ত প্রসন্নতার একটি লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কে বলিবে যে অনতিকাল পূর্ব্বে

ইনিই হৃতশাবক বন-হরিণীর মত ব্যাকুল নয়নের চঞ্চলদৃষ্টিতে বেবিকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন।

সুপ্রকাশই প্রথম কথা কহিল।—আপনার কন্যাবত্নটি ত' দেখছি ইতিমধ্যে ফিরে এসে আপনার নাতিকে ঘুম পাড়াতে বিশেষ ব্যস্ত; আর আপনিও বোধ হয় ভুলে গেছেন আমরা নদীর ধারে হাওয়া খেতে যাই নি। বলিয়া সে অমলের দিকে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

বৌদির সত্যই স্মরণ ছিল না, তিনি ইহাদের দুইজনকে বেবীর খোঁজে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি গ্রামোফোন বন্ধ করিয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—সত্যি, বেবীকে অনেকক্ষণ হ'ল পাওয়া গেছে, কোথাও যায়নি সে, ও পাশের গুদোম ঘরটার মধ্যে বসে' বসে' খেলা করছিল।—আপনারা যে সেই থেকে রোদে রোদে ঘুরছেন সে কি আর ছাই আমার মনে আছে, পোড়া মন আমার অম্‌নিই। আপনি আমার ওপর রাগ করলেন নাকি?

সুপ্রকাশকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া অমলই বলিল,—সে রাগ পেটে কিছু না পড়লে আমাদের যাবে না বৌদি; সকাল থেকে খালিপেটে—

তাহার বাক্য শেষ হবার পূর্ব্বেই বৌদি বামুন ঠাকুরকে ডাকিয়া বকাবকি সুরু করিয়া দিলেন,—সে কেন এত বেলা পর্য্যন্ত বাবুদের জলখাবার দেয় নাই।

ঘরটির নীচেই অনতিপরিসর চর; বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে স্থানে স্থানে দীর্ঘবক্ররেখাকারে ফাটিয়া গিয়াছে।… সম্মুখে নদীর জল কল-কল ছল-ছল করিয়া বহিয়া চলে। নদীর বুকে এখানে ওখানে ছোট ছোট পাল-তোলা নৌকা আকাশ বক্ষে ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল লঘুপক্ষ হংসের মত ধীর গতিতে চলিতে থাকে। অদূরে নদীর বাঁকের মুখে যেখানটায় ভাঙন ধরিয়াছে, ঠিক তাহারই উপরে একখানি টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর,…একপাশের কতকটা টিন উড়িয়া গিয়াছে,… দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় দীর্ঘকালের আশ্রয়, বহু সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত ঘরটির মায়া কাটাইয়া বাসিন্দারা চলিয়া গিয়াছে। হয়ত' অদূর ভবিষ্যতেই ঘরটিকে নদী গ্রাস করিবে। কত ঘর কত ইমারত যে ইহার পূর্ব্বে রাক্ষসীর কবলে গিয়াছে, তবু তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই। পূর্ব্বে এই নদীর ধার দিয়া সমান্তরালভাবে একটি চমৎকার সুপরিসর সরকারী পাকা রাস্তা ছিল, এখন তাহার চিহ্নও নাই। সাবেককালের সিভিল কোর্টও এখন নদীগর্ভে।…

সুপ্রকাশ একাকী জানালার ধারাটিতে বসিয়া তাহার কৌতূহলী দৃষ্টি নদীবক্ষে প্রসারিত করিয়া তন্ময় হইয়া থাকে। জগতের সমস্ত কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া নিরালয়ে বসিয়া নদীপারে যেখানে ঐ শ্যামল শস্যক্ষেত্রের অনতিস্পষ্ট আভাস এক অনির্ব্বচনীয় কল্পলোকের মত চিত্তের গভীরতম অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করে, সেইদিকে চাহিয়া জাগ্রতস্বপ্নের জাল বুনিয়া চলিতে সে ভালবাসে।…ওপারে শস্যক্ষেত্রের শ্যামল সঙ্কেত, এপারে ক্রমবর্দ্ধমান আবর্ত্তসঙ্কুল জলস্রোত, মধ্যে গর্জ্জমান প্রবাহিনী, ইহা হইতে সে মানবজীবনের একটা রূপক দাঁড় করাইতে চেষ্টা করে।

সহসা দু'টি কচি কচি কোমল হাতে পিছন হইতে কে চোখ টিপিয়া ধরে। সুপ্রকাশ বলে,—কে ব'লব?.. শেফালি; বলিয়া ধীরে ধীরে চোখের উপর হইতে হাত দুইটি সরাইয়া দেয়!

—বারে, শেফালি আবার কে? আমার নামত' লিলি।

—না, লিলি ভাল নাম নয়, আমি তোমায় ডা'কব শেফালি বলে'।

লিলি খুসীর আনন্দে খিল খিল করিয়া হাসিতে থাকে।

—বেশ, তা হ'লে, তাই ডাকবেন; ভালই ত' আমার দুটো নাম হ'ল, বেবির মোটে একটা।…কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলে,—কাকাবাবু, বাবা আমায় একটা কেমন ভালো ছবির বই এনে দিয়েছেন, দেখবেন? দাঁড়ান নিয়ে আসছি; বলিতে বলিতেই অদৃশ্য হইয়া যায়।

সুপ্রকাশ উন্মনা হইয়া বসিয়া থাকে।…ছোট্ট মেয়ে দুইটি, এই কয়দিনেই কি যেন যাদু করিয়াছে তাহারা। তাহাদের সরল ব্যবহারে, নিটোল স্বাস্থ্যে, শিশুসুলভ দেহ-লাবণ্যে সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়।..অমলের বৌদি'টিও চমৎকার লোক। কী সপ্রতিভ অকুণ্ঠ তাহার ব্যবহার; কত সহজে তিনি পরকে আপন করিয়া লইতে পারেন।

বিনয় অথবা লজ্জার অতিরিক্ততায় তিনি আড়ষ্ট নহেন। তাহারা দুই চার দিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছে; কি করিয়া তিনি এই কয়টি দিন তাহাদের মুহূর্ত্তগুলি আনন্দরসের মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া তুলিবেন, সে বিষয়ে সর্ব্বদাই সচেতন।

—আপনি সর্ব্বদা মুখ অমন গম্ভীর করে' একলাটী বসে' বসে' নদীর দিকে কি দেখেন বলুন ত'? বলিতে বলিতে বৌদি স্মিতমুখে ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার পশ্চাতে অমল, লিলি ও বেবি।

অমল পরিহাস করিয়া বলে,—কবি মানুষ, বৌদি, এটা বুঝলে না; ওর জড় শরীরটা দেখছ এখানে কিন্তু ওর মন এখন হয়ত' কত নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত পার হ'য়ে—

লিলি সমস্ত কথা ঠিক বুঝিতে পারে না, তবু খিল খিল করিয়া হাসিতে থাকে।

বৌদি বলেন,—সত্যি, আপনি কি রকম অন্যমনস্ক মানুষ? ঘরে বসে রয়েছেন, অথচ এদিকের জানলাটা দিয়ে বিষ্টির ছাট এসে ঘর যে ভেসে যাচ্ছে, সেটাও দেখেন নি! লিলি, দে ত' জালনাটা বন্ধ করে'।

সুপ্রকাশ অপ্রতিভ হইয়া হাসিতে থাকে। সত্যি, আমি জানিই না যে বাইরে এমন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে' গেছে।

অমল বলিল, সে আমি বুঝেছি; সেবার কি হয়েছিল জাননা বুঝি বৌদি? ভীষণ বিষ্টি হ'চ্ছে, এমন সময়ে ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে হাজির; জামা কাপড় সব ভিজে গেছে। আমি বললাম, ছাতা থাকতেও এত ভিজলি কি করে? বললে, কই? বলেই নিজের হাতের ছাতার দিকে লক্ষ্য করে' হেসে ফেললে; বললে, মাইরি আমার একদম খেয়ালই হয়নি।

বৌদির হাসিতে হাসিতে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম। হাসি থামিলে বলিলেন, সত্যি, আপনি কি বলুন ত'?

সুপ্রকাশও হাসিতে থাকে। বলে, সে আমি যাই হই বৌদি; কিন্তু আমাকে "আপনি" বলা ছেড়ে "তুমি" বলে ডাকতে পারলেন না এখনও; দূরে ঠেলেই রাখলেন।

বৌদি কথার জবাব দিবার পূর্ব্বেই প্রমোদ বাবু পান চিবাইতে চিবাইতে ঘরে ঢুকিলেন। বৌদির দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, কি হ'চ্ছে তোমাদের? বলিয়া সস্মিত-মুখে সুপ্রকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন।

বড় চমৎকার লোক অমলের দাদা এই প্রমোদবাবু। পোষ্টমাষ্টারি করেন, মাহিনাও পান মন্দ নহে, বেশ খাতিরও আছে। অথচ তাঁহার ব্যবহারে আত্মম্ভরিতার গন্ধও নাই। বেশ সরল, শান্তিপ্রিয়, সদাহাস্যময় পুরুষ

বৌদি' বলিলেন, তুমি বেরোচ্ছো?...আজ কিন্তু একটু সকাল সকাল আসতে চেষ্টা কোরো, বুঝলে?... রথতলায় আজ মস্ত মেলা বসবে, আমরা বিকেলের দিকে দেখতে যাব।

তা' বেশ ত,' যেও না।...মেল ষ্টীমারটা গেলেই আমি আ'সব'খন।

তোমার আসতে দেরী দেখলে আমরা কিন্তু বেরিয়ে পড়ব; বাড়ীতে ভজুয়া আর মিশির থাকবে'খন।

কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া উন্মুক্ত দরজার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বৌদি' বলিলেন, বিষ্টিটা একটু থামলেই না হয় বের হ'তে;...ভিজে ভিজে শেষে কি একটা অসুখ বিসুখ বাঁধাবে, আমার সেই ভয় হয়।

বিষ্টি ত' এখন থামবার লক্ষণ দেখছি না;...আর ভারি ত' পাঁচমিনিটের পথ; বলিতে বলিতেই তিনি ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

বৌদি কিছুক্ষণ উদাসদৃষ্টিতে তাঁহার গতিপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে রাস্তার মোড়ে তাঁহার মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেলে লিলিকে বলিলেন, লিলি, বেশ বর্ষা নেমেছে, হারমোনিয়ামটা আমি আনিয়ে দিচ্ছি, সেই নতুন গানটা তোমার কাকাদের শুনিয়ে দাও ত' মা;...সেই যে সেই "ঝর ঝর বরিষণে"।

লিলিও তাহাই চাহে। সুতরাং এ বিষয়ে তাহার আপত্তি হইবার কথা নহে। ভজুয়া হারমোনিয়াম দিয়া গেল। এইবার গান আরম্ভ হইবে।

বৌদি' বলিলেন, লিলি, যা ত', আগে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে' দিয়ে আয় ত'।

লিলি উঠিয়া গেল। দরজা বন্ধ করিতে গিয়া দেখে সাঁওতালদের একটা নয় দশ বছরের মেয়ে জড় সড় হইয়া

দরজার পাশে দেওয়ালের সঙ্গে যেন মিশিয়া অতি সন্তর্পণে বৃষ্টির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। তাহার মলিন বস্ত্রখানা ভিজিতে কোথাও আর বড় বাকী নাই; মাথার চুল দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিতেছে।

লিলির কোমল বালিকাচিত্ত ব্যথিত হইল। বলিল—মা, এখানে একটা সাঁওতালদের মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে।···পরে গলা একটু নামাইয়া বলিল, ওকে ভেতরে এসে দাঁড়াতে ব'লব?

মা'র চোখমুখের ভঙ্গী দেখিয়া তাহার সমস্ত উৎসাহ মুহূর্তে নিবিয়া গেল।—না, না, তোমার যে মা, সব তাতে দেখছি বাড়াবাড়ি; নাও, দরজাটা বন্ধ করে' এসে বোসে দিকিন্ এখানে।

লিলি মেয়েটার মুখের দিকে একবার চাহিয়া সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া মা'র কাছে আসিয়া বসিয়া পড়ে।

মা মেয়েকে বলিলেন,—নাও, এবার গাও দিকিন। লিলি হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান ধরিল।

দেখিতে দেখিতে কন্যার গর্ব্বে মাতার মুখ গৌরব-দীপ্ত হইয়া উঠে।

কিন্তু সেই আর্দ্রবসনা শীতার্ত্তা নিরাশ্রয়া মেয়েটির বেদনা অনুভব করিয়া সুপ্রকাশের মন টনটন করিতে থাকে। একের দুঃখে অপরের কী নিদারুণ ঔদাসীন্য! মানুষের দুঃখে মানুষের অন্তর তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে না। বৌদি স্বচ্ছন্দে তাঁহার সুখনীড়ের আনন্দপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দেন।

* * * * * * *

গান যখন থামিল, সুপ্রকাশের মনে হইল, যেন বেদনার একটি রহস্যে গৃহের ভিতরটা থম্‌থম্ করিতেছে।...

রৌদ্র পড়িতে না পড়িতে সকলে মেলায় গিয়া হাজির।

বৌদির উৎসাহের আর সীমা নাই।

—চলুন না, ঐ নাগরদোলায় চড়া যাক;···চড়বেন? কত লোক ত' চড়ছে।

সুপ্রকাশ রাজি নহে। বলে,—না, বৌদি, ওতে চ'ড়লে আমার বুক ধড়ফড় করে; জীবনে একবার চড়েছিলাম, বাব্বা, সে কথা কখনও ভু'লব না,—উঃ!

তাহার কথা বলার রকম দেখিয়া সকলে হাসিতে থাকে।

—তবে ঠাকুরপো, চল, আমরা চারজনেই উঠি;—উনি এখানে দাঁড়িয়ে দেখুন;—কি বল?...বেশ বন্দুটি করেছিলে যা হোক্।

চারিজনে গিয়া নাগরদোলায় উঠে।

বৌদির স্ফূর্ত্তি আর ধরে না। তাঁহার আনন্দ বয়সের বাধা লঙ্ঘন করিয়া মেয়েদের আনন্দকেও যেন ছাড়াইয়া যায়।

সুপ্রকাশ চাহিয়া চাহিয়া দেখে;···মন তাহার অকারণে উদাস হইয়া যায়। এক একজন লোক থাকে, আনন্দময় পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই তাহাদের বেশ শোভা পায়, দুঃখ দৈন্যের মধ্যে তাহাদের খাপছাড়া লাগে। বৌদিও যেন সেই পর্য্যায়ের। শোক দুঃখ অভাব অনটনের আবহাওয়া তাঁহার সহ্য হয় না। অনন্তপ্রবহমান বিভিন্নমুখী আনন্দস্রোতে তিনি নিয়তই ভাসিতে চাহেন।

নাগরদোলা হইতে নামিয়া বৌদি আসিয়া বলেন,—চলুন, ঐ দিকটায় যাওয়া যাক্।

আবার মেলা পরিক্রমণ সুরু হয়।

এখানে ওখানে চালা ছাউনির তলায় দোকান বসিয়াছে। ওদিকে একটা কাঠের পাটাতনের উপর সারি সারি কাঁচের গেলাসে নানা রঙের সরবৎ সাজাইয়া দোকানী অদ্ভুত সুরে খরিদ্দার ডাকিতেছে। আর একদিকে একটা ছাউনির নীচে কেরোসিনকাঠের বাক্সে কাঠের গুঁড়ি চাপা দেওয়া বরফ বিক্রয় হইতেছে; ছেলেরা লোলুপ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া আছে, বরফ এদেশে দুষ্প্রাপ্য বিলাস-সামগ্রী বলিয়া। একটা বট-গাছের তলায় বড় বড় থালার মত তেলে-ভাজা পাঁপর বিক্রয় হইতেছে; গ্রাম্য বালকবালিকারা অনেকেই এক একখানা হাতে লইয়া পরম তৃপ্তিভরে আহারে ব্যস্ত। ভদ্রলোকের ভিড় বেশী হইয়াছে পুতুলের দিকে। আর নানারকমের পুতুলই আসিয়াছে বেশী।

যেখানেই ছেলেদের খেলনা দেখে, সুপ্রকাশ লিলি ও বেবিকে কিনিয়া দেয়;—মাটির ছোট ছোট হাঁড়ি, কলসী,

পুতুল, কাগজের ফুল, তালপাতার সেপাই আরও অনেক কিছু।

বৌদি' অনুযোগ করিয়া বলেন,—ও আপনি কি করছেন মিছিমিছি,...এ আপনার ভারি অন্যায়,...উনি দেখলে কিন্তু ভারি......

সুপ্রকাশ বাধা দিয়া অল্প কথায় বলে,—তা হোক্।

ফিরিবার পথে স্বামিজীর আশ্রম। সুপ্রকাশ বলে,—বেশ আশ্রমটি ত', চলুন না, দেখে আসা যাক্; যবার সময়ে ত' লক্ষ্য করি নি'।

—আপনার যত ঐ সব; কোথায় আশ্রম, কোথায় হাঁসপাতাল;—ভালও ত' লাগে আপনার?...আমার কিন্তু এই আশ্রম আর ঐ গেরুয়াধারী সন্নেসীগুলোকে দেখলে ভারি রাগ হয়।

অমল একটু শ্লেষ দিয়া বলে,—কেন?...সন্নেসীগুলো কি ক্ষতি করলে তোমার বৌদি'?...চাঁদা চাইতে গিয়েছিলো, তাও ত' শুনেছি, দাদাকে দিতে দাও নি'।

উত্তেজনায় ও বিরক্তিতে বৌদি'র মুখ রক্তাভ হইয়া উঠে।—ক্ষতি আমার না করুক ঠাকুরপো, কিন্তু এই যে সব ছেলেদের এখন থেকেই মোহমুদ্গর পড়িয়ে, কাঁচকলাভাতে ভাত খাইয়ে পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে' রাখছে, এতে কি তা'দের ক্ষতি হ'চ্চেনা?

অমল ও সুপ্রকাশ পরস্পরের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে থাকে। কাজ নাই আর আশ্রম দেখিয়া বৌদির মেজাজ এখন ভাল হইলে হয়।

মেলা দেখিয়া যাহারা ফিরিতেছে, তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও রাস্তাটি অপ্রশস্ত বলিয়া ভিড় ঠেলিয়া যাইতে হয়। বেবি ও লিলি আগে আগে চলিয়াছে,—খেলনাগুলি সযত্নে বুকের উপর দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া। নিজের আনন্দেই মশগুল তাহারা।

একটু দৃষ্টির অন্তরাল হইলেই বৌদি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। বলেন, মেয়ে দুটো কই, ঠাকুরপো?...দেখ না ভাই, একবার।

অমল তাহাদের নাম করিয়া ডাক দেয়। তাহারা আসিয়া একজন অমলের একজন সুপ্রকাশের পাশে পাশে চলিতে থাকে।

সহসা সুপ্রকাশ সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলে, দেখ, দেখ, অমল, একজন মেয়েমানুষ কি রকম ছুটতে ছুটতে আসছে!

অমল চাহিয়া দেখে সত্যই একটি প্রৌঢ়া, বিধবা রোরুদ্যমানা, গ্রাম্য স্ত্রীলোক বিপরীত দিক হইতে জনস্রোত ভেদ করিতে করিতে ব্যস্ত সন্ত্রস্তভাবে আগাইয়া আসিতেছে। স্খলিতগুণ্ঠ মস্তকের রুক্ষ বিপর্য্যস্ত চুল বাতাসে উড়িতেছে, বিস্রস্ত অঞ্চল মাটিতে লুটাইতেছে, তাহার হুঁস নাই।

সে বৌদির পাশ দিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতেই বৌদি বিরক্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'আঃ মর মাগী, চোখের মাথা খেয়েছিস্ নাকি? ঘাড়ের ওপর দিয়েই চলে' গেল;...গা'য়ের গন্ধে ভূত পালায়, মা গো!

এই সময়ে কৌতূহলী পথিকদের অনেকেই পরস্পরের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। একজন বলিল, কি হয়েছে, কি?

আর একজন কে উত্তর দিল—বলছে ত' ব্যাটা হারিয়েছে।

অনেকে সহানুভূতিসূচক মন্তব্য করিল। তাহার পর সকলেই আবার গন্তব্য পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

কথার সূত্র ধরিয়া বৌদি চাপাগলায় বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, ব্যাটা হা'রিয়েছে…হারাবে না ত' কি?...ছোটলোকের ছেলে, মেলায় স্ফূর্ত্তি করতে যাওয়া কেন?...নিজের ছেলেকে যে মা নজরে নজরে রাখতে না পা'রে, তা'র ত' অমন হবেই।·· যেমন মায়ের বুদ্ধি।...বলিতে বলিতে ঘৃণায় ও বিরক্তিতে তাঁহার মুখের রেখাগুলি কঠিন ও ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সুপ্রকাশ নির্ব্বাক। বৌদির দিকে অপাঙ্গে চাহিতেও যেন তাহার সাহসে কুলাইতেছেনা। তাঁহার প্রখর আত্মমর্য্যাদাবোধে আঘাত লাগিয়াছে। দুঃখমেব বাঁধ ভাঙিয়া বুকের হলাহল মুখ দিয়া নিঃসৃত হইয়া পড়িয়াছে। কত অল্প পরিচয়ের মধ্য দিয়া মানুষের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রথম প্রথম সে বৌদিকে ভুল বুঝিয়াছিল। অতি তুচ্ছ দুই চারিটা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তাঁহার আসল নিরাবরণ

মূর্ত্তি স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি নিজের সংসারের ক্ষুদ্র পরিধিটুকুর চারিধারে সীমারেখা টানিয়া নিজের স্বতন্ত্র পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। বাহিরের বৃহত্তর পৃথিবীর দুঃখ দৈন্যের সহিত তাঁহার হৃদয়ের কোন যোগ বা সহানুভূতি নাই। সেখানে তিনি রূঢ়, নির্ম্মম, কঠোর। তাঁহার সংসারে আনন্দরস সঞ্চার করাতেই মাত্র বাহিরের পৃথিবীর সার্থকতা। তিনি দুঃখ-দারিদ্র্যের, বিরহ-বেদনার ছায়া এড়াইয়া চলেন, অথচ নিজ পরিবারে উহাদের সম্ভাবনা মাত্রেই নিদারুণ আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া পড়েন। এককথায় তিনি আত্মসুখী মানুষ; "আত্ম" অর্থে স্বামী, সন্তান ও স্বয়ং।

অমলের স্তব্ধতা আর ভাল লাগিল না। কত লোক মেলা দেখিয়া কলরব করিতে করিতে ফিরিতেছে,—হাসিতে গল্পে রাস্তা মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অথচ, এ তাহাদের কি হইল! তিনজনে পাশাপাশি চলিয়াছে, কাহারও মুখে কথা নাই। বুঝিল, একটা কিছু কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন। বলিল, বৌদি, বেলা এখন কত হ'ল বলতে পার?

—তা' বেলা গেছে বৈ কি; ঐ দেখ, আমার আবার মনে ছিল না, ভাগ্যিস্ বললে তাই মনে প'ড়ল। পোষ্ট-আফিসের কেরাণী বাবুর মেয়েটা দশ বার দিন হ'ল জ্বরে ভুগছে, একদিন্ না দেখতে গেলে ভাল দেখায় না। আজ একবারটি যা'ব মনে করেছিলাম;—একটু পা' চালিয়ে চল ত' ভাই।

তাহারা ভিড় কাটাইয়া দ্রুততর চলিতে থাকে। সুপ্রকাশ বলে,—আচ্ছা বৌদি, কলকাতার অত আমোদ প্রমোদ লোকজনের মধ্যে থেকে এখানে এসে আপনার কষ্ট হয় না?

বৌদি সহাস্যে বলেন,—হোতো বৈ কি; প্রথম প্রথম প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠত, মন চব্বিশঘণ্টা ভারি খারাপ হ'য়ে থাকত; এখন কিন্তু মন্দ লাগে না। সকলের সঙ্গেই ভাব হ'য়ে গেছে; ডক্টর ঘোষের বউ, মুন্সেফ অবনীবাবুর স্ত্রী, ডেপুটি সাহেবের স্ত্রী সবাই আমাদের বাসায় যান, আমিও তাঁদের বাসায় যাই; গান বাজনা, খাওয়া দাওয়ায় সময়টা বেশ ভালই কাটে। পরে অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া বলেন, একটু আমোদ আহ্লাদ না হ'লে মানুষ কখনও বাঁচে? গম্ভীর মুখে চুপচাপ মুখ টিপে বসে থাকলে, আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসে।

রাস্তার মোড় ঘুরিতেই বাঁহাতি দ্বিতীয় বাড়ীখানি দেখিয়া সুপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করে, এটা কা'দের বাড়ী বৌদি? চমৎকার ছবির মতন বাড়ী খানি ত'? আবার বাগানের সখও আছে দেখছি।...বেশ সৌখীন লোক বোধ হয়, না?

বৌদি উৎসাহভরে বলেন, এটা ডেপুটি সাহেবের কোয়ার্টার।...ঐ শুনুন, ওঁর বউ বোধ হয় অর্গান বাজাচ্চে;...শুনতে পাচ্চেন না? খাসা লোক, ভারি আমুদে, আমার সঙ্গে খুব ভাব। পরে অমলের দিকে চাহিয়া বলেন, ঠাকুর-পো, ঐ গেটের পাশের ছোট ঘরটায় ওদের চাকর থাকে, একবারটি ওকে বলে' ভেতরে খবর দেওয়াতে পারবে?

—তা পার'ব না কেন? কিন্তু তোমার দেরী হ'য়ে যাবে না? এই যে বলছিলে কা'র অসুখ দেখতে যাবে?

সে আর একদিন যা'ব খন।

ভৃত্য মারফৎ অন্দর হইতে ডেপুটিগৃহিণীর আহ্বান আসিতেই বৌদি' লিলি ও বেবিকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে সুপ্রকাশকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কিছু মনে করবেন না যেন যে বৌদি ভাবের লোক পেয়ে আমাদের একলা ছেড়ে দিলে।

সুপ্রকাশ কুণ্ঠিতভাবে শুধু বলিল, না। কিন্তু পথ চলিতে চলিতে সে ভাবিয়া দেখে প্রথম পরিচয়ের পর কল্পনায় বৌদিকে যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছিল, এখন তিনি সেখান হইতে বিচ্যুত ও ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন যেন। সহসা সে অকারণে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। মনে হয়, বিবর্ণ, ধূসর, হতশ্রী আকাশ প্রখর নিষ্করুণ দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছে।

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

শুভলগ্ন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

জীবনের শুভলগ্ন কতবার আসে, চলে যায়
রেখে যায় চিহ্ন হৃদিপাতে।
সসীম একদা কবে মিশে যায় দূর অসীমায়
সকলই ফুরায় এক রাতে।
নীরব বীণার বুকে ঢিলা ছিল সব তারগুলি
সুর দেয় একটী আঘাতে,
নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষ স্রোতের আঘাতে উঠে ফুলি,—
ক্ষুদ্র ফুল ভেসে যায় তাতে।

বসন্তের নীলাকাশে অকস্মাৎ মেঘ ছেয়ে আসে,
অকস্মাৎ চাঁদিমা লুকায়,
ঝড়ের নর্ত্তন জাগে,—ভয়ঙ্করী কালী শুধু হাসে,
কুসুমের সুবাস শুকায়।
ভেঙ্গে পড়ে সৌধমালা,—হাহাকার জাগে চারিদিকে
নেয়ে প্রাণপণে তরী বায়,
কূল কোথা? কোনদিকে চেয়ে থা'কে হায় অনিমিখে
তরী ছুটে কোন দিকে ধায়।

কত এল মধুনিশি, কত যে প্রভাত হল গত,
জীবনের শুভলগ্ন যায়,
জীবনের পথ বেয়ে পান্থ এলো কত শত শত,
চলে গেছে চাহিয়া আমায়।
সসীমে অসীম হল ;—কত হাসি নয়নের জল
ঝরে ঝরে পড়িল ধরায়,
কত ধ্বংস সৃষ্টি হল, কেটে গেল পল অনুপল,
দণ্ড মেশে প্রহরের গায়।

দিন যায় দিন যায়,—স্বপনেও জানিনি—কখন
সে শুভ লগন এলো পাশে,
চমকিয়া উঠি,—দেখি চলে গেছে সভি অযতন,
দূরে—বহুদূরে কে বা হাসে।
আবার অজ্ঞাতসারে কখন আসিয়া যাবে চলে,
চিহ্ন রবে ধূলাপরে—ঘাসে,
আসার আশায় যাবে সুকঠিন দিনগুলো গলে—
থাকিব চাহিয়া তারি আশে।

অন্তঃসলিলা

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক শীল

হাড়কাঁপান মাঘের শুক্লা-ত্রয়োদশীর সিক্তসন্ধ্যা এক অপূর্ব্ব মাদকতা লইয়া নিশাকরের চক্ষে নূতন রঙে রাঙিয়া উঠিল।

দিনাজপুর সহরের শেষ উপকণ্ঠে যেখানে লোকের বসতি ম্লান হইয়া আসিয়াছে, তাহারই একটী নির্জ্জন প্রান্তরে মেটে খোলায় ছাওয়া তাহাদের প্রাচীন কুটীরখানি দীন পূজারিণীর বেশে তন্দ্রাজড়িত চোখে আজো দাঁড়াইয়া আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রচণ্ড ভূকম্পে কুটীরখানির উপর অনেক কঠিন হস্তক্ষেপ হইয়া গিয়াছে। তাহার চিহ্ন শুধু এই একখানি কুটীরে নয়, সহরের প্রায় প্রত্যেক পাকা বাড়ীর বুকে স্পষ্ট ফুটিয়া আছে। ভিতর মহলের ঘরগুলির দেওয়াল খসিয়া পড়িয়া বাসের অযোগ্য হইয়াছে। শুধু বাহির বাড়ীতে করগেট-শেড-ঢাকা অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র কুটীরখানি প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলার পাষাণ হস্ত হইতে অতিকষ্টে অব্যাহতি পাইয়াছে। এই ঘরখানি অভ্যাগতদের জন্য ব্যবহৃত হয়। ঘরের বাহিরের খোলা স্থানটুকু নানাবিধ ফুল ও ফলের গাছে সাজান। শেডের উপর বিলাতী হানি-সাক্‌ল্ গাছে কমলা লেবু রঙএর থোকা থোকা পুষ্পগুচ্ছ মায়াজাল বুনিয়া রাখিয়াছে।

কিছু পূর্ব্বে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। টেবিলের উপর ছোট টেব্‌ল্‌-ল্যাম্পটি মিট্‌-মিট্‌ করিয়া জলিতেছে। আজ কয়টী চিন্তা একত্র জট্‌ পাকাইয়া নিশাকরের কৈশোর মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। সন্তপ্রকাশিত চাঁদের আলোয় ঘরখানি আজ তাহার চোখে এক অভিনব মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হানি-সাক্‌ল্‌ এর ঐন্দ্রজালিক গুচ্ছগুলি চাঁদকে লক্ষ্য করিয়া যেন প্রেমমাখা হাসিতে বলিতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয় হইয়া গেলেও আমরা এইভাবেই পরস্পর চাহিয়া থাকিব।...

অনেক চেষ্টা করিয়াও নিশাকর নিজেকে সংযত করিতে পারিতেছিল না। অথচ একটী গল্প তাহাকে লিখিতে হইবে। কারণ একখানি পত্রিকার তরফ হইতে শীঘ্রই লোক আসিবার কথা আছে।

আরো কত সময় কাটিয়া গিয়াছে খেয়াল নাই, তাহার চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া হঠাৎ নির্জ্জন দ্বারপ্রান্তে রজনীর স্তব্ধতা ভেদ করিয়া অপরিচিত স্ত্রীকণ্ঠে প্রশ্ন হইল, মে আই কাম্ ইন্?

একটা প্রচণ্ড ধাঁধার মতো নিশাকরের মস্তিষ্ক নিদারুণ ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। তাহার উত্তর দিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকিলেন এক তন্বী কিশোরী।

নিশাকরের উদ্দেশ্যে তরুণী কহিলেন; আপনিই সম্ভবতঃ মিঃ এন্, মিটার?

—আজ্ঞে হাঁ।

বিস্তৃত ক্যাম্পখাটখানির উপর হাতের ফার কোটটী ধপ্ করিয়া ফেলিয়া, বাহিরে দণ্ডায়মান কুলির উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিলেন, এ কোলি ভিতার চলাও।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপুলকায় স্যুটকেশ এবং টিফিন ক্যারিয়ার লইয়া কুলিটি আসিয়া প্রবেশ করিল। তরুণী তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া বিদায় দিলেন।

নিশাকর বিলক্ষণ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার জীবনে এই প্রকার সংঘটন এই প্রথম। সে বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া তরুণীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

তরুণী বলিয়া চলিলেন, আপনি বোধহয় খুব অবাক্ হয়ে গেছেন। কিন্তু আমি কিরকম আপনাকে চিনে ফেলেচি বলুন? সাহিত্যের বাতিক ছাড়া এই অজ পাড়াগাঁয়ে—রাত দুপুর অবধি—বলিয়া তিনি টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নিশাকর তবু কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বব্ করিয়া ছাঁটা ঘাড়ের চুলগুলি দুলাইয়া সারা অঙ্গ ফুঁ দিতে দিতে তরুণী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, দার্জ্জিলিঙ আর এখানকার 'ক্লাইমেটে' এত তফাৎ।—বলিয়া অপাঙ্গে একবার নিশাকরের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। পরে একখানি কার্ড বাহির করিয়া নিশাকরের হাতে দিয়া হাস্যোজ্জ্বলকণ্ঠে কহিলেন, আমাকে আপনার ভয়ানক বেয়াড়া ঠেকছে বোধহয়! তা হবারই কথা। তবে আপনার ভয় নেই আমার পরিচয় ঐ কার্ডেই পাবেন।—বলিয়া মৃদুমৃদু হাসিতে লাগিলেন।

কার্ডে ছাপা ছিল:

Law-Lit Bhawsey

Representative "Kallolini"

"কল্লোলিনী" পত্রিকার প্রতিনিধি জানিয়া মনে মনে স্বস্তি পাইলেও নিশাকর এই বিচিত্র নামের একবর্ণও বুঝিতে পারিল না। তাই বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাহিয়া রহিল।

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া তরুণী বলিলেন, অমন অবাক্ হয়ে দেখবার কিছু নেই—কার্ডখানা আমার 'নিক্-নেমে' লেখা। আমার নাম হচ্ছে, ললিতা বোস, ডাকনাম ললিট। কার্ডে তাই-ই লেখা আছে। শুধু পদবীটার ওপর আমি একটু-আধটু চেঞ্জ করে দিয়েছি। আমাদের ফ্যামিলিতে 'বোস্'-টা সবাই 'ভোস্' বলেই লেখেন। আমি ফ্রেঞ্চ ষ্টাইলে সেটাকে করে নিয়েচি 'ভসে'—এই যা।

নিরতিশয় বিস্ময়ে নিশাকর অভিভূত হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না।

হঠাৎ 'গোল্ড ফ্লেকে'র একটী প্যাকেট খুলিতে খুলিতে তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া ললিতা বলিয়া উঠিলেন, ইফ্ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, মিঃ মিটার!

নম্রকণ্ঠে নিশাকর কহিল, ধন্যবাদ, আমি ওতে বিশেষ অভ্যস্ত নই।—কদাচিৎ খাই।

কি জানি কেন, ইঁহাতে ললিতার মুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল। একটী সিগারেট ঠোঁটে চাপিয়া চাপাকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, ননসেন্স!

কি ভাবিয়া নিশাকর একবার হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। ললিতা বলিয়া উঠিলেন, ইজ্ ইট সো ডিস্টারবিং? বলিয়াই সিগারেটটী দ্বারের বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন।

নিশাকর রীতিমত অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়া উঠিল, ও কি? ফেলে দিলেন কেন? আমি ত এজন্যে উঠিনি।

তেল-জলবিহীন একরাশ পাঁশুটে কোঁকড়া চুলের ভিতর দুইহাত প্রবিষ্ট করাইয়া ললিতা বলিয়া উঠিলেন, যাক্ এইবার কাজের কথা বলি। যে জন্যে এই বনগাঁয় আসা। আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আমাদের চিঠি পেয়েছেন? আপনার গল্পের কতদূর বলুন?

নিশাকর নম্রকণ্ঠে বলিল, সেই জন্যেই বসেছিলুম। এ ক-দিন নানাবিধ কারণে পেরে উঠিনি। তা, আপনি এখান থেকে ফিরচেন কবে?

—কবে! বিপুল বিস্ময়ে ললিতা শিহরিয়া উঠিলেন। —রাত্রে আর কোন ট্রেণ নাই তাই, কাল সকালে প্রথম ট্রেণ আমায় ফ্যাণ্ডেল করতেই হবে।

মৃদুকণ্ঠে নিশাকর বলিল, আমি আজ রাত্রের মধ্যেই আপনাদের গল্প 'রেডি ক'রে দিচ্ছি। তা আজ আপনি থাকবেন কোথায়? রাত্তিরও অনেক হয়ে গেচে—খাওয়া দাওয়াও বোধ হয়—

হাসিতে হাসিতে হাত নাড়িয়া ললিতা বলিলেন, আমার জন্যে অতো আপনি উতলা হবেন না মিঃ মিটার। খাওয়া আমার হয়ে গেচে। আর থাকা সম্বন্ধে?—অসুবিধে না হয়, বলেন ত বাকী ক'ঘণ্টা যাহোক করে এখানেই না হয় কাটিয়ে দিই।

মোলায়েম স্বরে নিশাকর বলিল, তা বেশ ত। তাহলে চলুন আপনাকে মা'র কাছে রেখে আসি।

—মা! Are'nt you married? আপনার এখনো বিয়ে হয়নি?

নিশাকর বলিল, আজ্ঞে না। উপস্থিত বাড়ীতে আমার মা এবং এক পিসীমা আছেন। আপনার কোন অসুবিধাই হবে না তাঁদের কাছে।

হঠাৎ ললিতা যেন একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন। শ্লেষের সুরে বলিলেন, ওজন্যে আপনি এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন

বলুন ত? আমি যদি আজ আপনার কাছেই থাকি, তাতে আপনার এত আপত্তি কিসের? ধরুন, আপনি যদি লিখতে থাকেন, আর আমি ঐ খাটে শুয়ে কিম্বা বসে থাকি, তাতে আপনাদের সমাজ কী একেবারে রেউলে হয়ে যাবে? সত্যি মিঃ মিটার, আপনাদের মতো কয়েকটী সঙ্কীর্ণপন্থীদের জন্যেই বাঙ্গলার মেয়েদের আজ এই অবস্থা। তাঁর চোখমুখ যেন লাল হইয়া উঠিল।

একথার কী উত্তর দিবে নিশাকর খুঁজিয়া পাইল না। সে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। কিছু পরে উঠিয়া অন্দরে চলিয়া গেল।

প্রায় পনর কুড়ি মিনিট পরে যখন নিশাকর একটী লেপ এবং বালিস প্রভৃতি লইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন অতিরিক্ত বিস্ময়ের সুরে ললিতা কহিলেন, How very strange! আপনি কি সত্যি সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত শয়ন পর্ব্বের যোগাড় সুরু করে দিলেন? তবেই আর লিখেচেন গল্প!...তবে একটা কথা মিঃ মিটার, আপনাকে ঠাট্টা করচি বটে কিন্তু সত্যিই একটু যেন শীত করচে এখন।

তাহাকে বাধা দিয়া নিশাকর বলিয়া উঠিল, এগুলো ত আপনার জন্যেই আনলুম মিস্ ভোসে। একে ট্রেণের জার্ণি, তাতে এই বিশ্রী ঠাণ্ডা রাত; আপনি ওদিকে বিশ্রাম করুন, আমি এদিকে ঘণ্টা দুই তিনের মধ্যে সব ঠিক করে নিচ্চি।

মৃদু হাসিয়া ললিতা কহিলেন, কিন্তু আমার সাজেশ্চান অন্যরকম মিঃ মিটার। আমি বলি কি, আজ রাত্রে আপনারও পরিশ্রম করে কাজ নেই, আমি না হয় কাল সন্ধ্যার ট্রেণেই যাব। কাল সারাদিনের ভেতর নিশ্চয়ই সব ঠিক করে দিতে পারবেন?

নিশাকর কি ভাবিল, পরে বলিল, না, আপনি এখানেই ঘুমুন।। আমি একটু মনে মনে প্লটটা চেষ্টা করে দেখি। বলিয়া তাঁর উত্তরের পূর্ব্বেই স্যুটকেশটা সরাইয়া খাটের উপর চাদর বিছাইয়া দিতে লাগিল।

তাহাকে সচকিত করিয়া ললিতা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আর আপনি শোবেন কোথায়? না, না আপনিই এখানে থাকুন, আমি ভেতর বাড়ীতে যাচ্চি চলুন।

এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটিকে লইয়া নিশাকর বিশেষ মুস্কিলে পড়িল। বলিল, আপনি ভয়ানক exhausted হয়েচেন আপনি শুয়ে পড়ুন না। খুব ঘুম ধরে ত আমি ভেতর বাড়ীতে চলে যাবখন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ নিশাকর বলিয়া উঠিল, আচ্ছা আপনি আপনার নামটা অমন অদ্ভুত বানান দিয়ে লেখেন কেন? মৃদুহাসিয়া বলিল, ডক্টর অফ লিটারেচার" অনেক পুরাণো হয়ে গেচে ব'লে "ল ইয়ারটা" চালাতে চান নাকি?"

অস্পষ্ট আলোতে স্পষ্ট দেখা গেল ললিতার মুখে কে এক পোঁচ সিন্দুর লেপিয়া দিয়াছে। পরমুহূর্ত্তে সামলাইয়া ললিতা বলিলেন, বাঃ বেশ মাথা খেলিয়েচেন ত আপনি? হাজার হলেও সাহিত্যিক মানুষ ত বটে। তবে একটা কথা আপনাকে স্মরণ করান বোধহয় অসঙ্গত হবে না মিঃ মিটার, আপনার মগজে উপস্থিত আমার নাম প্রভৃতি কথার যে রকম 'ইনফ্লুয়েন্স' দেখচি তাতে গল্পের প্লটের চিন্তা ত্যাগ করে আপনার শয়ন পর্ব্বের উদ্যোগ করাই শ্রেয়।

নিশাকরকে কে যেন শপাং করিয়া একঘা চাবুক বসাইয়া দিল। তাহার মুখ দিয়া আর একটি বর্ণও বাহির হইলনা।

হঠাৎ চিমনিটা নিভাইয়া দিয়া ললিতা বলিলেন, এটা আর মিছিমিছি জ্বলে কেন? চাঁদেরইত পরিষ্কার আলো আসচে। যান্ শুয়ে পড়ুনগে।—বলিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া লেপটাকে টানিয়া নিশাকরের রচিত শয্যায় দেহ এলাইয়া দিলেন। অদূরে টেবিলের উপর কাঠের মতো শক্ত হইয়া নিশাকর বসিয়া রহিল। পারিপার্শ্বিক সমস্ত ঘটনাগুলি তাহার মনে এমনই এক উত্তপ্ততার সৃষ্টি করিল যে এই নিদারুণ শীতের রাত্রেও সে বিষমভাবে ঘামিয়া উঠিল।

আরো কতক্ষণ কাটিয়া গেছে নির্ণয় করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও নৈশ নির্জ্জনতা ভেদ করিয়া কাছারির ঘড়িতে দুইটা বাজার শব্দে নিশাকরের চমক ভাঙ্গিল। কম্পিত পদে কি ভাবিয়া টেবিল ছাড়িয়া সে ধীরে ধীরে একবার সেই ক্যাম্পখাটের দিকে অগ্রসর হইল। এই

অদ্ভুত প্রকৃতির তরুণীটীর নিদ্রা সম্বন্ধে তখনো সে স্থির নিশ্চয় হইতে পারে নাই। তাঁর পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে।

পশ্চিমের অর্দ্ধোন্মুক্ত জানালা দিয়া কুয়াসা ভেদ করিয়া চাঁদের অস্পষ্ট আলোকে পড়িয়া ললিতার সুগৌর মুখের একপার্শ্বে আর এক অপূর্ব্ব রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। অবিন্যস্ত চুলগুলির কয়েক গাছা সোনালি গালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, ঘুমের ঘোরে কৃত্রিমরঞ্জিত পাতলা ঠোঁটদুখানি মৃদুমৃদু কাঁপিতেছে। নিশাকরের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

চোরের মতো অতি সন্তর্পণে সে পুনরায় টেবিলের দিকে ফিরিয়া আসিল। একবার স্থির করিল চিমনিটা জ্বালিয়া ফেলিয়া নিজের কার্য্যে অগ্রসর হয়। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে ললিতা ঘুমের ঘোরে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেই ও-সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া বিস্ফারিত চক্ষে সে শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

আরো পাঁচ সাত মিনিট অতিবাহিত হইল, অতি সন্তর্পণে দ্বারের দিকে চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া কাগজের প্যাড ও কলম লইয়া চাঁদের উদ্ভাসিত আলোকে সে বসিয়া পড়িল। তাহার মস্তিষ্কে বুঝি ভাবের বান ডাকিয়াছে। উদ্দাম উচ্ছ্বাসে হাতের কলম ছুটিয়া চলিল। সে যে কী লিখিয়া চলিয়াছে সেদিকে তাহার খেয়াল নাই—। ভাবধারা যখনই আঘাত পাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তখনই একবার পিছনে ললিতার বিছানার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া লইতেছে এবং এই ভাবে এই বিচিত্র মেয়েটিকে ফাঁকি দিবার গৌরবে মনে মনে অসম্ভব রকম পুলকিত হইয়া উঠিতেছে।

...তাহার রচিত আখ্যায়িকার বিরহী নায়ক সমীর যখন পূর্ণিমার চাঁদের উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া চোরের মতো সন্তর্পণে বিভিন্নকক্ষে নিদ্রিতা নায়িকা মাধবীর গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল,– ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে যাইয়া তার সারা অঙ্গে চন্দ্রিমার আলোর বন্যায় অবিনশ্বর মায়ার সৃষ্টি দেখিল, তার সুগৌর ঘুমন্ত গালের উপর চূর্ণ-কুন্তলের এক অচিন্ত্যনীয় ইন্দ্রজালের রচনা দেখিল; এবং সামলাইতে না পারিয়া যখন সে তাহার অধরের লোভে আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তখন পরপারের লুপ্তপ্রায় চাঁদকে লইয়া নিশাকর বড় বিব্রত হইয়া উঠিল। আকাশের দিকে চাহিয়া বুঝিল ভোর হইতে আর অল্পকিছু বিলম্ব আছে, তাই চিম্‌নীটা প্রজ্বলিত করিবে কিনা ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল ললিতার কথায়: ইজ ইট্ এ ড্রীম মিঃ মিটার? আপনি আমাকে একেবারে অবাক্ করে দিয়েছেন! এই প্রচণ্ড শীতে এভাবে বসে বসে লিখচেন? ধন্য আপনার ধৈর্য্য! গল্প বোধ হয় শেষ করে ফেলেচেন?

নম্রকণ্ঠে নিশাকর জবাব দিল: শেষ বোধহয় হয়ে যেত, হঠাৎ চাঁদটা ডুবে গেল! আপনাকে আর কত কষ্ট দিই বলুন?

ললিতা বিহ্বল দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল।

পূবের আকাশ সবেমাত্র পরিষ্কার হইয়া আব্‌ছাআলো দেখা দিয়াছে, নিশাকর ললিতার উদ্দেশ্যে হঠাৎ বলিয়া উঠিল: যাই, একটু গরম জলের যোগাড় দেখি, আপনি মুখ-টুক ধুয়ে ফেলুন। আর সঙ্গে সঙ্গে একটু চায়ের কথাও বলে দি; কেমন?

হাসিয়া ললিতা কহিলেন: থ্যাঙ্কস্ ইনডীড। শুধু একটু গরম জল হলেই হবে। আমার কাছে মুখধোবার এবং চায়ের সমস্ত সরঞ্জামই আছে, আপনার মাকে আর অযথা বেশী বিব্রত করে তুলবেন না।

পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিয়া রৌদ্র তখন বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিশাকর ললিতার প্রাতঃকৃত্যের সরঞ্জাম ও চায়ের জল প্রভৃতির জোগাড় করিয়া অল্প পূর্ব্বে প্যাড ও কলম লইয়া সম্মুখস্থিত গাঁদাগাছের ঝোপের ভিতর একখানি অর্দ্ধভগ্ন টুল লইয়া বসিয়াছে। কিন্তু তাহার মনের অবস্থা তখন এমন বিকল হইয়া উঠিয়াছে যে কিছুতেই সে তাহার পূর্ব্ব চিন্তাধারার সহিত মিশিয়া যাইতে পারিতেছে না। তাই শূন্যদৃষ্টিতে কাগজের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেছে খেয়াল নাই, তাহার চমক ভাঙ্গিল টুলের পিছন দিকে উষ্ণ নিশ্বাসের শব্দেও পৃষ্ঠদেশে মৃদুমধুর কোমল শাড়ীর স্পর্শে। নিশাকর মুখ ফিরাইয়া দেখিল পূর্ব্বরাত্রি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সাজে কাশ্মিরী গাঢ় সবুজ রংএর শালে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া

সস্মিতমুখে ললিতা তার প্যাডের দিকে চাহিয়া আছেন। জরির কাজ করা আশমানি রংএর শিল্ক শাড়ীখানা তাঁকে আজ এক নূতন মূর্ত্তি দিয়াছে। আজ ঠোঁটে কৃত্রিম রঙ্গের আড়ম্বর নাই—পাৎলা এবং স্বাভাবিক্ গোলাপী রঙই শোভা পাইতেছে। চোখে একখানি রিমলেশ চশমা এবং সুগন্ধি পাউডারে সমস্ত মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক শাদা। তৈলবিহীন রেশমের মতো চুলগুলি শ্যাম্পু এবং চিরুণীর সাহায্যে সুবিন্যস্ত এবং তাহা হইতে সদ্যফোটা যুঁইফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে।

মণিবন্ধের ঘড়িব দিকে লক্ষ্য করিয়া ললিতা কহিলেন, সাতটা বেজে পঁচিশ মিনিট ত হয়ে গেচে দেখচি। যদি সাড়ে দশটার মেলেই ফিরতে হয়, তাহলে ত সাড়ে আটটায় বেরুতে হবে নিশ্চয়ই। পথ ত আর কম নয়? তা গল্পের কতদূর কি করলেন দেখি? বলিয়া প্যাডখানি তুলিয়া লইলেন।

এক অজ্ঞান শক্তিবলে নিশাকরের যেন সকল শক্তি অন্তহিত হইল। সে একটী কথাও বলিতে পারিল না।

খানিকটা পড়িয়াই হাসিতে হাসিতে ললিতা বলিলেন; 'এ ইউনিক ক্রিয়েশান্ আফ্টার অল!' কালবাত্রে তাহলে আমার ক'ঘণ্টা ঘুমের খুব' য়্যাডভানটেজ' (advantage) নিয়েচেন বলুন? শেষের অংশ কতকটা পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, এঃ! একেবারে যে ভয়ানক জায়গায় এনে ফেলেচেন দেখচি। নিন তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলুন। আমি ততক্ষণ একটা চক্কর দিয়ে আসি। ঠিক আটটায় ফিরব কিন্তু।

* * * অদূরে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিতেছে, নিশাকর মুখ তুলিয়া দেখিল টিনের ফটক ঠেলিয়া ললিতা প্রবেশ করিতেছেন। কিন্তু তখনো সে তার গল্পে বিশেষ কিছু যোগ করিতে পারে নাই। প্রমাদ গণিয়া অগত্যা সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং খাবারের যোগাড় হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য অন্দরে গেল।

ললিতা ইতিমধ্যে প্যাডের পাতা উল্টাইয়া গল্পের শেষ দিকে চোখ বুলাইয়া লইলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে কাগজ কথখানি খুলিয়া শালের ভিতর লুকাইয়া ফেলিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই নিশাকর ফিরিয়া আসিল ও তাঁহাকে লইয়া ভিতরে গেল।

ফিরিয়া যাইবার সময় আতিথ্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া ললিতা বলিলেন, আপনি তাহ'লে গল্পটা শেষ করে দু একদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেবেন? তারপর একখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া বলিলেন, ম্যানেজার বাবু আপনাকে গল্পের জন্যে এটা দিয়ে যেতে বলেচেন—এখানা আপনি রেখে দিন। গল্পটা দু-একদিন পরে ঠিক করে পাঠিয়ে দেবেন।

কৃতজ্ঞতায় নিশাকরের চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। এই মহিয়সী রমণীটী তাহার সম্মুখে এমনই এক বিচিত্র মায়ার সৃষ্টি করিয়াছেন যে সে রীতিমত সংশয় অনুভব করিল। নম্রকণ্ঠে বলিল, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব জানিনে। তবে একটা কথা, আমার টাকার অতো দরকার নেই। গল্প পাঠালে ম্যানেজার বাবুকে পাঠাতে বলে দেবেন।

হাসিতে হাসিতে ললিতা বলিয়া উঠিলেন, আবার কেন মনি অর্ডার মারফৎ—বলিয়া জোর করিয়া নোটখানি তার হস্তে গুঁজিয়া দিলেন। সাড়ে আটটা বাজিলে কুলির মাথায় মোটঘাট চাপাইয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

নিশাকর হতভম্ব হইয়া চেয়ারের উপর বসিয়া রহিল।

এই ঘটনার পরে আরো এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে প্যাডের পাতা উল্টাইয়া নিশাকরের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, সেকথা ভাবিবার ভার আমরা পাঠকগণের উপর ন্যস্ত করিলাম।

সেদিন যখন একখানি 'কল্লোলিনী' এবং ঐ অফিসের একখানি পত্র নিশাকরের হাতে আসিয়া পৌঁছিল তখন সে বিলক্ষণ দমিয়া গেল, এবং সেই মায়াবিনী ভোসেকেই বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। ম্যানেজারের কটূক্তি বহন করিয়াই যে পত্রখানি আসিয়াছে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাই পত্রখানি খুলিবার পূর্ব্বে প্রথমেই সে 'কল্লোলিনীর' আবরণী কাগজখানি খুলিয়া ফেলিল। সূচীপত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে অবাক হইয়া গেল যে 'সবুজ আলোর পরশ' নাম দিয়া তাহারই নামে একটি গল্প সেই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। পাতা উল্টাইয়া

সেই অসমাপ্ত রচনাটাই বাহির হইয়াছে দেখিয়া সে বিলক্ষণ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এতদিন যে কথাটি ধোঁয়ার মতো তাহার মস্তিস্ক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এমন কি যে কথা ভাবিতে পর্য্যন্ত বারংবার মন সন্দেহদোলায় দুলিয়া উঠিতেছিল, কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিতে দেখিয়া ললিতাকে কেন্দ্র করিয়া মধুর হাস্যে এবং অজ্ঞাত কৌতুহলে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। নূতন করিয়া মনে পড়িয়া গেল, গল্পটি সে শেষ করিতে পারে নাই! তাই তাড়াতাড়ি শেষের পাতা উল্টাইয়া সে পড়িতে লাগিল:

সমীর তাহার কম্পিত শীতল হস্তখানি খুব মৃদুভাবে নিদ্রিতা মাধবীর চিবুকে বুলাইয়া ডাকিল, প্রিয়ে! অজ্ঞাত স্পর্শে মাধবীর নিদ্রা টুটিয়া গেল। চাঁদের স্নিগ্ধ অথচ লুপ্ত আলোতে চোখ মেলিয়া সমীরের ক্ষুধার্ত্ত মুখের দিকে চাহিয়া বামহাতখানি তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া মাধবী ডাকিল, তুমি এয়েচ প্রিয়তম? সমীরকে সে তাহার উষ্ণ বক্ষের দিকে অবাধ বিশ্বাসে টানিয়া লইল। শান্ত শিশুর মতো সমীর তাহাতে আত্মসমর্পণ করিল।

কুয়াসা ভেদ করিয়া এক ঝলক চাঁদের আলো অপরূপ দীপ্তিতে মাধবীর চক্ষে ফুটিয়া উঠিল।

গল্প পড়িয়া কী এক গুপ্ত ইঙ্গিতে নিশাকরের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। সে কম্পিত হস্তে খাম ছিঁড়িয়া চিঠিখানি বাহির করিয়া লইল:

'কল্লোলিনী' অফিস
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

আজ আর আপনার কাছে লুকোব না—'কল্লোলিনী' কাগজখানি আমারই। আপনার প্রথম গল্পের সঙ্গে যে অনুরোধ পত্রখানি পাই তাতেই বিচলিত হয়ে উঠি। সেটা সত্য কিনা জানবার জন্যে অতদূর পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছিলুম। আপনার রচনাগুলি সেকেলে ধরণের এবং সেকেলে ভাবে পুষ্ট! এই সবুজ সাহিত্যের যুগে সেগুলির ঠিক মতো আদর হবে না জেনেও বরণ করে নিয়েছিলুম আপনার চিঠি দেখে।

যাক্, আপনার কবিত্বভরা কুটীরে সেদিন রাত্রে আমার যে পরিচয় পেয়েচেন সেটা আমার স্বরূপ কিনা বিচার করিয়ে আপনার মনে কোন প্রকার সমস্যা জাগাবার স্পৃহা আমার নেই। তবে এটা ঠিক আপনার লেখার মধ্যে ঐ আধুনিকতার কণাটুকুরই অভাব ছিল। লিপিই যখন আপনাকে চালাতে হবে, তখন যাতে না খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যান, তাই আধুনিক আর্টের কতক কতক আপনার মনে এঁকে দেবার চেষ্টা করেছিলুম।

না জানিয়ে গল্প নিয়ে আসাতে একটা অপবাদ ত দিয়েচেন নিশ্চয়ই। কিন্তু একথা সত্যি, অতো আপ টু-ডেট প্লট আপনার সেকেলে কলম শেষ পর্য্যন্ত ম্যানেজ করতে পারত না। তুকলম লিখে আমিই তাই শেষ করে দিয়েছি। আশা করি ক্ষুব্ধ হবেন না এবং ভাল থাকবেন।

বিনীতা
ললিতা দেবী

অপরিসীম বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া নিশাকর বসিয়া রহিল।

শ্রীকার্ত্তিক শীল

সাত মাইল

১৯৩৬

শ্রীশান্তি পাল

(সজ্জা)

আয় ভাই মদ্‌না
কোট্‌কে পান্না
লীলা রাণী
চণ্ডে খান্না
ওই শোন্‌ হুইসিল্‌
বাজছে লক্ষে
সার সার দাঁড়া
দাঁড়া মক্ষে।

সাত মাইল পাল্লা
বালির ঘাট,
সাতজন সংখ্যায়
নিচ্ছে ষ্টার্ট।

সাতজন সাঁতরে
সাতজন মাল্লা
সাতজন রক্ষী
দেয় দূর পাল্লা
দর্শক মাত্রই করে হাল্লা—
হিন্দু বলে জয় মা কালী
মুস্‌লিম বলে আল্লা আল্লা।

সাত মাইল পাল্লা
বালির ঘাট,
সাতজন সাঁতরে
নিচ্ছে ষ্টার্ট।

তিন দেঁড়ে পান্‌সী
এক দেঁড়ে ডিঙ্গে
পট্‌ পট ল্যাজ নাড়ে
রঙ্‌ করা ফিঙ্গে ;
মাঝি মাল্লা ষ্টার্টার দাঁড়ি,—
চৌদিকে হৈ হৈ
রৈ রৈ ভারি ;
ভাটির টানে ভাসিয়ে 'না',—
মারে চুম্‌কুড়ী—গোঁফে তা।

সাত মাইল পাল্লা
বালির ঘাট,—
সাতজন মাল্লা
নিচ্ছে ষ্টার্ট।

(যাত্রা)

সাত সায়রে সাঁতার কাটি
আমরা সাতজন,
সাত মাইলে জিতবো বলে
প্রাণ ক'রেছি পণ ,—
মোরা প্রাণ ক'রেছি পণ।
সাঁতার পোকা মাথায় নিয়ে
ষ্টার্টের মুখে ভড়কে গিয়ে
মারছি পাড়ি উজান দিয়ে।
সাত সমিতির জন,
মোরা সাত সমিতির ধন।

(চল্‌তি)

মার পাড়ি ভাই মার পাড়ি
মার পাড়ি ভাই মার পাড়ি,—
মুখ ডুবিয়ে
হাত চুবিয়ে
গড় গড়িয়ে
তর তরিয়ে
পাও হিলিয়ে

পাও মিলিয়ে
এক দুই আর তিন চারি।
সাম্‌লে চ'লিস্ ভাই
হা হা, সাম্‌লে চ'লিস্ ভাই।
মাঝ গাঙে দেখ
হাঙর কুমীর
মারছে কত ঘাই
হো হো, সাম্‌লে চ'লিস ভাই।

(মধ্যপথে)

ঝঞ্ঝা ঝড় জল
গঙ্গা টল্ মল্
মুখর চঞ্চল
তুফান ঢেউ ;—
বিদ্যুৎ চমকায়
সাঁতুরে শঙ্কায়
সাতটি সংখ্যায়
আর নাই কেউ।
সাতজন সাঁতরে
সা'তটি জাতরে
সবাই হাতড়ে
মরছে ভাই ;
দর্শক বর্ব্বর
ক'রছে হড় বড়
দাঁড়িয়ে পর পর
তুলছে হাই !

(ঘূর্ণি)

মাঝ গঙ্গায় সাঁতার কাটি
জল ঘুলিয়ে উজিয়ে ভাটি
সুস্থ মোরা স্বাস্থ্য খাঁটি
অসুখ মোটে নাই,
হা হা, অসুখ মোটে নাই ;
পান-কৌটির মত মোরা
ডুব গালিয়া যাই।—
হো হো. লিভার পিলে নাই।
কাজের মধ্যে সাঁতার কাটি,
ডুগডুগি বাজাই !

(সাঙ্গ)

মার পাড়ি
মার পাড়ি
মার প'াড়ি জোট্‌'কে
ওই দেখ মদনা
এগোয় ছোট্‌কে।

মার পাড়ি
মার পাড়ি
মার পাড়ি চণ্ডে
পরলাই আস্‌বি
দু' এক দণ্ডে।
এক দুই তিন চার
ক্রল আর ট্রাড্‌জান
নিশ্বাস প্রশ্বাস
চাই বল—চাই জ্ঞান ;
ভাটির টানে ভাসিয়ে গা,
হাতের ষ্ট্রোকে যা ভাই যা।
এক দুই তিন চার
ক্রল্ আর ট্রাডজান.
ডাইভিং প্লানজিং
চাই বল—চাই জ্ঞান।
ভাটির টানে ভাসিয়ে গা,—
পায়ের ষ্ট্রোকে যা ভাই যা।
সাত মাইল সাঙ্গ
বেনিয়াটোলা—
গঙ্গার জল আজ
বড়ই ঘোলা।

শান্তি পাল

আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে গঙ্গাবক্ষে সাত মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতার সময় লিখিত, ভাব ও ছন্দ বৈশিষ্ট্যে কবিতাটি বাঙলা সাহিত্যে নূতন। সন্তরণের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের ভঙ্গীবদল উপভোগ্য।

কবিতা পাঠ—(৭)

শ্রীনবেন্দু বসু এম্‌-এ

[মিল ও কলিবিন্যাস]

মিল আর কলিবিন্যাসের সাহায্যেও রূপকে ফুটিয়ে তোলা যায়। মিল (অবশ্য যে কবিতায় মিল আছে) আর কলি কবির খেয়ালখুসীতে এলোমেলো ভাবে সাজান হয় না। সেগুলির বিন্যাসে থাকে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ আর কলাপদ্ধতি। ছন্দ, অলঙ্কার আর বর্ণাসম্পদের মতন মিল আর কলি-বিন্যাসের পদ্ধতিও ভাবরূপের প্রকৃতি আর প্রয়োজন অনুসারে কতকটা নিজে হতেই নির্দ্দিষ্ট হয়। আবেগের ছন্দধারাই যেন উঁচু, নীচু, সরল বা বাঁকা পথে কবিচিত্তকে চালিয়ে নিয়ে যায়। কবীন্দ্রের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটির কথা সকলেই জানেন। সকলেই লক্ষ্য করেছেন একটি নির্ঝরের উৎসমুখ থেকে আরম্ভ করে' স্ফীতা মন্থর নদীতে পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ গতিবৈচিত্র্য কি ভাবে কবিতাটির ছন্দে ধরা পড়েছে। এই ছন্দের গতি পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে কি ভাবে বিভিন্ন চরণগুলি ছোট বড় হয়েছে, মিল অমিল যাওয়া আসা করেছে, বেগ হয়েছে ক্ষিপ্র বা মন্থর, ধ্বনি উঁচু বা নীচু। কবিতার প্রথম কলি :—

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখীর গান।
না জানি কেনরে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
ওরে উথলি উঠেছে বারি
ওরে প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

"রবির কর" আর "প্রাণের পর" এই পর পর দুটি হসন্তযুক্ত মিলেতে জলের প্রথম তীব্র উৎসারের সঙ্কেত পাওয়া যায়, যেন পাথরের বাধা ভেদ করে' উৎসের প্রথম মুক্তি। তৃতীয় আর চতুর্থ চরণ দুটিকে দীর্ঘতর করে, কিন্তু হসন্তযুক্ত মিল তখনও বজায় রেখে, ফোয়ারার সেই প্রথম উচ্ছ্বাসের গতি আর ধ্বনিকে চেতনার ওপর আর একটু বিস্তৃত করে' দেওয়া হ'ল। পঞ্চম চরণ মিল রাখলে তৃতীয় আর চতুর্থ চরণের সঙ্গে, কিন্তু ছোট হয়ে গেল, যেন উৎসমুখে এক নতুন উচ্ছ্বাসের মুক্তি। "ওরে উথলি উঠেছে বারি" —আর এক ঝলক! এই শেষ ঝলক আবার বিলম্বিত হ'ল :—

ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

দ্বিতীয় কলি :—

থর থর করি কাঁপিছে ভূধর
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে'
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়, কোথায় কারার দ্বার।

এইবার উৎসবারি পাথরের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে, ক্ষুদ্রতালে, চপল, তরঙ্গিত গতিতে চলতে আরম্ভ করলে। চরণগুলি তাই এখন ছোট, আর দ্বিতীয় আর চতুর্থ চরণে মিলে রেখে গতিটাকে অনেকটা নিয়মিত করে' ফেলা হ'ল। গতি নিয়মিত হয়ে পড়লো বলে' কলির শেষে কাছাকাছি মিলের শৃঙ্খলা সম্ভব হ'ল :—

হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়
বাহিরিতে চায় দেখিতে না পায়...

অর্থাৎ পর পর একই রকম তরঙ্গ। তার পর খানিকটা সমতল ভূমি এল :—

কোথায় কারার দ্বার।

এই ধরণে ভাবধারা তৃতীয় কলির মধ্যে দিয়েও চল্‌লো। চতুর্থ কলিতে প্রথমে কতকটা বন্ধুর পথ এল যেখানে জল-ধারাকে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হয়। কিন্তু পথটি বেশ ধাপে ধাপে :—

আমি ঢালিব করুণা ধারা, আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভূধর হইতে ভূধরে লুটি।

কলির শেষ দিকে সমতল ভূমি পাওয়া গেল। নদীর গতিও রীতিমত নিয়মিত হয়ে পড়লো :—

এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

শেষ কলির আরম্ভে সমুদ্রের বুকে নদীর নির্ব্বাণ লাভ। ধীর মন্থর গতি আর অতি ক্ষীণ ধ্বনি :—

কি জানি কি হ'ল আজি জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান।

"নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ" তরুণের প্রথম বিস্ময়ের সহর্ষ উল্লাসের গান। অন্য অন্য ধরণের উল্লাসভাবকে রূপ দিতে অন্যান্য রকমের মিল বিন্যাসের সাহায্য পাওয়া যায়। ধরা যাক "ক্ষণিকা" থেকে :—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে,
হৃদয় নাচেরে।
শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করিছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের যৌবনসুলভ অবাধ, অনিয়মিত, স-রব উল্লাস থেকে এ উল্লাস একটু ভিন্ন। এ অপেক্ষাকৃত বয়স্কের হর্ষ আর মোহ। সেই অনুপাতে ভাব অপেক্ষাকৃত সংযত। ছন্দও তাই উচ্ছ্বসিত হলেও নিয়মিত। প্রথম ছত্রের পর ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাওয়া দ্বিতীয় আর তৃতীয় ছত্রের দ্রুত উচ্চারণে আর তাদের মিলে উচ্ছ্বাসের বেগ আছে। সেই উচ্ছ্বাস প্রবল হয় শেষ চারটি চরণের প্রতিধ্বনিতে। আর মাঝখানে সে উচ্ছ্বাস একবার একটা আবর্ত্তের বন্ধনের মধ্যে পড়ে "শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস, কলাপের মত করিছে বিকাশ" এই শৃঙ্খলায়। কবিতার সকল কলিই চরণ-দৈর্ঘ্য আর মিল পর্য্যায়ে প্রথম কলির অনুবৃত্তি। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতন কলিতে কলিতে নূতন পরীক্ষার বৈচিত্র্য নেই।

উল্লাসের আরো পরিণত, আরো মন্থর, তৃতীয় রূপ :—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি
প্রভাত হ'ল যেই কী জানি হ'ল একি
আকাশ পানে চাই কি যেন কারে দেখি।
[প্রভাত সঙ্গীত—"প্রভাত উৎসব।"]

চার ছত্রের এই কলি, যার প্রত্যেক দুটি চরণে মিল, কলি বিন্যাসের অন্যতম সাধারণ নিদর্শন। একটি ছত্রের ধ্বনিতে যে প্রতিধ্বনির আশা জাগে, দ্বিতীয় ছত্রে শীঘ্রই সেটা তৃপ্ত হয়। এক একটি কলিতে এক একটী ভাব পর্য্যায় সম্পূর্ণ। প্রভাতে যে শান্ত হর্ষের ভাব অনুভব করি, এ ছন্দ তারই নিয়মিত সুসংযত অভিব্যক্তি। উল্লাসের প্রকাশ স্পষ্ট কিন্তু স্বর ধীর আর চাপা।

উল্লাসের কবিতা ছেড়ে বিষাদের কবিতা দেখা যাক :— "সোনার তরী" কবিতার কলিগুলি ছয় ছত্রের। প্রথম দু'ছত্রের এক রকম মিল। তৃতীয় আর চতুর্থ ছত্রে সে পর্য্যায় বদল হয়; শেষ দু'ছত্রে আবার ফিরে আসে :—

একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা;
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়া মসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা॥
এপারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।

এই শেষের দু'ছত্রে প্রথম দু'ছত্রের প্রতিধ্বনি জাগাতে গোড়াকার বিষাদ ভারাক্রান্ত সুরটি ঘুরে আসে। মাঝে যতক্ষণ বলি "পরপারে দেখি আঁকা, তরুছায়া মসীমাখা, গ্রামখানি মেঘে ঢাকা" ততক্ষণ যেন চারিদিক দেখতে দেখতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি।

এইবার বর্ণনামূলক কবিতা থেকে উদাহরণ দিই: কতকগুলি মিল পর্য্যায় আছে যেগুলি হাল্‌কা সুরের বর্ণনায় বেশ মনোজ্ঞ ভাবে লাগে। যেমন:—

দুইটি পাড়ায় বড়ই কাছাকাছি
মাঝে শুধু একটি মাঠের ফাঁক।
তাদের বনের অনেক মধুমাছি
মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক।
তাদের ঘাটে পূজার জবা মালা
ভেসে আসে মোদের বাঁধাঘাটে,
তাদের পাড়ার কুসুম ফুলের ডালা
বেচতে আসে মোদের পাড়ার হাটে।

[কণিকা "এক গাঁয়ে।"]

চারটি ছত্র নিয়ে এক একটি মিল শৃঙ্খলা; প্রথম আর তৃতীয় আর দ্বিতীয় আর চতুর্থ ছত্রে মিল। মিল বিন্যাসের এ একটি সুপরিচিত পদ্ধতি। বর্ত্তমান কবিতায় এক একটি কলির পর, অর্থাৎ আট ছত্র অন্তর, চার ছত্রের আর একটি পর্য্যায় বৈচিত্র্য সম্পাদন করে। তাতে প্রথম, দ্বিতীয় আর চতুর্থ ছত্রে মিল; তৃতীয়টি অমিল:—

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমাদের নাম জানে গাঁয়ের পাঁচজনে
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা। [ঐ]

দীর্ঘ বর্ণনার উপযোগী আর একটি মিল কৌশল দেখা যাক:—

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে,
বন্দী হতেম না জানি কোন্
মালবিকার জালে।
কোন্ বসন্ত-মহোৎসবে
বেণু বীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের
গোপন অন্তরালে,
কোন ফাগুনের শুক্লানিশায়
যৌবনেরি নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতাম
রাজার চিত্রশালে।
ছল করে তার বাধত আঁচল
সহকারের ডালে।
আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে।

[কণিকা-"সেকাল"]

ষোল ছত্রের এই কলির মিল পর্য্যায়ের বর্ণনা করতে মনে করা যাক কলিটি ষোলটি ফুলের একটি মালা। তাহ'লে দেখা যাবে মালার প্রথম আর দ্বিতীয় ফুলদুটি যা পঞ্চদশ আর শেষ ফুল দুটিও তাই। এই ফুলগুলি সম্ভবতঃ কোন ঘোর উজ্জ্বল রঙের—মনে করা যাক রক্ত করবী। এই ফুলেরই ছেদ আছে মালার চতুর্থ, অষ্টম, দ্বাদশ আর চতুর্দ্দশ পঙক্তিতে। এটাও লক্ষ্য করা যায় যে এই রক্ত করবীটি দ্বিতীয় আর চতুর্থ পঙক্তিতে যেমন কাছাকাছি তেমনি মালার শেষ দিকে, অর্থাৎ দ্বাদশ থেকে ষোড়শ পঙক্তিতেও কাছাকাছি (তিনবার) আছে। সত্যই ফুলের মালা হ'লে বলতাম যে গলার কাছে আর বুকের তলে মালাটি যেখানে দোলে সেখানে একটি বিশেষ ঘোর রঙ বেশী। মাঝে একবার সে রঙের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় অষ্টম পঙক্তিতে। তৃতীয়, সপ্তম, একাদশ আর ত্রয়োদশ পঙক্তিতে বিজোড় ফুল। বাস্তবে বিভিন্ন রঙের ফুল নিয়ে এই বর্ণপর্য্যায়ে মালা গেঁথে দেখলে কৌতূহলোদ্দীপক হ'তে পারে।

লঘু বিষয় বর্ণনার পর দেখা যাক গম্ভীর বিষয় বর্ণনা:—

ভিক্ষু ঊর্দ্ধভুজে করে জয়নাদ
কহে "ধন্য মাতঃ! করি আশীর্ব্বাদ,
মহা ভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে।"
চলিল সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীবখানি ল'য়ে শিরোপর,
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ-নখর-
আলোকে।

[কথা—"শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা।"]

এখানে তিন ছত্রে পর পর মিল রেখে চতুর্থ ছত্রে মাত্র

একটি কথা দিয়ে যতি দেওয়াতে বহমান ছন্দের ধারা যেন হঠাৎ থেমে যায়। সেই সঙ্গে ভাব ও চিন্তার ধারা, যেটা ক্রমশঃ মিলের দোলায় অবশ হয়ে আসছিল, চমকে জেগে ওঠে আর তাতে বিষয়ের গাম্ভীর্য্য যেন বিশেষ করে উপলব্ধি করা যায়। আর তিন ছত্র পরে ছন্দ গতি যখন আবার থামে, অথচ "পলকে"র সঙ্গে "আলোকে" মিলে আগেকার চমকেরই পুনরাবৃত্তি করে, তখন যেন একই আঘাত পেয়ে আবার মনোযোগ কেন্দ্রে ফিরে আসে।

"বন্দীবীর" কবিতাটিতেও কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বর্ণিত দৃশ্যের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কলিগুলি ছোট বড় হয়েছে। মিলগুলি এমন নিপুণ ভাবে বিন্যস্ত যে প্রত্যেক কলিতে একই ধ্বনির মোহজাল সৃষ্ট হয়। অথচ মিল এক পর্য্যায়ে সাজানো নয়। বিষয়ের আবেগ আর বর্ণনার বেগ যেখানে যেমন, অর্থাৎ প্রবল কিম্বা মন্দ, ক্ষিপ্র কিম্বা মন্থর, মিল শৃঙ্খলাতেও সেই রকম যথোচিত প্রভেদ ঘটেছে। কবিতাটি দীর্ঘ তাই প্রত্যেক কলি ধরে' বিচার করবার স্থান এখানে নেই, তবে পাঠক স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

আমরা এতক্ষণ আবেগ আর বর্ণনাপ্রধান কবিতা থেকে উদাহরণ দিলুম। এইবার দুটি একটি চিন্তা প্রধান কবিতা পরীক্ষা করা যাক। প্রশ্ন, মীমাংসা, তর্ক, বিচার, প্রভৃতি যে সকল কবিতার মূল সুর, তাতে অনেক সময়ে সাধারণ জোড়া ছত্রের মিল পর্য্যায় বেশ নিপুণ ভাবে প্রয়োগ করা যায়। যেমন:—

কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি,
নির্ব্বাপিত হোম-অগ্নি তাপস-বিহীন
শূন্য তপোবন ছায়ে। আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হ'য়ে এক দেহ
তখন কি জেনেছিলে তার মহা স্নেহ?
ছিল কি পাষাণ তলে অস্পষ্ট চেতনা
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা?

[মানসী—"অহল্যার প্রতি"।]

এই রকম মিল শৃঙ্খলাতেই সুদীর্ঘ "মানস সুন্দরী" কবিতাটিও বাঁধা। কিন্তু এখানে আর একটি মনোহর কবিতা উল্লেখ করবো যার মিলবিন্যাস এ রকম নিয়মিত নয়। "চিত্রা"র "১৪০০ সাল" নামক কবিতাটির তিনটি বিভাগ করছি।

প্রথম:—

আজি হ'তে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।
আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশ মাত্র ভাগ,
আজিকার কোন ফুল, বিহঙ্গের কোন গান,
আজিকার কোন রক্ত রাগ,
অনুরাগে সিক্ত করি পারিবে কি পাঠাইতে
তোমাদের করে,
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে?

এই প্রথম কলিটি হ'ল কবিতার ভূমিকা। এর দুটি অংশ। একটিতে জানান হ'ল কবির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কে, অন্যটিতে কবির উদ্দেশ্য কি। প্রথম চার ছত্র উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় দিয়ে সম্পূর্ণ। প্রথম, তৃতীয় আর চতুর্থ ছত্রে মিল রেখে এই অংশের বৃত্তটি সম্পূর্ণ ভাবে সমাপ্ত করা হ'ল। কলির দ্বিতীয় অংশে ধ্বনির বৈচিত্র্য ঘটান হ'ল "বসন্তের", "প্রভাতের", "আনন্দের" আর "ভাগ" "রাগ" আর "অনুরাগে"র অনুপ্রাস-মালা গেঁথে। কিন্তু ভিন্ন হ'লেও কলির প্রথম ভাগের সঙ্গে দ্বিতীয় অংশের যে নাড়ীর যোগ আছে তার পরিচয় পাওয়া গেল দ্বিতীয় ভাগের শেষ দু'ছত্রে "করে" আর "পরে"র মিল দিয়ে প্রথম ভাগের মিলের প্রতিধ্বনি তুলে।

কবিতার দ্বিতীয় কলিরও দুটি অংশ। প্রথম, অনুরোধ; দ্বিতীয় বর্ণনা। অনুরোধের অংশ এই:—

তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি
ভেবে দেখ মনে।

বর্ণনা হ'ল:—

একদিন শত বর্ষ আগে

চঞ্চল পুলকরাশি কোন স্বর্গ হ'তে ভাসি
নিখিলের মর্ম্মে আসি লাগে।
নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধনহীন
উন্মত্ত অধীর
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু-গন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর।
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে,
তোমাদের শত বর্ষ আগে।
সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে
কত কথা পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে
একদিন শত বর্ষ আগে।

এখন সম্পূর্ণ কলিটির মূল নিয়মক্রম হ'ল চারটি করে' ছত্র নিয়ে। প্রথম আর তৃতীয় ছত্রে দুটি করে' মিল, যেমন "বার" আর "দ্বার" আর "চাহি" আর "গাহি," আর দ্বিতীয় আর চতুর্থ ছত্রে মিল, যেমন "বাতায়নে" আর "মনে"। অনুরোধ বিভাগটি এই নিয়মেই সম্পূর্ণ হয়। বর্ণনা-বিভাগে কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটান হয়েছে। সর্ব্ব শুদ্ধ চারটি মিলবৃত্ত এই অংশে আছে। কিন্তু প্রথম আর তৃতীয় বৃত্ত দুটি তিন ছত্রের আর চতুর্থটি পাঁচ ছত্রের; কেবল দ্বিতীয়টি চার ছত্রের। দ্বিতীয় ছাড়া প্রত্যেক বৃত্তেরই মিলরূপ "আগে"। এই সকল পদ্ধতির প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। প্রথম আর তৃতীয় বৃত্তে মিলক্রম কাছাকাছি এনে, চতুর্থ বৃত্তে দূরে সরিয়ে দিয়ে, আর দ্বিতীয় বৃত্তে মিলের ধারাটিই বদলে দিয়ে, সমগ্র কলিটির অন্তর্গত ধ্বনি সাম্যের মধ্যেও বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হয়েছে। আগাগোড়া চার ছত্রের হ'লে, আর প্রত্যেক বৃত্তের মিল শব্দ একই হ'লে, এই দীর্ঘ কলিটি একটানা হয়ে পড়তো। আবেগের উচ্ছ্বাস এমন ভাবে প্রাণ পেত না যেমন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পায়।

এইবার কবিতার শেষ কলি। এতেও দুটি অংশ আছে।

প্রথম :—

আজি হ'তে শতবর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে।

এটাও কবিতার আরম্ভের মতন তিন ছত্রে পরিচয়ের অংশ। গোড়ার মিল নিয়মটিও সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এল; অর্থাৎ "পরে" আর "ঘরে"।

দ্বিতীয় অংশ :—

আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্তগান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণ তরে
হৃদয়স্পন্দনে তব ভ্রমরগুঞ্জনে নব
পল্লবে মর্ম্মরে,
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

এইটি কবিতার বক্তব্য ভাগ। কবি বক্তব্য সমাপ্ত করলেন সেই মিল ধারাতেই যে ধারায় কবিতা আরম্ভ করেছিলেন; অর্থাৎ :—

কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাগুলি
কৌতূহল ভরে।

আর :—

আমার ববন্তগান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে।

আবার সমাপ্তিতে আছে দ্বিতীয় কলির প্রতিধ্বনি। যেমন :—

কত কথা পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে,

আর ওদিকে :—

হৃদয়স্পন্দনে তব ভ্রমরগুঞ্জনে নব
পল্লবে মর্ম্মরে।

এই রকম মিল পর্য্যায়ের বৈচিত্র্য অথচ শৃঙ্খলার মধ্যে কবিতার ভিন্ন ভিন্ন কলিবৃত্ত বিভিন্ন ভাব, চিন্তা আর সুর এক অখণ্ড ঐক্যে অনুবদ্ধ হয়।

শ্রীনবেন্দু বসু

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

অষ্টম এড্‌ওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ

ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর অষ্টম এডওয়ার্ড বিবাহের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করায় সমগ্র সভ্যজগতে অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য ও বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রেমের জন্য তাঁহার এই আত্মোৎসর্গ জগতের ইতিহাসে নিঃসন্দেহ স্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে। যাহাদের ইতিহাস কেহ লিপিবদ্ধ করে না এমন অখ্যাত, অজ্ঞাত বহু লোকে লোক চক্ষুর অন্তরালে হয়ত মহত্তর আত্মদানও করিয়া গিয়াছেন, এবং করিতেছেন। কিন্তু, অফুরন্ত বিলাস ব্যসন, সীমাহীন সুখ-ঐশ্বর্য্য, জগত-জোড়া রাজ্য ও সম্মানের মোহও যে মানুষের মনুষ্যত্বকে সর্ব্বক্ষেত্রে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, পৌরুষ ও বীরত্বকে ক্ষুন্ন করিতে পারে না, রাজ্য ত্যাগ করিয়া অষ্টম এডওয়ার্ড তাহাই প্রমাণ করিলেন।

বিবাহ মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত কার্য্যে মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকা উচিত—যদি না সেই কার্য্য অপরের কোন ন্যায় সঙ্গত অধিকার ক্ষুণ্ণ করে। সমাজ এখনও আদর্শ সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া ব্যক্তিগত কার্য্যে লোককে দেশের ইচ্ছা মানিয়া চলিতে হয়। দুঃখ, লাঞ্ছনা এবং নিন্দা মাথা পাতিয়া লইয়া শক্তিমান লোকদিগকে বিদ্রোহের দ্বারা সমাজকে এই সম্পূর্ণতা দান করিতে হইবে। ইওরোপে মানুষের সামাজিক অধিকার অবশ্য অনেকটা বিস্তৃত এবং সাধারণ লোকের পক্ষে উক্ত প্রকার কার্য্য নিন্দনীয় হয় না। রাজাকে লোকে প্রাচীন আদর্শ ও আভিজাত্যের প্রতীক মনে করে বলিয়া ব্যাপার এতদূর গড়াইল; লোক মত ব্যতীত আইন-গত বাধাও কিছু থাকিয়া থাকিবে।

আমাদের দেশে লোকের সামাজিক অধিকার আরও অনেক সঙ্কীর্ণ এবং ব্যক্তিগত কার্য্যে দশের ইচ্ছাকে এত অধিক সম্মান করিয়া চলিতে হয় যে নিজের ইচ্ছা বাদই পড়িয়া যায়। আমাদের দেশে সাধারণ লোকের পক্ষেও এইরূপ কার্য্য ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

৺কৃষ্ণকুমার মিত্র

বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন যাঁহারা গড়িয়া তুলিতে খুব বড় রকম সাহায্য করিয়াছিলেন ও এতদর্থে আর্থিক ও নানা প্রকার প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ৺কৃষ্ণ-কুমার মিত্র মহাশয় অন্যতম। ৺কৃষ্ণকুমার যে পরিমাণে নেতা ছিলেন তদপেক্ষা অধিক ছিলেন কর্ম্মী, সুতরাং অন্যান্য নেতাদের তুলনায় তাঁহার খ্যাতি যে পরিমাণে ব্যাপ্ত হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। অধিক কি, তাঁহার মৃত্যুর পর জনসভা করিয়া শোক প্রকাশের আবশ্যকতাও কেহ উপলব্ধি করিল না। কৃষ্ণকুমার যখনই যে আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন তাহাতে শুধু নেতা হইয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নাই, সাধারণ কর্ম্মীর মত কাজও করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার কর্ম্মময় জীবন 'example is better than precept' এর জলন্ত নিদর্শন। রাজনৈতিক আদর্শে, নব্য-যুগের তুলনায় যদিও তিনি মধ্যপন্থী (moderate) ছিলেন, তথাপি তাঁহার স্বদেশ-প্রেম কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না।

আজিকার দিনে অনেকে হয়ত জানেন না, এবং যাঁহারা জানেন তাঁহারাও হয়ত ভুলিতে বসিয়াছেন যে 'বিলাতি-বর্জ্জন' এতদিন কংগ্রেস ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে তাহার উদ্ভাবক ছিলেন কৃষ্ণকুমার।

কৃষ্ণকুমার কোনও দিনই কাহারও কোন অন্যায় অত্যাচার সহিতে পারেন নাই—অত্যাচার নিজের উপরেই হউক বা অপরের উপরেই হউক। যেখানেই কোন সবল কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের অত্যাগার দেখিয়াছেন, সেখানেই তিনি সবলের অত্যাচারের নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়াছেন,—তা সে অত্যাচারী শ্বেতকায় শাসন জাতির কেহই হউক বা স্বয়ং দেশের গবর্ণমেণ্টই হউন। মধ্যপন্থী হইলেও, ইদানীং তিনি বিনাবিচারে আটক বন্দী প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র লেখনী চালনা করিতেন।

কিন্তু তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় কাহিনী হইতেছে নারীরক্ষায় তাঁহার আত্মনিয়োগ। যে কারণেই হউক ঘরে বাহিরে নিত্য শত শত নানা ভাবে অত্যাচারিতা নারীর করুণ ক্রন্দন আমাদের দেশের কোন সর্ব্বমান্য নেতার প্রাণেই কারুণ্যের উদ্রেক করিতে পারে নাই। কিন্তু কৃষ্ণকুমার ১৯০১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যাচারিত অবহেলিত নারীর দুঃখ মোচনে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত অমূল্য সময় ও অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, এই ঘোর ও জটিল সমস্যার প্রতি কোনও দিনই তাঁহার শৈথিল্য প্রকাশ পায় নাই। কত অত্যাচারিত নারী তাঁহার গৃহে স্থান পাইয়া যে ধন্য হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যাঁহারাই কৃষ্ণকুমারকে এই বিষয়ে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ে নারীর দুঃখ, কৃষ্ণকুমারের অকপট মর্ম্মস্থল হইতে নির্গত হইয়া, আঘাত করিয়াছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে কৃষ্ণকুমার পূর্ণ ভাবে যোগদান করিয়াছিলেন, এবং আন্দোলন সফল না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি পশ্চাদপদ হন নাই। বঙ্গদেশের অনেক সর্ব্বজনমান্য নেতাই বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন—কৃষ্ণকুমারও রাজরোষের সন্দেহ এড়াইতে পারেন নাই, তিনিও বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গলার জাতীয়তার উদ্বোধন কল্পে 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী'র দান নগণ্য নহে। কৃষ্ণকুমারের সাংবাদিক জীবন সুরু হয় 'বঙ্গবাসী'তে। পরে মতের মিল না হওয়ায়, বঙ্গবাসীর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কতিপয় বন্ধুর সহযোগিতায় ১৮৮৭ সালে 'সঞ্জীবনী'র প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেই অবধি সম্পাদক ও মালিক-রূপে ইহার আমরণ পরিচালনা করিয়াছেন।

গত ৫ই ডিসেম্বর ৮৫ বৎসর বয়সে কৃষ্ণকুমার ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

একটি মোকদ্দমার রায়—

সম্প্রতি ইউনাইটেড প্রেস (অমৃত বাজার, ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতা সংস্করণ) মৈমনসিংহ হইতে একটি মোকদ্দমার রায়ের সংবাদ দিয়াছেন। আমরা সংবাদটী নিম্নে হুবহু অনুবাদ করিয়া দিলাম।

মৈমনসিংহ, ৯ই ডিসেম্বর।

"সুবিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগণকে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে গিয়া মাত্রাজ্ঞান একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া আমি বিস্মিত (? amused) হইয়াছি।"

এই মন্তব্য সহকারে সেসন্স জজ মিঃ এম, এম, মাসিদপেরজঙ্গলের (ফরিদপুর) বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ও পটুয়াখালির (বরিশাল) প্রসন্নকুমার দাসগুপ্তের উপর দুই বৎসর সশ্রম কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা হ্রাস করিয়া প্রত্যেককে মাত্র ৩০৲ টাকা জরিমানা করেন।

প্রকাশ আসামীদ্বয় আটপাড়া থানায় অন্তরীণ ছিলেন, এবং তাঁহারা যে বাড়ীতে থাকিতেন তাহা থানা হইতে মাত্র কয়েক হাত দূরে অবস্থিত। বন্দীদ্বয় তিন দিন থানায় হাজিরা দেন নাই বলিয়া অভিযোগে প্রকাশ।

অভিযোগের উত্তরে বলা হয় যে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নামে বন্দীদ্বয় উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে।

নিম্ন আদালতের বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদ্বয়ের প্রত্যেককে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন ও প্রত্যেককে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আপীলের শুনানীর সময় প্রসঙ্গক্রমে সেসন্স জজ মন্তব্য করেন যে, তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন এই জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আইনের মারপ্যাচে নামমাত্র অপরাধেও (palpably technical offences) রাজবন্দীদের অস্বাভাবিক গুরুদণ্ড দিতে তৎপর

(prone)। প্রথম অন্তরীণকে বিধিভঙ্গের অপরাধে সাবধান করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইত; কিন্তু কাগজ পত্র হইতে এরূপ সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কিছু দেখা যায় না।

বর্ত্তমান মোকদ্দমায় মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় আপীল-কারীদিগের পক্ষ সমর্থন করেন।

ইউনাইটেড প্রেস।

সেসন্‌স্ জজের মন্তব্যের উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান

সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, বাঙ্গালা অথবা নেপালী এই ভাষা চতুষ্টয়ের যে কোনও একটির সাহায্যে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

প্রথম প্রথম শিক্ষাদান কার্য্যে ইংরাজি সহায়তা আবশ্যক হইলেও, সে আবশ্যক যে বহু দিন ফুরাইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উর্দ্দু ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গলা বা হিন্দী ভাষা কোন অংশেই হীন নহে, বরঞ্চ শ্রেষ্ঠতর। সেক্সপিয়রের কোন কোন নাটক উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করা না গেলেও বঙ্গভাষায় অতুল শব্দসম্পদের দরুণ উহা বাঙ্গলা-ভাষায় সুন্দর রূপে অনূদিত হইয়াছে। অথচ ওসমানীয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরু হইতেই উর্দ্দু ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দান কার্য্য প্রচলিত হইলেও, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছু দূর পর্য্যন্ত দেশীভাষার সাহায্যে শিক্ষা দানের প্রস্তাব অনেক পরে গ্রহণ করিয়াছেন।

একবার যখন ইংরাজি ভাষার অনাবশ্যক মোহ ঘুচিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন আশা করিতে পারি শীঘ্রই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও দেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করিবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ও বর্ম্মীভাষার সাহায্য শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

মেয়েদের শিক্ষা ও কর্ম্মসমস্যা

শিক্ষার সহিত যে দেশের বেকার সমস্যার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা আমরা গত সংখ্যায় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সমাজের যে স্তরের কোন সমস্যাই আমাদের চোখে পড়িতে চাহে না শিক্ষা, বেকার সমস্যাকে সেই স্তর হইতে, যাহাদের ব্যাপার লইয়া আমরা মাথা ঘামাইয়া থাকি তাহাদের স্তরে আনিয়া ফেলে মাত্র। যাহা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে ছিল, শিক্ষাবিস্তারের সহিত তাহা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে বলিয়া ভুল করিয়া আমরা শিক্ষার সহিত ইহার একটা সম্পর্ক আছে মনে করি। মেয়েদের সম্বন্ধেও এই কথাটা অনেকটা এইভাবে সত্য। আমরা যখন মনে করি বা বলি যে মেয়েদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার অধিক হইলে তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে অজ্ঞাত কর্ম্ম সমস্যা দেখা দিবে তখন তাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতা এবং সমাজে তাঁহাদের প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট অবিচার করিয়া থাকি। শিক্ষা কোন কর্ম্মাভাবের সৃষ্টি করে না, মানুষকে কোন কাজের অযোগ্য করিয়াও তোলে না। যদি শিক্ষাপ্রাপ্তদের মনে এমন ধারণা জন্মে যে, অশিক্ষিত থাকিলে তাঁহারা যে সকল কাজ করিতে পারিতেন, শিক্ষিত হইলে সে সকল কাজ তাঁহাদের পক্ষে মর্য্যাদাহানিকর হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলেও তাহার দায়িত্ব শিক্ষার নহে, তাহা প্রকৃত কর্ম্মাভাবও নহে। শিক্ষা সাপেক্ষ নহে এমন কাজ যদি প্রচুর থাকে অথচ, কাজ না পাইলেও যদি শিক্ষিতেরা তাহা করিতে না চাহে তবে শিক্ষা ও কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচলিত ভুল ধারণাই তাহার জন্য দায়ী এবং প্রকৃত কর্ম্মাভাব না থাকিলেও যে মনোভাবের জন্য আমরা বেকার থাকিয়া যাই তাহার পরিবর্ত্তনের চেষ্টাই ইহার প্রকৃত প্রতিকার—শিক্ষার সঙ্কোচসাধন তাহার প্রতিকার নহে।

আমাদের সমাজে মেয়েরা নেপথ্যে রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নির্ব্বিবাদে ও নিরুপদ্রবে পুরুষের ঘরকন্নার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন এবং তদতিরিক্ত আর কিছু চাহিবেন না ইহাই আমরা আশা করি। যাহা তাঁহাদের মধ্যে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে কর্ম্মের ক্ষমতা ও ইচ্ছা জাগ্রত করিতে পারে তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। বর্ত্তমানে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মেয়েই প্রায় বেকার রহিয়াছেন। কিন্তু সমাজে ও পরিবারে তাঁহাদের জন্য যে আসন নির্দ্দিষ্ট

আছে তাহাতে তাঁহাদের কোন কর্ম্মের দাবী আছে বলিয়াই পুরুষ বা নারী কেহই মনে করেন না। কাজেই তাঁহারা কর্ম্মহীন থাকিলেও, তাঁহারা বেকার আছেন বলিয়া কেহ মনে করেন না। কিন্তু শিক্ষা অবস্থান্তর ঘটাইতেছে; ইহা কর্ম্মের দাবী ও ইচ্ছা সৃষ্টি করিতেছে। ফলে আমরা মনে করিতেছি শিক্ষা নূতন করিয়া কর্ম্মসংস্থাব সৃষ্টি করিতেছে।

নারী ও পুরুষ কর্ম্মক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ম্মের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। কোন বা কোন কোন লোক বা শ্রেণীর পক্ষে যদি কাজ করিবার পূর্ণ সুযোগ না থাকে তবে, তাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক বা না করুক, দেশে বেকার সমস্যার যে সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বর্ত্তমানে যে বেকার সমস্যার কথা মনে করিয়া চিন্তিত হইয়াছি সাধারণভাবে তাহা দেশের পুরুষদের এবং বিশেষ করিয়া শিক্ষিত পুরুষদের। কিন্তু কাজের অভাবে অপর যাঁহারা সম্পূর্ণ বা আংশিক বসিয়া আছেন, তাঁহারও বেকার, তাঁহারাও কর্ম্মের সুযোগ পাইলে, তাঁহাদের ও সমগ্রভাবে জাতির সুখসমৃদ্ধি যে অনেক বাড়িয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অনেকে বলিবেন, আমাদের মেয়েরা বর্ত্তমানে বসিয়া নাই, ঘর সংসারের কার্য্যে তাঁহাদের সব সময় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। উচ্চশিক্ষা এবং তাহা হইতে আগত স্বাধীনতা পাইলে তাঁহারা ঘরসংসারের কাজের পরিবর্ত্তে নূতন কর্ম্ম ক্ষেত্রের সন্ধান করিবেন, তাহাতে একদিকে ঘরসংসার নষ্ট হইবে, অন্যদিকে কর্ম্মের অভাব আরও তীব্র হইবে। তাহার চেয়ে মেয়েরা যদি আরও যত্ন ও দক্ষতা সহকারে ঘরের কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারেন তবে একদিকে যেমন আমরা নূতন সমস্যার হাত হইতে উদ্ধার পাইব অন্যদিকে তেমনই আমাদের ঘরের সুখ সুবিধা ও শান্তি অনেকগুণ বাড়িয়া যাইবে। মেয়েদের শিক্ষাও এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিয়ন্ত্রিত করা কর্ত্তব্য।

এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ঘরসংসার একা পুরুষের নহে, তাহার প্রয়োজন এবং তাহার প্রতি আকর্ষণও একা পুরুষের নহে, পুরুষের ন্যায় নারীও সংসারের প্রতি সমান, হয়ত বা অধিকতর, আসক্ত। কাজেই তাঁহারাও গৃহকে নষ্ট করিতে চাহিবেন না। তবুও যদি দেখা যায়, শিক্ষাপ্রাপ্তির পর তাঁহারা বাহিরে কাজ করিতে চাহিতেছেন, তাহাহইলে বুঝিতে হইবে যে গৃহের কার্য্য তাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে এবং যাঁহারা বাহিরে আসিতেছেন, তাঁহাদের বাহিরে আসার ফলে তাঁহাদের পরিবার অধিকতর উপকৃত হইতেছেন। একটা কথা বলা হইবে যে, নারীর গৃহের প্রতি বর্ত্তমান আকর্ষণ বর্ত্তমান আদর্শের ফল। শিক্ষার সহিত এই আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটিলে নারীর গৃহের প্রতি আকর্ষণ কমিবে এবং গৃহে পর্য্যাপ্ত কাজ থাকিতেও বাহিরের আকর্ষণ তাঁহাদিগকে অনেকটা গৃহচ্যুত করিবে, পারিবারিক সুখ সুবিধা ও শান্তির ব্যাঘাত করিয়াও তাঁহারা বাহিরের কাজ করিতে চাহিবেন। সমাজের উপর ইহার ফল ভাল হইবে না।

গৃহ ও পরিবারের চতুঃসীমা একদিকে এবং বিপুল বহির্জগতের বিস্তৃতি অন্যদিকে; এই উভয়ের মধ্যে কোনটি নারীর কর্ম্মক্ষেত্র হইবে, শুধুমাত্র শিক্ষা তাহা নির্ণয় করিয়া দেয় না। ইহা বিশেষ মতবাদের কথা যাহা শিক্ষার আদর্শকে প্রভাবিত করিতে পারে। যদি এই মতবাদ দেশের বহু লোকের দ্বারা গৃহীত হয় তবে সমগ্র দেশেই ইহা আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবে। ঘরের মায়া শুধু নারীই কাটাইবেন না—পুরুষও কাটাইবেন। যে সব দেশে গৃহপরিবার ভাঙিয়া যাইতেছে সেখানেও এমন হইতেছে না যে, পুরুষ গৃহী হইতে ইচ্ছুক, শুধু নারীর অনুরূপ মতিগতির জন্য গার্হস্থ্য জীবন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বরং অবস্থা কতকটা উল্টাই বলিতে পারা যায়। নারীর প্রকৃত স্থান ও কর্ম্মক্ষেত্র কোথায় তাঁহারা আর্থিক স্বাধীনতা পাইলে নিজেরা আত্মরক্ষায় ও আত্মপ্রতিপালনে সক্ষম হইলেই মাত্র তাহা বুঝা যাইবে।

নারী এবং পুরুষের শারীরিক কিছু পার্থক্যের জন্য আমরা তাঁহাদের ক্ষমতা ও কর্ম্মক্ষেত্র যতটা পৃথক মনে করি, আসলে তাহার অনেকটা আমাদের মনগড়া ও সংস্কারজাত কিনা সে বিতর্ক বাদ দিয়াও যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ঘরের কাজের পক্ষে নারী এবং এবং বাহিরের কাজের পক্ষে পুরুষ অধিকতর উপযোগী একথা সাধারণভাবে সত্য, তবুও আমরা নিত্য দেখিতে পাই যে অনেক পুরুষ অপেক্ষা অনেক

নারী শারীরিক ও মানসিক গুণে বিশেষ করিয়া মানসিক গুণে বাহিরের কাজের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত। বাহিরের এমন অনেক কাজ আছে (বিদ্যাসাপেক্ষ প্রায় সব কাজই ইহার অন্তর্ভুক্ত) যাহার পক্ষে পুরুষের এবং মেয়েরা সমানই উপযুক্ত। কাজেই মেয়েরা যে শিক্ষার অভাবে এবং সামাজিক রীতির ফলে এই কার্য্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া গৃহের মধ্যে আবদ্ধ আছেন, তাহাতে তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে এবং আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হউক বা না হউক তাঁহাদিগকে কর্ম্মের উপযুক্ত সুযোগ দান করিবার দায়িত্ব সমাজের রহিয়া গিয়াছে। শিক্ষার ফলে মন হইতে সংস্কারের চাপ চলিয়া যাইতেছে এবং যেসকল মাপ কাঠির দ্বারা আমরা পুরুষের যোগ্যতা যাচাই করিয়া থাকি, তাহারই মাপে মেয়েদের যোগ্য দেখা যাইতেছে বলিয়া আমরা মনে করিতেছি, একেত পুরুষেরাই কাজ পাইতেছে না তাহার উপর আবার শিক্ষা মেয়েদেরও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে লইয়া আসিল। ভদ্রলোকে পূর্ব্বে যাহা চলিতেছিল, ভদ্রলোকের করিবার মতই কাজের ক্ষেত্র ছিল না। কাজের ক্ষমতা ছিল অথচ নানাকারণে যাহারা কাজ করিবার দাবী করিত না, এমন লোকেরাও যখন সেই অপ্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন, কর্ম্মের প্রতিযোগিতা যে তীব্রতর হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে আমরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইব তাহাও দেখা দরকার।

প্রতিযোগিতা বাড়িলে যে শ্রমের মূল্য কমিবে এবং তাহাতে কর্ম্মেচ্ছু স্ত্রী পুরুষ সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, মূল ব্যাধি হইতেছে, লোকের তুলনায় কর্ম্মের অভাব।—তাহার জন্য প্রতিযোগিতা অনিবার্য্য হইবে। এই প্রতিযোগিতার ফলে ইতিপূর্ব্বেই শ্রমের মূল্য এত নিম্নে নামিয়াছে যে তদপেক্ষা নিম্নে নামা বোধহয় আর সম্ভব নহে। মেয়েরা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ না করিলেও প্রতিযোগিতা উপার্জ্জনের সর্ব্বক্ষেত্রেই আরও বাড়িয়া যাইবে, দ্রুতবর্দ্ধনশীল জনসংখ্যার চাপ কর্ম্মক্ষেত্রের উপর পড়িবেই। তবুও মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের ফলে যদি প্রতিযোগিতা আরও বাড়িয়া জীবন সংগ্রাম তীব্রতর হয় তবুও সেই অজুহাতে মেয়েদের দূরে রাখিবার অধিকার আমাদের নাই। কতকগুলি লোককে যদি কোনপ্রকারে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরাইয়া রাখা যায় তাহা হইতে অন্যদের যে কিছু পরিমাণ সুবিধা হইতে পারে তাহা সত্য কথা। কিন্তু সেই কতকগুলি লোককে সরাইয়া রাখিবার যুক্তিটা কি?

মেয়েরা যদি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তবে, অর্থ বণ্টনের দিক দিয়া কোন প্রকার ওলটপালট হইতে পারে সম্ভবতঃ এমন আশঙ্কাও কেহ কেহ করিতে পারেন। কিন্তু এসম্পর্কে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মেয়েরা বাহির হইতে আসেন নাই, তাঁহারা আমাদেরই দেশের এবং পরিবারের লোক। তাঁহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিবেন তাহাও নারীপুরুষ সমন্বিত দেশের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বণ্টিত হইবে,—যেমন এখন পুরুষদের উপার্জ্জিত অর্থ হইতেছে। অবস্থাটা একটা কল্পিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে দেশে কর্ম্মের সংখ্যা হইতেছে পাঁচ, কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা হইতেছে দশ এবং কর্ম্মপ্রার্থী নহেন এমন কর্ম্মক্ষম বেকার লোকের সংখ্যা হইতেছে দশ। তাহা হইলে কর্ম্মক্ষম লোকের মোট সংখ্যা হইতেছে কুড়ি এবং তাহার মধ্যে কাজ পাইতে পারেন মাত্র পাঁচজন এবং বেকার থাকিয়া যাইবেন পনের জন। এই বেকার পনের জনের পাঁচজন থাকিবেন কর্ম্মপ্রার্থী এবং দশজন থাকিবেন নীরব ও নিশ্চেষ্ট। অবস্থা যদি এমন দাঁড়ায় যে নিশ্চেষ্ট দশজনের মধ্য হইতেও পাঁচজন কর্ম্মপ্রার্থী হন তবে, কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা দশ হইতে পনেরয় দাঁড়ায় বটে এবং তাঁহাদের মধ্যে পাঁচজনের বেশী লোকের কাজ পাইবার সম্ভাবনা না থাকায় প্রতিযোগিতা পূর্ব্বাপেক্ষা দেড়গুণ হইবে বটে এবং প্রার্থী বেকারের সংখ্যা পাঁচ হইতে দশে এবং নিশ্চেষ্ট বেকারের সংখ্যা দশ হইতে পাঁচে দাঁড়াইবে বটে তবে, মোট বেকারের সংখ্যা পনেরই থাকিয়া যাইবে। অবশ্য পূর্ব্বে পাঁচজন বেকার আমাদের দৃষ্টিপথে পড়িতেন এবং দশজন দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া যাইতেন। বর্ত্তমানে পাঁচজন অন্তরালে থাকিয়া দশজন দৃষ্টিপথে পড়িবেন বলিয়া বেকার সমস্যা

থাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া লোকে মনে করিতে থাকিবে ; — যদিও মূল সমস্যা অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া যাইবে ।

আরও ধরিয়া লওয়া যাক যে, নূতন কর্ম্মপ্রার্থী পাঁচজন স্ত্রীলোক এবং পূর্ব্বে যে পাঁচজন পুরুষ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন তাহার পরিবর্ত্তে এখন তিনজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইতে থাকিবেন। কিন্তু, তাহাতেও অবস্থার পরিবর্ত্তন এইজন্য হইবেনা যে, পূর্ব্বেও পাঁচজন পুরুষের উপার্জ্জিত অর্থ স্ত্রীপুরুষ সমন্বিত পাঁচটি পরিবারের মধ্যে বণ্টিত হইত এবং এখন তিনজন পুরুষ ও দুইজন নারীর উপার্জ্জিত অর্থও স্ত্রীপুরুষ সমন্বিত পাঁচটি পরিবারের মধ্যে বণ্টিত হইবে। কাজেই ইহাতে দারিদ্র্যবৃদ্ধির আশঙ্কা নাই।

বর্ত্তমানেও যেমন অনেক পরিবারের কেহই কাজ পান না আবার অনেক পরিবারের একাধিক পুরুষ কাজ পাইয়া থাকেন, নারীরা কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ দিলেও তেমনই এ সম্ভাবনা থাকিবে যে একই পরিবারের কর্ম্মক্ষম স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই কাজ পাইবেন আবার অনেক পরিবারের কেহই কাজ পাইবেন না। তবে ইহাতে নূতন কোন অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইবে না। কাজেই মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং তাহার জন্য তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের ফলে নূতন কোন কর্ম্মসমস্যার উদ্ভব হইবে না। বরং প্রতিযোগিতার ফলে অনেক অযোগ্য পুরুষের পরিবর্ত্তে যোগ্যতর মেয়েরা কাজের সুযোগ পাইবেন এবং বহু নিঃসহায়া মেয়ের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর হইবে। ইহাতে সমষ্টিগতভাবে তাঁহাদের আর্থিক অধীনতা ঘুচিবে বলিয়া সমাজেও মর্য্যাদা বাড়িবে এবং তাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধেও লোকের হীন ধারণা ঘুচিবে। বর্ত্তমানের আর্থিক পরাধীনতার মধ্যে তাঁহাদের মর্য্যাদা পাইবার বা যোগ্যতা দেখাইবার, সমাজ জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার বা অপরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার পূর্ণ সুযোগ নাই।

পল্লীপুলিশ

পুলিশের সংখ্যা অথবা পুলিশের জন্য ব্যয়ের কথা বলিতে আমরা চৌকিদার দফাদার প্রভৃতির সংখ্যা এবং তাহাদের জন্য ব্যয়ের কথা ধরি না। যদিও ইহারাই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পল্লীশাসন করিয়া থাকে এবং ইহাদের ব্যয়ভার বহন করিতে পল্লীবাসীদের প্রাণান্ত হইয়া উঠে ১৯৩৫ সালের বাংলার পুলিশ শাসন বিবরণীর উপর সরকারি মন্তব্য হইতে নিম্নের সংখ্যাগুলি উদ্ধৃত হইল।

আলোচ্য বর্ষে চৌকিদার দফাদার প্রভৃতির সংখ্যা ছিল ৭৫, ৩০৮ এবং তাহাদের জন্য খরচ হইয়াছিল ৫৪, ৫৬, ২৯৪। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ইহাদের সংখ্যা ছিল ৭৫, ৪৮৭ এবং ইহাদের জন্য ব্যয় হইয়াছিল ৫৫, ৫৮, ৮৮২ টাকা। গত বৎসর জনপ্রতি প্রতিমাসে ইহাদের জন্য গড় ব্যয় হইয়াছিল ৬-০-৭ টাকা।

পুলিশের সহিত ইউনিয়ন বোর্ডের সহযোগিতার কথা ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছে। ইউনিয়নবোর্ডগুলি অবৈতনিক ভাবে পুলিশের সহযোগিতা করা এবং পল্লীপুলিশের পোষণের জন্য ট্যাক্স আদায় করা ব্যতীত আর বড় কিছু বেশী করিবার অবসর যে পান না তাহা ত পল্লীবাসীদের নিত্যকার অভিজ্ঞতা।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

অব্যক্ত

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

নিত্যকার মত সেদিনও কলহ হয়। আশে পাশের বাড়ীর লোকেরা বলে, "স্বামী স্ত্রীতে রোজ এমন ঝগড়া তো দেখা যায় না।" প্রতিবাদ করিয়া আবার কেহ বলে, "বৌটাই বা করবে কি বল, অথচ্চে মিন্‌ষেটারও তো রকম-খানা দেখতে হবে। বার মাস তিরিশ দিন বারমুখো। বৌটার জ্বালা কি কম!"

শত সহানুভূতি পাইলেও ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের নিত্য এই ক্লিন্ন কলহও তো রুচিকর নহে!

স্বর্ণ বলে, "এতই যদি তোমার সোহাগ তবে আর ও আবঁতালটুকু কেন? থাকলেই পার ঐ মুখপুড়ীর ওখানে।"

প্রতুলের স্বরটা তত ঝাঁঝাল আর আর্ত্ত নহে; সে একটু ধীরভাবেই বলে, "তুমি অত চেঁচিয়ে কথা কইছ কেন? আমি তো আর বেশী তফাতে নেই!"

স্বর্ণ ঝাঁঝাইয়া বলে;—"কিসের জন্যে চেঁচিয়ে বলব না? কারুর কি জান্তে বাকী নাকি। তোমার যদি লজ্জা না করে ঐ হারামজাদী শতেখখোয়ারীর দোরের চৌকাঠ কামড়ে পড়ে থাকতে, তো আমার সে কথা কইতে দোষ? রেঁধে দিতে পারেনা, তাই বুঝি আসতে হয়?"

প্রতুল তেমনি নিরীহ ভাবে বলে,—"অমন করে বলতে নেই স্বর্ণ, রেঁধে চাট্টি আমায় সে দিতে পারে, কিন্তু তোমায় না দেখে দিনান্তে থাকতে পারি না..."

প্রতুল হয়ত এমনই রচনা করিয়া আরও দু একটা মিষ্ট কথা কহিত। কিন্তু এ কথা স্বর্ণ বহুবার শুনিয়াছে, তাই আর উহাতে মন ভিজে না। আজ তিন বৎসর হইল তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। নহিলে প্রতুল তো ভালই ছিল। কিন্তু এতটা বয়সে প্রতুল সহসা এমন আকণ্ঠ ডুবিয়া একেবারে তলাইয়া যাইবার মত হইবে, এ কথা স্বর্ণকে আরও ক্ষেপাইয়া তোলে। স্বর্ণর সন্তানাদি হয় নাই। যখন এ নিয়া মনঃকষ্ট হইত, তখন স্বামী স্ত্রী উভয়ে সে দুঃখের অংশ নিত। এখন সে দিন গিয়াছে। তারপব কোথায় একটা সাধারণ পবিবারের সহিত প্রতুলের পরিচয় হইল, পরিচয়ের পর নরেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর সহিত প্রতুলের প্রীতিটা সবার অলক্ষ্যে বেশ ঘনাইয়া উঠিল। সেই ঘনাইয়া ওঠা রসের বাষ্পের ধূয়াটাই স্বর্ণকে এমন পাগল করিয়াছে। নরেন্দ্রের স্ত্রীর সহিত প্রতুলের সৌখ্যটা যে একটা শঙ্কাজনক স্থানে পঁহুছিয়াছে সে কথা প্রতুল চাপিবার চেষ্টা করাতেও, স্বর্ণ তাহার স্বভাববৃত্তি দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছে।

এই অবস্থ কুৎসিৎ ব্যাপারটা এই দম্পতির সুখময় জীবনে একটা ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। এই লইয়াই প্রত্যহ কলহ, বিতণ্ডা।

স্বর্ণর বয়স প্রায় আটাশ, উনত্রিশ। কপালের ধারের চুল উঠিয়া কপালটা একটু উঁচু ও প্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সিঁথিতে সিন্দুর দিতে দিতে একটু চওড়া হইয়া গিয়াছে। চোখবসা, তাই চোখের কোণে একটু কালি, তবে বেশ জ্বলন্ত। সিন্দুরের চিহ্নে সুগৌর মুখমণ্ডলখানা যেন ডগ্‌ডগ্‌ করে। তা ছাড়া স্বাস্থ্য ভাল, রং ভাল। দেখিতে পড়ন্ত রৌদ্রের মত;—উদ্ভাসনের মধ্যেও আসন্ন দিনান্তের আভাস দেয়।

কিন্তু এ কলহ লইয়াই আরও চার বৎসর কাটিয়া যাইবার পর একদিন প্রতুল স্বর্ণকে কহিল,—"ছেলেটাকে মেরে ফেলার যো করেছে স্বর্ণ। তুমি জেদ ছাড়। একটু ভেবে দেখ, পাপ নয় আমার, কিন্তু ও তো কোন দোষ করেনি। ওর ওপর আমার বড্ড মায়া! আমারই তো! নরেনের নূতন বৌ ওকে মেরে ফেলবে। যদি তুমি মত কর, নরেন আজই দেবে।"

স্বর্ণ অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিল, "ওর ওপর মায়া, কতবার তো শুনেছি! মা মাগী মরেছে, আমার হাড় জুড়িয়েছে,

রেখে গেল একটা দুধের বাচ্চা। আমি ও ভোগ পোয়াতে যাব কিসের জন্যে?"

প্রতুল তেমনই নরম হইয়া বলিল, "আমার জন্যেও নয়, তার জন্যেও নয়। শুধু ঐ ছেলেটুকুর জন্যে। মনে কোরো রাস্তায় একটা কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। তোমারও যদি দশটা পাঁচটা থাকত আমি বলতাম না। তুমিও তো একা। কতবার একটা ছেলের জন্যে দুঃখু করেছ।"

স্বর্ণর স্বরে যেন একটু কিসের ভার। সে বলিল, "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না বলছি! ছেলে নেই, নেই। সে জন্য দুঃখ করেছি কি অন্য কোন্ পোড়ারমুখীর অগ্নি ধারা একটা ছেলে কুড়িয়ে পাব বলে; রাস্তার কুড়োনো ছেলে ওর চেয়ে ঢের ভাল। তার বাপের মায়ের ঠিক নেই, রাখি রাখব আমার ইচ্ছেয়। এর তো আর তা নয়, সবই ঠিকঠাক, জানাজানি,—আমি পুষব বই নয়।"

প্রতুলের সত্যই মায়া পড়িয়াছিল ঐ মাতৃহীন হতভাগ্যটার প্রতি। তাহার নিজেরও কোন সন্তানাদি ছিল না, অথচ ঐ সন্তানটির দেহে যে তারই রক্ত ইহাও সে জানে। অন্তরের কি একটা টানে সে দারুণ অপমানকে মাথায় করিয়াও বারবার স্বর্ণকে এ কথা না বলিয়া পারে না। "তুমি অমন করে যদি একরোখা হও, তো আমি কি করি বলত? ছেলেটা কি মরবে?"

"তা যা হয় হোক্। আমার কি!"

কিন্তু বলা নাই কহা নাই, প্রতুলের ঘরে বৈকালের কাজ গুছাইবার সময়ে স্বর্ণ আসিয়া দেখে একটি পরম সুন্দর বছর চারেকের শিশু অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। পরম সন্দেহের বশে স্বর্ণ নিদ্রিত ছেলেটির মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। প্রতুলের সহিত অবয়বের সৌসাদৃশ্য পাইতে তাহার আর বিলম্ব হইলনা।

শিশুটিকে চাক্ষুষ দেখিয়া স্বর্ণর মত রাগ, শঠ প্রতুলের উপর পড়িল। তাহারই ফলে সে ছেলেটাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত না করিয়া, প্রতুলের ঘর অসংস্কৃত রাখিয়াই বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, প্রতুলের দেখা নাই। শিশুটা উঠিয়া বসিয়াছে। কিছুক্ষণ নূতন স্থানের মধ্যে পড়িয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু তাহার পর আরম্ভ করিল রোদন। নিরাশ্রয়তার বেদনাকে অপসারিত করিবার ক্রন্দন শিশুকণ্ঠে যেমন তীক্ষ্ণ তেমনই করুণ হইয়া ফোটে।

শিশু কাঁদে। সন্ধ্যা আসিয়া চলিয়া যায়। তবুও শিশু কাঁদে। শিশু কাঁদে প্রতিবেশীদের প্রত্যেককে সচকিত করিয়া। তবুও স্বর্ণ চকিত হয় না। তাহার রুদ্ধ আক্রোশটা গুমরিয়া গুমরিয়া প্রতুলের প্রতিই বর্ধিত হইতে লাগিল। প্রতুল শুধু একবার আসিলে হয়। আজই ঐ হতভাগা ছেলেটাকে দুর করিয়া না দিলে স্বর্ণর নিদ্রা পর্য্যন্ত হইবেনা।

পা টিপিয়া টিপিয়া রাত্র প্রায় নয়টার সময় প্রতুল আসে। ছেলেটা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে ও ক্ষুধার তাড়নায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বাহির হইতে প্রতুল কাণ পাতিয়া শুনিল, বাড়ী নিস্তব্ধ। কড়া নাড়িল, মুহূর্ত্তের মধ্যে দরজা খুলিল। স্বর্ণর মুখের পানে চাহিয়া প্রতুল সকল আশা জলাঞ্জলি দিল।

স্বর্ণ কোন কথা কহিলনা। প্রতুলের মনে তখন একাধিক প্রশ্ন খোঁচা দিতেছে। অবশেষে প্রতুলই বলিল,—"ছেলেটা খুব কেঁদেছিল?"

"কাঁদবেনা আর? এতক্ষণ বাপ ছেড়ে ছিল, সারা পাড়াখানা মাথায় করে ছিল।"

উত্তরের ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া প্রতুল অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িল। তবুও গরজ তাহার। আবার সে প্রশ্ন করিল, "খাইয়েছ কিছু, না, না খেয়েই ঘুমুল?"

স্বর্ণর পুঞ্জিত ক্রোধের বিস্ফোরণ এত সহসা হইল যে তাহার বিরাট শব্দ বিষাক্ত বাতাস ও আনুষঙ্গিক আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে প্রতুলের বেশ সময় লাগিল।

কলহের আর অন্ত রহিলনা। প্রতুলই রাত্রে নিজহাতে ছেলেটাকে খাওয়াইয়া শুইয়া পড়িল, এবং বুঝিল স্বর্ণর নিকট হইতে কোনরূপ আশা করাই বৃথা।

প্রাতঃকালেরও সকল কৃত্য প্রতুলই নিজহাতে শেষ করিয়া দিল। কিন্তু শিশুর মন—স্বর্ণকে দেখিয়াও প্রশ্ন করে—"ও কে?"

থানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া প্রতুল বলে—"ও তোমার মা ?"

মা বলিতে শিশু জানিত একমাত্র সৎমাকে। তদবধি এই মা নামধারী জীবটির প্রতি তাহার মোটেই শ্রদ্ধা না প্রীতি নাই। সে জানে মায়ের মত ভয়ঙ্কর জীব পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। নয়েনের দ্বিতীয়া ভার্য্যার সেবায যত্নে ইহার মা সম্বন্ধে এমনিই একটি দৃঢ় ধারণা হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সে সশঙ্কিত মুখে প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "ও মা না !"

প্রতুল ব্যাপারটা উপলব্ধি করিয়া হাসিয়া বালককে একটু আদর করিয়া কহিল,—হ্যাঁ, মা ; ভাল মা ; দুষ্টু মা নয়! তোমায় আদর করবে।"

গতকল্যের অভিজ্ঞতা হইতে শিশুর নিকট এ আশ্বাস বিশেষ ফলপ্রসূ হইল না।

অফিসের বেলা যায়। প্রতুল যাইবার সময় বহুবার বলিয়া গেল, "সুবর্ণ-দেখ, ওকে না খাইয়ে শুখিয়ে মেরনা যেন ! ওকে একটু দুধ দিও।"

সুবর্ণ একটি কথারও উত্তর করিল না। তাহার মনে একটা দাহ নিরন্তর জ্বলিতেছেই। যাহা হউক, ছেলেটা ডাকে,—"মা ক্ষিদে !" আর ওই দুরন্ত সম্বোধনে সুবর্ণর কর্মতৎপর অবয়ব শিথিল হইয়া আসিতে চায়। ক্রোধে সে দিশা পায় না। বলে—"আমর, বালাই ! মা ! মা আবার কে শেখালে ? আমি কি তোর মা নাকি ?"

বালক বিস্ফারিত নয়ন মেলিয়া বলে—"হ্যাঁ মা তো" সুবর্ণর ক্রোধকম্পিত মুখের পানে সে গভীর বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে। গুরুগম্ভীর মেঘগর্জন শুনিলে হরিণশিশু বোধকরি এমনি করিয়াই চাহিয়া থাকে।

ওর চোখের পানে চাহিলে মন কেমন করে, তাই সুবর্ণ ওদিকে চাহে না।

কিন্তু দ্বিপ্রহরে বালক এমন একটি অপকর্ম করিবার আভাস দিল, যাহা স্বাভাবিক হইলেও সুবর্ণর নির্লিপ্ততা বজায় রাখিবার পক্ষে সুবিধাজনক নহে। সুবর্ণকে বাধ্য হইয়া আহার হইতেও এই অভাবকর্ত্তব্যটির প্রতি অধিক মনঃসংযোগ করিতে হইল।

সেই সময়ে প্রথম সুবর্ণ এই হতভাগ্য জীবটিকে স্পর্শ করিল। তাহারা শিশুদেহের নধর অনুভূতি যেন তাহার অন্তস্থল পর্য্যন্ত পঁহুছিল, মনের মধ্যকার বিক্ষোভ সে দমন করিয়া রাখিল।

শুনিয়াছি মানুষ মানুষের নিকট থাকিতে থাকিতে সহজ হইয়া আসে। বিশেষতঃ বর্ত্তমানক্ষেত্রে একটি যখন শিশু ও অপরটি যখন নিঃসন্তানা নারী, তখন এই আশা করাই স্বাভাবিক। প্রতুলও এই আশাতেই নির্ভর করিয়া মুকুটকে আনে। এই দুইটি জীবের মধ্যে মুকুটকে আনা যাবৎ দুই বৎসরকাল নিত্যকার কলহ অবিচ্ছিন্ন রহিল। দিনের পর দিন প্রতুলের মুকুটের প্রতি আসক্তি নিবিড় হইয়া আসে, মুকুটও তাহার প্রতিফলে প্রতুলকে অত্যন্ত ভালবাসিত। মুকুটের সুবর্ণর প্রতি ব্যবহারও এই দুই বৎসরে বেশ সহজ হইয়া আসিল। আসিলনা শুধু সুবর্ণর। তাহার মনের সেই পুরাতন বিদ্বেষটা বোধহয় আজকাল আর নাই। কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক কলহের পালাটা নিত্যনৈমিত্তিকতার একটা অঙ্গ হইয়া-পড়িয়া প্রত্যহের একটা অবশ্যপালনীয় অঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহার ফলে সুবর্ণর ভাষায় সেই পুরাতন উগ্রতা, প্রতুলের প্রতি ব্যবহারে সেই পুরাতন রূঢ়তা, মুকুটের সম্বন্ধে সেই পুরাতন নির্লিপ্ততা বজায় রহিল। নারীর মন বলিয়া যে স্বভাব কোমলত্বটুকু আশা করা গিয়াছিল, সেইটুকুকে বাহ্যিক ব্যবহারের ব্যর্থ আয়োজনের চাপে সুবর্ণ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

মুকুটের বয়স আজ ছয়ের কাছাকাছি। মুকুট এখন চোখেমুখে কথা কয়। তাহার মেধা ও বুদ্ধি সকলকে চমৎকার করে। সুবর্ণ বলে তাহার মধ্যে বালক প্রতুল নিয়ত উঁকি ঝুঁকি মারে। প্রতুলের ঘুমাইতে ঘুমাইতে পা নড়া প্রতুলের ডান কাৎ হইয়া শোয়া, প্রতুলের দাঁত দিয়া নখ খোঁটা, প্রতুলের কথার মধ্যে 'স' উচ্চারণের বৈচিত্র্য বা আহারে মিষ্ট হইতে ঝালের প্রতি অধিক প্রীতি, এ সবই সুবর্ণর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পড়িত। তাহার মনে যে হিংসা হইত তাহা হয়ত নহে, কিন্তু তাহার মন খারাপ হইয়া যাইত। সে জানিত মুকুট তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল, সে না হইলে মুকুটের

চলেনা, মুকুটের আবদার ও জেদ, তাহার বালকসুলভ চাপল্য সবই তাহার স্নেহসিক্ত ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। তথাপি তাহার মনে হইত, ঐ বালকটাকে কেন্দ্র করিয়াই তো তাহার জীবনে একটা অসীম বঞ্চনা লুকাইয়া আছে। সেই নিদারুণ অসত্য প্রতিপালনের একমাত্র বর্ত্তমান সাক্ষ্য ঐ বালক। তাই মুকুটের প্রত্যেক স্বভাব পরিচয় সুবর্ণর মন খারাপ করে

রন্ধনশালার দুয়ারে গিয়া মুকুট বলে,—"মা, সন্দেশ খাব।"

সুবর্ণ বলে, "সন্দেশ কই?"

হাসিয়া মুকুট বলে "কেন? বাবু তো কাল এনেছেন। আমি জানি। রাত্তিরে ঘুমিয়ে ছিলাম না। আমি ছুঁতে পেয়েছি।"

এদিকপানে না চাহিয়া সুবর্ণ বলে,—"শয়তানের বাচ্ছা শয়তান! সব জানে হতভাগা! দাঁড়া তরকারিটায় জল ঢেলে দিচ্ছি।"

সন্দেশ আনিয়া দিতে হয়। সন্দেশ হাতে পাইয়া এক-টুকরা ভাঙ্গিয়া স্নেহভরে মুকুট বলে, "তুমি এট্টু খাবে মা?"

আলমারী বন্ধ করিতে করিতে সুবর্ণ বলে,—"থাক্, আর আদর জানাতে হবে না, তুই খা!"

প্রতুলের জেদ মুকুটে আছে। সে বলে,—"না খাও!" আঁচল চাপিয়া ধরে। ফিরিয়া হাত পাতিয়া সুবর্ণ সন্দেশ নিতে যায়,—চোখে পড়িয়া যায় মুকুটের চোখ দুটি। সন্দেশের টুকরাটা বালকের হাত হইতে লইয়া নির্মমভাবে সে তাহা আঙ্গিনায় ফেলিয়া দেয়। চোখে চোখ না পড়িলে হয়ত এই কাণ্ডটা ঘটিত না।

কিন্তু মুকুটের এ অপমান হৃদয়ঙ্গম হইল। তৎক্ষণাৎ সে তাহার অংশও দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। রাগ করা গৃহিণীর শোভা পায়. আশ্রিত একটা জারজের তাহা শোভা পায় না।

সুবর্ণ ঠাস ঠাস করিয়া চড়াইয়া দিল মুকুটকে।

মুকুটের মুখে একটি শব্দ নাই চক্ষে এক ফোঁটা জল নাই।

সে গম্ভীর ভাবে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে সদর দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া যায়।

এমন সে বহুবার যায়। পাশে রজনীবাবুর বাড়ী গিয়া সে বসিয়া থাকে। তারপর আবার ডাকিলেই আসে।

কাজ করিতে করিতে সুবর্ণকে এ ঘর ও ঘর করিতে হয়, আর চক্ষে পড়ে ছড়ান সেই কয়টুকরা সন্দেশ। ঐ বালকটার নিকটে সুবর্ণর পরাজয়ের গ্লানি। সুবর্ণ নারী। পরাজয়, পুরুষের নিকট পরাজয় তাহার ললাট-লিপি। প্রতুলের নিকটে তাহার পরাজয়, সাক্ষ্য ঐ মুকুট; মুকুটের নিকটে তাহার পরাজয়, সাক্ষ্য ঐ কয়টুকরা সন্দেশ। জীবন হইতে জীবনান্তরে নারীকে পরাজয় করার অধিকার পুরুষ পাইয়া আসিল। শত ভালবাসা দিয়া বাঁচাইয়া তুলিলেও মুকুটের এই অভিলাষ মুছিবে না, মুকুটই বল আর প্রতুলই বল, সুবর্ণর নিকটে উভয়েই সমান।

তবু মনটা কেমন করে। ভালবাসিলে, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিলে মুকুট হয়ত তাহাকে আর অমর্য্যাদা করিবে না, যেমন করিয়াছে প্রতুল। মনে মনে সে বলে,—"ও যদি আর কারুর মত দেখতে না হোত, ওকে দেখলে যদি আর কারুকে আমার মনে না পড়ত, আমি ওকে ভালবাসতাম,—খুব ভালবাসতাম। কিন্তু পিতার রূপগুণের পরিপূর্ণ সত্বাধিকারী হওয়াই ছিল মুকুটের সকলের বড় অভিশাপ।

আড়ষ্ট চিন্তার বেদনাময় অনুভূতির মধ্য দিয়া খানিকক্ষণ কাটিয়া যায়। রজনীবাবুর বড় মেয়ে ছুটিয়া আসে এক হাতে মুকুটকে টানিতে টানিতে, ও কোলে তাহার তিন বৎসরের কন্যা মীরাকে লইয়া। "দেখলে মাসীমা, তোমার মুকুটের কাণ্ড!"

সুবর্ণ চাহিয়া দেখে মীরার কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে আর প্রাণপণ শক্তিতে মুকুট রজনীবাবুর কন্যার হাতখানি কামড়িয়া ধরিয়াছে।

ছুটিয়া আসিয়া মুকুটকে ছাড়াইয়া নিয়া সুবর্ণ বলিল,—"কি করে হোল? কি করেছে মুকুট? মুকুট মেরে অমন করল?"

"হ্যাঁ মাসীমা, কী যে হোল জানিনা, তবে মীরা চেঁচাতে গিয়ে দেখি কপাল কেটে রক্ত বেরুচ্ছে, আর মুকুট দাঁড়িয়ে আছে।"

কঠোর স্বরে স্বর্ণ বলিল,—"কি করে হোল মুকুট? কি করেছিলি?" আবার রজনীবাবুর কন্যার প্রতি চাহিয়া বলিল, —"কিন্তু ওতো অমি মারধোর করে না। মীরা নিশ্চয় কিছু করেছিল।" মীরার মা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন—"অমি করে আস্কারা দিওনা মাসীমা, ছেলেপিলেদের শাসন করতে হয়। আমি কিছু বলবনা, কিন্তু তোমার কাছে আমি মীরার কি দোষ জানাতে আসিনি।" বলিয়া দম দম করিয়া শব্দ করিতে করিতে সরোষে প্রস্থান করিল।

পাশের বাড়ী হইতে ঝঙ্কার আসিতে লাগিল,—"ঠেকার দেখে বাঁচিনা...তবু যদি নিজের হোত...কেই বা না জানে... মরণ হয়না...লজ্জা থাকলে কি আর...ইত্যাদি।

স্বর্ণ মুকুটকে ভীষণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—"কি করে মীরার কপাল কাটল বল, নয়তো আজ তোকে বঁটি দিয়ে দুখানা করব।"

ভীতকণ্ঠে মুকুট বলিল,—"আমি করিনি মা! সত্যি বলছি মা! মীরা আমার মত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গেল!"

কিন্তু স্বর্ণর কানে তখন বিষ ঢালিতেছিল পাশের বাড়ীর গর্জ্জনের ধ্বনি! ক্রোধে তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। "কেন যাস তুই পরের বাড়ী পোড়ারমুখো! তোর কি পরের বাড়ী যাবার মুখ আছে? তোর জন্যে আমার এই ঘরে বাইরে অপমান আর কত সহ্য হয়?" সে ক্রোধের বশে যেভাবে পারিল মুকুটকে প্রহার করিতে লাগিল।

প্রাণান্ত চিৎকার করিয়া মুকুট ডাকে—"ওমা আর যাবনা মা, ছেড়ে দাও মা!"

স্বর্ণর চক্ষু কোণে বাষ্প পুঞ্জীভূত হইয়া ওঠে। অতি কষ্টে সম্বরণ করিয়া সে ভিতরে চলিয়া যায়।

প্রতুলের নিকট ব্যাপারটা যখন ব্যক্ত করিতে হয় তখন স্বর্ণর মন হইতে সহানুভূতির লঘু বাতাসটুকু সরিয়া গিয়াছে। মুকুটের অপরাধের গুরুত্ব প্রতুলকে যেটুকু অপ-মানিত করিবে, সেইটুকুই প্রতুলের লাভ।

প্রতুলও আজ কি জানি কেন সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মুকুটকে সম্মুখে পাইয়া স্থির হইয়া সে দাঁড়াইল। মুকুট এতক্ষণে তাহার প্রতি মমতাসম্পন্ন স্নেহশীল প্রতুলকে পাইয়া অভিমানে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বালকের অভিমান পিতাকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহার অধরৌষ্ঠের মৃদুকম্পন তাহার চক্ষুতারকার বিচিত্র গতিভঙ্গী, তাহার নীরব অশ্রুধার সেই ক্ষুব্ধ অভিমানকেই ব্যক্ত করিতেছিল। কিন্তু এ সবের কিছুই আজ প্রতুলকে স্পর্শ করিলনা। সম্মুখে রাখা পাখার বাঁট দিয়া সে সপাং সপাং করিয়া ঘা কতক মুকুটের পিঠে বসাইয়া দিল!

ছুটিয়া আসিল স্বর্ণ। হাত হইতে পাখাখানি কাড়িয়া লইয়া সে বলিল, "নলের গোড়া থেকে নলই ওঠে, বাঁশের গোড়া থেকেই বাঁশ ওঠে। ও ভাল হবে কোত্থেকে? ও মার তোমার নিজের খাওয়া উচিত। ওকে ধরে মারছ ওর কেউ নেই বলে?"

এই লইয়াই কলহ। প্রতুল রাগ করিয়া না খাইয়াই আফিসে চলিয়া গেল। স্বর্ণর চক্ষুতে হয়ত দুচার ফোঁটা অশ্রু জমা হইয়াছিল, কিন্তু চিরদিন চাপাই রহিয়া গেল যাহার মনোবৃত্তি তাহার কথা এত সহজে আজ ধরা পড়িবে কেন?

সারাটা দিন মুকুটের অভিমানের আর বিরাম নাই। মুকুটও খাইবার নাম করিলনা। ভোজ্য বস্তু সম্মুখে পরিবেষিত হইলে সে গম্ভীর ভাবে উঠিয়া চলিয়া গেল, স্বর্ণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলনা।

বেলা গড়াইয়া আসিল। স্বর্ণ আর থাকিতে না পারিয়া শুইবার ঘরে গেল। ভূশয্যায় ক্ষুধাকাতর মুকুট নিদ্রিত। গালের চারিপাশে অশ্রুর চিহ্ন। পাখার বাঁটের দাগ ফুলিয়া আছে। নিশ্বাসে যেন কোথাকার মন্থরতা। তখনও রহিয়া রহিয়া ওর দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। শিশুকোমল সেই অনাবিল মুখখানি দেখিতে দেখিতে স্বর্ণর নারীবৃত্তি সজল হইয়া ওঠে।

সে মৃদুকণ্ঠে ডাকে 'মুকুট'। দুচার ডাকে মুকুট জাগে। কিন্তু কোনও সাড়া শব্দ না করিয়া সে তাহার দুই বাহু স্বর্ণর কণ্ঠে নীরবে জড়াইয়া নিয়া তাহার বক্ষে আপনার মাথাটা ঢুকাইয়া দেয়।

স্বর্ণ সচকিত হইয়া ওঠে। তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। খাবার আনিয়া খাওয়ায়।

দু চার দিন স্বামী স্ত্রীতে আলাপ বন্ধ। মুকুট একা একা। বাড়ীর বাহিরে যায়না।

সুবর্ণ একদিন বলিল,—"ছেলেটাকে পড়াতে হবেনা ?"

গম্ভীরকণ্ঠে প্রতুল বলে,—"ওকে আমি কোনও নার্সিং হোমে দেবার ব্যবস্থা করছি।"

সুবর্ণ রুখিয়া বলে,—"কেন শুনি! আমার বদনাম রটাবার জন্যে ? আমারই জ্বালাতনে তুমি তোমার ছেলে নিয়ে ঘর করতে পারলে না ?"

"সে কথা নিয়ে তো তোমার সাথে আমি ঝগড়া করবনা। কারণ যাই হোক, রোজ রোজ চব্বিশ ঘণ্টা একটা ব্যাপার নিয়ে খিটির খিটির ভাল লাগেনা। ওর জন্যে দায়ী আমিই, তুমি কেন ভোগ পোয়াতে যাবে ? ভেবেছিলাম তোমার একটাও নেই, হয়ত মেয়েমানুষ বলে একটা শিশুর ওপর রাগ তোমার স্থায়ী হবে না। কিন্তু তুমি হলে অন্য প্রকৃতির। তা তুমিই থাক। ওর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আমি করব। এতদিন করিনি টাকার অভাব বলে। এখন তা সত্ত্বেও করতে হবে। ওকে তো আর ফেলে দিতে পারবনা।"

একটি কথাও কয় নাই সুবর্ণ। প্রতুল চা খাইয়া বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আকাশের পানে চাহিয়া মুকুটের শিশু-মনটা বড়ই ফাঁকা ঠেকিতেছিল। জন্মাবধি সেও এই জাতি-গোত্রহীন কলহের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। 'মা' বলিয়া ডাকিতে গিয়া সত্যই যে তাহার কণ্ঠ ভরিয়া ওঠেনা, বালক হইয়াও সে ইহা উপলব্ধি করে। স্বভাববৃত্তি শৈশবে বেশী সজাগ থাকে মনস্তত্ত্ববিদেরা এই ভাবের একটা কথা বলিয়া থাকেন। মুকুট স্বভাববৃত্তি দিয়া আজিকার এই কলহটি গ্রহণ করিয়াছিল। প্রতুল বাহির হইয়া গেল, সুবর্ণ গৃহকর্মে মনোনিবেশ করিল। একা মুকুট ভাবিতে লাগিল, মা তামারই জন্য সারাদিন বাবুকে জ্বালাতন করেন। তাহাকে সেই জন্য শীঘ্রই স্থানান্তরে পাঠান হইবে, সেখানে বাবুও থাকিবেন না, মাও নহে। সে মনে মনে জানে মা তাহাকে সত্যই ভালবাসেন, তাহারও মনে মনে ভালবাসায় হৃদয় উদ্বেল হইয়া ওঠে, মনে হয় যাকে খুব ভালবাসি, কিন্তু অযথা মায়ের নিকট কেন যে সে অস্বাভাবিক রূঢ় ব্যবহার লাভ করে তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারেনা। কিন্তু কাল প্রাতে না হউক অতি শীঘ্র তাহাকে কোথাও যাইতে হইবে। নহিলে মায়ের কষ্ট।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সুবর্ণ প্রতুলের কথাগুলি ভাবিল মুকুটকে লইয়া যাইতে চায়। সুবর্ণ কোনদিন ভাবে নাই যে প্রতুলের সম্মুখে এইরূপ একটা উপায় খোলা আছে। সে কখনও মনে ভাবিতেও পারেনা মুকুটকে সে তাড়াইয়া দিয়া একা থাকিবে। তাহার সহজ বৃত্তিতেই সে মনে মনে মুকুটকে স্নেহ করে, কিন্তু তাহা প্রকাশ সে করিতে পারেনা। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নিদারুণ অমর্য্যাদার বিষময় ফল মুকুট। সেই বিষফলকে সে প্রকাশ্য স্নেহ দিলে পাপকেই যে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। তবুও একথা ভাবাও যায় না, মুকুটকে কেহ ছিনাইয়া লইয়া যাইবে।

প্রতুল আসিয়া পড়িল। মুখ গম্ভীর, প্রতি পদক্ষেপে যেন একটা স্থির সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা ও সাফল্যের উত্তেজনা।

স্বামী স্ত্রী কোন কথা কয় নাই। প্রতুলের খাইবার জায়গায় আসিয়া প্রতুল বসিল। পাশে ছোট গেলাসে জল ভরিয়া ছোট একটি আসন বিছাইবার ব্যবস্থা করিতেই প্রতুল বলিল,—"ওখানে কার ব্যবস্থা হচ্ছে ?"

ভীত কণ্ঠে সুবর্ণ বলিল,—"মুকুটের খাওয়া এখনও হয়নি।"

"সে কোথায় ?"

"জানি না, বোধহয় তোমার ঘরে।"

একটু শ্লেষভরা কণ্ঠে প্রতুল বলিল,—"সন্ধ্যে থেকে ছেলেটা কোথায় তাই জাননা ? ও বোধ হয় ক্ষিদে পেলেও তোমার কাছে সাহস করে কিছু চায় না, নয় সুবর্ণ ?"

"না চাইলে আর ছবছরেরটি এসে ছ বছর হোত ?"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া প্রতুল বলিল,—"রাস্তার শেয়াল কুকুরও বাঁচে। আর তারা সবাই তোমার কৃপাদৃষ্টির তলায় লালিত পালিত এই কথাই বলতে হবে নাকি ?"

সুবর্ণ আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "দেখ অমন করে বোলোনা, ধর্মে সইবে না। আমি কচি খুকীটি নই যে একটা ছোট্ট ছেলের সাথে দিনরাত রেষারিষি করি এই অপবাদ দিয়ে তুমি আমায় অপমান করবে।"

প্রতুলের রাগ তখন খুব। সে বলিল,—"সে ছেলে আর অন্য ছেলেতে ঢের তফাত। সে আমার দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত। সে শাস্তির তাপ তোমার গায়ে তো সইবে না।"

কণ্ঠস্বর ভারী করিয়া সুবর্ণ বলিল,—"আমি বেশ জানি ও আমার কেউ নয়। যখন তখন তুমি জানাতে চাও যে তুমি যখুনি ইচ্ছে করবে ওকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পার। আমার প্রতি তোমার কোন দৃকপাতও নেই। আমি যে একটা মেয়েমানুষ এ কথা তোমার মনেই হয়না। তোমার শুধু মনে হয় আমি মুকুটের কেউ নই, শুধু তোমার হুকুমে তাকে পালন করছি মাত্র। ক্ষমতা আছে বলেই একটা লোককে এমন্ শাস্তি দিতে নেই।"

বলিয়াই সে উঠিয়া গেল মুকুটকে শোবার ঘর হইতে আনিয়া খাওয়াইবার জন্য।

প্রতুল একা একা বসিয়া খাইতে লাগিল। সুবর্ণর কথা কথাগুলি তাহার মনে নানা তরঙ্গ তুলিল। এতদিন তা সুবর্ণর ব্যবহারে কৈ...

সহসা সুবর্ণ একটা চাপা চিৎকার করিতেই প্রতুল ভীত কণ্ঠে বলিল "কি হয়েছে?"

আলোটা হাতে এ ঘর ও ঘর ছুটাছুটি করিতে করিতে সুবর্ণ বলিল, "মুকুটকে দেখছিনা।"

প্রতুল বিস্ময়বিমূঢ়স্বরে বলিল—"সে কি, কোথায় গেল, খোঁজ জান না?"

ছুটিয়া সুবর্ণ বাহিরে গেল। প্রতুল একা বসিয়া রহিল। তাহার মনে এই অল্পকালের মধ্যে শত সম্ভব ও অসম্ভব ভবিতব্যের ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

তেমনি ছুটিয়াই সুবর্ণ আসিয়া সংবাদ দিল "না, সে আশে পাশে কোন বাড়ী নেই। কি হবে? তুমি অমন চুপ করে বসে আছ কেন? তাকে কি তুমি দিয়ে এসেছ? কথা কও। আমার যে তোমার চেহারা দেখে ভারী ভয় করছে।"

প্রতুলের ইচ্ছা করিতেছিল সে তাহার সকল ক্ষমতা নিয়া চিৎকার করিয়া ওঠে। কিন্তু তাহা চাপিয়া সে বলিল, —"আমি তাকে না নিয়ে গিয়েই ভুল করেছি! সন্ধ্যে থেকে ছেলেটা কোথায় গেল তার খোঁজ রাখনা, আর তুমি করছিলে তাকে ভালবাসার বড়াই?"—বলিয়া অর্দ্ধভুক্ত ভোজ্য ফেলিয়া রাখিয়া মুখ ধুইতে ধুইতে প্রতুল বলিল,—"তা হয়না সুবর্ণ! মেয়েমানুষের ঈর্ষা বড় ভয়ানক জিনিষ। তাকে তুমি ভালবাসবে সে উপাদান বিধাতা তোমায় দেননি। তবে আর একটা দিন অপেক্ষা করে এ ব্যবস্থাটা তুমি করলে পারতে। তোমার কণ্টক আমিই দূর করে দিতাম।"

সুবর্ণ আর্ত্তস্বরে বলিল,—"তুমি ও কথা বলতে পাবেনা। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি এই কথা তোমার বিশ্বাস হোল?"

নিষ্ঠুরভাবে প্রতুল বলিল,—"অভিনয় রাখ সুবর্ণ! আজই সে নিরুদ্দেশ হোল! তোমার সহস্র অত্যাচার এতদিন ধরে সহ্য করেও সেই বালকটার আজকের দিনটিতেই এমন বিবেক এলো যে সে আত্মসম্মান রাখার জন্যে বেরিয়ে পড়লো? আর তুমি যে তাকে মায়ের মত ভালবাস এই গর্ব্বেই ভগমগ, সেই তুমি সন্ধ্যে থেকে তার সংবাদটুকুও নিলেনা। এ হয়না সুবর্ণ আমি জানি তোমার চক্ষে ও ছিল বিষ, তোমার পথের কণ্টক ছিল সে। তাকে ধ্বংস করায় তার অপরিমিত উৎসাহ।"

নীরবে সুবর্ণ কাঁদে। এই তীব্র নিষ্ঠুর ভর্ৎসনার সে একটি প্রতিবাদও করিলনা। প্রতুল হয়ত মুকুটকে খুঁজিতেই বাহির হইয়া গেল।

সহসা মাথার উপর দরজা বন্ধ করার শব্দে সচকিত হইয়া সুবর্ণ উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল, পাশের বাড়ীর কে যেন এই কলহের দৃশ্যটা জানলার মধ্য হইতে উপভোগ করিতেছিল। এই মাত্র দরজা বন্ধ করিল।

ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে, ক্ষোভে সুবর্ণর একখানা মন দশখানা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। একদিকটায় সান্ত্বনা দিতে গেলে অপরদিকটা আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে। তাহার মুখের উপর তাহার স্বামী তাহাকে একটা জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করিয়া চলিয়া গেল, তাহার মানবত্বের, তাহার নারীত্বের, তাহার মাতৃবৃত্তির উপর সহস্র কুৎসা বর্ষণ করিয়া গেল। তাহাকে যে সে কতদূর অবিশ্বাস করে তাহা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গেল।

কিন্তু এ তো গেল তাহার নিজের কথা। মুকুটের কি

হইল? সত্যই তো সুবর্ণ তাহাকে বাহির করিয়া দেয় নাই, অন্তরে অন্তরে যে ওই ছয় বৎসরের শিশুটা তাহার হৃদয়ের কতটা অংশ অপহরণ করিয়া বসিয়াছিল তাহা কে জানিত! আজ সুবর্ণর বেশ মনে পড়ে সেই আড়াই বৎসরের মুকুটকে। তখন মুকুটের নিজের সত্বা বলিয়া বিশেষ কিছু উপলব্ধি ছিল না। সেদিনকার শিশুত্বের মান অভিমানের পালাটার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সুবর্ণর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া ঝুটো ঝুমঝুমি বা একটা বল বা গোটাচার পুতুলের মধ্যে সে আত্মবিস্মৃত হইত। তাহার নিদ্রিত মুখখানির পানে চাহিয়া কতদিনই যে সুবর্ণর মনে একটা চির-অপরিতৃপ্ত বাসনা উদ্বেল হইয়া উঠিত! তাহার অভিনব মন্ত্রে যে যাদুস্পর্শ ছিল তাহা মাঝে মাঝে গোপনে সুবর্ণর সকল বাহ্যেন্দ্রিয়কে যে অবশ করিয়া আনিত, এ কথা আর কেহ না জানুক সে তো জানে। ঐ শিশুর সুকোমল গণ্ড দুটি হইতে সবার অলক্ষ্যে কত চুমাই যে সে চুরি করিয়াছে! সেই সব মধুময় মুহূর্তগুলি যে তাহার মনে অনন্তের লেখা লিখিয়া গেছে। অসাফল্যভরা একটা অনুর্বর নারীজীবনে কোথা হইতে একটা আগাছা আসিয়া তাহার অশ্যামলতার অপবাদ ঘুচাইল। প্রয়োজন হইলে যে সে আর সব নারীদের সমান হইতে পারিত এ সংবাদ তো সে মুকুটের মধ্য দিয়াই পাইল। জীবনে সে প্রয়োজনও হইলনা, মুকুটও আজ কোথায় গিয়াছে কে জানে! মন-প্রাণকে নিতান্ত দরিদ্রের ন্যায় রিক্ত বলিয়া বোধ হয়। পরমেশ্বরকে বারংবার সুবর্ণ বলে, "তাহাকে ফিরাইয়া দাও প্রভু! জীবনের অনন্ত তৃষা তাহারই সান্নিধ্যে তৃপ্ত হইয়াছিল। দিবসের রৌদ্রদাহে আমার যে পরিচয় সে পাইয়াছে সে যে ঘোর মিথ্যা, কিন্তু রাত্রির মধ্যযামের সেই করুণ মুহূর্তগুলি, তাহাও তো তোমার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে লওয়া! সে সংবাদ তো তুমি জান! মুকুটকে ফিরাইয়া দাও!"

তাহার মনে হয় মুকুট আর আসিবেনা। সেই ঘোর কলঙ্কের পশরা সে কোন সামর্থ্যে বহিবে? স্বামীর নিকটে প্রমাণ করা কঠিন হইবে মুকুট তাহার কতখানি! আর সে প্রমাণ সে করিতেও চাহেনা। ওই প্রতিবেশীদের মধ্যে কাল প্রাতেই সকল কথা জানাজানি হইবে! তাহারই ঘোর অত্যাচারের ফলে ছয় বৎসরের একটা শিশু গৃহত্যাগ করিল, এ দারুণ অপবাদ হইতে তাহাকে কে মুক্ত করিবে? এই সহরের পথে যদি দুর্ঘটনার ফলে তাহার নির্জীব রক্তাক্ত দেহটা লুটাইয়া পড়ে, আর স্বামী যদি সেই দেহটা টানিয়া আনিয়া উঠানে ফেলেন! ওঃ সে সাংঘাতিক! মুকুটকে হয়ত কোন মটর নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া যাইবে। সে হয়ত 'মা' বলিয়া আর্তনাদ করিতে গেলে কে তাহার কণ্ঠ চিরতরে বন্ধ করিয়া দিবে।

এই তো জীবন! এ কতটুকু! কতটুকু ইহার স্থিতি! ঐ তো মুকুট গেল, কে তাহাকে ধরিয়া রাখিল? আজ এই রাত্রে যে কলঙ্কের চাপ সুবর্ণর মাথায় ভাঙিয়া পড়িল, প্রতিদিনের গতির সাথে সাথে সে আবর্জনা দশদিক হইতে বাড়িয়াই চলিবে। সুবর্ণ নিষ্ঠুর, বন্ধ্যা, সুবর্ণ পাষাণ, নিঃসন্তান সুবর্ণ সন্তানের স্নেহ জানেনা, সে শিশু হত্যা করিয়াছে, সে পাপ করিয়াছে। সহস্রজিহ্বা লোকাপবাদ সুবর্ণকে শতদিক হইতে দংশন করিবে। তবু সুবর্ণকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? কেন? স্বামীর নিকটে পাইবে সে চিরদিন ধরিয়া গ্লানি, তাহার কথায় থাকিবে বৃশ্চিকের জ্বালা, তবু সংসারে তাহার থাকা চাই? কেন? কি সুখে? স্বামী তাহার স্বামী নহে। সে তাহার ইচ্ছামত যখন কৃপা হয় মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা সুবর্ণকে তৃপ্ত করে, নহিলে স্বামী তো তাহার জন্য ভাবেনা। বিগত জীবনের কয়টা স্বর্ণময় দিন এই দম্পতির পানে সহাস্য নয়ন মেলিয়া আছে? মিথ্যা এই প্রসাধন, লোকপ্রবঞ্চনাকর এই অভিনয় আর কেন!

রাত্রি গভীর। আকাশে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ। মাঝে মাঝে নক্ষত্র খসিয়া পড়ে। আকর্ষণের ত্রুটিতেই তো অসময়ে পতন! গ্রহে নক্ষত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। তারারও মৃত্যু হয়!

সহরের কোলাহল স্তব্ধ। এই বিরাট নগরীর সে যেন এক পরম মৃত্যু! নিঃশ্বাস পড়ে না, রক্ত প্রবাহের গতি স্তব্ধ। দীর্ঘ একটা বিচ্ছেদের সুর আকাশ ও ধরার মধ্যে দুলিয়া বেড়ায়!

স্তব্ধ প্রতুলের গৃহের কোণ। স্তব্ধ সুবর্ণর সকল চিন্তা। কোথাও কোন শাড়াশব্দ নাই। কেবল একটা চাপা করুণ

আর্ত্তনাদ কাহার বক্ষ কন্দর ভেদ করিয়া গৃহের অতি গম্ভীর বিষণ্ণতাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে। মৃত্যুকাতর সে আর্ত্ত-নাদের বিরাম নাই।

ভোর হয়। প্রভাতের আলো আকাশের বুকে দেখা গেলেও গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া পহুঁছে নাই। সুবর্ণ অতি কষ্টে চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখে কেহ আসিল কি না।

ক্ষীণ স্বরে ডাকে "মুকুট, এখনও আয়।" একবার তাহাকে সে দেখিতে চায়।

রৌদ্র তখন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে নগরীর প্রতি সৌধ-চূড়ায়। প্রতুল আসিল। সাথে মুকুট।

প্রতুল ঘরে ঢুকিয়াই স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মুকুট কহিল—"মা ঘুমুচ্ছে!"

ক্ষীণ কণ্ঠে, প্রতুলের পানে চাহিয়া, সুবর্ণ বলিল,—"এসেছো?...মুকুট এসেছে?"

প্রতুল চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "কি খেয়েছ সুবর্ণ? বল শীগ্‌গির। এ কি করেছ তুমি? কি খেয়েছ বল!"

কোন মতে চক্ষু টানিয়া সুবর্ণ বলে, "কিছু না, তুমি মুকুটকে আমার কাছে দাও!"

প্রতুল ছুটিয়া বাহির হইতে যায়। "কোথায় যাচ্ছ?" বলিয়া সুবর্ণ বাধা দিবার চেষ্টা করে। "ডাক্তার ডাকতে" বলিয়া প্রতুল বাহির হইয়া যায়।

মুকুট মায়ের মুখের পানে জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিয়া থাকে।

সুবর্ণ বলে, "কোথায় গিয়েছিলি মুকুট?"

কিন্তু তাহার অর্দ্ধোচ্চারিত কথা মুকুট বুঝিতে পারে না। নিমীলিতনয়না মায়ের অর্দ্ধোচ্চারিত কথা শুনিয়া মুকুট ভয় পাইল। সে তাহার মায়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া আঙ্গুল দিয়া চক্ষের পাতা টানিয়া ফাঁক করিয়া দেবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মুখে বলিল—"থানায় ছিলাম মা, পুলিশের কাছে!"

মায়ের নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না। কেবল দুটি শিথিল বাহুতে সে মুকুটকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

মৃত্যুকে তখন মুকুট বেশ বোঝে। মা যে আর ফিরিবে না তাহা সে জানিল। প্রতুল ঘাট হইতে ফিরিলে মুকুট শুধু বলিল—"বাবা, মা কেন মরে গেল?"

প্রতুল উদাস দৃষ্টিতে শয়ন-কক্ষের পানে চাহিয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না।

উত্তর কালে মুকুট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। মা বলিতে তাহার যে মুখখানি মনে আসে মুকুট তাহাকেই মা বলিয়া জানে। মায়ের মৃত্যু দিনের কথাটা চিরদিনই তাহার মনে ছিল। তেমনিই মনে ছিল যে সেই মৃত্যুটা ঘটিয়াছিল একটা অজ্ঞাত কারণের বীভৎসতার মধ্যে। মুকুটের মায়ের প্রতি স্নেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুবর্ণর স্বর্গত আত্মা তাহাতে উল্লসিত হইয়াছিল না বিষণ্ণ হইয়াছিল তাহা কেহ জানে না। বৃদ্ধ প্রতুল পুত্রের এই ভ্রম কোন দিন অপনোদন করে নাই। মনে মনে সে সুবর্ণর প্রতি যেরূপ অপরাধী বোধ করিত, মুকুটের ভ্রমজাত মাতৃস্নেহে তাহার কথঞ্চিৎ প্রতিকার করিবে আশায় সে নীরব হইয়াই জীবনের সমাধি করিল।

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

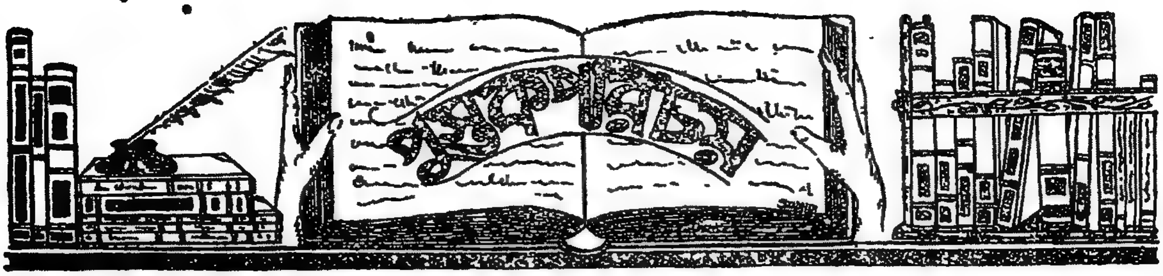

ব্রাউনীং পঞ্চাশিকা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্-এ (ক্যাল ও ক্যান্টাব), এ-আর-সি-এস্ (লণ্ডন), আই-ই-এস্ (রিটায়ার্ড) প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র কর্ত্তৃক অনূদিত রবার্ট ব্রাউনিং-এর কবিতাসমূহ হ'তে পঞ্চাশটি কবিতা নির্ব্বাচন পূর্ব্বক এই কাব্যগ্রন্থটি রচিত হয়েছে। বিদেশী কবিতার অনুবাদে সুরেন্দ্রনাথের অপরূপ দক্ষতার কথা বিচিত্রার পাঠকবর্গের নিকট অবিদিত নয়। শুধু তাই নয়, আলোচ্য গ্রন্থভুক্ত কয়েকটি কবিতার সহিত বিচিত্রার মারফৎ তাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয়ও আছে। 'ব্রাউনীং পঞ্চাশিকা' পাঠ ক'রে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রসন্ন হ'য়ে সুরেন্দ্রবাবুকে যে প্রশংসা-বাদ পাঠিয়েছেন গ্রন্থসম্পর্কে তদতিরিক্ত কিছু বলতে যাওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক ব'লে মনে করি। নিম্নে আমরা সেই প্রশংসা-লিপিটি মুদ্রিত করলাম।

কল্যাণীয়েষু,

ব্রাউনিঙের কবিতাগুলিকে তুমি যে বাংলারূপ দিয়েছ তা অপরূপ হয়েছে। তাতে অনুবাদের ক্লিষ্টতা লেশমাত্র নেই, তাতে যেন নবজন্মের নূতন শ্রী প্রকাশ পেয়েছে। সত্যেন্দ্র দত্তের অনুবাদে ছন্দোনৈপুণ্যের সহজ লীলা দেখা যায়, কিন্তু তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। বিদেশী রসপণ্যের ভার নিয়ে তুমি এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে খেয়া দিয়েছ দুর্গমতম উজান পথে। দুঃসাহসিক নাবিকবৃত্তিতে এ রকম কৃতিত্ব দেখা যায় না। ইতি ১৪।১২।৩৬

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাস্তবিকই দেখা যায় না,—বিশেষতঃ যখন দুরূহ ব্রাউনিং-কাব্যের বন্দর হ'তে সরসতা বহন ক'রে বাংলা অনুবাদের বন্দরে উপনীত হবার অবলীলার কথা স্মরণ করি। গ্রন্থের ভূমিকায় সুরেন্দ্রবাবু বলেছেন, "মূল কবিতায় ভাবের সঙ্গে ভাষার যে সহজ সামঞ্জস্য আছে, তাদের সমষ্টিগত গুরুত্ব ও আবেগটিকে বাঙলা ভাষায় কি রূপ দিতে পারলে ঠিক সংঘাতটি মনে লাগে এবং ঠিক সুরটি বাহির হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা ছাড়া অনুবাদের আর কোনো গূঢ় সঙ্কেত আছে কি না জানি না।" আলোচ্য গ্রন্থে অন্ততঃ এই 'গূঢ় সঙ্কেতটি' যে সম্পূর্ণ-ভাবে রক্ষিত হয়েছে, মূল কবিতার সহিত অনুবাদ মিলিয়ে পাঠ করলে সে বিষয়ে মন নিঃসন্দেহ হয়।

সুরসিক কাব্যামোদীর সেল্‌ফের প্রথম থাকের গ্রন্থ-সমষ্টিতে 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা' আর একটি সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে।

গ্রন্থটির ছাপা কাগজ এবং বাঁধাই সুরুচি এবং আভি-জাত্যের পরিচায়ক।"

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গীতগোবিন্দ—অনুবাদক শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ। প্রকাশক—গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷০ টাকা।

শ্রীমান বিমলাশঙ্কর দাশ বিরচিত গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদ পড়িলাম। একথা বলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি না যে পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বিমলাশঙ্করের দু'একটি কবিতা ইতিপূর্ব্বে "মাধবী" পত্রিকায় পড়িয়াছি, কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে এমন আশ্চর্য্য কবিপ্রতিভা লুক্কায়িত আছে তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদে সুললিত পদবিন্যাস এবং বাক্যচ্ছটা যত না চোখে পড়ে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী করিয়া চোখে পড়ে এই তরুণ কবির ছন্দবৈচিত্র্য। মূল গ্রন্থের ভাব এবং ভাষা এমন সুললিত ভঙ্গীতে বাংলা ছন্দে আমদানী করিয়াছেন যে, মন স্বতঃই তাঁহার রচনাভঙ্গীর প্রতি সম্মান জানাইতে দ্বিধা করে না। আর ছন্দবৈচিত্র্যের কথা কী বলিব। তরুণ কবির ধ্বনিময় ভাষা তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া কলগর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে, অপ্রতিহত তার বেগ, স্পন্দনময় তার বাণী,—

"পরাণে বহে যদি শ্রীহরি-প্রেম-নদী
জানিতে চাহ যদি বিলাস-রীত,
ঢালিও শ্রবণেতে এ সুধা নিরবধি
গাহিছে জয়দেব যে মধু গীত।"

* * *

"পূজি পদ-পঙ্কজ চন্দনগন্ধে
তব দশ-রূপ-রাশি জয়দেব বন্দে—
সকল ভুবনে যার মধু-মাখা ছন্দে
শোন সবে জগদীশ জয়।"

* * *

"ভুবন ভরি শ্যামেরে খুঁজি মলিন হয় অঙ্গরাগ
শুকায়ে যায় প্রিয়ের লাগি, রাধার তনু-কুসুম বাগ,
ফাগুন আসে রঙ্গীন সাজে, বঁধুয়া তবু আসিল কই?
বিরহ হেরি আদর করি' মধুর স্বরে কহিছে সই—"

* * *

"সরস মসৃণ অতি চন্দনপঙ্ক
তরল গরল ভাবি হেরিছে সশঙ্ক"

* * *

"অন্তর মন্থনি'
মৌলি বিঘূর্ণনি'
টুটি দেয় কুণ্ডল-পুষ্পহার—
দৃষ্টির হর্ষণে
গুঞ্জনে, কর্ষণে
মৃগাক্ষী বিমোহনে, মন্ত্রসার,—"

* * *

"অবিরত
মন্মথ
দহনে
প্রিয়তম বিহনে
বিষাদিতা চিত্ত-ব্যথায়,
সকরে
হরিভরে—
চিন্তা—
কলহান্তরিতা—।
সখী কহে মিষ্ট কথায়—"

যিনি একদিন মেঘৈর্মেদুরম্বরং নিরীক্ষণ করিয়া রাধা-মাধবের লীলাময় বিরহ-মিলন-গীতি ভক্তিপূত চিত্তে রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার পর কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে। মানুষের মনের গতি কত নবতর পন্থায় পরিচালিত হইয়া, কত মোড় ঘুরিয়া, কত দিকে বিদিকে পরিচালিত হইয়া চলিয়াছে। কোথা সেই বাচঃপল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ, কোথা সেই শৃঙ্গারোত্তরসৎ, প্রমেয়রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন, কোথা সেই ধোয়ী যে শ্রুতিধর! মানুষের কত কবি কত রূপে রঙে রসে মানুষের চিত্তজয়ের দিগ্বিজয়ে পৃথিবীকে নিনাদিত করিয়া গিয়াছেন; মেঘমেদুর বঙ্গদেশে আজ পুনর্ব্বার আর এক কবির মৃদঙ্গ বিশ্বহৃদয়কে সম্মোহিত করিতেছে, যাঁহার মধ্যে জয়দেবের গীতি, কালিদাসের উপমা, চণ্ডীদাসের প্রাণ পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে। কিন্তু এই সবের মধ্যে একটি ধারা চিরন্তন বহিয়া চলিয়াছে—নরনারীর প্রেম—কোথাও বা সে শকুন্তলার চোখের জলে, কোথাও বা সে শ্রীরাধিকার আত্ম নিবেদনে, কোথাও বা সে সীমার মাঝে অসীমের আবাহনে। এই প্রেম মানুষকে পশুত্বের জড়ত্ব হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে, মরলোক হইতে অমরলোকে লইয়া গিয়াছে। মানুষ যে দিন অগ্নি আবিষ্কার করিয়াছিল সে দিন সে বড় হয় নাই, যে দিন

সে প্রেম-বহ্নিকে আপনার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল সেই দিন হইতেই সে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। সেই জন্য গীত-গোবিন্দ মানুষের অমরতার জয়গান,—সঘন জঘন পীন পয়োধরের দ্বারা যতই সে কণ্টকিত হোক না কেন, তথাপি তাহার আদিম সুরটি মানুষের পশুত্বকে পরাভবের সুর।

এই কথাগুলি বলিবার প্রয়োজন আছে। 'সরল ঘনে জঘনে এবং 'রচয় কুচয়োঃ পত্রং' শুনিলেই আমাদের নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া ওঠে, এই জন্যই এই কথাগুলি বলিবার প্রয়োজন। বিমলাশঙ্কর যতদূর সম্ভব আমাদের নাসিকা কুঞ্চনকে সম্মান করিয়া চলিয়াছেন, সঘন জঘনকে তিনি যথা-সম্ভব তিমিরাবরণেই রাখিয়াছেন।

এই তরুণ কবি অনুবাদে সিদ্ধহস্ত একথা মুক্তকণ্ঠে বলা চলে। আশা করি অনুবাদে তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, মৌলিক রচনায় তদপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইবেন। তাঁহার কবিপ্রতিভা অচিরেই কাব্যামোদী পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিবে এ ভবিষ্যদ্বাণী আমি মুক্তকণ্ঠেই করিতেছি।

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

পাপের রাজ্যে (দ্বিতীয়-সংস্করণ)—হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট রচিত। প্রকাশক—শ্রীননীলাল ভট্টাচার্য্য, ১নং তালিমতলা লেন, কলিকাতা। ৯১ পৃষ্ঠা। মূল্য সাত আনা।

কলিকাতা সহরে অবিরত যে নানাপ্রকার, জাল, জুয়াচুরি, চুরি, রাহাজানি প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান চলিতেছে, এই পুস্তকে তাহার কতকগুলি বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। পকেটমার, টপ্‌কাওয়ালা ও নসরিয়ারা কি করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে, এলাচিখেলার বেড়াজালে প্রতারকরা কি করিয়া শীকার ধরে, চাকুরী দিবার প্রলোভন দেখাইয়া এবং ব্যবসায়ী সাজিয়া কি করিয়া প্রতারণা করে, এই পুস্তক পাঠে লোকে তাহা জানিয়া সাবধান হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ সহরে নবাগতদের পুস্তকখানি বিশেষ উপকারে লাগিবে। শেষভাগে সামাজিক দুর্নীতি বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাও সকলের প্রণিধানযোগ্য।

বাংলাপুস্তকে অনর্থক বহু ইংরাজী কথা দেওয়া হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ ভাল নয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

Visva-Bharati Bulletin. No. 20. February. 1936
(Visva Bharati Book Shop. Calcutta.)
Price /8/annas.

বাংলা দেশে অনেকেই হয়ত কিছুকালের মধ্যে বঙ্গীয় শিক্ষা সপ্তাহের কথা ভুলে যাবেন কিন্তু যাঁহারা সেদিন সেনেট হাউসে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধ শ্রবণ করেছিলেন তাঁরা কোনদিন এই কথা ভুলতে পারবেন না। বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের যৌবনদীপ্ত তেজঃপূর্ণ উদাত্ত বাণী সেদিন সেনেট হলে বজ্র নির্ঘোষে প্রচারিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' বাংলার প্রত্যেক হিতকামী এবং ভাষা প্রেমিকের অবশ্য পাঠ করা প্রয়োজন বাংলা দেশের সঙ্কটকালে রবীন্দ্রনাথের গভীর সাধনা ও প্রতিভাসমুজ্জ্বল, নির্ভীক ও ইঙ্গিতপূর্ণ বাণী জাতির বিশেষ উপকারে লাগবে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের শিক্ষা নিয়ে বহুকালাবধি আলোচনা করে এসেছেন। সকল চিন্তাব যেন শ্রেষ্ঠ এক সারাংশ এই প্রবন্ধে স্থান লাভ করেছে। আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত কেহ এত অধিকাল ধরে এত গভীর ও ব্যাপকভাবে আলোচনা করেননি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরেজীশিক্ষায় আমরা কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হই। ইংরেজী শিক্ষার ফলে সেকালে কোন কোন বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি পরধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। সেকালে ইংরেজীর শিক্ষার বিশেষ আদর ও চর্চ্চা হয়েছিল। সে ধারা বহুদিন প্রবলভাবে বাংলা দেশে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন হিসেব নিকেশ করে দেখা যাচ্ছে গর্দ্দভের সিংহ চর্ম্ম পরিধানের ন্যায় লাভ হয়েছে। অর্থাৎ নিজস্ব স্বকীয়তা, স্বাভাবিকতা ও সৃষ্টিক্ষমতা হাবিয়ে গর্দ্দভ নিয়ে নাকাল অবস্থা!

ইংরেজী শিক্ষায় আমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে আমাদের মনের আংশিক মুক্তিলাভ ঘটেছে নিঃসন্দেহ; এবং

সে অমূল্য দানের জন্য আমরা চিরদিন ইংরেজীর কাছে ঋণী থাকব। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা আমাদের মধ্যে যে নতুন জাতিভেদের সৃষ্টি করেছে তা ভয়াবহ, আমাদের সংস্কৃতির রাজ্যে যে চীনের প্রাচীর তুলে দিয়েছি তা দুর্লঙ্ঘ্য,—ওটিন ক্রীম মাখা দেশী মেম সাহেবের সঙ্গে বিলেতী মেমের যে পার্থক্য।

আমাদের দেশে শিক্ষার ভূরিভোজনের জন্য রবীন্দ্রনাথ দেশী ভাষার পত্র বিস্তারিত করতে বলেছেন—বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সত্য ও সাধনা আমাদের মানুষের মন সবল, সক্রিয় ও সৃষ্টিক্ষম করে তুলুক এই রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে অনেক কথা বলেছেন, তা নিয়ে বহু আলোচনা চলতে পারে। বাংলা দেশে এই আলোচনা হোক্ এই আমার প্রার্থনা।

এই গ্রন্থে অন্য একটী প্রবন্ধ আছে,—পণ্ডিত ক্ষিতিমোহনের "শিক্ষার স্বদেশীরূপ"। এটি যেন রবীন্দ্রনাথের Theoremএর corollary. ক্ষিতিমোহন বলছেন আমাদের দেশে চতুষ্পাঠীর মধ্যে যে নিঃস্বার্থ, গভীর, বিস্তৃত এবং স্নেহসিক্ত জ্ঞান দানের ব্যবস্থা ছিল তার ঢঙ বদলাতে হবে। ভারতবর্ষ ছাড়া অনেক নূতন সত্য তথ্য এবং রহস্য অন্যান্য দেশে উদ্ঘাটিত করেছে। সেই সকল জ্ঞানকে হারান রত্ন বলে সংগ্রহ করে চতুষ্পাঠীর রত্নভাণ্ডারে স্থান দিতে হবেই, জৈব নিয়মানুসারে এর বিকাশ হোক, মোমীর মত মৃত হয়ে যেন না থাকে।

এই উভয় প্রবন্ধ এক সঙ্গে পাঠ করলে অনেক বিষয়ে খোরাক পাওয়া যাবে।

জরীন কলম

কাব্য-নির্ণয়। ৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত। নবম সংস্করণ। প্রকাশক শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পাটনা। মূল্য ২।০ টাকা মাত্র।

কাব্য-নির্ণয় বাঙলা ভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। সংবৎ ১৯১৯ সালে, অর্থাৎ ৭৪ বৎসর পূর্ব্বে, এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার পর পরে পরে ক্রমশঃ নয়টি সংস্করণ হয়েছে। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ই বি কাউয়েল মহাশয় কর্ত্তৃক এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত সূত্র-বাক্যগুলির ইংরাজি প্রতিশব্দ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থখানির মূল্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়েছে। শুধু স্কুল এবং কলেজের ছাত্রগণের পক্ষেই নয়, সাধারণ পাঠক এবং সাহিত্যিকদের পক্ষেও অলঙ্কার শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি বিশেষ ভাবে অনুসন্ধেয় এবং উপকারী।

গ্রন্থখানি ছয়টি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত—যথা, রসপরিচ্ছেদ, গুণ পরিচ্ছেদ, রীতি পরিচ্ছেদ, ছন্দঃ পরিচ্ছেদ, অলঙ্কার পরিচ্ছেদ, ও দোষ পরিচ্ছেদ। ইহা ভিন্ন 'অতিরিক্ত বিষয়ের এক অধ্যায়' এবং পরিশেষে দণ্ডী, ভরত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকগণের অলঙ্কার শাস্ত্র হ'তে সঙ্কলিত সূত্রাবলী সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

কাব্য-প্রদীপ—শ্রীসুধীরকুমার দাশ এম্-এ প্রণীত। প্রকাশক,—শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৯৩।২ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন, "কাব্যনির্ণয় গ্রন্থের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের অনুরোধে 'কাব্য-প্রদীপ' লিখিত হইয়াছে। পরিপুষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ ও প্রয়োজনানুযায়ী বাঙ্গালা অলঙ্কার শাস্ত্রের কয়েকটি আবশ্যকীয় বিষয় বাছিয়া লইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থে পৃথকভাবে আলোচিত হইল। কাব্য-নির্ণয় গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, এখানে তাহা পুনরুক্ত হয় নাই।" এই উক্তি হ'তে বোঝা যাচ্ছে যে আলোচ্য পুস্তকটি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের নবতন দৃষ্টিতে কাব্য-নির্ণয় গ্রন্থের পরিপূরক। এই সুলিখিত পুস্তকটি পাঠ ক'রে আমরা সুখী হয়েছি। বাঙলা ভাষার ছাত্রগণের উপকারে লাগবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীবিষ্ণু শর্ম্মা

অচেনা বঁধু

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

যেথা ধানক্ষেতে সবুজ সে
মাঠের জলে
শাঁপলা ধবল তার
আঁচোল তোলে,
চেয়ে চেয়ে সেইখানে
মন যে অকূলে টানে,
লাবণী-সায়র প্রাণে
আপনি খোলে,—
মূক হয়ে আমি রই
কাহার কোলে ?

ঐ যেথা দেখা যায়
রূপালী ধারা
কাশের কেয়ার কূলে
আপনা হারা,
বুকের সফল ক্ষুধা
জুড়ায়ে হয় গো সুধা
কাহারে পাইয়া সেথা,
আমি গো সারা ?
ছোট বুক হয় মোর
মাঠের পারা !

এই হরিত ধরণী জুড়ি
নীলের মাঝে,
মোরে কাহার মাধুরী ডাকে
উষায় সাঁঝে ?
রবি মোর ডুবে যায়,
সোনার সে দরিয়ায়,
গোপন প্রেমের তার
গহন লাজে !
ওগো কে মোরে আগলি রাখে
সকল কাজে ?

তুমি বুঝি অকূলের
নিখিল বঁধু,
সুখের দুখের মোর
পদ্ম মধু !
অনিমিষ ঐ আঁখি
চেতনায় মেলে রাখি,
না জানি কেমনে লহ
ডুবায়ে শুধু—
অপরশ চুম্বনে
চুমিয়া বঁধু !

সিকিম ও তিব্বতে বারো দিন

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এল.

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গ্যাণ্টক সিকিম-রাজ্যের রাজধানী। নাতিবৃহৎ মনোমুগ্ধকর পার্ব্বত্য শহর, পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন। রাস্তাঘাটগুলি চমৎকার, অধিকাংশই পিচ্-ঢালা। বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত। শহরের অবস্থিতি একসারি পাহাড়ের কোলে। এর রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে করতে মনে হয় যেন দূরে চারপাশে ঘেরা উঁচু উঁচু পাথরের প্রাচীর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বুরুজ। গ্যাণ্টকের উচ্চতা ৫৮০০ ফিট। এই নগরের গৌরব অধুনা অনেক বেড়ে গিয়েছে, কেননা, সিকিম, ভুটান, ও তিব্বতের ব্রিটিশ পোলিটিকাল অফিসার এখানে বাস করেন। এঁকে বৈদেশিক রাজদূতও বলা যেতে পারে। রাজনীতি-ঘটিত কারণের জন্যই এই পদের সৃষ্টি। যদিও এই সব রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করবার এঁর অধিকার নেই, তবু তিন রাজ্যেরই রাজনীতির ওপর এঁর প্রভাব যথেষ্ট। সেই কারণে সিকিম-মহারাজ ও রাজকর্ম্মচারীরা অধিকাংশ সময়েই এখানেই বাস করেন। গ্যাণ্টকের ডাকবাংলোটি খুবই প্রশস্ত, এবং দুটি ক'রে ঘর ও সংলগ্ন স্নানের ঘর নিয়ে তিনটি ব্লকে বিভক্ত। প্রত্যেকটি ব্লক, খাটবিছানা, টেবিল-চেয়ার আয়না ইত্যাদি সকল প্রয়োজনীয় আসবাবে সুসজ্জিত। এর অবস্থিতি কতকগুলি বড় বড় রাস্তার সন্ধিস্থলে।

আমরা ডাকবাংলোতে পৌছিবামাত্রই আমাদের অভ্যর্থনা করলেন আমাদেরই পথ-প্রদর্শক শ্যুঠি পিণ্টু। জানলাম তিনি ভারবাহী ও সওয়ারীর পশুগুলি নিয়ে সেইদিনই বেলা ১১টার সময় পৌছেছেন। মালপত্র সব যথাস্থানে গোছগাছ ক'রে রেখে রসদের বাক্স হ'তে চা সংগ্রহ করে ১০ মিনিটের মধ্যেই তিনি মুখ প্রক্ষালনের জন্যে গরম জল ও পানের জন্যে গরম গরম চা প্রস্তুত করে আনলেন। রসদের Tiffin বাক্স থেকে কালিম্পং-এর বাটীর গৃহিণীদের তৈরী কড়াইশুঁটির কচুরী, আলুরদম, মিষ্টান্ন ইত্যাদি চা এর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে, গ্যাণ্টক নগর পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রথমেই যাওয়া গেল ডাকঘরে। সাত আট মিনিটের পথ, কিছু উঁচুতে। মোটরের পথ নিরাপদে সমাধা করার সমাচার দিয়ে সবার আপন আপন বাড়ীতে পত্র পাঠান গেল। ডাকঘরের কিছু উপরেই Resident সাহেবের ও সিকিম-রাজ্যের আইরিশ সেক্রেটারী সাহেবের দুটি মনোরম উদ্যান

গ্যাণ্টক রাজপ্রাসাদ সম্মুখস্থ রাজপথ

সম্বলিত ভবন দেখলাম। এই সেক্রেটারী সাহেব একাধারে স্থানীয় উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, আবার রাজ-দপ্তরের প্রধান কর্ত্তা। বেতন শুনলাম পাঁচ শত মুদ্রা। যদিও ইনি মহারাজেরই নিযুক্ত কর্ম্মচারী এবং যদিও কাগজে কলমে মহারাজ ইচ্ছা হলেই এঁকে বরখাস্ত করতে পারেন, তবু কার্য্যত এই পদ পোলিটিক্যাল অফিসারের অনুগ্রহের ওপরেই নির্ভর করে। সিকিম দরবার আজ প্রায় ৩।৪ বৎসর

তোল সিকিমী বালকদের উচ্চশিক্ষার জন্যে বাৎসরিক ২৫০০০৲ মুদ্রা ব্যয়ে এই উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিদ্যালয়টি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। ছাত্রসংখ্যা তিনশো। যোগ্য বেতনে উপযুক্ত শিক্ষকও নিযুক্ত করেছেন। তার মধ্যে দু'জন বাঙ্গালী ও একজন বেহারী। এছাড়া সিকিমী বালকদের কারিগরী শিক্ষার জন্যে একটি বিদ্যালয়ও গ্যাংটকে সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে।

সিকিম খুব ধনশালী রাজ্য নয়। রাজ্যে লোকসংখ্যাও খুব অল্প। সবশুদ্ধ এক লক্ষ বিশহাজারের বেশী হবে না। গ্যাণ্টক শহরে হাজার দুই লোকের বাস। সিকিমের আদিম-

গ্যাণ্টক—ম্যাল

অধিবাসীরা জাতিতে লেপ্‌চা। সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, পাঁচ ছয় হাজারের অধিক নয়। এই পার্ব্বত্য জাতি অত্যন্ত ভীরুস্বভাব ও উদ্যমহীন। কিন্তু শিশুর ন্যায় সরল প্রকৃতি। এখনো পর্ব্বতের নিভৃত কন্দরে গুপ্ত, বনজঙ্গলে বাস করতে ভালোবাসে। কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব জাতীয় ভাষায় ও আপন আদিম সিকিমী-সভ্যতার স্পর্দ্ধা করতে পারে। সাধারণত যাদের আমরা সিকিমী বলি, তারা আসলে তিব্বতীয়। গত তিন শতাব্দীর মধ্যে তারা হিমালয়ের ওপারের তিব্বত দেশ থেকে নেমে এসে লেপ্‌চাদের হারিয়ে দিয়ে তাদের দেশ দখল করেছে। কিন্তু এরা অত্যন্ত অলস প্রকৃতি, কৌশলবিহীন ও জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ। ফলে আজ সিকিমের শ্রমিক মজুর প্রায় সব নেপালী। সিকিমের বাসিন্দা শতকরা নব্বই জন আজ নেপাল ও অন্যান্য প্রদেশবাসী। এই পরিশ্রমী বিবেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় সিকিমবাসী হেরে গেলেও এদের আগমনে সিকিমের যে অনেক রকম উন্নতি হয়েছে, তাতে একটুও সন্দেহ নেই।

ডাকঘর ও রেসিডেন্সী হ'তে ফিরে আমরা ডাকবাংলোর পাশ দিয়েই চললাম, রাজপ্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন ধর্ম্মমঠ দেখতে। আগেই বলেছি, যে রাণী চুণা দরজী মহারাজের ভগিনী। তিনি পথ প্রদর্শকের হাতে প্রধান মন্ত্রীমশাইকে (সিকিমে যিনি রেণক কাজী নামে প্রসিদ্ধ) এক পরিচয়-পত্র দিয়েছিলেন। রেণক সিকিমের অন্তর্গত একটি পরগণার নাম, কাজী শব্দের অর্থ ভূস্বামী। প্রাসাদ-তোরণের সম্মুখে সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী শোভিত Mall ধরে একটু এগিয়ে যেতেই আমরা দেখতে পেলাম, দ্বারের দুই পাশে তিব্বতীয় পোষাকে সজ্জিত দুজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দূর হতেই পথ প্রদর্শক আমাদের বলে দিলেন, যে একজন রায়সাহেব সনাম দাদুল রেণক কাজী, অন্যজন মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী, রায় সাহেব টাসি দাদুল ডনসাপা উভয়েই আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দ্দন করে পরিচয় দিলেন। প্রধান মন্ত্রী রণক কাজী ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ। প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেব তাঁকে আমাদের কথা সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী পরিষ্কার ইংরাজী বলেন। তিনি দার্জিলিঙ সেণ্ট জোসেফ স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিলেন। গৌরকান্তি, দীর্ঘকায়, পৃষ্ঠে দোদুল্যমাণ বেণী রাজপ্রাসাদ সমস্ত ঘুরে দেখে আমরা উদ্যান-সংলগ্ন ধর্ম্মমঠ বা গুমফা দেখতে গেলাম। মঠটি সম্প্রতি মহারাজ স্থাপন করেছেন। প্রাসাদ ও গুমফা দারুনির্ম্মিত ও মনোমুগ্ধকর। এই মঠে যে ছ'জন লামা বা পুরোহিত বাস করেন তাঁরাই মঠের ভেতরটা সব যত্ন করে দেখালেন। মঠটি ত্রিতল। প্রথম ও দ্বিতীয় তলে বুদ্ধমূর্ত্তি ও বুদ্ধের অনুরূপ অন্য সব মূর্ত্তি রয়েছে দেখলাম। ত্রিতলে লামারা বাস করেন। মন্দিরের দেয়াল সব নানা বর্ণে, কারুকার্য্য ও চিত্রে ভরা। পত্র পুষ্প নৈবেদ্যাদি পূজার উপকরণের

কোনও বালাই নেই, কেবল প্রত্যেক মূর্ত্তির সামনে কাঁচের বাক্সের মধ্যে কাঁসার পাত্রে প্রজ্বলিত আগুন দেখলাম। প্রতি মঠেই অনেক পুঁথি বা ধর্ম্মগ্রন্থ থাকে, তিব্বতীয় কাগজের ও তিব্বতীয় ভাষায় লেখা এই সমস্ত গ্রন্থ মন্দিরগাত্রসংলগ্ন কুলুঙ্গীতে সাজান থাকে। দেবতার সম্মুখে লামারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ পড়েই নাকি পূজা সমাধা করেন। মন্দিরের

কাজুগুম্ফার লামাগণ

অভ্যন্তরে কোনও ছুঁতের হাঙ্গামা নেই। আমরা মূর্ত্তির একেবারে সামনে পর্য্যন্ত বিনা আপত্তিতে চলে গেলাম। নিয়মের মধ্যে কেবল বামদিকে হতে দক্ষিণে যেতে হবে। কোন মঠেই লামারা দক্ষিণ হতে বামে প্রদক্ষিণ করতে দেবে না। গুমফা পরিদর্শন শেষ হলে দেবতার প্রণামী স্বরূপ লামাদের হাতে কয়েক মুদ্রা দেওয়াতে সসম্ভ্রম অভিবাদন থেকে বুঝলাম, যে তাঁরা যথার্থ খুসী হয়েছেন। এর পরে আমরা সিকিম দরবারে নূতন দপ্তরখানা ও গালিচার কারখানা দেখতে গেলাম। সিকিমী মেয়েরা কাঁচা পশমকে নানা রকম পাট করে তাঁতে কারপেট বুনছেন দেখলাম। এঁরা পশম রঙাবার জন্যে যে সব রং ব্যবহার করেন তা নানারকম দেশী গাছ গাছড়া ও শিকড় হ'তে ঐ কারখানাতেই তৈরী করে নেওয়া হয়। প্রাসাদ ও গুমফা চারিদিক ঘুরে যে রাস্তা গেছে আমরা সেই রাস্তায় আবার ফিরে এসে কর্ম্মচারীদ্বয়ের কাছ হ'তে বিদায় নিলাম। মল্ (Mall) ধরে কিছুদূর ডাকবাংলোর দিকে আসতেই রাস্তার ওপর নানা ফুলগাছে সাজান এক ছোট বাগানে একটি পথিকের বিশ্রামমঞ্চ দেখলাম, তার মধ্যে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের মূর্ত্তি। মূর্ত্তিতলে খোদিত রয়েছে "সিকিম রাজ্যের রাজভক্ত প্রজার রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ নির্ম্মিত।" তারই পাশে সিকিমের প্রথম পোলিটিকাল অফিসারের নবনির্ম্মিত স্মৃতি-মন্দির হোয়াইট মেমোরিয়াল হল (White Memorial Hall)। এই হলটি ইট পাথরের তৈরী ইমারত। এইখানেই জনসাধারণের সভাসমিতি বসে। রাজ

গ্যাংটকের রাজ দপ্তরখানা

প্রাসাদে উড্ডীয়মান বৃটিশ পতাকা—Union Jack। প্রশস্ত রাজপথে পথিকের বিশ্রামমঞ্চে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রতিমূর্ত্তি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই ডাকবাংলোতে ফিরে শুনলাম, যে রেণক কাজী আমাদের জন্যে ছ'সের দুধ ও পরদিনের পাথেয় স্বরূপ ১০ সের মাটন ও চল্লিশটি ডিম পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঐ শীতের দেশে কাঁচা মাংস খারাপ হয়ে যাবার কোনও আশঙ্কা ছিলনা। ডাকবাংলোর চৌকীদারকে নৈশ ভোজন প্রস্তুত করতে বলে আমরা একটু বিশ্রাম করতে গেলাম। প্রশস্ত বারান্দায় আরাম-কেদারায় বিশ্রাম করবার সময়, সেইখানে তিন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হোল। এঁরা আমাদেরই সমগোত্র, অর্থাৎ তিব্বত-যাত্রী; কিন্তু তাঁরা

গ্যাণ্টক বাজার

সেটা শেষ করেছেন, আমাদের সেটা এখনো বাকী। যে পথে আমরা যাব, সেই পথেই তাঁরা নাথু-লা পর্য্যন্ত পদব্রজে গিয়েছিলেন। ফিরে সেইদিনটা গ্যাণ্টকে বিশ্রাম করে, পরদিনই কলিকাতায় চলে যাবেন। তাঁদের হাত-পা মুখের চামড়ার অবস্থা দেখে, ও তাঁদের কাছে পথের বিবরণ ও গিরি-ব্যাধির (Mountain Sickness) গল্প শুনে আমরা মোটেই উৎসাহিত হইনি। তবে আমরা পদব্রজে না গিয়ে অশ্বতরীর পৃষ্ঠে যা'ব শুনে, তাঁরা আমাদের আশ্বাস দিলেন যে আমাদের অসুস্থতার আশঙ্কা কম। রাত্রি নটা বাজতে না বাজতে আহারাদি সমাপন করে প্রত্যূষে যাত্রার কথা ভাবতে ভাবতে আমরা নিদ্রা দেবীর শরণাপন্ন হ'লাম।

১১ই অক্টোবর—কার্পোনাং।

প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে গ্যাণ্টকের ডাকবাংলোর প্রাঙ্গন আলোকিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শটি পিঞ্চু সকলকে—"Tea ready, Sir !"—বলে জানালেন। যত শীঘ্র সম্ভব বেশ প্রসাধন সমাধা করে আমরা সমবেত হ'লাম চায়ের টেবিলে। নূতনের সন্ধানে যাত্রা করছি, সকলের মন আনন্দে ভরপুর। চির অভ্যস্তযানবাহন ছেড়ে অশ্বতর পৃষ্ঠে পর্ব্বতারোহণের উৎসাহে মন প্রফুল্ল। শঙ্কা, সংশয় দূর হয়েছে, সংকল্প কার্য্যে পরিণত করতে চলেছি। এই যে প্রাতে চায়ের টেবিলে জলযোগ, এতেই আমাদের সারাদিনের মতো পেট ভরে যেত। পথে কারও নিতান্ত ক্ষুধা বোধ হ'লে Thermoflask-এর চা এবং পকেটস্থ চালকড়াই ভাজা, বিস্কুট বা মেওয়া ইত্যাদি একটু আধটু চর্ব্বন করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। পাউরুটি, মাখন, জেলি,ডিম, এক পেয়ালা দুধ, ইচ্ছামত চা, এই ছিল আমাদের প্রাতরাশ। এবারকার এই ভ্রমণেই প্রথম চায়ের

হোয়াইট্ মেমোরিয়াল হল

কদর বুঝলাম। চিরদিন আমি চা পানে অনভ্যস্ত। তবুও এই নিদারুণ শীতে হিমালয় শিখরে, পেয়ালার পর পেয়ালা শুধু গরম চা খেয়ে শুধু যে তৃষ্ণা নিবারণ হোত, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত ক্লান্তি কোথায় চলে যেত। এমন উপর্য্যুপরি দুদিন দিন গেছে যখন তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে এক ফোঁটাও ঠাণ্ডা জল খাবার দরকার বোধ হয়নি।

পান শেষ করে আমাদের তরুণের দল বিছানার ...ন্ চারটি বেঁধে নিলেন, রসদের বাক্সদুটি বাঁধবার ভার ...ছলেন স্বয়ং শটি পিঞ্চু। এই পিঞ্চু আমাদের দেশ-...র ইতিহাসে একজন স্মরণীয় ব্যক্তি। তিনি যে শুধু ...দের পথপ্রদর্শক ছিলেন তা নয়, ভদ্রলোক এমন সদালাপী, ...দপ্রিয় ও রসিক পুরুষ ছিলেন, যে আমাদের তাঁকে

গ্যাণ্টক—গুম্ফা

...র্য বন্ধু বলেই মনে হোত। সকাল সন্ধ্যা আহার্য্যের ...র, প্রত্যহ মালপত্র খোলা-বাঁধা, অশ্বতর পৃষ্ঠে মাল তোলা, ...ন, হিসাব রাখা, ডাকবাংলোয় পৌঁছে প্রত্যেকের সুবিধা-...বিধা দেখা, পথে প্রত্যেক যাত্রীর উপর নজর রাখা, এ ...ই তিনি এমন দরদ দিয়ে করতেন, যে মনে হোত, আমরা ...তাঁরই অতিথি হয়ে এই তিব্বত-ভ্রমণে বেরিয়েছি। এই ...পিঞ্চুকে রাজা দরজী একবার ভূটান দরবারের ব্যয়ে ...রে Tanning শিখবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি ...জী খুব পরিষ্কার বলতে পারাতে আমাদের ভারী সুবিধা ...ল। লোকটি সত্যিই চমৎকার। একজন অর্দ্ধসভ্য ...হাড়ীর মধ্যে এতো গুণের সমাবেশ দেখে আমরা সত্যই ...হয়েছিলাম।

বেলা ৯টায় মালপত্র পশুপৃষ্ঠে তুলে দিয়ে, আমরা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট মিউলের উপর সওয়ার হয়ে যাত্রা সুরু করলাম। যাত্রার ঠিক আগেই ডাকবাংলোর ইংরাজ পথিকরা উত্তরপূর্ব্ব কোণে এক বিশাল পর্ব্বতমালা দেখিয়ে বললেন, যে আমাদের ঐ পর্ব্বত পার হয়ে যেতে হ'বে। আর পাহাড়ের গায়ে সুতোর মত এক দাগ দেখিয়ে বললেন ঐ আমাদের পথ। ডাকবাংলো হ'তে রাস্তা খাড়া উঠে গেছে প্রায় মাইল খানেক। আধঘণ্টা চলবার পর আমরা গ্যাণ্টকের সাধারণ গুম্ফা বা Public Monastery দেখবার জন্য নামলাম। গুম্ফা কাষ্ঠ নির্ম্মিত এবং মহারাজের গুম্ফারই অনুরূপ; তবে ভেতরে সে রকম ছবি ও বিচিত্র কারুকার্য্য নেই। দেবমন্দির, লামার বাসস্থান, গর্ভগৃহ, গ্রন্থাগার, সব দেখে আধঘণ্টার মধ্যেই আবার পথ ধরলাম। এই গুম্ফা দর্শনের সময়ে জোঁকের আক্রমণ থেকে অনেক কষ্টে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। সুধীরবাবু

গুম্ফার অভ্যন্তরস্থ দেবমূর্ত্তি ও মন্দির

ছবি তোলবার মতলবে তাঁর ক্যামেরার Spool বদলাচ্ছিলেন। তাঁর মাথার টুপিটি খুলে ঘাসের ওপর রেখেছিলেন। যেই টুপী পরতে যাবেন, কি দেখেন তার চারপাশে সুতোর মত ১ ইঞ্চি লম্বা, দুটো কীট ঝুলছে। যদি না দেখে টুপী পরতেন, তাহলে সে সুতো দুটি রক্ত চুষে অচিরেই পেন্সিলের মত মোটা ও দু'ইঞ্চি লম্বা হয়ে যেত। জোঁকের মুখে নূন

না দিলে কিছুতেই তখন ছাড়ান যে'ত না। এই জোঁকের উপদ্রব সাত-আট হাজার ফুট পর্য্যন্ত অত্যন্ত বেশী। যাঁহারা পদব্রজে পাহাড় চড়েন, তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু নূন এইজন্য সঙ্গে রাখেন। সুধীরবাবুর টুপীর জোঁক দেখে আমরা পরস্পরের পায়ের দিকে নজর করে দেখি যে প্রত্যেকেরই বুটে একটি দুটি করে আশ্রয় নিয়েছেন। তাড়াতাড়ি সেখান হ'তে পালিয়ে, অপেক্ষাকৃত শুকনো জায়গায় গিয়ে জোঁকের আক্রমণ হ'তে নিজেদের বাঁচান গেল। ঐ জায়গা

কার্পোনাং ডাক-বাঙলো

হতে চারমাইল পথ খুব প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত সমতল। ঐ রাস্তায় গরুরগাড়ী ও মোটর যাতায়াত করতে পারে। ঐ চারমাইলের শেষে প্রায় গ্যাণ্টক ও কার্পোনং-এর মধ্যেপথে একটি গ্রাম পেলাম। তার নাম লাকৃপা। সেখানে পথের ধারে একটি কুটীরে মিউলের সহিসরা একটু বিশ্রাম করলে ও চা খেলে। কুটীরে একটি তক্তার ওপর তিব্বতীয় ভাষায় লেখা ছিল, "রেণক কাজী—পাকা গদি নং—" এইরূপ গদি আমরা সারা পথই পেয়েছিলাম। এগুলি সিকিম দরবার

হ'তে বন্দোবস্ত করা, আবগারী বা মদের
পাওয়া যায়। সিকিম দরবারের এই আবগারী
সবচেয়ে বেশী আয়। পাহাড়ীরা আবাল-বৃদ্ধ-
সিগারেট খায়। দেশীয় মাড়ওয়া নামে মদ সর্ব্বত্র
এই গদীগুলি রেণক কাজী সিকিম দরবার হ'তে
জমা লইয়া বিলি করিয়াছেন। আমরাও
মিনিট বিশ্রাম করলাম। যে যার বাহন হ'তে
হাতপা ছাড়িয়ে নিলাম। লাকৃপা গদী ছেড়ে
সঙ্কীর্ণ হয়ে অবশেষে bridle pathএ পরিণত
ক্রমশঃ আমরা ঘন বনানীর মধ্যে প্রবেশ করতে
পথের দৃশ্য সুন্দর হ'তে সুন্দরতর বোধ হ'তে লা
অন্ধকার ঘনঘোর বনের মধ্যে কখনও বৃক্ষান্তর
সূর্য্যালোকিত বনপথে, কখনো বা ভাসমান
মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে পথের ক্লান্তি বা
অনুভব করবার অবসর ছিলনা। পথ ক্রমশঃই
উচ্চে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। স্থানে স্থানে একেবারে
গায়ে রাস্তা যেন ঝুলে আছে বলে মনে হ
প্রায় নয় মাইল যাবার পর একটি পাহাড়ের বাঁ
গেল, দূরে উচ্চে বৃক্ষপল্লবে বিহঙ্গনীড়ের মতো
সংলগ্ন কার্পোণাং এর মনোরম ডাকবাংলো।
সময় আমরা পৌছিলাম সেই ডাকবাংলোতে
খচ্চরগুলিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল। মাল
সঙ্গে পিঞ্চু এক দুঃসংবাদ দিলেন যে একটি মি
যে মাল বোঝাই ছিল তার মধ্যে এক কেরোসিনে
হওয়াতে প্রায় কুড়িখানি পাঁউরুটি একেবারে নষ্ট
আমরা সে পাঁউরুটির আশা পরিত্যাগ কর
দেখলাম যে মিউলের সহিসরা কেরোসিন-সি
মহাউল্লাসে খেয়ে মেরে দিলে! কার্পোনাং গ্যাণ্ট
মাইল। এর উচ্চতা ৯৭০০ ফুট। নেমে
উত্তাপ দেখলাম ৬০° ডিগ্রী। পরদিন প্রত্যূষে
কমে ৪৫° হ'ল। কার্পোনাংএর ডাকবাংলোর
আগে ও তারপরে আর কোনও লোকালয়
পাহাড়ীরা অত উচ্চে বাস করেনা। নীচে
ভূমিতে থাকতে ভালবাসে। ডাকবাংলোর

ছাড়া লোকালয়ের আর কোনও চিহ্ন

পথে যতগুলি ডাকবাংলো পেয়েছিলাম তা'র ডাকবাংলোই সব চেয়ে চমৎকার। একটী ৫০ ফুট লম্বা কাচে ঘেরা বারান্দা আছে মুখের পর্ব্বতমালার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ । তা ছাড়া তিনখানি সংলগ্ন স্নানের ঘর টি খানা-কামরা। সবগুলিই আসবাবপত্রে বৃটিশ গভর্মেণ্টের শাসননীতির অনুস্বরূপ র্বত্র কি নিবিড় অরণ্যে, কি ধূসর প্রান্তরে, সুসজ্জিত পান্থনিবাসের সৃষ্টি এর প্রশংসা না না। পথশ্রান্ত অবসন্ন পথিকের পথের ক্লান্তি এই যে সব পান্থনিবাস স্থাপিত হয়েছে এর নী ছাড়া কে বুঝবে? প্রবীণ সাহিত্যিক ও নবীন সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল পথের যাত্রীদের দুঃসহ ক্লেশের যে বর্ণনা কথা তখন মনে পড়ল। যে পথে প্রতিবৎসর যাত্রী জীবন পণ ক'রে একটী বার দেবদর্শনের পিত হ'য়ে যাতায়াত করে সে পথে কেন কেউ বিনোদনের জন্য এরূপ পান্থনিবাসের ব্যবস্থা থে কষ্ট ভোগ না করলে কি পুণ্যফল কম হয়? এ দ্রষ্টব্য কিছুই নেই। সুতরাং ডাক-ম এবং নিজেদের কাজকর্ম্ম ছাড়া অন্য কিছুই আমাদের তরুণ সহযাত্রীরা সকলের Holdall তে দিয়ে বৈকালিক চা ও জলযোগ শেষ করে পহার সেই মাংসখণ্ড নিয়ে চপ তৈরী করতে । সুধীরবাবু ডাকবাংলোস্থিত পুস্তকাবলীর মধ্য থেকে একটি ইংরাজি উপন্যাস বেছে নিয়ে তাইতে মন দিলেন। প্রতি ডাকবাংলোতেই ইংরেজ পথিকদের সময় কাটাবার জন্য কয়েকখানি ক'রে ইংরাজী উপন্যাস ও পুরোনো মাসিকপত্র রাখা থাকে। আমি আমাদের যাযাবর জীবনের সূত্রপাত হ'তে আরম্ভ করে ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পকেট বইতে লিখতে বসলাম। সন্ধ্যা পড়তেই শীত এমন

কার্পোনাং ডাক বাঙলোয় অবতরণ

বেড়ে গেল যে চৌকীদার প্রতি কামরায় অগ্নিকুণ্ডে কাঠ জেলে দিয়ে গেল। ৯টার মধ্যেই নৈশ ভোজনের সমাধা করে তরুণের দলকে তাঁদের রন্ধন নৈপুণ্যের জন্য স্তুতিবাদ করতে করতে আমরা শয্যাগ্রহণ করলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

তুমি চলে গেছ

শ্রীঅমিয়কুমার রায়চৌধুরী

১

তুমি চলে গেছ করিয়া আঁধার
হৃদয় মম,
হেরিতে তোমারে পাইনি সময়
হে নিরুপম !
স্বপনের মাঝারে কল্পনা বনে,
কেটেছে শুধুই পুষ্প চয়নে,
এসেছ যখন, তখনো আঁধার
গভীরতম ;
নিদ্রাভিভূত ছিলাম সুপ্ত
কলিকা সম !

২

কোমল হস্ত বুলায়ে আমারে
ডেকেছ কত,
শুনিতে পাইনি এমনি কঠোর
বজ্রাহত !
ডেকে ডেকে চলে গিয়াছ যখন,
তন্দ্রা টুটিয়া উঠিনু তখন,
ম্লান রজনীতে রয়েছে গগন
তন্দ্রারত ;
হেরিনু আমারে ত্যজিয়া গিয়াছ
পরের মত !

৩

তুমি চলে গেছ তখনো প্রভা
হয়নি নিশি,
লীন দিগন্তে ঢলিয়া পড়েনি
পাণ্ডু শশী !
বকুল গন্ধে আকুলিত বন,
কুলায়ে বিহগ কুজেনি তখ
আধ ফোটা ফুল রঙিন পা
মেলেনি হাসি ;
অরুণ আলোকে রাঙেনি এ
পূরব দিশি !

৪

মন্দ মধুর বহে যায় হাওয়
কেয়ার বনে,
স্রোত ধারা তার স্নিগ্ধ সুব
বহিয়া আনে !
মিলন-যামিনী করিয়া ছিন্ন
রাখিয়া কেবল চরণ-চিহ্ন,
তুমি চলে গেছ বিরহের ব্য
হানিয়া প্রাণে ;
এ জীবনে প্রিয় হবে কি
তোমার সনে ?

———

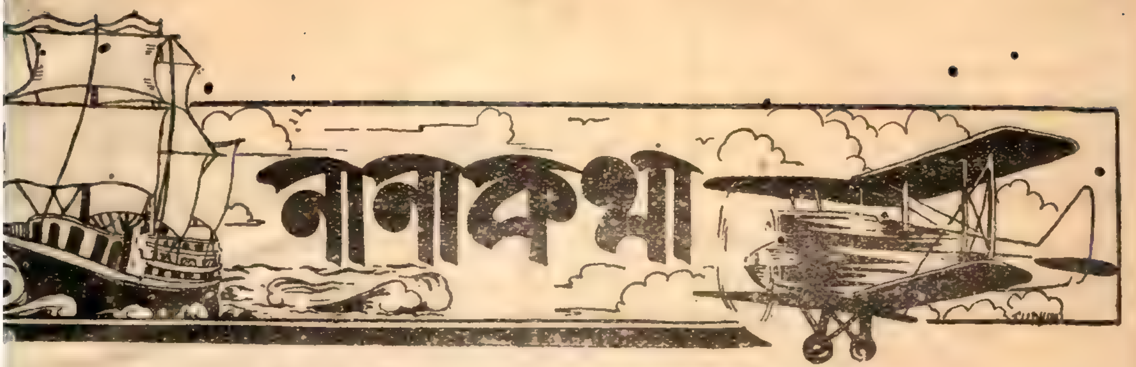

...াট অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ

সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ সমস্ত জগতের ...ত একটা প্রবল নাড়া দিয়েছে। ত্যাগের মহিমার প্রভাবে

সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড

জন্ম—২৩ জুন ১৮৯৪

সিংহাসন গ্রহণ—২০ জানুয়ারী ১৯৩৬

সিংহাসন ত্যাগ—১১ ডিসেম্বর ১৯৩৬

...াক্ বা না হোক, ঘটনার অপরূপত্বের এবং বিরলত্বের ...চয়ই। বহু প্রাচীন কালের কথা বাদ দিলে, এরূপ ...য়ি ত্যাগের কথা কেহ কখনো শোনে নি।

এই ত্যাগের মূলে প্রকৃতপক্ষে কি আছে, নারী প্রেমের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, না রাজোচিত আস্তিকতার প্রতি শৈথিল্য, না প্রচলিত রাজনীতির অনমনীয়তার বিরুদ্ধে চিত্ত প্রয়োগ,—এসকল কথা উপস্থিত আমরা কিছুই জানিনে এবং জানবার প্রয়োজনও তেমন নেই। আমরা শুধু এই জানি যে, নারী প্রেমের সহিত সসাগরা ধরণীর অধিশ্বরত্বের যুদ্ধে

নারী-প্রেমই জয় লাভ করল। মানুষের কাছে মানুষের গড়া রাজ্য এবং রাজ সম্পদ পরাভূত হ'ল। এই মানুষ যদি রাষ্ট্রাভিজাত্যের দৃষ্টিতে হেয় বিবেচিত হয়, তদ্দ্বারা এই ত্যাগের মহিমা কমে না, বরং বাড়ে। কয়লার খনি মধ্যে অবস্থিত হীরকের মূল্য কয়লার মূল্যের দ্বারা নিরূপিত হয় না। হীরক সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদাই হীরক। মনের খনির

বর্ত্তমান সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ, রাজমহিষী এবং ক্রোড়ে ইংল্যাণ্ডের রাজসিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী প্রিন্সেস এলিজাবেথ

বিষয়েও সেই একই কথা। এত বড় ত্যাগের বিরাটত্বকে যেন আমরা অবান্তর বস্তুর বর্ণ দিয়ে মলিন না করি। রাজ সিংহাসন হ'তে অবরূঢ় মিষ্টার উইণ্ডসর তাঁর ত্যাগের দিক দিয়ে জগতের শ্রদ্ধা পাবেন তা নিঃসন্দেহ।

সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের পরিত্যক্ত সিংহাসনের অধিকারী হলেন তাঁর সহোদর ডিউক অফ ইয়র্ক অধুনা সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ। আমরা আমাদের নূতন রাজ্যেশ্বরকে অভিনন্দিত করছি।

কৃষ্ণকুমার মিত্র

গত ৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৬ শনিবারে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা প্রবীণ সম্পাদক দেশপূজ্য সাংবাদিক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশ ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স পরিণত হয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু এ বয়সেও তিনি কার্য্যক্ষ হননি, এমন কি মৃত্যুর দিন সকাল বেলাও প্রাতঃভ্রমণ ক' এসেছিলেন, অকস্মাৎ হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র ৫৪ বৎসর বিশেষ যোগ্যত সহিত তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদনা করেন তাঁর পূর্ব্বে তিনি "বঙ্গবাসী" পত্রে যোগ দিয়েছিলেন কি উক্ত সংবাদ পত্রের মতধারার সহিত তাঁর নিজ মতের ঐ না হওয়ায় সে সংশ্রব পরিত্যাগ করে কতিপয় বন্ধুর সহি মিলিত হয়ে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা স্থাপিত করেন। চা বাগানে কুলীদের উপর অত্যাচার নিবারণের জন্য এবং শ্রমিকদে মধ্যে অহিফেন এবং মদ্যপান বন্ধ করবার জন্য সঞ্জীবনী মধ্যে নিরবসর আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্টের ঐ সকল বিষ বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছিল। চরিত্রের দৃঢ়তা এ ...শের জন্য স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার দেশের লোকের গভ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দো তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন বিশিষ্ট সহযো ছিলেন। ১৯০৮ সালে অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতির সহি গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক আটক বন্দী হন।

তিনি দীর্ঘকাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এবং মৃত্যু পর্য্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি ছিলেন। নারী নিগ্র নিবারণের তিনি একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন, এবং বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এবং কর্ম্মশীলতার জন্য দেশের ক তিনি বরেণ্য হয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সুকু মিত্র এবং দুই বিবাহিতা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী বসু ও শ্রী বাসন্তী চক্রবর্ত্তীকে আমরা আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন কর

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের অষ্টম বার্ষি অধিবেশন

উক্ত সম্মিলন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সংবাদদা বিতরণ আমরা নিম্নে প্রকাশিত করলাম।

"গত ৪ঠা হইতে ৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত মজঃফরপুরে 'নিখিল সঙ্গীত মহাসম্মিলনের' অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন অতি রাহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিহার শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী সৈয়দ আব্দুল আজিজ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত ন। ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞগণ লনে যোগদান করেন। সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর ্যাপাধ্যায়, নৃত্য কিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়ালি মহম্মদ পূর্ব্রতলা স্টেট) বি, কে, দেওধর (বোম্বে] আগা জুদ্দিন হাইদার [লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজ] ছাত্রছাত্রী গণের ত প্রতিযোগীতার বিচারক মনোনীত হইয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়ক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ম্বর অপরাহ্নে সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা ও প্রবন্ধাদি শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ভারত শ্রেষ্ঠ গুণীগণ ঐ সভার সভ্য মনোনীত াচনায় যোগদান করেন। সমাগত সঙ্গীত-ধ্য সঙ্গীত নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ত ওঙ্কারনাথ, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য ইনায়ৎ খাঁ, ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী, নারায়ণ াদবর্দ্ধন, শম্ভুপ্রসাদ মিশ্র, আব্দুল আজিজ খাঁ, দিলীপ চাঁদ বেদী, গণপৎ রাও, কুমার গন্ধর্ব্ব, নসির খাঁ ওয়ালি মহম্মদ, মিসেস বালা সরস্বতী [নৃত্য] ছোটে খাঁ, আগা হাইদার, বি, কে, দেওধর, এন্ কৃষ্ণমূর্ত্তি, বীণাপাণি মুখার্জি, সুষমা দে, শান্তা অমলাদী, মুস্তাক আলি, অনাথ বসু কৃষ্ণচন্দ্র দে, সুনীল বোস, রথীন চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৮ই নভেম্বর রাত্রিতে প্রতিযোগিতায় কৃতী ছাত্রছাত্রীগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর প্রসাদ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমেই এই সম্মিলন এতাদৃশ সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতার সুবিখ্যাত খেয়াল ও ঠুমরী গায়ক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু তাঁহার নারীকণ্ঠের ঠুমরী গাহিয়া ও ভারত বিখ্যাত গীতশিল্পী—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ সঙ্গীত রত্নাকর, অতি উচ্চাঙ্গের সুমধুর খ্যাল গান গাহিয়া সভাস সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন। উন্নতিশীলা নৃত্য-শিল্পী কুমারী দীপিকাদের নৃত্যও সকলকে সন্তোষ প্রদান করে।"

অন্তরীণদের আত্মহত্যা

অল্পদিনের মধ্যে তিনজন অন্তরীণ আত্মহত্যা করায় দেশের লোকের মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছে। গত ২২শে সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানায় নবজীবন ঘোষ গত ১৭ই অক্টোবর দেওলী ডিটেনশন ক্যাম্পে সন্তোষচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং গত ২২শে নভেম্বর মালদহে পিতৃগৃহে কৃষ্ণপঙ্কজ গোস্বামী আত্মহত্যা করেছেন। এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে তদন্ত হওয়ার পূর্ব্বে আত্মহত্যাগুলির কারণ কি তা বলা সম্ভবপর নয়। এবং তদন্তের ফলে যতদিন না সঠিক কিছু জানা যাচ্ছে ততদিন আত্মহত্যাগুলি আত্মহত্যাকারীদের দুর্ব্বলচিত্ততার ফল বলেই মনে করা সমীচীন। আমরা আশা করি অচিরে তদন্তের ফল প্রকাশ করে গভমের্ণ্ট দেশের লোকের চিত্ত নিরুদ্বেগ করবেন।

বোর্ণ-ভিটা দুগ্ধ-পানালয়

লক্ষ্ণৌ প্রদর্শনীতে এবার একটি সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই দুগ্ধ-পানালয়ে ক্যাডবরির বোর্ণ-ভিটা

সংযুক্ত দুধের নানা প্রকার পানীয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, চায়ের দোকানে চা পানের মত এখানে দুগ্ধ পান করা চলে। এরূপ দুগ্ধ-পানালয় ভারতবর্ষে এই প্রথম, যদিও পৃথিবীর অপরাপর দেশে এর প্রবর্ত্তন ইতিপূর্ব্বেই হয়েছে।

শরীর রক্ষা ও শরীর পুষ্টির পক্ষে দুগ্ধ অতিশয় প্রয়োজনীয় এবং উপকারী বস্তু। দুগ্ধপানের দোকান এবং দুগ্ধপানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'লে গো সমস্যার দিকে সহজেই সাধারণের মন আকৃষ্ট হবে—এবং দুগ্ধের পরিমাণ এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধির ফলে দেশের লোকের স্বাস্থ্যও উন্নত হবে। কেবলমাত্র অমিশ্রিত দুগ্ধপান রুচিকর না হতে পারে, সুতরাং দুগ্ধের সহিত বোর্ন-ভিটা অথবা অনুরূপ পদার্থ মিশ্রিত করে দুগ্ধ পানীয়ের বৈচিত্র্য এবং সুস্বাদ সম্পাদন করা যেতে পারে।

লক্ষ্ণৌ একজিবিশনে এই দুগ্ধ পানালয়টির উদ্বোধনের সময়ে যুক্ত প্রদেশের শিল্প-মন্ত্রী স্যার জোয়ালা প্রসাদ শ্রীবাস্তব যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তা থেকে সামান্য একটু অংশ আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করলাম।

"If milk could be made the basis of attractive drinks available wherever men or women collect in social gatherings the milk-drinking habit would become a national custom to the benefit of national health on the one hand and the development of the dairy industry on the other.

"Milk Bars were started in many big cities of America and rapidly became popular. They are now an important feature of the social and economic life of the United States.

"The movement has been taken up in other countries. The first Milk Bar in London was opened in 1935 in Fleet Street, where busy folk need quick service of nourishing food. They now are numerous throughout England. In South Africa the first Milk Bar was opened at the recent Empire Exhibition in Johannesburg. It is now Lucknow's turn to lea[d the] way in India, at this great Industri[al and] Agricultural Exhibition.

ওরিয়েণ্টাল গভর্মেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ অ্যাসিওরেন্স কোং লিমি[টেড]

উক্ত কোম্পানীর প্রেরিত গত ১৯৩৫ সালের [...] পাঠ করে আমরা কোম্পানীর সর্ব্বতোমুখী উন্নতি [...] বিশেষ আনন্দ লাভ, করেছি। ভারতীয় বীমা কো[...] মধ্যে "ওরিয়েণ্টালের" স্থান ও মর্য্যাদা বিশেষভাবে [...] জনক। রিপোর্ট হ'তে সঙ্কলিত কয়েকটি বিষয় বিবৃতি [...] কোম্পানীর সমুন্নত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে।

নূতন চুক্তি। আলোচ্যবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮,৮২৩[...] প্রস্তাব উপস্থিত হয়েছিল; ঐ প্রস্তাব সমূহের মোট তায়[দাদ] ৩৬, ০১, ৪৭৬৲ টাকা। উহার মধ্যে মোট ৮, ৮৯, ৮৯, [...] টাকার ৪৮,৮৫৮ প্রস্তাব পলিসির পরিণত হয়েছিল [...] পলিসির বার্ষিক প্রিমিয়মের তায়দাদ ৪৮, ৫৯, ৮২[...] পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি—৬,৪৮০ পলিসি ও [...] টাকা বীমার তায়দাদ।

বলবৎ পলিসি। মোট ৫৯,২৫,৩২,০৩৮ [...] ২,৯০,৬৭২টি পলিসি বলবৎ আছে।

দাবী। মায় বোনাস দাবী মেটানোর মোট ১,১৩,৩৩,০৪০৲ টাকা।

আয় ব্যয়। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর মোট ৩,৪৯,১৬,৪১১৲ টাকা ইহার মধ্যে ২,৬৬,২১,১৯৪ প্রিমিয়ম হ'তে প্রাপ্ত (গত বৎসরের চেয়ে ২৬,[...] টাকা বেশী, সুতরাং ১,৪৭,৭৩,৬৪৮৲ টাকা উদ্বৃত্ত।

ব্যয় হার (Expense Ratio)। প্রিমিয়ম আ[...] ব্যয়ের হার শতকরা ২২.৪। পূর্ব্ব বৎসরে [...] ২০.১।

ডিভিডেণ্ট। শেয়ার হোল্ডারদিগকে প্র[...] কমট্যাক্স মুক্ত ১২৫৲ টাকা ডিভিডেণ্ট দে[...]

জীবন বীমা

...মানুষের জীবনে অনিবার্য্য বস্তু। ইহার দ্বারা বৃদ্ধ বয়সে তাহার নিজের মঙ্গল সাধিত হয় এবং মৃত্যুর পর স্ত্রীর এবং পুত্রকন্যার সংস্থান করা চলে।

...রিয়েণ্টাল পলিসী সমূহের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জীবন বীমার চিত্তাকর্ষক ব্যবস্থা পাওয়া যায় যদ্দ্বারা সন্তান সন্ততিগণের শিক্ষা এবং বিবাহের ব্যয় প্রভৃতি জীবনের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান হয়।

...লিখিত লোভনীয় ওরিয়েণ্টাল পলিসী সমূহের মধ্যে যে-কোনটি গ্রহণ করিলে, আপনার যাহা-কিছুই হউক না কেন আপনার পোষ্যবর্গ কষ্টে পড়িবে না।

...রাণ্টিড ট্রিপল বেনি-...পলিসি উইথ ভ্যালু-...জীশন্যাল অফসনস

...এবং পারিবারিক সংস্থানের ...হারে আদর্শ ব্যবস্থা। লগ্নী ...বন বীমার ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ...ব্যবস্থা এপর্য্যন্ত হয় নাই।

* ওরিয়েণ্টাল স্পেশাল হোল লাইফ পলিসী

পারিবারিক সংস্থানের জন্য জীবন বীমার সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক পদ্ধতি। এই বিশেষ পলিসিতে প্রিমিয়াম দেওয়া টাকা কিছুতেই বীমায় প্রাপ্য টাকাকে অতিক্রম করিবে না।

* পারফেক্ট প্রোটেকশন পলিসী

তরুণ স্বামী এবং পিতার পক্ষে সবিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। শোচনীয় অকাল মৃত্যুর অবস্থায় বিধবা স্ত্রী এবং পরিবারবর্গের প্রতিপালনের জন্য নিরাপদ অর্থ-ব্যবস্থা।

লিমিটেড পেমেণ্ট লাইফ পলিসী

...ক সংস্থানের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ...প্রণালী। স্বল্পহার অথচ নিরাপদ।

* এডুকেশনাল এ্যানুইটিজ এণ্ড ম্যারেজ এণ্ডাউমেণ্ট

প্রধানতঃ পিতামাতার পক্ষে অগ্রহের বস্তু। ছেলে এবং মেয়েদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

* এণ্ডাউমেণ্ট পলিসী

জীবন বীমার সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় প্রণালী। একত্রে বার্দ্ধক্য এবং সংসারের জন্য সংস্থান।

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৭ কোম্পানীর অল্প বয়ের ত্রৈবার্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণ হইবে। ঐ তারিখের পূর্ব্বে সম্পন্ন সমস্ত লাভসহ পলিসী গত তিন বৎসরের লভ্যাংশের ভাগ পাইবেন।

বিলম্ব করিবেন না—এক্ষণি একখানি ওরিয়েণ্টালের বীমাপত্র গ্রহণ করুন

...জার, ওরিয়েণ্টাল বিল্ডিংস, বম্বে অথবা ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিস, ২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা এই ঠিকানায় একখানা পোষ্ট কার্ড লিখিলেই উল্লিখিত সমস্ত বা যে-কোন একটি ব্যবস্থার বিস্তারিত সংবাদ অবিলম্বে পাঠানো হইবে।

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এ্যাসিওরেন্স কোং লিঃ

(ভারতে প্রতিষ্ঠিত)

অফিস ঃ— ওরিয়েণ্টাল বিল্ডিংস, বম্বে

অন্তরীণদের মুক্তি

আগামী জানুয়ারী মাসে গভর্মেণ্ট একশত অন্তরীণকে মুক্তি প্রদান করবেন। এই সকল অন্তরীণকে গভর্মেণ্ট কৃষি এবং শিল্প বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন, এবং মুক্তিলাভের পর নিজ নিজ শিক্ষালব্ধ বৃত্তি পরিচালনার জন্য গভর্মেণ্ট এদের অর্থ সাহায্যও করবেন। রাজবন্দীদের বিষয়ে গভর্মেণ্টের এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ, এবং এতদ্বারা দেশের লোকের মনে সন্তোষ উৎপন্ন হয়েছে।

নূতন শাসন পদ্ধতি ও তৎসংক্রান্ত নির্ব্বাচন

নূতন শাসন পদ্ধতি অনুযায়ী আগামী ১লা এপ্রিল ১৯৩৭ হ'তে ভারতবর্ষ শাসিত হবে। তৎসংক্রান্ত সদস্য নির্ব্বাচনের দিন আসন্ন। সদস্যপদ প্রার্থীদিগকে ভোট দেবার জন্য ভোটারগণ যেন বিশেষরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক অগ্রসর হ'ন এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। ১৯৩৫ সালের গভর্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট যদি আমাদের পক্ষে ক্ষতিজনক এবং গ্লানিকর হ'য়ে থাকে তা হ'লে ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে আমাদের আরও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত, কারণ আগামী শাসনতন্ত্রের সদস্তগণের বুদ্ধি বিবেচনা, পদমর্য্যাদা, জনসাধারণের উপর প্রভাব, কার্য্যক্ষমতা, ক্রিয়াশীলতা প্রভৃতি গুণেরই উপর ভবিষ্যতে এই শাসনতন্ত্রের সংশোধন এবং পরিবর্ত্তন নির্ভর করছে। সমাজে এবং জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা সুপরিচিত এবং আদৃত, যাঁরা দেশের এবং জনসাধারণের সেবায় সকলের শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন। নির্ভীক, স্বাধীনচেতা এবং স্থিরবুদ্ধি ব'লে যাঁদের খ্যা অর্থাভাবের অসুবিধা এবং গ্লানি যাঁদের নেই, ব্যক্তিরাই সদস্য নির্ব্বাচিত হবার যোগ্য।

আমরা অবগত হয়েছি কলিকাতার প্রসিদ্ধ না বাহাদুর প্রমথনাথ মল্লিক মহাশয় কলিকাতার সাধা টুয়েন্সি হ'তে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্ব্বাচিত হবার জন্য প্রার্থী হয়েছেন। র প্রমথনাথের মতো উচ্চশিক্ষিত দেশহিতৈষী ব নির্ব্বাচিত হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব'লে আমরা বি কলিকাতা কর্পোরেশনে, কলিকাতা ইনপ্রুভমেণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থানীয় বোর্ডের মেম্বাররূপে, পুলিশ সংশোধনের স্পেশ্যাল কমিটিতে তাঁর যোগ্যত ক্রিয়াশীলতা সর্ব্বজনবিদিত।

শিক্ষা সংস্কৃতি এবং দেশ সেবার বিশিষ্ট কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অফিসিয়েটিং স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গলা দেশের ভূম্যধিকারিগণের অগ্রগণ্য দেশহিতৈষী বর্দ্ধমানের ধিরাজ বাহাদুর, ভূতপূর্ব্ব মিনিষ্টার স্বদেশভক্ত রাজাবাহাদুর, চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ স্বনামধন্য স্যার উ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহোদয়গণ রায় বাহাদুর প্রমথন মহাশয় সদস্যপদ প্রার্থী হওয়ায় বিশেষ আনন্দ প্রকা তাঁদের সম্পূর্ণ সহায়তা দানে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। প্রমথনাথ মল্লিক মহাশয়ের মতো সর্ব্বতোভাবে উপযু নির্ব্বাচিত হলে সকলেরই আনন্দের কারণ হবে।

Edited by Upendranath Ganguli, Printed by Bishnupada Chakravarti at Sahitya-Bhaban Press, 21, Holwel Lane, Calcutta and Published by Saratchandr Mukherjee from 27-1, Fariapooker Street, Calcutta.